বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র

বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র

প্রথম খণ্ড

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিভূতিভূষণ
গল্পসমগ্র

আমার লেখা

আমি কেমন করে লেখক হলাম, এ আমার জীবনের, আমার নিজের কাছেই, একটা অদ্ভুত ঘটনা। অবশ্য হয়তো একথা ঠিক, নিজের জীবনের অতি তুচ্ছতম অভিজ্ঞতাও নিজের কাছে অতি অপূর্ব। তা যদি না হত, তবে লেখক জাতটারই সৃষ্টি হত না। নিজের অভিজ্ঞতাতে এরা মুগ্ধ হয়ে যায়—আকাশ প্রতিদিনের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে কত কল্পনাকে রচনা করছে যুগে যুগে—তারই তলে কত শত শতাব্দী ধরে মানুষ নানা তুচ্ছ ঘটনার মধ্য দিয়ে নিজের দিন কাটিয়ে চলেছে; মানুষের জন্ম-মৃত্যু আশা-নৈরাশ্য, হর্ষ-বিবাদ, ঋতুর পরিবর্তন, বনপুষ্পের আবির্ভাব ও তিরোভাব—কত ছোট বড় ঘটনা ঘটে যাচ্ছে পৃথিবীতে—কে এসব দেখে, এসব দেখে মুগ্ধ হয়?

এক শ্রেণীর মানুষ আছে যাদের চোখে কল্পনা সব সময়েই মোহঅঞ্জন মাখিয়ে দিয়ে রেখেছে। অতি সাধারণ পাখীর অতি সাধারণ সুরও তাদের মনে আনন্দের ঢেউ তোলে, অস্তদিগন্তের রক্তমেঘস্তূপ স্বপ্ন জাগায়, আবার হয়ত তারা অতি দুঃখে ভেঙে পড়ে। এরাই হয় লেখক, কবি, সাহিত্যিক। এরা জীবনের সাংবাদিক ও ঐতিহাসিক। এক যুগের দুঃখবেদনা আশা আনন্দ অন্য যুগে পৌঁছে দিয়ে যায়।

আমার জীবনের সেই অভিজ্ঞতা তাই চিরদিনই আমার কাছে অভিনব, অমূল্য, দুর্লভ হয়ে রইল। যে ঘটনা আমার জীবনের স্রোতকে সম্পূর্ণ অন্য দিকে বাঁক ফিরিয়ে দিয়েছে—আমার জীবনে তার মূল্য অনেকখানি।

১৯২২ সাল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি নিয়ে ডায়মণ্ডহারবার লাইনে একটা পল্লী-গ্রামের হাইস্কুলে মাস্টারি চাকুরি নিয়ে গেলুম আষাঢ় মাসে।

বর্ষাকাল, নতুন জায়গায় গিয়েছি। অপরিচিতের মহলে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করছি। বৈঠকখানা ঘরের সামনে ছোট্ট একটু ঢাকা বারান্দাতে একলা বসে সামনে সদর রাস্তার দিকে চেয়ে আছি, এমন সময় একটি ষোল-সতের বছর বয়সের ছেলেকে একখানা বই হাতে যেতে দেখে তাকে ডাকলাম কাছে। আমার উদ্দেশ্য, তার হাতে কি বই দেখব এবং যদি সম্ভব হয় পড়বার জন্যে চেয়ে নেব একদিনের জন্যে।

বইখানা দেখেছিলাম, একখানা উপন্যাস। তার কাছে চাইতে সে বললে, এ লাইব্রেরির বই, আজ ফেরত দেওয়ার দিন। আপনাকে তো দিতে পারছি নে, তবে লাইব্রেরি থেকে বই বদলে এনে দেব এখন।

—লাইব্রেরি আছে এখানে?

—বেশ ভাল লাইব্রেরি, অনেক বই। দু আনা চাঁদা।

—আচ্ছা চাঁদা দেব, আমায় বই এনে দিও।

ছোকরা চলে গেল এবং ফেরবার পথে আমাকে একখানা বই দিয়েও গেল। আমি তাকে বললম—তোমার নামটি কি হে?

সে বললে—আমার নাম পাঁচুগোপাল চক্রবর্তী, কিন্তু এ গ্রামে আমাকে সবাই বালক-কবি বলে জানে।

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম—বালক-কবি বলে কেন? কবিতাটবিতা লেখ নাকি?

ছেলেটি উৎসাহের সঙ্গে বললে—লিখি বই কি। না লিখলে কি আমাকে বালক-কবি নাম দিয়েছে? আচ্ছা কাল এনে দেখাব আপনাকে।

পরদিন সে সকাল বেলাতেই এসে হাজির হল। সঙ্গে একখানা ছাপানো গ্রাম্য মাসিক পত্রিকা গোছের। আমাকে দেখিয়ে বললে—এই দেখুন, এই কাগজখানা আমাদের গাঁ থেকে বেরোয়। এর নাম 'বিশ্ব'। এই দেখুন প্রথমেই 'মানুষ' বলে কবিতাটি আমার। এই আমার নাম ছাপার অক্ষরে লেখা আছে কবিতার ওপরে—বলেই ছোকরা সগর্বে কাগজ-খানা আমার নাকের কাছে ধরে নিজের নামটি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। হ্যাঁ সত্যিই—লেখা আছে বটে, কবি পাঁচুগোপাল চক্রবর্তী। তাহলে তো নিতান্ত মিথ্যা বলে নি দেখছি।

কবিতাটি সে-ই আমায় পড়ে শোনালে। বিশ্বের মধ্যে মানুষের স্থান খুব বড়—ইত্যাদি কথা নানা ছাঁদে তার মধ্যে বলা হয়েছে।

অবশ্য কাগজখানা দেখে আমার খুব ভক্তি হল না। স্টেশনের কাছে একটা ছোট প্রেস আছে এখানে, সেই প্রেসেই ছাপানো—অতি পাতলা জিল-জিলে কাগজ। পত্রিকাখানিকে 'মাসিক' 'পাক্ষিক' ইত্যাদি না বলে 'ঐকিক' বললেই এর স্বরূপ ঠিক বোঝানো হয়। অর্থাৎ যে শ্রেণীর পত্রিকা গ্রামের উৎসাহী লেখা-বাতিকগ্রস্ত ছেলে-ছোকরার দল চাঁদা তুলে একটিবার মাত্র বার করে, কিন্তু পরের বারে উৎসাহ মন্দীভূত হওয়ার দরুন আশানুরূপ চাঁদা না ওঠাতে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়—এ সেই শ্রেণীর পত্রিকা।

তবু আমার ঈর্ষা না হয়ে পারল না। আমি লিখি না বা লেখার কথা কখনও চিন্তাও করি না। অথচ এতটুকু ছেলে—এর নাম দিব্যি ছাপার অক্ষরে বেরিয়ে গেল। এর ওপর আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা হল, মনে ভাবলাম, বেশ ছোকরা তো! অক্ষর মিলিয়ে মিলিয়ে কেমন কবিতা লিখেছে! সাহিত্যের সমঝদারিত্ব তার মধ্যে ছিল তা আমি জানি। তখনকার আমলের একজন বিশেষ লেখকের বই না থাকলে পল্লীগ্রামের কোন লাইব্রেরি চলত না। সেই লেখকের এক একখানা বই-এর তিন চার কপি পর্যন্ত রাখতে হত কোন কোন বড় লাইব্রেরিতে।

ছেলেটি বলত—ওসব ট্র্যাশ-ট্র্যাশ! দেখবেন ওসব টিকবে না।

এক একদিন পাঁচুগোপাল আমাকে নিয়ে গ্রামের মাঠে বেড়াতে যেত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের চোখও তার বেশ ছিল— মাঝে মাঝে মুখে মুখে কবিতা তৈরী করে আমাকে শোনাত। অনেকগুলো কবিতা হলে পর একটা কবিতার বই ছাপাবে এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করত। সেই সময় কলকাতার কোনও 'পাবলিশিং হাউস' ছয়-আনা গ্রন্থাবলী প্রকাশ শুরু করে দিল—তার প্রথম বই লিখলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের বইখানি স্থানীয় লাইব্রেরি থেকে পাঁচুগোপাল আমায় এনে দিয়ে বললে—"এ বই নিতে ভিড় নেই। নতুন এসেছে, এক-আধজন নিয়েছিল, কাল ফেরত দিয়ে গিয়েছে, কিন্তু দেখুন গে যান অমুকের বই-এর জন্যে কি যে মারামারি। ডিটেকটিভ উপন্যাস না রাখলে লাইব্রেরি উঠে যাবে। কেউ চাঁদা দেবে না।" পরের মাসে আর একখানি বই বেরুল। সেখানা আমার কাছে নিয়ে এসে সে বললে—"আমি একটা কথা ভাবছি, আসুন আপনাতে আমাতে এই রকম উপন্যাস সিরিজ বের করা যাক। খুব বিক্রি হবে, আর একটা নামও থেকে যাবে। আপনি যদি ভরসা দেন, আমি উঠে পড়ে লাগি।" আমি বিস্ময়ের সুরে বললাম—"তুমি আর আমি দুজনে মিলে বই-এর কারবার করব, এ কখনও সম্ভব? এ ব্যবসার আমরা কিই বা জানি? তা ছাড়া, বই লিখবেই বা কে? এতে লেখকদের পারিশ্রমিক দিতে হবে, সে পয়সাই বা দেবে কে?"

সে হেসে বললে—"বাঃ তা কেন, বই লিখবেন আপনি, আমিও দু-একখানা লিখব।

পরকে টাকা দিতে যাব কেন।"

বাংলা সাহিত্যকে ভালবাসতাম বটে, কিন্তু নিজে কলম ধরে বই লিখব এ ছিল সম্পূর্ণ দুরাশা আমার কাছে। অবিশ্যি পাঠ্যাবস্থায় অন্য অনেক ছাত্রের মত কলেজ ম্যাগাজিনে দু-একটা প্রবন্ধ, এক-আধটা কবিতা যে না লিখেছি তা নয়, বা প্রতিবেশীর অনুরোধে, বিবাহের প্রীতি-উপহারে কবিতা যে দু-পাঁচটা না লিখেছিলাম তাও নয়—কিন্তু সে কে না লিখে থাকে?

সুতরাং আমি তাকে বললাম—"লেখা কি ছেলেখেলা হে যে কলম নিয়ে বসলেই হল? ওসব খামখেয়ালি ছাড়। আমি কখনও লিখিনি, লিখতে পারবও না। তুমি হয়ত পারবে—আমার দ্বারা ওসব হবে না।"

সে বললে—"খুব হবে। আপনি যখন বি-এ পাস, তখন আপনার কাছে এমন কিছু কঠিন হবে না। একটু চেষ্টা করুন তাহলেই হয়ে যাবে।" তখন বয়েস অল্প, বুদ্ধি-সুদ্ধি পাকে নি, তবুও আমার মনে হল, বি-এ পাস তো অনেকেই করে, তাদের মধ্যে সকলেই লেখক হয় না কেন? অথচ বি-এ পাস করা লোকদের ওপর পাঁচুগোপালের এই অহেতুক শ্রদ্ধা ভেঙে দিতেও মন চাইল না। এ নিয়ে কোনও তর্ক আমি আর তার সঙ্গে করি নি।

কিন্তু করলেই ভাল হত, কারণ এর ফল হয়ে দাঁড়াল বিপরীত। দিন দশেক পরে একদিন স্কুলে গিয়ে দেখি সেখানে নোটিশ-বোর্ডে, দেওয়ালের গায়ে, নারকেল গাছের গুঁড়িতে সর্বত্র ছাপানো কাগজ টাঙানো—তাতে লেখা আছে,—বাহির হইল! বাহির হইল!! বাহির হইল!!! এক টাকা মূল্যের গ্রন্থমালার প্রথম উপন্যাস।

লেখকের নামের স্থানে আমার নাম দেখলাম।

আমার তো চক্ষুস্থির। এ নিশ্চয় সেই পাঁচুগোপালের কীর্তি। এমন ছেলেমানুষি সে করে বসবে জানলে কি তার সঙ্গে মিশি! বিপদের ওপর বিপদ, স্কুলে ঢুকতেই শিক্ষক ছাত্রবৃন্দ সবাই জিজ্ঞেস করে—"আপনি লেখক তা তো এতদিন জানতাম না মশাই? বেশ বেশ! তা বইখানা কি বেরিয়েছে নাকি? আমাদের একবার দেখিয়ে যাবেন।" হেডমাস্টার ডেকে বললেন, তাঁর স্কুল লাইব্রেরিতে একখানা বই দিতে হবে। সকলের নানারূপ সকৌতূহল প্রশ্ন এড়িয়ে চলি সারাদিন—কবে থেকে আমি লিখছি, আর আর কি বই আছে, ইত্যাদি। স্কুলের ছুটির পরে বাইরে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে!

তাকে খুঁজে বার করলাম বাসায় এসে। দস্তুরমত তিরস্কার করলাম তাকে, এ তার কি কান্ড! কথার কথা একবার একটা হয়েছিল বলে একেবারে নাম ছাপিয়ে এরকমভাবে বার করে, লোকে কি ভাবে!

সে নির্বাক হয়ে দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বললে—"তাতে কি হয়েছে? আপনি তো এক রকম রাজিই হয়েছেন লিখতে। লিখুন না কেন!"

আমি বললাম—"বেশ ছেলে বটে তুমি! কোথায় কি তার ঠিক নেই, তুমি নাম ছাপিয়ে দিলে কি বলে, আর দিলে দিলে একেবারে স্কুলের দেওয়ালে, নোটিশ বোর্ডে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছ, এ কেমন কান্ড? নামই বা পেলে কোথায়? কে তোমাকে বলেছিল ও নামে আমি কিছু কিছু লিখেছি বা লিখব?"

যাক—পাঁচুগোপাল তো চলে গেল হাসতে হাসতে। এদিকে প্রতিদিন স্কুলে গিয়ে সকলের প্রশ্নে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে হল—বই বেরুচ্ছে কবে? কত দেরি আছে আর বই বেরুবার?—মহামুশকিলে পড়ে গেলাম। সে যা ছেলেমানুষি করে ফেলেছে তার আর চারা নেই। আমি এখন নিজের মান বজায় রাখি কেমন করে? লোকের অত্যাচারের চোটে

তো অস্থির হয়ে পড়তে হয়েছে।

সাতপাঁচ ভেবে একদিন স্থির করলাম—এক কাজ করা যাক। সে এক টাকা সিরিজের বই কোনদিনই বের করতে পারবে না। ওর টাকা কোথায় যে বই ছাপাবে? বরং আমি একখানা খাতায় যা হয় একটা কিছু লিখে রাখি—লোকে যদি চায়, খাতাখানা দেখিয়ে বলা যাবে, আমার তো লেখাই রয়েছে, ছাপা না হলে আমি কি করব। কিন্তু লিখি কি? জীবনে কখনও গল্প লিখি নি, কি করে লিখতে হয় তাও জানা নেই। কি ভাবে প্লট যোগাড় করে, কি কৌশলে তা থেকে গল্প ফাঁদে—কে বলে দেবে? প্লটই বা পাই কোথায়? আকাশ-পাতাল ভাবি প্রতিদিন, কিছুই ঠিক করে উঠতে পারি নে। গল্প লেখার চেষ্টা কোনদিন করি নি। পাঠ্যাবস্থায় সুরেন বাঁড়ুজ্যে ও বিপিন পালের বক্তৃতা শুনে সাধ হত, লেখক হতে পারি আর না পারি, একজন বড় বক্তা হতে হবেই।

কিন্তু লেখক হবার কোন আগ্রহই কোনদিন ছিল না, সে চেষ্টাও করি নি। কাজেই প্রথমে মুশকিলে পড়ে গেলাম। সাতপাঁচ ভেবে প্লট সংগ্রহ আর করতে পারি না কিছুতেই। মন তখন বিশ্লেষণমুখী অভিব্যক্তির পথ খুঁজে পায় নি। সব কিছুতেই সন্দেহ, সব কিছুতেই ভয়।

অবশেষে একদিন এক ঘটনা থেকে মনে একটা ছোট গল্পের উপাদান দানা বাঁধল। সেই পল্লীগ্রামের একটি ছায়াবহুল নিভৃত পথ দিয়ে শরতের পরিপূর্ণ আলো ও অজস্র বিহঙ্গকাকলীর মধ্যে প্রতিদিন স্কুলে যাই, আর একটি গ্রাম্য বধূকে দেখি পথিপার্শ্বের একটি পুকুর থেকে জল নিয়ে কলসী কক্ষে প্রতিদিন স্নান করে ফেরেন। প্রায়ই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়—কিন্তু দেখা ওই পর্যন্ত। তাঁর পরিচয় আমার অজ্ঞাত এবং বোধ হয় অজ্ঞাত বলেই একটি রহস্যময়ী মূর্তিতে তিনি আমার মানসপটে একটা সাময়িক রেখা অঙ্কিত করেছিলেন। মনে মনে ভাবলাম এই প্রতিদিনের দেখা অথচ সম্পূর্ণ অপরিচিত বধূটিকে কেন্দ্র করে একটি গল্প আরম্ভ করা যাক তো, কি হয় দেখি! গল্প শেষ করে সেই গ্রামের দু-এক জনকে পড়ে শোনালাম—পাঁচুকেও। কেউ বলে ভাল হয়েছে, কেউ বললে মন্দ হয় নি। আমার একটি বন্ধুকে কলকাতা থেকে নিমন্ত্রণ করে গল্পটি শুনিয়ে দিলাম। সেও বললে ভাল হয়েছে। আমি তখন একেবারে কাঁচা লেখক ; নিজের ক্ষমতার ওপর কোন বিশ্বাস আদৌ জন্মায় নি। যে আত্মপ্রত্যয় লেখকের একটি বড় পুঁজি, আমি তখন তা থেকে বহু দূরে, সুতরাং অপরের মতামতের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে উপায় কি। আমার কলকাতার বন্ধুটির সমঝদারিত্বের ওপর আমার শ্রদ্ধা ছিল—তার মত শুনে খুশি হলাম।

পাড়াগাঁয়ে স্কুলমাস্টারি করি। কলকাতার কোন সাহিত্যিক বা পত্রিকা-সম্পাদককেই চিনি না—সুতরাং লেখা ছাপানো সম্বন্ধে আমায় একপ্রকার হতাশ হতে হল। এইভাবে পুজোর অবকাশ এসে গেল, ছুটিতে দেশে গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে এলাম। পুনরায় ফিরে এসে কাগজপত্রের মধ্যে থেকে আমার সেই লেখাটি একদিন বার করে ভাবলাম, আজ এটি কলকাতায় নিয়ে গিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখা যাক।

ঘুরতে ঘুরতে একটা পত্রিকা আপিসের সামনে এসে পড়া গেল। আমার মত অজ্ঞাত অখ্যাত নতুন লেখকের রচনা তারা ছাপবে এ দুরাশা আমার ছিল না, তবু সাহস করে গিয়ে ঢুকে পড়লাম। দেখা যাক না কি হয়, কেউ খেয়ে তো ফেলবে না, না হয় লেখা না-ই ছাপবে। ঘরে ঢুকেই একটি ছোট টেবিলের সামনে যাঁকে কর্মরত দেখলাম, তাঁকে নমস্কার করে ভয়ে ভয়ে বলি—"একটা লেখা এনেছিলাম—" ; ভদ্রলোক মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "আর কোথাও আপনার লেখা কি বেরিয়েছিল? আচ্ছা রেখে যান, মনোনীত না হলে ফেরত যাবে। ঠিকানাটা রেখে যাবেন।"

লেখা দিয়ে এসে স্কুলের সহকর্মী ও গ্রামের আলাপী বন্ধুদের বলি—"লেখাটা নিয়ে বলেছে শীগগির ছাপবে।" চুপি চুপি ডাকঘরে গিয়ে বলে এলাম, আমার নামে যদি বুকপোস্ট গোছের কিছু আসে, তবে আমাকে স্কুলে বিলি যেন না করা হয়। কারণ লেখা ফেরত এসেছে এটা তাহলে জানাজানি হয়ে যাবে সহকর্মী ও ছাত্রদের মধ্যে। দিন গুনি, একদিন সত্যিই ডাকপিওন স্কুলে আমায় বললে—আপনার নামে একটা বুকপোস্ট এসেছে, কিন্তু গিয়ে নিয়ে আসবেন। আমার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। নবজাত রচনার প্রতি অপরিসীম দরদ যাঁরা অনুভব করেছেন তাঁরা বুঝবেন আমার দুঃখ। এতদিনের আকাশকুসুম চয়ন তবে ব্যর্থ হল, লেখা ফেরত দিয়েছে!

কিন্তু পরদিন ডাকঘর থেকে বুকপোস্ট নিয়ে দেখি যে, আমার রচনাই বটে, কিন্তু তার সঙ্গে পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের একটি চিঠি। তাতে লেখা আছে, রচনাটি তাঁরা মনোনীত করেছেন, তবে সামান্য একটু-আধটু অদল-বদলের জন্যে ফেরত পাঠানো হল, সেটুকু করে আমি যেন লেখাটি তাঁদের ফেরত পাঠাই, সামনের মাসে ওটা ছাপা হবে।

অপূর্ব আনন্দ আর দিগ্বিজয়ীর গর্ব নিয়ে ডাকঘর থেকে ফিরি। সগর্বে নিয়ে গিয়ে চিঠিখানা দেখাতেই সবাই বললেন—"কারু সঙ্গে আপনার আলাপ আছে বুঝি ওখানে?—আজকাল আলাপ না থাকলে কিছু হবার জো-টি নেই। সব খোশামোদ, জানেনই তো।" তাঁদের আমি কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না, যাঁর হাতে লেখা দিয়ে এসেছিলাম, তাঁর নাম পর্যন্ত আমার জানা নেই! তার পর সে গ্রামের এমন কোনও লোক রইল না, যে আমার চিঠিখানা একবার দেখলে। কারও সঙ্গে দেখা হলে পথে তাকে আটকাই এবং সম্পূর্ণ অকারণে চিঠিখানা আমার পকেট থেকে বেরিয়ে আসে এবং বিপন্ন মুখে তাকে বলি—তাই তো, ওরা আবার একখানা চিঠি দিয়েছে, একটা লেখা চায়—সময়ই বা তেমন কই! হায়! সে সব লেখকজীবনের প্রথম দিনগুলি! সে আনন্দ, সে উৎসাহ, ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখার বিস্ময় আজও স্মরণে আছে, ভুলি নি। নিজেকে প্রকাশ করার মধ্যে যে গৌরব এবং আত্মপ্রসাদ নিহিত, লেখকজীবনের বড় পুরস্কার সবচেয়ে তাই-ই। স্বচ্ছ সরল ভাবানুভূতির যে বাণীরূপ কবি ও কথাশিল্পী তাঁর রচনার মধ্যে দিয়ে যান—তা সার্থক হয় তখনই, যখন পাঠক সেই ভাব নিজের মধ্যে অনুভব করেন। এইজন্য লেখক ও পাঠকের সহানুভূতি ভিন্ন কখনও কোন রচনাই সার্থকতা লাভ করতে পারে না।

বালক-কবির নিকট আমি কৃতজ্ঞ। সে-ই একরকম জোর করে আমাকে সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে নামিয়েছিল।

পাঁচুগোপালের সঙ্গে মাঝে দেখা হয়েছিল। সে এখন চব্বিশ পরগণার কাছে কি একটা গ্রামের উচ্চ প্রাথমিক পাঠশালায় হেডমাস্টার। এখনও সে কবিতা লেখে।

জুন ১৯৪৪—বেতারে পঠিত।

উপেক্ষিতা

পথে যেতে যেতেই তার সঙ্গে আমার পরিচয়।

সে বোধ হয় বাংলা দুই কি তিন সালের কথা। নতুন কলেজ থেকে বার হয়েছি, এমন সময় বাবা মারা গেলেন। সংসারের অবস্থা ভাল ছিল না, স্কুলমাস্টারী নিয়ে গেলুম হুগলী জেলার একটা পাড়াগাঁয়ে।...গ্রামটির অবস্থা এক সময়ে খুব ভাল থাকলেও আমি যখন গেলুম তখন তার অবস্থা খুব শোচনীয়। খুব বড় গ্রাম, অনেকগুলি পাড়া, গ্রামের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত বোধ হয় এক ক্রোশেরও ওপর। প্রাচীন আম-কাঁটালের বনে সমস্ত গ্রামটি অন্ধকার।

আমি ও-গ্রামে থাকতুম না। গ্রাম থেকে প্রায় এক মাইল দূরে সে গ্রামের রেলস্টেশন। স্টেশনমাস্টারের একটি ছেলে পড়ানোর ভার নিয়ে সেই রেলের P. W. D.-এর একটা পরিত্যক্ত বাংলোয় থাকতুম। চারিদিকে নির্জন মাঠ, মাঝে মাঝে তাল-বাগান। স্কুলটি ছিল গ্রামের ও-প্রান্তে। মাঠের মধ্যে নেমে হেঁটে যেতুম প্রায় এক ক্রোশ।

একদিন বর্ষাকাল, বেলা দশটা প্রায় বাজে, স্কুলে যাচ্ছি। সোজা রাস্তা দিয়ে না গিয়ে একটু শীঘ্র যাবার জন্য পাড়ার ভেতর দিয়ে একটা রাস্তা নেমে গিয়েছে সেইটে দিয়ে যাচ্ছি। সমস্ত পথটা বড় বড় আম-কাঁটালের ছায়ায় ভরা। একটু আগে খুব এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন ছিল! গাছের ডাল থেকে টুপ্‌টুপ্ করে বৃষ্টির জল ঝ'রে পড়ছিল। একটা জীর্ণ ভাঙ্গা ঘাটওয়ালা প্রাচীন পুকুরের ধার দিয়ে রাস্তা। সেই রাস্তা বেয়ে যাচ্ছি, সেই সময় কে একটি স্ত্রীলোক, খুব টকটকে রংটা, হাতে বালা অনন্ত, পরনে চওড়া লালপাড় শাড়ী, বয়স চব্বিশ-পঁচিশ হবে, পাশের একটা সরু রাস্তা দিয়ে ঘড়া নিয়ে উঠলেন আমার সামনের রাস্তায়। বোধ হয় পুকুরে যাচ্ছিলেন জল আনবার জন্যে। আমায় দেখে ঘোমটা টেনে পথের পাশে দাঁড়ালেন। আমি পাশ কাটিয়ে জোরে চলে গেলুম। আমার এখন স্বীকার করতে লজ্জা হয়, কিন্তু তখন আমি ইউনিভার্সিটির সদ্যপ্রসূত গ্রাজুয়েট, বয়স সবে কুড়ি, অবিবাহিত। সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের পাতায় পাতায় যে সব তরলিকা, মঞ্জুলিকা, বাসন্তী—উজ্জয়িনীবাসিনী অগুরু-বাস-মোদিত-কেশা তরুণী অভিসারিকার দল, তারা—আর তাদের সঙ্গে ইংরেজী কাব্যের কত Althea, কত Genevieve, Theosebia তাদের নীল নয়ন আর তুষার-ধবল কোমল বাহুবল্লী নিয়ে আমার তরুণ মনের মধ্যে রাতদিন একটা সুমিষ্ট কল্পলোকের সৃষ্টি ক'রে রেখেছিল। তাই সেদিন সেই সুশ্রী তরুণী রূপ, তাঁর বালা-অনন্ত-পরা অনাবৃত হাতদুটির সুঠাম সৌন্দর্য আর সকলের ওপর তাঁর পরনের শাড়ী দ্বারা নির্দিষ্ট তাঁর সমস্ত দেহের একটা মহিমান্বিত সীমারেখা আমাকে মুগ্ধ এবং অভিভূত ক'রে ফেললে। আমার মনের ভিতর এক প্রকারের নূতন অনুভূতি, আমার বুকের রক্তের তালে তালে সেদিন একটা নূতন স্পন্দন আমার কাছে বড় স্পষ্ট হয়ে উঠল।

বিকালবেলা রেল-লাইনের ধারে মাঠে গিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলুম। তাল-বাগানের মাথার ওপর সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। বেগুনী রং-এর মেঘগুলো দেখতে দেখতে ক্রমে ধূসর, পরেই আবার কালো হয়ে উঠতে লাগল।...আকাশের অনেকটা জুড়ে মেঘগুলো দেখতে হয়েছিল যেন একটা আদিম যুগের জগতের উপরীভাগের বিস্তীর্ণ মহাসাগর। ...বেশ কল্পনা ক'রে নেওয়া যাচ্ছিল, সেই সমুদ্রের চারিপাশে একটা গাঢ় রহস্যভরা অজ্ঞাত মহাদেশ, যার অন্ধকারময় বিশাল অরণ্যানীর মধ্যে প্রাচীন যুগের লুপ্ত অতিকায় প্রাণীরা সব ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দিন কেটে গিয়ে রাত হ'ল। বাসায় এসে Keats পড়তে সুরু করলুম। পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, মাটির প্রদীপের বুক পুড়ে উঠে প্রদীপ কখন নিভে গিয়েছে। অনেক রাত্রে উঠে দেখলুম বাইরে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে...আকাশ মেঘে অন্ধকার।...

তার পরদিনও পাড়ার ভেতর দিয়ে গেলুম। সেদিন কিন্তু তাঁকে দেখলুম না। আসবার সময়ও সেখান দিয়েই এলুম, কাউকে দেখলুম না। পরদিন ছিল রবিবার। সোমবার দিন আবার সেই পথ দিয়েই গেলুম। পুকুরটার কাছাকাছি গিয়েই দেখি যে তিনি জল নিয়ে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন, আমায় দেখে ঘোমটা টেনে দিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন।...আমার বুকের রক্তটা যেন দুলে উঠল, খুব জোরে হেঁটে বেরিয়ে গেলুম।...রাস্তার বাঁকের কাছে গিয়েই ইচ্ছা আর দমন করতে না পেরে একবার পিছন ফিরে তাকালুম, দেখি তিনি ঘাটের ওপর ঘোমটা খুলে কৌতূহলী নেত্রে আমার দিকেই চেয়ে রয়েছেন, আমি চাইতেই ঘোমটা আবার টেনে দিলেন।

ওপরের পথটা ছেড়েই দিলুম একেবারে। পুকুরের পথ দিয়েই রোজ যাই। দু'একদিন পরে আবার একদিন তাঁকে দেখতে পেলুম। আমার মনে হ'ল সেদিনও তিনি আমায় একটু আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন। এইভাবে পনেরো-কুড়ি দিন কেটে গেল। কোনদিন তাঁকে দেখতে পাই, কোনদিন পাই না। আমার কিন্তু বেশ মনে হতে লাগল, তিনি আমার প্রতি দিন দিন আগ্রহান্বিতা হয়ে উঠছেন। আজকাল ততটা ত্রস্তভাবে ঘোমটা দেন না। আমারও কি হ'ল—তাঁর গতি-ভঙ্গীর একটা মধুর শ্রী, তাঁর দেহের একটা শান্ত কমনীয়তা, আমায় দিন দিন যেন অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ফেলতে লাগল।...

একদিন তখন আশ্বিন মাসের প্রথম, শরৎ পড়ে গিয়েছে...নীল আকাশের সাদা সাদা লঘু মেঘখন্ড উড়ে যাচ্ছে...চারিদিকে খুব রৌদ্র ফুটে উঠেছে...রাস্তার পাশের বনকচু, ভাঁট শেওড়া, কুঁচলতার ঝোপ থেকে একটা কটুতিক্ত গন্ধ উঠছে।...শনিবার সকাল সকাল স্কুল থেকে ফিরছি। রাস্তা নির্জন, কেউ কোন দিকে নেই। পুকুরটার পথ ধরেছি, একদল ছাতারে পাখী পুকুরের ওপারের ঝোপের মাথায় কিচ্‌কিচ্ করছিল, পুকুরের জলের নীল ফুলের দলগুলো রৌদ্রতাপে মুড়ে ছিল। আমি আশা করিনি এমন সময় তিনি পুকুরের ঘাটে আসবেন। কিন্তু দেখলুম তিনি জল ভ'রে উঠে আসছেন। এর আগে চার-পাঁচ দিন তাঁকে দেখিনি, হঠাৎ কি মনে হ'ল, একটা বড় দুঃসাহসের কাজ ক'রে বসলুম। তাঁর কাছে গিয়ে বললুম—দেখুন, কিছু মনে করবেন না আপনি। আমি এখানকার স্কুলে কাজ করি, রোজ এই পথে যেতে যেতে আপনাকে দেখতে পাই, আমার বড় ইচ্ছে করে আপনি আমার বোন হন। আমি আপনাকে বৌদিদি বলব, আমি আপনার ছোট ভাই। কেমন তো? তিনি আমার কথার প্রথম অংশটায় হঠাৎ চমকে উঠে কেমন জড়সড় হয়ে উঠেছিলেন, দ্বিতীয় অংশটায় তাঁর সে চমকানো ভাবটা একটু দূর হল। ঘড়াকাঁখে নীচু চোখে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি যুক্তকরে প্রণাম ক'রে বললুম—বৌদিদি, আমার এ ইচ্ছা আপনাকে পূর্ণ করতে হবে। আমাকে ছোট ভাইয়ের অধিকার দিতেই হবে আপনাকে।

তিনি ঘোমটা অর্ধেকটা খুলে একটা স্থির শান্ত-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন। সুশ্রী মুখ যে আমি কখনো দেখিনি তা নয়, তবুও মনে হল তাঁর ডাগর কালো চোখ-দুটির শান্ত ভাব, আর তাঁর ঠোঁটের নীচের একটা বিশেষ ভাঁজ, এই দু'টিতে মিলে তাঁর সুন্দর মুখের গড়নে এমন এক বৈচিত্র্য এনেছে, যা সচরাচর চোখে পড়ে না।

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ ক'রে রইলুম। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার বাড়ী কোথায়?

আনন্দে সারা গা কেমন শিউরে উঠল। বললুম—কলকাতার কাছে, চব্বিশ পরগণা জেলায়। এখানে স্টেশনে থাকি।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার নাম কি?

নাম বললুম।

তিনি বললেন—তোমার বাড়ীতে কে কে আছেন?

বললুম—এখন বাড়ীতে শুধু মা আর দুটি ছোট ছোট ভাই আছে। বাবা এই দু'বৎসর মারা গিয়েছেন।

তিনি একটু যেন আগ্রহের সুরে বললেন—তোমার কোন বোন নেই?

আমি বললুম—না। আমার দু'জন বড় বোন ছিলেন, তাঁরা অনেকদিন মারা গিয়েছেন। বড়দি যখন মারা যান তখন আমি খুব ছোট, মেজদি আজ পাঁচ ছ'বৎসর মারা গিয়েছেন। আমি এই মেজদিকেই জানতুম, তিনি আমায় বড় ভালবাসতেন। তিনি আমার চেয়েও ছয় বছরের বড় ছিলেন।

তাঁর দৃষ্টি একটু ব্যথা-কাতর হয়ে এল, জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার মেজদি থাকলে এখন তাঁর বয়স হ'ত কত?

বললুম—এই ছাব্বিশ বছর।

তিনি একটু মৃদু হাসির সঙ্গে বললেন—তাই বুঝি ভাইটির আমার একজন বোন খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে, না?

কি মিষ্টি হাসি! কি মধুর শান্ত ভাব! মাথা নীচু ক'রে প্রণাম ক'রে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বললুম—তা হলে ভাইয়ের অধিকার দিলেন তো আপনি?

তিনি শান্ত হাসিমাখা মুখে চুপ ক'রে রইলেন।

আমি বললুম—বৌদি, আমি জানতুম আমি পাব। আগ্রহের সঙ্গে খুঁজলে ভগবানও নাকি ধরা দেন, আমি একজন বোন অনায়াসেই পাব। আচ্ছা এখন আসি। আপনি কিন্তু ভুলে যাবেন না বৌদি, আপনার যেন দেখা পাই। রবিবার বাদে আমি দুবেলাই এ রাস্তা দিয়ে যাব।

আমার মাঠের ধারের তাল-বাগানটার পাখীগুলো রোজই সকাল বিকাল ডাকে। একটা কি পাখী তার সুর খাদ থেকে ধাপে ধাপে তুলে একেবারে পঞ্চমে চড়িয়ে আনে। মন যেদিন ভারী থাকে সেদিন সে সুরের উদাস মাধুর্য প্রাণের মধ্যে কোন সাড়া দেয় না। ...আজ দেখলুম পাখীটার গানের সুরের স্তরে স্তরে হৃদয়টা কেমন লঘু থেকে লঘুতর হয়ে উঠছে।...মনে হ'তে লাগল জীবনটা কেবল কতকগুলো স্নিগ্ধ ছায়াশীতল পাখীর গানে ভরা অপরাহ্ণের সমষ্টি, আর পৃথিবীটা শুধু নীল আকাশের তলায় ইতস্তত বর্ধিত অযত্নসম্ভূত তাল-নারিকেল গাছের বন দিয়ে তৈরী—যাদের ঈষৎ কম্পমান দীর্ঘ শ্যামল পত্রশীর্ষ অপরাহ্ণের অবসন্ন রৌদ্রে চিক্‌চিক্ করছে।

তার পরদিন বৌদিদির সঙ্গে দেখা হ'ল ছুটির পর বিকাল বেলা। বৌদিদি যেন চাপা হাসির সুরে জিজ্ঞাসা করলেন—এই যে, বিমলের বুঝি আজ খুব সকাল সকাল স্কুলে যাওয়া হয়েছিল?

আমি উত্তর দিলুম—বেশ বৌদি, আমি ওবেলা তো ঠিক সময়েই গেলুম—আপনি ছিলেন না, এখন দোষটা বুঝি আমার ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে, না? আর বৌদি, ঘাটে ওবেলা আরও সব মেয়েরা ছিলেন।

বৌদিদি হেসে ফেললেন, বললেন—তাই তো! ভাইটির আমার ওবেলা তো বড় বিপদ

গিয়েছে তা হ'লে!

আমার একটু লজ্জা হল, ভাল ক'রে জবাব দিতে না পেরে বললুম—তা নয় বৌদি, আমি এখানে অপরিচিত, পাড়ার মধ্যে দিয়ে পথ—পাছে কেউ কিছু মনে করে।

বৌদিদির চোখের কৌতুক-দৃষ্টি তখনও যায় নি, তিনি বললেন—আমি ওবেলা ঘাটের জলেই ছিলাম বিমল। তুমি ওই চট্‌কা গাছটার তলায় গিয়ে একবার ঘাটের দিকে চেয়ে দেখলে, আমায় তুমি দেখতে পাও নি।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—বৌদি, আপনার বাপের বাড়ী কোথায়?

বৌদিদি উত্তর দিলেন, খোলাপোতা চেন? সেই খোলাপোতায়।

আমি ইতস্তত করছি দেখে আমায় আর একটু বিশদ সংবাদ দিয়ে বললেন, ওই যে খোলাপোতার রাস! বৌদিদির হাসিভরা দৃষ্টি যেন একটু গর্বমিশ্রিত হয়ে উঠল। কিন্তু বলা আবশ্যক যে, খোলাপোতা ব'লে কোনো গ্রামের নাম এই আমি প্রথম শুনলুম। অথচ বৌদির বাপের বাড়ী, যেখানে এমন রাস হয়, সেই বিশ্ববিশ্রুত খোলাপোতার ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা পাছে তাঁর মনে ব্যথা দেয়, এই ভয়ে ব'লে ফেললুম—ও! সেই খোলাপোতায়? ওটা কোন্ জেলায় ভাল···

বৌদিদির কাছ থেকে সাহায্য পাবার প্রত্যাশা করেছিলুম কিন্তু দেখলুম তিনি সে বিষয়ে নির্বিকার। তাঁর হাসিভরা সরল মুখখানির দিকে চেয়ে আমার করুণা হল, এ-সমস্ত জটিল ভৌগোলিক তত্ত্বের মীমাংসা নিয়ে তাঁকে পীড়িত করতে আর আমার মন সর্‌ল না।

বললুম—আচ্ছা, বৌদি, আসি তা হ'লে।

বৌদিদি তাড়াতাড়ি ঘড়ার মুখ থেকে কলার পাতে মোড়া কি বার করলেন। সেইটে আমার হাতে দিয়ে বললেন—কাল চাপ্‌ড়া ষষ্ঠীর জন্যে ক্ষীরের পুতুল তৈরী করেছিলাম, আর গোটাকতক কলার বড়া আছে, বাসায় গিয়ে খেও।

চার-পাঁচ দিন জ্বরভোগের পর একদিন পথ্য পেয়ে স্কুলে যাচ্ছি, বৌদিদির সঙ্গে দেখা। আমায় আসতে দেখে বৌদিদি উৎসুক দৃষ্টিতে অনেকদূর থেকে আমার দিকে চেয়ে ছিলেন। নিকটে যেতে জিজ্ঞাসা করলেন—এ কি বিমল, এমন মুখ শুকনো কেন?

বললুম—জ্বর হয়েছিল বৌদিদি।

বৌদিদি উদ্বেগের সুরে বললেন—ও, তাই তুমি চার-পাঁচ দিন আসনি বটে। আমি ভাবলাম, বোধ হয় কিসের ছুটি আছে। আহা তাই তো, বড্ড রোগা হয়ে গিয়েছ যে বিমল।

তাঁর চোখের দৃষ্টিতে একটা সত্যিকারের ব্যথা মিশ্রিত স্নেহের আত্মপ্রকাশ বেশ বুঝতে পেরে মনের মধ্যে একটা নিবিড় আনন্দ পেলুম। হেসে বললুম—যে দেশ আপনাদের বৌদি, একবার অতিথি হলে আপ্যায়নের চোটে একেবারে অস্থির ক'রে তুলবে।

বৌদিদি জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা বিমল, ওখানে তোমায় রেঁধে দেয় কে?

আমি বললুম—কে আর রাঁধবে, আমি নিজেই।

বৌদিদি একটু চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন—আচ্ছা বিমল, এক কাজ করো না কেন!

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—কি বৌদি?

তিনি বললেন—মাকে এই পুজোর ছুটির পর নিয়ে এস। এরকমভাবে কি ক'রে বিদেশে কাটাবে বিমল? লক্ষ্মীটি, ছুটির পর মাকে অবিশ্যি ক'রে নিয়ে এস। এই গাঁয়ের ভেতর অনেক বাড়ী পাওয়া যাবে। আমাদের পাড়াতেই আছে। না হ'লে অসুখ

হ'লে কে একটু জল দেয়? আচ্ছা হ্যাঁ বিমল, আজ যে পথ্য করলে, কে রেঁধে দিলে?

আমার হাসি পেল, বললুম—কে আবার দেবে বৌদি? নিজেই করলুম।

তিনি আমার দিকে যেন কেমন ভাবে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। তাঁর সেদিনকার সেই সহানুভূতি-বিগলিত স্নেহ-মাখানো মাতৃমুখের জলভরা কালো চোখদুটি পরবর্তী জীবনে আমার অনেকদিন পর্যন্ত মনে ছিল।...

সেদিন স্কুল থেকে আসবার সময় দেখি, বৌদিদি যেন আমার জন্যেই অপেক্ষা করছেন। আমায় দেখে কলার পাতায় মোড়া কি একটা আমার হাতে দিয়ে বললেন—শরীরটা একটু না সারলে, রাত্রে গিয়ে রান্না, সে পেরে উঠবে না বিমল। এই খাবার দিলাম, রাত্রে খেও।...বোধ হয় একটু আগেই তৈরী ক'রে এনেছিলেন, আমি হাতে বেশ গরম পেলুম। বাসায় এসে কলার পাতা খুলে দেখি, খানকতক রুটি, মোহনভোগ, আর মাছের একটা ডালনা মত।

তার পরদিন ছুটির পর আসবার সময়ও দেখি বৌদিদি খাবার হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আমার হাতে দিয়ে বললেন—বিমল, তুমি তোমার ওখানে দুধ নাও?

আমি বললুম—কেন, তাহ'লে দুধও খানিকটা ক'রে দেন বুঝি? সত্যি বলছি বৌদি, আপনি আমার জন্য অনর্থক এ কষ্ট করবেন না, তা হ'লে এ রাস্তায় আমি আর আসছি না।

বৌদিদির গলা ভারী হয়ে এল, আমার ডান হাতটা আস্তে আস্তে এসে ধ'রে ফেললেন, বললেন—লক্ষ্মী ভাই, ছিঃ, ও-কথা ব'লো না। আচ্ছা, আমি যদি তোমার মেজদিই হতাম, তা হ'লে এ কথা কি আজ আমায় বলতে পারতে? আমার মাথার দিব্যি রইল, এ পথে রোজ যেতেই হবে।

সেই-দিন থেকে বৌদিদি রোজ রাত্রের খাবার দেওয়া শুরু করলেন। সাত আট দিন পরে রুটির বদলে কোনদিন লুচি, কোনদিন পরোটা দেখা দিতে লাগল। তাঁর সে আগ্রহভরা মুখের দিকে চেয়ে আমি তাঁর সেসব স্নেহের দান ঠিক অস্বীকারও করতে পারতুম না, অথচ এই ভেবে অস্বস্তি বোধ করতুম যে আমার এই নিত্য খাবার যোগাতে না জানি বৌদিদিকে কত অসুবিধাই পোহাতে হচ্ছে। তার পরই আশ্বিন মাসের শেষে পুজোর ছুটি এসে পড়াতে আমি নিষ্কৃতি পেলুম।

সমস্ত পুজোর ছুটিটা কি নিবিড় আনন্দেই কাটল সেবার। আমার আকাশ বাতাস যেন রাতদিন আফিমের রঙিন ধূমে আচ্ছন্ন থাকত। ভোর বেলা উঠানের শিউলি গাছের সাদা ফুল বিছানো তলাটা দেখলে—হেমন্ত রাত্রির শিশিরে ভেজা ঘাসগুলোর গা যেমন শিউরে আছে, ওই রকম আমার গা শিউরে উঠত...কার ওপর আমার জীবনের সমস্ত ভার অসীম নির্ভরতার সংগে চাপিয়ে দিয়ে আমার মন যেন শরতের জলভরা নামানো হাল্‌কা মেঘের মত একটা সীমাহারা হাওয়ার রাজ্যে ভেসে বেড়াতে লাগল।...

ছুটি ফুরিয়ে গেল। প্রথম স্কুল খোলবার দিন পথে তাঁকে দেখলুম না। বিকালে যখন ফিরি তখন শীতল হাওয়া একটু একটু দিচ্ছে।...পথের ধারের এক জায়গায় খানিকটা মাটি কারা বর্ষাকালে তুলে নিয়েছিল, সেখানটায় এখন বনকচু, কাল-কাসুন্দা, ধুতুরা, কুঁচকাঁটা, ঝুমকো লতার দল পরস্পর জড়াজড়ি ক'রে একটুখানি ছোট ছোট ঝোপ মত তৈরী করেছে...শীতল হেমন্ত অপরাহ্নের ছায়া সবুজ ঝোপটির ওপর নেমে এসেছে...এমন একটা মিষ্টি নির্মল গন্ধ গাছগুলো থেকে উঠেছে, এমন সুন্দর শ্রী হয়েছে ঝোপটির, সমস্ত ঝোপটি যেন বনলক্ষ্মীর শ্যামল শাড়ীর একটা অঞ্চল-প্রান্তের মত।

তার পরদিন তাঁকে দেখলুম।

তিনি আমায় লক্ষ্য করেন নি, আপন মনে ঘাটের চাতালে উঠতে যাচ্ছিলেন। আমি ডাকলুম—বৌদি!...বৌদিদি কেমন হঠাৎ চমকে উঠে আমার দিকে ফিরলেন।

—এ কি বিমল! কবে এলে? আজ কি স্কুল খুলল? কি রকম আছ?...সেই পরিচিত প্রিয় কণ্ঠস্বরটি। সেই স্নেহ-ঝরা শান্ত চোখ দুটি। বৌদিদি আমার মনে ছুটির আগে যে স্থান অধিকার করেছিলেন, ছুটির পরের স্থানটা তার চেয়ে আরও ওপরে।... আমি সমস্ত ছুটিটা তাঁকে ভেবেছি, নানা মূর্তিতে নানা অবস্থায় তাঁকে কল্পনা করেছি, নানা গুণ আরোপ করেছি, তাঁকে নিয়ে আমার মুগ্ধ মনের মধ্যে অনেক ভাঙা-গড়া করেছি। আমার মনের মন্দিরে আমারই শ্রদ্ধা ভালবাসায় গড়া তাঁর কল্পনা-মূর্তিকে অনেক অর্ঘ্যচন্দনে চর্চিত করেছি। তাই সেদিন যে বৌদিদিকে দেখলুম, তিনি পূজার ছুটির আগেকার সে বৌদিদি নন, তিনি আমার সেই নির্মলা, পূতহৃদয়া পুণ্যময়ী মানসী প্রতিমা, আমার পার্থিব বৌদীদিকে তিনি তাঁর মহিমাখচিত দিব্য বসনের আচ্ছাদনে আবৃত ক'রে রেখেছিলেন, তাঁর স্নেহ-করুণার জ্যোতিবাষ্পে বৌদিদির রক্ত-মাংসের দেহটার একটা আড়াল সৃষ্টি করেছিলেন।

আমার মাথা শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে নত হয়ে পড়ল, আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলুম। বৌদিদি বললেন—এস, এস ভাই, আর প্রণাম করতে হবে না, আশীর্বাদ করছি এমনিই—রাজা হও। আচ্ছা বিমল, বাড়ী গিয়ে আমার কথা মনে ছিল?

মনে এলেও বাইরে আর বলতে পারলুম না—কে তবে আমার মগ্নচৈতন্যকে আশ্রয় ক'রে আছে। আমার নিত্য সুষুপ্তির মধ্যেও আমার সঙ্গিনী ছিল বৌদি?...শুধু একটু হেসে চুপ করে রইলুম। বৌদিদি জিজ্ঞাসা করলেন—মা ভাল আছেন?

আমি উত্তর দিলুম—হ্যাঁ বৌদি, তিনি ভাল আছেন। তাঁকে আপনার কথা বললুম।

বৌদিদি আগ্রহের সুরে বললেন—তিনি কি বললেন?

আমি বললুম—শুনে মার দুই চোখ জলে ভ'রে এল, বললেন—একবার দেখাবি তাকে বিমল? আমার নলিনীর শোক বোধ হয় তাকে দেখলে অনেকটা নিবারণ হয়।

বৌদিদিরও দেখলুম দুই চোখ ছলছল ক'রে এল, আমায় বললেন, হ্যাঁ, বিমল, তা মাকে এই মাসে নিয়ে এলে না কেন?

আমি বললুম—সে এখন হয় না বৌদি?

বৌদি একটু ক্ষুন্ধ হলেন, বললেন—বিমল, জানো তো সেবার কি রকম কষ্টটা পেয়েছ! এই বিদেশ-বিভুঁই, মাকে আনলে এই মিথ্যে কষ্টটা তো আর ভোগ করতে হয় না।

আমি উত্তর দিলুম—বৌদি, আমি তো আর ভাবি নি যে আমি বিদেশে আছি. যেখানে আমার বৌদি রয়েছেন, সে দেশ আমার বিদেশ নয়। মা না থাকলেও আমার এখানে ভাবনা কিসের বৌদি?

বৌদিদির চোখে লজ্জা ঘনিয়ে এলো, আমার দিকে ভাল ক'রে চাইতে পারলেন না, বললেন—হ্যাঁ, আমি তো সবই করছি। আমার কি কিছু করবার জো আছে? কত পরাধীন আমরা তা জানো তো ভাই। ওসব নয়, তুমি এই মাসেই মাকে আনো।

আমি কথাটাকে কোন রকমে চাপা দিয়ে সেদিন চ'লে এলুম।

তার পরদিন ছুটির পর বৌদিদির সঙ্গে দেখা। অন্যান্য কথাবার্তার পর আসবার সময় তিনি কলার পাতে মোড়া আবার কি একটা বার করলেন। তাঁর হাতে কলার পাত দেখলেই আমার ভয় হয়, আমি শঙ্কিতচিত্তে ব'লে উঠলুম—ও আবার কি বৌদি? আবার

সেই...

বৌদিদি বাধা দিয়ে বললেন—আমার কি কোন সাধ নেই বিমল? ভাই-ফোঁটাটা অমনি অমনি গেল, কিছু কি করতে পারলুম? কলার পাতা-মোড়া রহস্যটি আমার হাতে দিয়ে বললেন—এতে একটু মিষ্টিমুখ ক'রো, আর এইটে নাও—একখানা কাপড় কিনে নিও।

কথাটা ভাল ক'রে শেষ না ক'রেই বৌদি আমার হাতে একখানা দশ টাকার নোট দিতে এলেন। আমি চমকে উঠলুম—এ কি বৌদি, না না, এ কিছুতে হবে না, খাবার আমি নিচ্ছি, কিন্তু টাকা নিতে পারব না।

আমার কথাটার স্বর বোধ হয় একটু তীব্র হয়ে পড়েছিল, বৌদিদি হঠাৎ থতমত খেয়ে গেলেন, তার প্রসারিত হাতখানা ভাল ক'রে যেন গুটিয়ে নিতেও সময় পেলেন না, যেন কেমন হয়ে গেলেন। তারপর একটুখানি অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকবার পরই তাঁর টানা কালো চোখদুটি ছাপিয়ে বাঁধ-ভাঙা বন্যার স্রোতের মত জল গড়িয়ে পড়ল। আমার বুকে যেন কিসের খোঁচা বিঁধল।

এই নিতান্ত সরলা মেয়েটির আগ্রহ-ভরা স্নেহ-উপহার রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান ক'রে তাঁর বুকে যে লজ্জা আর ব্যথার শূল বিদ্ধ করলুম, সে ব্যথার প্রতিঘাত অদৃশ্যভাবে আমার নিজের বুকে গিয়েও বাজল!

আমি তাড়াতাড়ি দুই হাতে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁর হাত থেকে নোটখানা ও খাবার দুই-ই নিয়ে বললুম—বৌদি, ভাই ব'লে এ অপরাধ এবারটা মাপ করুন আমার। আর কখনো আপনার কথার অবাধ্য হব না।

বৌদিদির চোখের জল তখনও থামে নি।

দুই চোখ জলে ভরা সে তরুণী দেবীমূর্তির দিকে ভাল ক'রে চাইতে না পেরে আমি মাথা নীচু ক'রে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে রইলুম।

বাড়ী এসে দেখলুম, কলার পাতের মধ্যে কতকগুলো দুগ্ধশুভ্র চন্দ্রপুলি, সুন্দর ক'রে তৈরী।

সমস্ত রাত ঘুমের ঘোরে বৌদিদির বিষণ্ণ কাতর দৃষ্টি বার বার চোখের সামনে ভাসতে লাগল।

মাসখানেক কেটে গেল।

প্রায়ই বৌদিদির সঙ্গে দেখা হত। এখন আমরা ভাই-বোনের মত হয়ে উঠেছিলুম, সেই রকমই পরস্পরকে ভাবতুম। একদিন আসছি, ফ্লানেল শার্টের একটা বোতাম আমার ছিল না। বৌদি জিজ্ঞাসা করলেন—একি, বোতাম কোথায় গেল?

আমি বললুম—সে কোথায় গিয়েছে বৌদি, বোতাম পরাতে জানিনে কাজেই ঐ অবস্থা।

তার পরদিন দেখলুম, তিনি ছুঁচ-সুতো বোতাম সমেতই এসেছেন। আমি বললুম—বৌদি, এটা ঘাটের পথ, আপনি বোতাম পরাতে পরাতে কেউ যদি দেখে তো কি মনে করবে! আপনি বরং ছুঁচটা আমায় দিন, আমি বাড়ি গিয়ে চেষ্টা করব এখন।

বৌদিদি হেসে বললেন—তুমি চেষ্টা ক'রে যা করবে তা আমি জানি, নাও স'রে এসো এদিকে।

বাধ্য হয়ে স'রেই গেলুম। তিনি বেশ নিশ্চিন্ত ভাবেই বোতাম পরাতে লাগলেন। ভয়টা দেখলুম তাঁর চেয়ে আমারই হ'ল বেশী। ভাবলুম, বৌদির তো সে কাণ্ডজ্ঞান নেই, কিন্তু যদি কেউ দেখে তো এর সমস্ত কষ্টটা ওঁকেই ভুগতে হবে।

একদিন বৌদিদি জিজ্ঞাসা করলেন—বিমল, গোকুল-পিঠে খেয়েছ?

আমার মা খুব ভাল গোকুল-পিঠে তৈরী করতেন, কাজেই ও জিনিসটা আমি খুব খেয়েছি। কিন্তু বৌদিদিকে একটু আনন্দ দেওয়ার জন্য বললুম—সে কি রকম বৌদি?

আর রক্ষা নেই। তার পরদিনই বিকাল বেলা বৌদিদি কলার পাতে মোড়া পিঠে নিয়ে হাজির।

আমায় বললেন—তুমি এখানে আমার সামনেই খাও। ঘড়ার জলে হাত ধুয়ে ফেলো এখন।

আমি বললুম—সর্বনাশ বৌদি, এই এতগুলো পিঠে খেতে খেতে এ পথে লোক এসে পড়বে, সে হয় না, আমি বাড়ী গিয়েই খাব।

বৌদি ছাড়বার পাত্রীই নয়, বললেন—না, কেউ আসবে না বিমল। তুমি এখানেই খাও।

খেলুম, পিঠে খুব ভাল হয় নি। আমার মায়ের নিপুণ হাতের তৈরী পিঠের মত নয়। বোধ হয় নতুন করতে শিখেছেন, ধারগুলো পুড়ে গিয়েছে, আস্বাদও ভাল নয়। বললুম—বাঃ বৌদি, বড় সুন্দর তো। এ কোথায় তৈরী করতে শিখলেন? আপনার বাপের বাড়ীর দেশে বুঝি?

বৌদির মুখে আর হাসি ধরে না। হাসিমুখে বললেন—এ আমি, আমাদের গুরুমা এসেছিলেন, তিনি শহরের মেয়ে, অনেক ভাল খাবার করতে জানেন, তাঁর কাছে শিখে নিয়েছিলাম।

তারপর সারা শীতকাল অন্যান্য পিঠের সঙ্গে গোকুল-পিঠের পুনরাবৃত্তি চলল। ঐ যে বলেছি, আমার ভাল লেগেছে, আর রক্ষা নেই!

একটা কথা আছে।

কিছুদিন ধরে আমার মনের মধ্যে একটা আগ্রহ একটু একটু ক'রে জমছিল, জীবনটাকে খুব বড় ক'রে অনুভব করবার জন্যে। আমার এ কুড়ি-একুশ বছর বয়সে এই ক্ষুদ্র পাড়াগাঁয়ে খাঁচার পাখীর মত আবদ্ধ থাকা ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছিল। চ'লেও যেতাম এতদিন। এখানকার একমাত্র বন্ধন হয়েছিলেন বৌদিদি। তাঁরই আগ্রহে স্নেহ-যত্নে সে অশান্ত ইচ্ছাটা কিছুদিন চাপা ছিল। এমন সময় মাঘ মাসের শেষের দিকে আমার এক আত্মীয় আমায় লিখলেন যে, তাঁদের কারখানা থেকে কাচের কাজ শেখবার জন্যে ইউরোপ আমেরিকায় ছেলে পাঠানো হবে, অতএব আমি যদি জীবনে কিছু করতে চাই, তবে শীঘ্র যেন মোরাদাবাদ গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তিনি সেখানকার কাচের কারখানার ম্যানেজার।

পত্র পেয়ে সমস্ত রাত আমার ঘুম হ'ল না। ইউরোপ—আমেরিকা। সে কত ঊর্মিসঙ্গীত-মুখরিত শ্যামল সমুদ্রতট...কত অকূল সাগরের নীল জলরাশি, দূরে সবুজ বিন্দুর মত ছোট ছোট দ্বীপ, ঐ সিসিলি! নতুন আকাশ, নতুন অনুভূতি...ডোভারের সাদা খড়ির পাহাড়—প্রশস্ত রাজপথে জনতার দ্রুত পাদচারণ, লাড্‌গেট সার্কাস, টটেন্‌হাম্ কোর্ট রোড—বার্চ উইলো পপ্‌লার-মেপ্‌ল গাছের সে কত শ্যামল পত্রসম্ভার, আমার কল্পলোকের সঙ্গিনী কনককেশিনী কত ক্লারা, কত মেরী, কত ইউজিনী।...

পরদিন সকালে পত্র লিখলুম—আমি খুব শীঘ্রই রওনা হব। স্কুলে সেইদিনই নোটিশ দিলুম, পনেরো দিন পরে কাজ ছেড়ে দেব।

মন বড় ভাল ছিল না, উপরের পথটা দিয়ে কয়েকদিন গেলুম। দশ-বারো দিন পরে নীচের পথটা দিয়ে যেতে যেতে একদিন বৌদিদির সঙ্গে দেখা। বৌদিদি একটু অভিমান প্রকাশ করলেন—বিমল, বড় গুণের ভাই তো! আজ চার-পাঁচ দিনের মধ্যে বোনটা বাঁচল কি মল তা খোঁজ করলে না?

আমি বললাম—বৌদিদি, করলে সেটাই অস্বাভাবিক হ'ত। বোনেরাই ভাইয়েদের জন্যে কেঁদে মরে, ভাইদের দায় পড়েছে বোনদের ভাবনা ভাবতে। দুনিয়াসুদ্ধ ভাই-বোনেরই এই অবস্থা।

বৌদিদি খিল্‌খিল্‌ ক'রে হেসে উঠলেন। এই তরুণীর হাসিটি বালিকার মত এমন মিষ্ট নির্মল যে এ শুধু লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাতের জ্যোৎস্নার মত উপভোগ করবার জিনিস, বর্ণনা করবার নয়। বললেন—তা জানি, জানি, নাও, আর গুমোর করতে হবে না, সে গুণ যে তোমাদের আছে তা কি আমরা ভেতরে ভেতরে বুঝি না? কিন্তু বুঝে কি করব, উপায় নেই। হ্যাঁ, তা সত্যি সত্যি মাকে কবে আনছ?

আমার কাজ ছেড়ে দেওয়ার কথা আমি বৌদিদিকে কিছু বলিনি। সে কথা বললে যে তিনি মনে অত্যন্ত আঘাত পাবেন, এ আমি বুঝতে পেরেছিলুম। একবার ভাবলুম, সেই তো জানাতেই হবে, একদিন ব'লে ফেলি। কিন্তু অমন সরল হাসিভরা মুখ, অমন নিশ্চিন্ত শান্তির ভাব—বলতে বড় বাধল। মনে মনে বললুম, তোমরা কেবল বুঝি স্নেহ ঢেলে দিতেই জান? তোমাদের স্নেহ-পাত্রদের বিদায়ের বাজনা যে বেজে উঠছে এ সম্বন্ধে এ রকম অজ্ঞান কেন?

জিজ্ঞাসা করলুম—বৌদি, একটা কথা বলি, আপনি আমায় এই অল্পদিনে এত ভালবাসলেন কি ক'রে? আচ্ছা আপনারা কি ভালবাসার পাত্রাপাত্রও দেখেন না? আমি কে বৌদি যে আমার জন্যে এত করেন?

বৌদিদির মুখ গম্ভীর হয়ে এলো। তাঁর ওই এক বড় আশ্চর্য ছিল, মুখ গম্ভীর হ'লে প্রায়ই চোখে জল আসবে, জল কেটে গেলে, তো আবার হাসি ফুটবে। শরতের আকাশে রোদ-বৃষ্টি খেলার মত। বললেন—এতদিন তোমায় বলি নি বিমল, আজ এই পাঁচ বছর হ'ল আমারও ছোট ভাই আমার মায়া কাটিয়ে চলে গিয়েছে, তারও নাম ছিল বিমল। থাকলে সে তোমারই মত হ'ত এতদিন। আর তোমারই মত দেখতে। তুমি যেদিন প্রথম এ রাস্তা দিয়ে যাও, তোমায় দেখেই আমার মনের মধ্যে সমুদ্র উথলে উঠল, সেদিন বাড়ী গিয়ে আপন মনে কত কেঁদেছিলাম। তুমি এখান দিয়ে যেতে, রোজ তোমাকে দেখতাম। যেদিন তুমি আপনা হতেই দিদি ব'লে ডাকলে, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত যে কি সুখে আছি তা বলতে পারি নে। তোমায় যত্ন ক'রে, তুমি যে বড় বোনের মত ভালবাসো, তাতে আমি বিমলের শোক অনেকটা ভুলেছি। ওই এক ভাই ছিল আমার। তুলসীতলায় রোজ সন্ধ্যাবেলা কত প্রণাম করি, বলি, ঠাকুর এক বিমলকে তো পায়ে টেনে নিয়েছ, আর এক বিমলকে যদি দিলে তো এর মঙ্গল করো; একে আমার কাছে রাখ।

চোখের জলে বৌদিদির গলা আড়ষ্ট হয়ে গেল। আমি কিছু বললুম না। বলব কি!

একটু পরে বৌদিদি নিজেকে একটু সামলে নিয়ে জলভরা চোখ দুটি তুলে আমার মুখের দিকে চাইলেন। কি সুন্দর তাঁকে দেখাচ্ছিল। কালো চোখদুটি ছল ছল করছে, টানা ভুরু যেন আরও নেমে এসেছে, চিবুকের ভাঁজটি আরও পরিস্ফুট, যেন কোন নিপুণ প্রতিমাকারক সরু বাঁশের চেঁচাড়ি দিয়ে কেটে তৈরী করেছে।...পথের পাশেই প্রথম ফাল্গুনের মুগ্ধ আকাশের তলায় আঁকোড় ফুলের একটা ঝোপে কাঁটাওয়ালা ডালগুলিতে থোলো থোলো সাদা ফুল ফুটে ছিল...মনের ফাঁকে ফাঁকে নেশা জমিয়ে আনে, এমনি তার মিষ্টি গন্ধ!

দুজনে অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলাম না। খানিক পরে বৌদিদি বললেন—সেই জন্যেই বলছি ভাই, মাকে আনো। আমাদের পাড়ায় চৌধুরীদের বাড়ীটা প'ড়ে আছে। ওরা এখানে থাকে না। খুব ভালো বাড়ী, কোনো অসুবিধা হবে না, তুমি মাকে নিয়ে এস, ওখানেই থাক, সে তাঁদের পত্র লিখলেই তাঁরা রাজী হবেন, বাড়ী তো এমনি পড়ে আছে। তোমার বোন পরাধীন, কিছু করবার তো ক্ষমতা নেই। তোমার সঙ্গে এসব দেখাশোনা, এসব লুকিয়ে, বাড়ীর কেউ জানে না। তুমি দু'বেলা ঘাটের পথ দিয়ে যেও, দেখেই আমি শান্তি পাব ভাই। মাকে এ মাসেই আনো।

কেমন ক'রে তা হবে?

একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলুম—বৌদি, আমি এখানে থাকলে কি আপনি খুব সুখী হন?

বৌদিদি বললেন—কি বলব বিমল? মাকে আনলে তোমার কষ্টটাও কম হয়, তা বুঝেও আমার সুখ! আর বেশ দুটি ভাই-বোনে এক জায়গায় থাকব, বারো মাস দু'বেলা দেখা হবে, কি বল?

আমি বললুম—ভাই যদি কোন গুরুতর অপরাধ করে আপনার কাছে, তাকে ক্ষমা করতে পারবেন?

বৌদিদি বললেন—শোন কথার ভঙ্গী ভাইটির আমার, আমার কাছে তোমার আবার অপরাধটা কিসের শুনি?

আমি জোর ক'রে বললুম—না বৌদি, ধরুন যদি করি তা হ'লে?

বৌদিদি আবার হেসে বললেন—না না, তা হলেও না। ছোট ভাইটির কোন কিছুতেই অপরাধ নেই আমার কাছে, আমি যে বড় বোন।

চোখে জল এসে পড়ল। আড়ষ্ট গলায় বললুম—ঠিক বৌদি, ঠিক!

বৌদিদি অবাক হয়ে গেলেন, বললেন—বিমল, কি হয়েছে ভাই! অমন করছ কেন?

মুখ ফিরিয়ে আনতে উদ্যত হলুম, বললুম—কিছু না বৌদি, অমনি বলছি।

বৌদিদি বললেন—তবুও ভাল। ভাইটির আমার এখনও ছেলেমানুষি যায় নি। হ্যাঁ, ভাল কথা বিমল, তুমি ভালবাস ব'লে বাগানের কলার কাঁদি আজ কাটিয়ে রেখেছি, পাকলে একদিন ভাল ক'রে দেব এখন।

তার পরদিনই আমার নোটিশ অনুসারে স্কুলের কাজের শেষদিন। গিয়ে শুনলাম আমার জায়গায় নতুন লোক নেওয়া ঠিক হয়ে গিয়েছে। স্কুলে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে চ'লে এলুম।

শুধু একবার শেষ দেখা করবার জন্যে তার পরদিন পুকুরের ঘাটে ঠিক সময়ে গেলুম। তাঁর দেখা পেলে কি বলব তা ঠিক ক'রে সেখানে যাই নি, সত্য কথা সব খুলে বলত বোধ হয় পারতুম সেদিন—কিন্তু দেখা হ'ল না। সব দিন তো দেখা হ'ত না, প্রায়ই দু'তিন দিন অন্তর দেখা হ'ত, আবার কিছুদিন ধ'রে হয়ত রোজই দেখা হ'ত। সেদিন বিকালে গেলুম, তার পরদিন সকালেও গেলুম, কিন্তু দেখা পেলুম না।

সেদিন চ'লে আসবার সময় সেখানকার মাটি একটু কাগজে মুড়ে পকেটে নিলুম, যেখানে তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হবার দিন তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন।...

সেইদিনই বিকালে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চিরদিনের মত সে গ্রাম পরিত্যাগ করলুম।

মাঠের কোণে ছাতিম গাছের বনের মধ্যে কোথায় ঘুঘু ডাকছিল।—

সে সব আজ পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগেকার কথা।

তারপর জীবনে কত ঘটনা ঘ'টে গেল। ভগবানের কি অসীম করুণার দানই আমাদের এই জীবনটুকু! উপভোগ ক'রে দেখলুম, এ কি মধু! কত নতুন দেশ, নতুন মুখ, কত জ্যোৎস্না-রাত্রি, নতুন নব-ঝোপের নতুন ফুল, কত জুঁই ফুলের মত শুভ্র নির্মল হৃদয়, কান্না-জড়ানো কত মধুর স্মৃতি!...

কাকার কাছে মোরাদাবাদে কাচের কারখানায় গেলুম। বছরখানেক পরে তারা আমায় পাঠিয়ে দিলে জার্মানীতে কাচের কাজ শিখতে। তারপর কোলোয়ে' গেলুম কাটা বেলোয়ারী কাচের কারখানার কাজ শেখবার জন্যে। কোলোয়ে' অনেক দিন রইলুম। সেখানে থাকতে একজন আমেরিকান যুবকের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হ'ল, তিনি ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট "শিকাগো ইন্টার-ওশ্যান" কাগজের তিনি ফ্রান্স দেশস্থ সংবাদদাতা। কোলোয়ে' সব সময় না থাকলেও তিনি প্রায়ই ওখানে আসতেন। তাঁরই পরামর্শে তাঁর সঙ্গে আমেরিকায় গেলুম। তাঁর সাহায্যে দু'তিনটা বড় বড় কাচের কারখানার কাজ দেখবার সুযোগ পেলাম...পিট্সবার্গে। কর্ণেগীর ওখানে প্রায় ছ'মাস রইলুম, নতুন ধরণের ব্লাস্টফার্নেসের কাজ ভাল ক'রে বোঝবার জন্যে।...মিড্ল ওয়েস্টের একটা কাচের কারখানায় প্রভাত দে কি বসু বলে একজন বাঙালী যুবকের সঙ্গে দেখা হ'ল, তাঁরও বাড়ী চব্বিশ পরগণা জেলায়! সে ভদ্রলোক নিঃসম্বলে জাপান থেকে আমেরিকায় গিয়ে মহা হাবুডুবু খাচ্ছিলেন, তাঁরই মুখে শুনলাম, সেয়াট্ল্-এ একটা নূতন কাচের কারখানা খোলা হচ্ছে। আমি জাপান দিয়ে আসব স্থির করেছিলুম, কাজেই আসবার সময় সেয়াট্ল্ গেলুম। তারপর জাপান ঘুরে দেশে এলুম।...মা ইতিমধ্যে মারা গিয়েছিলেন। ভাই-দুটিকে নিয়ে গেলুম মোরাদাবাদে। বেশীদিন ওখানে থাকতে হ'ল না। বম্বেতে বিয়ে করেছি, আমার শ্বশুর এখানে ডাক্তারী করতেন। সেই থেকে বম্বে অঞ্চলেরই অধিবাসী হয়ে পড়েছি।

বহুদিন বাংলা দেশে যাইনি, প্রায় ষোল-সতের বছর হ'ল। বাংলা দেশের জল-মাটি গাছপালার জন্যে মনটা তৃষিত আছে। তাই আজ সন্ধ্যার সময় সমুদ্রের ধারে ব'সে আমার সবুজ শাড়ী-পরা বাংলা মায়ের কথাই ভাবছিলুম।...বাজাবাই টাওয়ারের মাথার ওপর এখনও একটু একটু রোদ আছে। বন্দরের নীল জলে মেসাজেরী মারিতিমদের একখানা জাহাজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে, এখানা এখুনি ছেড়ে যাবে। বাঁ-ধারে খুব দূরে এলিফ্যাণ্টার নীল সীমারেখা।...ভাবতে ভাবতে প্রথম যৌবনের একটা বিস্মৃত-প্রায় ঝাপ্সা ছবি বড় স্পষ্ট হয়ে মনে এলো। পঁচিশ বছর পূর্বের এমনি এক সন্ধ্যায় দূর বাংলা দেশের এক নিভৃত পল্লীগ্রামের জীর্ণ শান-বাঁধানো পুকুরের ঘাট বেয়ে উঠেছে আর্দ্র-বসনা তরুণী এক পল্লীবধূ!...মাটির পথের বুকে বুকে লক্ষ্মীর চরণচিহ্নের মত তার জলসিক্ত পা দুখানির রেখা আঁকা।...আঁধার সন্ধ্যায় তার পথের ধারের বেণুকুঞ্জে লক্ষ্মীপেঁচা ডাকছে। তার স্নেহভরা পবিত্র বুকখানি বাইরের জগৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ততায় ভরা। আম কাঁটালের বনের মাথার ওপরকার নীলাকাশে দু'একটা নক্ষত্র উঠে সরলা স্নেহ-দুর্বলা বধূটির ওপর সস্নেহ কৃপাদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। তারপর এক শান্ত আঙিনায় তুলসী মণ্ডমূলে স্নেহাস্পদের মঙ্গলপ্রার্থিনী সে কোন্ প্রণাম-নিরতা মাতৃ-মূর্তি করুণা-মাখা অশ্রু-ছলছল।...

ওগো লক্ষ্মী, ওগো স্নেহময়ী পল্লীবধূ, তুমি আজও কি আছো? এই সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে আজও তুমি কি সেই পুকুরের ভাঙা ঘাটে সেই আবার জল আনতে যাও?...আজ সে কত কালের কথা হ'ল, তারপর জীবনে আবার কত কি দেখলুম, আবার কত কি পেলুম...আজ কতদিন পরে আবার তোমার কথা মনে পড়ল...তোমায়

আবার দেখতে বড় ইচ্ছে করছে দিদিমণি, তুমি আজও কি আছো? মনে আসছে, অনেক দূরের যেন কোন খড়ের ঘর…মিট্‌মিটে মাটির প্রদীপের আলো…মৌন সন্ধ্যা…নীরব ব্যথার অশ্রু…শান্ত সৌন্দর্য…স্নেহ মাখা রাঙা শাড়ীর আঁচল…

আরব সমুদ্রের জলে এমন করুণ সূর্যাস্ত কখনও হয়নি!

প্রবাসী, মাঘ, ১৩২৮

ঠেলাগাড়ী

সবে বিছানা ছেড়ে উঠেছি, রোদ তখনও ভালোরকম ওঠেনি—খিড়কি দোরের জগডুমুর গাছটার মাথায় গোটাকতক শালিখ পাখীতে কিচ্‌ কিচ্‌ ও ঝটাপটি বাধিয়েছে—আমি উঠে মনে মনে তোলাপাড়া করছি যে কাল রাত্রের বাসি কলার বড়া যা আমাদের জন্যে রান্নাঘরে ঝুলন্ত শিকায় বড় জামবাটিতে টাঙানো আছে—তা কোন্ অছিলায় মার কাছে চাওয়া যায়, বা মুখ ধোবার পূর্বে তা চাইতে গেলে সেটা শোভনীয়ই বা কতদূর হবে—এমন সময় আমাদের বাহির দরজার কাছে একটা ঠেলাগাড়ীর ঘড়ঘড় শব্দ উঠল, সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি রিনরিনে গলায় ডাক শোনা গেল—

—টুনি-ই-ই-দা-আ-আ—ও টুনি…

অমনি আমার বৃদ্ধা জেঠাইমা মারমুখী হয়ে কি একটা হাতে উঁচিয়ে ছুটে গেলেন—সকাল বেলা জুটলে এসে? এখনো কাক-পক্ষীর ঘুম ভাঙেনি, অমনি এলে ছেলেটাকে টুইয়ে বার ক'রে নিয়ে যেতে? সকাল নেই, সন্দে নেই, দুপুর নেই, সব সময় ঘড়ঘড় ঘড়ঘড় শব্দ—যাই দিকি একবার হর গাঙ্গুলীর কাছে, বলি, ছেলেটাকে যে দিন নেই রাত নেই গাড়ী ঘড়ঘড় ক'রে বেড়াতে দিচ্ছ, ওর পরকালটা যে ঝর্‌ঝরে হয়ে গেল—যা এখন যা, টুনি এখন যাবে না। গাড়ীর ঘড়ঘড় সহ্যি হয় না বাপু সব সময়—যা ওসব নিয়ে যা…

আমি নিরীহ মুখে পূজনীয়া জেঠাইমার পিছনে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে গাড়ীর শব্দটা আমাদের ঘাটের পথ দিয়ে দূরে অস্পষ্ট হয়ে গেল, তারপর হাত-মুখ ধুতে গিয়ে খিড়কি দোরের কাছে মৃদু শব্দ কানে এল—ও টুনিদা?…আমি একবার পিছন ফিরে জেঠাইমার অবস্থিতি-স্থান ও তাঁর দৃষ্টির গতির দিগ্‌-নির্ণয় ক'রে নিয়েই ঝট্‌ করে খিড়কি দোরটা খুলে বার হয়ে এলুম। সকালের পদ্মের মত নির্মল, প্রফুল্ল, তরুণ নরু হাসিভরা ডাগর চোখে দাঁড়িয়ে আছে।

—আসবি নে টুনিদা?

—এই উঠলাম যে, এখনও মুখ ধুইনি, খাবারও খাইনি—বাড়ীর মধ্যে আয় না!

নরু চোখের ইশারায় দেখিয়ে বললে—কোথায়?

—কিছু বলবে না জেঠাইমা, আয় তুই…

উত্থাপিত প্রস্তাবে সে মনেপ্রাণে যোগ দিতে সক্ষম হ'ল না।

—তুই আয় মুখ ধুয়ে টুনিদা—আমি চাল্‌তেতলায় আছি গাড়ী নিয়ে, চড়বি তো টুনিদা?

দুজনে মিলে পাড়ায় বেরিয়ে গেলুম। তেঁতুলতলায় খেলার জায়গায় খুব ভিড়—মুখুয্যে পাড়ার কোন ছেলে আর বাকী নেই। নরু হাসিমুখে বললে—আয় পটুদা, নিতাইদা—আমি গাড়ী এনেছি—দেখ্‌ ঠিক সময়টা আসিনি? আয় চড়…গাড়ী একা নরুই টানতে লাগল। চড়ল সকলেই। পটু বললে—দুপুর বেলা আমাদের বাড়ী

যাবি নর?

নর ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানালে।

পটু বললে—যাস তুই—সেদিন যে একেবারে কাকার সামনে গিয়ে পড়েছিলি, তা কি হবে?

নরু বললে—আমি আর যাচ্ছিনে তোমাদের বাড়ী পটুদা। তোমার কাকা সেদিন একেবারে মারতে···বললে রোজ রোজ গাড়ী ঠেলে বেড়ানো বার করছি। আমি না পালালে সেদিন মার খেতাম ঠিক। যদি এর পর গাড়ী কেড়ে রাখে?

সেখান থেকে দুজনে গিয়ে পথের ধারে বড় জামতলার ছায়ায় ব'সে গল্প করলুম। রোজই কত গল্প হ'ত। এর পরে কে কি হবে তাই নিয়ে গল্প।

খোকার অত ভবিষ্যৎ ভেবে দেখবার বয়স হয়নি! সে এর পরে কি হবে অত গুছিয়ে বলতে পারে না—খাপছাড়া ভাবে উত্তর দেয়, বলে—সে নৌকোর মাঝির সর্দার হবে, রেল গাড়ীর ইঞ্জিন চালাবে, ইস্টিমার যারা চালায়, তাদের কি বলে—তাও হতে চায়। আমি আমার সমবয়সী ছেলেদের তুলনায় একটু অকালপক্ক, বলতাম—আমি ভাই সায়েব ডাক্তার হবো। মহকুমার হাকিম হবো।···

অনেক বেলায় সে রৌদ্রে ঘুরে রাঙামুখে বাড়ী ফিরত। বাবা যেদিকে বসে, সেদিকে না গিয়ে চুপি চুপি অন্য দিক দিয়ে বাড়ী ঢোকে। মা বলত—ওরে দুষ্টু, তুমি সেই বেরিয়েছ কোন্ সকালে, আর এই দুপুর ঘুরে গেল, এখন তুমি···

খোকা বলে—চুপ চুপ—না, আমি তো ওই ওদের বাড়ীর জামতলায় চুপটি ক'রে ব'সে ব'সে খেলা কচ্ছিলাম, আমি আর টুনিদা—কোথাও তো যাইনি মা! সত্যি···

কি জানি কেন ওকে বড় ভালবাসতুম। গ্রামের সকল ছেলের চেয়ে এর মুখে চোখে, কথায় কি মোহ যে ছিল—সারাদিনটির মধ্যে একবার অন্তত ওর সঙ্গে না দেখা ক'রে পারতুম না। খোকাও আমার বাড়ী না হয়ে পাড়ার অন্য কোথাও বেরুত না।

এক-একদিন আমাদের বাড়ীর সামনের জামতলা দিয়ে সে গাড়ী ঠেলে নিয়ে বাড়ী ফিরে যায় দুপুরের আগে। আমার দিকে চেয়ে বলে—এমন দুষ্টু এই নিতাইটা, এত ক'রে বললুম, চড় গাড়ীতে, আয় তোকে ঠেলে গয়লাপাড়া ঘুরিয়ে আনি···তা কিছুতে চড়লো না, বললে, মা বকবে, তেল আনতে যাচ্ছি—আয় চড়বি টুনিদা?

—তোর বুঝি আজ আর কেউ চড়ার লোক হয়নি খোকা?

—আমাদের পাড়ায় কেউ চড়লে না, কখন থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছি—সব যা দুষ্টু। আসবি টুনিদা?

খোকার চোখের মিনতি-ভরা দৃষ্টি তখনকার দিনে আমার এড়াবার সাধ্য হ'ত না কোনমতেই। আমি চড়তুম। মহা খুশির সঙ্গে খোকা চৈত্র-বৈশাখের মধ্যাহ্ন সূর্যকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা ক'রে গাড়ী ঠেলে নিয়ে বেড়াত···সূর্যও প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ওর কচি মুখ রাঙিয়ে দিতেন, ঘামে কাপড় ভিজিয়ে দিয়ে ছাড়তেন।

তার বয়স অল্প ও দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ মেয়েলী ধরনের ছিল ব'লে পাড়ার কোন ছেলের সঙ্গে বলে সে পেরে উঠত না···সকলের কাছে তাকে অবিচার সহ্য করতে হ'ত। দুর্বলের প্রতি সবলের অধিকার তার ওপর নির্বিবাদে জারি করত সকলেই।

সেদিনটা ছিল ভারি গরম। চৈত্র-বৈশাখের দিন গ্রামের পথের ধুলো তেতে আগুন হয়েছে—পঞ্চাননতলায় বারোয়ারীর আসর সাজানো, বাঁশের মাচা বাঁধা—সবাই কাজে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাটছে।

বড় পিটুলি গাছতলাটায় তার ঠেলাগাড়ীর ঘড়ঘড় আওয়াজ উঠল। অনু বললে—

ওই নরু আসছে। পিছনে পরমসংগী কেরোসিনের ঠেলাগাড়ীটা টেনে নরু হাজির। বাঁধা আসরের দিকে এসে আঙুল দেখিয়ে বলে—যাত্রা কবে বস্‌বে রে টুনিদা ?

সংবাদ সংগ্রহের পর সে সন্তোষের হাসি হাসল। আঙুল দিয়ে গাড়ীটার দিকে দেখিয়ে বললে—চড়বি পটুদা ? পটু ঘাড় নেড়ে বললে—চড়ব. টানবে কে ?

খোকা খুব খুশি হয়ে বললে—কেন আমি ?

আসন্ন আমোদের প্রত্যাশায় তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

পটু বললে, দূর, তুই বুঝি টানতে পারিস ? টান দিকি কেমন—হয় না আর আমাকে···

—বসো না ? টানতে কেমন পারিনে !

পটুর পালা শেষ হয়ে গেলে ক্রমে ক্রমে অনু, বরু, হরু উপস্থিত সব ছেলেই উঠল গাড়ীতে। এদের মধ্যে বড় ছোট সব রকমই আছে, টানতে টানতে খোকা হয়রান হয়ে পড়লেও সে উৎসাহের সংগে শেষ পর্যন্ত ঠিক টেনে নিয়ে বেড়াল সকলকে। সকলের শেষ হয়ে গেলে সে হেসে সকলের মুখের দিকে চেয়ে বললে—আমায় একটু এইবার টান।

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি শুরু করলে। ভাবে বোঝা গেল, তাকে কেউ টানতে রাজী নয়। তার প্রতি কৃপা ক'রে তার গাড়ীতে চ'ড়ে তাকে দিয়ে টানিয়ে তাকে কৃতার্থ করা হয়েছে, এতে আবার তার পরকে দিয়ে টানাবার কোন্ দাবী আছে ? সকলে মিলে এই ভাবটা দেখালে।

বাঃ, সকলকে চড়িয়ে দিলাম, আর আমার বেলায় বুঝি কেউ···

আমার ইচ্ছে হ'ল তাকে গাড়িতে চড়িয়ে টানি। কিন্তু সমবয়সী ছেলেদের কাছে উপহাসের ভয়েই হোক বা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস না থাকার দরুণই হোক—যেতে পারলুম না। সে গাড়ী টেনে নিয়ে চ'লে গেল। এদের মধ্যে পূর্বে কি পরামর্শ হয়েছিল আমার জানা নেই—গাড়ীখানা খানিক দূর যেতে না যেতেই দলের একজন একটা বড় ঝামা ইট নিয়ে গাড়ীতে ছুঁড়ে মেরে বসল।

গাড়ীখানার তলা তখনি মচ্ মচ্ ক'রে দেশলাইয়ের বাক্সের মত ভেংগে গেল। খোকা পিছন ফিরে চেয়ে দেখে কেমন অবাক হয়ে গেল—পরে তাড়াতাড়ি গাড়ীর ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করবার জন্যে এসে গাড়ীর অবস্থা দেখেই আর একবার বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাইলে। তারপর সে চাইল আমার দিকে—তার চোখের সে ব্যথা-ভরা বিস্ময়ের অপ্রত্যাশিত না-বুঝতে পারা দৃষ্টি আমার বুকে তীরের মত বিঁধল। ভাবল এই রকম যে, তুইও টুনিদা এর মধ্যে ?

কিন্তু সে কোন কথা কাউকে না বলে ভাঙা গাড়ীটার পাশে ব'সে প'ড়ে দেখতে লাগল। এর আগেই আমাদের দল সেখান থেকে স'রে পড়েছিল।

তারপর অনেকক্ষণ সে ব'সে ব'সে নেড়েচেড়ে দেখলে গাড়ীখানার ভাঙা তলাটা কি ক'রে সারানো যায়। পাশে একটা ছোট বাকস্ ফুলের গাছের সাদা ডালে থোলো থোলো বাকস্ ফুল দুলছিল—তারই পাশে গাব্ ভেরেণ্ডার ঝোপের ধারে সে গাড়ীখানা রেখে খানিক ব'সে ব'সে পরে ঠেলে নিয়ে গেল।

সারারাত ভাল ঘুম হ'ল না। সকালে ওদের বাড়ী ছুটে গিয়ে যদি ভাব ক'রে ফেল্‌তুম তো বেশ হ'ত, কিন্তু কেমন বাধো বাধো ঠেকতে লাগল। খোকা রোজ সকালে আসে. সেদিন এল না, অভিমানে ভুল বুঝেছে।

দু'তিন দিন ক'রে সপ্তাখানেক কেটে গেল।

অল্পদিন পরেই আমি বাড়ীর সকলের সংগে মামার বাড়ী চ'লে গেলুম ছোট মাসীমার বিয়েতে। ফিরতে হয়ে গেল আট-দশ মাস।

খোকাকে ফিরে এসে আর দেখিনি। আগের পৌষ মাসে সে হুপিংকাশিতে মারা গিয়েছে। ফেরবার দিন দশেক পরে একদিন ওদের বাড়ী গিয়েছিলুম। খোকার মা উঠানে কুল রোদ্রে দিয়েছিল, তখন তুলছে, আমায় দেখে বললে—টুনি, তোরা দেশে এলি?…আমি কোন কথা বলার আগেই তার মা হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল—তবুও এসেছিস তুই টুনি—আর কি কেউ আসবে এ বাড়ী বেড়াতে? খোকা যে আমায় ফাঁকি দিয়ে চ'লে গিয়েছে রে! বোস্ বোস্, বাতাবী নেবু পাকা ঘরে আছে, কেটে দেব, খাবি নুন দিয়ে? ওই পেকে পেকে থাকে, কেউ খায় না—খোকা কত খেত—খা না ব'সে ব'সে!

শরতের অপরাহ্ণ। নির্মেঘ নীল আকাশের তলায় অবসন্ন বৈকালের রৌদ্রে ডানা মেলে কি পাখী উড়ে চলেছে। কার্নিস ভাঙা ছাদের ফাটলে কোথায় ঘুঘুর ডাক… উঠানের ছায়াস্নিগ্ধ বাতাস শুকনো কুলের গন্ধে ভরপুর!…

খোকার সেই ঠেলাগাড়ীখানা দেখলুম—কাঠের মাচার নীচে তোলা আছে। দড়িটা পর্যন্ত। অনেকদিন গাড়ীটাতে কেউ হাতও দেয়নি।

বহুকালের কথা হলেও আমি কিন্তু চোখ বুজে ভাবলেই দেখতে পাই—কতকাল আগেকার আট বৎসরের সেই ছোট্ট খোকাটি ঠেলাগাড়ীটা টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। নির্জন দুপুর ঘুঘুর ডাকের মধ্যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পালেদের জামরুল বাগানের ছায়ায়… আমাদের বড় মাদার গাছটার তলাকার পথ দিয়ে, রাঙা মুখে আশা ও আনন্দ-ভরা উজ্জ্বল চোখে সে তার কেরোসিন কাঠের গাড়ীখানা টেনে টেনে আসছে…নারিকেলতলা বেয়ে—পটুদের বড় দো-ফলা আমগাছটার তলা বেয়ে…যেতে যেতে ক্রমে তার মূর্তি মাইতি-পুকুরের মোড়ের পথে সুপারি গাছের সারির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।…

বিচিত্রা, কার্তিক ১৩৩৫

খুকীর কাণ্ড

হরি মুখুয্যের মেয়ে উমা কিছু খায় না! না খাইয়া খাইয়া রোগা হইয়া পড়িয়াছে বড়।

উমার বয়স এই মোটে চার। কিন্তু অমন দুষ্টু মেয়ে পাড়া খুঁজিয়া আর একটি বাহির ক'রো তো দেখি…তাহার মা সকালে দুধ খাওয়াইতে বসিয়া কত ভুলায়, কত গল্প করে, সব মিথ্যা হয়। দুধের বাটিকে সে বাঘের মত ভয় করে—মায়ের হাতে দুধের বাটি দেখিলেই সোজা একদিকে টান্ দিয়া দৌড়।

মা বলে—রও দুষ্টু মেয়ে, তোমার দুষ্টুমি আমি…দুধ খাবেন না, সুজি খাবেন না, খাবেন যে কি দুনিয়ায় তাও তো জানি নে—চ'লে আয় ইদিকে—

খুকী নিরুপায় দেখিয়া কান্না শুরু করে। তাহার মা ধরিয়া ফেলিয়া জোর করিয়া কোলে শোয়াইয়া ঝিনুক মুখে পুরিয়া দুধ খাওয়ায়। কিন্তু জোরজবরদস্তিতে অর্ধেকের উপর ছড়াইয়া গড়াইয়া অপচয় হয়, বাকি অর্ধেকটুকু কায়ক্লেশে খুকীর পেটে যায় কি না যায়!

সময়ে সময়ে সে আবার মায়ের সঙ্গে লড়াই করে। চার বছর বয়স বটে, না খাইয়া খাইয়া কাটি কাটি হাত পাও বটে, কিন্তু তাহাকে কায়দায় ফেলিতে তাহার মায়ের এক-একদিন গলদঘর্ম। রাগ করিয়া মা বলে—থাক্ আপদ বালাই কোথাকার, না খাস তো বয়ে গেল আমার—সারাদিন খেটে খেটে মুখে রক্ত উঠবে, আবার ওই দস্যি মেয়ের সঙ্গে দিনে পাঁচবার কুস্তি ক'রে দুধ খাওয়াবার শক্তি আমার নেই—মর্ শুকিয়ে।

খুকী বাঁচিয়া যায়, ছুটিয়া এক দৌড়ে বাড়ির সামনের আমতলায় দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া সমবয়সী সঙ্গিনীকে ডাকে—ও নেনু উ-উ...

তাহার বাবা একদিন বাড়ীতে বলিল—দেখ, খুকীটাকে আজ দিন পনেরো ভাল ক'রে দেখিনি—আসবার সময় দেখি পথের ওপর খেলা ক'চ্ছে, এমনি রোগা হয়ে গিয়েছে যেন চেনা যায় না, পিঠটা সরু, কণ্ঠার হাড় বেরিয়েছে, অসুখ-বিসুখ নেই, দিন দিন ওরকম রোগা হয়ে পড়ছে কেন বলো তো?

খুকীর মা বলে—পড়বে না আর রোগা হয়ে? সারা দিনরাতে ক'ঝিনুক দুধ পেটে যায়? মরে মরুক, আমি আর পারিনে লড়াই করতে...কে এখন এই দস্যি মেয়েকে রোজ রোজ যায় দুধ খাওয়াতে? যাই ওর কপালে থাকে তাই হোক গে...

তাই হয়! দস্যি মেয়ে শুকাইতে থাকে!

ভাদ্র মাস, হঠাৎ বর্ষা বন্ধ হইয়া রৌদ্র বড় চড়িয়া উঠিয়াছে, গ্রামের ডোবা পুকুরে সারা গাঁয়ের পাটক্ষেতের পাটের আঁটি ভিজানো। নদীর ধারে কাশের ফুল ফুটিয়াছে!

গ্রামের হীরু চক্রবর্তীর আড়তে এই সময় কাজকর্মের বড় ভিড়। নানা দেশের ধানের ও পাটের নৌকো সব গঙ্গার ঘাটে জড়ো হইয়াছে। হরিশ যুগী আড়তের কয়াল—কাঁটার ফের্তায় এক মণ ধানে, আরও সের দশেক ঢুকাইয়া লওয়া—তাহার কাছে ছেলেখেলা মাত্র। হাঙরের মুখখোদাই বড় একখানা মহাজনী নৌকো হইতে ধানের বস্তা নামিতেছে, পট্‌পটি গাছের ছায়ায় উঁচু করা ধানের স্তূপ হইতে হরিশ সুর-সংযোগে কাঁটায় করিয়া ধান মাপিতেছে—রাম—রাম—রাম হে রাম—রাম হে দুই—দুই দুই—দুই হে তিন—তিন তিন...

গফুর মাঝি ডাবা হুঁকোয় তামাক টানিতে টানিতে বলিতেছে—তা নেন্ গো কয়াল মশাই, একটু হাত চালিয়ে নেন্ দিকি, মোরা একবার দেখি? ইদিকি নোনা গাঙের গোন্ নামলি কি আর নৌকা বাইতি দেবানে?

হরি মুখুয্যে মহাশয়কে একটু ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে আসিতে দেখিয়া হীরু চক্রবর্তী বলিলেন—আরে এস হরি, কি মনে ক'রে? এসো তামাক খাও...

—না থাক—তামাক—ইয়ে আমার মেয়েটাকে ইদিকে দেখেছ হীরু? না?...বড় মুস্কিলে ফেলেছে বাঁদর মেয়ে...বারোটা বাজে, সেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছে সকাল ন'টার সময়...একটু দেখি ভাই খুঁজে, এত জ্বালাতনও ক'রে তুলেছে মেয়েটা, সে আর তোমাকে কি বলব...

অনেক খোঁজাখুঁজির পরে রায়বাড়ীর পথে উমাকে ধুলোর উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া কি একটা হাতে লইয়া চুষিতে ও আপন মনে বকিতে দেখা গেল।

—ওরে দুষ্টু মেয়ে...

হরি মুখুয্যে গিয়া মেয়েকে কোলে তুলিয়া লইলেন! বাবার কোলে উঠিতে পাইয়া উমা খুব খুশি হইল, হাত-পা নাড়িয়া বলিতে লাগিল—বাবা, ও বাবা...ওই ওদের নাদু ভারি দুত্তু...এই, এই দুধ এই খায় না...আমি দুধ খাই, না বাবা?

—বেশ মেয়ে, দুধ খেতে হয়। ওটা কি খাচ্ছিস, হাতে কি?

—নেবেঞ্চুস, ওই পুঁটির মামা এসেছে, তাই দিয়েছে।

বাড়ীতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উমার শাস্তি শুরু হয়। বাটিভরা দুধ, ঝিনুক, টানাটানি ইত্যাদি। তাহার কান্না, কাকুতি-মিনতি পাষাণী মা শোনে না...জোর করিয়া ঝিনুক মুখে পুরিয়া দিয়া ঢোঁকে ঢোঁকে দুধ খাওয়ায়...শেষের দিকটায় সে পা ছুঁড়িতে গিয়া খানিকটা দুধসুদ্ধ বাটিটা উল্টাইয়া ফেলিয়া দিল।

দুম্ দুম্ দুই নির্ঘাত কিল পিঠে। পিঠ প্রায় বাঁকিয়া যায়।

—হতভাগা দস্যি আপদ কোথাকার…ছ'সের ক'রে দুধ টাকায়, ভাত জোটে না, দুধের খরচ যোগাতে যোগাতে প্রাণ গেল…দস্যি মেয়ের ন্যাকরা দেখ—আদ্ধেকটা দুধ কিনা ঠ্যাং ছুঁড়ে মাটিতে দিলে ফেলে!…

খুকী দম সাম্‌লাইয়া লইবার পরে পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল। অনেকক্ষণ কাঁদিল।

বেলা পড়িয়া আসে! ওদের উঠানে পূর্বপুরুষের আমলের বীজু-আমগাছের ছায়ায় অপরাহ্নের রোদকে আট্‌কাইয়া রাখে। খুকী বসিয়া বসিয়া ভাবে অপরের বাড়ীতে ভাল খাবার খাইতে পাওয়া যায়—মিষ্টি—তাহাদের বাড়ীতে শুধু দুধ আর দুধ!

তাহার মা বলিল—টিপ পরবি ও দস্যি?

খুকী ঘাড় নাড়িয়া মায়ের কাছে সরিয়া আসিল।

—বলে নয়ন-তারা টিপ, দুটো ক'রে এক পয়সায়, বেশ টিপগুলো—স'রে এসে বোস দিকি।

টিপ পরিয়া খুকী আবার পাড়া বেড়াইতে বাহির হয়। বাঁশবনের তলা দিয়া গুটি গুটি হাঁটে। পুনরায় সে লোভে লোভে রায়বাড়ী যায়, পরের বাড়ীতেই যত ভাল খাবার। বিস্কুট, নেবেঞ্চুস, কত কি।

নানুদের উঠানে পেঁপে গাছের মাথার দিকে তাহার চোখ পড়িতে সে প্রথমটা অবাক হইয়া গেল—সঙ্গিনীকে ডাকিয়া দেখাইয়া কহিল—ও নানু, ঐ পিঁপে।

পেঁপে তাহার মা কাটিয়া খাইতে দেয়, বেশ খাইতে লাগে, কিন্তু তাহা গাছের আগ্‌ডালে কি অমনভাবে দোলে! চাহিয়া চাহিয়া সে কিছু ঠাহর করিতে পারিল না।

পুজার কিছু পূর্বে খুকীর আপন মামা কলিকাতা হইতে আসিল। এত ধরণের খাবার কখনও সে চক্ষেও দেখে নাই। কিশমিশ দেওয়া মেঠাই, বড় বড় অমৃতি, জিলিপি. গজা, কমলালেবু আরও কত কি।

পাশের গ্রামে মামার এক বন্ধুর বাড়ী। মামা পরদিন সকালে উঠিয়া তাহাকে সাজাইয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল।

পথে কে একজন সাইকেলে চড়িয়া যাইতেছে, খুকী চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। মামাকে বলিল—ও কে গেল মামা?

—ও রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে একজন লোক…

উমা বলিল—ফরসা মুখ, ফরসা জামা গায়, না মামা?…চমৎকার!…

তাহার মামা হাসিয়া বলিল—'চমৎকার' কথাটা তুই শিখলি কি ক'রে?…আচ্ছা খুকু. তুই ওকে বিয়ে করবি?

উমা সপ্রতিভ মুখে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—তাহার কোন আপত্তি নাই।

ভাদ্রের শেষ, ম্যালেরিয়ার সময়, তবে এখনও খুব বেশী আরম্ভ হয় নাই, বাড়ীবাড়ী কাঁথামুড়ি দেওয়া শুরু হইতে এখনও দেরি আছে। উমার হাঁটুনির বেগ নিস্তেজ হইয়া পড়িতে থাকে, ক্রমে সে মাঝে মাঝে পথের ধারে বসিতে লাগিল, মাঝে মাঝে হাই তুলিতে লাগিল। তাহার মামা বলিল—কি হয়েছে খুকু, রোদ্দুর বড্ড বেশী রে, আর বেশী নেই, চল…

বন্ধুর বাড়ী পৌঁছিবার পূর্বেই উমা বলিল—মামা, আমার শীত লাগছে…

—শীত কি রে? ভাদ্র মাসে এই গরমে শীত? ও কিছু না, চল…

খুকী আর কিছু না বলিয়া বেশ চলিল বটে, কিন্তু খানিক দূর গিয়া তাহার মনে হইল শীত একটু বেশী করিতেছে। শুধু শীত নয়, তৃষ্ণাও পাইয়াছে। সে সাহসে ভর করিয়া বলিল—মামা, আমি জল খাব।

—বড় বিপদ দেখছি তো, আচ্ছা, আগে চল গিয়ে পৌঁছুই—খেও এখন জল…

গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া উমার মামা তাহার কথা ভুলিয়াই গেল। অনেকদিন পরে পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, গল্পগুজব ও হাসিঠাট্টায় মশগুল হইয়া উমার সুখ-দুঃখের দিকে চাহিবার অবকাশ পাইল না। উমা দু-একবার কি বলিল, আলাপের গোল-মালে সে কথা কেহ কানে তুলিল না।

খানিকক্ষণ পরে তাহার মামা ফিরিয়া দেখিল, সে গুটিসুটি হইয়া রৌদ্রে বসিয়া আছে, মামার প্রশ্নের উত্তরে বলিল—জল খাবো, মামা, জল-তেষ্টা পেয়েছে…

—দেখি? তাই তো রে, গা যে বড় গরম—উঃ, খুব জ্বর হয়েছে—যে ম্যালেরিয়ার জায়গা! আয়, চল্ ওদের ঘরে শুইয়ে রাখিগে, ওঠ্…

খুকীকে জল খাওয়াইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া মামা পুনরায় পাড়ার দিকে বাহির হইল, স্নানাহার বন্ধুদের বাড়ীতেই সম্পন্ন হইল ; ক্রমে দুপুর গড়াইয়া গেল, মুখুয্যে পাড়ার হাফ-আখড়াই-এর ঘরে গ্রামের নিষ্কর্মা ছোকরার দল একে একে আসিয়া পৌঁছিল, প্রকাণ্ড কেটলিতে চায়ের জল চড়িল, গল্পে গল্পে বেলা একেবারেই গেল পড়িয়া।

এতক্ষণে হঠাৎ খুকীর কথা মনে পড়িয়া গেল তাহার মামার। সে বলিল—ওই যাঃ, তোমরা বোসো ভাই, খুকীটার অসুখ হয়েছে ব'লে ভোম্বলদের ঘরে শুইয়ে রেখে এসেছি অনেকক্ষণ, দেখে আসি দাঁড়াও…

ভোম্বলদের বাড়ীর বাইরের উঠানে গোয়ালের কাছে আসিতে ভোম্বলের বড় ছেলে টোনা বলিল—খুকু কোথায় কাকা?

খুকীর মামা বিস্ময়ের সুরে বলিল—কেন, সে তোদের বাইরের ঘরে শুয়ে নেই?

—না কাকা, সে তো অনেকক্ষণ আপনার কাছে যাবে ব'লে বেরিয়েছে, তখন খুব রোদ্দুর, উঠে কাঁদতে লাগল, বললে, মামার কাছে যাবো—শুনলে না, তখুনি রোদ্দুরে আপনাকে খুঁজতে বেরুলো…

—সে কি রে! আমি কোথায় আছি তা সে জানবে কেমন ক'রে? আর তোরা বা ছেলেমানুষকে ছেড়ে দিলি কি ব'লে? বেশ লোক তো! আর এ মেয়ে নিয়েও হয়েছে—

মামা অত্যন্ত ব্যস্ত ও উদ্বিগ্নভাবে পুনরায় পাড়ার দিকে ফিরিল। পরিচিত স্থান-গুলিতে খোঁজা শেষ হইল, কোথাও সে নাই, কোন্ পথ দিয়া কখন চলিয়া গিয়াছিল কাহারও চোখে পড়ে নাই, কেবল মতি মুখুয্যের ছেলে বলিল, অনেকক্ষণ আগে একটি অপরিচিত ছোট খুকীকে চড়চড়ে রৌদ্রে টলিতে টলিতে ভোম্বলদের বাড়ীর উঠানের আগল পার হইয়া আসিতে দেখিয়াছিল বটে, খুকীকে সে চেনে না, ভাবিয়াছিল ভোম্বলদের বাড়ীতে কোন কুটুম্ব হয়ত আসিয়া থাকিবে, তাহাদের মেয়ে।

অবশেষে তাহাকে পাওয়া গেল গ্রামের বাহিরের পথে। মামাকে খুঁজিতে বাহির হইয়া পথ হারাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে নিরুপায় অবস্থায় পথের উপর বসিয়া কাঁদিতেছিল, বৃদ্ধ হারাণ সরকার দেখিতে পাইয়া লইয়া আসেন।

জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, সারাদিন কিছু খায় নাই—খাইবার মধ্যে দুপুরবেলা ভোম্বলদের বাড়ীর কোন্ ছেলে এক টুক্‌রা আমসত্ত্ব হাতে দিয়াছিল, জ্বরের ঘোরে সেটুকু শুধু চুষিয়াছে শুইয়া শুইয়া। তাহার মামাকে সকলে বকিতে লাগিল। সরকার মশায় বলিলেন—তোমারও বাপু আক্কেলটা কি—ছোট মেয়েটাকে নিয়ে দুপুর রোদে এক কোশ হাঁটিয়ে আনলে, পথে এল তার জ্বর, দেখলেও না, শুনলেও না, ওদের চণ্ডী-মণ্ডপে কাৎ ক'রে ফেলে রেখে তুমি বেরুলে আড্ডা দিতে—না একটু দুধ, না কিছু—ছিঃ…

তাহার মামা অপ্রতিভ হইয়া বলিল—তা আমি কি আনতে গেছলাম, আমি বেরুবার সময় ছাড়ে না কোন রকমেই—তোমার সঙ্গে যাব মামা, তোমার সঙ্গে যাব মামা— আমি কি করব?

—বেশ, খুব আদর করেছ ভাগ্নীকে—এখন চল আমার বাড়ী, ওকে একটু দুধ খাইয়ে দি, কচি মেয়েটাকে সারাদিন—ছিঃ—

খুকীর মামা একটু দমিয়া গিয়াছিল, বাড়ী ফিরিবার সময় খুকীকে বলিল—কিন্তু বাড়ী গিয়ে কিছু বোল না যেন খুকু! মার কাছে যেন বোল না যে জ্বর হয়েছিল, কি হারিয়ে গিয়েছিলে, কেমন তো? লক্ষ্মী মেয়ে, বললে আমি কলকাতা যাবো পরশু, সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব না···

—আমি কলকাতা যাব মামা···

—যদি আজ কিছু না বলো, পরশু ঠিক নিয়ে যাব···বলবি নে তো?

কিন্তু বাড়ী পৌঁছিয়া খুকী বুদ্ধির দোষে সব গোলমাল করিয়া ফেলিল। তাহার শুষ্ক মুখ ও চেহারায় তাহার মা ঠাওরাইয়া লইল একটা কিছু যেন ঘটিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল—কি খেলি রে খুকী সেখানে?

খাওয়ার কথা মামা কিছু শিখাইয়া দেয় নাই, সুতরাং খুকী বলিল—আমসত্ত্ব খুব ভাল—এত বড় আমসত্ত্ব···

—আমসত্ত্ব? আর কিছু খাসনি সেখানে সারাদিনে? হ্যাঁ রে ও যতীশ, খুকী সেখানে কিছু খায়নি?

—খেয়েছে বৈকি, খেয়েছে বৈকি—তা, হ্যাঁ—জানোই তো ওকে, কিছু খাওয়ানোই দায়···

মা একটু আড়ালে গেলে খুকী মুখ নীচু করিয়া হাসিমুখে মামার দিকে চাহিয়া হাত নাড়িয়া বলিল—মাকে কিছু বলিনি মামা—কাল আমায় কলকাতায় নিয়ে যাবে তো?

—ছাই যাবো, না-খাওয়ার কথা বললি কেন?—বাঁদর মেয়ে কোথাকার···

—মামার রাগের কারণ খুকী কিছু বুঝিতে পারিল না।

খাওয়ার কথা সম্বন্ধে মামা তো কিছু বলিয়া দেয় নাই, তবে সে কথা যদি বলিয়া থাকে তাহার দোষ কি?

তাহার মামা একথা বুঝিল না। রাগিয়া বলিল—তোমার জন্যে যদি আর কখনো কিছু কিনে আনি খুকী, তবে দেখো ব'লে দিলাম—কখনো আনব না, কলকাতাতেও নিয়ে যাব না।

তাহার প্রতি এই অবিচারে খুকীর কান্না আসিল। বা রে, তাহাকে যে কথা বলিয়া দেয় নাই, তাহা বলাতেও দোষ? সে কি করিয়া অতশত বুঝিবে?

খুকী খুব অভিমানী, সে চীৎকার করিয়া হাত-পা ছুঁড়িয়া কাঁদিতে বসিল না, এক কোণে দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া নিঃশব্দে ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

পরদিন সকালে তাহার মামা কলিকাতায় রওনা হইল—যাইবার সময় তাহার সহিত কথাটিও কহিল না।

আবার দিন কাটিতে লাগিল। বর্ষা শেষ হইয়া গেল, শরৎ পড়িল—ক্রমে শরৎও শেষ হয়। পূজা এবার দেরিতে, কার্তিক মাসের প্রথমে, কিন্তু বাড়ী-বাড়ী সবাই জ্বরে পড়িয়া, পূজায় এবার আনন্দ নাই। প্রবীণ লোকেও বলিতে লাগিলেন, এরকম দুর্বৎসর তাঁহারা অনেক্দিন দেখেন নাই।

উমা সারা আশ্বিন ধরিয়া ভুগিয়া সারা হইয়াছে। একে কিছু না খাওয়ার দরুণ

রোগা, তাহার উপর জ্বরে ভুগিয়া রোগা—তাহার শরীরে বিশেষ কিছু নাই। তবুও জ্বরটা একটু ছাড়িলেই কাঁথা ফেলিয়া উঠিয়া পড়ে,...কারুর কথা শোনে না—তারপর গয়লা-পাড়া, সদ্‌গোপ-পাড়া, কোথায় নবীন ধোপার তে'তুলতলা—এই করিয়া বেড়ায়। বাড়ী ফিরিলেই দুম্‌ দুম্‌ কিল পড়ে পিঠে। মা বলে—দস্যি মেয়ে, মরেও না যে আপদ চুকে যায়, কবে যাবে ষষ্ঠীর মাঠে। কবে তোমায় রেখে খুকী-খুকী ব'লে কাঁদতে কাঁদতে আসব...

ওঘর হইতে বড়-জা বলিয়া ওঠে—আচ্ছা, ওসব কি কথা সকালবেলা ছোট বৌ... বলি মেয়েটার ষষ্ঠীর মাঠে যাবার আর তো দেরী নেই, ওর শরীর আর আছে কি...তার ওপর রোগা মেয়েটাকে ওইরকম ক'রে মার?...ছি ছি, একটা পেটে ধ'রেই এত ব্যাজার, তবুও যদি আর দু'একটা হ'ত। এস উমা, আমার দাওয়ায় এসো তো মাণিক! এসো এদিকে।

তাহার মা পাল্টা জবাব দিয়া বলে—বেশ করেছি, আমি আমার মেয়েকে বলব তাতে পরের গা জ্বলে কেন? যাসনে ওখানে, যেতে হবে না। শৌখীন কথা সকলে বলতে পারে—যখন জ্বর হ'য়ে প'ড়ে থাকে, তখন যত্ন করতে তো কাউকে এগুতে দেখিনে—তখন তো রাত জাগতেও আমি, ডাক্তার ডাকতেও আমি, ওষুধ খাওয়াতেও আমি—মুখের ভালোবাসা অমন সবাই বাসে...

দুই জায়ে তুমুল ঝগড়া বাধিবার কথা বটে এ অবস্থায়, কিন্তু বড়-জা হরমোহিনী বড় ভাল মনুষ। সাতেপাঁচে থাকিতে ভালবাসে না, খুকীর ওপর একটা স্নেহও আছে, সে কিছু না বলিয়া নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া যায়।

পূজার সময় খুকীর মামা আবার আসিল। তাহারও বয়স এই কুড়ি-একুশের বেশী নয়, এই দিদিটি ছাড়া সংসারে তাহার আর কেহ নাই। এতদিন কলিকাতায় চাকুরীর চেষ্টায় ছিল, পূজার কিছুদিন মাত্র পূর্বে কোন্‌ ছাপাখানায় মাসিক আঠারো টাকা বেতনে লিনোটাইপের শিক্ষানবিশী করিতে ঢুকিয়াছে।

অনেক খাবারদাবার, খুকীর জন্যে ভাল ভাল দু'তিনটা রঙিন জামা, ছোট ডুরে শাড়ী ও জাপানী রবারের জুতা আনিয়াছে। তাহার দিদি বকে—এসব বাপু কেন আনতে যাওয়া, সবে তো চাকরি হয়েছে, নিজের এখন কত খরচ রয়েছে, দু' পয়সা হাতে জমাও. ভাল খাও-দাও—শরীর তো এবার দেখছি বড্ডই খারাপ—অসুখ-বিসুখ হয় নাকি?

ছেলেটি হাসিয়া বলে—না দিদি, অসুখ-বিসুখ তো নয়, বড্ড খাটুনি, সকাল নটা থেকে সারাদিন, বিকেল ছটা অবধি—এক-একদিন আবার রাত আটটাও বাজে—এক-একদিন আবার রবিবারেও বেরুতে হয়, তবে তাতে ওভার-টাইম পাওয়া যায় বারো আনা ক'রে—এবার গুড় উঠলে এক কলসী গুড় নিয়ে যাবই এখান থেকে, ভিজে ছোলা আর গুড় সকালে উঠে বেশ জলখাবার হবে।

তারপর সে চীনামাটির খেলনা বাহির করিয়া খুকীকে ডাকে—ও উমা. দেখে যা কেমন কাঁচের ঘোড়-সেপাই, এদিকে আয়...

খুকী নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া আসিল, মামা আসাতে খুকীর খুব আহ্লাদ হইয়াছে, এসব ধরনের খাবার মামা না আসিলে তো পাওয়া যায় না!...পূজার কয়দিন খুকী মামার কাছেই সর্বদা থাকিল। সকাল হইতে না হইতে খুকী চোখ মুছিয়া আসিয়া মামার কাছে বসে, মাঝে মাঝে বলে, এবার কলকাতায় নিয়ে যাবে না মামা?

পূজা ফুরাইয়া গেলে খুকীর মামা দিদির কাছে প্রস্তাবটা উঠায়. দিদি সহোদর বোন নয়, বৈমাত্রেয়, তবুও তাহাকে বেশ ভালবাসে, যত্ন করে। সেও ছুটি-ছাটা পাইলে এখানে আসে। স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া দিন-দশেকের জন্য আপাততঃ খুকীকে

কলিকাতা ঘুরাইয়া আনিবার সম্মতি দিল।

খুকীর মামা খুশী হইয়া বলে—আমি ওকে লেখাপড়া শেখাব, সেখানে গিয়ে মহাকালী পাঠশালায় ভর্তি ক'রে দেব—দেখতে পাই কেমন গাড়ী আসে, বাড়ী থেকে ছেলেমেয়েদের তুলে নিয়ে যায়—গাড়ীর গয়ে নাম লেখা আছে 'মহাকালী পাঠশালা'।

ভগ্নীপতি হরি মুখুয্যে বলেন—পাগল আর কি! অতটুকু মেয়ে স্কুলে ভর্তি আবার কি হবে?...হুজুগে পড়ে যেতে চাচ্ছে—ছেলেমানুষ, ও কি আর গিয়ে টিকতে পারে? যাও নিয়ে দু'দিন—এখানে তো ম্যালেরিয়ায় ম্যালেরিয়ায় হাড় সার ক'রে তুলেছে—যদি দু'দিন হাওয়া বদলাতে পারলে সেরে যায়...

ট্রেনে কলিকাতা আসিবার পথে উমা খুব খুশি। প্রথমটা তার ভয় হইয়াছিল, রেল-গাড়ীর জানালার ধারে মামা বসাইয়া দিয়াছে, গাড়ীটা চলিতেই খুকীর মনে হইল তাহার পায়ের তলা হইতে মাটিটা সরিয়া যাইতেছে, ভয়ে তাহার চোখ বড় বড় হইল—আতঙ্কে মামাকে জড়াইয়া ধরিতে যাইতেই তাহার মামা হাসিয়া বলিল—ভয় কি, ভয় কি খুকু? এ যে রেলের গাড়ী—দেখ আরও কত জোরে যাবে এখন...

রেলগাড়ী চড়িবার আনন্দকে যে বয়সে বুদ্ধি দিয়া উপভোগ করা যায়, উমার সে বয়স হয় নাই। সে শুধু চুপ করিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া বসিয়া থাকে। মাঝে মাঝে তাহার মামা উৎসাহের সুরে বলে—কেমন রে খুকী, সব কেমন বল্ তো? কেমন লাগছে রেলগাড়ী?

খুকী বলে—খুব ভাল...

কিন্তু খানিকক্ষণ পরে তাহার মামা দুঃখের সহিত লক্ষ্য করে যে খুকী বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে, দেখিতে দেখিতে সে ঘুমাইয়া পড়ে।

গাড়ী কলিকাতায় পৌঁছিলে একখানা রিক্সা ভাড়া করিয়া তাহার মামা তাহাকে বাসায় আনিল। অখিল মিস্ত্রীর লেনে একটা ছোট মেসে বাসা, অফিসের বাবুদের মেস. সকলেই বয়সে প্রবীণ, সে-ই কেবল অল্পবয়স্ক। খুকীর আকস্মিক আবির্ভাবে সকলেরই আনন্দ হইল। বাড়ীতে ছেলেমেয়ে সকলেরই আছে, কিন্তু চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা মাস-মাহিনার বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া পড়িবার দরুণ মাসে একবার কি দুইবার ভিন্ন বাড়ী যাওয়া ঘটে না, ছেলেমেয়ের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। খুকীকে পাইয়া একটা অভাব দূর হইল। চার-পাঁচ বছরের ছোট ফুটফুটে মেয়ে, চাঁদের মত মুখখানি, কোঁকড়া কালো চুল, কালো চোখের তারা,—আপিসের ছুটির পর তাহাকে লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। এ ডাকে উহার ঘরে, ও ডাকে তাহার ঘরে।

কিন্তু তাহার মামার বড় দুঃখ, খুকীর বেশভূষা একেবারে খাঁটি পাড়াগেঁয়ে। মাথায় বিনুনী, কপালে কাঁচপোকার টিপ, অতটুকু মেয়ের পায়ে আবার আল্তা. ছোট চুনুরী শাড়ী পরনে, ওসব সেকেলে কান্ড আজকাল শহর-বাজারে কি চলে? দিদি পাড়াগাঁয়ে পড়িয়া থাকে, শহরের রীতিনীতি বেশভূষার কি ধার ধারিবে? এখানকার ভদ্রঘরের ছেলে-মেয়েদের কেমন সুন্দর চুলের বিন্যাস, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন. ফিটফাট সাজানো. দেখিতে যেন কাঁচের পুতুল। খুকীকে ঐ রকম সাজানো যায় না?

ভাবিয়া ভাবিয়া সে খুকীকে সঙ্গে করিয়া ট্রামে ধর্মতলার এক চুল ছাঁটাই দোকানে লইয়া গেল। নাপিতকে বলিল—ঠিক সাহেবদের ছেলে-মেয়েদের মত যদি চুল কাটতে পার তবে কাঁচি ধরো, নইলে অমন ঘন কালো চুল নষ্ট কোর না যেন।

মেস হইতে সে খুকীর মাথার বিনুনী খুলিয়া আনিয়াছিল।

চুল ছাঁটিতে উমার বেশ ভাল লাগিতেছিল। সামনে একখানা প্রকান্ড আয়না, চার-

পাঁচটা বড় বড় আলো জ্বলিতেছে, নাপিত মাঝে মাঝে আবার ময়দার মত কি একটা গুঁড়া তাহার ঘাড়ের চুলে মাখাইতেছিল···এমন সুড়সুড়ি লাগে।···

তাহাকে সাজাইতে খুকীর মামা পাঁচ-ছয় টাকা খরচ করিয়া ফেলিল। মেসের নিয়োগী মশায় একে একে কয়েকটি পুত্র-কন্যাকে উপরি উপরি চার-পাঁচ বৎসরের মধ্যে হারাইয়াছেন, উমাকে পাইয়া আর ছাড়িতে চাহিলেন না। সন্ধ্যার পর রঙিন ফ্রক পরা, বব্ড চুল, মুখে পাউডার, পায়ে জরির জুতা, আর এক উমা যখন তাহার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাকে দেখিয়া তো নিয়োগী মশায় বিষম খাইবার উপক্রম করিলেন।

তাহার মামা হাসিয়া বলে—গেলই না হয় কিছু খরচ হয়ে, এমন সুন্দর মেয়ে কি ক'রে ভূত সাজিয়ে রেখেছিল বলুন দিকি?···ও কুণ্ডুমশায়, চেয়ে দেখুন পছন্দ হয়?

কি করিয়া খুকীর শীর্ণতা দূর করা যাইতে পারে, এ সম্বন্ধে নানা পরামর্শ চলিল। গলির মোড়ের একজন ডাক্তার কড্‌লিভার অয়েল ও কেপ্‌লারের মল্ট এক্সট্রাক্টের ব্যবস্থা দিলেন, তাহা ছাড়া বলিলেন—খাওয়া চাই, না খেয়ে খেয়ে এমন হয়েছে—পুষ্টির অভাব. এ বয়সে এদের খুব পুষ্টিকর জিনিস খাওয়ানো চাই কিনা। সকালে কোয়েকার ওট্‌স্ খাওয়াবেন দিন পনেরো, দেখুন কেমন থাকে।

কিন্তু চতুর্থ দিনে খুকীর কম্প দিয়া জ্বর আসিল। খুকীর মামার লিনোটাইপের কাজে যাওয়া হইল না, সারাদিন খুকীর কাছে বসিয়া রহিল। অন্য দিন বৃদ্ধ নিয়োগী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া ছাপাখানায় যাওয়া চলিত, আজ আর তাহা হইল না।··· সন্ধ্যার পূর্বে জ্বর ছাড়িয়া গেল, খুকী উঠিয়া এক টুকরা মিছরি চুষিতে লাগিল। আপিসফেরতা ফণীবাবু একটা বেদানা ও গোটাকতক কমলালেবু খুকীর জন্য আনিয়াছেন, সতীশবাবু পোয়াটাক ছোট আঙুর ও পুনরায় গোটাতিনেক কমলালেবু, আরও দু'তিন জনের প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু কিনিয়া আনিয়াছেন।···সকলে চলিয়া গেলে খুকী মামার দিকে একবার চাহিল, পরে ঠোঁট ফুলাইয়া মাথা নীচু করিল। মামা বিস্মিত হইয়া বলিল —কি রে খুকী? কি হয়েছে?

খুকী দুঃখের চাপা কান্নার মধ্যে বলিল—বাড়ী যাব মামা···মার কাছে যাব···

—আচ্ছা কেঁদো না খুকু—জ্বর সারুক, নিয়ে যাব এখন।

দু'তিন দিন কেটে গেল। জ্বর সারিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু রাত্রে মাঝে মাঝে সে ঘুমের ঘোরে মায়ের জন্য কাঁদিয়া ওঠে।···ভুলাইবার জন্য তাহাকে একদিন হগ সাহেবের বাজারে খেলনার দোকানে লইয়া যাওয়া হইল, সেখানে একটা খুব বড় মোমের খোকা-পুতুল তাহার খুব পছন্দ হইল, কিন্তু দামটা বড় বেশী, সাড়ে চার টাকা—খুকীর মামার এক-মাসের মাহিনার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। মামা বলিল—অন্য একটা পতুল পছন্দ করো খুকু. ওটা ভাল না। কেমন ছোট ছোট এইসব কুকুর, হাতী কেমন না?

খুকী দ্বিরুক্তি না করিয়া ঘাড় নাড়িল বটে, কিন্তু পুতুলটা ফিরাইয়া দিবার সময় (সে পূর্বে হইতেই পুতুলটাকে দখল করিয়া বসিয়াছিল) তাহার ডাগর চোখ দুটি ছল্ ছল্ করিয়া আসিল।

দোকানদার বলিল—বাবু. খুকীর মনে কষ্ট হয়েছে. আপনি বড় পুতুলটাই নিন্, কিছু কমিশন বাদ দিয়ে দিচ্ছি···

তাহার মামা বলিল—আচ্ছা, আচ্ছা খুকু তুমি বড়ো খোকা-পুতুলটাই নাও—কুকুরের দরকার নেই—ধরো বেশ ক'রে, যেন ভাঙে না দেখো···

প্রায় এক সপ্তাহ কাটিয়াছে। সেদিন রবিবার, খুকীর মামা বিশেষ কারণে চেতলার হাটে এক বন্ধুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছে। এখনি আসিবার কথা, কিছু টাকা পাওনা আছে, তাহারই আদায়ের চেষ্টায় যাওয়া. ততক্ষণ অন্যান্য দিনের মত নিয়োগী মহাশয়ের

তত্ত্বাবধানেই খুকীর থাকিবার কথা।...খানিকক্ষণ খুকীর সহিত গল্পগুজব করিবার পরে বৃদ্ধ নিয়োগী মহাশয়ের মাধ্যাহ্নিক নিদ্রাকর্ষণ হইল। কথা বলিতে বলিতে খুকী দেখিল তিনি আর কথা বলিতেছেন না, অল্প পরেই তাঁহার নাসিকা গর্জন শুরু হইল। মেসে কোন ঘরে কেহ নাই, উমার ভয় ভয় করিতে লাগিল। একবার সে জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া চাহিয়া দেখিল, গলির মোড়ে দুইজন কাবুলীওয়ালা দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছে, তাহাদের ঝোলাঝুলি, লম্বা চেহারায় ভয় পাইয়া সে জানালা হইতে মুখ সরাইয়া লইল।

মমা কোথায় গেল? মামা আসে না কেন?

সে ভয় পাইয়া ডাকিল—ও জ্যাতাবাবু, জ্যাতাবাবু?

তাহার মামা তাহাকে শিখাইয়া দিয়াছে—নিয়োগী মহাশয়কে জ্যাঠাবাবু বলিয়া ডাকিতে।

সাড়া না পাইয়া সে আর একবার ডাকিল—আমার মামা কোথায় জ্যাতাবাবু?

নিয়োগী মহাশয় জড়িতস্বরে ঘুমের ঘোরে বলিলেন—হুঁ আচ্ছা আচ্ছা।...

তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন দেশের বাটিতে রাত্রিতে শুইয়া আছেন, মালপাড়ার কেতু মাল চৌকিদার লাঠি ঘাড়ে রোঁদে বাহির হইয়া তাঁহার নাম ধরিয়া হাঁক দিতেছে।

খুকী এদিক-ওদিক চাহিয়া উঠিয়া পড়িল—সিঁড়ির দরজা খোলা ছিল সে নামিয়া নীচে আসিল। ঝি-চাকর রান্নাঘরে তালা বন্ধ করিয়া অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, একটা কালো বিড়াল চৌবাচ্চার উপর বসিয়া মাছের কাঁটা চিবাইতেছে।

বাহির হইয়াই রাস্তা। খুকীর একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে যে, এই রাস্তাটা পার হইলেই তাহার মামার কাছে পোঁছানো যাইবে, এই পথের যেখানটাতে শেষ, সেখান হইতেই পরিচিত গণ্ডীর আরম্ভ।

ঘুরিতে ঘুরিতে সে পথ হারাইয়া ফেলিল, গলি পার হইয়া আর একটা বড় গলি, তাহার পর একটা লোহার বেড়া-ঘেরা মাঠ মত, সেটার পাশ কাটাইয়া আর একটা গলি। ক্রমে খুকীর সব গোলমাল হইয়া গেল, এ পর্যন্ত সে একবারও পিছনের দিকে চাহে নাই, একবার পিছনের দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল সে দিকটাও সে চেনে না।... সামনের পিছনের দুই জগৎই তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত, কোথাও একটা এমন জিনিস নাই যাহা সে পূর্বে কখনো দেখিয়াছে।...

সে ভয় পাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ঠিক দুপুর বেলা, পথে লোকজনও কম, বিশেষতঃ এই সব গলির মধ্যে। আরও খানিকদূর গিয়া একটা লাল রঙের বাড়ীর সামনে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে, তাহাদের বাড়ীর মতি-ঝিয়ের মত দেখিতে একজন স্ত্রীলোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েছে খুকী, কাঁদছ কেন?...তোমাদের কোন্ বাড়ীটা, এইটে?

খুকী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—আমি মামার কাছে যাব...

—তোমাদের ঘর কোথা গো?

খুকী আঙুল তুলিয়া একটা দিক দেখাইয়া বলিল—ওই দিকে।

—তোমার বাপের নাম কি?

বাপের নাম...কই তাহা তো সে জানে না! বাপের নাম 'বাবা'—তা ছাড়া আবার কি? সে চোখ তুলিয়া ঝিয়ের মুখের দিকে চাহিল।

স্ত্রীলোকটি একবার গলির দুই দিকে চাহিয়া দেখিল, পরে বলিল—আচ্ছা এস, এস খুকী আমার সঙ্গে এস, আমি তোমার মামার কাছে নিয়ে যাচ্ছি, এস...

এ-গলি, ও-গলি ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে একটা ছোট্ট খোলার বাড়ী। ঝি কাহাকে ডাকিয়া কি একটা কথা নীচুসুরে বলিল, তারপর দুইজনেই খানিকক্ষণ কি বলাবলি করিল, নবাগতা স্ত্রীলোকটি হাত দিয়া কি একটা দেখাইল, খুকী সে সব বুঝিতে

পারিল না। পরে তাহারা খুকীকে একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। ছোট ঘুলঘুলির কাছে একটা প্রকাণ্ড মাটির জালা ও তাহার চারিপাশে একরাশ অন্ধকার। খুকীর কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল—যক্ষিবুড়ী যে জালাতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লুকাইয়া পুরিয়া রাখিবার গল্প শুনিয়াছে, যেন সেই ধরণের জালা। সে কাঁদো কাঁদো সুরে বলিল—আমার মামা কোথায় ?

নবাগত স্ত্রীলোকটি বলিল—কেউ দেখেনি তো আনবার সময়ে? আমার বাপু ভয় করে। এই সেদিন সৈরভীর বাড়ীতে পুলিশ এসে কি তম্বি, আমি থালা ফেরৎ দিতে গেনু তাই...

খুকীদের বাড়ীর মতি-ঝিয়ের মত দেখিতে যে স্ত্রীলোকটি সে বিদ্রূপ করিয়া বলিল—নেকু। যাও, সামনের দরজাটা খুলে ঢাক করে রেখে এলে কেন?...নেকু, জানে না যেন কিছু!

সে খুকীকে চৌকির উপর বসাইয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া অনেক আদরের কথা বলিল, তাহাকে একটা রসগোল্লা খাইতে দিল। পরে খুকীর হাতের সোনার বালা দু'গাছা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বলিল—এখন তুলে রেখে দি খুকী?...বেশ লক্ষ্মী মেয়ে—দেখি...

খুকী ভয়ে ভয়ে বলিল—বালা খুলো না...আমার মামাকে ডেকে দাও...

কিন্তু ততক্ষণে ঝি তাহার হাত হইতে বালা দু'গাছা অনেকটা খুলিয়াছে, দেখিয়া খুকী কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—আমার বালা নিও না, মামাকে বলে দেব—আমার বালা খুলো না...

মতি-ঝিয়ের ইঙ্গিতে নবাগতা স্ত্রীলোকটি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। কিন্তু একটা বিষয়ে দুজনেই বড় ভুল করিয়াছিল, উমার কাটি কাটি হাত-পা দেখিয়া তাহার লড়াই করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে সাধারণের হয়তো সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু এ ধারণা যে কতদূর অসত্য তাহা গত মাসে দুগ্ধপানের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের সময় উমার মা ভালরূপেই জানিত। ইহারা সেসব খবর জানিবে কোথা হইতে? বেচারীদের ভুল ভাঙিতে কিন্তু বেশী বিলম্ব হইল না, ধস্তাধস্তিতে বিছানা ওলটপালট হইয়া গেল, উমার আঁচড়-কামড়ে মতি-ঝি তো বিব্রত হইয়া উঠিল। গোলমালে একগাছা বালা হাত হইতে খুলিয়া কোথায় চৌকির নীচের দিকে গড়াইয়া গেল। পিছন হইতে তাহার হাত-মুখ চাপিয়া ধরিয়া অন্যগাছা নবাগতা স্ত্রীলোকটি ছিনাইয়া খুলিয়া লইল।

মতি-ঝি বলিল—ছেড়ে দে, ছেড়ে দে—হাঁপিয়ে মরে যাবে—দেখি ও আপদ রাস্তার ওপরে রেখে আসি—বাপ্‌রে, কি দস্যি!...

—এখন কোথায় রাখতে যাবি লো? খ্যান্তমণিকে একটা খবর দিবি নে?

—না বাপু, তাতে আর দরকার নেই, ওকে রেখে আসি—কেউ টের পাবে না, দেখ্ না ব'সে ব'সে...

তুমুল গোলমাল, খোঁজাখুঁজি, হৈচৈ-এর পরে সন্ধ্যার সময় উমাকে পাওয়া গেল নেবুতলার সেণ্টজেমস্ পার্কের কোণে। কেবিন-ছাঁটাই ববড চুল ছেঁড়াখোঁড়া, কপালে ও গালে আঁচড়ের দাগ; হাত শুধু, ফ্রকের কোমর-বন্ধ ছিঁড়িয়া ঝুলিতেছে...'মামা,' 'মামা' বলিয়া কাঁদিতেছিল, অনেক লোকে চারিধারে ঘিরিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে, একজন গিয়া একটা পাহারাওয়ালাও ডাকিয়া আনিয়াছে—ঠিক সেই সময়ে নিয়োগী-মশায়, কুণ্ডু-মশায়, সতীশবাবু, অখিলবাবু, খুকীর মামা সবাই গিয়া উপস্থিত হইলেন।

যথারীতি থানায় ডায়েরী ইত্যাদি হইল। কে তাহার বালা খুলিয়া লইয়াছে এ সম্বন্ধে খুকী বিশেষ কেনো খবর দিতে পারিল না। খুকীর মামাকে সকলে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিল। খবরদারী করিবার যখন সময় নাই, তখন পরের মেয়ে আনা কেন ইত্যাদি। সবাই বলিল—যাও ওকে কলই বাড়ী রেখে এস, ছিঃ, ওই রকম ক'রে কি কখনো ...মেসের সকলে চাঁদা তুলিয়া খুকীকে দু'গাছা পালিস-করা বিলিতী সোনার বালা কিনিয়া দিল।

গাড়ীতে যাইবার সময় তাহার মামা বলিল—খুকু, বাড়ীতে গিয়ে যেন এসব কথা কিছু বলো না?...কেমন তো?...কক্ষনো বলো না যেন?...হ্যাঁ, লক্ষ্মী মেয়ে—তাহলে আর কলকাতায় নিয়ে আসব না...

খুকী ঘাড় নাড়িয়া রাজি হইল। বলিল—আমায় তখন একটা পুতুল কিনে দিও মামা...আর একটা মেম পুতুল...

প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩৭

উমারাণী

বসন্ত প'ড়ে গিয়েছে না? দখিন্ হাওয়া এসে শীতকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। আকাশ এমন নীল যে, মনে হচ্ছে উড়ন্ত চিলগুলোর ডানায় নীল রং লেগে যাবে। এই সময় তার কথা আমার বড় মনে পড়ে। তার কথাই বলব।

মেডিকেল কলেজ থেকে বার হয়ে প্রথম দিনকতক গবর্ণমেণ্টের চাকরি নেবার বৃথা চেষ্টা করবার পর যে মাসে আমি একটা চা-বাগানের ডাক্তারী নিয়ে গৌহাটিতে চ'লে গেলুম, সেই মাসেই আমার ছোট বোন শৈল শ্বশুরবড়ীতে কলেরা হয়ে মারা গেল। এই শৈলকে আমি বড় ভালবাসতুম, আমার অন্যান্য বোনেদের সঙ্গে ছেলেবেলায় অনেক মারামারি করেছি, কিন্তু শৈলর গায়ে আমি কোনদিন হাত তুলিনি। শৈলর বিয়ে হয়েছিল যশোর জেলার একটা পাড়াগাঁয়ে। শৈল কখনো সে গ্রামে যায়নি, তার স্বামী তাকে নিয়ে কলকাতায় বাসা ক'রে থাকত। তার স্বামী প্রথমে পাটের দালালী করত, তারপর একটা অফিসে ইদানিং কি চাকরি করত। যেখানে শৈলর স্বামী বাসা করেছিল তার পাশেই আমার মামার বাড়ী,—একটা গলির এপার ওপার। এই বাসায় ওরা শৈলর বিয়ের অনেক আগে থেকেই ছিল এবং শৈলর বিয়েও মামার বাড়ী থেকেই হয়।

সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে বাগানের ম্যানেজারের বাংলো থেকে একটা ঘা ড্রেস ক'রে ফিরছি, পিওন খানকতক চিঠি আমার হাতে দিয়ে গেল। আমার বাসায় ফিরে এসে তারি একখানাতে শৈলর মৃত্যুসংবাদ পেলুম। বাংলোর চারি পাশের ঝাউ, কৃষ্ণচূড়া ও সরল গাছগুলো সন্ধ্যার বাতাসে সন্ সন্ করছিল। আমার চোখের সামনে সমস্ত চা-বাগানটা, দূরের ঢালু পাহাড়ের গাটা, মারঘোরিটা, ২নং বাগানের ম্যানেজারের বাংলোর সাদা রংটা, দেখতে দেখতে সবগুলো মিলে একটা জমাট অন্ধকার পাকিয়ে তুলল।

আলো জ্বালিয়ে চুপ ক'রে ঘরের মধ্যে ব'সে রইলুম। বাইরের হাওয়া খোলা দুয়ার জানলা দিয়ে ঢুকতে লাগল। অনেক দিনের শৈল যে! কলকাতা থেকে ছুটি পেয়ে যখন বাড়ী যেতুম, শৈল বেচারী আমায় তৃপ্তি দেবার পন্থা খুঁজে ব্যাকুল হয়ে পড়ত। কোথায় কুল, কোথায় কাঁচা তেঁতুল, কার গাছে কথ্‌বেল পেকেছে, আমি বাড়ী আসবার আগেই শৈল এসব ঠিক ক'রে রাখত; নানারকম মশলা তৈরী ক'রে কাগজে মুড়ে রেখে দিত. আমি বাড়ী গেলেই তার আনন্দ জড়ানো ব্যস্ততা ও ছুটোছুটির আর অন্ত থাকত না।

গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি বাড়ী গেলে আমায় বেলের শরবৎ খাওয়াবার জন্যে পরের গাছে বেল চুরি করতে গিয়ে ঘরের পরের কত অপমান সে সহ্য করেছে ; আমারই জুতো বুনে দেবে ব'লে তার উল বুনতে শেখা। সেই শৈল তো আজকের নয়, যতদূর দৃষ্টি যায় পিছনে ফিরে চেয়ে দেখলুম কত ঘটনার সঙ্গে, কত তুচ্ছ সুখ-দুঃখের স্মৃতির সঙ্গে কত খেলাধুলোয় শৈল জড়ানো রয়েছে। সে আজ ঐ আকাশের মাঝখানকার জ্বলজ্বলে সপ্তর্ষি মন্ডলের মত দূরের হয়ে গেল, ঝাউগাছের ডালপালার মধ্যেকার ঐ বাতাসের শব্দের মতই ধরাছোঁয়ার বাইরে চ'লে গেল!

তার পরদিন ছুটি নিয়ে দেশে চ'লে গেলুম। বাড়ীর সকলকে সান্ত্বনা দিলুম। আহা, দেখলুম আমার ভগ্নীপতি বেচারা বড় আঘাত পেয়েছে। শৈলর বিয়ে হয়েছিল এই মোটে তিন বৎসর, এই সময়ের মধ্যেই সে বেচারা শৈলকে বড় ভালবেসে ফেলেছিল। তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলুম। শৈল প্রথম বুন্‌তে শিখেই আমার ভগ্নীপতির জন্যে একটা গলাবন্ধ বুনছিল, সেটা আধ-তৈরী অবস্থায় প'ড়ে আছে, ভগ্নীপতি সেইটে আমার কাছে দেখাতে নিয়ে এল। সেইটে দেখে আমার মনের মধ্যে কেমন একটু হিংসে হ'ল, আমার জুতো বুনে দেবার জন্যে উল্ বুনতে শিখে শেষে কিনা নিজের স্বামীর গলাবন্ধ আগে বুনতে যাওয়া! তবু তো সে আজ নেই!

পরে আবার গৌহাটি ফিরে গিয়ে যথারীতি চাকরি করতে লাগলুম। দেশ থেকে এসে আমার ভগ্নীপতির সঙ্গে প্রথম প্রথম খুব পত্র লেখালেখি ছিল, তারপর তা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল। তার আর বিশেষ কোন সংবাদ রাখতুম না, তবে মাঝে মাঝে মামার বাড়ীর পত্রে জানতে পারতুম, সে অনেকেরে অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও পুনরায় বিবাহ করতে রাজী নয়। বিবাহ সে আর নাকি করবে না।

এই রকম ক'রে বিদেশে অনেক দিন কেটে গেল, দেশে যাবার বিশেষ কোন টান না থাকাতে দেশে বড় যেতুম না। আমার মা বাবা অনেকদিন মারা গিয়েছিলেন, বোন-গুলির সব বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, আমি নিজেও তখন অবিবাহিত, কাজেই আমার পক্ষে দেশ-বিদেশ দু-ই সমান ছিল। চা-বাগানের কাজের কোন বৈচিত্র্য ছিল না, সকালবেলা ডাক্তারখানায় ব'সে নীরস একঘেয়ে ভাবে কুলীদের হাত দেখা, কলের পুতুলের মত ঔষধ লিখে দেওয়া। রোগ তাদের যেন বড় একঘেয়ে রকমের, সাদা জ্বর, হিল্ ডায়েরিয়া, বড় জোর কালাজ্বর, কালে-ভদ্রে.এক-আধটা টাইফয়েড বা শক্ত রকমের নিউমোনিয়া। যখন হাতে কাজকর্ম বিশেষ থাকত না তখন পড়তুম, না হয় আমার একটা খেয়াল আছে—অপটিক্সের বা আলোকতত্ত্বের চর্চা করা—তাই করতুম। বাংলোর একটা ঘর এই উদ্দেশ্যে আঁধার ঘর বা ডার্করুমে পরিণত করে নিয়েছিলুম। কলকাতা থেকে প্রতি মাসে অনেক ভাল ভাল লেন্স ও অপটিক্সের বই সব আনাতুম।

বছর তিনেক এই ভাবে কেটে গেল। এই সময় মামার বাড়ির পত্রে জানলুম, আমার ভগ্নীপতি আবার বিবাহ করেছে। সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধ ও পীড়াপীড়ির হাত সে নাকি আর এড়াতে পারলে না। এতে মনে মনে আমি তাকে কোন দোষ দিতে পারলুম না, শৈলর প্রতি তার ভালবাসা অকৃত্রিমই, তারই বলে সে এতদিন যুঝলো তো?

সেবার বৈশাখ মাসের প্রথমে দেশে গিয়ে মামার বাড়ী উঠলুম। আমার এমন কতক-গুলো কথা অপটিক্স সম্বন্ধে মনে এসেছিল, যা একজন বিশেষজ্ঞের নিকট বলা নিতান্ত আবশ্যক ছিল। আমার এক বন্ধু সেবার বিলাত থেকে এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে বস্তু-বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিল, তার সঙ্গে সে সব বিষয়ের কথাবার্তা কইবার জন্যেই

আমার এক রকম কলকাতায় আসা। তার ওখানে যাতায়াত আরম্ভ করলুম, সেও খুব উৎসাহ দিল, অপটিক্স নিয়ে একেবারে মেতে উঠলুম।

এই অবস্থায় একদিন সকালবেলা বারান্দায় বসে পড়ছি, হঠাৎ আমার চোখ প'ড়ে গেল সামনের বাড়ীর জানলাটায়। সেইটেই আমার ভগ্নীপতির বাসা। দেখলুম কে একটি অপরিচিতা মেয়ে ঘরের মধ্যে কি কাজ করছে। আমার দিক থেকে শুধু তার সুপুষ্ট হাত দুটি দেখা যাচ্ছিল, আর মনে হচ্ছিল তার পিঠের দিকটা খুব চওড়া।

একটু পরেই সেই ঘরের ভিতর ঢুকল আমার ভগ্নীপতির বোন টুনি। টুনির বিয়ে হয়ে গিয়েছে, বোধ হয় সম্প্রতি শ্বশুর বাড়ী থেকে এসেছে। আমি গৌহাটি থেকে এসে পর্যন্ত ওদের বাড়ী যাইনি। টুনিকে দেখে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম—টুনি, ঐ মেয়েটি কি নতুন বৌ?

—হ্যাঁ, দাদা।

—দেখি একবার।

টুনি মেয়েটিকে ডেকে কি বললে, তাকে জানলার কাছে নিয়ে এসে তার ঘোমটা খুলে দিলে। ভাল দেখা গেল না। গলির এপারে আমাদের মামাদের বাড়ীটা উঠে গলির ওপারের বাড়ীর ঘরগুলোকে প্রায় অপটিকচর্চার ডার্করুম ক'রে তুলেছিল, দিন-মানেও তার মধ্যে আলো যায় না। ভাল দেখতে না পেয়ে বললুম—হ্যাঁ রে, কিছুই তো দেখতে পেলুম না।

টুনি হেসে উঠল, বললে—আপনি ওখান থেকে যে দেখতে পাবেন না, তা আমি জানি। তার ওপর তো আবার চশমা নিয়েছেন—তার পর কি ভেবে টুনি গম্ভীর হল, বললে—আপনি এসে পর্যন্ত তো এ বাড়ী একবারও আসেননি, দাদা। আজ দুপুরবেলা একবার আসবেন?

দুপুরবেলা ওদের বাড়ী গেলুম। বাড়ী ঢুকতেই মনে হল, চার পাঁচ বছর আগে ভাইফোঁটা নিতে শৈলর নিমন্ত্রণে এ বাড়ী এসেছিলুম, তারপর আর এ বাড়ী আসিনি। দালান পার হয়ে ঘরে যেতে বাড়ীর মেয়েরা সব আমায় ঘিরে দাঁড়ালেন। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ হয়ে গেলে টুনি বললে—দাদা, বৌ দেখবেন আসুন। ঘরের মধ্যে গেলুম। টুনি নতুন বৌয়ের ঘোমটা খুলে দিয়ে বললে—ওঁর সামনে ঘোমটা দিতে হবে না বৌদি। উনি তোমার দাদা।

মেয়েটি আধ-ঘোমটা অবস্থায় গলায় আঁচল দিয়ে আমায় পায়ের কাছে প্রণাম করছে। দিব্যি মেয়েটি তো! রং খুব গৌরবর্ণ, ভারি সুন্দর মুখখানির গড়ন। একরাশ কোঁকড়া কোঁকড়া ঠাস-বুনানি কালো চুল মাথা ভর্তি। বেশ মোটাসোটা গড়ন। বয়স বোধ হয় চৌদ্দ-পনেরো হবে। টুনির মা বললেন—মেয়েটির বাপ পশ্চিমে চাকরি করেন, সেখানেই বরাবর থাকেন। ওই এক মেয়ে, অন্য ছেলেপিলে কিছু নেই। তাঁদের সঙ্গে কি জানাশুনো ছিল, তাই এখানেই সম্বন্ধ ঠিক ক'রে বিয়ে দিয়েছেন।

মেয়েটি প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালে আমি তার হাত ধ'রে তাকে কাছে নিয়ে এলুম। বাঁ হাতে তার ঘোমটা আর একটু খুলে দিয়ে বললুম—আমার কাছে লজ্জা করো না খুকী, আমি যে তোমার দাদা। তোমার নামটি কি?

তার চোখের অসঙ্কোচ দৃষ্টি দেখে বুঝলুম, মেয়েটি সেই মুহূর্তেই আমার বোন হয়ে পড়েছে।

সে খুব মৃদুস্বরে উত্তর দিল—উমারাণী।

আমি বললুম—আচ্ছা, আমরা আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব? এসো উমারাণী এই চৌকিটায় ব'সে তোমার সঙ্গে একটু কথা কই।

আমি চৌকিতে তাকে কাছে নিয়ে বসলুম, খানিকক্ষণ তার সংগে একথা সেকথা নানা কথা কইলুম।

জিজ্ঞাসা করলুম—বাড়ী ছেড়ে এসে বড় মন কেমন করছে, না?

উমারাণী একটু হেসে চুপ করে রইল।

আমি বললুম—তোমার বাবা থাকেন কোথায়?

—মাউ।

আমি মাউয়ের নাম কখনো শুনিনি। জিজ্ঞাসা করলুম—মাউ, সে কোনখানে বলো দেখি?

—সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়ায়।

—তোমার বাবা সেখানে কি কাজ করেন?

—কমিসারিয়েটে চাকরি করেন।

—তোমার আর কোন ভাই-বোন নেই, না?

—না। আমার পর আমার আর এক বোন হয়, সে আঁতুড়েই মারা যায়। তারপর আর হয়নি।

বাড়ী ছেড়ে অনেক দূরে এসেছে, ভাবলুম হয়ত বাপ-মায়ের কথা বলতে মেয়েটির মনে কষ্ট হচ্ছে। কথার গতি ফিরিয়ে দেবার জন্যে জিজ্ঞাসা করলুম—তুমি লেখাপড়া জান, উমারাণী?

—আমি সেখানে মেয়েদের স্কুলে পড়তাম, বাংলা পড়া হ'ত না ব'লে বাবা ছাড়িয়ে নেন। তারপর বাড়িতে বাবার কাছে পড়তাম।

—বাংলা বই বেশ পড়তে পার?

—পারি।

আমি উমারাণীর কথাবার্তা কইবার ভাবে ভারি আনন্দিত হলুম। এমন সুন্দর শান্তভাবে সে কথাগুলি বলছিল মাটির দিকে চোখদুটি রেখে যে আমার বড় ভাল লাগল। আমি তার মাথায় একটা আদরের ঝাঁকুনি দিয়ে বললুম—বেশ, বেশ। ভারি লক্ষ্মী মেয়ে। আচ্ছা, অন্য আর এক সময়ে আসব, এখন আসি।

দাঁড়িয়ে উঠেছি, উমারাণী আবার সেই গলায় আঁচল দিয়ে আমার পায়ের কাছে প্রণাম করলে। আমি তাকে বললুম—খুব শান্ত হয়ে থেকো কিন্তু উমারাণী। কোনো দুষ্টুমি যেন কোরো না, তাহলে দাদার কাছে,—বুঝলে তো?

উমারাণী হেসে ঘাড় নীচু করে রইল।

এর পাঁচ ছয় মাস পরে পুজোর সময় আবার মামার বাড়ী এলুম। অষ্টমী পুজোর দিন—দিনব্যাপী পরিশ্রমের পর একটা বড় ক্লান্তি বোধ হওয়াতে সন্ধ্যার আগে একটা ঘরের খাটে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। আমার মামার বাড়ী পুজো হ'ত। সমস্ত দিন নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা করা, পরিবেশন করা প্রভৃতি নানা কাজে বড় খাটতে হয়েছিল। অনেক রাত্রে উঠে খেতে গেলুম। আমার ছোট ভাই খাবার সময় বললে—অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিলেন তো দাদা? দিদি এসেছিলেন আরতির সময়, আপনাকে দেখবার জন্যে আপনার ঘরে গেলেন। আপনি ঘুমিয়ে আছেন দেখে আপনার পায়ে হাত দিলেন আপনাকে ওঠাবার জন্যে। আপনি উঠলেন না। তারপর তাঁরা সব চ'লে গেলেন। তিনি নাকি পরশু বাপের বাড়ী চ'লে যাবেন। আপনি অবিশ্যি একবার ওবাড়ী যাবেন কাল। আপনার সংগে দেখা না হওয়ায় দিদি বড় দুঃখ করে গিয়েছেন

আমি ঘুমের ঘোরে কথাটা তলিয়ে না বুঝে বললুম—দিদি মানে?

—ও বাড়ীর।

—উমারাণী ?

—হ্যাঁ। দিদি, টুনিদি, এঁরা সব আরতির সময় এসেছিলেন কিনা।

উমারাণীর কথা আমার খুব মনে ছিল। তার সেই ভক্তিনম্র মধুরব্যবহারটুকু আমার বড় ভাল লেগেছিল। তাই তাকে ভুলিনি, এবার চা-বাগানে গিয়ে মেয়েটির কথা অনেকবার ভেবেছি। তার পরদিন সকালে উঠে কাজকর্মের পাশ কাটিয়ে এক ফাঁকে ওদের বাড়ী গেলুম। বাইরে কাউকেও না দেখতে পেয়ে একেবারে ওদের রান্নাঘরের মধ্যে চ'লে গেলুম। টুনির মা বললেন—এস বাবা। তা এতদিন এসেছ, এবাড়ী কি একবারও আসতে নেই ?

আমি সময়োচিত কি একটা কৈফিয়ৎ দিলুম। উমারাণী মাছ কুটছিল ; আমি যেতেই তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে চ'লে গেল। একটু পরেই হাত ধুয়ে এসে আমার পায়ের কাছে প্রণাম করলে। টুনির মা বললেন—বৌমা, সতীশকে দালানে নিয়ে গিয়ে বসাও গে। এখানে এই ধোঁয়ার মধ্যে···

দালানে যেতেই, টুনি কোথায় ছিল, এসে ব'লে উঠল—এ কি। দাদা যে ? কি ভাগ্যি। বৌদি দাদা দাদা ব'লে মরে—ফি-দিন আমায় জিজ্ঞেস করে—দাদা পুজোর ছুটিতে বাড়ী আসবেন তো? দাদার দায় প'ড়ে গিয়েছে খোঁজ করতে! চার-পাঁচদিন এসেছেন-এ বাড়ীর চৌকাঠ মাড়ালে চন্ডী কি অশুদ্ধ হয়ে যায় শুনি ?

আমাকে একটু অপ্রতিভই হত হ'ল। উমারাণীর কোঁকড়া চুলে ভরা মাথাটিতে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললুম—হ্যাঁ রে রাণী, দাদার কথা তা হ'লে ভুলিসনি ?

টুনির কথায় মেয়েটির খুব লজ্জা হয়েছিল, সে মুখ নীচু ক'রে আমার কাপড়ের কোণ হাতে নিয়ে চুপ ক'রে নাড়তে লাগল—আমি দালানে একটা খাটের ওপর ব'সে-ছিলুম, উমারাণী নীচে আমার পায়ের কাছটিতে ব'সে ছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—শচীশ বলছিল, দিদি চ'লে যাবে সোমবারের দিন। সে কথা কি ঠিক ?

উমারাণী নতমুখেই উত্তর দিল—বাবা চিঠি দিয়েছিলেন ; একাদশীর দিন নিয়ে যাবেন। কিন্তু আজও তো এলেন না।

ওর গলার সুরটা যেন একটু কেঁপে গেল।

ওর বিরহী বালিকা-হৃদয়টি মা-বাপের জন্যে তৃষিত হয়ে উঠেছে বুঝে সান্ত্বনার সুরে বললুম—আসবেন ; আজ তো মোটে নবমী। আচ্ছা, কলকাতা কেমন লাগল রাণী ?

উমারাণী উত্তর দিল—বেশ ভাল।

আমি তার নত মুখখানির দিকে চেয়ে বললুম—তা নয় রে রাণী! ভাল কখনই লাগেনি, দাদার খাতিরে ভাল বললে চলবে না। কোথায় পশ্চিমের অমন জলহাওয়া, আর এই ধুলো ধোঁয়া—ভাল লাগতেই পারে না।

উমারাণী একটুখানি হেসে চুপ ক'রে রইল।

জিজ্ঞাসা করলুম—পশ্চিমে পুজো হয় রে রাণী ?

সে বললে—ঠিক এদেশের মত হয় না। হিন্দুস্থানীরা কি একটা করে, সেও অনেকটা এই রকমের। আর সেখানে এ সময় রামলীলার খুব ধুম হয়।

আমি উঠে আসবার সময় উমারাণী আবার একবার আমার পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম করল। আমি বললুম—রাণী, আমি যতবার আসবো যাবো, ততবারই কি আমায় একটা ক'রে প্রণাম করতে হবে ?

উমারাণী বোধ হয় এই প্রথম বার আমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে বললে—কাল

বিকেলে আসবেন, দাদা?

এর আগে উমারাণী কখনো আমায় দাদা ব'লে ডাকেনি। আমি ওর মুখে দাদা ডাক শুনে বড় আনন্দ পেলুম। বললুম—কাল তো বিজয়া দিশমী, আসব বৈকি।

তার পরদিন বিজয়া দশমী। সন্ধ্যার পর ওদের বাড়ী গেলুম। সকলকে প্রণাম করলুম। টুনি এসে বললে—আপনি দালানের পাশের ঘরে যান। ওখানে বৌদি আছেন।

আমি সে ঘরের দোর পর্যন্ত গিয়ে ঘরের মধ্যে একটা বড় সুন্দর দৃশ্য দেখলুম। তাতে ঘরের মধ্যে যাওয়া বন্ধ ক'রে আমায় দোরের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে হল।

দেখি, ঘরের মধ্যে খাটের ওপরে বসে আমার ছোট ভাই শচীশ, তার বয়েস বার-তের। তার পাশে উমারাণী দাঁড়িয়ে খাটের পাশে একটা টেবিলের ওপরকার একখানা রেকাবি থেকে খাবার নিয়ে শচীশের মুখে তুলে দিয়ে তাকে খাওয়াচ্ছে। ওদের দু'জনকারই পেছন আমার দিকে।

এমন কোমল স্নেহের সংগে উমারাণী শচীশের কাঁধের ওপর তার বাঁ হাতটি দিয়ে স্নেহময়ী বড়দিদির মত আপন হাতে তার মুখে খাবার তুলে দিচ্ছে যে, আমার মনে হ'ল আজ শৈল বেঁচে থাকলে সে এর বেশী করতে পারত না। উমারাণীর প্রতি এতদিন অননুভূত একটা স্নেহরসে আমার মন সিক্ত হয়ে উঠল। আমি খানিকক্ষণ দোরের কাছে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে ঘরের ভিতর ঢুকে প'ড়ে উমারাণীকে বললুম—লুকিয়ে লুকিয়ে ছোট ভাইকে খাওয়ালে শুধু হবে না, দাদাকে কি খেতে দিবি রে রাণী?

বেচারী উমারাণীর মুখ লাল হ'য়ে উঠল লজ্জায়। সে এমন থতমত খেয়ে গেল হঠাৎ যে, খামকা যে এত প্রণাম করে, আজ বিজয়ার প্রণাম করতে সে ভুলে গেল। একটা কি কথা অস্পষ্টভাবে বার দুই ব'লে সে মাথা নীচু ক'রে রইল। আমি তার দিকে চেয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম, আজ যে তাকে ধ'রে ফেলেছি, তার ভাই-বোন-বিহীন নির্জন প্রাণটি কিসের জন্যে তৃষিত হয়ে আছে, তা যে আজ বার ক'রে ফেলেছি। আজ অনুভব করছিলুম, জগতের মধ্যে ভাইবোনের একটু স্নেহ পাবার জন্যে ব্যাকুল এমন অনেক হৃদয়কে আজ আমি আমার বড় ভাইয়ের উদার স্নেহ-ছায়াতলে আশ্রয় দিয়েছি। একটু বুকজুড়ানো তৃপ্তিতে আমার মন ভরে উঠল।

সেই সময় টুনি সে-ঘরে ঢুকে আমার সামনের টেবিলে থালা-ভরা মিষ্টান্ন রেখে বললে—দাদা, একটু মিষ্টিমুখ করুন।

আমি টুনিকে বললুম—আয় টুনি, সকলে মিলে···

উমারাণীকে খাটের ওপর বসালুম। খাবার সকলকেই দিলুম। উমারাণী লজ্জায় একেবারে আড়ষ্ট। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জ'মে গেল তার লজ্জার চোটে। বেচারী লজ্জায় আর ঘামে হাঁপিয়ে মারা যায় দেখে তার ঘোমটা বেশ ক'রে খুলে দিলুম। বললুম—আমি দাদা, আমার কাছে লজ্জা কি রে রাণী? আমার লক্ষ্মী ছোট বোনটি···

জলযোগ-পর্ব সমাধা ক'রে বাইরের দালানে এসে টুনির মায়ের সংগে গল্প করতে আরম্ভ করলুম। একটু পরে তিনি উঠে রান্নাঘরে চ'লে গেলেন। আরও খানিক পরে, আমি উঠতে যাচ্ছি, উমারাণী কাছে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করলুম—রাণী, আজ ঠাকুর বিসর্জন দেখলি নে?

—ওপরের ঘরের জানলা থেকে দেখছিলুম, বেশ ভাল।

—অনেক রকমের প্রতিমা, না?

—হ্যাঁ, কত সব বড় বড়।—তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে আমার দিকে চেয়ে বললে—দাদা, কাল আসবেন না?

আমি বললুম—সে কি বলতে পারি? সময় পাই তো আসব। আবার শীগ্‌গির চ'লে যাব কিনা, অনেক কাজ আছে।

—আপনি কি খুব শীগ্‌গির যাবেন দাদা?

—হ্যাঁ, বেশিদিন তো ছুটি নেই, পূর্ণিমার পরেই যেতেই হবে।

উমারাণী নতমুখে চুপ ক'রে রইল।

বললুম—তা তোকেও তো আর বেশীদিন থাকতে হবে না রে!

উমারাণী বলে—বাবা বোধ হয় কাল আসবেন।

ওকে একটু সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললুম—তবে আর কি? এই দুটো দিন কোন রকমে কাটালেই তো···

সে একটু চুপ ক'রে থেকে তারপর যেন ভয়ে ভয়ে বললে—যাবার আগে একবারটি এ বাড়ী আসতে পারবেন না, দাদা?

বললুম—খুব খুব। আসব বৈকি। নিশ্চয়।

এর ছয় সাত দিন পর গৌহাটি রওনা হলুম। এই কদিন নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে চারিদিকে ঘুরতে হয়েছিল। শচীশের মুখে শুনেছিলুম, উমারাণীর পশ্চিমে যাওয়া হয়নি। কি কারণে তার বাবা তাকে নিতে আসতে পারেননি। শচীশ মাঝে মাঝে বলত—দাদা, যাবার আগে একবার দিদির সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন। তিনি আপনার কথা প্রায়ই বলেন।

ইচ্ছা থাকলেও গৌহাটি যাবার আগে উমারাণীর সঙ্গে দেখা করা আর আমার ঘটে ওঠেনি।

গৌহাটি গিয়ে এবার অনেক দিন রইলুম। উমারাণীর কথা প্রথম প্রথম আমার খুব মনে হ'ত, তারপর দিনকতক পরে তেমন বিশেষ ক'রে আর মনে হ'ত না, ক্রমে প্রায় ভুলেই গেলুম। কিছুদিন পরে গৌহাটির চাকরি ছেড়ে দিলুম। শিলচর, দার্জিলিং নানা চা-বাগান বেড়ালুম। দু'একটা হাসপাতালেও কাজ করলুম। সব সময় নির্জনে কাটাতুম। একা বাংলোয় থেকে থেকে কেমন হয়েছিল, অনেক লোকের ভিড়, অনেক লোকের একসঙ্গে কথাবার্তা সহ্য করতে পারতুম না। এখানে সন্ধ্যায় পাহড়ের দেওয়ালের গায়ে কুঙ্কুম ছড়ানো সূর্যাস্ত, চা ঝোপের চারিপাশ ঘেরা গোধূলির অন্ধকার, গভীর রাত্রির একটা স্তব্ধ গম্ভীর ভাব, আর সরল গাছের ডালপালার মধ্যে বাতাসের বিচিত্র সুর, ওই আমার কাছে বড় প্রিয়, বড় স্বস্তিকর ব'লে মনে হ'ত।···বসবার ঘরটিতে সাজিয়ে রেখেছিলুম জগতের যুগ যুগের জ্ঞানবীরদের এই Gauss, Zollner Helmholtz, Geikie, Logan, Dawson, যাঁদের আলোক-সামান্য প্রতিভা অমাদের সুন্দরী বসুন্ধরার অতীত শৈশবের, তাঁর রহস্যময় বালিকা-জীবনের তমসাচ্ছন্ন ইতিহাসের পাতা আলোকোজ্জ্বল ক'রে তুলেছে, যাঁদের মনীষার যোগদৃষ্টি অসীম শূন্যের দুরন্ত ভেদ ক'রে নক্ষত্র জগতের তত্ত্ব অবগত হচ্ছে, তাঁদের সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত কাটাতুম। জগতের রহস্যভরা অন্ধিসন্ধি তাঁদেরই প্রতিভার তীব্র সার্চ-লাইট-পাতে উজ্জ্বল হয়ে তবে তা আমাদের মত সাধারণ মানুষের দৃষ্টির সীমার মধ্যে আসছে।

এই রকম সাত আট বছর পরে আবার কলকাতায় গেলুম। ভাবলুম কলকাতাতেই প্র্যাকটিস্ আরম্ভ করব। মামার বাড়ী গিয়ে উঠলুম। শুনলুম সামনের বাড়ীটায় আমার ভগ্নীপতিরা আর থাকে না, তারা বছর পাঁচ ছয় হ'ল দেশে গিয়েছে। কয়েক মাস কলকাতায় কাটল। প্র্যাকটিস্ যে খুব জ'মে উঠেছিল, এমন নয়, বা অদূর ভবিষ্যতেও যে খুব জ'মে উঠবে, এরকম মনে করবার কোন কারণও দেখতে পাচ্ছিলুম না। এমন

অবস্থায় একদিন সকালে মামার বাড়ীর ওপরের ঘরে ব'সে পড়ছি, এমন সময় কে ঘরে ঢুকল। চেয়ে দেখে প্রথমটা যেন চিনতে পারলুম না। তারপর চিনলুম—টুনি। অনেকদিন তাকে দেখিনি, তার চেহারা খুব বদলে গিয়েছে। আমি তাকে হঠাৎ দেখে যেমন আশ্চর্যও হলুম, তেমনি খুব আনন্দিতও হলুম।

টুনি বললে, সে তার স্বামীর সঙ্গে আজ পাঁচ ছ'দিন হ'ল কলকাতায় এসেছে, সিমুলেতে তাদের কোন্ আত্মীয়ের বাড়ীতে এসে আছে, আজ বাড়ীর সকলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। অন্যান্য কথাবার্তার পর তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—সুরেন এখন কোথায় ?

টুনি বললে—ছোড়দা এখন আবাদে কোথায় চাকরি করেন, সেখানেই থাকেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—উমারাণী কেমন আছে ?

টুনি একটু চুপ করে রইল। তারপর বললে, দাদা সে অনেক কথা, আপনি এখানে আছেন, তা আমি জানতুম। সে সব কথা আপনাকে বলব ব'লেই আমার একরকম এখানে আসা।

আমি বললুম—কি ব্যাপার শুনি ? সে ভাল আছে তো ?

টুনি বললে—সে ভাল আছে কি, কি আছে সে আপনিই শুনুন না। সেই যে-বছর পুজোর সময় আপনি এখানে ছিলেন, বৌদির বাপের নিতে আসবার কথা ছিল, সে তো আপনি জানেন। তখন তিনি ছুটি পাননি ব'লে আসতে পারেননি, পত্র দিয়েছিলেন পরের মাসে নিয়ে যাবেন। তার বুঝি মাসখানেক পরে খবর এল তিনি কলেরায় মারা গিয়েছেন। বৌদি সেই বিয়ের কনে বাপের বাড়ী থেকে এসেছিল, এমনি অদৃষ্ট, আর সেমুখো হতে হ'ল না। তারপর···

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—উমারাণীর মা ?

টুনি বললে—শুনুন না। মা আবার কোথায় ? তিনি তো বৌদির বিয়ে হবার আগেই মারা গিয়েছিলেন। তারপর এদিকে আবার দাদা তার সঙ্গে বিশেষ কোন সম্বন্ধ রাখেন না। তিনি সেই যেখানে চাকরি করেন, সেখানেই থাকেন, বৌদি থাকেন চাঁপাপুকুরের বাড়ীতে প'ড়ে, দাদা চিঠিপত্রও দেন না। বৌদি বড় শান্ত, বড় চাপা মেয়ে, সে মুখ ফুটে কখনো কিছু বলে না, কিন্তু তার মুখের দিকে চাইলে বুক ফেটে যায়। মেয়েমানুষের ও কষ্ট যে কি, সে আপনি বুঝবেন না দাদা। যতদিন মা ছিলেন, বৌদিকে কষ্ট জানতে দেননি, তা তিনিও আজ দু'বছর মারা গিয়েছেন। বাড়ীতে আছেন শুধু পিসীমা।

সেই শান্ত ছোট মেয়েটির উপর দিয়ে এত ঝড় বয়ে গিয়েছে শুনে আমার মনে বড় কষ্ট হল। জিজ্ঞাসা করলুম—সুরেনের এমন ব্যবহারের মানে কি ?

টুনি বললে—তা তিনিই জানেন। তবে তিনি নাকি বলেন, জোর ক'রে তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিয়ে করার তাঁর কোন ইচ্ছা ছিল না, এই সব। বড়দাও দেশের বাড়ীতে থাকেন। বাড়ীতে থাকেন শুধু পিসীমা। কাজেই বৌদির মুখের দিকে চেয়ে তাকে একটু যত্ন ক'রে দুটো কথা বলে, এমন একটা লোক পর্যন্ত নেই। পিসীমা আছেন, কিন্তু সে না থাকার মধ্যে।

সে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইল, তারপর বললে—আপনাকে একটা কথা বলি দাদা। আপনি একবার তার সঙ্গে দেখা ক'রে আসুন। আপনাকে সে যে কি চোখে দেখে তা বলতে পারিনে দাদা। সেবার চাঁপাপুকুরে গিয়েছিলুম, বৌদি বললে, আমার দাদার কথা কিছু জান ঠাকুরঝি ? আপনি এদেশ ওদেশ ক'রে বেড়াচ্ছেন শুনে সে কেঁদে বাঁচে না। মাঝে মাঝে যখনই তার কাছে গিয়েছি, আপনার কথা এমন দিন নেই যে সে

বলোনি। বলে, ভগবান আমার ভায়ের অভাব পূর্ণ করেছেন, দাদা আর শচীশকে দিয়ে। এখনও পর্যন্ত ফি চিঠিতেই আপনার খোঁজ নেয়। তা বড্ড পোড়াকপালী সে, কারুর কাছ থেকে কোন স্নেহই কোন দিন সে পেল না। আপনার পায়ে পড়ি দাদা, আপনি তাকে একবার গিয়ে দেখা দিয়ে আসুন, আপনি গেলে সে বোধ হয় অর্ধেক দুঃখ ভোলে।

ছাদের আলিসার ওপর থেকে রোদ নেমে গেল, পাশের বাড়ীর চিলছাদের ওপর ব'সে একটা কাক একঘেয়ে চীৎকার করছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—সুরেন কি মোটেই বাড়ী যায় না?

টুনি বললে—সে একরকম না যাওয়াই দাদা। বছরে হয় তো দু'বার ; তাও গিয়ে এক আধ দিন থাকেন। তাও যান সে কি জন্যে! কিস্তী না কি—সেই সময় যার কাছে যা খাজনা পাওয়া যাবে তাই আদায় করতে।

তারপর অন্যান্য এক-আধটা কথাবার্তার পর টুনি চ'লে গেল। সেদিন বিকেলে সেনেট হলে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের বক্তৃতা ছিল তিনি কেম্‌ব্রিজ থেকে এসেছিলেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে। বক্তৃতার বিষয়টি ছিল যেমনি চিত্তাকর্ষক,— বক্তৃতার অর্থাংশ ও বক্তার যুক্তিপ্রণালী ছিল তেমনই দুর্বোধ্য। আরম্ভ হবার সময় ছাত্রের দলে হল ভরা থাকলেও বেগতিক বুঝে বক্তৃতার মাঝামাঝি তারা প্রায় স'রে পড়েছিল। কেবল জনকতক নিতান্ত নাছোড়বান্দা রকমের ছাত্র তখনও হলে বিভিন্ন অংশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ব'সে ছিল। বক্তা খ্যাতনামা অধ্যাপক, রয়েল সোসাইটির ফেলো। তাঁর ব্যাখ্যার মৌলিকতার মোহে সকলেই তাঁর বক্তৃতায় অত্যন্ত আকৃষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ পোশাক পরা সৌমমূর্তি ঋজুদেহ অধ্যাপককে সত্যদ্রষ্টা ঋষির মত বোধ হচ্ছিল।...বক্তৃতা শুনতে শুনতে কিন্তু আমার মন ভেসে যাচ্ছিল বক্তৃতার বিষয় থেকে অনেক দূর, কলকাতায় ইট পাথরের রাজ্য থেকে অনেক দূর আমার অভাগিনী বোনটি যেখানে নিঃসঙ্গে জীবন যাপন করছে সেইখানে। মাঝে মাঝে হলের খোলা দুয়ার দিয়ে জ্যোৎস্না-ওঠা বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে উমারাণীর বালিকা মুখখানি বড় বেশী ক'রে মনে পড়ছিল। আর মনে পড়ছিল তার সেই মিনতিভরা দৃষ্টি, অনেক দিন পরে বাবাকে দেখতে পাবার জন্যে তার সে করুণ আগ্রহ। তার আগ্রহভরা দাদা ডাকটি অনেকদিন পরে আবার বড় মনে পড়ল। ভাবলুম সত্যিই কারুর কাছ থেকে কোন স্নেহ কখনো সে পায়নি। আজ বিজ্ঞানের গভীর তত্ত্বকথার রস আমার স্নায়ু-মণ্ডলী বেয়ে সমস্ত দেহে যখন পুলক ছড়িয়ে দিচ্ছে, তখন আমার মনের উন্নত আনন্দের অবস্থার সঙ্গে আমার অভাগিনী স্নেহবঞ্চিতা বোনটির নির্জন জীবনের অবস্থা কল্পনা ক'রে আমার মন কেঁদে উঠল। বাইরের জগতে যখন এত বিচিত্রস্রোত বয়ে যাচ্ছে, তখন সে কি ঘরের কোণে বসে দিনরাত চোখের জলে ভাসবে? জগতের আনন্দবার্তা তার কাছে বহন ক'রে নিয়ে যাবার কি কেউ নেই?

বাইরে যখন এলুম তখন গোলদীঘির জলের ওপর চাঁদ উঠেছে, কিন্তু ধোঁয়াভরা আকাশের মধ্যে দিয়ে জ্যোৎস্নার শুভ্রমহিমা আত্মপ্রকাশ করতে পারত না। আমার মস্তিষ্ক তখন বক্তৃতার নেশায় ভরপুর, পুকুরের জলের ধারে সবুজ ঘাসের মাঝে মাঝে মরশুমী ফুলের ক্ষেতগুলো আমার চোখের সামনে এক নতুন মূর্তি ধরেছে। কিন্তু ত্রয়োদশীর অমন বৃষ্টি-ধোয়া যুঁই ফুলের মত জ্যোৎস্নাও ধোঁয়ার জাল কাটিয়ে বাইরে আসতে না পেরে, ব্যর্থতার দুঃখে কেমন বিবর্ণ হয়ে গেছে লক্ষ্য ক'রে আমার একটা কথাই কেবল মনে হতে লাগল—এই জ্যোৎস্না, এই ফুলের ক্ষেত, এই ত্রয়োদশী, এবার-কার মত সব মিথ্যে, সব ব্যর্থ।...ও জ্যোৎস্না প্রতীক্ষায় থাকুক, সেই শুভ রাত্তটির, যে রাতে আকাশ-ভরা সার্থকতা ওকে বরণ ক'রে নেবে ফোটা ফুলের ঘন সুগন্ধের মধ্যে

দিয়ে, তরুণ-তরুণীদের অনুরাগ-নম্র দৃষ্টি-বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে, গভীর রাতের নীরবতার কাছে পাপিয়ার আকুল আত্মনিবেদনের মধ্যে দিয়ে।...

বাড়ী এসে ভাবতে ভাবতে, এতদিন নানা কাজের ভিড়ে আমার যে বোনটিকে আমি হারিয়ে বসেছিলুম, তারই কাছে স্নেহের বাণী বয়ে নিয়ে যেতে আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠল।

এর কয়েকদিন পরে কলকাতা ছেড়ে বার হলুম উমারাণীর কাছে যাব ব'লে। শীত সেদিন নরম প'ড়ে এসেছে, ফুটপাত বেয়ে হাঁটতে-হাঁটতে দখিন্ হাওয়া অতর্কিত ভাবে গায়ের ওপর এসে প'ড়ে উৎপাত শুরু ক'রে দিয়েছে।...

পরদিন বেলা প্রায় দুটোর সময় ওদের স্টীমার স্টেশনে নেমে শুনলুম, ওদের গাঁ সেখান থেকে প্রায় চার ক্রোশ। হেঁটে যাওয়া ছাড়া নাকি কোন উপায় নেই, কোন রকম যান-বাহনের সম্পূর্ণই অভাব।

কখনো এদেশে আসিনি, জিজ্ঞাসা করতে করতে পথ চলতে লাগলুম। কাঁচা রাস্তার দুধারে মাঠ, মাঝে মাঝে লতাপাতায় তৈরি বড় বড় ঝোপ। কোন কোন ঝোপের তাজা সবুজ ঘন বুনানি মাথা আলো ক'রে ফুটে আছে সাদা সাদা মেটে আলুর ফুল। মাঠে মাঠে মাটির ঢেলার আড়ালে ঝুপসি গাছে দ্রোণ-ফুলের খই ফুটে আছে। মাঠ ছাড়ালে গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে মাটির পথের ওপর অভ্যর্থনা বিছেয়ে রেখেছে রাশি রাশি সজ্‌নে ফুল। গ্রামের হাওয়া আমের বোলের আর বাতাবী লেবু ফুলের গন্ধে মাতাল। বুনো কুলে আর বৈঁচি গাছের বনে কোন কোন মাঠ ভরা। পড়ন্ত রোদে গাছপালার তলায়, বন ঝোপের মধ্যে, ফাঁকা জায়গায় ছোট ছোট পাখীর দল কিচ্ কিচ্ করছে মাঝে মাঝে, কোন কোন জঙ্গলের কাছ দিয়ে যেতে যেতে কোন অজ্ঞাত বনফুলের এমনি সুগন্ধ বেরুচ্ছে যে, তার কাছে খুব দামী এসেন্সের গন্ধও হার মানে। পায়ের শব্দ পেয়ে শুকনো পাতার রাশির ওপর খস্ খস্ শব্দ করতে করতে দু'একটা খরগোস কান খাড়া ক'রে রাস্তার এপাশের ঝোপ থেকে ওপাশের ঝোপে দৌড়ে পালাচ্ছে। মাঠের মাঝে মাঝে দূরে দূরে শিমুল ফুলের গাছগুলো দখিন হাওয়ার প্রথম স্পর্শেই আবেশ-বিধুরা তরুণীর মত রাগ-রক্ত হয়ে উঠেছে...

অনেকগুলো গ্রাম ছাড়িয়ে যাওয়ার পর একজন দেখালে মাঠ ছাড়িয়ে এবার পড়বে চাঁপাপুকুর। গ্রামের মধ্যে যখন ঢুকলুম তখন গ্রামের পথ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, আশপাশের নানা বাড়ী থেকে পল্লী-লক্ষ্মীদের সাঁজের শাঁখের রব নিস্তব্ধ বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছিল।...

কোন্ ঘরটি আলো ক'রে আছে আমার স্নেহের বোনটি? কোন্ গৃহস্থের আঙিনার আঁধার আজ দূর হয়ে উঠল তার সেবা-চঞ্চল চরণের শান্ত মধুর ছন্দে?...

রাস্তার মধ্যে এক জায়গায় কতকগুলো ছেলেকে দেখতে পেয়ে তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে তাদের মধ্যে একজন বললে—আসুন, আমি সে বাড়ী আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি। খানিক রাস্তা এগিয়ে গিয়ে সে পাশের একটা সরু পথ বেয়ে চলল। তারপর একটা বড় পুরনো বাড়ীর সামনে গিয়ে বললে, এই তাঁদের বাড়ী। আপনি একটু দাঁড়ান, আমি বাড়ীর মধ্যে বলি। একটু পরে একজন বৃদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে সে বাড়ীর মধ্যে থেকে বার হয়ে এল। বৃদ্ধাকে বললে—ইনি কলকাতা থেকে আসছেন জেঠাইমা, আপনাদের বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করাতে আমি ওপাড়া থেকে নিয়ে আসছি।

বৃদ্ধা আমার দিকে একটু এগিয়ে এসে আমায় ভাল ক'রে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমায় ত চিনতে পারছি নে বাবা, কোন্ জায়গা থেকে তুমি আসছ?

আমি আমার নাম বললুম—পরিচয় দিতেও উদ্যত হলুম।

বৃদ্ধা ব'লে উঠলেন যে, আমায় আর পরিচয় দিতে হবে না, আমার আসা-যাওয়া নেই ব'লে তিনি কখনো আমায় দেখেননি, তাই চিনতে পারছিলেন না। আমি বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আছি এতে তিনি খুব দুঃখিত হলেন। আমি কেন একেবারে বাড়ীর মধ্যে গেলুম না, আমি তো ঘরের ছেলের বাড়া, আমার আবার বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি কি ইত্যাদি।

তাঁর সঙ্গে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলুম। কেবল মনে হ'তে লাগল, আট বছর—আজ আট বছর পরে! কি জানি উমারাণী কেমন আছে, সে কেমন দেখতে হয়েছে। আজ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে আমায় দেখে সে যে আনন্দ পাবে, সে আনন্দের পরিমাণ আমি একটু একটু বুঝছি, আমার বুকের তারে তার প্রতিধ্বনি গিয়ে বাজছে। আজ এখনি তার স্নেহমধুর ক্ষুদ্র হৃদয়টির সংস্পর্শে আসব, তার কালো চুলে ভরা মাথাটিতে হাত বুলিয়ে আদর করতে পারব, তার মিষ্টি দাদা ডাকটি শুনব, এ কথা ভেবে আনন্দে আমার মনের পাত্র ছাপিয়ে পড়ছিল।

দেখলুম এদের অবস্থা এক সময় ভাল ছিল, খুব বড় বাড়ী, এখন সব দিকেই ভাঙা ঘরদোর, দেওয়াল ফেটে বড় বড় অশ্বত্থ-চারা উঠেছে। বাইরের উঠান পার হয়ে ভেতর বাড়ীর উঠানের দরজায় পা দিয়েই বৃদ্ধা ব'লে উঠলেন—ও বৌমা, বার হয়ে দেখো কে এসেছে!

কে পিসীমা?—ব'লে প্রদীপ হাতে সে ওদিকের একটা ঘর থেকে বার হয়ে এল, অস্পষ্ট আলোয় দেখলুম, তার মুখখানি আধ-ঘোমটা দেওয়া, ঘোমটার পাশ দিয়ে চুলগুলো অসংযতভাবে কানের পাশ দিয়ে কাঁধের ওপর পড়েছে, পরনে আধ-ময়লা শাড়ী, চেহারা রোগা রোগা একহারা। এই সেই-ই উমারাণী। তাকে দেখে প্রথমেই আমার মনে হ'ল সে আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গেছে আর মাথায়ও অনেকটা বেড়ে গিয়েছে।

কয়েক সেকেন্ড উমারাণী আমায় চিনতে পারলে না, তার পরই যেন হাঁপিয়ে বলে উঠল—দাদা!

অন্য কোন কথা তার মুখ দিয়ে বেরুল না, প্রদীপটা কোনো রকমে নামিয়ে রেখে সে এসে আমার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল।

আমি তাকে ওঠালুম, তার মুখে দেখলুম এক অপূর্ব ভাব! মনে হ'ল আনন্দ, বিস্ময়, আশা, অভিমান সব ভাবের রংগুলো এক সঙ্গে গুলে তার প্রতিমার মত মুখে কে মাখিয়ে দিয়েছে। বৃদ্ধা বললেন—বাবা, তুমিই আস না, বৌমা দাদা বলতে অজ্ঞান। কত দুঃখ করে, বলে, কলকাতায় থাকলে মাঝে মাঝে দাদার দেখা পেতাম, এ তেপান্তরের পর, তিনি আসবেন কেমন ক'রে!—বৌমা সতীশকে আগে হাতমুখ ধোবার জলটল দাও, বাছা একটু ঠান্ডা হোক, যে পথ।

হাতমুখ ধোবার পর উমারাণী একটা ঘরের মধ্যে আমায় নিয়ে গেল। আমি যে এখানে এ অবস্থায় হঠাৎ আসব, তা যেন সম্ভাবনার সীমার সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস। অন্ততঃ তার কাছে। তাই বেচারীর মুখ দিয়ে কথা বার হচ্ছিল না। তার আবেগকে স্বাভাবিক গতি লাভের সুযোগ দেবার জন্যে আমিও কোন কথা বলছিলুম না।

একটুখানি দুজনে চুপ করে থাকার পর উমারাণী বললে—দাদা, এতদিন পরে বুঝি মনে পড়ল?

আমি আগেকার মত তার মাথার দু'পাশের চুলগুলোয় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললুম—রাণী, আসতে পারিনি হয়ত নানান কাজে। কিন্তু এ কথা মনে ভাবিসনি যে ভুলে গিয়েছিলুম। চেহারা যে একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে রে, বড্ড কি অসুখ-বিসুখ

হয় ?

আট বছর আগেকার সেই ছোট্ট মেয়েটির মত মুখ নীচু ক'রে একটুখানি হেসে সে চুপ ক'রে রইল।

জিজ্ঞাসা করলুম—আচ্ছা রাণী, আমি আসব একথা ভেবেছিলি ?

তার দুই চোখ জলে ভ'রে এল, বললে—কি ক'রে ভাবব দাদা! আমি আপনাদের আবার দেখতে পাব, আদর-যত্ন করতে পারব, এমন কপাল যে আমার হবে তা কি ক'রে ভাবব ?

এলোমেলো যে সব চুল তার ঘোমটার আশেপাশে পড়েছিল, সেগুলো সব ঠিকমত সাজিয়ে দিতে দিতে বললুম, সেই জন্যেই ত এলুম রে! আর তোদের দেখবার ইচ্ছে বুঝি আমার হয় না? ভাবিস বুঝি, দাদাদের মন সব শান-বাঁধানো!

সে বললে—তাই আজ দু'তিন দিন থেকে আমার বাঁ চোখের পাতা অনরবত নাচছে দাদা। আজ ওবেলা যখন ঘাটে যাই, তখন বড্ড নেচেছে। পিসীমাকে বলতে পিসীমা বললেন—মেয়েমানুষের বাঁ চোখ নাচলে ভালো হয়।

আমি বললুম—আমার কথা তোর মোটেই মনে ছিল না, না রে রাণী? সে একথার কোন উত্তর দিল না, তার দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। জিজ্ঞাসা করলুম, হ্যাঁ রে, সুরেন বাড়ী থেকে গিয়েছে কতদিন ?

সে নতমুখে উত্তর দিল—প্রায় আট মাস।

বললুম—চিঠিপত্র দেয় ?

উত্তরে সে ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ।

তার মুখের ভাবে বুঝলুম যে তার বড় ব্যথার স্থানে আমি ঘা দিয়েছি, দুঃখিনী বোনটির এলোমেলো চুলে ঘেরা মুখখানির দিকে তাকিয়ে স্নেহে আমার মন গ'লে গেল। রুমাল বের ক'রে তার চোখের জল মুছিয়ে দিলুম। কত রাত তার এই রকম চোখের জলে কেটেছে, তার খোঁজ তো কেউ রাখেনি, তার সাক্ষী আছে কেবল আকাশের ঐ গহন অন্ধকার আর চারিপাশের গাছপালার মধ্যেকার ঐ ঝিঁঝিপোকার রব।...

উমারাণী জিজ্ঞাসা করলে—দাদা, আপনি কোথায় থাকেন ?

আমি বললুম—আগে নানা জায়গায় ঘুরছিলুম, এখন ঠিক করেছি কলকাতাতেই থাকব।

সে বললে—আপনি বিয়ে করেছেন দাদা ?

বললুম—না রে। বিয়ের তাড়াতাড়ি কি? সে একদিন করলেই হবে।

ছোট মেয়েটির মতন ঠোঁট দুটি অভিমানে ফুলে উঠল,—বললে—তাই বৈকি? আপনি ভেবেছেন চিরকাল এই রকম ভেসে ভেসে বেড়াবেন? তা হবে না দাদা, এই বছরেই আপনার বিয়ে দেব।

আমার হাসি পেল, বললুম—দিবি তুই!

সে বললে—দেবই তো, এই আষাঢ় মাসের মধ্যেই দেব।

আমি বললুম—তা যেন হ'ল। কিন্তু আমার তো বাড়ী-ঘর-দোর নেই, বিয়ে ক'রে রাখব কোথায় ?

সে বললে—কেন দাদা, রাখবার জায়গার বুঝি ভাবনা? আমি বৌকে এখানে রাখব। দু'জনে মিলে বেশ ঘর-সংসার ক'রব।

আমি একটু গম্ভীর ভাবে বললুম—তা হ'লে পাঁজিখানা আবার যে ফেলে এলুম রাণী, সামনের মাসে দিনটিন যদি থাকে...

উমারাণী বললে—পাঁজি ওপরের ঘরে রয়েছে দাদা। আপনি এখন খাওয়া-দাওয়া

করুন, কাল সকালে দেখলেই হবে।

আশ্বস্ত হলুম। কি বলতে যাচ্ছিলুম, উমারাণী ব'লে উঠল—আপনাকে খাওয়ানোর বন্দোবস্ত করিগে, কাল থেকে পেটে ভাত যায়নি, আপনার মুখ একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে দাদা।

তার পরদিন ভোরে উঠে দেখি উমারাণী সেই ভোরে নাইতে যাবার উদ্যোগ করছে। শীত সেদিন সকালে একটু বেশি পড়েছে। উমারাণীর শরীরের দিকে চেয়ে দেখি, তার শরীরে আর কিছু নেই। রাত্রে ভাল টের পাইনি, আট বছর আগেকার সেই স্বাস্থ্য-শ্রীসম্পন্না মেয়েটির সঙ্গে বর্তমানের এই নিতান্ত রোগা মেয়েটির তুলনা ক'রে আমার বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠল। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—এত সকালে নাইতে যাবার কি দরকার রে রাণী?

সে বললে একটু সকাল সকাল না নেয়ে এলে কখন রান্না চড়াব দাদা? কাল রাত্রে তো আপনার খাওয়াই হয়নি এক রকম।

আমি বললুম—তা হোক। আমাকে যে আটটার মধ্যেই খেতে হবে তার কোন মানে নেই। এত সকালে নাইতে যেতে হবে না তোর।

উমারাণী ঘড়া নামিয়ে রাখল।

পিসীমা বললেন—তোমার কথা, তাই শুনলে বাবা। নইলে ও কি তেমন পাগলী মেয়ে নাকি, দ্বাদশীর দিনে মাঘ মাসের ভোরে নাইতে যাবে। শোনে না, বলি, বৌমা তোমার শরীর ভাল নয়, এত সকালে জলে নেবো না। শোনে না, বলে পিসীমা কাল গিয়েছে আপনার একাদশী, একটু সকাল সকাল কাজ না সেরে নিলে, আপনাকে দুটো খেতে দেব কখন?

সেদিন দুপুরে ওদের ওপরের ঘরে শুয়ে শুয়ে কি বই পড়ছিলুম। উমারাণী এসে চুপ ক'রে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। বললুম—কে, রাণী? আয় না ভেতরে!

আমি উঠে বসলুম। সে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দেখলুম তার শরীর আগেকার চেয়েও খুব রোগা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তার মুখখানি প্রতিমার মতই টলটল করছে। বয়স যদিও বাইশ-তেইশ হ'ল, তার মুখ এখনও তেরো বছরের মেয়েটির মতই কাঁচা। কথা আরম্ভ করবার ভূমিকাস্বরূপ বললুম—আজ বড় শীত পড়েছে, না?

উমারাণী বললে—হ্যাঁ দাদা। আমি ভাবলুম আপনি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছেন। আপনি দিনমানে ঘুমোন না বুঝি?

বললুম—মাঝে মাঝে হয়তো ঘুমোই। আজ আর ঘুমোব না। আয় এখানে বোস, গল্প করি।

তাকে কাছে বসালুম। তার চুলের অবস্থা দেখে বুঝলুম সে চুলের যত্ন করে না। মুখের আশেপাশে কোঁকড়া চুলের রাশ অযত্নবিন্যস্ত ভাবে পড়েছিল, চুলগুলোর রং কটা হয়ে পড়েছিল। রাত্রের মত চুলগুলো কানের পাশ দিয়ে তুলে দিতে দিতে বললুম—তোর শরীর তো খুব খারাপ হয়ে গেছে! বিয়ের পর সেই সময় কেমনটি ছিলি! খুব কি জ্বর হয়?

একটু হাসি ছাড়া সে এ কথার কোন উত্তর দিলে না।

আমি বললুম—না, এ কথা ভালো না রাণী। আমি গিয়ে একটা ওষুধ পাঠিয়ে দেব, সেইটে নিয়মমত খেতে হবে। না হ'লে এ যে মহা কষ্ট।

একটু পরে সে বললে—তা হ'লে সত্যি দাদা, আমি কিন্তু বিয়ের চেষ্টা করব, বলুন!

আমি তার কথায় মনে বড় কৌতুক অনুভব করলুম। এই অবোধ মেয়েটা জানে

না যে সে এমনি একটা প্রস্তাব উত্থাপন ক'রে বসেছে, যাকে কার্যে পরিণত করা তার ক্ষুদ্র শক্তির বাইরে।

বললুম—বকিস নে রাণী।

খানিকক্ষণ হয়ে গেল, সে আর কথা কয় না দেখে পেছন ফিরে দেখি, ছেলেমানুষে হঠাৎ ধমক খেলে যেমন ভরসা-হারা চোখে তাকায়, তার চোখে তেমনি দৃষ্টি। মনে হ'ল, একটা ভুল করেছি, উমারাণী সেই ধরনের মেয়ে, যারা নিজেকে জোর ক'রে কখনও প্রচার করতে পারে না, পরের ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিলিয়ে দিয়ে স্রোতের জলের শেওলার মত যারা জীবন কাটিয়ে দিতেই অভ্যস্ত। স্নেহ-সুখে সে আবোল-তাবোল বকছিল, এর সঙ্গে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে ব্যবহার করতে হবে, বাতাস লজ্জাবতী লতার সঙ্গে যতটা সতর্ক হয়ে চলে তার চেয়েও। কথাটা যতটা পারি সামলে নেবার জন্য বললুম—তোর যদি সত্যি-সত্যি বিয়ে দেবার ইচ্ছে থাকত, তাহ'লে তুই পাঁজিখানা আন্‌তিস। দিন কোন্ মাসে আছে না আছে সেগুলো সব দেখতে হবে তো, না শুধু শুধু তোর কেবল বকুনি।

উমারাণার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে ভয়-ভয় দৃষ্টিটা কেটে গেল। আমার কথার মধ্যে সে আমার বকুনির একটা কারণ খুঁজে পেল। বোধ হয় বিয়ে করবার জন্যে নিতান্ত উৎসুক দাদাটির ওপর তার একটু কৃপাও হ'ল। সে বললে—পাঁজি আপনাকে দিয়ে আজ দেখিয়ে নেব সে তো ভেবেই রেখেছি দাদা। আপনি বসুন, আমি ওঘর থেকে পাঁজিখানা নিয়ে আসি।

দালানের ওপাশে একটা ঘর ছিল। উমারাণী সেই ঘরটার মধ্যে উঠে গেল। সেই সময় পিসীমা নীচে থেকে ডাক দিলেন—বৌমা, নেমে এস, বেলা গেল, চালগুলো আবার কুট্‌তে হবে তো।

উমারাণী ঘরটার বার হয়ে এসে আমার হাতে পাঁজিখানা দিয়ে বললে—আপনি দেখে রাখুন দাদা, আমায় বলবেন এখন। আমি এখুনি আসছি।

সে নীচে নেমে গেল।

তখন বেলা একটু প'ড়ে এসেছে, নীচের বাগানের সদ্য ফোটা বাতাবী লেবু ফুলের গন্ধে ঘরের বাতাস ভুরভুর করছে, বাগানের পথের পাশের সজনে গাছগুলো ফুলে ভর্তি! ...পড়ন্ত রোদ ঝিরঝিরে বাতাসে পেয়ারা গাছের সাদা ডালগুলো বুটিকাটা রাংতার সাজে মুড়ে দিয়েছে।...

উমারাণী কাজে গিয়েছে, এখন আর আসবে না ভেবে মাঠের দিকে বেড়াতে যাবার ইচ্ছে হ'ল। উঠতে গিয়ে লক্ষ্য করলুম খাটের পাশে একটা কাঠের হাতবাক্স রয়েছে, সেটা অনেক কালের, রং-ওঠা, তাতে চাবির কলটাও নেই। সেই কাঠের বাক্সটার ডালা খুললুম। দেখি তার মধ্যে কতকগুলো টাট্‌কা-তোলা লেবু ফুল, কতকগুলো গাঁদা ফুল, আর কতকগুলো আ-শুকনো ঘেঁটু ফুল। ফুলগুলোর তলায় একটা আধ-ময়লা নেকড়ায় যত্ন ক'রে জড়ানো কি জিনিস। নেকড়ায় এমন কি জিনিস যার সঙ্গে এতগুলো ফুলের কার্য-কারণ সম্পর্ক, এই নির্ণয় করতে কৌতূহলবশতঃ নেকড়ার ভাঁজ খুলে ফেলে দেখলুম তার মধ্যে খানকতক খামের চিঠি। চিঠিগুলোর ওপর উমারাণীর নামে ঠিকানা লেখা, হাতের লেখা ভগ্নীপতি সুরেনের। তার পোস্ট অফিসের মোহর দেখে বুঝলুম চিঠিগুলো পাঁচ-ছয় বছরের পুরানো, একখানা কেবল এক বছর আগে লেখা।

কৃপণের ধনের মত উমারাণী যার পুরোনো চিঠিগুলো এমন সযত্নে রক্ষা করেছে, তার মধুর হৃদয়ের স্নেহচ্ছায়া-গহন যূথীবনে যার স্মৃতির নীরব আরতি এমনি দিনের পর দিন প্রতি সকাল-সাঁঝে চলছে, কেমন সে অভাগা দেবতা, যে এ উপাসনা মন্দিরের

ধূপগন্ধকে এড়িয়ে চিরদিন বাইরে বাইরেই ফিরতে লাগল!...

মাঠ থেকে বেরিয়ে যখন আসি, তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, ওদের রান্নাঘরে আলো জ্বলছে। আমার পায়ের শব্দ শুনে উমারাণী বললে—দাদা এলেন?...আমি উত্তর দেবার পূর্বেই সে হাসিমুখে রান্নাঘর থেকে বার হয়ে এল। বললে—দাদা বুঝি আমাদের দেশ বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন? কোন্ দিক দিয়ে বেড়িয়ে এলেন, নদীর ধারে বুঝি? তারপর সে বলল—দাদা, আপনি রান্নাঘরে বসবেন? আমি আপনার জন্যে পিঁড়ি পেতে রেখেছি।

পিসীমা বললেন—বৌমার যত অনাছিষ্টি, এখানে বাছাকে ধোঁয়ার মধ্যে বসিয়ে রাখা।

আমি বললুম—আমার কোন কষ্ট হবে না, এখানে বসি পিসীমা।

রান্নাঘরের মধ্যে গিয়ে বসলুম। উমারাণী খাবার তৈরী ক'রে রেখেছিল, আমায় খেতে দিল, তারপর কাজ করতে ব'সে গেল। দেখলুম সে অনেকগুলো চালের গুঁড়ো, ময়দা ইত্যাদি উপকরণ নিয়ে উৎসাহের সঙ্গে পিঠে তৈরি শুরু করেছে। পিসীমা খুবই বৃদ্ধা, তিনি কাজকর্ম বিশেষ কিছু করতে পারেন না। খাটতে সবটাই হচ্ছিল উমারাণীর। রোগা মেয়েটার অবস্থা দেখে বড় কষ্ট হ'ল, ভাবলুম কেন অনর্থক পিঠে করতে ব'সে মিথ্যে কষ্ট পাওয়া? সেবার আনন্দে উমারাণী যা করতে বসেছে, তার বিরুদ্ধে কোন কথা বললুম না অবশ্য।

জিজ্ঞাসা করলুম—রাণী, আমায় পিঠে গড়তে শিখিয়ে দিবি?

উমারাণীর বড় লজ্জা হ'ল। মুখটি নীচু ক'রে সে বললে—দাদা, আমরা বেঁচে থাকতে পিঠে খাওয়ার ইচ্ছে হ'লে আপনাকে কি পিঠে গ'ড়ে নিতে হবে, যে আপনি পিঠে গড়তে শিখবেন?

পিসীমা বললেন—না, তোমার দাদার পিঠে খাবার ইচ্ছে হ'লে এই সাত লঙ্কা পাড়ি দিয়ে এসে তোমার এখানে খেয়ে যাবেন!

উমারাণী চুপ ক'রে রইল।

আমি বললুম—তা কেন পিসীমা? ও আর এক উপায় বার করেছে, শোনেননি বুঝি?

পিসীমা বললেন—কি বাবা?

আমি বললুম—ও এই আষাঢ় মাসের মধ্যেই ওর দাদার বিয়ে দেবে।

পিসীমা বললেন—তা বৌমা ঠিক কথাই বলেছে বাবা। এত বড়টি হয়েছ, আর কি বিয়ে না করা ভাল দেখায়? সংসারী হ'তে হবে তো!

উমারাণী বলে উঠল—ভাল কথা দাদা, দিন তখন তো আর দেখা হ'ল না পাঁজিতে আমি আর ওপরে যেতে পারলুম না। অবিশ্যি ক'রে বলবেন খাওয়ার পর রাত্রে।

আমি বললুম—বলব রে বলব। এতদিন তো মনে ছিল না তোর, এখন সামনে পেয়ে বুঝি দাদার ওপর ভারি মায়া।

পিসীমা বললেন—ও তোমার তেমন পাগলী বোন নয় বাবা। সে কথা বুঝি বৌমা বলেনি তোমায়! আজ তিন চার বছর হ'ল, ওরা যখন প্রথম কলকাতা থেকে এখানে আসে, তখন বৌমা এক জোড়া পশমের জুতো বুনে রেখেছে তোমার জন্যে। বলে, দাদা দুঃখু করেছেন যে আমার বোন আমার জুতো বুনে দেবার জন্যে উলবোনা শিখে প্রথম কিনা জুতো বুনলো তার স্বামীর। তা আমি এবার দাদাকে পশমের জুতো পরাব। তারপর ওদের আর কলকাতা যাওয়া হ'ল না, সুরেনের অন্য জায়গায় চাকরি হ'ল। তুমিও আর কখনো এদিকে আসোনি। কাল তুমি আসতেই বৌমার যে আহ্লাদ! আমায় বললে—পিসীমা, আমার সাধ এইবার পুরলো, এতদিন পরে দাদাকে পশমের জুতো পরাতে পারব।

উমারাণীর চোখ দুটি লজ্জায় নীচু হয়ে রইল, প্রদীপের আলোয় উজ্জ্বল তার মুখখানি কিশোরীর মুখের মতন এমন লাবণ্যমাখা অথচ কাঁচ মনে হচ্ছিল যে, বোধ হ'ল নোলক পরলে তাকে এখনও বেশ মানায়।

তারপর নানা কথায় আর খাওয়া শেষ হ'তে অনেক রাত হয়ে গেল। সেদিন অনেক রাত্রে যখন ওপরের ঘরে শুতে গেলুম, তখন চাঁদ উঠেছে। গভীর রাতের মৌন শান্তি সেদিন বড় করুণ হয়ে বাজল আমার মনে। আজ অনেকক্ষণ উমারাণীর নিকট ব'সে থেকে একটা জিনিস বেশ বুঝতে পেরেছি—উমারাণীর থাইসিস্ হয়েছে।

মৃত্যু ওর শান্ত ললাটে তার তিলক পরিয়ে ওকে বরণ ক'রে রেখেছে, শীগ্গির ওকে বেরিয়ে পড়তে হবে অনন্তের পথের তীর্থযাত্রায়···

উমারাণী এক গ্লাস জল দিতে আমার ঘরে ঢুকল। জল নামিয়ে রেখে বললে—কৈ দাদা, সে পাঁজিখানা?

তার মুখখানির দিকে চেয়ে বড় মন কেমন করে উঠল। বললুম—রাণী এদিকে আয়।···একথা আমার মনে উঠল না যে উমারাণী আমার আপন বোন নয় বা আমাদের দু'জনেরই বয়স কম। আমিও যেমন নিঃসঙ্কোচে বললুম, সেও তেমনি নিঃসঙ্কোচে এসে আমার পায়ের কাছে খাটের নীচু মাটিতে ব'সে পড়ল। আট বছর আগের মত আজও ওকে আদর ক'রে তার বিদ্রোহী চুলগুলো কানের পাশ দিয়ে তুলে দিতে দিতে বললুম—রাণী, জুতোর কথা কে বলেছিল রে তাকে?

উমারাণী অসীম নির্ভরতার সঙ্গে ছোট্ট মেয়েটির মত খাট থেকে ঝোলানো আমার পায়ের ওপর তার মুখটি লুকিয়ে রাখলে।···ওরে, স্নেহ যদি রোগ সারানোর ওষুধ হ'ত, তাহলে আমি বড় ভাইয়ের স্নেহ তোকে শিশি ভ'রে দাগ কেটে ডাক্তারী ওষুধের মত দিয়ে যেতুম।

আমার প্রশ্নের কোন উত্তর তার কাছ থেকে পেলুম না। কেন পেলুম না, তাও একটু পরেই বুঝলুম। একমাত্র লোক যে ঐ জুতোর কথা জানে বা যার কাছে আমি একসময় এ কথা বলেছিলুম, সে হচ্ছে সুরেন। সুরেনই বোধ হয় বিয়ের পর কোন সময় উমারাণীকে এ কথা ব'লে থাকবে। বড় ভাইয়ের কাছে ছোট বোনটি তো আর সে কথা বলতে পারে না।

বললুম—রাণী, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। টুনি বলছিল—মানে, সুরেন কি ঠিক চিঠিপত্র দেয়? বাড়ীটাড়ী আসে?

উমারাণী বড্ড জড়োসড়ো হয়ে গেল। আমার কথার কোন উত্তর দিল না, মুখও তুলে নিলে না, আগের মত আমার পায়ের ওপর মুখটি লুকিয়ে চুপ ক'রে রইল।

অনেকক্ষণ কেটে গেল, তারপর বুঝলুম সে কাঁদছে।···

তাকে সান্ত্বনা কি ব'লে দেব ঠিক বুঝতে পারলুম না, শুধু তার মাথার চুলগুলোর ওপর পরম স্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম।···বেশীদিন না রে, সোনার বোনটি, বেশীদিন না। তোর মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে।

ব্যর্থ নারী-হৃদয়ের রুদ্ধ আবেগ পরম নির্ভরতার সঙ্গে তার দাদার বুকে নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে যখন সে নীচে শুতে নেমে গেল, চাঁদের আলোর তলায় ঘুমন্ত বাতাস সজনে ফুলের মিষ্টি গন্ধে তখন স্বপ্ন দেখছে!

এর দু'তিন দিন পরে তাদের ওখান থেকে চ'লে আসবার জন্যে প্রস্তুত হলাম। এর আগেই চ'লে আসতুম, কলকাতায় অনেক কাজ ছিল আমার, কিন্তু উমারাণীর করুণ মিনতি এড়াতে না পেরে কিছু দেরী হয়ে গেলো।

কাপড় প'রে তৈরী হয়েছি, উমারাণী কাঁদো-কাঁদো মুখে নিকটে এসে দাঁড়াল। আমায় বললে—আবার কবে আসবেন দাদা?

বললুম—আসব রে আবার পুজোর সময় আসব।

সে বললে—সে যে অনেকদিন! না দাদা, আপনি আষাঢ় মাসে রথের সময় আসবেন। আমাদের এখানে রথের বড় জাঁকজমক হয় দাদা। আর আমি কিন্তু আপনার বিয়ে দেবই এই বছরে, লক্ষ্মী দাদামণি, আপনার পায়ে পড়ি—আপনি অমত করবেন না।

তারপর সে সেই পশমের জুতো জোড়া বের ক'রে আমার সামনে মাটিতে রাখলে। বললে—আমি আন্দাজে বুনেছি, আপনি পায়ে দিয়ে দেখুন দেখি দাদা, হবে'খন বোধ হয়।

জুতো জোড়াটা পায়ে ঠিক হয়েছে দেখে উমারাণী বড় খুশী হ'ল, তার সমস্ত মুখখানা সার্থকতার আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তারপর সে আবার বললে—দাদা, আমি আপনার গরীব বোন, কখনো আসেন না এখানে, যদি বা এলেন, না পারলুম ভাল ক'রে খাওয়াতে-দাওয়াতে, না পারলুম আদর-যত্ন করতে। এসে শুধু কষ্টই পেলেন, কি করব, আমার যেমন কপাল!

অনেকদিন অগেকার মত সেই রকম গলায় আঁচল দিয়ে সে আমায় প্রণাম করলে, তার চোখের জল আমার পায়ের ওপর টপ্ টপ্ ক'রে ঝরে পড়তে লাগল।

আমি তাকে উঠিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললুম—রাণী, তুই আমার মায়ের পেটের বোনই। এ কথা ভুলে যাস নে কখনো যে তোর বড় ভাই এখনও বেঁচে আছে।

যখন চ'লে আসি তখন সে তাদের বাইরের বাড়ীর দোর ধ'রে দাঁড়িয়ে রইল, আসতে আসতে পেছন ফিরে দেখলুম সে কাতর চোখে একদৃষ্টে চেয়ে আছে!

যখন পথের বাঁক ফিরেছি, তখনও তাকে দেখা যাচ্ছিল, বেলাশেষের হলদে রোদ সুপারি গাছের সারির ফাঁক দিয়ে তার রুক্ষ কোঁকড়া চুলে ঘেরা বিষণ্ণ মুখখানির ওপর গিয়ে পড়েছিল।...

বছরখানেক পরে আমি আবার চাকরি নিয়ে গেলুম ময়ূরভঞ্জ রাজস্টেটে। সেখানে থকতে সুরেনের এক পত্রে জানলুম উমারাণী মারা গিয়েছে।

যাবেই তা জানতুম। সেবার যখন তার কাছ থেকে চ'লে আসি তখনই বুঝে এসে-ছিলুম, এই তার সঙ্গে শেষ দেখা। সুরেনকে এসে পত্র লিখেছিলুম উমারাণীর অবস্থা সব খুলে, কোন একটা ভাল জায়গায় তাকে কিছুদিন নিয়ে যেতে। সুরেন লিখেছিল, জমিদারের কাজ-আদায়পত্র হাতে, পুজোর সময় বরং দেখবে, এখন যাবার কোন উপায় নেই ইত্যাদি। উমারাণী মারা গেল সেই ভাদ্র মাসে।

তারপর আরও বছর খানেক কেটে গেল। সেবার কিছুদিন ছুটি নিয়ে কলকাতা এসে দেখলুম ওদের সেই বাড়ীতে ওরা আবার বাস করছে। আমি এসেছি শুনে টুনি দেখা করতে এল। খানিক একথা সেকথার পর টুনি কাগজে-মোড়া একটা কি আমার হাতে দিল, খুলে দেখি মেয়েদের মাথায় দেবার কতকগুলো রুপোর কাঁটা।

টুনি বললে—বৌদি যে ভাদ্র মাসে মারা যায়, আমি সেই শ্রাবণ মাসে চাঁপাপুকুর গিয়েছিলুম। বৌদি আপনার কত গল্প করলে, বললে—মায়ের পেটের ভাই যে কি জিনিস ঠাকুরঝি, তা আমি দাদাকে দিয়ে বুঝেছি। আমার বড় ইচ্ছে আমি দাদার বিয়ে দিয়ে তাঁকে সংসারী ক'রে দেব। দাদা আমার ভেসে ভেসে বেড়ান, কেউ একটু যত্ন করবার নেই, ওতে আমার বড় কষ্ট হয়। ঐ রুপোর কাঁটাগুলো সে গড়িয়েছিল আপনার

বিয়ে হ'লে আপনার বৌকে দেবার জন্যে। সে আষাঢ় মাসে ওগুলো গড়িয়েছিল, আমি গেলে আমায় দেখিয়ে বললে—ইচ্ছে ছিল সোনার চিরুনি দিয়ে দাদার বৌয়ের মুখ দেখব, কিন্তু এত পয়সা কোথায় পাব, এই বছরেই দাদার বিয়ে না দিলে নয়। বিয়ে হোক তারপর চেষ্টা ক'রে গড়িয়ে দেব। কাঁটা ওর বাক্সে তোলা ছিল, তারপর ভাদ্র মাসে বৌদি মারা গেল, আমি তার বাক্স থেকে কাঁটাগুলো বের ক'রে এনেছিলাম আপনাকে দেব ব'লে। কোথায় পয়সা পাবে, সারা বছর জমিয়ে যা করেছিল তাতেই ঐগুলো গড়িয়েছিল ; দাদা তো এক পয়সাও তার হাতে দিতেন না, সংসার-খরচ ব'লে যা দিতেন তাতে সংসার চলাই ভার, তা তো আপনি একবার গিয়ে দেখেই এসেছিলেন!

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—তাহলে তার হাতে পয়সা জমল কোথা থেকে?

টুনি বললে—বৌদি বাজারের খাবার বড় ভালবাসত। ওরা পশ্চিমে থাকত, সেখানে ওসব বোধ হয় তেমন মেলে না, সেই জন্য ঐ বাজারের কচুরি নিমকির ওপর তার কেমন ছেলেমানুষের একটা লোভ ছিল। বৌদি করত কি, নারকেল পাতা চেঁচে ঝাঁটার কাঠি করে রাখত, লোকে পয়সা দিয়ে তা কিনে নিয়ে যেত। এই রকম ক'রে যে পয়সা পেত, তাই দিয়ে গোপালনগরের হাট থেকে পাড়ার ছেলে-পিলেদের দিয়ে খাবার আনাত, নিজে খেত, তাদের দিত। আপনি সেবার চ'লে যাবার পর থেকে সেই পয়সায় আর খাবার না খেয়ে তাই জমিয়ে জমিয়ে ঐ রুপোর কাঁটাগুলো গড়িয়েছিল।

আমি বললুম—সে মারা গেল কোন্ সময়ে?

টুনি বললে—শেষ রাত্রে, প্রায় রাত চারটের সময়। রাত্রে বৌদির ভয়ানক জ্বর হ'ল, সেই জ্বরে একেবারে বেহুঁশ হয়ে গেল। তার পরদিন বিকালবেলা আমি ওর বিছানার পাশে ব'সে আছি, দেখি বৌদি বালিশের এপাশ ওপাশ হাতড়াচ্ছে, কি যেন খুঁজছে। আমি বললুম—বৌদি লক্ষ্মীটি, ওরকম করছ কেন? তখন তার ভাল জ্ঞান নেই, যেন আচ্ছন্ন মত। বললে, আমার চিঠিগুলো কোথায় গেল, আমার সেই চিঠিগুলো? ব'লে আবার বিছানা হাতড়াতে লাগল। দাদা বিয়ের পর প্রথম যেসব চিঠি তাকে লিখেছিলেন সে সেগুলো যত্ন ক'রে ওর বাক্সে তুলে রেখেছিল, আমি তা জানতুম। আমি সেগুলো বাক্স থেকে বের ক'রে নিয়ে এসে তার আঁচলে বেঁধে দিলুম—তখন থামে। তারপর সেই রাত্রেই সে মারা গেল। যখন তাকে বার ক'রে নিয়ে গেল, তখনও তার আঁচলে সেই চিঠিগুলো বাঁধা।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—সুরেন সে সময় ছিল না?

টুনি বললে—ছোড়দাকে টেলিগ্রাম করা হয়েছিল, তিনি যখন এসে পৌঁছুলেন, তখন বৌদিকে দাহ করা হয়ে গিয়েছে।...

অনকে বছর হয়ে গিয়েছে।

এখনও শীতের অবসানে যখন আবার বাতাবী-লেবুর ফুল ফোটে, সজনে-তলায় ফুল কুড়োবার ধুম প'ড়ে যায়, পাড়াগাঁয়ের বন-ঝোপ ঘেঁটু ফুলে আলো ক'রে রাখে, পুকুরের জলে কাঞ্চন-ফুলের রাঙা ছায়া পড়ে, ফাগুন দুপুরের আবেশ-বিভোর রোদ আকাশে-বাতাসে থর্ থর্ কাঁপতে থাকে, তখন আপন মনে ভাবতে ভাবতে কার কথা যেন মনে পড়ে যায়...মনে হয় কে যেন অনেক দূর থেকে এলোমেলো-চুলে ঘেরা কাতর মুখে একদৃষ্টে চেয়ে আছে...তখন মন বড় কেমন ক'রে ওঠে, হঠাৎ যেন চোখে জল এসে পড়ে...

প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩২৯

অন্ধকার তখনও ঠিক হয় নাই। মুখুয্যে-বাড়ির পিছনে বাঁশবাগানে জোনাকীর দল সাঁঝ জ্বালিবার উপক্রম করিতেছিল। তাল-পুকুরের পাড়ে গাছের মাথায় বাদুড়ের দল কালো হইয়া ঝুলিতেছে—মাঠের ধারে বাঁশবাগানের পিছনটা সূর্যাস্তের শেষ-আলোয় উজ্জ্বল। চারিদিক বেশ কবিত্বপূর্ণ হইয়া আসিতেছে, এমন সময় মুখুয্যেদের অন্দর-বাড়ি হইতে এক তুমুল কলরব আর হইচই উঠিল।

বৃদ্ধ রামতনু মুখুয্যে শিবকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য। তিনি রোজ সন্ধ্যাবেলায় আরতি দিয়া থাকেন, এজন্য প্রায় একপোয়া খাঁটি গাওয়া ঘি তাঁর চাই। তিনি নানা উপায়ে এই ঘি সংগ্রহ করিয়া ঘরে রাখিয়া দেন। অন্যদিনের মত আজও তাকের উপর একটা বাটিতে ঘি-টা ছিল, তাঁর পুত্রবধূ সুশীলা সেই বাটি তাকের উপর হইতে পাড়িয়া সে ঘি-টার সমস্তই দিয়া খাবার তৈয়ারী করিয়াছে।

রামতনু মুখুয্যে মহকুমার কোর্টে গিয়েছিলেন, ও-পাড়ার চৌধুরীদের পক্ষে একটা মকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে।

বিপক্ষের উকীল তাঁকে জেরার মুখে জিজ্ঞাসা করেন—আপনি গত মে মাসে পাঁচু রায় আর তার ভাইয়ের পাঁচিলের জায়গা নিয়ে মামলায় প্রধান সাক্ষী ছিলেন না?

রামতনু মুখুয্যে বলিয়াছিলেন—হ্যাঁ তিনি ছিলেন।

উকীল পুনরায় জেরা করিয়াছিলেন—দু-নালির চৌধুরীদের কান-সোনার মাঠের দাঙ্গার মকদ্দমায় আপনি পুলিশের দিকে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন কি না?

রামতনু মহাশয়কে ঢোঁক গিলিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে তিনি দিয়াছিলেন বটে।

বিপক্ষের উকিল আবার প্রশ্ন করেন—আচ্ছা, এর কিছুদিন পরেই বড়-তরফের স্বত্বের মামলায় আপনি বাদী-পক্ষের সাক্ষী ছিলেন কি না?

কবে তিনি এ সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, মুখুয্যে মহাশয় প্রথমটা তাহা মনে করিতে পারেন নাই, তারপর বিপক্ষের উকীলের পুনঃ পুনঃ কড়া প্রশ্নে এবং মুন্সেফবাবুর ভ্রূকুটি-মিশ্রিত দৃষ্টির সম্মুখে হতভাগ্য রামতনুর মনে পড়িয়াছিল যে তিনি এ সাক্ষ্য দিয়াছিলেন বটে এবং এই গত জুলাই মাসে এই কোর্টেই তাহা দিয়া গিয়াছেন।

তারপর কোর্টে কি ঘটিয়াছিল, বিপক্ষের উকীল হাকিমের দিকে চাহিয়া রামতনুর উপর কি ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছিলেন, রামতনু উকীল-আমলায় ভর্তি মুন্সেফ-বাবুর এজলাসে হঠাৎ কিরূপে সপুষ্পে সর্বপক্ষেত্রের আবিষ্কার করেন, সে সকল কথা উল্লেখের আর প্রয়োজন নাই! তবে মোটের উপর বলা যায়, রামতনু মুখুয্যে যখন বাটী আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন তাঁর শরীরের ও মনের অবস্থা খুবই খারাপ! কোথায় এ অবস্থায় তিনি ভাবিয়াছিলেন হাত পা ধুইয়া ঠাণ্ডা হইয়া শ্রীগুরুর উদ্দেশ্যে আহুতি দিয়া অনিত্য বিষয়-বিষে জর্জরিত মনকে একটু স্থির করিবেন, না দেখেন যে আহুতির জন্য আলাদা করিয়া তোলা যে ঘি-টুকু তাকে ছিল, তাহার সবটাই একেবারে নষ্ট হইয়াছে।

তারপর প্রায় অর্ধ-ঘণ্টা ধরিয়া মুখুয্যে বাড়ির অন্দর মহলে একটা রীতিমত কবির লড়াই চলিতে লাগিল। মুখুয্যে মহাশয়ের পুত্রবধূ সুশীলা প্রথমটা একটু অপ্রতিভ হইলেও সামলাইয়া লইয়া এমন-সব কথায় শ্বশুরকে জবাব দিতে লাগিল যাহা একজন

আঠারো-বৎসর-বয়স্কা তরুণীর মুখে সাজে না। পক্ষান্তরে কোর্টে বিপক্ষের উকীলের অপমানে ও ঘরে আসিয়া পুত্রবধূর নিকট অপমানে ক্ষিপ্তপ্রায় রামতনু মুখুয্যে পুত্র-বধূর পিতৃকুল ও তাঁহার নিজের পিতৃকুলের তুলনামূলক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া এমন সব দুরূহ পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে বোধ হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ডুবালের গল্পে উল্লিখিত কুলাদর্শ-বিদ্যা অধ্যয়ন না করিলে সে-সব বুঝা একেবারেই অসম্ভব।

এমন সময় মুখুয্যে মহাশয়ের ছেলে কিশোরী বাড়ি আসিল। তাহার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ হইবে, বেশী লেখা-পড়া না শেখায় সে চৌধুরীদের জমিদারী কাছারীতে ন'টাকা বেতনে মুহুরীগিরি করিত।

কিশোরীলাল নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল ঘরে আলো দেওয়া হয় নাই, অন্ধকারেই জামা কাপড় ছাড়িয়া সে বাহিরে হাত-পা ধুইতে গেল। তারপর ঘরে ঢুকিয়া শুনিল, ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার ঘরে সুশীলা তাহার সম্মুখের বাতাসকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে যে, এ সংসারে থাকিয়া সংসার করা তাহার শক্তিতে কুলাইবে না, অতএব কাল সকালেই যেন গরুর গাড়ি ডাকাইয়া তাহাকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

কিশোরী সে কথার কোন বিশেষ জবাব না দিয়া লণ্ঠন জ্বালিয়া, বাঁশের লাঠিগাছা ঘরের কোণ হইতে লইয়া বাহির হইয়া গেল। ও-পাড়ায় রায়-বাড়িতে চণ্ডীমণ্ডপে গ্রামের নিষ্কর্মা যুবকদিগের যাত্রার আখড়াই ও রিহার্সেল চলিত—সেইখানে অনেকক্ষণ কাটাইয়া অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরিয়া আসা তাহার নিত্যকর্মের ভিতর।

রামতনু মুখুয্যে মহাশয়ও অনেকক্ষণ বাহিরের ঘরে কাটাইলেন। প্রতিবেশী হরি রায় তামাকের খরচ বাঁচাইবার জন্য সকাল-সন্ধ্যায় মুখুয্যে মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপ আশ্রয় করিতেন ; তাহাকে রামতনু জানাইলেন যে তিনি খুব শীঘ্র কাশী যাইতেছেন, কারণ আর এ বয়সে—, ইত্যাদি।...

তাঁহার এ বানপ্রস্থ অবলম্বনের আকাঙ্ক্ষার জন্য দায়ী একমাত্র তাঁহার পুত্রবধূ সুশীলা। সুশীলা সকাল নাই সন্ধ্যা নাই একটা কিছু না বাধাইয়া থাকিতে পারে না। সে অত্যন্ত আনাড়ি, কোন কাজই গুছাইয়া করিতে পারে না, অথচ দোষ দেখাইতে যাইলে ক্ষেপিয়া যায়। তাহার জন্য রামতনু মুখুয্যের বাড়িতে কাক চিল বসিবার উপায় নাই। শ্বশুর শাশুড়ীকে সে হঠাৎ আঁটিয়া উঠিতে পারে না বটে, কিন্তু এজন্য তাহার চেষ্টায় ত্রুটি দেখা যায় না!

অনেক রাত্রে কিশোরী বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার ঘরে খাবার ঢাকা আছে এবং স্ত্রী ঘুমাইতেছে। খাবারের ঢাকা খুলিয়া আহারাদি শেষ করিয়া সে শুইতে গিয়া দেখিল, স্ত্রী ঘুম-জড়ানো চক্ষে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছে। স্বামীকে দেখিয়া একটু অপ্রতিভের সুরে বলিল—কখন এলে ? তা আমায় একটু ডাকলে না কেন ?

কিশোরী বলিল—আর ডেকে কি হবে। আমার কি আর হাত পা নেই! নিতে জানি নে ?

হঠাৎ তাহার স্ত্রী রাগিয়া উঠিল—নিতে জান্ তো জেনো। কাল থেকে আমার এখানে আর বনবে না। এ যেন হয়েচে শত্রুপুরীর মধ্যে বাস—বাড়িসুদ্ধ লোক আমার পেছনে এমন করে লেগেছে কেন শুনতে চাই। না হয় বরং...

কান্নায় ফুলিয়া সে বালিসের উপর মুখ গুঁজিল।

কিশোরী দেখিল স্ত্রী রাত-দুপুরের সময় গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করিয়া একটা বিভ্রাট বাধাইয়া তোলে বুঝি। এরকম করিয়া আর সংসার করা চলে না—ভাত ঢাকা ছিল, খুলিয়া লইয়া খাইয়াছে, ইহাতেও যদি স্ত্রী চটিয়া যায় তাহা হইলে আর পারা যায় না ;

কিছু না, ও একটা ছল ; ঐ সামান্য সূত্র ধরিয়া এখনি সে একটা রাম-রাবণের যুদ্ধ বাধাইয়া তুলিবে।

কিশোরী বলিল—যা খুশী কালকে কোরো—এখন একটু ঘুমুতে দাও। ঘুমুচ্ছিলে বলেই আর ডাকিনি এই তো অপরাধ? তা বেশ, কাল থেকে ওঠাবো, চুলের নড়া ধরে ওঠাবো।

সুশীলা কথাও বলিল না, মুখও তুলিল না, বালিসে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া রামতনু মুখুয্যে শুনিলেন, চৌধুরীরা খবর পাঠাইয়াছে কয়েকটি নূতন সাক্ষীর তালিম দিতে হইবে। যাইবার সময় তিনি বলিলেন—ও বউমা, একটু সকাল সকাল ভাত দিয়ো, কোর্টে যেতে হবে।

বেলা নয়টার সময় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন—সুশীলা স্নান করিয়া আসিয়া রৌদ্রে কাপড় মেলিয়া দিতেছে, গৃহিণী মোক্ষদাসুন্দরী রান্নাঘরে বসিয়া রাঁধিতেছেন! স্বামীকে দেখিয়াই মোক্ষদা চৌকিদার হাঁকার সুরে বলিতে লাগিলেন—হয় আমি একদিকে বেরিয়ে যাই, না হয় বাপু এর একটা বিহিত করো। সেই সকাল থেকে ঘুরপাক দিয়ে দিয়ে বেড়াচ্ছে, বলছি—ও বউমা, দুটো ভাত চড়িয়ে দাও, ওগো যা হয় দুটো-কিছু রাঁধ—হাতে পায়ে ধরতে কেবল বাকী রেখেছি। কার কথা কে শোনে?—এই বেলা-দুপুরের সময় রাণী এখন এলেন নেয়ে...

সুশীলা রক হইতেই সমান গলায় উত্তর দিল—মাইনে করা দাসী তো নই, আমি যখন পারব রান্না চড়াবো—সকাল থেকে বসে আছি নাকি? এত খাটুনি সেরে আবার আটটার মধ্যে ভাত দেবো—মানুষের তো আর শরীর নয়—যার না চলবে সে নিজে রেঁধে নিক...

এ-কথার উত্তরে মোক্ষদা খুন্তী হাতে রান্নাঘরের দাওয়ায় আসিয়া নটরাজ শিবের তান্ডব নর্তনের একটা আধুনিক সংস্করণ শুরু করিতে যাইতেছিলেন—একটা ঘটনায় তাহা বন্ধ হইয়া গেল।

একটা দশ-বারো বৎসরের ছেলে, রংটা বড়ই কালো, ম্যালেরিয়ায় শরীর জীর্ণ শীর্ণ, পরনে অতি ময়লা এক গামছা, শীতের দিনে তাহার গায়ে কিছু নাই, হাতে ছোট একটা বাখারির ছড়ি লইয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিল। ছেলেটি পাশের গ্রামের আতর আলি ঘরামীর ছেলে, গত বৎসর তার বাপ মারা গিয়াছে, দুটি ছোট ছোট বোন আর মা ছাড়া তার আর কেহ নাই। অবস্থা খুব খারাপ, সবদিন খাওয়া জোটে না, ছেলেটা পিঠে ছড়ি বাজাইয়া হাপু গাহিয়া মা ও বোন দুটিকে প্রতিপালন করে। সে এ-গ্রামের প্রায় সব বাড়িতে আসিত, কিন্তু মুখুয্যে-বাড়ি আর কখনো আসে নাই। তাহার একটা কারণ এই যে, দানশীলতার জন্য রামতনু মুখুয্যে গ্রামের মধ্যে আদৌ প্রসিদ্ধ ছিলেন না।

ছেলেটি উঠানে দাঁড়াইয়া বগল বাজাইয়া নানারূপ সুর করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাপু গাহিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে পিঠে জোর করিয়া লাঠির বাড়ি মারিতে লাগিল।

তিনটি নেহাত গো-বেচারী সাক্ষীর তালিম দিতে অনেক ধস্তাধস্তি করিয়া রামতনুর মেজাজ ভাল ছিল না, ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—থাম্—থাম্, ও সব রাখ—এখন ওসব দেখবার শখ নেই—যা অন্য বাড়ি দেখ্‌গে যা—যা...

সুশীলা কাপড় মেলিয়া দিতে দিতে অবাক্ হইয়া হাপু গাওয়া দেখিতেছিল—ছেলেটি সংকুচিত হইয়া বাহিরে যাইতেই সে তাড়াতাড়ি বাহিরের রকে গিয়ে তাহাকে ডাকিল, বলিল—শোন, তোর বাড়ি কোথায় রে?

—হরিশপুর মা-ঠাক্‌রুণ।

—তোর বাড়িতে কে আছে আর?

—মোর বাপ মারা গিয়েছে আর-বছর মা-ঠাকরুণ—মোদের আর কেউ নাই, মুই বড়, ছোট দুটো বোন আছে…

—তাই বুঝি তুই হাপু গাস? হ্যাঁ রে, এতে চলে?

রামতনুর ধমক খাইয়া ছেলেমানুষ অত্যন্ত দমিয়া গিয়াছিল, সুশীলার কথার ভিতর সহানুভূতির সুর চিনিয়া লইয়া হঠাৎ তাহার কান্না আসিল—চোখের জল হু হু করিয়া পড়িতেই ম্যালেরিয়া-শীর্ণ হাতটি তুলিয়া চোখ মুছিয়া বলিল—না মা-ঠাক্‌রুণ, চলে না। এ-সব লোকে আর দেখতে চায় না। মুই যদি ভাল গান গাইতে পারতাম তো যাত্রার দলে যাতাম, বড় কষ্ট মোদের সংসারে—এই শীতি মা-ঠাক্‌রুণ…

সুশীলা বাধা দিয়া বলিল—দাঁড়া, আমি আসছি।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কান্নার বেগ অতি কষ্টে সামলাইয়া চাহিয়া দেখিল আলনায় একখানা নূতন মোটা বিছানার চাদর ঝুলিতেছে, হাতের গোড়ায় সেইখানা পাইয়া টানিয়া লইল। তারপর জানলা দিয়া বাড়ির মধ্যে চাহিয়া দেখিয়া চাদরখানা তাড়াতাড়ি ছেলেটির হাতে দিয়া চুপি চুপি বলিল—এইখানা নিয়ে যা, এতে শীত বেশ কাটবে! কাটবে না? খুব মোটা। শীগ্‌গির যা, লুকিয়ে নিয়ে যা, কেউ যেন না দেখে…

ছেলেটা চাদর হাতে হতবুদ্ধি হইয়া ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া সুশীলা বলিল—ওরে এক্ষুনি কে এসে পড়বে, শীগ্‌গির যা…

ছেলেটাকে বিদায় দিয়া সুশীলা ভিতর-বাড়িতে ঢুকিয়া দেখিল শ্বশুর আহার করিতে বসিয়াছেন। ছেলেটার দুঃখে সুশীলার মন খুব নরম হইয়া গিয়াছিল। সে গিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া কাজে মন দিল, শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনাকে কিছু দেব বাবা?

মোক্ষদা ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন—তোমাকে আর কিছু দিতে হবে না, যে মিষ্টি বচন দিয়েছ তাতেই প্রাণ ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে, নাও এখন পার তো এদিকে এস একবার, হাঁড়িটা দেখ, নয় তো বল নিজে মরি-বাঁচি একরকম ক'রে' সাঙ্গ ক'রে' তুলি।

রামতনু কোন কথা বলিলেন না, আপন মনে খাইয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন। এই-সব ব্যাপারেই সুশীলা অত্যন্ত চটিয়া যাইত, রামতনু, পুত্রবধূর নিকট কোন জিনিস চাহিয়া খাইলে তাহার রাগ গলিয়া জল হইয়া যাইত, কিন্তু লোকে তাহাকে জব্দ করিতেছে বা অপমান করিবার ফন্দী খুঁজিতেছে ভাবিলে তাহার আর কাণ্ডজ্ঞান থাকিত না, সেও কোমর বাঁধিয়া রণে আগুয়ান হইত। সেই বা ছাড়িবে কেন?

মাস-দুই পরে।

ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি, কিন্তু বেশ গরম পড়িয়াছে। কিশোরী অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরিয়াছে। বাড়িতে যে যাহার ঘরে ঘুমাইতেছে। সে নিজের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল সুশীলা ঘরের মেজেয় বসিয়া একখানা চিঠি লিখিতেছে। কিশোরী সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিল—কাকে চিঠি লেখা হচ্ছে?

সুশীলা চিঠির কাগজখানা তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া চাপিয়া স্বামীর দিকে ফিরিয়া একটু দুষ্টামির হাসি হসিল, বলিল—বলবো কেন?

—থাক, না বলো, ভাত দাও। রাত কম হয় নি। আবার সকাল থেকেই খাটুনি আরম্ভ হবে।

সুশীলা ভাবিয়াছিল স্বামী আসিয়া সে কি লিখিতেছে দেখিবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিবে। প্রকৃতপক্ষে সে চিঠি কাহাকেও লিখিতেছে না, স্বামীকে কথা বলাইবার এ তার একটা পুরানো কৌশল মাত্র। অনেক দিন সে স্বামীর মুখে দুটো ভাল কথা শুনে নাই, তাহার নারী-হৃদয় ইহারই জন্য তৃষিত ছিল এবং ইহারই জন্য সে ঘুমে

চুলিতে চুলিতেও এই সামান্য ফাঁদটি পাতিয়া বসিয়া ছিল—কিন্তু কিশোরী ফাঁদে পা দেওয়া দূরে থাকুক, সেদিকে ঘেঁষিলও না দেখিয়া সুশীলা বড় নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল।

কাগজ কলম তুলিয়া রাখিয়া সে স্বামীর ভাত বাড়িয়া দিল। একপ্রকার চুপচাপ অবস্থায় আহারাদি শেষ করিয়া কিশোরী গিয়া শয্যা আশ্রয় করিবার পর, সে নিজে অহারাদি করিয়া শুইতে গিয়া দেখিল কিশোরী ঘুমায় নাই, গরমে এ-পাশ ও-পাশ করিতেছে। আশায় বুক বাঁধিয়া সে তাহার দ্বিতীয় ফাঁদটি পাতিল।

—একটা গল্প বলো না? অনেকদিন তো বলনি, বলবে লক্ষ্মীটি।...

বিবাহের প্রথম প্রথম কিশোরী তাহার কিশোরী স্ত্রীর নিকট বটতলার আরব্য উপন্যাস হইতে নানা গল্প বলিত। রাত্রির পর রাত্রি তখন এ-সব গল্প শুনিয়া সুশীলা মুগ্ধ হইয়া যাইত। জনহীন দেশের মধ্যে যেখানে শুধু জীন-পরিদের জগৎ...খেজুর বনের মধ্যে ঠাণ্ডা জলের ফোয়ারা হইতে মণিমুক্তা উৎক্ষিপ্ত হইতেছে...পথহীন দুরন্ত মরুপ্রান্তরে মৃত্যু যেখানে শিকার সন্ধানে ওত পাতিয়া বসিয়া আছে, সমুদ্রের ঝড়... তরুণ শাহ্‌জাদাগণের দৈত্যসংকুল অরণ্যের মাঝখান দিয়া নির্ভীক শিকারযাত্রা—এ-সব শুনিতে শুনিতে তাহার গা শিহরিয়া উঠিত, ঘুম ভাঙিলে ঘরের মধ্যে অর্ধরাত্রির অন্ধকার বিকটাকার জীনদেহের ভিড়ে ভরিয়া গিয়াছে মনে করিয়া ভয়ে সে স্বামীকে জড়াইয়া ধরিত। প্রাচীন যুগের অরুণ শাহ্‌জাদাদের কল্পনা করিতে গিয়া অজ্ঞাতসারে সে নিজের স্বামীকে যাত্রার দলের রাজার পোশাক পরাইয়া দূরদেশে বিপদের মুখে পাঠাইত, শাহ্‌জাদাদিগের দুঃখে তাহার নিজের স্বামীর উপর সহানুভূতিতেই তাহার চোখে জল আসিত। এই রকম গল্প শুনিতে শুনিতে অদৃশ্য নায়কনায়িকাদের গুণ দৃশ্যমান গল্প-কারের উপরে প্রয়োগ করিয়া সে স্বামীকে প্রথম ভালবাসে। সে আজ পাঁচ ছয় বৎসরের কথা, কিন্তু সুশীলার এখনও সে ঘোর কাটে নাই।

কিশোরী স্ত্রীর কথা উড়াইয়া দিল—হ্যাঁ, এখন গল্প বলবো। সমস্ত দিন খেটেখুটে এলাম, এখন রাত-দুপুরে বকবক করি আর কি। তোমাদের কি? বাড়ি বসে' সব পোষায়।

অন্য মেয়ে হইলে চুপ করিয়া যাইত। সুশীলার মেজাজ ছিল একগুঁয়ে। সে আবার বলিল, তা হোক, একটা বলো, রাত এখন তো বেশী নয়...

—না বেশী নয়—তোমার তো রাত কম বেশীর জ্ঞান কত! নাও, চুপচাপ শুয়ে পড় এখন!...

সুশীলা এইবার জিদ ধরিল—বলো না একটা, ছোট দেখেই না হয় বলো—এত করে বলছি একটা কথা রাখতে পারো না?

কিশোরী বিরক্ত হইয়া বলিল—আঃ! এ তো বড় জ্বালা হ'ল। রাতেও একটু ঘুমুবার যো নেই—সমস্তদিন তো গলাবাজিতে বাড়ি সরগরম রাখবে, রাত্তিরটাও একটু শান্তি নেই?

এইটাই ছিল সুশীলার ব্যথার স্থান। স্বামারী মুখে একথা শুনিয়া সে ক্ষেপিয়া গেল—বেশ করি গলাবাজি করি, তাতে অসুবিধা হয় আমাকে পাঠিয়ে দাও এখান থেকে —রাত দুপুর করলে কে! নিজে আসবেন রাত দুপুরের সময় আড্ডা দিয়ে—কে এত রাত পর্যন্ত ভাত নিয়ে ব'সে থাকে? নিজেরই দেহ, পরের আর তো দেহ না। খেটেখুটে এসে একেবারে রাজা করেছেন আর কি? নিজেরই খাটুনিটাই কেবল...

কিশোরী ঘুমাইবার চেষ্টা পাইতেছিল, স্ত্রীর উত্তরোত্তর চড়া সুরে তাহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল—উঠিয়া বসিয়া প্রথমে সে স্ত্রীর পিঠে সজোরে ঘা-কতক পাখার বাঁট বসাইল, তাহার পর তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া বিছানার উপর হইতে নামাইয়া ধাক্কা মারিয়া

ঘরের বাহির করিয়া দিল, বলিল—বেরো, ঘর থেকে বেরো, আপদ—দূর হ—রাত দুপুরেও একটু শান্তি নেই—যা বেরো…যেখানে খুশি যা…

ঘরের আলোর কাছে আসিয়া কিশোরী দেখিল, স্ত্রী দুই হাতের নখ দিয়া আঁচড়াইয়া তাহার হাতের আঙুলগুলিতে রক্তপাত করিয়া দিয়াছে।

ইরাণী শাহ্জাদাগণের নজীর না থাকিলেও কিশোরী মধ্যে মধ্যে দুরন্ত স্ত্রীর প্রতি এরূপ ঔষধি প্রয়োগ করিত।

শেষ-রাত্রে একাদশীর জ্যোৎস্নায় চারিদিক যখন ফুলের পাপড়ির মত সাদা, ভোর রাত্রের বাতাস নেবু-ফুলের গন্ধে আর পাপিয়ার গানে মাখামাখি, সুশীলা তখন ঘরের দোরের বাহিরে আঁচল পাতিয়া অকাতরে ঘুমাইতেছিল।

সকাল হইলে যে-যার কাজে মন দিল। মোক্ষদা বলিলেন—বউমা, আজ চৌধুরীরা শিবতলায় পুজো দিতে যাবে, আমদের যেতে বলেছে, সকাল-সকাল সেরে নাও।

এই চৌধুরীটি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে রামতনু মুখুয্যের প্রতিপালক, ইঁহারাই গ্রামের জমিদার এবং ইঁহাদেরই জমি-জমা সংক্রান্ত মকদ্দমার তদ্বির ও সাহায্য করিয়া রামতনু অন্নসংস্থান করিতেন।

বেলা দশটার মধ্যে আহারাদি শেষ করিয়া ভাল কাপড় পরিয়া সকলে নৌকায় উঠিল—দুই ঘণ্টার পথ। চৌধুরী-বাড়িতে কলিকাতা হইতে একটি বউ আসিয়াছিল। তাহার স্বামী বড়লোকের ছেলে, এম-এ পাস করিয়া বছর-দুই হইল ডেপুটিগিরি চাকরি পাইয়াছে। বউটি কলিকাতার মেয়ে, চৌধুরীদের সহিত তাহার স্বামীর কিরূপ সম্পর্ক আছে, এজন্য চৌধুরীগৃহিণী রাসপূর্ণিমার সময় তাহাকে আনাইয়াছিলেন। ইতিপূর্বে সে কখনো পাড়াগাঁয়ে আসে নাই। নৌকায় খানিকটা বসিয়া থাকিবার পর বউটি দেখিল, নীলাম্বরী কাপড় পরনে তাহারই সমবয়সী আর-একটি বউ নৌকায় উঠিল। নৌকা ছাড়িয়া দিল, নৌকায় সমবয়সী সঙ্গিনী পাইয়া কলিকাতার বউটি খুব সন্তুষ্ট হইলেও প্রথমে আলাপ করিতে বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল। সঙ্গিনীর কাপড়-চোপড় পরিবার অগোছাল ধরন দেখিয়া বউটি বুঝিয়াছিল তাহার সঙ্গিনী নিতান্ত পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, অবস্থাও খুব ভাল নয়। নৌকার ও-ধারে চৌধুরীগৃহিণী মোক্ষদার সহিত সাবিত্রী-ব্রত প্রতিষ্ঠার কি আয়োজন করিয়াছেন, তাহারই বিস্তৃত বড়মানুষী ফর্দ আবৃত্তি করিতেছিলেন। নৌকায় কোন পরিচিতা মেয়েও নাই, কাজেই বউটি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বউটি লেখাপড়া জানিত এবং দেশ-বিদেশের খবরাখবরও কিছু কিছু রাখিত—চৌধুরীগৃহিণীর একঘেয়ে বড়মানুষী চালের কথাবার্তায় সে বড় বিরক্ত হইয়া উঠিল। খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর, সে লক্ষ্য করিল তাহার সঙ্গিনী ঘোমটার ভিতর হইতে কালো-কালো ডাগর চোখে তাহার দিকে সকৌতুকে চাহিতেছে। বউটির হাসি পাইল, জিজ্ঞাসা করিল—তোমার নাম কি ভাই?

সুশীলা সন্দিগ্ধসুরে বলিল—শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী দেবী।

সুশীলার রকম-সকম দেখিয়া বউটির খুব হাসি পাইতে লাগিল। সে বলিল—অত ঘোমটা কিসের ভাই? তুমি আর আমি ছাড়া তো আর কেউ এদিকে নেই, নাও এস, ঘোমটা খোল, একটু গল্প করি।

এই কথা বলিয়া বউটি নিজেই সুশীলার ঘোমটা খুলিয়া দিল—সুশীলার সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া সে যেন মুগ্ধ হইয়া গেল ; রং যদিও ততটা ফরসা নয়, কিন্তু কালোর উপর অত শ্রী সে কখনো দেখে নাই, নদীর ধারের সরস সতেজ চিক্কণ শ্যাম-কলমী-লতারই মত একটা সবুজ লাবণ্য যেন সারা মুখখানায় মাখানো। মুখখানি দেখিয়াই সে এই নিরাভরণা পাড়াগাঁয়ের মেয়েটিকে ভালবাসিয়া ফেলিল। জিজ্ঞাসা করিল—

উনি বসে আছেন কে ভাই, শাশুড়ী?

—হ্যাঁ।

—এস, আর একটু সরে এস ভাই, দুজনে গল্প করি আর দেখতে দেখতে যাই। তোমার বাপের বাড়ি কোথায় ভাই?

সুশীলার ভয় কাটিয়া যাইতেছিল, সে বলিল—সে হ'ল শিমলে।

—কোন্ শিমলে? কালকাতা শিমলে?

কলকাতায় শিমলে আছে নাকি? কৈ তাহা তো সুশীলা কোনদিন শোনে নাই। সে বলিল—আমার বাপের বাড়ি এখান থেকে রেশী দূর নয়, পাঁচ ছ'কোশ পথ, গরুর গাড়ি করে যেতে হয়।

নদীর ধারে যবক্ষেত, সর্ষেক্ষেত, বুনো গাছপালা দেখিয়া বউটি খুব খুশি। এ-সব সে পূর্বে বড় দেখে নাই, আঙুল দিয়া একটা মাছরাঙা পাখী দেখাইয়া বলিল—বাঃ বড় সুন্দর তো! ওটা কি পাখী ভাই?

—ওটা তো মাছরাঙা পাখী, কেন তুমি দেখনি কখনো?

বউটি বলিল—ভাই, আমি কলকাতার বাইরে অ্যাদ্দিন পা দিইনি, খুব ছেলেবেলা একবার বাবার সঙ্গে চন্দননগরে বাগানবাড়িতে যাবার কথা মনে আছে, তারপর এই আসছি—তুমি আমায় একটু দেখিয়ে নিয়ে চল। ওটা কিসের ক্ষেত ভাই?

সুশীলা দেখিল তাহার সঙ্গিনী আঙুল দিয়া নদীর ধারের একটা মৌরীর ক্ষেত দেখাইতেছে—প্রথমটা সে সঙ্গিনীর চোখ-ঝল্‌সানো রং অদৃষ্টপূর্ব দামী সিল্কের শাড়ি, ব্লাউজ এবং চিক্‌চিকে নেক্‌লেসের বাহার দেখিয়া যে ভয় অনুভব করিতেছিল, তাহার অজ্ঞতা দেখিয়া সুশীলার সে ভয় কাটিয়া অজ্ঞ-সঙ্গিনীর উপর একটু স্নেহ আসিল—কলিকাতায় মাছরাঙা পাখী, মৌরীক্ষেত, এ-সব সামান্য জিনিসও নাই নাকি? সুশীলা হাসিয়া বলিল—তুমি ফুলের গন্ধ দেখে বুঝতে পার না ভাই? ও তো মৌরীর ক্ষেত। কেন, আমাদের বাপের বাড়ির গাঁয়ে কত তো মৌরীর ক্ষেত আছে—মৌরীর শাক কখনো খাওনি? কল্‌কাতায় বুঝি নেই?

কলিকাতার বউটি বুঝাইয়া দিল যে কলিকাতার অতীত ইতিহাসের সে খবর রাখে না, বর্তমান অবস্থায় সেখানে মৌরীক্ষেত প্রভৃতি থাকা সম্ভবপর নয়, তবে ভবিষ্যতে কি হয় বলা যায় না।

ঘণ্টাখানেক পরে যখন নৌকা শিবতলার ঘাটে গিয়া লাগিল, তখন তাহাদের দুজনের মধ্যে অনেক ঘনিষ্ঠ রকমের কথাবার্তা হইয়া গিয়াছে। সঙ্গিনীর মুখে স্বামীর আদরের গল্প শুনিয়া সুশীলার মনের মধ্যে একটা গোপন ব্যথা জাগিয়া উঠিল—সেটা সে অনবরত চাপিবার চেষ্টা করে, তবু কি জানি কেন সেটা ফাঁক পাইলেই মাথা তোলে! প্রথম বিবাহের পর তাহার স্বামীও তো তাহাকে কত আদর করিত, রাত্রে ঘুমাইতে না দিয়া নানা গল্পে ভুলাইয়া জাগাইয়া রাখিত, সুশীলা পান খাইতে চাহিত না বলিয়া কত সাধ্যসাধনা করিয়া পান মুখে তুলিয়া দিত—সেই স্বামী তাহার কেন এমন হইল? তাহার বুকটার মধ্যে কেমন হু হু করিয়া উঠিল।

দুজনে তাহারা খানিকক্ষণ গাছের ছায়ায় নদীর ধারে এদিক ওদিক বেড়াইল, কি সুন্দর দেখায় চারিদিক!...নীল আকাশ সবুজ মাঠের উপর কেমন উপুড় হইয়া আছে। ...ওমা, পানকৌড়ির ঝাঁক চরের উপর বসিয়া কেমন ঝিমায়!...

কলিকাতার বউটি বলিল—এস ভাই, আমরা একটা কিছু পাতাই। কেমন?

সুশীলা খুশি হইয়া বলিল—খুব ভাল ভাই, কি পাতাব বলো...

—এক কাজ করি এস—আসতে আসতে নদীর ধারে যে মৌরীফুল দেখে এলাম,

এস আমরা দুজনে পাতাই। কেমন ?

সুশীলা আহ্লাদের সঙ্গে এ প্রস্তাবে সম্মতি দিল। নদী হইতে অঞ্জলি করিয়া জল তুলিয়া তাহারা মৌরীফুল পাতাইল।

এমন সময় মোক্ষদা ডাকিলেন—বউমারা এদিকে এস।

তাহারা গিয়া দেখিল গাছতলায় অনেক লোক—সেদিন পুজা দিতে অনেক লোক আসিয়াছিল। প্রকাণ্ড বটগাছ, তাহার তলায় ভাঙা ইঁটের মন্দির। গাছতলা হইতে একটু দূরে এক বুড়ী নানা ঔষধ বিক্রয় করিতেছে। সুশীলা ও তাহার সঙ্গিনী সেখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, রোগ সারা, ছেলে হওয়া হইতে শুরু করিয়া সকল রকমের ঔষধই আছে, গরু হারাইলে খুঁজিয়া বাহির করিবার পর্যন্ত। মেয়েরা সেখানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ঔষধ কিনিতেছে। সুশীলার সঙ্গিনী হাসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে সেখান হইতে মন্দিরের দিকে লইয়া চলিল, বলিল—চলো মৌরীফুল, দেখিগে কেমন পুজো হচ্ছে।

একটুখানি মন্দিরে দাঁড়াইয়া সুশীলা একটা ছুতায় সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ঔষধ-বেচা বুড়ীর নিকট দাঁড়াইল। সেখানে তখন কেহ ছিল না, বুড়ী বলিল—কি চাই।

সুশীলার মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল।

বুড়ী বলিল—আর বলতে হবে না মা-ঠাক্রুণ। তা তোমার তো এখনও ছেলে-পিলে হবার বয়েস যায় নি, ও বয়েসে অনেকের···

সুশীলা সলজ্জভাবে বলিল—তা নয়।

বুড়ী বলিল—এবার বুঝলাম মা-ঠাক্রুণ—তা যদি হয়, তা হ'লে তোমার সোয়ামীর বারমুখো টান আছে। একটা ওষুধ দিই, নিয়ে যাও, একমাসের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে—ও-রকম সব ঠিক হয়ে যাবে—ও-রকম কত হয় মা-ঠাক্রুণ···

বুড়ী একটা শিকড় তুলিয়া বলিল—এই নাও, বেটে খাইয়ে দিও। যেন কেউ টের না পায়, টের পেলে আর ফল হবে না। আট আনা লাগবে।

স্বামীর বার-মুখো টান আছে—একথা শুনিয়া সুশীলা খুব দমিয়া গেল। তাহার আঁচলে একটা আধুলী বাঁধা ছিল, আজকার দিনে জিনিসটা-আসটা কিনিবার জন্যে সে ইহা বাড়ি হইতে শাশুড়ীকে লুকাইয়া আনিয়াছিল। বাড়ির বার হওয়া তো বড় ঘটে না, কাজেই এটা তাহার পক্ষে একটা উৎসবের দিন। আধুলীটি শাশুড়ীকে লুকাইয়া আনিবার কারণ—মোক্ষদা ঠাকরুণ জানিতে পারিলে ইহা এতক্ষণ তাহার আঁচলে থাকিত না। সুশীলা আঁচল হইতে আধুলীটি খুলিয়া বুড়ীকে দিল এবং খাওয়াইবার প্রণালী জানিয়া লইয়া শিকড়টি কাপড়ের মধ্যে গোপনে বাঁধিয়া লইল।

পুজো দেওয়া সাঙ্গ হইয়া গেল। সকলে আবার আসিয়া নৌকায় উঠিল। গ্রামের ঘাটের কছাকাছি আসিলে সুশীলা বলিল—ভাই, তুমি এখন দিনকতক আছ তো ?

—না ভাই, আমি কাল কি পরশু চলে যাব। তা হ'লেও তোমায় ভুলবো না মৌরী-ফুল, তোমার মুখখানি আমার মনে থাকবে ভাই—চিঠি-পত্র দেবে তো ? এবার পাড়াগাঁয়ে এসে তোমায় কুড়িয়ে পেলাম—তোমায় কখনো ভুলবো না।

সুশীলার চোখে জল আসিল, এত মিষ্টি কথা তাহাকে কে বলে ? সে কেবল শুনিয়া আসিতেছে সে দুষ্টু, একগুঁয়ে ঝগড়াটে।

তাহার হাতে একটি সোনার আংটি ছিল, ইহা তাহার মায়ের দেওয়া আংটি. বিবাহের পর প্রথম তাহার মা তাহার হাতে এটি পরাইয়া দিয়াছিলেন। সেটি হাত হইতে খুলিয়া সে সঙ্গিনীর হাত ধরিয়া বলিল—দেখি ভাই তোমার আঙুল. তুমি হ'লে মৌরীফুল.

তোমায় খাওয়াবার কথা, কাপড় দেওয়ার কথা—এই আংটিটা আমার মায়ের দেওয়া, তোমায় দিলাম, তবু এটা দেখে তুমি গরীব মৌরীফুলকে ভুলে যাবে না।

সুশীলা আংটিটা সঙ্গিনীর হাতে পরাইয়া দিতে গেল,—বউটি চট করিয়া হাত টানিয়া লইয়া বলিল—দূর পাগল! না ভাই এ রাখো—তোমার মায়ের দেওয়া আংটি—এ কেন আমায় দিতে যাবে? না ভাই···

সুশীলা জোর করিতে গেল—হোক ভাই, দেখি—মায়ের দেওয়া বলেই···

বউটি বলিল—দূর! না ভাই ও-সব রাখো—সে বরং···

সুশীলা খুব হতাশ হইল। মুখটি তাহার অন্ধকার হইয়া গেল—সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গ্রামের ঘাটে নৌকা লাগিল। বউটি সুশীলার হাত ধরিয়া বলিল—পায়ে পড়ি ভাই মৌরীফুল, রাগ কোরো না। আচ্ছা, কেন তুমি শুধু শুধু তোমার মায়ের দেওয়া আংটি আমায় দিতে যাবে ভাই? আচ্ছা, তুমি যদি দিতেই চাও এই পুজোর সময় আসবো—অন্য কিছু বরং দিও—একদিন না হয় খাইয়ো—আংটি কেন দেবে ভাই! —আর আমায় ভুলবে না তো ভাই?

সুশীলা ব্যগ্রভাবে বলিল—তোমায় ভুলবো না ভাই মৌরীফুল! কখ্খোনো না—তুমি কোন্ জন্মে যে আমার মায়ের পেটের বোন ছিলে ভাই মৌরীফুল···

তাহার পরে সে একটু আনাড়ি ধরনে হাসিয়া উঠিল—হিঃ হিঃ হিঃ! কেমন সুন্দর কথাটি—মৌরীফুল—মৌরীফুল—মৌরীফুল—তুমি যে হ'লে গিয়ে আমার নদীর ধারের মৌরীফুল—তোমায় কি ভুলতে পারি?···

কথা শেষ না করিয়াই সে দুই হাতে সঙ্গিনীর গলা জড়াইয়া ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার কালো চোখ দুটি জলে ভরিয়া গেল।

কলিকাতার বউ এই অদ্ভুত প্রকৃতির সঙ্গিনীর অশ্রুপ্লাবিত সুন্দর মুখখানা বার বার সস্নেহে চুম্বন করিল—তারপর দুজনেই চোখের জলে ঝাপ্সাদৃষ্টি লইয়া দুজনের কাছে বিদায় লইল।···

দিন কতক কাটিয়া গেল। কিশোরী বাটী নাই, কি একটা কাজে অন্য গ্রামে গিয়াছে, ফিরিতে দু'একদিন দেরী হইবে। মোক্ষদা সকালে উঠিয়া জমিদার-গৃহিণীর আহ্বানে তাঁহার সাবিত্রী-ব্রত প্রতিষ্ঠার আয়োজনে সাহায্য করিতে চৌধুরী-বাড়ি চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—বউমা আমার ফেরবার কোনো ঠিক নেই, রান্নাবান্না করে' রেখো, আমি আজ আর কিছু দেখতে পারব না, চৌধুরী-বাড়ির কাজ—কখন মেটে বলা যায় না।

একথা মোক্ষদার না বলিলেও চলিত। কারণ ভোরে উঠিয়া বাসন-মাজা, জল-তোলা হইতে আরম্ভ করিয়া এ সংসারের সমস্ত কাজের ভারই ছিল সুশীলার উপর। এ সংসারে কিশোরীর বিবাহের পর কোনো দিন ঝি-চাকর প্রবেশ করে নাই—যদিও পূর্বে বাড়িতে বরাবরই একজন করিয়া ঝি থাকিত। সুশীলার খাটুনিতে কোন ক্লান্তি ছিল না, খাটিবার ক্ষমতা তাহার যথেষ্ট ছিল—যখন মেজাজ ভাল থাকিত, তখন সমস্ত দিন নীরবে ভূতের মত খাটিয়াও সে বিরক্ত হইত না।

শাশুড়ী চলিয়া গেলে অন্যান্য কাজকর্ম সারিয়া সুশীলা রান্নাঘরে গিয়া দেখিল একখানিও কাঠ নাই। কাঠ অনেক দিনই ফুরাইয়া গিয়াছে, এ-কথা সুশীলা বহুবার শ্বশুরকে জানাইয়াছে। রামতনু মধ্যে মধ্যে মজুর ডাকাইয়া কাঠ কাটাইয়া লইতেন, এবার কিন্তু অনেক দিন হইল তিনি আর এদিকে দৃষ্টি দেন নাই, কিশোরীর দোষ নাই, কেন না সে বড় একটা বাড়িতে থাকিত না, সংসারের সংবাদ তেমন রাখিতও না। আসল কথা হইতেছে এই যে রান্নাঘরের পিছন খিড়কির বাহিরে অনেক শুকনা বাঁশ ও ডালপালা

পড়িয়া আছে—সুশীলা রান্না চড়ানোর পূর্বে বা রান্না করিতে করিতে প্রয়োজন মত এগুলি দা দিয়া কাটিয়া লইয়া কাজ চালাইত। রামতনু দেখিলেন, কাজ যখন চলিয়া যাইতেছে তখন কেন অনর্থক কাঠ কাটিবার লোক ডাকিয়া আনা—আনিলেই এখনই একটা টাকা খরচ তো? পুত্রবধূ বকিতেছে বকুক, কারণ বকুনিই উহার স্বভাব।

কাঠ নাই দেখিয়া সুশীলা অত্যন্ত চটিয়া গেল। এদিকে বাড়িতেও এমন কেহ নাই যাহাকে বকিয়া গায়ের ঝাল মিটায়, কাজেই সে আপন মনে চীৎকার করিতে লাগিল—পারবো না, রোজ রোজ এমন করে' সংসার করা আমায় দিয়ে হয়ে উঠবে না—আজ দুমাস ধরে' বলছি কাঠ নেই, কাঠ নেই—এদিকে রান্নার বেলা ঠিক আছেন সব, তার একটু এদিক-ওদিক হবার যো নেই—কি দিয়ে রাঁধবে? হাত পা উনুনের মধ্যে দিয়ে রাঁধবে নাকি? রোজ কাঠ কাটো, কেটে রাঁধো—অত সুখে কাজ নেই—থাক্‌লো হাঁড়ি পড়ে', যিনি যখন আসবেন, তিনি তখন করে' নেবেন···

রাঁধিবার কোন আয়োজন সে করিল না। খানিকটা বসিয়া বসিয়া তাহার মনে হইল ততক্ষণ মশলাগুলো বাটিয়া রাখা যাক্। সে মাঝে মাঝে কাজের সুবিধার জন্যে কয়েক-দিনের মশলা একসঙ্গে বাটিয়া রাখিত।

বেলা প্রায় দশটার সময় একটি অল্পবয়সী ফুটফুটে বউ, পরনে একখানা চেলীর কাপড়, হাতে থাকিবার মধ্যে দুগাছি শাঁখা—একটি বাটি হাতে রান্নাঘরের দোরের কাছে ভয়ে ভয়ে উঁকি মারিয়া বলিল—দিদি আছ নাকি?

সুশীলা মশলা বাটিতে বাটিতে মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল—আয় আয় ছোট বউ—আয় না ঘরের মধ্যে—ঠাকরুণ নেই···

বউটি ঘরে ঢুকিয়া বলিল—একি দিদি, এত বেলা হ'ল এখনও রান্না চড়াওনি যে!

সুশীলা মুখ ঘুরাইয়া বলিল—রান্না চড়াব! হাঁড়ি-কুড়ি ভেঙে ফেলি নি এই কত!···

বউটির চোখে ভয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল, সে বলিল—না দিদি, ও-সব কিছু কোরো না, ভাত চড়িয়ে দাও লক্ষ্মীটি, নইলে জান তো কি রকম লোক সব···

—দেব—দেখবে সব আজ কি রকম মজা, রোজ রোজ কাঠ কাটবো আর ভাত রাঁধবো, উঃ!

—কাঠ নেই বুঝি? আচ্ছা, দা-খানা দাও দিদি, আমি দিচ্ছি কেটে।

—তোর কি দায় তুই দিতে যাবি? বোস ঠাণ্ডা হয়ে—যাদের গরজ আছে তারা নিজেরা বুঝুক গিয়ে···

—তোমার পায়ে পড়ি দিদি, দাও রান্নাটা চড়িয়ে, জান তো ওরা···

—তুই বোস দেখি ওখানে চুপ ক'রে, দেখিস এখন মজা—আজ দুমাস ধরে রোজ কাঠ নেই, কথা কানে যায় না কারুর—আজ মজাটি দেখাবো···

সুশীলার একগুঁয়েমিতে বউটি কিছু ভীতা হইল, কারণ মজা কোন্ পক্ষ দেখিবে এ সম্বন্ধে তাহার একটু সন্দেহ ছিল। কিন্তু সাহস করিয়া আর কিছু বলিতে না পারিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

এই বউটি রামতনু মুখুয্যের জ্যাঠতুত ভাই রামলোচন মুখুয্যের পুত্রবধূ। পাশেই এদের বাড়ি। রামলোচনের অবস্থা খুবই খারাপ—তা সত্ত্বেও তিনি বছর দুই হইল ছেলের বিবাহ দিয়াছেন—রামলোচনের স্ত্রী ছিল না, পুত্রবধূই গৃহিণী। দুরবস্থার সংসারে ছেলেমানুষ বউকে সংসার করিতে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইত। সে সময়ে-অসময়ে বাটি হাতে খুঁচি হাতে এ বাড়িতে হাত পাতিয়া তেলটা নুনটা লইয়া যাইত, চাউল না থাকিলে আঁচলে করিয়া চাউল লইয়া যাইত—ধার বলিয়াই লইয়া যাইত—কখনও শোধ করিতে পারিত, কখনও পারিত না।

মোক্ষদা ঠাকরুণকে বউটি বড় ভয় করে—তিনি থাকিলে জিনিসপত্র তো দেনই না, যদি বা দেন তাহা বহু মিষ্ট বাক্যবর্ষণ করিবার পর। তবু বউটির আসিতে হয়, কি করিবে, অভাব। সুশীলা তাহাকে মোক্ষদা ঠাকরুণের হাত হইতে বাঁচাইয়া গোপনে এটা ওটা যখন যাহা দরকার সাধ্যমত সাহায্য করিত। সামান্য একবাটি তেল লইয়া গেলেও হুঁশিয়ার মোক্ষদা ঠাকরুণ তাহা কখনও ভুলিতেন না—গলা টিপিয়া কড়া-ক্রান্তিতে তাহা আদায় করিয়া ছাড়িতেন। সুশীলা ছিল অগোছালো ও অন্যমনস্ক-ধরনের মানুষ, সে ধার দিয়া অত-শত মনেও রাখিত না, বা সামান্য তেল নুন ধার দিয়া আদায় করিবার কোন চেষ্টাও করিত না—শোধ দিতে আসিলে অনেক সময় বলিত—ওই তুই আবার দিতে এলি কেন ভাই ছোট বউ, ওর আবার নেব কি ? যা, ও তুই নিয়ে যা ভাই।

সুশীলা আপন মনে খানিকক্ষণ বকিয়া বউটির দিকে চাহিয়া বলিল—তারপর, তোর রান্নাবান্না ?

বউটি বাটিটা আঁচল দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, বাহির করিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিল—সেদিনকার সেই তেল নিয়ে গিয়েছিলাম দিদি, তা আমাদের এখনও আনা হয় নি। আজ রাঁধবার তেল নেই—একসঙ্গে দুদিনের দিয়ে যাবো—সেইজন্যে···

সুশীলা বলিল—আচ্ছা, নিয়ে আয় দেখি বাটি। দেখি কি আছে, আমাদেরও বুঝি তেল আনা হয় নি।

পাত্রে যতটুকু তেল ছিল সুশীলা সবটুকু এই কুণ্ঠিতা দরিদ্রা গৃহলক্ষ্মীটিকে ঢালিয়া দিল। বউটি চলিয়া যাইবার সময় মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—লক্ষ্মী দিদি, দাও রান্না চড়িয়ে···

সুশীলা বলিল—তুই পালা দেখি—আমি ওদের মজা না দেখিয়ে আজ আর কিছুতেই ছাড়ছি নে···

বেলা বারোটার সময় মোক্ষদা ঠাকরুণ আসিয়া শুনিয়া হইচই বাধাইয়া দিলেন। প্রকৃতই ইহাতে রাগ হইবার কথা। একটু পরে রামতনু আসিলেন, তিনি ব্যাপার দেখিয়া দালানে গিয়া আপন মনে তামাক টানিতে শুরু করিলেন। ঝগড়া ক্রমে খুব চাগাইয়া উঠিল, মোক্ষদা উচ্চৈস্বরে সুশীলার কুলজি গাহিতে লাগিলেন।—সুশীলাও যে খুব শান্তশিষ্ট, এ অপবাদ তাহাকে শত্রুতেও দিতে পারিত না, কাজেই ব্যাপার যখন খুব বাধিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় কোথা হইতে কিশোরী আসিয়া হাজির হইল—যদিও আজ তাহার ফিরিবার কথা ছিল না, তবুও কাজ মিটিয়া যাওয়াতে সে আর সেখানে অপেক্ষা করে নাই। মোক্ষদা ছেলেকে পাইয়া হাঁকডাক আরও বাড়াইয়া দিলেন। কিশোরী এত বেলায় বাড়ি আসিয়া এ অশান্তির মধ্যে পড়িয়া অত্যন্ত চটিয়া গেল—তাহার সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল স্ত্রীর উপর। হাতের গোড়ায় একখানা শুকনো চেলা-কাঠ পড়িয়াছিল, সেইটা লইয়াই লাফাইয়া সে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিল। সুশীলা তখনও বসিয়া বাটনা বাটিতেছিল—স্বামীকে শুকনো কাঠ হাতে লইয়া বীরদর্পে রান্নাঘরে লাফাইয়া উঠিতে দেখিয়া ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল—আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া হাত দুইটা তুলিয়া নিজের দেহটা আড়াল করিবার চেষ্টা করিল—কিশোরী প্রথমতঃ স্ত্রীর খোঁপা ধরিয়া এক হেঁচকা টান দিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল, তারপর তাহার পিঠে কয়েক ঘা চেলা-কাঠের বাড়ি মারিয়া তাহার গলা ধরিয়া প্রথমে এক ধাক্কা মারিল রান্না-ঘরের দাওয়ায় এবং তথা হইতে এক ধাক্কা দিল একেবারে উঠানে। ধাক্কার বেগ সামলাইতে না পারিয়া সুশীলা মুখ থুবড়িয়া উঠানে পড়িয়া গেল—মার আরও চলিত, কিন্তু রামতনু তামাক খাইতে খাইতে ছেলের কাণ্ড দেখিয়া হাঁ হাঁ করিয়া আসিয়া পড়িলেন।

পাশের বাড়ির বউটি তখন শ্বশুর ও স্বামীকে খাওয়াইয়া সবে নিজে খাইতে

বসিতেছিল, হঠাৎ এ-বাড়ির মধ্যে মারের শব্দ শুনিয়া সে খাওয়া ফেলিয়া সুশীলাদের খিড়কিতে ছুটিয়া আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল—সুশীলা উঠানে দাঁড়াইয়া আছে; সর্বাঙ্গে ধুলা, বাটনার পাত্রের উপর পড়িয়া গিয়াছিল, কাপড়ে চোপড়ে হলুদের ছোপ; মাথার খোঁপা একধারে খুলিয়া কতক চুল মুখের উপর কতক পিঠের উপর পড়িয়াছে; গাঙ্গুলী-বাড়ি হইতে দুটো ছেলে ব্যাপার দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছে, আরও দু-একজন পাড়ার মেয়ে সামনের দরজা দিয়া উঁকি মারিতেছে—ওদিকে পাঁচিলের উপর দিয়া মুখ বাড়াইয়া নিজের শ্বশুর রামলোচন মজা দেখিতেছেন।

চারিদিকের কৌতূহলদৃষ্টির মাঝখানে, সর্বাঙ্গে হলুদের ছোপ ও ধুলিমাখা বিস্রস্ত-কুন্তল, অপমানিতা দিদিকে অসহায়ভাবে উঠানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার বুকের মধ্যে কি-রকম করিয়া উঠিল—কিন্তু সে একে ছেলেমানুষ তাহাতে অত্যন্ত লজ্জাশীলা শ্বশুর ভাসুর এবং এক-উঠান লোকের মধ্যে বাড়ির ভিতর ঢুকিতে না পারিয়া প্রথমটা সে খিড়কির বাহিরে আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল, কিন্তু গাঙ্গুলী-বাড়ীর প্রৌঢ় গাঙ্গুলী মহাশয়ও যখন হুঁকা হাতে—কি হে রামতনু, বলি ব্যাপারখানা কি শুনি—বলিয়া বাড়ির মধ্যের উঠানে আসিয়া হাজির হইলেন, তখন সে আর থাকিতে না পারিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং সুশীলার হাত ধরিয়া খিড়কিদোর দিয়া বাহিরে লইয়া গিয়াই হঠাৎ ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, বলিল—কেন ও-রকম করতে গেলে দিদিমণি, লক্ষ্মীটি, তখনই যে বারণ করলাম?...

তার পরদিন দুপুরবেলা সুশীলা রান্নাঘরে রাঁধিতেছিল। কিশোরী খাইতে বসিয়াছে, মোক্ষদা ঠাকরুণ কি প্রয়োজনে রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, সুশীলা পিছনে ফিরিয়া ভাত বাড়িতে বাড়িতে স্বামীর ডালের বাটিতে কি গুলিতেছে, পাশে একটা ছোট বাটি। মোক্ষদার কি-রকম সন্দেহ হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—বউমা, তোমার বাটিতে কি? —কি মেশাচ্ছ বাটিতে?

সুশীলা পিছন ফিরিয়াই শাশুড়ীকে দেখিয়া যেন কেমন হইয়া গেল। তাহার চোখ-মুখের ভাব দেখিয়া মোক্ষদার সন্দেহ আরও বাড়িল—তিনি বাটিটা হাতে তুলিয়া লইয়া দেখিলেন তাহাতে সবুজ মত কি একটা বাটা।

তিনি কড়াসুরে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বেটেছ এতে?

তিনি দেখিলেন পুত্রবধূ উত্তর দিতে পারিতেছে না, তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে।

ইহার পর একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটিল। মোক্ষদা ঠাকরুণ বাটি হাতে—ওমা কি সর্বনাশ! আর একটু হ'লেই হয়েছিল গো,—বলিয়া উঠানে আসিয়া চীৎকার করিয়া হাট বাধাইলেন।

কিশোরী দালান হইতে উঠিয়া আসিল, রামতনু আসিলেন, গাঙ্গুলীবাড়ির মেয়ে-পুরুষ আসিল, আরও অনেকে আসিল।

মোক্ষদা সকলের সামনে সেই বাটিটা দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, দ্যাখো তোমরা সকলে, তোমরা ভাব শাশুড়ী-মাগী বড় দুষ্টু—নিজের চোখে দেখে নাও ব্যাপার, কি সর্বনাশ হয়ে যেত এখনি, যদি আমি না দেখতাম—দোহাই বাবা তারকনাথ, কি ঠেকানই আজ ঠেকিয়েছ...

এক-উঠান লোক—সকলেই শুনিল রামতনুর দুরন্ত পুত্রবধূ স্বামীর ভাতে বিষ না কি মিশাইয়া খাওয়াইতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে। কেউ অবাক হইয়া গেল, কেউ মুচকি হাসিয়া বলিল—ও-সব আমরা অনেক কাল জানি, আমরা রীত দেখলেই মানুষ চিনি, তবে পাড়ার মধ্যে বলে এতদিন...

কে একজন বলিল—জিনিসটা কি তা দেখা হয়েছে?...

মোক্ষদা ঠাকরুণের গাল-বাদ্যের রবে সে কথা চাপা পড়িয়া গেল।

গাঙ্গুলী মহাশয় রামতনুকে বলিলেন—গুরু রক্ষা করেছেন! এখন যত শীগগির বিদেয় করতে পার তার চেষ্টা করো, শাস্ত্রে বলে, দুষ্টা ভার্যে! আর একদিনও এখানে রেখো না।

সমস্ত দিন পরামর্শ চলিল।

সন্ধ্যার সময় ঠিক হইল কাল সকালেই গাড়ি ডাকিয়া আপদ বিদায় করা হইবে। আর একদিনও এখানে না, কি জানি কখন কি বিপদ ঘটাইবে। বিশেষতঃ পাড়ার মধ্যে ও-রকম দজ্জাল বউ থাকিলে পাড়ার অন্য অন্য বউ-ঝিও দেখাদেখি ঐরকমই হইয়া উঠিবে।

সেদিন রাত্রে সুশীলাকে অন্য একঘরে শুইতে দেওয়া হইল—ইহা মোক্ষদা ঠাকরুণের বন্দোবস্ত—কাল সকালেই যখন যেখানকার আপদ সেখানে বিদায় করিয়া দেওয়া হইবে, তখন আর তাহার সঙ্গে সম্পর্ক কিসের?

রাত্রে শুইয়া শুইয়া কত রাত পর্যন্ত তাহার ঘুম আসিল না। ঘরের জানালা সব খোলা, বাহিরের জ্যোৎস্না ঘরে আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার মনে কাল ও আজ এই দুইদিন অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে—সে স্বভাবত নির্বোধ, লাঞ্ছনা ভোগের অপমান সে ইহার পূর্বে কখনও তেমন করিয়া অনুভব করে নাই, যদিও মারধর ইহার পূর্বে বহুবার খাইয়াছে। তাহার একটা কারণ এই যে আজ ও কালকার দিনের মত শ্বশুরশাশুড়ী ও এক-উঠান লোকের সামনে এভাবে অপমানিতও সে কোনদিন হয় নাই। তবে আজ সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার চোখের জল বাঁধ মানিতেছে না—কাল মার খাইয়া পিঠ কাটিয়া গিয়াছে ও হাত দিয়া ঠেকাইতে গিয়া হাতের কাঁচের চুড়ি ভাঙ্গিয়া হাতও ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। তাহার সেই স্বামী, যে স্বামী পাঁচছয় বৎসর পূর্বে এমন সব রাতে তাহাকে সমস্ত রাত ঘুমাইতে দিত না, সে পান খাইতে চাহিত না বলিয়া কত ভুলাইয়া পান মুখে গুঁজিয়া দিত—সেই স্বামী এরূপ করিল?

পান খাওয়ানোর কথাটিই সুশীলার বার-বার মনে আসিতে লাগিল। রাত্রের জ্যোৎস্না ক্রমে আরও ফুটিল। তখন চৈত্রমাসের মাঝামাঝি, দিনে তখন নতুন-কচি-পাতা-ওঠা গাছের মাথার উপর উদাস অলস বসন্ত-মধ্যাহ্ন ধোঁয়া ধোঁয়া রৌদ্রের উত্তরীয় উড়াইয়া বেড়ায়...দীর্ঘ দীর্ঘ দিনগুলি প্রস্ফুট-প্রসূন-সুরভির মধ্য দিয়া চলিয়া চলিয়া নদীর ধারের শিমুলতলায় সন্ধ্যার ছায়ার কোলে গিয়া ঢলিয়া পড়ে...পাড়াগাঁয়ের আমবনে বাঁশবনে জ্যোৎস্না-ঝরা বাতাসে সারারাত কত কি পাখীর আনন্দ-কাকলী...বসন্ত লক্ষ্মীর প্রথম প্রহরের আরতির শেষে বনের গাছপালা তখন আবার নূতন করিয়া টাট্‌কা ফুলের ডালি সাজাইতেছে।...

শুইয়া শুইয়া সুশীলা ভাবিল, জগতে কেউ তাহাকে ভালবাসে না—কেবল ভালবাসে তার মৌরীফুল। মৌরীফুল পত্র লিখিয়াছে, তাহার কথা মনে করিয়া সে রোজ রাত্রে কাঁদে, তাহাকে না দেখিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া তাহার কষ্ট হইতেছে। সত্যই যদি কেউ তাহাকে ভালবাসে তো সে ওই মৌরীফুল—আর ভালবাসে ওই ছোট-বউটা। আহা, ছোট-বউ-এর বড় কষ্ট! ভগবান দিন দিলে সে ছোট-বউ-এর দুঃখ ঘুচাইবে।...কিন্তু স্বামী যে তাহাকে বিদায় করিয়া দিতেছে? ও কিছু না, অভাবে পড়িয়া উহার মাথা খারাপ হইয়া যাইতেছে, নহিলে সেও কি এমন ছিল? মৌরীফুলের বর তো কত জায়গায় বেড়ায়, মৌরীফুলকে একখানা পত্র লিখিয়া দেখিলে হয়, যদি কোন চাকরি করিয়া দিতে পারে। চাকরি হইলে সে আর তার স্বামী একটা আলাদা বাসায় থাকিবে, আর কেহই সেখানে থাকিবে না, মাঠের ধারের ছোট ঘরখানি সে মনের মত করিয়া সাজাইয়া রাখিবে, উঠানে কুমড়ার মাচা বাঁধিবে, বাজার খরচ কমিয়া যাইবে। লোকে বলে সে গোছালো নয়, একবার

বাসায় যাইলে সে দেখাইয়া দিবে যে সে গোছালো কি না। আচ্ছা, ওই বাড়িখানায় যদি আগুন লাগে! না—আগুন দিবে কে? ছোট-বউ, উঁহু, দিলে তাহার শাশুড়ী ঠাকরুণই দিবে, যে রকম লোক!

জানালার বাহিরে জ্যোৎস্নায় ও-গুলো কি ভাসিতেছে? সেই যে তাহার স্বামী গল্প করিত জ্যোৎস্না-রাত্রে পরীরা সব খেলা করিয়া বেড়ায়, তাহারা নয় তো?…তাহার বিবাহের রাত্রে কেমন বাঁশী বাজাইয়াছিল, কেমন সুন্দর বাঁশী, ওরকম বাঁশী নদীর ধারে কত পড়িয়া থাকে…আচ্ছা পিওনে মৌরীফুলের একখানা চিঠি দিয়া গেল না কেন? লাল চৌকা খাম, খুব বড় সোনার জল দেয়া, আতর না কি মাখানো…

পরদিন সকাল বেলা পুত্রবধূর উঠিবার দেরী হইতে লাগিল দেখিয়া মোক্ষদা ঠাকরুণ ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, পুত্রবধূ জ্বরের ঘোরে অঘোর অচৈতন্য অবস্থায় ছেঁড়া মাদুরের উপর পড়িয়া আছে, চোখ দুটা জবাফুলের মত লাল।…

সেদিন সমস্ত রাত একভাবেই কাটিয়া গেল, তাহার দিকে বিশেষ কেহ নজর করিল না, তার পরদিন বেগতিক বুঝিয়া রামতনু ডাক্তার আনিলেন। দুপুরের পর হইতে সে জ্বরের ঘোরে ভুল বকিতে লাগিল—সত্যি মৌরীফুল তা নয়, ওরা যা বলছে—আমি অন্য ভেবে…

সন্ধ্যার কিছুপূর্বে সে মারা গেল।

তাহার মৃত্যুতে গাঙ্গুলী-পাড়ার হাড় জুড়াইয়া গেল, পাড়ার কাক-চিলগুলোও একটু সুস্থির হইল। কিছুদিন পরেই কিশোরীর দ্বিতীয় পক্ষের বউ মেঘলতা ঘরে আসিল। দেখিলে চোখ জুড়ায় এমন সুন্দর মেয়ে, কর্মপটু হুঁশিয়ার, গোছালো। দ্বিতীয়বার বিবাহের অল্পদিন পরেই যখন কিশোরী পালেদের স্টেটে ভাল চাকরিটি পাইল, তখন নূতন বউ-এর লক্ষ্মীভাগ্য দেখিয়া সকলেই খুব খুশী হইল।

সংসারের অলক্ষ্মীস্বরূপা আগের পক্ষের বউ-এর নাম সে সংসারে আর কোনদিন কেহ করে না।

প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩০

রোমান্স

সমীরই প্রথমে কথাটা তুললে।

তার মতে এই যে রোমান্স প্রেম ও-সব নভেলিয়ানা কেবল নভেলেই ঘটে, বাস্তব জীবনে ওদের অস্তিত্ব নেই। তাতে সুধীরও যোগ দিল বলে মনে হোল। ক্রমে ক্রমে বাকী সবাই সমীরের মতেই মত ছিল। তারপর ক্লাবের বেয়ারা চা দিয়ে গেল। চা খেতে খেতে আমাদের গল্পের ধারা শীঘ্রই এসে টেনিসে পৌঁছলো অন্য সব দিনের মতো।

ঘরের কোণে ব্রিজ-টেবিলের আড়ালে রমেনবাবু এতক্ষণ আলোয়ান মুড়ি দিয়ে আরামকেদারায় টান হয়ে শুয়েছিলেন। এতক্ষণ পর্যন্ত কোনো তর্কেই তিনি যোগ দেননি, বিশেষ কোনো কথাও বলেননি। চায়ের এক চুমুক খেয়েই একটু তাজা হয়ে নিয়ে বললেন—দ্যাখো, তোমরা এতক্ষণ বকে যাচ্ছলে আমি শুনছিলাম, কথা কইনি বটে কিন্তু যখন কথাটা উঠেছে তখন বলি শোনো। রোমান্স আছে এবং খুবই আছে। জীবনটাই তো একটা প্রকাণ্ড রোমান্স হে—সে-চোখে দেখে ক'জন—দেখবার চোখই বা আছে ক'জনের? আচ্ছা, চাটা জুড়িয়ে যাচ্ছে, এস খেয়ে নেওয়া যাক্—শোন তারপর বলি…

রমেনবাবু আমাদের ক্লাবের নতুন মেম্বার, মাস চারেক হোল যোগ দিয়েছেন। তাঁকে একটু অদ্ভুত ধরনের লোক বলে আমাদের সকলেরই মনে হয়েছে। ব্রিজ, টেনিস বিলিয়ার্ড,

দাবা কোনো খেলাতেই কোনো দিন তিনি যোগ দেন নি। খুব বেশি মেশামেশি বা গল্পও কখনো তাঁকে করতে দেখা যায় না। আপন মনে এসে বসেন, কাগজপত্র পড়েন, সন্ধ্যার আগেই উঠে চ'লে যান। কিন্তু লোকটির মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে যাতে ক্লাবের সকলে তাঁকে পছন্দ করে। তিনি না এলে, কেন তিনি এলেন না সে সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং আর একটা জিনিস, যা আদৌ ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক নয়, সেটা এই যে তিনি উঠে চলে গেলে তাঁর পেছনে তাঁর সম্বন্ধে মন্দ কথা কেউ কোনো দিন বলতো না।

ইতিমধ্যে চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছলো। রমেনবাবু চা পান শেষ করে রুমালে মুখ মুছে গল্প শুরু করলেন—

বছর কয়েক আগে আমি তখন একটা স্বদেশী ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রি ও প্রচারের কার্যে ঢাকা যাই। সেই প্রথম ও-অঞ্চলে যাওয়া। সময়টা শীতের শেষ হলেও কলকাতার ধারণায় আমি শীতের কাপড় সঙ্গে নিয়ে যাইনি বলে একদফা পদ্মার স্টীমারে, তারপর ট্রেনে শীতে হি হি ক'রে কাঁপতে কাঁপতে রাত সাড়ে ন'টা দশটার সময় গিয়ে ঢাকায়। পে'ৗছলাম। আমাদের ব্যাঙ্কের একজন ডিরেক্টার ঢাকা শহরের এক ভদ্রলোকের নামে একখানা পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন। তিনি শহরের একজন বড় উকীল—নাম এখানে করবার আবশ্যক নেই—তাঁরই বাসায় গিয়ে উঠবো এরকম কথা ছিল।

আমি যখন সে বাড়ি গিয়ে পে'ৗছলাম তখন রাত সাড়ে দশটার কম নয়। বেশ জ্যোৎস্না রাত, কম্পাউন্ডের বাঁ ধারে ফুল-বাগান, জাফরীতে মাধবীলতা এ'কে-বে'কে উঠেছে—আলো-আঁধারে পাতার আড়ালে বড় বড় ব্ল্যাকপ্রিন্স গোলাপ ফুটে রয়েছে—এসব গাড়িতে বসেই কৌতূহলের সঙ্গে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। গাড়ি থামতেই একজন হিন্দুস্থানী দারোয়ান রুটি সে'কা ফেলে গাড়ির কাছে এসে সেলাম ক'রে দাঁড়াল। তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম উকীলবাবু কি কাজে কুমিল্লাতে গেছেন, আজ তিন-চারদিন বাড়ি ছাড়া, কবে আসবেন তার ঠিক নেই। কোচম্যানকে গাড়ি ফেরাতে বলেছি—ডাক বাংলোতেই অগত্যা উঠবো—একটি ছেলে বাড়ির মধ্যে থেকে বার হয়ে এল। সংগে-সংগে সেই দারোয়ানটিও এল—সে যে ইতিমধ্যে কখন বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিল আমি লক্ষ্য করিনি। ছেলেটি বললে—বাবা কাল সকালেই আসবেন, আপনি যাবেন না—শুনলে বাবা দুঃখ করবেন। রামদীন, বাবুর জিনিসপত্র নামিয়ে নাও।

সুতরাং র'য়ে গেলাম। আহার ও শয়নের ব্যবস্থা সুন্দর হোল, সারাদিনের পরিশ্রমে শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে উঠে বাইরের বারান্দাতে ব'সে কাগজ পড়ছি, গৃহস্বামীর গাড়ি সদর গেট দিয়ে কম্পাউন্ডের মধ্যে ঢুকলো। আজ সকালের ট্রেনেই উকীলবাবুর আসবার কথা ছিল—তাই তাঁর গাড়ি স্টেশনে গিয়েছিল তাঁকে আনতে। গৃহস্বামী গাড়ি থেকে আমায় দেখে নেমে আমার পরিচয় জেনে খুব খুশী হলেন। নানাভাবে আপ্যায়িত করলেন, রাত্রে কোন কষ্ট হয়েছে কিনা সেকথাটা অন্ততঃ দশবার এমনভাবে জিজ্ঞাসা করলেন যে মনে হোল রাত্রে কষ্ট হয়নি বললে তাঁকে হতাশ করা হবে। একদিনের মধ্যে আমি যেন বাড়ির লোক হয়ে পড়লাম সে বাড়িতে। রাত্রে আমার আহারের স্থান হোল বাড়ির মধ্যের দাওয়ায়। পরদিন সকালে আমার বাইরের ঘরে একটি বারো-তেরো বছরের সুন্দরী মেয়ে চা ও খাবার নিয়ে এল। বেশ ডাগর-ডাগর চোখ, কালো চুলের রাশ পিঠের ওপর পড়েছে, মুখ দেখে বুদ্ধিমতী মনে হয়। চা ও খাবারের পাত্রটা টেবিলের ওপর রেখে সে চলে যাচ্ছিল, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি খুকী এ-বাড়িরই না? নাম কি তোমার?

সে হেসে বললে—বীণা।

তারপরই সে চ'লে গেল।

পরের দিন সকালে সেই মেয়েটিই আবার চা নিয়ে এল। এ-দিন সে অত শীঘ্র চ'লে গেল না। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম--তুমি বুঝি স্কুলে পড়—না ?

সে বললে—আমি মিডফোর্ড গার্লস স্কুলে পড়ি।

—কোন্ ক্লাসে পড় ?

—এবার ফোর্থ ক্লাসে উঠেছি এই জানুয়ারী মাসে···

—কি কি বই পড় ?

কিছুক্ষণ ধ'রে আমাদের কথাবার্তার ধারা ওই পথ ধরেই বেয়ে চললো।

বিকালে সে আপনিই আবার এল। আমার ঘরের চেয়ারটার হাতলের ওপরে বসলো। বলল—আপনি বুঝি বই লেখেন ?

—কি ক'রে জানলে বল দেখি ?

—আপনার নাম দেখেছি আমাদের বাড়িতে মাসিকপত্র আসে, তাতে আছে···

—কই কোন্ মাসিকপত্র আনো তো দেখি।

বীণা দু'তিনখানা মাসিক পত্র নিয়ে এল।

একটাতে আমার "বিদেশী ব্যাংক ও আমাদের কর্তব্য" বলে একটা অর্থনৈতিক প্রবন্ধ বার হয়েছিল বটে ; সেইটা বীণা খানিকক্ষণ ধরে পড়লো। তারপর সেটা মুড়ে রেখে এ-গল্প ও-গল্প করতে লাগলো। আমি মুখে মুখে ট্রানস্লেশন্ জিজ্ঞাসা করলাম—সবগুলোর উত্তর দিলে। ঢাকা মিউজিয়াম দেখতে যাবার ইচ্ছা ছিল। বিকালটার কিন্তু বীণা অনেকক্ষণ ধ'রে ঘরে বসে রইলো—মিউজিয়াম দেখতে না যাওয়া হোলেও কোনো ক্ষতি অনুভব করলাম না।

শেষরাত্রে কি জন্যে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, কানে গেল বাড়ির মধ্যে মেয়েলি গলায় কে চেঁচিয়ে ইউক্লিডের জিওমেট্রি পড়ছে—Two tangents can de brawn to a circle from an external point and they are equal and also subtend—। ভারী আশ্চর্য লাগলো। বীণা বিশ্চয়ই নয়—কারণ ফোর্থক্লাসে জিওমেট্রির ট্যানজেন্ট কোনো স্কুলেই পড়ানো হয় না—তা ছাড়া সেটা বীণার গলাও নয়। ঘড়িতে দেখলাম রাত চারটে বেজেছে। মনে মনে ইউক্লিডের অপূর্ব প্রভাবকে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারলাম না। এই শীতের রাত্রে চারটের সময় কার জ্ঞান-পিপাসা এত প্রবল হয়ে উঠেছে জানবার ভারী ইচ্ছা হোল।

সকালে বীণা চা নিয়ে আসতেই জিজ্ঞাসা করলাম—বীণা, শেষরাত্রে কে জিওমেট্রি পড়ছিল বাড়ির মধ্যে—তুমি ?

বীণা হেসে বললে—আমি না, ও দিদি—এইবার ম্যাট্রিক দেবে। এই সামনের বুধবার থেকে একজামিন বসবে কিনা ?

অমি বললাম—কই, তোমার দিদি ম্যাট্রিক দিচ্ছেন সে-কথা তো শুনিনি ? স্কুলের গাড়িতে তো তুমিই একলা যাও দেখেছি···

বীণা হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি। বললে—বা রে, বেশ লোক তো আপনি। দিদি তো এলাউ হয়ে বাড়ি বসে পড়ছে—ও বুঝি আমার সঙ্গে রোজ রোজ স্কুলের গাড়িতে পড়তে যাবে ?

কথাটা বীণা ঠিকই বলেছে, তার হাসিটা নিতান্ত অসঙ্গত নয় বটে।

সেদিন বিকালে স্কুলের গাড়িটা যখন এসে লাগলো তখন আমি রোয়াকে পায়চারি করছিলাম। বীণাকে নামতে দেখলাম না কিন্তু আর একটি মেয়ে নামলো। বয়স পনরো-

যোল হবে, অপূর্ব সুন্দরী, লাল পাড় সিল্কের জ্যাকেটের বাইরে নিটোল শুভ্র বাহুদুটি যেন হাতীর দাঁতে কুঁদে তৈরী। একবার আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখে শান্ত-গতিতে বাড়ির মধ্যে ঢুকলো।

সন্ধ্যার একটু আগে বীণা এসে বললে—চা এখন আনবো, না বেড়িয়ে এসে খাবেন? ...পরে একটু থেমে বললে—দিদিকে আজ দেখেছেন না?

আমি তখনও ঠিক করতে পারিনি যে স্কুলের গাড়ির সেই মেয়েটিই বীণার দিদি। পূর্বেই বলেছি বীণা ভারী বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে আমার মুখ দেখেই ব্যাপার বুঝে নিয়ে বললে—আজ বিকালে স্কুলের গাড়ি থেকে যে নামলো তখন ঐ তো দিদি—আমি তো আজ স্কুলে যাইনি। দিদি রিসিট আনতে স্কুলে গেছলো যে, ও-বেলা...

পরে সে বললে—দিদিই আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, বাইরের ঘরে ও-ভদ্রলোকটি কে রে?

মনে মনে অভিমানে বড় ঘা লাগলো। বড়-মানুষের মেয়ে বটে, সুন্দরীও বটে, কিন্তু আজ ছ'সাতদিন যে আমি তাঁর বাপের বৈঠকখানার একখানা চেয়ার টেবিলের মতো বাইরের ঘরের এক কোণে প'ড়ে আছি, এতদিনের মধ্যে এ হতভাগ্যের সম্বন্ধে সে সংবাদটুকুও কি তাঁর কর্ণগোচর হয়নি?

দিন দুই কেটে গেল। এ কয়দিনে আমি নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে যথেষ্ট ঘোরাঘুরি করলাম তাতে ঠিক সময়ে স্নানাহার হয়ে উঠতো না কোনো দিনও। সুতরাং বীণা সঙ্গে দেখা হবার সময় হোত না। তৃতীয় দিন সকালে বার হয়ে সন্ধ্যার কিছু আগে ফিরে এলাম। বারান্দাটাতে বসে একটু বিশ্রাম করছি, অপ্রত্যাশিতভাবে বীণা ঘরে ঢুকে হাসি-মুখে বললে—ঠাকুর দু'বার, তারপর আমি দু'বার আপনাকে ডাকতে এসে ফিরে গিয়েছি—আপনার খিদেতেষ্টা কিছুই পায় না, কোথায় ছিলেন সারা দিনটা?

আমি কৈফিয়ত দেবার আগেই সে আবার ব'লে উঠলো—মুখ হাত ধুয়ে ফেলুন, আপনার চা নিয়ে আসি—বাবা এখনও কাছারি থেকে ফেরেননি, গরম জল চড়ানই আছে...

অল্প পরেই সে চা নিয়ে এসে অভ্যস্ত ভাবে সামনের চেয়ারের হাতলটার ওপর বসে অনর্গল বকে যেতে লাগলো—সব কথার উত্তর পাবারও প্রত্যাশা সে রাখে না। আপনা আপনিই বেশ বলে যেতে পারে। বললে—ভারী মজা হয়েছে, আমি আপনার একটা লেখা দিদিকে দেখিয়ে বললুম—পড়ে দেখো তো। দিদি পড়তে গিয়ে বুঝতে পারে না—দাঁড়ান সেখানা আনি...

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে বাড়ির মধ্যে চ'লে গেল, কিন্তু সেদিন আর সে বাইরের ঘরে দেখা দিলে না। বীণার খামখেয়ালি ধরন আমার জানা ছিল কাজেই এতে আমি কিছুমাত্র আশ্চর্য হলাম না। পর দিন সকালে সে এল—হাতে একখানা "বঙ্গ-বন্ধু"। আমায় দেখিয়ে বললে—এই নিন, দিন দিকি বুঝিয়ে? লাল পেন্সিলে দিদি দাগ দিয়ে দিয়েছে জায়গাগুলো। সেই মাসের "বঙ্গ-বন্ধু"তে আমার "যৌথ-ব্যাঙ্ক ও মধ্যবিত্তের কর্তব্য" বলে প্রবন্ধটা বেরিয়েছিল। হাতে নিয়ে মনে মনে ভাবলাম যদি ম্যাট্রিক ক্লাসের একটি মেয়েকেও তাক্ লাগিয়ে না দিতে পারলাম তবে অনবরত দিন-পনেরো ধ'রে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী যাতায়াত এবং নানান Year Book নাড়া-চাড়া করবার সার্থকতা আর কি হোল?

বীণা বিকেল বেলা একখানা খাতা হাতে নিয়ে এসে বললে—চা-টা খেয়ে নিন—নিয়ে দিদির ট্রান্স্লেশন্টা হয়েছে কিনা দেখে দিন তো। দিদি বললে আপনাকে দেখাতে...

সেটা হাতে নিয়ে দেখলাম—বেশ গোটা গোটা মুক্তোর ছাঁদের লেখাটা বটে কিন্তু ট্রান্স্লেশন্‌টা বিশেষ উঁচুদরের নয়। কাজেই যখন বীণা বললে—ধরুন কুড়ি নম্বর আছে, কত নম্বর দেবেন আপনি? তখন একটু আমতা আমতা করে বললাম—নম্বর? তা এই ধরো, অবিশ্যি বাংলাটা খুব শক্ত, তা ধরো এই চার কি পাঁচ দিতে পারি...

—মোটে? তবেই হয়েছে, দিদি তাহলে এবার ইংরিজিতে ফেল, ফেলতুঃ, ফেলুঃ—কথাটা শেষ করেই সে মুখে হাতখানা চাপা দিয়ে খিল খিল করে' হেসে উঠলো। আমি একটু অপ্রতিভ হয়ে বললাম—না না ফেল কেন হবেন—আর একটা সোজা দেখে করলেই—এটা বেজায় শক্ত কিনা?

বিকেলে এসে বীণা বললে—দিদি বলে দিলে আপনাকে রোজ রোজ তার ট্রান্স্লেশন্ দেখে দিতে হবে—পারবেন তো?

—খুব—খুব—নিয়ে এসো না কাল থেকে। কেন দেখে দেবো না?

সেদিন থেকে আমার কাজ হোল রোজ রোজ এক রাশ করে' ইংরাজি ও বানানের ভুল সংশোধন করা। বেশ হাতের লেখাটি কিন্তু—খাতার শেষে গোটা গোটা ছাঁদে আমার নেপথ্যপথবর্তিনী ছাত্রীটির নাম লেখা থাকে—প্রতিমা দেবী।

কয়েকদিন খুব গুমটের পর বৈকালের দিকে সেদিন খুব বৃষ্টি হলো। উকীলবাবুর বাড়ির সামনে একটা বটগাছে নতুন পাতা গজিয়েছে, বারান্দাটাতে বসে' সেদিকে চেয়ে আমি আমার দেশের বাড়ির কথা ভাবছিলাম—কত দিন যাইনি, কাজের খাতিরে বিদেশে বিদেশে বেড়াতে হয়। তবুও যখন নববর্ষা নামে, বৃষ্টি-সজল বাতাসে এখান থেকে তিনশো মাইল দূরের সে গ্রামখানির ভিজে মাটির গন্ধ যেন ভাসিয়ে আনে...মনে হয় আমার ছোট ভাই অন্তু হয়ত এতক্ষণ আমাদের উঠানের বৃষ্টির জলে কাগজের নৌকো ভাসিয়ে খেলা করছে!...গোঁসাই কাকাদের বৈঠকখানাতে এতক্ষণ তাদের মজলিস বসেছে...তখন মন বড় খারাপ হয়ে যায়, ইচ্ছা হয় চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়ি গিয়ে উঠি।

উকীলবাবু কয়েকদিন রক্তাধিক্যের অসুখ হওয়ায় বাড়ির মধ্যেই ছিলেন, কাছারিও যাননি। তিনি ঝড়-বৃষ্টি থামবার পরে বারান্দাতে এসে আমার পাশে একটা আরাম কেদারায় বসে নানা গল্প করতে লাগলেন। বেশ অমায়িক স্বভাবের ভদ্রলোকটি। বললেন—ক'দিন আপনার খোঁজ খবর করতে পারিনি, কোনো অসুবিধে হয়নি আপনার? হ্যাঁ দেখুন, বীণা বলছিল আপনি প্রতিমার ট্রান্স্লেশন্ রোজ দেখে দেন—কি রকম বুঝছেন, পাস টাস করবে? ইংরিজিটা তেমন জানে না, যদি কিছু না মনে করেন তবে আপনাকে একটু অনুরোধ করি মেয়েটিকে একটু করে দেখবেন আপনার সময় মত? শুধু ইংরিজিটা দেখে দিলেই—ওর মাস্টার ছিল, হঠাৎ মা মারা যাওয়াতে বেচারী জানুয়ারী মাসে বাড়ি চলে গেল আর এল না—অবিশ্যি যদি আপনার...

বলা বাহুল্য আমাকে এ-বিষয়ে রাজী করাতে তাঁর যতটা বাক্য ব্যয় করার প্রয়োজন ছিল, তিনি তার চেয়ে যেন একটু বেশীই করলেন।

তারপর দিন-দুই কেটে গেল। প্রতিমা রোজ বিকেলে নয় দুপুরে খাতা নিয়ে এসে বসে, সঙ্গে থাকে বীণা। কোন কোন দিন সেও থাকে না। ধরনটি ওর ভারি মিষ্টি অথচ ওর মধ্যে এমন একটা স্বাভাবিক গাম্ভীর্য আছে যা অবাধ পরিচয়ের পথে একটা সহজ ব্যবধানের সৃষ্টি করে।

সেদিন প্রতিমা এসে সামনের চেয়ারখানাতে বসলো। ট্রান্স্লেশন্ দেবার পরে সে মুখ নিচু করে হেসে বললে—এ আমি পারবো না—এটা বদলে দিন...

আমি বললাম—এমন আর শক্ত কি, করে' দেখবে এখন সোজা...

সে পুনরায় ঠিক সেই ভাবে হেসে বললে—না আমি পারবো না, আপনি বদলে দিন...

যে সুরে সে কথাটা বললে, সেটি অতি শান্ত মৃদু হলেও মনে হোল এর পর আর তর্ক চলে না। বদলে দিলাম বটে কিন্তু ভাবলাম মেয়েটি একটু একরোখা ধরনের।

পড়াশুনা শেষ করেই প্রতিমা খাতাপত্র উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। একটু পরে বিকেলের দিকে আবার খুব ঝড়বৃষ্টি নামলো--এ অবস্থায় বাইরে বেড়াতে যাওয়া উচিত হবে না বুঝে চুপ করে বারান্দায় আরাম কেদারাটাতে বসে' আছি—পেছনে দোর খোলার শব্দ হোল। চেয়ে দেখি আগে বীণা, পেছনে প্রতিমা ঘরে ঢুকছে। প্রতিমার আগমন অনেকটা অপ্রত্যাশিত—কারণ এক পড়াশোনার সময়টি ছাড়া প্রতিমা অন্য কোন সময়ে আমার এখানে আসেনি কখনো।

বীণা ঘরে ঢুকেই বললে—কেমন বৃষ্টি নেমেছে মাস্টার-মশায় ?

—এসো এসো। ভিজতে ভিজতে এলে যে ?

—দিদি বললে আপনি একলাটি বসে আছেন তাই চল গিয়ে গল্প...

—প্রতিমা তার দিকে ভ্রূকুটি করে' বললে—আমি ?

পূর্বে ও-কথাটা মনে হয়েছে এখনও মনে হোল, প্রতিমা যে সুন্দরী তার ব্লাউজের হাতার লাল সিল্কের পাড়ের সঙ্গে সুন্দর খাপখাওয়া শুভ্র বাহু দুটির নিটোল গঠনের দিকে চেয়ে একথা মনে মনে অস্বীকার করতে পারলাম না। কিন্তু সকলের চেয়ে অদ্ভুত তার দু'টি চোখ ও ভুরু দুটির একটা বিশেষ ভঙ্গি। সেটা কি তা ঠিক মুখে বোঝানো যায় না অথচ যে ধরণের সৌন্দর্যে মনের মধ্যে একটা অব্যক্ত অভাবের বেদনা সৃষ্টি করে ওর মুখের সৌন্দর্যটা ঠিক সেই ধরনের।

প্রতিমা বললে—একলা বসে থাকতে আপনার খুব ভালো লাগে, না ? বসে বসে লেখেন বুঝি ? উঃ, কি শক্ত লেখাই লিখেছেন—আচ্ছা অত পার্সেন্টেজ, গ্রাফ, সেন্সাস রিপোর্ট কোথায় পেলেন—সব বুঝি আপনার মুখস্থ ?

—মুখস্থ কি আর থাকে। ও-সব লাইব্রেরীতে গিয়ে বই দেখে লেখা—অত মুখস্থ থাকলে একটা সচল Year Book হয়ে উঠবো যে...

—আচ্ছা আপনার দেশ কোথায় ?

—অনেক দূর, বর্ধমান জেলায়। তোমার জিওগ্রাফি আছে ম্যাট্রিকে ?

প্রতিমা মৃদু হেসে বললে—জিওগ্রাফি না থাকলেও বর্ধমান জেলা জানি...

বীণা বললে—আমাদের ক্লাসের জিওগ্রাফিতে বর্ধমানের জেলার কথা আছে। আচ্ছা, আপনাদের দেশে খুব ধান হয় আর খুব কয়লার খনি আছে, না মাস্টার-মশায় ?

—কয়লার খনি নেই এমন নয়, তবে একটু পশ্চিম ঘেঁসে...

প্রতিমা বললে—কয়লার খনি দেখেছেন আপনি ? আচ্ছা ও কী করে হয় ?

কয়লার খনির উৎপত্তির কথা এসে পড়াতে স্বভাবতঃই অনেক কথা মনে পড়লো। পৃথিবীর আদিম জন্মকথা, নেবুলা, স্তর বিভাগ, বিভিন্ন যুগবিভাগ, সূর্য ও প্রাণীর জন্মের ইতিহাস, জীবাত্মা ও অধুনালুপ্ত অতিকায় জীবদিগের বিবরণ ইত্যাদি। একদিকে প্রতিমার সৌন্দর্য অন্যদিকে এ-সব মহিমাময় বৈজ্ঞানিক রোমান্স, যেন একদিকে শাশ্বতী নারীর কমনীয়তা অন্যদিকে পুরুষের বিশাল প্রসারতা ও উদার কল্পনার প্রতীক।

প্রতিমা খুব মন দিয়ে শুনছিল এবং মাঝে মাঝে এ-প্রশ্ন ও-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিল। শেষ হয়ে গেলে বললে—আমি এ-সব কথা শুনিনি তো কোনদিন—স্কুলে কেউ তো বলে না।

ওরা চলে' গেল। বাইরে গিয়েই প্রতিমা বীণার দিকে চেয়ে নিচুগলায় শাসনের সুরে

বলছে কানে গেল—ওরকম মাস্টার-মশাই মাস্টার-মশাই বলছিলি কেন বীণা? ভারি খারাপ শোনাচ্ছিল কানে—উনি কি আমাদের মাইনে নিয়ে পড়ান?

কয়েকদিন পরে হঠাৎ আমি কলকাতায় ফেরবার জরুরী তার পেলাম অফিস থেকে। পরদিন সকালে বিছানাপত্র বাঁধা-ছাদা চলছে, বীণা এসে বললে—আপনার আজ যাওয়া হবে না। বেশ তো আপনি, ভরা অমাবস্যা মাথায় বুঝি বাড়ি থেকে বেরুতে আছে? দিদি বলে' দিলে মাস্টার—এই রমেনবাবুকে বারণ ক'রে আয় কাল যাবেন এখন। খুলুন বিছানা—ধরবো?

সেদিন অমাবস্যা কাটবার কথা ছিল না, সুতরাং বিছানাপত্র আবার খুলতে হোল।

পরদিন সকালে এক কান্ড ঘটলো। দশটার গাড়িতে আমি যাবো, উকীলবাবুও আমার সংগে যাবেন তাঁর কি কাজে ফরিদপুরে। নারায়ণগঞ্জ থেকে এক স্টীমারেই আমরা যাবো। সকালে দু'জনে একসংগে মাঝের বারান্দাতে খেতে বসেছি, হঠাৎ উকীলবাবু প্রতিমার ওপর রেগে উঠলেন। আজকের রান্নাবান্নার ভার তারই ওপর বুঝি উকীলবাবু দিয়েছিলেন। সে একটু বেলায় আরম্ভ করিয়েছে ঠাকুরকে দিয়ে, এই তুচ্ছ বিষয় নিয়ে—বিশেষ করে আমি সেখানে একজন বাইরের লোক—আমার সামনে মেয়েকে এমন রূঢ় ও অপ্রীতিকর কথাবার্তা বললেন, যাতে করে' আমি অত্যন্ত সংকোচ বোধ করলাম। আমার দিকে চেয়ে চেয়ে তিনি বলতে লাগলেন—দেখলেন রমেনবাবু, আজকালকার মেয়েদের—আমি ওকে কাল রাত থেকে বলছি, সকালে আমরা যাবো সব যেন ঠিক থাকে—দেখছেন তো একবার কান্ডখানা? বলি এটা কি ঝোল না কি ছাই এটা? এর নাম ঝোল? না, আমি সত্যি বলছি রমেনবাবু আমি আজকালকার ও-সব বিবি সাজা পছন্দ করিনে একেবারেই। খুব হয়েছে পড়াশুনোর আর দরকার নেই, যথেষ্ট হয়েছে···

আমার সামনে এ-সব কথা হওয়াতে হয়তো নেপথ্যপথবর্তিনী প্রতিমা লজ্জায় অপমানে ভেঙে পড়তে চাইছিল। কেন না আমি সম্পূর্ণ বাইরের লোক। তিরস্কারের পর সে আর আমাদের সামনে পরিবেশন করতে বেরুলো না। অত্যন্ত ভারী মন নিয়ে নিজের ঘরটিতে ফিরে এলাম।

একটু পরেই বীণা চায়ের কাপে এক কাপ দুধ নিয়ে এসে বললে—দুধ-মিছরি খেয়ে নিন্—

—দুধ-মিছরি, কেন বলো দেখি?

—আমাদের বাড়িতে নিয়ম আছে, বাড়ি ছেড়ে কেউ কোথাও যাবার সময় তাঁকে দুধ মিছরি খেতে দিতে হয়। ওপরের ঘরে বাবাকে দিয়ে এলাম। দিদি বলে' দিলে—রমেনবাবুকেও দিয়ে আয় বাইরের ঘরে···

গত তিন দিন প্রতিমার সংগে আমার দেখা হয় নি। আজ এই মাত্র এই যা খাবার সময় দেখা হয়েছিল, তাও অতি অল্পক্ষণের জন্যে। যাবার সময়ও দেখা হোল না—শুধু বীণা বিছানাপত্র গাড়িতে ওঠাবার সময় কাছে কাছে ছিল। আমার মনে কয়েকদিন ধরে' একটা সন্দেহ হয়েছিল, আমি জিজ্ঞাসা করলাম—বীণা, আচ্ছা একটা কথা বলি, তোমার মাকে তো দেখতে পাইনি কোনদিন। তিনি···

—আমার মা এক মাস হোল মামার বাড়ি গিয়েছেন ছোটমামার বিয়েতে—এই বুধবার আসবেন। আর দিদির মা নেই, দিদির ছেলেবেলাতেই···

—প্রতিমা তোমার আপন বোন না?

বীণা ঘাড় নেড়ে হেসে বললে—বা রে, অ্যাদ্দিন আছেন, তাও জানেন না বুঝি? আপনার মন থাকে কোথায়? একদিন তো আপনার সামনে এ কথা হয়ে গিয়েছে না?

কবে পূর্বে একথা উত্থাপিত হয়েছিল, মনে না হোলেও এতদিনের একটা খটকা

আমার কাছে আজ পরিষ্কার হয়ে গেল। তাই বীণা ও প্রতিমার মুখের গড়নে এতখানি তফাত। কথাটা অনেক বার মনে হোলেও ঠিক কিছু ধারণা করতে পারিনি এত দিন।

অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে উকীলবাবুর সঙ্গে তাঁর গাড়িতে উঠে বসলাম। আজ কয়দিনের তো জানাশোনা—কিন্তু চলে' যাবার সময় মনে হতে লাগলো, প্রথম এসে এই অপরিচিত লোহার গেটের মধ্যে যখন আমার ঠিকাগাড়ি ঢুকেছিল, সেদিন আজ অনেক-দূর পেছনে পড়ে গিয়েছে—আজ এই বাড়ির প্রতি জিনিসটা, ঐ পাতা-বাহারের গাছটা, বাইরের উঠানের ঐ পুরানো ইঁদারাটা, সব যেন হঠাৎ বড় প্রিয় হয়ে উঠেছে—যেন নীড়-হারা বিহঙ্গ নিঃসীম শূন্যে মুক্তপক্ষে উড়তে উড়তে কোথায় নীড়ের সন্ধান পেয়েছিল, যে নীড়ে তার কোন দাবী-দাওয়া নেই, শুধু মনের মধ্যেকার একটা অনির্দিষ্ট নির্ভরতার ভাবে সেই মিথ্যা অধিকারের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিত মাত্র। তাই আজ ছেড়ে যাবার বাস্তবতার সঙ্গে দ্বন্দ্বে তার নিজের কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে সে অধিকারের বার্তাটা কতটা অসংগত ও ভিত্তিশূন্য।

দেশে ফিরে অল্প কিছুদিন থাকবার পরেই কয়েক মাস একরকম কেটে গেল। পুজোর পরে কার্তিক মাসের প্রথমে হঠাৎ অফিসের হুকুম হোল আবার ঢাকা যাবার।

এবার যখন গোয়ালন্দ থেকে স্টীমারে উঠলাম তখন আগেকার মত ভিড় ছিল না। পদ্মাবক্ষ শান্ত স্থির—চরে চরে কাশের বন ঘন সবুজ, আকাশের রঙ তিসির ফুলের মত নীল। নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত ভারী আরামে কাটলো।

ঢাকায় নেমে কিন্তু বীণাদের ওখানে না গিয়ে ডাক-বাংলোয় উঠলাম।

নানা কারণে এবার বীণাদের বাড়ি উঠতে পারা গেল না। বার বার অনাহূত ভাবে তাদের ওখানে গিয়ে উঠলে তারাই বা কি মনে করবে? হয়তো এবার আমার সেখানে যাওয়াটা তারা পছন্দ নাও করতে পারে। তার চেয়ে বরং নিজের কাজকর্ম সেরে এমনি একদিন তাদের বাড়িতে গিয়ে সকলের সঙ্গে দেখাশুনো করে' আসা যাবে এখন।

আবার জ্যোৎস্না-পক্ষ ঘুরে এল। ডাক-বাংলোর কম্পাউণ্ডের হাস্না ঝোপের মিঠা মৃদু সৌরভ-ভরা ঝিরঝিরে বাতাসে বারান্দায় রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত কথাই মনে ওঠে। একবার মনে হচ্ছিল, এই অপরিচিত ঢাকা শহরটিতে এমন কেউ আমার আপনার জন আছে যে, যদি সে জানে আমি ঢাকাতে এসেছি এবং লক্ষ্মীছাড়ার মতো ডাক-বাংলোয় উঠে দাড়িওয়ালা বাবুর্চির শিরাবহুল হস্তের ডালভাত ও সুরুয়া আহার করছি তো মনে মনে ভারী দুঃখিত হবে। কারণ আমি জানি আমার আহারের কিছুমাত্র অনিয়ম হোলে তার সহ্য হয় নি, নানা অনুযোগ করে' ঠিক সময়ে খেতে বাধ্য করেছে, কিসে আমার স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে তার জন্যে অলক্ষ্যে কত চেষ্টা ছিল তার। এক একবার মনে হচ্ছিল, এসব চিন্তার সার্থকতা কি? অতিথির প্রতি সৌজন্যকে অন্য কিছু বলে মনে করবার অধিকারই বা আমায় কে দিয়েছে?

দিন পনেরো ঢাকায় কেটে গেলেও বীণাদের বাড়ির রাস্তা পর্যন্ত মাড়ালাম না ইচ্ছে করেই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত শুধু "ভারতমাতা ব্যাঙ্কের" শেয়ার বিক্রি এবং কালু-ঝম্‌ঝম্‌ তোপের পুরাতত্ত্ব আলোচনা করে সময় কাটানো অসম্ভব ও একঘেয়ে হয়ে উঠলো। একদিন বিকেলের দিকে ওদের বাড়িতে ছড়ি হাতে নিশ্চিন্তমনে বেড়াতে গেলাম—যেন এই পথ দিয়েই কাজের খাতিরে যেতে যেতে একবার দেখতে আসা গেল কে কেমন আছে। গেটের মধ্যে ঢুকে চোখ পড়লো বাড়ির ওপরের ঘরে সব জানালা বন্ধ। উকীলবাবুর অফিস-ঘরের সামনে রামধনিয়া বেয়ারাও টুলের ওপর বসে নেই, বাইরে কোথাও একটা ...কি করা যায় বা কাকে ডাকবো ভাবছি, এমন সময় উকীলবাবুর পুরনো খানসামা

ছকু বাজার থেকে কি কিনে নিয়ে গেট দিয়ে বাড়ি ঢুকেই আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

—বাবু আপনি?

—হ্যাঁ, এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই। বাবু কোথায়?

—আপনি শোনেন নি, জানেন না কিছু?

পরে সে একে একে যা বলে' গেল তা সংক্ষেপে এই যে, গত ভাদ্রমাসে উকীলবাবু রক্তাধিক্য রোগে হঠাৎ হার্টফেল করে মারা যান। তার ওপর বিপদ—বড় দিদিমণি পরীক্ষায় ফেল হন এবং তারপরই তাঁর মাথা খারাপ মত হয়ে গিয়েছে—তিনি আছেন তাঁর মামার বাড়ি। বীণাকে নিয়ে তাঁর মা নিজের বাপের বাড়ি চ'লে গিয়েছেন এবং সেইখানেই আছেন। বর্তমানে এ-বাড়িতে রঘু মিশির দারোয়ান আর সে ছাড়া কেউ থাকে না, অন্য চাকর বাকরের জবাব হয়ে গিয়েছে।

ডাক-বাংলোয় ফিরে সেদিন কোনো কাজে মন গেল না। প্রতিমার কথা ভেবে আমার মন করুণায় পূর্ণ হয়ে গেল। ডাকবাংলোর নির্জন বারান্দার অন্ধকারটাও যেন অশ্রুসজল হয়ে উঠলো ওর নানা ছোটখাট কথাবার্তার স্মৃতিতে;…পরদিন সকালে আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রির কাজটা যে পরিমাণে হওয়া উচিত ছিল তা হয় নি। সকাল-সন্ধ্যায় সব সময় মহা উৎসাহে ঘুরে ঘুরে অফিসের কাজ করে বেড়াই আর কলকাতার অফিসে বড় বড় রিপোর্ট পাঠাই।

দিন পাঁচেক পরে সেদিন সকালে স্নান করে বসে খবরের কাগজ পড়ছি এমন সময় ডাক বাংলোর বেয়ারা বললে—আপ্‌কো পাস এক আদমি আনে মাংতা হ্যায়…

একটু পরেই দেখি উকীলবাবুর বাসার ছকু খানসামা বেয়ারার সঙ্গে ঘরে ঢুকছে। আমি আগ্রহের সুরে বললাম—কি মনে করে'?

ছকু বললে—পরশু ছোটদিদিমণি বাড়ি এসেছেন মার সঙ্গে। আপনি বাসায় গিয়েছিলেন শুনে আমায় বলে দিলেন, ডাকবাংলোয় গিয়ে দেখে আয় তিনি আছেন কিনা, থাকলে আমাদের বাড়ি অবিশ্যি করে' একবার আসতে বলে' আয় আমার নাম করে'—আজই বিকেলে যেতে বলে দিয়েছেন।

আমি তাকে বলে' দিলাম, অফিসের কাজ সেরে বিকেলের দিকে আমি নিশ্চয়ই যাবো।

বিকেলে যখন বীণাদের বাড়ি গেলাম তখন সন্ধ্যা হবার খুব বেশি দেরি ছিল না। রাস্তার ধারে ধারে আলো দিয়েছে, মোড়ে মোড়ে ফিরিওয়ালা 'চাই গরম গরম বাখরখানি' বলে হেঁকে যাচ্ছে। ওদের বাড়ি পৌঁছে বাড়ির মধ্যে খবর পাঠালাম। একটু পরে বীণা এসে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে মৃদু-স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—আপনার শরীর ভালো আছে?

—এক রকম মন্দ নয়। তোমরা—তোমাদের সব?

বীণার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে' জল ঝরে পড়লো। কথাটা জিজ্ঞাসা না করাই বোধ হয় উচিত ছিল। সান্ত্বনাসূচক গোটাকতক মামুলি কথা বলে আনাড়ির মতো বসে রইলাম। কিন্তু ঐ জন্যেই আমি বীণাকে ভারী পছন্দ করি—এত অল্পক্ষণের মধ্যে সে নিজের দুর্বলতাটুকু সামলে নিলে যে তাকে আমি মনে মনে সাধারণ মেয়েদের চেয়ে উচ্চ আসনে স্থান না দিয়ে পারলাম না।

চোখ মুছে নিয়ে বললে—আপনি এসে উঠেছেন কোথায়? ডাকবাংলোয়? আচ্ছা এইবার তো আমরা এসেছি, জিনিসপত্র নিয়ে এখানে চলে আসুন কাল সকালেই…

বীণা কথাটা এমন হুকুমের সুরে বললে যে হঠাৎ তার প্রতিবাদ করা সম্ভবপর নয়। অন্য কথা তুলে সেটা চাপা দেবার জন্য নানা অনাবশ্যকীয় কথা ওঠালাম, যেন প্রধানতঃ

সেইগুলো জানবার আগ্রহেই আমি এতটা পথ হে'টে এসেছি ; শেষে বললাম—প্রতিমা কোথায় ? এ প্রশ্নটা অনেকবার মুখে এলেও এতক্ষণের মধ্যে কি জানি কেন একবারও মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করে উঠতে পারি নি !

বীণা বললে—দিদি এখনও সারে নি। বড় মামাবাবু সঙ্গে করে চুনার নিয়ে গেছেন সেইখানেই আছে। কেবল আপন মনে বসে' বসে' কি ভাবে এ ছাড়া তার আর কোনো খারাপ লক্ষণ নেই। কিন্তু খায় না দায় না, শুতেও চায় না, বেড়াতে যেতেও চায় না, কেবল রাত দিন বসে' বসে' কি ভাবছে—ঐ তার রোগ…

—পরীক্ষায় পাস না করেই বোধহয় এমন হয়ে…

বীণা বললে—শুধু পরীক্ষায় পাস নয়, সে অনেক কথা। আপনাকে বলতে আর কি আপনি ঘরের লোক। দিদি পরীক্ষা দেওয়ার পর বাবা তার এক সম্বন্ধ ঠিক করলেন। চাটগাঁয়ের উকীল হাতে পয়সা আছে, কিন্তু তেজপক্ষের বর, বয়স চল্লিশেরও ওপর। দিদি সব শুনেছিল, কিন্তু কিছু বলেনি। মা কত বোঝালেন কিন্তু বাবার ইদানীং কেমন হয়েছিল জানিনে, দিদিকে একেবারে যেন বিষ নজরে দেখতেন। দিদি শেষে রাগে পড়ে' খবরের কাগজ দেখে কোথাকার স্কুলে মাস্টারীর দরখাস্ত করে, চাকরিও পায়—কিন্তু বাবার হাতে তাঁদের চিঠি এসে পড়ে। তারপর সে কী অপমান আর কী কাণ্ড ! তারপরই পরীক্ষায় ফেল হোল, সে আবার এক কাণ্ড। বাবা হঠাৎ মারা না গেলে এ-বিয়ে ঠিক হোত। এইসব গোলমালে দিদি যেন কেমন হয়ে গেল। চিরকাল সে ভারী অভিমানী। দিদির কোন দোষ ছিল না, সে যে মাস্টারীর দরখাস্ত করেছিল সে শুধু অপমানের জ্বালায় জ্বলে আর থাকতে না পেরে।

তারপর বীণা আমায় বসতে বলে তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে চলে' গেল এবং কিছুক্ষণ পরে পুরানো দিনের মতো নিজের হাতে চা ও ঝি-এর হাতে জল-খাবারের রেকাবি আর জলের গ্লাস নিয়ে ঘরের টেবিলে রেখে বললে—আসুন দিকি, খেয়ে দেখুন তো চা'টা—তবে কি আর আপনার ডাক-বাংলোর বাবুর্চির মত হয়েছে ?

বীণা আগেকার চেয়েও সুশ্রী ও মাথায় বড় হয়ে উঠেছে। তবে ওর ধরনগুলো ঠিক আছে, একটুও বদলায়নি। বেশ লাগে ওকে।

ওঠবার সময় বীণা বললে—কিন্তু আপনি কাল সকালেই আসবেন তো ? আমি মাকে বলেছি, আপনি না এলে ভারী রাগ করবো কিন্তু বলে' দিচ্ছি। কাল রঘু মিশিরকে সকালে ডাক-বাংলোয় পাঠিয়ে দেব এখন।

আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম—এবারকার অফিসের কাজ শেষ হয়ে এসেছে, বেশীদিন আর ঢাকায় থাকতে হবে না, অল্পদিনের মধ্যেই কলকাতায় যেতে হবে। বরং এর পর যখন আসবো—ইত্যাদি। বীণা কিন্তু কিছুতেই শুনলে না, তার মনেও বেশী কষ্ট দিতে পারলাম না, রাজী হয়ে বললাম—আচ্ছা তাই হবে, তবে একটু দেরী হয়ে যাবে হয়তো, এই বেলা ন'টার মধ্যেই আসবো। বীণা খুব খুশী হয়ে বললে—আপনার সেই ঘরটাতেই থাকবেন, সকালেই আটটার আগে আমি রঘু মিশিরকে পাঠাবো। চলে' আসবার সময় আবার ডেকে বললে—সকালে চা খেয়ে আসবেন না যেন, এখানে এসে খাবেন…

ডাক-বাংলোয় ফেরবার পথে সেদিন একটা সত্য আমার কাছে বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠলো—হঠাৎ বীণারা আমার বড় আপন হয়ে উঠেছে। এত অল্পদিনে যে উপকরণে গাঁথুনী পাকা ও শক্ত হয়ে ওঠে, ওদের দিক থেকে অন্ততঃ আর কোনো কার্পণ্য তো ছিল না। মানুষের সঙ্গে মানুষের এরকম সহজ সম্পর্ক আদান-প্রদান যে জীবনের কত বড় সম্পদ তা অনেক স্থলে আমরা বুঝিনে বলেই সকল সম্বন্ধকে ছোট করে' দেখতে

শিখি। মেয়েরা এটা কেমন সুন্দর ভাবে পারে, ওদের চরিত্রগত সেবাপ্রবৃত্তি ও মুগ্ধ মনের সৌন্দর্য জগৎকে যে কত দিক থেকে মঙ্গল ও কল্যাণ ভরে' রেখেছে তার বাস্তবতা সেদিন নির্জন ডাক-বাংলোর বারান্দাতে বসে' মনে-প্রাণে অনুভব করলাম।

সব কথা বুঝিয়ে বলা যায় না। শুধু নক্ষত্রদল যখন অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে কাঁপে ...রাত্রি অপূর্ব রহস্যময় হয়...নৈশ পাখীর ডাক দূর থেকে ভেসে আসে...মনের মধ্যের নাম-না জানা উল্লাসে সে সত্যটুকু নিজের কাছে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।...

ডাক-বাংলোয় ফিরে দেখি আমার এক পুরনো বন্ধু আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। তিনি ইন্সিওরেন্সের দালাল, নারায়ণগঞ্জের কাজে এসেছেন এবং সেখানেই আছেন। তাঁর নামে তাঁর একটা মণিঅর্ডার এসেছে কিন্তু সেখানকার পোস্টমাস্টার তাঁকে চেনেন না, তাঁকে সনাক্ত করবারও কেউ সেখানে নেই বলে' টাকা দিচ্ছেন না ; এদিকে তাঁর হাতেও এক পয়সা নেই—এখন কি করা যায়?

খুব ভোরের ট্রেনে বন্ধুকে নিয়ে নারায়ণগঞ্জে রওনা হলাম। যাবার সময় চৌকিদারকে ব'লে গেলাম কেউ এসে খোঁজ করলে বলবে যে জরুরী কাজে নারায়ণগঞ্জে চলে গিয়েছি, আজই ফিরবো। নারায়ণগঞ্জে কাটলো দিন দুই। মহা হাঙ্গামা। পোস্টমাস্টার আমাকেও চেনেন না, টাকাও কিছুতেই পাওয়া যায় না। দু' একজন যাদের সঙ্গে পূর্বে পরিচয় ছিল তাঁরা টাকাকড়ির হাঙ্গামা শুনে পেছিয়ে গেলেন। অনেক কষ্টে শেষে কাজ মিটলো। ডাক-বাংলো ফিরেই অফিসের চিঠি পেলাম বিশেষ দরকারে কুমিল্লা যেতে হবে। চিঠি এসে দু'দিন পড়ে আছে, আগেই যাওয়া উচিত ছিল, বিলম্বে কার্যক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা! ডাক-বাংলোর চাপরাশি বললে রঘু মিশির দুদিন এসে ফিরে গিয়েছে। এদিকে ট্রেনের সময় সংক্ষেপ, ফেরবার পথেই বীণার সঙ্গে দেখা করা ঠিক করলাম।

কুমিল্লা থেকে যেতে হলো চাটগাঁ, সেখান থেকে স্টীমারে বরিশাল, সেখান থেকে কলকাতা। তারপরেই ফাল্গুন মাসে আমার ছোট বোনের বিবাহ উপলক্ষে একমাসের ছুটি নিয়ে বাড়ি। ছোট বোনের বিবাহ শেষ হয়ে যাবার অল্পদিন পরেই মা পড়লেন অসুখে এবং মাসখানেক ভোগবার পর চৈত্র মাসের মাঝামাঝি সেরে উঠলেন, কিন্তু চেঞ্জে যাওয়ার দরকার হোল। অফিসে আরও একমাস ছুটির দরখাস্ত করাতে তারা ছুটি তো দিলেই না বরং লিখলে, শীঘ্র কাজে যোগ না দিলে অন্য লোক বহাল করবে। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এক লম্বা পত্র লিখলাম সেখানে।

তাই এতদিন পরে ভেবে দেখি জীবনের গতি অপূর্ব, অদ্ভুত। এর চেয়ে বড় রোমান্সের সন্ধান কেউ দিতে পারে না। বীণাকে যখন বলে আসি পরদিন সকালে তার ওখানে যাবো—এমন কি তার মন প্রফুল্ল রাখবার জন্যে তাকে কি সব বই পড়াবো তা পর্যন্ত ভাবতে ভাবতে এসেছিলাম—তখন কে জানতো বীণার সঙ্গে দেখা তো আর হবেই না, আমার ঢাকা যাওয়ার পথই একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে।

তারপর কয়েক বছর কেটে গেল। আইন পাস করে আলিপুর কোর্টে বেরুতে আরম্ভ করলাম। ভবঘুরের জীবন ক্রমে পেছনে পড়ে গেল। মাত্র নির্জন অবসর-মুহূর্তে বার-লাইব্রেরী কক্ষের মক্কেলহীন দুপুর বেলায় মাঝে মাঝে সে-সব দিনের নানা কথা মনে পড়ে—তখন যেন স্বপ্নের মত ঠেকে।...

এই সব স্মৃতিতেই জীবন মধুময় হয়ে ওঠে, জীবনের কুঞ্জবনে এরাই গায়ক-পাখী. ফুল ফলে সকাল দুপুরের সঙ্গে সুর-মেলানো অনন্তমুখী সংগীত এদেরই নিভৃত নীড়ান্তরাল থেকে শোনা যায়।

বিবাহের অনুরোধে বাড়িতে তিষ্ঠানো দায়। জ্যাঠামশায় ভবানীপুরে কোথায় বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করে পাত্রী দেখে এসে খুব প্রশংসা করলেন। জ্যাঠাইমার অনুরোধে তাঁদের

বাসা থেকে রওনা হয়ে বন্ধুবান্ধব সঙ্গে নিয়ে একদিন মেয়ে দেখতে গেলাম।

বেলতলা রোডে একতলা ছোট বাড়ি। বাড়ির সামনে ছোট্ট একটু কম্পাউন্ড, গেটের ওপরকার লোহার জালতিতে থোকা থোকা মাধবীলতা গুচ্ছ। আমরা গিয়ে বৈঠকখানায় বসবার অল্পক্ষণ পরেই মেয়েকে আনা হোল। তার মুখের দিকে চেয়েই আমি চমকে উঠলাম। বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বার হোল না।

বীণা!

কিন্তু এ কোন বীণা? চার বছর আগের সে চঞ্চলা বালিকা নয়, অনিন্দ্য-সুন্দরী, সংযতা তরুণী! মেয়ের মামা পরিচয় দিলেন মেয়েটি বেথুনে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, ম্যাট্রিক ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করেছে, পড়াশুনায় বেশ ভাল ; বাপ ঢাকার উকিল ছিলেন, মারা গিয়েছেন। বীণা চোখ নিচু করে ছিল, আমার দিকে চায় নি—সে বোধ হয় জানেও না যে আমি পাত্র।

বাড়ির বার হয়ে এসে বন্ধুরা আমাকে ভাগ্যবান বললেন। ও-রকম পাত্রী অদৃষ্টে জোটা ইত্যাদি।

কাউকে কোন কথা বললাম না।

শুভদৃষ্টির সময় কাপড় ঢাকা দিয়ে দেওয়া হোল না, এমনই দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে দেখলাম—বীণার মুখের অবস্থা ফটোগ্রাফ নেবার যোগ্য হয়েছিল।

অনেক রাত্রে বাসরে সে শাসনের সুরে বললে—আপনি তো আচ্ছা! তলে তলে বুঝি এই সব কু-মতলব ছিল?

আমি উত্তর দিলাম—আমি বুঝি জানি? মেয়ে দেখবার দিন তো আমি জানলাম। আগে জানতে পারলে তুমি বোধ হয় এতে রাজী হতে না—না?

বীণা রাগে ঘাড় দুলিয়ে মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলে। আমার দিকে না চেয়েই বললে—কোথায় ছিলেন এতদিন নিরুদ্দেশ হয়ে? আর এলেন না কেন সেবার?

সংক্ষেপে কৈফিয়ৎ দেবার পর আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করলাম—প্রতিমাকে দেখছি না, সে কি এখানে আসে নি আজ?

এবার বীণা আমার মুখের দিকে চাইলে, চেয়ে চুপ করে রইলো। তারপর সংযত সুরে বললে—জানেন না? দিদি নেই—সেবারই মাঘ মাসে মারা যায়। মাথা তার ভাল হয় নি। আপনার নাম বড় করতো, আমার কাছে, কতদিন বলেছে।

রাক্ষস-গণ

বিপত্নীক হবার অল্পদিন পরেই সুরেশ সলিমপুর স্টেশনে বদলী হয়ে গেল। মাঠের মধ্যে ছোট্ট স্টেশন, নিকটে লোকজনের বাস খুবই কম। রেলের কোয়ার্টারে বড়বাবু পুত্র-পরিবার নিয়ে বাস করেন। কিছু দূরে একটা ছাত্রবৃত্তি স্কুল আছে—তার শিক্ষকগণ স্কুলের নিকটেই একটা বড় আটচালা ঘরে মেস করে থাকেন। এ ছাড়া বড়-একটা বসতি নেই।

বিকেলের ট্রেনখানা রওনা করে দিয়েই সুরেশ স্কুল-মাস্টারের মেসের বাসায় তাস-খেলার আড্ডায় যায়। সন্ধ্যা সাতটার সময় ডাউন-যাত্রীগাড়ি আসবার পূর্ব পর্যন্ত সেই-খানেই থাকে। পরে খানিকক্ষণ স্টেশনের কাজকর্ম করবার পর রাত্রি সাড়ে ন'টার শেষ গাড়ি রওনা করেই নিজের কোয়ার্টারে ছোট্ট ঘরটিতে ফিরে এসে ও-বেলার রাখা বাসি রুটি-তরকারী খাওয়ার পরে সারাদিনের কর্ম-ক্লান্ত শরীরটাকে নিঃসঙ্গ শয্যায় লুটিয়ে দিয়ে আপন মনে কত কথা ভাবে ব্র্যাণ্ড লাইনের স্টেশন, রাত্রে আর ট্রেন নেই…

জানালার বাইরে খোলা আকাশটা নক্ষত্রভরা, একটা মাদার গাছের ডাল-পালা গরাদের গায়ে এসে ঠেকেছে। মনে পড়ে মৃত্যুর পূর্বে নলিনী তার হাত নিজের দু'খানি রোগ-জীর্ণ দুর্বল হাতের মধ্যে নিয়ে হাসিমুখে বলেছিল—আমার একটা কথা রাখবে লক্ষ্মীটি, ফের বিয়ে কোরো। কথা রাখবে ঠিক, বলো?

সে নলিনীর মুখে হাতচাপা দিয়ে বলেছিল—ছিঃ, ও-সব কথা কি বলতে আছে? তুমি সেরে উঠবে ; ডাক্তারবাবু তো বলেছেন, পূর্ণিমাটা কেটে গেলেই পথ্যি দেবেন। ও-রকম কথা আর তুলো না, মা ভয় পেয়ে কান্নাকাটি করবেন—ছিঃ...

সে পূর্ণিমা কাটে নি।

কর্মভারনত নিরানন্দ প্রবাসের দিনগুলিতে নলিনীর এই স্মৃতিই মাঝে মাঝে কাজের ফাঁকে ফাঁকে সুরেশের অন্যমনস্ক মুহূর্তগুলি মধুর রসে ভরিয়ে তোলে, নিশীথে ফোটা রজনীগন্ধার মিঠা মৃদু সুবাসের মত—বিশেষ করে এই সব রাত্রে যখন সে একা!...

মাঘ মাসের সকাল বেলা। এই মাত্র স্টেশন থেকে এসে রাঁধতে বসেছে একটি বারো তেরো বছরের অপরিচিতা মেয়ে একখানা থালা হাতে ঘরে ঢুকে লাজুক সুরে বললে—মা পাঠিয়ে দিলেন।...থালাতে ছয়-সাতটি বাটিতে নানা তরকারী।

সুরেশ হঠাৎ বড় সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো, কি করা উচিত ঠিক করতে না পেরে তাড়াতাড়ি তরকারী-বাটি থেকে তরকারী নামিয়ে সেগুলো খালি করে দেবার চেষ্টায় এতটা অনর্থক ব্যস্ততার আমদানি করে বসলো যে মেয়েটি মৃদু হেসে বললে—বাটি এখন থাক, রেখে দিন আপনি, ঝি এসে নিয়ে যাবে এখন।

শুধু থালাখানা উঠিয়ে নিয়ে সে চলে গেল। সুরেশ ভাবলে বড়বাবুর বাসা থেকে এসেছে বটে কিন্তু বড়বাবুর নিজের মেয়ে নয় সে জানে। এতদিন এ মেয়েটিকে কখনো দেখেও নি তো?

বেশ শান্ত মুখখানি।

মাসখানেক কেটে গেল। ব্র্যাঞ্চ লাইনের স্টেশনে ছোটবাবুর জীবন সকাল-সন্ধ্যা এক-ঘেয়ে একরঙা ছবির মত বৈচিত্র্যহীন ভাবে কেটে চলেছে। সেই মেয়েটি আরও কয়েকবার নানা কাজে সুরেশের বাসায় যাতায়াত করেছে ; মেয়েটি বড়বাবুর ভাগিনেয়ী...মা নেই, বাপ পদ্মার ওপারে কোন্ এক স্টেশনে চাকুরি করেন, সম্প্রতি মামার বাড়ি এসেছে বেড়াতে, মামীমাকেই মা বলে ডাকে—এ সব খবর সুরেশ ক্রমে জানতে পারে।

একদিন, কি কাজে মেয়েটি এল। সুরেশ কথায় কথায় বললে—রেণু, পানগুলো আজ কদ্দিন ধরে পড়ে রয়েছে, সাজা অভাবে খাওয়া হয় না। গোটাকতক সেজে রেখে যাবে?

রেণু অমনি পান সাজতে বসে গেল। নিপুণ হাতে এক রাশ পান সাজা শেষ করে সে তাগিদ দিয়ে কলঙ্ক-ধরা অপরিষ্কার কাঁসার ডিবেটা সুরেশের বাক্সের কোণ থেকে বার করে নিয়ে সেটা খানিকক্ষণ বসে বসে বালি দিয়ে মেজে ঝক্‌ঝকে করে তুললো। বিছানার ধারে পানে ভর্তি ডিবেটা রেখে দিয়ে হাসিমুখে বললে—দু'আনা পয়সা দিন আমাকে...

সুরেশ বুঝতে না পেরে বললে—কেন বলো তো?

—বৌ মারা গিয়ে সন্নিসী হয়েছেন বুঝি? না মশলা, না একটু এলাচ দারচিনি। শুধু ধনের-চাল দিয়ে পান সাজা—পয়সা দিন, আমি ভজুয়া পয়েন্টসম্যানকে দিয়ে আনিয়ে রাখবো বাজার থেকে...

এক এক দিন তার কোটটার পকেট থেকে ময়লা রুমালখানা বালিশের তোয়ালেখানাকে সাবান দিয়ে ধুয়ে রৌদ্রে দড়ির টানায় মেলে দিয়ে চলে গিয়েছে. ট্রেন পাস করে বাসায়

ফিরে এসে সে দেখতে পায়। তারপর উপরি উপরি দিন কয়েক সে অদৃশ্য সেবা-হস্তের সন্ধান পাওয়া যায় না, হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে একদিন চোখে পড়ে ঘরের তক্তপোশের নিচে তার ছোট পাথর-বাটিতে এক বাটি বেলের শরবৎ কে সযত্নে ঢাকা দিয়ে রেখে গিয়েছে।

স্কুল-মাস্টারদের মেসের বাসায় তাস খেলার ফাঁকে ফাঁকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। টিকিট-বিক্রির জানালায় পয়সা গুণে দিতে দিতে ভুল হয়, নির্জন শয্যা প্রান্তের সাথী মাদার গাছটার অন্ধকার ডালপালার সীমারেখা আরও অদ্ভুত অদৃষ্টপূর্ব মনে হয়।

ঝি পাঁচীর-মা সেদিন অত্যন্ত বেলায় কাজ করতে এল। কৈফিয়তের সুরে বললে —একটু বেলা হয়ে গেল বাবু, এই দুপুরের গাড়িতেই রেণু দিদি আবার চলে যাবে কিনা তাই সকাল সকাল বড়বাবুদের পাট সেরে তবে আসছি।...

সুরেশ যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললে—রেণু? আজ চলে যাবে? কই তা তো...কেন আজ কেন? আমি তো কিছুই জানিনে...

কথাটা বলেই সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে চুপ ক'রে রইলো। পরের বাড়ির মেয়ে তার সংগে তো পরামর্শ ক'রে মেয়েটির যাতায়াত ধার্য হবে না। যায় যাক না—তার কি?

পাঁচীর-মা বললে—নিজের বাপের কাছে চলে যাবে। বাপ সেখানে বিয়ের সম্বন্ধ করেছে কিনা তাই মেয়ে দেখতে আসবে। গেলেই বাঁচে, যে মামী—খাটিয়ে খাটিয়ে মুখে রক্ত উঠিয়ে মারে, না একটু যত্ন—না একটু আত্তি...

বারোটার ডাউন ট্রেন আসবার বেশী দেরী নেই। সুরেশ এই মাত্র খেয়ে উঠে পান মুখে দিয়ে কোট পরছে, রেণু বাসার সদর দরজা পার হয়ে উঠোনে এসে ঢুকলো। একটু যেন ইতঃস্তত করে পরে ঘরে ঢুকে বললে—আমার একটা সেপ্‌টি-পিন সেদিন কি এখানে ফেলে গিয়েছি?

সুন্দর করে চুল-বাঁধা, পরনে খয়েরী রঙ-এর জমির ওপর প্লেন জরির কাজ করা ছেলেমানুষের মতো শাড়ি, গলায় সরু চেনহার, একরাশ ঘন কৃষ্ণ চুলে ভরা শান্ত মুখ!

সুরেশ বললে—তুমি আজ চলে যাবে রেণু? কই সে কথা তো জানিনে? এই বারোটার গাড়িতেই বুঝি?

রেণু এ-কোণ ও-কোণ কি খুঁজছিল। বললে—আবার এই কাঁচের গেলাসটা সোজা করে বসিয়ে রেখেছেন? একটা ভেঙেছেন যে এমনি করে সেদিন—হ্যাঁ, আমি তো এই গাড়িতেই যাবো...একটা সেফ্‌টি-পিন দেখেছেন কোথাও? কোন্ প্রশ্নটির উত্তর সুরেশ আগে দেবে ভেবে ঠিক করবার আগেই রেণু বলে উঠলো—নাঃ, সে পাওয়া যাবে না। আচ্ছা আমি যাই, গাড়ি এল বলে...

কথা শেষ করেই হঠাৎ সে সুরেশের পায়ের কাছে উপুড় হয়ে প্রণাম করে উঠে শান্ত নত মুখে সদর দরজা পার হয়ে চলে গেল।

পূর্বেও ঘরে কেউ ছিল না, এখনও কেউ নেই—তবুও সন্ধ্যার ট্রেনখানা পাস করে দিয়ে বাসায় ফিরে এসে সুরেশের মনে হোল—সব খালি, কেউ কোথাও নেই, ঘরের আসবাব-পত্র শূন্যতায় ভরা!...

মাসখানেক পরে বড়বাবু সুরেশের কাছে এক অভাবনীয় প্রস্তাব উত্থাপিত করলেন। সে তাঁর ভগ্নিপতির স্বঘর, বিশেষতঃ রেণু মেয়েটিকে সে অবশ্যই দেখেছে, সংক্ষেপে রেণুর সংগে তার বিবাহের প্রস্তাব।

প্রথমে সুরেশের কথাটা যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হোল না, পরে চুপ করে রইলো। বড়বাবু প্রবীণ ব্যক্তি, সুরেশের বয়স সবে তেইশ, সুতরাং বড়বাবু সুরেশের সংগে এ-বিষয়ে এর বেশি আর কোন কথাবার্তার আবশ্যক দেখলেন না। তার কাছে ঠিকানা জেনে

নিয়ে তার জ্যাঠামশায়কে পত্র দিলেন। বিবাহের যোগাযোগ ও অন্যান্য কথাবার্তা চলতে লাগলো। ইতিমধ্যে সুরেশের জ্যাঠামশায় রেণুর বাপের কর্মস্থানে পাত্রী দেখে এসে সুরেশকে ও বড়বাবুকে জানালেন--পাত্রী সুন্দরী, তাঁদের খুব পছন্দ হয়েছে। সামনের মাসেই শুভকাজ সম্পন্ন হয় এই তার ইচ্ছা।

শীঘ্রই কিন্তু একটু গোল বেধে গেল। উভয়ের ঠিকুজী কোষ্ঠি মেলাতে গিয়ে দেখা গেল মেয়ের রাসক্ষ-গণ! মিলনের বহু বাধা, নক্ষত্রেরা সব তির্যগ্‌গতিতে অবস্থান করছেন—বিবাহ অসম্ভব। সুরেশের বিধবা মা কেঁদে বললেন—তাঁর ছেলের নর-গণ, তিনি কখনই এ পাত্রীর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবেন না। জ্যাঠামশায়ও সম্মতি দিতে পারলেন না, তবে খুব দুঃখিত হলেন, কারণ মেয়েটিকে তাঁর ভারী ভাল লেগেছিল।

সুরেশ বাড়িতে চিঠিপত্র দেওয়া একেবারে বন্ধ করে দিলে। তবে তার স্বগ্রামস্থ কোন বন্ধুকে লিখিত পত্রের সংবাদে বাড়ির সকলে জানতে পারলে যে সে শীঘ্রই গেরুয়া ধারণ করে রামকৃষ্ণ-মঠে যোগ দেবে। সুরেশের মা দেশ থেকে রেলের বাসায় এসে পড়লেন। নানা মতে বোঝালেন, কান্নাকাটিও কম করলেন না। পাঁচীর-মার মুখে রেণু ও সুরেশের পূর্ব-পরিচয়ের সব কথা শুনে বললেন—কোথাকার এক রাক্ষুসি সে আমার ছেলেকে ফাঁদ পেতে ধরতে এসেছিল। তোর বিয়ে না হয় এমনি বেঁচে থাক। দরকার নেই আমার ছেলের বউয়ের সেবার—ইত্যাদি।

বিবাহ হোল না। বিবাহ ভাঙবার পর থেকে বড়বাবুর বাসার সঙ্গে সুরেশের সদ্ভাবও আর তেমন রইলো না। বড়বাবু আর ভাল করে কথাই বলেন না।

বছর ঘুরতে না ঘুরতে সুরেশের অন্যত্র বিবাহ হয়ে গেল। অবস্থাপন্ন ঘরের সুন্দরী মেয়ে, নাম আভাবতী। বেশ নম্র লাজুক।

সুরেশ বিবাহের অল্পদিন পরেই নব বধূকে রেলের বাসায় নিয়ে এল। মাদার গাছের তলাকার ছোট্ট বাসাটিতে, তারপর তারা দুজনে যে সুখের নীড় বাঁধলো সুরেশের তা কত সীমাহীন নির্জন রাত্রির স্বপ্ন!...শেষ পর্যন্ত সুরেশের মনে হোল—ভালই হয়েছে সে বিয়েটা না হয়ে, গণকের কথা একেবারে উড়িয়ে দেবার জিনিস তো আর নয়? ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। ইতিমধ্যে আরো দুটো খবর সে পেয়েছে—রেণুর বিবাহ কোনো রকমে হয়ে গিয়েছে এবং বিবাহের কিছুদিন পরেই রেণুর বাপ কলেরায় মারা গিয়েছেন।

আরও এক বছর কাটলো। আভাবতী শুধু যে দেখতে সুন্দরী তা নয়, তার আয়-পয়ও যে খুব ভাল তার প্রমাণও শীঘ্র উপস্থিত হোল। সুরেশ বিখ্যাত পাটের ব্যবসায়ের গঞ্জ রসুলপুর স্টেশনের অস্থায়ী চার্জ পেয়ে বদলির হুকুম তামিল করবার জন্যে প্রস্তুত হোল, মাইনেও গেল বেড়ে।

যাবার দিন ক্রমেই নিকটে এসে গেল। স্কুল-মাস্টারেরা মেসের বাসায় তাকে এক বিদায়ভোজে নিমন্ত্রণ করে আকণ্ঠ খিচুড়ি ও ইলিশ মাছ ভাজা খাওয়ালেন। সে চলে যাওয়াতে যে সলিমপুরের বিশেষ ক্ষতির কারণ ঘটলো, এ-সম্বন্ধে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের কারো দুমত দেখা গেল না। সে অভাব ভবিষ্যতে পূরণ হওয়ার বিষয়েও অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করলেন।

রওনা হওয়ার পূর্বদিন সারা বিকেল ধরে জিনিসপত্র গোছানো হোল। আভাবতী ভারী গোছালো মেয়ে। সন্ধ্যার আগেই সব জিনিস বাঁধাছাঁদা ঠিক হয়ে গেল—মায় ট্রাঙ্ক বন্ধ করার আগে স্বামীর আয়না-চিরুনি, পানের ডিবেটি সকলের ওপরে রাখা পর্যন্ত—পাছে বা কখনো পথে দরকার হয়।

সকাল সাড়ে ন'টার ডাউন যাত্রী গাড়ি স্টেশনে এসে লাগলো। ছোট্ট স্টেশন, বেশীক্ষণ গাড়ি দাঁড়ায় না। যাত্রীর দল কে কার ঘাড়ে পড়ে এই রকম অবস্থায় ওঠা-নামা করছে। সুরেশ স্টেশনের কুলীদের সাহায্যে মালপত্র ওঠানোর ব্যবস্থা করে দিয়ে স্ত্রীকে মেয়ে-কামরায় তুলে দিতে গেল। মেয়ে-গাড়ির সামনে প্ল্যাটফরমের কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলায় এইমাত্র একটি অল্পবয়সী মেয়ে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে সম্ভবতঃ মালপত্র নামাবার অপেক্ষা করছে। সঙ্গে একজন প্রৌঢ়া একটি ছোট্ট ট্রাঙ্ক ও একটা বড় বোঁচকা নিকটে নামালো। সুরেশ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আর একবার ভাল করে চেয়ে দেখলে। না, তার ভুল হয়নি···ঠিকই দেখেছে সে।

সরুপাড় ধুতি পরা, হাত খালি, মাথায় আধরুক্ষ চুল, বিধবা বেশে রেণু। সুরেশ সেখানে আর দাঁড়াতে পারলো না, দিশেহারা ভাবে এসে নিজের গাড়িতে উঠলো। রেণু সম্ভবতঃ তাকে দেখেনি, তার চোখ অন্যদিকে ফেরানো ছিল।···সুরেশের সারা শরীর দিয়ে কি যেন একটা ঝাঁজ বেরুচ্ছিল। নিজের কতকটা অজ্ঞাতসারে তার মনে হোল—উঃ, কি বেঁচেই গিয়েছি! মার কথা যদি তখন না শুনতাম? রাক্ষুসীর ফাঁদই তো বটে! আটকেছিল তো পা আর একটু হলেই ফাঁদে? তার আরও মনে হোল, বড়বাবু এ-খবর পূর্বেই জানতেন কিন্তু প্রচার হতে না দিয়ে গোপন রেখেছিলেন।

তারপর কখন গার্ড হুইসিল দিয়েছে, কখন গাড়ি চলেছে এ-সব তার খেয়াল নেই। ···কৃষ্ণচূড়া গাছের সামনে আসতে সে চেয়ে দেখলে প্ল্যাটফরমের পূর্বদিকে তারের বেড়ার ওপরকার খিলান বসানো পাকা ধাপ ডিঙিয়ে আগে আগে মালপত্র হাতে ভজুয়া পয়েন্টসম্যান, পেছনে প্রৌঢ়াটি ও সর্বশেষে নম্রমুখী রেণু, বড়বাবুর কোয়ার্টারের দিকে চলেছে।···

হঠাৎ সুরেশের মনে দূর-সম্পর্কিত সহানুভূতিশূন্য এক আত্মীয়ের দারস্থ এই পিতৃমাতৃহীনা নিরপরাধা অভাগিনী বালিকার ছবিটি সম্পূর্ণ অন্যভাবে ফিরে এল। কার অপরাধে এই প্রস্ফুট-মুকুল-প্রথম-বসন্তের দিনে তার জীবনের আনন্দদীপটি নির্বাপিত হয়ে গেল চিরদিনের মত?···

দ্রুতগামী ট্রেনের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সে আর একবার চেয়ে দেখলে—রাক্ষসগণের মেয়ে ততক্ষণে বড়বাবুর সদর দরজায় পৌঁছে দাঁড়িয়ে আছে, দরজা তখনও খোলা হয়নি, বোধহয় ভজুয়া কাউকে ডকাতে গিয়ে থাকবে।

পদবৃদ্ধিজনিত কিছুক্ষণ পূর্বের সে আনন্দ সুরেশ আর মনের মধ্যে খুঁজে পেল না।

দাতার-স্বর্গ

শ্রেষ্ঠী কর্ণসেন ছিলেন খুব দাতা। পথের দুঃখী আতুর নিরাশ্রয় লোককে চিরদিন তিনি আশ্রয় দিয়ে এসেছেন। সকলে বলতো তাঁর মত লোক আর হয় না; স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা নেমে এসেছেন নবরূপ ধরে' প্রজার দুঃখ দূর করতে।

সামান্য ভাবে থাকলেও কর্ণসেন ছিলেন মস্ত ধনী। এই সব ধন বিতরণ করে' তিনি চিরদিন মহা সুখ পেয়ে এসেছেন। পথ চলতে চলতে অন্য অন্য কৃপণ-ধনীদের মূল্যবান অশ্বযোজিত-রথে রাজপথ কাঁপিয়ে চলে যেতে দেখে কর্ণসেন মনে মনে ভাবতেন—এই সব স্বার্থপর ধনীর চেয়ে আমি কত বড়! পরক্ষণেই কিন্তু তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে ভাবতেন—না না, ও-কথা না, কে কাকে দেয়? ভগবান শুধু আমার মধ্যে দিয়েই তাঁরই ধন তাঁর জীবদের দিচ্ছেন বই তো নয়।

তখনই আবার তাঁর মনে হোত—আমি কি নিরহঙ্কার! আছে আছে, আমার ভেতরে

কিছু না থাকলেই কি আর এত লোক থাকতে কেবল আমাকেই দিয়ে ভগবান তাঁর··· অমনি আবার সামলে নিয়ে জোর করেই মনকে বোঝাতেন—না না, ও কি, না, ছিঃ!

কিন্তু অহংকার যতই ছুঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করুন না কেন, মনের কোন গোপন-কক্ষে এ ভাব তাঁর জেগেই থাকতো—আমি এমন যে দানের আত্মপ্রসাদটাও চাপতে চেষ্টা করছি। ওই সব লোকে আর আমাতে কত তফাত! আমি একজন সাধু ব্যক্তি!

সেবার রাজ্য জুড়ে মড়ক উপস্থিত হোল। চারিদিকে লোক বর্ষাকালের বাদলপোকার মত মরতে শুরু করে' দিল। রাজ্যময় মহা হাহাকার। নিরাশ্রয় রোগীদের ভিড়ে নগরের আরোগ্যশালাগুলি ভর্তি হয়ে গেল! নতুন রোগী এসে আর স্থান পায় না, নগরের পথের ওপর তাদের মৃতদেহের স্তূপ ক্রমেই উঁচু হয়ে উঠতে লাগলো।

সকল রকম সৎকার্যের চিন্তা দাতা কর্ণসেনেরই মনে সকলের আগে এসে পৌঁছত। রাত্রে শুয়ে তাঁর মনে হোল—এক কাজ করি না কেন? আমার এই এত বড় প্রাসাদ যদি আরোগ্যশালার জন্যে ছেড়ে দিই, তবে কত রোগী এখানে এসে আশ্রয় নিতে পারে। আমার এত বড় প্রাসাদে কি প্রয়োজন?

পর মুহূর্তেই তাঁর মনে হোল—ওই! ওই যে আমার মনে একথা উঠলো, সে শুধু এই বিশাল রাজ্যের মধ্যে ভগবানের একমাত্র চিহ্নিত দাস বলেই। কই, আর তো কেউ···

তখনিই আবার ভাবলেন—না, ছিঃ, ও-সব অহংকারের কথা।

সেদিন সমস্ত দিন ধরে' তাঁর মনে হতে লাগলো—দিই বাড়িখানা ছেড়ে! লোকে এসে এখানে আশ্রয় নিক্।

তারপর তিনি ভাবলেন—না, যাক্ গে যাক্। বাড়ি ছেড়ে দেবার কোনো দরকার নেই। কতদিন এ মড়ক চলবে তার কিছু ঠিকানা নেই, বাড়ি ছেড়ে দেওয়া, সে যে মহা অসুবিধে।

পথ চলতে চলতে তাঁর চোখে পড়তো, নিরাশ্রয় আর্তদের অসহায় শীর্ণ মুখগুলি। তাঁর মন তখনি দয়ার আবেগে ভরে' উঠতো, ভাবতেন—দিই বাড়ি ছেড়ে! এদেরই তো বাড়ি। ভগবান আমার মধ্যে দিয়ে তাঁর দয়া প্রকাশ করেছেন, এই ইচ্ছা তাঁরই দেওয়া···

মনের এক গভীর গোপন-তল থেকে এ-কথা জাগতো—উঃ! দেখছ, দেখছ! মনটা আমার কি রকম দেখেছ একবার!

হতভাগ্য দরিদ্রের মৃত্যুকাতর শীর্ণ শুষ্ক মুখগুলো মনে করে' তাঁর চোখে জল আসতো।

মনে তাঁর উঁচুভাবের ঢেউ এল—গেল। অন্যান্য বার এই সব ভাবের আবেগেই তিনি অকাতরে পরের দুঃখ মোচন করে' এসেছেন, এবার কিন্তু তিনি মনের সে ভাবটাকে চেপে রাখলেন। ভাবলেন—না না, বাড়ি নয়, টাকা যেমন দিই, তেমনি কিছু দেব এখন।

মনের সে গোপন-তল থেকে এ-কথা উঠলো—আমি যে খারাপ লোক তা তো নয়। কতবার তো কত দিয়েছি—এবার যদি নাই দিই? আর লোক যে আমি কৃপণ তাও তো নয়—আমি উঁচুই। তবে এবার···

সেবা-যত্ন শুশ্রূষার অভাবে মৃত হতভাগ্য দরিদ্রের শবের পূতিগন্ধে নগরের বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো।

এমন সময়ে হঠাৎ একদিন শোনা গেল যে, নগরের এক কৃপণ-ধনী—এ পর্যন্ত যিনি কোনো সৎকাজে এক কানাকড়িও কোনো দিন দান করেন নি—তাঁর বৃহৎ অট্টালিকা ছেড়ে দিয়েছেন নিরাশ্রয় রোগীদের আরোগ্য লাভের জন্য!

মহাপ্রাণ ধনীর জয়-গীতে নগর-পথ মুখরিত হতে লাগলো।

কিছু না থাকলেই কি আর এত লোক থাকতে কেবল আমাকেই দিয়ে ভগবান তাঁর… অমনি আবার সামলে নিয়ে জোর করেই মনকে বোঝাতেন—না না, ও কি, না, ছিঃ!

কিন্তু অহংকার যতই ছুঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করুন না কেন, মনের কোন গোপন-কক্ষে এ ভাব তাঁর জেগেই থাকতো—আমি এমন যে দানের আত্মপ্রসাদটাও চাপতে চেষ্টা করছি। ওই সব লোকে আর আমাতে কত তফাত! আমি একজন সাধু ব্যক্তি!

সেবার রাজ্য জুড়ে মড়ক উপস্থিত হোল। চারিদিকে লোক বর্ষাকালের বাদলপোকার মত মরতে শুরু করে' দিল। রাজ্যময় মহা হাহাকার। নিরাশ্রয় রোগীদের ভিড়ে নগরের আরোগ্যশালাগুলি ভর্তি হয়ে গেল! নতুন রোগী এসে আর স্থান পায় না, নগরের পথের ওপর তাদের মৃতদেহের স্তূপ ক্রমেই উঁচু হয়ে উঠতে লাগলো।

সকল রকম সৎকার্যের চিন্তা দাতা কর্ণসেনেরই মনে সকলের আগে এসে পোঁছত। রাত্রে শুয়ে তাঁর মনে হোল—এক কাজ করি না কেন? আমার এই এত বড় প্রাসাদ যদি আরোগ্যশালার জন্যে ছেড়ে দিই, তবে কত রোগী এখানে এসে আশ্রয় নিতে পারে। আমার এত বড় প্রাসাদে কি প্রয়োজন?

পর মুহূর্তেই তাঁর মনে হোল—ওই! ওই যে আমার মনে একথা উঠলো, সে শুধু এই বিশাল রাজ্যের মধ্যে ভগবানের একমাত্র চিহ্নিত দাস বলেই। কই, আর তো কেউ…

তখনিই আবার ভাবলেন—না, ছিঃ, ও-সব অহঙ্কারের কথা।

সেদিন সমস্ত দিন ধরে' তাঁর মনে হতে লাগলো—দিই বাড়িখানা ছেড়ে! লোকে এসে এখানে আশ্রয় নিক্।

তারপর তিনি ভাবলেন—না, যাক্ গে যাক্। বাড়ি ছেড়ে দেবার কোনো দরকার নেই। কতদিন এ মড়ক চলবে তার কিছু ঠিকানা নেই, বাড়ি ছেড়ে দেওয়া, সে যে মহা অসুবিধে।

পথ চলতে চলতে তাঁর চোখে পড়তো, নিরাশ্রয় আর্তদের অসহায় শীর্ণ মুখগুলি।

তাঁর মন তখনি দয়ার আবেগে ভরে' উঠতো, ভাবতেন—দিই বাড়ি ছেড়ে! এদেরই তো বাড়ি। ভগবান আমার মধ্যে দিয়ে তাঁর দয়া প্রকাশ করেছেন, এই ইচ্ছা তাঁরই দেওয়া…

মনের এক গভীর গোপন-তল থেকে এ-কথা জাগতো—উঃ! দেখছ, দেখছ! মনটা আমার কি রকম দেখেছ একবার!

হতভাগ্য দরিদ্রের মৃত্যুকাতর শীর্ণ শুষ্ক মুখগুলো মনে করে' তাঁর চোখে জল আসতো।

মনে তাঁর উঁচুভাবের ঢেউ এল—গেল। অন্যান্য বার এই সব ভাবের আবেগেই তিনি অকাতরে পরের দুঃখ মোচন করে' এসেছেন, এবার কিন্তু তিনি মনের সে ভাবটাকে চেপে রাখলেন। ভাবলেন—না না, বাড়ি নয়, টাকা যেমন দিই, তেমনি কিছু দেব এখন।

মনের সে গোপন-তল থেকে এ-কথা উঠলো—আমি যে খারাপ লোক তা তো নয়। কতবার তো কত দিয়েছি—এবার যদি নাই দিই? আর লোক যে আমি কৃপণ তাও তো নয়—আমি উঁচুই। তবে এবার…

সেবা-যত্ন শুশ্রূষার অভাবে মৃত হতভাগ্য দরিদ্রের শবের পূতিগন্ধে নগরের বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো।

এমন সময়ে হঠাৎ একদিন শোনা গেল যে, নগরের এক কৃপণ-ধনী—এ পর্যন্ত যিনি কোনো সৎকাজে এক কানাকড়িও কোনো দিন দান করেন নি—তাঁর বৃহৎ অট্টালিকা ছেড়ে দিয়েছেন নিরাশ্রয় রোগীদের আরোগ্য লাভের জন্য!

মহাপ্রাণ ধনীর জয়-গীতে নগর-পথ মুখরিত হতে লাগলো।

কর্ণসেন ভাবলেন—এঃ, কাজটা বড় খারাপ হয়ে গেল দেখছি। তাই তো, কি করা যায়!

পরদিন তিনি শুনলেন, কৃপণ-ধনীর মহান দানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নগরের আর একজন ধনী বণিক তাঁর বাড়িও রোগীদের জন্যে ছেড়ে দিয়েছেন!

আনন্দ-কোলাহলে নগরে কান পাতা দায় হোল।

অন্যান্য বার সকল মহৎকার্যের অগ্রণী হতেন কর্ণসেন। তাঁরই দেখাদেখি অপরে তাঁর পথ ধরতো। এবার তিনি সে গৌরব থেকে বঞ্চিত হলেন। তাঁর মনে হতে লাগলো—কই! আমি যে তাঁর চিহ্নিত ব্যক্তি, তা কই? এতদিন ভুল বুঝেছি। কাজ করাবেন ইচ্ছে করলে ভগবান পাষাণকেও গলিয়ে কাজ করাতে পারেন। নইলে পরীক্ষিৎ ওই কঞ্জুষ, ও কিনা নিজের বাড়ি...

কর্ণসেনের অহংকার চূর্ণ হোল। তিনি ভাবলেন—ভগবানের কাছে চিহ্নিত অচিহ্নিত পাত্রাপাত্র নেই—সবাই সমান আর আমিই বা এমন সাধুব্যক্তি কই? আমি যে ত্যাগ স্বীকার করতে পেরে উঠলাম না, অপরে তা তো করলে।

মনে মনে নিজেকে ত্যাগী পরার্থপর বলে, যে আত্মপ্রসাদ তাঁর মনে জাগতো, তা একেবারে দূর হয়ে গেল। নিজের প্রতি একটা অশ্রদ্ধাই তাঁর এসে পড়তে লাগলো।

এদিকে প্রতিদিনই শোনা যেতে লাগলো, মহাপ্রাণ দাতাগণের পথ অনুসরণ করে আরও অনেক লোকে তাঁদের বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছেন। কর্ণসেনের বন্ধু-বান্ধবেরা এসে তাঁকে চুপি চুপি জানিয়ে গেল, তিনিও যেন শীঘ্র একটা কিছু করেন। লোকে এবার তাঁকে নীরব থাকতে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে। পূর্বে সকল সৎকাজই তিনি সকলের আগে করতেন, এবার তিনি অবিলম্বে একটা কিছু না করলে দুর্নাম রটবে।

কর্ণসেন ভাবলেন—পরের দেখাদেখি এবং লোকের কাছে দুর্নাম রটবার ভয়ে তাঁকে দান করতে হবে! কি গৌরব সে দানের? আর যদিও বাইরের লোকে তার গৌরব করতে পারে কিন্তু মনে মনে তিনি তো বেশ বুঝতে পারছেন এ দানে তাঁর কিছুমাত্র মহত্ত্ব নেই। যদি তাঁকে দান করতে হয় তো সে দায়ে পড়ে, মান বাঁচাবার জন্যে। এ দায়ের কথা মনে হলেই যে তাঁর মন নিচু হয়ে যাবে! অন্যান্য বারের মত সে উচ্চ আত্মপ্রসাদ কই এখানে?

কর্ণসেন মনে মনে মহা চটে গিয়ে ঠিক করলেন, তিনি কিছুই করবেন না। লোকে যা বলে বলুক, যে দান স্বার্থপ্রসূত, যার মূলে লোকের কাছে নিজের মান বাঁচানোর কথা নিহিত, এমন দান তিনি কখনো করবেন না।

শয্যায় শুয়ে অনেক রাত্রে কর্ণসেনের ঘুম ভেঙে গেল। জানালার বাইরে চেয়ে দেখলেন, দূর আকাশের নীল-সাগরের পারে একটি নক্ষত্র যেন তাঁর দিকেই চেয়ে জ্বলছে, প্রলয়কালের বিশ্বের অনন্ত-জলময়ী প্রসারতার মাঝখানে অনাদিকারণ প্রজাপতির চির-জাগ্রত নেত্র-জ্যোতির মত!...আকাশের নিথর নীল বুকে শুভ্র-জ্যোৎস্নার তরঙ্গগুলো যেন তাঁরই সৃজন বীণার মর্মস্পর্শী নীরব রবে কেঁপে কেঁপে উঠছে!...

কর্ণসেন ভাবলেন—উঃ, কি সুযোগই হারিয়েছি! আজ যদি আমার বাড়িখানা ছেড়ে দিতাম তো এই রাত্রের সঙ্গে আমার প্রাণের একটা যোগ হোত। আমার সঙ্গে ভগবানের আর কোন সম্বন্ধই নেই, কারণ আমি স্বার্থপর, আমি তাঁর প্রেরণার অবমাননা করেছি।

আকাশের সে দূর-নক্ষত্রটির ভর্ৎসনা থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে কর্ণসেন জানালা বন্ধ করে দিলেন।...

হঠাৎ আতুরদের মৃত্যুছায়াচ্ছন্ন মুখগুলি আবার তাঁর মনে এল—আহা, এই রাত্রে তারা সব আশ্রয় অভাবে পথে শুয়ে রয়েছে!...

কর্ণসেন ভাবলেন—দিই না বাড়িখানা ছেড়ে! অবশ্য এ দানে আমার আর কোনো গৌরব নেই, কিন্তু তা নাই বা হোল, এই নিরাশ্রয় লোকগুলো তো আশ্রয় পাবে? এই শীতে তারা যে সব পথে শুয়ে মরছে!...

কর্ণসেনের মনের সে গোপন কক্ষটিতে এবার আর কোনও সুর শুনতে পাওয়া গেল না। তার পরদিন নগরের লোকে শুনলে, কর্ণসেন তার বিরাট প্রাসাদ-তুল্য বাড়ি নগরের দুস্থ আতুরদের আরোগ্যশালার জন্যে ছেড়ে দিয়েছেন। এ ব্যাপারটা তখন আর নতুন নয়। কেউ কেউ একটু আধটু প্রশংসা করলে। কেউ ভাবলে, দেবার ইচ্ছে ছিল না, মানের দায়ে দিতে হোল।

যথাসময়ে কর্ণসেনের মৃত্যু হোল। তিনি তাঁর কৃতকার্যের ফলাফল শুনতে যমরাজের খাস-দরবারে নীত হলেন।

তিনি খাতা দেখে বললেন—দাতার স্বর্গ-ই হচ্ছে সমস্ত স্বর্গ থেকে শ্রেষ্ঠ। এক একটি দানে শত মন্বন্তর করে সে-স্বর্গ বাস করবার অধিকার জন্মায়। তোমার একশত মন্বন্তর দাতার স্বর্গে বাস করা মঞ্জুর হয়েছে।

সামনে প্রকাণ্ড খাতা খুলে বসে চিত্রগুপ্ত।

কর্ণসেন একটু ভেবে মাথা চুলকে বললেন—বোধহয় হিসেবে ভুল হয়ে থাকবে, আর একবার না হয়—কারণ...

চিত্রগুপ্ত খাতার পাতায় আর একবার চোখ বুলিয়ে বললেন—না, ভুল হয় নি। তুমি একবার তোমার বসতবাটী অত্যন্ত মড়কের সময় তোমার দরিদ্র প্রতিবেশীদের উপকারের জন্যে ছেড়ে দিয়েছিলে—এই একটি ছাড়া তোমার অন্য কোন দানের কথা তো খাতায় লেখা দেখছি নে বাপু।

কর্ণসেন বেকুবের মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

যমরাজ অন্য কি কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি অন্তর্যামী; কর্ণসেনের মনের কথা তাঁর মনে গিয়ে পোঁছলো। তিনি মুখ তুলে হেসে বললেন—বুঝেছি বাপু। কিন্তু তোমার অন্য অন্য দানের পুরস্কার আমরা তো তোমাকে সঙ্গে সঙ্গেই দিয়ে দিয়েছি। তুমি দান করে কি একটা সুন্দর আত্মপ্রসাদ উপভোগ কর নি?

কর্ণসেন বিনীতভাবে ঘাড় নেড়ে তা স্বীকার করলেন।

যমরাজ বললেন—সেই-ই তো আমাদের পুরস্কার! তোমার জন্মভূমি তোমার দানের খ্যাতিতে ভরে গিয়েছে, তুমি নিজে একটা সুন্দর তৃপ্তি অনুভব করেছ, ওই তো সে-সব দানের পুরস্কার। কিন্তু তুমি একটি দান একবার করেছিলে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে ভুলে গিয়েই শুধু পরের দুঃখ মোচন হবে বলে। নিজের দিকে সে-বার তুমি চাও নি। তোমার সে দানের পুরস্কার তখন হাতে হাতে দিয়ে তোমার দানকে অপমানিত করতে আমরা সাহস করিনি। সেইটেই তোমার পাওনা আছে।

গ্রহের ফের

"গত ২২শে অগ্রহায়ণ শনিবার কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌স্টিটিউটে অধ্যাপক নলিনাক্ষ রায়চৌধুরীর দ্বাদশ শ্রদ্ধাবাসরীয় স্মৃতি-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। গণ্যমান্য অনেক বক্তা উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। হলটি শ্রোতৃবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

তম্মধ্যে কলেজের ছাত্র সংখ্যাই অধিক। অধ্যাপক রায়চৌধুরী মহাশয় বাঙ্গালী জাতীর গৌরব ছিলেন ; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, অদ্য দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার কোনো স্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়া উঠিল না! সভার উদ্যোগীগণের উৎসাহ প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা স্বর্গত অধ্যাপক-মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার কোনো স্থায়ী ব্যবস্থার উদ্যোগ করিলে দেশবাসীর সমধিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।"

অধ্যাপক নলিনাক্ষবাবুর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হয়, বড় আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু সকালে উঠে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে 'বসুমতীর প্যারাটা' পড়তে আর একজন লোকের কথা মনে পড়ে গেল। নলিনাক্ষবাবুর মত তিনি ভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন না, বর্তমান কালের তরুণদলের অনেকেই তাঁকে দেখেন নি, কারণ আজ আঠাশ বছর হোল তাঁর মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু যাঁরা দেখে থাকবেন তাঁরা সেই পক্ককেশ, সৌম্যদর্শন বৃদ্ধের চেহারা এখনও ভুলে যান নি নিশ্চয়ই।

আমি বলছি স্বর্গত রাজচন্দ্র সেন মহাশয়ের কথা।

নলিনাক্ষবাবু ও রাজচন্দ্রবাবু একই কলেজে পড়াশুনা করেছিলেন। নলিনাক্ষবাবু প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে সরকারী বৃত্তি নিয়ে কেম্ব্রিজ যান এবং সেখান থেকে ফিরে এসে প্রেসিডেন্সী কলেজেই অধ্যাপক নিযুক্ত হন! রাজচন্দ্রবাবু তাঁর পূর্ব থেকেই সেখানে অধ্যাপক। আমি তখন ছাত্র। মোটে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছি পাড়াগাঁয়ের স্কুল থেকে এসে। ইডেন হিন্দু-হস্টেলে থাকি। ভয়ে ভয়ে কলকাতার পথে বেড়াই, কি জানি কখন গাড়ি-ঘোড়া চাপা পড়ি, কি পথই হারিয়ে বসি! এত চায়ের দোকান তখন ছিল না, কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে দু'তিনটেই যা ছিল। জাত যাবার ভয়ে তার ত্রিসীমানায় কখনও পা দিতাম না। এ-সবের দরুণ অজ-পাড়াগেঁয়ে বলে একটা অখ্যাতিও রটে ছিল আমার নামে।

সেদিন শনিবার! বেশ মনে আছে কি একটা ছুটি উপলক্ষে আমি বাড়ি যাবো। শোনা গেল পদার্থ-বিদ্যার লেকচার-থিয়েটারে রাজচন্দ্রবাবু একটা প্রবন্ধ পড়বেন। উৎসাহে পড়ে হোস্টেলের আরও দশজনের সঙ্গে আমিও গিয়ে গ্যালারীতে ভিড় বাধিয়ে তুললাম। খুব গোলমাল হচ্ছিল। হঠাৎ প্রবন্ধ-পাঠক বক্তৃতা মঞ্চে উঠতেই গোলমাল থেমে সব চুপ হয়ে গেল। প্রকাণ্ড মাথা ও একমুখ আধকালো, আধপাকা, খাটো ঘন দাড়ি, বেঁটে চেহারা, মাথাটা দেহের অনুপাতে অত্যন্ত বড়। শ্মশ্রুযুক্ত বামনের মত চেহারাখানা। চোখ দুটোর দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ন চকচকে ইস্পাতের মত একটা অস্বাচ্ছন্দ্য-কর দীপ্তি! ফার্স্ট ইয়ারে শ্রেণীর ছাত্র, উচ্চাঙ্গের গণিত বিষয়ক কোন প্রবন্ধ বোঝাবার কোনো ক্ষমতা না থাকলেও ; গ্যালারীতে ছাত্রের ভিড়, কলেজের বহু অধ্যাপকের উপস্থিতি, প্রবন্ধের ভেতরকার অপরিচিত বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাগুলি ও সেগুলির উচ্চারণ-ধ্বনি, সকলের ওপর বক্তার চেহারা—সব মিলিয়ে আমার বড় ভাল লাগলো।

তারপর আরও বক্তৃতা তাঁর শুনেছি, যত বুঝি আর না-বুঝি প্রত্যেকবারই আমার অন্ততঃ মনে হোত যে এমন একটা মনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছে, যা পথে-ঘাটে সুলভ নয়। যে-ধরনের লোক পৃথিবীটার ওজন মাপে, বড় গির্জা গড়ায়, সৌর-জগতের বয়স ঠিক করে, জোয়ারের সঙ্গে সময়ের সম্বন্ধ খাড়া করে, পৃথিবীর রেডিয়ম-ভাণ্ডার ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়—রাজচন্দ্রবাবুকে সেই শ্রেণীর মানুষ বলে মনে হোত। নলিনাক্ষবাবু বা রাজচন্দ্রবাবু কেউই আমাদের ক্লাসে পড়াতেন না। কলেজের তেতলার বারান্দায় কতদিন বক্তৃতা-ঘন্টার ফাঁকে দেখতাম রাজচন্দ্রবাবু অন্যমনস্ক হয়ে হেঁটে চলেছেন—এ অবস্থায় অনেক সময় তিনি নিজের পড়ানোর ক্লাসটিতে যেতে ভুলে গিয়ে হঠাৎ অন্য এক অধ্যাপনারত অধ্যাপককে বিপন্ন করে তাঁর ক্লাসটিতে ঢুকে পড়তেন এবং

পরক্ষণেই চমক ভেঙেগ অস্ফুটস্বরে কি বলেই সে ঘর থেকে বার হয়ে পড়তেন। ছেলেরা বলাবলি করতো, তিনি সব সময় গণিতের উ'চু বিষয় চিন্তা করেন, পৃথিবীর মাটির খবর রাখেন না!

তা না রাখুন তাতে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু রাজচন্দ্রবাবু উপরওয়ালার মেজাজের খবরটাও বড় একটা রাখতেন না বা রাখার জন্যে গ্রাহ্যও করতেন না। এটাই ছিল তাঁর মহৎ দোষ। প্রিন্সিপাল লসন সাহেবের নাম প্রেসিডেন্সি কলেজের সে সময়ের ছাত্রদের কাছে আর দুবার বলবার দরকার হবে না—খুব ভাল লোক, দর্শনে ট্রাইপসে জয়পতাকা উড়িয়ে পাস! সুতরাং শুধু হাকিমী চালচলনের প্রিন্সিপাল নন, বিদ্বানও বটে। তিনি রাজচন্দ্রবাবুকে অনেক রেহাই দিয়ে চলতেন। কিন্তু নিজের ডিপার্টমেণ্টের উপরওয়ালা নলিনাক্ষবাবুর সঙ্গে রাজচন্দ্রবাবুর বনিবনাও ছিল না আদৌ। কতদিন ছেলেরা দেখেছে, নলিনাক্ষবাবুর খাসকামরা থেকে রাজচন্দ্রবাবু অপ্রসন্ন মনে বিড় বিড় করে কি বকতে বকতে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে দুঁদে সওয়ারের পাল্লায়-পড়া বিপন্ন একরোখা ঘোড়ার ভঙ্গিতে বার হয়ে গেলেন। নলিনাক্ষবাবুর হুকুম ঠিক মত তামিল না করার মূলে রাজচন্দ্রবাবুর যে ইচ্ছাকৃত কোনো অভিনয় ছিল তা নয়—বোধহয় তাঁর স্বভাই ছিল সাধারণতঃ অন্যমনস্ক ধরনের। নলিনাক্ষবাবু অধস্তন কর্মচারীর এ রকম লর্ড কেলভিনের মত মেজাজ বরদাস্ত না করতে পেরে এবং সেটাকে তাঁর হুকুমের প্রতি সরাসরি ভাবের অমান্য ভেবে নিয়ে সব সময় পঞ্চমে চড়ে থাকতেন।

আমার সহপাঠী প্রতুল হোস্টেলে আমার পাশের ঘরেই থাকতো। অঙ্কে খুব পাকা, হুগলী জেলা থেকে টেম্পল বৃত্তি নিয়ে এণ্ট্রান্স পাস করে। চেহারা বেশ ভাল, আর একটু সেণ্টিমেণ্টাল ধরনের ছিল বলে' তাকে সকলে 'মিস গুপ্ত' বলে' ডাকতো। সেদিন সন্ধ্যার সময় সে হোস্টেলের বারান্দায় বসে আমার কাছে গল্প বললে, বিকালে রাজচন্দ্রবাবুর বাড়ি গিয়েছিল। সেখান থেকেই আসছে। আমি জানতাম, কলেজে যে সব ছেলে মুগ্ধ ভক্তের অর্ঘ্য নিবেদন করে প্রতুল সে-দলের একজন চাঁই। যেমন হয়ে থাকে কলেজে, ছেলেরা যে প্রফেসারকে পছন্দ করে, তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জমায়। প্রতুলও তারপর থেকে সপ্তাহে দুদিন তিনদিন রাজচন্দ্রবাবুর বাড়ি যাতায়াত শুরু করে দিলে।...একমাত্র মেয়ে ছাড়া তাঁর সংসারে কেউ নেই, বা তাঁর মেয়ের নাম যে প্রভাবতী এ-সব কথা আমি ঐ প্রতুলের মুখেই শুনেছিলাম। প্রতুলের মুখেই শুনতাম তাঁর বাড়িতে চায়ের বন্দোবস্ত ছিল না, কারণ তিনি নিজে চা খান না—ছেলেরা যাতায়াত শুরু করার পরে প্রভবাতী বাবাকে বলে চায়ের সমস্ত সরঞ্জাম আনিয়ে নিয়েছেন—নিজে চা পরিবেশন করেন, কাজেই আজকাল এদের—বিশেষ করে প্রতুলের কোনো অসুবিধা হয় না।

হঠাৎ একদিন মনে হোল রাজচন্দ্রবাবুর বাড়ি না-যাওয়াটা তাঁর প্রতি অত্যন্ত অসম্মান ও ঔদাসীন্য দেখানো হচ্ছে। উ'হু—সেটা ঠিক নয়। পরের রবিবার প্রতুলের সঙ্গে বিকালের দিকে তাঁর ওখানে গিয়ে হাজির হওয়া গেল। রাজচন্দ্রবাবু তখনও ওপরে নিজের ঘরটিতে পড়াশুনায় ব্যস্ত আছেন। তাঁর মেয়ে আমাদের বসালেন, চা ও খাবার তৈরি হোল, খানিকক্ষণ গল্পসল্পও হোল। তাঁর কথাবার্তায় মনে হোল রাজচন্দ্রবাবু অন্য বিষয়ে যতই অন্যমনস্ক হোন না কেন, মেয়েটির শিক্ষা দেওয়া বিষয়ে মোটেই ঔদাসীন্য দেখান নি।

তারপর আমরা ওপরের ঘরে গেলাম। আগাগোড়া দেওয়ালে বইভরা আলমারীতে ঢাকা পড়েছে। মেজের ওপর এখানে ওখানে যদৃচ্ছামত বই ছড়ানো। দেখে মনে হয় আলমারীভরা বই শুধু ঘর সাজানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় না। দিস্তা দিস্তা সাদা

কাগজে লম্বা লম্বা আঁকজোক ভরা তক্তপোশের ওপর, টেবিলে ছড়ানো "f" অঙ্করের বাড়াবাড়ি খুব, অনধিকারীকে যেন চাবুক উঁচিয়ে তাড়া করে আসছে। দেশের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যক্ষদের সঙ্গে রাজচন্দ্রবাবুর পত্র-ব্যবহার হয় বা তাঁদের দু, একজনের সঙ্গে পরিচয় যে খুব ঘনিষ্ঠ তাও রাজচন্দ্রবাবুর অনুপস্থিতির ফাঁকে প্রতুল খানকতক চিঠি দেখিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিলে। হোস্টেলে এসে গল্পের সময় তাঁদের মধ্যে হেনরী রবার্টসন ও হ্যারল্ড জেফ্রিস্—দু'টো নাম শুনে একজন এম্-এ শ্রেণীর গণিতের ছাত্র বললে, বর্তমান কালে এঁরা নাকি গণিতের দুই দিক্পাল।

কলেজে নলিনাক্ষবাবু "on ইত্যাদি ইত্যাদি" নামক এক দুর্বোধ্য প্রবন্ধ পাঠ করলেন। প্রিন্সিপাল তখন ছিলেন সভাপতি। অন্যান্য অধ্যাপক ও উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত ছিলেন। গণিতের অধ্যাপকেরা প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপিটা একবার দেখবার জন্যে, নলিনাক্ষবাবু বক্তৃতামঞ্চ থেকে নামলেই কাড়াকাড়ি শুরু করলেন। কেবল রাজচন্দ্রবাবুর কোনো উৎসাহ লক্ষ করা গেল না। তিনি নাকি, প্রতুল শুনে এল, বাড়িতে বলেছেন—নলিনাক্ষবাবুর প্রবন্ধের অধিকাংশই ভিত্তিহীন। অত অসম্পূর্ণ Data-র ওপর নলিনাক্ষবাবুর মত বিচক্ষণ লোক যে কি করে তাঁর বক্তব্য খাড়া করেছেন তা ভেবে রাজচন্দ্রবাবু আশ্চর্য হয়ে গেছেন—ইত্যাদি।

এর মাস পাঁচেক পরে Philosophical Magazine-এ রাজচন্দ্রবাবুর একটা প্রবন্ধ বার হোল। তাতে শুনলাম, তিনি নলিনাক্ষবাবুর মতবাদকে খণ্ডন করেছেন, যদিও নলিনাক্ষবাবুর প্রবন্ধের উল্লেখ কোথাও তিনি করেন নি। প্রতুল কলেজের লাইব্রেরীতে দেখালে, অক্সফোর্ডের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ অধ্যাপক O'sullivan তাঁর Geometry of Hyper-Spaces সংক্রান্ত নতুন বইয়ে অধ্যাপক সেনের অনুসন্ধানের যথেষ্ট সাহায্য নিয়েছেন এবং গণিতের এই নতুন শাখায় অধ্যাপক সেন যে যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন —মনিষী অধ্যাপক সে-কথা নিজ গ্রন্থের যথাস্থানে স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন।

একদিন রাজচন্দ্রবাবুর বাড়িতে আমাদের নিমন্ত্রণ হোল। প্রভাবতীর হাতের রন্ধনের প্রশংসা এর আগে প্রতুল দু'একদিন করেছিল বটে—খুব যে বাড়িয়ে বলেছিল তা মনে হোল না। প্রভাবতী আমাদের সঙ্গে যত শান্ত, অসঙ্কোচ ও সহজ ব্যবহার করতেন ততই আমাদের, বিশেষ করে আমার আনাড়ি ভাবটা যেন বেড়েই চলেছিল ; কোন রকমে নিমন্ত্রিতের কর্তব্য সমাপ্ত করার পর রাজচন্দ্রবাবুর আহ্বানে তাঁর ঘরে গেলাম। ঘরে টেবিল চেয়ার তত ছিল না। তিনি তাকিয়া ঠেস দিয়ে তক্তপোশের ওপর বসে আরাম করছিলেন। কথায় কথায় বললেন—ওহে, একটা জিনিস বার করে' ফেলেছি। ঠিক তিন বৎসর পরে একটা ধূমকেতু আসছে—এটা জানাশোনা বা তোমাদের ক্যাটালগের বাইরের জিনিস—এটা হয় আসছে প্রথমবার নয়তো অনেকদিন পরে। ঠিক তিন বছর পরে আমাদের আকাশে দেখা যাবে। তারপর তিনি জানালেন, অন্য একটা বিষয়ের অনুসন্ধান করতে এই ধূমকেতুর আসবার সন্ধান তিনি পেয়েছেন—তবে এটা ঠিক যে বৈজ্ঞানিকদের তালিকাভুক্ত ধূমকেতু তা নয়।

একটা কিসের বন্ধে ছুটি হোল। হয়তো গ্রীষ্মের হবে, ঠিক মনে নেই। অনেকদিন পর দেশ থেকে কলকাতায় এসেছি। ছুটির সময় রাজচন্দ্রবাবু তাঁর দেশ ঢাকা জেলায় যেতেন তা জানতাম। এসেছেন কিনা দেখতে তাঁদের বাসায় গেলাম। প্রভাবতীকে দেখতে পেলাম না। বাড়িতে অন্য কোন চাকর-বাকরও ছিল না—সকলে ওপরের ঘরে আছেন ভেবে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে রাজচন্দ্রবাবুর ঘরে ঢুকতেই দেখলাম, তিনি একমনে কি লিখছেন—মুখ তুলে আমাকে দেখেই রুক্ষস্বরে গরম মেজাজে বলে উঠলেন—কে ? …যাও যাও, যাও যাও…

কথা শেষ না করেই যেন মনে হোল, তক্তপোশ থেকে কি যেন একটা তুলে ছুঁড়ে মারতে গেলেন।

হঠাৎ পেছন থেকে চোখ টিপে ধরলে, মানুষ যেমন অতর্কিতভাবে হতভম্ব হয়ে পড়ে—সেই রকম হয়ে পিছু হটে রাজচন্দ্রবাবুর ঘর থেকে বার হয়ে এলাম। পরে কাঠের পুতুলের মত মুখ ফিরিয়ে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নামতে গিয়েই দেখি, প্রভাবতী উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে—বোধহয় চীৎকার শুনে তিনি এইমাত্র নিচে থেকে ছুটে আসছিলেন। আমাকে দেখে শুষ্কমুখে বললেন—আসুন, নিচে আসুন অমলবাবু। দেশ থেকে কবে এলেন ?

আমার বিস্ময় তখনও যায় নি কথার উত্তর খুঁজে দিতে দেখি তাঁর চোখ দুটি জলে ভরা। বললেন—আজ মাসখানেক হোল বাবা ওই রকম হয়েছেন—এক আমি ছাড়া কেউ কাছে যেতে পারে না। খান না, শোন্‌ না—কি সব অঙ্ক কষেন বসে বসে রাতদিন। মাথা একেবারে ঠিক নেই—ছুটিতে দেশে যাওয়া হয়নি। কি যে হবে অমলবাবু।

তাঁকে যথেষ্ট সাহস ও সান্ত্বনা দিয়ে সেদিন হোস্টেলে ফিরলাম। তারপর কয়েক-মাস প্রতুল ও আমি রাজচন্দ্রবাবুর ওখানে প্রায়ই যেতাম! তাঁদের দেশ থেকেও প্রভাবতীর বড় মামা এসে কিছুদিন থাকলেন।

কলেজে তাঁর চাকরি আর বেশীদিন থাকা সন্দেহের বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। দিন দিন তাঁর অপ্রকৃতিস্থতা যেন পরিস্ফুট হয়ে বেড়ে যেতে লাগলো। বেচারী নলিনাক্ষবাবু প্রকৃতিস্থ অবস্থাতেই তাঁকে সামলাতে হিম্‌সিম্‌ খেতেন, এ অবস্থায় তো হাল ছেড়ে দিয়ে শুধু প্রিন্সিপালের কাছে লম্বা লম্বা নোট পাঠাতে লাগলেন। চাকরিতে দীর্ঘ-দিনব্যাপী ছুটি নিয়ে নিয়ে শেষে ইস্তফা দিতে হোল।

তারপর কলকাতার বাস উঠিয়ে তাঁরা চলে গেলেন শিবপুর ব্যাঁটরা অঞ্চলে। সেখান থেকে চলে গেলেন চন্দননগরে গঙ্গার ধারে একটা ছোট বাড়িতে।

ইতিমধ্যে প্রতুল একবার সেখানে গিয়েছিল। ফিরে এসে বললে, তাঁরা সামান্যভাবে আছেন, খড়ের বাংলো ঘরে থাকেন। রাজচন্দ্রবাবু অনেকটা ভাল আছেন। কলকাতার বাইরে গিয়ে অনেকটা সুস্থ হয়েছেন আজকাল। রোজ সন্ধ্যার আগে গঙ্গার ধারে খুব বেড়ান, কোনো কোনো দিন গ্রামের বাইরের মাঠে গিয়ে এক জায়গায় বসে ওয়াটার-কলার ছবি আঁকেন শুনলাম। এ সংবাদটা নতুন এবং অদ্ভুত লাগলো। তুলি ও ইজেল হাতে রাজচন্দ্রবাবুর ছবিটা মনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারলাম না কোনো রকমে! ডাক্তারের পরামর্শে অবসর সময়ে চিত্রবিদ্যার চর্চা আরম্ভ করেছেন, গণিতের কেতাব সব আলমারীর মধ্যে চাবি বন্ধ!

পুজোর ছুটিতে তাঁদের ওখানে গেলাম। প্রভাবতী ভারী আনন্দ প্রকাশ করলেন। রাজচন্দ্রবাবুকে অনেক সুস্থ বলে মনে হোল বটে, কিন্তু আগেকার মত যেন দেখলাম না।

রাজচন্দ্রবাবু বললেন—ওহে, তোমরা ধূমকেতুটার কথা ভুলে যাওনি তো?···ওটা আসছে কিন্তু ঠিক···

আমি বললাম—আগে এটা এসেছিল কখনো?

রাজচন্দ্রবাবু বললেন—এসেছিল নিশ্চয়ই, তবে অনেকদিন আগে। মানুষ তখন শিশু ছিল। প্যারাবোলার পথে ঘুরতে—বড় প্যারাবোলার পথে ঘুরে আসতে অনেক বছর কেটে গিয়েছে···

আমি না বুঝতে পেরে বললাম—প্যারাবোলায় ঘুরলে সেটা কি ফিরে আসবে আবার—

তিনি বললেন—কেন আসবে না? বড় প্যারাবোলা আর কিছু না—Ellipse-ই—তবে চ্যাপ্টা খুব বেশী, যাকে বলে Eccentricity খুব বেশী। অন্য ধূমকেতুর পথ

ছোট Ellipse, মানুষের জ্ঞানের মধ্যেই হয়তো দু'বার আসতে পারে—হতে পারে এর পথ ঘুরতে লেগেছে পাঁচ হাজার কি দশ হাজার বছর।—দশ হাজার বছর আগে যখন এসেছিল তা মানুষের ইতিহাসের বাইরে···

তারপর সরল বৃদ্ধ অপ্রতিহতভাবে বললেন—ওহে, এটা তোমরা দাও না কাগজে-টাগজে লিখে! তারপরই তাঁর সেই প্রাণ খোলা হাসি।

কলকাতায় ফিরে খুব হইচই করা গেল। রাজচন্দ্রবাবুর লেখা এক চিঠি নিয়ে এলাম বঙ্গবাসীর সম্পাদকের নামে। বঙ্গবাসী তখন নামজাদা পয়সাওয়ালা কাগজ। বঙ্গবাসীতে বড় শিরোনামা ফেঁদে ছাপা হোল। ক্রমে হিতবাদী, বসুমতী, ঢাকাপ্রকাশ, তখনকার সব বড় কাগজেই কথাটা ছড়িয়ে গেল।

তখনও অবশ্য তিন বৎসর বাকী! কথাটা দু' একবার আলোচনা হয়েই থেমে গেল।

তারপর কি হোল, সে-কথা এখনও বোধহয় অনেকে ভুলে যাননি। তখন রুশ-জাপান যুদ্ধের সময়। জাপানীরা পর পর চেষ্টা করেও পোর্ট আর্থার দখল করতে পারছে না। জেনারেল স্টোশেল বন্দরের মধ্যে ইঁদুর-কলে আটকা পড়েছেন—ও-দিকে বাল্‌টিক বন্দর চলে আসছে, নৌ-সেনাধ্যক্ষ রোজডেস্ট-ভন্‌স্কির অধীনে। স্পেনের গ্যালিসিয়া প্রদেশের বন্দরটাতে কয়লা নিতে গিয়ে বন্দরের কর্তৃপক্ষদের অদূরদর্শিতার ফলে যে গোলমাল সৃষ্টি হয়েছিল, কাগজওয়ালারা তা নিয়ে খুব ব্যস্ত আছে। সকলে বলছে, এইবার একটা আন্তর্জাতিক বিপ্লবের সূত্রপাত না হয়ে আর যায় না। লোকে ভারী খুশী আছে, অনেকে রাত্রে ভাল করে ঘুমোয় না।

এমন সময় সংবাদ এল, স্পেনের সঙ্গে সে-বিবাদ রুশ মিটিয়ে ফেলেছে ইংরেজের মধ্যস্থতায়। অনেক হুজুগী লোক বড় আশাভঙ্গ হয়ে একেবারে শয্যাগ্রহণ করলো।

ঠিক একই সময়ে এই ধূমকেতুর আবির্ভাবে যেন সংবাদপত্র-গগনে হৈ-হৈ পড়ে গেল। যেদিন আসবার দিন কাগজে ছাপা হয়েছিল সেদিনের কথা এখনো অনেকেরই নিশ্চয় মনে আছে। সেদিন রবিবার, ৭ই জুন। সন্ধ্যার অনেক আগে থেকেই লোক ছাদে স্থান গ্রহণ করে' দাঁড়িয়ে রইলো। ভাল করে' দেখতে পাওয়া যাবে বলে' অনেকে কলকাতার বাইরে চলে' গেল। নতুন অপেরা-গ্লাসের কাট্‌তি 'লরেন্স ও মেয়োর' দোকানে খুব বেড়ে গেল; বঙ্গবাসী ও সন্ধ্যা কাগজে রাজচন্দ্রবাবুর ছবি বেরুলো। উৎসাহী দু' একখানা কাগজ তাঁর সংক্ষিপ্ত কাল্পনিক জীবন-কথাও লিখে ফেললে। বিদ্যুতের ট্রাম তখন কলকাতায় নতুন হয়েছে—মোড়ের ওপর ট্রামযাত্রীদের কাছে দৈনিক বঙ্গ-সুহৃৎ খুব বিক্রি হয়ে গেল—তারা উৎসাহের আতিশয্যে আগন্তুক ধূমকেতুর ছবিটা পর্যন্ত দিয়ে দিল।

এরকমও একটা গুজব রটেছিল, যে, ধূমকেতুর পুচ্ছটির সঙ্গে একটা বিরাট ধাক্কা খেয়ে পৃথিবীটা একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। এই সংবাদটা দু' একটা হিন্দি কাগজে রটে যাওয়ায় মাড়োয়ারীরা বেঙ্গল ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকা ওঠাতে শুরু করে' দিলে। একটা ছোট নতুন স্বদেশী ব্যাঙ্ক একদিনে দশটা থেকে ছ'টার মধ্যে একলক্ষ ষাট হাজার টাকা নগদ আদায় দিয়ে লালবাতি জ্বালাবার যোগাড় করে' তুললে। কিন্তু এক দুর্বোধ্য যুক্তিবলে সকলেই ঠাওরে নিলে, ধূমকেতুর লেজের ধাক্কায় বেঙ্গল ব্যাঙ্ক চুরমার হয়ে গেলেও তাদের লোহার সিন্দুকগুলো প্রাণে বেঁচে যাবে।

আমি তখন আর হোস্টেলে থাকি না, বহুবাজারের মোড়ে একটা মেসে থাকি। সন্ধ্যার সময় প্রতুল আমার বাসায় এল। দু'জনে ছাদে উঠলাম। আশে-পাশের ছাদ লোকে লোকারণ্য। ভীমনাগের সন্দেশের দোকান বন্ধ, ফুলওয়ালাদের দোকান বন্ধ, সেদিন তারা ছাদ ভাড়া দিয়েছে। ক্রমে বেশ অন্ধকার হোল। তখনও ধূমকেতুর কোনো

সন্ধান নেই। রাত্রি আটটা বেজে গেল। নটা—দশটা—এগারোটা। ভিড় ক্রমে পাতলা হয়ে এল। ফুলওয়ালারা মাল কাটাবার জন্যে অগত্যা অর্ধেক দরে মালা বিক্রি করতে লাগলো। আরও রাত হোল—কিন্তু কিছু হোল না।

প্রতুল আমায় বললে—এখন না, শেষ রাত্রের দিকে উঠবে···

সারা রাত্রির মধ্যে অনেকে মাঝে মাঝে ছাদে উঠে দেখতে লাগলো। সে-রাত্রে অনেকেরই ঘুম হোল না। কিন্তু কেউ কিছু দেখতে পেল না।

তার পরে আজ কাল করে' এক সপ্তাহ, ক্রমে দু'সপ্তাহ কেটে গেল, ধাক্কা খাবার ভয়ে যারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিল তারা আশ্বস্ত হোল, ধাক্কা তো দূরের কথা—ধূমকেতুর পুচ্ছের একটা পালকও কারুর নজরে এল না।

কলেজে খুব হাসাহাসি হোল। নলিনাক্ষবাবু এতদিন চুপ করে' ছিলেন, বোধহয় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর গণিতের প্রতিভার ওপর গোপনে গোপনে তিনি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। এবার তিনি ক্লাসে এসে বললেন (তখন তিনি আমাদের পড়ান) যে, পূর্বে থেকেই তিনি জানতেন ও কিছু নয়। রাজচন্দ্রবাবুর মত বিচক্ষণ লোক যে কি data-র ওপর এ আজগুবি খবর খাড়া করলেন তা তিনি ভেবে আশ্চর্য হয়েছিলেন ; তবে পাছে অশোভন হয় এজন্য কোন কথা বলেন নি। এমন কথারও আভাস দিলেন যে রাজচন্দ্রবাবুর মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ না হওয়ার দরুণই এই সব গোলযোগ এবং তাঁকে নিবৃত্ত না-করার দরুণ আমাদের মৃদু ভর্ৎসনাও করলেন।

এ ক্ষেত্রে যা হয় তাই হতে লাগলো। কাগজপত্রে, লোকের মুখে খুব গালাগালি চললো। নিরীহ রাজচন্দ্রবাবু কারুর কোন অনিষ্ট করেন নি, বরং ধূমকেতুর ধাক্কা খাওয়ার দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচিয়ে লোকের ইষ্টই করেছিলেন—কিন্তু আমাদের একটা বৃহৎ আশা দিয়ে তা থেকে বঞ্চিত করার অপরাধে তাঁকে কেউ ক্ষমা করলো না। স্টেট্স্ম্যান, ইংলিশম্যান মুচকে হাসলে। যে কাগজে ধূমকেতুর ছবি বেরিয়েছিল, তারা ভালমানুষটি সেজে ধূমকেতুর আসা না-আসা সম্বন্ধে কোন উল্লেখই করলে না। কলেজের নোটিশ বোর্ডে রাজচন্দ্রবাবুর ভক্তের বিপক্ষদলেরা খড়ি দিয়ে একটা ছবি আঁকলে···

দিন কুড়ি পরে প্রভাবতীর পত্র পেলাম, রাজচন্দ্রবাবুর অত্যন্ত অসুখ, একবার আসবেন।—অত্যন্ত অনুরোধ করেছেন।

প্রতুল ও আমি রাজচন্দ্রবাবুকে দেখতে গেলাম। তখন বৃদ্ধ একেবারে শয্যাগত, জ্ঞান নেই। প্রভাবতীর মুখে শোনা গেল, ক'দিন ধরে বৃদ্ধ অনবরত আঁকজোক কষেছেন—তারপরই হঠাৎ ঘাড়ে ও পিঠে ব্যথা হয় এবং রাত্রে খুব জ্বর হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। ডাক্তার মত দিয়েছেন, অতিরিক্ত মস্তিষ্কচালনার ফলেই এরূপ দাঁড়িয়েছে।

আমরা যাওয়ার তিনদিন পরে বৃদ্ধের অবস্থা আগের চেয়ে একটু ভাল হোল। সন্ধ্যার ঠিক আগে তাঁর বিছানার পাশের খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তিনি বালিশ ঠেস্ দিয়ে বসেছিলেন। প্রভাবতী, আমি, প্রতুল ও আরো দু'জন ছাত্র—আমরা সকলে তাঁর বিছানার পাশেই বসেছিলাম। হঠাৎ বৃদ্ধ ধীর ভাবে বললেন—ওটা আসছে—আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, প্রকাণ্ড Parabola-র পথে ঘুরে আসছে—আকাশের দিকে চোখ চেয়েই আমি সেটা দেখতে পাচ্ছি।

পরদিন প্রতুল সকালে আমার কাছে এল। বললে—একটা কথা আছে শোনো। তারপর সে বললে—অনেক রাত্রে রাজচন্দ্র বাবুর বিছানার পাশে প্রভাবতী জেগে বসেছিলেন, বৃদ্ধ মেয়েকে বলেছেন—তুমি সকলকে বলে' দিও হিসাব কষতে আমার পঁয়তাল্লিশ দিনের ভুল হয়েছে—আমি যেদিন বলেছিলাম তার পঁয়তাল্লিশ দিন পরে ধূমকেতু ঠিক আসবে। কোন ভুল নেই, আসতেই হবে। বলে দিও ছেলেদের।···প্রভাবতী এ-কথা

প্রকাশ করেছেন মাত্র, কিন্তু বৃদ্ধের কথা প্রলাপ কি সুস্থ মনের উক্তি না বুঝতে পেরে, কথার ওপর কোনো আস্থা স্থাপন করেন নি।

সেদিন শেষ রাত্রে বৃদ্ধের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে এল, দুপুরের পর তিনি মারা গেলেন।

কলকাতায় ফিরে এসে আমরা পরামর্শ করলাম, এ-কথা আর প্রকাশ করবার উপায় নেই—মৃত ব্যক্তির শিরে আর বিদ্রূপ বর্ষণ করার আয়োজন করে কি হবে? প্রতুলের মত মুগ্ধ ভক্ত রাজচন্দ্রবাবুর ছাত্রদের মধ্যে আর কেউ ছিল কিনা জানি না। সেও কিন্তু আমার প্রস্তাবে রাজী হোল। প্রিন্সিপ্যাল লসন সাহেব কলেজ একদিন বন্ধ রাখলেন।

আরও কুড়িদিন কেটে গেল। পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে এমন একটা অদম্য কৌতূহল সকাল থেকেই শুরু হোল, যে, কোনো রকমে অন্যমনস্ক না হোলে সময় কাটানো অত্যন্ত কষ্টকর হোত বিবেচনা করেই সন্ধ্যার পর আমি থিয়েটার দেখতে গেলাম। দর্শকগণের উল্লাসের ও করতালির গণ্ডগোলের মধ্যেও কথাটা কেবলই আমার মনের মধ্যে যাতায়াত করতে লাগলো!

রাত্রি বারোটার পর মেসে ফিরে এলাম। আস্তে আস্তে ছাদে উঠে প্রতুলকে বললাম—চলে আয় ভাই, নেমে আয়, রাত অনেক হয়েছে।

অনেকক্ষণ থেকে সে ছাদের ওপর হাঁ করে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। প্রতুলের চোখে জল এল! লোকে তাকে যতই সেণ্টিমেণ্টাল্ বলুক, নলিনাক্ষবাবুকে মনে মনে কৃপার পাত্র ভাবলাম সে রাত্রে, এ-রকম একজন মুগ্ধ একনিষ্ঠ ভক্ত ছাত্র লাভ করার সুযোগ তাঁর হয়নি বলে'—উঠুন গিয়ে ইম্পিরিয়াল গ্রেডে।

কত রাত্রে জানি না...

কে ডাকছে—অমল...অমল...

ঘুম ভেঙে গেল। মেসের চার পাঁচজন ছেলে ব্যস্তভাবে বললে, শীগ্গির এসো ছাদে—একেবারে তেতলায় চলো! প্রতুলকেও তারা ডেকে ওঠালে।

প্রতুল ভূতগ্রস্তের মত দৌড়ে ছাদে উঠলো।

রাত্রি তিনটের সময়। নৈর্ঋত কোণ আলো হয়ে উঠেছে। দূরে গোলতলার মিশনারী স্কুলটার মাথার ওপর দিয়ে আকাশের সেই দিকটা আলো করে' তুলে Astronomy-এর পাঠ্যকেতাবের ছবির মত অবিকল প্রকাণ্ড ধূমকেতু।...তবে পুচ্ছটা যেন একটু বাঁকা—ঠিক সোজা নয়, আর ঠিক পাশাপাশি দৃষ্টি না পড়ায়, একটু চ্যাপ্টা গোছের দেখাচ্ছে।... গোল অংশটা আমাদের দিকে ঘোরানো, আর বাঁকা ঝাঁটার মত পুচ্ছটা মিশনারী স্কুলের ছাদ ছাড়িয়ে ধর্মতলার গির্জার দিকে প্রসারিত!...

১৯০৪ সালের সে-কথা এখনও অনেকে ভুলে যান নি। আবার কি রকম হইচই হোল, সব কাগজে কিভাবে রাজচন্দ্রবাবুর ছবি বেরুলো, স্টেট্স্‌ম্যান সামলে নিয়ে কি কথা লিখলে! কলেজে প্রিন্সিপ্যাল লসন সাহেব সমস্ত ছেলে ও প্রফেসার নিয়ে এক সভায় মৃত-আত্মার কি-রকম সম্মান করলেন—সে আমলের ছাত্রেরা অনেকেই তা এখনও ভোলে নি।

তারপর প্রতি রাত্রে প্রায় ক'মাস ধরে' ধূমকেতু ক্রমে নিকট থেকে, নিকটে আসতে লাগলো। পুচ্ছটা ক্রমে একদিকে বেঁকে যেতে লাগলো—কিন্তু মাঝ-আকাশ ছুঁয়ে গেল না—নৈর্ঋত কোণ থেকে বার হয়ে একমাস এগারো দিন পরে ঈশান কোণ কেটে বেরিয়ে চলে' গেল।

কোন অনন্ত থেকে কোন্ বিশাল কক্ষপথে ঘুরে আসছে জানি না—এই প্রথম না এর আগে এসেছিল তাও জানা যায় নি। হয়তো শেষ যখন এসেছিল, আদিম-যুগের

বিশাল সমুদ্র তখন জনহীন আদিমকালের পৃথিবীর বুকে দুলতো…সৃষ্টির তখন সবে শুরু…উত্তাল অগ্নিস্রোত কম্পমান পৃথিবীর বাষ্পভরা নির্জন আকাশে বহুদূরাগত তার প্রিয় সন্তানদের স্বপ্ন দ্যাখে…

আবার যখন আসবে ফিরে—হয়তো দশ হাজার বৎসর পরের কোন্ তরুণ-যুগের মানুষেরা তখন তরুণ-দৃষ্টি মেলে পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখবে নতুন আশা, বল ও উৎসাহ নিয়ে। কে জানে?…

যে জানতো—সেও এই ধূমকেতুর মতই অনন্তে মিলিয়ে গিয়েছে—তবে ধূমকেতুটা হয়তো আবার ফিরে আসবে—কিন্তু সে মানুষটি আর ফিরবে না।

বসুমতীর প্যারাটা পড়তে পড়তে সেই সব পুরানো কথাই মনে এল নতুন করে।

মরীচিকা

কাল রাত্রে গ্রামের লোকের ঘুম হয় নাই ভাল।

আজ চাটুয্যে-গিন্নীর নাৎনীকে দেখিতে আসিবার দিন। গ্রামসুদ্ধ মেয়ে-পুরুষ সেখানে আজ নিমন্ত্রিত।

কিন্তু শুধু নিমন্ত্রণের আনন্দই যে এদের ঘুম না-হইবার একমাত্র কারণ তাহা নয়। ছোট্ট গাঁ, সবসুদ্ধ ঘর পঞ্চাশেক লোকের বাস। কেহ বিদেশে যায় না, চাকুরি করে না, করিবার দরকারও নাই। সামান্য জমিজমাটুকু নাড়িয়া চাড়িয়া প্রত্যেকে একরকম দিনপাত করে! কুলবেড়ে গ্রামের বাহিরে যে বড় জগৎটা আছে, সে সম্বন্ধে কেহ কিছু জানেও না, জানিবার জন্য মাথাও ঘামায় না। তাই কাল যখন জানা গেল, চাটুয্যে-বাড়িতে মেয়ে দেখিতে যে আসিতেছে, সে কলিকাতার ছেলে ও কলেজে শিক্ষিত, তখন এই অদৃষ্ট-পূর্ব জীবটিকে দেখিবার ও তাহার সহিত কথাবার্তা কহিবার আনন্দটা, খাওয়ার আনন্দকেও ছাপাইয়া উঠিল। তাছাড়া যে বর, সে-ই স্বয়ং আসিতেছে নিজের চোখে পাত্রী দেখিতে—আজকালকার ছেলের তাই ধরন। রেলের স্টেশনে শেষরাত্রে গরুর গাড়ি গিয়াছে। বেলা দশটার মধ্যে এখানে পৌঁছাইয়া যাইবে। রায়-বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে একদিকে ভূষির বস্তা ও বিচালীর স্তূপ সরাইয়া নূতন মাদুর পাতিয়া বসিবার জায়গা করা হইয়াছে, কারণ চাটুয্যে-বাড়িতে বাহিরের বসিবার ঘর নাই। পাত্রকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গ্রামের শখের যাত্রাদলের ছেলেরা কয়দিন হইতে গান-বাজনার তালিম দিয়াছে; একটি ছোকরা মামারবাড়ি বেড়াইতে গিয়া কলের গানে রিজিয়া ও বক্তিয়ারের অভিনয় শুনিয়া মুখস্থ করিয়াছিল—গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে বহুবার শুনাইয়াছে—আজ সেও একবার কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য অধীর হইয়া আছে।

সকাল হইতেই চণ্ডীমণ্ডপে লোকজনের জটলা। তাহারা ঘন ঘন তামাক খাইতেছে ও নানাবিষয়ে গল্পগুজব করিতেছে। বিশ্বাস-মহাশয়ের এক দূর-সম্পর্কের ভাই কলিকাতার কোন্ গদীতে বিল-সরকারের চাকুরী করিত—কলিকাতার গল্প বিশ্বাস-মহাশয় তাহার মুখে অনেকবার শুনিয়াছেন—সম্প্রতি তিনি তাহাই মুগ্ধ ও কৌতূহলী শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে বলিতেছিলেন।

পাঠশালার গুরু নিতাই সামন্ত আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ঐ যে গরুর গাড়ি ফিরেছে—বাঁশ-ঝাড়ের আগালে পড়ে' জুলির পথটা বুজে গিয়েছে কিনা, তাই ঘুরে আসছে বোধ হয়।

সকলেই গরুর গাড়িটা দেখিল, কিন্তু কেহই বিশ্বাস করিল না যে, পাত্র আসিতেছে। গরুরগাড়িটা ঘুরিয়া পিছনের পথ দিয়া আসিতেছিল, কেহই দেখিতে পাইল না ছই'-

এর মধ্যে লোক বসিয়া আছে কিনা।

মিনিট পাঁচ ছয় পরে। কলেজের ছেলেটি আসিয়া মাদুরে বসিয়াছে, তাহাকে ঘিরিয়া রথযাত্রার ভিড়। ছেলেটির বয়স তেইশ চব্বিশ কি এক-আধবছর বেশী, রং ফরসা, গায়ে মট্‌কার পাঞ্জাবি ও চাদর, চোখে চশমা। সে বৃদ্ধ বিশ্বাস-মহাশয়ের কাছে প্রথম ট্রেনটা ফেল হওয়ার গল্প করিতেছিল! সবাই হাঁ করিয়া শুনিতেছিল।

প্রথমে যদু ভড়ের কীর্তনগান শুরু হইল। তারপরে দুলাল মুখুয্যে শ্যামাবিষয়ে গাহিলেন। একজন বেহালা বাজাইল। তারপর রিজিয়া ও বক্তিয়ার।

গ্রামের সাতকড়ি মুখুয্যে এইবার তার ছেলে তিনটিকে সঙ্গে লইয়া চণ্ডীমণ্ডপে উঠিলেন। সাতকড়ি লেখাপড়া আদৌ জানেন না, গোলার ধানে সম্বৎসর চলিয়া যায়—সুতরাং চাকুরির ধারও ধারেন না, কিন্তু তার ঝোঁক গান বাজনার দিকে। পাঁচটি ছেলের একটিকেও লেখাপড়া শেখান নাই, গান-বাজনা শিখাইয়াছেন এবং যে-সব গ্রাম্যমজলিসে অন্য সব গ্রাম হইতে দু'পাঁচজন বাহিরের লোক আমদানী হয়, সে-সব স্থানে ছেলে কয়েকটিকে সঙ্গে লইয়া একখানা কম দামী বেহালা হাতে সাতকড়ি গিয়া হাজির হন।

ইনি আসন গ্রহণ করিয়াই সেজ ছেলে বসন্তকে বলিলেন—বাবা, রজনের থলিটা আনতে ভুল হয়ে গিয়েছে—একবার দৌড়ে যাও তো বাড়ি—চালির মুড়োয় তোলা আছে।

বসন্ত অপ্রসন্ন মুখে পৈঠা দিয়া নামিয়া গেল। অন্য সময় হইলে সে বাবাকে দু'কথা শুনাইত—কিন্তু নবাগত শহরের শিক্ষিত ভদ্রলোকের সম্মুখে তাহার সাহসে কুলাইল না।

—গেনু (বসন্তের ডাক নাম) আজকাল যা কীর্তন গায়, চমৎকার। রাসু অধিকারীর গাওনা তো শুনেছি ঘেঁট্‌গাছির বারোয়ারীতে—তার চেয়ে কম নয়। আমার ছেলে বলে' বলছি নে পদ্ম খুড়ো, তা নয়। রজন্‌টা ফেলে এসে মুশকিল হোল কিনা!···শোনাচ্ছি একখানা, আসুক।

পদ্মলোচন চক্রবর্তী গ্রামের পুরোহিত—তিনি গান-বাজনা বিশেষ বোঝেন না, তবুও সাতকড়িকে খুশি করবার জন্য বলিলেন—আহা হীরের টুকরো ছেলে তোমার বসন্ত। ওর গলা আর শুনিনি আমি? কোজাগরী পুজোর দিনে মহিমদা'র বাড়িতে গাইলে—আহা, যেমনি গলা তেমনি তাল-বোধ।

সাতকড়ি ছেলে তিনটিকে চারিদিকে বসাইয়া নিজে মধ্যে বসিলেন। ইতিমধ্যে রজন আসিয়াছিল, গান শুরু হইল।

—আর একটু ঠায়ে ধর বাবা···

বলিয়া সাতকড়ি গর্বিত হাসিমুখে ও প্রশংসমান-দৃষ্টিতে কীর্তনগানরত পুত্রের দিকে একবার চাহিয়া আবার চারিধার চাহিতে লাগিলেন। গান একে একে অনেকগুলি হইল। সাতকড়ি বড় ছেলেকে একবার ফরমায়েস করিয়া বলেন—মানু, গা তো সেই "ওগো শ্যাম গুণমণি?"···বড় ছেলের শেষ হইলে আবার সেই সেজ ছেলেকে ফরমায়েশ করিতেছিলেন—ধর দিকি বাবা "মম মানস শুক পাখি?" অনেকদিন শুনিনি তোর মুখে। কৈলাস খুড়ো' একটু ঠেকা দিয়ে যাও না, ভাল গানখানা···

সাতকড়ি ছেলেদের লইয়া আসিবার পর আসরে আর কেহ আমল পান নাই। সাতকড়ি নিজের ছেলেদের নিজে বাহবা দিয়া, হাসিয়া, চোখ বুজাইয়া, ঘাড় দোলাইয়া, ফরমায়েশ করিয়া এমন জমাইয়া তুলিলেন যে আর কাহারও আমল পাইবার যো ছিল না।

খানিকটা পরে আগন্তুক শহুরে-ছেলেটি কি কথায় কলেজের গল্প তুলিল। সে নূতন কলেজে ভর্তি হইয়াছে, বয়স অল্প, দেখিতে সুশ্রী। এ ধরনের অজ পাড়াগাঁয়ের লোকজনের মাঝে কথা বলিয়াও সুখ আছে। তাহার ইংরাজী বুক্‌নি-মিশানো কথা-

বার্তায় সাতকড়ি ভয় খাইয়া গেলেন! ছেলেটি বলিতেছিল—এ সব পাড়াগাঁয়ে সে-সব কেই বা বোঝে···এডুকেশন না থাকলে কি একটা জাত কখনো উঠতে পারে?···কলেজে আজকাল মেয়েরা পড়চে—এম.-এ.বি.-এ. পর্যন্ত পাস করছে—সে সব দিন কি আর আছে? দেখে আসুন একবার কলকাতায় গিয়ে।

মেয়েদের এত লেখাপড়ার কথা এ-গ্রামে কেহ শোনে নাই। কৈলাস ভট্চার্য বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—মেয়েরা এম্-এ বি-এ পাস দিচ্ছে? বলো কি বাবাজী! কই এ-কথা শুনিনি তো?

এ পাড়াগাঁয়ে বসে' শুনবেন কোথা থেকে? ছেলেরা যেখানে কখনো স্কুলের মুখ দেখেনি, সেখানে মেয়েদের লেখাপড়ার কথা তো ভাবতেই পারবেন না।

ও-দিকে সাতকড়ি মুখুয্যে একটু অপ্রতিভ হইলেন। শুধু অপ্রতিভ নয়, কোথায় যেন তিনি নিজেকে অপমানিত বিবেচনা করিলেন। পাঁচ পাঁচটি ছেলের কোনোটিকেই লেখাপড়া শেখানোর কোনো চেষ্টা করেন নাই—গান-বাজনা শিখিলে ভদ্রসমাজে, মজলিসে সর্বত্র সম্মান ও গৌরবলাভ করা যাইবে—এতদিন তিনি ইহাই জানিয়া আসিয়াছেন, ছেলেগুলিকে সেই অনুসারেই মানুষ করিয়াছেন। কুলবেড়ের বাহিরে বড় জগৎটাতে যে অন্য ধরনের হিসাব-নিকাশ প্রচলিত, তাহাদের খোঁজও তিনি জানিতেন না।

তিনি নিঃশব্দে তাঁর বেহালাখানা খেরোর খাপের মধ্যে পুরিলেন, রজনের থলিটা সবার অলক্ষ্যে বড় ছেলের হাতে তুলিয়া দিলেন।

একটু পরে জলযোগের ডাক পড়িল।

ইহাও কেবল মাত্র ভাবী পাত্রের জন্য নহে, গ্রামস্থ সকল নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের জন্য। ছেলেটি এই প্রথম পাত্রীর বাড়ি দেখিল। দেখিয়া একটু নিরাশ হইল। চার পাঁচখানি খড়ের বড় বড় ঘর, সামনের উঠানে বড় বড় গোটাকতক গোলা, দক্ষিণে একটা পুকুর, একটা বাতাবীলেবুর গাছ ও গোটাকতক নারিকেল গাছ। পাত্রীর দিদিমা বাড়ির কর্ত্রী; তিনিই গ্রামসুদ্ধ সলককে আদর করিয়া বসাইলেন, জলযোগের ব্যবস্থা করিলেন।

ক্রমে বেলা চড়িয়া গেল। মধ্যাহ্ন ভোজন মিটিতে দুইটা বাজিল। ছেলেটি একটু অবাক হইল, ইহাদের ভোজনের পরিমাণ দেখিয়া। একটি পনেরো বছরের বালকও যাহা খাইল, তাহা তার নিজের তিন বেলার খোরাক।

বেলা যখন পাঁচটা, তখন কৈলাস ভট্চায আসিয়া বলিলেন—বাবাজী, ওঠো একবার মেয়েটিকে দ্যাখো। বাবাজীই বলি, তোমার সঙ্গে তো সম্পর্কই বাধলো, মেয়ে দেখে অপছন্দ হবে না। তবে এ তো শহর বাজার নয়, একটু আধটু যা ত্রুটি, তা তোমাকে শুধরে নিতে হবে বৈকি। এসো বাবাজী।

আবার চাটুয্যে-বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে অনেক লোক জড়ো হইয়াছে। গতিক দেখিয়া মনে হয়, অদ্যকার মত একটা উৎসবের ব্যাপার ইহাদের গ্রামে অনেককাল ঘটে নাই। অন্ততঃ আগন্তুক ছেলেটির তাহাই মনে হইল: নতুবা গৃহস্থ-বাটীতে মেয়ে-দেখানো-রূপ সামান্য ব্যাপারে গ্রামসুদ্ধ লোকের এত উৎসাহ কেন?

মেয়ে দেখিয়া ছেলেটি সন্তুষ্ট হইল। বেশ স্বাস্থ্যবতী, রং খুব ফরসা না হইলেও মানান্সই—মুখশ্রী সুন্দর, বড় বড় চোখ। কেবল ইহাদের চুল বাঁধিবার ধরন সে পছন্দ করিল না। পাতা-কাটা খোঁপা শহর হইতে কোন্ কালে উঠিয়া গিয়াছে, আর ইহারা সেটাকে এখনও ফ্যাশন বিবেচনা করে! তা ছাড়া অত গহনা কেন গায়ে? গহনার ভারে মেয়েটি যেন বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে।

দিদিমা সজল চোখে বলিলেন—ওকে নাও গিয়ে দাদাভাই। ও আমার যেমন মেয়ে, তেমন মেয়ে এদিকে নেই, এ আমি বড় গলা করে' বলতে পারি। ওর মা আমাকে ফাঁসি

দিয়ে চলে' গেল, মেয়ে তখন তিন-মাসের—সেই থেকে আমার কাছে মানুষ। আমারও তো ও-ছাড়া আর কেউ নেই, ওর বাবা কোনো খোঁজ নেয় না ; সে আবার বিয়ে করেছে ছেলেপুলেও হয়েছে, সে এ-দিক মাড়ায় না। তোমার হাতে মেয়েটাকে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্দি হই—তারপর যা রইলো সবই তোমাদের। কর্তারা যা করে রেখে গিয়েছেন, তাতে চাকরি করে' খেতে হবে না, আমাদের বাড়িতে চাকরি কখনো কেউ করে নি।

কৈলাস ভট্চায বলিলেন—এ-গাঁয়ে কখনও কেউ চাকরি করেছে বউ-ঠাকরুণ? আপনাদের কর্তাদের কথা তো বাদই দিন, তাঁরা তো ছিলেন গাঁয়ের মালিক, মাথার মণি—আমাদের কর্তারা, কি আমরা কখনো গাঁয়ের বাইরে অন্নের চেষ্টায় পা বাড়িয়েছি? রামোঃ। এই যে দেখছো বাবাজী উত্তরে মাঠ এ সব লাখ্‌রাজ, একেবারে সেই রতনপুরের নীলকুঠি পর্যন্ত। তবে এদের বাড়িতে পুরুষ মানুষ নেই, একা বউ-ঠাকরণ আছেন, মেয়েমানুষ···তাই চাষ বাস হয় না। নইলে যাট সত্তর বিঘে খাসে আমন ধানের জমি রয়েছে, দুটো বড় পুকুর রয়েছে—চাষ করলে ভাবনা কিসের? এই দেখছো বটে খড়ের ঘর, এ গাঁয়ে সকলেই এঁদের প্রজা।

ছেলেটির নাম সুরেন। আহারাদির পরে সে বাড়ির চারিধারে ঘুরিয়া দেখিল। কলিকাতায় থাকিবার আজকাল বড় কষ্ট, পড়াশুনা শেষ করিয়া চাকুরির বাজারও সুবিধা নহে—যদি এখানে বিবাহ করিয়া সম্পত্তি পাইয়া বাস করা যায়, এ পল্লীগ্রামের শান্তি ও নির্জনতার মধ্যে শহরের উগ্র জীবন-সংগ্রাম হইতে বেশ দূরে, নিশ্চিন্তভাবে চমৎকার জীবন কাটিবে এখন।

সুরেন জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, এ জমিটা পড়ে আছে কেন ভট্চায্যি মশায়।

—ওই যে তোমাদের বল্লাম বাবাজী, এদের বাড়িতে চাষ করবার মানুষ কই? বুড়ী একা তো সব দিক্ দেখতে পারে না। তোমার সঙ্গে যদি বিধাতা যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন, তবে তুমিই এসে সব নিজের হাতে নাও না? তোমায় তা হোলে কি কারুর চাকরি করতে হবে। পায়ের ওপর পা দিয়ে চাটুয্যেদের সাত পুরুষ এই ভিটেতে দুধ-ঘি খেয়ে কাটিয়ে গিয়েছে, তোমারও কাট্‌বে।

সুরেন নিজের মেসের কথা ভাবিতেছিল। জানালাহীন ছোট্ট ঘরটার কথা ভাবিল—হাওয়া কোনো কালে খেলে না, গরমে অর্ধেক দিন রাত্রে ঘুম হয় না। এতটুকু এক টুকরা মাছ, বিস্বাদ ডাল, ততোধিক বিস্বাদ তরকারী—একদল লোক খাইয়া উঠিয়া গেলে তাহাদের উচ্ছিষ্ট ভাল করিয়া না ধুইয়াই তাহার উপর আর একদল লোক খাইতে বসিয়া যায়, দেওয়ালের গায়ে আরসুলা চলাচল করে—সব কথা ভাবিয়া দেখিল।

এখানে এই মুক্ত মাঠের ধারে স্বাধীন জীবন—নিজের লোকজন, নিজের হুকুমমত সকলকে খাটানো। সে দরিদ্র মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, এ-সব তো তাহার কাছে স্বর্গের মতই নাগালের বাহিরের জিনিস। মন্দ কি? আইন পাস করিয়া কি হইবে? এই তো বেশ।

মহা উৎসাহে সে ভট্চায্যি-মশায়কে বিষয়-আশয় সংক্রান্ত আরও প্রশ্ন করিতে লাগিল। কলমের বাগানগুলো কোন্ দিকে? প্রত্যেকটাতে কতগুলো করিয়া গাছ? পুকুরগুলো কি মাছ ছাড়িবার উপযুক্ত আছে?

বেলা খুব পড়িয়া আসিয়াছিল। নিকটের বিলের ধার হইতে চরিয়া গরুর দল কর্দমাক্ত গায়ে বাড়ি ফিরিতেছিল। সান্ধ্য হাওয়ায় তালগাছে বাবুই পাখীর বাসা দুলিতেছে ও শুক্‌না তালপাতার খড়্-মড়্ শব্দ হইতেছে!

সুরেন একা একটু বেড়াইবার জন্য দক্ষিণের মাঠের রাস্তাটা ধরিল। কৈলাস ভট্চায এবার সঙ্গে সঙ্গে আসেন এটা সে চায় না ; কিন্তু ভট্টাচার্য মশায় খোশগল্পের

শ্রোতাকে অত সহজে ছাড়িয়া দিতে রাজী নহেন। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

—শুভ রত্নপুরের খড়ের মাঠটার শালিয়ানা তিনশো টাকা আয় ছিল বাবাজী। বাঁড়ুয্যেগিন্নী তো বোঝেন না, ওঁকে ঠকিয়ে সেটা বারো ভূতে খাচ্ছে। তুমি দেখে শুনে খাসে আদায় করবে, শিখিয়ে দিলাম তোমায়!

সন্ধ্যার পরে আবার অনেকে চণ্ডীমণ্ডপে জড় হইল।

সুরেন এবার যেন এখানকার এই সকল আনন্দস্রোতে নিজেও ভাসিয়া গেল। সাতকড়ির বেহালা দু'তিনবার ফরমাইশ করিয়া শুনিল, তাঁর ছেলের কীর্তনের তারিফ্ করিল।

সাতকড়ি বলিল—গাঁয়ের সব ছেলেরা আমায় ধরেছে, তোমায় বলতে সাহস করে না, বাবাজী, এবার ওরা একটা শখের দল খুলেছে, তোমায় কিছু চাঁদা দিতে হবে।

তিনি আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে একটি লোক হাসিমুখে চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া হাত তুলিয়া সকলকে নমস্কার করিল।

সাতকড়ি বলিলেন—এসো মাস্টার বসো। স্কুল ছেড়ে দিয়ে এলে? সুরেন বাবাজী, এ'র সঙ্গে তোমার আলাপ নেই, ইনি পাশের গাঁয়ে স্কুল খুলেছেন; খুব ভালো মাস্টার, নিভাননীকে ইনি একবেলা ইংরাজী পড়ান।

মাস্টার সুরেনের দিকে চাহিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিল। তাহাকে দেখিয়া সুরেনের মনে বিশেষ ভক্তির উদ্রেক হইল না। এমন তেল মাখিয়াছে যে কানের পাশ দিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে, মুখ পানে লাল, বোকার মত হাসিটা। হাঁ, ইংরাজীর অধ্যাপক বটে! ভাবী পত্নীর ইংরাজী শিক্ষাটা হইতেছে ভালোই। মাস্টার জুটিয়াছে যখন এমন!

মাস্টার বসিয়া বক্‌বক্ করিতেছিল। নিজের কৃতিত্ব ব্যাখ্যা করিবার সুযোগ কে ছাড়ে? কি করিয়া নিভাননীকে অক্ষর চিনাইল কি করিয়া এ-বি-সি লিখিতে শিখাইল সেই সব বলিল। মাস্টারের কথা শুনিয়া সুরেনের মনে হইল—ফার্স্টবুকের ঘোড়ার গল্প তার ইংরেজী-ভাষাজ্ঞান-রূপ সৌধের সর্বোচ্চ সীমা। অতএব ছাত্রীর বিদ্যা কিরূপ হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

কিন্তু কি করিবে সে! এই দূর পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত মেয়েকেই জীবনসঙ্গিনী করিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। মেসের দেনা মিটাইতে না পারিলে আগামী মাসে ছাড়িতে হইবে—চারিধারে বন্ধুবান্ধব মহলে দেনা, দেনা। কলিকাতায় আর কতদিন টিকিয়া থাকা চলিবে?

ভাগ্যে, সে এই মেয়েটির বাপের এক বন্ধুর নিকট হইতে মেয়ের সন্ধান পাইয়াছিল। তিনিও তাহার মেসেই থাকেন। তাঁহার চিঠি লইয়াই সে এখানে আসিয়াছে মেয়ে দেখিতে। পাল্‌টি ঘর, দেখিতে সুশ্রী, কলেজে পড়াশুনা করিতেছে—ইহাদেরও আপত্তি হইবার কথা নয়।

কিন্তু একটা গোলমাল আছে।

সে-কথা এখনও পর্যন্ত সে কাহাকেও বলে নাই, কারণ কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে নাই। সে অতি দরিদ্র, তাহার নিজেদের ঘর বাড়ি পর্যন্ত নাই, তাহার বাবা চিরকাল শ্বশুরালয়ে বাস করেন, সেকালের ঘর জামাই। ই'হাদের কথাবার্তায় সে বুঝিতেছে, যে শিক্ষিত ও শহুরে পাত্রের হাতে মেয়ে দিলে মেয়ে শহর-বাজারে বাসায় থাকিবে, গাড়ি-ঘোড়া চড়িবে, গহনা-গাঁটি পরিবে—ইহা মেয়ের দিদিমার একটা সাধ এবং সম্ভবতঃ মেয়েরও।

কিন্তু তাহার দ্বারা কোনো সাধই যে পূর্ণ হইবার নহে, সেই কথা খুলিয়া বলা হয় নাই। সে বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে কাপড়-জামা, চশমা ধার করিয়া আনিয়াছে বলিয়া

ও চেহারাটা সুশ্রী বলিয়া উহাদের পক্ষে ধরিয়া লওয়া স্বাভাবিক যে সে অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ঘরের ছেলে। ইহারা সন্ধান করিয়াও আসল ব্যাপার বাহির করতে পারিত না; কারণ তাহার মামারা সত্যই অবস্থাপন্ন। তাহার পিতামাতা ও ভাইবোনের সে-বাড়িতে স্থান যে বাড়ির চাকর-বাকরের চেয়েও নিচু, তাহা ইহারা বাহির হইতে বুঝিতে পারিবে কি—বিশেষতঃ, এই ধরনের সরল প্রকৃতির লোক এরা!

নানা দিক ভাবিয়া সে এখানে আসিয়াছিল। মেসের ভদ্রলোকটির মুখে সে সবই শুনিয়াছে। মেয়ে-জামাই এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী দাঁড়াইবে, সত্য বটে। সে এখন নয়, বৃদ্ধার মৃত্যুর পরে যদিও—তবুও সারাজীবনের অন্ন-সমস্যার মীমাংসা বিবাহের সঙ্গেই হইয়া যাইবে।

কিন্তু সে যদি অবস্থা গোপন করিয়া বিষয়ের লোভে এখানে বিবাহ করে, যদি সে কাহাকেও কিছু না ভাঙে, হয়তো ইহারা কোনো অনুসন্ধান করিবে না তাহার বিষয়, হয়তো বিবাহ হইয়া যাইবে। কিন্তু সে কাজের পরিণাম ভালো নয়। ইহার পর স্ত্রী পর্যন্ত তাহাকে অশ্রদ্ধা করিবে।

রাত্রে সুন্দর জ্যোৎস্না উঠিল। নবীন পল্লীপ্রকৃতি একটি রহস্যাবৃত সৌন্দর্যের কুয়াশায় নিজেকে আবৃত করিয়াছে। সারা রাত সে ঘুমাইতে পারিল না।

অত্যন্ত সহজেই এ বাড়ি এ গ্রামের মাঠ, বন তাহার আপনার হইতে পারে।

কি করিবে সে?...

পরদিন সকালে উঠিয়া সে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু সেদিন সকালে কৈলাস ভট্‌চায তাহাকে নিজের বাড়িতে যাইতে বলিয়াছিলেন—সুরেনের আপত্তি তিনি শুনিলেন না। বলিলেন—বাবাজী, ভারী তো খাওয়াবো, দুটো মাছের ঝোল ভাত—তার জন্যে কি তোমার ট্রেন ফেল্ করাবো আমি! সব সকাল সকাল হয়ে যাবে এখন। গাড়ি ধরিয়ে দেবার ভার আমার ওপর! তুমি এখন থেকে আপনার জন হতে চললে, দুটো না খাইয়ে কি ছেড়ে দিতে পারি?

খাওয়ার আয়োজন সকাল সকালই হইল। দুধ মাছ, দই সব চাটুয্যে-বাড়ি হইতে পাঠাইয়া দিয়াছে। তাহাদেরই পুকুরে শেষরাত্রে মাছের জন্য জাল ফেলা হইয়াছিল। চাটুয্যে-গিন্নীও উপস্থিত ছিলেন, কাছে বসিয়া যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন। ছেলেটিকে সত্যই তাঁহার ভাল লাগিয়াছিল। দেখিতে সুশ্রী, বুদ্ধিমান, অমায়িক—লেখাপড়া জানা তো বটেই। নিভাননীর অদৃষ্টে এখন এমন বর জুটিলে তো! তেমন কপাল কি সে করিয়াছে!

গরুর গাড়িতে উঠিবার সময়ে তিনি পথে খাইবার জন্য গাড়িতে ডাব, পেঁপে ও আম তুলিয়া দিলেন। বাড়ির একজন চাকর সুরেনকে জিনিসপত্র সমেত ট্রেনে তুলিয়া দিতে যাইবে, ঠিক হইল।

চাটুয্যে-গিন্নী সুরেনের হাতদুটি ধরিয়া বলিলেন—দাদাভাই, এ কাজ যাতে বোশেখ মাসের মধ্যে হয় তা তোমাকে করতেই হবে। নিভাননীকে তোমায় নিতেই হবে। দেখে শুনে তো সবই গেলে, তোমার বাবাকে গিয়ে পাঠিয়ে দিও, এসে মেয়ে আশীর্বাদ যেন করে যান। আমায় কথা দিয়ে যাও, যে এতে তোমার অমত নেই। গিয়েই পত্তর দিও দাদা...

সুরেন চলিয়া গেলে দিন কতক গ্রামে তাহার সম্বন্ধে আলোচনা চলিল, এক সাতকড়ি ছাড়া অন্য সবাই ছেলেটিকে খুব পছন্দ করিয়াছে। কৈলাস ভট্‌চায তো সকলের কাছে তাহার শতমুখে প্রশংসা করিয়া বেড়াইলেন।

এক একদিন করিয়া সপ্তাহ খানেক কাটিয়া গেল। সুরেনের কোনো পত্র বা সংবাদ কিছুই আসিল না। চাটুয্যে-গিন্নী অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ক্রমে দিন বারো কাটিল। কোনো খবর নাই। চাটুয্যে-গিন্নী সুরেনের ঠিকানায় কৈলাস ভট্‌চাযকে দিয়া লিখাইয়া রেজেস্ট্রী পত্র দিলেন।

আরও দিন কাটিল, সে-পত্রের কোনো জবাব আসিল না।

চাটুয্যে-গিন্নী কৈলাস ভট্‌চাযের কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন। কৈলাসের নিজের বড় ছেলে রাম, পাশের গ্রামের নবীন কাপালির সঙ্গে দিনকতক ভাগে কাঁঠালের ব্যবসা করিয়াছিল ; বার তিনেক কাঁঠালের চালান লইয়া কলিকাতায় গিয়াছিল ; সুতরাং তাহাকেই সুরেনের বাসার ঠিকানা দিয়া কলিকাতা পাঠান হইল।

তিন দিন পরে রাম ফিরিল। কলিকাতার মেসের সেই বাবুটি একখানা পত্র দিয়াছেন সেখানা সে বাবার হাতে দিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কৈলাস পত্রখানা খুলিয়া পড়িলেন। সুরেন বাঁচিয়া নাই। এখান হইতে ফিরিয়া দিনকতক পরে সে নিজের দেশে অর্থাৎ মামার বাড়িতে যায় পিতার সঙ্গে সব কথা খুলিয়া বলিতে, সেখানে কলেরা হইয়া মারা গিয়াছে।

সময় কহারও জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে না। পরের শ্রাবণেই নিভাননীর বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। পাড়ার বড় চন্ডীমন্ডপটাতে আবার বিস্তৃত বরাসন পাতা হইয়াছে। দুপুরের পর হইতে গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েরা জড় হইয়া ভিড় করিতেছে। গ্রামসুদ্ধ সবারই আজ চাটুয্যে-বাড়ি নিমন্ত্রণ—সুদ্ধ ব্রাহ্মণ পাড়াটুকু যে তাহা নয় ; শূদ্রভদ্র সবারই। কৈলাস ভট্‌চায ব্যস্ত আছেন ; কারণ চাটুয্যেদের পুকুরে সব ছোট মাছ বলিয়া মহিমপুরের নিকারীদের মাছের বায়না দেওয়া হইয়াছে, মাছ এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই।

বৈকালে বরের দল আসিল। বরের বাড়ি এদিকেই, গোটাদুই স্টেশন পরেই। ইহাদের আনিতে বরের পাল্কী বাদে খান পাঁচছয় গরুর গাড়িও স্টেশনে গিয়াছিল। বরযাত্রীদের মধ্যে বৃদ্ধের দলই বেশী, দুই একটি বালকও আছে।

মেয়েরা চন্ডীমন্ডপের সামনে পথের ধারে বরকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মেটে হাঁড়ির ভিতর দৃষ্টি-প্রদীপ লইয়া কৈলাস ভট্‌চাযের স্ত্রী অপেক্ষা করিতেছিলেন। চাটুয্যে-গিন্নী একটু পিছনে দাঁড়াইয়াছিলেন।

বরের পাল্কী পাকুড়তলায় নামাইল।

বর পাল্কী হইতে বাহির হইল। বরকে এ-পর্যন্ত এখানকার কেহ দেখে নাই, বরের জ্যাঠামশাই আসিয়া সব ঠিকঠাক করিয়া গিয়াছিলেন। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হইবে, দোজপক্ষে বিবাহ করিতেছে, এবং খুব ফরসা না হইলেও কালো নয়, বেশ স্বাস্থ্য, মাথার সামনের দিকে একটা ছোট টাক।...

চাটুয্যে-গিন্নী অনেকক্ষণ হইতে একদৃষ্টে পাল্কীর দিকে চাহিয়া ছিলেন। ঝি-বউরা উলু দিয়া কলরব করিয়া উঠিলে তাঁহার যেন চমক ভাঙিল। তিনি তো জানিতেন সুরেন আসিতেছে না, আসিতে পারে না—তবুও পাল্কী হইতে সুরেনের পরিবর্তে ইহাকে আসিতে দেখিয়া তিনি নিরাশ হইলেন কেন—কে জানে!

পাড়াগাঁয়ের মাইনার স্কুল। মাঝে মাঝে ভিজিট করতে আসি, আর কোথাও থাকবার জায়গা নেই, হেডমাস্টার অবিনাশবাবুর ওখানেই উঠতে হয়। অবিনাশবাবুকে লাগেও ভাল, বছর বিয়াল্লিশ বয়স, একহারা চেহারা, বেশ ভাবুক লোক। বেশী গোলমাল ঝঞ্ঝাট পছন্দ করেন না, কাজেই জীবনের পথে বাধা ঠেলে অগ্রসর না হতে পেরে দেবলহাটি মাইনার স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে পনেরো বছর কাটিয়ে দিলেন এবং বাকী পনেরোটা বছর যে এখানেই কাটাবেন তার সম্ভাবনা ষোল আনার ওপর সতেরো আনা।

কার্তিক মাসের শেষে হেমন্ত সন্ধ্যা। স্কুলের বারান্দাতে ক্লাস-রুমের দুখানা চেয়ার টেনে নিয়ে আমরা গল্প করছিলাম। সামনে একটা ছোট মাঠ, একপাশে একটা বড় তুঁত-গাছ, একপাশে একটা মজা পুকুর। সামনের কাঁচা রাস্তাটা গ্রামের বাজারের দিকে গিয়েচে, স্থানটা নির্জন।

চায়ের কোন ব্যবস্থা এখানে হওয়া সম্ভব নয়, তা জানি। একটি গরীব ছাত্র হেড-মাস্টারের বাসায় থেকে পড়ে তাঁর হাটবাজার করে। সে এসে দুটো রেকাবিতে ঘি-মাখানো রুটি, আলুচচ্চড়ি ও একটু গুড় রেখে গেল। আমি বললুম—অবিনাশবাবু, বেশ ঠান্ডা পড়েছে—বেশ গরম মুড়ি খাবার ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু···

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—সার্টেন্‌লি—ওরে ও কানাই, শোন্, শোন্ যা দিকি, একবার গঙ্গার বউয়ের বাড়ি, আমার নাম করে বলগে, দুটি গরম মুড়ি যেন ভেজে দ্যায়—এক্ষুনি···

আমি বললুম, অভাবে চালভাজা···

তারপর গল্পগুজবে আধঘণ্টা কেটে গেল। অবিনাশবাবু কথা বলতে বলতে কেমন অন্যমনস্কভাবে মাঝে মাঝে বাঁ-ধারের মজা পুকুরটার দিকে চাইছিলেন! হঠাৎ বললেন—মুড়ি আসুক, একটা গল্প বলি ততক্ষণ। শুনুন, ইন্সপেক্টারবাবু। এইরকম শীতের সন্ধ্যাতেই কথাটা মনে পড়ে। আপনাকে পেয়ে মনে এত আনন্দ হয়!···এখানকার লোক-জন দেখেচেন তো? সব দোকানদার, লেখাপড়ার কোন চর্চা নেই, ছেলেপিলেকে লেখা-পড়া শেখায় এই জন্যে যে কোনো রকমে ধারাপাত আর শুভংকরীটা শেষ করাতে পারলেই দাঁড়ি ধরাবে! কারুর সংগে কথা বলে সুখ পাই নে, ঝালমসলার দরের কথা কাঁহাতক আলোচনা করি বলুন। ভদ্রঘরের ছেলে, না-হয় এসে পড়েচি পেটের দায়ে এই পান্ডববর্জিত দেশে, কিন্তু তা বলে মনটা তো—কলেজের দু-চার ক্লাস চোখে দেখেছিলামও তো—পড়াশুনো না-হয় নাই করেচি···

দেখলাম অবিনাশবাবু কলেজের দিনগুলোর কথা এখনোও ভুলতে পারেননি। বেচারীর জীবনে জাঁকজমক নেই, আত্মপ্রতিষ্ঠার দুরাশা নেই, সাহসও বোধ করি নেই। তাঁর যা-কিছু অভিজ্ঞতা, যা-কিছু কর্মনৈপুণ্য, সবই এই অনাড়ম্বর সরল জীবন-ধারাকে আশ্রয় ক'রে। কলেজের দিনগুলোতেই শহরের মুখ দেখেছিলেন, আড়ম্বর যা বিলাসিতা—মনেরই বলুন বা দেহেরই বলুন—ঐ কলেজের ক'টা বছরেই তার আরম্ভ ও শেষ। সে দিনগুলো যত দূরে গিয়ে পড়চে, রঙীন স্মৃতির প্রলেপ তাদের ওপর যে তত বিচিত্র ও মোহময় হয়ে পড়বে এটা খুব স্বাভাবিক বটে।

অবিনাশবাবু তামাক ধরিয়ে আমার হাতে দিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন।

—হুগলি জেলার কোনো এক গ্রামে ছিল আমার মামার বাড়ি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—ছিল কেন? এখন নেই?

—সে কথা পরে বলচি। না, এখন নেই ধরে নিতে পারেন। কেন যে নেই, তার সংগে এই গল্পের একটা সম্বন্ধ আছে, গল্পটা শুনলেই বুঝবেন।

হুগলী জেলার কোনো এক গ্রামে আমার মামার বাড়ি ছিল। ছেলেবেলায় যখন সর্বপ্রথম মায়ের সঙ্গে সেখানে যাই, তখন আমার বয়েস বছর পাঁচেক। আমাদের মামার বাড়ির পাড়ায় আট নয় ঘর ব্রাহ্মণের বাস, ঘেঁষাঘেঁষি বসতি, এক চালে আগুন লাগলে পাড়াসুদ্ধ পুড়ে যায়, এমন অবস্থা। কোঠাবাড়ি ছিল কেবল আমার মামাদের, আর সব খড়ের ছাউনি, ছোট-বড় আটচালা ঘর এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া যাবার পথে একটা বড় আম-কাঁঠালের বাগান, বনজঙ্গল, সজনে গাছ ও দু-একটা ডোবা। বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অনেকদূর গেলে তবে ও-পাড়ার প্রথম বাড়িটা। সেই বনজঙ্গলের মধ্যে কাদের একটা কোঠাবাড়ি খানিকটা গাঁথা হচ্ছে।

সে-বার কিছুদিন থেকে চলে আসবার পর আবার যখন মামার বাড়ি গেলুম, তখন আমার বয়স আট বছর। গ্রামটা অনেক দিন পরে দেখতে বেরিয়ে চোখে পড়ল, এ-পাড়া ও-পাড়ার মধ্যে বাঁদিকে ডোবার ধারের একটা জায়গা। একটু অবাক হয়ে গেলাম। ডোবার পাড়ের জঙ্গল অনেকটা কাটানো, কাদের একটা কোঠাবাড়ি খানিকটা গাঁথা অবস্থায় দাঁড়িয়ে, কিন্তু মনে হ'ল অনেক দিন গাঁথুনির কাজ বন্ধ আছে, যে-জন্যেই হোক, কারণ ভিতের গায়ে ও ঘরের মেঝেতে ছোট-বড় ভাঁট্‌শেওড়ার গাছ গজিয়েছে, চুণ-শুরকী মাথার ছোট খানাতে পর্যন্ত বনমুলোর চারা। মনে পড়ল, সে-বার এসে বাড়িটা গাঁথা হচ্চে দেখেছিলুম। এখনও গাঁথা শেষ হয়নি তো? কারা বাড়ি তুলচে?

ছুটে গিয়ে দিদিমাকে জিজ্ঞেস করলুম।

—কারা ওখানে বাড়ি করচে দিদিমা, সে-বার এসে দেখে গিইচি, এখনও শেষ হয়নি?

—তোর এত কথাও মনে আছে।...ও তোর ভণ্ডুলমামা বাড়ি করচে, এখানে তো থাকে না, তাই দেখাশোনার অভাবে গাঁথুনি এগুচ্ছে না।

আমার ভারী কৌতূহল হ'ল, সাগ্রহে বললুম, ভণ্ডুলমামা কোথায় থাকে দিদিমা? ভণ্ডুলমামা কে?...

—ভণ্ডুল রেলে চাকরি করে, লালমণিরহাটে না কোথায়। আমাদের গাঁয়েই ছেলে-বেলায় থাকত, বাড়িঘর তো ছিল না। ও-পাড়ার মুখুয্যে-বাড়ির ভাগ্নে, চাকরি-বাকরি করছে, ছেলেপুলে হয়েচে, একটা আস্তানা তো চাই? তাই টাকা পাঠিয়ে দ্যায়, মুখুয্যেরা মিস্ত্রী লাগিয়ে ঘরদোর শুরু ক'রে দিয়েচে, নিজে ছুটিতে এসে মাঝে মাঝে দেখা-শুনো করে—

আমি ছাড়বার পাত্র নই, বললুম—তবে বাড়ি গাঁথা হচ্ছে না কেন? মুখুয্যেরা তো দেখলেই পারে?

—তা নয়, সব সময় তো টাকা পাঠাতে পারে না? যখন পাঠায়, তখন মিস্ত্রী লাগানো হয়।

কি জানি কেন সেই থেকে এই ভণ্ডুলমামা ও তাঁর আধ-গাঁথা বাড়িটা আমার মনে একটা অদ্ভুত স্থান অধিকার ক'রে রইল। রূপকথার রাজপুত্রের মতই এই ভণ্ডুলমামা হয়ে রইলেন অবাস্তব স্পর্শের অতীত, দর্শনের অতীত, এক মানস-রাজ্যের অধিবাসী, তাঁর চাকরীর স্থান লালমণিরহাট, মায় তাঁর ছেলেমেয়েসুদ্ধ। তাঁর টাকা পাঠাবার ক্ষমতা বা অক্ষমতাও যেন কোথায় আমার ব্যক্তিগত সহানুভূতির বিষয়ীভূত হয়ে দাঁড়াল, অথচ কেন এসব হ'ল তার কোন ন্যায়সংগত কারণ আজও মনের মধ্যে খুঁজে পাই না।

কতবার দিদিমাদের চিলেকোঠার ছাদে শুয়ে দিদিমার মুখে রূপকথা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক মনে ভেবেচি—লালমণিরহাট থেকে ভণ্ডুলমামা আবার কবে টাকা পাঠাবে,

পাড়াগাঁয়ের মাইনার স্কুল। মাঝে মাঝে ভিজিট করতে আসি, আর কোথাও থাকবার জায়গা নেই, হেডমাস্টার অবিনাশবাবুর ওখানেই উঠতে হয়। অবিনাশবাবুকে লাগেও ভাল, বছর বিয়াল্লিশ বয়স, একহারা চেহারা, বেশ ভাবুক লোক। বেশী গোলমাল ঝঞ্ঝাট পছন্দ করেন না, কাজেই জীবনের পথে বাধা ঠেলে অগ্রসর না হতে পেরে দেবলহাটি মাইনার স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে পনেরো বছর কাটিয়ে দিলেন এবং বাকী পনেরোটা বছর যে এখানেই কাটাবেন তার সম্ভাবনা ষোল আনার ওপর সতেরো আনা।

কার্তিক মাসের শেষে হেমন্ত সন্ধ্যা। স্কুলের বারান্দাতে ক্লাস-রুমের দুখানা চেয়ার টেনে নিয়ে আমরা গল্প করছিলাম। সামনে একটা ছোট মাঠ, একপাশে একটা বড় তুঁত-গাছ, একপাশে একটা মজা পুকুর। সামনের কাঁচা রাস্তাটা গ্রামের বাজারের দিকে গিয়েচে, স্থানটা নির্জন।

চায়ের কোন ব্যবস্থা এখানে হওয়া সম্ভব নয়, তা জানি। একটি গরীব ছাত্র হেড-মাস্টারের বাসায় থেকে পড়ে তাঁর হাটবাজার করে। সে এসে দুটো রেকাবিতে ঘি-মাখানো রুটি, আলুচচ্চড়ি ও একটু গুড় রেখে গেল। আমি বললুম—অবিনাশবাবু, বেশ ঠান্ডা পড়েছে—বেশ গরম মুড়ি খাবার ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু···

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—সার্টেন্‌লি—ওরে ও কানাই, শোন্, শোন্ যা দিকি, একবার গঙ্গার বউয়ের বাড়ি, আমার নাম করে বলগে, দুটি গরম মুড়ি যেন ভেজে দ্যায়—এক্ষুনি···

আমি বললুম, অভাবে চালভাজা···

তারপর গল্পগুজবে আধঘণ্টা কেটে গেল। অবিনাশবাবু কথা বলতে বলতে কেমন অন্যমনস্কভাবে মাঝে মাঝে বাঁ-ধারের মজা পুকুরটার দিকে চাইছিলেন! হঠাৎ বললেন—মুড়ি আসুক, একটা গল্প বলি ততক্ষণ। শুনুন, ইন্সপেক্টারবাবু। এইরকম শীতের সন্ধ্যাতেই কথাটা মনে পড়ে। আপনাকে পেয়ে মনে এত আনন্দ হয়!···এখানকার লোক-জন দেখেচেন তো? সব দোকানদার, লেখাপড়ার কোন চর্চা নেই, ছেলেপিলেকে লেখা-পড়া শেখায় এই জন্যে যে কোনো রকমে ধারাপাত আর শুভংকরীটা শেষ করাতে পারলেই দাঁড়ি ধরাবে! কারুর সঙ্গে কথা বলে সুখ পাই নে, ঝালমসলার দরের কথা কাঁহাতক আলোচনা করি বলুন। ভদ্রঘরের ছেলে, না-হয় এসে পড়েচি পেটের দায়ে এই পাণ্ডববর্জিত দেশে, কিন্তু তা বলে মনটা তো—কলেজের দু-চার ক্লাস চোখে দেখেছিলামও তো—পড়াশুনো না-হয় নাই করেচি···

দেখলাম অবিনাশবাবু কলেজের দিনগুলোর কথা এখনোও ভুলতে পারেননি। বেচারীর জীবনে জাঁকজমক নেই, আত্মপ্রতিষ্ঠার দুরাশা নেই, সাহসও বোধ করি নেই। তাঁর যা-কিছু অভিজ্ঞতা, যা-কিছু কর্মনৈপুণ্য, সবই এই অনাড়ম্বর সরল জীবন-ধারাকে অশ্রয় ক'রে। কলেজের দিনগুলোতেই শহরের মুখ দেখেছিলেন, আড়ম্বর বা বিলাসিতা—মনেরই বলুন বা দেহেরই বলুন—ঐ কলেজের ক'টা বছরেই তার আরম্ভ ও শেষ। সে দিনগুলো যত দূরে গিয়ে পড়চে, রঙীন স্মৃতির প্রলেপ তাদের ওপর যে তত বিচিত্র ও মোহময় হয়ে পড়বে এটা খুব স্বাভাবিক বটে।

অবিনাশবাবু তামাক ধরিয়ে আমার হাতে দিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন।

—হুগলি জেলার কোনো এক গ্রামে ছিল আমার মামার বাড়ি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—ছিল কেন? এখন নেই?

বাড়ি গাঁথার জন্যে···না, এবার বোধ হয় নিজে আসবে। মুখুয্যেরা বোধ হয় ভণ্ডুল-মামার টাকা চুরি করে, তাই ওদের হাতে আর টাকা দেবে না। বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গল্পের ফাঁকে দিদিমাকে কখনো বা জিজ্ঞেস্ করি—লালমণিরহাট কোথায় দিদিমা? দিদিমা অবাক হয়ে বলেন—লালমণিরহাট! কেন, তাতে তোর হঠাৎ কি দরকার পড়ল? তা, কি জানি বাপু কোথায় লালমণিরহাট? নে নে, শুনবি-নে তো আমায় রেহাই দে, —রাত্তিরে এখন গিয়ে আমায় দুটো মোচা কুটে রাখতে হবে, ঠাকুরঘরের বাসন বের করতে হবে, ছিষ্টির কাজ পড়ে রয়েছে——তোমায় নিয়ে সারা রাত গল্প করলে তো চলবে না আমার!

আমি অপ্রতিভের সুরে বলতুম—না দিদিমা, গল্প বল, যেও না, আচ্ছা মন দিয়ে শুনচি।

এর পরে আবার মামার বাড়ি গেলুম বছর দুই পরে। এই দু-বছরের মধ্যে আমি কিন্তু ভণ্ডুলমামার বাড়ির কথা ভুলে যাইনি। শীতের সন্ধ্যায় গোয়ালে সাঁজালের ধোঁয়ায় আমাদের পুকুর পাড়টা ভরে যেত, বনের গাছপালাগুলো যেন অস্পষ্ট, যেন মনে হ'ত সন্ধ্যায় কুয়াশা হয়েছে বুঝি আজ, সেইদিকে চাইলেই আমার অমনি মনে পড়তো ভণ্ডুল-মামার সেই আধতৈরি কোঠাবাড়িটার কথা—এমনি শেওড়া বনে ঘেরা পুকুরপাড়ে—এতদিনে কতটা গাঁথা হ'ল কে জানে? এতদিন নিশ্চয় ভণ্ডুলমামা মুখুয্যেবাড়ি টাকা পাঠিয়েচে!

মামার বাড়িতে রাতে এসে পৌঁছলাম। সকালে ঐ পথে বেড়াতে গিয়ে দেখি—ও মা, এ কি, ভণ্ডুলমামার বাড়িটা যেমন তেমনি পড়ে আছে! চার-পাঁচ বছর আগে যতটা গাঁথা দেখে গিয়েছিলুম, গাঁথুনির কাজ তার বেশী আর একটুও এগোয় নি. বনে জঙ্গলে একেবারে ভর্তি, ইঁটের গাঁথুনির ফাঁকে বট-অশথের বড় বড় চারা! আহা, ভণ্ডুলমামা বোধ হয় টাকা পাঠাতে পারে নি আর!

ভণ্ডুলমামার সম্বন্ধে সেবার অনেক কথা শুনলাম। ভণ্ডুলমামা লালমণিরহাটে নেই, সান্তাহারে বদলি হয়েচে। তার এখন দুই ছেলে, দুই মেয়ে। বড় ছেলেটি আমারই বয়সী, ভণ্ডুলমামার মা সম্প্রতি মারা গিয়েচে। বড় ছেলেটির পৈতে হবে সামনের চৈত্র-মাসে। সেই সময়ে ওরা দেশে আসতে পারে।

কিন্তু সে-বার চৈত্রমাসের আগেই দেশে ফিরলুম, ভণ্ডুলমামার সঙ্গে দেখার যোগা-যোগ হয়ে উঠল না।

বছর তিনেক পরে। দোলের সময়। মামার বাড়ির দোলের মেলা খুব বিখ্যাত, নানা জায়গা থেকে দোকানপসারের আমদানি হয়। আমি মায়ের কাছে আবদার শুরু করলুম, এবার আমি একা রেলে চড়ে মেলা দেখতে যাব মামার বাড়ি। আমায় একা ছেড়ে দিতে বাবার ভয়ানক আপত্তি অবশেষে অনেক কান্নাকাটির পর তাঁকে রাজী করানো গেল। সারাপথ সে কি আনন্দ! একা টিকিট ক'রে, রেলে চড়ে, মামার বাড়ি চলেছি। জীবনে এই সর্বপ্রথম একা বাড়ির বার হয়েচি সেই আনন্দেই সারাপথ আত্মহারা!

কিন্তু এ সুখ সইল না। মামার বাড়ির স্টেশনে নেমেই কি রকম হোঁচট খেয়ে প্ল্যাট-ফর্মের কাঁকরের উপর পড়ে আমার হাঁটু ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। অতি কষ্টে মামার বাড়ি পৌঁছে বিছানা নিলুম। পরদিন সকালে উঠতে গিয়ে দেখি আর উঠতে পারি নে—দুই হাঁটুই বেজায় টাটিয়েচে, সঙ্গে সঙ্গে জ্বর। কোথা দিয়ে দোল কেটে গেল টেরও পেলুম না। দিদিমাকে অনুরোধ করলুম, বাড়িতে যেন তাঁরা চিঠি না লেখেন যে আমি আসবার সময় স্টেশনে পড়ে গিয়ে হাঁটু কেটে ফেলেছি।

সেরে উঠে বেড়াতে বেরিয়ে একদিন দেখি ভণ্ডুলমামার বাড়িটা অনেক দূর গাঁথা

হয়ে গেছে। কাঠ-থামাল পর্যন্ত গাঁথা হয়েছে, কিন্তু কড়ি এখনও বসানো হয় নি।

হঠাৎ এত খুশী হয়ে উঠলুম যে আছাড় খেয়ে হাঁটু কাটার কথা টের পেলে বাবা কি বলবেন, তখনকার মত সে দুশ্চিন্তা মন থেকে মুছে গেল। উৎসাহে ও কৌতূহলে এক দৌড়ে ভন্ডুলমামার বাড়িতে গিয়ে হাজির। গাঁথুনি অনেক দিন বন্ধ আছে মনে হ'ল, গত বর্ষার পরে বোধ হয় আর মিস্ত্রী আসে নি। ঘরের মেঝেতে খুব জঙ্গল গজিয়েছে, গাঁথুনির ফাঁকে ফাঁকে আমরুল শাকের গাছ, বাড়ির উঠোনে বড় একটা সজনে গাছে প্রথম ফাল্গুনে ফুলের খই ফুটেছে। ঘুরে ঘুরে দেখলুম, ভন্ডুলমামার বাড়িতে তিনটে ঘর, একটা ছোট দালান, মাঝে একটা সিঁড়ির ঘর, আট-দশ ধাপ সিঁড়ি গাঁথা হয়ে গেছে। ওদিকের বড় ঘরটা বোধ হয় ভন্ডুলমামার, মাঝের ঘরটাতে ছেলেমেয়েরা থাকবে। ভন্ডুলমামার বাপ আছে? কে জানে? তিনি বোধ হয় থাকবেন সিঁড়ির এপাশের ঘরটাতে। রান্নাঘর কোথায় হবে? বোধ হয় উঠোনের এক পাশে ওই সজনে গাছটার তলায়। ভন্ডুলমামা ছেলেমেয়ে নিয়ে যখন এসে বাস করবে, তখন এদের উঠোনে কি আর এমন জঙ্গল থাকবে? ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি দৌড়োদৌড়ি ক'রে খেলবে, হয়ত বাড়িতে সত্যনারায়ণের সিন্নি দেবে পূর্ণিমায় কি সংক্রান্তিতে সংক্রান্তিতে। পুকুরপাড়ের এ জংলী চেহারা তখন একেবারে বদলে যাবে যে! আমার মামার বাড়ির এ পাড়াতে এক ঘর লোক বাড়বে···ও-পাড়া থেকে খেলা ক'রে ফেরবার পথে সন্ধ্যে হয়ে গেলেও আর ভাবনা থাকবে না—ওদের বাড়িতে আলো জ্বলবে, ছেলেমেয়েরা কথা বলবে, কিসের আর তখন ভয়? দিব্যি চলে যাব।

আরও বছর দুই কেটে গেল। থার্ড ক্লাসে পড়ি। মামার বাড়ি একাই গেলুম। একাই এখন সব জায়গায় যাই। ভন্ডুলমামার বাড়ির ছাদ-পেটানো হয়ে গিয়েছে, সিমেন্টের মেঝে, দালানের বাইরে রোয়াক হয়েছে কবে আমি দেখি নি তো? রোয়াকের ওপর কেমন টিনের ঢালু ছাদ! কেবল একটুখানি এখনও বাকী, দরজা জানলায় এখনও কপাট বসানো হয় নি। বাঃ, ভন্ডুলমামার বাড়ি তাহলে হয়ে গেল!

ভন্ডুলমামা নাকি আজকাল বড় সুদখোর হয়ে উঠেছেন, মাঝে মাঝে গাঁয়ে আসেন, চড়া সুদে লোকজনকে টাকা ধার দেন, বাড়ি দেখাশুনো করেন, আবার চলে যান। মাসকতক পরে আবার এসে কাবুলীওয়ালার মত চড়াও হয়ে সুদ আদায় করেন। গাঁয়ের লোক তাঁর নাম রেখেছে রত্নদত্ত।

তারপর এল একটা সুদীর্ঘ ব্যবধান। ছেলেবেলার মত মামার বাড়িতে আর তত যাই নে, গেলেও এক-আধ দিন থাকি। সেই এক-আধদিনের মধ্যে পথে যেতে যেতে হয়ত দেখি, জঙ্গলের মধ্যে ভন্ডুলমামার বাড়িটা তেমনি জনহীন পড়ে আছে···বনজংগল চারিপাশে আরও গভীরতর, কেউ কোনদিন ও-বাড়িতে পা দিয়েছে বলে মনে হয় না··· একটা ছন্নছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া চেহারা, শীতের সন্ধ্যায় বর্ষার দিনে, চৈত্র-বৈশাখের দুপুরে কত বার ও-বাড়িটা দেখেচি, সেই একই মূর্তি···

এমনি করে বছর কয়েক কেটে গেল।

ক্রমে এণ্ট্রান্স পাস দিয়ে কলকাতায় এসে কলেজে ঢুকলুম। সেবার সেকেন্ড ইয়ারের শেষ, এফ-এ দেব, কি একটা দরকারে মামার বাড়ি গিয়েছি।

বোধকরি মাঘ মাসের শেষ। দুপুরে পুবের জানলার ধারে খাটে শুয়ে আছি, বোধ হয় একখানা লজিকের বই পড়চি, এমন সময়ে একজন কালো শীর্ণকায় প্রৌঢ় লোক ঘরে ঢুকলেন। বড় মামীমা বললেন,—এই তোর ভন্ডুলমামা, প্রণাম কর্।

আমার সে ছেলেবেলাকার মনের অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল, বয়স হয়েচে, কলেজে পড়ি; নানা ধরনের লোকের সঙ্গে মিশেছি, সুরেন বাঁড়ুয্যে ও বিপিন পালের

বক্তৃতা শুনেছি, স্বদেশী মিটিঙে ভলান্টিয়ারী করেছি, জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীই গেছে বদ্‌লে—তখন মনের কোন্ গভীর তলদেশে আরও পাঁচটা পুরানো দিনের আদর্শের ও কৌতূহলের বস্তুর স্তূপের সঙ্গে ভণ্ডুলমামা ও তাঁর বাড়িও চাপা পড়ে গিয়েচে। তাই ঈষৎ অবজ্ঞামিশ্রিত চোখে সামান্য একটু কৌতূহলের সঙ্গে চেয়ে দেখলুম মাত্র—ভণ্ডুলমামার বয়স পঞ্চাশের ওপর হবে, টিকিতে একটা মাদুলী বাঁধা, গলায় কিসের মালা, কাঁচাপাকা একমুখ দাড়ি। এই সেই ছেলেবেলাকার ভণ্ডুলমামা! উদাসীন ভাবে প্রণামটা সেরে ফেললুম।

ভণ্ডুলমামা কিন্তু আমার সঙ্গে খুব আলাপ করলেন, একটু গায়ে পড়েই যেন। আমি কোন্ কলেজে পড়ি, কোন্ মেসে থাকি, কবে আমার পরীক্ষা ইত্যাদি নানা প্রশ্নে আমায় জ্বালাতন ক'রে তুললেন। আজকাল তিনি কল্‌কাতায় চাকরি করেন, বাগবাজারে বাসা, তাঁর বড় ছেলেও এবারে ম্যাট্রিক দিয়ে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে—এসব খবরও দিলেন।

আমি জিজ্ঞেস্ করলুম,—আপনাদের এখানকার বাড়িতে ছেলেমেয়ে আনবেন না?

ভণ্ডুলমামা বললেন, আন্‌ব, শিগগীরই আন্‌ব বাবা। এখনও একটু বাকী আছে, একটা রান্নাঘর আর একটা কুয়ো—এ দুটো করতে পারলেই সব এনে ফেলি। কলকাতায় বাসাভাড়া আর দুধের খরচ যোগাতেই...সেইজন্যেই তো খেয়ে না খেয়ে দেশে বাড়িটা করলুম, তবে ঐ একটুখানি যা বাকী আছে...তা ছাড়া চিলেকোঠার ছাদটা এখনও... এইবারেই ভাবছি শ্রাবণ মাসের দিকে ওটাও শেষ করব।

বলে কি! এখনও বাকী! জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত দেখে আসছি ভণ্ডুলমামার বাড়ি উঠছে। এ তাজমহল নির্মাণের শেষ বেঁচে থেকে দেখে যেতে পারব তো!

ভণ্ডুলমামা আপন মনেই বলে যেতে লাগলেন—সামান্য চাকরি, ছা-পোষা মানুষ বাবা, কাচ্চাবাচ্চা খাইয়ে যা থাকে তাতেই তো বাড়ি হবে? এখন তো বাসায় বাসায় কাটচে, আজ যদি চাকরি যায় তবে ছেলেপুলে নিয়ে কোথায় দাঁড়াব, তাই ভেবে আজ চৌদ্দ পনেরো বছর ধ'রে একটু একটু ক'রে বাড়িটা তুলচি। তবে এইবার আর দেরি হবে না, আসছে বছর সব এনে ফেলবো। জায়গাটা বড় ভালবাসি।

ভণ্ডুলমামা বল্‌লেন তো চৌদ্দ-পনেরো বছর, কিন্তু আমার মনে হ'ল ভণ্ডুলমামার বাড়ি উঠছে আজ থেকে নয়, জীবনের পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে যতদূর দৃষ্টি চলে ততকাল ধ'রে...যেন অনন্তকাল, অনন্ত যুগ ধ'রে ভণ্ডুলমামার বাড়ির ইট একখানির পর আর একখানি উঠছে...শিশু থেকে কবে বালক হয়েছিলুম, বালক থেকে কিশোর, কৈশোর কেটে গিয়ে এখন যেমন প্রথম যৌবনের উন্মেষ, আমার মনে এই অনাদ্যন্ত মহাকাশ বেয়ে কত শত জন্ম-মৃত্যু, সৃষ্টি ও পরিবর্তনের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ভণ্ডুলমামার বাড়ি হয়েই চলেছে...ওরও বুঝি আদিও নেই, অন্তও নেই।

পরের বছর আবার ভণ্ডুলমামার সঙ্গে কলকাতাতেই দেখা। আমি তখন থার্ড ইয়ারে পড়ি। ভণ্ডুলমামা বললেন—এস একবার আমাদের বাসায়। তোমার মামী তোমায় দেখলে খুশি হবে। সামনের রবিবার তোমার নেমন্তন্ন রইল, অবিশ্যি, অবিশ্যি যাবে।

গেলুম, ভণ্ডুলমামার ছেলেদের সঙ্গেও আলাপ হ'ল। ভণ্ডুলমামা অনুযোগের সুরে বললেন—ওদের বলি, যা একবার এই সময়ে। আষাঢ় মাসে দেশে গিয়ে উঠোনে খাসা বরবটি আর সিম লাগিয়ে রেখে এসেছি, মাচাও বেঁধে রেখে এসেছি,—তা কেউ কি কথা শোনে?

মামীমা ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন,—যাবে সেখানে কেমন ক'রে শুনি? কোনো ঘরে বাস করবার জো নেই, ছাদ ফুটো হয়ে জল পড়ে। জলের ব্যবস্থা নেই বাড়িতে, শুধু

সিম আর বরবটি পাতা চিবিয়ে তো মানুষে···তাতে বাড়ি হাট আলগা, পাঁচিল নেই।

ভণ্ডুলমামা মৃদু প্রতিবাদের সুরে ভয়ে ভয়ে যা বললেন তার মর্ম এই যে মানুষ বাস না করলেই বাড়িতে বট অশ্বত্থের গাছ হয়, ছাদ আঁটা হয়ে গেছে আজ অনেক দিন, কিন্তু কেউ বাস তো করে না। বাড়ি কাজেই খারাপ হতে থাকে। তবুও তিনি বছরে দু-তিনবার যান ব'লে এখনও ঘরদোর টিকে আছে। পাতকুয়োর আর কত খরচ? চৈত্র মাসের দিকে না হয় ক'রে দেওয়া যাবে। আর তোমরা সবাই যদি যাও, পাঁচিল আষাঢ় মাসেই করে দেওয়া যাবে।

বুঝলুম পাঁচিল পাতকুয়া এখনও বাকী। ভণ্ডুলমামার বাড়ি এখনও শেষ হয় নি, এখনও কিছু বাকী আছে। কিন্তু এতদিন ধ'রে ব্যাপারটা চলচে যে, এক দিক গড়ে উঠতে অন্য দিকে ধরছে ভাঙন।

এর পরে মামার বাড়ি গিয়ে দু-একবার দেখেছি ভণ্ডুলমামা দু-পাঁচ দিনের ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসে আছেন। এটা সারাচ্ছেন, ওটাতে বেড়া বাঁধছেন, এ-গাছটা খুঁড়ছেন ও-গাছটা কাটছেন। ছেলেরা আস্‌তে চায় না কলকাতা ছেড়ে। নিজেকেই আস্‌তে হয়, দেখাশুনো করতে হয় বলে একদিন সলজ্জ কৈফিয়ৎও দিলেন।···পাঁচিল? হ্যাঁ তা পাঁচিল —সম্প্রতি একটু টানাটানি যাচ্ছে···সামনের বর্ষায়···ঘরদোর বেঁধেছি সারাজীবন খেটে, ওই আমার বড় আদরের জায়গা—তোরা না থাকিস, আমিই গিয়ে থাকি।

আমি বললুম,—ওখানে কেমন ক'রে থাকেন? সারা গাঁয়েই তো মানুষ নেই, মামার বাড়ির পাড়া তো একেবারে জনশূন্য হয়ে গেছে।

—কি করি বাবা, ওই বাড়িখানার ওপর বড় দম আমার যে। দেখ, চিরকাল পরের বাসায় পরের বাড়িতে মানুষ হয়ে ঘরের কষ্ট বড় পেয়েছিলুম—তাই ঠিক করি বাড়ি একখানা করবই। ছেলেবেলা থেকে ওই গাঁয়েই কাটিয়েছি, ওখানটা ছাড়া আর কোথাও মন বসে না। চিরকাল ভাবতুম রিটায়ার ক'রে ওখানেই বাস করব। একটা আস্তানা তো চাই, এখন না হয় ছেলেপিলে নিয়ে বাসায় বাসায় ঘুরছি, কিন্তু এর পরে দাঁড়াব কোথায়? তাই জলাহার ক'রেও সারাজীবন কিছু কিছু সঞ্চয় ক'রে ওই বাড়িখানা করেছিলুম! তা ওরা তো কেউ এল না—আমি নিজেই থাকি। না থাক্‌লে বাড়িখানা তো থাকবে না— আর এককাল না-এককালে ছেলেদের তো এসে বস্‌তেই হবে বাড়িতে। কল্‌কাতার বাসায় বাসায় তো চিরকাল কাটবে না।

তারপর মামাদের মুখে ভণ্ডুলমামার কথা আরও সব জানা গেল। ভণ্ডুলমামা একা বিজন বনের মধ্যে নিজের বাড়িখানায় থাকেন। তাঁর এখনও দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর ছেলেরা শেষ পর্যন্ত ওই বাড়িতেই গিয়ে বাস করবে। তিনি এখনও এ-জায়গাটা ভাঙচেন, ওটা গড়চেন, নিজের হাতে দা দিয়ে জঙ্গল সাফ করচেন। ছেলেদের সঙ্গে বনে না—ওই বাড়ির দরুনই মনান্তর, স্ত্রীও ছেলেদের দিকে। ছেলেরা বাপকে সাহায্যও করে না। ভণ্ডুলমামা গাঁয়ে একখানা ছোট মুদির দোকান করেছিলেন—লোক নেই তার কিনবে কে? যা দু-একঘর খদ্দের জুটেছিল—ধার নিয়েই দোকান উঠিয়ে দিলে। এখন ভণ্ডুলমামা এ-গাঁ ও-গাঁ বেড়িয়ে কোনো চাষার বাড়ি থেকে দু-কাঠা চাল, কারুর বাড়ির পাঁচটা বেগুন—এই রকম ক'রে চেয়ে চিন্তে এনে বাড়িতে হাঁড়ি চড়িয়ে দুটো ফুটিয়ে খান।

তারপর ধীরে ধীরে অনেক বছর কেটে গেল। আমি ক্রমে বি-এ পাস করে চাকরিতে ঢুকলুম। মামার বাড়ি আর যাই নে, কারণ সে-গ্রাম আর যাবার যোগ্য নয়। মামার বাড়ির পাড়ায় গাঙ্গুলীরা, রায়েরা, ভড়েরা সব একে একে মরে হেজে গেল, যারা অবশিষ্ট রইল তারা বিদেশে চাকরি করে, ম্যালেরিয়ার ভয়ে গ্রামের ত্রিসীমানা মাড়ায় না। ও-পাড়াতেও তাই জীবন মজুমদারের প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি ছাদ ভেঙে ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েছে, শুধু

একদিকের দোতলা-সমান দেয়ালটা দাঁড়িয়ে আছে। যে পুজোর দালানে ছেলেবেলায় কত উৎসব দেখেছি, এখন সেখানে বড় বড় জগডুমুরের গাছ, দিনেই বোধ হয় বাঘ লুকিয়ে থাকে। বিখ্যাত রায়দীঘি মজে গিয়েছে, দামে বোঝাই, জল দেখা যায় না, গরু-বাছুর কচুরীপানার দামের ওপর দিয়ে হেঁটে দিব্যি পার হতে পারে।

সন্ধ্যা রাতেই গ্রাম নিশুতি হয়ে যায়। দু-এক ঘর নিরুপায় গৃহস্থ যারা নিতান্ত অর্থাভাবে এখনও পৈতৃক ভিটেতে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ হাতে সন্ধ্যাদীপ জ্বালাচ্ছে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হতে-না-হতেই তারা প্রদীপ নিবিয়ে শয্যা আশ্রয় করে—তারপর সারারাত ধ'রে চারিধারে শুধু প্রহরে প্রহরে শৃগালের রব ও নৈশপাখীর ডানা ঝটাপটি!

আমার মামারাও গ্রামের ঘর-বাড়ি ছেড়ে শহরে বাসা করেছেন। ছোট মামার ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে সেখানে একবার গিয়েছি। ব্রাহ্মণভোজনের কিছু আগে একজন শীর্ণকায় বৃদ্ধ একটা পুঁটলি-হাতে বাড়িতে ঢুকলেন। এক পা ধুলো, বগলে একটা ময়লা সাদা কাপড়-বসানো বাঁশের বাঁটের ছাতা। প্রথমটা চিনতে পারি নি। পরে বুঝলুম ভণ্ডুলমামা, এত বুড়ো হয়ে পড়েছেন এর মধ্যে!…শহরে এসে মামাদের নতুন সভ্য, শৌখিন আলাপী বন্ধুবান্ধব জুটেছে, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদের ধরনে ও কথাবার্তার সুরে ভণ্ডুলমামা কেমন ভয় খেয়ে সঙ্কোচের সঙ্গে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের শতরঞ্চির এককোণে বসলেন। তিনিও নিমন্ত্রিত হয়েই এসেছিলেন বটে, কিন্তু মামা তখন শহুরে বন্ধুদের আদর-অভ্যর্থনায় মহা ব্যস্ত ; তাঁর আগমন কেউ বিশেষ লক্ষ্য করেছে এমন মনে হ'ল না।

আমি গিয়ে ভণ্ডুলমামার কাছে বসলুম। চারিধারে অচেনা মুখের মধ্যে আমায় দেখে ভণ্ডুলমামা খুব খুশী হলেন। আমি জিজ্ঞেস করলুম—আপনি কি কলকাতা থেকে আসছেন?

ভণ্ডুলমামা বললেন,—না বাবা, আমি রিটায়ার করেছি। আজ বছর-পাঁচেক হবে। গাঁয়ের বাড়িতেই আছি। ছেলেরা কেউ আসতে চায় না।

অন্নপ্রাশন শেষ হয়ে গেল। ভণ্ডুলমামা কিন্তু মামার বাড়ি থেকে আর নড়তে চান না। চার-পাঁচ দিন পরে কিছু চাল-ডাল ও বাসি সন্দেশ-রসগোল্লা নিয়ে দেশে রওনা হলেন। পায়ে দেখি কটক থেকে কিনে-আনা বড় মামার সেই পুরোনো চটিজুতো জোড়া। আমায় দেখিয়ে বললেন,—নবীন কটক থেকে এনেছে, দেখে বড় শখ হ'ল, বয়েস হয়েছে কবে মরে যাব, বললুম তা দাও নবীন, জুতোজোড়াটা পুরোনো হ'লেও এখনও দু-তিন মাস যাবে। বাড়িতে একজোড়া রয়েছে, আঙুলে বড় লাগে বলে খালি পায়েই—

তিনি বাড়ির বার হয়ে গেলেন। আমি চেয়ে চেয়ে দেখলুম শীর্ণকায় ভণ্ডুলমামা ভারী চাল ডালের মোটের ভারে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে চটিজুতোর ফটাং ফটাং শব্দ করতে করতে স্টেশনের পথে চলেছেন। হঠাৎ আমার মনে তাঁর উপরে আমার বাল্যের সেই রহস্যময় স্নেহ ও অনুকম্পার অনুভূতিটুকু কতকাল পরে আবার যেন ফিরে এল। আমি চেঁচিয়ে বললুম—একটু দাঁড়ান মামা, আপনাকে তুলে দিয়ে আসি। ভণ্ডুলমামার পুঁটলিটা নিজের হাতে নিলুম, টিকিট ক'রে তাঁকে গাড়িতে তুলেও দিলুম। ট্রেনে ওঠবার সময় একমুখ হেসে বললেন—যেও না হে একদিন, বাড়িটা দেখে এস আমার—খাসা করেছি—কেবল পাঁচিলটা এখনও যা বাকি। কি করি, আমার হাতে আজকাল আর তো কিছু নেই, ছেলেরা নিজেদের বাসার খরচই চালিয়ে উঠতে পারে না—অবিশ্যি ওদের জন্যেই তো সব। দেখি, চেষ্টায় আছি—সামনের বছরে যদি…

ভণ্ডুলমামার সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি। কিন্তু এর মাস-কতক পরে তাঁর বড়-ছেলে হরিসাধনের সঙ্গে কলকাতায় দেখা হয়েছিল। ম্যাকমিলান কোম্পানীর বাড়িতে

চাকরি করে, জিনের কোট গায়ে, হাতে বইয়ের আকারে খাবারের কৌটো, মুখে একগাল পান—বৌবাজারের ফুটপাত দিয়ে বেলা দশটার সময় আপিসে যাচ্ছে। আমিই ভন্ডুল-মামার কথা তুললুম। হরিসাধন বললেন—বাবা দেশের বাড়িতেই আছেন—আমরা বলি আমাদের সংসারে এসে থাকুন তাতে রাজী নন। বুদ্ধিশুদ্ধি তো কিছু ছিল না বাবার, নেইও—সারা জীবন যা রোজগার করেছেন ওই জঙ্গলের মধ্যে এক বাড়ি করতে গিয়ে সব নষ্ট করেছেন, নইলে আজ হাজার চার-পাঁচ টাকা হাতে জমতো। ও-গাঁয়ে যাবেই বা কে? রামোঃ, যেমন জঙ্গল তেমনি ম্যালেরিয়া—তাছাড়া লোকজন নেই, অসুখ হলে একটা ডাক্তার নেই—চার-পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে বাড়ির পিছনে, বেচতে গেলে এখন ইট কাঠের দরেও বিক্রী হবে ভেবেছেন? কে নিতে যাবে—পাগল আপনি?

আমি বললুম—কথাটা ঠিক বটে। কিন্তু ভেবে দেখ, তোমার বাবা যখন বাড়িটা প্রথম আরম্ভ করেছিলেন, তখন জাজ্বল্যমান গ্রাম। বাড়িটা তৈরী করতে এত দেরি হয়ে গেল যে ইতিমধ্যে গাঁ হয়ে গেল শ্মশান, লোকজন উঠে অন্যত্র চলে গেল, আর সেই সময় তোমাদের বাড়ির গাথুনিও শেষ হ'ল। কার দোষ দেবে?

তারপর ভন্ডুলমামার আর কোন সংবাদ রাখি নি অনেক কাল। বছর-তিনেক আগে একবার মেজমামা চেঞ্জে গিয়েছিলেন দেওঘরে। পুজোর ছুটিতে আমিও সেখানে যাই। তাঁর মুখেই শুনলুম ভন্ডুলমামা সেই শ্রাবণেই মারা গিয়েছেন। অসুখ-বিসুখ হয়ে ক'দিন ঘরের মধ্যেই ছিলেন, কেউ বিশেষ দেখাশুনা করে নি, আর আছেই বা কে গাঁয়ে যে দেখবে? এ অবস্থায় ঘরের মধ্যে ম'রে পড়েছিলেন, দু-তিন দিন পরে সবাই টের পায়, তখন ছেলেদের টেলিগ্রাম করা হয়। ভন্ডুলমামার এইখানেই শেষ।

এর পর আমি আর কখনও মামার বাড়ির গ্রামে যাই নি, হয়ত আর কোন দিন যাবও না, বাড়িটাও আর দেখি নি, কিন্তু জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত যে বাড়িটা গাঁথা হতে দেখেছি, সেটা আমার মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্থান অধিকার ক'রে আছে। আমার কল্পনায় দেশের মামার বাড়ির গ্রামের, একগলা বনের মধ্যে শীতের দিনের সন্ধ্যায় ভন্ডুলমামার বাড়িটা একটা কায়াহীন উদ্দেশ্যহীন রূপ নিয়ে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই গাছ-গজানো উঠোনটাতে ঢোকবার পথ বনে ঢাকা, দরজা-জানালার কপাট নেই, থামে থামে কাঠথামাল পর্যন্ত গাঁথা হয়েছে।...

আমার জীবনের সঙ্গে ভন্ডুলমামার বাড়িটার এমন যোগ কি ক'রে ঘটল সেটা আজ ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই—আমার গল্পের আসল কথাই তাই। অমন একটা সাধারণ জিনিস কেন আমার মন এমন জুড়ে বসে রইল, অথচ কত বড় বড় ঘটনা তো বেমালুম মন থেকে মুছেই গিয়েছে!

বিশেষ ক'রে এই সব শীতের সন্ধ্যাতেই মনে পড়ে এইজন্য যে. পাঁচ বছর বয়সে এই শীতের সন্ধ্যাবেলাতেই বাড়িটা প্রথম দেখি।

* * *

অবিনাশবাবুর ছাত্রটি মুড়ি নিয়ে এল।

সার্থকতা

সকাল বেলা। রূপগঞ্জের ভাঙ্গা কালীবাড়ির সামনে বাঁধানো বটতলায় নিয়মিত আড্ডা বসেছে। এখানে প্রথমেই বলা উচিত, রূপগঞ্জ কোনো ব্যবসার জায়গা নয়,—কোনো কালে ছিল যে, এমন কোনো প্রমাণও নেই। রূপগঞ্জ নিতান্তই সাধারণ ছোট পাড়াগাঁ—দুদশ ঘর ব্রাহ্মণের বাস ; এ ছাড়া কামার, জেলে ইত্যাদি অন্য জাত আছে। গঞ্জ থাকা তো

দূরের কথা, গ্রামে একখানা মাত্র মুদীখানার দোকান। কিন্তু লোকে বারোমাস ধার নিয়ে নিয়ে দোকানের অবস্থা এমন করে তুলেছে যে, দোকানের মালিক দোকান তুলে দিতে পারলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে—অথচ সে বেশ জানে এবং তার খরিদ্দাররাও জানে যে দোকান একবার উঠে গেলে বাকী বকেয়া আদায় হবার আর কোনো আশাই থাকবে না। রূপগঞ্জে সবাই গরীব, পরস্পরকে ঠকিয়ে কোনো রকমে তারা দিন কাটিয়ে চলেছে।

কালীবাড়ির বটতলায় বসে এই সব কথাই হচ্ছিল—রোজই হয়, আজ ত্রিশ বছর ধরে হয়ে আসছে। এর আগে কি হয়েছে না হয়েছে তার হিসেব নেই, কেননা সে-সব লোক এখন বেঁচে নেই। এ-গ্রামে খুব বুড়ো লোক বড় একটা দেখা যায় না—বিশেষ করে ভদ্রলোকের মধ্যে। তার আগেই তাদের রূপগঞ্জের কালীবাড়ীর আড্ডার মায়া কাটাতে হয়, পৈতৃক আমন ধানের জমি ও আমবাগানের মায়া কাটাতে হয়। বিশ বছর ধরে গোপনে মনের কোণে পোষণকরা কাশীবাসের ইচ্ছাও পরিত্যাগ করতে হয়।

পঞ্চু মুখুয্যে তাই দুঃখ করে বল্‌ছিলেনঃ কি জান হারাণ ভায়া! এই জায়গাজমি-গুলোই হয়েছে কাল—নইলে এ-গাঁয়ের মুখে ঝাঁটা মেরে কোন্‌দিন বেরুতাম। এই আমাদের দুঃখু! বিদেশে যারা বেরিয়েছে, তারা বেশ দু'পয়সা—এই ধরো না কেন, সরুলের দীনু ভট্‌চায্যির ছেলে—চেনো তাকে? আরে, অই যে রোগাপানা ছোক্‌রা, বোসেদের বাড়ি কালীপুজো দেখতে আস্‌তো—মনে নেই? সে লেখাপড়া তো শিখলে না, একবার তো ম্যালেরিয়ায় মর-মর হোল, তারপর তার মামারা তাকে কোথায় যেন নিয়ে গেল। এখন বেশ সেরে উঠেছে, আর সে পিলেরোগা চেহারা নেই। সেদিন শুনলাম রেলে চাক্‌রি পেয়েছে—পঁয়ত্রিশ টাকা করে মাইনে। থাকে অই মগরা লাইনে ওদিকে যেন কোথায়।... উপযুক্ত ভৌগোলিক জ্ঞানের অভাবে পঞ্চু মুখুয্যে বর্ণনাটাকে বিশদ করে তুলতে পারলেন না।

হারাণ রায় বললেনঃ তোমার সেই চাকরির কি হোল, পঞ্চু ভায়া?

পঞ্চু মুখুয্যের বয়স পঞ্চাশের ওপর। জীবনে তিনি এ-জেলার গন্ডী পার হন নি, কিন্তু উঠতি বয়েস থেকেই তাঁর ইচ্ছে, বিদেশে কোথাও তিনি চাকরি পেলে করেন। সুদীর্ঘ ত্রিশ বছরের মধ্যে এ-আশা পূর্ণ হয় নি। গ্রামের সামান্য সম্পত্তির আয়েই সংসার চলে। যে-ভাবে চলে, তাকে চলা বলা যায় না—অন্য জায়গায় হোলে অচল হোতো, রূপগঞ্জ বলেই চল্‌ছে।

তিনি মধ্যে বোসেদের বাড়ি 'হিতবাদী' কাগজে দেখেছিলেন, কলকাতার কি একটা আপিসে ষাট টাকা মাইনের গুটি দুই তিন চাকির খালি আছে—কাজ জানার দরকার হবে না, তারাই শিখিয়ে নেবে। পঞ্চু মুখুয্যে একখানা দরখাস্ত করেছিলেন ; কাল বিকেলে তার উত্তর পেয়েছেন।

হারাণ রায়ের প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চু সেই উত্তরের চিঠিখানা মলিন জীর্ণ কামিজের পকেট থেকে বার করে সলককে দেখিয়ে ম্লানমুখে বললেনঃ এই তো তারা চিঠি দিয়েছে—কালকে সরুলের হাটে পিওন বিলি কল্লে! কিন্তু পাচশো টাকা নগদ জামিন জমা চায়! কোথা থেকে দেবো নগদ পাঁচশো টাকা জমা? পাঁচটা টাকার সংস্থান নেই? নাঃ, ও-সব আমাদের জন্যে নয় হে—

মধু লাহিড়ী নিজের বাড়ি থেকে তামাক সেজে হুঁকো হাতে নিয়ে বটতলায় এসে পেঁাছলেন। সবাই জানে মধু লাহিড়ী সম্প্রতি কিছু টাকা হাতে পেয়েছেন তার শাশুড়ীর মৃত্যুর পরে, গত কার্তিক মাসে। এজন্য মধু লাহিড়ীর ওপর কেউ সন্তুষ্ট নয়, মনে মনে সবাই তাকে হিংসে করে।

মধু বয়োজ্যেষ্ঠ হারাণ রায়ের হাতে হুঁকো দিয়ে বললেনঃ কাল রাত্রে এক কান্ড

হয়েছে আমার বাড়ি, জানো না বোধ হয়? রান্নাঘরের জানলার পাশে অনেক রাত্তিরে কে একজন দাঁড়িয়ে ছিল—রাম ছাদ থেকে দেখতে পায়। সে বাইরে এসেছিল, ছাদের নীচেই ওপাশে রান্নাঘর। ধপ্‌ধপে জ্যোৎস্না রাত, দেখে যে কালোমত কে একজন জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে। সে ছেলেমানুষ, চেঁচিয়ে উঠতেই আমার স্ত্রীর ঘুম ভেঙেছে। আমারও ঘুম ভেঙেছে। সবাই ছাদে বার হয়ে দেখি, কোথাও কিছু নেই—কিন্তু রান্নাঘরের পেছনে সেওড়াগাছগুলোর মধ্যে যেন কি শব্দ হচ্ছে! সারা রাত জেগে কাটিয়েছি! গাঁয়ে বাস করা ভার হোল দেখছি!

মধু লাহিড়ীর এ-কথায় কেউ সন্তুষ্ট হোল না। কেউ কথাটা বিশ্বাসও করলে না। সবাই ভাবলে, হাতে টাকা হয়েছে, তাই লোককে জানানো যে আমার বাড়ি চোর যাতায়াত করে রাত্রে—এটা বড়মানুষী দেখানো একরকম।

হারাণ রায় মধুর হাত থেকে হুঁকো নিয়েছিলেন, তিনি চক্ষুলজ্জায় পড়ে বললেনঃ তুমি আবার বাস করো বাঁশবাগানের মধ্যে। রাত-বেরাত খুব সাবধান থাকবে, কাল পড়েছে বড়ই খারাপ।

মধু লাহিড়ী বললেনঃ উঠে যাবো উঠে যাবো করি, কিন্তু উঠে যাই বা কোথায়? একবার তো ভেবেছিলাম, শ্বশুরবাড়ি বলাগড় গিয়ে বাস করি! কিন্তু সে বেজায় ম্যালেরিয়ার জায়গা—আমাদের এখানকার চেয়েও বেশী। তাই দাদা বারণ করলে, দুই ভায়ে যে কদিন বেঁচে থাকি, এক জায়গাতেই থাকি, পৈতৃক ভিটেটাতে আলো দিই দুজনে।

পঞ্চু মুখুয্যে বললেনঃ না উঠে যাবে কেন? সবাই যদি উঠে যাবে, গাঁয়ে তবে থাক্‌বে কে? তোমাদের বাড়ির পাশে শ্যামাপদ চাটুয্যেদের ভিটে এখনও পড়ে আছে—তোমরা দেখো নি, আমাদের একটু একটু মনে আছে, শ্যামাপদ চাটুয্যে এখানেই মারা যায়। তার স্ত্রী এখানকার সম্পত্তি বেচে কিনে বাপের বাড়ি চলে গেল, ছ'মাসের ছেলে নিয়ে। অবস্থা ভাল ছিল না, থাকবার মধ্যে ছিল ওই ঘাটের ধারের আমবাগানখানা—এখন মাখন কাকা কিনেচেন। আর কিছু ধানের জমি, তাতে বছর চল্‌তো না। একশো টাকায় সম্পত্তি বিক্রী করে ফেল্লে, রাজকৃষ্ট জ্যাঠা কিন্‌লেন আমার বেশ মনে আছে। তারপর এখন আমার মাখন কাকা নিয়েচেন রাজকৃষ্ট জ্যাঠার ছেলের কাছ থেকে। তবে ফাঁকি দিয়ে কেনা সম্পত্তি, ওর অপবাদ আছে, ও ভোগে আসে না।

হারাণ রায় এখানে সকলের চেয়ে বয়োবৃদ্ধ। তিনি বল্লেনঃ অনেকদিন পরে শ্যামা-পদর কথাটা উঠ্‌লো। শ্যামাপদদা আমাদের চেয়ে দশ পনেরো বছরের বড় ছিল! তা'হোলেও একসঙ্গে ছিপে মাছ ধরতে গিয়েছে খাঁদের পুকুরে। আহা, অল্প বয়সে মরে গেল। হ্যাঁ হে, তার সে ছেলেটা বেঁচে আছে কিনা জানো? তার অন্নপ্রাশনে নেমন্তন্ন খেয়ে এসেচি, বেশ মনে আছে। ছেলেটার মুখে ভাত দেওয়ার মাস দুই পরেই শ্যামাপদদা মলো। আহা সে সব কি আজকের কথা!

পঞ্চু বল্লেনঃ না। তাদের আর কোনো খবরই পাওয়া যায় নি অনেককাল।

মধু লাহিড়ী বল্লেনঃ কি জানো, একবার এ গাঁ থেকে বেরুলে আর কি কেউ ফিরতে চায়? এই আমাদেরই যদি অন্য উপায় থাকতো, তবে কি আর এখানে পড়ে থাকতে যেতুম। এই যে আমার বাড়ি কাল রাত্তিতে কাণ্ডটি হয়ে গেল।—মধু লাহিড়ীকে কথা শেষ করতে না দিয়েই পঞ্চু অসহিষ্ণুভাবে কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় পথের মোড়ে হঠাৎ মোটর গাড়ির হর্ণের আওয়াজে তিনি এবং উপস্থিত সবাই সেদিকে চেয়ে রইলেন। এবং চেয়ে থাকতে থাকতেই প্রকাণ্ড একখানা নতুন মোটর বটতলায় এসে দাঁড়িয়ে গেল।

মোটর গাড়ি যে এ-গ্রামে আসে না তা নয়, তিন ক্রোশ দূরবর্তী ষ্টেশন থেকে মাঝে

মাঝে গ্রামের কোনো নতুন জামাই শখ করে ট্যাক্সি ভাড়া করে এসেচে, শক্ত অসুখে পড়লে কেউ মহকুমা থেকে ডাক্তার অনেকবার এসেচে নিজের মোটরে—কিন্তু এ-ধরণের বড় ও সুন্দর মোটর গাড়ি উপস্থিত ব্যক্তিগণের কেউ দেখে নি। লম্বা ধরণের প্রকাণ্ড গাড়ি, পালিশ-করা নিকেলের পাতের বনেট, দোরের হাতল ল্যাম্প—সবই ঝক্‌ঝকে; তবে গাড়ির পেছনে ও মাড্‌-গার্ডে রাঙা ধুলো জমেছে—যেন অনেক দূর থেকে আসচে।

একজন ত্রিশ-বত্রিশ বছরের যুবক গাড়ি চালাচ্ছিল—দোহারা গড়ন, গায়ে সাদা সিল্কের পাঞ্জাবি, মাথায় একমাথা ধুলো। সে নেমে বটতলার দিকে এগিয়ে এল—এবং অল্পক্ষণ উপস্থিত সবারই মুখের দিকে উৎসুক চোখে চেয়ে কি যেন চেনবার চেষ্টা করলে। তারপর হঠাৎ পঞ্চুর মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বল্লেঃ এই যে কাকা! আমায় চিনতে পারচেন না?

হারাণ রায়ের দিকে চেয়েও বল্লেঃ কাকা, আমায় মনে নেই আপনার? আমি ননী, আমার পিতার নাম ছিল রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনাদের পাড়াতেই—

হারাণ রায় বিস্ময়ে কেমন হয়ে গিয়েছিলেন। পঞ্চুও তাই। দু'জনেই সমস্বরে, কিন্তু খুব ধীরে ধীরে, যেন অনেকটা আপন মনেই বলে উঠলেনঃ রাজেনদা'র ছেলে সেই ননী!

এর বেশী কথা তাঁদের মুখ দিয়ে বের হোল না। ইতিমধ্যে ননী উপস্থিত সকলেরই পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। হারাণ রায় নিজের কোঁচা দিয়ে ঝেড়ে বাঁধানো বেদীর এক অংশে তাকে হাত ধরে বসালেন। নানা সাগ্রহ প্রশ্নোত্তরের আদান প্রদান চলতে লাগল।

হাঁ, রাজেন বাঁড়ুয্যেকে কার মনে নেই? বেশীদিনের কথা তো নয়, বড় জোর কুড়ি বছর আগে রাজেন মারা যায়। রাজেনের ছেলে এই ননী তখন দশ-বারো বছরের ছেলে। এই মাঠে কালী তলায় লাফিয়ে খেলা করে বেড়াতো—সবাই দেখেচে। রাজেন বাঁড়ুয্যে মহকুমার রেজেস্ট্রি অফিসে দলিল-লেখক ছিল। সেখানে শশী উকিলের বাসায় থাকতো। সপ্তাহের শেষে শনিবার সন্ধ্যার সময় পিঠে এক ক্যাম্বিসের ব্যাগ ঝুলিয়ে, এক পা ধুলো নিয়ে বাড়ি আসতো—আবার সোমবার ভোর বেলা মহকুমায় ফিরতো। বিশ বছর আগে রাজেন বাঁড়ুয্যের লাঠির আগায় কোম্বিসের ব্যাগ-ঝুলানো মূর্তি গ্রামের পথে-ঘাটে অতি সুপরিচিত ছিল। একদিন হঠাৎ খবর এল, কলেরা হয়ে রাজেন শশী উকিলের বাসাতেই মারা গিয়েচে। ননীর মা তার পরও বছর দুই এ গাঁয়ে ছিল, কিন্তু শেষকালে চলাচল্‌তির কোন উপায় না দেখে এখান থেকে চন্দননগরে ভগ্নিপতির ওখানে চলে যায়। তারপর আর কোন খবর কেউ রাখে না তাদের।

সেই ননী আজ এতকাল পরে ফিরে এল নতুন মোটরে চড়ে!

বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত কেটে গেলে সবাই দেখলেন, গাড়ির পেছনের সিটে একটি মহিলা ও দু'টি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। হারাণ বল্লেনঃ সঙ্গে কে ননী?...বৌমা আছে? ছি ছি, কি ছেলেমানুষ! এসো, এসো, নামিয়ে নিয়ে এসো? এই রুদ্দুরে কিনা—এই কাছেই তোমার গরীব কাকার বাড়ি, এসো বৌমাকে আমার নিয়ে এসো। পঞ্চু। উত্তেজিত ভাবে বললেনঃ তা কি কখনো হয়? আমার সঙ্গেই বাবাজীর প্রথমে কথা হোল—আমার বাড়িতেই এ বেলাটা অন্ততঃ—

শেষে হারাণ রায়ই জয়ী হয়ে বিজয়গর্বে উৎফুল্লমুখে ননী ও তার স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েদের নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

বিদ্যুৎবেগে এ সংবাদ গ্রামময় রাষ্ট্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হারাণ রায়ের বাড়িতে রথ-যাত্রার ভিড় শুরু হোল। ননীর স্ত্রী বেশ সুন্দরী, একটু মোটাসোটা, কথাবার্তায় খুব

অমায়িক, বড়মানুষী চালচলন একেবারে নেই। ননীকে ছেলেবেলায় দেখেছে, এমন অনেক লোকই গাঁয়ে আছে—সবাই বলাবলি করতে লাগলোঃ একেই বলে অদৃষ্ট! ওর মা ওর হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে গাঁ ছেড়ে গিয়েছিল, আর আজ দ্যাখো কাণ্ড! ভগবান যাকে যখন দ্যান—ইত্যাদি।

পঞ্চু বললেনঃ আহা, সকাল বেলাতেই তো বলেছিলাম, এ গাঁ ছেড়ে যে বাইরে পা দিয়েচে সে-ই উন্নতি করেচে—কেউ বেশী, কেউ কম। আজ যদি আমি গাঁয়ে বসে থেকে নিজেকে মাটি না করি, তবে আমার কি এ-দশা হয়? না—এবার বেরুতে হবে। দেখি একবার ননী বাবাজীকেই বলে দেখি, যদি কিছু যোগাড়-টোগাড় করে দিতে পারে।

ননীর অবস্থা পরিবর্তনে গ্রামের কেউই অসুখী নয়, বরং সকলেই আনন্দিত। কারণ ননীর সংগে এ গ্রামের কারো স্বার্থের সংঘাত নেই, ননী এখানে বাসও করে না—তা ছাড়া সবাই ননীকে শেষবার যখন দেখেচে তখন ননী ছিল ছোট ছেলে—তার সম্পর্কে কোনো হিংসাদ্বন্দ্বের স্মৃতি কারো মনে গড়ে ওঠে নি—ছোট ছেলের ওপর স্নেহের স্মৃতি ছাড়া।

বিকেলে বাঁধানো বটতলায় প্রকাণ্ড মজলিস বসেচে—মাঝখানে গাছের গুঁড়ি ঠেস দিয়ে বসে ননী—তাকে গোলাকারে ঘিরে গাঁয়ের বালক, বৃদ্ধ ও যুবার দল। কি ক'রে সে বড়লোক হোল, এ কথা সবাই শুনতে চায়।

শ্রীপতি কর্মকার ওপাড়ার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। তামাকের ব্যবসা করে তিনি হাতে দু'পয়সা জমিয়েচেন সবাই বলে, যদিও শ্রীপতি তা স্বীকার করেন না। শ্রীপতির সঙ্গে ননীর বাবা রাজেন বাঁড়ুয্যের খুব বন্ধুত্ব ছিল, ননীর আসবার খবর পেয়ে তিনি পায়ের বাত সত্ত্বেও ওপাড়া থেকে এসেচেন দেখা করতে। শ্রীপতি জিগ্যেস করলেন—তা বাবাজির এখন থাকা হয় কি কলকাতাতেই?

—আজ্ঞে না, আমি থাকি হোসংগাবাদ, নর্মদার ধারে, সি. পি.—সেখানেই আমার কাঠের গোলা আর আপিস। কলকাতাতে এসেছিলাম—একটু কাজও ছিল, আর একখানা মোটর কিনবো বলে। কাল তাই ভাবলাম গাড়িখানা তো কেনা হোল, একবার এতে করে গিয়ে পৈতৃক ভিটেটা দেখে আসি।

বলা বাহুল্য ননী কোথায় থাকে সে কথা কেউ বুঝতে পারলেন না, নর্মদা নামে একটা নদীর কথা অনেকে কাশীরাম দাসের মহাভারতের মধ্যে পড়েচেন—কিন্তু তার ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে এদের ধারণা—কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের প্রভাতে সমুদ্রবক্ষ থেকে দৃশ্যমান দূরের তীররেখার চেয়ে স্পষ্টতর নয়। পঞ্চু মুখুয্যে একটা সোজা প্রশ্ন জিগ্যেস করলেন—বিয়ে করেচ কোথায় বাবাজী?

—ওই হোসংগাবাদেই, আমার শ্বশুর ওখানকার ডাক্তার। বহুদিন সেখানে বাস করচেন, তবে কলকাতায় সব আত্মীয়স্বজন আছে তাঁদের।

দেখতে দেখতে দুদিন কেটে গেল। এক বেলা থাকবার জন্যে ননী এসেছিল এখানে ......কিন্তু শৈশবের শত স্মৃতি-মাখানো গ্রামকে হঠাৎ ছেড়ে যেতে তার সাধ্যে কুলিয়ে উঠল না। ননীর এক ছোট ভাই ছিল বোবা ও কালা, তিন বছর বয়সে বর্ষার সময় ননীদের বাড়ির পেছনে ডোবার জলে ডুবে মারা গিয়েছিল; মৃতদেহ যখন ভেসে উঠে-ছিল তখন জানা যায়, তার আগে হারিয়ে গিয়েচে বলে এপাড়া-ওপাড়া খোঁজ হচ্ছিল।

সেই ডোবাটি তেমনি আছে। এ-সব পাড়াগাঁয়ে কোনো কিছু হঠাৎ বদলায় না, হয়তো আরও বিশ বছর ডোবাটা থাকবে, হয়তো আরও পঞ্চাশ বছর থাকবে। ননীর বয়েস তখন ছ'বছর, কিন্তু সে বর্ষাদিনের কথা আজও তার বেশ মনে আছে—কখনও কি ভুলবে? ওপারের ওই ডুমুর গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন ননীর বাবা, এপারে লোকে লোকারণ্য হয়েছিল। হোসংগাবাদে তার কিসের বাঁধন আছে? কিছুই না—সে

দু'দিনের বাঁধন। এখানকার সঙ্গে সম্বন্ধ অনেক গভীর ; এতদিন আসে নি, তাই ভুলে ছিল। আজ সেই তিন বছরের অবোধ বোবা কালা ছোট ভাইয়ের করুণ মুখখানি তার মনে স্পষ্ট হয়ে ফুটলো—সে কি ভাবে তার দিকে চাইতো, তার সে বুদ্ধিহীন দৃষ্টি, নাকের সেই তিলটি—আশ্চর্য। মানুষের এতও মনে থাকে!

সমস্ত জীবনটা ননী যেন এক মুহূর্তে একটা ম্যাপের মত চোখের সাম্‌নে পড়ে আছে দেখ্‌তে পেলে। প্রথম জীবনের দারিদ্র্য, প্রথম বিদেশযাত্রা, ব্যবসাতে উন্নতি, বিবাহ—তার মনে হোল, যাকে সে এতদিন সাফল্য ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করে এসেছে, জীবনে আসলে তার মূল্য কি? তার যেন আজ একটা নতুন চোখ খুলেচে, জীবনের পাতাগুলো নতুনভাবে পড়তে শিখেচে. জীবনে যা নিয়ে এতদিন সে ভুলে আছে আজ মনে হচ্চে তা ভেতরের সম্পদ নয়, বাইরের পালিশ মাত্র।

তাও নয়। জীবনটা যেন এতদিন জ্যামিতির সরল রেখার মত প্রস্থবিহীন, গভীরতা বিহীন একটা পথে চলে এসেচে—গভীরতর অনুভূতির অভাবে সে বুঝতে পারে নি যে জীবনের আর একটা বিস্তার আছে আর একদিকে, সেটা তার গভীরতা। নিজের মনের মধ্যে ডুব দেওয়ার অবকাশ কখনো তো হয় নি!

যে-পথ দিয়ে নেমে গেলে সরোবরের গভীর অন্ধকারতলে লুকানো মায়াপুরীর সন্ধান মেলে—তার সোপাণশ্রেণী অস্পষ্ট নজরে পড়েচে. কিন্তু সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েচে. এমন অসময়ে নজরে পড়লেই কি, বা না পড়লেই কি?

তাকে ফিরে যেতে হবে। কাঠের হিসাব করতে হবে, ফরেস্ট অফিসারদের সাথে দেখা করে নতুন জঙ্গল ইজারা নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে. ব্যবসাকে আরও বাড়াবার চেষ্টা পেতে হবে, ব্যাংকে জমানো টাকার অংককে বাড়াতে হবে। আরও কত শত দরকারী কাজ তার জন্য অপেক্ষা করে আছে হোসংগাবাদের কাঠের গোলায়।

এখন নতুন পথ ধরে চল্‌বার মত সময়ও নেই, বয়সও নেই। সাফল্যের আলোয় তাকে ব্যর্থতার যে-পথে পথ ভুলিয়ে নিয়ে চলেচে—সেই পথই তার পথ।

তবুও এই দিনটি সে ভুলবে না। এই ম্লান মেঘলা দুপুরের আলো. এই প্রাচীন জগডুমুর গাছটা, এই পানা-শেওলা-ভরা ডোবা, এই আশ্চর্য অদ্ভুত জীবনমুহূর্তটি স্বপ্নের মত মনে আসবে বহুদূর উত্তরকালের মানসপটে।

সকলের প্রশংসাবাদের মধ্যে ননী একদিন গ্রামের বারোয়ারী ফণ্ডে শ'দুই টাকা দিল। গ্রামের সকলকে নিমন্ত্রণ করে হারাণ রায়ের বাড়ীতে ভুরিভোজে আপ্যায়িত করলে। একটি অনাথা বিধবাকে মাসিক কিছু সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলে। এক সপ্তাহ প্রায় কেটে গেল। ননীর স্ত্রী আর থাকতে চায় না ; ছেলেমেয়ের শরীর খারাপ হবে—তা ছাড়া হারাণ রায়ের বাড়িতে তেমন ঘরদোর নেই. থাকবারও কষ্ট।

নতুন মোটরগাড়ি চালিয়ে হারাণ রায়ের বাড়িসুদ্ধ সকলের এবং পাড়ার সবারই চোখের জলের মধ্যে ননী গ্রাম থেকে বিদায় নিলে।

পঞ্চু মুখুয্যে বল্লেনঃ একেই বলে ছেলে! বিদেশে না বেরুলে কি পয়সা হয় বাপু? দেখে নিলে তো চোখের ওপর? তা তোমাদের বলি, তোমরা তো শুনবে না? গাঁয়ে কারুর কিছু নেই, তাই মধু লাহিড়ী মুখের সামনে বড়মানুষী চালে কথা বলে পার পায়। দেখি এবার বেরিয়ে একটা কিছু যদি—

খবরের কাগজের অফিসে সন্ধ্যার পর আড্ডা চলছিল। 'তরুণ' শব্দটার ওপর ভয়ানক জোর দিয়ে কথা বলা তখন দিনকতক খুব চলেছিল—সেই সময়কার' ব্যাপার। তরুণ সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, তারুণ্য, তরুণ দৃষ্টিভঙ্গি, তরুণ সমিতি, তরুণের অভিযান, তরুণের জয়যাত্রা—মাসিক পত্রিকা ও কথাসাহিত্য তখন তরুণ-বায়ুগ্রস্ত! ওদিকে পরশুরাম তখন 'কচি সংসদ' গল্প লিখলেন তা নিয়ে দুটো দলের সৃষ্টি হোল, একজন বললে—আঃ, কি ঠোকাই ঠুকেচে। আর একজন বললে—যাদের নিজেদের জীবনের পুঁজি বহুকাল ফুরিয়েচে, যাদের প্রাণের ভারে মরচে ধরেচে, তারা তরুণের মনকে বুঝবে কেমন করে? সমস্ত মহী গ্রাস করতে ছুটেছে তরুণের জয়রথ-চক্র, তার উদ্দাম, অশান্ত বেগের সামনে দাঁড়াবার ক্ষমতা ধরে, তাদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলবার স্পর্ধা রাখে কোন ওল্ড ফসিল?...ইত্যাদি ইত্যাদি। মোটের ওপর শেষের দলটাই বেশী পুষ্ট—তরুণের বিরুদ্ধে যারা কথা বলছিল চেয়ে দেখলুম তারা সকলেই মধ্যবয়সী, অপর পক্ষে তরুণ ও প্রৌঢ় দু-ই আছে—এবং স্বয়ং সম্পাদক যিনি, ষাট্ বৎসরের বৃদ্ধ হলেও তিনি ছিলেন তরুণের সপক্ষে।

কাগজের অফিস থেকে বার হয়ে এসে একটা পার্কের বেঞ্চিতে বসলুম। মনটা খারাপ হয়ে গেল। সত্যিই তরুণেরাই জয়ী—কিন্তু সে বয়সটাকে বহুকাল হারিয়েচি। মাথার চুল ছ'আনা আন্দাজ পাকা, পরিচিত ছোক্‌রার দল সামনে বিড়ি-সিগারেট খায় না, হঠাৎ সামনা-সামনি হয়ে গেলে বিড়ি মুখে থাকলে তাড়াতাড়ি ফেলে দেয়। সমীহ করে কথা বলে—আর বয়োবৃদ্ধ লোকের পরিচয় দিতে গেলেই বলে,—"আজ্ঞে তাঁর বয়েস হয়েচে, এই প্রায় আপনার বয়েসী হবেন।" তা সে কে জানে চল্লিশ—কে জানে পঞ্চাশ—আমার বয়েসী, তাও 'প্রায়'—অর্থাৎ আমিই বড়। কারণ কুড়ি, বাইশ, পঁচিশ বয়সের ছোক্‌রারা চল্লিশে আর পঞ্চাশে বিশেষ কোনো তফাৎ দেখে না। এদিকে বাড়িতেও বড় সংসার, সেখানে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের মুখে 'বাবা' 'বাবা' অনবরত শুনতে শুনতে মনটাও অনেকটা গম্ভীর প্রবীণত্বের দিকে ঝুঁকে চলেচে বৈকি। ছোট মেয়েটা কাছে এলেই বলে—বাবা তোমার পাকা চুল তুলে দেবো?

নাঃ, মনটা খারাপ হবারই কথা বটে। রাত ক্রমে বেশী হলো, পার্কের মধ্যে কুলপীবর-ফওয়ালা হেঁকে যাচ্চে, মোড়ের মাথায় বেলফুলের মালা বিক্রী হচ্চে, রাস্তায় লোক চলাচল ক্রমে কমে আস্‌চে। জ্যোৎস্নারাত, চাঁদ ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘের মধ্যে লুকোচুরি খেল্‌চে।

কত বছর বয়সের মানুষকে ঠিক তরুণ বলা চলে? উনিশ থেকে বত্রিশ, না আঠারো থেকে আটাশ, না কুড়ি থেকে পঁচিশ? এ-বয়েস একদিন আমারও ছিল—ওর চেয়েও কম ছিল। কিন্তু তখন কেউ বলে দেয় নি যে আমি তরুণ বা তার জন্যে একটা কিছু হয়েচে। দুর্ভাগ্যের বিষয় তার উল্টোটাই শুনে এসেচি চিরকাল। কখনও বুঝতে পারি নি যে আমার বয়স অল্প।

সেই কথাটাই আজ রাত্রে আমার বেশী করে মনে এল।

ছেলেবেলায় আমি ছিলাম খুব রোগা শীর্ণ—অসুখে ভুগতাম বছরে ন'মাস। হাতে তাবিজ-কবচ, গলায় আমড়ার আঁটি, কোমরের ঘুন্‌সিতে বাদুড় নখ—সমস্ত দেহে নানা ধরনের বাধা ও গণ্ডী—মৃত্যু যাতে হঠাৎ ডিঙ্গিয়ে এসে আমাকে নিয়ে না পালায়।

এই কারণে ইস্কুলে ভর্তি হতে হয়ে গেল দেরি। যে ক্লাসে গিয়ে ভর্তি হলুম, সে ক্লাসের মধ্যে আমিই বড়। সকলে আমাকে ডাকতে লাগল—'কানু-দা' বলে। কিন্তু প্রথমে

ততটা বুঝতে পারি নি যে আমার বয়েসটা এমন বেখাপ্পা গোছের বেশী। একদিন হোল কি, তখন মাস দুই ভর্তি হয়েচি, মামার বাড়ি যাওয়াতে দিন তিনেক ইস্কুল কামাই হোল—তারপর যেদিন ইস্কুলে গেলাম, ফণিমাস্টারের ক্লাসের পড়া হোল না। ফণিমাষ্টার আমার চুল ধরে টেনে বল্লে—বুড়োধাড়ী কোথাকার, শিং ভেঙে বাছুরের দলে মিশেচে—আবার ইস্কুল কামাই করে! ছেলেরা অনেকে খিল্-খিল্ করে হেসে উঠ্ল আমার দুর্দশায় খুশি হয়ে। বাবার আপিসের পেন্সিলের ও 'পেন্সিল-ঘষা' রবারের প্রত্যাশা রাখ্তো যে সব ছেলে, তারাই চুপ করে রইল। এই আমি প্রথম জানলুম যে আমার বয়স বেশী। এর আগে কেউ আমাকে এ-কথা বলে নি। বাড়িতে দিদি ছিলেন আমার চেয়ে বড়। মা বাবা এদের মুখে কখনও আমার বয়েস সম্বন্ধে শ্লেষ-সূচক কোনো কথা শুনি নি। কিন্তু আজ থেকে আমার ধারণা বদলে গেল—তখন বুঝলাম কেন ক্লাসের ছেলেরা আমায় 'কানুদা' বলে ডাকে। এবং এই দিনটি থেকে ক্লাসের পড়া না বলতে পারার অক্ষমতার চেয়েও আমার বয়সের লজ্জায় সব সময় সঙ্কুচিত হয়ে থাকতুম। ফণিমাস্টারও কি প্রতিবারই প্রতি পদে পদেই আমার সে গোপন লজ্জা, যা আমি লোকচক্ষু থেকে লুকিয়ে রাখতে প্রাণপণ করি, —তা-ই ঢাক পিটিয়ে সকলের সামনে প্রচার করবে আর আমার সে অত্যন্ত নিভৃত গোপন ব্যথার স্থানে কারণে অকারণে আঘাত করবে নির্মম ভাবে? এদিকে বয়সের তুলনায় আমি একটু লম্বা ছিলাম। একদিন গ্রামারের কি ভুল বার হোতেই ফণিমাস্টার বল্লে—না, এ ধাড়ী ছোঁড়াটাকে নিয়ে আর পারা গেল না দেখ্চি। বলি গোঁপ-দাড়ি যে লতিয়ে চললো. এখনও নাউনের পার্সিং শিখলে না? আমার চোখে লজ্জায়, অপমানে জল এল। আমার মনে হোল বাস্তবিকই আমার বয়েস বেশী তাতে নীচের ক্লাসের ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে পড়া আমার পক্ষে লজ্জাকর কথা—প্রতিদিন ওদের চোখের সাম্নে আমি এরকমভাবে বকুনি খেতে আর পারি নে, বিশেষ করে ওই ছোট ছোট ছেলেরা—যারা আমায় দাদা বলে ডাকে, তাদের সাম্নেই আমার এ অপমানের লজ্জা অসহ্য।

বাড়ি গিয়ে মাকে লাজুক মুখে বললুম—আমি আর স্কুলে পড়বো না মা! আমার ক্লাসের ছেলেরা ছোট ছোট, আমার লজ্জা করে ওদের সঙ্গে পড়তে।

মা অবাক হয়ে বললেন—কেন রে তোর বয়স কত হয়েছে?

—তুমিই বল না কত হয়েচে?

—এই তেরোয় পড়্বি আষাঢ় মাসে—বারো বছর ন' মাস চল্চে—

—ও বয়সে কেউ বুঝি সিক্সথ্ ক্লাসে পড়ে?

—না, তুমি একেবারে বুড়ো হয়ে গিয়েচো—তোমার দাঁত পড়ে গিয়েচে, চুল পেকে গিয়েচে—তুমি কি আর সিক্সথ্ ক্লাসে পড়তে পার? পাগ্লা একটা কোথাকার—

মায়ের কথায় আমার মনের সন্দেহ দূর হোল না। নিজের ছেলেকে কেউ বড় দেখে না—ওঁরাই আমায় ছোট বলেন, কই আর তো কেউ বলে না? হায় আমার সে তেরো বছর বয়েসের শৈশব! এখন সেই কথা ভাবি।

বয়েস আর কম্লো না—বেড়েই উঠ্তে লাগ্ল। বাকী ক'বছরের মধ্যে আমার চেয়ে বড় কোনো ছেলে এসে ভর্তি হোল না আমার ক্লাসে. আমিই সকলের 'দাদা' রয়ে গেলুম। এর পরে ক্লাসে আমি পড়াশুনোতে খুব ভাল হয়ে ফার্স্ট. সেকেণ্ড হয়ে উঠ্তাম —কিন্তু তাতে আমার গৌরব বাড়লো না। আমি সকলের চেয়ে বয়েসে বড়. আমি পড়াশুনোতে ভালো করবো, এতে বাহাদুরিটা কি?

এই সময় আবার আমার গোঁপ বেরুল একটু একটু—সেই 'ভ্রেডেড্' গোঁপ যার কথায় চিরকাল খোঁটা খেয়ে আস্চি—যখন সত্য সত্যই সেটা বেরুলো—তখন মরীয়া হয়ে সহ্য করলুম। প্রথম বড় লজ্জা হোত—শেষে সয়ে গেল।

একবার আমাদের ওখানে রামেন্দুবাবু উকীলের বাড়িতে তার ভাগ্নে এল—তার নাম প্রসাদ, কলকাতায় কলেজে বি. এ. পড়ে। খুব ভাব হয়ে গেল তার সংগে—হঠাৎ কথায় কথায় একদিন সে তার বয়েস বল্লে উনিশ বছর, আমি মনে হিসেব করে দেখলুম আমারও এই বয়েস—অথচ আমি এবার ম্যাট্রিক দেবো—আর ও পড়ে বি. এ. থার্ড ইয়ার ক্লাসে। ক্লাসের সবাই ঠিক বলে, আমার বয়েস বেশী আমি যে পড়াশুনোতে ভাল করবো এ আর বিচিত্র কি?

ম্যাট্রিক দেবার সময় হেড্ মাস্টারের কাছে ফর্ম লিখবার সময় অন্য সব ছেলে লিখলে, ষোল, সতেরো। ধীরেন বলে একটা ছেলে ষোলর চেয়েও কম বলে তাকে হেড্ মাস্টার পরীক্ষা দিতেই দিলেন না—আর আমি লজ্জায় মুখ নীচু করে, কান লাল করে বয়েসের জায়গায় লিখ্‌লুম—উনিশ বছর ক'মাস। এমন বিড়ম্বনাতেও মানুষে পড়ে?

এই সময় আমি আর এক দুর্ভাবনায় পড়ে গেলুম। অনেক দিন আগে আমার আট-ন' বছর বয়েসের আমার মামা এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে। তাঁর গোঁপ বেরিয়েছিল, খুব লম্বা-চওড়া—তাকে আমার খুব বড় বলেই মনে হোত—আমি তার বুকে হেলান দিয়ে বসতাম সে সময়—আমাকে কাঁধে পিঠে করে নিয়েও কত খেলা করেছেন। তখন শুনেছিলাম মা'র মুখে যে মামার বয়েস বাইশ বছর। উঃ সে কত বয়েস ; তার ওদিকে তখন ভাব্‌তেই পারতুম না, আমার শৈশব মনের জগতের অনন্ত কালসমুদ্রে 'বাইশ বছর' বলে একটা পরিচিত, একটা সুদূর দ্বীপ—আমার বয়োবৃদ্ধ মামা ছিলেন সেই দ্বীপের অধিবাসী—তার ওদিকে কি আছে আমি জানতাম না, ভাবতেও চেষ্টা করি নি তখন : সেই থেকে বাইশ বছরের সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা ছিল যে—যার বাইশ বছর, তার জীবন ফুরিয়ে এল।

এই ম্যাট্রিক দেবার বছরে আমার হঠাৎ মনে হোল, আমার বয়েস কুড়িতে পড়বার আর দেরি নেই—এবং সেই ভীষণ বাইশ বছরে আসবার দেরি মাত্র দু'টি বছর! আরও মুশকিল বাধ্‌ল এই যে—এতদিন ছিল গোঁপ, এইবার আমার এমন অবস্থাতে এসে পেঁছতে হোল যে দাড়ি না কামালে আর চলে না। গোঁপ ও দাড়ি দুই-ই হোল। গোঁপ-দাড়ি এবং কুড়ি বছরে পা দেবার দেরি মাস কতক মোটে—তার পরে বছর দুই পরেই বাইশ বছর।

কিন্তু তখনকার দু'বছর অনেকে সময়—আজকালকার মত নয়। মন ছিল চিন্তাশূন্য, স্ফূর্তিবাজ, কৌতুকপ্রিয়,—দু'বছর আসতে দেরি হয়ে গেল। এল বাইশ বছর...চলেও গেল।

তখন যদি কেউ বলতোও যে আমার বয়েস কম, বাইশ বছর আর এমন কি বয়েস—তাহোলেও হয়তো তার কথা আমার বিশ্বাস হোত না, যেমন বারো বছর বয়েসে বিশ্বাস করি নি মায়ের কথা যে আমি ছোট—কিন্তু আসলে সে-কথা আমাকে কেউ বলেও নি।

বরং আরো একটা ঘটনায় উল্টো কথাটাই একবার শুনলুম! তেইশ বছর বয়েসে আমার বিবাহের জন্য কোথা থেকে একটা সম্বন্ধ এল—আমি তখন থার্ড ইয়ারে পড়চি। ঘটক আমাকে দেখে বল্লে—ছেলের বয়েস একটু বেশী না?

বাবা সামনে বসে। বল্লেন, কোথায়, এই তো মোটে তেইশ—

আমি ভাবলুম বেশ তো? বাবা ওরকম কথা কেন বল্লেন? ছিঃ, ওরা কি মনে ভাবলে? মোটে তেইশ মানে কি? সেই থেকে আমার বিশ্বাস হোল যে বিবাহ করবারও আমার বয়েস আর নেই। ঘটক নিশ্চয় আমার লম্বা-চওড়া মূর্তি দেখে আমার বয়েস বেশী আন্দাজ করেছিল—তেইশ বছরের অনুপাতে আমার চেহারা বড় ছিল। কিন্তু আমার সেই থেকে বিশ্বাস দাঁড়ালো অন্যরকম।

চব্বিশ, পঁচিশ, ছাব্বিশ, সাতাশ, আটাশ......

ত্রিশ বৎসর বয়সে যেদিন পড়লাম, সেদিন থেকে মনে হোল এখন থেকে গম্ভীরভাবে চলাফেরা করতে হবে, সাদা রং ছাড়া অন্য রঙের জামা পরা তো অনেকদিনই ছেড়েছিলুম, এখন থেকে ছোট বড় চুল ছাঁটা পর্যন্ত ছেড়ে দিলুম। তখন থাকতুম, পাড়াগাঁয়ে, সেখানে কেউ কোন দিন একথা বলে নি যে আমার বয়েস খুব বেশী এমন কিছু নয়। পাড়াগাঁয়ে কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, ত্রিশের পরেই বৃদ্ধত্বে পৌঁছোয়, মনে তো বটেই, চেহারাতেও খানিকটা বটে।

কারণ আমাদের মুখশ্রীকে আমরা অহরহ গড়চি, আমাদের ভাব ও চিন্তার দ্বারা, যেমন ভাস্কর বাটালি দিয়ে মূর্তির মুখ গড়ে। এদের প্রভাব আমাদের মুখশ্রীর ওপরে অনেক বেশী, অন্তরের তারুণ্য মুখশ্রীতে তো বটেই, সারাদেহের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এমন কি দৈহিক স্বাস্থ্যের ওপর। বাল্যের কত সুন্দর-মুখ ছেলেকে যৌবনে হতশ্রী, হীনশ্রী হতে দেখেছি, শিক্ষার ও কালচারের অভাবে। বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে কত লোকের দেখেছি, বিধাতা যেন তাদের দেহ ও মুখশ্রীকে এমন কি চোখের দৃষ্টি পর্যন্ত ভেঙে গড়ছেন।

এ সব অবান্তর কথা যাক্।

তারপর আজ এতকাল পরে যখন পঞ্চাশের কোঠায় বয়েস চল্‌চে, কাগজে-পত্রে লোকের মুখে শুনি কুড়ি বছর বয়েস থেকে তরুণ বয়েসের নাকি শুরু—মোটের ওপর বাইশ বছরটা যে নিতান্ত তরুণ বয়েস, এতকাল পরে তা' বুঝছি খুব ভাল করেই। কারণ আমার বড় ছেলেরই প্রায় হতে চলেচে ওই।

কিন্তু শুনলাম কখন, যখন বয়োবৃদ্ধ ভীষ্ম পিতামহ মর্ত্যধামে ফিরে এলেও আর আমাদের তরুণ বলতে সাহস করবেন না, স্নেহপরবশ হয়েও নয়। লোক-লজ্জার ভয় একটা আছে তো?

হায় রে ,আমার বাইশ বৎসরের প্রথম যৌবন, তুমি যখন এসেছিলে, তখন তোমায় চিনি নি, তারপর পৃথিবী নিজের কক্ষপথে বহুদূরে চলে গিয়েচে সে দিনটির পরে, আজ আর তোমার জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে লাভ কি? কিন্তু মুশকিল এই যে তখন একথা বললেও বিশ্বাস করতুম না। একটা কথা মনে এল। চব্বিশ বছর বয়সে একবার টুর্গেনেভের কোন একখানা বইয়ে পড়ি যে ভালবাসা, প্রেম, রোমান্স সব তরুণদের জন্যে। যৌবন ফুরিয়ে গেলে ওসবের দিন শেষ হোল। কথাটা পড়ে মনে বড় কষ্ট হয়েছিল—এই জন্যে যে আমার আর সেদিন নেই—বাইশ বছরের গণ্ডি অনেক দিন ছাড়িয়েচি, যৌবন কতকাল শেষ হয়ে গিয়েচে।

তাই বলচি—যদি কেউ একথা বলতো তখন যে বাইশ বৎসরে তরুণ বয়সের অবসান নয়, সবে শুরু—একথা আমি বিশ্বাস করতুম না নিশ্চয়।

মা তো বারো বছর বয়সে বলেছিলেন আমি ছেলেমানুষ, সে তো নিতান্ত বাল্যকাল, মায়ের কথা কি বিশ্বাস করেছিলাম?

ডানপিটে

যে সময়ে আমাদের গল্পের শুরু, কাশীতে তখন উৎকৃষ্ট লচ্ছাদার রাব্‌ড়ি পাঁচ আনা সের বিক্রয় হইত, ল্যাংড়া আম টাকায় এক পণ, মহিষের দুধ টাকায় পাকি বারো সের।

বাংলা ১২৮৭-৮৮ সালের কথা।

কাশীতে তখন স্কুল-কলেজ বেশী ছিল না, শহরের বসতি আরও ঘিঞ্জি ছিল, তেলের

আলো জ্বলিত রাস্তায়, অত্যন্ত অপরিষ্কার ছিল শহরের অবস্থা, গাড়ি-ঘোড়া ছিল কম। বুঢ়ুয়া-মঙ্গলের মেলার সময় গঙ্গার ধারে ধনীদের দু'চারখানা নূতন ধরনের ভিক্টোরিয়া কি ফিটন দেখা যাইত। এক্কা ও স্প্রিংবিহীন টাঙা ছিল প্রধান সম্বল, শহরের বাহিরে উটের গাড়ি চলিত।

গণেশ মহল্লাতে তখন রামজীবন চক্রবর্তীর খুব নাম ও প্রসার-প্রতিপত্তি। কমিসারিয়েট্ বিভাগে বড় চাকুরিতে তিনি বেশ দু'পয়সা রোজগার করিয়াছিলেন, তবে হাতে রাখিতে পারিতেন না। সেকালের রীতি অনুযায়ী তাঁর কাশীর বাড়িটা ছিল একটা হোটেলখানা। চাকুরী-প্রয়াসী বা অক্ষম ও নিরাশ্রয় আত্মীয়স্বজন ও স্ব-গ্রামের লোকের ভিড়ে বাড়িতে পা দিবার স্থান থাকিত না।

রামজীবনবাবুর চার ছেলে, বড় তিনটি ভয়ানক ডানপিটে, স্কুলে যাইবার নাম করিয়া পথে মারামারি করিত, ঘুড়ি উড়াইত, স্কুলের সময়টি কাটাইয়া ছুটির সময়ে বাড়ি ফিরিত। ইহাদের উপযুক্ত সঙ্গীও জুটিয়াছিল দশ-বারোজন পাড়ার ছেলে, সকলেই সমান ডানপিটে, সমানই তাদের বিদ্যার্জনস্পৃহা। স্কুলের সময় দল বাঁধিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া হয়তো শহরের বাহিরে পথের ধারের এক বড় পেয়ারা বাগানে ঢুকিয়া ফল ছিঁড়িয়া খাইয়া ফেলিয়া ছড়াইয়া নষ্ট করিয়া বেলা চারটার পরে বাড়ি ফিরিত। কোনোদিন বা সারনাথের পথে কোথাও চড়ুইভাতি করিতে গেল। মাসের মধ্যে পনেরো দিন এইরকম চলিত।

গণেশ-মহল্লাতে প্রেমচাঁদ মুখুয্যে নামে নদীয়া জেলার একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কাশীবাস করিতেন। তাঁর এক পিতৃমাতৃহীন ভাই-পো তাঁর কাছে থাকিয়া নামে বিদ্যাভ্যাস করিত। কাজে সে ছিল উপরোক্ত ডানপিটে স্কুল-পালানো ছেলের দলের একজন চাঁই সদস্য। ভ্রাতুষ্পুত্রটির নাম সতীশ, রং টক্‌টকে গৌরবর্ণ, একহারা চেহারা, নতুন স্প্রিং-এর মত তার সমস্ত দেহের একটা দৃঢ় বাঁধুনী ও স্থিতিস্থাপকতা ছিল। নতুন নতুন বদ্‌মায়েশি ফন্দী আঁটিবার বুদ্ধিতে ও সাহসে দলের সকলেই তার কাছে হার মানিত।

ফলে এই দলটির লেখাপড়া যাহা হইবার হইল, তারপর যখন শখের থিয়েটারের ধুম কলিকাতা হইতে কাশী গিয়া পৌঁছিল, এদের দল কাশীতে নব আন্দোলনের প্রতিভূ ও প্রাণস্বরূপ হইয়া মহা উৎসাহে নিজেরাই বড় বড় কাগজে সিন্ আঁকিয়া বেলের আঠা দিয়া জুড়িতে লাগিল। নিজেরাই স্টেজ বাঁধিল এবং ঘণ্টা মার্কা সবেদার সাহায্যে রাজা, উজির সাজিয়া নাটকাভিনয় শুরু করিল।

বছর পাঁচেক পরে প্রেমচাঁদ মুখুয্যের লীলা-প্রাপ্তি ঘটিল, গণেশ-মহল্লার রামজীবনবাবুও গভর্নমেণ্ট পেন্‌সনের মায়া কাটাইলেন। তাঁর ছেলেরা পৈতৃক অর্থ ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইয়া ভায়ে ভায়ে পৃথক হইল। সতীশ নিরাশ্রয় ও কপর্দকশূন্য অবস্থায় এখানে-ওখানে ঘুরিতে ঘুরিতে জুটিল গিয়া নেপালে।

নেপালে যে কি করিয়া সে দরবার হাসপাতালে কম্পাউন্ডারী পাইয়া চাকুরিতে ও চিকিৎসা ব্যবসায়ে দু'পয়সা রোজগার করিতে লাগিল—যে সতীশ ইংরাজি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর গণ্ডি দু'তিন বৎসরেও ডিঙাইতে পারে নাই, সে কি করিয়া দুরূহ ইংরাজীতে লেখা ডাক্তারী বই আয়ত্ত করিয়াছিল, সামান্য বেতনের কম্পাউন্ডার হইয়া সে কি ভাবে অবসর সময়ে রোগী দেখিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ে বেশ নাম করিয়া ফেলিয়াছিল—সে সব খবর দিতে পারিব না। কিন্তু প্র্যাক্‌টিসে সে বাস্তবিকই সুনাম অর্জন করিল, বিশেষ করিয়া অস্ত্র-চিকিৎসায়। ভালো ও নিপুণ অস্ত্র-চিকিৎসকের যে যে গুণ থাকা দরকার—সাফ্ হাত, সাফ চোখ, সাহস, সতকর্তা, প্রকৃতিস্থতা, অবিচলিত বিচার-বুদ্ধি—এ সব

গুণ তার ধীরে ধীরে বাড়িতে লাগিল—সঙ্গে সঙ্গে পসারও।

সতীশ নেপালে আসিয়া স্থানীয় স্কুলের জনৈক শিক্ষকের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। শিক্ষকের নাম মৃত্যুঞ্জয়বাবু, বাড়ি নদীয়া জেলার মেহেরপুরে। পাঁচ বৎসর অন্তর বৃদ্ধ পিতাকে দেখিতে একবার করিয়া দেশে যাইতেন। বিবাহের দুই বৎসর পরে বাংলা ১৩০৭ সালে তাঁহাদেরই সঙ্গে সতীশ বাংলাদেশে অনেককাল পরে ফিরিয়া আসিল ও সর্বপ্রথম কলিকাতা শহর দেখিল। পৈতৃক বাসস্থান যে গ্রামে ছিল, সেখানেও একবার গেল। বাংলা-দেশে আসিয়া সতীশের মনে হইল, যে মায়ের মুখ সে ভাল মনে করিতে পারে না, ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট সামান্য একটু মনে পড়ে, যেন মেঘলা দিনের দিবানিদ্রার স্বপ্ন—সে মায়ের স্নেহ সারা দেশটাতে ছড়াইয়া পড়িয়া যেন সাগ্রহে তাহার প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। গ্রামে আসিলে গ্রামের তো কেহ তাহাকে চিনিতেই পারে না, কারণ সে গিয়াছিল নিতান্ত ছেলেবেলাতে দশ-বারো বছর বয়সে। পৈতৃক ভিটা খুঁজিয়া বাহির করিতে বেগ পাইতে হইল, কারণ এমন দুর্ভেদ্য বন-জঙ্গলে ঢাকিয়া পড়িয়াছে যে বাহির হইতে চিনিয়া লওয়াই কষ্টকর।

গ্রামের সকলেই আসিয়া ধরিয়া বসিল যে, তাহাকে দেশে ঘরবাড়ি করিতে হইবে—এখানে বাস করিতে হইবে। ইহার মধ্যে প্রতিবেশীর পুত্রের উপর নিছক নিঃস্বার্থ ভাল-বাসা ছিল না, তাহা বলাই বাহুল্য। দেশে মোটে ডাক্তার নাই, সতীশের মত একজন নাম-জাদা ডাক্তার গ্রামে বসিয়া প্র্যাক্টিস করিলে গ্রামের লোকের সুবিধা বড় কম নহে চক্ষু-লজ্জার খাতিরে অন্ততঃ গ্রামের লোকের কাছে সে তো আর ভিজিট লইতে পারিবে না!

সেবার সতীশ ভিটার মায়া কাটাইয়া ফিরিয়া গেল বটে, কিন্তু দেশের মায়া তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল—পরের বৎসরই সে পুনরায় শীতকালে ছুটি লইয়া গ্রামে ফিরিয়া পৈতৃক ভিটার বনজঙ্গল কাটাইয়া টিনের ঘর তুলিয়া ফেলিল। ছুটি ফুরাইলে আবার কর্মস্থানে ফিরিল সেবারও।

কিন্তু দেশের মায়া একবার পাইয়া বসিলে তাকে কি ছাড়ানো সহজ? চন্দ্রগিরি, উদয়-গিরির দুর্গম গিরিসঙ্কট পার হইয়াও নদীয়া জেলার ক্ষুদ্র গ্রামের ডাক নেপালে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। পর বৎসর সতীশ চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া স্ত্রী-পুত্র সহ দেশে আসিয়া বসিল ও গ্রামে প্র্যাক্টিস শুরু করিল।

সে আজ বত্রিশ বৎসর পূর্বের কথা। তখন অলিতে-গলিতে এম্-বি পাশ ডাক্তার হয় নাই, আজকালকারের মত পাশ-করা ডাক্তার খুঁজিয়া মেলানো দুর্ঘট ছিল। নিকটবর্তী নর-হরিপুরের বাজারে তখন যাদুরাম স্যাক্রা ছিল দেশের মধ্যে বড় ডাক্তার।

যাদুরাম বাদে একজন মুসলমান হোমিওপ্যাথ একজন কবিরাজও ছিল। ইহারা গেল প্রবীণের দলে। তরুণের মধ্যে কানাইলাল রায় কলিকাতা হইতে কিসের একখানা সার্টি-ফিকেট আনিয়া ডাক্তার সাজিয়া বসিয়াছিল।

সতীশ আসিয়াই প্র্যাক্টিস জমাইয়া ফেলিল। সে উপরোক্ত হাতুড়ে দলের অনুকরণে নরহরিপুরের বাজারে ডাক্তারখানা খুলিয়া আধহাত লম্বা হরফে নিজের নামের সাইন-বোর্ড ঝুলাইল না, বা রোগীর বাড়ি আসিয়া স্থানীয় অন্যান্য ডাক্তারদের নিন্দাবাদ করাও অভ্যাস করিল না। গ্রামের বাড়ির একখানা ঘরে ঔষধ রাখিত, আলাদা ডিস্পেন্সারিও ছিল না—রোগীরা আসিয়া বসিত সতীশের বাড়ির সামনে বটতলায়—তাহাদের বসিবার স্থানের পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও সতীশের বাড়ির সামনে বটতলায় রোগীর ভিড় দিন দিন বাড়িয়া চলিল। দিনরাতে স্নানাহারের সময় নাই, সাত-আট ক্রোশ দূরের গ্রাম হইতেও রোগী দেখিবার ডাক আসিতেছে, গরুর গাড়িতে রোগী দেখিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সতীশ

হাঁফাইয়া পড়িল। প্রতিদিন সকালে নিজের বাড়িতে গড়ে তিন-চারটা সার্জিক্যাল কেস লাগিয়াই আছে।

ব্যাপার দেখিয়া যাদুরাম একদিন কানাই ডাক্তারকে ডাকিয়া বলিল, "এত রুগী এ-দেশে ছিল কোথায় এতদিন হে?" গত বিশ বৎসরের মধ্যে যদু ডাক্তার এত রোগীর ভিড় কখনো দেখে নাই এ-অঞ্চলে।

বেগতিক বুঝিয়া কবিরাজটি একদিন জিনিস-পত্র বাঁধিয়া অন্যত্র সরিয়া পড়িল—কানাই দরজির দোকান খুলিবার জন্য সুবিধামত দোকান ঘরের সন্ধান করিতে লাগিল! যাদু স্যাক্‌রার অন্য কোনো উপায় ছিল না এ-বয়সে। আগেকার দু'পাঁচটা বাঁধা পুরানো ঘর ও পূর্ব সঞ্চিত সামান্য কিছু টাকার জোরে কোনো রকমে টিকিয়া রহিল মাত্র!

সতীশের দুটি ছেলে ও ছোট একটি মেয়ে। মেয়েটির হঠাৎ একদিন ভয়ানক জ্বর হইয়া পড়িল! নিজের বাড়িতে নিজে চিকিৎসা করা যায় না বলিয়া সতীশ যাদুরাম স্যাক্‌রাকে ডাকাইল। যাদুরাম দেখিয়াই বিষণ্ণমুখে বলিল, তাই মুখুয্যে মশায়, এ তো ভয়ানক রোগ, আপনিও বোঝেন, আমিও বুঝি, এ-রোগ তো এখানে সারবার নয়। এখন অন্য সবাইকে তফাৎ করুন, ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়, ডিপ্‌থিরিয়া বড় সাংঘাতিক ব্যাপার কিনা?

যাদুরাম প্রাণপণে ক'দিন দেখিল, কিছুই করা গেল না! তৃতীয় দিনে মেয়েটি মারা পড়িল।

এই ব্যাপারের পর হইতে সতীশের স্ত্রীর সামান্য মস্তিষ্ক-বিকৃতি-ঘটিল—আপন মনে বকুনি, ইহাই দাঁড়াইল উপসর্গ! নয় তো অন্য সবদিকে কোনো অপ্রকৃতিস্থতার চিহ্নও নাই, সংসারের কাজকর্ম, স্বামী পুত্রের যত্ন—কিছুরই মধ্যে কোন ত্রুটি নাই।

সতীশ বড় দমিয়া গেল। হাতে পয়সার জোর ছিল, কিছুদিন প্র্যাক্‌টিস্ বন্ধ রাখিয়া এখানে-ওখানে ঘুরাইয়া আনিল সকলকে, পূর্ববঙ্গে শ্বশুরবাড়ি গিয়া রহিল কিছুদিন. কলিকাতায় আসিয়া ডাক্তার-কবিরাজ দেখাইল, তখনকার মত উপশম না হইল যে, এমন নয়। কিন্তু দেশে আসিয়াই 'যথা পূর্বং তথা পরং।'

বড় ছেলেটির বয়স বারো, সে তিন ক্রোশ দূরবর্তী রামনগরে হাই স্কুলের বোর্ডিং-এ থাকিয়া পড়াশুনো করিতেছিল। ছোট ছেলেটিকেও এবার সতীশ সেখানে রাখিয়া দিল!

এ-সব বাংলা ১৩১২ সালের কথা।

তারপর যেমন অন্য পাঁচজন মানুষের দিন যায়, সতীশের দিনও তেমনি ভাবে যাইতে লাগিল।

রোগী দেখা, টাকা রোজগার, সংসার প্রতিপালন।

ছেলেরা বড় হইল। বড় ছেলেটির নাম বিনয়, সে আই-এস-সি পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়িতে লাগিল। সতীশ পুত্রবধূর মুখ দেখিবার জন্য এই সময় তাহার বিবাহও দিল। ছোট ছেলে তখনও স্কুলের ছাত্র, সে তার দাদার চেয়েও মেধাবী এবং সুবুদ্ধি। ইতিমধ্যে নানাস্থান হইতে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ যাতায়াত করিতেছিল।

এ সব গেল বাহিরের ব্যাপার। সতীশের মনের বড় অদ্ভুত পরিবর্তন হইতে লাগিল ধীরে ধীরে। পনেরো-ষোল বৎসর ধরিয়া সে এই গ্রামে এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ডাক্তারী করিতেছে—এই পনেরো-ষোল বৎসরের জীবন নিতান্ত একঘেয়ে; রোগী দেখা, খাওয়া. ঘুমানো—ভূষণ দাঁ-এর দোকানে বসিয়া মাঝে মাঝে গল্প-গুজব. সংসারের বাজার-হাট করানোর ব্যবস্থা করা—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর—একঘেয়ে. এক রকম জীবনধারা, বৈচিত্র্য নাই. পরিবর্তনও নাই, নূতনতর অনুভূতির কোনো আসিবার পথ নাই কোনো দিক্ দিয়া। কিন্তু সতীশ এ বিষয়ে খুব সচেতন নয়, জীবনে তেমন

আর আনন্দ নাই, এ কথা এক-আধবার তাহার মনে যে না উঠিয়াছে এমন নয়—কিন্তু এ লইয়া ভাবিতে সে বসে নাই কখনো, ভাবিবারও সময়ও পায় নাই।

কিন্তু ক্রমে এ কথাটা তাহার মনের মধ্যে উঁকি মারিতে লাগিল। হয়তো নিস্তব্ধ দুপুরে বিলের পাশের পথ দিয়া গরুর গাড়িতে আরামে সে ভিন্ গাঁয়ে রোগী দেখিতে চলিয়াছে ; মাঠের ধারে ধারে ঘুঘু পাখীর ডাকে কিংবা বিলের গভীর জলে বাগ্দী ছেলের ডোঙা চড়িয়া মাছ ধরিবার দৃশ্যে—সে দেখিত সে হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া কাশীতে যাপিত বাল্যজীবনের কথা ভাবিতেছে···রামরাম সাহু হালওয়াইর দোকানে লছমী বলিয়া সেই মেয়েটি থাকিত—এতকাল পরেও তার সে গলার সুমিষ্ট সুর যেন প্রাণে লাগিয়া আছে··· একবার সে, রামজীবনবাবুর বড় ছেলে বাদল, তাঁর ভাগ্নে নরু—তিনজনে জঙ্গল বাড়ির বারোয়ারী আসরে সিদ্ধি খাইয়া কি কাণ্ডটাই করিয়াছিল।···

নেপালে একবার—কর্ণেল খড়্গ সম্সের জংগ রাণা বাহাদুরের কন্যার বিবাহেতে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিল। গিয়া দেখিল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নাই—একটা মোড়কের মধ্যে মসলা ও সুপারি আর একটা মোড়কে পাঁচটি টাকা! সতীশ কর্ণেল বাহাদুরের দেওয়ানকে বলিল—টাকা কিসের? নিমন্ত্রিত হয়ে এসে টাকা নেওয়া আমরা অপমানজনক মনে করি। দেওয়ান বলিল—এখানে এই নিয়ম। না নিলে কর্ণেল চটতে পারে।

সতীশ রাগ করিয়া বলিল—চটে আমার কি করবেন তিনি? চাকরি নেবেন? নিন—আমি এখুনি ইস্তফা দিতে রাজী আছি, টাকা কখনই নিতে পারবো না।

গোলমাল শুনিয়া রাণা বাহাদুর নিজে আসিয়া ব্যাপারটা অন্যভাবে মিটাইয়া দিলেন। চাকুরি যাওয়া তো দূরের কথা, সেই মাসেই সতীশের দশ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়াছিল।···

গত পনেরো বৎসর ধরিয়া সতীশ তো অনবরত সকলের কাছেই কাশী আর নেপালের গল্প করিয়া আসিতেছে। তাহার সমবয়সী লোকদের কাছে, দেশের বন্ধুদের কাছে, রোগী ও রোগীদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে—কিন্তু সে শুধু বাহাদুরি লইবার জন্য, সে কত দেশ বেড়াইয়া কত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে, কত বড়মানুষী করিয়াছে, কত বড় বড় লোকের সমাজে মিশিয়াছে—তাহা সাড়ম্বরে জাহির করিবার জন্য। এবার কিন্তু এ সব জীবনের স্মৃতি একটা অস্পষ্ট বেদনার মত তাহার মনে আসিয়া উদয় হইতে লাগিল—কি যেন একটা জিনিস চিরকালের জন্য হারাইয়া গিয়াছে, আর কোনো দিন তাহার সাক্ষাৎ মিলিবে না, সতীশের এই এত বড় পসারের বিনিময়েও না, সঞ্চিত অর্থের বিনিময়েও না, কোনো কিছুতেই না।

এ গ্রামের জীবনও ক্রমে নিরানন্দ হইয়া উঠিতে লাগিল। সতীশ গ্রামে আসিয়া এ গ্রামে যে কয়টি সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী প্রবীণ আত্মীয়-স্থানীয় লোক পাইয়াছিল, এ পাড়ার অম্বিকা রায়, শ্যামাকান্ত গাঙ্গুলী—ও পাড়ার বৃদ্ধ গোঁসাই মশায়—ইঁহারা একে একে মারা গেলেন।

আষাঢ় মাসের শেষে যাদুরাম স্যাক্‌রার রোগশয্যা-পার্শ্বে সতীশের ডাক পড়িল।

যাদুরামের বয়স হইয়াছিল প্রায় পঁচাত্তর বৎসরের কাছাকাছি, গত দশ বৎসর অর্থাভাব ও দারিদ্র্যে সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া যাদুরামের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। সতীশ বুঝিল এই বয়স, তার উপর ডবল নিউমোনিয়া রোগ, যাদুরামও বিছানা ছাড়িয়া আর উঠিবে না। যাদুরাম নিজেও সেটা খুব ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল—ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, মুখুয্যে মশায়, ওষুধ আর কি দেবেন, পায়ের ধুলো দিন। একটা কথা বলি, নাতিটার উপায় করতে পারলাম না, দু'দুটো ছেলে মারা গেল—ওইটুকু বংশের মধ্যে শিবরাত্রির সল্‌তে, ওকে আপনার চরণে দিয়ে গেলাম। কম্পাউন্ডারীতে ভর্তি করে নেবেন আপনার

ডাক্তারখানায়—বছর তিনেক দেখে শুনে শিখলে তবুও অন্য চাষা গাঁয়ে গিয়ে হাতুড়েগিরি করেও দুটো খেতে পারবে।

সতীশের চোখ জলে ভরিয়া আসিল ভগ্নহৃদয় বৃদ্ধ চিকিৎসকের অন্তিম শয্যাপার্শ্বে বসিয়া। সে আশ্বাস দিল, এ বিষয়ে তাহার দ্বারা যতদূর সাধ্য সে করিতে ত্রুটি করিবে না। যাদুরাম এমন পয়সা রাখিয়া যায় নাই, তাহার শ্রাদ্ধের খরচ নির্বাহ হইতে পারে—সতীশ নিজে শ্রাদ্ধ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিল। নাতিকে নিজের ডাক্তারখানায় আনিয়া কাজ শিখাইতে লাগিল, খুচরা কিছু দেনা ছিল বৃদ্ধের, তাহাও একরূপ সাময়িক মীমাংসা করিয়া দিল।

এই সময় সতীশের নিজের সময়েরও পরিবর্তন দেখা দিল। ছোট ছেলের কলেজের খরচ, বড়ছেলের ডাক্তারী পড়ার খরচ—এদিকে কি জানি কেন রোগীর সংখ্যা কমিতেছে। স্থানটা কি হঠাৎ স্বাস্থ্যনিবাস হইয়া উঠিল নাকি? সঞ্চিত অর্থে ক্রমশঃ হাত পড়িতে লাগিল—এবং সাধারণতঃ যাহা ঘটিয়া থাকে, একবার সঞ্চিত অর্থে হাত যখন পড়িল, সে হাতকে আর গুটানো গেল না—বৎসরের পর বৎসর ক্রমশঃ খরচ বাড়িয়াই চলিয়াছে—আয় তেমন নাই, হাতের টাকা নিঃশেষ হইতে এ অবস্থায় কত দিন লাগে?

সতীশ অমানুষিক পরিশ্রম করিতে লাগিল। আর দুটো বছর, বিনয় মানুষ হইলে আর কিসের ভাবনা? এ অঞ্চলে এম্-বি পাশ করা ডাক্তার ক'টা আছে? কখনো যে-সব গ্রামে দশ টাকা ভিজিটের কমে সতীশ যায় নাই—এখন চার টাকা লইয়াও সেখানে যাইতেছে। নিজে দুধ খাওয়া ছাড়িয়া দিল—বাড়ির চাকরকে জবাব দিল। খরচ কম পড়িবে বলিয়া স্ত্রী ও পুত্রবধূকে কলিকাতায় পাঠাইয়া ছেলেদের বাসা করিয়া দিল—নিজে দেশে হাত পুড়াইয়া রাঁধিয়া খাইয়া এবং সারাদিন টো টো করিয়া গ্রামে গ্রামে রোগী দেখিয়া যাহা পায়, প্রতি সপ্তাহে কলিকাতার বাসাতে বিনয়ের নামে মণিঅর্ডার করে।

বিনয় এম্-বি পাশ করিয়া যুদ্ধে গেল।

সতীশের দুঃখ ঘুচিল এতদিনে।

গ্রামের মধ্যেও একটা সাড়া পড়িল না এমন নয়। এ অঞ্চলে এম্-বি পাশ করা ডাক্তার এই প্রথম। তাহার উপর বিনয় আবার গবর্নমেন্টের চাকরি পাইয়া সুদূর মেসোপটেমিয়ায় গিয়াছে সেদিন নাকি ছোটখাটো একটি খণ্ডযুদ্ধে আরবদের গুলি বিনয়ের কানের পাশ কাটাইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, পয়সা কি এমনি হয়? বিনয় পত্রে এ ঘটনাটি বাবাকে জানাইয়াছিল। নরহরিপুরের বাজারে ভূষণ দাঁ-এর পুরনো আড্ডাটি আর ছিল না—কারণ পনেরো বৎসর হইল ভূষণ মারা গিয়াছে। তবুও এ দোকানে, ও দোকানে বসিয়া সতীশ গর্বের সঙ্গে পুত্রের চিঠি হইতে যতটুকু সে-দেশের খবর পায়, তারই সাহায্যে যুদ্ধের গল্প করে।

সঙ্গে সঙ্গে বলে—কিন্তু আমাদের নেপালে যখন প্রাইম-মিনিস্টারের বাড়ির সাম্‌নের ময়দানে প্যারেড হোত, তাতে আমরা যুদ্ধের কৌশল সবই দেখেছি। মেসিন গান্? ও তো আমাদের সময়েই প্রথমে নেপালে এল···আমাদের কাছে ওসব নতুন নয়—

অর্থাৎ নেপাল ও সতীশের যৌবন—ইহারা কাহারও কাছে পরাজয় স্বীকার করিবে না। সব ছিল নেপালে। দু'চারবার মোটা টাকার মণিঅর্ডার পাইয়া সতীশ মহা উৎসাহে বাড়ি নতুন করিয়া তৈরী করিবার জন্য মিস্ত্রি লাগাইল। ছেলে বড় ডাক্তার হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে, সাহেবী মেজাজ এখন তার—এ ধরনের বে-মেরামতি পুরনো বাড়িতে থাকিতে তাহার কষ্ট হইবে। সতীশ ছেলের উপযুক্ত মত বাড়ির পুনরায় সংস্কার করিতে অনেক ব্যয় করিয়া ফেলিল। এইখানে ডাক্তারখানা হইবে, এইটি ছেলের বসিবার ঘর এইটি

নাতিদের পড়িবার ঘর।

হঠাৎ মেসোপটেমিয়া হইতে বিনয়ের পত্র আসা বন্ধ হইয়া গেল। দুদশদিন করিয়া মাসখানেক কোনো খবর নাই—সতীশ অত্যন্ত ধৈর্যশীল, সে নিজে অটল থাকিয়া স্ত্রী ও পুত্রবধূকে নানা মিথ্যা স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে. ক্রমে গ্রামময় গুজব রটিয়া গেল বিনয় আর নাই, যুদ্ধে মারা পড়িয়াছে!

বিনয়কে গ্রামের সকলেই ভালবাসিত, তাহার সুন্দর চেহারা ও মধুর ব্যবহারের গুণে বিনয়কে কেহ পর ভাবিত না। এ দুঃসংবাদে চোখের জল ফেলিল না, এমন লোক নাই গ্রামে। সতীশের সহ্য করিবার শক্তি দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল. তাহার মুখে একদিন কেহ কোনো দুর্বল কথা শুনিল না—চোখের জল তো দূরের কথা।

জ্যৈষ্ঠ মাস। ভীষণ গরম, মুখুয্যে-বাড়ির তেঁতুলতলার সামনে একখানা ভাঙা গরুর গাড়ির উপর বসিয়া পাড়ার নিষ্কর্মা যুবকেরা আড্ডা দিতেছে—এমন সময়ে সাইকেলে মোড়ের মাথায় সহেবী-পোশাকে কাহাকে আসিতে দেখা গেল। বিনয়।

মুখুয্যে-গিন্নী স্নানান্তে শিব-পূজা করিতে বসিয়াছিলেন, পূজা ফেলিয়া ছুটিতে ছুটিতে পথের ধারে আসিলেন অর্থাৎ তাঁহার পায়ের বাতের দরুন যতটুকু ছোটা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় ততটুকু বেগে, বিনয়কে বুকের মধ্যে জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন. যুবকেরা সকলে বলিল. আচ্ছা ভয় দেখিয়েছিলেন বিনয়-দা, বেশ যা হোক্—

বিদ্যুৎবেগে গ্রামের সর্বত্র বিনয়ের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সতীশ ডাক্তারের বাড়ির উঠানে সব পাড়ার লোক ভাঙিয়া পড়িল। বিভিন্ন পাড়ায় সেদিন সন্ধ্যায় গ্রামের মেয়েরা হরির্লুট দিল।

বিনয় যুদ্ধ হইতে আসিয়া প্রথম প্রথম গ্রামেই বসিয়াছিল—তারপর সে মহকুমায় গিয়া বসিল। এত পসার এ অঞ্চলে কোনো ডাক্তার কেহ কখনো দেখে নাই।

সতীশও ডাক্তারী করিত স্ব-গ্রামেই কিন্তু ছেলে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পসার কমিয়া গেল. সবাই বিনয়কে চায়, সতীশকে কেহ বড় একটা ডাকে না। সে সকলকে গর্বের সঙ্গে বলে, তা তো হবেই, বিনয় এসেছেন। অত বড় ডাক্তার. আমরা তো সেকেলে কোয়াক্, ওঁদের কাছে কি আমরা—

পরাজয়েরও সুখ আছে, গর্ব আছে।

সতীশ একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল, সে বৃদ্ধের দলে পড়িয়া গিয়াছে।

গণেশমহল্লার সে ডানপিটে সতীশ—ঠাসা বন্দুকের এক দ্যাওড়ে আসিঘাটের ওপারের চরে যে তিনটা পাখী মারিয়াছিল মনে আছে, বুড়ুয়া-মঙ্গলের সময় আলোকিত বজরার পাশ দিয়া ডুব সাঁতার দিতে দিতে কাহাদের আলোকোজ্জ্বল বজ্‌রা—

যাক্, সে সব পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটিয়া লাভ কি? মোটের উপর সতীশকে সবাই এখন 'বুড়োকর্তা' বলিতে শুরু করিয়াছে, এটা সে লক্ষ্য করিল: বিশেষতঃ বিনয় ফিরিয়া আসিবার পর হইতে।

নাতিরা স্কুলে পড়ে। সতীশের ছোট ছেলে কিন্তু ভাল হইল না। সে কলেজ ছাড়িয়া দিয়া এত দিন বাড়িতেই বসিয়া ছিল—এইবার দাদার ডাক্তারখানায় কম্পাউন্ডারী আরম্ভ করিল।

জলের স্রোতের মত বৎসর কাটিয়া যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে বিনয়ের প্রত্যাবর্তনের পর সাত বৎসর কাটিল।

এই সাত বৎসরে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়া গেল সতীশের জগতে। বিনয় কুসঙ্গে পড়িয়া ঘোর মাতাল হইয়া উঠিয়াছে—পয়সা যথেষ্ট রোজগার করে কিন্তু হাতে রাখিতে পারে না। কাহাকেও মানে না। যুদ্ধে গিয়াই সে মদ খাইতে শিখিয়াছিল। আগে বাপকে ভয়

করিত, লোক-লজ্জার ভয় রাখিত। এখন বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বাপকে আর তেমন মানে না।

সতীশ স্ব-গ্রামেই থাকিত। প্রথম প্রথম পুত্রবধূরা গ্রামের বাড়িতেই থাকিত। ক্রমে তাহারা চলিয়া গেল বিনয়ের বাসায়। সতীশের স্ত্রীর সেই উন্মাদ রোগ একেবারে কখনো সারে নাই, এই সময় বেশী করিয়া দেখা দিল। সেই জন্যই মাকে বিনয় দেশের বাড়িতে রাখিয়াছিল। তবু এতদিন সর্বদা দেখাশুনা করিত, শুশ্রূষা ও চিকিৎসার ত্রুটি কখনো করে নাই।

ক্রমে ক্রমে কিন্তু মাকেও সে অবহেলা করিতে লাগিল। এক মাসেও একবার মাকে দেখিতে আসে না, অথচ সে মোটর কিনিয়াছে। এই ন' মাইল আসিতে কতক্ষণ লাগে?

শুধু পানদোষ নয়, আনুষঙ্গিক অনেক উপসর্গই জুটিয়াছে বিনয়ের। স্ত্রী-পুত্রকে যন্ত্রণা দেয়, সংসারের ন্যায্য খরচের টাকা রাত্রে কোথায় গিয়া ব্যয় করিয়া আসে, কেহ জানে না! প্রায়ই সারারাত্রি বাহিরে কাটায়। মাঝে মাঝে দিনমানেও ডাক্তারখানায় বসে না। পসার কমিতে লাগিল, রোগীরা আসিয়া ফিরিয়া যায়। বৃদ্ধ বয়সে সতীশ ঘোর অর্থকষ্টে পড়িল। বিনয় বাপ-মাকে মাঝে-মাঝে টাকা যে না দেয় এমন নয়, কিন্তু তাহাতে সতীশের চলে না। ছোট ছেলেটি দাদার অবস্থা দেখিয়া নিজের স্ত্রী পুত্র লইয়া শ্বশুর-বাড়ি চলিয়া গেল, সে-ও বাপ-মায়ের বিশেষ কোনো সংবাদ লয় না।

সন্ধ্যা বেলা বসিয়া বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে সতীশ অন্যমনস্ক ভাবে এই সব কথাই ভাবিতেছিল, এমন সময়ে উঠানে কাহাকে আসিতে দেখা গেল।

—কে?

—আমি পটল, দাদা।

সতীশ খুশী হইয়া একগাল হাসিয়া হুঁকা-হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

—আয়, পটল! আয়, আয়,—

পটল বিনয়ের বড় ছেলে দিব্যেন্দুর ডাক নাম। গৌরবর্ণ, সুশ্রী, চৌদ্দ-পনেরো বছরের হাস্যমুখ বালক। নাতিদের জন্য বৃদ্ধের মন-কেমন করে সর্বদা—কিন্তু তাহারা বড় একটা এদিকে পা দেয় না অপ্রত্যাশিত ভাবে নাতিকে দেখিয়া সতীশ যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল।

—তোর বাবার খবর কিরে, পটল?

দিব্যেন্দু অপরাধীর মত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—সেই একই রকম দাদা। বরং আরও বেড়েচে। পরে সে দাগ দেখাইল, মাতাল অবস্থায় বাবা কি একটা শক্ত এ্যালজেব্রার অঙ্ক কষিতে দিয়াছিল, সে পারে নাই বলিয়া ছড়ি দিয়া মারিয়াছে। দুজনে বসিয়া অনেক কথা হইল। সতীশ বলিল—বোস্ পটল, রাঁধি গে গিয়ে, খাবি কি নৈলে?

সতীশের স্ত্রী এখন সম্পূর্ণ পাগল, একটা ঘরে একা দিনরাত শুইয়া থাকে, আপন মনে বিড়-বিড় করিয়া বকে, কাজকর্ম করা দূরের কথা, না খাওয়াইয়া দিলে খায় না। সতীশ বলিল—এক একবার মনে হয় পটল, আবার প্র্যাক্‌টিস শুরু করি। কিন্তু এখন আর আমায় ডাকবে না। ত্রিশ বছর আগে যখন এসেছিলাম এ দেশে, তখন তেমন ডাক্তার ছিল না। এখন নরহরিপুরের বাজারেই তিনটে ক্যাম্বেল পাশ, একটা এম্-বি। ওদিকে তো বিনয় রয়েচে, অমল রয়েচে—শ্যামবাবু—সবাই এম্-বি। আমাকে আর কে ডাকবে?

দিব্যেন্দু বলে—ভেবো না দাদা। আমি পাশ করে যখন চাকরি করবো, তখন তোমার আর এ দশা থাকবে না।

সতীশ উৎসাহের সহিত বলে—আমায় কাশী পাঠিয়ে দিস্ পটল। কতকাল দেখি নি—এই শুন্‌বি তবে আমরা কি করতাম সেখানে?

দিব্যেন্দু জ্ঞান হইয়া পর্যন্ত কাশীর গল্প, নেপালের গল্প অনেক শুনিয়াছে ঠাকুরদাদার মুখে। একই গল্প পঞ্চাশবার সে শুনিয়াছে অন্ততঃ। মুখস্থ বলিতে পারে। তবুও বৃদ্ধ ঠাকুরদাদাকে খুশী করিবার জন্য বলিল—বল না, দাদা! চন্দ্রাগিরি পার হবার সময় সেবার নেপালের পথে সেই কি হয়েছিল?

দিব্যেন্দু কখনো নেপাল দেখে নাই, কিন্তু ঠাকুরদাদার মুখে আজন্ম বর্ণনা শুনিয়া চন্দ্রাগিরি রত্নগিরি, রক্সৌলের পশুপতিনাথের-মেলার দৃশ্য—এসব তাহার মানসপটে সুস্পষ্ট রেখা ও বর্ণে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। চোখ বুজিলেই এ সব যেন সে দেখিতে পায়।

সকালে উঠিয়া দিব্যেন্দু চলিয়া গেল।

সতীশ বলিল—তোর বাবাকে বলিস্ দিকি পটল, জুতো এই দ্যাখ, একেবারে নেই—স্যান্ডেলটা সেই তোর বাবার দরুন, সেবার বাসা থেকে এনেছিলাম, তা ছিঁড়ে গিয়েচে।

দিব্যেন্দু যাবার সময় বলিয়া গেল—এ-সব কথা আমি বলেচি, বোলো না যেন বাবাকে, দাদা। তা হোলে বাবা পিঠের ছাল তুলবে আমার—

দিব্যেন্দু চলিয়া গেলে বৃদ্ধ আবার পুরাতন দিনগুলির স্বপ্ন দেখিতে থাকে। আজকাল হাতে কাজকর্ম একেবারেই নাই—এ ধরনের অলস জীবন সে যাপন করে নাই কখনো। আপন মনে বসিলেই সেই সব কথাই মনে আসে।

গাঙ্গুলী-বাড়ীর অন্নাকালি দুটি কাঁচ শসা হাতে পৈঠাতে উঠিয়া বলিল—গাছে হয়েছিল জ্যাঠাবাবু, মা বললে দিয়ে আয়।

আঁচলের মুড়ায় বাঁধা কি একটা জিনিস খুলিতে খুলিতে বলিল—আর এই ক'টা—

সতীশের মনের নিরানন্দ ভাব অন্তর্হিত হইয়া গেল। আগ্রহ-উজ্জ্বল চোখে অন্নাকালীর আঁচলে বাঁধা দ্রব্যের দিকে চাহিয়া বলিল—কি রে ওতে? মটর ডালের বড়ি! বাঃ বাঃ—দে, রাখ্ এখানে, মা।

সতীশ চিরকাল খাইতে ও খাওয়াইতে ভালবাসে। আজকাল অভাবে পড়িয়া গিয়াছে অমন উপার্জনক্ষম ছেলে থাকিতেও নাই—তাই গ্রামের মেয়েরা ভাল জিনিসটা বাড়িতে হইলে সতীশকে মাঝে মাঝে পাঠাইয়া দেয়।

অন্নাকালী চোদ্দ-পনেরো বছরের সুন্দরী মেয়ে—উপরি উপরি চারটি কন্যার জন্মগ্রহণের পরে বাপ-মা পঞ্চম ও সর্বকনিষ্ঠ কন্যাটির ওই নাম রাখিয়াছিলেন, নামের সঙ্গে তার চেহারার কোনো সম্পর্ক নাই। সে হাসিয়া বলিল—আপনার হাতের সেই কলায়ের ডাল রান্না কখনো ভুলবো না জ্যাঠাবাবু। মেয়েমানুষে অমন রাঁধতে পারে না।

সতীশ খুশী হইয়া উজ্জ্বল মুখে বলিল—কবে খেলি রে, অন্না?

অন্নাকালী ঘাড় দুলাইয়া বলিল—বা রে, এই তো ভাদ্রমাসে অরন্ধনের দিন। তারপর ঘরের দিকে চাহিয়া বলিল—জ্যাঠাইমা কেমন?

—ওই এক রকম, ওর আবার ভালো আর মন্দ। ওরই জন্যে তো কোথাও যেতে পারিনে অন্না। নইলে কাশীতে গেলে একটা পেট চলে যায়। আর কাশীময় আমার বন্ধু-বান্ধব, তা ওর অযত্ন হবে, ওকে দেখবে কে, সেই জন্যেই তো আছি আটকে। নইলে আমার আবার ভাবনা? এই শুনবি, কাশীতে আমরা কি করতাম?

তারপর কাশীর গল্প আরম্ভ হয়। অন্নাও এসব গল্প ইতিপূর্বে শুনিয়াছে, কিন্তু গল্প শুনিতে সে ভালোবাসে, বিশেষ করিয়া জ্যাঠামশায়ের মুখে। সে রোয়াকের পৈঠার উপর বসিয়া পড়ে। কাশীর কথা হইতে কখন নেপালের কথা আসিয়া পড়িয়াছে দুজনের কেহই লক্ষ্য করে নাই, হঠাৎ অন্না উঠানের দিকে ভীত চোখে চাহিয়া বলিল—জ্যাঠাইমা কোথায় বেরিয়ে যাচ্ছে যে!...

—ধর্, ধর্, মা, ধর্—নিয়ে আয়। নাঃ জ্বালালে বাপু।

আন্না দৌড়িয়া উঠিয়া গিয়া শীর্ণদেহ, রুক্ষকেশ, বকুনি-রত জ্যাঠাইমার হাতখানা খপ করিয়া ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—এসো জ্যাঠাইমা কোথায় যাচ্চ, এসো···

—একেবারে ঘরের মধ্যে নিয়ে যা, মা। নাঃ, আমার হয়েচে যতো বিপদ ; তা ইয়ে আন্না কলায়ের ডাল রাঁধবো এখন মা, আজ দুপুরে আমার এখানে দুটো খাস এখন।

পরের বছর হইতে বিনয়ের পসার একেবারেই কমিয়া গেল। দশ-বারো বছর আগের ব্যাপার আর ছিল না, এখন মহকুমা-টাউনের উপর তিনজন এম্-বি। পানদোষ ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য ভদ্র-গৃহস্থের বাড়িতে তাহাকে কেহ আজকাল ডাকে না, তা ছাড়া রোগীরা আসিয়াও ডাক্তারের দেখা পায় না।

তাহার পর দেখা দিল পৃথিবী-ব্যাপী মন্দা। পাটের বাজার একেবারে পড়িয়া গেল। রোগ ইহলেও আর লোকে ডাক্তার দেখাইতে পারে না। বিনয় মহা অর্থ-কষ্টের মধ্যে পড়িল। সে লোক খারাপ নয়, হাতে পয়সা থাকিলে যতক্ষণ খরচ করিতে না পারে, ততক্ষণ তাহার মনে শান্তি হয় না, উদার, দিল-দরিয়া মেজাজের মানুষ। বাবাকে সে ইচ্ছা করিয়া অবহেলা করে তা নয়, বাবা এত ঘনিষ্ঠ, এত সুপরিচিত যে, তাহার সম্বন্ধে সে কোনো খেয়ালই করে না। সতীশ মুখ ফুটিয়া কখনো ছেলেকে জানায়ও নাই তাহার অসচ্ছলতার কথা, পাছে ছেলেকে বিব্রত হইতে হয়।

এই অবস্থায় একদিন বিনয় পিতার সহিত দেখা করিতে আসিল। সতীশ অপ্রত্যাশিত ভাবে ছেলেকে দেখিয়া মহাব্যস্ত হইয়া উঠিল। সারা বাড়ির মধ্যে একখানা চেয়ার কি টুল পর্যন্ত নাই, ছেলেকে বসিতে দেয় কিসে যে!

বিনয় বলিল—থাক্ বাবা থাক, আমি এই যে বেশ বসেছি।

সতীশ ব্যস্তসুরে বলিল—উঃ, ঘেমে একেবারে···দাঁড়াও একটু চা করে আনি। ভাড়াটে মোটরে এলে কেন? তোমার গাড়ি কোথায়?

—গাড়ি আছে, ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেছে মেরামতের জন্য একমুঠো টাকা দরকার, হাতে পয়সা কোথায়? কাজেই গাড়ি গ্যারেজে পড়ে।

—পটল কোথায়?

কলকাতাতেই আছে। ওর পড়াশুনার যে কি করি? মেসে তো একগাদা টাকা খরচ, তিনমাসের মেসের দেনা বাকী। কলেজের মাইনেও দুমাস পাঠাতে পারি নি।

পিতা-পুত্রে অনেকক্ষণ পরামর্শ হইল। তিন জয়গার খরচ বিনয় তো আর পারে না। দেশের বাড়ি টাউনের বাসা এবং দিব্যেন্দুর মেস ও কলেজের খরচ। কি এখন করা যায়?

বিশেষ কিছুই মীমাংসা হইল না। উঠিবার সময় বিনয় কুণ্ঠিত ভাবে বাবাকে দুটি টাকা দিতে গেল। ছেলের শুষ্ক ও চিন্তাকুল মুখ দেখিয়া বৃদ্ধ টাকা দুটি প্রাণ ধরিয়া লইতে পারিল না। বলিল—রেখে দাও এখন, সোমবার দস্তিঘাটা থেকে ডাক এসেছিল, কিছু পেয়েচে, তোমার মোটরের ভাড়াও তো লাগবে আবার?

গ্রামের একটি ছেলে রেলে কাজ করিত, ছুটি লইয়া দেশে আসিয়া প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা সতীশের কাছে গল্প করিতে আসিত। একদিন সতীশ বলিল—দ্যাখ উমাপদ, ভাবচি কি জানো? তোমার জ্যাঠাইমাকে ওর বাপের বাড়িতে রেখে আমি কাশী চলে যাই। একজন লোকের কাশীতে বেশ চলবে। নইলে এদিকে সবই তো শুনলে—বিনয় বড় মুশকিলে পড়েচে, রুগী-পত্তর নেই, ডাক নেই, এই বাজারে দুটো সংসার চালানো কি সোজা কথা রে, বাবা? আমরা চলে গেলে, ও তবু খানিকটা খোলসা হয়···তা ছাড়া কাশীতে আমার বন্ধু-বান্ধব ভর্তি, আহা, কত কাণ্ডই করেচি সব এক সময়, কাশীতে কাকে না চিনি?

উমাপদ আবাল্য এসব গল্পের সঙ্গে পরিচিত সে, বলিল—পাগল হয়েচেন? আপনার ছেলেবেলার আমলের তারা কি আর কেউ এখন আছে ভাবচেন? সে সব কি—

সতীশ কথাটা পছন্দ করিল না, বাধা দিয়া বলিল—তুমি কি ক'রে জানলে নেই? আমাদের সে ডার্নাপিটে দলের ছেলে হঠাৎ মরবার নয় জেনো ('ছেলে' কথাটা অসতর্ক মুহূর্তে মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল)—সব আছে, হে'-হে' হঠাৎ আমরা মরচি নে। তুমি জানো না, আমাদের সে দলের কথা—শুনবে তবে?

উমাপদ ব্যস্ত হইয়া বলিল—ইয়ে, জ্যাঠামশায় আর একদিন বরং এসে—আজ একটু কাজ আছে—উঠি এখন।

দিন পনেরো পরে সতীশ একদিন কাশী স্টেশনে দুপুরবেলা নামিল! স্ত্রীকে মেহের-পুরে ছোট শালার কাছে রাখিয়া আসিয়াছে। আসিবার সময় বাড়ির চাবিটা আন্নাকালীর হাতে দিয়া আসিয়াছে, বিনয় আসিলে দিবার জন্য। ছেলেকে কোন খবর দেয় নাই—কেন মিছামিছি তাহাকে বিব্রত করা।

কাশীতে নামিয়া মনে একটা অপূর্ব উৎসাহ ও উত্তেজনা অনুভব করিল—বাল্যের সেই কাশী! এতদিন কি করিয়া ভুলিয়াছিল সে! বাংলা দেশের একটা জঙ্গলে-ভরা ছোট্ট পাড়াগাঁয়ে জীবনের ত্রিশটি বছর—

সারাদিন ধরিয়া সে কাশীর পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইল। পঞ্চগঙ্গা ঘাটে স্নান করিল, বিশ্বনাথ দর্শন করিল। বাল্যের দিনগুলির সঙ্গে জড়িত যে সব জায়গায় একদিনের মধ্যে পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া সম্ভব, তাহা সে বড় বাদ দিল না।

কিন্তু ধীরে ধীরে তাহার মনে হইতে লাগিল—কাশী, তাহার সে চল্লিশ বছর আগে-কার কাশীকে সে যেন খুঁজিয়া পাইতেছে না, সে কাশী কোথায় গেল? এ কাশীকে তো চেনে না।

গণেশ-মহল্লায় পুরাতন সঙ্গীদের সন্ধান কেহ জানে না, কেবল রামজীবনবাবুর মেজ-ছেলে পতিতপাবন পৈতৃক বাটিতে এখনও বাস করিতেছে। পতিতপাবন সতীশকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল। বলিল, সতীশ-দা, তোমার চেহারা তো এখনো বেশ আছে! আমারও ধরো এই বাষট্টি হোল, আমি তোমার চেয়ে বুড়ো হয়ে গেছি—মানে, অম্বলের অসুখে আমরা—এতদিন ছিলে কোথায়?

নানা পুরাতন দিনের গল্প হইল। পতিতপাবনের অবস্থা ভাল নয়, ব্যবসায় বার বার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া সর্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছিল। তারপর উপরি উপরি দু'টি উপযুক্ত ছেলে মারা গিয়াছে। ছোট ছেলেটি রেশমের কাপড়ের ব্যবসা করে বিশ্বনাথের গলির মধ্যে—তাতেই কোনোরকমে চলে। ভাইগুলির মধ্যে কেবল ছোট ভাইটি বাঁচিয়া আছে, পাটনাতে শ্বশুরবাড়ি বাসা বাঁধিয়াছিল, বহুদিন হইল সেইখানে আছে।

সন্ধ্যাবেলা সতীশ দশাশ্বমেধ ঘাটে চুপ করিয়া বসিল। সম্মুখে হাসিমাখা, কত অজানা তরুণ মুখে—গান…আনন্দের উচ্ছ্বাস…দিব্যেন্দুর কথা মনে পড়িল। বিদ্যেন্দু বলিয়াছিল—দাদা, আমি চাকরি করলে তোমার ভাবনা থাকবে না। দিব্যেন্দু জানে না যে, তাহার দাদা লুকাইয়া কাশী চলিয়া আসিয়াছে। এই দশাশ্বমেধ ঘাটে, এই সন্ধ্যা-বেলা যেন প্রত্যেক বালককেই মনে হইতে লাগিল দিব্যেন্দু। দিব্যেন্দু না সে পঞ্চাশ বছর আগেকার নিজে?

আন্নাকালীর মুখ মনে পড়িল—যখন গরুর গাড়ির পাশে দাঁড়াইয়া ঘরের চাবিটা তার হাতে দিয়াছিল, সে সময়কার তার ছলছল চোখ দু'টি মনে পড়িল।

নাঃ, সে ডানাপিটে সে আর নাই। কাশীও তার কাছে আর কিছুই না। তার সে কাশী হারাইয়া গিয়াছে।

রাত্রে ঘুম হইল না কত রাত পর্যন্ত। শুইয়া শুইয়া ঠিক করিল সে ফিরিয়া যাইবে। আন্নাকালীর জন্য কৌটা লইতে হইবে, ছেলেমানুষ, খুশী হইবে এখন। দিব্যেন্দুর জামার উপযুক্ত খানিকটা সিল্ক, পতিতপাবনের কাছে ধারে লইয়া গেলেই হইবে, গিয়া দাম পাঠাইবে। ভাল পট···বৌমা ছবি ভালবাসে।

কিন্তু সকালে উঠিয়াই সে পতিতপাবনকে বলিল—তুমি একটা উপকার করো ভাই আমার। তোমার এখানে আর ক'দিন থাকবো। তুমি একটা বাজার-সরকারী গোছের কাজ জুটিয়ে দাও দিকি আমায়। অভাবে রাঁধুনী-গিরিতেও রাজী আছি। খুব ভাল রাঁধতে পারি, দেখে নেবে তারা।

নাঃ, সে ছেলেকে বিব্রত করিতে ফিরিবে না। ছেলে পারিয়া উঠিবে কেন? শেষে কি দিব্যেন্দুর কলেজের পড়া বন্ধ হইবে? বৌমার গহনা বন্ধক দিতে হইবে, ছিঃ—

একটা পেটের জন্য কাশীতে আবার ভাবনা?

যাত্রাবদল

ভাটপাড়াতে পিসিমার বাড়ি গিয়েছিলুম বড়দিনের ছুটিতে। সারাদিন বাড়িতে বসে থেকে ভাল লাগ্‌ল না, বিকেলের দিকে নৈহাটি স্টেশনে বেড়াতে গেলুম। তখন দেশেই থাকি, বিদেশে বেরুনো অভ্যাস নেই, এত বড় স্টেশন ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ বড় একটা হয় নি। ডাউন প্ল্যাটফর্মের ওধারে প্রকাণ্ড ইয়ার্ডটা মালের ওয়াগনে ভর্তি, ওভারব্রিজের ওপর দিয়ে যাত্রীরা পোঁটলা-পুটলি নিয়ে যাতায়াত করচে, নানা ধরনের লোকের ভিড়, নানারকমের শব্দ—দুখানা পাইলট এঞ্জিন ইয়ার্ডের মধ্যে ওয়াগনের সারি টানাটানিতে ব্যস্ত ···ওপারের গাড়ি একখানা ছেড়ে গেল, আর একখানা এখুনি আসবে···বাজারের দিকে সাইডিং লাইনে দুখানা কেরোসিন তেলের ট্যাঙ্ক বসানো গাড়ি থেকে তেল নামাচ্চে।··· এত মাছিও প্ল্যাটফর্মে, কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়াবার জো নেই, যেখানে যাই সেইখানেই মাছি ভন্‌ ভন্‌ করে; চা খাওয়ার ইচ্ছে ছিল কিন্তু স্টলের অবস্থা দেখে সেখানে বসে কিছু খেতে প্রবৃত্তি হোল না। প্ল্যাটফর্মের ওধারে একটা ছোট ঘর, দোর বন্ধ, ঘরটার আশেপাশে পুরানো স্লিপার ও ফিশ-প্লেট্‌ পড়ে আছে রাশীকৃত, একটি ক্ষুদ্র কুলী-পরিবার সেখানে তের্‌পলের তাঁবু খাটিয়ে তোলা উনুনে আঁচ দিয়েচে।

হঠাৎ প্ল্যাটফর্মের সবাই একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। সবাই যেন প্ল্যাট্‌ফর্মের ধারে ঝুঁকে কলকাতার দিকে চেয়ে কি দেখবার চেষ্টা কর্তে লাগল—একজন হিন্দুস্থানী যাত্রী প্ল্যাটফর্মের নিতান্ত ধারে দাঁড়িয়ে চোখ মুছতে ব্যস্ত—ওপার থেকে একজন কুলী তাকে হেঁকে বল্লে—এ আঁখ্‌ পুছনেওয়ালা, হঠ যাইয়ে ডাকগাড়ি আতা হ্যায়—

কাছের একটি ভদ্রলোক যাত্রীকে জিজ্ঞেস্‌ করলুম—কোন্‌ ডাকগাড়ি মশাই?

তিনি বলেন—দার্জিলিং মেলের সময় হয়েচে—

একটু পরেই ধুলো কুটো উড়িয়ে একটা ছোটখাটো ঘূর্ণি ঝড়ের সৃষ্টি করে স্টেশন কাঁপিয়ে দার্জিলিং মেল বেরিয়ে গেল এবং সে শব্দ থাম্‌তে না থাম্‌তে ডাউন প্ল্যাটফর্মে একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেন সশব্দে এসে দাঁড়ালো।

একটু পরে দেখি যে প্ল্যাটফর্মে একটা গোলযোগ উঠেচে। অনেক লোক ওভারব্রিজের ওপর দিয়ে ডাউন প্ল্যাটফর্মের দিকে ছুটে যাচ্ছে—সবাই যেন কি বল্‌চে—ট্রেনটা ছাড়তেও খানিকটা দেরি হোল। তারপর ট্রেনখানা ছেড়ে গেলে দেখলাম প্ল্যাটফর্মের এক জায়গায়

অনেক লোকের ভিড়, গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে সবাই কি যেন দেখচে।

ভিড় ঠেলে ঢুকতে না পেরে একজনকে জিজ্ঞেস্ করতে সে যা বললে তার মর্ম এই যে মুর্শিদাবাদের ওদিক থেকে একটি ভদ্রলোক সপরিবারে এইখানে গাড়ি বদ্লাবার জন্যে নেমেছিলেন পশ্চিমের লাইনে যাবার জন্যে, তাঁর স্ত্রী প্ল্যাটফর্মে নেমেই অজ্ঞান হয়ে যান, সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে অজ্ঞান নয় তিনি, মারাই গেছেন।

লোকের ভিড় পুলিস এসে সরিয়ে দিল। তারপর একটা অতি করুণ দৃশ্য চোখে পড়ল। গোটা দুই স্টীলের তোরঙ্গ, একটা ঝুড়ি, গোটা চারেক ছোট বড় পুঁটুলি—একটা মানকচু ও এক নাগরী খেজুরের গুড় এদিক-ওদিকে অগোছালো ভাবে ছড়ানো—গৃহস্থালীর এই দ্রব্যাদির মধ্যে একটি পাড়াগাঁয়ের বৌয়ের মৃতদেহ, রং ফর্সা, বয়স কুড়ি-বাইশের বেশী নয়। বৌটির মাথার কাছে একটি মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, গায়ে কালো বুক-খোলা কোট—কাঁধে একখানা জম্কালোপাড় ও কল্কাদার সস্তা আলোয়ান, পায়ে ডার্বি জুতো—পাড়াগাঁয়ের অর্ধশিক্ষিত ভদ্রলোকের পোশাক। তাঁর কোলে একটি বছর আড়াই বয়সের ছোট ছেলে মায়ের মত ফর্সা, চুলগুলি কোঁকড়া কোঁকড়া, হাতে কি একটা নিয়ে নাড়াচাড়া করচে ও এক একবার বিস্ময়ের দৃষ্টিতে সমাগত লোকের ভিড়ের দিকে চাইচে। মায়ের মৃতদেহের চেয়েও তার কাছে বেশী কৌতূহলের বিষয় হয়েচে চারিধারে এই গোল-মাল ও অদৃষ্টপূর্ব লোকের ভিড়।

একটু পরে সাহেব স্টেশন মাষ্টার ও তাঁর সঙ্গে একজন ভদ্রলোক এলেন। বুঝতে দেরি হোল না যে ভদ্রলোকটি ডাক্তার, তিনি বৌটির নাড়ী দেখলেন, চোখ দেখলেন, স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে কি কথা হোল তাঁর, স্বামীটির সঙ্গেও কি যেন বললেন, তারপর তাঁরা চলে গেলেন।

মৃত্যুই তা হোলে ঠিক!...

কৌতূহলী জনতা আরও খানিকক্ষণ তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল—মৃতা পল্লী-বধূ তার শোকস্তব্ধ স্বামী, অবোধ ক্ষুদ্র পুত্র ও তাদের ঘর-গৃহস্থালীর সাধের দ্রব্যাদি—তারপর একে একে যে যার কাজে চলে গেল—আরও নতুন দল এল—তারাও খানিকটা থেকে নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি কর্তে কর্তে ফিরে গেল। এবার এল রেলওয়ে পুলিসের লোক তারা খানিকক্ষণ ধরে ভদ্রলোকটিকে কি সব প্রশ্ন করলে, নোটবুকে কি টুকে নিলে—তারপর তারাও চলে গেল—কেবল একজন কনস্টেবল একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল।

এ সবে কাটল প্রায় এক ঘণ্টা। তখন সন্ধ্যে প্রায় হয়-হয়। স্টেশনের আলো জ্বালিয়েচে, আপ্ ডাউন দুদিকের সিগন্যালে লাল সবুজ বাতির সারি জ্বলচে : কিন্তু তখনও অন্ধকার হয়নি, সিগন্যালের পাখা তখনও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, আপ্ লাইনের হোম স্টার্টার নামানো—বোধ হয় কোনো ট্রেন আসচে।

যা হবার তা তো হয়ে গিয়েচে, এখন সৎকারের ব্যবস্থা! এ ধরনের প্রশ্ন কেউ ভদ্রলোকটিকেও কর্লে না—তিনিও কাউকে কর্লেন না। এদিকে ভিড় ক্রমেই পাতলা হয়ে এল—অনেকেই আপ ট্রেনের যাত্রী—কল্কাতার দিকে দুখানা সিগন্যাল নামানো দেখে তারা ওভারব্রিজ দিয়ে উঠি-পড়ি অবস্থায় ছুটলো আপ্ প্ল্যাটফর্মের দিকে এটা যে গুডু ট্রেন আসচে, তা ভেবে তখন কে দেখে? ভিড়ের মধ্যে বেশির ভাগ ছিল হিন্দুস্থানী কুলীখালাসীর দল, তারা খৈনি টিপ্তে টিপ্তে নিজেদের কাজে চলে গেল।

আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলুম—ভদ্রলোক আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। কাছে যেতেই আকুল ভাবে বল্লেন—মশাই আপনি তো দেখচেন, একটা ব্যবস্থা করুন দয়া করে। এখন কি করি আমার মাথামুণ্ডু, এই অচেনা দেশ, তাতে শীতের রাত। আমরা ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের দেহ শেষে কি অন্য জাতে ছোঁবে?... এই একটা বাচ্চা এরই বা

উপায় কি করি?

মুখে অবিশ্যি তাকে সাহস দিলুম। কিন্তু তারপর আধ ঘণ্টা এদিক ওদিক ঘুরেও সৎকারের কোনো ব্যবস্থাই আমায় দিয়ে হয়ে উঠলো না। না আমাকে এখানে কেউ চেনে, না আমি কাউকে চিনি—অধিকাংশ লোকই তারা যাত্রী, এই ট্রেনেই তাদের অমুক জায়গায় যেতে হবে। কেউ কথা শোনে না। আকস্মিক ব্যাপারের উত্তেজনাটুকু কেটে যাবার পরে সবাই বুঝেচে বেশী ঘনিষ্ঠতা কর্তে গেলে এই শীতের রাত্রে দুর্ভোগ আছে কপালে—কাজেই সবাই আমায় এড়িয়ে চলতে চায়। অবশেষে একজন টিকিট কলেক্টরকে কথাটা বল্লুম। অনেক সাধ্য-সাধনার পরে তাঁকে রাজীও করানো গেল। তিনি বল্লেন, কিন্তু শুধু আমি আর আপনি এতে তো হবে না? আপনি দাঁড়ান—আমি দেখে আসি।

একটু পরে একজন অতি কদর্য চেহারার ময়লা কাপড় পরা লোককে সঙ্গে করে তিনি ফিরে এলেন! আমায় বললেন—শুনুন মশাই, লোক যেতে চায় না কেউ শীতের রাতে। এই লোকটি ভাল বামুন, আমাদের ইস্টিশানে পাঁউরুটির ভেণ্ডার, রাজী হয়েচে, এ আরও দুজন লোক আনতে রাজী আছে। কিন্তু—

টিকিট বাবু সুর নীচু করে বললেন—জানেন তো ছোট লোক—ওদের কিছু খাওয়াতে হবে, নৈলে রাজী হবে না। একটু ইয়ে—মানে—বুঝলেন তো? ওরা নেশাখোর লোক লেখাপড়া জানে না—সবই বুঝতে পারচেন। তার একটা ব্যবস্থা কর্তে হয়—

আমি বললুম—সে কি রকম খরচ পড়বে না পড়বে আমায় বলুন, আমি গিয়ে বল্‌চি। ঘাট খরচের হিসেবটাও ধরবেন—। টিকিট বাবু টাকা-পনেরোর এক ফর্দ দাখিল করলেন। আমি ফিরে গিয়ে বল্‌তেই ভদ্রলোক মণিব্যাগ খুলে দুখানা দশ টাকার নোট আমার হাতে দিয়ে বললেন—এই নিন্—যা ব্যবস্থা করবার করুন, আমায় এ দায় থেকে উদ্ধার করুন, বাঁচান আপনি—কথা শেষ না করেই অমার হাত দুটো জড়িয়ে ধর্তে এলেন—আর আমার এই খোকার একটা কিছু—ওকে তো এই ঠাণ্ডায় সেখানে নিয়ে যেতে পারি নে, তা হলে ও কি বাঁচবে?...

আমি ফিরে এসে খোকার কথা তুলতেই তিনি বললেন—আমার তো ফ্যামিলি এখানে নেই, তা হোলে আর কি কথা ছিল? আচ্ছা দাঁড়ান, দেখি ছোট বাবুর বাসায়—

ছোট বাবুর বাসায় খোকার ব্যবস্থা হয়ে গেল। ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে বললুম দিন ওকে আমার কাছে। ছোট বাবুর বাসায় তাঁরা রাখবেন বলেচেন।

ভদ্রলোক বললেন—যাও খোকন বাবা, বাবুর কাছে যাও। তোমার মাসীমার বাড়ি নিয়ে যাবেন, যাও বাবা—

তাঁর চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগলো। আমায় বললেন—অনেকক্ষণ কিছু খায় নি, রাণাঘাটে ওর মা গজা কিনে দিয়েছিল—একটু গরম দুধ যদি—

খোকা বেশ সপ্রতিভ। বেশ শান্ত ভাবেই আমার কাছে এল, হাসি হাসি মুখে। তাকে কোলে নিয়ে মনে হোল খোকার যত বয়স ভেবেছিলুম তার চেয়ে ছোট—এখনও তেমন কথা বলতে পারে না। ছোট বাবুর বাসার ঝি তাকে কোলে করে বাড়ির ভিতর নিয়ে গেল। ওকে কোলে তুলে নিয়ে কাঁদো কাঁদো সুরে বললে—আহা, এ যে একেবারে দুধের বাছা! এস এস সোণামণি, আহা,! মাণিক আমার—

খোকা ব্যাপারটা কিছুতেই বুঝতে পারে নি, বরং এত লোক তাকে কোলে নিয়ে নাচানাচি করাতে সে খুব খুশী।

একটু পরে আমরা কজনে মৃতদেহ বহন করে শ্মশানের দিকে রওনা হলুম। আমি, পাঁউরুটির ভেণ্ডার, টিকিট বাবু ও পাঁউরুটির ভেণ্ডারের একজন বন্ধু। টিকিট বাবুর এক ভাইপো আমাদের সম্মিলিত গরম কোট ও আলোয়ানের পুঁটুলি হাতে ঝুলিয়ে

পিছনে পিছনে আসছিল। সকলের পিছনে ভদ্রলোকটি ; তাঁকে আমরা অবশ্য শব বহন কর্তে দিই নি। ভদ্রলোকের জিনিসপত্র মৃতদেহের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়েচে, কারুর বাসায় জায়গা দেবে না সেগুলির স্টেশনের ক্লোকরুমে জমা দেওয়া হোল। নৈহাটির বাজার যেখানে প্রায় শেষ হয়েচে, সেখানটায় এসে ভদ্রলোক বললেন—একটা ভুল হয়ে গিয়েছে. দাঁড়ান আমি সিঁদুর কিনে আনি ওর কপালে দিয়ে দিতে হবে।

শ্মশানঘাট নৈহাটী স্টেশন থেকে প্রায় তিন পোয়া পথ দূরে। বাজার ছাড়িয়ে দক্ষিণে মাঠের মাঝখান দিয়ে পথ, সুমুখ জ্যোৎস্নারাত, সন্ধ্যার পরে মেঘশূন্য আকাশে ফুটফুটে চাঁদের আলো ফুটেচে, কন্‌কনে হাড়কাঁপানো শীত, মাঝে মাঝে পৌষ রাত্রির ঠাণ্ডা হাওয়া বাধাশূন্য প্রান্তরে আমাদের শিরার উপশিরার রক্ত জমিয়ে দিচ্চে, তার ওপরে মুশকিল—আমন ধানের জমির ওপর দিয়ে পথ—ধান কাটা হয়ে গিয়েচে, শীতের ঘায়ে ধানের গোড়াগুলো পায়ে যেন কুশাঙ্কুরের মত বিঁধছিল।

হঠাৎ পিছন থেকে ভদ্রলোক মেয়েমানুষের মত আকুল সুরে কেঁদে উঠলেন। আমরা অবাক হয়ে ফিরে চাইলুম। টিকিটবাবু বললেন—ওকি মশাই ও কি, অত ইয়ে হোলে চলবে কেন—ছিঃ—আসুন এগিয়ে আসুন।

পুরুষমানুষকে অমন অসহায় ভাবে কখনো কাঁদতে শুনি নি, তখন বয়েস ছিল অল্প, লোকটির কান্না শুনে যেন আমার চোখও অশ্রুসজল হয়ে উঠল। তারপর তিনি চুপ করলেন, আমরা সবাই আবার চুপচাপ চলতে লাগলুম।

শ্মশানে যখন পৌঁছানো গেল, রাত তখন সাড়ে সাতটা হবে। মৃতদেহ চিতায় উঠানো হোল। সেই সময় সর্বপ্রথম লক্ষ্য করলুম বধূটির দুপায়ে আলতা—কোথাও বেরুতে হোলে গ্রামের মেয়েরা আল্‌তা পরে থাকে জানতাম, মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল, মেয়েটি কি ভেবেছিল আজ কোন্ যাত্রার জন্যে তাকে দুপুরে আলতা পরতে হয়েছিল? কপালে খানিকটা সিঁদুর—ভদ্রলোকটি নিজেই দিয়েছিলেন—বধূটিকে সর্বপ্রথম এই ভাল করে দেখে মনে হোল সত্যিই সুন্দরী। টানা টানা জোড়া ভুরু, পাণ্ডুর বর্ণের গৌর মুখ, অনিন্দ্য দেহকান্তি। মৃত্যুতেও যেন ম্লান হয় নি, মুখের চেহারা দেখে মনে হয় যেন ঘুমিয়ে পড়েচে। মনে হচ্ছে গোলমালে এখুনি ঘুম ভেঙে উঠে পড়বে বুঝি।

জ্বলন্ত চিতার একটু দূরে সেই পাঁউরুটি ভেণ্ডার ও তার বন্ধু। পাঁউরুটি ভেণ্ডার আমার দিকে চেয়ে দাঁত বার করে হেসে বললে—যাক্, আজ শীতের রাতটা কাট্‌বে ভালো—কি বলুন? লালু চক্কোত্তির পরোটার দোকানে ভাজতে দিয়ে এসেছি। আমাদের শশী আচার্যিকে বসিয়ে রেখে এসেচি, রাত বারোটার মধ্যে এখানকার কাজ শেষ হয়ে যাবে—গরম গরম বেশ—

তার বন্ধু বলে—মাংস কতটা? কুলুবে তো?

—বাঃ, জোনাজাৎ দেড়পোয়া হিসেব করে দিয়ে এসেচি—মোট তিন সের—কজন আছি আমরা, তুমি, আমি, যতীনবাবু, যতীনবাবুর ভাইপো লালু, শশী আচার্যি (আমার দিকে আঙ্গুল দিয়ে) এই বাবু—

আমি বললুম—আমি খাবো না।

দুজনেই আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে চাইলে। আমার কথা যেন বুঝতেই পার্লে না কিংবা বুঝে বিশ্বাস কর্তে পার্লে না। পাঁউরুটি ভেণ্ডার বলে—খাবেন না কিছু? সে কি মশাই! এই হাড় কন্‌কনে পোষ মাসের রাত, খাবেন না তো এলেন কেন?...পাগল!...তার বন্ধু বললে—খাবেন না কেন? ভাল জিনিস মশাই. আমরা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কিনিয়েচি—খাসা চর্বিওয়ালা খাসি। লালু চক্কোত্তি নিজে রাঁধবে. অমন মাংস-রাঁধিয়ে গঙ্গার এপারে পাবেন না। ওই যে দেখচেন নৈহাটির বাজারের চটের দোকানখানা—শুধু

ওর রান্নার গুণে আজ পনেরো বছর এক ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে—দেখবেন খেয়ে—

এই সময় টিকিট বাবুর ইশারায় দুজনেই অন্যদিকে একটু দূরে কি জন্য উঠে গেল এবং একটু পরেই আবার নিজেদের জায়গাটিতে মুখ মুছতে মুছতে এসে বসল। আমায় বললে—আপনার চলে না বুঝি?

আমি বললুম—কি?

—একটু আধটু...এই শীতের রাতে, নৈলে চলে কি করে বলুন...বেশ ভাল মাল—। কেন এদের টিকিট বাবু ডেকেচে ওদিকে, তখন ব্যাপারটা বুঝলুম। ও আমার চলে না শুনে তারা আরও আশ্চর্য হয়ে গেল। এই শীতের রাতে শ্মশানে আসবার স্বার্থটা যে আমার কি, এ তারা ভেবেই পেলে না। আমার দিকে আর কোনো মনোযোগ না দিয়ে তারা নিজেদের বিষয় কথাবার্তা বলতে লাগলো। নৈহাটি স্টেশনে পাঁউরুটির ব্যবসা করে আর কেউ কিছু কর্তে পারবে না। রেল কোম্পানীর লাইসেন্সের দাম ক্রমেই বাড়চে, তার ওপরে শিখেরা এসে চায়ের স্টল খুলে ওদের অর্ধেক ব্যবসা মাটি করেচে। খরচা ওঠাই দায়! দেশে সুবিধে নেই তাই ওরা পেটভাতায় এখানে পড়ে আছে। নইলে কাঁথিতে ওদের অমন চমৎকার দোকান ছিল—

পাঁউরুটি ভেণ্ডারটির নাম বিনোদ বাঁড়ুয্যে। সে আর একবার উঠে গেল ওদিকে। আমি ওর বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলুম—খাবার-টাবার কত খরচ হোল?

—তা প্রায় টাকা সাতেক ধরুন। কিছু মিষ্টিও আছে। তা ছাড়া দু-একটা—আপনার তো দেখচি ওসব চলে না।

বিনোদ ফিরে এসে নিজেদের মধ্যে আবার গল্প শুরু করলে। হঠাৎ আমার মনে পড়ল আমার গরম কোটের পকেটে বিস্কুট আছে, নৈহাটির প্ল্যাটফর্মে কিনেছিলুম সেই, কিন্তু খাওয়া হয় নি। টিকিট বাবুর ভাইপোকে ডেকে বললুম—আমার কোটের পকেটে বিস্কুট আছে, দয়া করে আমার মুখে খানকতক ফেলে দিন না—আমি এই হাত আর ওতে দেবো না—

আমায় ওভাবে বিস্কুট খেতে দেখে টিকিটবাবু অবাক হোলেন। আমি শব ছুঁয়ে স্নান না করেই বিস্কুট খাচ্ছি! আমায় বললেন—আপনার খুব খিদে পেয়েচে দেখচি—তা চলুন, নৈহাটিতে ফিরে খুব খাওয়াবো—

আমি বললুম—আমি খাবো না কিছু। তাছাড়া, আমি স্টেশনের দিকেও যাবো না—এখান থেকে ভাটপাড়া চলে যাবো।

—খাবেন না আপনি, সে কি মশাই? না না তা কি হয়? অতটা মাংস...ওহে বিনোদ, কাঠ দাও ঠেলে—বসে গল্প-গুজব করবার জন্যে তোমাদের আনা হয় নি—

টিকিট বাবু আমার দিকে চেয়ে আবার কি বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু আমি তাঁকে সে সুযোগ না দিয়েই নিজের জায়গাটিতে গিয়ে বসলুম।

বিনোদ বাঁড়ুয্যে চিতায় কাঠ ঠেলে দিয়ে ফিরে এসেছে। দুই বন্ধুর মুখের বিরাম নেই। এবার তারা কার বিয়ের কথা আলোচনা করচে—বোধ হোল বিনোদ বাঁড়ুয্যের ভাইয়ের। বিনোদ এক পয়সা সাহায্য কর্তে পারবে না। ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে বিনোদের বৌ ওর কাছে টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিল সে দুটো টাকা বাড়িতে মনিঅর্ডার করে দ্যায়।

—সোজা লিখে দিলাম দু'টাকার বেশী হবে না—এতে ভাইদুতীয়েই করো—

বিনোদের বন্ধুটি বল্লে—আর বোন্‌দুতীয়েই করো—হি-হি—কি বলো?

বিনোদ দু'পাটি দাঁত বার ক'রে হেসে বল্লে—হ্যা, হ্যা—তাই বলি. বিয়ে কল্লেই হয় না। তুলো দেখতে নরম, ধুনতে লবেজান—বিয়ে করে এই বাজারে সংসারটি চালানো—সে বড় ঠ্যালা।...

রাত অনেক বেশী—বোধ হয় এগারোটা। হালিশহর জুট মিলের আলোর সারি নিবে গিয়েচে। প্রকাণ্ড একটা অশরীরী পাখী যেন জ্যোতির্ময় পাখা মেলে গঙ্গার ওপর উড়ে বেড়াচ্ছে, এক একবার সেটা যেন জলের কাছাকাছি আসচে, স্নিগ্ধ জ্যোতির বিশাল প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেছে গঙ্গার বুকে—আবার যখন দূরে চলে যাচ্ছে, তখন অল্প সময়ের জন্যে সে জায়গাটা অন্ধকার...আবার আলো ফুটে উঠল, আবার অন্ধকার।

এতক্ষণ ভদ্রলোকটি চিতার শিয়রের একটু দূরে চুপ করে বসে ছিলেন। হঠাৎ তিনি আমার পাশে উঠে এলেন। বল্লেন—খোকা বোধ হয় এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েচে—কি বলেন?

—হ্যাঁ, এতক্ষণ নিশ্চয়ই।

খানিকটা চুপ করে থেকে বল্লেন—কাল সকালে নৈহাটিতে দুধ পাওয়া যাবে না মশাই?

—অভাব কি? সেজন্য ভাববেন না। সে যোগাড় হয়ে যাবে।

একটু চুপ করে থেকে আমি জিজ্ঞেস করলুম—আপনারা কোথায় যেতেন? পশ্চিমে কোথাও বুঝি?

ভদ্রলোক বল্লেন—পশ্চিমে বেশী দূর নয়—আমি যাচ্ছিলাম আসানসোল। সেখানে চাক্‌রি করি। অনেক দিন চাক্‌রি খুঁজে বেড়িয়ে বেড়িয়ে শেষে ওইটি জুটিয়েছিলাম। তা চাক্‌রিও করচি আজ এক বছর। এতদিন রেলবাবুদের মেসে খেতাম, আশ্বিন মাসে মেসে খেয়ে খেয়ে ডিসপেপসিয়া গোছের দাঁড়ালো। এত ঝাল দ্যায় মশাই, অত ঝাল খাওয়া আমার অভ্যাস নেই। আমার স্ত্রী বল্লে—যা পাও, একটা বাসা করো, আমাদের দুজনের খুব চলে যাবে। তোমারও কষ্ট থাকবে না, আমারও এখানে তোমায় বিদেশে ফেলে থাক্‌তে ভাল লাগে না। তাই এবার বাসা করে বড়দিনের ছুটিতে একে আন্‌তে যাই শ্বশুরবাড়িতে—সেখানেই বিয়ের পর আজ চার পাঁচ বছর রেখেছিলাম। দেশে আমার বাড়ি-ঘর সবই আছে, কিন্তু সেখানে মশাই শরিকী গোলমাল। সেখানে ওকে রাখার অনেক অসুবিধে—বার-দুই নিয়ে গিয়েছিলাম, তাতেই জানি।

আমি বল্লুম—ওঁর কি কোনো অসুখ ছিল—হঠাৎ এমন—

—অসুখের কথা তো কিছুই জানি নে। তবে মাঝে মাঝে বুক ধড়ফড় করতো বল্‌তে শুনেচি।...অসুখটা আমার বাড়িতে যখন আনি আর-বছর, তখন বড় বেড়েছিল। আমার সে সময় নেই চাকরি, হাতে নেই পয়সা, আর এদিকে বাড়িতে আমার জাঠ্‌তুতো ভাইয়ের স্ত্রী—তার যৎপরোনাস্তি দুর্ব্যবহার। এই সবে সংসারে শান্তি ছিল না একদণ্ড।...ও আবার ছিল একটু ভালমানুষ মতো—ওর ওপরই যত ঝক্কি।

খানিকটা আপন মনেই যেন বল্‌তে লাগলেন—কালও বিকেলে কত কথা বলেচে! বাসার কথা আমায় কত জিজ্ঞেস্ করলে। বল্‌ছিল, সেখানে পাতকুয়ো না পুকুর? আমি বল্লাম—দুই-ই আছে। তবে পুকুরে রেলের কুলী চাপরাসীরা নায় আর কাপড় কাচে—তার চেয়ে তুমি বাসার পাতকুয়ার জলেই নেও। খাবার জন্যে রেলের বাবুদের কোয়ার্টারে টিউব-ওয়েল আছে—নিকটেই—সেখান থেকে জল আনাবো। বাসায় পেঁপে গাছ আছে শুনে কত খুশি! বল্লে, হ্যাঁ গা, ওদেশের পেঁপে নাকি খুব বড় বড়? কাল দুপুরের পর থেকে বাক্স গুছিয়েচে...মানকচু সঙ্গে নিয়ে যাবে বলে বিকেলে বেছে বড় মানকচুটা ওর ভাইকে দিয়ে তোললে। রাত্রে ঘুমোয় না—কেবল বাসার গল্প করে, এ করবো...ও করবো...আমায় বল্লে—পেতলের ডেক্‌চিতে খেয়ে খেয়ে তোমার অসুখ হয়েছে তারা তো আর তেমন মাজে না?...অসুখের আর দোষ কি? সেখানে মাটির হাঁড়ি-কুঁড়ি পাওয়া যাবে তো?...রাত অনেক হয়েছে দেখে আমি বল্লাম—শোও ঘুমোও, কাল আবার সারা-দিন গাড়ির কষ্ট হবে...রাত দুপুর হোল...ঘুমিয়ে পড়...কোথায় চলে গেল আজ—আর আমায় রেঁধে খাওয়াতে আসবে না।...

হঠাৎ একটা গোলমাল ও বচসার আওয়াজ ভদ্রলোক ও আমি দুজনেই ফিরে চাইলুম। বিনোদ বাঁড়ুয্যে ও তার বন্ধু টিকিট বাবুর সঙ্গে কি নিয়ে ঝগড়া বাধিয়েছে এবং আমার মনে হোল তারা এমন সব কথা বল্‌চে যা হয়তো তারা স্বাভাবিক অবস্থায় বল্‌ত সাহস কর্তো না টিকিট বাবুকে। বিনোদ বাঁড়ুয্যে বল্‌চে, যান্ যান্ মশাই অনেক দেখেচি ওরকম—আমরা গড়বাড়ির বাঁড়ুয্যে—সুতোহাটা পরগণার মধ্যে যেখানে যাবেন ওদিকে তমলুক এস্তেক—আমাদের এক ডাকে চেনে—ছোট নজর যেখানে দেখি সেখানে আমরা থাকি নে। এই শীতের রাতে কে আসতো মশাই? আমাদের আগে খোলসা করে আপনার বলা উচিত ছিল তা হোলে দেখতাম নৈহাটীর বাজার থেকে কোন্ ব্যাটা পৈতেওলা বামুন আজ মড়া নিয়ে আস্‌তো…মুর্দফরাস দিয়ে না যদি…

ব্যাপার কি উঠে দেখতে গেলুম। বিনোদ বাঁড়ুয্যে আমায় দেখে বললে, এই তো এই ভদ্দর লোক রয়েছেন—আচ্ছা বলুন তো আপনি? আমরা সকলের আগে বলে দিয়েচি আমাদের এই চাই, এই চাই…এখন আসলে হাত গুটোলে চলবে কেন?…আপনিই বলুন তো? হ্যাঁ, মানুষ বলি এই বাবুকে…কোনো লোভ নেই, উনি খাবেন না, কিছু করবেন না—উনি এসেচেন মড়া নিয়ে এই শীতে। উনি বল্‌তে পারেন—ওঁর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিতে হয়—

ঝোঁকের মাথায় বিনোদ বাঁড়ুয্যে সত্যিই আমার পায়ে হাত দেবার জন্যে ছুটে এল। আমি সেখান থেকে সরে পড়লুম—এদের অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ভাগ-বাঁটোয়ারা সংক্রান্ত কথার মধ্যে আমার থাক্‌বার দরকার কিসের?

মনে কেমন একটা দুঃখ হোল। এই অভাগিনী পল্লীবধূর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপযুক্ত সম্মান এখানে রক্ষিত হোল না। মনে হোল ও এখানে কেন? এই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত গঙ্গার উদ্দাম তরঙ্গভঙ্গ, এই হিমবর্ষী নক্ষত্র বিরল আকাশ, এই অমঙ্গলময়ী মহানিশার মৃত্যু অভিযান—জীবনের নানা ছোটখাটো সাধ যাদের মেটে নি, এ রুদ্র আহ্বান তাদের বেলা আর কিছুদিন স্থগিত রাখলে বিশ্বকর্মার কাজের কি ক্ষতিটা হোত?…ছোট্ট একটি গৃহস্থ বাড়ির দাওয়ায় মেয়েটি খোকাকে কোলে নিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছে, সবে সে নদীর ঘাট থেকে গা ধুয়ে এসেচে, পায়ে আল্‌তা, কপালে টিপ, খোঁপাটি বাঁধা—ওকে মানায় জীবনের সেই শান্ত পটভূমিতে—শ্মশানে মাতালের হুড়োহুড়ির মধ্যে ওকে এনে ফেলা যেমনি নিষ্ঠুর তেমনি অশ্লীল?

রাত দুপুর।…

বিনোদ বাঁড়ুয্যে হঠাৎ কি মনে করে আমার পাশে এসে বস্‌লো। সে আমার প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমান হয়ে উঠেচে…আমি কি করি, কোথায় থাকি, বাড়িতে কে কে আছে, —এই সব নানা প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুললে।

—আপনি মশাই এর মধ্যে মানুষ। মানুষ চিনি মশাই, আজ না হয় দেখ্‌চেন ইস্টিশানে পাঁউরুটি ফিরি করি…আমরা গড়বাড়ির বাঁড়ুয্যে…যান্ যদি কখনো ওদিক, পায়ের ধুলো ঝেড়ে দিলেই বুঝতে পারবেন—সুতোহাটা পরগণার মধ্যে—

সব শেষ হতে রাত একটা বাজ্‌লো। চাঁদ ঢলে পড়েচে।

চিতা ধুতে গিয়ে ভদ্রলোক আবার হাউ হাউ করে কেঁদে উঠ্‌লেন—আমরা অনেক সান্ত্বনা দিয়ে তাঁকে থামালুম। আমি ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা পিসিমার বাড়ি চলে আস্‌বো—ওরা কিছুতেই ছাড়ে না। টিকিট বাবু বল্লেন—আসুন আসুন অতটা মাংস খাবে কে? সব গরম গরম পাবেন—আমার বলে দেওয়া আছে—রাত বারোটার পর তবে ময়দায় জল দেবে। গিয়েই গরম গরম…চলুন মশাই…

অতি কষ্টে ওদের হাত এড়িয়ে পিসিমার বাড়ি ফিরলুম। কিন্তু সকালে উঠেই খোকাকে দেখ্‌বার ইচ্ছে হোল। সাড়ে সাতটার ট্রেনে নৈহাটি গিয়ে ছোটবাবুর বাসায় হাজির। খোকা নাকি অনেকক্ষণ উঠেচে। ভোরবেলা থেকে মায়ের কাছে যাবার জন্যে কাঁদ্‌ছিল, বাসার মেয়েরা অনেক কৌশলে থামিয়ে রেখেচেন।

ভদ্রলোকটিও এলেন। তিনি টিকিটবাবুর বাসায় রাত্রে শুয়েছিলেন—দেখে মনে হোল রাতে বেশ ঘুমিয়েছেন। খোকা এখন আর কাঁদচে না। বাসার মেয়েরা কমলালেবু দিয়েচে হাতে, তাই খেতে খেতে ঝিয়ের কোলে বাইরে এল। ঝি বল্লে—কাল ছোটবাবুর বৌ নিজের কোলের কাছে ওকে নিয়ে শুয়েছিলেন। জেগে উঠ্‌লেই মুখে মাই দিয়েচেন, রাতে ঘুমের ঘোরে ও ভেবেচে ওর মা। কিন্তু ভোরে উঠেই সে কি কান্নাটা! কেবল বলে 'মা যাবো' 'মা যাবো'—আহা বাছা আমার, মানিক আমার…

একটু পরে আমি ভদ্রলোককে ট্রেনে তুলে দিতে গেলুম, খোকাকে কোলে নিয়ে। তিনি এই ট্রেনে মুর্শিদাবাদে, শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাবেন। আমায় বল্লেন—কি ক'রে সেখানে ঢুক্‌বো মশাই, ভেবে আমার হাত পা আসচে না। তবে যেতেই হবে, খোকাকে ওর দিদিমার কাছে দিয়ে আস্‌বো—নইলে কে দেখবে আর ওকে?

তারপর পাগলের মত হাসি হেসে বল্লেন—যাত্রাটা বদলে আসি মশাই। কি বলেন?… হ্যা হ্যা—

আমি বল্লুম—টিকিটবাবু কাল আপনাকে কিছু ফেরত দিয়েছেন?

—না, আমিও চাই নি। তবে আজ সকালে একটা ফর্দ দেখাচ্ছিলেন, বল্লেন সব খরচ হয়ে গেছে। সে ফর্দ আমি দেখিও নি—যা উপকার করেছেন আপনারা, তার শোধ কি কখনো দিতে পারবো?…

ট্রেন ছেড়ে চলে গেলো।…

প্ল্যাট্‌ফর্মে বিনোদ বাঁড়ুয্যের সঙ্গে দেখা। আমায় একপাশে ডেকে মুখ ভার করে বল্লেন—শুনেচেন টিকিটবাবুর আক্কেলটা? সাড়ে সাত টাকা হাতে ছিল কালকের দরুন। কাল রাতে খাওয়া দাওয়ার পরে বল্লাম—ভাগ করো। তা আমাদের দিলে এক টাকা করে—দু'জনকে দু'টাকা। নিজে নিলে সাড়ে পাঁচ টাকা। বলে ওদের দু'জনের ভাগ, ও আর ওর ভাইপো। আচ্ছা, ভাইপো কি করেচে মশাই? কাপড়ের পুঁট্‌লিটা হাতে ঝুলিয়ে গিয়েচে বৈ তো নয়?…আর আমাদের অত ছোট নজর নেই…হাজার হোক্‌, কুলীন বামুনের ছেলে মশাই…না হয় পেটের দায়ে আজ পাঁউরুটি ফিরিই করি…

যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ

আপনারা একালে যদু হাজরার নাম বোধ হয় অনেকেই শোনেন নি।

আমাদের বাল্যকালে কিন্তু যদু হাজরাকে কে না জানত? চব্বিশ-পরগণা থেকে মুরশিদাবাদ এবং ওদিকে বর্ধমান থেকে খুলনার মধ্যে যেখানেই বাজারে বা গঞ্জে বড় বারোয়ারীর আসরে যাত্রা হ'ত সে সব স্থানে দশ বার ক্রোশ পর্যন্ত যদু হাজরার নাম লোকের মুখে মুখে বেড়াত। কাঠের পুতুল চোখ মেলে চাইত—যদু হাজরার নাম শুনলে। আপনারা কেউ কি যদু হাজরাকে 'নল দময়ন্তী' পালাতে নলে-র পার্ট করতে দেখেন নি? তা হলে জীবনের বহু ভালো জিনিসের মধ্যে একটা সেরা ভালো জিনিস হারিয়েছেন।

আমি দেখেছি।

সে একটা অদ্ভুত দিন আমার বাল্য জীবনে। তখন আমার বয়স হবে বার কি তের। আমাদের গ্রামের একটি নববিবাহিতা বধূর বাপের বাড়ীতে কি একটা কাজ উপলক্ষে

নব বধূটিকে নৌকো করে তার বাড়ীতে আমাকেই রেখে আসতে হবে ঠিক ছিল।

পৌষ মাস। খুব শীত পড়েছে! বধূটি গ্রাম-সম্পর্কে আমার গুরুজন, আমার চেয়ে তিন চার বছরের বড়ও বটে। দুজনে গল্পগুজবে সারাপথ কাটালুম। তাঁর বাপের বাড়ী পেঁছে আমি কিন্তু পড়লুম একটু মুশকিলে। মস্ত বড় বাড়ী ; উৎসব উপলক্ষে অনেক জায়গা থেকে আত্মীয়-কুটুম্বের দল এসেছে, তার মধ্যে দুটি শহর অঞ্চলের চালাক-চতুর জ্যাঠা ছেলে আমার বড় অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠল। আরও এত ছেলে থাকতে তারা আমাকেই অপ্রতিভ কোরে কেন যে এত আমোদ পেতে লাগল, তা আমি আজও ঠিক বুঝতে পারি না।

একটি ছেলের বয়স বছর পনের হবে। রং ফর্সা, ছিপছিপে সিল্কের পাঞ্জাবি গায়ে—নাম ছিল যতীন, নামটা এখনও মনে আছে—সে আমাকে বললে—কি পড়?

আমি বললাম—মাইনর সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি।

সে বললে—বল ত হাঁচি মাইনাস কাসি কত?

প্রশ্ন শুনে আমি অবাক্।

বাঙলা স্কুলে পড়ি, "মাইনাস" কথার মানে তখন জানিনে। তা ছাড়া এ কি অদ্ভুত প্রশ্ন! আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে অমনি আবার জিজ্ঞাসা করল—"হবগবলিন" মানে কি!

আমি ইংরাজী পড়ি বটে কিন্তু সে সুশীল আর সুবোধ আবদুলের গল্প, দারোয়ান ও জেলের গল্প, বড় জোর গুটিপোকা ও রেশমের কথা। সে সবের মধ্যে ঐ অদ্ভুত কথাটা নেই। লজ্জায় লাল হয়ে বললুম—পারব না।

কিন্তু আমার রেহাই নেই। ভগবান সেদিন লোক-সমাজে আমাকে নিতান্ত হেয় প্রমাণিত করতেই বোধ হয় যতীনকে ওদের বাড়ীতে হাজির করেছিলেন। সে দু'হাতের আঙুলগুলো প্রসারিত ক'রে আমার সামনে দেখিয়ে বললে—এতগুলো কলা যদি এক পয়সা হয়—তবে পাঁচটি কলার দাম কত?

আমি বিষণ্ণ মুখে ভাবছি, দু'হাতের মধ্যে কতকগুলো কলা ধরতে পারে—সে খিলখিল করে হেসে উঠে বিজ্ঞের ভঙ্গীতে ঘাড় নেড়ে আমার মাইনর স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাসে অর্জিত বিদ্যার অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রতিপন্ন করলে।

তারপর থেকে আমি তাকে ভয়ে-ভয়ে এড়িয়ে চলতে লাগলুম। বয়স তার আমার চেয়ে বেশিও বটে, শহর অঞ্চলে ইংরাজী স্কুলে পড়েও বটে, দরকার কি ওর সঙ্গে মিশে? তা ছাড়া চৌমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে আমি আর কত অপমানই বা সহ্য করি!

কিন্তু সে আমায় যতই জ্বালাতন করুক, জীবনে আমার একটা বড় উপকার করেছিল—সে জন্য আমি তার কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ! সে যদু হাজরার অভিনয় আমাকে দেখিয়েছিল।

সন্ধ্যার কিছু আগে সে আমায় বললে—এই, কি তোমার নাম, রাজগঞ্জের বাজারে বারোয়ারী হবে, শুনতে যাবে?

রাজগঞ্জ ওখান থেকে প্রায় আড়াই ক্রোশ পথ। হে'টেই যেতে হবে. কিন্তু যাত্রা শুনবার নামে আমি এত উত্তেজিত হয়ে উঠলাম যে, এই দীর্ঘ পথ এর সাহচর্যে অতিক্রম করবার যন্ত্রণার দিকটা একেবারেই মনে পড়ল না।

তথাপি সারা পথ যতীন ও তার দলের তারই-বয়সী জন-কয়েক ছোকরা অশ্লীল কথাবার্তা ও গানে আমাকে নিতান্ত উত্যক্ত করে তুললে। আমি যে বাড়ির আবহাওয়ায় মানুষ,—আমার বাবা. মা, জ্যাঠামশায় সকলেই নিতান্ত বৈষ্ণব প্রকৃতির। প্রায় আমারই বয়সী ছেলের মুখে ওরকম টপ্পা খেউড় শুনে আমার অনভিজ্ঞ বালক-মনের নীতি-

বোধ ক্রমাগত ব্যথা পেতে লাগল।

ওরা কিন্তু আমায় রাজগঞ্জের বাজারে পৌঁছে একেবারে রেহাই দিলে। সেই অপরিচিত জন-সমুদ্রে আমায় একা ফেলে ওরা যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল—আমি কোন সন্ধানই করতে পারলুম না।

যাত্রা বোধ হয় রাত্রে, তখন সবে সন্ধ্যা হয়েছে, বারোয়ারীর খুব বড় আসর, অনেক ঝাড়লণ্ঠন টাঙিয়েছে—বাঁশের জাফরীর গায়ে লাল-নীল কাগজের মালা ও ফুল, আসরের চারিধারে রেলিং দিয়ে ঘেরা, রেলিং-এর মধ্যে বোধ হয় ভদ্রলোকদের বসবার জায়গা—বাইরে বাজে লোকদের।

রাজগঞ্জের বাজারে আমি জীবনে আরও দু'একবার বাবার সঙ্গে এর আগে যে না এসেছি এমন নয়, কিন্তু এখানে না আমি কাউকে চিনি, না আমাকে কেউ চেনে। রেলিং-এর ভিতরে জায়গা আমার মত ছোট ছেলেকে কেউ দিলে না—আমিও সাহস করে তার মধ্যে ঢুকতে পারলুম না, বাইরে বাজে লোকদের ভিড়ের মধ্যে ঠেসাঠেসি করে ইট পেতে বসতে গেলুম—তাতেও নিস্তার নেই—বারোয়ারীর মুরুব্বী পক্ষের লোকেরা এসে আমাদের সে জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বিশিষ্ট লোকদের জন্যে বেঞ্চি আনিয়ে পাতিয়ে দেয়,—আবার যেখানে গিয়ে বসি, সেখানেও কিছুক্ষণ পরে সেই অবস্থা। অতি কষ্টে আসরের কোনের দিকে দাঁড়াবার মত জায়গা কোন মতে খুঁজে নিলুম। অন্যান্য বাজে লোকদের কি কষ্ট! তারা চাষাভূষো লোক, পাঁচ ছয় ক্রোশ দূর থেকে পর্যন্ত অনেকে মহা আগ্রহে যাত্রা শুনতে এসেছে—এই শীতে তারা কোথাও বসবার জায়গা পায় না, কেউ তাদের বসবার বন্দোবস্ত করে না—স্টেশন-মাস্টারবাবু, মালবাবু, কেরানীবাবু ও পোস্ট-মাস্টারবাবুদের যত্ন করে বসাতে সবাই মহা ব্যস্ত।

যাত্রা আরম্ভ হ'ল। নল-দময়ন্তীর পালা। একটু পরেই যদু হাজরা "নল" সেজে আসরে ঢুকতেই—তখন হাততালীর রেওয়াজ ছিল না—চারিদিকে হরিধ্বনি উঠল। অত বড় আসর মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্থির ও নীরব হয়ে গেল।

আমি যদু হাজরার নাম এর আগে কখনো শুনিনি, এই প্রথম শুনলুম। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলুম, শ্যামবর্ণ, সুপুরুষ—বয়স তখন বুঝবার ক্ষমতা হয়নি, ত্রিশও হ'তে পারে পঞ্চাশও হ'তে পারে। কিন্তু কি কথা বলবার ভঙ্গি, কি চোখ মুখের ভাব, কি হাত-পা নাড়ার ঢং। আমার এগারো বৎসরের জীবনে আর কখনো অমনটি দেখিনি। ভিড়ের কষ্ট ভুলে গেলুম, কিছু খেয়ে বেরুই নি, খিদেতে পেটের মধ্যে যেন বোল্তায় হুল ফোটাচ্ছে—সে কথা ভুললাম—যাত্রা থেমে গেলে এত রাত্রে একা অজানা স্থানে শীতে কোথায় যাবো—সে সব কথাও ভুলে গেলুম—পঞ্চদেবতা পঞ্চ-নলরূপে দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভায় এসে বসেছেন, আসল "নল"-রূপী যদু হাজরা বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে বলছেন—

এ কি হেরি চৌদিকে আমার—
মম সম রূপ নল চতুষ্টয়
মম সম সাজে সাজি বসিয়াছে
সভা মাঝে
বুঝিতে না পারি কিবা মায়াজাল
ইষ্টদেব,
পুরাও বাসনা মোর, মায়া জাল ফেল ছিন্ন করি।

এমন সময়ে বরমালা হস্তে দময়ন্তী সভায় প্রবেশ করতেই নল বলে উঠলেন—

দময়ন্তী, দময়ন্তী, মনে পড়ে হংসী মুখে
আনন্দ-বারতা? এই আমি নল-রাজ
বসি স্তম্ভ পাশে।—

অপর চার জনও সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে বলে উঠল—

দময়ন্তী, দময়ন্তী, মনে পড়ে হংসী মুখে
আনন্দ-বারতা? এই আমি নল-রাজ
বসি স্তম্ভ পাশে।—
প্রকৃত নলের তখন বিমূঢ় দৃষ্টি!

তারপরে বনে-বনে ভ্রাম্যমাণ রাজ্যহীন সহায়-সম্পদহীন উন্মত্ত নলের সে কি করুণ ও মর্মস্পর্শী চিত্র! কতকাল তো হয়ে গেল, যদু হাজরার সে অপূর্ব অভিনয় আজও ভুলিনি। চোখের জল কতবার গোপনে মুছলুম সারারাত্রির মধ্যে, পাছে আশপাশের লোক কান্না দেখ্‌তে পায়, কতবার হাঁচি আনবার ভঙ্গীতে কাপড় দিয়ে মুখ চেপে রাখলুম। যাত্রা শেষরাত্রে ভাঙ্‌ল। কিন্তু পরদিনও আবার যাত্রা হবে শুনে আমি বাড়ী গেলুম না। একটা খাবারের দোকানে কিছু খেয়ে সারাদিন কাটিয়ে দিলুম। রাত্রে আবার যাত্রা হ'লো —শিখিধ্বজের পালা। যদু হাজরা সাজল শিখিধ্বজ। এটা নাকি তার বিখ্যাত ভূমিকা, শিখিধ্বজের ভূমিকায় যদু হাজরা আসর মাতিয়ে পাগল করে দিলে। সেই একরাত্রের অভিনয়ের জন্যে চার পাঁচখানা সোনা ও রূপোর মেডেল পেলে যদু হাজরা। যাত্রা ভাঙ্‌ল যখন তখন রাত বেশি নেই। আসরে একটা বেঞ্চিতে শুয়ে রাত কাটিয়ে সকালে একা নিজের গ্রামে ফিরে এলুম।

তারপর কয়েক বছর কেটেছে। তখন আমি আরও একটু বড় হয়েছি—স্কুলে ভর্তি হয়েছি। যদু হাজরার কথা প্রায় এর ওর মুখে শুনি। যেখানেই যাত্রা দলের কথা ওঠে, সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করে যাত্রা জগতের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা যদু হাজরা।

আমি কিন্তু বহুদিন যদু হাজরাকে আর দেখলুম না।

এর অনেক কারণ ছিল।

আমি দূরে শহরের স্কুল-বোর্ডিং-এ গেলুম।

মন গেল লেখাপড়ার দিকে, ধরাবাঁধা রুটিনের মধ্যে জীবনের মুক্ত গতি বন্ধ হয়ে পড়ল। এ্যালজেব্রার আঁক, জ্যামিতির এক্‌স্ট্রা, ইংরাজী ভাষার নেশা, ফুটবল, ডিবেটিং ক্লাব, খবরের কাগজ—জীবনের মধ্যে নানা পরিবর্তন এনে দিলে। ছেলেবেলার মতো যে যেখানে যাত্রার নাম শুনব সেখানেই দৌড়ে যাব—তা কে জানে চার ক্রোশ, কে জানে ছ' ক্রোশ—এমন মন ক্রমে ধীরে ধীরে বদলে যেতে লাগল। ইচ্ছে হ'লেও হয়তো স্কুলের ছুটি থাকে না, স্কুলের ছুটি থাকলেও বোর্ডিং-এর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছাড়তে চান না—নানা উৎপাত।

পাড়াগাঁয়ের ছেলে ছিলুম, থিয়েটার কাকে বলে জানতুম না। যে শহরে পড়তুম, সেখানে উকিল-মোক্তারদের একটা থিয়েটার ক্লাব ছিল, তাঁরা একবার থিয়েটার করলেন, পালাটা ঠিক মনে নেই—বোধ হয় "প্রতাপাদিত্য"। ভাষা ও ঘটনার বিন্যাসে থিয়েটারের পালা আমাকে মুগ্ধ করল—ভাবলুম যাত্রা এর চেয়ে ঢের খারাপ জিনিস। প্লটের এমন বাঁধুনি তো যাত্রার পালাতেই নেই। তারপর অনেকবার উকিলদের ক্লাবে থিয়েটার দেখলুম —ছেলেবেলার মন ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করেছে, বাজারে যাত্রা হ'ল বারোয়ারীর সময়ে, কলকাতার দল, কিন্তু তাতে আগেকার মতো আনন্দ পেলুম না।

তারপর কলকাতায় এলুম। তখন নতুন মতের অভিনয় সবে কলকাতায় শুরু হ'য়েছে। বড় বড় বহু বিখ্যাত নটদের অভিনয় দেখবার সুযোগ জীবনে এই প্রথম ঘটল, তাদের

নানা পালাতে নানা অভিনয় দেখলুম,—বিলিতী ফিল্মে বিশ্ব-বিখ্যাত নটদের অভিনয় অনেকদিন ধরে দেখলুম—মানুষ ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞ হয়, উকিল-মোক্তারদের প্রধান অভিনেতা গুরুদাস ঘোষ—যাকে এতকাল মনে মনে কত বড় বলে ভেবে এসেছি—এখন তার কথা ভাবলে আমার হাসি পায়!

আরও কয়েক বছর কেটে গেল। কলেজ থেকে বেরিয়ে চাকুরি করি। কলকাতার থিয়েটারের অভিনেতারাও তখন আমার কাছে পুরানো ও একঘেয়ে হয়ে গিয়েছে—থিয়েটার দেখাই দিয়েছি ছেড়ে। ফিল্ম সম্বন্ধেও তাই। খুব নামজাদা অভিনেতা না থাকলে সে ছবি দেখতে যাইনে—যাঁদের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছি একদিন—তাদের অনেকের সম্বন্ধেই মত বদলেছি।

এই যখন অবস্থা, তখন কি একটা ছুটিতে বাড়ী গিয়ে শুনি দেশে বারোয়ারী। শুনলুম, ক'লকাতা থেকে বড় যাত্রার দল আসছে—দেড়শো টাকা এক রাত্রির জন্য নিয়েছে. এমন দল নাকি এদেশে আর কখনও আসে নি। ভালো বিলিতী ফিল্মই দেখিনে, থিয়েটার দেখাই ছেড়ে দিয়েছি ভালো লাগে না ব'লে—এ অবস্থায় রাত জেগে যাত্রা দেখবার যে বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও মনে জাগবে না—একথা বলাই বাহুল্য। যাত্রা আবার কি দেখব! নিতান্ত বাজে জিনিস—কে কষ্ট করে এই গরমের মধ্যে লোকের ভিড়ে বসে যাত্রা দেখতে যাবে?

কিন্তু বন্ধু-বান্ধবেরা ছাড়লেন না। বারোয়ারীর কর্তৃপক্ষেরা বিশেষ অনুরোধ করে গেলেন—আমার যাওয়া চাই-ই। কি করি, ভদ্রতা বলেও তো একটা ব্যাপার আছে। খানিকটা দেখে না হয় উঠে এলেই হবে। একেবারে না যাওয়াটা ভালো দেখাবে না হয় তো—বিশেষ দেশে যখন তত বেশি যাতায়াত নেই।

সন্ধ্যার সময় যাত্রা বসল। যাত্রা জিনিসটা দেখিনি অনেককাল—দেখে বুঝলুম সেকালের যাত্রা আর নেই। জুড়ির গান, মেডেলধারী বেহালাদারদের দীর্ঘ কসরৎ—এ সব অতীত ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। সলমা-চুমকীর কাজ করা সাজ পোশাকও আর নেই—ক'লকাতার থিয়েটারের হুবহু অনুকরণ যেমন সাজ-পোশাকে, তেমনি তরুণ অভিনেতাদের অভিনয়ের ঢঙে। এমন কি কয়েকজন অভিনেতার ব'লবার ধরন, মুখভঙ্গি ও হাত-পা নাড়ার কায়দা, ক'লকাতার স্টেজের কোন কোন নামজাদা বিশিষ্ট অভিনেতার মতো। দেখলুম. আসরের শ্রোতাদের দলের মধ্যে যারা তরুণ বয়স্ক তাদের কাছে এরা পেলে ঘন ঘন হাততালি। কেউ কেউ বললে—ওঃ, কি চমৎকার নকলই করেছে ক'লকাতার স্টেজের অমুককে—বাস্তবিক দেখবার জিনিস বটে!

এমন সময়ে আসরে ঢুকলো একজন মোটা ও কালো বেঁটে লোক। কিসের পার্টে তা আমার মনে নেই। লোকটির বয়স ষাটের উপর হবে. তবে স্বাস্থ্যটা ভালো। কেউ তার বেলা একটা হাততালিও দিলে না, যদিও সে দর্শকদের খুশি করবার জন্যে অনেক রকম মুখভঙ্গি করলে, অনেক হাত-পা নাড়লে। আমার সঙ্গে একদল স্কুলের ছেলে বসেছিল. তাদের মধ্যে একজন ব'লে উঠল—এ বুড়োটাকে আবার কোথা থেকে জুটিয়েছে? দেখতে যেন একটা পিপে। এ্যাক্‌টিং করছে দেখ্ না ঠিক যেন সঙ!

পাশের আর একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন—ও এককালে খুব নামজাদা এ্যাকটার ছিল হে. তখন তোমরা জন্মাও নি। ওর নাম যদু হাজরা।

আমি হঠাৎ ভদ্রলোকের মুখের দিকে চাইলুম. তারপর একবার বৃদ্ধ অভিনেতাটির দিকে চাইলুম। বাল্য দিনের একটা ঘটনা আমার মনে পড়ে গেল। সেই কনকনে শীতের রাত্রি, সেই শহুরে ডেঁপো-ছেলেদের সঙ্গ. সেই তারা আমাকে ফেলে কোথায় পালাল—তারপর বাড়ী থেকে অনেক দূরে এক অপরিচিত গঞ্জের বারোয়ারী আসরে ময়রার দোকানে

খাবার খেয়ে আমার সেই একা বিদেশে দু'দিন কাটানো। সে রাত্রে যার অভিনয় দেখে আমার বালক মন মুগ্ধ বিস্মিত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল—সেই যদু হাজরা এই?

এক সময়ে তার যে ধরনের মুখভঙ্গি দেখে ও কথাবার্তার উচ্চারণ শুনে দর্শকেরা আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠত, আজও যদু হাজরা সেই সব হুবহু করে যাচ্ছে আমার চোখের সামনে—অথচ দর্শকেরা খুশি নয় কেন? খুশি তো দূরের কথা, তাদের মধ্যে অনেকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করছে কেন, ব'সে ব'সে এই কথাটাই ভাবলুম।

মন যেন কেমন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। অপর লোকের কথা কি, আমারই তো যদু হাজরার হাব-ভাব হাস্যকর ঠেকছে! কেন এমন হয়?

বাল্য দিনের সেই যাত্রার আসরে এঁকে আমি দেখেছিলুম, এঁর সেই অভিনয় এখনও স্পষ্ট মনে আছে। বিশ্বাসঘাতক সেনাপতির সঙ্গে রাজার কনিষ্ঠ পত্নী ভ্রষ্টা, রাজা একদিন দুজনকে নির্জনে প্রেমালাপে নিমগ্ন দেখতে পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কি ভেবে বললেন—'মধুছন্দা, আমি প্রৌঢ়, তুমি তরুণী এই বয়সে তোমায় বিবাহ করে ভুল করেছি। তোমায় আমি এখনও ভালোবাসি, প্রাণে মারবো না—তোমরা দুজনে আমার চোখের সামনে প্রেমিক-প্রেমিকার মতো হাত ধরাধরি করে চলে যাও। কিন্তু আমার রাজ্যের বাইরে। আর কখনও তোমাদের মুখ না দেখি।' ওরা ধরা পড়ে দুজনে ভয়ে ও লজ্জায় সংকুচিত হয়ে পড়েছে। রাজার সামনে একাজ কেমন করে করবে? হাত ধরাধরি করে কেমন করে যাবে? রাজা তলোয়ার খুলে বললেন—'যাও, নইলে দুজনকেই কেটে ফেলব—ঠিক ওই ভাবেই যাও।'

শেষে তারা তাই করতে বাধ্য হ'ল। রাজা স্থির দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে ছিলেন—তারা যখন কিছুদূর চ'লে গিয়েছে, তখন তিনি হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্তের মতো মুক্ত তলোয়ার হাতে 'হা—হা—হা' রবে একটা চিৎকার করে তাদের দিকে ছুটে গেলেন—সঙ্গে সঙ্গে তারাও আসরের বাইরে চলে গেল। মনে আছে রাজার সেই চমৎকার ভঙ্গিতে, তার হতাশ 'হা—হা' রবের মধ্যে এমন একটা ট্র্যাজিক সুর ছিল, আসরসুদ্ধ দর্শককে তা বিচলিত করেছিল। আমি তখন যদিও নিতান্ত বালক, কিন্তু আমার মনে সেই দৃশ্যটি এমন গভীর দাগ দিয়েছিল যে, এই এত বয়েসেও তা ভুলিনি।

পরের দিন যদু হাজরার সঙ্গে দেখা হ'ল। ওদের যেখানে বাসা দিয়েছে, তার সামনে একটা টুলের উপর বসে সে তামাক টানছে। আমি বললুম—কাল আপনার পার্ট বড় চমৎকার হ'য়েছে। বৃদ্ধ আগ্রহের সুরে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—আপনার ভালো লেগেছে? বললুম—চমৎকার! এমন অনেক দিন দেখিনি!

কথাটার মধ্যে সত্যের অপলাপ ছিল। বৃদ্ধ খুশি হ'ল, মনে হ'ল প্রশংসা জিনিসটা বেচারীর ভাগ্যে অনেকদিন জোটেনি। আসরে কাল যখন তরুণ অভিনেতাদের বেলায় ঘন ঘন হাততালি পড়েছে, যদু হাজরার ভাগ্যে সে জায়গায় বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছুই জোটেনি।

বৃদ্ধ বললে—আপনি বোঝেন তাই আপনার ভালো লেগেছে। আর কি মশায় সেদিন আছে? এখনকার সব হয়েছে আর্ট—আর্ট, সে যে কি মাথা-মুণ্ডু তা বুঝিনে। বৌ-মাস্টারের দলে ভৃগু সরকার ছিল। রাবণের পার্টে অমন এ্যাক্‌টো আর কেউ কখনও করবে না। আমি সে ভৃগু সরকারের শাগরেদ—বুঝলেন? আমায় হাতে ধরে শিখিয়েছেন তিনি। মরবার সময় আমার হাত ধ'রে ব'লে গেলেন—যদু, তোমায় যা দিয়ে গেলাম, তোমার জীবনে আর ভাবনা থাকবে না!

আমি বললুম—এ বয়সে আপনি আর চাকুরি কেন করেন?

—না ক'রে কি করি বলুন? বড় ছেলেটি উপযুক্ত হ'য়েছিল, আজ বছর দুই হ'ল

কলেরা হয়ে মারা গেল। তার সংসার আমারই ওপর, নাতনীটির বিয়ে দিতে হবে আর কিছুদিন পরেই। পয়সা আগে যা রোজগার করেছি হাতে রাখতে পারিনি। এখন আর তেমন মাইনেও পাইনে। দেড়শো টাকা পর্যন্ত মাইনে পেয়েছি এক সময়—আমার জন্যে অধিকারী আলাদা দুধ বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল, যখন ভূষণ দাসের দলে থাকতাম। এখন পাই পঁইত্রিশ টাকা মাইনে। আর সতীশ ব'লে ওই-যে ছোকরা কাল রামের পার্ট করলে—সে পায় আশি টাকা। ওরা নাকি আর্ট জানে। আপনিই বলুন তো, কাল ওর পার্ট ভালো লাগল আপনার, না আমার পার্ট ভালো লাগল? এখনকার আমলে ওদেরই খাতির বেশি অধিকারীর কাছে। আমাদের চাকরি বজায় রাখাই কঠিন হয়েছে।

মনে মনে ভেবে দেখলুম, যদু হাজরার এতদিন বেঁচে থাকাটাই উচিত হয়নি। চল্লিশ বছর আগে তরুণ যদু হাজরাকে বৌ-মাস্টারের দলের ভৃগু সরকার যে ভাবে হাত-পা নাড়বার ভঙ্গি ও উচ্চারণের পদ্ধতি শিখিয়েছিল, বৃদ্ধ যদু হাজরা আজও যদি তা আসরে দেখাতে যায়, তবে বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছু প্রাপ্য হবে না—একথা তাকে বলি কেমন করে? কালের পরিবর্তন তো হয়েছেই, তাছাড়া তরুণ বয়সে যা মানিয়েছে এ বয়েসে তা কি আর সাজে?

এই ঘটনার বছর পাঁচ ছয় পরে নেবুতলার গলি দিয়ে যাচ্ছি ; একটা বেনেতি মশলার দোকানে দেখি যদু হাজরা বসে আছে। দেখেই বুঝলুম দারিদ্র্যের চরম সীমায় এসে সে ঠেকেছে। পরনে অর্ধমলিন থান, পিঠের দিকটা ছেঁড়া এক ময়লা জামা গায়ে। আমায় দেখে সে চিনতে পারলে না। আমি ওঁকে খুশি করবার জন্যে বললুম—আপনি চিনতে পারুন আর না-ই পারুন, আপনাকে না চেনে কে! আগুন কি ছাই চেপে ঢেকে রাখা যায়? তা এখন বুঝি কলকাতায় আছেন?

বৃদ্ধের চোখে জল এল প্রশংসা শুনে। বললে, আর বাবু মশায়, আমাদের দিন ফুরিয়েছে। এই দেখুন আজ তিনটি বছর চাকুরি নেই। কোন দলে নিতে চায় না। বলে, আপনার বয়স হয়েছে হাজরা মশাই, এ বয়সে আর আপনার চাকরি করে পোষাবে না, আসল কথা আমাদের আর চায় না। ভালো জিনিসের দিন আর নেই, বাবু মশায়। এখনকার কালে সব হয়েছে মেকি। মেকির আদর এখন খাঁটি জিনিসের চেয়ে বেশি। আমার গুরু ছিলেন বৌ-মাস্টারের দলের ভৃগু সরকার, আজকালকার কোন্ ব্যাটা অ্যাক্টার ভৃগু সরকারের পায়ের ধুলোর যুগ্যি আছে? 'রাই উন্মাদিনী' পালায় আয়ানঘোষের পার্টে যে একবার ভৃগু সরকারকে দেখেচে—

আরও বার কয়েক প্রশংসা ক'রে এই ভগ্নহৃদয় বৃদ্ধ নটকে শান্ত করলুম। জিজ্ঞাসা ক'রে ক্রমশ জানলুম এই মশলার দোকানই বৃদ্ধের বর্তমান আশ্রয়স্থল। কাছেই গলির মধ্যে কোন ঠাকুরবাড়ীতে এক বেলা খেতে দেয়, রাত্রে এই দোকানটাতে শুয়ে থাকে। দোকানের মালিক বোধ হয় ওর জানাশোনা।

কার্যোপলক্ষে গলিটা দিয়ে প্রতিদিনই যাতায়াত করি, আর ফিরবার সময়ে যদু হাজরার সঙ্গে একটু গল্প-গুজব করি। একদিন বৃদ্ধ বললে—বাবুমশাই, একটা কথা বলব? একদিন একটু মাংস খাওয়াবেন? কতকাল খাইনি।

একটা ভালো রেস্টোরেণ্টে নিয়ে গিয়ে খাওয়ালুম। ওর খাওয়ার ভঙ্গি দেখে মনে হ'ল, বৃদ্ধ কতদিন ভালো জিনিস খেতে পায়নি। তারপর দুজনে একটা পার্কে গিয়ে বসলুম। রাত তখন ন'টা বেজে গিয়েছে। শীতকাল, অনেকে পার্ক থেকে চলে গিয়েছে। একটা বেঞ্চে বসে বৃদ্ধ নিজের সম্বন্ধে কত কথাই বললে। কোন্ জমিদার কবে তাকে আদর করে ডেকে নিজের হাতে সোনার মেডেল পরিয়ে দিয়েছিলেন, তার অভিনয় দেখে

কবে কোন্ মেয়ে তার প্রেমে পড়েছিল, হাতীবাধার রাজা নিজের গায়ের শাল ওর গায়ে জড়িয়ে দিয়েছিলেন।

বলতে বলতে মাঝে মাঝে যেন ও অন্যমনস্ক হয়ে পড়চে। পঁচিশ বৎসর আগের কোন্ তরুণী প্রেমিকের হাসিমাখা চাহনি ওর আবেশ-মধুর যৌবনদিনগুলির উপর স্পর্শ রেখে গিয়েচে—কে জানে সেই সব দিন, সেই সব বিস্মৃত-প্রায় মুখ ও মনে আনবার চেষ্টা করছিল কিনা। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললুম—শিখিধ্বজ আর মধুছন্দার সেই অভিনয় আমার বড় ভালো লাগে, সেই যখন রাজা বললেন, 'তোমরা প্রেমিক প্রেমিকার মত হাতধরাধরি করে চলে যাও'—সেই জায়গাটা এখনও ভুলিনি।

বৃদ্ধ নট সোজা হয়ে বসল। তার চোখে যৌবন-কালের সেই হারানো দীপ্তি যেন ফিরে এল। বললে—ওঃ, সে কত কালের কথা যে! ও পালা গেয়েছি প্রসন্ন নিয়োগীর দলে থাকতে। দেখবেন—করে দেখাব?

আমি উৎসাহের সঙ্গে বললুম—মনে আছে আপনার? দেখান না?

ভাগ্যে পার্কে তখন বিশেষ কেউ ছিল না। বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াল—আমি হলুম মধুছন্দা। ও নিজের পার্ট বলে যেতে লাগল—দেখলুম কিছুই ভোলেনি। শেষে আমার দিকে ফিরে জলদ-গম্ভীর সুরে বললে—যাও মধুছন্দা, তোমরা দুজনে প্রেমিক প্রেমিকার মতো হাত ধরাধরি করে চলে যাও—তারপর আমি কয়েক পা এগিয়ে যেতেই বৃদ্ধ তার সেই পুরানো ট্র্যাজিক সুরে 'হা—হা—হা—হা' করে আমার দিকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে এল। সত্যিই কি অপূর্ব সে সুর, কি অপূর্ব ভঙ্গি! ভগ্নহৃদয় বৃদ্ধ নট তার জীবনের সমস্ত ট্র্যাজেডি ওর মধ্যে ঢেলে দিলে। যেন সত্যিই ও ভগ্নহৃদয় প্রৌঢ় রাজা শিখিধ্বজ, অবিশ্বাসিনী মধুছন্দা ওকে উপেক্ষা ক'রে তার তরুণ প্রেমিকের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে গেল। অল্প কয়েক মুহূর্তের জন্যে বৃদ্ধ যদু হাজরা ত্রিশ বছর আগেকার তরুণ নট যদু হাজরাকেও ছাড়িয়ে গেল।

এই যদু হাজরার শেষ অভিনয়। এর মাসখানেক পরে একদিন নেবুতলায় সেই মশলার দোকানটিতে খোঁজ করতে গিয়ে শুনলুম সে মারা গিয়েছে।

জন্ম ও মৃত্যু

জীবনে মাঝে মাঝে বেশ চমৎকার ব্যাপার ঘটে। ভেবে দেখবার ও উপভোগ করবার জিনিস হিসেবে সেগুলোর মূল্য বড় কম নয়। সম্প্রতি আমার অভিজ্ঞতার গণ্ডীর মধ্যেই এমনি একটা ঘটনা এসে পড়েছিল—ঠিক একটা ঘটনা না ব'লে বরং তাকে দুটো ঘটনার সমষ্টিই বলা যেতে পারে।

মধুপুরে একটা বাড়ী ভাড়া করবার দরকার ছিল—এক জায়গায় সন্ধান পেলাম—ভবানীপুরের এক ভদ্রলোকের বাড়ী আছে মধুপুরে এবং তিনি সেটা ভাড়া দেবেন। সকাল বেলা তাঁর ওখানে গেলাম, বেলা তখন দশটা। ভবানীপুরে ভদ্রলোক যে বাড়িতে থাকেন তা বেশ বড় বাড়ী। বাইরে সুসজ্জিত বৈঠকখানা, কিন্তু তিনি তখন বৈঠকখানার পাশে একটা ছোট ঘরের তক্তাপোশের উপর ব'সে গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়ে তামাক খাচ্ছিলেন।

ভদ্রলোক বৃদ্ধ, বয়স প'য়ষট্টির কাছাকাছি মনে হ'ল। কিন্তু তিনি নিজেই তাঁর বয়সের সম্বন্ধে আমার মনে কোন কল্পনার স্থান করলেন না। বললেন—আসুন, আসুন, বড় ভালো দিনে এসেছেন। আজ আমার জন্মতিথি কি-না, তাই বাড়ীতে একটু উৎসব গোছের আছে। তা বেশ, এসেছেন যখন আপনাকেও ছাড়ছিনে—ইত্যাদি।

কারুর জন্মতিথি উৎসবে যে ভাবে তাকে মিষ্টকথা বলবার কথা—ভদ্রলোককে আমি

তা বললাম। কাজের কথাটা এই উৎসবের দিনে কি ভাবে পাড়া যায়? বা কতক্ষণ ধ'রে জন্মতিথিতে মঙ্গলেচ্ছা প্রকাশ সংক্রান্ত কথাবার্তা বলবার পরই বা কাজের কথা পাড়া সুষ্ঠু হবে—কিংবা আজকার দিনে বাড়ী ভাড়ার দরদস্তুর-রূপ ইতরজনোচিত কথাবার্তা বলা আদৌ শোভন হবে কি-না—ইত্যাদি মনে মনে তোলাপাড়া করছি এমন সময়ে একটি সুন্দরী তরুণী হাসিমুখে বড় একটা ফুলের তোড়া হাতে ঘরে ঢুকলেন, পেছনে একটি যুবক। গৃহকর্তা ব'লে উঠলেন—এই যে অরুণা এসেছিস দিদি—ওঃ, পেছনে যে নির্মলকে গাঁটছড়া বেঁধে এনে হাজির করেছিস—ছেড়ে আসা যায় না বুঝি? বেশ বেশ, আমরা হয়ে গিয়েছি এখন বুড়োসুড়ো—

তরুণী ফুলের তোড়াটি বৃদ্ধের হাতে দিয়ে প্রণাম ক'রে এবং হাসি মুখে বৃদ্ধের গালে দুটি ঠোনা মেরে ঘর থেকে বার হ'য়ে গেল, যুবকটিও গেল পেছনে পেছনে। বৃদ্ধ বললেন—আমার নাতনী—আমার বড় ছেলের মেয়ে। আই. এ. পাস— ওবছর বিয়ে হয়েছে —স্বামী ইঞ্জিনিয়ার, বিলেত-ফেরত, কর্পোরেশনে ভালো চাকরি পেয়েছে!

কথা তখনও ভালো ক'রে শেষ হয়নি, আর দুটি তরুণী ঘরে ঢুকল—এদের ঘাড়ের উপর এলোখোঁপা এলিয়ে পড়েছে—পরনে জামিয়ারের মতো ছোট কল্কার কাজ করা নীল শাড়ি ও ব্লাউজ, গলায় সরু মফ্‌চেন, পায়ে সোনালি জরির কাজ করা নাগরা। দুটিই অবিবাহিতা—একটি গৌরী, অপরটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। এরাও ফুলের তোড়া দিলে—গৌরী মেয়েটি ঝিনুকের কাজ করা একটি নস্যদানি বৃদ্ধের হাতে দিয়ে বললে—বাবা পাঠিয়েছেন কুমুর থেকে—মা আসতে পারলেন না এখন—রাত্রে আবার থিয়েটারে যাবেন।

বৃদ্ধ বললেন—আজ দু'জনে বুঝি স্কুল-কলেজ কামাই ক'রে ব'সে আছ? যা, ও ঘরে যা হরিদাসকে বলে রাখ্‌ গাড়ীর কথা। আমার এর পরে মনে থাকবে না।

তরুণী দুটি চলে যেতেই বৃদ্ধ বললেন—আমার মেজ মেয়ের মেয়ে—বাগবাজারে আমার মেজ মেয়ের শ্বশুরবাড়ি। গোরাচাঁদ মল্লিকের নাম শুনেছেন তো? ওই তাদেরই বাড়ী। বনেদী বংশ—গোরাচাঁদ মল্লিক ছিলেন আমার মেয়ের শ্বশুরের···এই যে ভুধর! এসো, এসো বাবা—ব'সো।

এবার আরও গুরুতর ব্যাপার! যাঁকে সম্বোধন করা হ'ল এবং যাঁর নাম ভুধর তাঁর বয়স পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন। তিনি স্থূলকায় হ'লেও সঙ্গের মহিলাটির তুলনায় তিনি নিতান্ত কৃশ। এ'দের স্বামী-স্ত্রীর পেছনে চার পাশ ঘিরে ছ' সাতটি ছেলেমেয়ে। এদের বয়েস দশ থেকে উনিশের মধ্যে—আর একটি কুড়ি বাইশ বছরের মেয়ে একটু পিছিয়ে ছিল—তার কোলে একটি শিশু কিন্তু এ পর্যন্ত যে কয়টি মেয়ে এখানে দেখলুম, তার মধ্যে এই মেয়েটিই সর্বাপেক্ষা সুন্দরী।

বৃদ্ধ তার দিকে চেয়ে বললেন—এই যে মৃণাল, পিছিয়ে কেন—আয় আয়, খোকাকে দেখি, দে একবার ভাই আমার কোলে। নিশীথ এল না?

আমার অবস্থা শোচনীয় হ'য়ে উঠেছে। ছোট ঘরে যে ফাঁকা জায়গাটুকু ছিল স্বামী-স্ত্রী তার অনেকটা অংশ জুড়ে দাঁড়িয়েছেন। বাকিটা জুড়েছে ছেলেমেয়ের দল—পেছনের মেয়েটির জন্যে তেমন জায়গা নেই, আমি সংকুচিত অবস্থায় চেয়ার যতদূর সম্ভব পিছিয়ে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে দেওয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি। জড় পদার্থকে আর সঙ্কুচিত করা সম্ভব নয়। অথচ এই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ঠেলে যে বাইরে গিয়ে এদের স্থানের সঙ্কুলান করবো তাও অসম্ভব। এরা আমাকে সঙ্কোচের হাত থেকে শীঘ্রই অব্যাহতি দিলেন—এই জন্যে যে, পেছনে আর একদল এসে ঘরের বাইরে অপেক্ষা করছে, এরা না বেরুলে তারা ঢুকতে পারে না। এরা তো প্রত্যেকে এক-একটা তোড়া দিয়ে গেল—দুটি মেয়ে আবার দুটি বেলের গোড়ে বৃদ্ধের গলায় নিজেরা পরিয়ে দিলে—বৃদ্ধ কি একটা ঠাট্টাও করলেন।

আমার তখন শোনবার মতো অবস্থা ছিল না। তারা ঘর থেকে বা'র হয়ে গেলে বৃদ্ধ বললে—এই আমার বড় ছেলে তারক, আলিপুরে প্র্যাক্‌টিস্‌ করে, বালিগঞ্জে বাড়ী করেছে, সেখানেই থাকে। পিছনের দলটির মধ্যে মহিলা নেই—তিনটি ছোকরা, বয়সে ষোল থেকে একুশ, এরা এসে কিছু দিলে না, একজন অটোগ্রাফের খাতা বার করে বললে—জ্যেঠামশায়, আমার খাতায় আজকের দিনে কিছু লিখে দিন। অটোগ্রাফের খাতা ফেরত দিতে না দিতে আর দুটি ছেলে, তাদের সঙ্গে বারো তেরো বছরের একটি বেণী-দোলানো মেয়ে।

তারপরে ব্যাপারটা গণনার বাইরে চলে গেল।

কত ছেলে-মেয়ে, তরুণ-তরুণী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া যে ঘরটায় ঢুকতে বেরুতে লাগল, আমার আর তাদের হিসেব রাখা সম্ভব হ'ল না। ফলে ফুলে তক্তাপোশটা ছেয়ে গেল, ফুলের তোড়া ক্রমশ উঁচু হ'য়ে উঠতে লাগল—আর সেখানে জায়গা দেওয়া যায় না। আর এরা সবাই আত্মীয়-আত্মীয়া, বাইরের লোক কেউ নেই। সব আপনা-আপনির মধ্যে, পুত্র-কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী, জামাই, ভ্রাতৃবধূ, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্রী—ইত্যাদি। ভদ্রলোক ভাগ্যবান, এঁদের মতো লোকের সাহায্য না পেলে প্রজাপতির সৃষ্টি রক্ষা অসম্ভব হয়ে উঠ্‌ত। ক্রমশ ভিড় বাড়চে দেখে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লুম, আমি তখন হাঁপিয়ে উঠেছি, ভদ্রলোকও গোলমালের মধ্যে আমাকে তখন ভুলে গিয়েছেন। আমি বাড়ীর বাইরে এসে হাঁপ্‌ ছেড়ে বাঁচি। বাড়ীর সামনে গলিতে সারিবন্দী মোটর দাঁড়ানো—সেখানে ধরেনি। গলি ছাপিয়ে মোটরের সারি বড় রাস্তায় এসে পোঁছেচে; বিয়ে বাড়ীতেও এত মোটর জমে কি-না সন্দেহ। গলি পার হ'য়েই বড় রাস্তার মোড়ে নিবারণ মিত্রের সঙ্গে দেখা—সে আমার পরিচিত বন্ধু, সেজেগুজে সিল্কের পাঞ্জাবি শুঁড়ওয়ালা নাগরা পরে তাকে ব্যস্তসমস্ত ভাবে গলিতে ঢুকতে দেখে বললুম, ওহে, তুমিও কি বিশ্বনাথবাবুর বাড়ী যাচ্ছো না কি?

—হ্যাঁ। কেন বল তো? তুমি বিশ্বনাথবাবুকে চিনলে কি করে?

—এতক্ষণ সেখানে বসেছিলুম ভাই, দেখে শুনে মাথা ঘুরে উঠল। শহরের এক-তৃতীয়াংশ লোক দেখলুম বিশ্বনাথবাবুর আত্মীয়-আত্মীয়া, আর তাঁরা সবাই এসেছেন ওই সাতাত্তর বছরের বুড়োর জন্মদিনে ফুলের তোড়া উপহার দিতে। তোমার তোড়া কই?

বন্ধু হেসে বললে—খুব আশ্চর্য লাগছে? বিশ্বনাথবাবুর সাত ছেলে চার মেয়ে। এদের সকলেরই আবার ছেলেমেয়ে এবং অনেকেরই নাতি-নাতনী, নাতজামাই ইত্যাদি হ'য়ে গিয়েছে। বিশ্বনাথবাবুরা তিন ভাই। তাদের ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনী আছে। হিসেব ক'রে দ্যাখো কত হয়—এবং আসল কথা কি জানো, বুড়োর হাতে হাজার পঞ্চাশ-ষাট টাকা আছে, সকলেরই চোখ সেদিকে একথা যদি বলি, তবে সেটা খুব খারাপ শোনাবে হয়তো। কিন্তু কথাটা মনে না উঠে কি পারে? তুমিই বলো। আচ্ছা, আসি ভাই, দেরি হ'য়ে যাচ্ছে।

বিশ্বনাথবাবুর জন্মদিনের সপ্তাহ দুই পরেই আমি স্বগ্রামে গেলুম। বলা আবশ্যক যে, আমার গ্রামের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব বেশি নয়, সেখানে বছরে একবার যাওয়াও ঘটে কি-না সন্দেহ।

বাড়ী গিয়ে শুনলুম গ্রামের বৃদ্ধা শশী-ঠাকরুণ মারা গিয়েছেন। শশী-ঠাকরুণের বয়স যে কত হ'য়েছিল, তা বলা শক্ত। কেউ বলে নব্বুই, কেউ বলে একশো'র কাছাকাছি হবে। আমরা মোটের উপর তাঁকে আমাদের বাল্যকাল থেকেই অতি-বৃদ্ধাই দেখে আসছি। বয়সের যে গণ্ডী পার হ'য়ে গেলে মানুষের আকৃতির পরিবর্তন আর চেনবার উপায়

থাকে না, শশী-ঠাকরুণ আমাদের বাল্যেই সে গণ্ডী পার হ'য়েছিলেন। শশী-ঠাকরুণের চার ছেলে, তিন মেয়ে। বড় ছেলেটি ছাড়া আর সকলেই বিদেশে চাকরি করে—বড় ছেলে তেমন লেখাপড়া না জানার দরুণ দেশে থেকে সামান্য কি কাজকর্ম করে, তার অবস্থাও ভালো নয়, অনেকগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে বড় কষ্ট পায়। ভায়েরা পৃথক, কেউ কাউকে সাহায্য করে না। কর্মস্থান থেকে দেশেও কেউ আসে না!

শশী-ঠাকরুণের কষ্টের অবধি ছিল না। একটা চালা-ঘরে ইদানীং তিনি পড়ে থাকতেন—বড় ছেলেই তাঁর ভরণ-পোষণ করতো বটে, কিন্তু তেমন আগ্রহ ক'রে করতো না। অর্থাৎ তার মনের মধ্যে এ ভাবটা জেগে রইতো যে, মা তো আমার একার নয়—সকলেরই তো কিছু কিছু সাহায্য করা উচিত মাকে—তারা যদি না করে আমিই বা কেন এত দায় ঘাড়ে করতে যাই?

শশী-ঠাকরুণের অন্য ছেলেরা কখনো সন্ধান নিত না—বুড়ী বাঁচল, কি মোলো। অথচ তাদের সকলেরই অবস্থা ভালো—মাইনে কেউই মন্দ পায় না, শহরে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে থাকে। বড় ভাইয়ের পত্রের জবাব দিত—তাদের নিজেদেরই অচল হয়েছে, শহরের খরচ থেকে বাঁচিয়ে বাড়ীতে কি ক'রে পাঠায়। বাড়ীতে বিষয়-সম্পত্তি তো রয়েছে—তার আয় থেকে তো মায়ের চলা উচিত—ইত্যাদি। কিন্তু বিষয়-সম্পত্তি এমন কিছুই না যার আয় থেকে বেকার বড় ছেলের একপাল পোষ্য ও শশী-ঠাকরুণের ভরণ-পোষণ ভালো ভাবে চলে।

বুড়ী খেতেই পেত না। ইদানীং আবার তার ছেলেমানুষের মতো লোভ দেখা দিয়েছিল—বিশেষ ক'রে মিষ্টি জিনিস খাবার। আমি সেবার যখন দেশে যাই, বুড়ী দেখি একটা কঞ্চির লাঠি হাতে মুখুয্যে পাড়ার মোড়ে বেলতলায় বসে। আমায় দেখে বললে, কুঞ্জ এলি নাকি?

—হাঁ, ঠাক্‌মা। এখানে ব'সে কেন?

—এই বাদা বোষ্টম খাবার বেচতে যাবে, তাই ব'সে আছি তার জন্যে। বাতাসা কিনব—ভিজিয়ে খাই।

—তা বেশ, বসো। ভালো আছো তো?

—আমাদের আবার ভালো থাকা-থাকি, তুমিও যেমন দাদা। খেতেই পাইনে। বাদার কাছে চারটে পয়সা ধার হ'য়েছে, আর সে ধার দিতে চায় না। সিধুর কাছে আর কত চাইব। সে নিজের ছেলেপিলে নিয়ে আতান্তরে পড়ে আছে। আহা, বাছার আমার মুখ দেখলে বুক ফেটে যায়। আমি তার কাছে কিছু নিই নে—তা তুই আমাকে আনা চারেক পয়সা দিয়ে যাবি?

বুড়ীর অবস্থা দেখে বড় কষ্ট হ'ল। পকেট থেকে একটা টাকা বার করে তার হাতে দিয়ে বললাম—এখন রাখুন ঠাক্‌মা, যখন যা দরকার হয়—আমি যতদিন বাড়ি থাকি. দিয়ে যাব আপনাকে।

বুড়ী অবাক্ হয়ে গেল—আনন্দে বিস্ময়ে সে যেন প্রথমটা বুঝতেই পারলে না—আমি কি তাকে সত্যি একটা গোটা টাকা দিলুম!

পরের বছর—পুজোর কিছু আগে দেশে গিয়েছি—বুড়ী দেখি আমাদের বাড়ীর সামনের বাতাবি লেবুর তলার পথটা দিয়ে যাচ্ছে—হাতে একটা কাঁসার জামবাটি। আমায় দেখে বললে—কখন বাড়ী এলি?

বললুম—কাল এসেছি ঠাক্‌মা। বাটি হাতে কোথায় গিয়েছিলেন?

—আর বলিস্‌নে, দাদা! বাটিটা নাপিতপাড়া নিয়ে গিয়েছিলাম যদি ওরা কেনে। আমার দিন তো আর চলে না, হাতে মোটে পয়সা নেই। সিধু খুলনে গিয়েছে—আজ

চার-পাঁচদিন। বাড়ী একেবারে অচল। ছেলেপিলেগুলো খেতে পায় না এমন অবস্থা।

—তা বাটিটা বিক্রী ক'রে আর ক'দিন যাবে ঠাক্‌মা?

—তবু যে ক'দিন যায়। তাও ওরা নিলে না—বলে নগদ এখন দিতে পারব না। ধারে বাটি দিলে আমার কি করে চলে ভাই বলো তো? একটু গুড় খেতে পাচ্ছিনে, বাটিটা বেচে ভেবেছিলাম আজ হাটে আধসের ভালো আকের গুড় আনতে দেব—আর অজকের হাটটাও হবে এখন। ছেলেপিলে শুধু ঝিঙে ভাজা আর ভাত খেয়ে মারা গেল। তা নিবি দাদা বাটিটা?—ফুল কাঁসা, এ ওদের বাটি না। আমার নিজের বাটি—বিয়ের দানে আমার বাবা দিয়েছিলেন, দ্যাখ্‌ না?

শহরে থাকি,—অনেক সময় কাঁচা পয়সা রোজগার করি। পাড়াগাঁয়ে যে এত পয়সার কষ্ট তা ভেবে দেখি নে। আমায় অন্যমনস্ক দেখে বুড়ী ভাবলে বোধহয় বাটি কেনবার ইচ্ছে নেই আমার। অনেকটা মিনতির সুরে বললে—না কিনিস্‌, ওটা বাঁধা রেখে আমায় বরং আট আনা পয়সা দে।

এ রকম অবস্থায় বুড়ীকে আমি আরও কয়েকবার দেখেছি।

শুনলাম—বুড়ীর মরণকালে অন্য ছেলেরা কেউ আসেনি—বড় ছেলে খুব সেবাযত্ন করেছিল। বুড়ীর গায়ে একটা লেপ ছিল, মরণের ঘণ্টা দুই আগে বুড়ী পুত্রবধূকে বলেছিল—বৌমা, লেপটা সরিয়ে নাও, চার-পাঁচ টাকা দামের লেপটা—আমি বাঁচব না, তখন ওটা আমার সঙ্গে ফেলে দিতে হবে। ও গেলে আর হবে না বৌমা। আহা, কোথায় পাবে সিধু যে, আবার চার-পাঁচ টাকা খরচ ক'রে লেপ বানাবে? শীতকালে বাছারা আমার আদুড় গায়ে কাটাবে তা হ'লে।

আরও খানিক পরে বুড়ী ছেলেকে ডেকে বললে—দ্যাখ্‌ সিধু, একটা কথা বলি শোন্‌। আমার শ্রাদ্ধে বেশি কিছু খরচপত্র করতে যাসনে যেন। বিধু, মনি, শরৎ ওরা কেউ কিছু হয়তো দেবে না—তুই একা পাবি কোথায় যে খরচ করবি? নমো নমো করে অমনি পাঁচটি ব্রাহ্মণ খাইয়ে দিবি। আর যদি ওরা কেউ কিছু পাঠায়, তাও সব টাকা খরচ করিস্‌ নে। হাতে কিছু রাখবি,—এর পরে তোর ছেলে-পিলেরা খেয়ে বাঁচবে।

শুনলাম শশী-ঠাকরুণের ছেলেরা সবাই বাড়ী এসেছে ও খুব ঘটা করে মায়ের শ্রাদ্ধ করছে।

বেড়াতে বেড়াতে ওদের বাড়ীর দিকে গেলাম। সামনের উঠানে নারিকেলের ডাল পুঁতে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধের মণ্ডপ তৈরী করা হ'য়েছে—মণ্ডপের সামনে শামিয়ানা টাঙানো। গ্রামের অনেকেই সেখানে উপস্থিত, সেজ ছেলে গোপেশ্বর কাছা গলায় গ্রামের বৃদ্ধ চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে আপিসে নূতন লোক ঢোকানো আজকাল যে কত অসম্ভব হ'য়েছে—সে সম্বন্ধে কি বলচে। গোপেশ্বরের বয়েস পঁয়তাল্লিশ ছাড়িয়েছে, রেলের অডিট অফিসে বড় চাকুরি করে—চৌধুরী মহাশয় বোধ হয় তাকে কারো চাকুরির জন্যে ব'লে থাকবেন, কথার ভাবে তাই মনে হল।

—আগে অনেক ঢুকিয়েছি কাকাবাবু, সিমসন গিয়ে পর্যন্ত আর সেই সুবিধে নেই। সিমসন সাহেব, আমি যা বলেছি তাই করেছে। এখন পোস্ট খালি হ'লে সব তলায় তলায় ঠিক হ'য়ে যায়—আপিসের আর সে-দিন নেই।...শুনলাম গোপেশ্বর রিটায়ার করবার পরে প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের দরুণ প্রায় আঠার-উনিশ হাজার টাকা পাবে, হাওড়ায় না বরানগরে জমি কিনেছে, সেইখানেই বাড়ী করবে। আজ দশ-এগারো বছর পরে সে দেশে এসেছে, মায়ের মৃত্যু না ঘটলে, আরও কতদিন আসতো না তাই বা কে জানে!

ওদের বাড়ীর মধ্যে ঢুকে আমি অবাক্‌ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এদের বাড়ীতে যে এত ছেলে-মেয়ে, বৌ, ঝি-চাকর আছে—তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবার জো ছিল না।

মেজ, সেজ ও ছোট ছেলের বৌয়েরা এসেছে, তাদের ছেলেমেয়ে, নাতি, নাতনীতে বাড়ী ভর্তি। খুব ছোট বেলায় যে মেয়েদের দেখেছিলাম, হয়তো অনেকের সঙ্গে খেলাও করেছি —তাদের বিয়ে হ'য়ে ছেলেপিলে হয়ে গিয়েছে—অনেকের স্বামীরাও এসেছে। তবু তো বুড়ীর বড় মেয়ে অনেক দূরে থাকে ব'লে আসতে পারেনি—অপর দুই মেয়ে ও তাদের ছেলেমেয়েরা এসেছে। সবাই ব্যস্তসমস্ত, এখানে তরকারি কোটা হচ্ছে, ওখানে জিনিসের ফর্দ হচ্ছে, বাড়ীময় ছেলেমেয়েদের চিৎকার, হাসি, ছোটাছুটি—মেয়েরা এ ওকে ডাকছে, মেয়েরা ছেলেপিলেদের বকছে, কুয়োতলায় বড় বড় পেতলের গামলা মাজার শব্দ, বাড়ী-সুদ্ধ সবাই শশব্যস্ত, কারো হাতে একদণ্ড সময় নেই।

—ওরে ও ঝি, রেণুর গায়ের জামাটা ছাড়িয়ে নিয়ে কেচে দে না বাপু, কতক্ষণ থেকে বলছি, আমার কি সব সময় সব কথা মনে থাকে?

—ও কমলা, হেলে দুলে বেড়াচ্ছ মা, ততক্ষণ পানগুলো তুমি আর বীণা নিয়ে ধুয়ে ফেল না—এরপর আর সময় পাবে?...কি—কি—আবার মরছে ডেকে ছোট বৌ—মাগো, হাড় জ্বালালে—বসতে দেয় না একরত্তি—এই তো আসছি ভাঁড়ার ঘর থেকে—

একটি সতেরো-আঠারো বছরের সুন্দরী মেয়ে দালানে ঢুকবার দরজার এক পাশে একটা স্টোভ ধরাবার চেষ্টা করছে—আমি পাশ কাটিয়ে দালানের মধ্যে ঢুকে দেখি—মেজ ছেলে বীরেশ্বর ও তার বৌয়ে ঝগড়া হ'চ্ছে। মেজ ছেলে কোন জমিদারী স্টেটের ম্যানেজার, বয়েস পঞ্চাশের ওপর—তার স্ত্রীকে আগে কৃশাঙ্গী দেখেছি, আজ আট ন' বছর দেখিনি —এঁরি মধ্যে এত মোটা হয়েছেন যে প্রথমটা যেন চিনতে পারি না। হাতে মোটা সোনার বালা ও অনন্ত, গলায় ছিকলি হার। তিনি স্বামীকে বলছেন—ও ঘরে আমি থাকতে পারব না, এই ভিড়, তাতে ও ঘরে খিল নেই। আমার মেয়ের গায়ে এক-গা গয়না, কাজের বাড়ী, লোকের ভিড়—বিশ্বাস আছে কাউকে—তাতে এই পাড়াগাঁ জায়গা? বাবা, ভালোয় ভালোয় কাজ মিটিয়ে এখন এখান থেকে বেরুতে পারলে বাঁচি। কাল সারারাত মশায় খেয়েছে।

বীরেশ্বর বলচে, তা তুমি তোমার মেয়েকে নিয়ে না হয় পশ্চিমের কোঠায় শুয়ো—মাথা গরম কোরো না, দোহাই তোমার—তোমার মাথা গরম আমার বরদাস্ত হয় না বাপু—

আমি ঢুকে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে বললুম—চিনতে পারেন কাকীমা?

তিনি কথার উত্তর দেবার পূর্বেই এগারো বছরের একটি মেয়ে কোথা থেকে ছুটে এসে বললে—নাথুনি এখনও পিণ্টুকে দুধ খাওয়ায়নি মা—সকাল থেকে তাকে নিয়ে বাইরের উঠোনে বসে আছে—বললেও শুনচে না—

বীরেশ্বর বললে—যা এখন যা, বলগে যা নাথুনিকে—আমি ডাকছি। এসো কুঞ্জ বসো। ওগো তুমি কুঞ্জকে চিনতে পারলে না?

বীরেশ্বরের স্ত্রী মৃদু হাস্যে বললে—দেখেচি বোধ হয় ওকে ছেলেবেলায়, যাতায়াত নেই—দেখাশুনো তো হয় না, না-চিনবার আর দোষ কি বল? শাশুড়ী মারা না গেলে কি এখন আসা হ'ত? চিঠি পেয়ে আমি বলি—না যেতে হবে বই কি, দেশে একটা মান-খাতির আছে। শাশুড়ীর কাজটা ভালো করে না করলে লোকে ওঁদেরই দুষবে। বট্-ঠাকুরের পয়সা নেই সবাই জানে। ওঁদের গাঁয়ে-ঘরে নাম রয়েছে, দেশে-বিদেশে সবাই মানে, চেনে, বলবে—অমুক বাবুর মায়ের শ্রাদ্ধে কিছুই করেনি, বল তো বাবা, কথাটা কি শুনতে ভালো? তাই তো এলুম, নইলে এসব জায়গায় কি মানুষ আসে? কি মশা! কাল রাত্তিরে একদণ্ড চক্ষের পাতা বুজতে দেয়নি।

রোয়াকের ধারে বসে মেজ ভাইয়ের ছেলে বিকাশ তাদের স্কুল কি ভাবে একটা ফুটবল ম্যাচ্ জিতেছে, মহা-উৎসাহে সে গল্প করছে সেজ ভাইয়ের ছেলে বিনুর কাছে। বড়

ভাইয়ের ছেলে ভোলা অবাক্ দৃষ্টিতে ওদের মুখের দিকে চেয়ে এক মনে গল্প শুনছে। তার বয়েস ওদের চেয়ে যদিও বেশি, কিন্তু জীবনে কখনো সে গাঁয়ের আপার প্রাইমারী পাঠশালা ছাড়া অন্য স্কুলের মুখ দেখেনি। এদের কাছে সে সর্বদা কুণ্ঠিত হ'য়ে আছে। শুধু ভোলা নয়—ভোলার মাকেও লক্ষ্য করলুম,—জায়েদের বড়মানুষি চালচলন ও কথা-বার্তার মধ্যে নিতান্ত সংকুচিত হ'য়ে আছে। জায়েরা বড়মানুষি দেখাবার জন্যে প্রত্যেকে ঝি-চাকর এনেছে, তাদের কাছেও যেন ও-বেচারি কুণ্ঠিত ও সংকুচিত।

হঠাৎ কোথা থেকে বিকাশের ছোট দিদি আরতি ঝড়ের মত এসে বললে—এই যে এখানে বসে গল্প হচ্ছে ছেলের। ওদিকে কাকীমা, দিদি—সব ডেকে ডেকে হয়রান, চা হ'য়ে গেছে, খেয়ে এসে সবার মাথা কেনো, যাও—

ওকে দেখেই আমার একটা ছবি মনে এসে গেল। বৃদ্ধা, মাজা-বাঁকা গাল-তোবড়ানো শশী-ঠাকরুণ কাঁসার বাটি বিক্রয় করতে গিয়ে নিরাশ হয়ে ফিরছে নাপিত-বাড়ী থেকে। এই হাসিমুখ বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী, তরুণী—এদের সৌন্দর্য, সজীবতা, আনন্দ, যৌবন—এদের সৃষ্টি করেছে সেই দরিদ্রা বৃধা শশী-ঠাকরুণ—এরা তারই বংশধর—তারই পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র দৌহিত্রী ; আজ তার মৃত্যু-বাসরে এই যে চাঁদের হাট বসেছে—এতদিন এরা ছিল কোথায়? এরা থাকতে বুড়ী কেন খেতে পেত না, কেন চোখের জলে তার বুক ভেসেছে—তার কোনো উত্তর নেই।

সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার সেই বাড়ীওয়ালা বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বাড়ীর উৎসবের কথাও মনে পড়ে গেল। এইরকমই অগণিত পুত্র, কন্যা, পৌত্র, দৌহিত্র দৌহিত্রীর ভিড় দেখেছি সেখানেও। সবই সেইরকম—কেবল সেটা ছিল জন্মতিথি উৎসব—জন্মতিথি যার, তার বয়েস শশী-ঠাকরুণের মতই প্রায়।

সই

দুপুরে বাসায় শুইয়া আছি, এমন সময় উচ্ছলিত খুশী ও প্রচুর তরল হাস্য-মিশ্রিত তরুণ কণ্ঠস্বরে শুনিতে পাইলাম ; ও সই, সই লো—ও—ও, ক্যামন আছ, ও সই?

পাশের ঘর হইতে আমার ভগ্নি (বিধবা, বয়স ত্রিশের বেশী) হাসির সুরেই বলিল, এস সই এস। ব'স, কি ভাগ্যি যে এ পথে এলে?

—এই তোমার সয়া হাট কত্তি এল। নতুন গুড়ের পাটালি সের দুই করেলো আজ বেন বেলা। ছোট ছেলেডার আবার জ্বর আর ছর্দি। তাই তোমার সয়াকে হাটে পাঠালাম, আমি বলি সইয়ের সঙ্গে কতদিন দেখা হই নি। ছেলেডাকে নিয়ে আর হাটের ভিড়ের মধ্যে ক'নে যাব, সইয়ের বাড়ি একটু বসি।

কথার ভঙ্গিতে মনে হইল দুলে কি বাগদীদের মেয়ে। আমার বোনের সহিত সই পাতানো তাহার পক্ষে আশ্চর্য নয়, কারণ তাহারও শ্বশুরবাড়ী নিকটবর্তী এক পল্লী-গ্রামেই। ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার সুবিধার জন্য শহরের বাসায় থাকে।

দুপুরের ঘুম নষ্ট হইল। বোনের নবাগত সঙ্গীটি লেখাপড়া ভাল করিয়া শিখিলে এ্যানি বেসাণ্ট হইতে পারিত। মুখের তাহার বিরাম নাই। অনবরত বকিয়া যাইতেছে, এবং কথার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে ছেদস্বরূপ বলিতেছে, সই একটা পান দেবা?... দোক্তা খাও না? তা দ্যাও একটা এমনি পানই দ্যাও। ও হাবলা, এই তোর সেই সই-মা চিনতে পেরিলি, হাঁরে বোকা ছোঁড়া? গড় করলি নি যে সই-মাকে? নে, পায়ের ধুলো আর নিতি হবে না, এমনি গড় কর।

পান খাইয়া সে আবার শুরু করিল, ঘরের কত ভাড়া দ্যাও, হ্যাঁ সই? তের টাকা? ও মা, ক'নে যাব। তা কি দরকার তোমার শহরে এত টাকা খরচ করে থাকবার, হ্যাঁ সই?

দিব্যি তোমার ঘরডা-বাড়ীডা রয়েচে গেরমে। আম কাঁঠাল গাছগুলো দেখা-অবানে নষ্ট হয়ে যাবে। ন্যাও সই, মেয়ে যেন তোমায় চাকরি করে নিয়ে খাওয়াবে লেখাপড়া শিখে, হি—হি—হি—হি—বলিয়া সে হাসিয়া লুটাইয়া পড়ে আর কি!

আমার শোবার ঘরের বাহিরের রোয়াকে তাহার হাসি ও বক্তৃতা চলিতেছে, তা-ও এমন উচ্চকণ্ঠে যে, কলকাতা শহরে হইলে ফুটপাতে ভিড় জমিয়া যাইত। আমি একে কাল রাত্রে মশার উপদ্রবে তেমন ঘুমাইতে পারি নাই, এমন বিপদও আসিয়া জোটে, আর জুটিল ঠিক কিনা দুপুর বেলাতেই। ছোট বাসা, অন্য কোন ঘরও নাই যে সেখানে গিয়া ঘুমাই।

—ও সই ছেলেডাকে একটু জল দ্যাও দিকিন, অনেকক্ষণ থে খাবে বলচে। তা ওর আবার লজ্জা দেখলে হয়ে আসে! জল চাবি তোর সই-মার কাছে, তার আবার লজ্জা দেখ না ছেলের?

আমার বোন জল আনিতে ঘরের মধ্যে ঢুকিলে তাহার ছেলেকে আশ্বাসের সুরে বলিতে শুনিলাম—তোর সই-মা কি তোরে এমনি জল দেবে? কিছু খ্যাতি দেবে অখন দেখিস। দেখি? পেটটা পড়ে রয়েচে, অ মোর বাপ, সেই সকালে দুটা পান্তা খেয়োলো, আহা। পাটালি হাটে বিক্কি হলি চাল কিনে নে যাব, এ-বেলা ভাত রাঁধব অখন। এখন তোমার সই-মা যা খাতি দ্যায়, তাই খেয়ে থাক। পয়সা নেই যে, মানিক।

এই সময় আমার বোন জল এবং বোধ হয় বাটিতে একটু গুড় লইয়া রোয়াকে গিয়া উপস্থিত হইল—কারণ শুনিলাম সে ছেলেটিকে বলিতেছে—নে, হাবলা, হাত পাত, গুড়টা খেয়ে জল খা। শুধু জল খেতে নেই।

হাবলা ও হাবলার মা যে একটু নিরাশ হইয়াছে, ইহা আমি তাহাদের গলার সুর হইতেই অনুমান করিলাম। হাবলার মা নিরুৎসাহভাবে বলিল, নে, গুড়টুকু হাতে নে। খেয়ে ফেল্। যেন রোয়াকে না পড়ে—

ঠিক দুপুরের পরই সময়টা, এখন যে কিছু খাইতে দেওয়া প্রয়োজন, এ-কথা আমার বোনের মাথায় আসে নাই বুঝিলাম। তা ছাড়া পল্লীগ্রামে এ-রকম নিয়মও নাই।

—ভালো কথা সই, তোমার জন্যি ভালো নংকার বীজ এনেলাম। এই মোর আঁচলে বাঁধা ছেলো, তা রাস্তার মাঝখানে কোথায় পড়ে গিয়েচে। বাসায় জায়গা আছে গাছপালা দেবার? আসচে হাটবার আবার নিয়ে আসব।

এই সময়ে আমার ছোট ভাগ্নে স্কুল হইতে ফিরিল। টিফিনের ছুটি হইয়াছে, সে সকালে খাইয়া যাইতে পারে নাই বলিয়া ভাত খাইতে আসিয়াছে।

—ও টুলু, চিনতে পার তোমার সই-মারে? হি হি, ও মা ছেলে এরি মধ্যে কত বড় হয়ে গিয়েচে মাথায়। গায়ে এটা কি, জামা? বেশ জামাটা।

আমার ভাগিনেয় এই বয়সেই একটু চালবাজ। গ্রাম হইতে আগত এই সই-মাকে দেখিয়া সে যে খুব খুশি হইয়া উঠিয়াছে, এমন কোন লক্ষণ তাহার ব্যবহারে প্রকাশ পাইল না। তাহার সই-মা বলিল, বেশ জামাটা টুলুর গায়ে। টুলুর আর কোন ছেঁড়া-কাটা জামা-টামা নেই? হ্যাঁ সই? ছেলেডা এই শীতি আদুড় গায়ে থাকে। তোমার সয়া এবার অসুখে পড়ে গাছ কাটতে পারে নি। মোটে দশটা গাছে যা রস হয় তাই জ্বাল দিয়ে সের আড়াই পাটালি হয়। হাট্রা হাটে পাটালির দর নেই, তার ওপর ছ' পয়সা সের। ওই থেকে চাল ডাল, ওই থেকে সব। গাছের আবার খাজনা আছে। ছেলেডাকে একখানা দোলাই কিনে দেব ভাবচি আজ তিন হাটে, কোথা থে দেই বল দিকিন সই? কি রে—কি? হুঁ, উ উ? ছেলের আবার আবদার দেখ না?

আমার বোন বলিল, কি বল্‌চে হাবুল?

—ওর কথা বাদ দ্যাও সই। রাস্তা দিয়ে ওই যে মিন্‌সে চিনির কি বলে ওগুলো—

হাবুল বলিল—গোলাপছড়ি।

—তা যে ছড়িই হোক, ওই ওঁকে কিনে দিতে হবে। না, ও খায় না। কি ছড়ি? গোলাপছড়ি? হি হি, নাম দেখ না?—গোলাপছড়ি।

আমার ভাগ্নের দৃষ্টিও বোধ হয় ইতিমধ্যে গোলাপছড়ির দিকে পড়িয়াছিল। সে ছুটিয়া গিয়া ফিরিওয়ালাকে ডাকিয়া আনিল ও আমায় সটান আসিয়া বলিল—গোলাপছড়ি কিনব, মামা। পয়সা দাও।

বোধ হইল হাবুলও কিছু ভাগ পাইয়াছে, কারণ একটু পরেই হাবুলের মায়ের খুশি-ভরা গলার সুর শুনিতে পাইলাম—ন্যাও, হ'ল তো? কেমন, বেশ মিষ্টি? খাও। পাটালির চেয়ে কি বেশি মিষ্টি? দেখি দে তো একটু গালে দিয়ে? কি জানি, এ-সব কখনও দেখিও নি চক্ষে।

একটু পরে টুলুকে ভাত দিতে তাহার মা রান্নাঘরে চলিয়া গেল। সেই সময়ে শুনিলাম, হাবুল নাকিসুরে বলিতেছে, না, মা, হুঁ। আর তোমারে দেব না। আমি তবে কি খাব?

হাবুলের মা তাহার সইকে আর পাইল না, কারণ ছেলেকে খাওয়াইয়া স্কুলে পাঠাইয়া দিয়া নিজের ঘরের মধ্যে বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে। অনুপস্থিত সইয়ের উদ্দেশ্যে হাবুলের মা আপন মনে অনেক গল্প করিয়া গেল। খানিক পরে শুনিলাম বলিতেছে—ওই, সই ক'নে গেলে? ঘুমুলে না কি? মোরে আর একটা পান দেবা না?

কেহ তাহার কথার উত্তর দিল না।

বেলা তিনটা বাজিয়াছে। আমি বেড়াইতে বাহির হইতে গিয়া দেখি অতি মলিন শাড়ি পরনে এক বাইশ তেইশ বছরের কালো-কোলো মেয়ে একটা চুপড়ি পাশে রাখিয়া ঠিক পৈঠার কাছে বসিয়া আছে। তার ছেলেটিও কাছে বসিয়া তখনও গোলাপছড়ি চুষিতেছে। আমাকে দেখিয়া মেয়েটি থতমত খাইয়া মাথায় ঘোমটা তুলিয়া দিল। দুপুরের বিশ্রামের ব্যাঘাত হওয়ায় মনটা বিরক্ত ছিল, একটু রুক্ষ সুরেই বলিলাম—একটু সরে ব'স পথ থেকে। চুপড়িটা রাস্তার ওপর কেন?

মেয়েটি ভয়ে ও সংকোচে জড়সড় অবস্থায় চুপড়ি সরাইয়া এক পাশে রাখিয়া নিজে যেন একেবারে মাটির সহিত মিশিয়া গেল।

সন্ধ্যার কিছু আগে উকীলদের ক্লাবে টেনিস খেলিয়া বাসায় ফিরিতেছি, দেখি বাসার পাশে বড় রাস্তার ধারে তুঁততলার শুকনো পাতার উপর আমার বোনের সই তাহার ছেলেটিকে লইয়া বসিয়া আছে। পাশে সেই চুপড়ি ও একটা ছোট ময়লা কাপড়। সন্ধ্যা হইবার দেরি নাই, তুঁতগাছের মগডালেও আর রোদ দেখা যায় না। হাবুলের বাপ এখনও পাটালি বিক্রী করিয়া হাট হইতে ফিরে নাই। মেয়েটি যেন কেমন ভরসা-হারা নিরাশ মুখে বসিয়া আছে, অন্ততঃ তেমন হাসিখুশির ভাব আর দেখিলাম না।

রামশরণ দারোগার গল্প

রামশরণবাবু আমাদের সান্ধ্য-আড্ডায় নিত্যই আসেন, কিন্তু কথাবার্তা বড় একটা বলেন না। তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশের কর্মচারী, জীবনে অনেক জিনিসই দেখেছেন, —আমাদের অনেকের চেয়ে বেশি দেখেছেন। কিন্তু তিনি এসেই একটা তাকিয়া আশ্রয় ক'রে সেই যে আড় হয়ে শুয়ে পড়েন, যতক্ষণ না আড্ডার শেষ লোকটি চলে যায়—ততক্ষণ তিনি চোখ বুজে এবং নিজে নির্বাক থেকে অন্য সকলের কথা মন দিয়ে শোনেন।

সেদিন সন্ধ্যা থেকেই মেয়েদের প্রেম ও তার মূল্য—এই ধরনের একটা আলোচনা চলছিল। এ সম্বন্ধে যার যা অভিজ্ঞতা সকলেই কোন-না-কোন ঘটনা বলছে। রামশরণ-বাবু তাকিয়া ঠেস দিয়ে শুয়ে চোখ বুজেই বলে উঠলেন, আমার চাকুরীজীবনে একটা ব্যাপার একবার ঘটেছিল, অনেকদিন হলেও এখনও ভুলিনি। আরও ভুলিনি এই জন্যে যে ব্যাপারটা আমার কাছে একটা সমস্যার মতো চিরকাল রয়ে গিয়েছে, যদিও কত জটিল সমস্যারই মীমাংসা করে বেড়িয়েছি সারা জীবন! বলি শুনুন ঘটনাটা।

আমি তখন থাকি আলমপুর থানায়। কলকাতার অত কাছে, বড় শহরের উপকণ্ঠে, চুরি-জুয়াচুরির আড্ডা বেশি—একথা পুলিশ-কর্মচারী মাত্রই জানেন। এক মাসের মধ্যে কলকাতা পুলিশ থেকে অন্ততঃ সাত বার জিজ্ঞেস করে পাঠাল—আমাদের এলাকার কোন বাগান-বাড়ীতে একজন নোট জাল করছে, তার সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি কি না। আর সাত বার জিজ্ঞেস করে পাঠাল—বাগান-বাড়ীতে বোমার কারখানা বসেছে, আমরা সে বিষয়ে কি খবর রাখি। ফেরারী আসামী তো হরদম পালিয়ে এসে আড্ডা নিচ্ছে আমাদের এলাকায়! একবার তো মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে—কে কার মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে এসে লুকিয়ে রইল থানারই পাশে আমাদের নাকের কাছে—এক খোলার ঘরে। তা ছাড়া বে-আইনী কোকেন্, গুম, টাকা জাল, চোরাই মালের ব্যবসা, গুণ্ডামি প্রভৃতি প্রত্যেক হাঙ্গামার সঙ্গেই কি আলমপুর থানার এলাকাভুক্ত বাগান-বাড়ী ও বস্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক?...অনুসন্ধান করলে দেখা যায়—শতকরা নব্বুইটা হয় সম্পূর্ণ ভিত্তি-হীন, নয়ত আলমপুর থানার ত্রিসীমানায় উক্ত দুর্বৃত্তের দল কখনো পদার্পণ করে নি, তবুও কলকাতা পুলিশের এন্‌কোয়ারীর শিলপের ভিড়ে আমাদের প্রাণ অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠত!

একদিন দুপুরের পর তেমন কাজকর্ম নেই, আমি রোদ পিঠে করে বসে খবরের কাগজ পড়ছি, শীতকাল—এমন সময় গাড়ীর শব্দে মুখ তুলে চেয়ে দেখি—একখানা সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ী থেকে একজন স্ত্রীলোক থানার সামনেই নামছেন। তিনি থানার মধ্যে ঢুকে, আমাকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

—দারোগাবাবু কোথায়?

—বলুন—আমিই।

তখন তিনি একখানা খামের চিঠি আমার হাতে দিলেন। খাম খুলে চিঠিখানায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে স্ত্রীলোকটিকে বসতে বললুম। চিঠি লিখেছেন নারী-কল্যাণ-আশ্রমের বিখ্যাত কর্মী শ্রীযুক্ত যোগেশ চক্রবর্তী। যোগেশবাবু আমার পরিচিত পুরাতন বন্ধুও বটে, তাঁর দ্বারা স্ত্রীলোকঘটিত নানা ঘটনায় পুলিশের অনেক উপকারও হয়েছে বটে। তাঁর বর্তমান পত্রে বিশেষ কিছু লেখা নেই, মাত্র এইটুকু যে, যিনি এই পত্র নিয়ে যাচ্ছেন, তিনি যোগেশবাবুর পরিচিতা; তাঁর বক্তব্য কি, তা শুনে আমি যদি তাঁকে সাহায্য করি—তবে ভালো হয়।

আমরা পুলিশের লোক—কাউকে বিশ্বাস করা আমাদের অভ্যাস নয়! মানুষের চরিত্রের খারাপ দিকটা এত দেখেছি যে—এতে আমাদের দোষ দেওয়া খুব বেশি চলে না। স্ত্রীলোকটিকে একবার ভালো ক'রে চেয়ে দেখে নিয়ে মনে হ'ল তাঁর বয়স চল্লিশের মধ্যে হবে। এক সময়ে খুব রূপসী ছিলেন। খুব সরল চরিত্রের মেয়ে নয়--একটু খেলোয়াড় ধরনের। অবস্থাও খুব ভালো নয়।

জিজ্ঞেস করলুম—আপনি কি চান?

তিনি উত্তরে যা বললেন, সংক্ষেপে তার মর্ম এই যে—এখানকার কোন কালী-মন্দিরের পূজারীর সঙ্গে তাঁর একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের সময় তাঁর অবস্থা

খুব ভালো ছিল না বলেই ওরকম পাত্রে মেয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। মেয়েটি বড়ই কষ্টে আছে। তিনি বর্তমানে মেয়েকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চান—তাঁর নিজের কাছে। যোগেশবাবুর সাহায্যে মেয়েটিকে কোথাও লেখাপড়া কি নার্সের কাজ শেখাবার ব্যবস্থাও করতে পারেন ; মোটের উপর মেয়েকে তিনি এখানে রাখতে রাজী নন, এ বিষয়ে আমাকে তাঁর সাহায্য করতে হবে।

এত সংক্ষেপে তিনি কথাটা আমায় বলেন নি! স্ত্রীলোকটির কথার বাঁধুনি খুব। তাঁর নিজের জীবনের ইতিহাসও কিছু কিছু ওই সঙ্গে আমায় শুনে যেতে হ'ল। তার মধ্যে দুটো কথা প্রধান। এক সময় তাঁর স্বামীর কত টাকা ছিল এবং তিনিও দেখতে এর চেয়ে অনেক ভালো ছিলেন।

আমি বললুম—পুলিশের সাহায্য চান কেন? আপনি নিজেই কেন গিয়ে জামাইকে বলুন না?

তিনি বললেন—অনেকবার বলেছি, জামাই শোনে না, মেয়ে পাঠাবার মত নেই, অথচ তার দুর্দশার একশেষ করছে! আপনি নিজের চোখে গিয়ে দেখলেই সব বুঝবেন। আমি মেয়েমানুষ, আমার কোনো জোর খাটবে না তো, আমার সহায় নেই, সম্পত্তি নেই, কে আমার পক্ষ হ'য়ে দুটো কথা বলবে? তাই যোগেশবাবুকে ধরে আপনার কাছে আসা।

আমি বললুম—দেখুন, এতে পুলিশের কিছু করবার নেই। বিবাহিতা স্ত্রীকে রাখবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে স্বামীর। আপনার জামাই যদি মেয়েকে না আপনার সঙ্গে দেন, আমরা তাতে কি করব?—আপনার মেয়ের মত কি?

স্ত্রীলোকটি একটু ইতস্ততঃ করে বললেন—মেয়েরও মত নয় এখানে থাকা। তারপরে কাঁদো কাঁদো সুরে বললেন—আমার এই উপকারটুকু করুন আপনি। মেয়েকে আমি নিয়ে যাবই। তার কষ্ট আর দেখতে পারিনে। আপনি একটু সহায় না হলে—আমার আর কোনো উপায় নেই—এটুকু দয়া আপনাকে করতেই হবে। মার খেয়ে খেয়ে তার শরীরে আর কিছু নেই।

স্ত্রীলোকটির কথার বাঁধুনি আমার ভালো লাগল না। অনেক রকম লোক দেখেছি, মশাই, ভালো-মন্দ সব রকম দেখে যদি একটু সিনিক হ'য়ে থাকি, তার জন্যে আমাদের বেশী দোষী ঠাওরাবেন না।

শেষ পর্যন্ত কতকটা উপরোধে পড়ে—কতকটা কৌতূহলের বশবর্তী হ'য়ে গেলাম সেই কালীবাড়ী। কিন্তু স্ত্রীলোকটিকে থানায় বসিয়ে রেখে গেলাম। কালী-মন্দিরের কাছেই ছোট্ট একতলা ঘরের একটা কুঠুরীতে পূজারী-ঠাকুর থাকে, সন্ধান নিলাম। পূজারীকে খুঁজে বার করতে বেগ পেতে হ'ল না। বছর পঁয়ত্রিশ বয়েস, একহারা পাক-শিটে চেহারা। এই বয়সেই চুলে বেশ পাক ধরেছে, দেখেই মনে হ'ল—নেশাখোর লোক। ধড়িবাজও বটে।

তাকে সব খুলে বললাম। পুলিশ দেখে সে জড়সড় হয়ে গিয়েছে। কাঁচু-মাচু ভাবে বললে—আজ্ঞে বাড়ীতে যদি আপত্তি না করে, আপনি গিয়ে শাশুড়ী ঠাকরুণকে নিয়ে আসুন আমি পাঠিয়ে দেব। যদি সত্যি কথা জিজ্ঞেস করেন দারোগাবাবু, আমার মোটেই আপত্তি নেই। একটা পেট আমার, যে-কোনো রকমে চালিয়ে নেব। বেশ, আপনি চলুন আমার বাসায়। আমার স্ত্রীকে বলুন—আমি সেখানে থাকব না।

এর পরে আমার এমন একটা অভিজ্ঞতা হ'ল, যা অতদিনের পুলিশ-জীবনে কখনো হয়নি। পূজারী যখন তার স্ত্রীকে দোর খুলতে বললে—আমরা তখন দোরের পাশে, কিন্তু অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে। দোর কে একজন এসে খুলতেই পূজারী-ঠাকুর বললে,

দ্বটি ভদ্রলোক এসেছেন তোমার বাপের বাড়ী থেকে,—তোমার মায়ের কাছ থেকে, ওঁরা তোমাকে কি বলবেন। ওঁদের সঙ্গে কথা বল। আমি একটু জলটল খাওয়ানোর ব্যবস্থা দেখি।

তারপর আমাদের দিকে চেয়ে বললে, আসুন আপনারা,—কথাবার্তা বলুন।… আসচি আমি।

ঘরের মধ্যে আঠরো উনিশ বছরের একটি মেয়ে আধ-ঘোমটা দিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে, বললে বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনে—কিন্তু অমন অপরূপ সুন্দরী মেয়ে আমি তো মশাই আমার জীবনে খুব বেশি যে দেখেছি, এমন মনে হয় না। টকটকে গৌর বর্ণ,—মাথায় ঘন কালো চুলের রাশ, প্রতিমার মতো মুখশ্রী, কি সুন্দর হাত-পায়ের গড়ন,—কি সুন্দর ছোট্ট কপালখানি। আর চোখ—সকলের চেয়ে দেখবার জিনিস তার চোখ, ডাগর ডাগর, ভাসা ভাসা, তুলি দিয়ে আঁকা টানা জোড়া ভুরু। কতদিন হয়ে গিয়েছে—এখনও সে চেহারা চোখের সামনে দেখছি।

ঘরে ঢুকে বললুম—মা, আমাদের দেখে ভয় পেও না, লজ্জাও করো না। আমরা পুলিশের লোক। এখানকার থানা থেকে আসচি! তোমার মা খানিকটা আগে থানায় আসেন এবং আমাদের অনুরোধ করেন—তাঁকে সাহায্য করতে। তিনি তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চান। তিনি থানায় বসে আছেন। তুমি যদি যাবার মত কর, তবে তাঁকে এখানে গাড়ি নিয়ে আসতে বলি।

মেয়েটি একটিবার ঘাড় নেড়ে বললে—আমি যাব না।

ঘরের মধ্যে চার ধারে চেয়ে দেখি—এক কোণে একটা ভাঙ্গা তোরঙ্গ। তোরঙ্গটার ওপরে একটা কাঠ-বাঁধানো পুরানো আয়না ও একটা কাঁচের তেল মাখবার বাটি ; এক কোণে কতকগুলো ছেঁড়া-খুকড়ি লেপ, কাঁথা। ঘরের কড়ি থেকে টাঙানো গোটা দুই দড়ির শিকে। তাতে কলাইকরা জামবাটি বসানো। পেতল কাঁসার চিহ্ন নেই কোথাও। দারিদ্র্যের এমন রূপ আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হ'ল না।

মেয়েটির উত্তর শুনে বললুম—মা, যদি তোমার স্বামীর মতামতের বিষয়ে তোমার সন্দেহ থাকে, আমি বলচি তোমার মা যদি তোমায় নিয়ে যন, তোমার স্বামীর তাতে অমত নেই। আমার কাছে তিনি বলেছেন একথা। আসবার সময় সে-সব কথা হ'য়ে গিয়েছে।—কোনো ভয় নেই। নির্ভয়ে তুমি চলে আসতে পার। আর এখানে যে কষ্টে আছো দেখচি, তাতে আমার মনে হয়—তোমার যাওয়াই ভালো।

সে এবারও ঘাড় নেড়ে বললে—না, আপনি মাকে গিয়ে বলুন—আমার যাওয়া হবে না।

সে সুরের দৃঢ়তা এমনি যে, তার ওপর আর বিশেষ কিছু বলা চলে না। তবুও আর একবার বললুম—দেখ মা, বেশ করে ভেবে দেখো, তোমার মা এসেচেন অনেক আশা করে। আমাদের সাহায্য চেয়েচেন বলেই আমরা এসেচি। অবিশ্যি এটাও আমরা দেখবো তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে গেলে, তোমার স্বামী তোমার ওপর কোনো রূঢ় আচরণ না করেন। সে বিষয়ে তুমি নির্ভয়ে থাকতে পার।

মেয়েটি মুখ নিচু করে এবারও ঠিক আগের মতো সুরেই বললে—না আমি যাব না।

আমার কেমন একটু রাগ হ'ল—পুলিশে কাজ করে করে একটা বদ অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল—কারোর প্রতিবাদ সহ্য করতে পারতাম না। একটু বিরক্তির সুরে বললুম—এই কষ্টে থাকবে, সেও ভালো? যাবে না তবুও? মেয়েটি চুপ করে রইলো। বেশ, না যাবি মরগে যা, তাতে আমার কি? বললুম—তা হ'লে একটা কাজ কর—না যাও সে তোমার ইচ্ছে। আমাদের কিছু বলবার বা জোর করবার নেই। তুমি একখানা পত্র লেখ তোমার

মাকে, যে আমরা তোমাকে যাবার জন্যে অনুরোধ করেছিলুম,—তুমি যেতে রাজী হওনি, আমরা থানায় নিয়ে তাঁকে দেখাব।

কাগজ কলম আমরা দিলাম। মেয়েটি মেঝের ওপর বসে চিঠি লিখতে লাগল। ওর সুগৌর হাত দুটির ওপর সেই সময় ভালো ক'রে চোখ পড়তে দেখি একজোড়া রাঙা কড় ও নোয়া ছাড়া এমন সুশ্রী সুডৌল হাতে আর কিছু নেই।

আরও কষ্ট হ'ল ঘরের মেঝের অবস্থা দেখে। কি বিশ্রী সেঁতসেঁতে মেঝে, সপসপ করছে ভিজে। সদা-সর্বদা যেন জল উঠছে। এই মেঝের ওপর বিনা খাটে শোয় কি করে—এ আমার বুদ্ধির অতীত। অত্যন্ত সুস্থ লোকও তিন দিন এ রকমের শুধু মেঝের ওপর যদি শুয়ে থাকে, সে নিশ্চয়ই একটা কঠিন অসুখে পড়বে।

কথাটা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ অবাক হ'য়ে চেয়ে দেখি—মেয়েটি মুখ নিচু করে, পা ছড়িয়ে মেয়েলি ধরনে বাঁ-হাতের কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে একদিকে কাত হ'য়ে বসে চিঠি লিখছে আর তার ডাগর চোখ দুটি বেয়ে টস্ টস্ করে জল পড়ছে, দু' এক ফোঁটা জল চিঠির ওপরও পড়ল।

পুলিশের চাকুরিতে মন বেশ একটু কঠিন হ'য়ে গিয়েছিল বটে, তবু মেয়েটির নিঃশব্দ কান্না দেখে, ওর সংসারের এই নগ্ন দারিদ্র্য, নিরাভরণ ওই হাত দু'টি, এই সেঁতসেঁতে ঘরের মেঝে, ভাঙ্গা আয়নাখানা, ওই ধুকড়ি লেপ কাঁথা দেখে, তার ওপর ওর গাঁজাখোর মুর্খ স্বামীর কথা মনে হয়ে—না মশাই আপনারা বললে বিশ্বাস করবেন না—সুরটা নরম করেই বললুম—এই তো, মাকে চিঠি লিখতেই তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। তবে কেন চল না, তাঁর সঙ্গে?

আমার সহানুভূতির সুর বোধ হয় ওর হৃদয় স্পর্শ করলে, বললে, সেখানে এর চেয়েও কষ্ট।

ওর সেই দৃষ্টিতে হতাশা, ঔদাসীন্য, মরীয়াভাব—সব একসঙ্গে জড়ানো।

অবাক্ হ'য়ে বললুম—এর চেয়েও কষ্ট! এর চেয়ে আর কি কষ্ট থাকতে পারে?

মেয়েটি শান্ত, স্থির সুরে বললে—আপনি সব কথা জানেন না, বললুম যে আরও অনেক কথা আছে এর মধ্যে! সে সব কথা বলতে চাইনে। মাকে আমার প্রণাম জানাবেন আর বলবেন, তোমার মেয়ে মরেচে আর তার খোঁজ কোরো না—

কথাটার শেষের দিকে রুদ্ধ-কান্নায় ওর গলার সুর আটকে গেল। আমিও চিঠিখানা নিয়ে সে স্থান ত্যাগ করলুম। পথে দেখি পূজারী-ঠাকুর একটা শালপাতার ঠোঙা হাতে আসছে, আমাদের দেখে দাঁত বার করে বললে—হেঁ হেঁ, কি হ'ল দারোগাবাবু? যা বলেচি, তাই হ'ল কিনা? তা এখুনি চললেন যে......? একটু যৎসামান্য মিষ্টিমুখ—

ওর ওপর রাগ কি হিংসে—কি হ'ল জানিনে। তার সে সব আপ্যায়নের কথা রূঢ়-ভাবে মাঝ পথেই থামিয়ে দিয়ে বললুম—ওসব থাক্। একটা কথা বলি শোন ঠাকুর, কাল থানায় যেয়ো সকাল বেলা। একটা তক্তপোশ সস্তায় নীলাম হবে। দাম তুমি যখন হয় দিও, কাল গিয়ে নিয়ে এসো সেখানা। বুঝলে?

পূজারী-ঠাকুর অবিশ্যি নিজের কাজ ভোলেনি। পরদিন সকালে এসে খাটখানা নিয়ে গিয়েছিল। এইখানেই আমার গল্পের শেষ।

আমরা এতক্ষণ একমনে শুনছিলুম। রামশরণবাবু চুপ করলে আমরা একজোটে জিজ্ঞেস করলুম—আপনি আর কখনো সে মেয়েটিকে দেখতে যান নি?......

রামশরণবাবু বললেন—আর কিছুদিন আলমপুরে থাকলে হয়তো যেতুম। কিন্তু এর অল্পদিনের মধ্যে বদলির হুকুম পেয়ে আলমপুর ছাড়তে হ'ল। তারপরে সে মেয়েটির আর কোন খবর জানি না। মেয়েটি কেন মায়ের সঙ্গে যেতে চাইলে না, আমি আজও বুঝতে পারিনে।

খুড়ীমা

খুব বর্ষা নামিয়াছে।

দিনরাত টিপটিপ বৃষ্টি।

আমি চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসিয়া অঙ্ক কষিতেছি। বেলা প্রায় দুপুর হইতে চলিল। বর্ষা-বাদল না হইলে বিনোদমাস্টারের কাছে ছুটি পাওয়া যাইত। কিন্তু কি বাদলই নামিয়াছে আজ তিন দিন হইতে আমার ভাগ্যে।

এমন সময়ে কোথা হইতে একটা ময়লা-কাপড়-পরা লোক আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপের সামনের উঠানে দাঁড়াইল এবং আমার দিকে চাহিয়া ফিক করিয়া হাসিল। আজও মনে আছে—লোকটির গায়ে একটা ময়লা চিটচিটে কামিজ, খালি পা, রুক্ষ চুল। বয়স বুঝিবার উপায় নাই, অন্তত আমার পক্ষে।

আমি লোকটাকে আর কখনও দেখি নাই, কারণ বাবা-মা এখানে থাকিলেও, দিদিমা আমায় ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না বলিয়া এতদিন ছিলাম মামার বাড়ীতেই! এ-গ্রামে আমি আসিয়াছি বেশী দিন নয়। যখন চলিয়া গিয়াছিলাম তখন আমার বয়স মাত্র ছ-বছর।

বিনোদ-মাস্টার বলিল—কি পরেশ, কি খবর?

লোকটা উঠানে দাঁড়াইয়া বৃষ্টিতে ভিজিতেছে দেখিয়া বলিতে গেলাম—আসুন না ওপরে—

কিন্তু বিনোদ-মাস্টার আমার কথায় বাধা দিয়া বলিল—কি চাই পরেশ? লোকটা আর একবার কেমন এক ধরনের হাসিল। এই প্রশ্নের উত্তরে যে-ধরনের হাসা উচিত ছিল তেমন নয়—যেন নিজের প্রশংসা শুনিয়া বিনীত ও লাজুক হাসি হাসিতেছে। ছেলেমানুষ হইলেও বুঝিলাম হাসিটা অসংলগ্ন ধরনের।

বলিল—খিদে পেয়েছে।

আমার জাঠতুতো ভাই শীতল বাড়ীর ভিতর হইতে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া উঠানের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—এই যে পরেশকাকা কোথা থেকে? কোথায় ছিলেন এতদিন?

লোকটি উত্তরে শুধু বলিল—খিদে পেয়েছে।

শীতল বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া এক বাটি মুড়ি আনিয়া লোকটার কোঁচার কাপড়ে ঢালিয়া দিল। আমি অবাক্ হইয়া ভাবিতেছি লোকটা কে, এবং এত সম্মানসূচক সম্বোধন করিতেছে শীতল-দা অথচ বসিতে বলিতেছে না-ই বা কেন, এমন সময় লোকটা একটা কাণ্ড করিয়া বসিল। শীতলদা'র দেওয়া মুড়ির এক গাল মাত্র খাইয়া বাকিগুলি একবার রাইট-য়্যাবাউট্-টার্ণ করিয়া ঘুরপাক খাইয়া উঠানময় কাদার উপর ছড়াইয়া ফেলিল—সঙ্গে সঙ্গে কি একটা দুর্বোধ্য ছড়া উচ্চারণ করিল গান করার সুরে—

গুগ্‌লি ঝিনুক ঝা—
খোদার চাল গামছায় বাঁধি
গুগ্‌লি ঝিনুক ঝা—
গুগ্‌লি ঝিনুক—
গুগ্‌লি ঝিনুক—

তখনও সে ঘুরপাক খাইতেছে ও ছড়া বলিতেছে, এমন সময় আমার জ্যাঠামহাশয় দুর্লভ রায়—তিনি অত্যন্ত রাশভারী ও কড়া মেজাজের লোক—বাড়ীর ভিতর চণ্ডীমণ্ডপের পাশের উঠান হইতে অন্দরে যাইবার দরজায় দাঁড়াইয়া হাঁক দিয়া বলিলেন—কে

চেঁচামেচি করে দুপুরবেলা? ও, পাগ্‌লাটা? মুড়িগুলো নিলে, তবে কেন ও-রকম করে ফেললে যে বড়— বদমায়েশী করবার আর জায়গা পাও নি?

বলিয়া তিনি আসিয়া লোকটার গালে ঠাস্‌ ঠাস্‌ করিয়া কয়েক ঘা চড় মারিলেন, পরে তাহাকে সজোরে একটা ধাক্কা দিয়া বলিলেন, "বেরোও এখান থেকে, আর কোনদিন দরজায় ঢুকেছ তো মেরে হাড় গুঁড়ো করব"—আমার বলিষ্ঠ জ্যাঠামহাশয়ের ধাক্কার বেগে রোগা ও পাতলা লোকটা খানিকটা দূরে ছিটকাইয়া গিয়া কাদায়-পিছল উঠানের উপর পড়িয়া যাইতে যাইতে বাঁচিয়া গেল এবং একটু সামলাইয়া লইয়া দাঁড়াইয়া মাটিতে একবার থুতু ফেলিল—রক্তে রাঙা।

ইতিমধ্যে মজা দেখিতে আমাদের বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা উঠানের দরজায় জড় হইয়াছিল—লোকটা ধাক্কা খাইয়া ছিটকাইয়া পড়িতেই তাহারা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

লোকটার উপর সহানুভূতিতে আমার মনটা গলিয়া গেল।

পরেশ-কাকার সহিত এই ভাবেই আমার প্রথম পরিচয়।

ক্রমে জানিলাম পরেশ-কাকা এই গাঁয়েরই মুখুজ্যেবাড়ীর ছেলে, পশ্চিমে কোথায় যেন চাকুরি করিত, বয়স বেশি নয়—এই মাত্র পঁচিশ! হঠাৎ আজ বছর-দুই মাথা খারাপ হওয়ার দরুন চাকুরি ছাড়িয়া আসিয়া পথে-পথে পাগলামি করিয়া ঘুরিতেছে। তাহাকে দেখিবার কেহ নাই, সে যে-বাড়ীর ছেলে তাহাদের সকলেই বিদেশে কাজকর্ম করে, এখানে কেহ থাকে না, উন্মাদ ভাইকে বাসায় লইয়া যাইবার গরজও কেহ এ-পর্যন্ত দেখায় নাই। পাগল পরের বাড়ী ভাত চাহিয়া খায়, সব দিন লোক দেয় না, মাঝে মাঝে মার-ধোরও খায়।

একদিন নদীর ধারে পাখির ছানা খুঁজিতে গিয়াছি একাই। আমায় একজন সন্ধান দিয়াছিল গাঙের উঁচু পাড়ে গাং-শালিকের অনেক বাসা দেখা যায়। অনেক খুঁজিয়াও পাইলাম না।

সন্ধ্যা হয়-হয়। রোদ আর গাছের উপরও দেখা যায় না। নদীর পাড়ে ঘন-ছায়া নামিয়াছে। বাড়ী ফিরিতে যাইব, দেখি নদীর ধারে চটকাতলার শ্মশানে গ্রামের প্রহ্লাদ কলুর বৌ যে ছোট টিনের চালাখানা তৈরি করিয়া দিয়াছে, তাহারই মধ্যে কে বসিয়া আছে।

ভয় হইল। ভূত নয় তো?

একটু আগাইয়া গিয়া ভালো করিয়া দেখি ভূত নয়, পরেশ-কাকা। ঘরের মেজেতে শ্মশানের পরিত্যক্ত একখানা জীর্ণ মাদুর পাতিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

আমাকে দেখিয়া বলিল—পয়সা আছে কাছে?

পরেশ-কাকাকে ভয় করিয়া সবাই এড়াইয়া চলে, কিন্তু আমি সাহস করিয়া কাছে গেলাম। আমি জানি পরেশ-কাকা এ-পর্যন্ত মার খাইয়াছে, মারে নাই কাহাকেও। আহা, পরেশ-কাকার পিঠে একটা দগ্‌দগে ঘা, ঘায়ে মাছি বসিতেছে. পাশে একটা মালসায় কতকগুলি ডালভাত, তাহাতেও মাছি বসিতেছে।

বলিলাম—এ জঙ্গলের মধ্যে আছেন কেন কাকা? আসবেন আমাদের বাড়ী? আসুন, শ্মশানে থাকে না—

পরেশ-কাকা বলিল—দূর, শ্মশান বুঝি, এ তো আমার বৈঠকখানা। ওদিকে বাড়ী রয়েছে, দো-মহলা বাড়ী। দু-হাজার টাকা জমা রেখেছি দাদার কাছে। বৌদিদির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে কিনা তাই দিচ্ছে না। ঝগড়া মিটে গেলেই দিয়ে দেবে। পাঁচ বছর চাকরি করে টাকা জমাই নি ভেবেছিস?

কত করিয়া খোশামোদ করিলাম, পরেশ-কাকা মড়ার মাদুর ছাড়িয়া কিছুতে উঠিল না।

ইহার কিছুদিন পরে শুনিলাম পরেশ-কাকার মামারা আসিয়া তাহাকে হুগলি লইয়া গিয়াছে।

দুই বৎসর পরে আমার উপনয়নের দিন ভোজে পরেশ-কাকাকে ব্রাহ্মণদের পংক্তিতে পরিবেশন করিতে দেখিলাম। শুনিলাম তাহার রোগ সম্পূর্ণ সারিয়া গিয়াছে, মামারা অনেক ডাক্তার কবিরাজ দেখাইয়াছিল, এবং অনেক পয়সাকড়ি খরচ করিয়াছিল।

কি সুন্দর চেহারা হইয়াছে পরেশ-কাকার। পরেশ-কাকা যে এত সুপুরুষ, পাগল অবস্থায় ছেঁড়া নেকড়া পরনে, গায়ে কাদা-ধুলা মাখিয়া বেড়াইত বলিয়াই আমি বুঝিতে পারি নাই। বলিষ্ঠ একহারা গড়ন, রং টকটকে গৌরবর্ণ, মুখশ্রী সুন্দর, দেখিয়া খুশি হইলাম।

কিছুদিন পরে ঘটা করিয়া পরেশ-কাকার বিবাহ হইল। শুনিলাম নববধূ কলিকাতার কোন অবস্থাপন্ন গৃহস্থ বাড়ীর মেয়ে! বৈকালে খুব ঝড়-বৃষ্টি হওয়ার দরুন বর বধূর পৌঁছিতে এক প্রহর রাত্রি হইয়া গেল। আলো জ্বালিয়া বরণ হইল। এসিটিলিন গ্যাসের আলোতে আমরা নববধূর মুখ দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম—এ-সব অঞ্চলে অমন সুন্দরী মেয়ে কখনও দেখি নাই। সকলেই একবাক্যে বলিল—বৌ না পরী, পরেশের বহু জন্মের ভাগ্যে এমন বৌ মিলিয়াছে।

বিবাহের কিছুদিন পরে পরেশ-কাকার বৌ বাপের বাড়ী চলিয়া গেলেন। মাস-দুই পরে আবার আসিলেন।

সকালে পরেশ-কাকাদের বাড়ী বেড়াইতে গেলাম। তাহাদের বাড়ীর সকলে তখন কি-একটা ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছে। অনেকে আমার বয়সী ছেলেমেয়ে।

নতুন খুড়ীমা বারান্দায় বসিয়া কুটনো কুটিতেছেন। জরিপাড় শাড়ি পরনে আমাদের স্কুলে সরস্বতী-প্রতিমা গড়ানো হইয়াছিল এবার, ঠিক যেন প্রতিমার মতো মুখশ্রী।

আমরা সামনে উঠানে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছিলাম। পরেশ-কাকার বৌ ওখানে বসিয়া থাকাতে সেদিন আমার যেন উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। ইচ্ছা হইল, কত কি অসম্ভব কাজ করিয়া খুড়ীমাকে খুশি করি। সে কি লাফঝাঁপ, কি দৌড়াদৌড়ি, কি চেঁচামেচি শুরু করিয়া দিলাম হঠাৎ! গায়ে যেন দশজনের বল আসিল।

এমন সময় শুনিলাম পরেশ-কাকার বৌ বাড়ীর ছেলে নেপালকে বলিতেছেন—ওই ফর্সা ছেলেটি কে নেপাল? বেশ চোখ-দুটি—

নেপাল বলিল—ওপাড়ার গাঙ্গুলি-বাড়ীর পাবু—

পরেশ-কাকার বৌ বলিলেন—ডাক না ওকে?

আনন্দে আমার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করিতে লাগিল। মুখ আগেই রোদে ছুটা-ছুটিতে রাঙা হইয়াছিল, এখন তা আরও রাঙা হইয়া উঠিল লজ্জায়। অথচ কিসের লজ্জা!

গিয়া প্রথমেই একটি প্রণাম করিলাম। পরেশ-কাকার বৌ বলিলেন—তোমার নাম কি? পাবু? ভালো নাম কি?

লজ্জা ও সংকোচের হাসি হাসিয়া বলিলাম—বাণীব্রত—

তিনি বলিলেন—বাঃ, বেশ সুন্দর নাম। যেমন দেখতে সুন্দর, তেমনিই নাম। পড় তো? বেশ, বেশ। এখানে এস খেলা করতে রোজ। আসবে?

সেরাত্রে আনন্দে আমার বোধ হয় ভালো করিয়া ঘুম হয় নাই। যেন কোন্ স্বর্গের

দেবী কি রূপকথার রাজকুমারী যাচিয়া আমার সঙ্গে ভাব করিয়াছেন। অমন রূপ কি মানুষের হয়।

ইহার পরদিন হইতে পরেশ-কাকাদের বাড়ী রোজ যাইতে আরম্ভ করিলাম, দিন নাই, দুপুর নাই, সকাল নাই। কি ভাবই হইয়া গেল খুড়ীমার সঙ্গে! আমার বয়েস তখন বারো, খুড়ীমার কত বয়স বুঝিতাম না, এখন মনে হয় তাঁর বয়স ছিল আঠার-উনিশ।

বিবাহের পর-বৎসর গ্রামে খবর আসিল পরেশ-কাকা বিদেশে চাকুরিস্থলে আবার পাগল হইয়া গিয়াছেন। খুড়ীমা তখন মাস-দুই বাপের বাড়ী। পাগল হইবার সংবাদ শুনিয়া বাপের সঙ্গে তিনি স্বামীর কর্মস্থানে গিয়াছিলেন, কিন্তু গিয়া দেখেন পরেশ-কাকাকে পাগলাগারদে পাঠান হইয়াছে। খুড়ীমার সঙ্গে তার দেখা হয় নাই। খুড়ীমার বাবা মেয়েকে পাগলাগারদে লইয়া গিয়া জামাইয়ের সঙ্গে দেখা করাইয়া দিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। সব ব্যাপার মিটিয়া গেলে তিনি মেয়েকে লইয়া ফিরিলেন।

পরেশ-কাকার বড় ভ্রাতৃবধূ তখন ছেলেমেয়ে লইয়া গ্রামের বাড়ীতেই ছিলেন, তিনি পত্র লিখিয়া পরেশ-কাকার বৌকে মাস-দুই পরে আনাইলেন। খুড়ীমার আসিবার সংবাদ পাইয়া সকালে উঠিয়াই ছুটিয়া দেখা করিতে গেলাম। তাঁর মুখে ও চেহারায় দুঃখের কোন চিহ্ন দেখিলাম না, তেমনই হাসি-হাসি মুখ, মুখশ্রী তেমনি সুকুমার, বিদ্যুতের মতো রং এতটুকু ম্লান হয় নাই। কি স্নেহ ও আদরের দৃষ্টি তাঁর চোখে, আমি পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিতেই তিনি আমার চিবুকে হাত দিয়া হাসিমুখে বলিলেন—এই যে পাবু, কেমন আছ? একটু রোগা দেখছি যে!

আমি উত্তরে হাসিয়া খুড়ীমার সামনে মেজের উপরে বসিয়া পড়িলাম। বলিলাম—আপনি ভালো ছিলেন খুড়ীমা?

খুড়ীমা বলিলেন—আমার আর ভালো থাকাথাকি, তুমিও যেমন পাবু!

পরেশ-কাকা পাগল হইয়াছেন সে-কথা ভাবিয়া খুড়ীমার জন্য দুঃখ-হইল। অভাগিনী খুড়ীমা!

খুড়ীমা বলিলেন—কাছে সরে এসে বসো পাবু। পাবু আমাকে বড় ভালোবাস—না?

ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিলাম খুব ভালোবাসি।

—আমিও কলকাতায় থাকতে পাবুর কথা বড় ভাবি। পাবু, এ গাঁয়ে তোর মতো ভালোবাসে না কেউ আমায়।

লজ্জায় রাঙা হইয়া হাসিমুখে চুপ করিয়া থাকিলাম। তেরো বছরের ছেলে কি কথাই বা জানি!

—কলকাতা দেখেছ পাবু?

—না, কে নিয়ে যাবে?

—আচ্ছা, এবার আমি যখন যাব এখান থেকে, নিয়ে যাব সঙ্গে করে। বেশ আমাদের বাড়ী গিয়ে থাকবে, কেমন তো?

—কবে যাবেন খুড়ীমা? শ্রাবণ মাসে? না এখন কিছুদিন থাকুন এখানে। যাবেন না এখন।

—কেন বল তো?

হাসিয়া তাঁহার মুখের দিকে না চাহিয়া বলিলাম—আপনি থাকলে বেশ লাগে।

নতুন বামুন হইয়াছি। তখনও একাদশী ছাড়ি নাই, যদিও এক বৎসরের বেশি উপনয়ন হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক একাদশীতে খুড়ীমা নিমন্ত্রণ করিয়া আমায় খাওয়াইতেন। নিজের হাতে আমার জন্য খাবার করিয়া রাখেন, কোনদিন মোহনভোগ, কোনদিন নিমকি কি কচুরি, বৈকালে বেড়াইতে গেলে কাছে বসিয়া যত্ন করিয়া খাইতে

দেন। অনেক রকম ব্রত করিতেন, তাঁর ব্রতের বামুন আমিই। পৈতে ও পয়সা কত জমা হইয়া গেল আমার টিনের ছোট বাক্সটাতে।

আমিও অবসর পাইলেই খুড়ীমার কাছে ছুটিয়া যাইতাম, ছাদের কোণে বসিয়া কত আবোল-তাবোল বকিতাম তাঁর সঙ্গে। বই পড়িয়া শোনাইতাম। খুড়ীমা বেশ ভালই লেখাপড়া জানিতেন, কিন্তু বলিতেন—পাবু, তুই পড়ে শোনা দিকি? ভারি ভালো লাগে আমার তোর মুখে বই-পড়া শুনতে! তোর গলার সুর ভারি মিষ্টি—

আমাদের গ্রামে সে-বার "নিমাই-সন্ন্যাস" পালা হইয়াছিল বারোয়ারিতে। পালাটার মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়ার একটা গান চমৎকার লাগিয়াছিল বলিয়া শিখিয়া লইয়াছিলাম, এবং বেশ ভালো গাহিতে পারিতাম।

নয়নে কখনো হেরিব না নাথ,
দেখা হবে মনে মনে।
আমার নিশীথ স্বপনে এসো।
এসো তন্দ্রা আবরণে।

খুড়ীমা প্রায়ই বলিতেন—পাবু, সেই গানটা গাও তো?

গ্রামের লোকে অনেকে কিন্তু খুড়ীমাকে দেখিতে পারিত না।

আমার কানেও এ-রকম কথা গিয়াছে।

একবার রায়-বাড়ীর বড়গিন্নীকে বলিতে শুনিলাম—কি জানি বাপু জানি নে, ও সব কলকেতার কান্ড। সোয়ামি যার পাগলাগারদে, তার অত চুলবাঁধার ঘটাই বা কিসের, অত পাতাকাটার বাহারই বা কিসের, এত হাসিখুশিই বা আসে কোথা থেকে! কিবে ঢং, কিবে শাড়ির রং—না বাপু, আমার তো ভালো লাগে না—তবে আমরা সেকেলে বুড়োহাবড়া, কলকেতার ফেশিয়ান্ তো জানি নি?

এ-রকম কথা আমি আরও শুনিয়াছি অন্য-অন্য লোকের মুখে।

মনে হইত তাদের নাকে ঘুষি লাগাইয়া দিই, তাদের সঙ্গে ঝগড়া করি, তাদের বলি—না, তোমরা জান না। তোমাদের মিথ্যে কথা। তোমাদের অনেকের চেয়ে খুড়ীমা ভালো—খুব ভালো।

কিন্তু যাহারা বলে তাহারা গ্রামসম্পর্কে গুরুজন, বয়স অনেক বেশি। কাজেই চুপ করিয়া থাকিতাম।

তাঁহার চেহারা, মুখশ্রী এতকাল পরে আমার খুব যে স্পষ্ট মনে আছে তা নয়। কেবল একদিনের তাঁর অপূর্ব কৌতুকোজ্জ্বল হাসিমুখ গভীর ভাবে আমার মনে ছাপ দিয়াছিল। যখন সে-মুখ মনে পড়ে তখন একটি উনিশ-কুড়ি বছরের কৌতুকপ্রিয়া, হাস্য-মুখী সুন্দরী তরুণীকে চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিতে পাই।

সে-বার আমাদের গ্রামে কোথা হইতে এক দল পঙ্গপাল আসিয়াছিল। গাছপালা, বাঁশবন, সজনেগাছ, ঝোপঝাপ পঙ্গপালে ছাইয়া ফেলিল। খুড়ীমা ও আমি ছাদে দাঁড়াইয়া এ-দৃশ্য দেখিতেছিলাম—দু'জনের কেহই আর কখনও পঙ্গপাল দেখি নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। হঠাৎ খুড়ীমা বিস্ময়ে ও কৌতুকে আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া বলিলেন—ও পাবু, দ্যাখ্ দ্যাখ্—রায়দের নিমগাছে একটা পাতাও রাখে নি, শুধু গুঁড়ি আর ডাল, এমন কান্ড তো কখনও দেখি নি—ও মাগো।

বলিয়াই কৌতুকে ও আনন্দে বালিকার মতো খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তাঁর এই হাসিমুখটিই আমার মনে আছে।

বর্ষা কাটিয়া শরৎ পড়িল। আমাদের নদীর দু-ধারে কাশফুল ফুটিয়া আলো করিল। আকাশ নীল, লঘু শুভ্র মেঘখন্ড বাদামবনীর চরের দিক হইতে উড়িয়া আসে, আমাদের

সায়েরের ঘাটের উপর দিয়া, গিরীশ-জ্যাঠাদের বড় আমবাগানের উপর দিয়া শুভরত্নপুরের মাঠের দিকে কোথায় উড়িয়া যায়...বড় বড় মহাজনী কিস্তী নদী বাহিয়া যাতায়াত শুরু করিয়াছে, কয়ালরা ধান মাপিতে দিনরাত বড় ব্যস্ত।

খুড়ীমা আমাদের গ্রামেই রহিয়া গেলেন। পরেশ-কাকাও পাগলাগারদ হইতে বাহির হইলেন না। খুড়ীমাদের বাড়ী তাঁর ননদের এক দেওর আসিল পূজার সময়, নাম শান্তিরাম, বয়স চব্বিশ-পঁচিশ, দেখিতে চেহারাটা ভালোই। অল্প দিনের জন্য এখানে বেড়াইতে আসিয়া কেন যে কুটুম্ববাড়ী ছাড়িয়া আর নড়িতে চায় না, যাইলেও অল্প দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া আবার কিছুকাল কাটাইয়া যায়—ইহার কারণ আমি কিছু বলিতে পারিব না—কেবল ইহা শুনিলাম যে গ্রামে তার নামের সঙ্গে খুড়ীমার নাম জড়াইয়া একটা কুকথা লোকে রটনা করিতেছে। একদিন দুপুরের পরে খুড়ীমাদের বাড়ী গিয়াছি। পিছনের রোয়াকে পেঁপেতলার জানালার ধারে খুড়ীমা বসিয়া আছেন, শান্তিরাম বাহিরের রোয়াকে দাঁড়াইয়া জানালার গরাদ ধরিয়া খুড়ীমার সঙ্গে আস্তে আস্তে এক-মনে কি কথা বলিতেছে—আমাকে দেখিয়া বিরক্তির সুরে বলিল—কি পাবু, দুপুরবেলা বেড়ানো কি? পড়াশুনো করো না? যাও, এখন যাও—

আমি শান্তিরামের কাছে যাই নাই, গিয়াছি খুড়ীমার কাছে। কিন্তু আমার দুঃখ হইল যে, খুড়ীমা ইহার প্রতিবাদে একটি কথাও বলিলেন না—আমি তখনই ওদের বাড়ী হইতে চলিয়া আসিলাম। ভয়ানক অভিমান হইল খুড়ীমার উপর—তাঁর কি একটা কথাও বলা উচিত ছিল না?

ইহার পর খুড়ীমাদের বাড়ী যাওয়া একেবারে বন্ধ না করিলেও কমাইয়া দিলাম। খুড়ীমাকে আর তেমন করিয়া পাই না ; শান্তিরাম আজকাল দেখি সময় নাই, অসময় নাই, ছাদে কি সিঁড়ির ঘরে বসিয়া খুড়ীমার সহিত গল্প করিতেছে—আমার যাওয়াটা সে যেন তেমন পছন্দ করে না। খুড়ীমাও যেন শান্তিরামের কথার উপর কোন কথা জোর করিয়া বলিতে পারেন না।

খুড়ীমার নামে পাড়ায় পাড়ায় যে-কথা রটনা হইতেছে, তাহা আমার কানে প্রতিদিনই যায়। লক্ষ্য করিলাম, ইহার জন্য খুড়ীমার উপর আমার কোনই রাগ নাই, যত রাগ শান্তিরামের উপর। সে দেখিতে ফর্সা বটে, বেশ শহুরে-ধরনের গোছালো কথাবার্তাও কয় বটে, শৌখীন সাজপোশাকও করে বটে কিন্তু হয়ত তাহার ফিট্‌ফাট সাজগোজের দরুনই হোক, কিংবা তাহার শহর-অঞ্চলের বুলির জন্যই হোক, কিংবা তাহার ঘন ঘন বার্ডসাই খাওয়ার দরুনই হোক, লোকটাকে প্রথম দিন হইতেই আমি কেমন পছন্দ করি নাই। কেমন যেন মনে হইয়াছিল এ লোক ভালো না।

একদিন চৌধুরীদের পুকুরঘাটে বাঁধানো-রাণায় সর্ব চৌধুরী ও কালীময় বাঁড়ুয্যে কি কথা বলিতেছিল—আমি পুঁটি-মাছ-মারা ছিপ-হাতে মাছ ধরিতে গিয়াছি—আমাকে দেখিয়া উহারা কথা বন্ধ করিল। আমি বাঁধানো ঘাটে নামিয়া মাছ ধরিতে বসিলাম। সর্ব চৌধুরী বলিল—তাই তো, ছোঁড়াটা যে আবার এখানে।

কালীময়-জ্যাঠা বলিলেন—বল, বল, ও ছেলেমানুষ, কিছু বোঝে না।

সর্ব চৌধুরী বলিলেন—এখন কি করবে, এর একটা বিহিত করতে হয়। গাঁয়ের মধ্যে আমরা এমন হ'তে দিতে পারি নে। একটা মিটিং ডাকো। পরেশের বৌ সম্বন্ধে এমন কথা উঠেছে যে কান পাতা যায় না। নরেশকে একখানা চিঠি লিখতে হয় তার চাকুরির স্থানে, আর ওই শান্তিরাম না কি ওর নাম?—ওকেও শাসন ক'রে দিতে হয়।

কালীময়-জ্যাঠা বলিলেন—শাসন-টাসন আর কি—ওকে এ-গ্রাম থেকে চলে যেতে বলো। না যায় আচ্ছা ক'রে উত্তম-মধ্যম দাও। নরেশ কি চাকুরি ছেড়ে আসবে এখন

কুটুম্ব শাসন করতে? সে যখন বাড়ী নেই, তখন আমরাই অভিভাবক।

সর্ব চৌধুরী বলিলেন—ছুঁড়ীটাও নাকি বড্ড বাড়িয়েছে শুনতে পাই।

কালীময়-জ্যাঠা বলিলেন—তাই তো শুনছি। বয়েসটা খারাপ কিনা। তাতে স্বামী ওই রকম।

কালীময়-জ্যাঠা আমাকে যতই না বোকা ভাবুন আমার কিন্তু বুঝিতে কিছুই বাকি রহিল না। খুড়ীমার উপর অভিমান চলিয়া গেল, ভাবিলাম ইহারা হয়তো খুড়ীমাকে কোন একটা শক্ত কথা শুনাইবে কিংবা অপদস্থ করিবে। কথাটা খুড়ীমাকে জানাইয়া সাবধান করিয়া দিলে হয়। কিন্তু সংগে সংগে ভাবিয়াও দেখিলাম খুড়ীমাকে এ-কথা আমি বলিতে পারিব না, কোনমতেই নয়।

শান্তিরামের উপর ভয়ানক রাগ হইল। তুমি কেন বাপু এখানে আসিয়াছ পরের সংসারের শান্তি নষ্ট করিতে? নিজের দেশে কেন চলিয়া যাও না? এতদিন কুটুম্ব-বাড়ীতে পড়িয়া থাকিতে লজ্জাও তো হওয়া উচিত ছিল।

ইহার কিছুদিন পরে আমি কাকার বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া করিব বলিয়া গ্রাম হইতে চলিয়া গেলাম। যাইবার আগে খুড়ীমার সংগে দেখা করিতে গেলাম। মাকে ছাড়িয়া যাইতে যত কষ্ট হইতেছিল, খুড়ীমাকে ছাড়িয়া যাইতেও তেমনি।

খুড়ীমা আদর করিয়া বলিলেন—পাবু, লেখাপড়া শিখে কত বিদ্বান হয়ে আসবে, কত বড় চাকুরি করবে! মনে থাকবে তো খুড়ীমার কথা?

লাজুক মুখে বলিলাম—খুব মনে থাকবে। আমি ভুলব না খুড়ীমা।

খুড়ীমা তাড়াতাড়ি কয়েক পা আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—সত্যি বলছিস্ ভুলবি নে কখনও পাবু?

জোর গলায় বলিলাম—কক্ষনো না।

বলিয়াই তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম তিনি সজল চোখে কিন্তু হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া আছেন।

সত্যিই বলিতেছি চলিয়া আসিয়াছিলাম নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত। গ্রাম ছাড়িতে হইল বাবার কড়া হুকুমে। খুড়ীমাকে কোন ভয়ানক বিপদের মুখে ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছি, আমার মন যেন বলিতেছিল।

থাকিলেই বা ছেলেমানুষ কি করিতে পারিতাম? মাস ছয়-সাত পরে গরমের ছুটিতে বাড়ী ফিরিয়া শুনিলাম, মাঘ মাসে শান্তিরাম খুড়ীমাকে লইয়া কোথাও চলিয়া গিয়াছে। কেহই তাহাদের কোন সন্ধান করে নাই, কোন আবশ্যক বিবেচনা করে নাই।

খুড়ীমার ইতিহাসের এই শেষ। তার পর দু-একবার খুড়ীমার সংবাদ যে নিতান্ত না পাইয়াছি এমন নয়, যেমন, একবার যখন থার্ড ক্লাসে পড়ি তখন শুনিয়াছিলাম আমাদের গ্রামের কাহারা চাকদায় গংগাস্নান করিতে গিয়া খুড়ীমাকে দেখিয়াছে—ভাল জামা-কাপড় পরনে, গায়ে এক-গা গহনা ইত্যাদি। আরও একবার ফার্স্ট ক্লাসে পড়িবার সময় গাঁয়ে গুজব রটিয়াছিল কাঁচরাপাড়ার বাজারে খুড়ীমার সংগে আমাদের অমূল্য জেলের মা না মাসীমার দেখা হইয়াছে, খুড়ীমার সে চেহারা আর নাই, শান্তিরাম নাকি ফেলিয়া পলাইয়াছে, ইত্যাদি।

খুড়ীমার নিরুদ্দেশ হওয়ার ছ-সাত বছর পরের কথা এ-সব। কিন্তু এ-সব কথার কতদূর মূল্য আছে আমি জানি না। আমার তো মনে হয় না গাঁ ছাড়িয়া যাওয়ার পরে খুড়ীমাকে কখনও কেহ কোথাও দেখিয়াছে।

যাক্, এ অতি সাধারণ কথা। সব জায়গায় সচরাচর ঘটিয়া আসিতেছে, ইহার মধ্যে নূতনত্ব কি আছে! তা নয়। আমার মনের সংগে খুড়ীমার এই ইতিহাসের সম্বন্ধ কিন্তু খুব

সাধারণ নয়। আসল কথাটা সেখানেই।

বড় তো হইলাম, কলেজে পড়িলাম, কলিকাতায় আসিলাম। বাল্যের কত বন্ধুত্ব, কত গলাগলি ভাব, নূতন বন্ধুলাভের জোয়ারের মুখে কোথায় মিলাইয়া গেল! খুড়ীমাকে কিন্তু আমি ভুলিলাম না। এ-খবর কি কেউ জানে, কলেজের ছুটিতে দেশে ফিরিবার সময় নৈহাটি কি কাঁচরাপাড়া স্টেশনে গাড়ী আসিলেই কতবার ভাবিয়াছি এই সব জায়গায় কোথায় হয়তো খুড়ীমা আছেন। নামিয়া কখনও অনুসন্ধান করি নাই বটে, কিন্তু অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াই ভাবিয়াছি তাঁর কথা। কলিকাতার কোন কুপল্লীর সহিত তাঁহার কোন যোগ আমি মনেও স্থান দিতে পারি নাই কোনদিন। কেন, তাহা জানি না, বোধ হয় বাল্যে কাঁচড়াপাড়া বা চাকদহে তাঁহাকে দেখা গিয়াছে বলিয়া যে গুজব রটিয়াছিল, তাহা হইতেই ঐ অঞ্চলের সহিত তাঁহার সম্পর্ক আমার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু কেন নামিয়া কখনও খুঁজিয়া দেখি নাই, ইহার কারণ আছে। আমার মনে এ-কথা কে যেন বলিত খুড়ীমা বাঁচিয়া নাই। যে-ভুল তিনি না-বুঝিয়া অল্প বয়সে করিয়া ফেলিয়াছেন, সে-ভুলের বোঝা ভগবান তাহাকে চিরকাল বহিতে দিবেন না, সংসার-জ্ঞানানভিজ্ঞা তরুণী খুড়ীমার কাঁধ হইতে সে-বোঝা তিনি নামাইয়া লইয়াছেন।

স্কুল-কলেজের যুগও কাটিয়া গেল। বড় হইয়া সংসারী হইলাম। কত নূতন ভালো-বাসা নূতন মুখ, নূতন পরিচয়ের মধ্য দিয়া জীবন চলিল। কত পুরাতন দিনের অতি-মধুর হাসি ক্ষীণ স্মৃতিতে পর্যবসিত হইল, কত নূতন মুখের হাসিতে দিনরাত্রি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। জীবন এ-রকমই হয়। একদিন যাহাকে না দেখিলে বাঁচিব না মনে হইত, ধীরে ধীরে সে কোথায় তলাইয়া যায়, হঠাৎ একদিন দেখা গেল তাহার নামটাও আর মনে নাই।

মনের ইতিহাসের এই ওলটপালটের মধ্য দিয়াও খুড়ীমা কিন্তু টিকিয়া আছেন অনেক দিন। বাল্যে তাঁহার নিকট বিদায় লইবার সময় তাঁহাকে কখনও ভুলিব না বলিয়া যে আশ্বাস দিয়াছিলাম, বালক-হৃদয়ের সেই সরল সত্য বাণীর মান ভগবানই রাখিয়াছেন।

কিসে জানিলাম বলি। আমাদের গ্রাম হইতে খুড়ীমা কতকাল চলিয়া গিয়াছেন। পঙ্গপালও আর কখনও তার পরে আমাদের গ্রামে আসে নাই—কিন্তু রায়েদের সেই নিম-গাছটি এখনও আছে। বেশি দিনের কথা নয়—বোধ হয় গত মাঘ মাসের কথা হইবে—রায়েদের বাড়ী জমিজমা সম্পর্কে একটা কাজে গিয়া সীতানাথ রায়ের সঙ্গে একখানা দরকারী দলিলের আলোচনা করিতেছি—হঠাৎ নিমগাছটায় নজর পড়াতে কেমন অন্য-মনস্ক হইয়া গেলাম। বহুদিন এদিকে আসি নাই। বাল্যের সেই নিমগাছটা। পরক্ষণে দুইটি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। ছাব্বিশ বৎসর পূর্বের এক হাস্যমুখী বালিকার কৌতুক ও আনন্দ উচ্ছ্বসিত মুখ মনে পড়িল এবং নিজের অলক্ষিতে মনটা এমন একটা অব্যক্ত দুঃখে ও বিষাদে পূর্ণ হইয়া গেল যে দলিলের আলোচনায় আর কোন উৎসাহই খুঁজিয়া পাইলাম না. দেখিলাম, খুড়ীমাকে তো এখনও ভুলি নাই।

বয়স হইয়াছে, মনে হইল মোটে আঠার-উনিশ বছর বয়স ছিল খুড়ীমার! কি ছেলে-মানুষই ছিলেন!

মানুষের মনে মানুষ এই রকমেই বাঁচিয়া থাকে। গত ছাব্বিশ বছরের বীথিপথ বাহিয়া কত নববধূ গ্রামে আসিয়াছেন, গিয়াছেন—কিন্তু দেখিলাম ছাব্বিশ বছর আগেকার আমাদের গ্রামের সেই বিস্মৃতা হতভাগিনী তরুণী বধূটি আজও সেই গ্রামে বাঁচিয়া আছেন।

হাঁসখালি থেকে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর পর্যন্ত যে রাস্তা চলে গিয়েছে, ঐ রাস্তা বেয়ে যাচ্ছিলুম আমার এক আত্মীয়ের বাড়ী। বগুলা স্টেশনে নেমে সোজা পাকা রাস্তা। দুপুরের পর একাই হেঁটে চলেছি, পথে বড় একটা লোকজন নেই, বৃষ্টির দিন, আকাশ মেঘান্ধকার, জোলো হাওয়া বইছে, রাস্তার দু'ধারের বড় বড় গাছ থেকে টুপটাপ জল পড়ছে, দিনটা ঠান্ডা, রাস্তা হাঁটবার পক্ষে উপযুক্ত দিন বটে।

ডোমাচিতি, গোয়ালবাগি ছাড়িয়েছি। রাস্তার দু-ধারে ঘন বন বাগান। আরও আট-দশ মাইল রাস্তা যেতে হবে। একটা বাঁধানো সাঁকোর ওপর বিশ্রাম করব বলে বসেছি, এমন সময় আর একজন পথ-চল্‌তি লোক এসে আমার সামনের সাঁকোটাতে বসল। খানিকটা বসে সে আমার দিকে একবার চাইলে, তারপর একটু সঙ্কোচের সুরে বল্‌লে—বাবু আপনার কাছে দেশলাই আছে? তারপর দেশলাই নিয়ে বললে—আমার সঙ্গে তামাক আছে। একটু তামাক সাজব, খাবেন?

বললুম—না দরকার নেই। আমি—

লোকটা যেন দুঃখিত হ'ল। বললে—না কেন বাবু, খান না? আমি সেজে দিচ্ছি। এমন সুরে বললে যে, আমার জন্যে তামাক না সাজতে পেয়ে তার মনে যেন সুখ নেই। একটু অবাক্ হয়ে দেখলুম ওর দিকে, চিনিনে শুনিনে কোনো কালে, আমি তামাক খাই না খাই তাতে ওর কি আসে যায়?

অগত্যা বললুম—সাজ—

এইবার তাকে ভালো করে দেখলুম! বয়েস ত্রিশের মধ্যে, মুখশ্রী কাঁচা, লম্বা লম্বা চুল। গায়ে একটা খাকির সার্ট। কিন্তু ওর চোখ দু'টো এত শান্ত ও এত নিরীহ যে, দেখলেই তার ওপর কোন সন্দেহ বা অবিশ্বাস আসে না। একটা ভাঙা ছাতি আর একটা বোঁচকা ওর সম্বল, ধরন-ধারণে নিছক খাঁটি ভবঘুরে।

দুজনে একদিকেই পথ চলতে আরম্ভ করলুম তারপর থেকে। মামুদপুরের বাজারে এসে সন্ধ্যা হয়ে গেল। একটি মুদীর দোকানে রাত্রের জন্যে আশ্রয় নিলুম দু'জনেই—কারণ সবাই বললে,—এখন দুর্ভিক্ষের সময়, সন্ধ্যার পরে এ পথে হাঁটা নিরাপদ নয়। অনেক সময়, সামান্য পয়সার জন্যে মানুষ খুন করছে।

আমার সঙ্গীর সঙ্গে ইতিমধ্যে আমার বেশ আলাপ পরিচয় হয়ে গিয়েছে। সে ব্রাহ্মণের ছেলে, নদীয়া জেলাতেই কোন্ গ্রামে বাড়ী, সংসারে কেউ নেই, দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়। বছরখানেক পথে বিপথে ঘুরবার পরে সম্প্রতি নিজের গ্রামে ফিরে যাচ্ছে।

একটা স্বভাব দেখলুম তার, সাধারণের পক্ষে স্বভাবটা খুব অদ্ভুত বলতে হবে। লোকের এতটুকু উপকার করতে পারলে সে যেন বেঁচে যায়। কাছের লোককে কি করে খুশি করবে, এই হ'ল তার জীবনে মস্ত বড় একটা নেশা!

রাত্রে সে-ই রান্না করলে। আমায় এতটুকু সাহায্য পর্যন্ত করতে দিলে না।

খেতে বসে আমি বুঝলুম লোকটা পাকা রাঁধুনি। পাকা রাঁধুনি বললে সবটা বলা হ'ল না। রান্নার কাজে সে একজন শিল্পী। উঁচুদরের প্রতিভাবান শিল্পী। সত্যিই অবাক্ হয়ে গেলাম তার রান্না খেয়ে।

বললাম—কোথায় শিখলে হে এমন চমৎকার রান্না?

ও বললে—কেউ শেখায় নি, এমনি হয়েচে।

—তুমি কলকাতায় কি অন্য কোথাও মোটা মাইনের চাকুরি পেতে পারো হে, রান্নায়

কাজে। ধরো কোন বড়লোকের বাড়ীতে। এ রকম ক'রে বেড়াও কেন?

সে হেসে বললে—তাও করেচি। কিন্তু আমার একটা বাতিক আছে বাবু। সেজন্যে আর কোথাও চাকরি স্বীকার করতে ইচ্ছে হয় না। সে কথাটা খুলে বলি তবে। সেটাকে একরকম রোগও বলতে পারেন। হয়তো বা বায়ুরোগ।

আমি ম্যাট্রিক পাস করে ভেবেছিলুম আরও পড়বো, কিন্তু অবস্থা খারাপ ছিল ব'লে পড়ার খরচ চালানো গেল না, সুতরাং ছেড়ে দিতে হ'ল।

তারপর চাকরির সন্ধানে বেরুই। সিংভূম জেলার একটা পাহাড়ে ও জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায় খনিসংক্রান্ত কি জরীপ হচ্চে। ঘুরতে ঘুরতে সেখানে গিয়ে জুটলাম। মস্ত বড় মাঠে অনেকগুলো তাঁবু পড়েচে, অনেক লোক। আমি একজন ওভারসিয়ারের তাঁবুতে রাঁধুনীর কাজ পেয়ে গেলাম। লোকটির বয়েস চল্লিশের ওপর হবে। একাই থাকে, একটা ছোকরা চাকর ছিল, আমি যাবার পরে তাকে জবাব দিয়ে দিলে।

কিছুদিন সেখানে কাজ করবার পর মনিবের প্রতি আমার একটু অদ্ভুত ধরনের ভালোবাসা লক্ষ্য করলুম। কিসে সে খুশি হবে, কিসে তাকে তৃপ্তি দিতে পারব খাইয়ে, এই হ'ল আমার একমাত্র লক্ষ্য। সে জিনিসটা একটা নেশার মত আমায় পেয়ে বসল। সেই জংলী জায়গায় খাবার জিনিস মেলে না, আমি হেঁটে দূর দূর গ্রাম থেকে মাছ তরকারী বহুকষ্টে সংগ্রহ ক'রে এনে রাঁধতাম। মনিবকে সকল কথা খুলে বলতাম না যে, কোথা থেকে কি জিনিস আনি। রান্না যতদূর সম্ভব ভালো করবার চেষ্টা করতাম, যাতে খেয়ে তৃপ্তি পায়।

লোকটা যে ভালো লোক ছিল, তা নয়। মাইনে বাকি ফেলতে লাগল, বাজারের পয়সা চুরি করি, এমন সন্দেহও মাঝে মাঝে করতো। আমি সে সব গায়ে মাখিনি কোনোদিন। চার মাস এই ভাবে কাটল। এই চার মাসে আমার অন্য কোন ধ্যান-জ্ঞান ছিল না, কেবল কি করে মনিবকে ঠিক সময়ে দু'টি খেতে দেব এবং ভালো খেতে দেব।

কিরকম—দু'একটা উদাহরণ দিই।

একবার শুনলাম মুংলী বলে একটা পাহাড়ী নদীতে বাঁধ বেঁধে সাঁওতালরা বড় চিংড়ি মাছ ধরবে। মাছ জিনিসটা ওদেশে বড় দুর্লভ বস্তু। টাকা-পয়সা ফেললেই পাবার জো নেই। চিংড়ি মাছ আনবার জন্যে ভয়ানক পাথর-তাতা রৌদ্রের মধ্যে—সাত মাইল চলে গেলুম এবং মাছ নিয়ে ফিরে এসে রান্না করে খাওয়ালুম মনিবকে। সে কথা বললুমও না যে কোথা থেকে মাছ এনেছি।

চার মাস পরে রান্নার খ্যাতি ও প্রভুভক্তির কথা জরীপের তাঁবুর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। সে দেশটাতে ভালো বাঙালী রাঁধুনী পাওয়া যায় না, সকলেই আমার মনিবকে বেশ একটু হিংসের চোখে দেখতে লাগল, ক্রমে আমার কাছে চুপি চুপি লোক হাঁটতে শুরু করলে আমায় ভাঙিয়ে নেবার জন্যে। বেশি মাইনে দিতে চায়, নানারকম সুবিধে করে দিতে চায়। আমি কিছুতেই গেলাম না। জরীপের হেড্ কানুনগো কুড়ি টাকা পর্যন্ত মাইনে দিতে চাইলে, আমি তখন পাই মোটে সাত টাকা। কিন্তু টাকার সুবিধের কথা আমার মনেই উঠল না। আমার মনিবকে তো আমি এ সব কথা কিছুই বলতাম না।

মাস পাঁচ-ছয় পরে কি জানি কেমন কুবুদ্ধি হ'ল মনিবের, আমায় অকারণে বকুনি গালাগালি শুরু করলে। আগেও যে একেবারে না বকতো এমন নয়, কিন্তু তাতে মাত্রা থাকতো। পুরনো হওয়াতে মনিব বোধ হয় ভাবতে লাগল আমার আর যাবার জায়গা নেই —কাজেই কারণে অকারণে গাল-মন্দ ক্রমেই মাত্রা ছাড়িয়ে উঠতে লাগল।

একদিন মনিব আমায় ডেকে বললেন—শোন এদিকে। আলুতে বালি দিয়ে রাখোনি কেন? সব যে কল্ বেরিয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েচে—

সন্ধ্যার কিছু আগে। আমি আধ মাইল দূরবর্তী দোকান থেকে সবে-মাত্র তেল, মশলা কিনে ফিরে এসেচি। বললাম—বালি তো দেওয়াই ছিল, বর্ষাকালে বালি দিলেও কি কল্ বেরুনো সামলানো যায় বাবু?

মনিব হঠাৎ চটে উঠে বললে—কি! পাজি, র‍্যাস্কেল, আমার সঙ্গে মুখো-মুখি উত্তর?

ব'লেই আমায় মারলে দু'টো চড়। তারপর গটগট করে বাইরে চলে গেল।

আমার হাত থেকে তেলের বোতল প'ড়ে চুরমার হয়ে গেল। মারের চোটে ও অপমানে কান লাল হয়ে উঠল। সেখানে বসে পড়লুম এবং অনেকক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে বসে রইলুম।

কিন্তু শুনলে আপনি আশ্চর্য হবেন এবং আমিও তখন আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলুম যে, মনিবের ওপর রাগের পরিবর্তে আমার উল্টে একটা করুণার উদ্রেক হ'ল। ভাবলুম—আহা, লোকটা জানে না যে, ওর নিজের দোষে এবার আমি হাতছাড়া হয়ে যেতে বসেছি। হেড্ কানুনগোর তাঁবুতে খবর পাঠাবার অপেক্ষা মাত্র। কানুনগোর সঙ্গে যে আমার মনিবের সদ্ভাব নেই, তাও সবাই জানে। খেও কাল থেকে হাত পুড়িয়ে রেঁধে—এখানে আর বাঙ্গালী রাঁধুনী মিলছে না।

এই কথা যতই ভাবি, ততই ওর উপর করুণা ও অনুকম্পা গভীর হয়ে ওঠে। সে এক অপূর্ব অনুভূতি! ভগবান আমার বুকে এসে যেন তাঁর আসন পেতেছেন। ওকে আমি ছেড়ে গেলে ওর কত কষ্ট হবে এবং বিশেষ ক'রে লোকটা কি বোকাই বনে যাবে—এই ভেবেই আমার মন গলে গেল। নিজের অপমান ভুলেই গেলাম একেবারে।

রাত আটটা যখন বেজেচে, তখন আমি উঠে গিয়ে রান্না চড়িয়ে দিলুম। তার আগেই ঠিক করে ফেলেচি আমি মনিবকে ছেড়ে কোথাও যাব না।

ঘোড়ার সইস্টা কিন্তু আড়াল থেকে আমার মার খাওয়াটা দেখেছিল। সে গিয়ে সবাইকে গল্প করেচে। ফলে সকাল থেকে এক হেড্ কানুনগোর কাছ থেকেই আমার কাছে পাঁচবার লোক এলো আমায় ভাঙিয়ে নিতে।

তিন চার দিন ধ'রে তারা সবাই আমাকে বিরক্ত করে মারলে। মনিব কাজে বেরিয়ে গেলেই তারা আসে। হেড্ কানুনগোর লোক এবং আরও লোক। কতরকম লোভ দেখায়, মনিবের বিরুদ্ধে আমায় রাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করে।

হেড্ কানুনগো বাবুর সঙ্গে একদিন পথে দেখা। তিনি ঘোড়ায় চেপে কাজে বেরিয়েছিলেন। আমায় দেখে বললেন—ওহে শোনো, আমার লোক তোমার কাছে গিয়েছিল?

বললুম—আজ্ঞে হাঁ!

—তা তুমি আসতে রাজী হও না কেন? শুনলাম সেদিন তোমায় মেরেচে। ছিঃ ছিঃ—কি বলে তুমি সেখানকার ভাত এখনও মুখে তুলচো? চলে এস ওবেলা থেকেই আমার ওখানে! কি বল?

আমি বড় বিপদে পড়ে গেলুম। স্বয়ং হেড্ কানুনগো বাবু। তাঁকে 'না' বলি বা কি করে, এ তো আর উড়ে চাকর বা আরদালির দল নয়। হঠাৎ একটা বুদ্ধি মাথায় এল। বললুম—হুজুর আজই যাব আপনার ওখানে। দেখুন না, মিছিমিছি সেদিন অমনি মার দিলেন—

—কি, হয়েছিল কি?

—কিছু না, ওঁর সোনার বোতামের সেটটা আমি মেঝেতে কুড়িয়ে পাই। পেয়ে নিজের বাক্সে তুলে রাখি। ভেবেছিলুম এলে দিয়ে দেব। তারপর আর মনে নেই সন্ধ্যেবেলা। উনি এদিকে পরদিন সকালে বোতাম হারিয়েচে বলে খুব তোলপাড় করচেন বাসা। আমি তখন গিয়েচি দোকানে। সে সময় উনি আমার তোরঙ্গটা খুঁজে বোতাম দেখতে পেয়েছেন

সেখানে। তাই আমি দোকান থেকে আসতেই বললেন—রাস্কেল, তুই চুরি ক'রে রেখেছিলি বোতাম তোর বাক্সে। এই বলেই মার। কিন্তু হুজুর বাস্তবিক আমি চুরির মতলবে—

কানুনগোর মুখের ভাবে ক্রমশ পরিবর্তন হতে লাগল, ঘুঘু লোক, বেশ বুঝলেন আমি চুরির মতলবেই সোনার বোতাম তোরঙ্গে রেখেছিলুম। এমন লোককে কে বাসায় স্থান দেবে? তিনি 'হুঁ' 'হাঁ' 'তা বটে' বলতে বলতে সরে পড়লেন।

চতুর্দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল, 'দু'একদিনের মধ্যেই, যে আমি মনিবের সোনার বোতাম লুকিয়ে রেখেছিলুম, তাই ধরা পড়াতে মার খেয়েছি। আর আমায় কেউ ভাঙ্‌চি দিতে আসে না। জেনে শুনে চোরকে কে কাছে রাখতে চায়?

মনিব একদিন আমায় বললে—এ কি শুনচি? তুমি কানুনগো বাবুর কাছে বলেচ সোনার বোতাম লুকিয়ে রেখেছিলে বলে তোমায় মেরেছিলুম সেদিন? কেন এ কথা বললে?

বললুম সব কথা খুলে। ওরা ভাঙ্‌চি দিতে আসে, বিরক্ত করে সর্বদা, না ব'লে উপায় কি? ও কথা না বললে কি আমার নিস্তার ছিল?

মনিব বললে—তুমি অদ্ভুত লোক। এমন লোক আমি কখনো দেখিনি। আমায় ছেড়ে যেতে হবে বলে নিজের নামে নিজেই একটা মিথ্যে অপবাদ রটালে? এ তো নিজের ভাই করে না, ছেলে করে না। তুমি রাঁধুনীর কাজ কোরো না, সাধারণ লোক নও তুমি। তোমাকে রাঁধুনী করে রেখে দিলে আমার অপরাধ হবে।

তিনি যদিও সবাইকে বলে বেড়ালেন বোতাম চুরির কথা সর্বৈব মিথ্যে, কিন্তু সে কথা কেউ বিশ্বাস করলে না। মনিবকে কত বোঝালুম, ছেড়ে যেতে চাইলুম না। তিনি হাতজোড় করে মাপ চাইলেন, বললেন—আমায় অপরাধী করো না, তুমি আমার রাঁধুনীর কাজ করবার লোক নও। যা হয়ে গিয়েছে তার চারা নেই—আর আমি সজ্ঞানে জেনে শুনে তোমায় দিয়ে চাকরের কাজ করাতে পারব না।

সেখানে চাকরি তো গেলই, যদিও এদিকে মনিব সবাইকে বলে বেড়ালেন বোতাম চুরির কথা মিথ্যে, কেউ সে কথা বিশ্বাস করলে না। সবাই ভাবলে চুরির জন্যে আমার চাকরি গেল।

আসবার সময় মনিব তাঁর ঘড়ি-চেন এবং পঞ্চাশটি টাকা দিয়েছিলেন। এই দেখুন সেই ঘড়ি-চেন। কিন্তু সেই থেকে মনে কেমন একটা কষ্ট হ'ল, পথে পথে বেড়াই। আর কারো বাড়ী রাঁধুনীর চাকরি নিইনি। নেবও না।

অরন্ধনের নিমন্ত্রণ

এক একজন লোকের স্বভাব বড় খারাপ, বকুনি ভিন্ন তারা একদণ্ডও থাকতে পারে না। শ্রোতা পেলে বকে যাওয়াতেই তাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ। হীরেন ছিল এই ধরনের মানুষ! তার বকুনির জ্বালায় সকলে অতিষ্ঠ। অফিসে যারা তার সহকর্মী, শেষ পর্যন্ত তাদের অনেকের স্নায়ুর রোগ দেখা দিলে, অনেকে চাকরি ছাড়বার মতলব ধরলে।

সব বিষয়ের প্রতিভার মতই বকুনির প্রতিভাও পৈতৃক শক্তির আবশ্যক রাখে। হীরেনের বাবার বকুনিই ছিল একটা রোগ। শেষ বয়সে তাঁকে ডাক্তারে বারণ করেছিল, তিনি বেশী কথা যেন না বলেন। তাতে তিনি জবাব দিয়েছিলেন—তবে বেঁচে লাভটা কি ডাক্তারবাবু? যদি দু'একটা কথাই করো সঙ্গে বলতে না পারলুম! কথা বলতে বলতেই হৃৎপিণ্ড দুর্বল হবার ফলে তিনি মারা যান—মার্টার টু দি কজ্!

এ হেন বাপের ছেলে হীরেন। বাইশ বছরের যুবক—আপিসে কাজ করে—আবার

রামকৃষ্ণ মঠেও যাতায়াত করে। বিবাহ করবার ইচ্ছে নেই। শুনেছিলাম সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। এতদিন হয়েও যেত, কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের লোকেরা এ বিষয়ে উৎসাহ দেন নি ; হীরেন সন্ন্যাসী হয়ে দিনরাত মঠে থাকতে শুরু করলে এক মাসের মধ্যেই মঠ জনশূন্য হয়ে পড়বে।

হীরেনের এক বৃদ্ধা পিসিমা থাকতেন দূর পাড়াগাঁয়ে। স্টেশন থেকে দশ-বারো ক্রোশ নেমে যেতে হয় এমন এক গ্রামে। পিসিমার আর কেউ নেই, হীরেন সেখানে পিসিমাকে একবার দেখতে গেল! বুড়ী অনেকদিন থেকেই দুঃখ করে চিঠিপত্র লিখছিল।

সে গ্রামের সবাই এতদিন জানতো যে, তাদের কুমী অর্থাৎ কুমুদিনীর মতো বকুনিতে ওস্তাদ মেয়ে সে অঞ্চলে নেই। কুমীর বাবা গ্রাম্য পুরোহিত ছিলেন—কিন্তু যেখানে যখন পুজো করতে যেতেন, আগড়ুম বাগড়ুম বকুনির জ্বালায় যজমান ভিটে ছেড়ে পালাবার যোগাড় করতো, বিয়ের লগ্ন উত্তীর্ণ হবার উপক্রম হ'ত।

কুমীর বাপের বকুনি-প্রতিভার একটা বড় দিক্ ছিল এই যে, তাঁর বকুনির জন্য কোনো বস্তুর প্রয়োজন হত না। যত তুচ্ছ বিষয়ই হোক না কেন, তিনি তাই অবলম্বন করে বিশাল বকুনির ইমারত গড়ে তুলতে পারতেন। মনে যথেষ্ট উৎসাহ ও শক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ বলবার ও ছবি গড়বার ক্ষমতা না থাকলে মনুষে এমন বকতে পারে না বা শ্রোতাদের মনোযোগ ধ'রে রাখতে পারে না। তাঁর মৃত্যুর সময়ে গ্রামের সকলেই দুঃখ করে বলেছিল—আজ থেকে গাঁ নিঝুম হয়ে গেল।

দু'একজন বলেছিল—এবার আমসত্ত্ব সাবধানে রৌদ্রে দিও, মুখুয্যে মশায় মারা গিয়েছেন, কাক-চিলের উৎপাত বাড়বে। অর্থাৎ তাদের মতে গাঁয়ে এতদিন কাক-চিল বসতে পারত না মুখুয্যে মশায়ের বকুনির চোটে। নিন্দুক লোক কোন্ জায়গায় নেই?

কিন্তু হায়! নিন্দুকের আশা পূর্ণ হয় নি বা মুখুয্যে মশায়ের হিতাকাঙ্ক্ষীদের দুঃখ করবারও কারণ ঘটে নি। মুখুয্যে মশায় তাঁর প্রতিনিধি রেখে গিয়েছিলেন তাঁর আট বৎসরের মেয়ে কুমীকে। পিতার দুর্লভ বাক-প্রতিভার অধিকারিণী হয়েছিল মেয়ে। এমন কি তার বয়েস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই সন্দেহ করলেন যে, মেয়ে তার বাপকে ছাড়িয়ে না যায়।

সেই কুমীর বয়েস এখন তেরো-চোদ্দ। সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কোঁকড়া কোঁকড়া একরাশ চুল মাথায়, বড় বড় চোখ, মিষ্টি গলার সুর, একহারা গড়ন, কথায় কথায় খিলখিল হাসি, মুখে বকুনির খই ফুটছে দিন-রাত।

শুভক্ষণে দু'জনের দেখা হ'ল।

হীরেন সকালবেলা পিসিমার ঘরের দাওয়ায় বসে প্রাণায়াম অভ্যাস করবার চেষ্টা করচে, এমন সময়ে পিসিমা আপন মনে বললেন—দুধ কি আজ দিয়ে যাবে না? বেলা যে তেতপর হ'ল—ছেলেটা যে না খেয়ে শুকিয়ে বসে আছে, একটু চা করে দেব তার দুধ নেই—আগে জানলে রাত্রের বাসী দুধ রেখে দিতাম যে—

—রাতের বাসী দুধ রোজ রাখো কি না—

বলতে বলতে একটি কিশোরী একঘটি দুধ-হাতে বাড়ীর পেয়ারা গাছটার তলায় এসে দাঁড়াল।

পিসিমা বললেন—দুধের ঘটিটা রান্নাঘর থেকে বের ক'রে নিয়ে আয় দিকি, এনে দুধটা ঢেলে দে—

কিশোরী চঞ্চল লঘুপদে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকল এবং দুধ ঢেলে যথাস্থানে রেখে এসে আমতলায় দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললে—শোনো ও পিসি, কাল কি হয়েছে জানো?—হি—হি—

পিসিমা বললেন—কি?

এই কথার উত্তরে আমতলায় দাঁড়িয়ে মেয়েটি হাত-পা নেড়ে একটা গল্প জুড়ে দিলে—কাল দুপুরে নাপিত-বাড়ীতে ছাগল ঢুকে নাপিত-বৌ কাঁথা পেতেছিল, সে কাঁথা চিবিয়ে খেয়েছে, এইমাত্র ঘটনাংশ গল্পের। কিন্তু কি সে বলবার ভঙ্গি, কি সে কৌতুক-পূর্ণ কলহাসির উচ্ছ্বাস, কি সে হাত-পা নাড়ার ভঙ্গি; পিসিমার চায়ের জল গরম হ'ল, চা ভিজোনো হ'ল, হালুয়া তৈরী হল, পেয়ালায় ঢালা হ'ল—তবুও সে গল্পের বিরাম নেই।

পিসিমা বললেন—ও কুমী মা, একটু ক্ষান্ত দাও, সকালবেলা আমার অনেক কাজকর্ম আছে—তোমার গল্প শুনতে গেলে সারা দুপুরটি যাবে—এই চা-টা আর খাবারটুকু তোর এক দাদা—ওই বড়ঘরের দাওয়ায় বসে আছে—দিয়ে আয় দিকি?...

কুমী বিস্ময়ের সুরে বললে—কে পিসি?

—তুই চিনিস্ নে, আমার বড় জ্যাঠতুতো ভাইয়ের ছেলে—কাল রাত্তিরে এসেছে—তবে চা তৈরী করবার আর এত তাড়া দিচ্ছি কি জন্যে? তুই কি কারো কথা শুনতে পাস, নিজের কথা নিয়েই বে-হাতি—

কুমী সলাজমুখে চা ও খাবার দাওয়ার ধারে রেখে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু হীরেন তাকে অত সহজে যেতে দিতে প্রস্তুত নয়। সে কুমীর নাপিত-বাড়ীতে ছাগলের কাঁথা চিবোনোর গল্প শুনেচে এবং মুগ্ধ, বিস্মিত, পুলকিত হয়েছে এইটুকু মেয়ের ক্ষমতায়।

সে বললে—খুকী তোমার নাম কি?

—কুমুদিনী—

হীরেন বললে—এই গাঁয়েই বাড়ী তোমার বুঝি? ও-পাড়ায়? তা ছাগলের কথা কি বলছিলে? বেশ বলতে পার—

কুমী লজ্জায় ছুটে পালাল।

কিন্তু কুমুদিনীকে আবার কি কাজে আসতে হ'ল। হীরেনের সঙ্গে একটু একটু করে পরিচয় হয়েও গেল! দু'জন দু'জনের গুণের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ! দু'জনেই ভাবে এমন শ্রোতা কখনো দেখেনি। তিন দিন পরে দেখা গেল পিসিমার দাওয়ার সামনে উঠোনে দাঁড়িয়ে কুমী এবং দাওয়ার খুঁটি হেলান দিয়ে বসে হীরেন ঘণ্টাখানেক ধরে পরস্পরের কথা শুনচে, হীরেন অনর্গল বকে যাচ্ছে, কুমী শুনচে—আর কুমী যখন অনর্গল বকচে তখন হীরেন মন দিয়ে শুনচে।

সেবার পাঁচ ছ'দিন পিসিমার বাড়ী থেকে হীরেন চলে এল।

কুমী যাবার সময় দেখা করলে না ব'লে হীরেন খুব দুঃখিত হ'ল, কিন্তু হীরেন চলে যাবার পরে কুমী দু'তিন দিন মন-মরা হয়ে রইল, মুখে হাসি নেই, কথা নেই।

বুড়ি পিসিমার প্রতি হীরেনের টানটা যেন হঠাৎ বড় বেড়ে উঠ্ল; যে হীরেন দু'বছর তিন বছরেও অনেক চিঠিপত্র লেখা সত্ত্বেও এদিকে বড় একটা মাড়াতো না, সে ঘন ঘন পিসিমাকে দেখতে আসতে শুরু করলে।

আজ বছর দুই আগের কথা, হীরেনকে পিসিমা বলেছিলেন—হীরু বাবা, যদি এলি তবে আমার একটা উপকার করে যা। আমার তো কেউ দেখবার লোক নেই তোরা ছাড়া। নরসুপুরের ধরণী কামারের কাছে একগাদা টাকা পাব জমার খাজনার দরুন। একবার গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে টাকাটার একটা ব্যবস্থা করে আয় না বাবা?

হীরেন এসেচে দু'দিন পিসিমার বাড়ী বেড়িয়ে আম খেয়ে ফূর্তি করতে। সে জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরে রোদে খাজনার তাগাদা করে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে আসেনি। কাজেই নানা অজুহাত দেখিয়ে সে পরদিন সকালেই সরে পড়েছিল। এখন সেই হীরেন স্বতঃপ্রবৃত্ত

হয়ে একদিন বললে—পিসিমা, তোমার সেই নরসুপুরের প্রজার বাকি খাজনার কিছু হয়েচে? যদি না হয়ে থাকে, তবে এই সময় না হয় একবার নিজেই যাই। এখন আমার হাতে তেমন কাজকর্ম নেই, তাই ভাবছি তোমার কাজটা করেই দিয়ে যাই।—

ভাইপোর সুমতি হচ্চে দেখে পিসিমা খুব খুশি।

হীরেন সকালে উঠে নরসুপুরে যায়, দুপুরের আগেই ফিরে এসে সেই যে বাড়ী ঢোকে, আর সারাদিন বাড়ী থেকে বার হয় না। কুমীকেও প্রায়ই দেখা যায় পিসিমার উঠোনে, নয় তো আমতলায়, নয়তো দাওয়ার পইঠাতে বসে হীরুদার সঙ্গে গল্প করতে। কাক-চিল পাড়ায় আর বসে না।

জ্যোৎস্না উঠেচে।

কুমী বলল—চললুম হীরুদা।

—এখনই যাবি কেন, বোস আর একটু—

উঠানের একটা ধারে একটা নালা। হঠাৎ কুমী বললে—জ্যোৎস্না রাতে এলো চুলে লাফিয়ে নালা পার হ'লে ভূতে পায়—আমায় ভূতে পাবে দেখবে দাদা—হি-হি-হি-হি— ; তারপর সে লাফালাফি ক'রে নালাটা বারকতক এপার-ওপার করচে, এমন সময় ওর মা ডাক দিলেন—ও পোড়ারমুখী মেয়ে, এই ভর সন্ধেবেলা তুমি ও করচ কি? তোমায় নিয়ে আমি যে কি করি? ধিঙ্গী মেয়ে, এতটুকু কান্ডজ্ঞান যদি তোমার থাকে!—হীরু ভালো মানুষের মতো মুখখানি ক'রে হারিকেন লণ্ঠনটা মুছে পরিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

মায়ের পিছু পিছু কুমী চলে গেল, একটু অনিচ্ছার সঙ্গেই গেল, মুখে তার অপ্রতিভের হাসি। হীরেন মনমরা ভাবে লণ্ঠনের সামনে কি একখানা বই খুলে পড়তে বসবার চেষ্টা করল।

মাসের পর মাস যায়, বছরও ঘুরে গেল। নতুন বছরের প্রথমে হীরেনের চাকুরিটা গেল, আপিসের অবস্থা ভালো নয় ব'লে। এই এক বছরের মধ্যে হীরেন পিসিমার বাড়ী আরও অন্ততঃ দশবার এল গেল এবং এই এক বছরের মধ্যে হীরেন বুঝেচে কুমীর মতো মেয়ে জগতে আর কোথাও নেই—বিধাতা একজন মাত্র কুমীকে সৃষ্টি করেচেন। কি বুদ্ধি, কি রূপ, কি কথাবার্তা বলবার ক্ষমতা, কি হাত নাড়ার ললিত ভঙ্গি, কি লঘুগতি চরণছন্দ।

প্রস্তাবটা কে উঠিয়েছিল জানি নে, বোধ হয় হীরুর পিসিমাই। কিন্তু কুমুদিনীর জ্যাঠামশাই সে প্রস্তাবে রাজী হন নি—কারণ তাঁরা কুলীন, হীরেনরা বংশজ। কুলীন হয়ে বংশজের হাতে মেয়ে দেবেন তিনি, একথা ধারণা করাই তো অন্যায়।

হীরু শুনে চটে গিয়ে পিসিমাকে বললে—কে তোমাকে বলেছিল পিসিমা ডেকে অপমান ঘরে আনতে? আমি তোমার পায়ে ধরে সেধেছিলুম কুমীর সঙ্গে আমার বিয়ে দাও? সবাই জানে আমি বিয়ে করব না, আমি রামকৃষ্ণ আশ্রমে ঢুকব। সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েচে, এবার এই ইয়েটা মিটে গেলেই—

কুমীর কানে কথাটা গেল যে হীরু এই সব বলেচে। সে বললে—হীরুদাকে বিয়ে করতে আমি পায়ে ধরে সাধতে গিয়েছিলুম যে! বয়ে গেল—সন্ন্যাসী হবে তো আমার কি?

হীরু তল্পী বেঁধে পরদিনই পিসিমার বাড়ী থেকে নিজের বাড়ী চলে গেল।

হীরুর বাড়ীর অবস্থা এমন কিছু ভালো নয়। এবার তার কাকা আর মা একসঙ্গে বলতে শুরু করলেন—সে যেন একটা চাকরির সন্ধান দেখে। বেকার অবস্থায় বাড়ী বসে কতদিন আর এভাবে চলবে?

হীরুর কাকার এক বন্ধু জামালপুরে রেলওয়ে কারখানার বড়বাবু, কাকার পত্র নিয়ে হীরু সেখানে গেল এবং মাস দুই তাঁর বাসায় বসে-বসে খাওয়ার পরে কারখানার আপিসে

ত্রিশ টাকা মাইনের একটা চাকুরি পেয়ে গেল।

লাল টালি-ছাওয়া ছোট্ট কোয়ার্টারটি হীরুর। বেশ ঘর-দোর, বড় বড় জানালা। জানালা দিয়ে মারক পাহাড় দেখা যায় ; কাজকর্মের অবসরে জানালা দিয়ে চাইলেই চোখে পড়ে টানেল দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে ট্রেন যাচ্চে আসচে। শাণ্টিং এঞ্জিনগুলো ঝক্ ঝক্ শব্দ করে পাহাড়ের নিচে সাইডিং লাইনের মুড়োয় গিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে। কয়লার ধোঁয়ায় দিন--রাত আকাশ-বাতাস সমাচ্ছন্ন।

একদিন রবিবারে ছুটির ফাঁকে—সে আর তার কাকার বন্ধু সেই বড়বাবুর ছেলে মণি, মারক পাহাড়ের ধারে বেড়াতে গেল। মণি ছেলেটি বেশ, পাটনা ইউনিভার্সিটি থেকে বি-এস-সি দিয়েচে এবার, তার বাবার ইচ্ছে কাশী হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে তাকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো। কিন্তু মণির তা ইচ্ছে নয়, সে কলকাতার সায়েন্স কলেজে অধ্যাপক রমণের কাছে ফিজিক্স্ পড়তে চায়। এই নিয়ে বাবার সঙ্গে তার মতান্তর চলচে। হীরু জানত এসব কথা।

বৈকাল বেলাটি। জামালপুর টাউনের আওয়াজ ও ধোঁয়ার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে ওরা দক্ষিণ দিকে পাহাড়ের ওপর দিয়ে অনেকটা চলে গিয়েচে, নীল অতসী ও বনতুলসীর জঙ্গল হয়ে আছে পাহাড়ের মাথায় সেই জায়গাটায়। ঘন ছায়া নেমে আসচে পূর্বদিকে শৈলসানুতে, একটি বন্যলতায় হলদে ক্যামেলিয়া ফুলের মতো ফুল ফুটেচে, খুব নিচে কুলী-মেয়েরা পাহাড়তলীর লম্বা লম্বা ঘাস কেটে আঁটি বাঁধ্‌চে—পূর্বদিকে দৃষ্টি যায় সমতল মাঠ, ভুট্টার ক্ষেত, খোলার বস্তি, কেবল দক্ষিণে, পূব-পশ্চিমে টানা পাহাড়শ্রেণী ও শালবন থৈ থৈ করচে, আর সকলের ওপরে উপুড় হয়ে পড়েচে—নিকট থেকে দূরে সুদূরে প্রসারিত মেঘমুক্ত সুনীল আকাশ।

একটা মহুয়াগাছের তলায় বসে মণি বাড়ী থেকে আনা স্যাণ্ড্উইচ্, ডিমসিদ্ধ, রুটি এবং জামালপুর বাজার থেকে কেনা জিলাপী একখানা খবরের কাগজের ওপর সাজালে—থার্মো-ফ্ল্যাস্ক খুলে চা বার ক'রে একটা কলাই-করা পেয়ালায় ঢেলে বললে—এসো হীরুদা—

দেখলে, হীরু অন্যমনস্ক ভাবে মহুয়াগাছের গুঁড়িটা ঠেস্ দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে বসে আছে।

—খাবে এসো, কি হ'ল তোমার হীরুদা?

হীরু নিরুৎসাহ ভাবে খেতে লাগল। সারা বৈকালটি যতক্ষণ পাহাড়ের ওপর ছিল, কেমন যেন অন্যমনস্ক, উদাস—কি যেন একটা ভাবচে। মণি ভাবলে, পাহাড়ে বেড়ানোটাই মাটি হয়ে গেল হীরুদার জন্যে। পাহাড় থেকে নামবার পথে হীরু হঠাৎ বললে—মণি, একটি মেয়েকে বিয়ে করবে ভাই।

মণি হো হো ক'রে হেসে উঠে বললে—কি ব্যাপার বল তো হীরুদা? তোমার আজ হয়েচে কি?

—কিছু হয় নি, বলো না মণি? একটি গরীবের মেয়েকে বিয়ে ক'রে দায় থেকে উদ্ধার করো না—তোমার মতো ছেলের—

—কি, তোমার কোনো আপনার লোক? তোমার নিজের বোন নাকি?

—বোন না হ'লেও বোনের মতই। বেশ দেখতে মেয়েটি, সুশ্রী, বুদ্ধিমতী।

—আমার কথায় তো কিছু হবে না, তুমি বাবাকে কি মাকে বলো। একে তো লেখাপড়া নিয়েই বাবাকে চটিয়ে রেখেছি, আবার বিয়ে নিয়ে চটালে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। বাবার মেজাজ বোঝ তো?

রাত্রে নিজের ছোট্ট বাসাটিতে হীরু কথাটা আবার ভাবলে। আজ পাহাড়ের ওপর

উঠেই তার কেমন সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। কুমীর কথা তাহলে তো সে মোটেই ভোলে নি! নীল আকাশ, নির্জনতা, ফুটন্ত বন্য ক্যামেলিয়া ফুল, বনতুলসীর গন্ধ—সব সুদ্ধ মিলে একটা বেদনার মতো তার মনে এনে দিয়েচে কুমীর হাসিভরা ডাগর চোখ দুটির স্মৃতি, তার হাত নাড়ার ললিত ভঙ্গি, তার অনর্গল বকুনি···সে তো সন্ন্যাসী হ'য়ে যাবে রামকৃষ্ণ আশ্রমে সবাই জানে, মিথ্যেই পিসিমা কুমীর বাবাকে বিয়ের কথা গিয়েছিলেন বলতে। কিন্তু কুমীকে জীবনে সুখী করে দিয়ে যেতে হবে। এ তার একটা কর্তব্য।

সাহসে ভর ক'রে মণির বাপের কাছে সে প্রস্তাবটা করলে। হীরুকে মণির বাপ-মা স্নেহ করতেন ; তাঁরা বললেন—মেয়ে যদি ভালো হয় তাঁদের কোনো আপত্তি নেই। তাঁরা চাকরির উপলক্ষে পশ্চিমে থাকেন, এ অবস্থায় স্বঘরের মেয়ের সন্ধান পাওয়াও কঠিন বটে। যখন সন্ধান পাওয়া গিয়েচে ভালো মেয়ের—আর মণির বিয়ে যখন দিতেই হবে, তখন মেয়েটিকে দেখে আসতে দোষ কি?

কুমীর জ্যাঠাকে আগেই চিঠি লেখা হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা সমস্ত জিনিসটাকে অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। অত বড় লোকের ছেলেকে জামাই করার মতো দুরাশা তাঁদের নেই। হীরুর যেমন কাণ্ড!

কিন্তু হীরু পুজোর ছুটিতে সত্যিই মণির এক জাঠতুতো দাদাকে মেয়ে দেখাতে নিয়ে এল।

কুমী এসে হীরুর পায়ের ধুলো নিয়ে নমস্কার করলে।

হীরু বললে—ভালো আছিস্ কুমী?

—এতদিন কোথায় ছিলে হীরুদা?

—চাকরি করচি যে পশ্চিমে জামালপুরে। সাত-আট মাস পরে তো দেশে ফিরচি।

—ও কাকে সঙ্গে করে এনেচ?

হীরু কেশে গলা পরিষ্কার ক'রে বললে—ও আমার এক বন্ধুর দাদা—

—তা এখানে এসেচে কেন?

—এসেচে গিয়ে ইয়ে—এমনি বেড়াতে এসেচেই ধরো—তবে—ইয়ে—

—তোমার আর ঢোঁক গিলতে হবে না। আমি সব জানি, কেন ওসব চেষ্টা করছ হীরুদা?

হীরু বললে—যাও—অমন করে না ছিঃ, চুলটুল বেঁধে দিতে বল গিয়ে। ওঁরা খুব ভালো লোক, আর বড় লোক। জামালপুরে ওঁদের খাতির কি। আমি অনেক কষ্টে ওঁদের এখানে এনেচি। বড় ভালো হবে এ বিয়ে যদি ভগবানের ইচ্ছেয় হয়—

অনেক কষ্টে কুমীকে রাজী করিয়ে তার চুল বাঁধা হ'ল, মেয়ে দেখানোও হ'ল। দেখানোর সময় মেয়ের অজস্র গুণ ব্যাখ্যা ক'রে গেল হীরু। কুমী কিন্তু পাঞ্জাব প্রদেশ কোন দিকে বলতে পারলে না, তাজমহল কে তৈরি করেছিল সে সম্বন্ধেও দেখা গেল সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। হাতের লেখা বেঁকে গেল। গান গাইতে জানে না বললে—যদিও সে ভালোই গাইতে জানে এবং তার গলার সুরও বেশ ভালো।

সঙ্গে ভদ্রলোকটি মেয়ে দেখা শেষ ক'রেই ফিরতি নৌকোতে রেল স্টেশনে চলে গেলেন। রাত্রের ট্রেনেই তিনি খুলনায় তাঁর শ্বশুরবাড়ী যাবেন। যাবার সময়ে ব'লে গেলেন—মতামত চিঠিতে জানাবেন। হীরু তাঁকে নৌকোতে তুলে দিয়ে ফিরে এসে কুমীকে বললে—কি করে বললে—গান গাইতে জানো না? ছিঃ, একি ছেলেমানুষি, ওরা শহরের মানুষ, গান শুনলে খুব খুশী হয়ে যেত। এমনি তো ঘরের কোণে খুব গান বোরোয় গলায়? আর এর বেলা—

কুমী রাগ ক'রে বললে—ঘরের কোণে গান গাইবে না তো কি অসরে বসে গাইতে যাবে? পারব না যার তার সামনে গান গাইতে।

হীরুও রেগে বললে—তবে থাকো চিরকাল আইবুড়ো ধিঙ্গী হয়ে। আমার কি? কুমীর বাড়ীর ও পাড়ার সবাই এজন্য কুমীকে ভর্ৎসনা করলে। গান গাও না গাও, গান গাইতে জানি একথা বলার দোষ ছিল কি? ছিঃ, কাজটা ভালো হয় নি।

বলাবাহুল্য, ভদ্রলোকের কাছ থেকে কোন পত্র এল না এবং হীরু পূজার ছুটি অন্তে জামালপুরে গিয়ে শুনলে, মেয়ে তাঁদের পছন্দ হয় নি।

মাস পাঁচ ছয় কেটে গেল। কি অদ্ভুত পাঁচ-ছ' মাস! কাজ করতে করতে জানালা দিয়ে যখনই উঁকি দিয়ে বাইরের দিকে চায়, তখনই সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, কুমীকে কতবার জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেচে...হাত-পা নড়ে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে হেসে গড়িয়ে পড়ে কুমী গল্প করেচে...নিমফুলের গন্ধভরা কত অলস চৈত্র-দুপুরের স্মৃতিতে মধুর হয়ে উঠেচে বর্তমান কর্মব্যস্ত দিনগুলি...

ইতিমধ্যে এক ছোকরা ডাক্তারের সঙ্গে তার খুব আলাপ হয়ে গেল। নতুন এম-বি পাস ক'রে জামালপুরে প্র্যাকটিস করতে এসেচে, বেশ সুন্দর চেহারা, বাড়ীর অবস্থাও খুব ভালো, তার জ্যাঠামশাই এখানে বড় চাকরি করেন। কথায় কথায় হীরু জানতে পারলে ছোকরা এখনও বিয়ে করে নি এবং কুমীদের পালটি ঘর। অনেক বুঝিয়ে সে তার জ্যাঠা-মশাইকে মেয়ে দেখতে রাজী করালে। মেয়ে দেখাও হ'ল—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু হ'ল না, তাঁদের কুটুম্ব পছন্দ হয়নি শোনা গেল। একে তো অজ পাড়াগাঁ, দ্বিতীয়তঃ তাঁরা ভেবেছিলেন পাড়াগাঁয়ের জমিদার কিংবা অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে, অমন গরীব ঘরের মেয়ে তাঁদের চলবে না।

মাস তিনেক পরে হীরু আর এক বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে গিয়ে পিসিমার বাড়ী হাজির হ'ল। কুমীদের বাড়ীর সবাই বললে—হীরু বড় ভালো ছেলে, কুমীর জন্য চেষ্টা করচে প্রাণপণে। কিন্তু অত বড় বড় সম্বন্ধ এনে ও ভুল করচে, ওসব কি জোটে আমাদের কপালে? মেয়ে পছন্দ হ'লেই বা অত টাকা দিতে পারবো কোত্থেকে?

কুমীর সঙ্গে খিড়কী দোরের কাছে হীরুর দেখা। কুমী বললে—হীরুদা, তুমি কেন এসব পাগলামি করচ বল তো? বিয়ে আমি করব না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি ওসব বন্ধ কর।

হীরু বললে—ছিঃ লক্ষ্মী দিদি, অমন করে না, এবার যে জায়গায় ঠিক করচি, তাঁরা খুব ভালো লোক, এবার নির্ঘাত লেগে যাবে—

কুমী লজ্জায় রাঙা হয়ে বললে—তুমি কি যে বল হীরুদা! আমার রাত্রে ঘুম হচ্চে না, লাগবে কি না লাগবে তাই ভেবে। মিছিমিছি আমার জন্যে তোমাকে লোকে যা তা বলে—তা জানো? তুমি ক্ষান্ত দাও, তোমার পায়ে পড়ি হীরুদা—

হীরু এসব কথা কানে তুললে না। পাত্রপক্ষের লোক নিয়ে এসে হাজির করলে, কিন্তু কুমী কিছুতেই এবার তাদের সামনে আসতে রাজী হ'ল না। সে দস্তুরমতো বেঁকে বসলো।

হীরু বাড়ীর মধ্যে গিয়ে বললে—পিসিমা, আপনারা দেরি করচেন কেন?

কুমীর মা বললেন—এসে বোঝাও না মেয়েকে বাবা! আমরা তো হার মেনে গেলাম। ও চুলে চিরুণী ছোঁয়াতে দেবে না, উঠবেও না, বিছানায় পড়েই রয়েচে।

কুমী ঘর থেকে বললে—পড়ে থাকব না তো কি? বারে বারে সং সাজতে পারবো না আমি, কারো খাতিরেই না। হীরুদাকে বল না—সং সেজে বেরুক ওদের সামনে।

হীরু ঘরের মধ্যে ঢুকে কড়া সুরে বললে—কুমী ওঠ্, কথা শোন,—যা চুল বাঁধগে যা—

—আমি যাব না—

—যাবি নে, চুলের মুঠি ধ'রে টেনে নিয়ে যাব—ওঠ্—দিন দিন ইয়ে হচ্চেন—না? ওঠ্ বলচি—

কুমী দ্বিরুক্তি না ক'রে বিছানা ছেড়ে দালানে চুল বাঁধতে গেল, সাজানো গোজানোও বাদ গেল না, মেয়ে দেখানোও হ'ল, কিন্তু ফল সমানই দাঁড়ালো অর্থাৎ পাত্রপক্ষ বাড়ী গিয়ে চিঠি দেবো ব'লে গেলেন।

জামালপুরের কাজে এসে যোগ দিলে হীরু। কিন্তু সে যেন সর্বদাই অন্যমনস্ক। কুমীর জন্যে এত চেষ্টা ক'রেও কিছু দাঁড়ালো না শেষ পর্যন্ত! কি করা যায়? এদিকে কুমীদের বাড়ীতেও তার পসার নষ্ট হয়েচে, তার আনা সম্বন্ধের ওপর সবাই আস্থা হারিয়েচে। হারাবারই কথা। এবার সেখানেও কথা তুলবার মুখ নেই তার। অত বড় বড় সম্বন্ধ নিয়ে যাওয়াই বোধ হয় ভুল হয়েচে। কুমীর ভালো ঘর জুটিয়ে দেবার ব্যাকুল আগ্রহে সে ভুলে গিয়েছিল যে, বড়তে ছোটতে কখনো খাপ খায় না।

লজ্জায় সে পিসিমার বাড়ী যাওয়া ছেড়ে ছিল।

বছর দুই তিন কেটে গেল।

হীরু চাকুরিতে খুব উন্নতি ক'রে ফেলেচে তার সুন্দর চরিত্রের গুণে। চিফ ইঞ্জিনীয়ারের আপিসে বদলী হ'ল দেড়শো টাকায় মার্চ মাস থেকে।

হীরু আর সেই হীরু নেই। এমনি হয়, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। প্রতি দিন, প্রতি মাস, প্রতি বৎসর, তিলে তিলে মানুষের দেহের ও মনের পরিবর্তন হচ্চে—অবশেষে পরিবর্তন এমন গুরুতর হয়ে ওঠে যে, বহুকাল পরে আবার সাক্ষাৎ হ'লে আগের মানুষটিকে আর চেনাই যায় না। হীরু ধীরে ধীরে বদলেচে। অল্প অল্প ক'রে সে কুমীকে ভুলেচে। রামকৃষ্ণ আশ্রমে যাবার বাসনাও তার নেই বর্তমানে। এর মূলে একটা কারণ আছে, সেটা এখানে বলি। জামালপুরে একজন বয়লার ইন্স্পেক্টার ছিলেন, তাঁর বাড়ী হুগলী জেলায়, রুড়কীর পাস ইঞ্জিনীয়ার, বেশ মোটা মাইনে পেতেন। কিন্তু অদৃষ্টের দোষে তাঁর ছটি মেয়ের বিয়ে দিতে তাঁকে সর্বস্বান্ত হ'তে হয়েচে। এখনও একটি মেয়ে বাকি।

হীরুর সঙ্গে এই পরিবারের বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল! সুরমা হীরুর সামনে বার হয়, তাকে দাদা ব'লে ডাকে, কখনও কখনও নিজের আঁকা ছবি দেখায়, গল্প করে, গান শোনায়।

একদিন হঠাৎ হীরুর মনে হ'ল—সুরমার মুখখানা কি সুন্দর! আর চোখ দুটি—পরেই ভাবল—ছিঃ, এসব কি ভাবচি? ও ভাবতে নেই।

আর একদিন অমনি হঠাৎ মনে হ'লো—কুমীর চেয়ে সুরমা দেখতে ভালো—কি গায়ের রং সুরমার! তখনই নিজের এ চিন্তায় ভীত ও সংকুচিত হয়ে পড়ল। না, কি ভাবনা এসব, মন থেকে এসব জোর ক'রে তাড়াতে হবে। কিন্তু জীবনকে প্রত্যাখ্যান করা অত সহজ হ'লে আজ গেরুয়াধারী স্বামিজীদের ভিড়ে পৃথিবীটা ভর্তি হয়ে যেতো। হীরুর বয়েস কম, মন এখনও মরে নি, শুষ্ক, শীর্ণ, এক অতীত মনোভাবের কংকালের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রাখতে তার নবীন ও সতেজ মন ঘোর আপত্তি জানালে। কুমীর সঙ্গে যা কিছু ছিল, সে অমূলে তরু শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে গিয়েছে আলো-বাতাস ও পৃথিবীর স্পর্শ না পেয়ে।

সুরমাকে বিয়ে করার কিছুদিন পরে সুরমার বাবা বয়লার ফাটার দুর্ঘটনায় মারা গেলেন; রেল কোম্পানী হীরুর শাশুড়ীকে মোটা টাকা দিলে এজন্যে; প্রভিডেন্ট ফণ্ডের টাকাও যা পাওয়া গেল তাতে মেয়ের বিয়ের দেনা শোধ করেও হাতে ছ' সাত হাজার

টাকা রইল। সুরমার মা ও একটি নাবালক ভাইয়ের দেখাশোনার ভার পড়েছিল হীরুর উপর, কাজেই টাকাটা সব এসে পড়লো হীরুর হাতে। হীরু সে টাকায় কয়লার ব্যবসা আরম্ভ করল। চাকরি প্রথমে ছাড়ে নি, কিন্তু শেষে রেল কারখানায় কয়লার কণ্ট্রাক্ট নিয়ে একবার বেশ মোটা কিছু লাভ ক'রে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসাতে ভালো ভাবেই নামল। সুরমাকে বিয়ে করার চার বছরের মধ্যে হীরু একজন বড় কনট্রাক্টার হয়ে পড়ল। শাশুড়ীর টাকা বাদ দিয়েও নিজের লাভের অংশ থেকে সে তখন ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা কারবারে ফেলেচে।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে হীরুর চালচলনও বদলে গিয়েচে। রেলের কোয়ার্টার ছেড়ে দিয়ে মুঙ্গেরে গঙ্গার ধারে বড় বাড়ী ভাড়া নিয়ে সেখানেই সকলকে রেখেচে। রেলে জামালপুরে যাতায়াত করে রোজ, মোটর এখনও করেনি—তবে বলতে শুরু করেচে মোটর না রাখলে আর চলে না; ব্যবসা রাখতে গেলে ওটা নিতান্তই দরকার, বাবুগিরির জন্যে নয়। হঠাৎ এই সময় দেশ থেকে পিসিমার চিঠি এল, তিনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না; বহুকাল হীরুকে দেখেন নি তিনি, তাঁর বড় ইচ্ছে মুঙ্গেরে হীরুর কাছে কিছুদিন থাকেন ও দুবেলা গঙ্গাস্নান করেন।

সুরমা বলে—আসতে যখন চাইচেন, নিয়ে এস গে—আমিও তাঁকে কখনও দেখিনি—আমরা ছাড়া আর তাঁর আছেই বা কে? বুড়ো হয়েচেন—যে ক'দিন বাঁচেন এখানেই গঙ্গা-তীরে থাকুন।

বাসায় আর এমন কেউ ছিল না, যাকে পাঠানো যায় পিসিমাকে আনতে, কাজেই হীরুই দেশে রওনা হলো।

ভাদ্রমাস। দেশ এবার ভেসে গিয়েচে অতিবৃষ্টিতে। কোদ্‌লা নদীতে নৌকোয় ক'রে আসবার সময় দেখলে জল উঠে দুপাশের আউশ ধানের ক্ষেত ডুবিয়ে দিয়েচে। গোয়াল-বাসির বিলে জল এত বেড়েচে যে, নৌকোর বুড়ো মাঝি বললে সে তার জ্ঞানে কখনও এমন দেখেনি, গোয়ালবাসি ও চিত্রাঙ্গপুর গ্রাম দু'খানা প্রায় ডুবে আছে।

অথচ এখন আকাশে মেঘ নেই, শরতের সুনীল আকাশের নিচে রৌদ্রভরা মাঠ, জল বাড়বার দরুন নৌকো চললো মাঠের মধ্য দিয়ে, বড় ববলা বনের পাশ কাটিয়ে। ঘন সবুজ দীর্ঘ লতানে বেতঝোপ কড় কড় ক'রে নৌকার ছইয়ের গায়ে লাগচে, মাঠের মাঝে বন্যার জলের মধ্যে জেগে আছে ছোট ছোট ঘাস, তাতে ঘন ঝোপ।

পিসিমাদের গ্রামে নৌকো ভিড়তে দুপুর ঘুরে গেল। এখানে নদীর পাড় খুব উঁচু বলে কূল ছাপিয়ে জল ওঠে নি; দু-পাড়েই বন, একদিকে হ্রস্ব ছায়া পড়েচে জলে, অন্য পাড়ে খররৌদ্র। ...এই বনের গন্ধ...নদীজলের ছলছল শব্দ...বাঁশবনে সোনার সড়কীর মতো নতুন বাঁশের কোঁড় বাঁশঝাড়ের মাথা ছাড়িয়ে উঠেচে...এই শরত দুপুরের ছায়া... এই সব অতি পরিচিত দৃশ্য একটিমাত্র মুখ মনে করিয়ে দেয়...অনেকদিন আগের মুখ ...হয়তো একটু অস্পষ্ট হয়ে গিয়েচে, তবুও সেই মুখ ছাড়া আর কোনো মুখ মনে আসে না। নদীর ঘাটে নেমে, পথে চলতে চলতে সে মুখ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল মনের মধ্যে...এক ধরনের হাত-নাড়ার ভঙ্গি আর কি বকুনি, অজস্র বকুনি!...জগতে আর কেউ তেমন কথা বলতে পারে না। অনেক দূরের কোন অবাস্তব শূন্যে ঘুরচে সুরমা, তার আকর্ষণের বাইরে এ রাজ্য। এখানে গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবী আর একজন, তার একছত্র অধিকার এখানে —সুরমা কে? এখানকার বন, নদী, মাঠ, পাখি সুরমাকে চেনে না।

হীরু নিজেই অবাক হয়ে গেল নিজের মনের ভাবে।

পিসিমা যথারীতি কান্নাকাটি করলেন অনেকদিন পরে ওকে দেখে। আরও ঢের বেশি বুড়ী হয়ে গিয়েছেন, তবে এখনও অথর্ব্ব হন নি। বেশ চলতে ফিরতে পারেন। হীরুর

জন্যে ভাত চড়াতে যাচ্ছিলেন, হীরু বললে—তোমায় কষ্ট করতে হবে না পিসিমা, আমি চিঁড়ে খাব। ওবেলা বরং রেঁধো।

অনেকবার বলি বলি করেও কুমীর কথাটা সে কিছুতেই পিসিমাকে জিগ্যেস করতে পারলে না। একটু বিশ্রাম ক'রে বেলা পড়লে সে হাটতলার মধু ডাক্তারের ডাক্তারখানায় গিয়ে বসল। মধু ডাক্তারের চুল-দাড়িতে পাক ধরেচে, একটি ছেলে সম্প্রতি মারা গিয়েচে—সেই গল্প করতে লাগল। গ্রামের মক্তবের সেই বুড়ো মৌলবী এখনও আছে ; এখনও সেই রকম নিজের অংকশাস্ত্রে পারদর্শিতার প্রসঙ্গে সাব্-ইনস্পেক্টার মহিমবাবুর গল্প করে। মহিমবাবু ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে এ অঞ্চলে স্কুল সাব্-ইনস্পেক্টরী করতেন। এখন বোধ হয় মরে ভূত হয়ে গিয়েচেন। কিন্তু কোনবার মক্তব পরিদর্শন করতে এসে নিজেই শুভংকরীর সারাকালির একটা অংক দিয়ে নিজেই কষে বুঝিয়ে দিতে পারেন নি, সে গল্প আজও এদেশে প্রচলিত আছে। এই মৌলবী সাহেবের মুখেই হীরু এ গল্প বহুবার শুনেচে।

সন্ধ্যা হবার পূর্বেই হীরু হাটতলা থেকে উঠল। মধু ডাক্তার বললে—বসো হে হীরু সন্ধ্যেটা জ্বালি—তারপর দু-এক হাত খেলা যাক। এখন না হয় বড়ই হয়েচ. পুরোনো দিনের কথা একেবারে ভুলে গেলে যে হে!

হীরু পথশ্রমের ওজুহাত দেখিয়ে উঠে পড়ল। তার শরীর ভাল নয়; পুরোনো দিনের এই সব আবেষ্টনীর মধ্যে এসে পড়ে সে ভালো করে নি।

কুমী এখানে আছে কিনা, এ কথাটা মধু ডাক্তারকেও সে জিগ্যেস করবে ভেবেছিল। ওদের একই পাড়ায় বাড়ী। কুমী মধু ডাক্তারকে কাকা বলে ডাকে। কুমীদের সম্বন্ধে মাত্র সে এইটুকু শুনেছিল যে, কুমীর জ্যাঠামশাই বছর পাঁচেক হোল মারা গিয়েচেন এবং জাঠতুতো ভাইয়েরা ওদের পৃথক করে দিয়েচে।

অন্যমনস্ক ভাবে চলতে চলতে সে দেখলে কখন কুমীদের পাড়াতে একেবারে কুমীদের বাড়ীর সামনেই এসে পড়েচে। সেই জিউলি গাছটা, এই গাছটাতে একবার সাপ উঠে পাখীর ছানা খাচ্ছিল, কুমী তাকে ছুটে গিয়ে খবর দিতে, সে এসে সাপ তাড়িয়ে দেবার জন্য ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি করে। এ পাড়ার গাছে-পালায়, ঘাসে-পাতায় সন্ধ্যার ছায়ায়, শাঁকের ডাকে কুমী মাখানো। এই রকম সন্ধ্যায় কুমীদের বাড়ী বসে সে কত গল্প করেচে কুমীর সঙ্গে!

চুপ করে সে জিউলিতলায় খানিকটা দাঁড়িয়ে রইল।...

তার সামনের পথটা দিয়ে তেইশ চব্বিশ বছরের একটি মেয়ে দুটো গরু দড়ি ধরে নিয়ে আসচে! কুমীদের বাড়ীর কাছে বাঁশতলাটায় যখন এল, তখন হীরু চিনতে পারলে সে কুমী।

প্রথমটা সে যেন অবাক হয়ে গেল...আড়ষ্টের মতো দাঁড়িয়ে রইল। সত্যিই কুমী? এমন অপ্রত্যাশিতভাবে একেবারে তার চোখের সামনে! কুমীই বটে. কিন্তু কত বড় হয়ে গিয়েছে সে!

হঠাৎ হীরু এগিয়ে গিয়ে বললে—কুমী কেমন আছ? চিনতে পারো?

কুমী চমকে উঠল, অন্ধকারে বোধ হয় ভাল করে চিনতে পারলে না. বললে—কে?

—আমি হীরু।

কুমী অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ তার মুখ দিয়ে কথা বার হ'ল না। তারপর এসে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে হীরুর মুখের দিকে চেয়ে বললে—কবে এলে হীরুদা? কোথায় ছিলে এতকাল? সেই জামালপুরে?

—আজই দুপুরে এসেচি।

আর কোন কথা তার মুখ দিয়ে বেরুল না। সে কেবল একদৃষ্টে কুমীর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কুমীর কপালে সিঁদুর, হাতে শাঁখা, পরণে একখানা আধময়লা শাড়ি—যে কুমীকে সে দেখে গিয়েছিল ছ-সাত বছর আগে, এ সে কুমী নয়। সে কৌতূহলোচ্ছল কলহাস্যময়ী কিশোরীকে এর মধ্যে চেনা যায় না। এ যেন নিরানন্দের প্রতিমা, মুখশ্রী কিন্তু আগের মতোই সুন্দর। এতদিনেও মুখের চেহারা খুব বেশী বদলায় নি।

কুমী বললে—এসো আমাদের বাড়ী হীরুদা। কত কথা যে তোমার সঙ্গে আছে, এই ক'বছরের কত কথা জমানো রয়েচে, তোমায় বলব বলব করে কতদিন রইলাম, তুমি এ পথে আর এলেই না।

হয়েছে! সেই কুমী! ওর মুখে হাসি সেই পুরোনো দিনের মতই আবার ফুটে উঠেছে ; হীরু ভাবলে, আর বকুনির শ্রোতা এতদিন পায়নি তাই ওর মুখখানা ম্লান।

—তুই আগে চল্ কুমী।

—তুমি আগে চল, হীরুদা।

চার-পাঁচ বছরের একটি ছেলে রোয়াকে বসে মুড়ি খাচ্ছিল। কুমীকে দেখে বললে—ওই মা এসেচে!

—বসো হীরুদা, পিঁড়ি পেতে দিই! মা বাড়ী নেই, ওপাড়ায় গিয়েচে রায়-বাড়ী, কাল ওদের লক্ষ্মীপুজোর রান্না রেঁধে দিতে। আমি ছেলেটাকে মুড়ি দিয়ে বসিয়ে রেখে গরু আনতে গিয়েছিলুম দীঘির-পাড় থেকে। উঃ—কতকাল পরে দেখা হীরুদা! বসো, বসো। কি খাবে বলো তো? তুমি মুড়ি আর ছোলাভাজা খেতে ভালোবাসতে। বসো, সন্দেটা দেখিয়ে খোলা চড়িয়ে গরম গরম ভেজে দিই। ঘরে ছোলাও আছে, নারকোলও আছে। দাঁড়াও, আগে পিদিমটা জ্বালি।

সেই মাটির ঘর সেই রকমই আছে। সেই কুমী সন্ধ্যা-প্রদীপ দিচ্ছে পুরোনো দিনের মতো, যখন সে কত রাত পর্যন্ত ওদের বাড়ী বসে গল্প করতো। তবুও কত—কত পরিবর্তন হয়ে গিয়েচে! কত ব্যবধান এখন তার আর কুমীর মধ্যে।

কুমী প্রদীপ দেখিয়ে চাল ভাজতে বসল। একটু পরে ওকে খেতে দিয়ে সামনে বসল সেই পুরোনো দিনের মতোই গল্প করতে। সেই হাত-পা নাড়া, সেই বকুনি—সবই সেই। কত কথা বলে গেল। হীরু ওর দিকে চেয়ে থাকে, চোখ আর অন্য দিকে ফেরাতে পারে না। কুমীও তাই।

হীরু বললে—ইয়ে, কোথায় বিয়ে হ'ল কুমী?

কুমী লজ্জায় চোখ নাময়ে বললে—সামটা।

—তা বেশ।

তারপর কুমী বলল, ক'দিন থাকবে এখন হীরুদা?

—থাকবার জো নেই, কাজ ফেলে এসেচি, পিসিমাকে নিয়ে কালই যাব। পিসিমা চিঠি লিখেছিলেন বলেই তো তাঁকে নিতে এলাম।

—না, না হীরুদা, সে কি হয়? কাল ভাদ্র মাসের লক্ষ্মীপুজো, কাল কোথায় যাবে? থাকো এখন দু'দিন। কতকাল পরে এলে। তুমিও তো বিয়ে করেচ, বৌদিকে নিয়ে এলে না কেন? দেখতাম। ছেলেমেয়ে কি?

—দুটি ছেলে একটি মেয়ে।

—বেশ, বেশ। আচ্ছা, আমার কথা মনে পড়তো হীরুদা?

মনে খুব পড়তো না, কিন্তু একথাও ঠিক যে, এখন এমন মনে পড়চে যে সুরমা ও জামালপুর অস্পষ্ট হয়ে গিয়েচে। বড় লোকের মেয়ে সুরমা তার মনের মতো সঙ্গিনী নয়, তার সঙ্গে সব দিক থেকে মেলে—খাপ খায় এই কুমীর। অথচ সুরমার জন্যে দামী

মাদ্রাজী শাড়ী কিনে নিয়ে যেতে হবে কলকাতা থেকে যাবার সময়—সুরমা বলেচে, যাচ্চ যখন দেশে, ফিরবার সময় কলকাতা থেকে পুজোর কাপড়-চোপড় কিনে এনো। এখানে ভালো জিনিস পাওয়া যায় না, দরও বেশি।

আর কুমীর পরণে ছেঁড়া আধময়লা কাপড়।

না—দরিদ্র গৃহলক্ষ্মীকে বড়লোকী উপহার দিয়ে সে তার অপমান করবে না।

কুমী বকেই চলেচে। অনেক দিন পরে আজই ও আনন্দ পেয়েচে—নিরানন্দ অসচ্ছল সংসারের একঘেয়ে কর্মের মধ্যে বালিকাবয়সের শত আনন্দের স্মৃতি নিয়ে পুরোনো দিনগুলো হঠাৎ আজ সন্ধ্যায় কেমন ক'রে ফিরেচে।

ঘণ্টা দুই পরে কুমীর মা এলেন। বললেন—এই যে, জুটেচ দুটিতে? আমি শুনলাম দিদির মুখে যে হীরু এসেচে। কাল লক্ষ্মীপুজো, তাই রায়দের বাড়ী রান্না করে দিয়ে এলাম। তা ভালো আছিস্ বাবা হীরু? কুমী কত তোর কথা বলে! তোর কথা লেগেই আছে ওর মুখে ; এই আজও দুপুর বেলা বলছিল, মা, হীরুদা নদীতে বন্যা দেখলে খুশি হোত ; এবার তো বন্যা এসেছে, হীরুদা যদি দেখতো, খুব খুশি হোত—না মা? তা, আমি তুই এসেছিস্ শুনেই দিদির ওখানে গিয়েছিলুম। বাড়ী নেই দেখে ভাবলাম সে ঠিক আমাদের ওখানে গিয়েচে। তা ব'স বাবা, চট্ করে পুকুর থেকে কাপড় কেচে গা ধুয়ে আসি। গামছাখানা দে তো কুমী। খোকার জন্যে তরকারী এনেচি কাঁসিতে। ওকে ভাত দে। এই ওর বিয়ে দিয়েচি সামটায়—বুঝলে বাবা হীরু? জামাই দোকানে সামান্য মাইনের খাতা-পত্র লেখা কাজ করে। তাতে চলে না। তার ওপর দজ্জাল ভাই-বৌ। খেতে পর্যন্ত দেয় না ভালো করে মেয়েটাকে! এই দেখো—এখানে এসেচে আজ পাঁচ মাস, নিয়ে যাবার নামটি নেই. বৌদিদির হুকুম হবে তবে বৌ নিয়ে যেতে পারবে। আর এদিকে তো আমার এই অবস্থা, মেয়েটার পরণে নেই কাপড়, জামাই আসে যায়, কাপড়ের কথা বলি, কানেও তোলে না। আমি যে কি ক'রে চালাই? তা সবই অদৃষ্ট! নইলে—

কুমী ঝাঁজালো সুরে বললে—আঃ যাও না, গা ধুয়ে এসো না—কি বকবক শুরু করলে—

অদৃষ্ট, হাঁ অদৃষ্টই। সে আজ কোথায়, আর কুমী কোথায় পড়ে কষ্ট পাচ্চে। পরণে কাপড় নেই, পেটে ভাত নেই, জীবনে আনন্দ নেই, সাধ-আহ্লাদ নেই, কিছুই দেখলে না, কিছুই ভোগ করলে না, সবই অদৃষ্ট ছাড়া আর কি?

খানিক রাত্রে হীরু উঠল। কুমী প্রদীপ ধরে এগিয়ে দিলে পথ পর্যন্ত। বললে—আমাদের হারিকেন লণ্ঠন নেই, একটা পাকাটি জেবলে দিই, নিয়ে যাও হীরুদা, বাঁশবনে বড্ড অন্ধকার।

সকালে কুমী পিসিমার বাড়ী এসে ডাক দিলে—কি হচ্চে, ও হীরুদা—

—এই যে কুমী, কামিয়ে নিলাম। এইবার নাইবো।

কুমী ঘরের মধ্যে ঢুকে বললে—কেন, কিসের তাড়া নাইবার এত সকালে? তোমার কিন্তু আজ যাওয়া হবে না হীরুদা—বলে দিচ্চি। আজ ভাদ্রমাসের লক্ষ্মীপুজোর অরন্ধন, তোমায় নেমন্তন্ন করতে এলুম আমাদের বাড়ী। মা বললেন—যা গিয়ে বলে আয়।

হীরু আর প্রতিবাদ করতে পারলে না, কুমীর কাছে প্রতিবাদ করে কোনো লাভ নেই সে জানে। কুমী খানিকটা পরে বললে—আমার অনেক কাজ হীরুদা, আমি যাই। তুমি নেয়ে সকালে সকালে এস।

হীরু বেলা দশটার মধ্যে ওদের বাড়ী গেল। আজ আর রান্নার হাঙ্গামা নেই। কুমী বললে—আজ কিন্তু পান্তা ভাত খেতে হবে জানো তো? আর কচুর শাক—আর একটা কি জিনিস বলো তো?...উঁহু...তুমি বলতে পারবে না।

কুমীর মা বললেন—কাল রাত্রে তুই চলে গেলে মেয়ে অত রাত্রে তোর জন্যে নারকেল কুমড়ো রাঁধতে বসল। বললে, হীরুদা বড় ভালোবাসে মা, কাল সকালে খেতে বলব, রেঁধে রাখি।

কুমী স্নান সেরে এসে একখানা ধোয়া শাড়ী পরেচে, বোধহয় এইখানাই তার একমাত্র ভালো কাপড়। সেই চঞ্চলা মুখরা বালিকা আর সে সত্যিই নেই, আজ দিনের আলোয় কুমীকে দেখে ওর মনে হ'ল—কুমীর চেহারা আরও সুন্দর হয়েচে, তবে ওর মুখে চোখে একটা শান্ত মাতৃত্বের ভাব ফুটে উঠেচে, যেটা হীরু কখনো ওর মুখে দেখে নি। কুমী অনেক ধীর হয়েচে, সংযত হয়েচে। মাথায় সেই রকমের এক ঢাল চুল, মুখশ্রী এখনও সেই রকম লাবণ্যময়। তবুও যেন কুমীকে চেনা যায় না, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বালিকা কুমী অন্তর্হিত হয়েচে, এখন যে কুমীকে সে দেখচে তার অনেকখানিই যেন সে চেনে না।

কিন্তু খানিকটা বসবার পরে হীরুর ও ভ্রম ঘুচে গেল। বাইরের চেহারাটা যতই বদলে যাক না কেন, তার সামনে যে কুমী বার হয়ে এল, সে সেই কিশোরী কুমী। ওর যেটুকু পরিচিত তা ওর মধ্যে থেকে বা'র হয়ে এল—যেটুকু হীরুর অপরিচিত, তা নিজেকে গোপন রাখলে।

কি চমৎকার কুমীর মুখের হাসি। হীরুর মোহ নেই, আসক্তি নেই, আছে কেবল একটা সুগভীর স্নেহ, মায়া, অনুকম্পা—এ এক অদ্ভুত মনের ভাব, কুমীকে সে সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারে তাকে এতটুকু খুশি করবার জন্য।

কুমী কত কি বকচে বসে বসে...পুরোনো দিনের কথা তুলচে কেবল কেবল।

—মনে আছে হীরুদা, সেই একবার জেলেদের বাঁশতলায় আলেয়া জ্বলেছিল—সেও তো এই ভাদ্রমাসে...সেই চারুপাঠ মনে আছে?

হীরুর খুব মনে আছে। সবাই ভয়ে আড়ষ্ট, আলেয়া নাকি ভূত, যে দেখতে যায় তার অনিষ্ট হয়। হীরু সাহস করে এগিয়ে গিয়েছিল দেখতে, কুমীও পিছু পিছু গিয়েছিল।

হীরু বলেছিল—আসছিস্ কেন পোড়ারমুখী, ভূত ধরে খাবে যে—

কুমী ভেংচি কেটে বলেছিল—ইস্! ভূতে ধরে ওঁকে খাবে না—আমাকেই খাবে। আলেয়া বুঝি ভূত? ও তো একরকম বাষ্প, আমি পড়িনি বুঝি চারুপাঠ? শুনবে বলব ...অনেকের বিশ্বাস আছে আলেয়া এক প্রকার ভূতযোনি, বাস্তবিক ইহা তা নয়—

হীরু ধমক দিয়ে বলেছিল—রাখ্ তোর চারুপাঠ—আরম্ভ করে দিলেন এখন অন্ধকারের মধ্যে চারুপাঠ...বলে ভয়ে মরচি—

পরক্ষণেই কুমী খিলখিল করে হেসে উঠে বলেছিল—কি বললে হীরুদা, ভয়ে মরচো? হি হি—হি হি—এত ভয় তোমার যদি এলে কেন? চারুপাঠ পড়লে ভয় থাকতো না—চারুপাঠ তো আর পড় নি?

সেই সব পুরোনো গল্প। আলেয়া...আলেয়াই বটে।

কুমীর যে খানিকটা পরিবর্তন হয়েচে তা বোঝা গেল, যখন ও গ্রামের এক বিধবা গরীব মেয়ের কথা তুললে। আগে এসব কথা কুমী বলত না। এখন সে পরের দুঃখ বুঝতে শিখেচে। মুখুয্যে-বাড়ীর বড় পুরীপাল্লার মধ্যে হর মুখুয্যের এক বিধবা নাতনী—নিতান্ত বালিকা—কি রকম কষ্ট পাচ্চে, পুকুরঘাটে কুমীর কাছে বসে নির্জনে, মৃত স্বামীর রূপগুণের কত গল্প করে—এ কথা কুমী দরদ দিয়ে বলে গেল। সত্যিই মাতৃত্ব ওর মধ্যে জেগেচে, ওকে বদলে দিয়েছে অনেকখানি।

হঠাৎ কুমী বললে—অই দেখো হীরুদা বকেই যাচ্চি। তোমায় যে খেতে দেবো, সে কথা মনে নেই।

তার পরে সে উঠে তাড়াতাড়ি হীরুকে ঠাঁই করে দিয়ে ভাত বেড়ে নিয়ে এল। হাসি-

মুখে বললে—জামালপুরের বাবুর আজ কিন্তু পান্তা ভাত খেতে হবে। রুচবে তো মুখে? নেবু কেটে দেবো এখন অনেক ক'রে নারকোল-কুম্‌ড়ি আছে, কচুর শাক আছে।

এসব সত্যিই হীরু অনেকদিন খায় নি। যা যা সে খেতে ভালোবাসে, কুমী তার কিছুই বাদ দেয় নি। হীরু আশ্চর্য হয়ে গেল—এতকাল পরেও কুমী মনে রেখেচে এ সব কথা।

খেতে বসে হীরু বললে—কুমী, ছেলেবেলা ভালো লাগে, না এখন ভালো লাগে?

—এ কথার উত্তর নেই হীরুদা। ছেলেবেলায় তোমরা সব ছিলে, সে এক দিন ছিল। এখনও তা বলে খারাপ লাগে না—জীবনে নানারকম দেখা ভালো—নয় কি?

—কুমী, একটা কথার উত্তর দে! তোর সংসারের টানাটানি খুব?

—কে বললে একথা? মা বলেছিল সেই তো কাল রাত্তিরে? ও বাজে কথা, জানো তো মা যত বাজে বকে। বুড়ো হয়ে মার আরও জিব আলগা হয়ে গেছে।

—কুমী, আমার কাছে সত্যি কথা বলবিনে?

—ঐ, তুমিও পাগলামি শুরু করলে। নাও, খেয়ে নাও—যত বাজে বকতে পারো—মা গো!...দাঁড়াও, পায়েসটা আনি—কচুর শাক পড়ে রইল কেন অতখানি?...না সে হবে না—

—দ্যাখ্‌ কুমী, আমার কাছে বেশি চালাকি করিস্‌ নে। তোকে আর আমি জানি নে? কোদ্‌লার ঘাটে পায়ে খেজুরকাঁটা ফুটে গিয়েছিল, মুখে একটু রা করিস্‌ নি, জান্‌তে দিস্‌ নি কাউকে—

—আবার?

হীরু চুপ করে গেল। এতখানি ব'লে সে ভালো করে নি, ঝোঁকের মাথায় ব'লে ফেলেচে। কুমী যা ঢাকতে চায়, ও তা বা'র ক'রে কুমীর আত্মসম্মানে ঘা দিতে চায় কেন? ছিঃ—

কুমী বললে—আবার কবে আসবে হীরুদা?

—সত্যি কথা যদি শুনতে চাস্‌, আমার যেতে ইচ্ছে হচ্চে না কিন্তু।

—আবার বাজে বকতে শুরু করেচ হীরুদা। তোমার যা কিছু সব সামনে, চোখের আড়াল হ'লে আর মনে থাকে না। আর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যত বাজে বকুনি—

—তুমি তো জানো না একটুও বাজে বকতে? আমি ইচ্ছে করলে থাকতে পারি নে ভেবেছিস্‌?

—হাঁ, থাকো না দেখি কাজকর্ম বন্ধ করে। বৌদি এসে চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যাবে না?

—আচ্ছা সে যাক, একটা কথার উত্তর তোকে দিতেই হবে। আমি যদি এখানে থাকি তুই খুশি হোস্‌?

—উঃ, মা গো, মুখ বুজে খেয়ে নাও দিকি? কি বাজে বকতেই পারো?

হীরু দুঃখিত ভাবে বললে—আমার এ কথাটারও উত্তর দিবি নে কুমী? তুই এত বদলে গিয়েছিস্‌ আমি এ ভাবতেই পারি নে। আচ্ছা, বেশ।

কুমী হেসে প্রায় লুটিয়ে পড়তে পড়তে বললে—তোমার কিন্তু একটুও বদলায় নি হীরুদা, সেই রকম 'আচ্ছা, বেশ' বলা, সেই রকম কথায় কথায় রাগ করা। আচ্ছা, কি বলব বলো দিকি? তুমি জানো না ও-কথার কি উত্তর আমি দিতে পারি? ভেবে দ্যাখো তা হ'লে আমি বদলাই নি, বদলে গিয়েছ তুমি হীরুদা।

—আচ্ছা কুমী, এতটা না বকে সামান্য দু' কথায় সাদা উত্তর একটা দে না কেন? বকুনিতে আমি কি তোর সঙ্গে পারব?

—না, তা তুমি পারবে কেন? বকতে তুমি একটুও জানো না। হ্যাঁ, হুঁই।

—মন থেকে বলচিস্?

—আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করচে হীরুদা, এতটা বদলে গিয়েচ তুমি? যাও—আমি তোমার কোনো কথার আর উত্তর দেবো না! তুমি না নিজের বুদ্ধির বড় অহঙ্কার করতে?

—কুমী, রাগ করিস্ নে। অনেক কাজের মধ্যে থেকে আমার সূক্ষ্ম-বুদ্ধিটা নষ্ট হয়ে গিয়েচে। যাক্, বাঁচলুম কুমী!

—পায়েসটা খাও তোমার পায়ে পড়ি। আর বকুনিটা কিছুক্ষণের জন্যে ক্ষান্ত রাখো। কিছু তোমার পেটে গেল না এই অনাছিষ্টি বকুনির জন্যে।

কুমী পরদিন এসে বিছানা-বাক্স গুছিয়ে দিলে। ঘাট পর্যন্ত এসে ওদের নৌকোতে উঠিয়ে দিলে। নৌকো ছেড়ে যখন অনেকটা গিয়েছে তখনও কুমী ডাঙায় দাঁড়িয়ে আছে।

দু'পাড়ের নদীচর নির্জন! দুপুরের রৌদ্র আজ বড় প্রখর, আকাশ অদ্ভুত ধরনের নীল, মেঘলেশহীন। বন্যার জলে পাড়ের ছোট কালকাসুন্দি গাছের বন পর্যন্ত ডুবে গিয়েছে। কচুরি-পানার বেগুনী ফুল চড়ার ধারে আটকে আছে। সেই সব বন-জঙ্গলময় ডাঙার পাশ দিয়ে চলেছে ওদের নৌকো। ঝোপের তলায় ছায়ায় ডাহুক চরছে। বন্যার জলে নিমগ্ন আখের ক্ষেতের আখগাছগুলো স্রোতের বেগে থরথর করে কাঁপছে।

ছইয়ের মধ্যে পিসিমা ঘুমিয়ে পড়েচেন। নিস্তব্ধ ভাদ্র অপরাহ্ণ। নৌকোয় তক্তার ওপর বসে বসে হীরু কত কি ভাবছিল। এ গ্রামে যদি সে থাকতে পারত! মধু ডাক্তারের মতো হাটতলায় ওষুধের ডিস্পেন্সারি খুলে? ডাক্তারীটা যদি শিখতো সে!

পুজোর বাজারটা ফিরবার সময় করতে হবে কলকাতা থেকে...অন্ততঃ দেড়-শো টাকার বাজার। আসবার সময় খুব উৎসাহ করে সুরমার কাছ থেকে ফর্দ করে নিয়ে এসেছে...

একটা মানুষের মধ্যে মানুষ থাকে অনেকগুলো! জামালপুরের হীরু অন্যলোক, এ হীরু আলাদা। এ বসে বসে ভাবছে, কুমীদের রান্নাঘরে অরন্ধনের নেমন্তন্ন খেতে বসেছিল, সেই ছবিটা। অনবরত ওই একটা ছবিই...

কুমী বলছে—আমার কথা মনে পড়তো হীরুদা?...

কুমী এখনও কি ঠিক তেমনি হাত-পা নেড়ে কথা বলে...ঠিক সেই ছেলেবেলাকার মতো!...আচ্ছা, আর কারো সঙ্গে কথা ব'লে অমন আনন্দ হয় না কেন? সুরমার সঙ্গেও তো রোজ কত কথা হয়...কই...

রেলের বাঁশির আওয়াজে হীরুর চমক ভাঙলো। ওই স্টেশনের ঘাট দেখা দিয়েছে। সিগ্ন্যাল নামানো, বোধ হয় ডাউন ট্রেনটা আসবার দেরি নেই...

বড়বাবুর বাহাদুরি

আপিসে মাঝে মাঝে নানা পার্টি আসিয়া গোলঞ্চলতা ও গাছ-গাছড়া বিক্রী করিয়া যাইত। ইহাদের নাম লেখা আছে বটে, কিন্তু অনেকেরই ঠিকানা কিছু লেখা থাকে না! এখানে ছোট-খাটো কাজকর্ম সবই হয় নগদ—বড়বাবুর এসিস্ট্যাণ্ট, সে সব পাওনাদারকে সাহেব তো দূরের কথা, বড়বাবুর কাছে পর্যন্ত যাইতে দেয় না।

হরিপদ এবার নগু দালালের হাত দিয়া জিনিস না বেচিয়া নিজেই সরাসরি কোম্পানীর আপিসে লইয়া গিয়া নামাইয়াছিল।

যে পাড়াগাঁয়ে হরিপদ থাকে, গাছ-গাছড়ার সেখানে অভাব নেই। নগু দালালের

পরামর্শেই সে এই সব গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। তাহাকে সে সব চিনাইয়াছিল শান্তি কবিরাজ।

মনপিছু দু' টাকা লরি ভাড়া দিয়া বার বার মাল আনিয়া পোষায় না। হরিপদ সেজন্য এক বছর ধরিয়া বিস্তর গাছপালা মজুদ করিতেছিল। নগু দালাল ইহার মধ্যে দু' তিনবার সন্ধান লইয়াছেও।

—ওহে হরিপদ, মালগুলো এবার দেখচি তুমি পচাবে। আপাং শিমুলের শেকড়, শ্বেতপর্পটি এ সব ছ'মাসের বেশী থাকে না, পচে নষ্ট হয়ে যায়। তখন দুখানা করেও বিক্রী হবে না। নিয়ে এসো হে, নিয়ে এসে ফেল কলকাতায়—।

কিন্তু হরিপদ খুব কাঁচা ছেলে নয়। বেলেঘাটার মুখুয্যে মশায়ের আড়তে সে আর যাইতে প্রস্তুত নয়। অবিশ্যি একথা ঠিক যে, তাহার থাকিবার ও খাইবার কোনো কষ্ট কলিকাতায় হয় না। আজকাল আড়তে উঠিলেই হইল। আড়তের রাঁধুনী বামুন তাহাকে চিনে, তাহাকে গিয়া বলিলেই হইল—ও কুবের ঠাকুর! এখানে দুটো খাব এবেলা।

উহারা যতই খাতির করুক, এবার হরিপদ বেলেঘাটার আড়তে গিয়া উঠে নাই।

নগু দালাল তো জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করে না, তাহাকে সে লাভের একটা মোটা অংশ কেন দিতে যাইবে?

কলিকাতায় এবার আসিয়া সে শুনিল, হিন্দুস্থান কেমিক্যাল কোম্পানী শীতের মরশুমে এই রকম গাছ-গাছড়া কিনিয়া থাকে।

সে সোজা গিয়া হাজির হইল হিন্দুস্থান কেমিক্যাল্ কোম্পানীর আপিসে। প্রচণ্ড ব্যাপার। লোকজন, লিফ্‌ট, দরওয়ান, ঘোরানো দরজা, দিনমানে ইলেক্‌ট্রিক্ আলো জ্বালিয়া কাজ চলিতেছে। ঘন ঘন টেলিফোন বাজিবার শব্দ। এই জন্যেই বোধ হয় নগু দালালের শরণাপন্ন হইতে হয়। এখানে জিনিস বেচা কি পাড়াগাঁয়ে লোকের কর্ম? অবশেষে সন্ধান মিলিল এন্‌কোয়ারী আপিস হইতে।

জিনিস ক্রয় করিবার ভার যার উপর, তার বয়েস খুব বেশি নয়। লোকটা মাল দেখিয়া শুনিয়া যা দর বলিল, বেলেঘাটা মুখুয্যে মশায়ের আড়তের দরের তুলনায় মনপিছু অন্ততঃ আট আনা বেশি।

মাল নামাইয়া ওজন করিয়া দিতে দেরি হইয়া গেল। কেরানী বাবুটি জিজ্ঞাসা করিল—আপনি চেক নেবেন, না নগদ টাকা? কাল এসে টাকা নিয়ে যাবেন তবে। আজ ক্যাশ থেকে টাকা বের ক'রে রেখে দেব। একটা বিল ক'রে বড়বাবুর কাছে সই করিয়ে নিয়ে আসুন। বিলখানা এখানে দিয়ে যাবেন।

পরদিন কাউণ্টারে বেজায় ভিড়। আজ টাকা দিবার দিন, অনেক লোক টাকা লইতে আসিয়াছে। এক-একখানা খামের পাওনাদারের নাম টাইপ করা।

কেরানী বাবু জিজ্ঞাসা করিতেছে—কি নাম? রামশরণ পাল?—এই নিন্। পাওনাদার একখানা খাম লইয়া চলিয়া যাইতেছে—কেহ কেহ বা খাম খুলিয়া নোটগুলি দেখিয়া লইতেছে।

হরিপদর হাতে কেরানী এমনি একখানা খাম দিল। তার ওপরে লেখা আছে **H. P. B.** সামান্য চল্লিশ টাকার জন্য খাম খুলিয়া টাকা দেখিয়া লইতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। এত কাণ্ডকারখানা যেখানে, সেখানে কি আর ভুল হইবার সম্ভাবনা আছে? খামের বাহিরে টাইপ করা অক্ষরে তার নাম লেখা ঠিকই আছে।

কিন্তু শেয়ালদ' ষ্টেশনে আসিয়া খাম খুলিয়া নোটগুলি কি ভাবিয়া একবার দেখিয়া লইতে গিয়া হরিপদ মাথা ঘুরিয়া সেখানে বসিয়া পড়িল। চারিদিকে তাকাইয়া সে তাড়াতাড়ি নোটের খামখানা পকেটে পুরিয়া সোজা প্ল্যাটফর্মে ঢুকিয়া ট্রেনে চড়িয়া

বসিল। শীতকালেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। সর্বনাশ! সব ক'খানাই একশো টাকার নোট। সর্বসুদ্ধ এগারো খানা। চল্লিশ টাকার জায়গায় এগারোশো টাকা!

এ ভুল কি করিয়া হইল হরিপদ বুঝিতে পারিল না। হয়তো তাড়াতাড়িতে অন্য কোনো বড় পাওনাদারের খাম তাহাকে দিয়াছে। তাহারও নাম বোধ হয় H. P. B., অত ভিড়ের মধ্যে কেরানী বাবু কাহার নামের খাম কাহাকে দিয়াছে।

এগারোশো টাকা তাহার নিকট অ-নে-ক টাকা। সামান্য অবস্থার মানুষ সে, গাছ-গাছড়া বেচিয়া সংসার চালায়! ভগবান দিয়া দিয়াছেন—উঃ, আর কি সময়েই দিয়াছেন—ভগবানের দান তো! সারা-জীবন গাছ-গাছড়া বিক্রয় করিয়াও সে এগারোশো টাকা জমাইতে পারিত না। আর একসঙ্গে নগদ এতগুলি টাকা হাতে পাওয়া কি সোজা কথা? কার মুখ দেখিয়াই না সে উঠিয়াছিল!

ট্রেনে যাইতে যাইতে ঠান্ডা হাওয়া লাগিয়া তাহার উত্তেজনা অনেকটা শান্ত হইল। কিন্তু একটা উত্তেজনা তখনও কমিল না—কতক্ষণে স্ত্রীর কাছে কথাটা বলিবে। গাড়ী যেন চলিতে চাহিতেছে না, এত বড় আনন্দের খবর কাহাকেও না জানাইতে পারিয়া, ভগবান জানেন কি অসহ্য যন্ত্রণা যে তাহার হইতেছে!

গাড়ীর কোণে একটা প্রৌঢ় ভদ্রলোক গলায় কম্ফর্টার জড়াইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাকে গিয়া কথাটা বলিবে?

—দেখুন মশায়, বড় একটা মজা হয়েচে। একটা আপিসে চল্লিশটা টাকা পেতুম, তারা ভুল ক'রে এগারোশো টাকা দিয়েচে। এই দেখুন টাকা।

আপিসের নাম সে তো বলিতে যাইতেছে না?

দরকার নাই, সন্দেহ করিয়া লোকটা যদি পুলিশে খবর দেয়!

আপিসের লোকে নিশ্চয়ই ভুল ধরিয়া ফেলিবে এবং তখনি তাহার সন্ধানে লোক ছুটিবে। ছুটিলেও তাহার ঠিকানা বাহির করার কোনো উপায় নাই। একশো টাকার নোটগুলি ভাঙ্গাইয়া ফেলিতে হইবে। সিরাজগঞ্জে তাহার মামা পাটের আপিসে কাজ করেন, মামার সাহায্যে একশো টাকার নোট ভাঙ্গাইয়া খুচরা দশ টাকার নোট সংগ্রহ করিতে হইবে। কালই সকালের ট্রেনে সিরাজগঞ্জ রওনা হওয়া দরকার।

হরিপদর স্ত্রী আশালতা নোটের তাড়া দেখিয়া অবাক্ হইয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল। বলিল—হ্যাঁগা, তারা বুঝতে পারলে না, ভুল ক'রে কার টাকা কাকে দিলে!

—বড় বড় আপিসের মজাই তো তাই। বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। এদিকে এক এক ডিপার্টমেণ্টে পঞ্চাশ ষাট একশো লোক খাটচে, আর ও দিকে ওই কান্ড। বড়বাবুর কাছে যাও, বিল সই করে নিয়ে এসো, ক্যাশে যাও, আবার সই করাও। সব মিথ্যে জাঁকজমক আর কেতা-দুরস্ত।

আশালতা বলিল, কিন্তু ওসব নোটের শুনেচি নম্বর থাকে, যদি পুলিশে হুলিয়া করে দেয়, তুমি নোট ভাঙ্গাবে কি করে? ওইখানেই তো ভয়!

—কিছু ভয় নেই। প্রথম তো আজকাল একশো টাকার নোটের নম্বর থাকে না শুনেচি। অতবড় অপিসে একশো টাকার যে সাধারণ নম্বর থাকে, তা টুকে রাখবে না। আর তা ছাড়া কালই সিরাজগঞ্জে গিয়ে মামার কাছ থেকে সব নোট ভাঙ্গিয়ে আনচি। আমার ঠিকানা ওদের কাছে নেই যে ধরবে। নাম দেখে ধরতে পারবে না।

হরিপদর স্ত্রী বলিল—ভালোয় ভালোয় নোটগুলো ভাঙ্গিয়ে তো আনো। সামনের পুন্নিমের দিন সত্যনারায়ণের শিন্নি দিয়ে দিই। ও টাকা ভগবান আমাদের মুখ চেয়ে দিয়েছেন।

সিরাজগঞ্জে গিয়া টাকা ভাঙ্গাইয়া আনিতে কোনো বাধা হইল না। কথা ফাঁস করিতে

হয় নাই, চতুর হরিপদ মামাকে বলিল, ব্রহ্মোত্তর ধানের জমিগুলো সব বেচে দিলুম। কি করি, একটা ব্যবসা খুলব, টাকা যোগাড় করি কোথা? সত্যনারায়ণের শিন্নি দেওয়াও ভুলিয়া গেল।

মাস খানেক কাটিয়া গিয়াছে। অন্য কোনো দিক হইতেই হাঙ্গামা বাধে নাই বটে, কিন্তু হরিপদ বড় বিপদে পড়িয়াছে, এই এক মাস তাহার মনের দিক হইতে একটা বড় গোলমাল বাধিয়া গিয়াছে। এই টাকাটা লইয়া সে কি ভালো করিল!

আপিসের তাহারা এতদিন তাহাদের ভুল নিশ্চয়ই জানিয়া ফেলিয়াছে। তাহার খোঁজও করিয়াছে। কিন্তু কোথায় পাইবে তাহার পাত্তা। সেই কেরানী বাবুর উপরে নিশ্চয়ই সব দায়িত্ব পড়িয়াছে এবং এতদিন বেচারীর চাকরি আছে কিনা সন্দেহ।

যতই দিন যাইতে লাগিল, হরিপদ ততই মনে অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিল। যতদিন পুলিশের ভয় ছিল, বা আপিস হইতে তাহার টাকা কাড়িয়া লইবার ভয় ছিল, ততদিন তাহার মনে এ কথা ওঠে নাই যে, এ টাকা লওয়া অন্যায় বা পাপ। কিন্তু এ সম্বন্ধে যতই সে নিজেকে নিরঙ্কুশ বোধ করিতে লাগিল, ততই মনে হইতে লাগিল এ টাকায় তাহার কোনো অধিকার নাই, এ অপরের টাকা সে চুরি করিয়া আনিয়াছে।

ছ'মাস কাটিয়া গেল; কখনো সে ভাবে, টাকাটা ফিরাইয়া দিব; আবার পরদিনই মনে হয় এই এগারোশো টাকায় একখানি মুদীর দোকান খুলিয়া গ্রামে বসিয়া সে চমৎকার চালাইতে পারে। ভগবান তাহাদের দুঃখ দেখিয়া মূলধন যোগাড় করিয়া দিয়াছেন! থাক্, টাকাটা।

টাকা ফেরত দেওয়ার একটা প্রধান বাধা দাঁড়াইয়াছে হরিপদর স্ত্রী। সে যেদিন হইতে শুনিয়াছে স্বামী টাকা ফেরৎ দেওয়ার সংকল্প করিতেছে, সেদিন হইতে সে কাঁদিয়াকাটিয়া অনর্থ বাধাইয়াছে। গরীবের ঘরের মেয়ে, গরীবের ঘরের বৌ—তার কাছে এগারোশো টাকা একটা খুব বড় ব্যাপার।

হরিপদ তাহাকে বুঝাইয়া বলিল—দ্যাখো, ফাঁকির টাকা তো বটে! এতদিন কথাটা ভালো করে বুঝিনি, আজকাল রাত্রে আমার ঘুম হয় না ভেবে ভেবে তা জানো? কাজ নেই বাপু, এগারোশো টাকা ক'দিন খাব? ওটা তাদের দিয়েই আসি।

আশালতা বলিল—ফাঁকির টাকা হ'ল কি ক'রে? ভগবান না দিলে তাদেরই বা ভুল হবে কেন? ও যখন ঘরে এসেচে, তখন হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না, আমার কথা শোনো, ও নিয়ে ভেবে মিথ্যে মাথা খারাপ কোরো না লক্ষ্মীটি। ও তো তুমি কোন একটা লোককে ফাঁকি দিয়ে নিয়ে আসোনি, তারা ভুল করে দিয়েচে, এতে তোমার দোষ কি? কারো একজনের টাকা নয়, কোম্পানীর টাকা, বড় লোক কোম্পানী, তাদের কাছে এগারোশো টাকা কিছুই নয়, কিন্তু আমাদের কাছে অনেক বেশি। সারা জীবনের একটা হিল্লে হয়ে যাবে। আমি কি আমার নিজের জন্যই বলি, নিজের চেহারাটা একবার আয়না.. দেখো দিকি? বনজঙ্গলে ঘুরে গাছপালা খুঁজে খুঁজে কি ছিরি বেরিয়েচে। ওই টাকায় একখানা দোকান করো, বসে চলবে।

কি ভয়ানক বাধা হইয়া উঠিয়াছে স্ত্রীর এই অনুরোধ। কেন ছাই এ কথা ও স্ত্রীকে বলিতে গিয়াছিল? ওর মুখের দিকে চাইলে কষ্ট হয়, ওর কাতর অনুরোধ শুনিলে মনে হয়—দূর করো, কাজ নাই সাধুতা দেখাইয়া। ওই অভাগিনীকে জীবনে কখনো সে সুখী করিতে পারে নাই, টাকাটায় একটা ব্যবসা খুলিয়া দিলে অন্নবস্ত্রের কষ্টের একটা মীমাংসা হইবে। এখানে সাধু সাজা স্বার্থপরতা, ঘোর স্বার্থপরতা।

আশালতার বয়েস কম, জীবনে কোনো সাধ ওর পূর্ণ হয় নাই। ওর মুখের দিকে চাহিয়া না হয় সে নিজের কাছে অসাধুই হইয়া রহিল।

দিনে এই সব ভাবে, কিন্তু গভীর রাত্রে যখন গ্রাম নিষুতি হইয়া যায়, আশালতা ঘুমাইয়া পড়ে, তখন তার মনে হয় চুরির স্বপক্ষে কি চমৎকার যুক্তিই সে বাহির করিয়াছে। জুয়াচুরি জুয়াচুরিই, তার স্বপক্ষে কোনো যুক্তি নাই, তর্ক নাই। টাকা তাকে ফিরাইয়া দিতেই হইবে, নিজের কাছে চোর হইয়া সে থাকিতে পারিবে না।

নিদ্রিত আশালতার মুখের দিকে চাহিয়া সে ভাবিল—ছি ছি, মেয়েমানুষ জাতটা কি ভয়ঙ্কর! ওদের মনে কি এতটুকু সৎ কিছু জানে না? কেবল টাকা-কড়ি, গহনা, চাল-ডালের দিকে নজর?

দিন যায়। হরিপদ দেখিল, সে স্ত্রীকে মনে মনে অশ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার কত আদরের আশালতা! যাহাকে চোখ ভরিয়া দেখিয়াও চোখের তৃপ্তি হইত না, তাহার সম্বন্ধে এ সব কি ভাবনা তার মনে?

একদিন হঠাৎ তাহাদের একটা বাছুর মরিয়া গেল।

এবার হরিপদ ভাবিল—তা যাবে না? সংসারে যখন ওর মতো মেয়ে এসেচে। তখন ওর পরমর্শেই সংসার এবার উচ্ছন্নে যাবে।

দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ ধারণা তাহার বদ্ধমূল লইতে লাগিল। আজকাল স্ত্রীর প্রতি ব্যবহারটা দিন দিন রুক্ষ হইয়া উঠিতেছে। সামান্য কথায় খিটখিট করে, সামান্য ব্যাপার লইয়া স্ত্রীকে দু'কথা শুনাইয়া দেয়। মনের মিলের জোড় ক্রমে অলক্ষিতে খুলিতে লাগিল। আশালতা ভাবিয়া কূল পায় না, তাহার অমন স্বামী কেন এমন হইয়া যাইতেছে দিন দিন? ক্রমে তাহার মনেও ভাঙন শুরু হইল! ভাবে এত হেনস্তা কিসের? কোন্ জিনিসটাতে আমার ত্রুটি হয়? উদায়স্ত মুখে রক্ত উঠে খেটে মরি, সে কথা একবার বলা তো দূরের কথা, উল্টে আবার পান থেকে চুন খসলেই এই সব গাল-মন্দ, অপমান?

গত মাসখানেক সেই আপিসের টাকাতে হাত পড়িয়াছে। এরই মধ্যে ত্রিশ চল্লিশ টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। আশালতা ভাবে—'ওর শরীরটা খারাপ হয়ে গিয়েচে রোদে রোদে সাত গাঁয়ের বন-জঙ্গলে ঘুরে। ওকে একটু সারিয়ে তুলি।' গত মাস হইতে আশালতা রাত্রে প্রায়ই লুচি ভাজিয়া স্বামীকে খাওয়ায়। মাঝে মাঝে ভালো খাবার-দাবার করে। একদিন বলিল—ওগো, তোমার পায়ের দিকে একবার নজর দাও। এক জোড়া জুতা কিনো দিকি ভালো দেখে। জলে-জলে পা হেজে পাঁকুই ধরে গেল যে!

একদিন সন্ধ্যার পর হরিপদ খাইতে বসিয়াছে, আশালতা তাহার জন্য দুধ গরম করিয়া আনিতে গিয়াছে। হঠাৎ হরিপদ লুচি চিবাইতে চিবাইতে বেকায়দায় জিভ কামড়াইয়া ফেলিয়া যন্ত্রণায় বলিয়া উঠিল—উঃ—

ঠিক সেই সময় আশালতা দুধের বাটি লইয়া আসিয়া বলিল—কি হ'ল গা? হরিপদ বাঁ হাত দিয়া গলাটা চাপিয়া ধরিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া মুখ বিকৃত করিয়া বসিয়া রহিল, কোন কথা বলিল না।

আশালতা পুনরায় উদ্বেগের সুরে বলিল—কি হয়েচে, হ্যাঁগো? অমন করে আছ কেন? হরিপদ সঙ্গে সঙ্গে রুক্ষসুরে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—হবে আর কি, যেদিন থেকে তুমি অলক্ষ্মী ঘরে ঢুকেচ, সেদিন থেকে এ সংসারের ভাষ্যি নেই। শুধু শুধু নইলে গরুর বাছুরটাই বা মরে যাবে কেন, আর—বলিয়া লুচির থালা হাতের ঠেলায় সজোরে দশ হাত তফাতে ছিটকাইয়া ফেলিয়া হরিপদ উঠিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

আশালতা দুধের বাটি-হাতে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হরিপদ অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিল। আসিয়া দেখিল, স্ত্রী বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া আছে। জিভের ব্যথা কমিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইয়াছে—ছিঃ, অমন করে তখন বলাটা ভালো হয়নি—নাঃ, একটু বেশি বলা হয়ে গিয়েচে—তখন আর মাথার ঠিক

ছিল না তো।—ছিঃ। ঘরে ঢুকিয়া স্ত্রীকে ওভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল—'নাও ওঠো, রাগ করেচ নাকি? খাওয়া-দাওয়া হয়েচে?' আশালতা ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, কোন কথা বলিল না।

হরিপদ স্ত্রীর হাত ধরিয়া উঠাইতে গেল। আশালতা আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিল, থাক, বোসো এখানে, একটা কথা বলি।

—কি?

—দেখো সে টাকা তুমি ফেরত দিয়ে এসো। যা খরচ হয়েছে, আমার চুড়ি ক'গাছা বন্ধক দিয়ে হোক, বেচে হোক, সেটা পুরিয়ে দাও গিয়ে। ওই টাকা যেদিন থেকে ঘরে ঢুকেচে, সেদিন থেকে সংসারের শান্তি চলে গিয়েচে, ও আর কিছুদিন থাকলে একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তুমি কাল যাও, টাকা ফেলে দিয়ে এসো গিয়ে।'

রাত্রিটা কাটিয়া গেলে হরিপদ দেখিল, প্রায় একশো টাকা আন্দাজ খরচ হইয়া গিয়াছে সেই টাকা হইতে। স্ত্রীর গহনা লইয়া সেদিনই সে কলিকাতা রওনা হইল এবং পোদ্দারের দোকানে বেচিয়া টাকাটা সংগ্রহ করিল। কোম্পানীর আপিসে গিয়া ভাবিল, কোনো ছুটো কেরানীর কাছে টাকাটা দেব না,—হিসেবের বাইরের টাকা সে মেরে দেবে। সে একেবারে সরাসরি বড়বাবুর ঘরে গিয়া হাজির হইল।

বড়বাবু বলিলেন, কি চান?

হরিপদ সব খুলিয়া বলিল। ঘরে আর কেহ ছিল না। বড়বাবু আশ্চর্য হইয়া গেলেন। এই টাকা লইয়া আপিসে যথেষ্ট গোলমাল হইয়া গিয়াছে। হরিপদ যাইবার দু'দিন পরে ভুল ধরা পড়ে। তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু পারা যায় নাই। যে কেরানী ভুল করিয়াছিল, তাহার মাহিনা হইতে প্রতি মাসে ত্রিশ টাকা করিয়া কাটিয়া লওয়া হইতেছে এবং পূজার বোনাস্ সে কখনো পাইবে না, এই বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

আজ দু'মাস আড়াই মাস পরে সেই পলাতক লোকটি টাকা ফেরত দিতে আসিয়াছে! ব্যাপারখানা কি? বড়বাবু এমন কাণ্ড কখনো তাঁহার বাহান্ন বছর বয়সে দেখেন নাই।

জিজ্ঞাসা করিলেন, পুরো টাকাই দেবেন তো? নিয়ে এসেচেন সব? তা এতদিন আসেন নি কেন?

হরিপদ বলিল, যখন টাকাটা এখান থেকে নিয়ে গেলুম, তখন বুঝতে পারিনি যে এত টাকা নিয়ে যাচ্ছি। ধরা পড়ল অনেক পরে বাড়ী গিয়ে। তারপর লোভ প্রবল হয়ে উঠল বড়বাবু, আমরা গরীব লোক, এতগুলো টাকার লোভ সামলানো সোজা কথা তো নয়!

বড়বাবু বলিলেন—বেশ, টাকা দিয়ে যান।

টাকা গুনিয়া দিয়া হরিপদ চলিয়া গেল। আপিসে ইতিমধ্যে অনেকেই কথাটা শুনিয়াছে, তাহারা বড়বাবুর কাছে কথাটা শুনিতে আসিল। এতদিন পরে টাকা ফেরত দিতে আসিল কি ব্যাপার?

বড়বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—হুঁ-হুঁ—তোমরা তো জানো না। কোম্পানীর জন্যে কত খেটে মরি, নামও নেই এ আপিসে, যশও নেই। বাছাধন আজ এতকাল পরে এসেচেন বোধ হয় মাল বিক্রি করতে। ভেবেচেন এতদিন আর চিনতে পারবে না। জিজ্ঞেস করলুম আপনার নামটি কি? আপনি একবার জিনিস বেচতে এসে বেশী পেমেণ্ট নিয়ে গিয়েছিলেন না? আমি ওকে বিল সই করতে দেখেচি—চেহারা দেখেই ভাবলুম, এ ঠিক সেই লোক। যেমন বলেচি, বাছাধনের মুখটি চুন। বললুম, টাকা ফেলো, নইলে পুলিশে দেব। ব্যবসাদার লোক, পাওনা টাকা আদায় করেছিল বোধ হয়। সঙ্গে টাকাও ছিল, তা থেকে

ভয়ে ভয়ে আমাদের টাকাটা বের করে দিলে। যাবে কোথায়? কত বড় ফাঁদে পা দিয়েচে, ; জানে না।

বড়বাবুর জয়-জয়কার পড়িয়া গেল।

অন্নপ্রাশন

খোকার অবস্থা শেষ রাত হইতে ভালো নয়।

কি যে অসুখ তাই-ই কি ভালো করিয়া ঠিক হইল? জান্তিপুরের সদানন্দ নাপিত এ সব গ্রামে কবিরাজী করে, ভালো কবিরাজ বলিয়া পসারও আছে। সে বলিয়াছিল, সান্নিপাতিক জ্বর। মহেশ ডাক্তারের কম্পাউন্ডার একটাকা ভিজিটে রোগী দেখে, সে বলিয়াছিল, ম্যালেরিয়া। মহেশ ডাক্তারকে আনিবার মতো সংগতি থাকিলে এতদিন তাহাকে আনা হইত; কাল বৈকালে যে আনা হইয়াছিল সে নিতান্ত প্রাণের দায়ে, খোকা ক্রমশঃ খারাপের দিকে যাইতেছে দেখিয়া খোকার মা কান্নাকাটি করিতে লাগিল, পাড়ার সকলেই মহেশকে আনিবার পরামর্শ দিল, পরিবারের গায়ের একমাত্র সোনার অলংকার মাকড়ি জোড়াটা বাঁধা দিয়া আটটা টাকা কেশব ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়া ও ভিজিটেই ডাক্তারের পাদ-পদ্মে ঢালিয়াছে। তবুও তো ওষুধের দাম বাকি আছে, নিতান্ত কম্পাউন্ডারবাবু এখানে ডাকডোক পান, সেই খাতিরেই টাকা-দুই আন্দাজ ওষুধের বিলটা এক হপ্তার জন্য বাকি রাখিতে রাজী হইয়াছেন।

এই তো গেল অবস্থা!

মহেশ ডাক্তার বলিয়া গিয়াছেন, কোন আশা নাই। অসুখ আসলে নিউমোনিয়া, এত-দিন যা-তা চিকিৎসা হইয়াছে। রাতটা যদি বা কাটে, কাল দুপুরে 'ক্রাইসিস' কাটাইবার সম্ভাবনা কম।

কেশব এ কথা জানিত, কিন্তু স্ত্রীকে জানায় নাই। শেষ রাত্রের দিকে যখন খোকার হিক্কা আরম্ভ হইল, খোকার মা বলিল—ওগো, খোকার হিক্কা উঠেচে, একটু ডাবের জল দিলে হিক্কাটা সেরে যাবে এখন।

জল দেওয়া হইল, হেঁচকি ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কমিবার নামটিও করে না। অতটুকু কচি বালকের সে কি ভীষণ কষ্ট! এক একবার হেঁচকি তুলিতে তার ক্ষুদ্র দুর্বল বুকখানা যেন ফাটিয়া যাইতেছে। আর তার কষ্ট দেখা যায় না, তখন কেশবের মনে হইতেছিল, "হে ভগবান্! তুমি হয় ওর রোগ সারিয়ে দাও, নয় তো ওকে নাও, তোমার চরণে স্থান দাও, কচি ছেলের এ কষ্ট চোখের ওপর আর দেখতে পারি নে।"

সূর্য উঠিবার পূর্বেই খোকা মারা গেল।

কেশবের স্ত্রী কাঁদিয়া উঠিতেই পাশের বাড়ী হইতে প্রৌঢ়া বাঁড়ুয্যে-গিন্নি-ছুটিয়া আসিলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর তিন মেয়ে আসিল। সামনের বাড়ীর নববিবাহিতা বধূটিও আসিল। বধূটি বেশ, আজ মাস-দুই বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু খোকার অসুখের সময় দুবেলা দেখা শোনা করা, রোগীর কাছে বসিয়া খোকার মাকে স্নানাহারের অবকাশ দেওয়া, নিজের বাড়ী হইতে খাবার করিয়া আনিয়া খোকার মাকে খাওয়ানো—ছেলেমানুষ বৌয়ের কাণ্ড দেখিয়া সবাই অবাক্। এখন সে আসিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। বড় নরম মনটা।

দশ মাসের ছেলে মোটে। শ্মশানে লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই।

খোকাকে কাঁথা জড়াইয়া কেশব আগে আগে চলিল, তার সঙ্গে পাড়ার আরও তিন-চারজন লোক। ঘন বাঁশবাগান ও বনের মধ্যে সুঁড়ি-পথ। এত সকালে এখনও বনের মধ্যে রৌদ্র প্রবেশ করে নাই, হেমন্তের শিশিরসিক্ত লতাপাতা, ঝোপঝাপ হইতে একটা আর্দ্র অস্বাস্থ্যকর গন্ধ বাহির হইতেছে।

ওপাড়ার সতু বলিল—আর বেশীদূর গিয়ে কি হবে, কি বলো রজনী খুড়ো? এখানেই—

কেশব বলিল—আর একটু চল বিলের ধারে—

বিলের ধারে ঘন বাঁশবনের মধ্যে গর্ত করিয়া কাঁথা-জড়ানো শিশুকে পুঁতিয়া ফেলা হইল। দশ মাসের দিব্যি ফুটফুটে শিশু, কাঁথা হইতে গোলাপ ফুলের মতো ছোট মুখ-খানি বাহির হইয়া আছে। মুখখানিতে ছোট্ট একটুখানি হাঁ, মনে হইতেছে যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কেশবের কোলেই ছেলে, গর্তের মধ্যে পুঁতিবার সময় সে বলিল—গা এখনও গরম রয়েচে।

রজনী খুড়ো ইহাদের মধ্যে প্রবীণ, তিনি বলিলেন—আহা-হা' ওসব ভেবো না। সতু, নাও না ওর কোল থেকে, ওর কোলে কি বলে রেখে দিয়েচ?

গর্তে মাটি চাপান হইল। কেশব অবাক্ নয়নে গর্তের মধ্যে যতক্ষণ দেখা যায়, চাহিয়া রহিল। ছোট্ট মুঠাবাঁধা হাত দুটি মাটি চাপা পড়িয়া অদৃশ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা শেষ হইয়া গেল।

রজনী খুড়ো বলিলেন—চল হে বাবাজী, ওদিকে আর চেও না। সংসার তবে আর বলেচে কেন? আমারও একদিন এমন দিন গিয়েচে, আমার সেই মেয়েটা—জান তো সবই। আজ আবার তোমার মনিব-বাড়ী কাজ, তোমারও তো সেখানে থাকতে হবে। দেখ তো, দিন বুঝে আজই—

কাজটা সাঙ্গ হইয়া গেল খুব সকালেই। বাড়ী যখন ইহারা ফিরিল, তখন সবে রোদ্র উঠিয়াছে।

একটু পরে সান্ন্যাল-বাড়ী হইতে লোক আসিল কেশবকে ডাকিতে। বলিল—আসুন মুহুরী মশায়, বাবু ডাকচেন। তিনি সব শুনেচেন, কাজকর্ম করলে মনটাকে ভুলে থাকবেন, সেই জন্যে ডেকে নিয়ে যেতে বলে দিলেন।

আজ সান্ন্যাল-বাড়ীর মেজবাবুর ছেলের অন্নপ্রাশন। সান্ন্যালেরা গ্রামের জমিদার না হইলেও খুব সম্পন্ন গৃহস্থ বটে। পয়সাওয়ালা ও বর্ধিষ্ণু। এ অঞ্চলে প্রতিপত্তিও খুব। তেজারতিতেও ষাট সত্তর হাজার টাকা খাটে। পাশাপাশি আট-দশখানা গ্রামে এমন চাষী প্রায় নাই, যে সান্ন্যালদের কাছে হাত পাতে নাই।

কেশব বলিল, চল যাচ্ছি, ইয়ে···বাড়ীতে একটু শান্ত করে যাই! মেয়েমানুষ, বড্ড কান্নাকাটি করচে।

সান্ন্যালেরা লোক খুব ভালো। বৃদ্ধ সান্ন্যাল মশায় কেশবকে দেখিয়া বলিলেন, আরে, এস এস কেশব। আহা, শুনলাম সবই। তা কি করবে বল। ও দেবকুমার, শাপভ্রষ্ট হয়ে এসেছিল, কি রূপ, তোমার অদৃষ্টে থাকবে কেন? যেখানকার জিনিস সেখানে চলে গিয়েচে! তা ও আর ভেবো না, কাজকর্মে থাক, তবুও অনেকটা অন্যমনস্ক থাকবে। দেখ গিয়ে বাড়ীর মধ্যে ভাতের উনুনগুলো কাটা হচ্চে কি না। বৌমাকেও অনাতে পাঠাচ্চি, তিনিও এসে দেখাশুনো করুন, কাজের বাড়ী ব্যস্ত থাকবেন।

মোটরে করিয়া একদল মেয়ে-পুরুষ কুটুম্ব আসিল।

শহরের লোক। মেয়েদের গহনার বাহার নাই, সে সব বালাই উঠিয়া গিয়াছে, শাড়ির রঙচঙে চোখ ধাঁধিয়া গেল। মেয়েরা ঠিকই কলিকাতার চাল শিখিয়া ফেলিয়াছে,—কিন্তু এ সব পাড়াগাঁয়ের শহরে পুরুষদের বেশভূষা নিজের নিজের ইচ্ছামত—ধুতির সঙ্গে কোট পরা এখানকার নিয়ম, কেউ তাতে কিছু মনে করে না।

চারিধারে হাসিখুশি, উৎসবের ধুম। কেশবের মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা প্রকাণ্ড বড় ফাঁকা, এদের হাসিখুশির সঙ্গে তার মিল খাইতেছে না। আচ্ছা, এদের মধ্যে কেউ

বোধ হয় জানে না, তার আজ সকালে কি হইয়া গিয়াছে…

একটি ভদ্রলোক চার বছরের একটি ছেলেকে সংগে লইয়া গাড়ী হইতে নামিলেন। বেশ সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটি, গায়ে রাঙা সিল্কের জামা, কোঁচান ধুতি পরনে এতটুকু ছেলের, পায়ে রাঙা মখমলের উপর জরির কাজ করা জুতো। কি সুন্দর মানাইয়াছে।

কেশবের ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া ভদ্রলোকটিকে বলে—শুনুন মশায়, আমারও একটি ছেলে ছিল, অবিকল এমনটি দেখতে। আজ সকালে মারা গেল। আপনার ছেলের মতোই তার গায়ের রং।

মহিমপুরের নিকারীরা মাছ আনিয়া ফেলিল। গোমস্তা নবীন সরকার ডাকিয়া বলিল—ওহে কেশব, চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকো না, চট করে মাছগুলোর ওজনটা একবার দেখে নিয়ে ওদের হাতচিঠেখানা সই করে দাও—দাঁড়িয়ে থাকবার সময় নেই—কাতলা আধ মনের বেশি হলে ফেরত দিও—শুধু রুইয়ের বায়না আছে।

নবীন সরকার জানে না তাহার খোকা আজ সকালে মারা গিয়াছে। কি করিয়া জানিবে, ভিন গাঁয়ের লোক, তাতে এই ব্যস্ত কাজের বাড়ীতে ; সে খবর তাকে দেওয়ার গরজ কার ?

কেশব একবার নবীন সরকারকে গিয়া বলিবে—গোমস্তা মশায়, আমার খোকাটি মারা গিয়েছে আজ সকাল বেলা। ফুটফুটে খোকাটি! বড় কষ্ট দিয়ে গিয়েছে।

নবীন সরকার নিশ্চয়ই আশ্চর্য হইয়া যাইবে। বল কি কেশব! তোমার ছেলে আজ সকালে মারা গিয়েছে, আর তুমি ছুটোছুটি করে কাজ করে বেড়াচ্ছ! আহা-হা, তোমার ছেলে! আহা, তাই তো!

কিন্তু কেউ কিছু জানে না। কেশব তো কাহাকেও কিছু বলিবে না।

মাছ ওজন করিয়া লইবার পরে দুধ দই আসিয়া উপস্থিত! তারপর আসিল বাজার হইতে হরি ময়রার ছেলে, দুমন-আড়াই মন সন্দেশ ও আড়াই মন পান্তুয়া লইয়া দই-সন্দেশ ওজন করিবার হিড়িকে কেশব সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। সপ বিছান, সামিয়ানা খাটান প্রভৃতি কাজ তদারক করিবার ভারও পড়িল তাহার উপর।

ইতিমধ্যে সকলেই সব ভুলিয়া গেল, একটা বড় গ্রাম্য দলাদলির গোলমালের মধ্যে। সকলেই জানিত, আজ হারাণ চক্রবর্তীর বিধবা মেয়ের কথা এ সভায় উঠিবেই উঠিবে। সকলে প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল। প্রথমে কথাটা তুলিলেন নায়েব মশায়—তারপরে তুমুল তর্ক-বিতর্ক ও পরিশেষে ওপাড়ার কুমার চক্রবর্তী রাগ করিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে কাজের বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন—অমন দলে আমি থাকি নে! যেখানে একটা বাঁধন নেই, বিচার নেই—সে সমাজ আবার সমাজ? যে খায় খাক, একটা ভ্রষ্টা স্ত্রীলোককে নিয়ে আমি বা আমার বাড়ীর কেউ খাবে না—আমার টাকা নেই বটে, কিন্তু তেমন বাপের—ইত্যাদি।

তিন-চারজন ছুটিল কুমার চক্রবর্তীকে বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া ফিরাইয়া আনিতে। কুমার চক্রবর্তী যে একরোখা, চড়ামেজাজের মানুষ সবাই তাহা জানে। কিন্তু, ইহাও জানে যে, সে রাগ তার বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। নায়েব মশায় বলিলেন—তুমি যেও না হরি খুড়ো—তোমার মুখ ভালো না, আরও চটিয়ে দেবে। কার্তিক যাক, আর শ্যামলাল যাক—

হারাণ চক্রবর্তীর যে মেয়েটিকে লইয়া ঘোঁট চলিতেছে, সে মেয়েটি কাজের বাড়ীতে পদার্পণ করে নাই।

পাশের বাড়ীর গোলার নিচে সে এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, আজই একটা মিটিং হইয়া তাহার সম্বন্ধে যে চূড়ান্ত সামাজিক নিষ্পত্তি কিছু হইবে, তাহা সে জানিত এবং তাহারই ফল কি হয় জানিবার জন্যই সে অপেক্ষা করিতেছিল।

হঠাৎ চেঁচামেচি শুনিয়া সে ভয় পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাহারই নাম কুমার চক্রবর্তীর মুখে ওভাবে উচ্চারিত হইতে শুনিয়া পাঁচিলের ঘুলঘুলি দিয়া দুরু দুরু বক্ষে ব্যাপারটা কি দেখিবার চেষ্টা পাইল।

পাঁচিলের ওপাশে নিকটেই কেশবকে দেখিতে পাইয়া সে ডাকিল—কাকা, ও কাকা—

কেশব কাকাকে সে ছেলেবেলা হইতে জানে, কেশব কাকার মতো নিপাট ভালোমানুষ এ গাঁয়ে দুটি নাই।

আহা, সে শুনিয়াছে যে, আজই সকালে কেশব কাকার খোকাটি মারা গিয়াছে, অথচ নিজের দুর্ভাবনায় আজ সকাল হইতে সে এতই ব্যস্ত যে, কাকাদের বাড়ী একবার দেখা করিয়া আসিতে পর্যন্ত পারে নাই।

কেশব বলিল—কে ডাকে? কে, বিদ্যুৎ? কি বলচ মা? তা ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?

হারাণ চক্রবর্তীর মেয়েটির নাম বিদ্যুৎ। খুব সুন্দরী না হইলেও বিদ্যুতের রূপের চটক আছে সন্দেহ নাই, বয়স এই ঊনিশ।

বিদ্যুৎ ম্লানমুখে গলার সুমিষ্ট সুরে অনেকখানি খাঁটি মেয়েলি সহানুভূতি জানাইয়া বলিল—কাকা, খোকামণি না কি নেই? আমি সব শুনেছি সকালে। কিন্তু কোথাও বেরুতে পারিনি সকাল থেকে, একবার ভেবেছিলুম যাব।

কেশব উত্তর দিতে গিয়া চাহিয়া দেখে বিদ্যুতের চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। এতক্ষণ এই একটি লোকের নিকট হইতে সে সত্যকার সহানুভূতি পাইল। কেশব একবার গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল—তা যা, এখানে দাঁড়িয়ে থাকিস্ নে—যা। ও ঘোঁটের কথা শুনে আর কি হবে, তুই বাড়ী যা। কুমার চক্কোত্তি রাগারাগি করে চলে গিয়েছে, ওকে সবাই গিয়েছে ফিরিয়ে আনতে। তোর ওপর খুব রাগ কুমারের। তবে ও তো আর সমাজের কর্তা নয়, ওর রাগে কি-ই বা এসে যাবে!

—কি বলছিল ওরা?

—তুই নাকি এখনও গাঙ্গুলী বাড়ী যাস্, তোকে ওদের টিউবকলে জল তুলতে যেতে দেখেছে কুমারের স্ত্রী। কোন্‌দিন নাকি ওদের নারকোল তলায়—ইয়ে, সুশীলের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলি, তাও কুমারের স্ত্রী দেখেছে—এই সব কথা।

বিদ্যুৎ বলিল—আমি যাইনি কাকা, সেবার সেই বারণ করে দেওয়ার পর থেকে আর কখনো যাই নি।

এ কথাটা বিদ্যুৎ মিথ্যা বলিল। সুশীলের সঙ্গে তার ছেলেবেলা হইতে আলাপ। সুশীল যখন কলেজে পড়িত, তখন বিদ্যুৎ বার তের বছরের মেয়ে। সুশীলদা'র দেখা পাইলে তখন হইতেই সে আর কোথাও যাইতে চায় না।

সুশীলের সঙ্গে তাহার বিবাহ হওয়ার কোন সম্ভবনা ছিল না, কারণ তাহারা বৈদিক আর সুশীলেরা রাঢ়ীশ্রেণী। বিদ্যুতের বিবাহ হইয়াছিল পাশের গ্রামের শ্রীগোপাল আচার্যের সঙ্গে। বিদ্যুৎ বিধবা হইয়াছে বিবাহের দু' বছর পরেই। শ্বশুরবাড়ী মাঝে মাঝে যায়, কিন্তু বেশির ভাগ এখানেই থাকে। সুশীলের সঙ্গে তাহার ছেলেবেলার মাখামাখি লইয়া একটা অপবাদ গ্রামের মাঝে রটিয়াছিল। এই অপবাদের দরুনই তাহারা এখন গ্রামে একঘরে হইয়া আছে, এ বাড়ীতে তাহাদের নিমন্ত্রণ হয় নাই।

ইতিমধ্যে ঝুমুর গানের দল আসিয়া হাজির হইল। সামিয়ানার একধারে ইহাদের জন্য স্থান নির্দিষ্ট ছিল, গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েরা, দল আসিতেই সেখানে গিয়া জায়গা দখল করিয়া বসিবার জন্য হুড়াহুড়ি বাধাইয়া দিল। কেশব ছুটিয়া গেল গোলমাল থামাইতে। দলের অধিকারী বলিল—ও সরকার মশাই, আমাদের একটু তামাক-টামাকের যোগাড় করে দিন, আর দু-পাঁচ-খিলি পান। রোদ্দুরে বামুনগাতির বিল পার হতে যা

নাকালটা হয়েচে সবাই মিলে।

বেলা বারোটার সময় কেশব একবার বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। স্ত্রীর জন্য তাহার মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আহা, বেচারী ও বাড়ী আসিয়াছে তো,—না খালি বাড়ীতে একা পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে?

না, দেখিয়া আশ্বস্ত হইল স্ত্রী আসিয়াছে ও ইঁদারার পাড়ে একরাশ পুরোনো বাসন ঝিয়ের সঙ্গে বসিয়া মাজিতেছে, তাহাদের আজ মরণাশৌচ, বাহিরের কাজকর্ম ছাড়া অন্য কাজ করিবার জো নাই।

মেজবাবুর যে-খোকার অন্নপ্রাশন, দালানে খাটের উপর সুন্দর বিছানাতে চারিদিকে উঁচু তাকিয়া ঠেস্ দিয়া তাহাকে বসাইয়া রাখা হইয়াছে। ছ'মাসের হৃষ্টপুষ্ট নধরকান্তি শিশু গায়ে একগা গহনা, সামনের গদিতে একখানা থালে যে সব বিভিন্ন অলঙ্কার আত্মীয়-কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধবে দিয়াছে, সেগুলি সাজানো। তিন-চার ছড়া হার, সোনার ঝিনুক, পদক, তাগা, বালা, রূপার কাজললতা। চারিধারে ঘিরিয়া মেয়েরা দাঁড়াইয়া আছে, ইহারা কেউ কেউ এ গ্রামের বৌ-ঝি, কিন্তু বেশীর ভাগই নবাগত কুটুম্বিনী দল। সকাল হইতে বেলা এগারটা পর্যন্ত আপ্-ডাউন যে তিনখানা ট্রেন যায়, প্রত্যেক ট্রেনের সময়ে দু'তিনখানা ট্যাক্সি বোঝাই হইয়া ইহারা কোন দল কলিকাতা হইতে, কোন দল বা রাণাঘাট, কি গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর, কি শান্তিপুর হইতে আসিয়াছে। শহরের মেয়ে, কি সব গহনা ও শাড়ির বাহার, কি রূপ, কি মুখশ্রী, যেন এক একজন এক একখানি ছবি!

খোকাটি কেমন চমৎকার হাসিতেছে। কেমন সুন্দর মানাইয়াছে ওই বেগুনী রংয়ের জামাটাতে। তাহার খোকারও অন্নপ্রাশন দিবার কথা ছিল এই মাসে।

গরীবের সংসার, খোকার যখন চার মাস বয়স, তখন হইতে ধীরে ধীরে সব যোগাড় করা হইতেছিল। কাপালীরা মুসুরি ও ছোলা দিয়াছিল প্রায় আধ মণ, নাড়ুর চালের জন্য ধান যোগাড় করা হইয়াছিল, সাত-আটখানা খেজুরের গুড় দিয়াছিল বাগদীপাড়ার সকলে মিলিয়া। বৃদ্ধ ভুবন মণ্ডল বলিয়াছিল—মুহুরী মশায়, যত তরিতরকারি দরকার হবে, আমার ক্ষেত থেকে নিয়ে যাবেন খোকার ভাতের সময়। এক পয়সা দিতে হবে না। কেবল বামুন-বাড়ীর দুটো পেরসাদ যেন পাই। শূদ্র-ভদ্র সবাই খোকাকে ভালবাসিত।

মেজবাবুর খোকার গায়ের রং অনেক কালো তার খোকার তুলনায়। মেজবাবু নিজে কালো, খোকার খুব ফরসা হইবার কথাও নয়। সুতরাং এদের মানানো শুধু জামায় গহনায়। তাহার খোকা গরীবের ঘরে আসিয়াছিল। এক জোড়া রূপার মল ছাড়া আর কোন-কিছু খোকার গায়ে ওঠে নাই।

আজ শেষ রাত্রে খোকার সেই হেঁচ্কীর কষ্টে কাতর কচি মুখখানি, অবাক্ দৃষ্টি, নিষ্পাপ, কাচের চোখের মতো নির্মল ব্যথাক্লিষ্ট চোখদুটি···আহা, মানিক রে!

—ও কেশব, বলি হ্যান্দেশ্যে এখানে সঙের মতো দাঁড়িয়ে আছ যে! বেশ লোক যা হোক। ব্রাহ্মণের পাতা করবার সময় হ'ল, সামিয়ানা খাটাবার ব্যবস্থা কর গে। আমি তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি চৌদ্দভুবন, আর তুমি এখানে. বেশ নম্বুরী নোটখানি বাবা! পা চালিয়ে দেখ গিয়ে—

নবীন সরকার।

কিন্তু, নবীন সরকার তো জানে না······

সে কি একবার বলিবে?···ও গোমস্তা মশায়. এই আমার খোকা আজ সকালে···ও রকম করে আমায় ডাকবেন না······আমার মনটা আজ ভাল না······

দলে দলে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণেরা আসিতে আরম্ভ করিয়াছে নানা গ্রাম হইতে। এগারো-খানা গাঁ লইয়া সমাজ, সমাজের সকলেই নিমন্ত্রিত। বড় বৈঠকখানায় লোক ধরিল না,

শেষে লিচুতলায় প্রকাণ্ড শতরঞ্জ পাতিয়া দেওয়া হইল। আসরের মধ্যে দাঁড়াইয়া দেউলে সরাবপুরের বরদা বাঁড়ুয্যে মশায় বলিলেন—একটা কথা আমার আছে। এ গাঁয়ে হারাণ চক্কোত্তি সমাজে একঘরে, তাদের বাড়ীর কারুর কি নেমন্তন্ন হয়েচে আজ কাজের বাড়ীতে? যদি হয়ে থাকে বা তাদের বাড়ীর কেউ যদি এ বাড়ীতে এসে থাকেন, তবে আমি অন্ততঃ দেউলে সরাবপুরের ব্রাহ্মণদের তরফ থেকে বলচি যে, আমরা এখানে কেউ জল-স্পর্শ করব না।

আরও দু'পাঁচখানা গ্রামের লোকেরা সমস্বরে এ কথা সমর্থন করিল। অনেকে আবার হারাণ চক্রবর্তীর আসল ব্যাপারটা কি জানিতে চাহিল। ছেলে-ছোকরার দল না বুঝিয়া গোলমাল করিতে লাগিল।

এ বাড়ির বৃদ্ধ কর্তা সান্যাল মশায়ের ডাক পড়িল। তিনি কাজের বাড়ীতে কোথাও ব্যস্ত ছিলেন, গোলমাল শুনিয়া সভায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। এ গাঁয়ের সমাজ বড় গোল-মেলে, তাহা তিনি জানিতেন। পান হইতে চুন খসিলেই এই তিনশো নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ এখনই হৈ-চৈ বাধাইয়া তুলিবে, খাইব না বলিয়া শুভকার্য পণ্ড করিয়া দিয়া বাড়ী চলিয়া যাইবে। প্রাচীন, বিচক্ষণ ব্যক্তি সব, কিন্তু সামাজিক ঘোঁটের ব্যাপারে ইহাদের না আছে বিচার-বুদ্ধি, না আছে কাণ্ডজ্ঞান।

তবুও সান্যাল মশায় সভার মধ্যে খুব সাহসের পরিচয় দিলেন। বলিলেন, আপনাদের সকলকেই জানাচ্ছি যে হারাণ চক্কোত্তির বাড়ীর একটি প্রাণীও আমার বাড়ী নিমন্ত্রিত নয়, তাদের কেউ এ বাড়ীতে আসেও নি! কিন্তু, আমার আজ অনুরোধ, এই সভাতেই সেই ব্যাপারের একটা মীমাংসা হয়ে যাওয়া দরকার। হারাণ আমার প্রতিবেশী, আমার বাড়ীর পাশেই তার বাড়ী। তার ছেলে-মেয়ে আমার নাতি-নাতনীর বয়সী। আজ আমার বাড়ীর কাজ, আর তারা মুখ চুন করে বাড়ী ব'সে থাকবে, এ বাড়ীতে আসতে পারবে না, খুদ-কুঁড়ো যা দুটো রান্না হয়েচে তো মুখে দিতে পারবে না, এতে আমার মন ভালো নেয় না। আপনারা বিচার করুন তার কি দোষ—আমাদের গাঁয়ের লোক মিলে আজ সকালে একটা মিটিং আমরা এ নিয়ে করেছিলাম, কিন্তু সকলে উপস্থিত না হ'লে ব্যাপারটা উত্থাপন করা ভালো নয় ব'লে আমরা বন্ধ রেখেছি। আমার যদি মত শোনেন, আমি বলি হারাণ চক্কোত্তির মেয়ে নির্দোষ, তাকে সমাজে নিতে কোনো দোষ নেই।

ইহার পর ঘণ্টা-দুই-ব্যাপী তুমুল বাগ্‌যুদ্ধ শুরু হইল, আজ সকাল বেলার মতোই। এই সভায় সবাই বক্তা, শ্রোতা কেহ নাই। চড়া গলায় সকলেই কথা বলে, কথার মধ্যে যুক্তিতর্কের বালাই নাই। দেখা গেল, এ গাঁয়ের হারাণ চক্রবর্তীর ব্যাপার লইয়া দুটো দল, একদল তাহাকে ও মেয়েকে একঘরে করিয়া রাখিবার পক্ষে মত দিল। অপর পক্ষ ইহার বিরুদ্ধে। হারাণ চক্রবর্তীর ডাক পড়িল, তার বয়স যদিও খুব বেশি নয়, কিন্তু কানে একেবারে শুনিতে পান না। টাইফয়েড হইয়া অল্প বয়স হইতেই কান দুটি গিয়াছে। তিনি হাতজোড় করিয়া নিবেদন করিলেন, তাঁহার মেয়েকে তিনি ভালো রকমই জানেন, তার স্বভাব-চরিত্র সৎ। যে ছেলেটিকে লইয়া এ কথা উঠিয়াছে, গাঙ্গুলীবাড়ীর সেই ছেলেটি কলেজের পাস, উঁচু নজরে কাহারও দিকে চায় না। ছেলেবেলা হইতেই বিদ্যুতের সঙ্গে তার ভাইবোনের মতো মেশামেশি, এর মধ্যে যে কিছু দোষ ধরিতে পারে—ইত্যাদি!

ইহার উত্তরে বিরুদ্ধ দলের কর্তা কুমার চক্রবর্তী রাগিয়া উঠিয়া যাহা বলিলেন, তাহা আমাদের মনে আছে, কিন্তু সে সব কথা পাড়াগাঁয়ের দলাদলি সভায় উচ্চারিত হইতে পারিলেও ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করিবার যোগ্য নয়।

অনেক করিয়াও হারাণ চক্রবর্তীর হিতাকাঙ্ক্ষী দল কিছু করিতে পারিল না। কুমার চক্রবর্তীর দলই প্রবল হইল। আসলে বিদ্যুৎ যে খুব ভালো মেয়ে, বিদ্যুতের মনটি

বড় নরম, পাড়ার আপদ-বিপদে ডাকিতেই ছুটিয়া আসে এবং বুক দিয়া পড়িয়া উপকার করে, তাহার উপর সে ছেলেমানুষ, এখনও তত বুঝিবার বয়স হয় নাই, বৃদ্ধের দলের আসল যুক্তি এই। কিন্তু, এ সত্য কথা সভায় দাঁড়াইয়া বলা যায় না।

কুমার চক্রবর্তীর দলের লোকেরা বলিল—সেবার সুরেনের মেয়ের বিয়ের সময় আমরা তো ব'লে দিয়েছিলাম, বিদ্যুৎ সুশীলদের বাড়ী যাতায়াত বা সুশীলের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করুক। এক বছর আমরা যদি দেখি, সে আমাদের কথা মেনে চলেছে, তবে আমরা তাদের দলে তুলে নেব—কিন্তু সে কি তা শুনেচে?

হারাণ চক্রবর্তী বলিলেন—কৈ কে দেখেছে—বলুক কবে আমরা মেয়ে এই এক বছরের মধ্যে—

কিন্তু এমন ক্ষেত্রে পাড়াগাঁয়ে দেখিবার লোকের অভাব হয় না।

দেখিয়াছে বৈ কি। বহু লোক দেখিয়াছে। পরের বাড়ী কোথায় কি হইতেছে দেখিবার জন্য যাহারা ওত পাতিয়া থাকে, তাদের চোখে অত সহজে ধুলো দেওয়া চলে না।

অবশেষে কে বলিল—আচ্ছা, কাউকে দিয়ে সেই মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করা হোক না—সে যদি আমাদের সামেন স্বীকার করে, সে ওখানে যাতায়াত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘাট স্বীকার করে, কথা দেয় যে, আর কখনও এ কাজ সে করবে না, তবে না হয়—

বিদ্যুৎ পাঁচিলের ঘুলঘুলিতে চোখ দিয়াই দাঁড়াইয়া ছিল।

কেশব গিয়া বলিল—মা আছিস? রাজী হয়ে যা না, ওরা যা যা বলছে। কেন মিছে মিছে—

বিদ্যুৎ কাঁদিয়া বলিল—আপনি ওদের বলুন আমি সব তাতে রাজী আছি কাকা।

সভার মধ্যে বাপকে অপদস্থ হইতে দেখিয়া লজ্জায়, দুঃখে সে মরিয়া যাইতেছিল··· তার জন্যই তার নিরীহ পিতার এ দুর্দশা···তা ছাড়া তার দাদা শ্রীগোপালের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আজ পাঁচ ছ' দিন হইতে যজ্ঞিবাড়ীর নিমন্ত্রণ খাইবার লোভে অধীর হইয়া আছে, ছেলেমানুষ তারা কি বোঝে—অথচ আজ তাদের নিমন্ত্রণ হয় নাই, এবাড়ীতে আসিতে না পাইয়া মুখ চুন করিয়া বেড়াইতেছে—ইহা তাহার প্রাণে বড়ই বাজিয়াছে।

ছোট মেয়ে সুবু তো কেবলই জিজ্ঞাসা করিতেছে—পিছিমা, ওদের বালি থেকে ডাকতে আছবে কখন? পায়েছ খাব, ছন্দেস খাব, না পিছি? আমি যাব, ওবু যাবে, দাদা যাবে, মা যাবে—

তার মা ধমক দিয়া থামাইয়া রাখিয়াছে—থাম্, এখন চুপ কর। যখন যাবি তখন যাবি। তা না এখন থেকে—এখন বরং একটু ঘুমো দিকি। ঘুমিয়ে উঠে আমরা সেই বিকেলে তখন সবাই যাব—

ঘরে বাহিরে বিদ্যুতের আর মুখ দেখাইবার জো নাই।

কিন্তু, কেশবের কথায় কি হইবে। এক আধটি বাজে লোকের প্রস্তাবেই বা কি হইবে। বরদা বাঁড়ুয্যে ও কুমার চক্রবর্তী এ প্রস্তাবে রাজী হইল না। একবার যে শর্ত ভঙ্গ করিয়াছে, তাহার সঙ্গে আর শর্ত করিয়া ফল নাই। আর এ শর্তের ব্যাপার নয়। একটা স্ত্রীলোককে সামাজিক শাসন করা হইতেছে, ইহার মধ্যে শর্তই বা কিসের? মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া যে গ্রাম হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া হয় নাই এতদিন, ইহাই যথেষ্ট।

সুতরাং হারাণ চক্রবর্তী যেমন একঘরে ছিলেন, তেমনি রহিয়া গেলেন।

তারপর ব্রাহ্মণ-ভোজনের পালা। কেশবের মরণাশৌচ, সে পরিবেশন করিবে না, ভিখারী বিদায়ের ভার পড়িল তার উপর। দু' তিন দফা ব্রাহ্মণ খাওয়ান ও ভিখারী বিদায় করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সন্ধ্যার পরে শূদ্রভোজন, সে চলিল রাত দশটা পর্যন্ত।

কেশব সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর যখন খাইতে বসিল, তখন রাত এগারটা।

আয়োজন ভালই হইয়াছিল, কিন্তু এত রাত্রে জিনিসপত্র বেশি কিছু ছিল না! কেবল দই ও মিষ্টি এবং দু'তিন রকমের টক তরকারি দিয়া কেশব পরিতৃপ্তির সঙ্গে দুই জনের আহার একা করিল। পরে স্ত্রীকে লইয়া অন্ধকারেই নিজের বাড়ী রওনা হইল।

কেশবের স্ত্রীও খুব খাইয়াছে। কেশবের প্রশ্নের উত্তরে বলিল—তা গিন্নীর বড় মেয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়ালে। নিজের হাতে আমার পাতে সন্দেশ দিয়ে গেল। খুব যত্ন করেছে। রান্নাবান্না কি চমৎকার হয়েছে, না?

কেশব বলিল—তা বড়লোকের ব্যাপার, চমৎকার হবে না? নয় তো এমন অসময়ে কপি কোথা থেকে এই পাড়াগাঁয়ে আসে বল দিকি? পেয়েছিলে কপির তরকারি?

—তা আর পাইনি? দু' দুবার দিয়েছে আমার পাতে। হ্যাঁ গা, এখন কপি কোত্থেকে আনলে? কলকাতায় কি বারমাস কপি মেলে?

বাড়ীর উঠানে তুলসীতলায় একটা মাটির প্রদীপ তখনও টিমটিম করিয়া জ্বলিতেছে। কেশবের স্ত্রী বলিল—ও বাড়ীর ছোট-বৌ জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছে, আহা বড় ভালো মেয়ে! আজ সকালে কেঁদে একেবারে আকুল।

সকালে যে ভাবে ইহারা ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, ঘরবাড়ী সেই ভাবেই পড়িয়া আছে। কারো সাড়া-শব্দ নাই,—নির্জন, নিস্তব্ধ। বাড়িখানা খাঁ খাঁ করিতেছে। আশে পাশে ঘন অন্ধকার, কেবল তুলসীতলায় ওই মিটমিটে মাটির প্রদীপের আলোটুকু ছাড়া।

কেশব শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িল।

অনেক রাত্রে ঘুমের মধ্যে কেশব স্বপ্ন দেখিতেছিল, বিদ্যুৎ আসিয়া উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কাঁদ-কাঁদ মুখে বলিতেছে—কাকা, আজই বুঝি…একবার ভেবেছিলাম আসব, কিন্তু যে দুর্ভাবনা আমার ওপর দিয়ে আজ সারাদিন…

বাহিরে ঝমঝম বৃষ্টির শব্দে তার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল—সর্বনাশ! ভয়ানক বৃষ্টি আসিয়াছে! খোকা, কচি ছেলে, নিউমোনিয়ার রোগী, বাঁশতলায় তার ঠাণ্ডা লাগিতেছে যে!…পরক্ষণেই ঘুমের ঘোরটুকু ছুটিয়া যাইতেই নিজের ভুল বুঝিয়া আবার শুইয়া পড়িল।

ভাবিল—আহা, যখন পুঁতি, তখনও ওর গা গরম, বেশ গরম ছিল…হঠাৎ দেখিল সে কাঁদিতেছে, অঝোর ধারে কাঁদিতেছে…বাহিরে ঐ বৃষ্টিধারার মতো অঝোর ধারে… বার বার তার মনে হইতে লাগিল—তখনও ওর গা গরম ছিল…বেশ গরম ছিল…

ডাকগাড়ি

এক এক সময় রাধা ভাবে কোথাও বেড়াইয়া আসিতে পারিলে ভালো হইত। আজ ছ' বছরের মধ্যে সে একখানা দুর্গা প্রতিমার মুখ পর্যন্ত দেখে নাই। এ গাঁয়ে সবাই গরীব, দুর্গোৎসব তো দূরের কথা, তেমন একটা জাঁকের কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা পর্যন্ত হয় না। অবশ্য এ গাঁয়েরই সে মেয়ে, এই অবস্থার মধ্যেই মানুষ হইয়াছে, বাল্যে সে ভাবিত সর্বত্রই এই রকম ব্যাপার। কিন্তু বিয়ের পর বাসুদেবপুর গিয়া রাধা প্রথম বুঝিল, তাদের গাঁ অতি হীন অবস্থার গাঁ। গরীব আর বড়লোকে তফাত কি, বুঝিল। বাসুদেবপুরে এমন কিছু শহর বাজার জায়গা নয়, গঙ্গার ধারে একখানা বর্ধিষ্ণু গ্রাম এই পর্যন্ত। সেখানে মুস্তফিরা বড় লোক, এমন পূজা নাই যে, তাদের বাড়ী হইত না—দুর্গোৎসব বল, শ্যামা পূজা বল, জগদ্ধাত্রী পূজা বল, এমন কি রথ পর্যন্ত।

বছর তিনেক বড়ই আনন্দে কাটিয়াছিল—সব দিক দিয়াই।

তারপর তাহার স্বামী মারা গেল যকৃতের রোগে। শাশুড়ীর সঙ্গে রাধার বনিল

না, দিনকতক উভয়ের মধ্যে যে সব বাক্যাবলীর আদান-প্রদান- চলিল, তাহাকে ঠিক সদয় ও ভদ্রবাক্য বলা চলে না। রাধা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত হইল, তাহার বাবা এত দরিদ্র আজও হন নাই যে, তাহাকে একবেলা এক মুষ্টি আতপ চালের ভাত দিয়া পুষিতে পারিবেন না। ফলে একদিন একটি মাত্র পুঁটলি সম্বল করিয়া রাধা তাহার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বাপের বাড়ি আসিয়া পৌঁছিল। ভাইটিকে সে-ই পত্র লিখিয়া আনাইয়াছিল। তাহার তোরঙ্গ ও ক্যাশবাক্স শাশুড়ী আটকাইয়া রাখিলেন।

ছ' বছর তারপর কাটিয়া গিয়াছে।

সেই যে বিধবা হইয়া আসিয়া বাপের বাড়ী ঢুকিয়াছে, আর সে গ্রাম হইতে বাহির হয় নাই।

এই ছ' বছরে অনেক কিছু ঘটিয়া গেল তাহাদের সংসারে। বাবা লেখাপড়া ভালো জানেন না, বিশ্বাসদের পাটের আড়তে কাজ করিয়া সামান্য কয়েকটি টাকা পাইতেন। বাবার সে চাকুরিটা গেল। রাধার ছোট ভাই গেল মারা। বাবা বাত হইয়া কিছুদিন শয্যাগত থাকিলেন। বাবার সঙ্গে মায়ের মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইল। ক্রমে উভয়ের মধ্যে সামান্য কথায় ঝগড়া বিবাদ হইতে লাগিল। জমিদার নালিশ করিয়া তাহাদের বড় জমা ক্রোক করিয়া লইল, ইত্যাদি ইত্যাদি।

একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে দিনগুলি, সেই সংসারের কাজ, সেই গরুর সেবা, সেই রাঁধাবাড়া, বাবার হাতে পায়ে তেল মালিশ করা, মায়ের দোক্তার পাতা পুড়াইয়া তামাক তৈরি করা, কলের মতো একটানা একঘেয়ে ভাবে চলিতেছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

আজ সকালে ডোবার ধারে বাসন মাজিতে বসিয়া তাই সে ভাবিতেছিল, একবার কোথাও বেড়াইয়া আসিবে!

ছোট ডোবাটা। চারি পাড়ে বড় বড় গাছের ছায়ায় ঝুপসি অন্ধকার হইয়া আছে। দুপুর বেলাতেও রোদ পড়ে না। এইটুকু তো ডোবা, এর আবার চারিদিকে চারিটা ঘাট। বাঁধান নয়, কাঁচা ঘাট! দক্ষিণ দিকের জামতলায় জেলে পাড়ার ঘাট, পশ্চিম পাড়ের বেল-তলায় নাপিতদের ঘাট, পূর্বদিকে বামুন-পাড়ার ঘাট, উত্তর পারে যাদের জমিতে ডোবাটা তাঁদের ঘাট। তাঁরাও ব্রাহ্মণ, নিজেদের জন্য একটা ঘাট আলাদা রাখিয়াছেন, কহাকেও সে ঘাটে যাইতে দেন না।

সেই বাড়ীরই মেয়ে সুবি, ভালো নাম সুবিনীতা—তাদের ঘাটে চায়ের পাত্র ধুইতে নামিল। গ্রামের মধ্যে ওরা ওরই মধ্যে একটু শৌখিন, চা খাওয়ার অভ্যাস রাখে, সুবি কিছুদিন কলিকাতায় কাকার বাসায় থাকিয়া পড়িত। ক্লাস এইট্ পর্যন্ত পড়িয়া পড়া ছাড়িয়া দিয়া আজ বছরখানেক বাড়ীতে বসিয়া আছে। গ্রামের মেয়েদের মধ্যে তার প্রভাব ও প্রতিপত্তি খুবই বেশি, কারণ গ্রামের মধ্যে সে-ই একমাত্র মেয়ে, যে স্কুলের মুখ দেখিয়াছে—তাও আবার কলিকাতায়। সুবি দেখিতে মোটামুটি ভালোই, রং উজ্জ্বল শ্যাম, বড় বড় চোখ, একরাশ কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, সর্বদা ফিটফাট হইয়া থাকে, একটু চাল-বাজ। ষোল বছর বয়েস, বিবাহের চেষ্টা চলিতেছে। রাধা সুবি বলিতে অজ্ঞান, কিন্তু সুবি তাকে বড় একটা আমল দেয় না। গরীব ঘরের মেয়ে, তেইশ বছর বয়েস, তার ওপরে বিধবা এবং লেখাপড়াও তেমন কিছু জানে না—এ অবস্থায় রাধা কি করিয়া আশা করিতে পারে যে, সে কলিকাতার স্কুলের ক্লাস এইট্ পর্যন্ত পড়া মেয়ে সুবির অন্তরঙ্গ মণ্ডলীতে স্থান পাইবে। তা সে পারে না—বা সে আশা করা তার উচিতও নয়।

সুবিকে জলে নামিতে দেখিয়া রাধার মুখ ঠিক আগ্রহে ও আশায় উজ্জ্বল দেখাইল। সে বলিল—ও সুবি ভাই, তোদের চা খাওয়া হয়ে গেল?

সুবি কচুর ঝাড়ের গোড়া হইতে চায়ের পেয়ালা লইয়া জল বুলাইতে বুলাইতে বলিল —হয় নি। মার তো আজ সোমবার, মা খাবে না—শুধু আমি আর যাদু। তাড়াতাড়ি নেই, এবার গিয়ে জল চড়াব।

সুবি নিজে থেকে কোনো কথা বড় একটা রাধার সঙ্গে বলে না—তবে রাধা যে কথা জিজ্ঞাসা করে, ভদ্রভাবে তার উত্তর দেয়।

রাধা জানে সুবি সাংসারিক কথাবার্তা বলিতে ভালবাসে না। পড়াশুনা, গান, ফিল্ম, কবিতা প্রভৃতি তাহার কথাবার্তার বিষয়। কলিকাতায় থাকিয়া তাহার রুচি বদলাইয়া গিয়াছে।

রাধা তাহার মন যোগাইয়া চলিবার চেষ্টায় বলিল—কাল সন্ধ্যেবেলা তুই এলিনে ভাই, আমি কতক্ষণ বসে বসে একটা কবিতা মুখে মুখে বানালাম। তোকে শোনাব আজ দুপুরে।

—কি কবিতা?

—আসিস, এখন না। শোনাব। মুখস্থ নেই, ভাই।

সুবি আর কোন আগ্রহ দেখাইল না। শুধু বলিল—দুপুরে মা কাঁথা সেলাই করবে, আমাকে কাছে বসে সূঁচে সুতো পরাতে হবে। আমার যাওয়া তো হবে না।

রাধা বলিল—সেই গানটা একটু গা না সুবি?

সুবি চায়ের পাত্রগুলি হাতে লইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত অবস্থায় বলিল—এখন সময় নেই। অনেক কাজ। চলি।

রাধা অতি করুণ মিনতির সুরে বলিল—গা না ভাই, দুটো লাইন গা। বলছি এত করে'—

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি পাড়াগাঁয়ের মেয়ের তুলনায় সুবি গান গাহিতে পারে মন্দ নয়। কলিকাতায় থাকিবার সময় নিধুদার কাছে সে অনেক গান শিখিয়াছিল। নিধুদা তার কাকীমার পিসতুতো ভাইয়ের ছেলে। কলেজে পড়ে, বেশ গান গাহিতে পারে. চেহারাও ভালো। সুবিকে দিনকতক সে গান শিখাইতে ঘন ঘন আসিত।

সুবি গুন্ গুন্ করিয়া মাত্র দু' কলি গাহিল—

যৌবন সরসী-নীরে
মিলন শতদল
কোন্ চঞ্চল বন্যায় টলমল টলমল!

ঠিক এই সময় নাপিতদের ঘাটে নাপিত-বৌ এক কাঁড়ি বাসন লইয়া মাজিতে আসিল। নাপিত-বৌ শ্যামবর্ণ, বয়স উনিশ কুড়ি, খুব সুন্দর নিটোল গড়ন. স্বাস্থ্যবতী. মুখশ্রীর মধ্যে একটা সুলভ ও সহজ সৌন্দর্য আছে—অর্থাৎ সে শ্রীটা এই বয়সেই থাকে. পাঁচ বছর পরে যাহার আর বিশেষ কিছু অস্তিত্ব থাকিবে না। কিন্তু এখন যখন সেটা আছে, তখন খুব জমকালো ভাবেই আসর মাতাইয়া রাখিয়াছে।

নাপিত-বৌ সুবিকে প্রায় পূজা করিয়া থাকে মনে মনে। তাহার জীবনে এমন মেয়ে সে দেখে নাই। অমন রূপ, অমন কথাবার্তা, অমন লেখাপড়া. অমন গান—সকল দিকেই সুবি নাপিত-বৌয়ের মন হরণ করিয়া লইয়াছে। যে পাড়াগাঁয়ে নাপিত-বৌয়ের বাপের বাড়ী, সে গাঁয়ে এমন একটি মেয়ের কল্পনাও করা শক্ত। ইহার সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের সুযোগ পাইয়া সে ধন্য হইয়া গিয়াছে। নাপিত-বৌ আঁচলের চাবিটা শক্ত করিয়া গেরো দিতে দিতে সুবির দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া গান শুনিতে লাগিল।

বলিল—ভারি চমৎকার গলা দিদিমণি আপনার। কখনো এমন শুনিনি. কি গানটা দিদিমণি?

সুবি পদগুলি আবৃত্তি করিয়া গানটি বলিয়া গেল।

নাপিত-বৌ গানের ভাষা বিন্দুবিসর্গও বুঝিল না। সুবির মন যোগাইবার জন্য একমনে শুনিবার ভান করিয়া মাঝে মাঝে ঘাড় নাড়িতে লাগিল।

সুবি ভাবিতেছিল, এ বর্বরদের গান শুনাইয়া লাভ কি? আজকাল তাহার গলা সত্যিই ভালো হইয়াছে। নিধুদা যদি শুনিত!…

আর কলিকাতায় যাওয়া হইবে না…নিধুদা'র সঙ্গে দেখাও আর হইবে না। তাহার বিবাহের সম্বন্ধ খোঁজা চলিতেছে, স্কুল ছাড়াইয়া আনিয়া বাড়ীতে রাখা হইয়াছে। বয়স ষোল ছাড়াইয়া চলিল কি না! আর বাড়ীর বাহির হইবার হুকুম নাই। কলিকাতা…… চিত্রা……রূপবাণী, কেতকী, শোভা, নিধুদা……সব স্বপ্ন……এ জন্মের মত সব ফুরাইয়াছে…সোনার স্বপ্ন ভাঙিয়া গিয়াছে। আশ্চর্য নয় যে, তেইশ বছরের বিধবা রাধার ঘনিষ্ঠতা তাহার ভালো লাগে না। নাপিত-বৌ তাহার পায়ের তলায় পোষা কুকুরের মতো পড়িয়া থাকে, কোনো রকমে সহ্য করিয়া থাকিতে হয়। ঝি-চাকরকেও তো লোকে সহ্য করে।

রাধা বলিল—ভাই সুবি, তোর গলাখানা যদি একবার পেতাম! হিংসে হয় সত্যি।

সুবি নাপিত-বৌয়ের খোশামোদ ও রাধার গায়ে পড়িয়া আলাপ জমানোর চেষ্টা ঠেলিয়া ফেলিয়া চায়ের পাত্র লইয়া চলিয়া গেল! সে মরিতেছে নিজের জ্বালায়, এমন সময়ে এ-সব ন্যাকা ন্যাকা কথা তাহার ভালো লাগে না।

জেলেপাড়ার ঘাটে ছিপছিপে, ফরসা থান-পরা জেলে-বৌ কাপড় কাচিতে নামিল।

রাধা বলিল—ও রামুর মা, রামুর কোনো খবর পেলে?

জেলে-বৌ বলিল—কোথায় দিদিঠাকুরুণ—আজ পাঁচ মাস ছেলে গিয়েচে, একখানা পত্তর নয়—টাকা পাঠানো চুলোয় যাক—তার টাকা পাঠাতে হবে না। আমি ধান ভেনে, ক্ষার কেচে, গতর খাটিয়ে যেমন চালাচ্চি, এমনি চালিয়ে যেতে পারলে বাঁচি। ছেলের রোজগার খেতে চাইনে, সে ভালো থাকুক, নিজের খরচ নিজে করুক, তাতেই আমি খুশি। কিন্তু বলো তো দিদিঠাকরুণ, একখানা চিঠি নেই আজ পাঁচ মাস, আমি কি ক'রে ঘরে থাকি?

রামু লালমণিরহাটের রেলে কি একটা চাকরি পাইয়া গিয়াছে। মাকে একবার পাঁচটি টাকা পাঠাইয়াছিল—তারপর এখন লেখে যে, সামান্য মাইনেতে তাহার কুলায় না, মাকে এখন আর টাকা পাঠাইতে পারিব না। মা যেন কষ্ট করিয়া পূজা পর্যন্ত কোনো রকমে চালাইয়া লয়! ছেলের কষ্ট হইবার ভয়ে মাও আর টাকা চায় না। কষ্টে-সৃষ্টেই চালায়।

রাধার জেলে-বৌকে ভালো লাগে বড়।

এমন ধরনের মেয়ে এ গ্রামে ব্রাহ্মণ কায়স্থের ঘরেও নাই। এত সুন্দর মন ওর, পরের উপকারে প্রাণ ঢালিয়া দিতে এমন লোক সত্যিই গাঁয়ে আর নাই। শুধু রাধাদের বলিয়া নয়, লোকের চিঁড়ে কুটিতে জেলে-বৌ, ধান ভানিতে জেলে-বৌ, যাহাদের বাড়ীতে পুরুষ মানুষেরা বিদেশে থাকে, শুধু বাড়ীতে মেয়েরা আছে—এক ক্রোশ দূরবর্তী বাজার হইতে তাদের হাট-বাজার করিয়া দিতে জেলে-বৌ, কুটুম্ব বাড়ীতে তত্ত্বতাবাস পাঠাইতে কিংবা নব-বিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি যাইতে জেলে-বৌ—জেলে বৌ না হইলে এ গাঁয়ের লোকের চলে না। অথচ এ সবের জন্যে জেলে-বৌ কারো কাছে একটি পয়সা প্রত্যাশা করে না—পাড়ার পাঁচজনের বিনি পয়সায় বেগার খাটিয়া বেড়ানোই তার অভ্যাস।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসে রাধার মনে আছে—আমবাগানের পথ দিয়া সে ঘাটে যাইতেছে—জেলে-বৌ আম কুড়াইতেছে বাগানে।

রাধা বলিল—রামুর মা, আম কুড়ুচ্চ? দেখি কোন্ কোন্ গাছের, ও গুয়োথলীর আম পেয়েছ যে দেখচি!...ও বাবা, ও তো বড় একটা পাওয়া যায় না। আমি কত খুঁজি, একটাও পাইনে একদিনও। তোমার ভাগ্যি ভালো। ভারি বোঁটা-শক্ত আম, তলায় পড়েই না।

অত মিষ্টি গাছের আম, আর পাওয়া অত শক্ত, মাত্র তিনটি আম পাইয়াছিল জেলে-বৌ অমনি হাসিমুখে বলিল,—তা নিয়ে যান দিদিঠাকরুণ, আম ক'টা আপনি সেবা করবেন। দয়া ক'রে নিয়ে যান আপনি। জেলে-বৌ এর গুণ আছে, অত সহজে ত্যাগ স্বীকার করিতে ওর জুড়ি নাই এ গাঁয়ে।

রাধা আম লইয়াছিল এই জন্য যে, না লইলে জেলে-বৌ ভাবিবে, ছোট জাতের দান বলিয়া ব্রাহ্মণের মেয়ে সকালবেলা গ্রহণ করিল না। লইয়া সে ভাবিল—জেলে-বৌ-এর আপন-পর জ্ঞান থাকতো যদি, এ গাঁয়ে হাংগামা পোয়াতে হ'ত তা হ'লে।

রাধা বলিল—জেলে-বৌ, আমার সংগে একবার শ্বশুরবাড়ী চল না? অনেক দিন কোথাও বেরুই নি, ভাবচি দিনকতক ঘুরে আসি।

জেলে-বৌ বলিল—যান না দিদিঠাকরুণ। আপনাদের যাবার জায়গা আছে কেন যাবেন না। শ্বশুরবাড়ী যানও নি তো অনেকদিন। তাঁরা দেখলে খুশি হবেন।

সে বিষয়ে রাধার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। শাশুড়ী তাকে দু'চক্ষে দেখিতে পারে না, তা রাধার জানিতে বাকী নাই। তবুও যাইতে হইবে, তোরংগ আর ক্যাশ বাক্সটা সেখানে ছাড়িয়া আসায় লাভ কি? সেগুলো আনা দরকার। অমন ভালো তোরংগটা।

পরদিন বাবা-মাকে কথাটা বলিতেই বাড়ীতে একপালা ঝগড়া শুরু হইল। রাধার বাবার আদৌ মত নাই সেখানে মেয়ে পাঠাইতে, রাধার মা কিন্তু রাধার দিকে। দু'জনে এই লইয়া বাধিল ঘোরতর দ্বন্দ্ব।

রাধা বাবাকে বলিল, আমি ঘুরে আসব তো বলচি সাত দিনের মধ্যে। নবুকে সংগে নিয়ে যাই—না থাকতে দেয়, আসা তো আমার হাতের মুঠোয়। একঘেয়ে ভালো লাগে না এখানে।

রাধার বাবা বলিলেন—এ অপমান সাধ ক'রে কুড়ুবার কি দরকার তোর? তারা কি এই ছ'বছরের মধ্যে একখানা পত্তর দিয়ে খোঁজ নিয়েচে যে তুমি কেমন আছ?

অনেক কষ্টে অবশেষে বাবাকে নিমরাজী গোছের করাইয়া ছোট ভাইকে সংগে লইয়া রাধা আসিয়া গাংনাপুর স্টেশনে গাড়ী চাপিল।

রেলগাড়ীতে চাপিয়া রাধার মনে হইল সে মুক্তির স্বাদ পাইয়াছে বহুদিন পরে। কেবল বাবা মায়ের একঘেয়ে ঝগড়া অশান্তি, কেবল 'নাই নাই' শুনিতে শুনিতে তাহার তরুণ মন অকালে প্রৌঢ়ত্বের দিকে চলিয়াছে। সংসারে আলো নাই, বাতাস নাই, এতটুকু আনন্দ নাই—শুধুই শোনো চাল নাই, কাঠ নাই, একাদশীর আটা কোথা হইতে আসিবে, নবুর কাপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছে, নতুন একটা ইজের ছ' আনা হইলে পাওয়া যায়, তা যেন ছ'টি মোহর। নবুর পাঁচ মাসের স্কুলের মাইনে বাকি, দুবেলা মাস্টারে শাসায়, মুখুয্যেদের বাড়ীর ঠাকুরমার দেনার টাকার সুদের তাগাদা—আর বাবার যত মিথ্যে কথা বানাইয়া বলা পাওনাদার বিদায় করিতে। আজ সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

রাণাঘাট স্টেশনে গাড়ী বদল করিয়া মুর্শিদাবাদ লাইনের গাড়ীতে চাপিতে হইল। মুড়াগাছা নামিয়া ক্রোশখানেক হাঁটিয়া বৈকাল তিনটার সময় সে শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া পৌঁছিল।

শাশুড়ী বৌকে দেখিয়া বলিলেন—এই যে নবাবের মেয়ে, তা এতদিন পরে কি মনে ক'রে? সংগে কে? ছোট ভাই—ও, সেই নবু না? এসো এসো বাবা, সুখে থাকো, চির-

জীবী হও। তা বেশ ছেলেটি।

কিন্তু শাশুড়ীর অমায়িকতা তিনদিনের মধ্যেই ঘুচিয়া গেল। রাধার বিধবা বড় ননদ ভ্রাতৃবধূকে পুনরায় এ বাড়ীতে আসিতে দেখিয়া সন্তুষ্ট হন নাই। রাধার গলার ছ'ভরির হার সেবার শাশুড়ী কাড়িয়া রাখিয়াছিলেন, সেই হারছড়া ভাঙিয়া ননদের মেয়ের বিয়ের সময় হাতের রুলি আর বালা গড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। বড় ননদ ভাবিয়াছিলেন, আজ ছ'বছর যে বৌ এ বাড়ী আসে নাই, সে আর আসিবে না। কিন্তু আপদ আবার আসিয়া জুটিল, এখন তো হারের দাবি করিয়া বসিবে। হইলও তাই। রাধা শাশুড়ীর কাছে হার চাহিল। শাশুড়ী বলিলেন—তোমার বাবা যে টাকা বিয়েতে দেবেন বলেছিলেন, তা দেন নি—দুশো টাকা বাকি ছিল। তার দরুন হার রেখে দিই। সে টাকা নিয়ে এসো আগে, হার এখুনি বার ক'রে দিচ্ছি।

বড় ননদও এই কথায় সায় দিলেন।

রাধা বলিল—বারে, আমার বাবার গড়িয়ে দেওয়া, তোমরা তো আর দাও নি? বাবা টাকা দিয়েছেন কিনা সে তোমরা বোঝ গিয়ে তাঁর সঙ্গে। আমার হার কেন তোমরা দেবে না?

কিন্তু টাকাকড়ির কথা আর কি অত সহজে মেটে!

রাধা বলিল, আমার বাবার দেওয়া তোরঙ্গ, তাই বা তোমরা কেন আটকে রাখবে? আর তোরঙ্গের চাবি ভেঙ্গে তোমরা জিনিসপত্র বার করে নিয়েছ কেন?

শাশুড়ী ও ননদ দুজনে মিলিয়া বলিলেন, চাবি কেহ ভাঙ্গে নাই, ভাঙ্গাই ছিল।

রাধা বলিল, আমার নতুন তোরঙ্গ, চাবি ভাঙ্গা থাকলেই হ'ল? তোমরা ভেঙ্গেচ? যত চোরের ঝাড়, দাও আমার হারছড়া—

শাশুড়ী বলিলেন, মুখ সামলে কথা বলো বৌমা, বলচি—

উভয়পক্ষে তুমুল ঝগড়া বাধিয়া গেল। ননদ মারিতে আসিলেন ভ্রাতৃবধূকে। নবুকে সেদিন আর কেহ খাইতে ডাকিল না। রাধার তো কথাই নাই, তাহাকে কে আদর করিয়া খাওয়াইবে, সে যখন তার বিবাহের হার ও তোরঙ্গ চাহিতে আসিয়াছে?

দুপুরের পরে ঝগড়াঝাঁটি করিয়া নবুকে সঙ্গে লইয়া রাধা ধর্মদহ গ্রাম হইতে মুড়াগাছা স্টেশনে হাঁটিয়া আসিল। দুজনেরই অনাহার! মনে পড়িল এই শ্রাবণ মাস, এই শ্রাবণ মাসেই সে ওই পথেই একদিন পালকি করিয়া নববধূরূপে আসিয়াছিল। কথাটা মনে আসিতেই রাধার চোখে জল বাধা মানিল না। স্টেশনে আসিবার সারা পথটাই সে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিল।

ট্রেনটি আসিলে তাহাতে কলের পুতুলের মতো বসিয়া রাধা কত কথা ভাবিতে লাগিল। মিছামিছি প্রায় তিনটি টাকা খরচ হইয়া গেল। এ টাকা অবশ্য তাহার বাপের বাড়ীর নয়—তাহার নিজেরই জমানো টাকা। টাকাটা হাতে থাকিলে টানাটানির সংসারে কত কাজ দিত। বাবার অমতে আসা হইয়াছে, শুধু হাতে ফিরিলে বাবার বকুনি খাইতে হইবে, মা মুখ ভার করিয়া থাকিবে। ছ'ভরির হারছড়া—লইয়া যাইতে পারিবার আশা করিয়াই সে আসিয়াছিল। বাবা-মায়েরও সে আশা যে একেবারে না ছিল তা নয়। এবার সকলে রাগ করিবে। তা ছাড়া ভবিষ্যতে শ্বশুরবাড়ী আসিবার পথও গেল। শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া না করিলেই হইত। না হয় গিয়াছেই হারছড়াটা! বাপ-মায়ের অবর্তমানে শ্বশুরবাড়ীতে একটু দাঁড়াইবার স্থানও তো হইত! তাহার জীবনে কোন সুখ নাই। বাড়ী গিয়া তো সেই একঘেয়ে ব্যাপার। সেই ডোবার ধারে সকালে বাসন মাজা, সেই গোয়াল পরিষ্কার, সেই রাঁধাবাড়া। সুবি—তা সে-ও তেমন মন খুলিয়া কথা কয় না। সে অনেক কিছু ভুলিতে পারিত, যদি সুবি তাহার সঙ্গে হাসিয়া আলাপ করিত, প্রাণ

খুলিয়া মিশিত। তা করে না—কত করিয়া সাধিয়া কত ভাবে মন যোগাইয়া রাধা দেখিয়াছে।

সত্যি, জীবন সব দিক দিয়াই অন্ধকার। বাঁচিয়া কি সুখ?

কাল সকালে কি হইবে সে বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে। রাত্রে আজ সে বাড়ী ফিরিলেই বাবার সঙ্গে মায়ের ঝগড়া বাধিবে। অর্থাৎ সে হার আদায় করিতে না পারিয়া ফিরিলেই বাবার আশাভঙ্গের রাগটা গিয়া পড়িবে মা'র উপর, দুজনে ধুন্ধুমার বাধিয়া যাইবে। কাল সকালে ডোবাতে বাসন মাজিবার সময় মুখুয্যে পাড়ার ঘাট, জেলে পাড়ার ঘাটের সবাই জানিতে চাহিবে সে এত শীঘ্র শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিল কেন। শাশুড়ী কি করিল, কি বলিল—এই কৈফিয়ত দিতে দিতে আর মিথ্যে কথা বানাইয়া বলিতে বলিতে তাহার প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিবে। কারণ, সত্যকথা তো সে বলিতে পারিবে না! রায়বাড়ীর কুচুটে মেজ বৌ মুখ টিপিয়া হাসিবে। সুবি নামিবে ওদের নিজেদের ঘাটের কচুতলায় চায়ের বাসন ধুইতে। নিজে হইতে একটা কথাও সে জিজ্ঞাসা করিবে না যে, রাধা কবে আসিল বা কিছু। রাধাকে প্রথমে কথা বলিতে হইবে। সুবি দু'একটা 'হাঁ' 'না' গোছের দায়সারা উত্তর দিয়া চায়ের পেয়ালা পিরিচ উঠাইয়া লইয়া চলিয়া যাইবে, যেন বেশীক্ষণ ডোবার ঘাটে দাঁড়াইয়া ওর সঙ্গে কথা বলিলে তার আভিজাত্য খর্ব হইয়া যাইবে। বাসন-মাজার পরে ঘাটে যাওয়া, রান্না, খাওয়ানো দাওয়ানো, দুপুরে পান মুখে দিয়াই ছুটিতে হইবে ঘাটে গরুকে জল খাওয়াইতে সেই নদীর ধারের মাঠে, যেখানে গরুকে গোঁজ পুঁতিয়া রাখিয়া আসা হইয়াছে। সেই সময়টা যা একটু ভালো লাগে—নীল আকাশ, নদীর ধারে কাশ ফুল দোলে, সমস্ত জিউলি গাছের গা বাহিয়া সাদা সাদা মোম-বাতি-ঝরা মোমের মতো আটা ঝরিয়া পড়ে, হু হু খোলা হাওয়া বয় ওপারের দেয়াড়ের চর হইতে, পাট-বোঝাই গরুর গাড়ির দল ক্যাঁচ কোঁচ করিতে করিতে ঘাটের পথের রাস্তা দিয়া কোথায় যেন যায়। গরুকে জল দেখাইয়া আসিয়া তাহার বড় ইচ্ছা করে সুবিদের বাড়িতে সুবির সঙ্গে বসিয়া একটু আধটু গল্প-গুজব করে, দু' একখানা বর্ণসূচি পড়িয়া শোনায়—(কারণ সে বই পড়িতে জানে না) গান শোনায়—কিন্তু হায় রে দুরাশা! গায়ে পড়িয়া আলাপ জমাইতে গেলে সুবি গভীর ঔদাস্যের সুরে বলিবে—হ্যাঁ, যাই রাধাদি। কত কাজ পড়ে রয়েচে, বিনুর সেই মোজা জোড়াটা বুনতে বুনতে ফেলে রেখেছি, সেটা সম্পূর্ণ শেষ করে ফেলি গিয়ে। বসো তুমি—মা'র সঙ্গে কথা বলো।

তার পর বেলা পড়িয়া যাইবে। রোয়াকে কাস্তে বঁটি পাতিয়া একরাশ বিচুলি কাটিতে হইবে, গরুকে জাব খাওয়াইতে। মাঠ হইতে গরু অবশ্য মা-ই আনে, কারণ এ সময়টা সে কাজে এত ব্যস্ত থাকে যে, নদীর ধারের মাঠ হইতে গরু আনিবার সময় তার বড় একটা হয় না। তারপর বাইরের বেড়ার গা হইতে শুকনো কাপড় তুলিতে হইবে, ঘর ঝাঁট দিতে হইবে, লণ্ঠনে তেল পুরিয়া মুছিয়া রাখিতে হইবে, গা ধুইয়া আসিতে হইবে, পাতকুয়া তলায় সাঁজ জ্বালিয়াই বাবার মিছরি মরিচ গরম করিয়া দিয়া রাত্রের ভাত চড়াইতে হইবে। সকলের খাওয়া-দাওয়া সারা হইলে সে নিজে এক মুঠা চালভাজা তেল-নুন মাখিয়া এক ঘটি জল খাইয়া বাবার পায়ে বাতের তেল মালিশ করিতে বসিবে। এই সব সারিতে রাত সাড়ে দশটার গাড়ী গড় গড় করিয়া মাত্‌লার বিলের পুলের উপর দিয়া যাইবার শব্দ পাওয়া যাইবে।

তবে দিনের মতো ছুটি। এই চলিবে দিনের পর দিন, তিন শো ত্রিশ দিন।

হঠাৎ নবু জানলার বাহিরে হাত বাড়াইয়া আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ঊই রাণাঘাটের ইস্টিশান দেখা যাচ্ছে দিদি--

রাধার চমক ভাঙিল।

সে মুখ বাড়াইয়া দেখিল, প্রকাণ্ড ট্রেনটা অজগর সাপের মতো বাঁকিয়া রেল স্টেশনের নিকটবর্তী হইতেছে। যেখানে তার ইঞ্জিন, সেখানে দূরে একটা বড় বাড়ী ও টিনের ছাদ দেওয়া দালান-মতো দেখা যাইতেছে। রাণাঘাট পৌঁছিয়া গেল এর মধ্যে!

প্ল্যাটফর্মে নামিয়াই নবু বলিল—একখানা পাঁউরুটি কিনে দ্যাও না দিদি! কি খিদেই পেয়েছে—ডাক্‌ব?

আঁচলের গেরো খুলিয়া তিনটি পয়সা বাহির করিয়া রাধা ভাইকে একখানা পাঁউরুটি কিনিয়া দিল। তাহার নিজেরও খুব ক্ষুধা পাইয়াছে—সেও তো সারাদিন কিছু খায় নাই। ভাইকে বলিল—আর কিছু খাবি? এক কাজ কর বরং, চল বাইরের দোকান থেকে আলুর দম কিনে দিই এক পয়সার। পাঁউরুটি দিয়ে খা, পেট ভরবে এখন।

নবু বলিল—তুমি কিছু খাবে না দিদি?

—আমি রেলের কাপড়ে কি খাব? চা খেতে পারি, ওতে দোষ নেই—যা দিকি ঐ চা বিক্রি করচে, জেনে আয় কত করে নেবে এক পেয়ালার দাম।

নবু জানিয়া আসিয়া বলিল—এক পেয়ালা চা চার পয়সা, দিদি।

—উঃ বাবা, চার পয়সা। তবে থাক্ গে। মোটে আর ন'টি পয়সা আছে। বাবার জন্য একখানা পাঁউরুটি কিনে নিতে হবে। দুধ দিয়ে পাঁউরুটি খেতে ভালোবাসেন বাবা। মা'র জন্য কি নেব বল্ তো?

রাণাঘাট স্টেশনে দাঁড়াইয়া রাধার মনের দুঃখ অনেকটা চলিয়া গিয়াছে। কত লোক-জন, গাড়ী-ঘোড়া, দোকান, পসার—দেখিলে মনে শান্তি পাওয়া যায়।

এমন সময়ে প্ল্যাটফর্মে একটা শব্দ উত্থিত হইল—লোক-জন, পানওয়লা, পাঁউরুটি-ওয়ালারা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। লোক যে যেখানে ছিল দাঁড়াইয়া উঠিল। রাধা একটি কুলিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, ডাক-গাড়ী আসিতেছে। দার্জিলিং মেল।

অল্পক্ষণ পরে সশব্দে বিশাল ট্রেনখানা প্ল্যাটফর্মের ওপ্রান্তে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে ভিড়, হাঁকাহাঁকি, লোক-জনের দৌড়াদৌড়ি, পুরি-তরকারি, পান-বিড়ি-সিগারেট, 'কুলি কুলি', 'ইধার আও', হৈ হৈ ব্যাপার। স্টেশন সরগরম হইয়া উঠিল; রাধা আর নবু যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, তারই সামনে ডাক-গাড়ীর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী কামরা-গুলি থামিল।

রাধা অবাক্ হইয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। ঝকঝক তকতক করিতেছে কামরা-গুলি। কি রকম পুরু চামড়ার গদি-আঁটা বেঞ্চি। সাহেব, মেম, মোমের পুতুলের মতো তাদের ছেলেমেয়েরা, দামী শাড়ী-পরা সুন্দরী বাঙালী বড়লোকের মেয়েরা...সুবি কোথায় লাগে এদের কাছে? বেহারারা ট্রের উপর চায়ের জিনিস বসাইয়া ছুটোছুটি করিতেছে ...একটি অতি সুন্দর ছ'সাত বছরের ফ্রক-পরা সাহেবদের মেয়ে প্ল্যাটফর্মে নামিয়া লাফাইতেছিল—তার মা আসিয়া তার হাত ধরিয়া গাড়ীর মধ্যে উঠাইয়া লইতে লইতে কি বলিল—হিট্ হিট্ প্রিং প্রিং—কেমন মজার কথা ওদের?...হাসি পায় শুনলে। সত্যি সত্যি কি চমৎকার দেখিতে খুকিটা!

নবু বলিল—এই দিকে এসে দ্যাখো দিদি, খাবার গাড়ী।

একখানা খুব লম্বা গাড়ির মধ্যে সারি সারি টেবিল পাতা, টেবিলের উপর ধপ্‌ধপে চাদর, কাঁচের ফুলদানিতে ফুল সাজানো, চকচকে সব কাঁচের বাসন! মেলা সাহেব-মেম খাইতে বসিয়াছে। বাঙালীর মেয়েও আছে তাদের মধ্যে। তবে বেশি নয়—দু-একজন। আঠারো উনিশ বছরের একটি বাঙালীর মেয়ে বেশি দামের টিকিটের কামরা হইতে নামিয়া প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া ফল কিনিতেছে।

রাধা কি দেখিল, কি পাইল জানি না কিন্তু ডাকগাড়ীখানা তার সুশ্রী সুবেশ আরোহীদল ও সুসজ্জিত ঝকঝকে তকতকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাগুলি লইয়া তাহার মনে একটি অপূর্ব আনন্দ, উৎসাহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করিল। সমস্ত দার্জিলিং মেলখানা যেন একটি উদ্দীপনাময়ী কবিতা—কিংবা কোনো প্রতিভাবান গায়কের মুখে শোনা সংগীত। রাধার মনে হইল, এই ভালো কাপড়-চোপড় পরা সুন্দর চেহারার মেয়ে-পুরুষ, বালক-বালিকাদের সে দেখিতে পাইতে পারে—যদি মাত্র ছ' আনা পয়সা খরচ করিয়া রাণাঘাট স্টেশনে আসে। যে পৃথিবীতে এরা আছে, সেখানে তার বাবার বাতের বেদনা, সুবির হৃদয়হীনতা, মায়ের খিটখিটে মেজাজ, বাবা-মায়ের ঝগড়া, শাশুড়ীর নিষ্ঠুর ব্যবহার—সব ভুলিয়া যাইতে হয়, এমন কি তার ছ ভরির হারছড়ার লোকসানের ব্যথাও যেন মন হইতে মুছিয়া যায়। কি চমৎকার! দেখিলে জীবন সার্থক হয় বটে, মন ভরিয়া ওঠে বটে। সংসারে এত সুখ, এত রূপ, এত আনন্দও আছে!

পূর্বেই বলিয়াছি, রাধা কি বুঝিল, কি পাইল জানি না—কিন্তু একথা খুবই সত্য যে, মেল গাড়ীখানা ছাড়িয়া গেলে রাধা দেখিল যে, সে যেন নতুন মানুষ হইয়া গিয়াছে। মনে নতুন উৎসাহ, হাতে পায়ে নতুন বল, চোখে নতুন ধরনের দৃষ্টি। সে যেন রাধা নয়—যে সংসারে অসহায়, অনাহূত, উপেক্ষিত, অবলম্বনহীন এবং যার শেষ সম্বল ছ' ভরির হারছড়াটা পর্যন্ত শাশুড়ী ঘুচাইয়া দিয়াছে। একটুখানি সহানুভূতির কথা ও মিষ্টি হাসির লোভে যাকে কালই ডোবার ঘাটে সুবির অজস্র খোশামোদ করিতে হইবে।

নবুকে বলিল—ওদের কাছ থেকে এক পেয়ালা চা নিয়েই আয় নবু, তুই আর আমি ভাগ করে খাই। যাক গে চার পয়সা। আমাদের ট্রেনের এখন অনেক দেরি। ততক্ষণ এক পেয়ালা চা খেয়ে নেওয়া যাক। বাড়ী গিয়ে যেন মা'র কাছে বলিস্ নে।

মণি ডাক্তার

আষাঢ় মাসের প্রথমে জ্যৈষ্ঠের গরমটা কাটিয়া গিয়াছে তাই রক্ষা, যে কষ্ট পাইয়াছিলাম গত মাসে! এই বাগানঘেরা হাটতলায় কি একটু বাতাস আছে?

কিছু করিতে পারিলাম না এখানেও। আছি তো আজ দেড় বছর। শুধু এখানে কেন, বয়স তো প্রায় বত্রিশ-তেত্রিশ ছাড়াইতে চলিয়াছে, এখনও পর্যন্ত কি করিলাম জীবনে? কত জায়গায় ঘুরিলাম, কোথাও না হইল পসার, না জমিল প্র্যাক্‌টিস্! বাগআঁচড়া, কলারোয়া শিমুলতলী, সত্রাজিৎপুর বাগান গাঁ, কত গ্রামের নামই বা করিব। কোথাও মাস কয়েকের বেশী চলে না। এই পলাশপাড়ায় যখন প্রথম আসি, বেশ চলিয়াছিল কয়েক মাস। ভাবিয়াছিলাম ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিলেন বুঝি। কিন্তু তার পরেই কি ঘটিল, আজ কয়েকমাস একটি পয়সারও মুখ দেখিতে পাই না।

এখন মনে হয় কুণ্ডু বাবুদের আড়তে যখন চাকুরি করিতাম শ্যামবাজারে, সেই সময়টাই আমার খুব ভাল গিয়াছে। আমাদের গ্রামের একজন লোক চাকুরিটা জুটাইয়া দিয়াছিল, খাতাপত্র লিখিতাম, হাতের লেখা দেখিয়া বাবুরা খুশি হইয়াছিল। আট নয় মাসের বেশী সেখানে ছিলাম, তার মধ্যে কলিকাতায় যাহা কিছু দেখিবার আছে, সব দেখিয়াছি। চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, বায়োস্কোপ, থিয়েটার, পরেশনাথের বাগান, কালীঘাটের কালীমন্দির। কি জায়গাই কলকাতা।

চাকুরিটা যাইবার পরে পরের দাসত্বের উপর বিতৃষ্ণা হইল। ভাবিলাম ডাক্তারী ব্যবসায় বেশ চমৎকার স্বাধীন ব্যবসা। কুণ্ডু বাবুদের বাড়ির ডাক্তারবাবুকে ধরিয়া তাঁহার ডিস্‌পেন্সারিতে বসিয়া মাস দুই কাজ শিখিলাম। কিছু বাংলা ডাক্তারী বই কিনিয়া পড়া-

শনুনাও করিলাম। তারপর হইতেই নিজের দেশ ছাড়িয়া এই সনুদনুর যশোহর জেলার পল্লীতে পল্লীতে ঘনুরিয়া বেড়াইতেছি।

এ গ্রামে ব্রাহ্মণের বাস নাই, হিন্দনুর মধ্যে কয়েক ঘর গোয়ালা ও কলনু আছে, বাকী সব মনুসলমান। পলাশপনুরে কারো কোঠাবাড়ি নাই, সকলে নিতান্ত গরীব, সকলেরই খড়ের ঘর। খনুব বেশী লোকের বাসও যে এখানে আছে, তাও নয়। যদি বলেন, এখানে কেন ডাক্তারী করিতে আসিয়াছি, তার একটা কারণ নিকটবর্তী অনেকগনুলি গ্রামের মধ্যে এখানেই হাট বসে। এমন কিছনু বড় হাট নয়, তবনুও বনুধবারে ও শনিবারে অনেকগনুলি গ্রামের লোক জড়ো হয়।

হাটতলায় ক'খানা খড়ের আটচালা ও সবাইপনুরের গাঙ্গনুলীদের ছ'আনি তরফের কাছারী-ঘর আছে। কাছারী-ঘরখানা দেওয়াল-বিহীন খড়ের ঘর। বছরের মধ্যে কিস্তির সময় জমিদারের তহশীলদার আসিয়া মাস দনুই থাকিয়া খাজনাপত্র আদায় করিয়া চলিয়া যায়। সনুতরাং ঘরখানা ভাল করিবার দিকে কাহারও দনৃষ্টি নাই। ঘরের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, সারা মেজেতে ইঁদনুরের গর্ত, মটকা দিয়া বর্ষার জল পড়ে, ঝড়-ঝাপনুটা হইলে ঘরের মধ্যে বসিয়াও জলে ভিজিতে হয়! ছ'আনির বাবনুদের এহেন কাছারী-ঘরে নায়েবকে বলিয়া কহিয়া আশ্রয় লইয়া আছি।

একাই থাকি। এ দিকের সব গাঁয়ের মত এ গাঁয়েও বনজঙ্গল, বাঁশবন, প্রাচীন আমের বাগান বড় বেশী। হাটতলার তিনদিক ঘিরিয়া নিবিড় বাঁশবন ও আমবাগান, একদিকে সনুঁড়ি জঙ্গলের গা ধরিয়া আধপোয়া পথ গেলে বেত্রবতী নদী—স্থানীয় নাম বেতনা। বনজঙ্গলের দরনুন দিনের বেলাও হাটতলাটা যেন খানিকটা অন্ধকার দেখায়, রাত হইলে হাটতলায় লোকজন থাকে না, দনু'একখানা যা দোকানপত্র আছে, দোকানীরা বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইবার পরে হাটতলা একেবারে নির্জন হইয়া পড়ে, বনে ঝোপে-ঝাড়ে বাঁশবাগানে জোনাকী জবলে, ক্বচিৎ ফনুটন্ত ঘেঁটনুকোল ফনুলের দনুর্গন্ধ বাহির হয়, উত্তর দিকের শিমনুলগাছটায় পেঁচা ডাকে, আমি একা বসিয়া ভাত রাঁধি, কোন কোন দিন ভাত চড়াইয়া দিয়া একতারাটা হাতে লইয়া আপন মনে গান করি।

আজ ছয় সাত মাস একটা পয়সা আয় নাই। হাটে ঢেঁড়া পিটাইয়া দিয়াছি, চার আনা ভিজিট লইব, ওষনুধের দাম দাগপিছনু এক আনা। তবনুও রোগীর দেখা নাই। ভাগ্যে মনুজিবর রহমান লোকটা ভাল, নিজের দোকান হইতে আজ চার পাঁচ মাস ধরে চাল ডাল দেয়, তাই কোনরকমে চলিতেছে।

গোয়াল-পাড়ায় দামনু ঘোষের বাড়ি একটা নিউমোনিয়া কেস ছিল গত মাসে। মনুজিবর এদিকের মধ্যে মাতব্বর লোক, সবাই তার কথা মানে, তাকে ধরিয়া সনুপারিশ করাইয়াছিলাম দামনু ঘোষের কাছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমায় না ডাকিয়া ডাকিল গিয়া বলরামপনুরের অবিনাশ সেক্‌রা কবিরাজকে। অবিনাশ কবিরাজের উপর তাদের নাকি অশেষ বিশ্বাস।

সনুবাসিনীকে লইয়া হইয়াছে মনুশকিল। বিবাহ করিয়া পর্যন্ত তাকে বাপের বাড়ি ফেলিয়া রাখিয়াছি। একখানা ভাল কাপড় পর্যন্ত কোন দিন দিতে পারি নাই, ছেলেটির দনুধের দাম সাত আট টাকা বাকী, শাশনুড়ী ঠাকরনুণ তাগাদা করিয়া চিঠি দেন, কোথায় পাইব সাত আট টাকা, নিজেই পাই না পেটে খাইতে। টাকা দিতে পারি না বলিয়া শাশনুড়ী ঠাকরনুণ মহা অসন্তুষ্ট, তিনি ভাবেন কত টাকাই না রোজগার করিতেছি ডাক্তারীতে।

কেহ বলিলে হয়তো বিশ্বাস করিবে না, আজ চার পাঁচ মাস এক রকম শনুধনু ভাত খাই! পাড়াগাঁ হইলেও এখানে জিনিসপত্র উৎপন্ন হয় না বলিয়া অতিরিক্ত আক্রা—পটল

দুই আনা সের, আলু ছয় পয়সা। মাছ চার আনা ছয় আনার কম নয়। কেহ দেখিতে পাইবে বলিয়া খুব ভোরে নদীর ধার হইতে শুশুনি আর কাঁচড়াদাম শাক তুলিয়া আনি মাঝে মাঝে। আজকাল আমের সময়, শুধু আম ভাতে আর ভাত; কতদিন শুধু নুন দিয়াই ভাত খাইয়াছি।

পাশকরা ডাক্তার নই, কিন্তু তাতে কি? বাড়ি বসিয়া বই পড়িয়া কি আর ডাক্তারী শেখা যায় না? আজ সাত আট বছর তো ডাক্তারী করিতেছি, অভিজ্ঞতা বলিয়া একটা জিনিসও তো আছে। পাশকরা ডাক্তারের হাতে কি আর রোগী মরে না? ধোপাখালির ইন্দু ডাক্তার আসিয়া বিধু গোয়ালিনীর মেয়েটাকে বাঁচাইতে পারিয়াছিল?

তবে কেন যে দুষ্ট লোকে রটাইয়াছে, মণি ডাক্তারের ওষুধ খাইলে জ্যান্ত মানুষ মরিয়া ভূত হয়, ইহার কারণ কে বলিবে? আমি গরীব বলিয়া আমার দিকে কেউ হয় না, এক মুজিবর ছাড়া—ঐ লোকটা আজ তিন চার মাস বিনা আপত্তিতে নিজের দোকান হইতে চাল ডাল না দিলে আমাকে উপবাস করিতে হইত। সে আমার জন্য যত করিয়াছে, এ অঞ্চলের কেহ তাহার সিকিও কোনদিন করে নাই। তাহার ঋণ কখনও শোধ করিতে পারিব না।

এ সব অজ-পাড়াগাঁ। রেলস্টেশন হইতে দশ বারো ক্রোশ দূরে। কাছে কোন বড় বাজার কি গঞ্জ নাই, লোকজন নিতান্ত অশিক্ষিত; রোগ হইলে ডাক্তার ডাকার বদলে জল-পড়া, তেল-পড়া দিয়ে কাজ সারে। ফকির ডাকাইয়া ঝাড়ফুঁক করে, বলে অপ-দেবতার দৃষ্টি হইয়াছে। ডাক্তার ডাকিবার রেওয়াজই নাই।

বাড়ি যাই নাই আজ দেড় বছর। পলাশপুর আসিবার আগে কিছুদিন ছিলাম সত্রাজিৎপুরে, তখন হইতেই যাই নাই। বাড়ি মানে শ্বশুরবাড়ি—নিজের বাড়িঘর বলিয়া কিছু নাই অনেক দিন হইতেই। শ্বশুরবাড়ি যাইতে হইলে আট ক্রোশ হাঁটিয়া নাভারণ স্টেশনে রেলে চাপিতে হইবে। সেখান হইতে মসলন্দপুর স্টেশনে নামিয়া মোটরবাসে যাইতে হইবে খোলাপোতা। সেখানে মার্টিন লাইনের ছোট রেলে হাসানাবাদ পর্যন্ত গিয়া ইছামতীতে নৌকায় ছয় সাত ঘণ্টা গেলে তবে শ্বশুরবাড়ি। সবসুদ্ধ তিন চার টাকা খরচ পড়ে—যখনই টাকা হাতে আসিয়াছে, তখনই মণি-অর্ডার করিয়া সুবাসিনীর নামে পাঠাইয়া দিয়াছি—তিন চার টাকার মুখ একসঙ্গে কমই দেখিয়াছি আজ দু'বছরের মধ্যে। টাকা না পাঠাইলে শাশুড়ী ঠাক্‌রুণের আর আমার বিধবা শালীর গঞ্জনার চোটে বেচারীকে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে হয়।

তাই এবার যখন আসি, খাওয়া-দাওয়া সারিয়া নৌকায় চড়িব, সুবাসিনী কোণের ঘরে ডাকিয়া বলিল—শোন, এবার আমায় এখানে বেশী দিন ফেলে রেখো না—তুমি যেখানেই থাক, আমায় নিয়ে যেয়ো শীগ্‌গীর।

—সেই সব পাড়াগাঁয়ে কি আর থাকতে পারবে?

—এই বা এমন কি শহর? তা ছাড়া তুমি যেখানে থাকবে, সেই খানেই আমার শহর। এখানে দিদির বাক্যির জ্বালায় এক এক সময় মনে হয় গলায় দড়ি দিই, কি গাঙে ডুবে মরি।

—সবই বুঝি সুবি, আমার যদি একটুকু সংস্থান হয় কোথাও, তবে তোমাকে ঠিক সেখানে নিয়ে যাবো। আমিই কি তোমাকে আর কোথাও ফেলে মনের সুখে থাকি ভাবো? তবে কি করি বল—

দরজার বাহিরে পা দিয়াছি শাশুড়ী ঠাক্‌রুণ ওৎ পাতিয়া ছিলেন, বলিলেন—তুমি বাপু অমনি নিউদ্দিশ হয়ে থেকো না গিয়ে। আমার এই অবস্থা, সংসারে একপাল কুপুষ্যি কোথা থেকে কি করি বল তো? এক কাঁড়ি দুধের দেনা গোয়ালার কাছে, ছেঁড়া

কাপড় পরে পরে দিন কাটায়, মা হয়ে চোখের সামনে দেখতে পারিনে বলে এক জোড়া কাপড় কিনে এনে দিয়েছিলাম, তার দাম এখনও বাকী—তোমার তো বাপু এখান থেকে চলে গেলে আর চুলের টিকি দেখা যায় না—কি যে আমি করি, এমন পুরুষমানুষ বাপের জন্মে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেই অবস্থায় আসিয়া আজ দেড় বৎসর শ্বশুরবাড়ি-মুখো হই নাই। অবশ্য এর মধ্যে মাঝে মাঝে হাতে যখন যা আসিয়াছে, সুবাসিনীর নামে পাঠাইয়া দিয়াছি—কিন্তু সবসুদ্ধ ধরিলে খরচের তুলনায় তার পরিমাণ খুব বেশী নয়। কিন্তু আমি কি করিব, চুরি-ডাকাতি তো করিতে পারি না।

সত্যই সুবাসিনীকে বিবাহ করিয়া পর্যন্ত বেশী দিন তাহার সঙ্গে একত্র থাকিবার সুযোগ আমার হয় নাই। প্রথম প্রথম ভাবিতাম, একটা কিছু সুবিধা হইলেই তাহাকে লইয়া গিয়া কাছে রাখিব। কিন্তু বিবাহ করিয়াছি আজ ছয় সাত বছর, তার মধ্যে এ সুযোগ কখনও হইল না। শ্বশুরবাড়িতেই বা গিয়া কয়দিন থাকা যায়, একে তো মেয়ে এতকাল ধরিয়া রহিয়াছে, তার উপর জামাই গিয়া দুদিনের বেশী দশদিন থাকিলেই শাশুড়ী ঠাকুরুণ স্পষ্ট বিরক্ত হইয়া উঠেন বেশ বুঝিতে পারি, কাজেই বুদ্ধিমানের মত আগেই সরিয়া পড়ি। নিজের মান নিজের কাছে।

একদিন শুনিলাম পানখোলার পাঠশালায় একজন মাস্টারের পোস্ট খালি আছে। মুজিবর রহমানের দোকানে সকালে বিকালে বসিয়া দুই একটা সুখদুঃখের কথা বলি, সে আমায় পরামর্শ দিল, মাস্টারির জন্য চেষ্টা দেখিতে!

বাড়ি আসিয়া কথাটা ভাবিলাম। সাত আট বছর ডাক্তারী করিয়া তো দেখা গেল পেটের ভাত জুটান দায়—তবুও একটা বাঁধা চাকুরী করিলে, মাস গেলে যত কমই হোক, কিছু হাতে আসিবে।

খবর লইয়া জানিলাম, মকরন্দপুরের শ্রীনাথ দাস ঐ পাঠশালার সেক্রেটারী। পরদিন সকালে রওনা হইলাম মকরন্দপুরে।

মকরন্দপুর এখান হইতে সাত আট ক্রোশের কম নয়। সকালে স্নান সারিয়া দুটি চাল গালে দিয়া জল খাইয়া বাহির হইলাম। মকরন্দপুর কোন্ দিকে আমার ঠিকমত জানা ছিল না, পলাশপুর ছাড়াইয়া অম্বিকাপুরের কলুবাড়ির কাছে যাইতে কলুরা বলিয়া দিল ঝিটকিপোতার খেয়া পার হইয়া নকফুলের মধ্য দিয়া গেলে, দেড় ক্রোশ রাস্তা কম হইতে পারে।

সকাল আটটার মধ্যে খেয়া পার হইলাম। একটি ছোট ছেলে আমার সঙ্গে এক নৌকায় পার হইল। মাঠের মধ্যে কিছুদূরে গিয়া সে একটা বটগাছের তলা দেখাইয়া বলিয়া দিল—ঐ গাছতলা দিয়ে চলে যান বাবু, বাঁ দিকে নকফুলের রাস্তা।

রোদ বেশ চড়িয়াছে। ছোট একটা খাল হাঁটিয়া পার হইয়া বড় একটা আমবাগানের ভিতরে গিয়া পড়িলাম। এ সব অঞ্চলের আমবাগান মানে গভীর জঙ্গল। তার মধ্যে অতি কষ্টে পথ খুঁজিয়া লইয়া বাগানটা পার হইয়া যাইতেই একটা কোঠাবাড়ি দেখা গেল। ক্রমে অনেকগুলি দালান কোঠা পথের ধারে দেখা যাইতে লাগিল। অধিকাংশই পুরাতন, প্রাচীন কার্নিসে দেওয়ালে বট-অশ্বত্থের চারা গজাইয়াছে। গ্রামখানা ছাড়াইয়া মাঠের মধ্যে একটা বটগাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। পিপাসা পাইয়াছে। ভাবিলাম, নকফুলে কাহারও বাড়ি জল চাহিয়া খাইলেই হইত। এদিকে শুধুই মাঠ, নিকটে আর কোন গ্রামও তো নজরে পড়ে না।

পুনরায় পথ হাঁটিতে লাগিলাম। পথে সবই চাষাদের গাঁ পড়িতে লাগিল। ব্রাহ্মণ মানুষ, যেখানে সেখানে তো আর জল খাইতে পারি না!

সুন্দরপুর, চাতরা, নলদি, মামুদপুর...

তারপরেই পড়িল আর একটা মাঠ। বেলা তখন দুপুর ঘুরিয়া গিয়াছে। কিছু খাইতে পাইলে ভালই হইত—পেট জ্বলিয়া উঠিল। আপাততঃ জল খাইলেও চলিত। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড কি ছাই এ দিকে কোথাও একটা টিউবওয়েলও দেয় নাই কোন গ্রামে? মাঠের মধ্যে কোথাও কি একটা পুকুর নাই?

মেটেরাস্তায় হাঁটিয়া যখন নদীর ধারে পেঁছিলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। পেঁছিয়া দেখি খেয়াঘাট কচুরিপানায় বুজিয়া গিয়াছে, খেয়ার নৌকাখানি ডুবানো অবস্থায় এপারে বাঁধা। কোনও জনপ্রাণী নাই।

কি বিপদ! এখন পার হওয়ার কি করি? নিকটে একটা চাষা গাঁ। সেখানে খোঁজ লইয়া জানিলাম, কচুরিপানায় ঘাট বুজিয়া যাওয়ায় সেখানকার খেয়া আজ মাসখানেক যাবৎ বন্ধ। আরও ক্রোশখানেক উজানে খালিশপুরের ঘাটে খেয়া পাড়িতেছে।

এই অবস্থায় মাঠ ভাঙিয়া এক ক্রোশ নদীর ধারে খালিশপুর পর্যন্ত যাওয়া তো দেখিতেছি বড় কষ্ট! পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—পোয়াটাক পথ গিয়া একটা বড় শিমুলগাছের নীচে নদী হাঁটিয়া পার হওয়া যায়।

অন্ধকারে আধ মাইল হাঁটিয়া নদীর পারে একটা শিমুল গাছ দেখা গেল বটে, কিন্তু জল সেখানে বিশেষ কম বলিয়া মনে হইল না। জলে তো নামিলাম, জল ক্রমে হাঁটুর উপর ছাড়াইয়া কোমরে উঠিল। কোমর হইতে বুক, বুক হইতে গলা। কাপড়-জামা ভিজিয়া ন্যাতা হইয়া গেল—তখনও জল উঠিতেছে—নাকে আসিয়া যখন ঠেকিল, তখন পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়া ডিঙি মারিয়া চলিতেছি! অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, —ভয় হইল একা এই অন্ধকারে অজানা নদী পার হইতে কুমীর না ধরে! বড় কুমীর না আসুক, দুই একটা মেছো কুমীরেও তো গুঁতাটা-আস্‌টা দিতে পারে!

কোন রকমে ওপারে গিয়ে উঠিলাম। কোন দিকে লোকালয় নাই, একটা আলোও জ্বলে না এই অন্ধকারে। একটা জায়গায় মাঠের মধ্যে দুইদিকে রাস্তা গিয়াছে। মকরন্দপুরের রাস্তা কোন্ দিকে—ডাইনে না বাঁয়ে? কে বলিয়া দিবে, জনমানবের চিহ্ন নাই কোথাও। ভাগ্য আবার এমনি, ভাবিয়া চিন্তিয়া যে পথটি ধরিলাম, সেইটিই কি ঠিক ভুল পথ! আধক্রোশ তিনপোয়া পথ হাঁটার পরে এক বাগ্দীবাড়িতে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—আমি তিনপোয়া পথ উল্টোদিকে আসিয়া পড়িয়াছি। যাওয়া উচিত ছিল ডাইনের পথে, আসিয়াছি বাঁয়ের পথে।

আবার তখন ফিরিয়া গিয়া সেই পথের মোড়ে আসিলাম! সেখান হইতে ডাইনের পথ ধরিলাম। এইবার পথে বিষম জঙ্গল। বড় বড় আমবাগান, বাঁশবন, আর ভয়ানক আগাছার জঙ্গল! আমি জানিতাম, এখানে খুব বাঘের ভয়। দিনমানে গরু-বাছুর বাঘে লইয়া যায়—একবার আমি একটা রোগীর চিকিৎসা করি, তাহার কাঁধে গোবাঘায় থাবা মারিয়াছিল।

ভীষণ অন্ধকার—রাস্তা হাঁটা বেজায় কষ্ট, পাকা আম পড়িয়া পথ ছাইয়া আছে —এ সব অঞ্চলে এত আম যে, আমের দর নাই, তলায় পড়া আম কেউ বড় একটা কুড়োয় না। অন্ধকারে আমের উপর পা দিয়া পা পিছলাইয়া যাইতে লাগিল। আম তো ভাল, সাপের ঘাড়ে পা দিলেই আমার ডাক্তারলীলা অচিরাৎ সাঙ্গ করিতে হইবে, তাই ভাবিতেছি।

অতি কষ্টে মকরন্দপুর পেঁছিলাম, রাত নয়টার সময়। সেক্রেটারী শ্রীনাথ দাসের বাড়িতে রাত্রে আশ্রয় লইলাম। কিন্তু চাকুরি মিলিল না, যাতায়াতই সার। পরদিন সকালে শ্রীনাথ দাস বলিল—এ মাসে নয়, আশ্বিন মাস থেকে ভাবছি লোক নেব। ইস্কুলের

অবস্থা ভাল নয়। ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের সাহায্য আসে মাসে দশ টাকা চার আনা, সেইটিই ভরসা। ছাত্রদত্ত বেতন মাসে ওঠে মোট তের সিকে। দুজন মাস্টার কি করে রাখি? তা আপনি আশ্বিন মাসের দিকে একবার খোঁজ করবেন।

গেল মিটিয়া। আশ্বিন মাস পর্যন্ত খাই কি যে পানখোলা ইউ-পি-পাঠশালার দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদের জন্য বসিয়া থাকিব! বেতন শুনিলাম পাঁচ টাকা। হেড পণ্ডিত পান নয় টাকা।

সারাদিন হাঁটিয়া আবার ফিরিলাম পলাশপুর। সন্ধ্যা হইয়া গেল ফিরিতে। শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত, পা টন্ টন্ করিতেছে। মুজিবর জিজ্ঞাসা করিল—কি হল ডাক্তারবাবু? তাহাকে সব বলিলাম, তারপর নিজের অন্ধকার খড়ের ঘরে ঢুকিয়া ভাঙা লণ্ঠনটা জ্বালিলাম। নদীর ঘাট হইতে হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া মাদুরটা বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম। ক্ষুধা খুবই পাইয়াছিল, কিন্তু উঠিয়া রাঁধিবার উৎসাহ মোটেই ছিল না। গোটাকতক আম খাইয়া রাত্রি কাটিল।

অন্ধকারে শুইয়া শুইয়া কত কথা ভাবি। একা একা কাটাইতে হয়, কথা বলিবার মানুষ পাই না, এই হইয়াছে সকলের চেয়ে কষ্ট। ইচ্ছা হয় স্ত্রীকে আনিয়া কাছে রাখিতে। কতকাল তাহাকে দেখি নাই, তাহার একটু সেবা পাইতে সাধ হয়। এই সারাদিন খাটিয়া-খুটিয়া আসিলাম, ইচ্ছা হয় কাছে বসিয়া একটু গল্প করুক, দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও সুখে থাকিব। কিন্তু আনি কোথা হইতে? খাওয়াই কি?

হাটতলায় কি ভীষণ অন্ধকার। মাত্র দুখানি দোকান, তাও দোকানীরা বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। চারিদিকে বড় বড় গাছপালার অন্ধকারে জোনাকী জ্বলিতেছে, বিলাতী আম্ড়াগাছটায় বাদুড়ে ডানা ঝট্পট্ করিতেছে।

গভীর রাত্রি হইয়াছে, কিন্তু গরমে ঘুম আসে না চোখে। কি বিশ্রী গুমোট! সারা-রাত্রি ঢুব্‌ঢাব্ শব্দে পাকা আম পড়িতেছে চারিদিকের আমবাগানে, শুইয়া শুনিতেছি।

উঃ, কি একঘেয়েই হইয়া উঠিয়াছে এখানকার জীবন, সকালে উঠিয়া নদীর ধারে একটু বেড়াইয়া আসিয়া সেই হাটতলায় ফিরিয়া আসি, বেশিদূর কোথাও যাইতে পারি না, কি জানি রোগী আসিয়া যদি ফিরিয়া যায়? সারাদিন ডিসপেন্‌সারি আগলাইয়া বসিয়া থাকিতে হয় আশায় আশায়।

মুদি পোড়া আঁখি বসি রসালের তলে
ভ্রান্তিমদে মাতি ভাবি পাইব
পাদপদ্ম! কাঁপে হিয়া দুরু দুরু করি—

আর তা ছাড়া যাই বা কোথায়? চাষা গাঁ, কোন ভদ্রলোকের বাড়ি নাই যে বসিয়া গল্প-গুজব করি। ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই আমার ফুটা খড়ের ঘরের ডিস্‌পেন্‌সারি আর মুজিবরের দোকান, দোকান আর ডিস্‌পেন্‌সারি। কোন কোন দিন সন্ধ্যার দিকে পিঁপলি-পাড়ার বিলের ধারে বেড়াইতে গিয়া দেখি বাগ্দীরা কি করিয়া ডোঙায় উঠিয়া কোঁচ ছুঁড়িয়া কই মাছ মারিতেছে। অন্ধকার দেখিয়া দুটো হয়তো শাক তুলিয়াও আনি কোন কোন দিন। একঘেয়ে আমভাতে ভাত অখণ্ড প্রতাপে রাজ্য চালাইতেছে তো বৈশাখ মাস হইতেই—কতদিন আর ভাল লাগে?

আমার নামের কপাল নয়! কাল ওপাড়ার বিষ্ণু কলুর বড় ছেলেকে সন্ধ্যার পরে ঘানিঘরের দরজায় সাপে কামড়াইল. আমি শুনিয়াই ছুটিয়া গেলাম, আমায় কেহ ডাকিতে আসে নাই বটে, কিন্তু কানে শুনিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারি কি করিয়া? গিয়াই শক্ত করিয়া গোটাকতক বাঁধন দিলাম. দষ্টস্থান চিরিয়া পটাস্ পারম্যাঙ্গানেট টিপিয়া দিলাম—এমন সময় পাড়ার লোকে ওঝা ডাকিয়া আনিল। ওঝা আসিয়াই আমার বাঁধন

খুলিয়া ফেলিতে হুকুম দিল। আমার নিষেধ কেহই গ্রাহ্য করিল না। বাঁধন খুলিয়া ঝাড়-ফুঁক করিতে করিতে রোগী সারিয়া উঠিল। ঝাড়-ফুঁক সব বাজে, আমার বাঁধনে আর পটাস্ পারম্যাঙ্গানেটে কাজ হইয়াছিল—নাম হইল সেই ওঝার। যাক, সে জন্য আমি দুঃখিত নই, একজনের জীবন বাঁচিয়া গেল, এই আমার যথেষ্ট পুরস্কার।

না খাওয়ার কষ্টও সহ্য করিতে পারি। একঘেয়ে জীবনের কষ্টে একেবারে মারা যাইতে বসিয়াছি। তবুও বসিয়া দিবা-স্বপ্নে কাটাইয়া মনের কষ্ট মন হইতে তাড়াই।

টাকা পয়সা হাতে হইলে কি করিব বসিয়া তাহাও ভাবি।

সুবাসিনীকে লইয়া আসিব, খোকাকে লইয়া আসিব। নদীর ধারে মুজিবর জমি দিতে চাহিয়াছে, সেখানে দুখানা খড়ের ঘর তুলিব আপাততঃ! বাড়ির চারিধারে ছোট একখানা ফুল বাগান করিব, সন্ধ্যা বেলা আধফুটন্ত বেলকুঁড়ি এই গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় রেকাবি করিয়া তুলিয়া আনিয়া কিছু ঘরে কিছু সুবাসিনীর খোঁপায় পরাইয়া দিব। এখানকার তহশিলদারকে বলিয়া কিছু ধানের জমি লইয়া চাষবাস করিব. ঘরে ধান হইলে সচ্ছলতা আপনিই দেখা দিবে।

ভাদ্র মাসে একদিন ডিস্পেন্সারি ঘরে বসিয়া আছি, দেখি যে একটি মেয়ে হাট-তলার বনের মধ্যে জামতলায় কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। আমায় দেখিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

বলিলাম—কি খুঁজছ ওখানে খুকী?

মেয়েটি লাজুক সুরে বলিল—ঘেঁটকোলের ডগা—

—কি হবে ঘেঁটকোলের ডগা?

—ঘেঁটকোলের ডগা তো খায়—

কথাটা জানিতাম না। ঘেঁটকোলের ডগা যদি খাওয়া যায়, তবে তো আমার তরকারী কিনিবার সমস্যা ঘুচিয়া যায়। হাটতলার চারিদিকের বনে-জঙ্গলেই দেখিতেছি বহু ঘেঁটকোল আছে! কিন্তু গাছটি চিনিতাম না, নাম শুনিয়া আসিয়াছি বটে।

বলিলাম—কৈ, কি রকম গাছ দেখি?

মেয়েটি বলিল—এই দেখুন, কচুগাছের মত দেখতে। কিন্তু একটা পাতা তিনটি ভাঁজ করা—

—কি করে খায়?

—যেমন ইচ্ছে। ছেঁচ্কি করে খায়, চচ্চড়ি করেও খায়। খাবেন, দেব তুলে?

মেয়েটির কাছে একটু চাল দেখাইলাম। ডাক্তারবাবু হইয়া বুনো ঘেঁটকোলের ডগা কি করিয়া খাইব, তবে যদি নিতান্তই খাইতে হয়, সে এই অবজ্ঞাত বন্য উদ্ভিদের প্রতি নিতান্ত কৃপা করিয়াই খাইব,—এই ভাবটা দেখাইবার চেষ্টা করিলাম।

বলিলাম—ও সব কচু-ঘেঁচুর ডগা কে রাঁধবে? কি করে রাঁধতে হয়?

মেয়েটি শিখাইয়া দিল, ঘেঁটকোলের ডগার ছেঁচকি রাঁধিবার প্রণালী. এক আঁটি ডগা তুলিয়া দিয়াও গেল।

যাইবার সময় আমার রান্নাঘরের দিকে চাহিয়া বলিল—এখানে কে থাকে?

—আমিই থাকি।

—সে কথা নয়, আপনার সঙ্গে থাকে কে? রেঁধেবেড়ে দেয় কে?

—কেউ না, নিজেই।

সেই হইতে মেয়েটি আমায় একটু কৃপার চক্ষে দেখিল বোধ হয়। যখনই সে হাটতলায় ঘেঁটকোলের ডগা সংগ্রহ করিতে আসিত—আমায় এক আঁটি দিয়া যাইত।

সকালের দিকেও আসিত, আবার বৈকালেও আসিত। একদিন বৈকালে আপন মনে

বসিয়া আছি, মেয়েটি আসিয়া দাওয়ার ধারে কোঁচড় হইতে কিছু ডুমুর বাহির করিয়া রাখিয়া বলিল—এ বেলা হরে কলুদের পুকুরপাড় থেকে ডুমুর পেড়েছিলাম, তাই আপনাকে দুটো দিয়ে যাচ্ছি!

মেয়েটি কে তা আমি কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই। মেয়েটি দেখিতে ভাল, বেশ বড় বড় চোখ, বয়েস আঠারো উনিশ হইবে। গায়ের রং যতটা ফর্সা, এ সব পাড়াগাঁয়ে তত সুন্দর গায়ের রং প্রায়ই দেখা যায় না। তবে ব্রাহ্মণ কায়স্থের ঘরের মেয়ে নয়—দেখিলেই বোঝা যায়। সেদিন তাহার পরিচয় লইয়া জানিলাম সে সেই গ্রামেরই বিধু গোয়ালিনীর মেয়ে, তার ভাল নাম সম্ভবতঃ প্রেমলতা বা ঐ রকম কিছু, সবাই 'প্রমো' বলিয়া ডাকে। অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছে, যেমন সাধারণতঃ আমাদের দেশে গোয়ালার ঘরে হয়।

মেয়েটি কিছুক্ষণ চালের বাতা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বলিল—আপনার বিয়ে হয় নি?

—কেন হবে না?

—তবে বৌকে নিয়ে আসেন না কেন? এখানে তো আপনার রান্নাবান্নার খুব কষ্ট।

—হাঁ, তা বটে। এইবার আনব ভাবছি।

—মা বাবা আছেন?

—নাঃ।

—কোথায় আপনার বাড়ি?

—সে তুমি চিনতে পারবে না, সে অনেক দূর।

এইভাবে আলাপের সূত্রপাত। তারপর কতদিন সকালে বিকালে প্রমো আসিত, কোন দিন ওলের ডাঁটা, কোন দিন ডুমুর, কোন দিন বা একটা চালতা, নিজে যা বনে জঙ্গলে সংগ্রহ করিত, তার কিছু ভাগ আমায় না দিয়া তার যেন তৃপ্তি হইত না। মাঝে মাঝে ওইখানটায় দাঁড়াইয়া চালের বাতা ধরিয়া কত গল্প করিত। সরলা বালিকা কাঠ কুড়াইয়া, শাকপাতা সংগ্রহ করিয়া তার দরিদ্র মায়ের গৃহস্থালীর অভাব দূর করিতে চেষ্টা করিত, তেমনই এই দরিদ্র ডাক্তারের প্রতি গভীর অনুকম্পাবশতঃ তার ভাতের থালার উপকরণও জুটাইয়া দিত। বড় ভাল লাগিত তাকে। একটা অদৃশ্য সহানুভূতির সূত্রে সে আমাকে বাঁধিয়াছিল এবং বোধ হয় আমিও তাকে বাঁধিয়াছিলাম। পলাশপুরের হাটতলায় নিঃসঙ্গ জীবনে একটি মমতাময়ী নারীর সঙ্গ বোধ হয় খুব ভালই লাগিয়াছিল। তাই সে আসিলে মনটা খুশি হইয়া উঠিত। ইদানীং সে আসিতও ঘন ঘন, নানা ছলছুতায়, কারণে অকারণে। আসিয়া খেইহারা কথাবার্তায় থাকিয়া যাইতও অনেকক্ষণ।

একদিন লক্ষ্য করিলাম, প্রমো তার বেশভূষার দিকে নজর দিয়াছে। প্রথম সেদিন তার যত্ন করিয়া বাঁধা খোঁপাটির দিকে চাহিয়া আমার এ কথা মনে হইল। ফর্সা শাড়ি-খানা পরিপাটী করিয়া পরিতে শিখিয়াছে। মুখের হাসির মধ্যে একদিন সলজ্জ সংকোচের ভাব দেখিলাম, যে ধরনের হাসি তার মুখে নতুন। আর কত ভাবেই সেবা করিতে সে চেষ্টা করিত, শাক তুলিয়া, তরকারী কুটিয়া দিয়া। আগে আসিয়া চালের বাতা ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত, ইদানীং দাওয়ার কোণে ওইখানটায় বসিত। তার মুখের ভাব দিন দিন যেন আরও সুশ্রী হইয়া উঠিতেছিল।

পলাশপুরে তো কত লোক আছে, হাটতলায় তো কত লোক যাতায়াত করে, এই দরিদ্র ডাক্তারের নিঃসঙ্গ জীবনের প্রতি কেহই তো অমন দরদ দেখায় নাই—তাই বলি পুরুষমানুষের মেয়েমানুষের মত বন্ধু কোথায়?

গত ফাল্গুন মাসে উপরি উপরি কয়েকদিন সে আসিল না। মনটা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। এমন তো কখনও হয় না। দু'তিন দিন পরে কানে গেল বিধু গোয়ালিনীর

মেয়ের টাইফয়েড হইয়াছে। কেহ ডাকিতে না আসিলেও দেখিতে গেলাম। দেখিয়া শুনিয়া বুঝিলাম, এ বয়সে টাইফয়েড, শিবের অসাধ্য রোগ। প্রাণপণে চিকিৎসা করিতে লাগিলাম—উহারা সাতদিন পরে আমার উপরে আস্থা হারাইয়া ডাকিল ইন্দু ডাক্তারকে। আমাকে রোগশয্যার পাশে দেখিয়া প্রমোর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল প্রথম দিন। শুনিলাম ইন্দু ডাক্তার যেদিন দেখিতে আসিয়াছিল সেদিন সে ইন্দু ডাক্তারের ঔষধ খাইতে চায় নাই। মরণের ছয় সাত দিন পূর্ব হইতে সে অজ্ঞান অবস্থায় ছিল।

আজ কয়েক মাস হইল আমি আবার যে একা, সেই একা। কে আর আমার জন্য শাক, ডুমুর, ঘেঁটকোলের ডগা তুলিয়া দিবে, এখন আবার সেই আমভাতে ভাত!

বর্ষা নামিয়া গিয়াছে। রাস্তাঘাটে বেজায় কাদা, মশার উৎপাত বাড়িয়াছে। হাট-তলার চারিপাশের বাগানের বড় বড় গাছের মাথায় সারাদিন ধরিয়া মেঘ জমিতেছে, ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়িয়া আকাশ একটুখানি ফরসা হইতেছে···আবার মেঘ উড়িয়া আসিতেছে, আবার বৃষ্টি। জলে ভিজিয়া গাছের গুঁড়িগুলির রং আবলুসের মত কালো দেখাইতেছে!

চুপ করিয়া বসিয়া থাকি। মনে হয় কারাগারে আবদ্ধ হইয়া আছি। যখন নিতান্ত অসহ্য হয় মুজিবরের দোকানে গিয়া বসি। নীচু চালাঘরের দোকান, রেড়ির তেল, কেরোসিন তেল, জিরেমরিচ,খড়িমাটি, কড়া তামাক, আলকাতরা, পচা সর্ষের তেল, সবে মিলিয়া কেমন একটা গন্ধ ঘরটায়। গন্ধটায় মন হু হু করে, মনে হয় এ কোথায় পাড়া-গাঁয়ে পড়িয়া আছি! কবে বেড়াজালের নাগপাশ হইতে মুক্তি পাইব? আদৌ মুক্তি পাইব কিনা তাই বা কে জানে। জীবনটা যেন কেমনধারা হইয়া গেল। তবুও যদি—এত কষ্টেও এই একঘেয়ে অজ পাড়াগাঁয়েও, আমার মনে হয়, সব কষ্ট সহ্য করিতে পারিতাম, যদি সুবাসিনী ও খোকা কাছে থাকিত।

একবার যখন কলিকাতায় থাকিতাম, ভবানীপুর দিয়া আসিতেছি, দেখি একটা বড় বাড়ি হইতে দলে দলে মেয়েরা বই হাতে করিয়া বাহির হইতেছে। নানা বয়সের মেয়ে আছে তার মধ্যে।

ভাবিলাম—এ কি? এত মেয়ে আসে কোথা হইতে? ব্যাপার কি একবার দেখিতে হইতেছে তো।

তারপর জানিলাম—সেটা একটা মেয়েদের কলেজ।

কি চমৎকার সব মেয়ে ছিল তার মধ্যে। কেমন সব পরনে, কেমন চশমা, কি রূপ! আর একবার দেবেন্দ্র ঘোষ স্ট্রীট দিয়া যাইতেছিলাম, একটি বড় লোকের বাড়ীর দোতলায় কোন এক মেয়ে গান গাহিতেছিল, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিলাম। অমন সুন্দর গান তারপর আর কখনো শুনি নাই। কোথায়ই বা শুনিব? গানের কয়েকটি লাইন এখনও মনে আছে।

প্রিয় তুমি আস নাই আজ ভোরে
মধুমালতীর নয়নে শিশির দোলে।

সে সব গান আমাদের মত মাটির মানুষের জন্যে নয়।

সারাদিন ঝম্ ঝম্ বৃষ্টির পরে সন্ধ্যার সময় একটু বাদল থামিয়াছে। গাছপালার অন্ধকারের সঙ্গে আকাশের অন্ধকার মিলিয়া হাটতলা যেমন নির্জন, তেমনি অন্ধকার। ডোবার জলে মনের আনন্দে ব্যাঙ ডাকিতেছে, প্রমো যেখানে ঘেঁটকোলের ডগা তুলিয়া বেড়াইত, সেই সব বনে ঝিঁ ঝিঁ পোকার দল একঘেয়ে ডাক জুড়িয়া দিয়াছে। জামগাছের উঁচু ডালটা হইতে দমকা হাওয়া ছড়্ ছড়্ করিয়া পাকা জাম বনের মধ্যে অন্ধকারে জল-ভেজা শেওড়াবনের মাথায় পড়িতেছে।

নির্জন সন্ধ্যায় একা বসিয়া ভাবি······

বঙ্গশ্রী, আশ্বিন, ১৩৪৪

পুরানো কথা

বাল্যে সর্বদাই দেখতুম, বাবার সঙ্গে ঠাকুরমার ঝগড়াবিবাদ চলেছে।

এর কারণ কিছু বুঝতুম না, আমার বয়স তখন সাত বছর। ঠাকুরমা যে বাবার মা এটা অনেকদিনই বুঝেছিলাম, কিন্তু মা ছেলেকে অমনি ক'রে যে দিন নেই রাত নেই বকে, তার কোন নজীর আমার নিজের মায়ের সঙ্গে আমার সম্বন্ধে খুঁজে পাই নি।

বুড়ো মানুষেই যে অমনি করে, তাও তো নয় ; কারণ আমার দিদিমা ছিলেন ঠাকুরমার চেয়েও বেশী বয়সের। দিদিমার মাথার চুল পেকেছিল, ঠাকুরমার মাথার চুল তখনও অনেক কাঁচা। কিন্তু কই দিদিমা তো আমায় খুব ভালবাসতেন, কাউকে তো কখনও বকতে শুনি নি তাঁর মুখে। তবে কেন ঠাকুরমা এরকম করেন আমার বাবাকে? মাঝে মাঝে একথা ভেবেছি। কিন্তু সাত বছরের ছেলে, ভেবে কিছু ঠিক করতে পারতুম না, বা বেশীক্ষণ এসব কথা আমার মনে দাঁড়াতও না।

দিদিমার কাছে আমি অনেক সময় থাকতুম। তাঁর বাড়ি আমাদের গ্রাম থেকে নৌকায় যেতে হয়। অনেকখানি সময় লাগত সেখানে পেঁছিতে। সকালে খেয়ে বার হ'লে সেখানে পেঁছাবার আগে রোদ রাঙা হয়ে আসত ; বাদুড়ের দল ডানা ঝট্‌পট্‌ ক'রে আকাশ দিয়ে উড়ে বাসায় যেত, নদীর জলে নৌকার ধারে ভুস্‌ভুস্‌ করে শুশুকেরা ডিগবাজি খেয়ে ডুব দিত।

এসব অনেক ছেলেবেলাকার কথা। তখন আমরা থাকতাম আমাদের দেশের বাড়িতে। সেখান থেকে অনেকদিন আমরা চ'লে এসেছিলুম, আর কখনও যাই নি। দেশে এখন আর আমাদের বাড়িঘর নেই, ম্যালেরিয়ায় জনহীন শ্রীহীন হয়ে গিয়েছে শুনেছি। বহুদিন কলকাতার বাসিন্দা, এখন সেসব জায়গায় যেতে ভয় করে, বিশেষ করে এখন যখন বয়স হয়েছে; সাবধানে থাকাই ভাল।

দেশের বাড়ির সঙ্গে মায়ের স্মৃতি জড়ানো। যখনই দেশের বাড়ির ডালিম গাছটা, তার পাশে লম্বা পেঁপে গাছটা, তার পাশে পুরোনো পাতকুয়ো ও গোয়ালঘরটার ছবি মনে আসে, সঙ্গে সঙ্গে অমনি মনে আসে আমার মায়ের খুব অস্পষ্ট একটি ছবি। ওদের সঙ্গে মা যেন জড়ানো আছেন।

কি ভালোই বাসতুম মাকে! জীবনে অত ভাল কাউকে বাসিনি, বাসতে পারবও না।

মায়ের সম্বন্ধে আমার অতি শৈশবকালের যে ছবিটি জাগে, তাতেও দেখি ঠাকুরমা মাকে অনেক কষ্ট দিতেন, মাকে শক্ত কথা বলতেন অকারণে। ছেলেমানুষ হ'লেও আমি তা বুঝতুম ; বুদ্ধি দিয়ে না বুঝলেও শিশুর 'ইন্সটিংক্ট' দিয়ে বুঝতুম ; তার একটা মস্ত কারণ, মার প্রতি ছিল আমার গভীর দরদ ও সহানুভূতি, একই রক্ত একই মাংস আমার গায়ে। আমার চেয়ে মায়ের দুঃখ বুঝবে কে?

একদিনের কথা আমার মনে হয় অস্পষ্ট একখানা ছবির মত।

আমাদের বাড়ির সদর দরজার সামনে কিছু দূরে আর একজন কাদের বাড়ি ছিল। একটা খুব বড় ঝাঁকড়া লিচু গাছ ছিল তাদের বাড়ির বাইরের উঠানে। বিকেলবেলাটায় আমি ও আরও অনেক ছেলে লিচুতলায় খেলছিলুম।

এমন সময়ে আমাদের বাড়ির সদর দরজায় দাঁড়িয়ে মা ডাক দিলেন, ভানু খাবার খাবি আয়।

খেলা ফেলে ছুটে গেলুম খেতে।

সদর দরজার ফ্রেমে মার ছবিটা আজও বেশ মনে হয়। দুদিকের কাঠে হাত দিয়ে

দাঁড়িয়েছেন, পরনে সাদা শাড়ি, মুখে হাসি। দরজার কবাট জোড়া সেকেলে ধরনের মোটা পেরেকের গুল-বসানো। পাশেই ছোট একটি চালাঘরে খড়-বিচালি থাকত।

মা খেতে দিলেন মুড়ি মেখে। বেতের ছোট্ট ধামিতে মুড়ি নিয়ে খেতে বসেছি, এমন সময় নদীর ঘাট থেকে ঠাকুরমা ফিরলেন জল নিয়ে, এবং আমার হাতে মুড়ির ধামি দেখেই মাকে বকুনি ও গালাগালি শুরু করলেন।

ঠিক কথাগুলো মনে নেই, কিন্তু তার মোট মর্ম এই যে, বাড়িতে ওবেলা পুরুত-ঠাকুরের নিমন্ত্রণ ছিল একাদশী ব'লে, তিনি রুটি খেয়েছিলেন, তাঁর পাতে রুটি তরকারি রয়েছে। সেই পাতের রুটি তরকারি আমার জন্যেই ঢাকা দিয়ে রেখে দিয়েছেন ঠাকুরমা। ঘাট থেকে আসতেও এমন কিছু দেরি হবে না, তখন এরই মধ্যে মুড়ির ঘড়া পেড়ে ছেলেকে সোহাগ ক'রে মুড়ি খেতে দেওয়ার মানে কি?

আমায় বললেন, রাখ মুড়ি, পাঁচ-ছখানা রুটি পড়ে রয়েছে পা'তে, ওগুলো উঠবে কি ক'রে?

পরের পাতের ঘাঁটা জিনিস খেতে আমার ঘেন্না করে। কিন্তু ঠাকুরমার ভয়ে কিছু বলতে পারলুম না। ঠাকুরমা ঢাকা খুলে পাতের খাবার আমায় খেতে দিলেন। খাবার সময়েই আমার কান্না এল মায়ের কথা ভেবে। মিথ্যে মিথ্যে ঠাকুরমা মাকে বকলেন কেন? মা হয়তো জানত না পাতের খাবার ঢাকা আছে। ভাবলুম, মায়ের প্রতি এমন একটা কিছু দেখাব, যাতে মায়ের মনের কষ্ট দূর হয়, কিন্তু চার বছর তখন আমার বয়স, না পারি কথা গুছিয়ে বলতে, না পারি কিছু বোঝাতে। হয়তো খুব শক্ত ক'রে মায়ের গলা জড়িয়ে রাত্রে শুয়েছিলুম, এ ছাড়া সহানুভূতি দেখানোর অন্য কোন উপায় আমার জানা ছিল না সে বয়সে।

মধ্যে কিছুদিনের কথা আমার তত মনে পড়ে না, আবার যখন মায়ের কথা মনে পড়ে, তখন মার খুব অসুখ। কি অসুখ জানতুম না তখন। নীচের একটা ঘরে মা থাকতেন, আমাকে মার কাছে যেতে সবাই বারণ ক'রে দিয়েছিল। কিন্তু আমাকে ধ'রে রাখা সোজা কথা নয়, ফাঁক পেলেই আমি মার ঘরে ঢুকতুম, খানিকক্ষণ ধ'রে মার সঙ্গে কি সব কথা কইতুম। তারপর সন্ধান পেয়ে ওরা এসে ধ'রে নিয়ে যেত। ঠাকুরমার কাছে বকুনি খেতে হ'ত ওঘরে যাওয়ার জন্যে।

এ রকম চলল দু দশ দিন নয়, অনেক—অনেকদিন, কতদিন তা আমার জানবার বয়স হয় নি। মোটের ওপর অনেক দিন। এখন মনে হয় সাত আট মাসের কম নয়।

একদিন শুনলুম মায়ের অসুখ নিয়ে বাবার সঙ্গে ঠাকুরমার ঝগড়া হচ্ছে।

ঠাকুরমা বলছেন, আর ওর পেছনে পয়সা খরচ ক'রে কি হবে? আমার ছেলেমেয়ে-গুলো কি পথে দাঁড়াবে? সংসারের টাকা দিয়ে দামী দামী ওষুধ এল কত এই ক-মাসে, তাতে কিছু যখন হ'ল না, তখন আর আমি বেশি টাকা খরচ করতে দেব না।

বাবা বলছেন, তা ব'লে একটা মানুষ বিনা চিকিৎসায় মরবে চোখের সামনে?

ঠাকুরমা বললেন, চিকিচ্ছে কম হয় নি কিছু। এখনও তো চিকিচ্ছের ত্রুটি নেই, কিন্তু আর আমি তোমায় টাকা দোব না। যে বাঁচবে না, তার পেছনে আর কেন টাকা খরচ?

সেদিন বুঝলুম, মার অসুখ খুব গুরুতর। মন খুব খারাপ হয়ে গেল, সমস্ত বাড়ির মধ্যে আমার মন টানে কেবল মায়ের ঘরে। যখন মন খারাপ হয়, মার কাছে গেলে সব দুঃখ চলে যায়। কিন্তু সেখানে যখন-তখন যাবার জো নেই। লুকিয়ে যেতে হবে, নইলে ঠাকুরমাকে পিসীমা ব'লে দেবেন। ছোটপিসীমা আমায় কোলে ক'রে পুকুরধারে নিয়ে যাবে চ'লে। ওদের সঙ্গে আমি তো জোরে পারি না!

পুকুরধারে বড় চাঁপাফুলের গাছ আছে। তার তলায় ছোটপিসীমা আমায় নিয়ে গিয়ে বলত, ওরকম যেও না যখন-তখন ও ঘরে ; যেতে নেই। এখানে ব'স।

মা ভিন্ন সংসারটা আমার কাছে ফাঁকা। মা ছাড়া আর কিছু বুঝি না, আর কাউকে ভাল লাগে না—কেবল দিদিমা ছাড়া। দিদিমা নিতান্ত গরীব, আমার মা তাঁর একমাত্র মেয়ে। মাঝে মাঝে তিনি যখন এসে আমাদের বাড়ি থাকতেন, রান্নাঘরের কাজকর্ম নিয়ে তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হ'ত সদাসর্বদা। তিনি যেন এসে হতেন আমাদের বাড়ির রাঁধুনী। মায়ের অসুখের সময় তিনি এসেছিলেন, এবং রোগীর সেবা করবার জন্য তিনি ছাড়া আর লোক ছিল না।

মায়ের খাওয়ার আলাদা একখানা থালা, গেলাস ও বাটি ছিল। দিদিমা থালা বাটি রান্নাঘরের দাওয়ায় পেতে দাঁড়িয়ে থাকতেন, মায়ের ভাতের জন্যে। মায়ের ঘরে থাকতেন ব'লেই বোধ হয় ইদানীং তাঁকেও আমাদের ঘরে-দোরে উঠতে দেওয়া হ'ত না।

মায়ের ঘরে দিদিমা যা কিছু করবার সব করতেন, এ জন্যে তাঁকে কেউ ছুঁতো না, তিনি ভাত খেতেন রান্নাঘরের দাওয়ায় ব'সে, নয়তো উঠানের পেয়ারা-তলায় ব'সে। তিনি থাকতেন এ বাড়িতে চোর হয়ে। মায়ের অসুখের কি ওষুধপত্র নিয়ে কথা বলতে যেতে ঠাকুরমার কাছে তাঁকে কতবার বকুনি খেতে হয়েছে।

ঠাকুরমা বলতেন, অত যদি দরদ মেয়ের ওপর, নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে চিকিচ্ছে-পত্তর করাও গে। জামাইকে তো দিনরাত জপাচ্ছ, হুগলী থেকে ডাক্তার আনতে, পয়সা দেবে কে? তোমার কি? একটা মোটে মেয়ে, সস্তায় ঝেড়ে ফেলে দিয়েছ। আমার এখনও আইবুড়ো মেয়ে ঘরে, তোমার মেয়ের জন্যে তাকে তো আমি জলে ভাসিয়ে দিতে পারি না? যে ক'টা টাকা আছে, তা এখন তুলে রেখে দিতে হবে ওর ঘরবর দেখে দিতে ; এতে তোমার মেয়ের ভাগ্যে বাপু যা থাকে।

দিদিমাকে কতদিন পুকুরঘাটের তলায় ব'সে একা হাপুসনয়নে কাঁদতে দেখেছি। এ রকম কতদিন যে কাটল! কতদিন যে মায়ের ঘরে যেতে পারলুম না! মা দিন দিন যেন বিছানার সঙ্গে মিশে যেতে লাগলেন। মায়ের ঘরের দোর সর্বদাই বন্ধ। আমি জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতুম, মা একা ঘরের মধ্যে বিছানায় অঘোর হয়ে অচৈতন্য হয়ে শুয়ে। দিদিমা হয়তো মায়ের ছাড়া কাপড় কাচতে গিয়েছেন।

আমি আস্তে আস্তে ডাকতুম, ও মা, মা! তারপর দোর ঠেলে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করতুম। অমনি ছোটপিসীমা কোথা থেকে এসে আমায় ছোঁ মেরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেন।

—বাবা কি দস্যি ছেলে! এক দণ্ড যদি চোখের আড় করবার জো আছে! ঘুরছেন সর্বদা মার কাছে যাবার জন্যে। বারণ ক'রে দিইছি না তোমায়?

ঠাকুরমা চেঁচিয়ে বলে উঠতেন, দে আচ্ছা ক'রে দু ঘা কষিয়ে। পরের হোলা খায় বন পানে ধায় ; যতই কর, ছেলের সর্বদাই মা, মা, আর মা!

বড়পিসীমা মাকে সত্যিকারের ভালবাসতেন। তাঁর বিয়ে হয়েছিল এই গাঁয়েই। পিসেমশায়ের অবস্থা বোধ হয় ভাল ছিল না, বড়পিসীমাকে ভাল কাপড়-চোপড় পরতে দেখি নি কোনও দিন। ঠাকুরমার সঙ্গেও বোধ হয় তাঁর তেমন ভাব ছিল না। তিনি কিন্তু মাঝে মাঝে এসে মায়ের কাছে ব'সে থাকতেন, দিদিমা বাদে তিনি আর বাবা ছাড়া মায়ের ঘরে আর কেউ ঢুকত না।

বাবার কোন কথা বলবার জো ছিল না। মায়ের অসুখের সম্বন্ধে কিছু বললেই ঠাকুরমার সঙ্গে ঝগড়া বেধে যেত। একদিন সকালে উঠেই শুনলাম ঠাকুরমাতে আর বাবাতে তুমুল তর্ক চলছে।

ঠাকুরমা বলছেন, চান্দ্রায়ণ প্রাচিত্তির না করলে আমার বাড়িতে অকল্যেণ হবে।

তোমার বউ তো একা নয়, আমার আরও লোকজন নিয়ে ঘরকন্না করতে হয়। পুরুত-ঠাকুর ব'লে গিয়েছেন, প্রায়শ্চিত্তির করাতে হবে এই একাদশীর দিন।

বাবা বলছেন, বল কি মা? ও কালও বলেছে, হ্যাঁগো আমি বাঁচব তো? আমি বলেছি, কেন বাঁচবে না? এবার ডাক্তার বলেছে সেরে উঠবে। চান্দ্রায়ণের নাম শুনলেই ও ভয়ে খুন হয়ে যাবে। যার এখনও এত বাঁচবার ইচ্ছে, তাকে কি ক'রে প্রায়শ্চিত্তির করানো যায় মা? ও তা হ'লে ভয়ে ম'রে যাবে।

ঠাকুরমা বললেন, আর এমনিই যেন বাঁচবে! দুদিন আগে আর দুদিন পাছে। তোর লজ্জা করে না বোয়ের কথা বলতে আমার সামনে? মুখের লাগাম আলগা ক'রে দিয়েছ যে একেবারে! এক কড়ার মুরোদ নেই, আবার কথাবর্তা শোন গুণধর ছেলের? সোজা কথা ব'লে দিচ্ছি, প্রায়শ্চিত্তির না হ'লে ওই রোগের মড়া কেউ বার করতে আসবে ঘর থেকে?

বাবা বললেন, চুপ চুপ, শুনতে পাবে ও ঘর থেকে। আচ্ছা মা, তোমার কি একটু দয়াও হয় না! ও মরণের নামে ভয়ে কালি হয়ে যাচ্ছে, দুবেলা একে ওকে বলছে, আমি বাঁচব তো? আর তুমি কি ব'লে ওর কানের কাছে—

এর উত্তরে ঠাকুরমা চীৎকার ক'রে বিপরীত কান্ড বাধিয়ে তুললেন।

যাই হোক, বাবার কোনও কথা বোধ হয় খাটল না, কারণ একদিন মায়ের ঘরে কি সব পুজো-আচ্চার যোগাড় হ'ল, পুরুতঠাকুর এলেন ওপাড়া থেকে। তিনি কালীর বাবা, আমি তাঁকে চিনি, কালী আমাদের সঙ্গে খিড়কী বাগানে কত খেলা করেছে, ভারি ছুটতে পারে, তার সঙ্গে ছুটে কেউ পারি না আমরা। সে এখন এখানে নেই, তার মামার বাড়িতে গিয়েছে।

বড়পিসীমা বলছিলেন হরি গয়লানীর কাছে, সে আমাদের দুধ যোগান দেয়।

—আহা, বলছি পুরুত আসছেন, তোমার একটা স্বস্ত্যেন করতে হবে কিনা; বউয়ের মুখ ভয়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছে! বলছে, কেন ঠাকুরঝি, তবে কি আমি বাঁচব না? তখন আবার বোঝাই, বলি, তা কেন, স্বস্ত্যেন করলে তোমার অসুখ সারবে, ভয় কি? আহা, ছেলেমানুষ, এই সবে বাইশ বছরে পা দিয়েছে; ওর এখনও কত সাধ জীবনে, বাঁচবার কি ইচ্ছে পোড়াকপালীর!

দিন দশ-বারো পরের কথা।

পাশেই এপাড়ায় সন্তুদের বাড়ি। সন্তুর দাদা বিয়ে ক'রে নতুন বউ এনেছে। তাদের বাড়িতে সবাই গিয়েছে বউ দেখতে। খুব বাজি-বাজনা ক'রে বিয়ে করতে গিয়েছিল সন্তুর দাদা। এক-একটা হাউইবাজি যেন গিয়ে একেবারে আকাশে ঠেকে।

বাড়ির সবাই গিয়েছে। দিদিমা যান নি, রাত জাগেন ব'লে তিনি ও-বারান্দায় আঁচল পেতে ঘুমোচ্ছেন।

আমি চুপিচুপি মায়ের ঘরে ঢুকে মায়ের কাছে গিয়ে বসলুম। মায়ের কাছে আসবার লোভেই বউ দেখতে যাই নি, বাগানে গিয়ে লুকিয়ে ছিলুম; নইলে ছোটপিসীমা অনেক ডাকাডাকি করেছিল।

মা বেশি কথা বলতে পারেন না। আমি চুপ ক'রে মায়ের বিছানায় শিয়রের পাশ-টিতে ব'সে আছি। বেলা বেশি নেই। পুকুরের চাঁপা গাছে রোদ রাঙা হয়ে এসেছে।

খানিকটা পরে মা বললেন, খোকা, আমি যদি মরে যাই, তুই কি করবি?

আমি কিছু বললুম না, চুপ ক'রে রইলুম। আমার মনে একটা অদ্ভুত ধরনের বিষাদ।

আর কখনও এ ধরনের ভাব আমার মনে হয় নি। ভয়ানক মন-কেমন করছে কার জন্যে; কার জন্যে যে বুঝতেও পারি না।

মা যেন আপন মনেই বলছিলেন, খোকা, তোকে যে কার কাছে রেখে যাব সেই হয়েছে আমার ভাবনা। কেই বা তোকে বুঝবে!

হঠাৎ মা তাঁর হাতের আংটিটা খুলে আমায় দিয়ে বললেন, যা, এটা লুকিয়ে রেখে দিগে যা, ওরা তোকে কিচ্ছু দেবে না! এটা দিয়ে কিছু মিষ্টিটিষ্টি কিনে খাস, তুই ভালবাসিস পক্কান্ন মেঠাই, তাই খাস। কাউকে দেখাস নি।

আমার বন্ধু চুপ করল। আমার চোখে জল এল। বহুকাল আগেকার এক রোগ-জীর্ণ তরুণী মায়ের ছবি মনে এল—অসহায় বন্ধুহীন সংসারে যার একমাত্র অবলম্বন ছিল ছ' বছরের ছেলেটি আর এক দুর্ভাগ্য স্বামী।

আমার বন্ধু এখন খুব বড়লোক, অনেকগুলো কয়লার খনির মালিক। তাঁর সার্কুলার রোডের বাড়িতে ব'সে চা-পানের পরে সন্ধ্যাবেলা আমার কথা বলছিলুম।

তারপরে তিনি ওপরের গল্পটা বললেন।

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে আমি বললুম, তারপর কি হ'ল?

রাত্রে কি হয়েছিল আর জানি না। ওরা এসে পড়বার পরেই আমি ঘর থেকে পালিয়ে গিয়েছিলুম। তারপর ঘুমিয়ে পড়ি। ভোরে উঠে মাকে আর দেখি নি! আমার ছেলে-বেলাকার মা রাত্রের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এই রকম সন্ধ্যায় আবার সেই কতকাল আগের কথা—সেই সন্ধ্যাটি আমার মনে আসে।

খোসগল্প

জীবনে এমন সব অদ্ভুত ঘটনা অনেক সময় ঘটে, যা লিখিতে বসিলে যেন গল্পের মত শোনায়।

আমার জীবনে এমনি ধরনের ঘটনা একটি ঘটিয়াছিল, ঘটিয়াছিলই বা কি করিয়া বলি—ঘটিয়াছে বলাই সঙ্গত, কারণ তাহার জের এখনও চলিতেছে। যদিও বাহিরের দিক হইতে তাহার জের কিছুই নাই, যা কিছু ঘটিতেছে সবই আমার ও আর একজনের মনে।

প্রেমের কাহিনী এ নয়, কিসের কাহিনী বলা শক্ত। এত সূক্ষ্ম ও বস্তুবিহীনতার ঘটনা, যেন মাকড়সার জালে বোনা কাপড়—জোর করা চলে না তার উপর—একটু বেশী বা একটু কম কথা বলিলেই ঘটনার সূক্ষ্ম রহস্যটুকু একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তাই খুব সতর্কতার সহিত ব্যাপারটি বলিতে চেষ্টা করিতেছি।

আর ভূমিকা করিব না, এখন গল্পটা বলি।

প্রথমেই আমার একটু পরিচয় দিয়া লই। যাঁহারা এ গল্প পড়িবেন, তাঁহাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটা লাইনও যেন বাদ দিবেন না—মনে রাখিবেন এর প্রতি লাইনের প্রয়োজনীয়তা আছে, গল্পটিকে সম্যক বুঝিতে হইলে।

যে-সময়ের কথা বলিতেছি তখন আমি বিবাহ করি নাই, করিবার ইচ্ছাও ছিল না। কেন কি বৃত্তান্ত সে-সব গল্পের পক্ষে অবান্তর। সুতরাং সে-কথার দরকার নাই।

বিবাহ করি নাই বলিয়া ভবঘুরেও ছিলাম না।

ছোট একটি ব্যবসা ছিল। তাহা হইতে দু-পয়সা রোজগারও হইত। এখন সে-ব্যবসা আরও বাড়িয়াছে। কাজের খাতিরে মাঝে মাঝে দেশ-বিদেশে ঘুরিতে হইত, এখনও হয়। কলিকাতায় বাড়ি এখনও করি নাই, তবে হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবান্ধবগণ যেমন ধরিয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে বাড়ি না করিলে আর চলে না—চক্ষুলজ্জার খাতিরেও অন্ততঃ

করিতে হইবে। বালিগঞ্জ অঞ্চলে সুবিধামত জমি দেখিতেছি। এই হইতেই আমার মোটামুটি পরিচয় আপনারা পাইলেন।

বর্ধমান জেলায় বনপাশ স্টেশনে নামিয়া উত্তর দিকে বাঁধানো সড়ক ধরিয়া সাত-আট মাইল গরুর গাড়ি করিয়া গেলে দিয়াখালি বলিয়া একটি গ্রাম পড়ে। এখানে আমার এক সহপাঠীর বাড়ি।

এই অঞ্চলে ব্যবসা উপলক্ষে মাঝে মাঝে যাইতাম। অর্থাৎ আখের গুড় কিনিতে বনপাশ হইতে ছ-মাইল দূরবর্তী জগন্নাথপুরের হাটে আমাকে মাঘ ফাল্গুন মাসে প্রতি বৎসর যাইতে হইত।

যখনই গিয়াছি দিয়াখালি গ্রামে আমার সেই সহপাঠীর বাড়িতে গিয়া একবার করিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিতাম। কলিকাতায় কলেজে একসঙ্গে বি-এ পড়িয়াছিলাম, আমার সে বন্ধুটি বি-এ পাস করিতে পারে নাই, গ্রামেরই মাইনর স্কুলে অনেকদিন হইতেই সে হেডমাস্টারি করিতেছে।

আমার বন্ধুর স্ত্রী পল্লীগ্রামের বধূ যদিও, আমার সামনে বাহির হইয়া থাকেন তো বটেই, আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার করেন, তাঁহাদের পরিবারেরই একজনের মত।

মেয়েমানুষের যেমন স্বভাব, যখনই যাই, আমার বন্ধুপত্নী আমায় বাঁধা নিয়মে অনুযোগ করিতেন, আমি কেন বিবাহ করিতেছি না। এ-নিয়মের ব্যতিক্রম যতবার সেখানে গিয়াছি কখনও ঘটিতে দেখি নাই।

—শুনুন, এবার একটি বড়সড় দেখে, এই ফাল্গুন মাসের মধ্যেই বিয়ে ক'রে ফেলুন। না—শুনুন আমার কথা—এর পরে কে দেখবে শুনবে, সেটাও তো ভাবতে হবে? বিয়ে ক'রে ফেলুন।

এ ধরনের কথা শুধু আমার বন্ধুপত্নীর মুখ হইতে যদি শুনিতাম, হয়তো আমার মনে একটা কিছু রেখাপাত করিলেও করিতে পারিত। কিন্তু আমি তো এক দিয়াখালি গ্রামেই ঘুরি না—সারা বাংলা দেশের কত জেলায়, কত গ্রামে, কত শহরে কার্যোপলক্ষে ঘুরিতে হয় এবং প্রায় অনেক স্থানেই হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবান্ধবের মুখ হইতে ঐ একই কথা শুনিয়া আসিতেছিলাম।

আমার মাসীমা, পিসীমা এবং অন্যান্য আত্মীয়া-কুটুম্বিনী সমস্ত এ-বিষয়ে যথেষ্ট অধ্যবসায় ধৈর্যের পরিচয় দিয়া আসিতেছিলেন—ঘরে বাহিরে এভাবে অনুরুদ্ধ হওয়ায় জিনিসটা আমার যথেষ্ট গা-সহা-গোছের হইয়া পড়ার দরুন কোনো প্রস্তাবই তেমন গায়েও মাখিতাম না বা নূতন কিছু বলিয়া ভাবিতাম না।

একবার দিয়াখালি গিয়াছি মাঘ মাসে, আমার বন্ধুপত্নী সেবার যে-কথা বলিলেন, তাহা শুনিয়া রীতিমত কৌতুক অনুভব করিলাম।

বলিলেন—আমি কিন্তু এক জায়গায় আপনার বিয়ে ঠিক করে রেখেছি।

একটু কৌতুক করিয়াই বলিলাম—কি রকম?

—আজ প্রায় ছ-সাত মাস আগে আমাদের এখানে শিবতলায় বারোয়ারি শুনতে গিয়ে একটা মেয়ের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়। মেয়েটি এ গাঁয়ের নয়—তার দিদিমার সঙ্গে গরুর গাড়ি ক'রে পাশের গাঁ বারোদীঘি থেকে যাত্রা শুনতে এসেছিল। বেশ মেয়েটি, চমৎকার গড়নপিটন, লম্বা, একহারা চেহারা। কেবল রংটি ফর্সা নয়, কালো। খুব কালো না হলেও কালোই মোটের উপর। নামটা ভুলে গেচি—খুব সম্ভব মণিমালা।

উৎসাহ দিবার সুরে বলিলাম—বেশ, তারপর?

—আমি তাকে বললুম আপনার কথা। আপনি কি করেন, কোথায় বাড়ি ; সব বলবার

পরে তাকে বললুম এ'র সঙ্গে কিন্তু তোমার ভাই বিয়ের ঠিক করেছি।

এমন কথা কখনও শুনি নাই। অবাক হইয়া বলিলাম—কি ক'রে বললেন? জানা নেই, শোনা নেই, বললেন অমনি বিয়ের কথা?

বন্ধুপত্নী পাড়াগাঁয়ের সহজ সারল্যের মধ্যে মানুষ হওয়ার দরুনই বোধ হয় এই অদ্ভুত আচরণের অদ্ভুতত্ব একেবারেই ধরিতে পারিলেন না। বলিলেন—কেন বলব না? আমার চেয়ে বয়সে যদিও ছোট, তবুও তার সঙ্গে সমবয়সীর মত ভাব হয়ে গেছল। বললুম, ওঁর একজন বন্ধু আছেন, তিনি মাঝে মাঝে আমাদের এখানে আসেন—আমি তাঁর সঙ্গে তোমার বিয়ের চেষ্টা করছি। এখন তুমি যদি মত দাও ভাই, তবে আমি ওঁর কাছে কথা পাড়ি।

—মেয়েটি কি বললে? মত দিলে?

—বললে, তিনি এতদিন বিয়ে করেন নি কেন? আমি বললুম, খেয়ালী লোক তাই। এবার বিয়ে করবার ইচ্ছে হয়েছে, তা ছাড়া তোমার মত মেয়ে পেলে নিশ্চয়ই বিয়ে করবেন। তার পরে মেয়েটি আপনার সম্বন্ধে আরও দু-একটি কথা জিজ্ঞেস করলে। আপনার বয়েস কত, মুখুজ্যে না চাটুজ্যে—কি পাস। কি পাস, এই কথাটা দুবার করে জিজ্ঞেস করলে—যখন বললুম বি-এ পাস—সে তা তো আবার বোঝে না। বললুম—তিনটে পাস। তখন তার মুখ দেখে মনে হ'ল বেশ খুশীই হয়েছে। সুতরাং ও-পক্ষের মত আছে বোঝা গিয়েছে। এখন আপনি মত ক'রে ফেলুন তো ঠাকুরপো। আমি সব ঠিক করি। বাপের নাম-ঠিকানা আমি জেনে নিইছি। ওঁকে দিয়ে চিঠি লেখাই—কেমন তো?

কোনো মতে সেবারের মত কথাটা চাপা দিয়া তো কলিকাতা ফিরিলাম। তাহার পর বছর-খানেক আমার সেখানে আর যাইবার দরকার হয় নাই। পুনরায় সেখানে গেলাম পরের বৎসর মাঘ মাসে।

সন্ধ্যায় বসিয়া গল্প করিতেছি, বন্ধুপত্নী বলিলেন কথায় কথায়—ঠাকুরপো, মনে আছে সেই মণিমালার কথা? এবারও যে শিবতলায় বারোয়ারির দিন তার সঙ্গে দেখা হ'ল।

বলিলাম—বেশ কথা।

তিনি বলিলেন—তার বিয়ে এখনও হয় নি। গরীব ঘরের মেয়ে, বাপ থেকেও নেই, কে বিয়ে দিচ্ছে? ঐ দিদিমা ভরসা। ক-জায়গায় সম্বন্ধ হয়েছিল, টাকার বহর শুনে এরা পিছিয়েছে। তার উপর মেয়েটি অন্য দিকে যদিও খুব সুশ্রী, কিন্তু রং তো তেমন ফর্সা নয়। আমি কিন্তু আবার তুলেছিলাম আপনার সঙ্গে বিয়ের কথা। আহা করুন না ঠাকুরপো, গরীবের মেয়ের দায় উদ্ধার? এবার সে নিজেই আপনার কথা জিজ্ঞেস করলে।

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—কি রকম?

বন্ধুপত্নী বলিলেন—আমার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গিয়েছে কিনা। আমরা যেখানে বসি সেখানটাতে ব'সে কথা বললে কারও কানে যাবার ভয় নেই।

পরে একটু থামিয়া হাসিমুখে একটু সুর নামাইয়া বলিলেন—এ-কথা সে-কথার পরে আপনার কথা তুললাম। তা বললে, বি-এ পাস তো চাকরি না ক'রে ব্যবসা করেন কেন? আমি বললাম—স্বাধীন ব্যবসা ভালবাসেন, টাকাও বেশ রোজগার করেন। আর একটা কথা বলেছে, শুনলে আপনি হাসবেন।

—কি কথা?

—বললে, আপনি দেখতে কেমন; কালো না ফর্সা।

কৌতুকের সুরে বলিলাম—আপনি কি বললেন?

—বললাম, না কালো, না ফর্সা, মাঝামাঝি।

—এঃ, আপনি আমার বিয়ের চান্সটা এভাবে মাটি ক'রে দিলেন?

বন্ধুপত্নী কৃত্রিম ভর্ৎসনার সুরে বলিলেন—এর মধ্যে ঠাট্টার কথা কি আছে? না, ও হবে না। এই ফাল্গুন মাসের মধ্যেই বিয়ে করুন—সব ঠিক ক'রে ফেলি।

এ ধরনের কথা খোসগল্প হিসাবেই শুনিয়া থাকি, এতই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি এ ধরনের কথায়। কাজেই যখন কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম তখন বেমালুম সকল কথাই মনের মধ্যে কোথায় তলাইয়া গেল কাজের হুড়াহুড়িতে।

বছর পার হইতেই জীবন অন্য পথে চলিল।

পূর্বের ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া অন্য ব্যবসা খুলিলাম কলিকাতায়। সুতরাং জগন্নাথ-পুরের হাটে গুড় কিনিতে আর যাই না। ইতিমধ্যে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের অনুরোধে বিবাহও করিলাম। মেয়েটি পাইয়াছি ভালই, ভবানীপুর অঞ্চলে বাপেরবাড়ি, লেখাপড়া জানে, সুন্দরীও বটে। কিন্তু সবচেয়ে বড় গুণ—চমৎকার গান গায়।

বিবাহের পরও দেড় বছর কাটিয়া গিয়াছে। গত মাঘ মাসের কথা, এক দিন ভবানী-পুরে শ্বশুরবাড়ি হইতে ফিরিতেছি। বৈকাল গড়াইয়া গিয়াছে, সন্ধ্যা হয়-হয়। পশ্চিম আকাশ লাল হইয়া উঠিয়াছে, ফোর্টের বেতারের মাস্তুলে লাল আলো জ্বলিয়াছে। বৈদ্যুতিক সংবাদপত্রের উজ্জ্বল অক্ষরে জানাইয়া দিল যে আবিসিনিয়ার সম্রাট লীগ অব নেশন্সে পুনরায় দরখাস্ত পেশ করিয়াছেন এবং মোহনবাগান হকি না ক্রিকেট খেলিতে বোম্বে যাইতেছে।

চৌরঙ্গীর মোড়ে বাস্ হইতে নামিতেই নজর পড়িল আমার সেই দিয়াখালির বন্ধুটি সস্ত্রীক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, সম্ভবত বাসের প্রত্যাশায়। খুশীর সহিত আগাইয়া গেলাম।

—আরে, তুমি কলকাতায় যে? কবে এলে? এই যে নমস্কার, ভাল আছেন? অনেক দিন দেখাসাক্ষাৎ হয় নি—চিনতে পারেন?

বন্ধুপত্নী বলিলেন—চিনতে কেন পারব না? আপনি ডুমুরের ফুল হয়ে গেলেন তার পর থেকে। আপনার সঙ্গে আর কথা বলব না।

বন্ধুপত্নীকে মিষ্ট কথায় ঠান্ডা করিলাম। বন্ধুটির মুখে শুনিলাম তাহার ছোট শালী চিত্তরঞ্জন-সেবাসদনে চিকিৎসার জন্য আসিয়াছে আজ দিন পনর হইল—মধ্যে অবস্থা খারাপ হওয়াতে পত্র পাইয়া বন্ধুটি সস্ত্রীক শালীকে দেখিতে আসিয়া শ্যামবাজারে এক আত্মীয়বাড়ি উঠিয়াছে। এখন চিত্তরঞ্জন-সেবাসদন হইতেই ফিরিতেছে। মেট্রোয় বায়োস্কোপ দেখিবে বলিয়া এখানে নামিয়া পড়িয়াছে।

বন্ধু বলিল—চল না হে, তুমিও চল। এ তো কখনো ওসব দেখতে পায় না, তাই ভাবলাম ফিরবার পথে মেট্রোতে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে যাব। আর এদিকে শালীটি তো সেরে উঠেছে, কাজেই মনও ভাল। এস আমাদের সঙ্গে।

অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া গেলাম মেট্রোতে। কয় বছর যাই নাই, বন্ধু ও বন্ধু-পত্নী সেজন্য যথেষ্ট অনুযোগ করিলেন। কথায় কথায় বন্ধুপত্নী বলিলেন—বিয়ে করেছেন আপনি?

কথার কি উত্তর দিব ভাবিতে না-ভাবিতেই তিনি বলিলেন—করেন নি তা বেশ বুঝতে পারছি। উনিও বলেন, সে বিয়ে করলে কি আর আমাদের একখানা নেমন্তন্ন-পত্রও দিত না?...করেন নি—না?

এ-কথার পরে বিবাহ করিয়াছি কথাটা হঠাৎ বলা চলে না। সুতরাং তখনকার মত অর্থবিহীন হাসি হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। তবে হাসিটি যত দূর সম্ভব স্বার্থ-

সূচক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম মনে আছে।

ইণ্টারভ্যাল হইল। বন্ধুটি পান কিনিবার জন্য বাহিরে গেল।

আমার বিবাহের কথা বলিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলাম, ভাবিলাম এইবার মোলায়েম করিয়া বলিয়া ফেলি বন্ধুপত্নীর নিকট।

কিন্তু বন্ধুপত্নীও যে আর একটি কথা বলিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন, তাহা বুঝি নাই। বলিলেন—জানেন একটা কথা বলি। সেই যে আমাদের দেশের মেয়েটির কথা বলে-ছিলুম মনে আছে? সেই মণিমালা?

—হ্যাঁ, খুব মনে আছে।

মনে মনে একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম।

—এই গত পৌষ মাসে শিবতলায় আমার তার সঙ্গে দেখা! দু-বছর দেখা হয় নি, কথা আর ফুরুতে চায় না। তার বিয়ে হয় নি এখনও। কেন হয় নি সে কথা আমি জিজ্ঞেস করি নি, তবে ভাবে বোঝা তো যাচ্ছে ও-রকম গরীব-ঘরের মেয়ের কেন বিয়ে হ'তে দেরি হয়।

—আমি কথা বলিবার জন্যই বলিলাম—হ্যাঁ, তা বইকি।

তর পর শুনুন কথায় কথায় কলকাতার কথা উঠল। সে কখনও কলকাতা দেখে নি। আমি হেসে বললুম—আচ্ছা, তোমায় শীগ্‌গির কলকাতা দেখাচ্ছি। এ-কথায় মেয়েটি হাসলে। ভারি বুদ্ধিমতী মেয়ে, ও বুঝতে পেরেছে আমি কি বলছি। একটু পরে নিজেই বললে—আপনাদের বাড়িতে সেই যে ভদ্রলোক আসতেন, তিনি আর আসেন না? আমি বললাম—অনেক দিন আসেন নি, তারপর হেসে বললাম—তবে একটা কথা জানি, তিনি এখনও বিয়ে করেন নি, তাহলে একখানা অন্তত নেমন্তন্নের চিঠি তো আমরা পেতাম নিশ্চয়ই। মেয়েটি হেসে চুপ করে রইল। আমার বেশ মনে হয় সে এখনও মনে মনে ভাবে আপনি তাকে বিয়ে করবেন! তার উপর আবার শুনুন, হয়তো আমার উচিত হয় নি এত কথা বলা—আসবার সময় আবার তাকে বললাম—তাহলে কিন্তু এবার কলকাতা দেখার ব্যবস্থা করছি। মেয়েটির লজ্জা হ'ল কিন্তু মুখ দেখে মনে হ'ল ভারি খুশী হয়ে উঠেছে মনে মনে। মুখে কেবল একটা কথা বলেছিল উঠে আসবার সময়। যেন তাচ্ছিল্যের সুরে হঠাৎ বললে—আমার আর অমত কি, তবে তুমি ভাই দিদিমাকে একবার ব'লো। সত্যই সে আপনার আশায় আশায় রয়েছে, এ আমি জোর ক'রে বলতে পারি। যা বলেছে, মেয়েমানুষ তার চেয়ে আর কি বেশী বলবে? এ দোষ আমারই, সে-জন্যে ওঁর সামনে বললাম না। উনি শুনলে রাগ করবেন। আমার অনুরোধ, ঠাকুরপো, দয়া করে গরীব-ঘরের মেয়েটাকে নিয়ে তাদের দায় উদ্ধার করুন। আপনি তাকে নিয়ে জীবনে সুখী হবেন, একথা বলতে পারি। অমন সুশ্রী, সরলা, শান্ত মেয়ে পাবেন না—হ'লই বা গরীব?

আমার বন্ধু পান কিনিয়া ফিরিয়া আসাতে কথাটা চাপা পড়িল।

অতঃপর আর আমার বিবাহের কথা ইহাদের নিকট বলিতে পারিলাম না। হয়তো একটু গর্ব করিয়াই বলিতাম আমার স্ত্রী সত্যই সুন্দরী, এমন কি ইহাও ভাবিতেছিলাম এক দিন উভয়কে বাসায় নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া স্ত্রীর গান শুনাইয়া দিব—কিন্তু বন্ধুপত্নীর সহিত কথাবার্তার পরে আমার মুখ যেন কে চাপিয়া ধরিল।

কেন যে এমন সব ধরনের ব্যাপার ঘটে!

কোথায় কাহাকে কে খোসগল্পের ছলে কি বলিল, তাহাই শুনিয়া একটি সরলা পল্লী-বালিকা মনে কি জানি কিসব স্বপ্নজাল বুনিতেছে এখনও, অথচ যাহাকে ঘিরিয়া এ স্বপ্ন রচনা—এ বিষয়ে সে কিছুই জানে না, সে দিব্য আরামে চাল দিয়া কলিকাতায়

বেড়াইতেছে, বিয়ে-থাওয়া করিয়া নববধূকে লইয়া মশগুল হইয়া মহাসুখে দিন কাটাইতেছে।

সেই হইতে এই কয়মাস সুদূর রাঢ় অঞ্চলের একটি অদেখা পাড়াগাঁয়ের মেয়ের কথা আমি ক্রমাগত ভুলিবার চেষ্টা করিতেছি!

একটি দিনের কথা

একটিমাত্র দিনের কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার বটে, কিন্তু তার পেছনে সামান্য একটু ইতিহাস আছে। সেটা না বললে ব্যাপারটা তার সমস্ত নিষ্ঠুরতা ও নীচতা নিয়ে প্রকাশ হবে না। তাই একটু আগে থেকেই বলি।

একবার কলকাতা থেকে অনেকদূরে একটা পাড়াগাঁয়ে আমার এক বন্ধুর ভ্রাতার জন্যে মেয়ে দেখতে যাই। যাঁদের জন্যে মেয়ে দেখতে যাওয়া, তাঁরা এসে আমায় বড় ধরা-ধরি করলেন যে, আমায় তাঁদের সঙ্গে যেতে হবে, কারণ ঐ গ্রামে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি থাকায় সেখানকার অনেকেই আমার পরিচিত এবং আমি নিজে বারকতক সে গাঁয়ে গিয়েছি, এ খবর তাঁরা জানতেন।

অগত্যা তাঁদের সঙ্গে যেতে হোল। জায়গাটা নিতান্তই পাড়াগাঁ। আমি সেখানে এর আগে দু-একবার গেলেও আমার সেই আত্মীয়ের পাড়াটি ছাড়া অন্য অন্য পাড়ার লোক-দের ভাল চিনিনে, বিশেষ কারো নামও জানিনে। যাঁদের বাড়িতে মেয়ে দেখার কথা, তাঁরা এই অপরিচিত দলের লোক। প্রকৃতপক্ষে এই উপলক্ষেই তাঁদের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হোল এবং তাঁদের বাড়িতে এই আমি প্রথম গেলুম। মেয়ের বাপের নাম গোপাল চক্রবর্তী, বয়স ষাটের কাছাকাছি, আগে কি একটা ভাল চাকুরি করতেন, এখন চোখের অসুখ হওয়াতে বাড়ি ছেড়ে কোথাও নড়তে পারেন না। ছেলেরা সব বড় বড়, মেয়েটিই ছোট। ভদ্রলোকের অবস্থা সচরাচর পাড়াগাঁয়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহস্থের যেমনি হয়ে থাকে তেমনি। বাইরে একখানা খড়ের চণ্ডীমণ্ডপ, একটা পুরানো কোঠাবাড়ি, উঠানের এক ধারে বাঁশের বেড়ার মধ্যে গোটাকতক জবাফুলের গাছ, নারিকেলের চারা, কুমড়োর মাচা ইত্যাদি। এক পাশে গোয়াল ও কাঠ-কুটো রাখবার আর একখানা ছোট চালা।

গোপাল চক্রবর্তী আমাদের যত্ন আদর করলেন খুব। চা খাওয়ালেন জলযোগ করালেন। মেয়ে দেখানোও হোল—মামুলী প্রশ্নাদি জিগ্যেস করা ও মেয়ের তৈরী মামুলী পশমের আসন, হাঁস, তুলোর বেড়াল ও মাছের আঁশের কাজ ইত্যাদি দেখা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা উঠবার উদ্যোগ করলাম।

কথায় কথায় আমাদের মধ্যে একজন জিগ্যেস করলেন—এই কি আপনার বড় মেয়ে?

গোপাল চক্রবর্তী বললেন—না, এটি আমার দ্বিতীয় কন্যা (বিবাহের ব্যাপারে পাড়া-গাঁয়ে কথাবার্তার সময় সাধুভাষা ব্যবহার করার পদ্ধতি প্রচলিত আছে।)

আমি বললুম—বড় মেয়েটির কোথায় বিয়ে দিয়েছেন, চক্কত্তি মশায়?

—না, তার এখনও বিবাহ হয় নি।

মনে একটা খটকাও লাগলো। এই মেয়েটির বয়েস পনেরোর কম নয়। বড় মেয়েটির বয়েস সুতরাং কম হলেও সতেরো! অতবড় আইবুড়ো দিদি ঘরে থাকতে তার ছোট বোনের বিয়ের আয়োজন উদ্যোগ—তবে কি বড় মেয়েটি কানা খোঁড়া বা ঐ রকম কিছু?

গোপাল চক্কত্তি তখনই আমাদের সন্দেহ দূর করলেন। তাঁর বড় মেয়েটির এক জায়গায় সম্বন্ধ হয়েছে, পাত্রের বাড়ি আছে কলকাতায় হাতীবাগানে, পাত্র মার্চেণ্ট আপিসে চাকুরি করে। চক্কত্তি মশায়ের ইচ্ছে, শ্রাবণ মাসের মধ্যে দুই মেয়েরই বিয়ে দিয়ে তিনি

আপাততঃ নিশ্চিন্ত হন।

আমরা বিদায় নিলাম।

ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুদূর এসে বাঁ ধারে একটা পুকুর।

গ্রামের একটি ভদ্রলোক আমাদের এগিয়ে দিতে আসছিলেন, তিনি হঠাৎ পুকুরের বাঁধা ঘাটের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বল্লেন—ঐ যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে, ঐ হোল গোপাল কাকার বড় মেয়ে রাণী— যার কথা হচ্ছিল—

কি ক্ষণে না জানি মেয়েটিকে যে দেখলুম! কত ছবি চোখের সামনে দিন-রাত আসে যায়, ঢেউয়ের মাথায় ফেনার ফুলের মত তখন বেশ দেখায়, তারপর কোথায় যায় মিলিয়ে তলিয়ে, কোনো চিহ্নও রেখে যায় না। লক্ষ অখ্যাত ছবির মধ্যে একটি কি করে যে মনের মধ্যে সেদিন স্থায়ী দাগ রেখে গেল! চেয়ে দেখি একটি ষোল-সতেরো বছরের মেয়ে পুকুর ঘাটে জলের ধারে দাঁড়িয়ে আছে, বোধ হয় নাইতে এসে তখনও জলে নামে নি, মোটামুটি সুশ্রী মন্দ নয়, গায়ের রংটিও ফর্সা, স্বাস্থ্যবতী বটে। বাঁ হাতে একটা সাবানের পাত্র, একখানা রাঙা গামছা দুটি অঙ্গুল দিয়ে ধরে খেলার ছলে জলে ফেলে দিচ্ছে—কিছু না, অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার—অথচ আজও যখন ছবিটা কাজের ফাঁকে হঠাৎ মনে এসে পড়ে—

যাক্, ওসব কথা পরে বলবো—

আমাদের মধ্যে একজন বললেন—মেয়েটি তো বেশ দেখতে, এই মেয়েটির সঙ্গে সম্বন্ধ হোলে খুব ভাল হোত। যে মেয়েটি দেখা গেল, তার চেয়ে এটি সত্যিই অনেক ভাল।

তারপর আমরা গ্রামের বাইরে মাঠে এসে পড়লুম—আমাদের সঙ্গের লোকটিও ফিরে গেলেন।

ওদের ব্যাপার আমি এই পর্যন্ত জানি। আমার বন্ধুর ভাইয়ের সেখানে বিয়ে হয় নি একথা আমি পরে অবিশ্যি শুনেছিলুম, কেন হয় নি সে খবর রাখবার আবশ্যক বিবেচনা করি নি। তবে শুনেছিলুম নাকি দেনা পাওনা নিয়ে কি একটা গোলযোগই সম্বন্ধ ভেঙে যাওয়ার কারণ।

এর পরে বছরখানেক কেটে গিয়েছে।

একদিন সকালে আমার বাসায় জন কয়েক ছোকরা এসে হাজির হোল। তাদের সকলের বাড়ি ঐ গ্রামে—তাদের মধ্যে আমার আত্মীয়টির এক ভাইও আছে। সকলেই খুব ব্যস্তসমস্ত।

আমায় বল্লে—শীগ্‌গির নিন তৈরী হয়ে—চলুন আমাদের সঙ্গে যেতে হবে—

—কি ব্যাপার? হয়েচে কি?

সকলেই সমস্বরে বল্লে—পথে বেরিয়ে শুনবেন, এখন বেরিয়ে পড়ুন চট্ করে—শ্মশানে যেতে হবে—কাশীমিত্তিরের ঘাটে—

খুব বিস্মিত হোলাম।

—কে মারা গিয়েচে? ব্যাপার কি?

আমার আত্মীয়ের ছেলেটি বল্লে—গোপাল কাকার মেয়ে রাণীর স্বামী আজ মারা গিয়েচে। এখানে বিয়ে হয়েছিল হাতীবাগানে—বিয়ের পর তিনমাস এখনও পোরে নি। আর একটি ছেলে বললে—তার চেয়েও বিপদ, রাণীর দেওর আর শাশুড়ীর ব্যবহার ভয়ানক খারাপ, তারা কেউ শ্মশানে যাবে না—মুখাগ্নি করতে হবে রাণীকেই—দেওর এখন চেষ্টায় আছে, নগদ টাকা, গহনা সরাবে, দাদার বৌকে ফাঁকি দেবে। সে ভয়ানক ব্যাপার, চলুন না, গিয়ে শুনবেন সব।

—আমরা কি জানতাম কিছু, আজ সকালে রাণীর সেজদা ললিত আমাদের মেসে এসে খবর দিলে যে, একা সে কিছু করতে পারচে না—আমরা তো গাঁয়ের একদল ছেলে মেসে আছি—বললুম—আমরা থাকতে ভয় কি? চলো যাই। ললিতাকে তো ওরা বাড়ি ঢুকতেই দেয় না—দেওরটা এমনি করেছিল।

কাশীমিত্রের ঘাটে পৌঁছে দেখি রাস্তার দিকের পাঁচিলের এক কোণে একটা খাট নাবানো—তাতে চাদর-ঢাকা একটি মৃতদেহ। খাটের পাশে সেই মেয়েটি বসে আছে, যাকে সেবার ওদের গাঁয়ের পথের ধারে পুকুর ঘাটে নাইতে নামতে দেখেছিলুম সাবানের বাক্স হাতে। ওর পরনে রাঙাপাড় শাড়ি, মাথার চুলগুলো রুক্ষ ও অগোছালো, চোখেমুখে একটি দিশাহারার ভাব—যেন সে বুঝতে পারচে না, যে কি হচ্ছে বা কেন সে এখানে এসেচে। কিন্তু তার চোখে জল দেখলাম না। সেও যেন একজন এই ব্যাপারের নিস্পৃহ উদাসীন দর্শক আরও পাঁচজন বাইরের লোকের মত, এই রকম ভাবটা তার মুখে। খাটখানা এবং মেয়েটির চারিধারে ঘিরে কতকগুলি ছোক্‌রা।

আমায় দেখে ওদের মধ্যে একজন বলে উঠল—এই যে এসেচেন? আপনাকে আনতেই বলে দিলুম আমরা। আমরা তো সব ছেলেছোকরা, একজন আপনাদের মত লোক উপস্থিত না থাকলে আমরা ভরসা পাইনে।

আর একটি ছোকরা বললে—দেখুন, এমন চামার রাণীর দেওরটা—ভাই মরে পড়ে আছে, সে সিন্দুক বাক্স সামলাতে ব্যস্ত। রাণীর তো দুর্দশা যে কি করেচে এই ক'দিন, এর দাদা না থাকলে বোধ হয় ওকেও ওই সঙ্গে মেরে ফেলতো। টাকার ভাগ, বাড়ির ভাগ ওকে দিতে হবে, এই আপসোসে মা আর ছেলে মরে যাচ্ছে! সে যদি দেখতেন কাণ্ডটা। আপনি যদি বলেন, আমরা চিতায় চড়িয়ে দিই মড়া। দেখুন, মুখাগ্নি করতে পর্যন্ত এল না ভাই—এই ছোট মেয়েটাকে দিয়ে সব কাজ করাতে হবে—সঙ্গে অন্য একটি মেয়েমানুষ পর্যন্ত নেই—ওর শাশুড়ীকে কত করে বললাম—এলো না।

মৃতদেহ চিতায় তুলে দিতে পরামর্শ দিলাম।

রাণীর দাদা তার হাত ধরে তাকে দিয়ে মুখাগ্নি করালে।

মুখাগ্নি নিষ্পন্ন হয়ে গেলে তার দাদা তাকে একপাশে বসালে। দু'একটি কথায় নীচু স্বরে বোনকে কি বলছিল, বোধ হয় সান্ত্বনাসূচক কথা।

এমন সময়ে একটি কাণ্ড ঘটলো।

কোথা থেকে তিনজন লোক এসে উপস্থিত হোল। একজনের বয়েস তেইশ চব্বিশ, বৃষকাষ্ঠের মত শুক্‌নো চেহারা, মাথায় লম্বা লম্বা চুল, সামনে পেছনে ঘাড়ের দিক চাঁচা। শখের থিয়েটার দলে ফ্লুট বাজায়—চেহারাখানা এমনি ধরনের! বাকী দু'জন বেশী বয়সের লোক—কিন্তু তাদের মুখ দেখলে মনে হয়, ওদের বংশে তিন পুরুষের মধ্যে কারো অক্ষর পরিচয় ঘটে নি, এমনি চাষাড়ে-চোয়াড়ে মুখ।

ছোকরাটি আসতেই মেয়ের দাদা বললে—এই যে আসুন ধীরেনবাবু—মাকে আনলেন না? ছোকরা সে কথায় কোনো জবাব না দিয়ে চোয়াড়ে ধরনের একজন লোককে দেখিয়ে বললে—ইনি আমার মামা। এঁকে নিয়ে এলাম, নইলে আপনারা তো আমার কথা শুনবেন না!

—কি কথা?

এইবার সেই মামা নিজে এগিয়ে এসে মেয়ের ভাইকে বললে—আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে, একটু এদিকে আসুন। মেয়ের ভাই তার সঙ্গে এক পাশে গেল। দুজনে কি কথা হল জানিনে, ভাই ফিরে এসে আমার দিকে চেয়ে বললে—ইনি রাণীর মামাশ্বশুর। ইনি বলচেন রাণীর গহনাগুলো দিতে ওঁর হাতে। আপনি কি বলেন? এই কথাতে মামা-

শ্বশুরের সংগী সেই আর একজন চোয়াড়মত লোক চটে গেল। বল্লে—উনি কি বলবেন? মেয়ের মামাশ্বশুর আর দেওর নিজে এসে গহনা চাইচেন, উনি এর মধ্যে কি বলবেন?

কতকগুলো ছেলেছোকরা সমস্বরে কি একটা কথা বলতে গেল—আমি ওদের থামিয়ে দিয়ে মামাশ্বশুরকে বললুম—আপনি গহনা এখন চান কেন?

মামাশ্বশুর বল্লে—গহনা বৌমার গা থেকে হারিয়ে যেতে পারে, এমন গোলমাল আর ভিড়ের মধ্যে। আমাদের কাছে এখন রেখে দিই, এর পরে আবার দেবো—

বললুম—না, গহনা আমরা দিতে পারি নে।

মামাশ্বশুর মহারুখে উঠলেন।

—দিতে পারেন না? আপনি কে মশাই? আপনার কি অধিকার আছে দেবার না-দেবার? আমার বৌমার গহনা আমি নিতে এসেছি, আপনি যে বড়—

পেছন থেকে একজন ছোক্‌রা বললে—ওঃ ভারী বৌমা বৌমা এখন, বড় দরদ দেখাতে এসেচেন বৌমার ওপর—এতদিন কোথায় ছিলেন মশাই? কেশবের অসুখের সময় কোন-দিন তো চুলের টিকিও দেখি নি—

মামাশ্বশুর বললে—মুখ সামলে কথা কও বলচি—

পেছনের সেই চোয়াড় লোকটা আস্তিন গুটিয়ে এগিয়ে এসে বললে—আলবৎ আমরা গহনা নিয়ে যাবো—আমাদের বৌয়ের গহনা আমরা নিয়ে যাবো তাতে কে কি করবে?

একটা হৈ হৈ বাধবার উপক্রম হয়ে উঠলো, মামাশ্বশুরের ও তার সঙ্গীর এই কথায়। আমি আমাদের দলের ছোক্‌রাদের থামিয়ে দিয়ে বললুম—আপনাদের গহনা আপনারা নিয়ে যাবেন কি না সে তর্ক আমরা করতে আসি নি, কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করি, আপনাদের ঘরেরই তো বৌ, ছেলেমানুষ, কাঁদ্‌চে, এই কি সময় ওর গা থেকে গহনা খুলে নেবার? এখন আমরা তা হতে দিতে পারি নে।

মামাশ্বশুর বল্লে—হতে দিতে পারেন না কি মশাই? আপনি যে বড্ড লম্বা লম্বা কথা বলচেন দেখতে পাই। হতে দিতে হবে—আমরা গহনা নিয়ে যাবোই, আপনি কি করবেন?

আমার ভয়ানক রাগ হয়ে গেল লোকটার ইতরামি দেখে। বললুম—আপনারা বলচেন আপনাদের বৌমা, এই বুঝি তার ওপর আপনাদের দরদের পরিচয়? গহনা নিতে এসেচেন এ সময় গা থেকে খুলে? গহনা যদি আমরা না দিই, কি করবেন আপনারা?

ওঁরা তিনজনেই আস্ফালন করে বলে উঠলো—গহনা জোর করে নিয়ে যাবো, আপনাদের কি অধিকার আছে গহনা আটকাবার? কে আপনারা? আলবৎ গহনা আমরা নিয়ে যাবো—

এইবার আমাদের ছেলের দল ক্ষেপে উঠলো—তারা সবাই রাণীকে ঘিরে দাঁড়িয়েচে ততক্ষণ। তারা বললে—কারো সাধ্যি নেই, আমরা এখানে থাকতে আমাদের গাঁয়ের মেয়ের গা থেকে কেউ গহনা ছিনিয়ে খুলে নিয়ে যায়—আসুক কে এগিয়ে আসবে দেখি—

একটা তুমুল হৈ চৈ ও বিশ্রী কোলাহলের সৃষ্টি হোল তারপরে। সকলেই একসঙ্গে কথা বলতে লাগলো—লোক জমে গেল চারিধারে—সকলেই জিজ্ঞেস করে, ব্যাপারটা কি? ওরাও চীৎকার করে—

—দেখে নেবো, কার সাধ্যি—

—কি হয়েচে মশাই? ব্যাপারটা কি মশাই?

—আলবৎ নিয়ে যাবো,—কত জোর গায়ে আছে দেখবে?

—হাঁ হাঁ মশাই, থামুন,—থামুন—

—ভদ্রলোক না ছোটলোক—চামার একেবারে—

—মুখ সাম্‌লে—খবরদার—

—আমাদের বোনের মত—আমাদের গাঁয়ের মেয়ে—

—পুলিস পুলিস—

সবাই মিলে যখন একটা দক্ষযজ্ঞির সূত্রপাত করে তুলেচে, তখন হঠাৎ আমার চোখ পড়লো রাণীর দিকে। সদ্য-বিধবা হতভাগিনী বালিকা ভয়ে, বিস্ময়ে লজ্জায় কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে উঠে বড় বড় ভীতিপূর্ণ চোখে যুধ্যমান দল দুটির দিকে চেয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েচে—একে তো সে অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে কলকাতাতেই বিয়ের আগে কখনো আসে নি, তার উপর আজই সে বিধবা হয়েচে। এত বেলা হয়েচে এক বিন্দু জল নিশ্চয়ই ওর মুখে যায় নি, এদিকে দেওর আর মামাশ্বশুরের এই কাণ্ডকারখানা·····একপাল পুরুষমানুষের মধ্যে আজকার দিনে ওই বালিকা একা, এমন আর একজন মেয়েমানুষ নেই যে চোখের জল মুছিয়ে দেয়, একটা সহানুভূতির কথা বলে। ওর সেই ছবিটা আমার মনে এল, ওদের গাঁয়ের পুকুরঘাটে সেই যে ওকে দেখেছিলুম···সহজ, সরল, নিশ্চিন্ত জীবনের আনন্দে ভরপুর, লীলাময়ী, সুন্দরী কিশোরী। একটা সুকুমার সন্ধ্যামালতী ফুলের লতাকে ছায়াবৃক্ষের শীতল আশ্রয় থেকে জোর করে ছিঁড়ে এনে কাশীমিত্রের ঘাটের চিতার আগুনের আঁচে বসানো হয়েচে—ওর চোখের জল পর্যন্ত শুকিয়ে গিয়েচে সেই আঁচে······

পুলিসের কথা শুনে ভাইবোন দুজনেই ভয় পেয়ে গেল।

পাড়াগাঁয়ের লোক, পুলিস সম্বন্ধে ওদের ধারণা খুব স্পষ্ট নয়।

বোন ভয়ে ভয়ে বললে—দাদা, তুমি ঝগড়া কোরো না ওদের সঙ্গে, গহনা আমি খুলে দিচ্চি, তুমি ওদের দ্যাও—এই ধরো—পুলিস আসবার আগেই দিয়ে দ্যাও দাদা—

দাদা আমায় বললে—দেখুন, আমি বলছি কুটুম্বের সঙ্গে একটা মনান্তর করে কি হবে, রাণীও বলচে গহনাগুলো না হয় দিয়েই—

বললুম—কক্ষনো না। তা হতে পারে না। পুলিস আনবে আনুক না? ওদের সে সাহস হোলে তো? তুমি ভয় খেও না।

ছেলেরাও বললে—রাণী, তুই কিছু ভয় খাসনে। আমরা আছি এখানে, কারো সাধ্য নেই কিছু করে। ওরা তিনজন আর আমরা এগারজন—

আমাদের দলের প্রতুল বলে যে ছোকরা আমার বাসায় আমাকে ডাকতে গিয়েছিল, সে বললে, আচ্ছা দাঁড়ান আপনারা সবাই একটু—আমি রজনী ডাক্তারকে ডেকে আনি, তিনি নিকটেই থাকেন, প্রবীণ মানুষ, তিনি রাণীর বরের চিকিৎসা করেছিলেন এই অসুখে। তিনি যে রকম পরামর্শ দেন, তাই করা যাবে—কি বলেন?

মামাশ্বশুর আর তার সঙ্গী কি একটা পরামর্শ করলে নিজেদের মধ্যে। তারপর ওদের সঙ্গী সেই চোয়াড় লোকটা কোথায় চলে গেল।

আমাদের দলের একটা ছোকরা বল্লে—গেল কোথায়?

বললুম যেখানে খুশি যাক গে। চিতার দিকে লক্ষ্য রেখো—রাণীকে বসতে বলো ওর দাদার কাছে গিয়ে। রোদে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

দেওর আর মামাশ্বশুর আমাদের থেকে একটু দূরে বসেছে। কি একটা পরামর্শ আঁটছে দুজনে, বেশ বুঝতে পারা গেল। রাণীর ভাই একবার ভয়ে ভয়ে বললে—থানায় যায় নি তো?

আমাদের দলের কেউ কেউ বললে—ওরা নইলে আরও লোক আনতে গিয়েচে। একটা মারা-মারি না করে দেখ্‌ছি ছাড়বে না।

রাণীর দাদা বললে—সেটা কি ভালো হবে? তার চেয়ে দিই না গহনা ওদের হাতে? আমি বুঝিয়ে বল্লুম—কেন তুমি গহনা দিতে যাবে? এ গহনা ওরা দেয় নি, দিয়েছেন

তোমার বাবা। ওদের কোন অধিকার নেই এতে। রাণীর শাশুড়ীর যেমন গতিক দেখছি, তাতে মনে হয়, সেখানে ওর স্থান হবে না। এই গহনাগুলোই ওর সম্বল। গহনার মধ্যে তো দেখছি একছড়া হার, আর হাতের চুড়ি কগাছা, আর তো কিছু নেই। তাই বা কেন হাতছাড়া করবে? গুন্ডা আনে, আমরাও পুলিসে খবর দিতে পারি।

ওদের ফিরতে দেরি দেখে ভেবেছিলুম ব্যাপারটা আর বোধ হয় গড়ালো না; কিন্তু রাণীর অদৃষ্টে সেদিন আরও দুঃখ ছিল। একটু পরে সত্যিই ওরা একদল লোক নিয়ে ফিরে এল। আমাদের দেখিয়ে বললে—এরা কোথা থেকে এসেছে চিনি নে। উনি আমার বৌদিদি, মা আসতেন শ্মশানে, কিন্তু তিনি বাতের ব্যথায় নড়তে পারেন না। বৌদিদির ভাইয়ের মতলব গহনাগুলো হাতিয়ে নেওয়া, তাই বোধ হয় এই সব বন্ধুর দল এসেছে।

আবার একটা গোলমাল, তর্ক-বিতর্ক, চেঁচামেচি শুরু হোল। তখন গোলমাল শুনে পুলিস এসে না পড়লে হাতাহাতি পর্যন্ত হতে বাকী থাকত না। আমাদের দুই দলকেই থানায় যেতে হবে বললে।

ইতিমধ্যে দাহকার্য শেষ হয়ে গিয়েছিল—আমরা রাণীকে স্নান করিয়ে নিলাম। থানায় গিয়ে ঘণ্টাখানেক আটকে থাকতে হোল। নানারকম জেরা জবানবন্দি চললো আমাদের উপর। রাণী তো ভয়েই সারা। সে ভাবলে গহনাগুলো খুলে না দেওয়ার অপরাধে পুলিসে এখুনি তাকে হাজতে আটকে রাখবে। অপর পক্ষের লোকেরা নিজেদের সাচ্চা প্রতিপন্ন করতে আমাদের ঘাড়ে নানারকম দোষ চাপালে, এমন কি রাণীর সম্বন্ধেও দু'একটা এমন কথা বল্লে, যা থানার বাইরে বল্লে আমাদের দলের ছোকরারা ওদের হাড় গুঁড়িয়ে দিত।

বেলা তিনটার সময় থানা থেকে আমাদের ছুটি হোল।

রাণীকে এখন কোথায় পাঠান যায়?……

ওর শ্বশুরবাড়িতে ওকে নিয়ে তোলা আমাদের কেউ সমীচীন মনে করলে না—বিশেষ করে এইমাত্র যখন তার দেওরের সঙ্গে এই কাণ্ডটা ঘটে গেল।

আমরা ওর ভাইকে পরামর্শ দিলাম, ওকে বাপের বাড়ী নিয়ে যেতে, নইলে একা শ্বশুরবাড়ীতে ওকে রেখে গেলে দেওর আর শাশুড়ীতে মিলে ওর যা দুর্দশা করবে, সে কল্পনা না করাই ভাল। ভাইয়ের কাছে আবার দু'জনের যাওয়ার মত ভাড়া নেই। আমাদের যার কাছে যা ছিল দিয়ে দু'জনের দু'খানা টিকিট কিনে ওদের শেয়ালদা স্টেশনে ট্রেনে উঠিয়ে দিতে এলাম।

শুনলুম ও বিয়ের পরে জোড়ে একবার বাপের বাড়ী গিয়েছিল বরের সঙ্গে নব-বধূর সাজে। সেই যে এসেছিল, আর এই যাচ্ছে।

সেই কথা মনে হওয়ার দরুন বা অন্য কিছু জানিনে, যাবার সময় রাণী খুব কাঁদতে লাগলো। এতক্ষণ ও তেমন কাঁদে নি। সারাদিনে যে ঝড় ঐ মেয়েটির ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে, তারপরে ও যেন একেবারে কান্নায় ভেঙে পড়তে চাইচে।

ওর সে কান্না শুনলে বড় কষ্ট হয়। ছেলেমানুষের মত কান্না……চীনে মাটির সাধের পুতুলটা ভেঙে গেলে ছোট মেয়ে যেমন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে তেমনি……স্বামী-হীনা সদ্য-বিধবার কান্নার মত নয়, কান্নাটা……মনে হয় ছেলেমানুষই তো, খেলার ঘরের পুতুল-ভাঙার কান্নাটাই শিখে রেখেচে, বড় মেয়ের মত ট্র্যাজিক কান্না কাঁদতে শেখে নি এখনও।

এর পরে রাণীর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি বা তার খোঁজও রাখিনি। যদি বেঁচে থাকে, তার বয়স এখন ছাব্বিশ-সাতাশ, বাপের বাড়ীতে ভাইয়ের স্ত্রীর দাসীবৃত্তি করে দুমুষ্টি অন্নসংস্থান করচে, অকালে বুড়ী হয়ে গিয়েচে, হয়তো বা এতদিন শুচিবাই রোগেও ধরেচে। ঐ ছাড়া আর তার কি হবে?

কিন্তু ওর সেই ছেলেবেলাকার পুকুরঘাটের সেই কুমারী দিনের ছবিটি আমার চিরকাল মনে রয়ে গেল……পুকুরের বাঁধা ঘাটে নামচে……দু' আঙুলে ধরে রাঙা গামছাখানা খেলার ছলে জলে ফেলে দিচ্ছে লীলাময়ী বালিকা……সেই ছবিটা যেন কিছুতেই ভুলতে পারিনে।

বাটি-চচ্চড়ি

সংসারটা এমন কিছু বড় নয়। মাত্র দুটো মেয়েমানুষ এবং একজন পুরুষের সমবায়ে গঠিত। ডাক্তার, ডাক্তারের বৌ এবং তাদের এক বিধবা পিসিমা, আবার এই পিসিমা ডাক্তারের চেয়ে বছর দশেকের ছোট। সরকারী হাসপাতালের পুরোনো ডাক্তার। চক্রধরপুরে বদলি হয়েছে সম্প্রতি। ছোট্ট সংসার—আরও ছোট্ট একখানা বাড়িতে অবস্থিত—বেশ ভাল ভাবেই চলছিল সুখে, শান্তিতে, হাসিতে ও আনন্দে—উদয়াস্ত সুমহান্ কাল কেটে যাচ্ছিল মোহন ছন্দে।

এ হেন সময়ে ডাক্তার একখানা চিঠি পেল এই মর্মে, কলকাতা থেকে নাকি তার বাপের ছোট কাকার বড় ছেলের রুগ্ন বধূ আসছে তার শরীরের ক্ষতিপূরণ করতে এই পাহাড়ের দেশে। অলকার স্বামীই ডাক্তারের চেয়ে অনেক ছোট।

প্রস্তাবনাটা পিসিমার কাছে উত্থাপিত হলে তো সে প্রতিবাদ করলে, "বেশ, আসুক ছোট বৌদি। আমি কলকাতায় যাব—এখানে থাকতে পারবো না।"

ডাক্তার প্রতিবাদ করলে, "তাহ'লে এখানে দিন চলবে কি করে?"

"সে আমি কি জানি ভাইপো।" পিসিমা ঐ বলেই ডাক্তারকে সম্বোধন করে।

"কিন্তু বৌমা আসছেন রোগা মানুষ। তাঁকে দিয়ে তো আর সংসারের কাজ করানো যাবে না। আর তোমাদের বৌ তখন হয়ে পড়বে একা—ছেলে-পিলে নিয়ে আর ক'দিক সামলাবে বল? তা ছাড়া কলকাতায় তো দেখছি মানুষের অভাব তেমন নেই।"

সুতরাং পিসিমাকে থেকে যেতে হল। অলকার সঙ্গে তার আজ প্রায় পাঁচ বছরের বিবাদ। সেই বিবাদের ঝাঁজেই সে প্রতিবাদ করেছিল। তবে সে প্রতিবাদ টিকলো না কিছুতেই ডাক্তারের প্রবল যুক্তির কাছে।

ওদিকে অলকা এল যথাসময়ে। দীর্ঘদিন ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে তার দেহের সক্রিয় কলকব্জাগুলো অচলপ্রায় হয়ে গেছে। শরীরের সে কান্তি বা শোভা নেই। মুখশ্রী হয়েছে কালিমালিপ্ত। গায়ের হাড়গুলো এমনভাবে বার হয়ে পড়েছে যে, তাদের এক-একখানা করে গোনা যায় অক্লেশে।

আসার পরের দিন তো ডাক্তার পরীক্ষা করলে। দেখলে জীবনের আশা বড় কম। নিজের মৃত্যুর জন্যে সে নিজে দায়ী। কারণ সে মৃত্যু ডেকে এনেছে অযথা নিজের নির্বুদ্ধিতার ফলে এবং চিকিৎসার অভাবে। এমন কি, এ কথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে, সে ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিঃশেষের পানে এগিয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ নিছক ভাইটামিনের অভাব বা খাদ্যপ্রাণের অকিঞ্চিৎকরতায়। স্বামীর দীর্ঘ দিনের বেকার অবস্থা রোগের আর একটি কারণ বলা যেতে পারে।

যা হোক, বৌমার চিকিৎসা এবার চলতে লাগলো যথাসাধ্য। কিন্তু সে চিকিৎসার কোন সুফল ফললো না মাসখানেকের মধ্যেও। ডাক্তার হতাশ হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বস্‌লো। তবু অলকার রোগ কমলো না; পরন্তু বৃদ্ধি পেতে লাগলো একটু একটু করে দিন দিন, সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ প্রতিপন্ন করে।

অলকার নুন খাওয়া নিষেধ। কোন এক রাজার মেয়ে নাকি তার বাপকে নুনের মত

ভালবাসতো। সুতরাং নুনের প্রয়োজনীয়তা কিংবা গুণ সামান্য নয়। তাই অলকা সচরাচর নুনহীন তরকারী খেত না। ডাক্তারের বৌ আবার লোককে খাওয়াতে নাকি বড় ভালবাসতো। সুতরাং অলকার খাওয়ার কষ্ট দেখে তার করুণ মন ক্লিষ্ট হোত অত্যন্ত। অনেক ব'লে ক'য়ে সে স্বামীর কাছ থেকে বৌমার সামান্য একটু বাটি-চর্চ্চাড় খাবার অনুমতি পেয়েছিল এবং প্রতিদিন তার জন্যে একটা বাটি-চর্চ্চাড় করে দিত সযত্নে।

সেদিন অনেকগুলো বিছানা পরিষ্কার করে উঠতেই ডাক্তারের বৌয়ের বেশি বেলা হয়ে গেল। পিসিমা তাড়াতাড়ি স্নান করে এসে রান্না করতে বসলো। আর বৌমা?—বাতায়নপাশে বসে দূর আকাশের পানে তাকিয়ে দেখতে লাগলো অপরূপ মেঘের খেলা। দূরে অতিকায় ধূমের মত দাঁড়িয়ে আছে আকাশচুম্বী পর্বত। তার নীচে ইতস্ততঃ বৃক্ষলতাশোভিত কালো বর্ণের ছোট ছোট পাহাড়। তাদের গায়ে লাল কাঁকরে বঙ্কিম পথরেখা—মনে হয় যেন কোন্ অচিন দেশে চলে গেছে পাহাড়ের বুক ব'য়ে। বৌমা অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিল, এমন সময় ডাক্তারের বৌ ভিজে চুল মুছতে মুছতে এসে বললে, 'বৌমা, আজ কি দিয়ে দুধ সাবু খাবে?'

—"যা হোক দিয়ে খাব অখন মা।"

—"কেন বাটি করতে দিলে না?"

—"থাকগে, কুটনো তো সব কোটা হয়ে গেছে!"

—"তা হোক, তুমি একটা বাটি করতে দাও মা।" কথা শেষ করে ডাক্তারের বৌ গৃহত্যাগ করে আর বৌমা উঠে যায় বাটি-চর্চ্চাড়র কুটনো কুটতে।

পিসিমা কড়ার ওপর মাছ দিয়ে একবার বাটির পানে তাকিয়ে নিল, তারপর বললে, "বলি হ্যাঁগা বৌদি, আমার গতরে কি-এমন পোকা পড়েছে?"

বৌমা সবিস্ময়ে কয়, "কেন ঠাকুরঝি?"

মুখরা পিসিমা তখন ফেটে পড়লেন, "আমি কি বাটির কুটনো কুটতে পারি না, না কুটলে হাতে পক্ষাঘাত হোত? তেজ করে আমায় একবার বলা হোল না। রোগ তো বারো মাস লেগেই আছে। তার আবার অত দেমাক কিসের?"

রুগ্না বধূটির শুষ্ক নয়নদ্বয় বিদীর্ণ করে ঝরে পড়ে অঝোরে মুক্তার মত অশ্রুকণা নিদারুণ ঘৃণায় ও বেদনায়, ননদের এই বাক্যবাণের সুতীব্র আঘাতে। স্বামীর অর্থ-হীনতা এবং নিজের রোগের চিন্তায় তার সারা কোমল অন্তরাত্মা সহসা রী রী করে ওঠে। আর পিসিমার মুখে তখন যেন তুবড়ীতে আগুন লেগেছে। সমস্ত বারুদ না নিঃশেষিত হলে সে নীরব হবে না। বৌমা আস্তে আস্তে বাটিটা নিয়ে আসে সকলের অজ্ঞাতসারে।

ঘণ্টা দুয়েক পর পিসিমার বারুদ ফুরিয়ে যেতে ডাক্তারের বৌ এসে বললে, "বৌমা, বাটি আমায় দাও মা, আমি করে দিচ্ছি। ছিঃ ছিঃ, মানুষকে মানুষ অমন করে বলে?"

বিশ বছরের রোগশীর্ণ বধূটি আজ সারা হৃদয় মথিত করে কেঁদে ফেলল বিপুল বেদনায়। শ্বশুর-শাশুড়ীকে অকালে হারিয়ে সে আর বিধবা ননদের গঞ্জনা সহ্য করতে পারচে না। ডাক্তারের বৌ আঁচল দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললে, "কেঁদো না মা, বাটিটা আমায় দাও!"

—"না, থাক্ মা। বাটি আমি আর জীবনে খাব না।"

—"ছিঃ, সে কি হয় মা?"

—"খুব হয়।"

ডাক্তারের বৌয়ের বহু অনুনয়বিনয় সত্ত্বেও বৌমা বাটি বার করে দিলে না। ডাক্তারের বৌ বেলা একটা পর্যন্ত বাটির খোঁজে সমস্ত কিছু তন্ন তন্ন করে দেখলো, কিন্তু

কোথাও সে বাটি পাওয়া গেল না, আর পাওয়া গেল না সে কোটা তরকারীগুলো।

সেদিন রাতে ডাক্তার গিয়েছে রিহার্সাল দিতে। এবার পূজায় নাকি ভারী ধুম করে থিয়েটার হবে। ডাক্তারের বৌ মুখের মধ্যে অনেকগুলো এলাচ পুরে ছারপোকা মারতে বিছানা পাতিপাতি করে খোঁজে—এ তার নিত্যকার অভ্যাস। রাতে সে বড় একটা ঘুমোয় না। এমন সময়ে পাশের ঘরে বৌমা উত্ত্যক্ত হয়ে বললে, "ভাল জ্বালা, দরজাটা যে কিছুতেই খুলছে না মা।"

ডাক্তারের বৌ আলো নিয়ে এগিয়ে এল, "কি হয়েছে বৌমা?"

—"দেখ না মা, দরজার খিল কিছুতেই পাচ্ছি না।"

—"দরজা তো খোলা বৌমা?"

—"তবে খিল কোথায় গেল?"

ডাক্তারের বৌ জানে যে, তার জ্যাঠাইমা মৃত্যুর পূর্বে ঐ রকম দিকভ্রান্ত হয়ে গেছিল। বৌমার এই রহস্যজনক আচরণে সে রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। আস্তে আস্তে নিজে এসে দরজাটা খুলে দিলে।

সামান্য পরে বৌমা বাইরে থেকে ফিরে এসে আবার নিজের বিছানায় শোয় এবং ডাক্তারের বৌ মশা তাড়িয়ে পুনরায় মশারিটা গদির তলায় গুঁজে দেয়। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়ে জানে না। ডাক্তারের ডাকে ধড়মড় করে উঠে দরজা খুলে দিল।

ডাক্তার বললে, "যেন মোষ একেবারে। ঘুমে অচেতন।"

—"থাক, খুব হয়েছে!"

—"আধঘণ্টা ধরে একজন ভদ্রলোক ডাকছে।"

—"সকালে অতগুলো কাঁথা তোশক কাচলে ও-ভদ্রলোকেরও এই দশা হোত নিশ্চয়।"

ডাক্তার শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কতক্ষণ যে ঘুমঘোরে কেটেছিল দুজনের তা হয়তো তারা জানে না। ডাক্তারের বৌ সহসা সচেতন হ'ল স্বামীর আহ্বানে. "ওগো, ওগো, দেখ তো ও ঘরে বৌমা কি যেন বলছেন।"

ডাক্তারের বৌ শুনলে বৌমা পাশের ঘরে বলছে, "দূর ছাই! কিছুতেই তো আলো জ্বলছে না।"

রুগ্নকণ্ঠ ক্ষীণস্বরে নিশীথের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে অট্টহাসি হেসে ওঠে যেন কিসের ব্যাকুল প্রচেষ্টায়। ডাক্তারের বৌ গৃহে প্রবেশ করে দেখে সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। বৌমা মশারির মধ্যে হ্যারিকেনের ল্যাম্প নিয়ে গিয়ে অনবরত ফস্ ফস্ করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে যাচ্ছে আর সেই প্রজ্বলিত কাঠি চিমনিতে ঠুকে ঠুকে নিবিয়ে ফেলছে প্রতিবার। এমনি করে জ্বালাতন হচ্ছে ব্যর্থতার বেদনায়। ডাক্তারের বৌ স্তম্ভিত হয়ে স্থাণুর মত স্থির হয়ে থাকলো এক মুহূর্ত, তারপর বললে, "বৌমা, ওকি করছো মা!"

বৌ মৃদু ক্রন্দনের সুরে বললে, "দেখ দিকিন্ মা, আলোটা কিছুতেই জ্বলছে না।"

বৌমার জ্ঞান সহসা ফিরে আসে। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত তাকিয়ে থাকে ডাক্তারের বৌয়ের পানে। ডাক্তারও এগিয়ে আসে—তারপর ত্বরিত বৌমাকে পরীক্ষা করে বলে, "শীগ্‌গির আগুন করে ওঁর হাত-পা সেঁক কর।"

এতক্ষণে পিসিমার ঘুম ভাঙে। সে আলস্য ত্যাগ করে পিট্ পিট্ করে তাকিয়ে থাকে। ডাক্তার এসে তাড়াতাড়ি বৌমাকে একটা ইন্‌জেকশন করে দিলে, তারপর বাইরে গিয়ে বললে, "না, এত ক'রেও বৌমাকে বাঁচাতে পারলুম না।"

নয়নকোণ থেকে ঝরে পড়ে বিন্দু বিন্দু অশ্রুকণা। ডাক্তারের বৌয়েরও চক্ষু হয় বাদল দিনের সজল আকাশের ন্যায়।

মুহূর্তে সব কিছু এলোমেলো হয়ে যায়। কলকাতায় টেলিগ্রাম করা হয় বৌমার স্বামীর কাছে। তবুও যদি একবার শেষ দেখা করতে পারে পারের ঘাটে।

ডাক্তার যথাসাধ্য চেষ্টা করলে। স্বামী এল দূরান্তর থেকে আর এল তার মেজদি, গলার বোতাম বাঁধা দিয়ে একেবারে শেষক্ষণে। তবুও বৌমা বাঁচল না। ডাক্তার কাঁদলো আর কাঁদলো তার বৌ, মৃতার স্বামী ও মেজ ননদ। শুধু কাঁদেনি তার বিধবা ছোট ননদ ; কারণ মৃতার সঙ্গে তার কথা বন্ধ প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর যাবৎ। আর সেই কারণেই সারারাত দিক্‌ভ্রান্ত একজনকে মশারির মধ্যে দেশলাই জ্বালাতে দেখেও নিবারণ করতে পারে নি কিছুতেই।

এই ঘটনার দিনসাতেক পর ডাক্তারের বৌ কোন এক মধ্যাহ্নে ভাঁড়ার ঘর গোছাতে গোছাতে একটা খালি হাঁড়ির মধ্যে পেল সেই বাটিটা আর তার মধ্যেকার কতগুলো শুকনো তরকারী। পুরোনো ক্ষতে আবার যেন নতুন করে আঘাত লাগলো, একটা ব্যথিত দীর্ঘনিঃশ্বাস বুকের মধ্যেই চেপে ধরলো। মর্মন্তুদ বিচ্ছেদ বেদনা লাঘব করলে না সশব্দ শোকার্ত বাক্যবিন্যাসে, কেবল সজল নয়নে তাকিয়ে রইলো সেই বাটির পানে আর শুকনো তরকারীগুলোর পানে।

ডাইনী

অফিস থেকে ফিরে দেখলুম স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে বিছানায় শুয়ে। চমকে গেলুম খুবই— ভয়ও পাই নি যে তা নয়। বিজুকে তো কখনও ভর সন্ধ্যেবেলা এমন করে সংসারের কাজকর্ম ফেলে শুতে দেখিনি। মেয়ের আবার কি বিপদ হোল? ভয়ে ভয়ে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "ব্যাপার কি বিজু?"

বিজু কোন উত্তর দিলে না। তার কপালে হাত দিয়ে দেখলুম জ্বর হয়েছে কি না। না, শরীরে উত্তাপ তো স্বাভাবিক। তবে? স্ত্রীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ডাকলুম, "বিজু!"

এতক্ষণ পর বিজু কথা বল্লে, "ক'দিন থেকে বলছি এ অলুক্ষণে বাড়িটা বদলে ফেলো, বদলে ফেলো। তা যদি কথা কানে করবে। কলকাতায় কি আর বাড়ি আছে!"

সত্যি বটে বিজু ক'দিন থেকে বাড়ি বদল করবার জন্য তাগাদা করছে ; কিন্তু বাড়ি বদল করা তো আর সোজা কথা নয়। ভুক্তভোগীমাত্রেই জানে। সুতরাং কথাটা তেমন গ্রাহ্য করিনি। বললুম, "এ বাড়ি কি দোষ করেছে?"

ব্যস্! বিজু যেন ফেটে পড়ল, "দোষ করেছে?—চারিদিকে সব ডাইনী! একটা মেয়ে নিয়ে যাও বা ঘর কচ্ছি, তা যদি ওদের সহ্য হয়!"

"ডাইনী!" আমি ওসব অন্ধবিশ্বাসকে প্রশ্রয় দিই না কানেও।

"তা বিশ্বাস হবে কেন? দেখ দিখি আজ দুপুরের থেকে শানি কিছু মুখে করছে না। যা খাচ্ছে তাই তুলে ফেলছে।"

আমার মাথা ঘুরে গেল। শানি আমার আড়াই বছরের মেয়ে। তার ওপর ডাইনী-বুড়ীর কোপ গিয়ে পড়লো কোন্ দুঃখে? বিজু তখনও বলে চলেছে, "আচ্ছা ওদের কি চক্ষুলজ্জাও নেই একটুও?"

আমি বল্লুম, "তা ডাইনীকে কোথায় দেখলে শুনি?"

"ঐ ওখানে।" অঙ্গুলি সংকেতে বিজু পাশের বাড়ির একটা ঘর দেখিয়ে দিলে। তার সন্দেহ দেখে আমার সর্বাঙ্গ রী রী করতে লাগলো। আমি অস্ফুট স্বরে বল্লুম, "কমলা?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ! বিশ্বাস হয় না?"

"আশ্চর্য!"

"আশ্চর্য কিছুই নয়। কদিন থেকে দেখছি ওর ঐ সোহাগ আদর—পোড়াকপালীর কপাল যখন পোড়া তখন অপরের কাচ্চাবাচ্ছার ওপর নজর দেওয়া কেন?"

আমি বিজুর প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারলুম না। মাসখানেকের কথা মনে পড়ল। একদিন ঐ পাশের বাড়ির ঘরটায় কমলা চীৎকার করে উঠলো, "ওরে শোভা রে, তুই কোথায় গেলি রে? আমায় এমনি করে ফাঁকি দিলি কেন রে?"

রাত তখন প্রায় দশটা, আমি খেতে বসেছি। বিজু আমায় দুধের বাটিটা এগিয়ে দিতে বল্লে, "পাতের গোড়ায় একটু জল দাও।"

আমি বল্লুম, "কমলা কাঁদছে না?"

"আগে পাতের গোড়ায় জল দাও দিকি।"

সত্যি কমলা কাঁদছে সারা মাতৃ-হৃদয় মথিত করে কন্যার বিচ্ছেদ বেদনায়। দু'মাস আগে শোভা এসেছিল মর্ত্যলোকে আর আজ চলে গেল মায়ামমতার পাশ ছিন্ন করে। হয়ে পর্যন্ত মেয়েটা রোগে রোগে ভুগছে। সর্বাঙ্গে তার ঘা—বড় বড় দাগা দাগা। পুঁজের গন্ধে কাছে যাওয়া যায় না। কিন্তু কমলা সমস্ত ঘৃণা তুচ্ছ করে শোভার সেবা করেছে দু'হাতে। তার ফলে নিজের গায়েও স্থানে স্থানে ঘা হয়েছে—সে সব গ্রাহ্য করেনি একটুও। সারা-হৃদয় নিয়োজিত করেছে তার প্রাণসদৃশ শোভাকে আরোগ্য করবার প্রচেষ্টায়। বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ দেখান হোল—রোজা এসে ফোঁড়া কাটলো—অসংখ্য দেবতার কাছে মানত করা হল। চেষ্টার কোন ত্রুটি রইলো না; কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ প্রতিপন্ন করে রাত দশটায় শোভা মহানিদ্রায় আক্রান্ত হোল! মা বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ে শতবার নাড়াচাড়া করে তাকে সজাগ করবার চেষ্টা করলে—বিনিয়ে বিনিয়ে তার প্রস্থানের জন্যে অনুশোচনা করলে সারারাত্রি প্রায়।

সে ঘটনার মাসখানেক পর কমলা নাকি শানিকে দেখে একদিন কেঁদে ফেলে—বুকের একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপতে পারেনি। তার নিঃশ্বাসের শব্দে আমার স্ত্রীর চিত্ত বিচলিত হয়। আস্তে আস্তে খুকিকে নিয়ে সরে আসে পাশের ঘরে। আমি তখন অফিসের হিসাবপত্র মেলাচ্ছি। বিজু আমার পাশে এসে বসলো। আমি চশমাটা আস্তে আস্তে চোখ থেকে খুলে বলি, "কিছু বলবে নাকি?"

"না এমন কিছু নয়।"

আমি হাসি, বলি, "তা, ঐ এমন সামান্য কিছুই শুনি না কেন।"

"সত্যি, তোমার আবার এ সবে বিশ্বাস হয় না।"

"আঃ, কৌতুহলই তো বাড়িয়ে দিচ্ছ কেবল।"

"তুমি এ বাড়ি বদলাও।"

"কারণ?"

"কমলা রোজ রোজ শানির পানে তাকিয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ করে নিঃশ্বাস ফেলবে আর কাঁদবে। বাছার আমার অকল্যাণ হবে তাও বুড়ো মাগী ভুলে যায়।"

"পাগল!" আমি হাসতে লাগলুম।

"ঐ তো! তুমি সব কথা উড়িয়ে দাও কেবল। কপাল যখন পোড়া তখন অপরের ছেলেমেয়েদের ওপর নজর দেওয়া কেন বাপু?"

বিজু আমার কাছ থেকে চলে যায়—আমি ওসব বিশ্বাস করি না বলেই হয়তো। আমার মাথার মধ্যে বিজুর সেই শেষ কথা কেবল ভাসতে লাগলো, 'কপালপোড়া'। বাস্তবিকই কি কমলার কপাল পোড়া—বিধাতাপুরুষ তার প্রতি অপ্রসন্ন? এই রুগ্ন মেয়ে

প্রসব করবার জন্যে দোষী কে? কমলা? একটুও নয়। আমি জানি কমলার স্বামীর দুরারোগ্য সিফিলিস্ রোগ বর্তমান। একথাও জানি যে, সেই মহাপুরুষ প্রায়ই রাত্রি বেলা বাড়ি ফেরেন না। বাপ-ঠাকুরদা অনেক পয়সা জমিয়ে গেছে। তাই ব্যয় করে সে ফুরিয়ে উঠতে পারছে না। তবুও লোকে দোষ দেবে কমলাকে। আমার স্ত্রী অন্ধ-বধির, সে অকারণ পুরুষদের প্রতি সর্বদাই সদয়, কমলার স্বামীর দোষ সে দেখে না। কারণ পুরুষ পুরুষের শত্রু, আর নারী নারীর শত্রু।

এ হেন কমলা শানি হবার দিন-সাতেক পরে প্রায় একটি প্রাণহীন মাংসপিণ্ড প্রসব করে। নিজের ব্যর্থতার বেদনায় মুষড়ে পড়ে কমলা কাঁদলো, চীৎকার করলো—দু'দিন বিছানা থেকে উঠলো না, খেল না—চোখ ফুলিয়ে ফেললো কেঁদে। তারপর একদিন নজর পড়ল শানির ওপর। শানির পানে তাকিয়ে ওর ব্যর্থতার কথা পুনরায় যেন কে ওর ক্ষতে আঘাত করলে, নিজের অজ্ঞাতসারে একটি ব্যথিত দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলে। আমার স্ত্রী শিউরে উঠলো। সে শানিকে নিয়ে সেখান থেকে চলে এল। অযথা সেই দিন থেকে শানিকে কমলা ভালবাসলে।

এরপর অনেক মাদুলী ধারণ করে, অনেক গ্রহ উপগ্রহকে ঘুষ দিয়ে অনেক নির্দিষ্ট গাছে ঢিল ঝুলিয়ে কমলা আবার অন্তঃসত্ত্বা হলো—আবার সে ক্ষুধিত মাতৃহৃদয় দিয়ে অনুভব করল তার গর্ভস্থ ভ্রূণের সূক্ষ্ম সত্তা। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলুম, "প্রভু, ওকে আর বঞ্চিত করো না।" তিনি হয়তো আমার প্রার্থনায় সাড়া দিলেন। কমলার মেয়ে হোল। আবার সে তার পুরোনো হাসি ফিরিয়ে পেল। মেয়েকে মানুষ করতে লাগলো বহু প্রয়াসে।

কিন্তু এ খুকীও বাঁচলো না। তার এই পৃথিবীর আবহাওয়াটা সইল না। এ কথা আমি আগেই বলেছি, সেই সঙ্গে আরও বলেছি যে কমলা তার শোক ভুলে আবার আমাদের শানির পানে ফিরে তাকাল, আবার তার বুকে আঘাত লাগলো। সে দু'হাত বিস্তার করে শানির দিকে ছুটে এল। আমার স্ত্রী ভাবতে লাগলো এর হাত থেকে রেহাই পাবার কথা! অগত্যা আমাকে বাড়ি বদল করবার জন্যে অনুনয় বিনয় করতে লাগলো খুবই। যেহেতু আমি ওসব অযৌক্তিক কিছু বিশ্বাস করি না—সেই জন্যে আমি তার কথা উপেক্ষা করেছিলুম।

যাই হোক, কমলা একদিন জিজ্ঞেস করলে, "শানি কই ভাই?"

আমার স্ত্রী আজকাল বড় একটা শানিকে কমলার সামনে বার করে না। শানি তখন আরামে নিদ্রা যাচ্ছে। আমার স্ত্রী বললে, "শানির অসুখ করেছে।"

আমি পাশেই চেয়ারে বসেছিলাম। স্ত্রীর এই মিথ্যা কথা শুনে চমকে গেলুম। কমলা ভয়ার্ত স্বরে বল্লে, "কি অসুখ ভাই?"

"এই সামান্য জ্বর।"

"ডাক্তার দেখাচ্ছো?"

"না। দেখাবো।"

"না ভাই দেরি করো না একটুও। ভালো ডাক্তার দেখাও। যে দিনকাল পড়েছে!—ফেলে রাখা একটুও উচিত নয়।"

ও চলে গেল। ওর গলার স্বর ঈষৎ কম্পিত হোল—আমি বেশ বুঝতে পারলুম। আমি স্ত্রীকে বললুম, "এ মিথ্যে বলে কি লাভ?"

"তুমি থামো দিকি।" সুতরাং আমি নীরব হই আর স্ত্রী বলে চলে, "পঞ্চাশ দিন বলছি বাড়ি বদল কর, বাড়ি বদল কর। সে কথা যদি গ্রাহ্য হয়।"

তার পরের দিন দুপুর বেলা কমলা নাকি এসেছিল শানিকে দেখতে। শানির

অসুখের খবর পেয়ে সে চুপ করে থাকতে পারেনি। সারাদিন সে খুকীকে কোলে করে ছিল, আমার স্ত্রীর সমস্ত বিপরীত চেষ্টা ব্যর্থ করে। আমি আসবার ঘণ্টা তিনেক আগে এখান থেকে চলে গেছে। আমি অফিস থেকে ফিরে বিজুকে আর শানিকে ঐ অবস্থায় দেখলুম। বিজু বল্লে, "কি ছাই বেদানা খাইয়ে গেল। তারপর থেকে বাছা আমার কিছু মুখে করছে না।"

আমি বিজুর পানে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। সে আমার হাত দু'খানা চেপে ধরে করুণ সুরে বল্লে, "তুমি আজই বাড়ি বদল কর। নয় আমায় বাপের বাড়ি রেখে এসো। ও রাক্ষুসী আবার কালই আসবে বলে গেছে।"

আমার কানের মধ্যে সে যেন গরম সীসে ঢেলে দিলে, ঘরের মধ্যে আর কোন শব্দ নেই। সব কিছু নিথর নিস্তব্ধ। আমি বিচার করতে বসলুম। শানির অসুখের জন্যে বাস্তবিক দায়ী কে? কমলা না আমার স্ত্রী? মিথ্যা একজনের বুকে আঘাত করলে, বিধাতার বিচারালয়ে তার কি কোন শাস্তি নাই? বিধির বিধান কি নিরর্থক শব্দসমষ্টি মাত্র? এমন সময়ে অন্ধকারে নীড় হারিয়ে একটা কাক কা-কা-কা রবে ডেকে উঠলো। আমি শানির গায়ে কপালে হাত বুলাতে লাগলুম। আমার বেশ মনে পড়লো ক'দিন ধরে শানির অনবরত টক লেবু খাওয়ার কথা। শানির রোগের কারণ দিনের আলোর প্রকাশিত হোল। ঐ কচি মেয়ে অত অ্যাসিড সহ্য করতে পারে? ঠিক সেই মুহূর্তে ছাদের ওপর একটি বিড়াল করুণ সুরে বিলাপ করতে লাগলো। সম্প্রতি তার একটি সন্তান মারা গেছে। আমার স্ত্রী চমকে উঠে আমায় অনুরোধ করলে, "আগে বেড়ালটাকে দূর করে এস—আগে ওকে দূর করে দাও।"

আমি তার অনুরোধ শুনলাম না। বিজু কাঁদলো ফুলে ফুলে, "তবে আমায় দূর করে দাও। আমি পথের ধুলো—আমি কেউ নয়—আমায় গ্রাহ্য হয় না একটুও!"

একটু সুস্থ হয়ে শানিকে ডাক্তারবাড়ি নিয়ে গেলুম। ডাক্তার এক ডোজ ওষুধ দিলে। সেটা খাইয়ে দিলুম যথাসময়ে। বিজু সারারাত্রি মেয়েকে বুকে করে নিয়ে রইলো, আর আমার অবিশ্বাস দেখে দুঃখ প্রকাশ করলে, "বললুম, পীরের কাছ থেকে জলপড়া নিয়ে এস। তা হোল না। ডাক্তার-বদ্যি কি এসব সারাতে পারে?"

কিন্তু বিজুর কথাই মিথ্যা হোল। ডাক্তার আশ্চর্য রকমে শানিকে নিরাময় করলে। সকাল বেলা শানি আবার তার সহজ সরল পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরে পেল। আবার সে খেতে লাগলো, হাসতে লাগলো। অফিস যাবার সময় বিজুকে বললুম, "ডাইনীর হাত থেকে যখন শানি রেহাই পেলে তখন কমলাকে ক্ষমা করো।"

বিজুর যেন অসহ্য হোল আমার কথা, বললে, "মাইরি বলছি, তুমি আমায় পাগল করে দেবে। কালকের মধ্যে যদি না বাড়ি বদলাও, ত'হলে সত্যি সত্যি আমি বাপের বাড়ি চলে যাবো।"

অগত্যা সেই শনিবার দিনই রাত্রে বাড়ি ঠিক করে ফিরলুম। পরের দিন জিনিসপত্র নিয়ে উঠে গেলুম নতুন বাসায়। পরের জন্যে—স্ত্রীর সংগে ঝগড়া করে সংসারের শান্তি নষ্ট করতে আমি নারাজ।

বিধু মাস্টার

বিধু মাস্টারের কথা আমি কখনও ভুলতে পারব না। তাঁর স্মৃতি হয়তো আজীবন আমায় বহন করে বেড়াতে হবে। মাত্র ক'টা মাস তিনি আমার কাছে এসেছিলেন, তারপর চলে গেলেন—শুধু এই ক্ষণিকের পরিচয় আজ অমর হয়ে রয়েছে।

বেশ মনে আছে, সে দিনটা ছিল রবিবার। আমি সকালবেলা কৌমুদী খুলে ধাতুরূপ মুখস্থ করছি চোখ বন্ধ করে দুলে দুলে, এমন সময় বাইরে কে যেন ডাকলেন, হারাণবাবু আছেন? হারাণবাবু!

আমি জানলা দিয়ে মুখ বার ক'রে প্রশ্ন করলুম, কাকে চাই?

—এখানে হারাণবাবু বলে কি কেউ থাকেন?

—থাকেন। তিনি আমার কাকা।

—তাঁকে একবার ডেকে দাও তো।

—কি দরকার?

—তাঁর কি একজন টিউটর চাই?

সত্যিই তো মেজকাকা আমাদের জন্য একজন টিউটর চাই ব'লে খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। কথাটা আমি একেবারে ভুলেই গেছলুম। বললুম, আপনি বুঝি সেই বিজ্ঞাপন দেখেই আসছেন?

—হ্যাঁ।

—তা ভেতরে এসে বসুন। আমি মেজকাকাকে ডেকে দিচ্ছি।

ছিপ্‌ছিপে, লম্বা, কালোপানা লোকটা অত্যন্ত দ্বিধায়, অতি সন্তর্পণে আমাদের বৈঠকখানায় প্রবেশ করলেন। আমি বললুম, বসুন আপনি।

তিনি ভয়ে ভয়ে যেন একবার আমার দিকে তাকিয়ে একখানা পাশের বেঞ্চে বসলেন। আনাড়ী লোকটাকে দেখে আমার মাস্টারের প্রতি সকল শ্রদ্ধা তিরোহিত হল। বললুম, ঐ চেয়ারটায় বসুন না।

তিনি প্রথমে বললেন, থাক্ থাক্। তারপর একখানা চেয়ারে গিয়ে বসলেন। আমি ফ্যানটা খুলে দিয়ে আস্তে আস্তে ওপরে চলে গেলুম মেজকাকাকে ডেকে দিতে। মেজ-কাকা উঠে এলেন, আমিও এলুম তাঁর পিছু পিছু আর এল ঝণ্টু, মিণ্টু, চাঁদু ও রেবা। মেজকাকা বৈঠকখানায় ঢুকতেই তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে হাত জোড় করে তাঁকে নমস্কার করলেন। মেজকাকা বললেন, আপনি তো আজ সকালের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে আসছেন?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

মেজকাকা আবার বলতে আরম্ভ করলেন, এই পাঁচটি ছেলে-মেয়েকে পড়াতে হবে। রাতে তিন ঘণ্টা। মাইনে তো লিখেই দিয়েছি সাত টাকা। কামাই চলবে না।

তিনি বললেন, না, কামাই করবোই বা কেন?

মেজকাকা বললেন, তা আপনি থাকেন কোথায়?

—শ্রীনাথ দাস লেনে।

—আপনার নাম?

—শ্রী বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

—কদ্দুর লেখাপড়া আছে?

—ম্যাট্রিক পাস।

কথাটা শুনে মেজকাকা ঠোঁট কামড়াতে লাগলেন, টেবিলের ওপর বারকয়েক ডান হাত দিয়ে আঘাত করলেন। তারপর বললেন, আপনি ফোর্থ ক্লাসের ছেলেকে পড়াতে পারবেন তো?

ফোর্থ ক্লাসে পড়ি কেবল আমি। এদের দলের মধ্যে বয়সে সব চেয়ে বড়। আমার বুক গর্বে ফুলে উঠল। আমি বিধু মাস্টারের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম। তিনি বললেন, তা পারব না কেন?

মেজকাকা বললেন, বেশ ভাল। সোমবার থেকে কাজে লাগবেন। সন্ধ্যা ছ'টার সময় ঠিক মত আসবেন। তারপর আমাদের বললেন, ইনি তোদের নতুন মাস্টার, এনার কাছে মন দিয়ে পড়বি! বুঝলি?

তারপর সোমবার দিন তিনি এলেন ঠিক ছ'টার সময়ে। আমাদের সকলের নাম জিজ্ঞেস করলেন—আমাদের বইগুলো উল্টে পাল্টে দেখলেন—বেশীক্ষণ দেখলেন আমার ইংরিজি বইখানা। বললেন, বেশ শক্ত বই পড়ানো হয় তো।

তাঁর কথা শুনে আমার কি আনন্দই না হল! আমি বললুম, আমাদের আবার ইংরিজি ফিজিকস্, কেমিস্ট্রি পড়ান হয়!

তিনি অবাক হয়ে গেলেন, বললেন, তাই নাকি?

অমি তাঁকে আমাদের সায়েন্স বইখানা এনে দেখালুম। তিনি বললেন, কি পড়া হয়েছে?

—প্রপারটিস্ অব্ এয়ার আর ব্যারোমিটার।

আমার কথাগুলো শুনে তিনি বেশ চম্‌কে গেলেন আর আমি খুব কৌতুক বোধ করলুম।

তিনি তখন রেবাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি খুকি?

রেবা লজ্জায় মুখ নীচু করে রইল। নতুন লোক দেখলে ওর ঐ রকম লজ্জা। আমি বললুম্, বল্, না রে কি নাম?

তিনি তখন রেবার পশমের মত কোমল চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। রেবাও অনেক কষ্টে বলল, লেবা।

ও 'র' উচ্চারণ করতে পারে না। তিনি বললেন, বা! বেশ নাম তো তোমার, খাসা নাম তো তোমার।

কিন্তু দিন যত বয়ে গেল রেবার লজ্জাও তত কমে যেতে লাগল আর বিধু মাস্টারও রেবাকে বেশী ভালবাসতে লাগলেন। শুধু রেবাকেই না, তিনি আমাদের সবাইকে খুব ভালবাসতেন। তিনি পড়াতে আসবার পর প্রায়ই একজন ফেরিওয়ালা সুর করে হেঁকে যেত চাই অবাকজলপান, স্বাধীন ভাজা, ঘুঘনিদানা।

মাস্টার মশাইও আমাদের প্রায় ঐ কিনে খাওয়াতেন। নতুন মাইনে পেয়ে তিনি আমাদের সবাইকে বার আনার কুল্পী বরফ খাইয়েছিলেন। সবাই তাই মাস্টারকে খুব ভালবাসতো। তাঁকে আদৌ দেখতে প্যারতুম না কেবল আমি। কেন তা জানি না। তথাপি আমার অনিচ্ছায় তাঁর অধীনে থাকতে হোত, কারণ মেজকাকার হুকুম। মেজকাকাকে আবার সবার চেয়ে ভয় করি, মায় বাবার চেয়েও। সুতরাং আমি খুঁজতে লাগলুম-মাস্টারের ভুল-ত্রুটি, যাতে আমি তাঁর হাত থেকে রেহাই পাই। একদিন আমি জিজ্ঞেস করলুম, মাস্টার মশাই, পাহাড়ের হাইট মাপতে গেলে ব্যারোমিটার কি দরকার লাগে?

তিনি বললেন, দরকার লাগে নাকি? কে বলল?

—স্কুলের মাস্টার।

—তা হবে। কোথায় লেখা আছে বল তো?

—সায়েন্সের বইতে।

—দেখি সায়েন্সের বই।

আমি তাঁর হাতে বইখানা তুলে দিয়ে বললুম কিছুই বুঝতে পারিনি মাস্টার মশাই।

তিনি বইয়ের পাতা খুলতে খুলতে বললেন, বেশ, বুঝিয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু আমায় বোঝান দূরের কথা নিজেই হয়তো সেই ইংরিজি অংশটার সঠিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন না। অগত্যা অনেকক্ষণ পরে তর্জমা করে দিলেন। তার-

পর জিজ্ঞেস করলেন, বুঝতে পেরেছো?

আমি বললুম, কিছুই না।

তিনি বললেন, আমি তোমার বইখানা বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি, একবার পড়ে ভাল করে বুঝিয়ে দেবো।

বইখানা নিয়ে গেলেন সত্যি, সেটা আমায় ফিরিয়েও দিলেন যথাসময়ে; কিন্তু আমার প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারলেন না। কথাটা কাকাকে বলতে তিনি বললেন, আচ্ছা, কেমন পড়ায় তা আমি দেখছি।

পরের দিন থেকে তিনি আমাদের কাছে বসে পড়া শুনতে লাগলেন। মাস্টার মশাইয়ের পড়ানোর তিনি প্রায়ই ভুল ধরতেন। হয়তো বলতেন, লুসি গ্রের শেষের স্ট্যাঞ্জা দুটো আরও বিশদভাবে বুঝিয়ে দিন। ঐ যে ওর।

O'er rough and smooth she trips along
And never looks behind ;
And sings a solitary song
That whistles in the wind.

ওর ভাবার্থটাও ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। বুঝেছেন কি না?

এ সব ক্ষেত্রে মাস্টার মশাই কোন কথা বলতেন না বড় একটা। কাকাকে তিনি বেশ সমীহ করে চলতেন।

তিনি বড় একটা বুদ্ধির অঙ্ক কষতে পারতেন না। একদিন কাকার সামনে তিনি একটা অঙ্ক এক্স দিয়ে কষ্‌ছিলেন। কাকা বললেন, সব গোলমাল হয়ে গেল মাস্টার মশাই।

তিনি বললেন, কেন?

কাকা বললেন, ও অঙ্ক তো আলজেব্রার প্রসেস্ অনুযায়ী আপনি করতে পারবেন না।

যাই হোক, তিনি কিন্তু কোন উপায়েই আমায় অঙ্কটা বুঝিয়ে দিতে পারলেন না। তিনি চলে যাবার পর কাকা বললেন, মাস্টার তত সুবিধের নয়।

এমন সময়ে বিশ্বকর্মা পূজা এল। আমরা বললুম, মাস্টার মশাই, আমাদের ঘুড়ি-লাটাই কিনে দিতে হবে।

তিনিও রাজী হলেন কারণ তিনি সম্প্রতি মাইনে পেয়েছিলেন। তিনি আমাদের সেণ্ট জেমস্ স্কোয়ারের দক্ষিণ কোণের একটা মনোহারী দোকান থেকে এক টাকার প্রায় ঘুড়ি লাটাই কিনে দিলেন। কিন্তু আমাদের তিনি যা কিনে দিতেন সে সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলা নিষেধ ছিল। এসব লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের দিতেন। রেবার জন্মদিনে তিনি তিন টাকা দামের একটা কলের রেলগাড়ি কিনে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, কাউকে বোলো না যেন ঘুণাক্ষরে।

বিশ্বকর্মা পূজার দিন চারেক পর একদিন শ্রীনাথদাস লেনে মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে দেখা। আমি নমস্কার করলুম। তিনি বললেন, এই যে, পিণ্টু যে। কোথায় চলেছো?

আমি বললুম, আপনি কোথায় থাকেন মাস্টার মশাই?

তিনি বললেন, এইখানেই।

—চলুন না দেখে আসি।

কি জানি কেন মাস্টার মশাইয়ের বাড়ি দেখবার জন্যে আমি অত্যন্ত উতলা হলুম। তিনি দ্বিধায় আমায় নিয়ে গেলেন তাঁর অপূর্ব গৃহে। টিনের চাল দেওয়া একখানা

মেটে বাড়ির দোতলায় একখানা ছোট্ট ঘরে থাকেন। সরু ভাঙ্গা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে ভয় করে। ফালি বারান্দাটা মানুষের ভারে সামান্য কাঁপে। আস্তে আস্তে তাঁর পিছু পিছু তাঁর ঘরের দিকে গেলুম। তিনি গিয়ে তাঁর ঘরের তালা খুললেন। অপরিষ্কার ও অপরিসর ঘর। দেওয়ালে কতকগুলো ক্যালেন্ডার টাঙানো। একপাশে একখানা বিবেকানন্দের ছবি। মেঝের ওপর একটা খাটিয়া পাতা, তার ওপর আবার একটা কালো ও তেল চিট্‌চিটে বালিস। মাস্টার মশাই আমায় বসিয়ে 'আসছি' বলে কোথায় চলে গেলেন সহসা। আর আমি তাঁর ঘরখানা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলুম। বড় দুঃখ হ'ল তাঁর দরিদ্রক্লিষ্ট অবস্থা দেখে। ঘরের মধ্যে আর একখানা কাপড়ও নেই। যদিও বা একখানা আছে তাও শতচ্ছিন্ন এবং অত্যন্ত কালো। একটি জামা ও একখানি মাত্র কাপড়ে তাঁকে দিন কাটাতে হয়। আমার বড় অনুকম্পা জাগল তাঁর প্রতি। তাঁকে যে আমি এত ঘৃণা করতুম তা একেবারে বিস্মৃত হলুম। হঠাৎ যেন আমি একেবারে বদলে গেলুম।

এমন সময়ে মাস্টার মশাই এক ঠোঙা খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। আমি ব্যথিত সুরে বললুম, ও সব আবার কেন মাস্টার মশাই?

তিনি আমার কথা শুনে একটু যেন আশ্চর্যান্বিত হলেন। আমতা আমতা করতে লাগলেন, না-না, এ আর এমন কি?

আমি বুঝলুম যে তাঁর শ্রমের পারিশ্রমিকটা এমন করে অপচয় করা তাঁর শরীরের বিন্দু বিন্দু রক্ত গ্রহণ করার সামিল। আমি তীব্র প্রতিবাদ করলুম, না, এ কখনই হবে না।

আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখে তাঁর মুখের চির প্রফুল্ল হাসি অকস্মাৎ যেন মিলিয়ে গেল। তিনি মুখ চুন করে বললেন, এ কি বলছো পিণ্টু?

আর সাহস হোল না কিছু বলতে। যাই হোক, বাড়ি ফেরার পথে সেদিনই আমি প্রতিজ্ঞা করলুম যে মাস্টার মশাই যাতে আমাদের জন্যে তাঁর মাইনে থেকে কিছু খরচ না করেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। হাজার হোক বেচারা ঐ ক'টি টাকা সম্বল ক'রে কলকাতায় বাস করছেন।

কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা মত কাজ করবার আগেই একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেল। মেজকাকা একদিন আমার ট্র্যানস্লেশনের খাতাখানা দেখতে দেখতে মাস্টার মশাইকে বললেন, এ সব কি পড়াচ্ছেন মাস্টার মশাই! ইংরিজি আপনি দেখছি কিছুই জানেন না। I live in a boarding সেন্‌টেন্‌সটার মধ্যে 'in' কি এমন অপরাধ করেছে যে ওকে তুলে আপনি 'at' বসিয়ে দিলেন! আসলে ওর ভুল কোথায় তা তো দেখতে পেলেন না। আর Every bush and every tree was in bud সেন্‌টেন্‌সটার 'was' কেটে 'were' করলেন কোন্ Grammar অনুযায়ী? আপনি ফোর্থ ক্লাসের ছেলে পড়াবেন কেমন করে?

মাস্টার লজ্জায় মুখ নীচু করে রইলেন। আর আমি? আমি ভাবতে লাগলুম ভাবী বিপদের কথা। মেজকাকা বললেন, তাই বলি ছেলেরা এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেন। পিণ্টু তোর হাফ্‌ইয়ার্লির প্রোগ্রেস রিপোর্টটা নিয়ে আয় তো।

আমি ভয়ে ভয়ে আমার প্রোগ্রেস রিপোর্ট নিয়ে এলুম। মেজকাকা বললেন, দেখুন, কি বিশ্রী রেজাল্ট। ইংরেজীতে তো ফেল। আর সবে রগ ঘেঁসিয়ে পাস করেছে। এর পর আর আপনাকে রাখতে আমি সাহস করি না। তা হলে ওদের পায়ে কুড়ুল মারা হয়। আমরা অন্য মাস্টার দেখবো। আপনার বাকী মাইনেটা দু' তারিখে নিয়ে যাবেন।

মেজকাকার কথায় মাস্টার মশাই একটি প্রতিবাদ পর্যন্ত করলেন না, নীরবে নিঃশব্দ

পদক্ষেপে প্রস্থান করলেন। আমি তাঁর মুখের দিকে তাকাতে পারলুম না। এর জন্যে দোষী তো আমি। আমি তো মাস্টার মশায়ের ভুলগুলো মেজকাকাকে বলে বলে তাঁর মন একেবারে চটিয়ে রেখেছিলুম।

আমি অপরাধীর মত বসে রইলুম মুখ নীচু করে।

উন্নতি

গোকুলের অবস্থা যে কত শোচনীয়,—তা গ্রামের কেউ জানত না। বুদ্ধিমতী গোকুলের মা নিজেদের দারিদ্র্য লোকচক্ষু থেকে যথাসাধ্য লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করতো। কিন্তু এবার শীতকালের দিকে অবস্থা এমনি দাঁড়ালো—যে আর কোন রকমে ঢেকে রাখা চলে না। গোকুলের মা একদিন সন্ধ্যাবেলা ছেলেকে বল্লে, সত্যি গোকুল, তুই বসে বসে আর কতদিন সংসারটা মাটি করবি? একটা কিছু দ্যাখ একবার।

গোকুল পৈতৃক কোঠাবাড়ির ভাঙা রোয়াকের একপাশে বসে সান্ধ্য চা-পানে নিযুক্ত। অর্থাৎ, চটা-ওঠা একটা কলাই-করা বাটিতে সে একপ্রকার ফিকে কটা রংয়ের বিস্বাদ তরল পদার্থ সেবন করছিল—তাতে দুধের ছিটে-ফোঁটা থাকলেও চিনির বালাই ছিল না। পুরোনো খেজুর-গুড় সংযোগেই গোকুলের প্রাত্যহিক চা-পান নিষ্পন্ন হয়—আজ ওর মা গুড় দিতে নারাজ,—ও চাইতে গিয়ে বিমুখ হয়ে এসেছে। মায়ের কথার মধ্যে যুক্তির অভাব ছিল না। বাড়িতে ঠাকুরপুজো আছে, দশমী-দ্বাদশী আছে, এক ভাঁড় খেজুরগুড় এসে সিকি ভাঁড়ে ঠেকেচে—নতুন বছরে এখনও গুড় কেনা হয়নি বা কেনবার পয়সাও নেই—ওইটুকু ফুরিয়ে গেলে তখন চলবে কিসে?

এই গুড়ের ব্যাপার নিয়ে মায়ে-ছেলের বচসা চললো সারা সন্ধ্যাবেলা।

গোকুল বিয়ে-থাওয়া করেনি, বয়স এই মোটে পঁচিশ বছর, বাপ মারা যাওয়ার পরে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে আজ আট-দশ বছর বাড়ি বসে আছে—গরীব বামুনের সহায়-সম্পত্তিহীন ছেলে, কে চাকরি করে দেবে? লেখাপড়ারও তেমন কিছু জোর নেই। সংসার অবিশ্যি খুব বড় নয়, সে আর তার মা। গোকুলের বাবা বেঁচে থাকতেই মেয়েটির বিবাহ দিয়ে গিয়েছিলেন বারো বছর বয়সে, তাই রক্ষে—নইলে এ বাজারে আর ভগ্নীর বিবাহ দেওয়া গোকুলের সাধ্যে কুলিয়ে উঠতো না।

গোকুলের মা বল্লে, আমার বুদ্ধি শোন্ গোকুল, চল আমরা কলকাতায় যাই। সেখানে কত লোক কত কি করচে, সেখানে গেলে তোর একটা হিল্লে হয়ে যাবেই। আমিও তোকে ফেলে থাকতে তো পারবো না। আমিও সঙ্গে যাই। বড় আমবাগানটা বিক্রি করে ফেলি।

এ প্রস্তাব মা আরও কয়েকবার করেচে, কিন্তু গোকুলের গাঁ ছেড়ে কোথাও যেতে মন সরে না। কলকাতা শহরকে সে মনে মনে ভয় করে। অত বড় শহরে তো তার জন্যে চাকরি নিয়ে লোকে বসে আছে! মার যেমন কথা।

আজ কিন্তু মার কথায় তার মনটা উৎসাহিত হয়ে উঠলো। ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখলে হয় একবার। এখানেও তো মাঝে মাঝে অনাহার শুরু হয়েচে আজকাল, সেখানে তার চেয়ে আর কি বেশী কষ্ট হবে? কলকাতায় পয়সা রোজগারের অনেক রকম উপায় আছে সেও শুনেচে বটে।

সারারাত ধরে মা ও ছেলে পরামর্শ করলে। বড় বাগান বিক্রী করলে এখন দর হবে না. বন্ধক রেখে সেই টাকা থেকে প্রথম মাস কয়েক শহরের খরচ চলবে। এখানকার বাড়িতে কিছুদিন তালা বন্ধ থাকুক।

অবশেষে কলকাতায় যাওয়াই ধার্য হোল। যদুহরি কুণ্ডু স্থানীয় বাজারের বড়

কাপড়ের মহাজন—বাগানখানা পঞ্চাশটি মাত্র টাকায় তার কাছে বন্ধক রাখা হ'ল এবং নির্দিষ্ট দিনে মায়ে-ছেলেয় কলকাতায় রওনা হোল। চিৎপুর শোভাবাজারে শঙ্কর মিত্রের লেনে ওদের গ্রামের এক নাপিত থাকতো। বাক্স হাতে ঝুলিয়ে জাত-ব্যবসা করে সে ত্রিশ-চল্লিশ টাকা রোজগার করতো মাসে। গোকুল খুঁজে খুঁজে তার বাসা বার করলে। একখানা ছোট খোলার ঘর—তাতে সে একা থাকে, নিকটবর্তী হোটেলে এক-বেলা ডাল-ভাত খায়, একবেলা মুড়ি খেয়ে কাটায়, এই তার অবস্থা। গ্রামের ব্রাহ্মণ-কন্যা তার খোলার ঘরে অতিথি, বঙ্কু পরামাণিক শশব্যস্ত হয়ে উঠলো। রান্নার হাঁড়িকুড়ি কিনে নিয়ে এল, আর নিয়ে এল চাল ডাল তরকারি। খোলার ঘরে একখানা ছোট্ট পরচালার নীচে আপাততঃ রান্নার ব্যবস্থা করা হোল।

বঙ্কু বল্লে—মা ঠাকরুণ, রোজ রোজ মরি উড়ে বামুনের রান্না খেয়ে, আজ আমার সৌভাগ্যি যে আপনারা এয়েচেন, মা-ঠাকরুণের হাতের দুটি প্রসাদ খেয়ে বাঁচবো আজ।

গোকুল তার মা বঙ্কু পরামাণিকের সেই খোলার বাসার পাশেই আর একখানা ছোট খোলার ঘর নিলে। মাসে মাত্র তিনটি টাকা ভাড়া।

গোকুলের মা এখানে এসে অকুল সমুদ্রে পড়ে গিয়েছে—একমাত্র ভরসা বঙ্কু পরামাণিক, যে কলকাতার রাস্তাঘাট চেনে—সে যদি কিছু কিনারা করতে পারে এর।

প্রতিদিন দুপুরে আর সন্ধ্যাবেলা নিকটেই কোথা থেকে শাঁখ, ঘণ্টা, কাঁসরের আওয়াজ আসে। একদিন গোকুলের মা জিগ্যেস করলে—হ্যাঁ বঙ্কু, এখানে কি কোথাও ঠাকুরবাড়ি আছে নাকি? বঙ্কু বল্লে,—হ্যাঁ মা-ঠাকরুণ, পাশেই মিত্তিরবাড়ি, ওরা মস্ত বড়লোক। ওদেরই তো ঠাকুরবাড়ি রয়েছে বাড়িতেই। এই রাসের সময় খুব ধুমধাম হবে—আপনি যাবেন না দেখতে? সবাই যাবে? খুব ভাল বন্দোবস্ত।

রাসের দিন পাড়ার আরও পাঁচজন মেয়ের সঙ্গে গোকুলের মা মিত্তিরবাড়ি ঠাকুর দেখতে গেল। প্রকাণ্ড শ্বেতপাথরের বাঁধানো মেঝের উপর ঝক্‌ঝকে রুপোর বাসনে ভোগ, রুপোর ঘণ্টা, কড়িকাঠ থেকে বড় বড় কাঁচের পরকলাওয়ালা ঝাড়ে ইলেকট্রিক আলো জ্বলচে, ধূপ-ধুনোর গন্ধ বেরিয়ে ঘর আমোদ করচে, আর নানা রকম ফুলের কি চমৎকার গন্ধ।

গোকুলের মা এমন ঠাকুরবাড়ি, এমন জাঁকজমক কখনো দেখে নি জীবনে, বাড়ির কর্ত্রীঠাকরুণ ঠাকুরের এক পাশে বসেছিলেন, লোকে চিনিয়ে দিলে। আশী বছর হয়েচে, এখনও কি ধপ্‌ধপে গায়ের রং।

আরতি ও কীর্তনাদি শেষ হয়ে যাওয়ার পরে প্রসাদ বিতরণ ও ব্রাহ্মণ-ভোজন। গোকুলের মা বড় থালার এক থালা খাবার নিয়ে বাড়ি এল। মা ও ছেলে দুজনেই খুব খুশি, এসব খাবার ফলমূল কখনো পাড়াগাঁয়ে ওরা চোখেও দেখেনি।

গোকুলের মা আরও দু'চারদিন ঠাকুরবাড়ি সন্ধ্যাবেলা কীর্তন শুনতে গেল।

একদিন গিন্নীমা ওকে লক্ষ্য করলেন। নূতন মুখ, একে তো আগে কখনো দেখেন নি ঠাকুরবাড়িতে।

কাছে ডেকে বল্লেন—তোমার বাড়ি কোথায় গা? এসো তোমার সঙ্গে আলাপ করি। গোকুলের মা সম্ভ্রমে, সঙ্কোচে একেবারে জড়সড় হয়ে গেল। মুখ দিয়ে ভাল কথা বেরোয় না, এত বড় বাড়ির কর্ত্রী নিজে যেচে তার সঙ্গে আলাপ করতে চাইচেন। ও সব পরিচয় দিলে। দেশে দুঃখকষ্টে পড়ে এখানে এসেচে, কাছেই খোলার বাড়িতে থাকে। ছেলেটি চাকরি-বাকরির চেষ্টা করচে। কেই বা চাকরি দেবে, এখানে ও কাউকেই চেনে না।

গিন্নীমা ওর সঙ্গে অনেক কথাবার্তা কইলেন, লোকটি বড় ভালো! বল্লেন—আমাদের ঠাকুরবাড়িতে রাত্তিরের ভোগ ব্রাহ্মণ-বাড়ি দেওয়ার নিয়ম আছে। তুমি বাছা

রোজ এসে আরতির পর ভোগ নিয়ে যেও, আমার বলা রইল। কত রবাহূত, অনাহূত লোক এসে খেয়ে যায়। তুমি আর তোমার ছেলে খেলে আমি খুশি হবো।

সেদিন থেকে গোকুলের মায়ের কপালে যা ঘটতে লাগলো—সে স্বপ্নেও তেমন সৌভাগ্য কখনো কল্পনা করে নি।

মস্ত বড় এক থালা-ভর্তি লুচি, তরকারি, মিষ্টি, ফলমূল—গোকুলের মায়ের বাড়ি নিয়ে যাওয়াই কষ্ট। কে কত খায়? বঙ্কু নাপিত পর্যন্ত লুচি খেয়ে আর পারে না। রোজ রাত্রে লুচি। রোজ রাত্রে একরাশ ফলমূল, বাদাম পেস্তা ছানা মিষ্টি। বড় লোকের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের নৈশ ভোগের যা কিছু উপকরণ সকল ওদের বাড়িতে।

মাঘ মাসের দিকে ঠাকুরবাড়ির পুরাতন টহলদার মারা গেল। গিন্নীমা গোকুলের মাকে সে-কাজে নিযুক্ত করলেন। মাইনে পাবে সাত টাকা, দু'বেলা ভোগের প্রসাদ পাবে! সকালের ভোগটা খুব জমকালো, উপকরণও বেশী—কিন্তু চারজন ব্রাহ্মণের মধ্যে সে ভোগটা বিলি করে দেওয়ার প্রথা অনেকদিন থেকে প্রচলিত, গোকুলের মায়ের সুপারিশে গোকুল সেই চারজন নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের অন্যতম হয়ে দাঁড়ালো।

এছাড়া পূজাপার্বণে, বড় বড় উৎসব উপলক্ষে কাপড়-চোপড়ও পাওয়া যায়—ভোজন দক্ষিণা প্রণামী থেকে ওঠে! গিন্নীমা গোকুলের মাকে বড় অনুকম্পার চোখে দেখতে আরম্ভ করেচেন, এতে অন্যান্য ঝি-চাকরের চোখ টাটায়।

একদিন গিন্নীমা বল্লেন—হ্যাঁ বাছা, তোমার ছেলে লেখাপড়া জানে কতদূর? গোকুলের মা ভাল জবাব দিতে পারলে না। লেখাপড়া সম্বন্ধে তার খুব স্পষ্ট ধারণা নেই।

গিন্নীমা বল্লেন—ওকে নীচে ম্যানেজারের কাছে একদিন দেখা করতে বলো। যদি মুহুরীর কাজ-টাজ করতে পারে, তবে আমি আমার ছেলেকে বলে দোব এখন।

গিন্নীমার সুপারিশে গোকুল পনেরো টাকা মাইনের একটা চাকরি পেয়ে গেল। ওর বাংলা হাতের লেখা খুব ভাল, গ্রামে ওর হাতের লেখার খ্যাতি ছিল।

গোকুলের ইচ্ছা খোলার বাড়িটা বদলায়, মা ওর কিন্তু আপত্তি করলে, বল্লে—বাবা, এই খোলার বাড়িই লক্ষ্মী—এ ছেড়ে কোথাও যাবো না। এ থেকে আরও উন্নতি হবে দেখিস তুই।

হোলও তাই। গোকুল পরের বৎসরই বিল-সরকারের পদে উন্নীত হোল। একাজে উপরি রোজগার খুব, দেনাদারেরা কিছু কিছু ঘুষ দিয়ে নিজেদের বিলের ওয়াদা দেরিতে ফেরাতো। গোকুল মাসে ইচ্ছে করলে পঞ্চাশ টাকা অনায়াসে রোজগার করতে পারতো—কিন্তু ও স্টেটের মুখের দিকে চেয়ে কোথাও ঘুষ নিত না। ফলে ওর আমলে টাকা বেশী আদায় হতে লাগলো। ম্যানেজারের নজর পড়ল ওর দিকে।

সংসার সেরেস্তার নায়েবের পদ খালি হোল ইতিমধ্যে। বুড়ো নায়েব নালু মুখুয্যের চোখের অসুখ হওয়ার দরুণ সে পেনসনের দরখাস্ত করলে। এই পদে মাসে একশো-দেড়শো টাকা কমিশন পাওয়া যায়, বিভিন্ন মুদী, খাবারওয়ালা, দোকানদারের কাছে। ন্যায্য ভাবেই এটা পাওয়া যায়, এতে স্টেটের কোনো অনিষ্ট নেই। এ-কাজে একজন বিশ্বস্ত লোকেরই দরকার বটে।

ম্যানেজার একদিন ওকে ডেকে বল্লেন—গোকুল, সংসার সেরেস্তার নায়েবের কাজের জন্যে তুমি দরখাস্ত করেচ?

ও বল্লে, আজ্ঞে হাঁ বাবু।

ও দিয়েছিল কপাল ঠুকে একখানা দরখাস্ত করে। সেরেস্তার অনেকেই তো করেচে। ম্যানেজার বল্লেন—তুমি কি পারবে? বড্ড হুঁশিয়ারি কাজ, আর বড় খাটুনি।

গোকুল সাহস করে বল্লে—খাটুনির ভয় করিনে হুজুর। আর হুঁশিয়ারির কথা বলচেন, আপনি তো বিল আদায়ের কাজেও দেখেছেন আমায়।

—আচ্ছা তুমি পাঁচশো টাকার একটা হ্যান্ডনোট লিখে দাও স্টেটের নামে। ও কাজে পাঁচশো টাকা ডিপজিট দিতে হবে তোমায়। তোমার মাইনে থেকে আমরা মাসে মাসে দশ টাকা কেটে নেবো হ্যান্ডনোটের দেনার দরুণ। তোমাকে আমি ও পোস্ট দিলাম। মন দিয়ে কাজ করো।

গোকুল চোখে ঝাপ্সা দেখলে। ব্যাপার কি? সে স্বপ্ন দেখচে না তো? পঁচিশ টাকা মাইনের বিল সরকারী থেকে সে ষাট টাকা মাইনের সংসার সেরেস্তার নায়েবের পদে ঠেলে উঠলো এই এক বছরের মধ্যে—যে পদের উপরি কমিশনের আয় গড়ে মাসে দেড়শো টাকার কম নয়।

কিন্তু সত্যিই তার পরদিন তাকে ডেকে ম্যানেজার একখানা পাঁচশো টাকার হ্যান্ড-নোট লিখিয়ে নিয়ে ওকে গিয়ে সংসার সেরেস্তার গদিতে বসতে আদেশ দিলেন।

সেদিন গোকুলের মা ঘটা করে সত্যনারায়ণের সিন্নি দিয়ে পাড়ার লোকদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালে। লোকজনের ভিড় কমে গেলে, কাছে রমানাথ মন্ডলের গলির বাঁড়ুয্যে বাড়ির বড় বৌ গোকুলের মাকে এক পাশে ডেকে বল্লেন—মা, তোমাকে একটা অনুরোধ রাখতে হবে। আমার মেয়ে রমাকে তো দেখেছ তুমি মিত্তিরবাড়িতে ঠাকুরঘরে? তাকে তোমায় নিতে হবে।

গোকুলের মা ভাবলে সে ভুল শুনচে। বাঁড়ুয্যেদের অবস্থা বেশ ভালই, মেয়েটিও সুন্দরী—কিছুদিন আগেও স্কুলের বাসে উঠে তাকে স্কুলে যেতে দেখা গিয়েছে দিব্যি পুতুলটির মতো সেজেগুজে। আজ বাঁড়ুয্যে-গিন্নী আপনা থেকে প্রস্তাব নিয়ে এসেচেন তার সঙ্গে গোকুলের বিয়ের?

সেই মোমের পুতুলের মত সুশ্রী মেয়েটিকে পুত্রবধূ করবার স্বপ্ন দেখতেও তো তার সাহস হয় না।

বাঁড়ুয্যে-গিন্নী খুব হাঁটাহাঁটি আরম্ভ করলেন। একদিন সামাজিক ভাবে মেয়ে দেখাও হোল। মেয়েকে পছন্দ না করবার কোন কারণই থাকতে পারে না। বিয়ের প্রায় সব ঠিকঠাক, বাঁড়ুয্যের বাড়ি থেকে মেয়েরা দল বেঁধে পাত্র দেখতে এল। পাত্র গোকুল বিয়ের ব্যাপারে মুখে ছিলু না বললেও মনে মনে খুশিই ছিল। মেয়েটি সত্যিই সুশ্রী, তার ওপর ভাল অবস্থাপন্ন ঘরের স্কুলে-পড়া মেয়ে—পাড়াগাঁয়ের গরিব ঘরের ছেলে গোকুলের পক্ষে স্বপ্নের অতীত ওখানে বিয়ে হওয়া।

গোকুল মাকে বললে, ঠিকুজিখানা তো মা এখানে নেই, বাড়ির বড় কাঁঠাল কাঠের সিন্দুকটাতে জমিজমার কাগজ-পত্তরের সঙ্গে এক বাণ্ডিলে বাঁধা আছে। আমি সেটা এই শনিবার গিয়ে রবিবার নিয়ে আসি। অনেক দিন দেশে যাওয়া হয়নি, অমনি বাড়িঘর দেখেও আসা হবে এখন।

শনিবার দুটোয় অফিস ছুটি হতেই গোকুল শেয়ালদহ স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরে বাড়ি রওনা হোল। এসেচে আজ তিন বছর দেশ থেকে, এর মধ্যে আর যাওয়ার অবকাশ ঘটেনি।

সন্ধ্যার কিছু আগে নিজের গাঁয়ে ঢুকতেই হাটতলার চারিদিক থেকে লোকে ওকে ছেঁকে ধরল। আজ শনিবার, গ্রামের হাট, সব লোক আজ সেখানে জড় হয়েচে, শেষা হাটে জিনিসপত্র সস্তা হয় বলে অনেকেই বেলা শেষ করে তবে হাটে আসে।

—আরে গোকুল না? বেঁচে আছিস? আমরা ভাবলাম—

—এতদিন কোথায় ছিলে গোকুল বাবাজি, তোমার মা কোথায়?

—এই যে গোকুল-দা, কোত্থেকে এ্যাদ্দিন পরে, সব ভালো তো?

নানা অধীর আগ্রহ-ভরা প্রশ্নোত্তরের আদান প্রদান। গোকুলের বেশভূষা দেখে সবাই বুঝলে ওর নিশ্চয় ভাল চাকরি হয়েচে কলকাতায়। সবাই এই তিন বছরের ইতিহাস শোনবার জন্যে ব্যস্ত।

লোকুল তাদের হাত এড়িয়ে পৈতৃক বাড়ির চাবি খুললে। ঘর-দোর বিশ্রী অপরিষ্কার হয়ে আছে। উঠানে বন-জঙ্গল গজিয়েচে। জানালা-দরজায় উই ধরেচে, কড়িকাঠে বাদুড় চামচিকের বাসা। পাশের বাড়ির ছোট ছেলেকে ডেকে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন চেয়ে আনলে ওদের বাড়ি থেকে। তক্তাপোশটা থেকে একরাশ চামচিকের নাদি সরিয়ে সেখানে সুটকেস্‌টা রাখলে নামিয়ে।

একটু পরে তিনকড়ি মুখুয্যের ছেলে প্রমোদ ডাকতে এলো। প্রমোদের বাড়ি যেতে গোকুলের যথেষ্ট সংকোচ বোধ হচ্ছিল। এরই বোন, বীণার সঙ্গে গোকুলের একবার বিয়ের প্রস্তাব হয়েছিল বছর তিনেক আগে, যে বছর ওরা কলকাতায় যায়, সে বছর। গোকুল বলেছিল চাকরি না পেয়ে সে বিয়ে করবে না।

বীণার বয়েস এখন হয়েচে ষোল-সতেরো। এখনো তার বিয়ে হয়নি, একথা গোকুল জানে। বীণাকে ছেলেবেলায় সে সঙ্গে করে নিয়ে কত বেড়িয়েচে, কুল পেড়ে দিয়েচে, কত শাসন করেচে, পাঠশালার পড়া বলে দিয়েচে। বাড়ি থেকে যাবার আগে বীণা প্রায়ই ওদের বাড়িতে আসতো-যেতো, ওর সঙ্গে গল্প করতো—কেবল বিয়ের প্রস্তাবের পরে তাকে আর বেশী দেখা যেতো না।

এতদিন পরে দেশে এসে বীণাদের বাড়ি যাওয়া একটা কর্তব্য বটে, বীণার সঙ্গে দেখা করাও উচিত। কিন্তু যদি বীণার মা পুরোনো প্রস্তাবটি আবার পাড়েন। এখন তো চাকরি করচে, এখন কোনো ওজর থাকবার কথা তো নয়।

অথচ বীণাকে বিয়ে করবারও ইচ্ছে নেই।

পাড়াগাঁয়ের মেয়ে না জানে লেখাপড়া, না জানে গান, না জানে ভালো করে কথা কইতে। অবস্থাও খারাপ ওর বাপের—

রমাকে দেখবার পর ওর মনে হয়েচে, এমন ধরনের মেয়েকে জীবন সঙ্গিনীরূপে লাভ করা একটা সৌভাগ্য। দেখবার মত মেয়ে; তার মায়েরও আন্তরিক ইচ্ছা তার বিয়ে হয় রমার সঙ্গে।

প্রমোদের মা যখন পরদিন সকালে কথাটা পাড়লেন, গোকুল তখন মায়ের কথাটাই বড় করে বললে। তার কোন হাত নেই। আচ্ছা, কলকাতায় গিয়ে মাকে জানাবে, পরে কি হয় পত্র লিখবে।

বীণা বোধ হয় তখন জানালা ধরে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছিল—ওর কথা শেষ হতেই চলে গেল—কেউ টের পায়নি, কখন যে এসেছিল পাশের ঘরে—কিন্তু গোকুলের চোখ এড়ালো না।

তারপর যখন ওদের বাড়ি থেকে বার হয়ে আসে, তখন বীণার সঙ্গে আবার দেখা হোল বাড়ির বাইরে গোয়ালের দরজায়। গরুর দড়ি হাতে বীণা ওদের ছোট্ট বাছুরটা পেয়ারা গাছের গুঁড়িতে বাঁধচে। পরনে আধময়লা শাড়ি, গাছাকতক কাঁচের চুড়ি হাতে; শ্যামবর্ণ মেয়ে, দেখতে এমন কিছু নয়; ওকে দেখে বীণা লজ্জায় চোখ তুলে যেন ভাল করে চাইতে পারলে না; কারণ তার আগেই বীণা শুনেচে মায়ের মুখে বিয়ের প্রস্তাবটা।

গোকুল দেখলে যখন দেখা হয়ে পড়লো তখন একটা কথাও না বলাটা ভাল দেখাবে না। বললে—বীণা, ভাল আছিস? ওঃ, বেশ লম্বা হয়ে পড়েচিস যে!

বীণা সলজ্জ মুখে বললে—ভাল আছি—তুমি ভাল আছ গোকুলদা?

—হ্যাঁ, মন্দ নয়।

—জ্যাঠাইমার শরীর ভাল আছে?

—মায়ের শরীর মন্দ না, তবে সেই বাতের ব্যথা মাঝে মাঝে—

বীণা আর কিছু না বলে গোয়ালের মধ্যে ঢুকে গেল।

বিকেলের ট্রেনে গোকুল কলকাতায় রওনা হোল। চমৎকার ছায়াচ্ছন্ন বিকালটা, গাড়ির জানালার ধারে বসে বাইরের দিকে চেয়ে কেবলই বীণার কথা ওর মনে আসচে দেখে ও আশ্চর্য হোল। আজ সকালে বীণার সেই দীনমূর্তি—পরণে আধময়লা শাড়ি, হাতে গাছাকতক কাঁচের চুড়ি.....

আরও দেখে আশ্চর্য হোল—ও ভাবচে, বীণার কোথায় বিয়ে হবে, কার ঘরে পড়বে অজ পাড়াগাঁয়ে—এই বয়সে, গোয়াল, গরু, ধানসেদ্ধ, ভাত রাঁধতেই জীবনটা কাটবে। যখন বাপের পয়সার জোর নেই, জীবনে কিছুই দেখবে না, শুনবে না।

তার চেয়ে যদি ওকে বিয়ে করে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া যায়—থিয়েটার, বায়োস্কোপ, লোকজন—মাঝে মাঝে দেতলা বাসে করে কালীঘাট কি দক্ষিণেশ্বর, যা কখনো বীণা দেখেনি—কি খুশিই হবে বীণা। জীবনে কখনো ওর হয়নি রমা কলকাতার মেয়ে, কত দেখেচে, কত শুনেচে। তাকে আর নতুন কি দেখাবে ও।

কিন্তু সহানুভূতি বা দুঃখ এক জিনিস আর তা থেকে কাজের প্রেরণা পাওয়া সম্পূর্ণ অন্য—বিশেষতঃ স্বার্থপর যৌবন চায় যা নাগালের বাইরে তাকে হাতে আঁকড়ে ধরতে, চায় তার রূপ, চায় উন্নতি, ছোট চায় বড়কে আয়ত্ত করার আত্মপ্রসাদ—

গোকুল বীণার চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালে।

কিন্নর দল

পাড়ায় ছ'সাত ঘর ব্রাহ্মণের বাস মোটে। সকলের অবস্থাই খারাপ। পরস্পরকে ঠকিয়ে, পরস্পরের কাছে ধার-ধোর করে এরা দিন গুজরান করে। অবিশ্যি কেউ কাউকে খুব ঠকাতে পারে না, কারণ সবাই বেশ হুঁশিয়ার। গরিব বলেই এরা বেশী কুচুটে ও হিংসুক, কেউ কারো ভাল দেখতে পারে না, বা কেউ কাউকে বিশ্বাসও করে না।

পূর্বেই বলেচি, সকলের অবস্থা খারাপ এবং খানিকটা তার দরুন, খানিকটা অন্য কারণে সকলের চেহারা খারাপ। কিশোরী মেয়েদেরও তেমন লালিত্য নেই মুখে, ছোট ছোট ছেলেরা এমন অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন থাকে এবং এমন পাকা পাকা কথা বলে যে তাদের আর শিশু বা বালক বলে মনে হয় না। কাব্যে বা উপন্যাসে যে শৈশবকালের কতই প্রশস্তি পাঠ করা যায়, মনে হয় সে সব এদের জন্যে নয়, এরা মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে একেবারে প্রবীণত্বে পা দিয়েছে।

পাড়ায় একঘর গৃহস্থ আছে, তারা এখানে থাকে না, তাদের কোঠাবাড়িটা চাবি দেওয়া পড়ে আছে আজ দশ-বারো বছর। এদের মস্তবড় সংসার ছিল, এখন প্রায় সবাই মরে হেজে গিয়ে প্রায় পাঁচটি প্রাণীতে দাঁড়িয়েছে। বাড়ির বড় ছেলে পশ্চিমে চাকরি করে, মেজ ছেলে কলেজে পড়ে কলকাতায়, ছোট ছেলেটি জন্মাবধি কালা ও বোবা—পিসিমার কাছে থেকে মূকবধির বিদ্যালয়ে পড়ে। বড় ছেলে বিবাহ করেনি, যদিও তার বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হয়েছে, সে নাকি বিবাহের বিরোধী, শোনা যাচ্ছে যে এমনি ভাবেই জীবন কাটাবে।

পাড়ার মধ্যে এরাই শিক্ষিত ও সচ্ছল অবস্থার মানুষ। সেজন্যে এদের কেউ ভাল চোখে দেখে না, মনে মনে সকলেই এদের হিংসে করে এবং বড় ছেলে যে বিয়ে করবে না

বলছে, সে সংবাদে পাড়ার সবাই পরম সন্তুষ্ট। যখন সবাই ছোট ও গরিব, তখন একঘর লোক কেন এত বাড় বাড়বে? বড় ছেলে বিয়ে করলেই ছেলেমেয়ে হয়ে জাজ্বল্যমান সংসার হবে দুদিন পরে, সে কেউ সহ্য করতে পারবে না। মেজ ছেলে মোটে কলেজে পড়ছে, এখন সাপ হয় কি ব্যাং হয় তার কিছু ঠিক নেই, তার বিষয়ে দুশ্চিন্তার এখনও কারণ ঘটেনি, তবে বয়েসও বেশী নয়।

মজুমদার-বাড়িতে ভাঙা রোয়াকে দুপুরে পাড়ার মেয়েদের মেয়ে-গজালি হল। তাতে রায়-গিন্নি, মুখুয্যে-গিন্নি, চক্কত্তি-গিন্নি প্রভৃতি তো থাকেনই, পাড়ার অল্প-বয়সী বৌয়েরা ও মেয়েরাও থাকে। সাধারণতঃ যে সব ধরনের চর্চা এ মজলিসে হয়ে থাকে, তা শুনলে নারীজাতি সম্বন্ধে লিখিত নানা সরল প্রশংসাপূর্ণ বর্ণনার সত্যতার সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ যাঁর উপস্থিত না হবে, তিনি নিঃসন্দেহে একজন খুব বড় ধরনের অপ্‌টিমিস্ট।

আজ দুপুরে যে বৈঠক বসেছে, তাতে আলোচিত বিষয়গুলি থেকে মোটামুটি প্রতিদিনের আলোচনা ও বিতর্কের প্রকৃতি অনুমান করা যেতে পারে।

বোস-গিন্নি বলছিলেন—আরে বাপু দিচ্ছি তো রোজই, আমার গাছের কাঁটাল খেয়েই তো মানুষ, আমাদের যখন কাঁটাল পাড়ানো হয়, ছেলেমেয়েগুলো হ্যাংলার মত তলায় দাঁড়িয়ে থাকে—ঘেয়ো কি ভুয়ো এক-আধখানা যদি থাকে তো বলি, যা নিয়ে যা। তোদের নেই, যা খেগে যা। তা কি পোড়ার মুখে কোনদিন সুবাক্যি আছে? ওমা, আজ আমার মেয়ে দুটো নেবু তুলতে গিয়েছে ডোবার ধারের গাছে, তো বলে কিনা রোজ রোজ নেবু তুলতে আসে, যেন সরকারী গাছ পড়ে রয়েছে আর কি—চব্বিশ ঝুড়ি কথা শুনিয়ে দিলে মণ্টুর মা। আচ্ছা বলো তো তোমরাই—

মণ্টুর মা—যাঁকে উদ্দেশ করে একথা বলা হচ্ছিল, তিনি এঁদের মজলিসে কেবল আজই অনুপস্থিত আছেন নইলে রোজই এসে থাকেন। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে সবাই তাঁর চালচলন, ধরন-ধারণ, রীতি-নীতির নানারূপ সমালোচনা করলে।

প্রিয় মুখুয্যের মেয়ে শান্তি—ষোল-সতেরো বছরের কুমারী—তার মায়ের বয়সী মণ্টুর মার সম্বন্ধে অমনি বলে বসলো,—ওঃ, সে কথা আর বোলো না খুড়ীমা, কি ব্যাপক মেয়েমানুষ ঐ মণ্টুর মা! ঢের ঢের মেয়েমানুষ দেখিচি, অমন লঙ্কাপোড়া ব্যাপক যদি কোথাও দেখে থাকি, ক্ষুরে নমস্কার, বাবা বাবা!

ছোট মেয়ের ঐ জ্যাঠামি কথার জন্যে তাকে কেউ বকলে না বা শাসন করলে না, বরং কথাটা সকলেই উপভোগ করলে।

তারপর কথাটার স্রোত আরও কতদূর গড়াতো বলা যায় না, এমন সময় রায়-বাড়ির বড়বৌ হঠাৎ মনে-পড়ার ভঙ্গীতে বল্লেন—হাঁ, একটা মজার কথা শোনেনি বুঝি। শ্রীপতি যে বিয়ে করেছে, বটঠাকুরের কাছে চিঠি এসেচে, শ্রীপতির মামা লিখেচে।

সকলে সমস্বরে বলে উঠলো—শ্রীপতি বিয়ে করেচে!

তারপর সকলেই একসঙ্গে নানারূপ প্রশ্ন করতে লাগলোঃ

—কোথায়, কোথায়?

—কবে চিঠি এল?

—তবে যে শুনলাম শ্রীপতি বিয়ে করবে না বলেচে।

শ্রীপতির বিয়ের খবরে অনেকেই যেন একটু দমে গেল। খবরটা তেমন শুভ নয়। কারো উন্নতির সংবাদ এদের পক্ষে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করা অসম্ভব। তাদের যখন উন্নতি হ'লো না তখন অপরের উন্নতি হবে কেন? কিন্তু এর পরেই যখন রায়-বৌ মুখ টিপে হেসে আস্তে আস্তে বল্লেন—বৌটি নাকি বামুনের মেয়ে নয়—তখন সকলে

খাড়া হয়ে সটান উঠে বসলো, তাদের মরা-মরা ভাবটা এক মুহূর্তে গেল কেটে। একটা বেশ সরস ও মুখরোচক পরনিন্দা আর ঘোঁটের আভাস ওরা পেলে, রায়-বৌয়ের চাপা ঠোঁটের হাসি থেকে।

শান্তি উৎসুক চোখে চেয়ে হাসিমুখে বল্লে—ভেতরে তা'হলে অনেকখানি কথা আছে!

বোস-গিন্নি বল্লেন—তাই বল! নইলে এম্‌নি কোথাও কিছু নয় শ্রীপতি বিয়ে করলে, এ কি কখনো হয়! কি জাত মেয়েটার? হিন্দু তো?

অর্থাৎ তা'হলে রগড়টা আরও জমে। রায়বৌ বল্লেন,—হিন্দুই, মেয়েটা বদ্দি বামুন।

এদেশে বৈদ্যকে বলে থাকে 'বদ্দি বামুন'—এ অঞ্চলের ত্রিসীমানায় বৈদ্যের বাস না থাকায় বৈদ্যজাতির সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে এদের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট। কারো বিশ্বাস ব্রাহ্মণের পরেই বৈদ্যের সামাজিক স্থান, তারা একপ্রকারের নিম্নবর্ণের ব্রাহ্মণ, তার চেয়ে নীচু নয়—আবার কারো বিশ্বাস তাদের স্থান সমাজের নিম্নতর ধাপের দিকে।

শান্তি বল্লে—বৌয়ের বয়েস কত?

—ওঃ, তা অনেক। শুনচি চব্বিশ-পঁচিশ—

সকলে সমস্বরে আবার একটা বিস্ময়ের রোল তুল্লে। চব্বিশ-পঁচিশ বছর পর্যন্ত মেয়ে আইবুড়ো থাকে ঘরে! এ আবার কোথাকার ছোট জাত, রামোঃ! ছিঃ—

শান্তির মা বল্লেন—তাহ'লে মেয়ে আর নয়, মাগী বল! পাঁড় শসা—বাপ-মা বুঝি ঘরে বীজ রেখেছিল!

কে একজন মুখ টিপে হেসে বললেন—বিধবা না তো?

চক্কত্তি-গিন্নী বল্লেন—আগের পক্ষের ছেলেমেয়ে কিছু আছে নাকি মাগীর!

এ কথায় শান্তিই আগে মুখে আঁচল দিয়ে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠলো—তারপরে বাকি সকলে তার সঙ্গে যোগ দিলে। হ্যাঁ, এটা একটা নতুন ও ভারী মজার খবর বটে, মেয়েগজালির কিছুদিনের মত খোরাক সংগ্রহ হ'ল। আমচুরি কাঁটালচুরির গল্প একটু একঘেয়ে হয়ে পড়েছিল।

ঠিক পরের দিনই এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটলো। শ্রীপতির মেজ ভাই উমাপতি গাঁয়ে এসে বাড়ির চাবি খুলে লোক লাগিয়ে ঘরদোর পরিষ্কার করতে লাগলো। তার দাদা বৌদিদিকে নিয়ে শীগ্‌গির আসবে এবং কিছুদিন নাকি গাঁয়েই বাস করবে। বৌদিদি পাড়াগাঁ কখনো দেখেননি,—গ্রামে আসবার তাঁর খুব আগ্রহ। তার দাদাও কলকাতায় বদলি হবার চেষ্টা করচে।

মেয়ে মজলিসে সবাই তো অবাক। শ্রীপতি কোন্‌ মুখে অজাতের বউ নিয়ে গাঁয়ে এসে উঠবে। মানুষের একটা লজ্জা-সরমও তো থাকে, করেই ফেলেছিস্‌ না হয় একটা অকাজ। এ সব কি খিরিস্টানি কাণ্ডকারখানা, কালে কালে হ'ল কি! আর সে ধিঙ্গি মাগীটারই বা কি ভরসা, ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্রাহ্মণপাড়ায় বিয়ের বউ সেজে সে কোন্‌ সাহসে আসবে।

শ্রীপতি অবিশ্যি বৌ নিয়ে পৈতৃক বাড়িতে আসার বিষয়ে এ'দের মত জিজ্ঞাসা করেনি। একদিন একখানা নৌকো এসে গ্রামের ঘাটে দুপুরের সময় লাগলো এবং নৌকো থেকে নামল শ্রীপতি, তার নববিবাহিতা বধূ, একটি ছোক্‌রা চাকর ও দুটি ট্রাংক ও একটা বড় বিছানার মোট, একটা ঝুড়ি-বোঝাই টুকিটাকি জিনিস। ঘাটে দু-একজন যারা অত বেলায় স্নান করছিল, তারা তখুনি পাড়ার মধ্যে গিয়ে খবরটা সবাইকে বললে।

তখন কিন্তু কেউ এল না, অত বেলায় এখন শ্রীপতিদের বাড়ি গেলে তাদের খেতে বলতে হয়। অসময়ে এখন এসে তারা রান্নাবান্না চড়িয়ে খাবে, সেটা প্রতিবেশী হয়ে হতে দেওয়া কর্তব্য নয়, সুতরাং সে ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে করবার চেয়ে এখন না যাওয়াই বুদ্ধির কাজ।

কিন্তু রাসু চক্কত্তি আর প্রিয় মুখুয্যের বাড়ির মেয়েরা অত সহজে রেহাই পেলেন না।

শ্রীপতি নিজে গিয়ে একেবারে অন্তঃপুরের মধ্যে ঢুকে বল্লে—ও পিসিমা, ও বৌদিদি, আপনারা আপনাদের বৌকে হাতে ধরে ঘরে না তুললে কে আর তুলবে? আসুন সবাই।

বাধ্য হয়ে কাছাকাছির দু-তিন বাড়ির মেয়েরা শাঁক হাতে, জলের ঘটি হাতে নতুন বৌকে ঘরে তুলতে এলেন—খানিকটা চক্ষুলজ্জায়, খানিকটা কৌতূহলে। মজা দেখবার প্রবৃত্তি সকলের মধ্যেই আছে। ছোটবড় ছেলেমেয়েও এল অনেকে, শান্তি এল, কমলা এল, সারদা এল।

শ্রীপতিদের বাড়ির উঠোনে লিচুতলায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দূরে থেকে মেয়েটির ধপ্‌ধপে ফর্সা গায়ের রং ও পরনের দামী সিল্কের শাড়ি দেখে সকলে অবাক হয়ে গেল। সামনে এসে আরও বিস্মিত হবার কারণ ওদের ঘটলো—মেয়েটির অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী দেখে। কি ডাগর ডাগর চোখ! কি সুকুমার লাবণ্য সারা অংগে! সর্বোপরি মুখশ্রী—অমন ধরনের সুন্দর মুখ এসব পাড়াগাঁয়ে কেউ কখনো দেখেনি।

সকলে আশা করেছিল গিয়ে দেখবে কালোকোলো একটা মোটা-মত মাগী আধ-ঘোমটা দিয়ে উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্যাট্ প্যাট্ করে চেয়ে রয়েছে ওদের দিকে। কিন্তু তার পরিবর্তে দেখল, এক নম্রমুখী সুন্দরী তরুণী মূর্তি···। মুখখানি এত সুকুমার যে মনে হয় ষোল-সতেরো বছরের বালিকা।

বিকেলে ওপাড়ার নিতাই মুখুয্যের বৌ ঘাটের পথে চক্কত্তি-গিন্নীকে জিজ্ঞেস করলেন—কি দিদি, শ্রীপতির বৌ দেখলে নাকি? কেমন দেখতে?

চক্কত্তি-গিন্নী বল্লেন—না, দেখতে বেশ ভালই—

চক্কত্তি-গিন্নীর সংগে শান্তি ছিল, সে হাজার হোক ছেলেমানুষ, ভাল লাগলে পরের প্রশংসার বেলায় সে এখনও কার্পণ্য করতে শেখেনি, সে উচ্ছ্বসিত সুরে বলে উঠলে—চমৎকার, খুড়ীমা, একবার গিয়ে দেখে আসবেন, সত্যিই অদ্ভুত ধরনের ভাল।

নিতাই মুখুয্যের বৌ পরের এতখানি প্রশংসা শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন না—বুঝতে পারলেন না শান্তি কথাটা ব্যাঙ্গের সুরে বলছে, না সত্যিই বলছে। বললেন—কি রকম ভাল?

এবার চক্কত্তি-গিন্নী নিজেই বল্লেন—না, বৌ যা ভেবেছিলাম তা নয়। বৌটি সত্যিই দেখতে ভাল। আর কেনই বা হবে না বলো, শহরের মেয়ে, দিনরাত সাবান ঘষছে, পাউডার ঘষছে, তোমার-আমার মত রাঁধতে হ'ত, বাসন মাজতে হ'ত; তো দেখতাম চেহারার কত জলুস বজায় রাখে।

এই বয়সে তো দূরের কথা, তাঁর বিগত যৌবন দিনেও অজস্র পাউডার সাবান ঘষলেও যে কখনো তিনি শ্রীপতির বৌয়ের পায়ের নখের কাছে দাঁড়াতে পারতেন না—চক্কত্তি-গিন্নীর সম্বন্ধে শান্তির একথা মনে হ'ল। কিন্তু চুপ করে রইল সে।

বিকেলে এ-পাড়ার ও-পাড়ার মেয়েরা দলে দলে বৌ দেখতে এল। অনেকেই বল্লে, এমন রূপসী মেয়ে তারা কখনো দেখেনি। কেবল হরিচরণ রায়ের স্ত্রী বল্লেন—আর বছর তারকেশ্বরে যাবার সময় ব্যাণ্ডেল স্টেশনে তিনি একটি বৌ দেখেছিলেন, সেটি এর চেয়েও রূপসী।

মেয়ে-মজলিসে পরদিন আলোচনার একমাত্র বিষয় দাঁড়ালো শ্রীপতির বৌ। দেখা

গেল তার রূপ সম্বন্ধে দু-মত নেই সভ্যদের মধ্যে, কিন্তু তার চরিত্র সম্বন্ধে নানারকম মন্তব্য অবাধে চলেছে।

—ধরন-ধারন যেন কেমন-কেমন—অত সাজগোজ কেন রে বাপু?

—ভাল ঘরের মেয়ে নয়। দেখলেই বোঝা যায়—

—বাসন মাজতে হ'লে ও-হাত আর বেশীদিন অত সাদাও থাকবে না, নরমও থাকবে না—ঠ্যালা বুঝবেন পাড়াগাঁয়ের। গলায় নেক্‌লেস্ ঝুলুতে আমরাও জানি—

—বেশ একটু ঠ্যাকারে। পাড়াগাঁয়ের মাটিতে যেন গুমরে পা পড়ছে না, এমনি ভাব। বামুনের ঘরে বিয়ে হয়ে ভাবছে যেন কি—

—তা তো হবেই, বদ্দি বামুনের মেয়ে, বামুনের ঘরে এয়েছে, ওরা সাত-পুরুষের সৌভাগ্যি না?

নববধূর স্বপক্ষে বল্লে কেবল শান্তি ও কমলা। শান্তি ঝাঁজের সঙ্গে বললে—তোমরা কারো ভালো দেখতে পার না বাপু! কেন ওসব বলবে একজন ভদ্দর ঘরের মেয়ের সম্বন্ধে? কাল বিকেলে আমি গিয়ে কতক্ষণ ছিলাম নতুন বৌয়ের কাছে। কোন ঠ্যাকার নেই, অংখার নেই, চমৎকার মেয়ে!

কমলা বল্লে—আমাদের উঠতে দেয় না কিছুতেই—কত গল্প করলে, খাবার খেতে দিলে, চা করলে—আর, খুব সাজগোজ কি করে? সাদাসিদে শাড়ি সেমিজ পরে তো ছিল। তবে খুব ফর্সা কাপড়চোপড়—ময়লা একেবারে দু'চোখে দেখতে পারে না—

শান্তি বল্লে—ঘরগুলো এরই মধ্যে কি চমৎকার সাজিয়েছে! আয়না, পিক্‌চার, দোপাটি ফুলের তোড়া বেঁধে ফুলদানিতে রেখে দিয়েছে—শ্রীপতিদা'র বাপের জন্মে কখনো অমন সাজানো ঘরদোরে বাস করেনি—ভারী ফিট্‌ফাট্ গোছালো বৌটি—

দিন দুই পরে ডোবার ঘাটে নববধূকে একরাশ বাসন নিয়ে নামতে দেখে সকলে অবাক হয়ে গেল। চারিদিকে বনে ঘেরা ঝুপসি আধ-অন্ধকার ডোবাটা যেন মেয়েটির স্নিগ্ধ রূপের প্রভায় এক মুহূর্তে আলো হয়ে উঠল, একথা যারা তখন ডোবার অন্যান্য ঘাটে ছিল, সবাই মনে মনে স্বীকার করলে। দৃশ্যটাও যেন অভিনব ঠেক্‌লো সকলের কাছে, এমন একটা পচা এঁদো জঙ্গলে ভরা পাড়াগেঁয়ে ডোবার ঘাটে সাধারণতঃ কালো-কালো, আধ-ময়লা শাড়িপরা শ্রীহীনা ঝি-বৌ বা ত্রিকালোত্তীর্ণা প্রৌঢ়া বিধবাদের গামছা-পরিহিতা মূর্তিই দেখা যায়, বা দেখার আশা করা যায়—সেখানে এমন একটি আধুনিক ছাঁদে খোঁপা বাঁধা, ফর্সা শাড়ি-ব্লাউজ-পরা, 'রূপকথার রাজকুমারীর মত রূপসী, নব-যৌবনা বধূ সজনেতলার ঘাটে বসে ছাই দিয়ে নিটোল সুগৌর হাতে বাসন মাজছে, এ দৃশ্যটা খাপ খায় না। সকলের কাছেই এটা খাপছাড়া বলে মনে হ'ল। প্রৌঢ়ারাও ভেবে দেখলেন গত বিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে এমন ঘটনা ঘটেনি এই ক্ষুদ্র ডোবার ইতিহাসে।

রায়পাড়ার একটি প্রৌঢ়া বল্লেন—আ-হা, বৌ তো নয়, যেন পিরতিমে—কিন্তু অত রূপ নিয়ে কি এই ডোবায় নামে বাসন মাজতে! না ও-হাতে কখনো ছাই দিয়ে বাসন মাজা অভ্যেস আছে! হাত দেখেই বুঝেছি।

তারপর থেকে দেখা গেল ঘরসংসারের যা কিছু কাজ শ্রীপতির বৌ সব নিজের হাতে করচে।

ইতিমধ্যে শ্রীপতির কল্‌কাতায় বদ্‌লি হবার খবর আসতে সে চলে গেল বাড়ি থেকে।

পাড়ার মেয়েদের মধ্যে শান্তি ও কমলা শ্রীপতির বৌয়ের বড় ন্যাওটা হয়ে পড়লো। সকাল নেই বিকেল নেই, সব সময়েই দেখা যায় শান্তি ও কমলা বসে আছে ওখানে।

পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের মেয়ে, অমন আদর করে কেউ কখনো রোজ রোজ ওদের

লুচি হালুয়া খেতে দেয়নি।

একদিন কমলা বলে—বৌদিদি, তোমার ঘরে কাপড়-মোড়া ওটা কি?

শ্রীপতির বৌ বল্লে—ওটা এসরাজ—

—বাজাতে জানো বৌদি?

—একটুখানি অমনি জানি ভাই, কিন্তু এ্যাদ্দিন ওকে বার পর্যন্ত করিনি। কেন জানো, গাঁয়েঘরে কে কি হয়তো মনে করবে।

শান্তি বল্লে—নিজের বাড়ি বসে বাজাবে, কে কি মনে করবে? একটু বাজিয়ে শোনাও না বৌদি!

একটু পরে রায়-গিন্নী ঘাটে যাবার পথে শুনতে পেলেন শ্রীপতির বাড়ির মধ্যে কে বেহালা না কি বাজাচ্ছে, চমৎকার মিষ্টি। কোনো ভিখিরী গান গাচ্ছে বুঝি? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ শুনে তিনি ঘাটে চলে গেলেন।

ঘাটে গিয়ে তিনি মজুমদারবৌকে বল্লেন কথাটা।

—ওই শ্রীপতির বাড়ি কে একজন বোষ্টম বেহালা বাজাচ্ছে শুনে এলাম। কি চমৎকার বাজাচ্ছে দিদি, দুদণ্ড দাঁড়িয়ে শুনতে ইচ্ছে করে।

দুপুরের মেয়ে-মজলিসে শান্তির মা বল্লেন—শ্রীপতির বৌ চমৎকার বাজাতে পারে, এসরাজ না কি বলে, একরকম বেহালার মত। শান্তিদের ওবেলা শুনিয়েছিল—

রায়-বৌ বল্লেন—ও! তাই ওবেলা নাইতে যাবার সময় শুনলাম বটে! সে যে ভারী চমৎকার বাজনা গো, আমি বলি বুঝি কোন ফকির বোষ্টম ভিক্ষে করতে এসে বাজাচ্ছে!

এমন সময় শান্তি আসতেই তার মা বল্লেন—ওই জিজ্ঞেস কর না শান্তিকে।

শান্তি বল্লে—উঃ, সে আর তোমায় কি বলব খুড়ীমা, বৌদিদি যা বাজালে অমন কখনো শুনিনি—শুনবে তোমরা? তা'হলে এখন বলি বাজাতে—বল্লেই বাজাবে।

শান্তি শ্রীপতিদের বাড়ি চলে যাবার অল্প পরেই শোনা গেল শ্রীপতির বৌয়ের এস্‌রাজ বাজনা। অনেকক্ষণ কারো মুখে কথা রইল না।

চক্কত্তি-গিন্নী বল্লেন—আহা, বড় চমৎকার বাজায় তো!

সকলেই স্বীকার করলে শ্রীপতির বৌকে আগে যা ভাবা গিয়েছিল, সে-রকম নয়, বেশ মেয়েটি।

এস্‌রাজ বাজনার মধ্যে দিয়ে পাড়ার সকলের সঙ্গে শ্রীপতির বৌয়ের সহজ ভাবে আলাপ পরিচয় জমে উঠলো। দুপুরে, সন্ধ্যায় প্রায়ই সবাই যায় শ্রীপতিদের বাড়ি বাজনা শুনতে।

তারপর গান শুনলো সবাই একদিন। পূর্ণিমার রাত্রে জ্যোৎস্নাভরা ভেতর-বাড়ির রোয়াকে বসে বৌ এস্‌রাজ বাজাচ্ছিল, পাড়ার সব মেয়েই এসে জুটেচে। শ্রীপতি বাড়ি নেই।

কমলা বল্লে—আজ বৌদি একটা গান গাইতেই হবে—তুমি গাইতেও জানো ঠিক—শোনাও আজকে—

বৌটি হেসে বল্লে—কে বলেচে ঠাকুরঝি যে আমি গাইতে জানি?

—না, ওসব রাখো—গাও একটা—

সকলেই অনুরোধ করলে। বল্লে—গাও বৌমা, এ পাড়ায় মানুষ নেই, আস্তে আস্তে গাও, কেউ শুনবে না—

শ্রীপতির বৌ একখানা মীরার ভজন গাইলে।

রাণাজি, ময় গিরধর কে ঘর যাঁহু
গিরধর ম্‌হারা সাচো প্রিতম্ দেখত রূপ লুভাঁউ।

গায়িকার চোখে মুখে কি ভক্তিপূর্ণ তন্ময়তার শোভা ফুটে উঠলো গানখানা গাইতে গাইতে—শান্তি একটা গন্ধরাজ আর টগরের মালা গেঁথে এনেছিল বৌদিদিকে পরাবে বলে—গান গাইবার সময়ে সে আবার সেটা বৌয়ের গলায় আলগোছে পরিয়ে দিলে—সেই জ্যোৎস্নায় সাদা সুগন্ধি ফুলের মালা গলায় রূপসী বৌয়ের মুখে ভজন শুনতে শুনতে মণ্টুর মার মনে হলো এই মেয়েটিই সেই মীরাবাই, অনেককাল পরে পৃথিবীতে আবার নেমে এসেছে, আবার সবাইকে ভক্তির গান গাইয়ে শোনাচ্ছে।

মণ্টুর মা একটু বাইরের খবর রাখতেন, যাত্রায় একবার মীরাবাই পালা দেখেছিলেন তাঁর বাপের বাড়ির দেশে।

তারপর আর একখানা হিন্দীগান গাইলে বৌ, এঁরা অবিশ্যি কিছু বুঝলেন না। তবে তন্ময় হয়ে শুনলেন বটে।

তারপর একখানা বেহাগ। বাংলা গান এবার। সকলে শুয়ে পড়লো, শান্তির চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। অনেকে দেখলে বৌয়েরও চোখ দিয়ে জল পড়ছে গান গাইতে গাইতে—রূপসী গায়িকা একেবারে যেন বাহ্যজ্ঞান ভুলে গিয়েছে গানে তন্ময় হয়ে।

সেদিন থেকেই সকলে শ্রীপতির বৌকে অন্য চোখে দেখতে লাগলো।

ওর সম্বন্ধে ক্রমে উচ্চ ধারণা করতে সকলে বাধ্য হ'ল আরও নানা ঘটনায়। পাড়াগাঁয়ে সকলেই বেশ হুঁশিয়ার, একথা আগেই বলেছি। ধার দিয়ে—সে যদি এক খুঁচি চাল কি দু পলা তেলও হয়—তার জন্যে দশবার তাগাদা করতে এদের বাধে না। কিন্তু দেখা গেল শ্রীপতির বৌ সম্পূর্ণ দিলদরিয়া মেজাজের মেয়ে। দেবার বেলায় সে কখনও না বলে কাউকে ফেরায় না, যদি জিনিসটা তার কাছে থাকে। একেবারে মুক্তহস্ত সে বিষয়ে—কিন্তু আদায় করতে জানে না, তাগাদা করতে জানে না, মুখে তার রাগ নেই, বিরক্তি নেই, হাসিমুখ ছাড়া তার কেউ কখনও দেখেনি।

শ্রীপতির বৌয়ের আপন-পর জ্ঞান নেই, এটাও সবাই দেখলে। পাশের বাড়িতে চক্কত্তি-গিন্নী বিধবা, একাদশীর দিন দুপুরে তিনি নিজের ঘরে মাদুর পেতে শুয়ে আছেন, শ্রীপতির বৌ একবাটি তেল নিয়ে এসে তাঁর পায়ে মালিশ করতে বসে গেল। যেন ও তাঁর নিজের ছেলের বৌ!

চক্কত্তি-গিন্নী একটু অবাক হলেন প্রথমটা। পাড়াগাঁয়ে এরকম কেউ করে না, নিজের ছেলের বৌয়েই করে না তো অপরের বৌ।

—এসো, এসো, মা আমার এসো। থাক্ থাক্, তেল মালিশ আবার কেন মা? তোমায় ওসব করতে হবে না, পাগলী মেয়ে—

এই পাগলী মেয়েটি কিন্তু শুনলে না। সে জোর করেই বসে গেল তেল মালিশ করতে। মাথায় চুল এসে অগোছালো ভাবে উড়ে পড়েছে মুখে, সুগৌর মুখে অতিরিক্ত গরমে ও শ্রমে কিছু কিছু ঘাম দেখা দিয়েছে—চক্কত্তি-গিন্নী এই সুন্দরী বৌটির মুখ থেকে চোখ যেন অন্যদিকে ফেরাতে পারলেন না। বড় স্নেহ হ'ল এই আপন-পর জ্ঞান-হারা মেয়েটার ওপর।

ইতিমধ্যে কমলার বিয়ে হয়ে গেল। শ্বশুরবাড়ি যাবার সময়ে সে শ্রীপতির বৌয়ের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বল্লে—বৌদিদি, তোমায় কি করে ছেড়ে থাকবো ভাই? মাকে ছেড়ে যেতে যত কষ্ট না হচ্ছে, তত হচ্ছে, তোমায় ছেড়ে যেতে!···এই এক ব্যাপার থেকেই বোঝা যাবে শ্রীপতির বৌ এই অল্প কয়েক মাসের মধ্যে গ্রামের তরুণ মনের ওপর কি রকম প্রভাব বিস্তার করেছিল।

পুজোর সময় এসে পড়েচে। আশ্বিনের প্রথম, শরতের নীল আকাশে অনেকদিন পরে সোনালী রোদের মেলা, বনসিমের ফুল ফুটেছে ঝোপে ঝোপে, নদীর চরে কাশ

ফুলের শোভা। পাশের গ্রাম সত্রাজিৎপুরে বাঁড়ুয্যে-বাড়ি পুজো হয় প্রতি বৎসর, এবারও শোনা যাচ্ছে মহানবমীর দিন তাদের বাড়ি আর বছরের মত যাত্রা হবে কাঁচড়াপাড়ার দলের।

শ্রীপতির বৌ গান পাগলা মেয়ে, এ কথাটা এতদিনে এ গাঁয়ের সবাই জেনেছে। তার দিন নেই, রাত নেই, গান লেগে আছে, দুপুরে রাত্রে রোজ এস্‌রাজ বাজায়। গান সম্বন্ধে কথা সর্বদা তার মুখে। শান্তির এখনও বিয়ে হয়নি, যদিও সে কমলার বয়সী। সে শ্রীপতির বৌয়ের কাছে আজকাল দিনরাত লেগে থাকে গান শেখবার জন্যে।

একদিন শ্রীপতির বৌ তাকে বল্লে—ভাই শান্তি, এক কাজ করবি, সত্রাজিৎপুরে তো যাত্রা হবে বলে সবাই নেচেছে। আমাদের পাড়ার মেয়েরা তো আর দেখতে পাবে না? তারা কি আর অপর গাঁয়ে যাবে যাত্রা শুনতে? অথচ এরা কখনো কিছু শোনে না—আহা! এদের জন্যে যদি আমরা আমাদের পাড়াতেই থিয়েটার করি?

শান্তি তো অবাক্! থিয়েটার? তাদের এই গাঁয়ে? থিয়েটার জিনিসটার নাম শুনেছে বটে সে, কিন্তু কখনো দেখেনি। বল্লে—কি করে করবে বৌদি, কি যে তুমি বলো! তুমি একটা পাগল।

শ্রীপতির বৌ হেসে বললে—সে সব বন্দোবস্ত আমি করবো এখন। তোকে ভেবে মরতে হবে না—দ্যাখ্ না কি করি।

সপ্তাহখানেক পরে শ্রীপতি যেমন শনিবারের দিন বাড়ি আসে তেমনি এল। সঙ্গে তিনটি বড় মেয়ে ও দুটি ছোট মেয়ে ও চার পাঁচটি ছেলে। বড় মেয়ে তিনটির ষোল, সতেরো এমনি বয়েস, সকলেই ভারী সুন্দরী, ছোট মেয়ে দুটির মধ্যে যেটির বয়েস তেরো, সেটি তত সুবিধে নয় কিন্তু যেটির বয়েস আন্দাজ দশ—তাকে দেখে রক্তমাংসের জীব বলে মনে হয় না, মনে হয় যেন মোমের পুতুল। ছেলেদের বয়েস পনেরোর বেশী নয় কারো। সকলেই সুবেশ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

শান্তি, শান্তির মা এবং চক্কত্তি-গিন্নি তখন সেখানেই উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপতির বৌ ওদের দেখে ছুটে গেল রোয়াক থেকে উঠোনে নেমে। উচ্ছ্বসিত আনন্দের সুরে বল্লে—এই যে রমা, পিন্টু, তারা, এই যে শিব, আয়, আয় সব কেমন আছিস্? ওঃ কতদিন দেখিনি তোদের—

রমা বলে ষোল-সতেরো বছরের সুন্দরী মেয়েটি ওর গলা জড়িয়ে ধরলে, সকলেই ওকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলে।

—দিদি কেমন আছিস্ ভাই—

—একটু রোগা হয়ে গেছিস্ দিদি—

—ওঃ, কতদিন যে তোকে দেখিনি—

—দাদাবাবু যখন বল্লেন তোর এখানে আসতে হবে আমরা তো—

—আহিরীটোলাতে মিউজিক কম্পিটিশন ছিল—নাম দিয়েছিলাম—ছেড়ে চলে এলাম—

মেয়েগুলির মুখ, রং, গড়ন শ্রীপতির বৌয়ের মত। রমা তো একেবারে হুবহু ওর মত দেখতে, কেবল যা কিছু বয়সের তফাত। জানা গেল মেয়ে দুটির মধ্যে রমা ও তার ছোট সতী, এবং ছেলেদের মধ্যে বারো বছরের ফুটফুটে ছেলে শিবু শ্রীপতির বৌয়ের আপন ভাই-বোন, বাকী সবই কেউ খুড়তুতো, কেউ জ্যাঠতুতো ভাই-বোন।

ক্রমে আরও জানা গেল শ্রীপতির বৌ এদের চিঠি লিখিয়ে আনিয়েছে থিয়েটার করানোর জন্যে।

পাড়ার সবাই এদের রূপ দেখে অবাক্। এসব পাড়াগাঁয়ে অমন চেহারার ছেলে মেয়ে কেউ কল্পনাই করতে পারে না। দশ বছরের সেই ছেলেটির নাম পিন্টু, সে শান্তির বড়

ন্যাওটা হয়ে গেল। সে আবার একটা সাঁতার দেবার নীল রঙের পোশাক এনেছে, সিক্ত নীল পোশাক সুগৌর দেহে যখন সে নদীর ঘাটে স্নান করে উঠে দাঁড়ায়—তখন ঘাটসুদ্ধ মেয়েরা—বোস-গিন্নী, মণ্টুর মা, শান্তির মা, মজুমদার-গিন্নী ওর দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকেন। রূপ আছে বটে ছেলেটির! শান্তি দস্তুরমত গর্ব অনুভব করে, যখন পিণ্টু অনুযোগ করে বলে—আঃ শান্তিদি, আসুন না উঠে, ভিজে কাপড়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো? আসুন বাড়ি যাই।

পুজো এসে পড়লো। এ-গাঁয়ে কোনো উৎসব নেই পুজোয়, গরীবদের গাঁয়ে পুজো কে করবে? দূর থেকে সত্রাজিৎপুরের বাঁড়ুয্যে-বাড়ির ঢাক শুনেই গাঁয়ের মেয়েরা সন্তুষ্ট হয়। ভিন্ গাঁয়ে গিয়ে মেয়েদের পুজো দেখবার রীতি না থাকায় অনেকে দশ-পনেরো কি বিশ বছর দুর্গাপ্রতিমা পর্যন্ত দেখেনি। মেয়েদের জীবনে কোন উৎসব আমোদ নেই এ গাঁয়ে।

শ্রীপতির বৌ তাই একদিন শান্তিকে বলেছিল—সত্যি কি করে যে তোরা থাকিস্ ঠাকুরঝি—একটু গান নেই, বাজনা নেই, বই পড়া নেই, মানুষে যে কেমন করে থাকে এমন করে!

বোধ হয় সেই জন্যেই এত উৎসাহের সঙ্গে ও লেগেছিল থিয়েটারের ব্যাপারে।

শ্রীপতিদের বাড়ির লম্বা বারান্দার একধারে তক্তপোশ পেতে দড়ি টাঙিয়ে হল্‌দে শাড়ি ঝুলিয়ে স্টেজ করা হয়েছে।

শ্রীপতির বৌ ভাই-বোনদের নিয়ে সকাল থেকে খাটচে।

শান্তি বল্লে—তুমি এতো জানলে কি করে বৌদি?

রমা বল্লে—তুমি জানো না দিদিকে শান্তিদিদি। দিদি অল্ বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশনে—

শ্রীপতির বৌ ধমক দিয়ে বোনকে থামিয়ে দিয়ে বল্লে—নে, নে—যা, অনেক কাজ বাকী, এখন তোর অত বক্তৃতা করতে হবে না দাঁড়িয়ে—

রমা না থেমে বল্লে—আর খুব ভাল পার্ট করার জন্যেও সোনার মেডেল পেয়েছে—যতবার পয়লা বোশেখের দিন আমাদের বাড়িতে থিয়েটার হয়, দিদিই তো তার পাণ্ডা—জানো আমাদের কি নাম দিয়েছেন জ্যাঠামশায়?

শ্রীপতির বৌ বল্লে—আবার?

রমা হেসে থেমে গেল।

মহাষ্টমীর দিন আজ। শুধু মেয়েদের আর ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে থিয়েটার। দেখবে শুধু মেয়েরাই—সমস্ত পাড়া কুড়িয়ে সব মেয়ে এসে জুটেছে থিয়েটার দেখতে।

ছোট্ট নাটকটি। শ্রীপতির বৌয়ের জ্যাঠামশায়ের নাকি লেখা। রাজকুমারকে ভালবেসেছিল তাঁরই প্রাসাদের একজন পরিচারিকার মেয়ে। ছেলেবেলায় দুজনে খেলা করেছে। বড় হয়ে দিগ্বিজয়ে বেরুলেন রাজপুত্র, অন্য দেশের রাজকুমারী ভদ্রাকে বিবাহ করে ফিরলেন। পরিচারিকার মেয়ে অনুরাধা তখন নব-যৌবনা কিশোরী, বিকশিত মল্লিকাপুষ্পের মত শুভ্র, পবিত্র। খুব ভাল নাচতে গাইতে শিখেছিল সে ইতিমধ্যে। রাজধানীর সবাই তাকে চেনে জানে—নৃত্যের অমন রূপ দিতে কেউ পারে না। এদিকে ভদ্রাকে রাজ্যে এনে রাজকুমার এক উৎসব করলেন। সে সভায় অনুরাধাকে নাচতে গাইতে হ'ল রাজপুত্রের সামনে ভাড়া করা নর্তকী হিসাবে। তার বুক ফেটে যাচ্চে, অথচ সে একটা কথাও বল্লে না, নৃত্যের মধ্যে দিয়ে, সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে জীবনের ব্যর্থ প্রেমের বেদনা সে নিবেদন করলে প্রিয়ের উদ্দেশ্যে। তারপরে কাউকে কিছু না বলে দেশ ছেড়ে পরদিন একা একা কোথায়

নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

শ্রীপতির বৌ অনুরাধা ; রমা ভদ্রা। ওর অন্য সব ভাই-বোনেরাও অভিনয় করলে। শ্রীপতির বৌ বেশভূষায়, রূপে, গলে দোদুল্যমান জুঁইফুলের মালায় যেন প্রাচীন যুগের রূপকথার রাজকুমারী, রমাও তাই, গানে গানে অনুরাধা তো স্টেজ্ ভরিয়ে দিলে, আর কি অপূর্ব নৃত্যভঙ্গি! সতী, রমা, পিণ্টুও কি চমৎকার অভিনয় করলে, আর কি চমৎকার মানিয়েছে ওদের!

তারপরে বহুকাল পরে পথের ধারে মুমূর্ষু অনুরাধার সঙ্গে রাজপুত্রের দেখা। সে বড় মর্মস্পর্শী করুণ দৃশ্য! অনুরাধার গানের করুণ সুরপুঞ্জে ঘরের বাতাস ভরে গেল। চারিদিকে শুধু শোনা যাচ্ছিল কান্নার শব্দ, শান্তি তো ফুলে ফুলে কেঁদে সারা।

অভিনয় শেষ হলো, তখন রাত প্রায় এগারোটা। গ্রামের মেয়েরা কেউ বাড়ি চলে গেল না। তারা শ্রীপতির বৌকে ও রমাকে অভিনয়ের পর আবার দেখতে চায়। শ্রীপতির বৌ ও তার ভাইবোনদের রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে চক্কত্তি-গিন্নী ও শান্তির মা ও মণ্টুর মা খেতে বসিয়ে দিলেন আর ওদের চারিধার দিয়ে পাড়ার যত মেয়ে।

ও পাড়ার রাম গাঙ্গুলির বৌ বল্লেন—বৌমা যে আমাদের এমন তা তো জানিনে। ওমা এমন জীবন তো কখনো দেখিনি—

মণ্টুর মা বল্লেন—আর ভাইবোনগুলিও কি সব হীরের টুকরো! যেমন সব চেহারা তেমনি গান—

শান্তি তো তার বৌদিদির পিছুপিছু ঘুরছে, তার চোখ থেকে অভিনয়ের ঘোর এখনও কাটেনি, সেই জুঁইফুলের মালাটি বৌদির গলা থেকে সে এখনও খুলতে দেয় নি। ওর দিক থেকে অন্যদিকে সে চোখ ফেরাতে পারচে না যেন।

চক্কত্তি-গিন্নী বল্লেন—আর কি গলা আমাদের বৌমার আর রমার! পিণ্টু অতটুকু ছেলে কি চমৎকার করলে!...

শান্তির মা বল্লেন—পিণ্টু খাচ্ছে না, দ্যাখ সেজো বৌ। আর একটু দুধ দি, ভাত ক'টা মেখে নাও বাবা, চেঁচিয়ে তো ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছে।...কি চমৎকার মানিয়েছিল পিণ্টুকে, না সেজ বৌ?—একে ফুট্‌ফুটে সুন্দর ছেলে...

শ্রীপতির বৌ হাজার হোক্ ছেলেমানুষ, সকলের প্রশংসায় সে এমন খুশী হয়ে উঠলো যে খাওয়াই হোল না তার। সলজ্জ হেসে বল্লে—জ্যাঠামশায় আমাদের বলেন কিন্নর দল—এখন ওই নামে আমাদের—

রমা হেসে ঘাড় দুলিয়ে বল্লে—নিজে যে বল্লে দিদি, আমি বলতে যাচ্ছিলুম, আমায় তবে ধমক দিলে কেন তখন?

তারা বল্লে—নামটি বেশ, কিন্নর দল, না? আমাদের শ্যামবাজারের পাড়ায় কিন্নর দল বলতে সবাই চেনে—

রমা বল্লে, কৃত্রিম গর্বের সঙ্গে—প্রায় এক ডাকে চেনে—হুঁ হুঁ—

তারপর এই রূপবান বালক-বালিকার দল, সকলে এক যোগে হঠাৎ খিল্‌খিল্ করে মিষ্টি হাসি হেসে উঠলো।

সতী হাসতে হাসতে বল্লে—বেশ নামটি, কিন্নর দল, না?

এমন একদল সুশ্রী চেহারার ছেলেমেয়ে, তার ওপর তাদের এমন অভিনয় করার ক্ষমতা, এমন গানের গলা, এমনি হাসিখুশী মিষ্টি স্বভাব, সকলেরই মনোহরণ করবে তার আশ্চর্য কি?

মণ্টুর মা ভাবলেন, কিন্নর দলই বটে!...

ওদের খেতে খেতে হাসি গল্প করতে মহাষ্টমীর নিশি ভোর হয়ে এল!

শ্রীপতির বৌ বল্লে, অসুন, বাকী রাতটুকু আর সব বাড়ি যাবেন কেন? গল্প করে কাটানো যাক্!

শ্রীপতি বাড়ি নেই, সে সত্রাজিৎপুরের বাঁড়ুয্যে-বাড়ির নিমন্ত্রণে গিয়েছে, আজ রাত্রের যাত্রা দেখে সকালে ফিরবে। সেইজন্যে সকলে বল্লে, তা ভাল, কিন্তু বৌমা তোমাকে গান গাইতে হবে!

শান্তি বল্লে—বৌদি, অনুরাধার সেই গানটা গেও আর একবার, আহা, চোখে জল রাখা যায় না শুনলে।

শ্রীপতির বৌ গাইলে, রমা এস্‌রাজ বাজালে। তারপর রমা ও তারা একসঙ্গে গাইলে।

একটিমাত্র তেড়ো-পাখী বাঁশ গাছের মগডালে কোথায় ডাক্ আরম্ভ করেছে। রাত ফরসা হ'ল।

সে মহাষ্টমীর রাত্রি থেকে গ্রামের সবাই জানলে শ্রীপতির বৌ কি ধরনের মেয়ে।

কেবল তারা জানলে না যে শ্রীপতির বৌ প্রতিভাশালিনী গায়িকা, সত্যিকার আর্টিস্ট। সে ভালবেসে শ্রীপতিকে বিয়ে করে এই পাড়াগাঁয়ের বনবাস মাথায় করে নিয়ে, নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছেড়েচে, যশের আশা, অর্থের আশা, আর্টের চর্চা পর্যন্ত ত্যাগ করেছে। তবু গানের ঝোঁক ওকে ছাড়ে না—ভূতে পাওয়ার মত পেয়ে বসে—দিনরাত তাই ওর মুখে গান লেগেই আছে, তাই আজ মহাষ্টমীর দিন সেই নেশার টানেই এই অভিনয়ের আয়োজন করেচে।

শান্তি কিছুতেই ছাড়তে চায় না ওকে। বলে, তুমি কোথাও যেও না বৌদিদি, আমি মরে যাবো, এখানে তিষ্ঠুতে পারবো না। শান্তি আজকাল শ্রীপতির বৌয়ের কাছে গান শেখে, গলা মন্দ নয় এবং এদিকে খানিকটা গুণ থাকায় সে এরই মধ্যে বেশ শিখে ফেলেচে। কিছু কিছু বাজাতেও শিখেচে। গান-বাজনায় আজকাল তার ভারী উৎসাহ। শ্রীপতির বৌ তো গান-বাজনা যদি পেয়েছে, আর বড় একটা কিছু চায় না, শান্তির সংগীত শিক্ষা নিয়েই সে সব সময় মহাব্যস্ত।

অগ্রহায়ণ মাসের দিকে বৌয়ের বাড়ি থেকে চিঠি এল রমা কি অসুখ হয়ে হঠাৎ মারা গিয়েচে। শ্রীপতি কলকাতা থেকে সংবাদটা নিয়ে এল। শ্রীপতির বৌ খুব কান্নাকাটি করলে। পাড়াসুদ্ধ সবাই চোখের জল ফেললে ওকে সান্ত্বনা দিতে এসে।

শান্তি সব সময় বৌদির কাছে কাছে থাকে আজকাল। তাকে একদিন শ্রীপতির বৌ বল্লে—জানিস শান্তি, আমাদের কিন্নর দল ভাঙতে শুরু করেছে, রমাকে দিয়ে আরম্ভ হয়েছে, আমার মন যেন বলছে…

শান্তির বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো, ধমক দিয়ে বল্লে, থাক ওসব, কি যে বল বৌদি!

কিন্তু শ্রীপতির বৌয়ের কথাই খাটলো।

সে ঠিকই বলেছিল, শান্তি ঠাকুরঝি, কিন্নর দলে ভাঙন ধরেছে।

রমার পরে ফাল্গুন মাসের দিকে গেল পিণ্টু বসন্ত রোগে। তার আগেই শ্রীপতির বৌ মাঘ মাসে বাপের বাড়ি গিয়েছিল, শ্রাবণ মাসের প্রথমে প্রসব করতে গিয়ে সেও গেল।

এ সংবাদ গ্রামে যখন এল, শান্তি তখন সেখানে ছিল না, সেই বোশেখ মাসে তার বিবাহ হওয়াতে সে তখন ছিল মেটারি বাণপুর, ওর শ্বশুরবাড়িতে। গ্রামের অন্য সবাই শুনলে, অনাত্মীয়ের মৃত্যুতে খাঁটি অকৃত্রিম শোক এ রকম এর আগে কখনো এ গাঁয়ে করতে দেখা যায় নি। রায়-গিন্নী, চক্কত্তি-গিন্নী, শান্তির মা, মণ্টুর মা কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন। ঐ মেয়েটি কোথা থেকে দু'দিনের জন্যে এসে তার গানের সুরের প্রভাবে সকলের অকরুণ, কুটিল ভাবে পরিবর্তন এনে দিয়েছিল, সে পরিবর্তন যে কতখানি, ওই সময়ে

গাঁয়ের মেয়েদের দেখলে বোঝা যেতো। ওদের চক্কোত্তি-বাড়ির দুপুরবেলার আড্ডায়, স্নানের ঘাটে শ্রীপতির বৌয়ের কথা ছাড়া অন্য কথা ছিল না।

চক্কোত্তি-গিন্নী শোক পেয়েছিলেন সকলের চেয়ে বেশী। শ্রীপতির বৌয়ের কথা উঠলেই তিনি চোখের জল সামলাতে পারতেন না। বলতেন, দু'দিনের জন্যে এসে মা আমায় কি মায়াই দেখিয়ে গেল! আমার পেটের মেয়ে অমন কক্খনো করেনি···আহা। আমার পোড়া কপাল, সে কখনো এ কপালে টেঁকে!

মণ্টুর মা বলতেন, সে কি আর মানুষ! দেবী অংশে ওসব মেয়ে জন্মায়। নিজের মুখেই বলতো হেসে হেসে, 'আমরা কিন্নর দল খুড়ীমা', শাপভ্রষ্ট কিন্নরীই তো ছিল। ···যেমন রূপ, তেমনি স্বভাব, তেমনি গান···ও কি আর মানুষ, মা!

কথা বলতে বলতে মণ্টুর মার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তো।

এসবের মধ্যে কেবল কথা বলতো না শান্তি। তার বিবাহিত জীবন খুব সুখের হয় নি, ভেবেছিল বাপের বাড়ি এসে বৌদিদির সঙ্গে অনেকখানি জ্বালা জুড়োবে। পুজোর পরে কার্তিক মাসের প্রথমে বাপের বাড়ি এসে সে সব শুনেছিল। বৌদিদি যে তার জীবন থেকে কতখানি হরণ করে নিয়ে গিয়েছে তা এরা কেউ জানে না। মুখে সে-সব পাঁচজনের সামনে ভ্যাজ ভ্যাজ করে বলে লাভ কি? কি বুঝবে লোকে?

বছর দুই পরে একদিনের কথা। গাঁয়ের মধ্যে শ্রীপতির বৌয়ের কথা অনেকটা চাপা পড়ে গিয়েছে। শ্রীপতিও অনেকদিন পরে আবার গ্রামের বাড়িতে যাওয়া আসা করছে শনিবারে কিংবা ছুটিছাটাতে।

শ্রীপতিদের বাড়ি থেকে শান্তিদের বাড়ি বেশী দূর নয়, দু'খানা বাড়ির পরেই। শান্তি তখন এখানেই ছিল। অনেক রাত্রে সে শুনলে শ্রীপতিদাদাদের বাড়িতে কে গান গাইচে। ঘুমের মধ্যে গানের সুর কানে যেতেই সে ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসলো—

বিরহিনী মীরা জাগে তব অনুরাগে, গিরিধর নাগর—

এ কার গলা? ওর গা শিউরে উঠলো। ঘুমের ঘোর এক মুহূর্তে ছুটে গেল। কখনো সে ভুলবে জীবনে এ গান, এ গলা? সেই প্রথম পরিচয়ের দিনে ওদের রোয়াকে জ্যোৎস্না রাত্রে বসে এই গানখানাই বৌদিদি প্রথম গেয়েছিল! সেই অপূর্ব করুণ সুর, গানের সুরের প্রতি মোচড়ে যেন একটি বিষণ্ণ আকাঙ্ক্ষার প্রাণঢালা আত্মনিবেদন! এ কি আর কারো গলার—ওর কুমারী জীবনের আনন্দভরা দিনগুলির কত অবসর প্রহর যে এ কণ্ঠের সুরে মধুময়!

ও পাগলের মত ছুটে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো।

রাত অনেক। কৃষ্ণাতৃতীয়ার চাঁদ মাথার ওপর পেঁৗছেচে। ফুট্ফুটে শরতের জ্যোৎস্নায় বাঁশবনের তলা পর্যন্ত আলো হয়ে উঠেছে।

ঠিক যেন তিন বছর আগেকার সেই মহাষ্টমীর রাত্রির মত।

শান্তির মা ইতিমধ্যে জেগে উঠে বল্লেন, ও কে গান করছে রে শান্তি? তারপর তিনিও তাড়াতাড়ি বাইরে এলেন। শ্রীপতিদের বাড়ি তো কেউ থাকে না, গান গাইবে কে? ওদিকে মণ্টুর মা, মণি, বাদল সবাই জেগেছে দেখা গেল।

প্রথমেই এরা সবাই ভয়ে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। পরে ব্যাপারটা বোঝা গেল। শ্রীপতি কখন রাতের ট্রেনে বাড়ি এসেছিল, কেউ লক্ষ্য করেনি। সে কলের গান বাজাচ্ছে। ওদের সাড়া পেয়ে সে বাইরে এসে বল্লে—আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে আজ চেয়ে আনলুম ওর গানখানা। মরবার ক'মাস আগে রেকর্ডে গেয়েছিল।

সবাই খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। শান্তি প্রথমে সে নীরবতা ভংগ করে আস্তে আস্তে বল্লে—ছিরুদা, রেকর্ডখানা আর একবার দেবে?

পরক্ষণেই একটি অতি সুপরিচিত, পরমপ্রিয়, সুললিত কণ্ঠের দরদ-ভরা সুরপুঞ্জে পাড়ার আকাশ-বাতাস, স্তব্ধ জ্যোৎস্না রাত্রিটা ছেয়ে গেল। মানুষের মনের কি ভুলই যে হয়! অল্পক্ষণের জন্যে শান্তির মনে হোল তার কুমারী জীবনের সুখের দিনগুলি আবার ফিরে এসেছে, যেন বৌদিদি মরেনি, কিন্নরের দল ভেঙে যায়নি, সব বজায় আছে। এই তো সামনে আসছে পুজো, আবার মহাষ্টমীতে তাদের থিয়েটার হবে, বৌদিদি গান গাইবে। গান থামিয়ে ওর দিকে চেয়ে হাসি হাসি মুখে বলবে—কেমন শান্তি ঠাকুরঝি, কেমন লাগলো!

ভিড়

স্টেশন আসতে দেরি হয়ে গিয়েছে, টিকিট-ঘরের দিকে চেয়ে হৃদস্পন্দন বন্ধ হবার উপক্রম হ'ল। তিনবার কুণ্ডলী খেয়ে এক বিরাট কিউ, টিকিটের জানালা থেকে এন্‌কোয়ারি অফিস পর্যন্ত দাঁড়িয়ে। ঘড়ির দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে সর্বাগ্রে চট ক'রে সেই কুণ্ডলী-পাকানো অজগর সাপের লেজের আগায় গিয়ে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলাম। নইলে আরও পিছিয়ে পড়তে হবে এক্ষুনি।

তিন মিনিটের মধ্যে লেজটা আরও ছ' হাত বেড়ে গেল।

বহু লোক ব্যাপার দেখে টিকিটের জানালার কাছাকাছি যে সব লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘর্মাক্ত কলেবরে, তাদের কাছে টাকা নিয়ে গিয়ে খোশামোদ করছে,—মশাই, আপনি তো টিকিট করছেনই, এই উলুবেড়ের দু'খানা অমনই ওই সংগে—

আমার, মশাই, একখানা অমনই কোলাঘাটের—

যাকে অনুনয় করা হচ্ছে, সে বলছে,—ওসব হবে না। নিজের নিয়েই ব্যস্ত—না, না, কেন আপনি বকছেন মশাই? যান, তার চেয়ে কিউতে দাঁড়ানো ভাল। লোককে খোশামোদ করা ধাতে সয় না।

কিন্তু এদিকে ঘড়িতে এগারোটা বাজে। এগারোটা কুড়িতে নাগপুর প্যাসেঞ্জার ছাড়বে —কুড়ি মিনিটের মধ্যে। সম্মুখে এই বিরাট কিউ। বিশ্বাস তো হয় না।

আরও দশ মিনিট কেটে গেল। কিউ যেমন তেমনই, বিশেষ কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন অন্তত চর্মচক্ষে তো দৃষ্টিগোচর হয় না, এক-একখানা টিকিট দিতে ছ'মাস লাগছে। এই রেটে আমার পালা আসতে বেলা আড়াইটে বাজবে, এগারোটা কুড়িতে এর সিকির সিকিও ফুরোবে না।

সংগে লটবহর, মেয়েছেলে। নইলে না হয় ফিরেই যেতাম। সারাদিনে আর ট্রেনও নেই।

এই সব ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ হুড়মুড় ক'রে গেল কিউ ভেঙে। দেখি, জনতা ঊর্ধ্বশ্বাসে পাশের জানালার দিকে ছুটছে। কি ব্যাপার, কেউ বলে না। চেয়ে দেখি, এ জনালা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ছুটলাম পাশের জানালার দিকে। সেখানে তখন ঠেসাঠেসি, ধাক্কাধাক্কি ও হাতাহাতি চলছে। পূর্বতন কিউয়ের লেজের দিকে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারাই এখন নতুন কিউয়ের পুরোভাগে আসবার প্রয়াসী।

একজন বলছে,—তুমার জায়গা এখানে ছিল? খবরদার—

—খবরদার।

—মু' সামালকে বাত বোলো—

—এই ব্যাটা, দেখবি?

মুহূর্তমধ্যে বিশৃঙ্খলা, কিলোকিলি। অকথ্য ভাষণের বন্যা ব'য়ে গেল উভয় পক্ষে।

আমি অতি কষ্টে প্রাণপণে জন আষ্টেক লোকের পেছনে জায়গা দখল করেছিলাম। মিনিট দশের পরে যখন টিকিটের জানালার কাছে আসবার পালা এল, তখন আমার গন্তব্য স্থানের কথা শুনেই মেমসাহেব বললে, নট হিয়ার, নম্বর টুয়েণ্টি।

সে আবার কোথায়? নাঃ, ট্রেন পাওয়া যাবে না দেখছি। আর সময় নেই। যদি বা অতি কষ্টে একটু জায়গা করলাম, তাও কোনও কাজে এল না। খুঁজে খুঁজে কুড়ি নম্বরের জানালা বার করলাম, সেখানেও কিউ, তবে তত লম্বা নয়। একজন বললে,—মশাই, কোথায় যাবেন? আমায় দয়া ক'রে একখানা খড়্গাপুরের—

মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছে। রূঢ়স্বরে বললাম,—কেন বিরক্ত কর বাপু?

মেমসাহেবকে নোট বার ক'রে দিতেই ছুঁড়ে ফেলে দিলে,—নো চেঞ্জ, ভাগো।

তটস্থ ও কাঁচুমাচু হয়ে বলি,—ইয়েস ম্যাডাম, সরি ম্যাডাম, হিয়ার মাই চেঞ্জ ম্যাডাম।

পকেট হাতড়ে দশ আনা পয়সা বার করবার পথ খুঁজে পাই না।

কনুইয়ের কাছে একটি সানুনয় অনুরোধ—আমায় বাবু, একখানা মেচেদার টিকিস যদি ক'রে দেন, ছোট ছেলে সঙ্গে রয়েছে, ভিড়ে ঢুকতে পারছি না, দু'বার গেনু—

মাথা তখন সম্পূর্ণ বেঠিক। বলি,—ভাগো।

—বাবু, দেন একখানা। দু'বার গেনু—

—নেই হোগা, ভাগো।—রাগের মাথায় হিন্দি বেরিয়ে পড়ে।

টিকিট-কাটা পর্ব সাঙ্গ ক'রে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটি গাড়ী ধরতে। মেয়েদের গাড়ীতে জিনিসপত্র তুলে দিলাম, কারণ চেয়ে দেখে মনে হ'ল অতি কষ্টে নিজে উঠতে পারব কি না সন্দেহ।

অসম্ভব ভিড় প্রত্যেক গাড়ীতে। তার ওপর মানুষ কেমন যেন হৃদয়হীন, রূঢ়, পশুবৎ হয়ে উঠেছে, এরা নিজের নিজের জিনিস, নিজের নিজের বসবার জায়গা সামলাতে ভীষণ ব্যস্ত ও অত্যধিক সতর্ক। এই রেলেই আগে কতবার ভ্রমণ করেছি, মানুষের মধ্যে কত সহানুভূতি কত মমত্ব দেখেছি। এখন এই বিপদের চাপে মানুষ রূঢ় কঠোর হয়ে উঠেছে। একবার মনে আছে,—সম্পূর্ণ অপরিচিতা এক ভদ্রমহিলা আমাকে তাঁদের খাবার ঝুড়ি থেকে খাবার বের ক'রে ডিশে সাজিয়ে তাঁর স্বামীর হাতে দিয়ে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। ভদ্রলোক আমার সামনে ডিশ রেখে বিনীতভাবে বললেন, একটু জলযোগ করুন।

আমি চমকে উঠলাম। হাওড়া থেকে এক সঙ্গে ইণ্টার ক্লাসে যাচ্ছি পাশাপাশি বেঞ্চিতে, অথচ একটা কথা বিনিময় হয় নি তাদের সঙ্গে আমার। জলখাবার দেওয়ার ব্যাপার ঘটল পরদিন সকালে কিউল স্টেশনে।

সংকোচের সঙ্গে বললাম,—না না, এ কেন, আমি—আপনারা খান।

—না, সে শুনব না, খেতেই হবে। এ সব স্টেশনে খাবার পাওয়া যায় না অনেক খাবার আছে আমাদের সঙ্গে, দয়া করে একটু মুখে দিন।

কোথায় গেল সে সব দিন! এখন একখানা কচুরির মত তিন ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট পুরির দাম এক আনা। মানুষের ভ্রাতৃভাব কোথায় উবে গিয়েছে।

ট্রেনের জানালার বাইরে ভিখারীর ভিড়। একজন শীর্ণকায় স্ত্রীলোক, কোলে তার একটি ছেলে, ইনিয়ে বিনিয়ে বলছে,—বাবু, তোমারা থাকতে আমরা ডুবে যাব! সমস্ত দিন খাই নি, দুটো পয়সা দেন।

একজন উত্তর দিলে,—কোথা থেকে দোব বাপু! চল্লিশ টাকা চালের মণ, এবার সবাই ডুববে, যাও, হবে না।

একটি রোগা হ্যাংলা গোছের লোক ময়লা পৈতে বার ক'রে ভিক্ষে করছে। কামরার ও-প্রান্ত থেকে সে সুর ক'রে প্রার্থনাবাণী উচ্চারণ করতে করতে আসছে শুনছি। তার নাকি অনেক কষ্ট, বাড়ীতে বৃদ্ধা মাতা শয্যাগত, স্ত্রী-পুত্র অনাহারে মরছে! যত কাছে আসে, ততই দেখলাম নিজের মনে রাগ ও বিরক্তি জমে' উঠেছে। কাছে এলে মুখ খিঁচিয়ে বলি, ইদিকে আর কোথায় আসছ? দেখছ ভিড়ের ঠ্যালা! না পাব কোথাও খুচরো যে তোমায় দোব! খুচরার অভাব বলে চা খেতে পাই নি—

গাড়ীর ভিড় ক্রমশই বাড়ছে ব'লে সবাই গাড়ীর দোর ঠেলে বন্ধ ক'রে রেখেছে, কাউকে উঠতে দেবে না। জানালা গলিয়ে জোরজবরদস্তি ক'রে লোক উঠে প'ড়ে দফায় দফায় মারমারির সৃষ্টি করছে।

—মশাই, একটু, সরে' বসুন না।

—কোথায় সরে' বসব, দেখুন। বাঃ, ঘাড়ে এসে বসলেন যে!

—আপনি যে এতটা জায়গা জুড়ে ব'সে থাকবেন! দেখছেন না ভিড়!

—তাই ব'লে আপনি ঘাড়ের ওপর এসে বসবেন? খুব ভদ্দরলোক তো?

—ভদ্দরলোক তুলে কথা বলবেন না, সাবধান ক'রে দিচ্ছি!

—ওঃ, কেন? নবাব খান্‌জা খাঁ নাকি? কিসের ভয়? তোমার এক চালায় বাস করি?

—খবরদার! মুখ সামলে। 'তুমি' 'তুমি' করবে না বলছি। একটি চড়ে—

অতঃপর, বিরাট কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি। এক পক্ষে ভাঙা ছাতা, অপর পক্ষে মুষ্টিবদ্ধ হস্ত। গাড়ীর লোকে 'হাঁ' 'হুঁ' ক'রে উভয়ের মধ্যে এসে প'ড়ে তাদের ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। চলল নানাবিধ সদুপদেশ।—এই সামান্যক্ষণ গাড়ীতে থাকা, তার জন্য কেন ঝগড়া করা? বলি, এই আঁদুল থেকেই তো লোক নামতে শুরু হবে।

গাড়ী চলেছে। কলকারখানা, লোকের ঘরবাড়ী, ধানের ক্ষেত। প্রত্যেক স্টেশনে লোকে কামরার বাইরে হ্যান্ডেল ধ'রে ঝুলছে, প্রায়ই নাকি দু-একটা প'ড়ে গিয়ে মারাও যাচ্ছে। নতুন নতুন স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে কি ভীষণ ভিড়, এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত লোকজন, মেয়েছেলে, ট্রাঙ্ক, বোঁচকা, পুঁটলি, গুড়ের ভাঁড়, চোরাই চালের বস্তা, ছাতি, লাঠি নিয়ে অধীর ব্যস্ততার সঙ্গে ছুটোছুটি করছে, যে ক'রে হোক গাড়ীতে উঠতেই হবে তাদের।

আমাদের কামরায় যত লোক ব'সে আছে, তার দু'গুণ দাঁড়িয়ে রয়েছে। যারা ঢুকতে আসছে, তাদের সকলকেই বলা হচ্ছে,—আগে যাও, আগের গাড়ী খালি।

সে স্তোকবাক্যে কেউ ভুলে আগে দেখতে যাচ্ছে, কেউ না ভুলে বলছে, কোথায় খালি বাবু, দেখে আসুন পিঁপড়ে ঢোকানোর জায়গা নেই কোনও গাড়ীতে, দেন একটু খুলে, দিনেরাতে এই একখানা গাড়ী।

এক দাড়িওয়ালা শিখ আমাদের দ্বারপাল। সে হুঙ্কার দিয়ে বলছে,—আগাড়িওয়ালা ডাব্বামে চলা যাও।

ইতিমধ্যে ওপরের তাক থেকে এক লুঙি-পরা গোঁফছাঁটা মুসলমান পা দুলিয়ে নীচের বেঞ্চিতে নামবার চেষ্টা করলে দু-একবার, ভিড়ের জন্যে কৃতকার্য হ'ল না. শেষ পর্যন্ত একজনের প্রায় ঘাড়ে পা দিয়েই নামল। লম্বা, রোগামত লোকটা, মুখখানাতে যেন বদমাইশি মাখানো। ওকে দেখে আজকের এই সমস্ত কলহ-কোলাহল-নির্মমতার প্রতীক ব'লে যেন মনে হ'ল। বিড়ির ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার ক'রে দিয়ে দিব্যি সে চেপে বসল সামনের বেঞ্চিতে।

কামরার মধ্যে অন্য কোন কথা নেই, কেবল—

—মশাই আপনাদের ইদিকে চাল কি দর?

—চাল্লিশ টাকা। আপনাদের?

—আমাদের সাড়ে বত্রিশ দেখে এসেছি।

—সে কোন্ জায়গা?

—ওই দক্ষিণে—ডায়মণ্ডহারবার।

—মানুষ এবার না খেয়ে ম'রে যাবে মশাই।

ডায়মণ্ডহারবারবাসী লোকটি বললে,—ম'রে যাবে কি মশাই, ম'রে যাচ্ছে। আমাদের ওদিকে একদিন কতকগুলো গরীব লোকের মেয়েছেলে এসে বললে, তোমাদের বনের কচু সব তুলে নিয়ে যাব, আর কচি জামরুলপাতা।

কে একজন জিজ্ঞেস করলে,—জামরুলপাতা আবার খায় নাকি?

—খায় না? গিয়ে দেখুন, আমাদের দেশে জামরুল গাছের আর পাতা নেই, সব সাবাড় করেছে।

আর একজন বললে,—এই তো আজও দুটো ভিখিরি শেয়ালদার কাছে ফুটপাথে ম'রে প'ড়ে ছিল সকালবেলা।

—আজ নতুন দেখলেন আপনি? ও দুটো-পাঁচটা রোজ মরছে। কাল বৈঠকখানার বাজারে কণ্ট্রোলের চালের কিউতে এক বুড়ি ধুঁকতে ধুঁকতে মারা গেল, আমাদের দোকানের সামনে।

—কিসের দোকান আপনাদের?

—কাপড়কাচা সাবান। আমি এই ইস্টিশানে নামব, পুঁটুলিটা ছেড়ে দেন।—চিঁড়ে, তাই দু'টাকা সের।

মনে পড়ল, আমাদের দেশের হাটে সদ্গোপ মেয়েরা চিঁড়ে বিক্রি করত, দু' আনা সের, চিরকাল দেখে এসেছি! চার আনা সেরের মুড়কি, খুব ভাল মুড়কি ছিল। আর সে সব দিন ফিরবে কখনও?

কি একটা স্টেশনে এসে গাড়ী দাঁড়াল। শিখ দাঁড়িয়ে উঠল, দরজা ঠেলে বন্ধ ক'রে যাত্রীদের রুখতে হবে। আবার একদফা হৈ-হৈ চীৎকার, গালাগালি, অনুনয়-বিনয় ও হুংকারের পালা শুরু হ'ল। একটা কচি ছেলের চীৎকার প্ল্যাটফর্মের বাইরে। একজন লোক জানালা দিয়ে গ'লে আসবার প্রাণপণ চেষ্টা করাতে গাড়ীর লোকে তাকে ধাক্কা মেরে নামিয়ে দিয়ে জানালা বন্ধ ক'রে দিলে। মনে হ'ল, বেশ হয়েছে, ওঠ জানালা দিয়ে?

মন নিষ্ঠুর নির্মম হয়ে উঠেছে বিপদের মুখে প'ড়ে। অন্য কারও সুবিধা-অসুবিধা সে এখন বুঝতে রাজি নয়!

একটা স্টেশনে দেখা গেল, চারিদিকে থৈ-থৈ করছে জল। বললাম,—এটা কি বন্যে নাকি?

একজন বললে, কাঁসাই নদীর বন্যে। কত ধান যে ডুবে গিয়েছে, দু'খানা গাঁ একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে মশাই।

শিখ দ্বারপাল বললে,—নেই হোগা, আগাড়িওয়ালা ডাব্বা একদম খালি, যাও আগাড়ি।

আর একজন বললে,—ভাসিয়ে নিয়ে যাবে না মশাই? চেতাবুনিতে যে লিখেছিল--

কোণ থেকে কে ব'লে উঠল,—বাদ দিন চেতাবুনি! জোচ্চোর কোথাকার—

অর্থাৎ লোকটা চেতাবনিতে কথিত প্রলয় দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়েছে।

এইবার সেই লুঙি-পরা লোকটি ন'ড়ে চ'ড়ে ব'সে বললে--বাবু, আমাদের নন্দিগ্রাম

থানায় এমন এক জ্বর দেখা দিয়েছে, যার হচ্ছে, তিন দিন চার দিন পরে মারা পড়ছে। আর বছর হ'ল আশ্বিনে ঝড়, এ বছর বন্যে আর তার সঙ্গে এই জ্বর। আমার মশাই বাইশ বছরের ছেলে—

ব'লেই কোথাও কিছু নেই,—লোকটা হাউমাউ ক'রে কেঁদে উঠল।

—কি হয়েছে ছেলের?

—আর কি হবে বাবু, নেই। সেই খবর পেয়েই তো দেশে যাচ্ছি। কলকাতায় কলে চাকরি করি, আর বছর ঘরদোর ঝড়ে সব প'ড়ে গেল, আবার এ বছর বাইশ বছরের ছেলেটা—

আবার সে হাউমাউ ক'রে কেঁদে উঠল। গাড়ীসুদ্ধ লোকের গোলমাল যেন মন্ত্রবলে স্তব্ধ হয়ে গেল। শিখ দ্বারপাল তার হুঙ্কার থামিয়েছে। কাছাকাছি দু-একজন লোক সান্ত্বনা দেবার কথা বলতে লাগল। কি অসহায় ওর কান্না!

—কেঁদো না ভাই, কি করবে কেঁদে, আহা, বাইশ বছরের ছেলে! বাঁচা-মরা কারও হাতে নয় দাদা। নাও, বিড়িটা ধরাও।

ওই একটি পুত্রবিয়োগাতুর পিতার ক্রন্দনে গাড়ীর আবহাওয়া যেন বদলে গেল এক মুহূর্তে।

সূচগ্রপরিমাণ স্থানের জন্যে যে নির্লজ্জ চেষ্টা ও আঁকড়ে থাকবার আগ্রহ, তা বন্ধ হয়ে গেল!

—স'রে আসুন না, এদিকে জায়গা আছে।

একটা ছোট ছেলে অনেকক্ষণ থেকে একটা নারকেল তেলের বোতল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, এতক্ষণ পরে একজন কে তাকে হাত ধ'রে বললে,—বাবা, এখানে ব'স কোনও রকমে, হয়ে যাবে এখন।

যে লুঙি-পরা লোকটিকে এতক্ষণ আমি গুণ্ডার সর্দার ব'লে ভাবছিলাম, তার মুখের দিকে চেয়ে কেমন একটা করুণা ও সহানুভূতির উদ্রেক হ'ল। হতভাগ্য পিতা, হয়তো ওর বৃদ্ধ বয়সের সম্বল হয়ে দাঁড়াত এই পুত্রটি, হয়তো ওর একমাত্র পুত্র। গাড়ীর আবহাওয়া ওর কান্নার সুরে কি আশ্চর্যভাবেই বদলে গিয়েছে। এই নির্মমতা নিষ্ঠুরতা, উগ্র স্বার্থবোধ, যা হাওড়া থেকে উঠে পর্যন্ত সমানে দেখে আসছি, যাতে শুধু মানুষের পশুত্বের ছবিটাই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল চোখের সামনে, ওই লুঙিপরা লোকটির চোখের জলে সব যেন ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল। মানুষের লজ্জা হ'ল মানবতার অপমানে যেন। যেন সবাই সতর্ক হয়ে উঠল।

এইবার যে স্টেশনে গাড়ী এসে দাঁড়াল, সেখানে লোকটি নেমে যাবে! গাড়ীর এক কোণে একটি দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ ব'সে ছিল, সে আবেগভরে বললে,—এখানে নামবে? আচ্ছা বাবা, ভগবান তোমার মনে শান্তি দিন, আমি বুড়ো বামুন, আশীর্বাদ করছি, ভালো হবে তোমার, ভালো হবে।

শনিবারের চিঠি অগ্রহায়ণ ১৩৫০

থিয়েটারের টিকিট

সকালে উঠেই আভা স্বামীকে বল্লে—ওগো, শিগ্‌গির করে বাজারটা করে এনে দাও—সকাল সকাল রান্নাবাড়া করে আবার তৈরী হ'বে তো? যা বেলা ছোট।

অবিনাশ বল্লে—কি কি আনতে হবে, একটা ফর্দ করে রাখো। আমি কলঘর থেকে চট্ করে আসি—আর একটু পরে কলঘর খালি পাওয়া যাবে না।

—এখনই যায় কিনা দেখ—একটা কল, আর এই সাতঘর ভাড়াটে, এখন দোতলার বুধুর মা জল নিতে এসেচে, এই তো দেখে এলুম।

—না, বাড়ীটা বদলাবো এই সামনের মাসেই, এরকম কষ্ট আর পোষায় না। দেখে এস বুধুর মা আছে না গেল—সকালে উঠে একটু চান করবার জো নেই!

আভা খুকীকে কাল রাত্তিরের বাসি রুটি ও একটু গুড় একখানা কলাইকরা রেকাবিতে বার করে দিয়ে চঞ্চল পদে নৃত্যের লঘুচটুল ভঙ্গিতে কলঘরের দিকে গেল এবং তখুনি ফিরে এসে বল্লে—শীগ্‌গির যাও—এখুনি আবার বুড়ো নিবারণ বাবু নাইতে আসবে—খালি আছে—

তারপর সে বাজারের ফর্দ করতে বসলোঃ—

আলু—এক পো

বেগুন—এক পো

রাঙা শাক—আধ পয়সা

কাঁচকলা—এক পয়সা

নুন—এক পয়সা

পান—দু' পয়সা।

অবিনাশ কলঘর থেকে ফিরে এসে বল্লে—পান দু' পয়সা?

আভা ঘাড় দুলিয়ে বল্লে—তা হবে না? ওবেলা এক কৌটো পান সেজে সঙ্গে করে নিতে হবে না?...রাস্তায় যেখানে সেখানে পান কিনতে আমি তোমায় দেবো না বাপু।

অবিনাশ বাজারে চলে যাওয়ার পরে আভা উনুনে কয়লা দিয়ে কলঘরের দিকে গেল নাইতে।

তবু আজ রবিবার তাই অনেকটা রক্ষে...সময় তাও খুব বেশী কোথায়? খেতে দেতেই তো আজ বেলা বারটা বেজে যাবে এখন...তারপর সাজগোজ...তৈরী হওয়া... একটার তোপ পড়লে দুটো বাজতে আর কত দেরি থাকে?

—খুকী, ও খুকী, শোন্ তুই আর আমি একজায়গায় বসবো কেমন তো? ওমা মুখে সিঁদুর মেখে ভূত হলি যে! তুই ঠিক যেন একটা—হি-হি-হি—

খুকীর হাত থেকে সিঁদুরকৌটো ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে কড়ি থেকে দোদুল্যমান দড়ির শিকেতে তুলে রেখে আভা হাত উঁচু করে ওপরদিকে হাস্যোচ্ছল মুখখানা তুলে বল্লে—উড়ে গেল—হুস্—যাঃ—

খুকীর আসন্নপ্রায় কান্না অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে পরিবর্তিত হওয়াতে সে অবাক চোখে মায়ের হস্তেভিঙ্গতে প্রদর্শিত ঘরের কড়িকাঠের শূন্যতার দিকে চেয়ে রইল।

আভা বল্লে—আবার আমরা একজায়গায় যাচ্চি যে খুকু, কত কি দেখচি, তুই খাবার খাচ্চিস। ছবি, বাজ্‌না কত কি হচে—গাড়ী চড়ব তুই আর আমি—বুঝলি খুকি, বুঝলি?

অবিনাশ বাজার করে এনে ছোট্ট পায়রার খোপের মত রান্নাঘরটার সামনে নামালো। আভা গামছা খুলে বল্লে—মাছ আননি?

—তেমন মাছ পেলাম না, আবার ওবেলাকার ধরো রিক্‌সাভাড়া রয়েচে—কতকগুলো পয়সা—

—থাক্‌গে তবে। তুমি তাহোলে কবিরাজের বাড়ী থেকে চট্ করে সেরে এস—বেশী দেরি হয় না যেন। খেতেদেতে' ওদিকে আবার—

যথেষ্ট সময় থাকবে, ভাবনা কি? এই তো য়্যালবার্ট হল্, কতটুকুই বা রাস্তা। যেতে ধরো কুড়িমিনিট রিক্‌সাতে—গোলদীঘি দেখ নি? সেই সেবার কালীঘাট থেকে

আসতে দেখালাম, রেলিং দিয়ে ঘেরা একটা পুকুর কত লোক বেড়াচ্ছে, মনে নেই? ওরই কাছে।

অবিনাশ চলে গেল।

আভা ছুটোছুটি করে রান্না চড়িয়ে দিলো......মনে আজ তার ভারি আনন্দ! কত-দিন সে কোথাও বেড়ায় নি, সেই পৌষমাসে কালীঘাট গিয়েছিল, আর এটা আশ্বিন মাসের প্রথম...কোনো কিছু দেখা, বা কোথাও যাওয়া তো ঘটেই ওঠে না। লোকে বলে কলকাতা শহরে কত দেখবার জিনিস, কি-ই বা দেখলো সে কলকাতায় এসে? এসেচে তো আজ দু'বছরের ওপর হ'ল।

আর কি করেই বা হবে? খুকীর বাবা একটা কাগজের দোকানে কাজ করে, মাসে ত্রিশটি টাকা মাইনে পায়। ওর মধ্যে দুধ, ওর মধ্যে ঘরভাড়া, ওর মধ্যে কাপড় চোপড়। মাসের শেষে এক একদিন বাজার হয় না, তা বেড়ানো আর থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখা। মুদী ধারে চাল ডাল দেয়, তাই রক্ষে।

ধার চারিদিকে। কয়লাওয়ালা, কেরোসিন তেলওয়ালা, ধোপা, মুদী, বাড়ীভাড়া। তবুও তো ঠিকে ঝিটাকে ওমাস থেকে জবাব দেওয়া হয়েচে, আভা নিজেই সব কাজ করে। খুকি এখন বড় হয়েচে, মাসে দেড়টাকা ঝিয়ের পেছনে দেওয়ার চেয়ে ওই দেড় টাকায় খুকীর আর খুকীর বাপের বিকেলের জলখাবারটা তো হয়ে যায়!

পরশু অবিনাশ এসে একখানা রাঙা কার্ড আভার হাতে দিয়ে বলেছিল, টিকিটখানা ভালো করে রেখে দাও তো আভা।

আভা বল্লে—এ কিসের টিকিট গো?

—ও, আমাদের এসোসিয়েশানের বার্ষিক উৎসব কিনা রবিবার। এ্যালবার্ট হল ভাড়া নিয়েচে। তাই একখানা টিকিট দিয়েচে।

—কি হবে সেখানে?

—কনসার্ট হবে, গান হবে। তার পরে খাওয়া-দাওয়া আছে।

—আমার জন্য একখানা টিকিট আনলে না কেন? আর দেয় না? বেশ গান শুনতুম, দেখতুম কি হয়। কতকাল তো কোথাও বেরুইনি। দেখো না যদি পাওয়া যায়—

তাই অবিনাশ কাল শনিবারে আর একখানা রাঙা টিকিট এনেচে।

খাওয়া দাওয়া সারাসোরা হয়ে গেলে আভা আর একটুও বসেনি। এক বালতি জল ওবেলা অতিকষ্টে মারামারি করে কলঘর থেকে সংগ্রহ করেছিল—নইলে বেলা দুটোর সময় গা ধোয়ার জল কোথায় পাওয়া যাবে? সাত ঘর ভাড়াটের সঙ্গে একত্রে বাস ন্যায্য নাইবার জল তাই মেলে না—তা আবার অসময়ে শখের গা ধোওয়া! কি কষ্ট যে জলের এ বাসাতে!

আভা আগে আগে অবাক্ হয়ে যেতো জলের কষ্ট দেখে। নদীর ধারের পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, মাপজোপ করে জল ব্যবহার করবার কল্পনা সে করতে পারতো না। এখন অবিশ্যি সব সয়ে গেছে।

সাবান মেখে, গা ধুয়ে, সাজগোজ করতে বেলা আড়াইটা বেজে গেল। রিক্সা ডাকতে আর একটু দেরি হ'ল। ওরা যখন বাসা থেকে বেরুলো, তখন পৌনে তিনটে।

আভা অধীর আগ্রহে চেয়ে আছে কতক্ষণ সেই রেলিং-দেওয়া পুকুরটা দেখা যাবে—যার ধারে—ঐ যে কি নাম জায়গাটার?

য়্যাল্‌বার্ট হল? খুব বড় বাড়ী? ক'তলা? তোমাদের ক'তলায় সভা হবে?

কিন্তু সকলের চেয়ে আকর্ষণের বিষয়—কাগজের দোকানের লোকেরা মিলে এখানে আজ থিয়েটার করবে। থিয়েটার কি জিনিস, আভা কখনও দেখে নি।

ওদের রিক্সা যখন সংস্কৃত কলেজের কাছাকাছি এসে পৌঁছেচে, তখন দূরাগত

সমুদ্রকল্লোলের মত একটা শব্দ ওদের কর্ণগোচর হ'ল। অবিনাশ ঘাড় উঁচু করে যা চেয়ে দেখলে, তাতে তার তো চক্ষু স্থির।

প্রথমটা ওর মনে হোল য়্যালবার্ট হলে ঢোকবার দরজার সামনে রাস্তার ওপর একটা বুঝি দাঙ্গা চলচে।

প্রায় শ' দুই আড়াই লোক এক জায়গায় জড় হয়ে এক যোগে চীৎকার, ঠেলাঠেলি করচে—য়্যাল্‌বার্ট হলের কলেজ স্ট্রীটের দিকের সিঁড়ির মুখ থেকে জনতা শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত বিস্তৃত।

অবিনাশ বল্লে—এঃ, বড্ড ভিড় জমে গেছে দেখচি!

ভিড় ঠেলে রিক্‌সা থেকে নেমে ওরা কোনো রকমে দরজা পর্যন্ত গেল বটে, কিন্তু আর এগোনো অসম্ভব। সিঁড়িটা লোকে লোকারণ্য। একটা দলের সঙ্গে ওরা ওপরে খানিকদূর উঠতে গেল ব্যস্তসমস্ত হয়ে—আভা ভাবলে না জানি কি অদ্ভুত ব্যাপার চলচে ওপরে, যা দেখবার জন্যে এত ভিড়—কিন্তু দু-চার সিঁড়ির ধাপ উঠতে না উঠতে ওপর থেকে আর এক দলের ধাক্কা খেয়ে ছিট্‌কে এসে পড়ল দেওয়ালের গায়ে। ওদের চারিপাশে ভিড় জমে গেল! আভার কপালে বেশ লেগেচে দেওয়ালে ঠুকে গিয়ে, ফুলে উঠেচে এরই মধ্যে। সবাই বলে—আহা, কোথায় লাগলো! জনতার কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে আভা জড়সড় হয়ে গেল। একজন ঘর্মাক্তকলেবর ভলাণ্টিয়ার এসে অবিনাশকে বল্লে—আহা-হা, কোথায় লেগেচে! আপনি এই ভিড়ে মেয়েদের এনেচেন? ভাল করেন নি। আচ্ছা, আপনি ওঁকে নিয়ে বাইরে দাঁড়ান। দেখি আমি।

সত্যই দেখা গেল জনতার মধ্যে আর কোন মেয়ে নেই—মেয়ের মধ্যে একা আভা আর তার আড়াই বছরের খুকী...

অবিনাশ আভাকে ভিড়ের মধ্য থেকে বার করে এনে খানিকক্ষণ ফুটপাথে দাঁড় করিয়ে রাখলে। ঝাড়া কুড়ি মিনিট কেটে গেল, কারো দেখা নেই। ওপর তলার খোলা জানালা দিয়ে নীচে বাজ্‌নার শব্দ যেন কানে আসচে। আভা অধীর ভাবে বল্লে—কই কেউ তো এল না? ওপরে যাবে না?......এইবার চলো 'দিকি সিঁড়ির ধারে?

অবিনাশ আর একবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলে ভলাণ্টিয়ারেরা কাউকে ওপরে যেতে দিচ্চে না। একজন বল্লে—মশাই, ওপরে মেয়েদের নিয়ে যেতে আপনাকে পরামর্শ দিই নে। মারামারি হচ্চে সেখানে। আর একটি মেয়েও নেই—কোথায় মেয়েদের নিয়ে যাবেন সেখানে?

আভা লজ্জায় মরে গেল।

ফিরবার পথে, রিক্‌সায় উঠে তখন উত্তেজনা ও আগ্রহ কমে গিয়ে আভার ওপর অবিনাশের করুণা হ'ল। অতগুলো পুরুষের ভিড়ের মধ্যে সেজেগুজে সে থিয়েটার দেখতে এসেচে আশা করে, জানেও না আজকার আসাটা কতটা অশোভন দেখালো। কি ভাবলে সবাই......। ও দুঃখিত হয়েচে থিয়েটার দেখতে না পেয়ে! স্ত্রীকে বল্লে—খুব লেগেচে নাকি কপালে? দেখি? দেখাও হ'ল না, কিছুই না—যাতায়াতে রিক্‌সা ভাড়া ছ'আনা পয়সাই দণ্ড মিছিমিছি।

আভা কিন্তু ভাবছিল তার আঁচলে-বাঁধা রাঙা টিকিট দুখানার কথা। কাল খুকীর বাবা তাকেই রাখতে দিয়েছিল, আজ সে হুঁশিয়ার হয়ে আঁচলে বেঁধে এনেছিল টিকিট দুখানা। কত কষ্টে যোগাড় করা, কোনো কাজেই এল না, মিছামিছি গেল!

পার্থক্য

সকাল হইতে ভিখিরীর উপদ্রব লাগিয়াই আছে।

এদিকে ঘরে চাউল নাই, ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে। গৃহিনী জানাইলেন, চাউল যা আছে তাহাতে আর দিন চারেক চলিবে। বাজারে চাউল নাই একথা বলিলে ভুল হইবে, আছে চোরাবাজারে, সাঁইত্রিশ টাকা মন।

গৃহিণীকে শুনাইয়া বলি—ভাতের ফ্যানে যা কিছু সার অংশ থাকে। ফ্যান যে ফেলে দেওয়া হয় ওতে সত্যিই আমাদের বস্ত……মানে যা কিছু পুষ্টিকর ওর সঙ্গে বেরিয়ে যায়। সাহেবেরা ফ্যান ফেলে না, জাপানীরা ফেলে না।

আমার ইঙ্গিত বাড়ীর কেহই বুঝিল না। ঝরঝরে ভাতই খাইতে লাগিলাম।

শুনিলাম আর দু'দিন চলিবে। তার উপর ভিখিরী। সকাল হইতেই শোন—মা দুটি চাল দেন, মা একটু ফ্যান—

মনে সহানুভূতি জাগায় না, রাগ ধরে। ঘরে নাই চাউল, কেবল ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও, সকাল হইতে! হিসাব করা চাউল আজকাল। এদিকে বাজারে ও-দ্রব্য প্রায় অমিল। সাঁইত্রিশ টাকা দরে চাউল কিনিয়া কতদিন চালাইব। কায়ক্লেশে যদি বা চলে, ভিখিরীর উপদ্রবে আর তো পারি না! অথচ ভিক্ষা মিলিবে না বলিতে পারি না, সংস্কারে বাধে।

বাল্যে পল্লীগ্রামের বাড়ীতে থাকিতে দেখিতাম, মুষ্টিভিক্ষা হইতে ফকির বৈষ্ণবকে কেহ কখনো বঞ্চিত করিত না। সেই হইতে কেমন একটা সংস্কার দাঁড়াইয়া গিয়াছে—ভিক্ষা না দিয়া পারি না।

কিন্তু আসিলে বিরক্ত হই। না আসিলেই যেন ভালো।

সকালে ছোট ঘরে বসিয়া লিখিতেছি, চাকর বাজার হইতে বাড়ী ঢুকিল হাতে মাঝারি গোছের একটি পুঁটুলি। বাড়ীর ভিতর হইতে মেয়েরা কি চাউল আনিতে পাঠাইয়াছিল? ভাঁড়ার খালি? বলিলাম—ওতে কি রে?

রাজেন চাকরটি জিনিসটা লুকাইয়া লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, ভাবে বুঝিলাম। ধরা পড়িয়া একটু অপ্রতিভ হইল। মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—চাল আজ্ঞে।

—ও, কত?

—দু'সের করে চাল আজ্ঞে জহুরীর দোকানে। কন্‌ট্রোল—

—ও, কন্‌ট্রোলের দোকান তাহোলে এখানেও হ'ল? কত দিচ্চে?

—দু টাকার বেশি দেবে না আজ্ঞে।

এটা বাঙলা নয়, বিহার। তবুও এখানে কন্‌ট্রোল খুলিল, দু টাকার বেশি চাউল কাহাকেও দেওয়া হইবে না—এ সব কি?

একজন ভিখিরী আসিয়া হাঁকিল—ভিক্ষে দেন মা-চাড্ডি ভিক্ষে—

রাজেন বলিল—ভিক্ষে হবে না যাও, চাল নেই—

লিখিতে লিখিতে বলিলাম—দে এক মুঠো দে—

সঙ্গে সঙ্গে আসিল আর একজন। তাকেও ভিক্ষা দেওয়া হইল।

বেলা ন'টা আন্দাজ সময়ে আরও দুইজন। ভিক্ষা লইয়া তাহারাও চলিয়া গেল। এইবার একজন বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। মনে তখন বিরক্তি ধরিয়াছে, রাজেনকে বলিলাম, ভিক্ষা না দেয়। কিন্তু তবুও লোকটা কেন দেরি করিতে লাগিল, কেন তবুও যায় না, বার বার একঘেয়ে চীৎকার করিতে লাগিল। বড়ই রাগ হইল। বাহির হইয়া বলিলাম—ভিক্ষে হবে না, চলে যাও—আবার কি?

লোকটি বৃদ্ধ। পরনে একটুকরা মলিন নেকড়া, হাতে তোবড়ানো টিনের মগ। জীর্ণ শীর্ণ চেহারা বটে, তবে বাংলাদেশের ভিখারির মত কংকালসার নয়।

লোকটা মগটা তুলিয়া টানিয়া টানিয়া বলিল—একটু ফ্যান দাও বাবা—বড্ড খিদে পেয়েচে—

রাগিয়া বলিলাম—কি আব্দার রে! আবার ভাতের ফ্যান—

—দেন বাবা একটুখানি—

—ভাগ এখান থেকে! যাঃ—আব্দার দ্যাখো—কোন সকালে রান্না হয়েচে, এখন ফ্যান রয়েচে ওর জন্যে।

লোকটা হতাশভাবে চলিয়া গেল, আবার লিখিতে বসিলাম। ইহাতে আমার সংস্কারে বাধিল না। প্রতিদিনের বরাদ্দ মত মুষ্টি-ভিক্ষা তো দিয়াছি। ক'জনকে দেওয়া যায়? বেলা বাড়িল, স্নান করিতে যাইব। এমন সময় একটি প্রৌঢ় ব্যক্তি গায়ে অর্ধমলিন পিরান, পায়ে চটি জুতা, হাতে এক গাছা বাঁশের লাঠি, জানালার কাছে দাঁড়াইয়া বলিল—বাবু, আপনারা ব্রাহ্মণ?

মুখ তুলিয়া তারের বেড়ার ওপারে চাহিয়া বলিলাম—কেন, কি চাই?

লোকটা হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—ব্রাহ্মণেভ্যো নমো—

প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিলাম—কোত্থেকে আসা হচ্চে?

—বাবু, ঢুকবো বাড়ীর ভেতর? আমিও ব্রাহ্মণ।

—হ্যাঁ আসুন।

লোকটা বাড়ীতে ঢুকিল বটে, কিন্তু বারান্দায় না উঠিয়া উঠানেই দাঁড়াইয়া বলিল—একটা কথা আছে। অনেক খুঁজেচি, ব্রাহ্মণ বাড়ী পাই-ই নি। আমার বাড়ী নদেশান্তিপুর—মুসাবনীতে আমার এক আত্মীয় কাজ করে, সেখানেই যাচ্চি। সঙ্গে একটা ছোট ছেলে আছে, ওই আতাতলায় বসিয়ে রেখে এসেচি। একটু খাবার জল যদি আমাদের দেন—

—হ্যাঁ হ্যাঁ—তার আর বেশী কথা কি—বিলক্ষণ। ডেকে আনুন।

ছেলেটিও আসিল। দেখিয়া বুঝিলাম ইহারাও দুর্দশাগ্রস্ত ভিক্ষুক। মুখে খাদ্য চাহিতে পারিতেছে না। বলিলাম—আপনাদের খাওয়া হয়নি তো, এত বেলায় কোথায় যাবেন—এখানেই দুটো ডাল ভাত—

—না না, একটু জল খেয়েই যাবো। আপনাকে আর কেন বিরক্ত······মুসাবনীতে আমার ভাইপো—

সে কি হয়! বসুন বসুন—মুসাবনী এখান থেকে ছ'মাইল পথ।

না খাওয়াইয়া ছাড়িলাম না। দু'জনে খাইয়া দাইয়া বিশ্রাম করিয়া বিকালের দিকে চলিয়া গেল।

রাত্রে শুইবার সময় হঠাৎ মনে পড়িল— এ কেমন হইল? ভাতের ফ্যান চাহিতে ভিখিরীর উপর রাগিয়া উঠিলাম, অথচ নদে-শান্তিপুরের ব্রাহ্মণ শুনিয়া আদর করিয়া দু'জনকে খাওয়াইলাম, এখন তো চাউল বাঁচাইবার কথা মনে উঠিল না?

কেন এমন হয়?

ভাবিয়া দেখিলাম—ইহার কারণ সে ভিখিরী আমার শ্রেণীর মানুষ নয়। নিজেকে আমি ভিখিরীরূপে কল্পনা করিতে পারি না, কিন্তু মনে মনে নিজেকে নদীয়াবাসী দরিদ্র-ব্রাহ্মণরূপে অনায়াসে কল্পনা করিতে পারি।

দেশ ১৩৫০

বামা

আমার যখন বাইশ চব্বিশ বছর বয়েস তখন নানা দেশ বেড়ানোর একটা কাজ জুটে গেল আমার অদৃষ্টে। তখন আমি দৈব ঔষধের মাদুলি বিক্রি করে বেড়াতুম। চুঁচড়োর শচীশ কবিরাজের তরফ থেকে মাইনে ও রাহাখরচ পেতুম। অল্প বয়সের প্রথম চাকরি, খুব উৎসাহের সঙ্গেই করতুম।

আমাকে কাপড়চোপড় পরতে হ'ত সাধু ও সাত্ত্বিক বামুনের মতো। ওটা ছিল ব্যবসায়ের অঙ্গ। গিরিমাটির রঙে ছোপানোর কাপড় পরণে, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো গলায় মালা, হাতে থাকতো একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ, তারই মধ্যে মাদুলি ও অন্যান্য ওষুধ থাকতো।

বছর তিনেক সেই চাকরি করি, তারপর শরীরে সইলো না বলে ছেড়ে দিলুম।

একবার যাচ্ছি বর্ধমান জেলার মেমারি স্টেশন থেকে মাখমপুর বলে একটা গ্রামে। এটা মাদুলি বিক্রির জন্যে নয় ; মাখমপুরে শচীশ কবিরাজের শ্বশুরের বাড়ী। সেখানকার জমিজমার ওয়ারিশান দাঁড়িয়েছিলেন শচীশবাবু—শ্বশুরের ছেলেপুলে না থাকায়। আমাকে পাঠিয়েছিলেন পৌষ-কিস্তির সময় জমিজমার খাজনা যতটা পারি আদায় করে আনতে।

কিন্তু তা হ'লেও পরণে আমার গেরুয়া কাপড়, হাতে মাদুলি ও ওষুধভরা ক্যাম্বিসের ব্যাগ ইত্যাদি সবই ছিল, যদি পথেঘাটে কিছু বিক্রি হয়ে যায়, কমিশনটা তো আমি পাব!

কখনও ও অঞ্চলে যাইনি। মেমারি স্টেশনে নেমে বেলা দুটোর সময়ে হাঁটচি তো হেঁটেই চলেচি, পথ আর ফুরোয় না। এক জায়গায় একটা ছোট বাজার পড়লো, সেখানে কিছু খেয়ে নিয়ে আবার পথ হাঁটি।

গ্রামে গ্রামে ওষুধ বিক্রি করে বেশ কিছু রোজগারও করা গেল, দেরিও হ'ল বিশেষ করে সেই জন্যে। আর একটা বাজার পড়লো। সেখানে দোকানদারদের কাছে শুনলুম, আমার গন্তব্য স্থানে পোঁছুতে অন্ততঃ রাত নটা বাজবে। কিন্তু সকলেই বললে, "সন্ধ্যের পরে আগে গিয়ে আর পথ হাঁটবেন না, ঠাকুরমশায়। এই সব দেশে ফাঁসুড়ে ডাকাতের বড় ভয়, বিদেশী দেখলে মেরেধরে যথাসর্বস্ব কেড়ে নেয়। প্রায়ই বনের ধারে বড় বড় মাঠের মধ্যে ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকে। সাবধান, একটা দীঘি পড়বে মাঠের মধ্যে ক্রোশ তিনেক দূরে, জায়গাটা ভালো নয়......"

বড় বড় মাঠের ওপর দিয়ে রাস্তা। সন্ধ্যা প্রায় হয়-হয়, এমন সময় দূরে একটা তালগাছ ঘেরা দীঘি দেখা গেল বটে। আমার বুক ঢিপঢিপ করে উঠলো। দীঘির ও-পাশে সঞ্জয়পুর বলে একটা গ্রাম, সেখানেই রাত্রের জন্যে আশ্রয় নেওয়ার কথা বাজারে বলে দিয়েছিলো। কিন্তু সন্ধ্যা তো হয়ে গেল তালদীঘির এদিকেই—অন্ধকার হবার দেরি নেই, কোথায় বা সঞ্জয়পুর, কোথায় বা কি?

মনে ভারি ভয় হ'ল। কি করি এখন? সঙ্গে মাদুলি ও ওষুধ বিক্রির দরুন অনেক টাকা। পরক্ষণেই ভাবলাম, কিছু না পারি, দৌড়তে তো পারব? না-হয় ব্যাগটাই যাবে,—প্রাণ তো বাঁচবে।

ভয়ে ভয়ে দীঘির কাছাকাছি তো এলুম। বড় সেকেলে দীঘি, খুব উঁচু পাড়, পাড়ের দুধারে বড় বড় তালগাছের সারি। তার ধার দিয়েই রাস্তা। দীঘির পাড়ে কিন্তু লোকজনের সম্পর্ক নেই। যে ভয় করেছিলুম, দেখলুম সবই ভুয়ো। মানুষ মিথ্যে যে কেন এ-রকম ভয় দেখায়!

প্রকাণ্ড দীঘিটার পাড় ঘুরে যেমন তালবনের সারি ও দীঘির উঁচু পাড়কে পেছনে ফেলেচি, সামনেই দেখি ফাঁকা মাঠের মধ্যে দূরে একটা গ্রাম লি-লি করছে—নিশ্চয় ওটা সেই সপ্তয়পুর!···বাঁচা গেল বাবা! কি ভয়টাই দেখিয়েছিল লোকে! দিব্যি ফাঁকা মাঠ, কাছেই লোকের বসতি, গাঁয়ের গরু বাছুর চরছে মাঠে—কেন এ সব জায়গায় বিপদ থাকবে?

আমি এই রকম ভাবচি, এমন সময় তালপুকুরের ওদিকের পাড়ের আড়ালে যে পথটা সেই পথ বেয়ে একজন বৃদ্ধকে আমার দিকে আসতে দেখলুম। বৃদ্ধ বেশ বলিষ্ঠ গড়নের, এই বয়সেও মাংসপেশী বেশ সবল, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে ছোট একটি লাঠি।

বৃদ্ধ আমায় বললে, "ঠাকুরমশায় কোথায় যাবেন?"

"যাব মাখমপুর······"

"মাখমপুর! সে যে এখনও তিন ক্রোশ পথ······কাদের বাড়ী যাবেন?"

"শচীশ কবিরাজের বাড়ী।"

"ঠাকুরমশায় কি কবিরাজমশায়ের গোমস্তা?"

"গোমস্তা নই, তবে যাচ্ছি জমিজমার কাজে বটে।"

"এ অঞ্চলে আর কাউকে চেনেন?······মশাইয়ের নিজের বাড়ী কোথায়?"

"আমি এদিকে কখনও আসিনি, কাউকে চিনিও নে। মাখমপুরেও নতুন যাচ্ছি···"

"সেখানেও কেউ তা'হলে আপনাকে চেনে না?"

"নাঃ, কে চিনবে?"

আমার এই কথায়, আমার যেন মনে হ'ল বুড়ো একটু কি ভাবলে, তারপর আমায় বললে, "কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা বলি······রাত্রে আজ দয়া করে আমার বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিন। আমরা জাতে বারুই, জল-আচরণীয়, আপনার অসুবিধে হবে না। চণ্ডীমণ্ডপের পাশে বাইরের ঘর আছে, সেখানে থাকবেন, রান্নাবাড়া করে খাবেন······আসুন দয়া করে······"

আমি বৃদ্ধের কথায় ভারী সন্তুষ্ট হলুম। সত্যিই তো, সেকালের লোকেরা অন্য ধরণের শিক্ষায় মানুষ। অতিথি-অভ্যাগতদের সেবা করেই এদের তৃপ্তি। বৃদ্ধ এই প্রস্তাব না করলে রাঢ়-অঞ্চলের অজানা মেঠো পথ বেয়ে এই সুমুখআঁধার রাতে আমার যেতেই তো হ'ত মাখমপুরে, তিন ক্রোশ হেঁটে।

গ্রামের পূর্বপ্রান্তে বড় মাঠের ধারে বৃদ্ধের বাড়ী। বৃদ্ধের নাম নফরচন্দ্র দাস। আমি চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে উঠতেই একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠলো।

কুকুরের এই ডাকটা আমার ভালো লাগলো না ; এর আমি কোন কারণ দিতে পারবো না,—কিন্তু এই কুকুরের চিৎকারে যেন একটা ছন্নছাড়া অমঙ্গলজনক অর্থ আছে—মঙ্গল-সন্ধ্যায় কোন গৃহস্থবাড়ীতে আসি নি, যেন শ্মশানভূমিতে এসেচি······

বৃদ্ধের বাড়ী দেখে মনে হ'ল বেশ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। বাড়ীর উঠোনে সারি সারি তিনটে বড় বড় ধানের গোলা—গোলার সঙ্গে প্রকাণ্ড গোয়ালঘর, বলদ ও গাইয়ে প্রায় কুড়ি বাইশটা। অন্তঃপুরের দিকে চারখানা বড় বড় আটচালার ঘর। বাইরের এই চণ্ডী-মণ্ডপ ও তার পাশে আর একখানা কুঠরি!

আমার কথাটা ভালো করে বুঝতে গেলে এই কুঠরিটার কথা আর একটু ভালো করে শুনতে হবে। কুঠরিটিকে চণ্ডীমণ্ডপ-সংলগ্ন একটা কামরাও বলা যায়, কারণ একটা সরু রোয়াকের দ্বারা চণ্ডীমণ্ডপের পেছন দিকের সঙ্গে সংলগ্ন ; অথচ দোর বন্ধ করে দিলে বাইরের বাড়ীর সঙ্গে এর সম্পর্ক চলে গিয়ে এটা ভেতরবাড়ীর একখানা ঘরের

সামিল হয়ে দাঁড়ায়।

আমায় বাসা দেওয়া হ'ল এই কুঠরিতে। কুঠরির একপাশে ছোট একটা চালা। সেখানে আমার রান্নার আয়োজন করে দিয়েচে। হাত-মুখ ধুয়ে সুস্থ হয়ে আমি বিশ্রাম ক'রচি।

গৃহস্বামী এসে বললে, "ঠাকুরমশায় রান্না চাপান্, আর রাত করেন কেন?"

আমি রান্নাচালায় বসে রান্না চড়িয়ে দিতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি একটি বাড়ীর বৌ ভেতর থেকে একগাছা ঝাঁটা হাতে এসে আমার রান্নাচালার সামনে দিয়ে ঢুকলো ও ঝাঁট দিতে লাগলো।

কুঠরির দরজা খোলা, আমি যেখানে বসে সেখান থেকে কুঠরিটার ভেতর দেখা যায়। আমি দু-একবার বিস্ময়ের সংগে দেখলুম বৌটি ঝাঁট দিতে দিতে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখচে। দু'তিন বার বেশ ভালো করে লক্ষ্য করে মনে হ'ল বৌটি ইচ্ছে করেই আমার দিকে অমন করে চাইচে।

আমি দস্তুরমত অবাক হয়ে গেলুম। ব্যাপার কি? সম্পূর্ণ অপরিচিতা মেয়ে, পল্লীর গৃহস্থবধূ—এমন ব্যবহার তো ভালো নয়? কি হাংগামায় আবার পড়ে যাবো রে বাবা। কর্তাকে কাছে বসিয়ে রাঁধতে রাঁধতে গল্প করবো নাকি?

এমন সময় বৌটি ঝাঁট শেষ করে চলে গেল। কিন্তু বোধ হয় পাঁচ মিনিট পরেই আবার এলো। দেখে মনে হ'ল সে যেন খুব ব্যস্ত, উদ্বিগ্ন, উত্তেজিত। এবারও সে কুঠরির মধ্যে ঢুকে এটা ওটা সরাতে লাগলো এবং আমার দিকে চাইতে লাগলো, তারপর হঠাৎ রান্নাচালার দরজায় এসে চকিতদৃষ্টিতে চারদিক চেয়ে কেউ নেই দেখে আমার দিকে আরও সরে এলো এবং নিচুস্বরে বললে, "ঠাকুরশমায়, আপনি এখনই এখান থেকে পালান, না হলে আপনি ভয়ানক বিপদে পড়বেন—এরা ফাঁসুড়ে ডাকাত, রাতে আপনাকে মেরে ফেলবে"—বলেই চট করে বাড়ীর মধ্যে চলে গেল!

শুনে তো আর আমি নেই! হাতের খুন্তি হাতেই রইলো, সমস্ত শরীর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল—আর সারা হাত-পা অবশ ও ঝিমঝিম করতে লাগলো। বলে কি! দিব্যি গেরস্তবাড়ী, গোলাপালা, ঘরদোর—ডাকাত কি রকম?

কিন্তু পালাবোই বা কেমন করে? এখন বেশ রাত হয়েচে। সামনের চণ্ডীমণ্ডপে বৃদ্ধ বসে লোকজনের সংগে কথা কইচে—ওখান দিয়ে যেতে গেলেই তো সন্দেহ করবে!

কাঠের মতো আড়ষ্ট হয়ে গিয়েচি একেবারে—হাতে পায়ে জোর নেই, কিছু ভাববারও শক্তি লোপ পেয়েচে। মিনিট পাঁচেক এমনি ভাবে কাটলো—এমন সময়ে দেখি সেই বৌটি আবার কি-একটা কাজে কুঠরির মধ্যে ঢুকে খোলা দরজা দিয়ে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মেয়েটি কথা বলবার পূর্বেই আমি বললুম, "তুমি যে হও, তুমি পরম দয়াময়ী—বলে দাও কোন্ পথে কি ভাবে পালাবো······"

বৌটি চাপা গলায় বললে, "সেই জন্যেই এলুম। সব দেখে এলুম। পালাবার পথ নেই—ওরা ঘাঁটি আগলে রেখেচে······"

আমি বললুম, "তবে উপায়!"

মেয়েটি বললে, "একটা মাত্র উপায় আছে। তাও আমি ভেবে এসেচি। আমি এ-বাড়ীতে আর ব্রহ্মহত্যা হ'তে দেব না—অনেক সহ্য করেচি, আর কত করবো, না······ দাঁড়ান ঠাকুরমশায়, আর, একবার বাড়ীর মধ্যে থেকে আসি, নইলে সন্দেহ করবে।"

মিনিট পাঁচেক পরে বৌটি আবার এলো, চকিতদৃষ্টিতে চারদিকে চেয়ে বললে, "শুনুন, আমার উপায়—এই কথা ক'টা মনে রাখুন। মনে যদি রাখতে পারেন, তবে বাঁচাতে পারবো।······আমার নাম বামা, আমি এ-বাড়ীর মেজবৌ, আমার বাপের বাড়ীর গ্রামের

নাম কুসুমপুর, জেলা বর্ধমান, থানা রায়না—আমার বাপের নাম হরিদাস মজুমদার জ্যাঠামশায়ের নাম পাঁচকড়ি মজুমদার, আমরা দুই বোন, আমার দিদির নাম ক্ষান্তমণি, বিয়ে হয়েচে সামন্তপুর তেওটা, বর্ধমান জেলা। শ্বশুরের নাম দুর্লভ দাস—সবাই জাতে বারুই। আমার বাবা, জ্যাঠামশায় সব বেঁচে আছেন, কিন্তু মা নেই······"

আমার তখন বুদ্ধি লোপ পেতে বসেচে—যা বলে মেয়েটি তাই করে যাই। এতে কি হবে? বৌটি কিন্তু এক একবার বাড়ীর মধ্যে যায়, আবার অল্প দু'মিনিটের জন্যে ফিরে এসে আমায় তালিম দিয়ে যায়—"মনে আছে তো? জ্যাঠামশায়ের নাম কি?"

আমি বললুম, "হরিদাস মজুমদার······"

"না—না, পাঁচকড়ি মজুমদার, বাবার নাম হরিদাস মজুমদার······আমার দিদির নাম কি? শ্বশুরবাড়ী কোন্ গাঁয়?······"

"ক্ষান্তমণি। শ্বশুরবাড়ী হ'ল—শ্বশুরবাড়ী······"

"আপনি সব মাটি করলেন দেখচি! সামন্তপুর-তেওটা, বলুন······"

"সামন্তপুর-তেওটা—শ্বশুরের নাম রামযদু দাস—দুর্লভরাম দাস······"

অবশেষে মিনিট দশ-বারোর মধ্যে আমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে এসেচে।

বৌটি বললে, "রান্না-খাওয়া করে নিন ঠাকুরমশায়, কোন ভয় করবেন না। আমার বাপের বাড়ীর নাম-ধাম যখন জানা হয়ে গেছে, তখন আপনাকে বাঁচাতে পেরেচি। এখন শুনুন,—খাওয়া-দাওয়ার পরেই শ্বশুরমশায়ের কাছে আমার বাপের বাড়ীর পরিচয় দিয়ে বলবেন—আপনি তাদের গুরুবংশ, আমার নাম বলে জিগ্যেস করবেন—আমার বিয়ে হয়েচে কোথায়, জানো নাকি? গলা যেন না কাঁপে, কোনরকম সন্দেহ যেন না হয়······ আমি চললুম, আবার আসবো আপনি শ্বশুরকে বলবার পরে; কিন্তু দেরি করবেন না বেশি, বিপদ কখন হয় বলা যায় না?"

রান্ন-খাওয়া শেষ না করলেও তো সন্দেহ করতে পারে। রান্না-খাওয়া করতেই হ'ল। রাত্রের অন্ধকার তখন বেশ ঘন হয়ে এসেচে, রাত আন্দাজ দশটার কম নয়, আহারাদির পর নিজের কুঠুরিতে বসেচি, আর আমার মনে হচ্ছে এ বাড়ীর সবাই যেন খাঁড়ায়, রাম-দাতে শান দিচ্ছে, আমার গলাটি কাটবার জন্যে।

এই সময় গৃহস্বামী স্বয়ং আমার জন্যে পান নিয়ে এলো। বললে, "কি ঠাকুরমশায়, আহারাদি হ'ল? এখন দিব্যি করে শুয়ে পড়ুন। মশারীটা টাঙিয়ে দিয়ে যাচ্ছি; রাত হয়েচে আর দেরি করবেন না······"

আমি বললুম, "হ্যাঁ, একটা কথা বলি······আমাদের এক মন্ত্রশিষ্য, বাড়ী কুসুম-পুর, থানা রায়না, নাম পাঁচকড়ি—ইয়ে, হরিদাস মজুমদার, তার একটি মেয়ের নাম বামা —এ দিকেই কোথায় বিয়ে হয়েচে। তারাও জাতে তোমাদের বারুই কিনা—তাই হয়তো চিনলেও চিনতে পারো। মেয়েটির জ্যাঠা দুর্লভরাম—ইয়ে পাঁচকড়ি—আমায় বলে দিয়েছিল মেয়েটির শ্বশুরবাড়ী খোঁজ করে একবার সেখানে যেতে তা যখন এলুমই এ দেশে······"

আমার কথা শুনে বৃদ্ধ যেন কেমন হয়ে গেল, আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বললে, "কুসুমপুরের হরিদাস মজুমদার? বামা?···আপনি তাদের চিনলেন কি করে?"

বামার কথা স্মরণ করে গলা না কাঁপিয়ে দৃঢ়স্বরে বললুম, "আমি যে তাদের গুরু-বংশ—আমার বাবার ওরা মন্ত্রশিষ্য কিনা?"

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বললে, "বসুন, আমি আসচি······"

আমি একটা কুঠরির মধ্যে বসে রইলুম, সন্দেহ ও ভয় তখনও কিছু যায় নি। আর এরা যে গুরুদেবকেই রেহাই দেবে তা কে বলেচে?

কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ ফিরে এলো ; পেছনে পেছনে সেই বধূটি, আর একজন গুণ্ডা-মার্কা গোছের যুবক এবং একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক—সম্ভবতঃ বৃদ্ধের স্ত্রী।

বৃদ্ধ বললে, "এই যে বামা, ঠাকুরমশায়। আমারই মেজছেলের সঙ্গে......এই আমার মেজ ছেলে শম্ভু......গড় করো সব, গড় করো......মেজবৌমা, দেখ তো, চিনতে পারো এঁকে?"

চমৎকার অভিনেত্রী বটে বামা! অদ্ভুত অভিনয় করে গেল বটে।

ঘোমটা খুলে হাসিমুখে সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে গলায় আঁচল দিয়ে। জীবনদাত্রী, দয়াময়ী বামা! আমার চোখে প্রায় জল এসে পড়লো।

তারপর সে রাত্রি তো কেটে গেল। খাবার জল দেবার ছুতো করে এসে বামা আমায় আশ্বাস দিয়ে গেল। বললে, "বিপদ কেটে গিয়েছে ; আমার চোখে না পড়লে সর্বনাশ হ'ত, ভিটেতে ব্রহ্মহত্যে হ'ত। অনেক হয়েছে,— এই কুঠরিতে,—এই বিছানায়, এই মেঝেতে অনেক লাশ পোঁতা......"

আমার মনের অবস্থা বলবার নয়। বললুম, "পুলিস কি গাঁয়ের লোক কিছু টের পায় না,—কিছু বলে না?"

"কে কি বলবে! এ ফাঁসুড়ে ডাকতের গাঁ। সবাই এ-রকম। আগে জানলে কি বাবা এখানে বিয়ে দিতেন? বিয়ের পর সব ধরা পড়ে গেল আমার কাছে। এখন আমার একটি সন্তান হয়েছে—এ পাপ-ভিটেয় বাস করলে তার অকল্যাণ হবে। ওকে বারণ করি, কিন্তু ও কি করবে? মাথার ওপর শ্বশুরমশায় রয়েচেন--পুরনো ডাকাত, দাদারা রয়েচে......আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন বাবাঠাকুর, আর ভয় নেই......"

সকাল হ'ল। বিদায় নেবার সময় বৃদ্ধ আমায় পাঁচ টাকা গুরু-প্রণামী দিলে। বামাকে আড়ালে ডেকে বললুম, "তুমি আমার মা, আমার জীবনদাত্রী। আশীর্বাদ করি চিরসুখী হও মা......"

বামার মতো বুদ্ধিমতী নারী জীবনে আর আমার চোখে পড়ে নি। কতকাল হয়ে গেল, এই বৃদ্ধ বয়সেও সেই দয়াময়ী পল্লীবধূটির স্মৃতিতে আমার চোখে জল এসে পড়ে, শ্রদ্ধায় মন পূর্ণ হয়ে ওঠে।

বামাচরণের গুপ্তধন প্রাপ্তি

বামাচরণের জন্মের সময় নকীপুরের যদু চক্কোত্তি বলেছিলেন, "এ ছেলে একদিন রাজা হবে।"

যদু চক্কোত্তি এ অঞ্চলের মধ্যে একজন বড় জ্যোতিষী, তার কথার দাম আছে। কিন্তু বামাচরণের জন্মদিনটির পরে বহু বছর কেটে গিয়েচে, রাজা হওয়া তো দূরের কথা, রাজসভার একজন ভালোগোছের প্রহরী হবার লক্ষণও তো বামাচরণের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না।

অল্পবয়সে বামাচরণ তার মামার বাড়ী থেকে স্কুলে পড়তো। ফোর্থক্লাসে ওঠবার সময়ে ফেল করে সে লেখাপড়া দিলে ছেড়ে। বললে, "ছোট ছোট ছেলেরা উঠবে নিচে থেকে আমার ক্লাসে—তাদের সঙ্গে পড়তে লজ্জা করে।"

সুতরাং বামাচরণের লেখাপড়া হ'ল না। মামারা বললে, "লেখাপড়া যদি না করো বাপু, তবে এখানে বসে বসে অন্নধ্বংস করে আর কি করবে, বাড়ী চলে যাও।"

বাড়ী এসে যখন সে বসলো, তখন তার বয়েস চৌদ্দ-পনরো বছর। অজ পাড়াগাঁয়ে বাড়ী, সেখানে থেকে চাকরির চেষ্টা করা চলে না।

এই সময়ে তার এক ভগ্নীপতি তাদের বাড়ীতে এলেন কিছুদিনের জন্যে বেড়াতে। তিনি পশ্চিমে কোথায় রেলে চাকরি করেন, বামাচরণকে উপদেশ দিয়ে গেলেন—টেলিগ্রাফি শিখতে। তা হ'লে রেলে চাকরি হবার সম্ভাবনা আছে। কলকাতা থেকে তিনি বামাচরণকে একটা ঢোঁককলও আনিয়ে দিয়ে গেলেন, আর টেলিগ্রাফ শেখবার একখানা বই।

বামাচরণ সর্বদা গম্ভীর চালে থাকত, সমবয়সী ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে মিশলে তার মান যাবে। আর একটা মজা ছিল তার, সে তাদের নানারকম বৈষয়িক উপদেশ দিত।

যেমন হয়তো ছেলের দল ওদের বাড়ীর সামনে কয়েতবেলের গাছে উঠে মহা হৈ-চৈ করচে, ও এসে গম্ভীর মুখে বললে, "এই সব, নাম—গাছ থেকে নাম।"

বামাচরণ বললে, "কয়েতবেল তো খাচ্ছিস, এদিকে ঘরে যে অনেকের চাল নেই, সে খোঁজ রাখিস? শুধু কয়েতবেলে কি আর পেট ভরবে? যা, যাতে দু'পয়সা রোজগার হয় তার চেষ্টা করগে যা।"

বামাচরণের বিজ্ঞ ধরণের কথাবার্তায় বেশ কাজ হ'ল। পাড়াগাঁ জায়গা, সকলেরই অবস্থা অল্পবিস্তর খারাপ, প্রত্যেক ছেলেই জানে যে তার বাপ-মার অবস্থা ভালো নয়। অতএব বামাচরণের কথায় অনেকেরই মনের মধ্যে কোথায় ঘা লাগলো—তারা মাথা নিচু করে যে যার বাড়ী চলে গেল।

এই সময়েই ওর ভগ্নীপতি এসে ওকে ঢেঁকিকল দিয়ে গেলেন।

গ্রামের ছেলেরা প্রশংসমান দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখতো, বামাচরণ দিনরাত গম্ভীর মুখে ওদের বাড়ীর পশ্চিমের ঘরে বসে ঢেঁকিকলটাতে টরে-টক্কা অভ্যাস করচে। ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই, শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, দোল নেই, রাস নেই, শনিবার-রবিবার নেই। কি সে অধ্যবসায়! দ্রোণাচার্যের কাছে ধনুর্বিদ্যা শিখতে অর্জুনও বোধ হয় এত অধ্যবসায়. এত মনোযোগ দেখান নি—তা তিনি মল্লভূমিতে কাঠের বিবিধ পাখী বিদ্ধ করে যতই নাম করুন গিয়ে। বছর খানেক টেলিগ্রাফ শেখবার পর বামাচরণ রেলে চাকরির চেষ্টা করলে; কিন্তু অদৃষ্টের দোষে কোথাও কিছু হ'ল না। গাঁয়ের ছেলেদের সে বলতো, "জানিস, ই-আর-আর রেলের টি-আই সাহেব আমার দরখাস্তের জবাব দিয়েছে? তাঁর নিজের হাতের সই আছে।"

ছেলেদের মধ্যে দু-একজন সম্ভ্রমের সঙ্গে জিগ্যেস করতো, "কি লিখেছে বামাচরণ-দা?"

"লিখেছে, এখন চাকরি হবে না, পোস্ট খালি নেই। খালি হলে জানাবে। দাঁড়া···"

তারপর সে পশ্চিমের কোঠায় তার ঘর থেকে একখানা লম্বা খাম নিয়ে এসে তার মধ্যে থেকে ছোট্ট একটা ইংরেজি লেখা কাগজ বার করে সকলের সামনে বাতাসে দুবার উঁচু করে উড়িয়ে বলতো, "এই দ্যাখ্।"

কিন্তু এত করেও কিছু হ'ল না, মাসের পর মাস গেল. টি-আই সাহেবের সে চিঠি আর পৌঁছুলো না।

হঠাৎ মেঘ-ভাঙা আকাশে একদিন চাঁদ উঠলো। বামাচরণের পিতা ছিলেন সেকালের ফৌজদারী কাছারীর নাজির। যখন তিনি মেহেরপুরে, সে সময়ে বম্‌পাশ সাহেব মেহেরপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট। সাহেব নাজিরমশায়কে খুবই খাতির করতো, ভালোও বাসতো।

বামাচরণের বাবা বৃদ্ধবয়সে পেন্‌সনভোগী অবস্থায় নিজের চণ্ডীমণ্ডপে বসে সমবেত বৃদ্ধমণ্ডলীর কাছে চাকরি জীবনের গল্প করতে করতে বলতেন, "বম্‌পাশ সাহেবকে তো আমিই কাজ শিখিয়েছি. ছোকরা সিভিলিয়ান. নতুন বিলেত থেকে এসেছে তখন—

ট্রেজারি অফিসের হিসেব রাখতে জান বেরিয়ে যেতো। আমায় বলতো, 'শোন নাজির, এ আমার পোষাবে না, গাঁজা-আফিমের হিসেব রাখতে আর ওজন করতে করতে প্রাণ বেরুলো।' কত কষ্টে বুঝিয়ে সাহেবকে শান্ত করতুম।"

সে গ্রামে গবর্ণমেণ্টের চাকরি বামাচরণের বাবা ছাড়া কেউ করে নি—সবাই হাঁ করে থাকতো। পেনসনও ভোগ করচেন তিনি আজ বাইশ-তেইশ বছর কি তারও বেশি।

বামাচরণের বয়স যখন আঠারো-উনিশ বছর, তখন বামাচরণের বাবা গ্রামে বসে 'হিত-বাদী' কাগজে দেখলেন বম্‌পাশ সাহেব রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর হয়ে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে এসেছে।

তিনি গেলেন কলকাতায় সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। বম্‌পাশ সাহেবও আর ছোকরা নেই, পঞ্চাশের ওপর বয়স হয়েছে। পুরনো নাজিরকে চিনতে পারলে, জিজ্ঞেস করলে, "আমি তোমার কি উপকার করতে পারি, নাজির?"

এক কথায় বামাচরণের চাকরি ঠিক হয়ে গেল। খুলনায় সার্ভে ক্যাম্প পড়েচে, জমি জরীপ হচ্চে। বামাচরণের বাবা একগাল হেসে সকলকে কথাটা জানালেন। বামাচরণের বাড়ীতে সত্যনারায়ণের সিন্নি দেওয়া হ'ল।

গাঁয়ের প্রতিবেশীরা যখন প্রসাদ খাচ্ছে ভেতরের ঘরের বারান্দায় বসে, তখন বামা-চরণের বাবা সবিস্তারে তাদের সামনে তাঁর রাইটার্স বিল্ডিংয়ে গিয়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা করার বৃত্তান্ত বর্ণনা করছিলেন; "সাহেব বললে, নাজির, তোমার ছেলে যদি এন্ট্রান্স পাস করতো তবে আমি ওকে সাবডেপুটি করে দিয়ে যেতাম আজ।"

বামাচরণ চাকরি করতে গেলে, সঙ্গে তার বৃদ্ধ পিতা গেলেন। কারণ বামাচরণের মা বললেন, ছেলেকে অত দূর দেশে একলা তিনি পাঠাতে পারবেন না।

আবার সেই অদৃষ্ট এসে বাধা দিলে। মাস দুইয়ের মধ্যে বামাচরণের বাবা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী এলেন। শোনা গেল বামাচরণ চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছে। সেখানে নাকি থাকার কষ্ট, নদীর জল লোনা, কাছেই সুন্দরবন, সন্ধ্যার পর বাঘের ভয়, জঙ্গল থেকে কাঠ ভেঙে এনে রান্না করতে হয়। সেখানে কি ওই কচি ছেলে থাকতে পারে?

বামাচরণের বাবা বললেন, "কোন ভয় নেই। আমি আবার যাচ্ছি সাহেবের কাছে আর একটা ভালো জায়গায় চাকরি যাতে হয়।"

কিন্তু এবার সাহেব বেজায় চটে গিয়েচে দেখা গেল, না জানিয়ে চাকরি ছেড়ে আসাতে। সাহেবের আরদালি বললে, সাহেবের এখন দেখা করবার সময় হবে না।

বামাচরণের বাবা এতটা ভাবেন নি, তিনি হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরে এলেন। কিন্তু সেই যে তাঁর মন কেমন ভেঙে গেল, এরপর আর বেশীদিন বাঁচেন নি।

ক্রমে দিন চলে গেল। বামাচরণেরও বয়স হয়ে উঠলো। বাবা বেঁচে থাকতেই তার বিবাহ দিয়ে গিয়েছিলেন, দু'একটি ছেলেপুলেও হ'ল।

গ্রামের যে সব ছোট ছেটে ছেলেদের বামাচরণ গম্ভীর মুখে উপদেশ দিয়ে বেড়াতো, তাদের মধ্যে অনেকে এখন বিদেশে বেরিয়ে ভালো লেখা-পড়া শিখেচে, দু'একজন ভালো চাকরিও পেয়েচে। বাপের পেন্‌সনের টাকায় সংসার একরকম চলতো, বাপের মৃত্যুর পর বড় সংসার ঘাড়ে পড়াতে বামাচরণ চোখে অন্ধকার দেখলে।

নিজের ছেলে-মেয়ে দু'তিনটি, এক বিধবা ভগ্নী বাড়ীতে, তারও দু'তিনটি ছেলে-মেয়ে, বৃদ্ধা মা.—অনেকগুলি পুষ্যি খেতে, চলে কিসে এতগুলি প্রাণীর?

* * *

এই সব কথাই সে ভাবছিল আজ নদীর ধারে বড়-ভাঙনের চট্‌কা গাছতলায় মাছ ধরতে বসে। বেলা পড়ে এসেচে, কচুরিপানার দামগুলো উজান মুখে চলেচে.—বোধ হয়

জোয়ার এলো।

সামনের চট্‌কাগাছটায় রোদ রাঙা হয়ে আসচে। রোজ এইখানটিতে বামাচরণ মাছ ধরতে আসে। তাদের গ্রাম থেকে প্রায় দেড়মাইল দূরে নদীর বাঁকের মুখে, জায়গাটা চারিদিকে নির্জন।

এখন তার মনে হল খুলনার চাকরিটা ছেড়েও এসেচে আজ চোদ্দ-পনরো বছর হবে।

হঠাৎ নদীর উঁচু পাড়ের দিকে তার নজর পড়লো ;—ওটা কি?

পাড়টা সেখানে খুব উঁচু ও খাড়া—হাত ত্রিশ-চল্লিশ উঁচু সে যেখানে বসে আছে সেখান থেকে। পাড়ের খানিকটা ভেঙে পড়েচে বোধ হয় দু'একদিন হ'ল। সেই পাড়ের গায়ে একটা বড় কলসী পাড় ভাঙার দরুন বেরিয়ে পড়েচে—অর্ধেকটা দেখা যাচ্ছে। বাকি অর্ধেকটা মাটির মধ্যে পোঁতা।

বামাচরণের চট করে মনে পড়ে গেল, সে গ্রামের বুড়োদের মুখে শুনেচে এই বাঁকের মুখে আগে—বহুকাল আগে, খুব সমৃদ্ধ গোয়ালাদের গ্রাম ছিল ; অনেক লোকের বাস ছিল। কলসীটা জমির ওপর থেকে হাত চার-পাঁচ নিচে পোঁতা অবস্থায় রয়েচে। সেকালে লোকে কলসী করে টাকা পুঁতে রেখে দিত—এ নিশ্চয়ই টাকার কলসী।

বামাচরণ এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে আর কেউ কাছাকাছি আছে কিনা। স্থানটা নির্জন, অন্য লোক এদিকে আসে না। কলসীটা আর কেউ দেখে নি নিশ্চয়ই। তা ছাড়া মোটে কাল রাত্রে এই পাড় ভেঙেচে, কে আর লক্ষ্য করেচে একটা কানাভাঙা কলসী? কে-ই তার পর এসেচে এদিকে?

অবশ্য নৌকো থেকে দেখা যাওয়ার কথা। কিন্তু জেলে-ডিঙি এতদূরে আসে না, গাঁ থেকে ওই কদমতলা পর্যন্ত তাদের দৌড়। এতদূরে কেউ কোমড়-জাল পাতে না।

বামাচরণ সেখানে আর দাঁড়ালে না, ছিপ গুটিয়ে উঠে বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল। তাকে এখানে'কেউ না দেখে ফেলে।

বাড়ীতে এসে সে ভাবতে বসলো। এখন সে কি করবে? আজ রাত্রেই অবশ্য কলসীটা তুলে আনতেই হবে। কিন্তু একা সে কি করে পারবে? জমির ওপর থেকে খোঁড়া অসম্ভব। যদি শাবলের ঘায়ে কলসীটা নদীগর্ভে পড়ে যায়, তা হ'লে স্রোতের মুখে হয়তো কোথায় ভেসে চলে যাবে নয়তো ডুবে যাবে।

তা নয়, নিচে থেকে মই লাগিয়ে উঠতে হবে কলসী পর্যন্ত, তার পর সন্তর্পণে খুঁড়ে কলসী বার করতে হবে! তাতে অন্ততঃ দুজন লোকের দরকার ; মই নিচে থেকে একজন ধরে থাকা চাই, কলসী নামাবার সময়েও সাহায্য পাওয়া দরকার।

অনেক ভাবনাচিন্তার পরে বামাচরণ বড় ছেলে নিতাইকে সঙ্গে নেওয়া ঠিক করলে। নিতাই এই বারো বছরে পড়েছে, গ্রাম্য স্কুলে পড়ে, খেলা-ধুলোয় খুব পটু আর সাহসীও বটে। বামাচরণ ছেলেকে বললে, "তোর মাকে বলিস নে, রাত্তিরে যাবি আমার সঙ্গে একটা জায়গায়।"

পিতাপুত্রে মই, শাবল, একগাছা শক্ত দড়ি নিয়ে রাত দুপুরের পরে নদীর ধারে চটকা গাছটার তলায় এসে দাঁড়ালো।

বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করচে বামাচরণের, কি জানি কি হয়!

বামাচরণের ছেলে কিছুই জানে না কি ব্যাপার, বাবার কথায় সে এসেচে। কেন এসেছে তার বাবা তাকে বলে নি। কিন্তু সে জিনিসটা খানিকটা আন্দাজ করে নিয়েছিল। নিশ্চয়ই জেলেরা কোথাও জলের ভেতর বাঁশের ঘুনিতে বড় মাছ জিইয়ে রেখেচে—সেই মাছ চুরি করতে তার বাবা তাকে সঙ্গে করে এনেচে। কিন্তু মই কি হবে?

জায়গাটা দেখেও সে অবাক হয়ে গেল। বাবাকে বললে, "বাবা, এতদূরে তো জেলেরা কোমড় ফেলে না? এ তো চট্‌কাতলার বাঁক···"

তার বাবা ওর মুখের দিকে চেয়ে বললে, "জেলেদের সঙ্গে আমাদের কি দরকার? নে, মইটা এখানে বেশ করে লাগা······"

অতিকষ্টে বামাচরণ মই বেয়ে উপরে উঠলো। নিতাই খুব অবাক্ হয়ে গিয়েচে—পাড়ের ওপর মই দিয়ে কি হবে, কি আছে ওখানে? সে একটু হতাশও যে না হয়েচে—এমন নয়। বড় মাছ নয়, তাহলে হয়তো বাবা কোনো ওষুধের শেকড় কি মুথোঘাসের শেকড় তুলতে এসেচে। অনেক সময় রাত্রেই ওষুধের গাছ তুলতে হয়, সে জানে।

তার ভয়ও হচ্ছিল, চারিদিকে অন্ধকার, নদীর জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হচ্ছে ডাঙায় ছোট ছোট ঢেউ লেগে। এখানে ভূতের উপদ্রবের কথা অনেকে বলে, শ্মশান এখান থেকে খুব বেশী দূরে নয়। নিতাইয়ের গা-টা ছমছম করে উঠলো।

তার বাবা ওপরে গিয়ে পাড়ের গা খুঁড়তে লাগলো। সে নিচে থেকে অন্ধকারে তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছে না বাবা কি খুঁজচে। একবার সে বললে, "কি বাবা, মুথোর শেকড়?"

বামাচরণ চাপাগলায় বললে, "আঃ, চুপ কর্ না! মই ধরে থাক্, তোর সে কথায় দরকার কি?"

নিতাই চুপ করে রইলো, কিন্তু ওষুধ খুঁড়তেও কি এত সময় লাগে? সে অন্ধকারের মধ্যেই মইয়ের নীচে একা দাঁড়িয়ে অত্যন্ত অশান্তি বোধ করছিল, বাবার ভয়ে কিছু বলতেও পারছে না।

অবশেষে অতি কষ্টে ভারী ও কালো একটা কলসী নিয়ে বামাচরণ মই থেকে নামলো। নিতাই অবাক্ হয়ে বললে "কি বাবা এতে?"

"চুপ কর্ না, কেবল চেঁচামেচি! তোর সব কথায় কি দরকার? শাবল আর মইটা নিতে পারবি একলা?"

কেউ না দেখে এজন্য বামাচরণ বাঁশবনের পথ দিয়ে চললো। বেশী রাত্রে গ্রামে চৌকিদার পাহারা দিতে বার হয়, কি জানি যদি সে এ অবস্থায় হঠাৎ চৌকিদারের সামনেই পড়ে যায়?

বামাচরণের বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করচে। কলসীটা বেজায় ভারী। নিশ্চয়ই কোনো জিনিসে ভর্তি। কলসীর মুখটা একখানা পাথরের ছোট খুরি দিয়ে চাপা ছিল—বহুদিন মাটির মধ্যে থাকার দরুন সেটা এমন দারুণ এঁটে গিয়েচে যে অস্ত্র দিয়ে চাড় না দিলে খোলা যাবে না।

বাড়ী পেঁাছেই বামাচরণ বাইরের দরজা বন্ধ করে দিলে। স্ত্রীকে বললে, "একটা আলো নিয়ে এসো তো?"

ওর আর বিলম্ব সইচে না। এখুনি সে কলসীর মুখ খুলে দেখবে।

নিতাইয়ের মা একটা কাচ-ভাঙা সেকেলে হিঙ্ক্‌সের লণ্ঠন নিয়ে উঁচু করে ধরলে। বিস্ময়ের সুরে বললে, "কলসীটাতে কি? মড়ার কলসীর মতো দেখতে,—ওটাকে আনলে কোথা থেকে গো?"

অধীর কৌতূহলে ও আগ্রহে বামাচরণ শাবলের এক ঘা দিয়ে কলসীটা ফাটিয়ে ফেললে—সঙ্গে সঙ্গে কালো আলকাতরার মতো কি একটা দুর্গন্ধ পদার্থ মেঝেময় ছত্রাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়লো।

নিতাইয়ের মা অবাক্, স্বামী পাগল হয়ে গেল নাকি পয়সার দুর্ভাবনায় এতদিন পরে?

"রাতদুপুরে কিসের একটা কলসী কোথা থেকে উঠিয়ে এনে কি কাণ্ড বাধালে

দেখো তো?"

বামাচরণ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। এত কষ্ট তবে সব বৃথা! রূপোর গুঁড়োও এতটুকু নেই কলসীটাতে। কোথায় এক কলসী টাকা বা মোহর—আর তার বদলে—এগুলো কি কালো কালো? অদৃষ্ট একেই বলে।

সারারাত্রি বামাচণের ঘুম হ'ল না। সত্যিই তার অদৃষ্ট ভালো নয়। এমন জায়গায় পোঁতা কলসী পেয়েও তার মধ্যে থেকে বেরোয় কালো আলকাতরা! না হ'লে বম্‌পাশ সাহেবের দেওয়া এমন চাকরি সে ছেড়ে দিয়ে আসে? পেয়ে হারানোই তার অদৃষ্ট।

পরদিন সকালে লোকজনকে আলকাতরার মতো জিনিসটা দেখাতে কেউ কিছু বলতে পারে না। অবশেষে মামুদপুরের বাজারের বুড়ো কবিরাজমশায় দেখে বললেন, "এ পুরনো ঘি। বহুকালের পুরনো ঘি। কতটা আছে? এর দাম খুব। বিক্রি করবে? কলকাতায় বৌবাজারের সেনেদের দোকানে পেলেই নেবে।"

বুড়ো কবিরাজকে সঙ্গে নিয়ে বামাচরণ কলকাতায় এলো।

বৌবাজারের সেনেদের মস্ত কবিরাজী দোকান, সারা ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবীর সঙ্গে তাদের কারবার। ঘি দেখে তারা বললে, "হ্যাঁ, জিনিসটা খুবই ভালো, অন্ততঃ দুশো বছরের পুরোনো। তোমাদের ঘরে ছিল?"

বামাচরণ সংক্ষেপে কলসী-প্রাপ্তির কথা বর্ণনা করলে। তারপর দরদস্তুর চললো. ওরা সাত টাকার বেশী দিতে রাজী নয়, তারপর উঠলো দশ টাকায়, তার বেশী কিছুতেই নয়। বুড়ো কবিরাজকে সঙ্গে না আনলে কিন্তু বামাচরণ দু'টাকা সেরেই জিনিসটা দিয়ে ফেলতো।

একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক অনেকক্ষণ থেকে ওদের কথাবার্তা শুনছিলেন; তিনি উঠে এসে বুড়ো কবিরাজকে বাইরে নিয়ে গিয়ে বললেন, "আমি খয়রাগড়ের রাজার ম্যানেজার। আমি আপনাদের কথাবার্তা এতক্ষণ শুনছিলাম—রাজার মায়ের বয়স হয়েচে. হাঁপকাশের অসুখ। এই পুরোনো ঘি কিনতেই আমি এদের দোকানে এসেছিলাম। এত বছরের পুরোনো ঘি কলকাতায় কোন দোকানে নেই। আমি আপনাদের জিনিস নেবো। একশো টাকা সেরের দাম দেবো আমি। ওজন করুন মাল।"

এ কলসীতে মোট সাড়ে বারো সের ঘি ছিল। কিন্তু আদত কলসীটাতে বোধ হয় আরও বেশী ছিল, কিন্তু সেটা ভেঙে নষ্ট হয়ে যায়। বাকিটা ওরা নতুন কলসীতে পুরে এনেছিল।

ঘি বিক্রি করে মোট পাওয়া গেল সাড়ে বারোশো টাকা।

বদু চক্কোত্তি জ্যোতিষী ছিল বড়, সে মিথ্যে বলে নি—এখন তো বামাচরণের অনন্ত-কাল পড়ে রয়েচে। রাজা হওয়ার আশ্চর্যটা কি?

দুই দিন

রামনগর বারোয়ারি তলায় আজ খুব জাঁকের যাত্রা। কলকাতা থেকে দল এসেচে, বেশ বড় দল। রসিক বাঁড়ুয্যের যাত্রার দল, যার নাম এ অঞ্চলের লোকের যথেষ্টই শোনা, কিন্তু এত বড় দল কি পাড়াগাঁয়ে আসে যখন তখন? এবার বহু চেষ্টার ফলে ওদের আনা হয়েচে। রামনগর উচ্চপ্রাথমিক পাঠশালা থেকে ফেরবার পথেই কাতু এ সংবাদটি জোগাড় করে এনেচে। এ নিয়ে অনেক কথাবার্তাও হয়ে গিয়েচে কাতু ও তার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে।

ননী ওদের বাড়ী এল পেয়ারা পাড়তে। কাতুর বাবা দুর্গাচরণ মজুমদার চোখে দড়ি

বাঁধা চশমা পরে বাইরের ঘরে বসে জমিসংক্রান্ত কাগজপত্র দেখছিলেন।

ননীকে দেখে বললেন—কি?

দুর্গাচরণ বড় কড়া প্রকৃতির মানুষ। ননী ভয়ে ভয়ে বললে—জ্যাঠামশায়, কেতো আছে?

—কেন? কি দরকার তোমার?

—জ্যাঠামশায়, দুটো পেয়ারা পাড়বো?

—তা পাড়বে না কেন? তোমাদের জন্যেই তো গাছ করে রাখা। কেন পাড়বে না?

ননীর সাহসে কুলোল না আর পেয়ারার সম্বন্ধে কোনো কথা তুলতে। সে চলে যাচ্ছে বাড়ীর বার হয়ে, এমন সময়ে কাতু তাকে দেখতে পেয়ে বাড়ীর ভেতর থেকে ছুটে এল।

ননী বললে—ভাই, তোর বাবা পেয়ারা পাড়তে দিলে না—

কাতু আশ্বাস দিয়ে বললে—বাবা এখুনি উঠলো বলে। নসরাপুর যাবে খাজনার তাগাদা করতে। সেই ফাঁকে তুই আর আমি পেয়ারা পাড়বো। আজ রাত্রে যাত্রা শুনতে যাবি নে?

—তুই যাবি? দল খুব ভালো, না?

—ও বাবা। কলকাতার বড় দল, দেখিস কি চেহারা, কি সব সাজগোজ, কি গান—

—তুই কি করে জানলি? দেখিছিস নাকি?

—সবাই বলচে রামনগরের বাজারে। দুশো টাকায় এক রাত—আর আমাদের বেলে-ডাঙার দল আর-বছর ত্রিশ টাকায় এক রাত গাইলে—রামোঃ, কিসের সঙ্গে কিসের কথা। দুশো টাকা আর ত্রিশ টাকা!

কাতু আর ননী খুব হেসে উঠল এক চোট। তাদের মনে হলো এমন একটা মজার কথা তারা কখনো বলে নি বা শোনবার সুযোগ পায়নি! উৎসাহের চোটে কাতু রসিক বাঁড়ুয্যের দলের গুণাগুণ অনেক বাড়িয়ে বলে। তাদের দলের ভীম যে সাজে তাকে নাকি সে দেখে এসেচে, এক হাঁড়ি ভাত ডাল তার সামনে বেড়ে দেওয়া হয়েচে, তা সে একা খাচ্চে। তার চোখ দুটো লাল ভাঁটার মত, দেখলে ভয় হয়। গলার সুর কি! যেন বাঘের গলার আওয়াজ। ওদের তলোয়ারগুলো কিন্তু সত্যিকার তলোয়ার, অন্য অন্য বাজে দলের মত রাঙ বা টিনের নয়।

বলা বাহুল্য এ সবের কিছুই কাতু দেখে আসে নি। সে অবিশ্যি যাত্রা দলের বাসাতে গিয়ে দেখেছিল অনেকগুলো লোক কলার পাতা পেতে ভাত খেতে বসেচে, তার মধ্যে কোন্‌টা ভীম কোন্‌টা নকুল কোন্‌টা বেদব্যাস সে তার কিছুই জেনে আসে নি।

ননী সব শুনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—তোর বাবা তোকে নিয়ে যাবে। আমার আমার মামা যেতে দেবে না। মামা যদি দেয়, মামীমা তো খাঁড়া উঠিয়ে আছে! আমার বড় ইচ্ছে যেতে।

দুই বন্ধুতে পরামর্শ করলে। ওরা যাবে নিশ্চয়ই। ননীকে যদি মামা না যেতে দেয় তবে সে লুকিয়ে যাবে কাতুর বাবার সঙ্গে। দুজনেরই বুক দুরদুর করচে কি হয় কি হয়।

সন্ধ্যার আগেই দুর্গাচরণ মজুমদার চাদর কাঁধে ফেলে লাঠি হাতে নিয়ে লণ্ঠন ঝুলিয়ে যাত্রা শুনতে বেরুলেন। কাতু গেল বাবার সঙ্গে, কিন্তু ননী বেচারীর মামা প্রসন্ন না হওয়ায় তার বাড়ীর বাইরে পা দেওয়া সম্ভব হোল না।

কাতুর মন বেলুনের মত ফুলে উঠেচে। এখুনি সে রসিক বাঁড়ুয্যের যাত্রা দেখতে পাবে এখানে!

এ অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হবে এখুনি!

কতকগুলো লোক এসে আসরে আলো জেলে দিয়ে গেল। লোকের ভিড় জমে গেল আসরে। বহু দূরদূরান্তর থেকে লোক দেখতে এসেচে রসিক বাঁড়ুয্যের যাত্রা, তাদের হাতে চিঁড়ের পুঁটুলি, বগলে তামাক টিকের ঠোঙা। আসরের বাইরে এক-একখানা থান ইঁট পেতে সবাই বসে গেল।

আসরে বাদ্যযন্ত্র আনা হোল। সুর বাঁধা, টুভ টাং করতে আধঘণ্টা কাটলো। কাতুর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে ভাঙে। রাজা কতক্ষণে আসবে। ও বাবাকে জিজ্ঞেস করলে—কি পালা হবে বাবা?

দুর্গাচরণ অন্য এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন, ধমক দিয়ে বললেন—দেখো এখন কি হবে। আমি কি জানি? দুর্গাচরণ যে লোকটির সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি বললেন—সত্যি আজ এদের কি প্লে হবে জানো? নল দময়ন্তী এদের নামকরা প্লে, দ্যাখো কি হয়।

এমন সময় পালার প্রোগ্রাম বিলি হোল আসরে। কাতু তার বাবার খানা চেয়ে নিলে। তারপর পড়ে দেখেই বিস্ময়ে আনন্দে বাবাকে দেখিয়ে বললে—বাবা, এই দেখো নল-দময়ন্তীর পালা হবে। নলদময়ন্তী বাবা—দেখো না? ও বাবা—নল দময়ন্তী—

—আঃ, নল দময়ন্তী তা কি করতে হবে? নাচবো? চুপ করে বসে দ্যাখো।

যাত্রা আরম্ভ হয়ে গেল। বিস্ফারিত চোখে কাতু একদৃষ্টে চেয়ে দেখলে পঞ্চনল জাঁকজমকের সঙ্গে সলমা চুমকির কাজ-করা জরির পোশাক পরে সভাস্থল আলো করে বসেচে।

কি তাদের হাত-পা নাড়ার কায়দা, কি তাদের তরবারির আস্ফালন!

ইন্দ্রের সঙ্গে বরুণের কথা কাটাকাটির কি বাহার!

আর গান? এমন সুন্দর সুরের গান এ পর্যন্ত সে শোনে নি এ পাড়াগাঁয়ে।

দৃশ্যের পর দৃশ্য বদলে চলেচে। প্রত্যেক দৃশ্যে অভিনব ঘটনার সমাবেশ, নতুন নতুন সুরের গান, নতুন নতুন সুন্দর মুখ। পরীর মত মেয়েরা। মেয়ে নয়, ওরা পুরুষ, কাতু জানে না যে এমন নয়, কিন্তু দু-একটি মেয়ে সম্বন্ধে, কাতু ঠিক বুঝতে পারলে না ওরা ছেলে, না সত্যিই মেয়ে।

সে বাবাকে বললে—বাবা, ও বাবা—

দুর্গাচরণ বললেন—কি? কেন কথা বলচো? চুপ করে থাকো।

—ওরা মেয়ে না ছেলে?

—চুপ করে বসে থাকো। বকো না।

কাতু তন্ময় হয়ে গিয়েচে, তার বাহ্যজ্ঞান নেই। একটা দৃশ্যে তার মন নেচে উঠলো। এবার বোধ হয় যুদ্ধের আয়োজন চলবে। কলিরাজ যে সেজেছে তার কি বিকট চেহারা আর সাজসজ্জা। সত্যিই লোকটা খারাপ নাকি? নিশ্চয় লোকটা খুব বদমায়েশ। বুড়ো কঞ্চুকী কি হাসিয়েই গেল।

এইবার একটা করুণ দৃশ্যের অবতারণায় সভার লোক কেঁদে ভাসিয়ে দিল, সেই সঙ্গে কাতুও।

রাজ্যহারা নল বনে দিশাহারা অবস্থায় একটি বৃক্ষতলে আশ্রয় নিয়েচেন (বৃক্ষতলে আশ্রয় নেওয়ার ব্যাপারটা অবিশ্যি নলের বক্তৃতার মধ্যে দিয়েই প্রমান পেয়েচে, কেন না তিনি বসে আছেন আসরের ঝাড় লণ্ঠনের তলায়), সঙ্গে রয়েচেন নিরাভরণা দময়ন্তী। প্রোগ্রামে আছে অলক্ষ্যে বিধিলিপির সঙ্গীত—নলের করুণ বক্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আসরের সকলে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখলে বিধিলিপি সাজঘর থেকে বেরুল কিনা।

কাতু অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে উঠেছে।

কিন্তু ঠিক যে সময় একটি বালককণ্ঠের মধুর সংগীতের সুরে আসর ভরে গিয়েচে, দেখা গেল ধীরে ধীরে বিধিলিপি গান গাইতে গাইতে আসরে ঢুকচে, সেই সময় দুর্গা-চরণ মজুমদার হাই তুলতে তুলতে বললেন—চলো অনেক রাত হয়েচে। যাওয়া যাক। বাড়ী চলো—ছাতি নাও হাতে—

কাতু অবাক। বাবা কি সত্যিই বাড়ী যেতে চায়? ঠিক এই সময়ে মানুষে পারে আসর ছেড়ে বাড়ী চলে যেতে? কাতু বললে—বাবা, এখন বাড়ী যাবো কি বলচো? আমি যাবো না বাবা।

—না না চলো। ও আর কি দেখবে সারারাত জেগে। রাত দশটা। ওই নাকে কান্না চলবে এখন সারা রাত। চলো, চলো—ছাতিটা নে হাতে—ভিড়ে হারিয়ে যাবে। কাল আবার জেয়ালাতে খাজনার তাগিদে যেতে হবে ভোরে।

চলে আসতেই হোল। উপায় নেই কাতুর। ওর চোখে জল ভরে এল। বাবার ওপর বিরাগে ওর মন তিক্ত হয়ে উঠেচে। কেমন লোক বাবা? কিচ্ছু বোঝে না। এমন সুন্দর জায়গা—!

রাগে সে বাবার সঙ্গে কথা বললে না সারা রাস্তা।

পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর পরের কথা।

কার্তিকচরণ মজুমদার সকালে উঠে কাগজপত্র দেখচেন। কার্তিকের মহাজনী কারবার আছে, আড়ত আছে ধানের ও পাটের। গত পঞ্চাশের মন্বন্তরে ধানচাল হাত ফিরতি করে বেশ কিছু লাভও করেছেন। তাঁর কর্মচারী হরিপদ এসে বললে—বড় বাবু ছে-কাটি কখানা গাড়ী যাবে?

—যে কখানা জোগাড় হয়। মাল কত?

—দাদনের মাল হবে পঞ্চাশ মণ। আর ইদিক ওদিক যা যোগাড় হয়।

—পাঁচখানা এখান থেকে নিয়ে যাও।

—লরির জন্যে শম্ভুকে খবর দিতে বলে দেলাম।

—লরি একখানা নয়, দুখানা। আমের গুঁড়ি যাবে সাতটা। চার টন।

—আপনি বেরুবেন কখন?

—আমি খেয়ে দেয়ে বেরুবো। তুমি চলে যাও আগে—

এমন সময়ে কর্তিক মজুমদারের দশ বছরের পুত্র নীলু এসে বললে—বাবা আজ থিয়েটার হবে রামনগরে। দেখতে যাবো বাবা।

থিয়েটারের নিমন্ত্রণপত্র কার্তিক মজুমদার পেয়েছিলেন বটে, রামনগরের তরুণ সংঘ আজ কি যেন একটা প্লে করবে তাতে লেখা ছিল। কিছু চাঁদাও তারা নিয়ে গিয়েছিল একদিন এসে। কিন্তু কর্মব্যস্ত কার্তিকের সে কথা স্মরণ ছিল না।

নীলু বললে—বাবা যাবে তো?

—দেখি আজ আবার অনেক গোলমাল। যেতে পারি কিনা দেখি।

—সে হবে না বাবা। তুমি না গেলে আমি যাবো কার সঙ্গে? আমার দেখা হবে না। থিয়েটার কক্ষনো আমি দেখি নি—

—আচ্ছা, যাও সকালে উঠে এখন পড়গে যাও—সে তো ওবেলা, তার এখন কি?

এই সময়ে পাটের মহাজন ফলেয়ার মানিক মণ্ডল উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে বললে বড় বাবু, আমার তার কি হোল?

—কিসের?

—আমার সেই মামলা আজ মিটিয়ে দেন বাবু।

—দেবো। আজ পঞ্চাশ মণ আনচি দাদনের মাল, আরও একশো মজুত। তোমার কখানা লরি?

—দুখানার বায়না দেওয়া আছে! মাল বেশী হোলে আরও একখানা আনবো। আমায় দুশো মণ জোগাড় করে দিতে হবে আপনার। একটু নেকনজর করুন—

কার্তিক তাকে আশ্বাস দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলেন চা খেতে। কার্তিকের স্ত্রী বললেন—তা যাও না একবার খোকাকে থিয়েটার দেখিয়ে আনো না? পাড়াগাঁয়ে ও-সব জিনিস তো কখনো হয় না—এবার হচ্ছে যখন ওকে দেখিয়ে আনো। ও কখনো দেখে নি!

কার্তিককে অগত্যা যেতে হলো সন্ধ্যার সময় রামনগরের বাজারে, স্ত্রীর নিতান্ত পীড়াপীড়িতে। নতুবা ঝগড়া বাধে। কিন্তু মন তাঁর ভাল ছিল না। কর্মচারীরা সংবাদ দিয়েচে দাদনের পাট আশানুরূপ আদায় হয় নি। প্রায় সাড়ে সাত হাজার টাকা ছড়ানো রয়েচে চাষী মহলে ধান আর পাটের দাদন বাবদ। গত দুর্ভিক্ষের সময় চড়া দামে ধান চাল বিক্রী করে মোটা টাকা ঘরে এসেছিল বলেই এবার আশায় আশায় এত টাকা ছড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু বাজার হঠাৎ নেবে যাবে বুঝতে পারা যায় নি। ধানের দামও অত্যন্ত কম, পাটও তথৈবচ। তারপর অতগুলো ছড়ানো টাকার বদলে ধান বা পাট আদায় হোল না আজও।

নীলু দুধ-চিঁড়ের ফলার খেয়ে এসেচে। ছেলেমানুষের ক্ষিদে বেশী। কার্তিক কিছু খেয়ে আসেন নি, তিনি অর্থ উপার্জন-শক্তি অর্জন করবার সঙ্গে সঙ্গে পরিপাকশক্তি হারিয়েছেন। রাত্রে খান দুখানা রুটি আর একটু দুধ। আগে খেতেন সুজির রুটি কিন্তু এখন যুদ্ধের বাজারে ঘনীভূত অবস্থায় সুজি পাওয়া যায় না, আটার রুটিই খেয়ে থাকেন।

সন্ধ্যার পরেই থিয়েটার আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু চ্যাংড়া ছোকরাদের ব্যাপার, হৈ চৈ করতে দুঘণ্টা কাটবার পরে রাত নটার সময় কনসার্ট বাজনা শুরু হলো। একালের থিয়েটারে ও সব অচল বলে কোন শহর-ঘেঁষা অতি-আধুনিক তরুণ সভ্য আপত্তি তুলেছিল। শেষ পর্যন্ত আপত্তি টেঁকে নি। কনসার্ট না বাজলে এ পল্লীগ্রামে থিয়েটার জমবে কেন?

কার্তিক ছেলেকে নিয়ে একেবারে সামনের আসনে বসেচেন। তার কারণ এ নয় যে তিনি ভালোভাবে অভিনয় দেখতে পাবেন সেই উদ্দেশ্যে। এর প্রধান কারণ রামনগরের বাজারের প্রসিদ্ধ আড়তদার শরৎ নাথ ওখানে বসেছে। শরৎ নাথ এ অঞ্চলের বড় আড়ত-দার, তার পাশে বসে কার্তিক মজুমদার ব্যবসায়ের কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তিনি আসলে জানতে চান শরৎ নাথের দাদন অনুযায়ী পাট ধান আদায় হচ্ছে কিনা। কেন এ বৎসর তাঁর এ বিপর্যয় ঘটলো।

শরৎ নাথ ঘুঘু লোক, তিনি ব্যবসার প্রকৃত সংবাদ কাউকে প্রকাশ করতে রাজী নন। দুজনেই যখন কথাবার্তায় মশগুল তখন স্টেজে বন্দী অক্ষম সাজাহান জাহানারার হাত ধরে বিলাপ করচেন।

শরৎ নাথ বললেন—আর ভায়া, সে জুত বাজারের নেই। নতুন ধান সাড়ে তিনটাকা মণ। আলমপুর পরগণা ভোর পাটের দাদন ছড়িয়েচি, দুটো মণ পাট এখনো মজুত হয় নি। ব্যবসার দিন চলে গিয়েচে।

কার্তিক মজুমদার বললেন—আরে দাদা, তোমরা হলে হাতী। গেলেও দু-পাঁচ হাজার, মরবে না। আর আমরা হচ্চি মশা, সামান্যতেই কষ্ট পাবো। তারপর—

নীলু বলচে—বাবা, ওই দ্যাখো আওরংজেব—বাবা, ভারতবর্ষের ইতিহাসে আছে আওরংজেবের কথা—সেই আওরংজেব—

—আঃ, তুমি খোকা বোকো না।

শরৎ নাথকে কার্তিক সব কথা খুলে বলেন নি। ব্যবসার গুপ্ত কথা কেউ বলে না।

পাঁচশো মণ পাট তিনি চিনিলি কাপাসডাঙ্গার আড়তে জমা করে রেখেছেন, গরুর গাড়ী অভাবে আনতে পারচেন না সদর আড়তে, এখান থেকে লরিতে বোঝাই দেবেন।

গরুর গাড়ীর কি ব্যবস্থা করে থাকেন শরৎ নাথ, এইটি কার্তিক মজুমদার জানবার উদ্দেশ্যে বার বার সেই কথাই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলতে লাগলেন।

সাজাহান বলচেন—দেবো লাফ, দিই লাফ—

নীলুর চোখ বেয়ে জল পড়চে। সে কথার অর্থ যে সব বুঝচে তা নয়, সাজাহানের কথা বলবার ভঙ্গিতে তার কান্না আসচে।

নীলু বললে—বুড়ো কি বলচে বাবা? ও লাফ দেবে কোথায়?

কার্তিক মজুমদার জবাব দিলেন—আঃ চুপ করো। শোন কি বলচে। দুষ্টুমি করতে নেই।

দুষ্টুমি সে কি করলে, বুঝতে না পেরে নীলু চুপ করে রইল।

আরও ঘণ্টাখানেক কাটলো। শরৎ নাথ পাঁচখানা গরুর গাড়ী কাল সকালে পাঠিয়ে দেবার অঙ্গীকার করেচেন।

বললেন—কত সকালে?

—এই সাতটার সময়।

—তোমার বাড়ী পাঠাবো, না আড়তে?

—সদর আড়তে।

—লরি জোগাড় আছে?

—সে জন্যে ভাবনা নেই। সুবল লরি দেবে বলেচে—ইস্টিশানে পৌঁছে দেবে মাল।

—ভাড়া মণকরা না টিপ পিছু?

—টিপ পিছু।

জহরৎউন্নিসা রাজসভায় আওরংজেবকে হত্যা করতে গিয়েছিল এইমাত্র। খুব এক-চোট হাততালি পড়তেই কার্তিক মুখ তুলে চেয়ে দেখলেন। সুলতান সোলেমানের সঙ্গে আওরংজেবের কথা কাটাকাটি হচ্চে। কার্তিক মজুদার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কত রাত হয়েচে? এগারো?

আর তিনি থাকতে পারচেন না। কাল সকালে উঠে সদর আড়তে শরৎ নাথের প্রেরিত পাঁচখানা গাড়ী বাদে আরও অন্ততঃ পাঁচখানা গাড়ীর যোগাড় রাখতে হবে।

নীলু বললে—না বাবা, আমি এখন উঠবো না—কেমন জায়গাটা হচ্চে আর তুমি উঠচো এখন—

—চলো চলো। ওসব দেখবার অনেক সময় আছে। কাল রাত থাকতেই আমাকে উঠে মুচিপাড়ায় লোক পাঠাতে হবে গাড়ীর জন্যে। তোমাদের কি? ভাবনা চিন্তা তো নেই, বাবা—নাও ওঠো—

নীলু নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে কাঁদো কাঁদো মুখে বাবার সঙ্গে আসরের বাইরে এলো।

বাইরে এসে দাঁড়িয়েও সে সতৃষ্ণ ও আগ্রহ দৃষ্টিতে পিছন ফিরে বার বার দূরের আলোকিত স্টেজটার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো।

কার্তিক মজুমদার বললেন—হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে—হাঁ করে দেখচো কি পিছন ফিরে? চোখ দিয়ে চেয়ে পথ হাঁটো—অন্ধকার রাত্তিরে—

তালনবমী

ঝমঝম বর্ষা।

ভাদ্র মাসের দিন। আজ দিন পনরো ধরে বর্ষা নেমেচে, তার আর বিরামও নেই, বিশ্রামও নেই। ক্ষুদিরাম ভট্চাজের বাড়ী দু'দিন হাঁড়ি চড়ে নি।

ক্ষুদিরাম সামান্য আয়ের গৃহস্থ। জমিজমার সামান্য কিছু আয় এবং দু-চার ঘর শিষ্য-যজমানের বাড়ী ঘুরে-ঘুরে কায়ক্লেশে সংসার চলে। এই ভীষণ বর্ষায় গ্রামের কত গৃহস্থের বাড়ীতেই পুত্র-কন্যা অনাহারে আছে,—ক্ষুদিরাম তো সামান্য গৃহস্থ মাত্র! যজমান-বাড়ী থেকে যে ক'টি ধান এনেছিল তা ফুরিয়ে গিয়েচে।—ভাদ্রের শেষে আউশ ধান চাষীদের ঘরে উঠলে তবে আবার কিছু ধান ঘরে আসবে, ছেলেপুলেরা দুবেলা পেট পুরে খেতে পাবে।

নেপাল ও গোপাল ক্ষুদিরামের দুই ছেলে। নেপালের বয়স বছর বারো, গোপালের দশ। ক'দিন থেকে পেট ভরে না-খেতে পেয়ে ওরা দুই ভায়েই সংসারের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠেচে।

নেপাল বললে, "এই গোপাল, খিদে পেয়েচে না তোর?"

গোপাল ছিপ চাঁচতে বললে, "হুঁ, দাদা!"

"মাকে গিয়ে বল্; আমারও পেট চুঁই চুঁই করচে।"

"মা বকে; তুমি যাও দাদা!"

"বকুক গে। আমার নাম করে মাকে বলতে পারবি নে?"

এমন সময় পাড়ার শিবু বাঁড়ুয্যের ছেলে চুনিকে আসতে দেখে নেপাল ডাকলে, "ও চুনি, শুনে যা!"

চুনি বয়সে নেপালের চেয়ে বড়। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ছেলে, বেশ চেহারা। নেপালের ডাকে সে ওদের উঠোনের বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে বললে, "কি?"

"আয় না ভেতরে।"

"না যাবো না, বেলা যাচ্ছে। আমি জটি পিসিমাদের বাড়ী যাচ্ছি। মা সেখানে রয়েছে কিনা, ডাকতে যাচ্ছি।"

"কেন, তোর মা এখন সেখানে যে?"

"ওদের ডাল ভাঙতে গিয়েচে। তালনবমীর বের্তো আসচে এই মঙ্গলবার; ওদের বাড়ী লোকজন খাবে।"

"সত্যি?"

"তা জানিস্ নে বুঝি? আমাদের বাড়ীর সবাইকে নেমন্তন্ন করবে। গাঁয়েও বলবে।"

"আমাদেরও করবে?"

"সবাইকে যখন নেমন্তন্ন করবে, তোদের কি বাদ দেবে?"

চুনি চলে গেলে নেপাল ছোট ভাইকে বললে, "আজ কি বার রে? তা তুই কি জানিস্? আজ শুক্কুরবার বোধ হয়। মঙ্গলবারে নেমন্তন্ন।"

গোপাল বললে, "কি মজা! না দাদা?"

"চুপ করে থাক্,—তোর বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই; তালনবমীর বের্তোয় তালের বড়া করে, তুই জানিস্?"

গোপাল সেটা জানতো না! কিন্তু দাদার মুখে শুনে খুব খুশী হয়ে উঠলো; সত্যিই

তা যদি হয়, তবে সে সুখাদ্য খাবার সম্ভাবনা বহুদূরবর্তী নয়, ঘনিয়ে এসেচে কাছে। আজ কি বার সে জানে না, সামনের মঙ্গলবারে। নিশ্চয় তার আর বেশি দেরি নেই।

দাদার সঙ্গে বাড়ী যাবার পথে পড়ে জটি পিসিমার বাড়ী। নেপাল বললে, "তুই দাঁড়া, ওদের বাড়ী ঢুকে দেখে আসি। ওদের বাড়ী তালের দরকার হবে, যদি তাল কেনে।"

এ গ্রামের মধ্যে তালের গাছ নেই। মাঠে প্রকাণ্ড তালদীঘি, নেপাল সেখান থেকে তাল কুড়িয়ে এনে গাঁয়ে বিক্রি করে।

জটি পিসিমা সামনেই দাঁড়িয়ে। তিনি গ্রামের নটবর মুখুজ্যের স্ত্রী, ভালো নাম হরিমতী ; গ্রামসুদ্ধু ছেলে-মেয়ে তাঁকে ডাকে জটি পিসীমা।

পিসীমা বললেন, "কি রে?"

"তাল নেবে পিসীমা?"

"হ্যাঁ, নেব বই কি। আমাদের তো দরকার হবে মঙ্গলবার।"

ঠিক এই সময় দাদার পিছু পিছু গোপালও এসে দাঁড়িয়েচে। জটি পিসীমা বললেন, "পেছনে কে রে? গোপাল? তা সন্ধ্যেবেলা দুই ভায়ে গিয়েছিলি কোথায়?"

নেপাল সলজ্জমুখে বললে, "মাছ ধরতে।"

"পেলি?"

"ওই দুটো পুঁটি আর একটা ছো বেলে...তাহ'লে যাই পিসীমা?"

"আচ্ছা, এসোগে বাবা, সন্ধ্যে হয়ে গেল? অন্ধকারে চলাফেরা করা ভালো নয় বর্ষাকালে।"

জটি পিসিমা তাল সম্বন্ধে আর কোনো আগ্রহ দেখালেন না বা তালনবমীর ব্রত উপলক্ষে তাদের নিমন্ত্রণ করার উল্লেখও করলেন না,—যদিও দুজনেরই আশা ছিল হয়তো জটি পিসীমা তাদের দেখলেই নিমন্ত্রণ করবেন এখন। দরজার কাছে গিয়ে নেপাল আবার পেছন ফিরে জিগ্যেস্ করলে, "তাল নেবেন তা হ'লে?"

"তাল? তা দিয়ে যেও বাবা। ক'টা করে পয়সায়?"

"দুটো করে দিচ্ছি পিসীমা। তা নেবেন আপনি, তিনটে করেই নেবেন।"

"বেশ কালো হেঁড়ে তাল তো? আমাদের তালের পিঠে হবে তালনবমীর দিন—ভালো তাল চাই।"

"মিশ্‌কালো তাল পাবেন। দেখে নেবেন আপনি।"

গোপাল বাইরে এসেই দাদাকে বললে, "কবে তাল দিবি দাদা?"

"কাল।"

"তুই ওদের কাছে পয়সা নিস্ নে দাদা।"

নেপাল আশ্চর্য হয়ে বললে, "কেন রে?"

"তা'হলে আমাদের নেমন্তন্ন করবে, দেখিস এখন।"

"দূর! তা হয় না। আমি কষ্ট করে তাল কুড়বো—আর পয়সা নেবো না?"

রাত্রে বৃষ্টি নামে। হু হু বাদলার হাওয়া সেই সঙ্গে। পূর্বদিকের জানলার কপাট দড়িবাঁধা ; হাওয়ায় দড়ি ছিঁড়ে সারারাত খট্ খট্ শব্দ করে ঝড়বৃষ্টির দিনে। গোপালের ঘুম হয় না, তার যেন ভয় ভয় করে। সে শুয়ে শুয়ে ভাব্‌চে—দাদা তাল যদি বিক্রি করে,—তবে ওরা আর নেমন্তন্ন করবে না। তা কখনো করে?

খুব ভোরবেলা উঠে গোপাল দেখলে বাড়ীর সবাই ঘুমিয়ে। কেউই তখন ওঠে নি। রাত্রের বৃষ্টি থেমে গিয়েচে,—সামান্য একটু টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়চে। গোপাল একছুটে চলে গেল গ্রামের পাশে সেই তালদীঘির ধারে। মাঠে এক হাঁটু জল আর কাদা। গ্রামের উত্তরপাড়ার গণেশ কাওরা লাঙল ঘাড়ে এই এত সকালে মাঠে যাচ্ছে। ওকে দেখে

বললে, "কি খোকা ঠাকুর, যাচ্ছ কনে এত ভোরে?"

"তাল কুড়ুতে দীঘির পাড়ে।"

"বড্ড সাপের ভয় খোকাঠাকুর! বর্ষাকালে ওখানে যেও না একা-একা।"

গোপাল ভয়ে ভয়ে দীঘির তালপুকুরের তালের বনে ঢুকে তাল খুঁজতে লাগলো। বড় আর কালো কুচকুচে একটা মাত্র তাল প্রায় জলের ধারে পড়ে ; সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ফিরে আসবার পথে আরও গোটা-তিনেক ছোট তাল পাওয়া গেল। ছেলেমানুষ, এত তাল বয়ে আনার সাধ্য নেই, দুটি মাত্র তাল নিয়ে সোজা একেবারে জটি পিসীমার বাড়ী হাজির।

জটি পিসীমা সবেমাত্র সদর দোর খুলে দোরগোড়ায় জলের ধারা দিচ্ছেন, ওকে এত সকালে দেখে অবাক হয়ে বললেন, "কিরে খোকা?"

গোপাল একগাল হেসে বললে, "তোমার জন্যে তাল এনিচি পিসীমা!"

জটি পিসীমা আর কিছু না বলে তাল দুটো হাতে করে নিয়ে বাড়ীর ভেতরে চলে গেলেন।

গোপাল একবার ভাবলে, তালনবমী কবে জিগ্যেস করে ; কিন্তু সাহসে কুলোয় না তার। সারাদিন গোপালের মন খেলাধুলোর ফাঁকে কেবলই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। ঘন বর্ষার দুপুরে, মুখ উঁচু করে দেখে—নারকোল গাছের মাথা থেকে পাতা বেয়ে জল ঝরে পড়চে, বাঁশ ঝাড় নুয়ে পড়চে বাদলার হাওয়ায়, বকুলতলার ডোবায় কট্‌কটে ব্যাঙের দল থেকে থেকে ডাকচে।

গোপাল জিগ্যেস করলে, "ব্যাঙ্‌গুলো আজকাল তেমন ডাকে না কেন মা?"

গোপালের মা বলেন, "নতুন জলে ডাকে, এখন পুরোনো জলে তত আমোদ নেই ওদের।"

"আজ কি বার, মা?"

"সোমবার। কেন রে? বারের খোঁজে তোর কি দরকার?"

"মঙ্গলবারে তালনবমী, না মা?"

"তা হয়তো হবে। কি জানি বাপু! নিজের হাঁড়িতে চাল জোটে না, তালনবমীর খোঁজে কি দরকার আমার?"

সারাদিন কেটে গেল। নেপাল বিকেলের দিকে জিগ্যেস করলে, "জটি পিসীমার বাড়ীতে তাল দিইছিলি আজ সকালে? কোথায় পেলি তুই? আমি তাল দিতে গেলে পিসী বললেন, 'তাল, গোপাল তাল দিয়ে গেচে, পয়সা নেয় নি।'—কেন দিতে গেলি তুই? একটা পয়সা হ'লে দুজনে মুড়ি কিনে খেতাম!"

"ওরা নেমন্তন্ন করবে, দেখিস্ দাদা, কাল তো তালনবমী!"

"সে এমনিই নেমন্তন্ন করবে, পয়সা নিলেও করবে। এই একটা বোকা!"

"আচ্ছা দাদা, কাল তো মঙ্গলবার না?"

"হুঁ।"

রাত্রে উত্তেজনায় গোপালের ঘুম হয় না। বাড়ীর পাশের বড় বকুল গাছটায় জোনাকির ঝাঁক জ্বলচে ; জানালা দিয়ে সেদিকে চেয়ে চেয়ে সে ভাবে—কাল সকালটা হ'লে হয়। কতক্ষণে যে রাত পোহাবে!...

জটি পিসীমা আদর করে ওকে বললেন খাওয়ানোর সময়, "খোকা, কাঁকুড়ের ডাল্‌না আর নিবি? মুগের ডাল বেশি করে মেখে নে।" জটি পিসীমার বড় মেয়ে লাবণ্য-দি একখানা থালায় গরম-গরম তিল-পিটুলি ভাজা এনে ওর সামনে ধরে হেসে বললে, "খোকা, ক'খানা নিবি তিল-পিটুলি?"—বলেই লাবণ্য-দি থালাখানা উপুড় করে তার

পাতে ঢেলে দিলে। তার পর জটি পিসীমা আনলেন পায়েস আর তালের বড়া। হেসে বললেন, "খোকা যাই তাল কুড়িয়ে দিয়েছিলি, তাই পায়েস হ'ল!...খা, খা,—খুব খা— আজ যে তালনবমী রে!"...কত কি চমৎকার ধরনের রাঁধা তরকারির গন্ধ—বাতাসে! খেজুর গুড়ের পায়েসের সুগন্ধ—বাতাসে! গোপালের মন খুশি ও আনন্দে ভরে উঠলো। সে বসে বসে খাচ্ছে, কেবলই খাচ্ছে!......সবারই খাওয়া শেষ, ও তবুও খেয়েই যাচ্ছে...... লাবণ্য-দি হেসে হেসে বলছে, "আর নিবি তিল-পিটুলি?"

"ও গোপাল?"

হঠাৎ গোপাল চোখ চেয়ে দেখলে—জানলার পাশে বর্ষার জলে ভেজা ঝোপঝাড়, তাদের সেই আতা গাছটা...সে শুয়ে আছে তাদের বাড়ীতে। মার হাতের মৃদু ঠেলায় ঘুম ভেঙেচে, মা পাশে দাঁড়িয়ে বলচেন, "ওঠ, ওঠ, বেলা হয়েচে কত! মেঘ করে আছে তাই বোঝা যাচ্ছে না।"

বোকার মত ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে সে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

"আজ কি বার মা...?"

"মঙ্গলবার।"

তাও তো বটে! আজই তো তালনবমী! ঘুমের মধ্যে ওসব কি হিজিবিজি স্বপ্ন সে দেখছিল!

বেলা আরও বাড়লো, ঘন মেঘাচ্ছন্ন বর্ষার দিনে যদিও বোঝা গেল না বেলা কতটা হয়েচে। গোপাল দরজার সামনে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর ঠায় বসে রইলো। বৃষ্টি নেই একটুও, মেঘ-জমকালো আকাশ। বাদলের সজল হাওয়ায় গা সিরসির করে। গোপাল আশায় আশায় বসে রইলো বটে, কিন্তু কই, পিসীমাদের বাড়ী থেকে কেউ তো নেমন্তন্ন করতে এলো না!

অনেক বেলায় তাদের পাড়ার জগবন্ধু চক্কোত্তি তাঁর ছেলেমেয়ে নিয়ে সামনের পথ দিয়ে কোথায় যেন চলেছেন। তাদের পেছনে রাখাল রায় ও তাঁর ছেলে সানু; তার পেছনে কালীবর বাঁড়ুয্যের বড় ছেলে পাঁচু আর ও-পাড়ার হরেন......

গোপাল ভাব্‌লে এরা যায় কোথায়?

এ-দলটি চলে যাবার কিছু পরে বুড়ো নবীন ভট্‌চাজ ও তার ছোট ভাই দীনু সঙ্গে একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে চলেছে।

দীনু ভট্‌চাজের ছেলে কুড়োরাম ওকে দেখে বললে, "এখানে বসে কেন রে? যাবিনে?"

গোপাল বললে, "কোথায় যাচ্ছিস তোরা?"

"জটি পিসীমাদের বাড়ী তালনবমীর নেমন্তন্ন খেতে। করে নি তোদের? ওরা বেছে বেছে বলেচে কি না, সবাইকে তো বলেনি......"

গোপাল হঠাৎ রাগে, অভিমানে যেন দিশাহারা হয়ে গেল। রেগে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "কেন করবে না আমাদের নেমন্তন্ন? আমরা এর পরে যাবো......"

রাগ করবার মত কি কথা সে বলেচে বুঝতে না পেরে কুড়োরাম অবাক্‌ হয়ে বললে, "বা রে! তা অত রাগ করিস কেন? কি হয়েচে?"

ওরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গোপালের চোখে জল এসে পড়লো—বোধ হয় সংসারের অবিচার দেখেই। পথ চেয়ে সে বসে আছে কদিন থেকে! কিন্তু তার কেবল পথ চাওয়াই সার হল? তার সজল ঝাপ্‌সা দৃষ্টির সামনে পাড়ার হারু, হিতেন, দেবেন, গুটুকে তাদের বাপ-কাকাদের সঙ্গে একে একে তার বাড়ীর সামনে দিয়ে জটি পিসীমাদের বাড়ীর দিকে চলে গেল......

বাড়ী বসিয়া লিখিতেছিলাম। সকাল বেলাটায় কে আসিয়া ডাকিল—জ্যাঠামশাই?...... একমনে লিখিতেছিলাম, একটু বিরক্ত হইয়া বলিলাম—কে?

বালিকা-কণ্ঠে কে বলিল—এই আমি, হাজু।

—হাজু? কে হাজু?

বাহিরে আসিলাম। একটি ষোল সতেরো বছরের, মলিন বস্ত্র পরনে মেয়ে একটি ছোট ছেলে কোলে দাঁড়াইয়া আছে। চিনিলাম না। গ্রামে অনেকদিন পরে নতুন আসিয়াছি, কত লোককে চিনি না। বলিলাম—কে তুমি?

মেয়েটি লাজুক সুরে বলিল—আমার বাবার নাম রামচরণ বোষ্টম।

এইবার চিনিলাম। রামচরণের সঙ্গে ছেলেবেলায় কড়ি খেলিতাম। সে আজ বছর পাঁচ ছয় হইল ইহলোকের মায়া কাটাইয়া সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছে সে সংবাদও রাখি। কিন্তু তাহার সাংসারিক কোনো খবর রাখিতাম না। তাহার যে এতবড় মেয়ে আছে, তাহা এখনই জানিলাম।

বলিলাম—ও! তুমি রামচরণের মেয়ে? বিয়ে হয়েচে দেখচি। শ্বশুরবাড়ী কোথায়?

—কালোপুর।

—বেশ বেশ। এটি খোকা বুঝি? বয়েস কত হলো?

—এই দু বছর।

—বেশ। বেঁচে থাক। যাও বাড়ীর মধ্যে যাও।

—আপনার কাছে এইচি জ্যাঠামশাই। আপনি লোক রাখবেন?

—লোক? না, লোক তো আছে গয়লা বৌ। আর লোকের দরকার নেই তো। কেন? থাকবে কে?

—আমিই থাকতাম। আপনার মাইনে লাগবে না, আমাদের দুটো খেতে দেবেন।

—কেন তোমার শ্বশুরবাড়ী?

মেয়েটি কোনো জবাব দিল না। অত শত হাঙ্গামাতে আমার দরকার কি? লেখার দেরি হইয়া যাইতেছে। সোজাসুজি বলিলাম—না, লোকের এখন দরকার নেই আমার।

তারপর মেয়েটি বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল এবং পরে শুনিলাম সে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল। চাল লইয়া চলিয়া গিয়াছে।

মেয়েটির কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, হঠাৎ একদিন দেখি, রায়েদের বাহিরের ঘরের পৈঠায় বসিয়া সেই মেয়েটি হাউহাউ করিয়া এক টুকরা তরমুজ খাইতেছে। যে ভাবে সে তরমুজের টুকরাটি ধরিয়া কামড় মারিতেছে, 'হাউহাউ' কথাটি সুষ্ঠু ভাবে সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং ঐ কথাটা আমার মনে আসিল। অতি মলিন বস্ত্র পরিধানে। ছেলেটি ওর সঙ্গে নাই। পাশে পৈঠার উপরে দু-এক টুকরা পেঁপে ও একখণ্ড তালের গুড়ের পাটালি। অনুমানে বুঝিলাম আজ অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে রায়-বাড়ী কলসী-উৎসর্গ ছিল, এসব ফলমূল ভিক্ষা করিতে গিয়া প্রাপ্ত। কারণ মেয়েটির পায়ের কাছে একটা পোঁটলা এবং সম্ভবত তাহাতে ভিক্ষায় পাওয়া চাল।

সেদিন আমি কাহাকে যেন মেয়েটির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। শুনিলাম মেয়েটি শ্বশুরবাড়ী যায় না, কারণ সেখানকার অবস্থা খুবই খারাপ, দু বেলা ভাত জোটে না। চালাইতে না পারিয়া মেয়েটির স্বামী উহাকে বাপের বাড়ী ফেলিয়া রাখিয়াছে, লইয়া যাইবার নামও করে না। এদিকে বাপের বাড়ীর অবস্থাও অতি খারাপ। রামচরণ বোষ্টমের

বিধবা স্ত্রী লোকের বাড়ী ঝি-বৃত্তি করিয়া দুটি অপোগণ্ড ছেলেমেয়েকে অতি কষ্টে লালন-পালন করে। মেয়েটি মায়ের ঘাড়ে পড়িয়া আছে আজ একবছর। মা কোথা হইতে চালাইবে, কাজেই মেয়েটিকে নিজের পথ নিজেই দেখিতে হয়।

একদিন আমাদের বাড়ীর ঝি গয়লা-বৌকে কথায় কথায় জিজ্ঞেস করাতে সে বলিল—হাজু নাকি আপনার বাড়ী থাকবে বলেছিল?

—হ্যাঁ। বলেছিল একদিন বটে।

—খবরদার বাবু, ওকে বাড়ীতে জায়গা দেবেন না, ও চোর।

—চোর? কি রকম চোর?

—যা সামনে পাবে, তাই চুরি করবে। মুখুয্যে বাড়ী রাখে নি ওকে, যা তা চুরি করে খায়, দুধ চুরি করে খায়, চাল চুরি করে নিয়ে যায়—আর বড্ড খাই খাই—কেবল খাবো আর খাবো। ওর হাতীর খোরাক জোগাতে না পেরে মুখুয্যেরা ছাড়িয়ে দিয়েচে। এখন পথে পথে বেড়ায়।

—ওর মা ওকে দেখে না?

—সে নিজে পায় না পেট চালাতি। ওকে বলেচে, আমি কনে পাবো? তুই নিজেরটা নিজে করে খা। তাই ও দোরে দোরে ঘোরে।

সেই হইতে মেয়েটির ওপর আমার দয়া হইল। যখনই বাড়ী আসিত, চাল বা ডাল, দু-চারিটা পয়সা দিতাম। বার দুই দুপুরে ভাত খাইয়াও গিয়াছে আমার বাড়ী হইতে।

মাসখানেক পরে একদিন আমার বাড়ীর সামনে হাউ মাউ কান্না শুনিয়া বাহিরে গেলাম। দেখি, হাজু কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদের বাড়ীর দিকে আসিতেছে। ব্যাপার কি? শুনিলাম মধু চক্রবর্তী নাকি তাহার আর কিছু রাখে নাই, তাহার হাতে একটা ঘটি ছিল, সেটিও কাড়িয়া রাখিয়া দিয়াছে—তাহাদের বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল, এই অপরাধে।

রাগ হইল। আমি গ্রামের একজন মাতব্বর, এবং পল্লীমঙ্গল সমিতির সেক্রেটারী; তখনই মধু চক্রবর্তীকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। মধু একখানা রাঙা গামছা কাঁধে হন্তদন্ত হইয়া আমার বাড়ী হাজির হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম—মধু, তুমি একে মেরেচ?

—হ্যাঁ দাদা, এক ঘা মেরেচি ঠিকই। রাগ সামলাতে পারি নি, ও আস্ত চোর একটা। শুনুন আগে, আমাদের বাড়ী ভিক্ষে করতে গিয়েচে, গিয়ে উঠোনের লঙ্কা গাছ থেকে কোঁচড় ভরে কাঁচা পাকা ঝাল চুরি করেচে প্রায় পোয়াটাক। আর একদিন অমনি ভিক্ষে করতে এসে, দেখি বাইরের উঠোনের গাছ থেকে একটা পাকা পেঁপে ভাঙচে, সেদিন কিছু বলি নি—আজ আর রাগ সামলাতে পারি নি দাদা। মেরেচি এক চড়, আপনার কাছে মিথ্যে বলবো না।

—না, খুব অন্যায় করেচ। মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলা, ওসব কি? ইতরের মত কাণ্ড। ছিঃ—যাও, ওর কি নিয়ে রেখেচ ফেরত দাও গে যাও।

হাজুকে বলিয়া দিলাম, সে আর কোনদিন মধু চক্রবর্তীর বাড়ী ভিক্ষা করিতে না যায়।

এই সময় আকাল শুরু হইয়া গেল। ধান-চাল বাজারে মেলে না, ভিখিরীকে মুষ্টি-ভিক্ষা দেওয়া বন্ধ। এই সময় একদিন হাজুকে দেখিলাম ছেলে কোলে গোয়ালপাড়ার রাস্তায় ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। আমাকে দেখিয়া নির্বোধের মত চাহিয়া বলিল—এই যে জ্যাঠামশায়।......যেন মস্ত একটা সু-সংবাদ দিতে অনেকক্ষণ হইতেই আমাকে খুঁজিতেছে।

আমি একটু বিরক্তির সহিত বলিলাম—কি?

—এই! আপনাদের বাড়ীও যাবো।

—বেশ। আমাদের বাড়ীতে প্রসাদ পাবি আজ—বুঝলি?

হাজু খুব খুশী। খাইতে পাইলে মেয়েটা খুব খুশী হয় জানি। কাঁটালতলার ছায়ায় রোয়াকে সে যখন খাইতে বসিল, তখন দুজনের ভাত তাহার একার পাতে। নিছক খাওয়ার মধ্যে যে কি আনন্দ থাকিতে পারে তাহা জানিতে হইলে হাজুর সেদিনকার খাওয়া দেখিতে হয়। স্ত্রীকে বলিয়া দিলাম—একটু মাছ-টাছ বেশি করে দিয়ে ওকে খাওয়াও……।

একদিন বোষ্টমপাড়ার হরিদাস বৈরাগীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের পাড়ার হাজু শ্বশুরবাড়ী যায় না কেন?

—ওকে নেয় না ওর স্বামী।

—কারণ?

—সে নানান কথা। ও নাকি মস্ত পেটুক, চুরি করে হাঁড়ি থেকে খায়। দুধের সর বসবার জো নেই কড়ায়, সব চুরি করে খাবে। তাই তাড়িয়ে দিয়েচে।

—এই শুধু দোষ? আর কিছু না?

—এই তো শুনিচি, আর তো কিছু শুনি নি। তারাও ভাল গেরস্ত না। তাহলে কি আর ঘরের বৌকে তাড়িয়ে দেয় খাওয়ার জন্যে? তারা তেমনি।

কিছুদিন আর হাজুকে রাস্তাঘাটে দেখা যায় না। একদিন তাদের পাড়ার বোষ্টমবৌ বলিল—শুনেচেন কান্ড?

—কি?

—সেই হাজু আমাদের পাড়ার, সে যে বনগাঁয়ে গিয়ে নাম লিখিয়েচে।

আমি দুঃখিত হইলাম। এদেশে নাম লেখানো বলে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করাকে। হাজু অবশেষে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করিল! খুব আশ্চর্যের বিষয় নয় এমন কিছু, তবু দুঃখ হয় গ্রামের মেয়ে বলিয়া। এখানেই এ ব্যাপারে শেষ হইয়া যাইত হয়তো, কারণ গ্রামে সব সময়ে থাকিও না, থাকিলেও সকলের খবর সব সময় কানেও আসে না।

পঞ্চাশের মন্বন্তর চলিয়া গেল। পথের পাশে এখানে ওখানে আজও দু-একটা কঙ্কাল দেখা যায়। ত্রিপুরা জেলা হইতে আগত বুভুক্ষু নিঃস্ব হতভাগ্যেরা পৃথিবীর বুকে চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। এ জেলায় মন্বন্তরের মূর্তি অত তীব্র ছিল না। যে দেশে ছিল, সে দেশ হইতে নিঃস্ব নরনারী এখানে আসিয়াছিল, আর ফিরিয়া যায় নাই।

পৌষ মাসের দিন। খুব শীত পড়িয়াছে। মহকুমার শহরে একটা পাঠাগারের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গিয়াছি, ফিরিবার পথে একটা গলির মধ্যে দিয়া বাজারে আসিয়া উঠিব ভাবিয়া গলির মধ্যে ঢুকিয়া কয়েক পদ মাত্র অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় কে ডাকিল—ও জ্যাঠামশায়।

বলিলাম—কে?

—এই যে আমি—

আধ অন্ধকার গলিপথে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম। একটা চালাঘরের সামনে পথের ধারে একটি মেয়ে রঙীন কাপড় পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কাপড়ের রঙ অন্ধকারের সংগে মিশিয়া গিয়াছে, আমি শুধু তাহার মুখের আবছায়া আদল ও হাত দুটি দেখিতে পাইলাম।

কাছে গিয়া বলিলাম—কে?

—বা রে, চিনতে পারলেন না? আমি হাজু।

হাজু বলিলেও আমার মনে পড়িল না কিছু। বলিলাম—কে হাজু?

সে হাসিয়া বলিল—আপনাদের গাঁয়ের। বা রে ভুলে গেলেন? আমার বাবার নাম রামচরণ বৈরাগী। আমি যে এই শহরে নটী হয়ে আছি।

এমন সুরে সে শেষের কথাটি বলিল, যেন সে জীবনের পরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে এবং সেজন্য সে গর্ব অনুভব করে। অর্থাৎ এত বড় শহরে নটী হইবার সৌভাগ্য কি কম কথা, না যার তার ভাগ্যে তা ঘটে? গ্রামের লোক, দেখিয়া বুঝুক তার কৃতিত্বের বহরখানা।

আমি কিছু বলিবার পূর্বেই সে বলিল—আসুন না দয়া করে আমার ঘরে।

—না, এখন যেতে পারবো না। সময় নেই।

—কেন, কি করবেন?

—বাড়ী যাবো।

সে আবদারের সুরে বলিল—না। আসতেই হবে। পায়ের ধুলো দিতেই হবে আমার ঘরে। আসুন—

কি ভাবিয়া তাহার সঙ্গে ঢুকিয়া পড়িলাম তাহার ঘরে। নিচু রোয়াক খড় ছাওয়া, রোয়াক পার হইয়া মাঝারি ধরনের একটি ঘর, ঘরে একখানা নিচু তক্তপোশের উপর সাজানো গোছানো ফর্সা চাদর পাতা বিছানা। দেওয়ালে বিলিতি সিগারেটের বিজ্ঞাপনের ছবি দু-তিনখানা। মেমসাহেব অমুক সিগারেট টানিতেছে। একখানা ছোট জলচৌকির উপর খানকতক পিতল-কাঁসার বাসন রেড়ির তেলের প্রদীপের অল্প আলোয় ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। মেঝেতে একটা পুরানো মাদুর পাতা। বোষ্টমের মেয়ে, একখানা কেষ্টঠাকুরের ছবিও দেওয়ালে টাঙানো দেখিলাম। ঘরের এক কোণে ডুগিতবলা এক জোড়া, একটা হুঁকো, টিকে তামাকের মালসা, আর কি কি।

হাজু গর্বের স্বরে বলিল—এই দেখুন আমার ঘর—

—বাঃ, বেশ ঘর তো। কত ভাড়া দিতে হয়?

—সাড়ে সাত টাকা!

—বেশ।

হাজু একঘটি জল লইয়া আসিয়া বলিল—পা ধুয়ে নিন—

—কেন? পা ধোয়ার এখন কোনো দরকার দেখচি নে। আমি এক্ষুনি চলে যাবো।

—একটু জল খেয়ে যেতে হবে কিন্তু এখানে জ্যাঠামশায়।

এখানে জলযোগ করিবার প্রবৃত্তি হয় কখনো? পতিতার ঘরদোর। গা ঘিন্ ঘিন্ করিয়া উঠিল। বলিলাম—না, এখন কিছু খাবো না। সময় নেই—

হাজু সে কথা গায়ে না মাখিয়া বলিল—তা হবে না। সে আমি শুনচি নে—কিছুতেই শুনবো না—বসুন—

তাহার পর সে উঠিয়া জলচৌকি হইতে একটা চায়ের পেয়ালা তুলিয়া আনিয়া সযত্নে সেটা আঁচল দিয়া মুছিয়া আমাকে দেখাইয়া বলিল—দেখুন, কিনিচি—আপনাকে চা করে খাওয়াবো এতে—চা করতে শিখিচি।

ড্রেসডেন চায়না নয়, অন্য কিছু নয়, সামান্য একটা পেয়ালা। হাজুর মনস্তুষ্টির জন্য বলিলাম—বেশ জিনিস, বাঃ—

ও উৎসাহ পাইয়া আমাকে ঘরের এ জিনিস ও জিনিস দেখাইতে আরম্ভ করিল। একখানা আয়না, একটা টুকনি ঘটি, একটা সুদৃশ্য কৌটা ইত্যাদি। এটা কেমন? ওটা কেমন? সে এসব কিনিয়াছে। তাহার খুশি ও আনন্দ দেখিয়া অতি তুচ্ছ জিনিসেরও প্রশংসা না করিয়া পারিলাম না। এতক্ষণ ভাবিতেছিলাম, ইহাকে এ পথে আসিবার জন্য তিরস্কার করি এবং কিছু সদুপদেশ দিয়া জ্যাঠামশায়ের কর্তব্য সমাপ্ত করি। কিন্তু

হাজুর খুশি দেখিয়া ওসব মুখে আসিল না।

যে কখনো ভোগ করে নাই, তাহাকে ত্যাগ করো যে বলে, সে পরমহিতৈষী সাধু হইতে পারে, কিন্তু সে জ্ঞানী নয়। কাল ও ছিল ভিখারিণী, আজ এ পথে আসিয়া ওর অন্নবস্ত্রের সমস্যা ঘুচিয়াছে, কাল যে পরের বাড়ী চাহিতে গিয়া প্রহার খাইয়াছিল, আজ সে নিজের ঘরে বসিয়া গ্রামের লোককে চা খাওয়াইতেছে, নিজের পয়সায় কেনা পেয়লা-পিরিচে—যার বাবাও কোনোদিন শহরে বাস করে নাই বা পেয়ালায় চা পান করে নাই। ওর জীবনের এই পরম সাফল্য ওর চোখে। তাহাকে তুচ্ছ করিয়া, নিন্দা করিবার ভাষা আমার জোগাইল না।

সংকল্প ঠিক রাখা গেল না। হাজু চা করিয়া আনিল। আর একখানা কাঁসার মাজা রেকাবিতে স্থানীয় ভাল সন্দেশ ও পেঁপে কাটা। কত আগ্রহের সহিত সে আমার সামনে জলখাবারের রেকাবি রাখিল।

সত্যিই আমার গা ঘিন্ ঘিন্ করিতেছিল।

এমন জায়গায় বসিয়া কখনো খাই নাই। এমন বাড়ীতে।

কিন্তু হাজুর আগ্রহভরা সরল মুখের দিকে চাহিয়া পাত্রে কিছু অবশিষ্ট রাখিলাম না। হাজু খুব খুশী হইয়াছে—তাহার মুখের ভাবে বুঝিলাম।

বলিল—কেমন চা করিচি জ্যাঠামশায়?

চা মোটেই ভালো হয় নাই—পাড়াগেঁয়ে চা, না গন্ধ, না আস্বাদ। বলিলাম— কোথা-কার চা?

এই বাজারের।

—তুই নিজে চা খাস?

—হুঁ দুটি বেলা। চা না খেলে সকালে কোনো কাজ করতে পারি নে, জ্যাঠামশায়।

আমার হাসি পাইল। সেই হাজু!

ছবিটি যেন চোখের সামনে আবার ফুটিয়া উঠিল। রায়বাড়ীর বাহিরের ঘরের পৈঠার কাছে বসিয়া খোলাসুদ্ধ তরমুজের টুকরা হাউহাউ করিয়া চিবাইতেছে। সেই হাজু চা না খাইলে নাকি কোনো কাজে হাত দিতে পারে না।

বলিলাম—তা হোলে এখন উঠি হাজু। সন্দে উতরে গেল। আবার অনেকখানি রাস্তা যাবো।

হাজুর দেখিলাম, এত শীঘ্র আমাকে যাইতে দিতে অনিচ্ছা। গ্রামের এ কেমন আছে, সে কেমন আছে, জিজ্ঞাসাবাদ করিল। বলিল—একটা কথা জ্যাঠামশায়, মাকে পাঁচটা টাকা দেবো, আপনি নিয়ে যাবেন? লুকিয়ে দিতে হবে কিন্তু টাকাটা। পাড়ার লোকে না জানতে পারে। মার বড় কষ্ট। আমি মাসে মাসে যা পারি মাকে দিই। গত মাসে একখানা কাপড় পাঠিয়েছিলাম।

—কার হাতে দিয়ে দিলি?

—বিনোদ গোয়ালা এসেছিল, তার হাত দিয়ে লুকিয়ে পাঠালাম।

—তোর ছেলেটা কোথায়?

—মার কাছেই আছে। ভাবচি, এখানে নিয়ে আসবো। সেখানে খেতে-পরতে পাচ্চে না। এখানে খাওয়ার ভাবনা নেই জ্যাঠামশায়, দোকানের খাবার খেয়ে খেয়ে তো অছেন্দা হোল। সিঙেগড়া বলুন, কচুরি বলুন, নিম্‌কি বলুন—তা খুব। এমন আলুর দম করে ওই বটতলার খোট্টা দোকানদার, অমন আলুর দম কখনো খাই নি। এই এত বড় বড় এক-একটা আলু—আর কত রকমের মশলা—আপনি আর একটু বসবেন? আমি গিয়ে আলুর দম আনবো? খেয়ে দেখবেন।

নাঃ, ইহার সরলতা দেখিয়াও হাসি পায়। রাগ হয় না ইহার উপর। বলিলাম—না, আমি এখন যাচ্ছি। আর ঐ টাকাটা আমি নিয়ে যাবো না, তুমি মনিঅর্ডার করে পাঠালেও পারো। অন্য লোকে দেবে কি না দেবে—বিনোদ যে তোমার মাকে টাকা দিয়েচে কি না, তার ঠিক কি?

হাজুর এ সন্দেহ মনে ওঠে নাই এতদিন। বলিল—যা বলেচেন জ্যাঠামশাই, টাকাটা জিনিসটা তো এর ওর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিই। মা পায় কি না পায় তা কি জানি।

—এ পর্যন্ত কত টাকা দিয়েচ?

—তা কুড়ি পঁচিশ টাকার বেশী। আমি কি হিসেব জানি জ্যাঠামশাই, মা কষ্ট পায়, আমার তা কি ভাল লাগে?

—কার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিস?

হাজু সলজ্জ মুখে চুপ করিয়া রহিল। বুঝিলাম আমাদের গ্রামের লোকজন ইহার নিকট যাতায়াত করে।

বলিলাম—আচ্ছা, দে সেই পাঁচটা টাকা। —চলি—

—আবার আসবেন, জ্যাঠামশায়। বিদেশে থাকি, মাঝে মাঝে দেখে শুনে যাবেন এসে।

গ্রামে ফিরিয়া হাজুর মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া টাকা পাঁচটা তাহার হাতে দিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—আর কেউ তোমাকে কোন টাকা দিয়েছিল?

হাজুর মা আশ্চর্য হইয়া বলিল—কই না। কে দেবে টাকা?

বিনোদ ঘোষের নাম করিতে পারিতাম। কিন্তু তা করিলে কথাটা জানাজানি হইয়া পড়িবে। বিনোদ ভাবিবে আমারও ওখানে যাতায়াত আছে এবং হাজুর প্রণয়ীদের দলে আমিও ভিড়িয়া গিয়াছি এই বয়সে। কি গরজ আমার?

গল্প নয়

আমি এ গল্পটি শুনি যেভাবে তাই বলি।

গাড়ীতে বড় ভিড়, ইণ্টার ক্লাসও নেই, সেকেণ্ড ক্লাসও নেই। অতি কষ্টে একখানা গাড়ীতে ভীষণ ভিড়ের মধ্যে ঠেলেঠুলে কোনরকমে উঠলাম। উঠে ঠিক বোঝা গেল না গাড়ীর মধ্যে কোথাও জায়গা আছে কি নেই। এক জায়গায় কায়ক্লেশে একটু স্থান করে নিয়ে কোনরকমে নিজেকে গুঁজলাম দুজন মানুষের মাঝখানে। আমার বাঁ ধারে যে লোকটা বসে ছিল, তাকে অন্ধকারের মধ্যে দেখে মনে হল গরীব উড়িয়া, কারণ আসছিলাম কটক থেকে। একটু অবজ্ঞার সুরে বললাম—কোথায় যাউছন্তি?

আমার উড়িয়া ভাষার জ্ঞান বার-দুই পুরী আসবার অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত, এটা এখানে বলা আবশ্যক। যে লোকটির গায়ে হাত দিয়ে কথা বললাম, সে বিরক্তির সুরে পরিষ্কার বাংলায় বল্লে—এ রকম বলাটা এটিকেট নয় মশায়—

আমি অপ্রতিভ হয়ে পড়লাম। বাঙালী ভদ্রলোক জানলে কখনই আমি এ রকম বলতে সাহস করতাম না। হাতজোড় করে বললাম—মাপ করবেন মশাই। আমি বুঝতে পারি নি—

—না না কিছু না। আপনিও কিছু মনে করবেন না।

—ক্রমে খুব আলাপ জমে গেল ওঁর সঙ্গে। নাম বল্লেন জগবন্ধু চক্রবর্তী, বাড়ী বর্ধমান জেলায়। বয়স সত্তরের কাছাকাছি, কিন্তু এখনো বেশ শক্ত-সমর্থ। সাধু সন্ন্যাসী ধরনের লোক। তীর্থে তীর্থে বেড়িয়ে বেড়ানোই কাজ। আগে রেলে কাজ করতেন। গত পনেরো বিশ বছর ধরে তীর্থভ্রমণ ছাড়া কোনো বৈষয়িক কর্মে মন দেন নি।

রাত তখন ন'টা। এই সময় থেকে রাত তিনটের সময় খড়্গপুর আসা পর্যন্ত দীর্ঘ পথে আমরা দুজনে শুধু গল্পগুজব করেচি। আমি বেশি গল্প করি নি, বেশির ভাগ গল্প করেচেন তিনি।

একটা অসাধারণ ধরনের গল্প এখানে করি। শুনে সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তাঁর কথাতেই বলি।—

—সংসারটা অসার। চাকরি ছেড়ে দিয়ে তীর্থে তীর্থে বেড়াতে লাগলাম। বুঝলেন না? কিছু ভাল লাগে না।

—আপনার স্ত্রী?

—স্ত্রী থাকে বাড়ীতে।

—দেখাশুনো করে কে? ছেলেরা?

—ছেলে নেই। তিনটি মেয়ে। বিয়ে থাওয়া হয়ে গিয়েচে, শ্বশুরবাড়ি। ঘরকন্না করচে। কাজেই আমার কোনো পিছুটান নেই মশায়। কেন বেড়াবো না। নানারকম অভিজ্ঞতা হয়েছে দেশবিদেশে বেড়িয়ে। একটা বড় অভিজ্ঞতা হয়েচে কি জানেন, ভগবানের নামের অনেক গুণ। বড় মজা।

—কি রকম?

—সেবার চৈত্র মাসেই বড় গরম পড়ে গেল। কাটোয়া স্টেশনে নেমে দু-ক্রোশ তফাতে অজয় নদের বাঁধ, বেশ চওড়া, দুধারে কাশবন। সেই বাঁধ ক্রোশ-দুই গেলে তিলজুড়ি গাঁয়ে আমার এক শিষ্যের বাড়ী। সেখানেই যাচ্চি। যেতে যেতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। নির্জন স্থান, মানুষ-জন নেই কেনোদিকে—নিকটবর্তী গ্রামও দুক্রোশ দূর। এমন সময় মশায়, দেখি যে চারজন ষণ্ডামার্কা জোয়ান লোক বাঁ-দিকের কাশবন ঠেলে বাঁধের উপর এসে উঠলো। হাতে তাদের মোটা মোটা বাঁশের লাঠি—আমার দিকে এগিয়ে এসে সামনের লোকটা দুহাতে লাঠি তুললে আমার মাথা লক্ষ্য করে। মাথায় লাঠি মারে মারে—আর বেশি দেরি নেই! ভবলীলা সাঙ্গ হল, হল কি, হয়ে গিয়েছে—এমন সময় আমার মনে কে যেন কি বলে দিলে, আমি লোকটির দিকে চেয়ে বল্লাম—বাপু হে, হরিনাম করো। হরিবোল বলো। কেন আমাকে খুন করে ব্রহ্মহত্যার পাতক ঘাড়ে নেবে? টাকা চাও, এই নাও ব্যাগ। সামান্য যা কিছু আছে, ব্যাগে আছে। মানুষ খুন করবে কেন? পাপ কেন করবে? হরিবোল বলো। হরিবোল বলো—

আমি বল্লাম—আপনি যখন বলেছিলেন একথা, আপনার মনের ভাব কি রকম হচ্ছিল?

—মনে ভয়ও ছিল না ভরসাও ছিল না। অসাড় হয়ে গিয়েছিল মন। মরে যাই, যাবো। এই রকম মনের ভাব। কে যেন কি বলচে মনের মধ্যে বসে। কি আশ্চর্য ভাব—কে যেন বলচে—ওকে বলো, ওকে বলো। কি বলবো? যা মুখ দিয়ে বেরুবে।

আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বল্লাম—তারপর?

—তারপর, যা আশা করি নি, তাই ঘটে গেল হঠাৎ। লোকটি লাঠি নামিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। বল্লে—আপনার নাম কি? আমি নাম বল্লাম। সে আরও এগিয়ে বল্লে—দিন ব্যাগটা আমার হাতে। আমি ওর হাতে ব্যাগটা তুলে দিয়ে ভাবলাম টাকাগুলো নিয়ে লোকটা আমায় ছেড়ে দিলে বুঝি। কিন্তু তারপর দেখি লোকটা আমার পিছু পিছু আসচে। তিলজুড়ি গ্রামের কাছে এসে পেঁাছেচি, ঘরবাড়ী দেখা যাচ্চে, তখন সে বল্লে—ঠাকুর, আপনার ব্যাগটা ধরুন। কথার সুরে মুর্শিদাবাদের টান। পেছনে চেয়ে দেখি বাকি তিনটি লোক নেই, কখন সরে পড়েচে লক্ষ্য করি নি। তারপর সে ট্যাঁক থেকে একটা টাকা বার করে নীচু হয়ে আমার পায়ের ওপর রেখে উপুড় হয়ে প্রণাম করলে। বল্লে, পায়ের ধুলো নেবার যুগ্যি নই, আমি জাতে বাগদী। আমার বাড়ী ডহরা-

পাড়া, কাটোয়া ইস্টিশান থেকে সাত ক্রোশ পশ্চিমে। আমার নাম সতীশ বাগদী। আপনাকে একটা কথা দিতে হবে ঠাকুর, বলুন যে আমার বাড়ী একদিন পায়ের ধুলো দেবেন? আমি অতি নীচ জাত। তবু নীচকেও তো উদ্ধার করতে হবে? নীচ জাত যাবে কোথায়? বলুন, কিরূপা করবেন তো?

আমি বল্লাম—যাবো। আজ যাও। আর, হরিমন্ত্রে তোমায় দীক্ষা দিলাম। ওটি ভুলো না।

সে চলে গেল। যখন যাচ্চে তখন আমি স্পষ্ট শুনলাম সে হরিনাম করতে করতে গেল। আপনি অবিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু আমি স্বকর্ণে শুনেচি।

আর একটা কি হল জানেন, যখন ও চলে যাচ্চে তখন আমার মনে সে কি অপূর্ব ভাব! আমি ওর দিকে চেয়ে আছি; ও ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে, আমার মনে যেন কে বলচে—আহা, কষ্ট পাচ্ছিল, উদ্ধার হয়ে গেল, উদ্ধার হয়ে গেল। ভগবানের নাম মহাপুণ্য। সেই পুণ্য আজ ওর হল। বেঁচে গেল লোকটা, বেঁচে গেল। কে দয়া করে এই ঘটনাটির যোগাযোগ ঘটালে কি জানি! এই সন্ধ্যাবেলা আমাকে উপলক্ষ্য করে কে যেন এই পাপী-তাপীকে হরিনাম বিলিয়ে উদ্ধার করে গেল।

এইবার আমার পালা।

বল্লাম—সতীশ বাগদীর বাড়ী গিয়েছিলেন?

—শুনুন বলি। সেই শ্রাবণ মাসে অবসর পেয়ে ভাবলাম ডহরপাড়া গ্রামে যাবো। কাটোয়ার বাজারে একটা দোকানে বসে ওই গ্রামের নাম বলতে একজন বল্লে—সে গ্রামে কোথায় যাবেন? আমি বললাম, সতীশ বাগদীর বাড়ী। সে লোকটা বল্লে—লেঠেল সতীশ বাগদী?

—তা হবে।

—তাকে আপনি চিনতেন?

—একবার আলাপ হয়েছিল।

—সতীশ নেই। মাস দুই হল কলেরায় মারা গিয়েচে।

মনে মনে সতীশের আত্মার মঙ্গলকামনা করে কাটোয়া স্টেশনে ট্রেনে চড়লাম।

চাউল

মানভুমের টাঁড় ও জঙ্গল জায়গা। একটু দূরে বড় পাহাড়শ্রেণী, অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। বসন্তকালের শেষ, পলাশ ফুল বনে আগুন লাগিয়ে দিয়েচে, নার্কাটিটাঁড়ের উঁচু ডাঙা জমি থেকে যতদূর দেখা যায়, শুধু রক্তপলাশের বন দূরে নীল শৈলমালার কোল ছুঁয়েছে।

জঙ্গল দেখতে এসেচি এদিকে, কাছেই রাস্তার ধারে পলাশবনের প্রান্তে ডাক-বাংলোতে থাকি, জঙ্গলের কাঠে কেমন আয় হবে তাই দেখে বেড়াই। একদিন সন্ধ্যের আগে নার্কাটিটাঁড়ের বন দেখে ফিরচি, পথের ধারে একটা হরিতকী গাছের তলায় একটি লোক ও একটি ছোট মেয়ে বসে পুঁটলি খুলে কি খাচ্ছে। জনহীন পথিপার্শ্ব, কেউ কোনদিকে নেই—সন্ধ্যেরও আর অল্পই বিলম্ব, সামনে বাঘমুণ্ডীর বনময় পথ, এমন সময়ে লোকটা কি করে জানবার আগ্রহে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। লোকটার চেহারা দেখে বয়স অনুমান করা শক্ত। মাথার চুল কিছু পাকা, কিছু কাঁচা। পুঁটুলির মধ্যে খানদুই ছেঁড়া নেকড়া, একখানা কাঁথা আর কিছু মকাই—সের দুই হবে, একটা খালি চায়ের কিংবা বিস্কুটের টিন। বোধ হয় সেটাই তৈজসপত্রের অভাব পূর্ণ করচে সব দিক

দিয়ে। সঙ্গের মেয়েটির বয়স চার কি পাঁচ। পরণে ছোট্ট একটু ময়লা নেকড়া মেয়েটার, কোমরে ঘুন্সী।

আমি বললাম, "কোথায় যাবে হে, বাড়ী কোথায় ?"

লোকটি মানভূমি বাংলায় বললে, "তোড়াং হে···টুকু আগুন আছে ?"

"দেশলাই ? আছে, দিচ্ছি।···তোড়াং কতদূর এখন এখান থেকে ?"

"টুকু দূর আছে বটে। পাঁচ কোশ হবেক।"

"কোথা থেকে আসা হচ্ছে এমন সন্ধ্যেবেলা ?"

"হেই সেই পুরুলিয়া থিকে।···আগুন দাও বাবু। শোরিল এক্কেবারে কাবু হয়ে গিয়েছে। হেই মেয়েটার-মা মরে গেল ওর দু'বছর বয়সে। ওকে রেখে জঙ্গলে কাঠের কাম করতি যাইতে পারি নাই—তাই পুরুলিয়া গেঁইছিলি। ভিক্ষা মাঙি দু'বছর রঁইয়েছিলি।"

লোকটির কথাবার্তার ধরণ আমাকে আকৃষ্ট করলে। ডাক-বাংলোতে সন্ধ্যার সময় ফিরেই বা কি হবে এখন? সেখানেও সঙ্গিহীন ঘর-দোর। তার চেয়ে একটু গল্প করা যাক্ এর সঙ্গে। কাছে একটা বড় পাথর পড়েছিল, সেটার ওপর বসে ওকে একটা বিড়ি দিলাম। নিজেও একটা ধরালাম। লোকটার বাড়ী নাকি পাঁচ-ছ' ক্রোশ দূরবর্তী একটি ক্ষুদ্র বন্য গ্রামে, বাঘমুন্ডী ও ঝাল্‌দা শৈলমালা ও অরণ্যের মধ্যবর্তী কোন নিভৃত ছায়াগহন উপত্যকাভূমিতে, পলাশ, মহুয়া, বট, কেঁদ গাছের তলায়। ওর আর দুটি সন্তান হয়ে মারা যাওয়ার পরে এই মেয়েটি হয় এবং মেয়েটির বয়স যখন দু'বছর, তখন মাও হ'ল মৃত্যুপথযাত্রী। লোকটা জঙ্গলের কাঠ ভেঙে এনে চন্দনকিয়ারীর হাটে বিক্রী করতো এদেশের অনেক গ্রাম্যলোকের মতো। কিন্তু ঘরে কেউ নেই দু'বছরের মেয়েকে দেখবার, তাকে সঙ্গে নিয়ে উচ্চ পাহাড়ে উঠে রৌদ্র ও বর্ষায় কি করে কাঠ ভাঙে? তাই ঘরে আগড় বন্ধ করে ও চলে গিয়েছিল অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় পুরুলিয়া শহরে।

আমি বললাম, "কাঠের কাজে আয় হ'ত কেমন ?"

লোকটা বিড়িতে টান দিয়ে বললে, "বোঝা পিছু তিন আনা, চার আনা। জঙ্গলে ছাড় লিত দু'পয়সা। চাল ছস্তা ছিলি। হঁইয়ে যেতো পেটের ভাত দু'জনার। তারপর বাবু মেয়্যাটা হোলেক্, ওর মা মর্‌্যা গেলেক্। তখন কচি মেয়্যাটারে ফেলে জঙ্গলে যেতে মন নাই সরলেক্। বলি যাই পুরুলিয়া, ভারি শহর, পেটের ভাত দু'জনার হইয়ে যাবেক্।"

"পুরুলিয়া বড় জায়গা ?"

"ওঃ বাবু, ইধার থিকে উধার যাওয়ার কূল-কিনারা দু'বছরে নাই পাইলেক্। ভারি শহর বাবু······" আমি ওকে আর একটা বিড়ি দিলাম। গল্প জমে উঠেচে। বললাম,—"তারপর······?"

তারপর পুরুলিয়া শহরে কিভাবে গেল, তার গল্প করলে। ওদের পাশের গাঁয়ের একজন লোক পুরুলিয়া শহরে কি একটা কাজ করে, তার ঠিকানা খুঁজে বার করতে দিন কেটে গেল। সন্ধ্যা হয়েছে, তখন এক বড়লোকের বাড়ীর ফটকে মেয়ের হাত ধরে ভিক্ষে করতে দাঁড়ালো। তারা দুটি পয়সা দিলে, দু'পয়সার ছোলা কিনে বাপ-মেয়েতে রাত কাটিয়ে দিলে গাছতলায় শুয়ে। পুলিসে আবার শুতে দেয় না ; অর্ধেক রাত্রে এসে লণ্ঠনের আলো ফেলে বলে, "হিঁয়াসে হঠ্ যাও!" তার পরদিন আলাপী লোকের সন্ধান মিললো। গিয়ে দেখে দেশে সে লোকটা যত বড়াই করে, আসলে সে তত বড় নয়। সামান্য একটা দু-কামরা ঘরে সে আর তার স্ত্রী থাকে—তামাক মেখে বিক্রি করে মাথায় নিয়ে, কখনো জলের কুঁজো পাইকেরি দরে কিনে ফিরি করে খুচরো বেচে—

এই সব উঞ্ছবৃত্তি। অথচ দেশে বলেছিল সে বড় সাহেবের আরদালি।

যাহোক্, অনেক বলা-কওয়াতে সে জায়গা একটু দিলে—ঘরের বাইরের দাওয়ার একপাশে শুয়ে থাকতে হবে, তবে নিজের এনে খাওয়া-দাওয়া, তার ভার সে নেবে না। বছর দুই সেখানেই থেকে চলেছিল যা হয় এরকম—তারপর এই আকাল পড়লো, চালের দাম চড়লো—শহরে চালের দাম হ'ল আঠারো টাকা। ভিক্ষে আর তেমন লোকে দিতে চায় না—তাও হয়তো চলতো যা হয় করে, কিন্তু যাদের বাড়ীতে থাকা তারা গোলমাল করতে লাগলো। তারা আর জায়গা দিতে চায় না, বলে, "আমাদের লোক আসবে, বাড়ী ছেড়ে দাও।" রোজ গোলমাল করে, তাই আজ তিন দিন শহর থেকে বেরিয়ে জন্মভূমি তোড়াং গ্রামে চলেচে।

ছোট মেয়েটা এতক্ষণ খালি বিস্কুটের টিন হাতে করে বাজাচ্ছিল।

ওর দিকে সস্নেহদৃষ্টিতে চেয়ে লোকটা বললে, "এর নাম রেঁখেছে থুপী।"

আমি বাপের মনে আনন্দ দেবার জন্যে বললাম, "থুপী? বেশ নাম।"

বাপ সগর্বে বললে, "হাঁ, থুপী।" তারপর আমায় বললে, "বাবু, তামাক কিনবার পয়সা দিবেন দুটি?"

আমি পয়সা সামান্যই নিয়ে বেড়াতে বার হয়েচি, জঙ্গলের পথে পয়সা কি করবো? ওকে দুটি মাত্র পয়সা দিতে পারলাম। থুপী কি একটা বললে ওর বাবাকে, বাবা তাকে কাঁধে নিয়ে চললো। আমি চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম—

রাস্তা যেখানে উঁচু হয়ে ওদিকের সব দৃশ্য ঢেকে দিয়েচে, সেখানে ওর পাঁচ বছরের মেয়েটিকে কাঁধে নিয়ে পুঁটুলি বগলে ও চলেচে—সেদিকেই অস্তদিগন্ত ও সূর্যাস্ত, রঙীন অকাশের পটে ওর মূর্তি দেখাচ্ছে ছবির মতো, কারণ আগেই বলেছি রাস্তা উঁচু হওয়ার দরুন সেখানে আর কিছু দেখা যায় না, রাস্তাই সেখানে চক্রবালরেখার সৃষ্টি করেচে।

মনে মনে ভাবলাম, ওর কোথাও অন্ন নেই, গৃহ নেই—পাঁচ বছরের মেয়েকে কত স্নেহে কাঁধে তুলে ও যে চললো গ্রামের দিকে, সেখানে অন্ন কি জুটবে এ দুর্দিনে,—যদি পুরুলিয়া শহরে না জুটে থাকে। কোন্ বৃথা আশার আকর্ষণ ওকে নিয়ে চলেচে গ্রামের মুখে? তার পরেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল।......

এ হ'ল গত মাসের কথা। তখনও চাল ছিল ষোল টাকা আঠারো টাকা মণ, ক্রমে তাই দাঁড়ালো বত্রিশ টাকা, চল্লিশ টাকা। এই সময় একবার কার্য উপলক্ষে বিহার থেকে আমায় যেতে হ'ল বাংলাদেশে, পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা জেলায়। মানুষের এমন কষ্ট কখনো চোখে দেখি নি—চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত হবে।

যে আত্মীয়ের বাড়ী ছিলাম তাদের বাড়ীতে সন্ধ্যা থেকে কত রাত পর্যন্ত শীর্ণ বুভুক্ষু, কঙ্কালসার বালকবালিকা, বৃদ্ধ, প্রৌঢ় কালো হাঁড়ি উঁচু করে তুলে দেখিয়ে বলচে,—"একটু ফেন দিন মা, একটু ফেন!..." অনাহারে মৃত্যুর কত মর্মন্তুদ কাহিনী শুনে এলাম সারা পথ কুমিল্লা থেকে বেরিয়ে পর্যন্ত—স্টীমারে, ট্রেনে।

বিহারে এসে দেখি এখানেও তাই। বহেরাগোড়া স্কুলের বোর্ডিংএ ড্রেন্ দিয়ে যে ভাতের ফেন গড়িয়ে পড়ে তাই ধরে খাবার জন্যে একপাল বুভুক্ষু ছোট ছোট ছেলেমেয়ে হাঁড়ি হাতে দুবেলা বসে থাকে—তারই জন্যে কি কাড়াকাড়ি!

হেডমাস্টার বললেন, "এই গ্রামের ডোম আর কাহারদের ছেলেমেয়ে এখানেই পড়ে আছে ভাতের ফেনের জন্যে—সকাল থেকে এসে জোটে আর সারাদিন থাকে, রাত ন'টা পর্যন্ত। সামান্য দুটো ভাতের জন্যে কুকুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে।"

পুরুলিয়া থেকে আদ্রা যাচ্ছি, প্ল্যাটফর্মের খাবারের দোকানে খাবার খেয়ে পাতা

ফেলে দিয়েচে লোকে—তাই চেটে চেটে যাচ্ছে উলঙ্গ, কঙ্কালসার ছোট ছোট ছেলেরা—অথচ সে পাতায় কিছুই নেই। কি চাটছে তারাই জানে।

এই অবস্থার মধ্যে ভাদ্রমাসের শেষে আমি এলাম একটা জায়গায়, যেখানে অনেক লোক খাটচে একজন বড় কণ্ট্রাক্টরের অধীনে ডিনামাইট্ দিয়ে পাথর ফাটানো কাজে। জঙ্গলের মধ্যে পাথর ফাটিয়ে এরা টাটায় চালান দিচ্ছে, স্থানীয় জমিদারের কাছ থেকে নতুন ইজারা নেওয়া পাথর-খাদান।

একদিন সেখানকার ছোট্ট ডাক্তারখানাটার সামনে ভিড় দেখে এগিয়ে গেলাম। ডাক্তারখানাটার সংকীর্ণ বারান্দাতে একজন কুলি শুয়ে আছে। পিঠে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা—ব্যাণ্ডেজ ভিজে রক্ত দরদরিয়ে পড়ে সিমেণ্টের রোয়াক ভিজিয়ে দিয়েচে।

জিজ্ঞেস করলাম, "কি হয়েচে?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "এমন মাঝে মাঝে এক আধটা হচ্ছেই। ব্লাস্টিং করতে গিয়ে পাথর ছুটে লেগে মেরুদণ্ড একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়েচে। সেলাই করে দিয়েচি, এখন টাটানগর হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। অ্যাম্বুলেন্স্ আসচে!"

ভিড় একটু সরিয়ে কাছে গিয়ে দেখি একটা পাঁচ-ছ' বছরের মেয়ে ওর কাছে একটু দূরে বসে—কিন্তু সে কাঁদেও না, কিছুই না—নির্বিকার ভাবে বসে একটা খড় তুলে মুখে দিয়ে চিবুচ্ছে।

আমি তাকে দেখেই চিনলাম—আটমাস পূর্বে মানভূমের বন্য অঞ্চলে দৃষ্ট সেই ক্ষুদ্র বালিকা থুপী!

আহত কুলির মুখ ভাল করে দেখে চিনলাম—এ সেই থুপীর বাবা, যে সগর্বে বলেছিল, "এর নাম রেখেচি থুপী।"

আশপাশের দু'একজনকে জিগ্যেস করলাম, "এ কোথা থেকে এসেছিল জানো?"

একজন বললে, "মানভূম জিলা থেকে আজ্ঞে।"

"কি গাঁ?"

"তোড়াং।"

"ওর কোনো আপনার লোক এখানে নেই?"

"কে থাকবেক্ আজ্ঞে—ওর ওই বিটি ছানাটা আছে। কত কত দূর থিক্যা এখেনে কাজ করতে এসেচে, চাল দেয় সেই জন্যে আজ্ঞে।"

"কোম্পানী কত করে চাল দেয়?"

"হপ্তায় পাঁচ সের মাথাপিছু।"

সুতরাং থুপীর বাপের ইতিহাস আমি অনেকটা অনুমান করে নিলাম। গ্রামে গিয়ে দেখলে বাড়ী ভেঙেচুরে গিয়েচে, চাল মেলে না, মিললেও ওর সামর্থ্যের বাইরের জিনিস তা কেনা। মকাই ও বিরি কলাই, তারপরে বুনো কচু ও ভুঁই-কুমড়োর মূল খেয়ে যতদিন চলবার চললো—কারণ ঠিক এই ইতিহাস আমি বিভিন্ন অঞ্চলগুলি থেকে আগত প্রত্যেক কুলির মুখেই শুনেচি—শেষে এখানে ও এসে পড়লো মজুরি, বিশেষ করে চাল পাওয়ার লোভে। পয়সা দিলেও গ্রামে আজকাল চাল মিলচে না, আমি সেদিন বহেরাগোড়া অঞ্চলে দেখে এসেছি।

এ্যাম্বুলেন্স্ গাড়ী এলো। ধরাধরি করে থুপীর বাবাকে গাড়ীতে ওঠানো হল—সে কেবলমাত্র একবার যন্ত্রণাসূচক 'আঃ' শব্দ উচ্চারণ করা ছাড়া অত আদরের অত গর্বের বস্তু থুপীর নামও করলে না, তার দিকে ফিরেও চাইলে না।

ডাক্তার বললেন, "টাটা এখান থেকে সাতাশ মাইল রাস্তা। ঝাঁকুনিতেই বোধ হয় মারা যাবে—বিশেষ করে রক্ত বন্ধ হল না যখন এখনো।"

দুধারে শালবনের মধ্যবর্তী রাঙা মরুম মাটির সোজা রাস্তা বেয়ে এ্যাম্বুলেন্সের মোটর ছুটলো থুপীর বাবাকে নিয়ে—পুনরায় অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে, পনুরায় পশ্চিমের আকাশ লক্ষ্য করে জন্ম থেকে মৃত্যুর দিকে। অতি সাধের অনাথা থুপীকে কার কাছে রেখে চললো সে হিসেব নেবার অবসর তখন তার নেই।

নস্তুমামা ও আমি

ছেলেমানুষ তখন আমি। আট বছর বয়স।

দিদিমা বলতেন, তোর বিয়ে দেব ওই অতুলের সঙ্গে।

মামার বাড়ীতে মানুষ, বাবা ছিলেন ঘর-জামাই—এসব কথা অবিশ্যি আরও বড় হলে বুঝেছিলাম।

অতুল আমার দিদিমার সইয়ের ছেলে, কোথায় পড়ে, বেশ লম্বামত আধ-ফর্সা গোছের ছেলেটা। আমাদের রান্নাঘরে বসে দিদিমার সঙ্গে আড্ডা দিত। অতুলকে আমার পছন্দ হতো না, কেমনধারা যেন কথাবার্তা। আমায় বলতো—এই পাঁচী, যা—এখানে কি? ঐ দিকে গিয়ে খেলা করগে যা—

কখনো বলতো—অমন দুষ্টুমি করবি তো বাঁশবনে লম্বা শেয়ালটা আছে তার মুখে ফেলে দিয়ে আসবো বলে দিচ্ছি—

অতুলকে সবাই বলতো ভাল ছেলে। লেখা-পড়ায় বছর বছর ভালো হয়ে ক্লাসে উঠতো। আমার ছোট মামার সঙ্গে কি সব ইংরিজি-মিংরিজি বলতো—যদি তার কিছু বুঝি।

এইসব জন্যেই হয়তো অতুলকে আমার মোটেই ভালো লাগতো না। তা সে যতই ভালো হোক, লোকে তাকে যতই ভালো বলুক।

ভালো আমার লাগতো মুখুয্যে-বাড়ীর নসুকে। কি সুন্দর ফর্সা চেহারা, ননী-ননী গড়ন, ডাগর চোখ-দুটি, বেশ হাসি-হাসি মুখখানি। বয়সও অতুল মামার মত অত বেশি নয়, আমার চেয়ে সামান্য কিছু বড় হবে। অতুল মামার বয়েস হয়তো ছিল ষোলো-সতেরো।

নসু হাসলে তার মুখ দিয়ে যেন মুক্তো ঝরতো—দিদিমার সেই গল্পের মত। এমন সুন্দর মুখ আমার আট বছরের জীবনে এ অজ পাড়াগাঁয়ে ক'টাই বা দেখেছি! দিদিমার কাছে এসে বসে মাঝে মাঝে সেও গল্প করতো, সে যা বলতো তা যেন মধুর, অতি মধুর। আমি হাঁ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে একমনে ওর কথাগুলো যেন গিলতাম। অতুলও তো কথা বলে, কিন্তু তার কথা এত ভালো লাগতো না তো?

দিদিমা বলতেন—অতুলের সঙ্গে পাঁচীর বিয়ে দেবো, বেশ মানাবে।

আমি মুখ ভারি করে বলতাম—ছাই মানাবে।

দিদিমা হেসে বলতেন—ওমা মেয়ের কাণ্ড দ্যাখো। কেন মানাবে না?

—তুমি তো সব জানো!

—তবে তোর মনটা কি শুনি? কাকে বিয়ে করবি তুই?

—ওই নসুকে।

দিদিমা হেসে গড়িয়ে পড়ে বলতেন—এর মধ্যেই মেয়ে নিজের বর বেছে নিয়েচে। ধন্যি যা হোক, একালের মেয়ে কি না! শুনলে সই, নসু নাকি ওর বর হবে।

অতুলের মা হেসে বলতেন—কেন রে, অতুলকে তোর পছন্দ হয় না কেন?

—অতুল মামার বয়েস বেশি।

—বেশি আর কত? ষোল বছর।

—তা যাই হোক, ষোল বছরের বুড়োকে আমি বুঝি বিয়ে করবো? নসু ছেলেমানুষ।

দিদিমা বলতেন—দ্যাখো সই একালের মেয়ের কান্ড। নসুর বয়স বারো, ওকেই বেশি পছন্দ। তোমার আমার কাল চলে গিয়েচে। তেরো বছর বয়সে আমার বিয়ে হলো, উনি তখন বিয়াল্লিশ, দোজপক্ষে আমায় ঘরে আনলেন। তোমারও তো—

অতুলের মা বল্লেন—আমার অত না! উনি তখন ঊনত্রিশ, আমার এগারো।

—দোজপক্ষ তো বটে।

—শুধু তাই? সতীন বেঁচে।

—আমায় ভগবান সেদিক থেকে নিষ্কণ্টক করেছিলেন তাই খানিক রক্ষে।

মাঝে মাঝে নসুকে অনেকদিন দেখতাম না। আমাদের পাড়ায় সে আসতো না খেলতে। আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠতো, ছুটে যেতাম মুখুয্যেবাড়ীতে।

নসুমামা উঠোনে বসে কঞ্চি কেটে খেলাঘরের বেড়া বাঁধছে। সঙ্গে আরও তিন-চারটি ছেলে, ওরই বয়স।

আমি বলতাম—ও নসুমামা, আমাদের বাড়ী যাওনি যে?

—কি রোজ রোজ যাবো! তুই এতদূর এলি যে? আসতে ভয় করে না?

—না।

—খেলা করবি?

—হুঁ।

অন্য ছেলেগুলো তখুনি বলে উঠতো—মেয়েমানুষ আবার আমাদের সঙ্গে খেলবি কেন? । তুই, পুঁটি, মান্তিদের সঙ্গে খেলগে যা।

নসু বলতো—খেলুক আমাদের সঙ্গে—তাতে কি।

হাবু বলতো—ও কি দা দিয়ে কঞ্চি কেটে আনতে পারবে? কি খেলা হবে ওকে নিয়ে? যা তুই—

আমাকে কাঁদো-কাঁদো দেখে নসু এসে হাত ধরতো। বলতো—কেন ওকে অমন কচ্ছিস তোরা? ও কেন কঞ্চি কাটতে যাবে? মেয়েমানুষ, চুপ করে বসে থাকবে। বোস তুই পাঁচী—

আমি অমনি কৃতার্থ হয়ে উঠোনের একপাশে বসে পড়তাম। নসুমামা খেলতে খেলতে হয়তো একটা পেয়ারা ছুঁড়ে দিতো আমার দিকে। বসে বসে পেয়ারা চিবুতাম। অনেকক্ষণ পরে বলতাম—নসুমামা, খিদে পেয়েচে—

হাবু অমনি বলে উঠতো—ঐ শোনো কথা। ও সব হ্যাঙ্গামা—

নসুমামা বলতো—তুই চুপ কর্ হাবু। খিদে পেয়েচে? চল্ পিসিমার কাছে, দুটো চালভাজা খাবি তেলনুন দিয়ে, না একটা কচি শসা পেড়ে দেবো—

আমি বলতাম—না, তুমি বাড়ী দিয়ে এসো। আমি বাড়ী গিয়ে ভাত খাবো।

হাবু অমনি চোখ পাকিয়ে বলে—তবে একলা এলি কি করে? কে এখন তোর সঙ্গে যাবে পৌঁছে দিতে? উঃ, ভারি পাজি মেয়ে—

নসু আমায় আগে আগে বাড়ী পৌঁছে দিতে আসতো, ধুলোমাটির পথের ধারে কত কেঁচোর মাটি, কত বেনে-বৌ গাছে গাছে, পাকা বকুল পড়ে থাকতো বকুল তলায়। নসুকে পাকা বকুল খাওয়াতে ইচ্ছে করতো, আমি বড্ড ভালোবাসি পাকা বকুল। নসু-মামাকে কুড়িয়ে খাওয়াতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সে বলতো—দূর, ও কষা লাগে। তুই খা, আমি খাবো না। নসুকে খেতে দিয়ে যেন আমার তৃপ্তি, সে সুযোগ ও আমায় দিত কই।

এইভাবে সারা শৈশব ও বাল্যকাল কেটে গেল সেই আমার ছেলেবেলাকার অতি পরিচিত মামার বাড়ীর গ্রামের গাছপালার ছায়ায়, চৈত্র মাসের পাখী-ডাকা শীতল সকাল-বেলাকার মত। তারপরেই জীবনের রোদ খরতর হয়ে উঠলো ক্রমশ। ফুল-ফোটা পাখী-

ডাকা বসন্তপ্রভাত গেল ধীরে ধীরে মিলিয়ে। বাতাস গরম হয়ে উঠলো।

সেই গাঁ, সেই তাঘরা শেখহাটি এখনও আছে। মাঝে মাঝে এখনও সেখানে যাই, কত্ত বদলে গিয়েছে সে জায়গা। সে মামার বাড়ী নেই, সে দিদিমাও নেই।

বাবা কোথায় কাদের আড়তে কাজ করতেন। সামান্য ক'টি টাকা মাইনে পেতেন, দিদিমার সঙ্গে সংসারের খরচপত্র নিয়ে তাঁর ঝগড়া-তর্ক হোত। বাবা রাগ করে চলে যেতেন বাড়ি থেকে, দু-একমাস কোন খবর আসতো না, মা কান্নাকাটি করতেন, হঠাৎ বাবা একদিন এসে হাজির হোতেন। দিন এভাবেই চলতো।

তেরো বছর বয়সে আমার বিয়ে হলো আড়ংঘাটার কাছে এক গ্রামে। বিয়ের দিনকতক আগে নসুদের বাড়ী গিয়েছিলাম। নসুর মার শরীর খারাপ, নসু রান্নাঘরে ভাত রাঁধছে। উনুনের আঁচে ওর ফর্সা মুখ রাঙা হয়ে গিয়েচে। ওদের বাড়ীর কোন বিলিব্যবস্থা নেই। অনেকগুলো ভাই নসুর, তারা কেউ বাইরে পড়ে, কেউ কাজ করে। নসুর মার শরীর চিররুগ্ন, সংসারের রান্নাবান্নার ভার নসুমামার উপর। আজ অনেকদিন থেকেই নসুর এই অবস্থা দেখছি।

নসুর অবস্থা দেখে সত্যিই কষ্ট হলো। নসুর মুখের দিকে চাইবার কেউ নেই, ভাইয়েরা সব স্বার্থপর, সংসার চালানোর ভার ওর ওপর ফেলে দিয়ে সবাই তারা নিশ্চিন্ত হয়ে আছে।

নসুমামা আমায় দেখে হেসে বল্লে—আয় পাঁচী, বোস। কাল দই পেতেছিলাম, দইটা বসেনি। উনুনের পাড়ে রেখে দেবো, কি বলিস ?

যত সব মেয়েলি গল্প নসুর। সাধে কি ওকে সকলে বলে জনার্দন মুখুয্যের বিধবা মেয়ে ?

আমায় বল্লে—কাল বুঝলি, এক কাঠা মুগের ডাল ভাজলাম, ভাঙলাম। বেলা গেল ডালডুল করতে। গা-হাত-পা ব্যথা।

বল্লাম—তুমি ডাল ভাজলে? সত্যি?

—হ্যাঁ রে। নইলে কে করবে? আবার কাল একগাদা ময়লা কাপড় সোডাসাবান দিয়ে সেদ্ধ করতে হবে।

দুঃখিত সুরে বল্লাম—ওসব মেয়েলি কাজ। তুমি ওসব কর কেন? আমায় ডাকলে না কেন? আমি ডাল ভেজে দিতাম।

নসু বল্লে—আহা! আমি না-পারি কি? তোকে আবার ডাকতে যাব কেন?

—লেখাপড়া করবে না নসুমামা? এসব কাজ কি তোমার সাজে? পুরুষমানুষ, লেখাপড়া কর।

—আমায় কে পড়াবে? দাদারা এক পয়সা দেবে না। তা ছাড়া মার শরীর খারাপ, আমি বাড়ী থেকে গেলে রান্নাবান্না কে করে বল্। পড়বার খরচ জুটলেও আমার পড়া হোত না।

আমি বসে বসে ওর কুটনো কুটে দিলাম। আমার বিয়ের কথা বল্লাম। নসুমামা বিশেষ কোনো আগ্রহ প্রকাশ করলে না। ও যদি একটুও আগ্রহ প্রকাশ করতো, শুনতো কোথায় আমার বিয়ে হচ্চে ইত্যাদি, তাহলে আমার ভালো লাগতো। কিন্তু নাঃ, সে সুখ আমার অদৃষ্টে নেই। নসুমামা একটা কথাও জিজ্ঞেস করলে না সে সম্বন্ধে।

আমার বিয়ের রাত্রে নসু নেমন্তন্ন খেয়ে এল পেট পুরে, কিন্তু না এল একবার বিয়ে দেখতে, না একবার বাসরঘরে উঁকি মেরে দেখতে। আমার মনটা যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা, ও যদি আসতো তবে খুব ভালো লাগতো। মনের মধ্যে ডুব দেবার সময় আমার নয় তখন, তবুও কি যেন একটা হয়ে গেল, এত বাজনা, এত খাবার-দাবার, এত লোক-

জনের যাতায়াত, আমার নতুন কাপড় গয়না—কিছুই ভালো লাগলো না। মনে উৎসাহ নেই।

আগেই বলেচি আমার বিয়ে হয়েছিল আড়ংঘাটার কাছে শিকারপুরে। স্বামীর বয়সও সতেরো-আঠারোর বেশি নয়, রোগা চেহারা, মাথার চুল-ওঠা। বিয়ের পরে জানা গেল স্বামী ম্যালেরিয়ার পুরনো রোগী। মাসে দুবার ম্যালেরিয়া জ্বর বাঁধা আছেই। আড়ংঘাটার যুগলকিশোর ঠাকুরের মেলার সময় ময়রার দোকান খোলেন আমার খুড়শ্বশুর, স্বামী তাড়ু দিয়ে সন্দেশ-মুড়কি ভিয়েন করেন!

শ্বশুরবাড়ীতে যাবার সময় মনে খানিকটা কৌতূহল নিয়ে যে না গিয়েছিলাম এমন নয়। না জানি কেমন বাড়ী-ঘর, কেমন খাওয়া-দাওয়া। গিয়ে দেখি, পুরনো আমলের ইঁট-বেরকরা কোঠাবাড়ী, দুটি মাত্র ঘর, ছোট একটা বারান্দা, তবে সব ঘরগুলির সামনে সান-বাঁধানো টানা রোয়াক এবং রান্নাঘরটিও কোঠা। খুব বড় একটা আম গাছ সমস্ত বাড়ীর উঠোন জুড়ে ঘুপসি করে রেখেচে।

আমার শ্বাশুড়ী গর্বের সুরে বল্লেন—আমের সময় তো আসচে, দেখো বৌমা। এমন আম এ অঞ্চলে নেই আমার বাগানে যা আছে, ডাকসাইটে বাগান, কর্তা করে রেখে গিয়েছিলেন, এস্তেক গোয়াড়ি, এস্তেক শান্তিপুর, কোথা থেকে কলমের চারা এনে না পুঁতেচেন!

আমের সময় এল, কোথা থেকে ব্যাপারীরা এসে বাগান কিনে নিলে। দু-এক ঝুড়ি আম যা আমাদের বাড়ী এল, তা থেকে দুটো-একটা জুটল আমার ভাগ্যে। শাশুড়ী নিতান্ত বাজে কথা বলেন নি, আম ভালো।

আমায় বল্লেন—তুমি কি খেতে ভালোবাসো?

আমি লজ্জা-টজ্জার ধার ধারিনে, বলে ফেল্লাম—তেলেভাজা খাবার।

স্বামী বল্লেন—দূর! অমন বোকা মেয়ে কেন? ভালো খাবারের নাম করো।

—গজা। জিলিপি।

—কেন খাজা?

—সে আবার কি গা? আমাদের গাঁয়ে শুনিনি তো।

উনি হো হো করে হেসে বল্লেন—পাড়াগেঁয়ে ভূত! আমাদের এ শহর বাজার জায়গা। কাল খাজা আনবো লুকিয়ে। কিন্তু সাবধান, মা যেন টের না পায়। বক্‌বে। আমি নিজে খাজা ভিয়েন করি।

সেই থেকে মাঝে মাঝে স্বামী লুকিয়ে লুকিয়ে খাবার আনেন। কোনোদিন খাজা, কোনোদিন মিহিদানা। আমরা দু'জনে লুকিয়ে খাই। স্বামী বলেন—সবাইকে দিতে গেলে চলে না। খুড়তুতো ভাইয়েরা হাঁসের পাল, সবার মুখে দিতে গেলে তোমার আমার মুখে এক টুকরো উঠবে কি না-উঠবে।

শ্বশুরবাড়ী ভালো লাগলো না বটে, তবে স্বামীকে কিছুটা ভালো লাগলো এই খাবার খাওয়া থেকে। উলোর জাতের মত বড় মেলা এ অঞ্চলে নেই, সে সময় ময়রার দোকানে কাজ বেশি। উনি ফেরেন অনেক রাতে। হাতে বড় বড় ঠোঙায় খাবার ভর্তি। উনি হেসে বলতেন—খাও; খুব খাও—এসো দুজনে পেটভরে খাই।

একদিন কি করে খুড়শ্বশুর টের পেলেন লুকিয়ে খাবার আনার ব্যাপারটা। এ নিয়ে খুব ঝগড়া হলো বাড়ীতে। আমাকে আর ওঁকে যথেষ্ট অপমান গালিগালাজ সহ্য করতে হলো।

খুড়শাশুড়ী বল্লেন—অমন নোলায় সাত ঝাঁটা মারি। লুকিয়ে লুকিয়ে খাবার খেয়ে দোকানটা শেষ করে দিলে গা! এমন অলক্ষ্মী বৌ তো কখনও দেখিওনি, শুনিওনি।

লজ্জাও করে না গুরুজনকে লুকিয়ে লুকিয়ে খেতে।

স্বামীকে রাত্রে বল্লাম—আর ওসব এনো না। দ্যাখো তো কি কাণ্ড বাধালে!

স্বামী বল্লেন—না আনবে না! আমায় কি মাইনে দেয় কাকা? বিনি মাইনের চাকর করে তো রেখেচে। পেটে দুটো খাবো না? ঠিক আনবো লুকিয়ে, তুমি দেখো। কেমন করে ধরবে কাকা তা দেখবো।

স্বামীর শরীর ভালো নয় অথচ ঘোর পেটুক। আমার কথা শুনতেন না। খাবার চুরি বন্ধ হলো না। রোজ রাত্রে একগাদা বাসি লুচি আর রসগোল্লার রস আনেন। নিজে খান, আমাকেও যথেষ্ট দেন। ওঁর পেটের অসুখ ছাড়ে না। আমার বারণ শোনেন না মোটে।

বলেন—খেয়ে যা উঠিয়ে নিতে পারি। কাকা একপয়সা উপুড়-হাত করবে না।

আমি বল্লাম—আমি বাপের বাড়ী যাবো আষাঢ় মাসে, আমায় নতুন কাপড় কিনে দেবে না?

উনি ঠোঁট উল্টে বল্লেন—কে দেবে? কাকা? তা দেখে আর বাঁচলাম না!

—সত্যি আমার নতুন কাপড় হবে না? বাপের বাড়ীতে কিন্তু সবাই নিন্দে করবে!

—যদি আমি দিতে পারতাম, সব হোত। আমার কি ইচ্ছে করে না তোমায় কাপড় দিতে? কোথায় পাবো?

—তাই তো। অনেকের নিন্দে শুনতে হবে তাই ভাবচি।

আষাঢ় মাসে বাপের বাড়ী এলাম। স্বামীও আমার সঙ্গে এলেন। তাঁকে দেখে গ্রামের সমবয়সী মেয়েরা নানা রকম নিন্দেবাদ করতে লাগলো।

আমায় একদিন রায়বাড়ীর মেজগিন্নি বল্লেন—হ্যাঁ পাঁচী, জামাই নাকি তাড়ু ঘোঁটে, ময়রার দোকানে?

আমি অতশত বুঝিনে, বল্লাম—হ্যাঁ। খুব ভালো খাজা তৈরি করে। সবাই হাতের সুখ্যাতি করে মাসীমা।

মেজগিন্নী হেসেই খুন। তাঁর বড় পুত্রবধূ যে বাপের বাড়ী থেকে আসতে চায় না, বাপের বাড়ীর কোন প্রতিবেশী ছেলের সঙ্গে প্রণয়াসক্ত, এসব কথা তিনি তখন ভুলে গেলেন। আমার স্বামীর খাবারের দোকানে কাজটাই প্রবল দোষের ও নিন্দের কারণ হয়ে উঠলো তাঁর কাছে। আমার স্বামীকে গ্রামের লোকে নতুন জামাই বলে খাতির আদর করলে না। আমার তাতে মনে বড় দুঃখ হলো। নতুন জামাইকে সকলে নেমন্তন্ন করে খাওয়ায়, আমার স্বামীকে সবাই যেন কেমন হেনস্থা করলে।

নসুমামা ঠিক তেমনি ভাত রাঁধচে। আমি তার ওখানে গিয়ে বসে গল্প করে একটু যা আনন্দ পেতাম। একটা জিনিস দেখলাম, নসু ধর্মে কর্মে মন দিয়েচে এই বয়সেই। চন্দন ঘষচে দেখে বল্লাম—দিদিমা পুজো করেন বুঝি আজকাল? নসু হেসে বল্লে—মা নয়। পুজো করবো আমি। রোজ শিব গড়িয়ে পুজো করি। মানুষ হয়ে জন্মে শুধু খেয়ে যাব শুওরের মত!

আমার হাসি পেলো ওর মুখে তত্ত্বকথা শুনে। নসুমামা আমাকে শসা কেটে খেতে দিল, নিজেই নারিকেলের নাড়ু করেচে ঘরে, তা দিলে, চা খেতে দিলে।

বছর দুই-তিন কাটলো। আমার স্বামীর শরীর সারলো না। ক্রমেই যেন আরও খারাপ হয়ে উঠচে। শাশুড়ী ও খুড়শাশুড়ী বলেন—ওই অলুক্ষণে বৌ এসে বাছার শরীর একদিনও ভালো গেল না।

শাশুড়ী বল্লেন—সংসারের কোনো জিনিসে আঁট নেই তা দেখেছ লক্ষ্য করে?

কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়, এ আমিও স্বীকার করচি। সত্যিই যেন আমার কোনো জিনিসে কোনো আসক্তি নেই। ভালো কাপড় নয়, গহনা নয়—কোনো কিছুতে না। আমার স্বামী বলেন—পয়সা জমাও না কেন? যা মাঝে মাঝে হাতে এনে দিই, জমিও। তোমার আখেরে ভালো হবে।

ওসব কথা আমিও শুনেও শুনিনি কোনো দিন। কার আখেরে কি হবে সে ভেবে ফল কি।

আমার একটি ছেলে হলো, কয়েকমাস পরে মারাও গেল। স্বামীর অসুখ সারে না। সংসারে খেটেই মরি, মুখের মিষ্টি কথা কেউ বলে না। স্বামী আমায় নানারকম সাংসারিক উপদেশ দেন। তাঁর যে রকম শরীর, কবে মরে যাবেন, তখন কি উপায় হবে? আমি যেন কিছু কিছু হাতে রাখি। এ কথা আমি যখন শুনি তখনই মনে থাকে, তারপর আর মনে থাকে না।

সেই মাঘ মাসে আমি বাপের বাড়ী এলাম। গ্রামে এসে শুনি নসুমামার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েচে, সে দিন-রাত পুজো-আচ্চা নিয়ে থাকে, কারো সঙ্গে কথা বলে না, কি রকম যেন। আমি গিয়ে দেখা করলাম বিকেলের দিকে। নসুমামা বল্লে—কি খবর পাঁচী, কখন এলি?

—কাল এসেছি। ভালো আছ?

—ভাল আছি। খুব আনন্দে আছি।

—সবাই তোমাকে পাগল বলচে যে?

নসুমামা মৃদু হেসে চুপ করে রইল। তারপর আমার দিকে শান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—আমি আসল বস্তু পাওয়ার চেষ্টায় আছি। এতে যে যা বলে বলুক। আমি পাগলই হই আর ছাগলই হই—হি-হি—হি-হি—হ্যাঁরে পাঁচী?

শেষের কথাগুলো আমার কানে একটু অসংলগ্ন-মত ঠেকলেও নসুমামার ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। কি যেন একটা ওর মধ্যে আমি পেলাম, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখিনি। ওর মুখের চেহারা যেন অন্য রকম হয়ে গিয়েছে। লোকে টাকাকড়ি ঘর-জমি আঁকড়ে পড়ে আছে দেখচি আমার চারিপাশে, খুড়শাশুড়ীকে দেখেছি গাছের সামান্য একটা আম যদি গাছের তলা থেকে কোনো-বাড়ীর ছেলে কুড়িয়ে নিয়ে যায় তবে ঝগড়া করে পাড়া মাত করেন। গাঁয়ের মধ্যে দেখেচি এক হাত জমি হয়তো এগিয়ে বেড়া দিয়েছে কেউ, তাই নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা দু-তিন বছর ধরে চলেচে। এমন আবহাওয়ার মধ্যে নসুমামা মানুষ হয়েও স্বতন্ত্র, ওর কাপড়ে-চোপড়ে, খাওয়ায়, বিষয়-আশয়ে কোনো আসক্তি নেই; পৈতৃক বিষয় আছে, কিন্তু ভায়েদের দিয়ে বসে আছে সর্বস্ব, একটা পয়সাও চায় না।

আমার স্বামী এসে দু-চারদিন রইলেন। স্বামীর ওপর আমার কেমন একটা মায়া হয়। এর মুখের দিকে কেউ চায় না আমার শাশুড়ী ছাড়া—তাও তিনি বুড়ো হয়েছেন, দেওরের কাছে কোনো কথা তাঁর খাটে না।

আমাদের গ্রামেও তাঁর তেমন খাতিরযত্ন নেই।

বল্লেন—এই গাঁয়ে একটা ঘর করলে ভালো হয়।

আমি বল্লাম—কেন, শ্বশুরবাড়ী বাস করবে? কেউ কিছু বলবে না?

—বলুক গে। কাকার ওখানে আর ভালো লাগে না।

—দেখ ভেবে।

—তোমাদের গাঁয়ের লোকগুলো যেন কেমন কেমন। ভালো করে কথাই বলে না।

আমার রাগ হলো, বল্লাম—তাড়ুঘোটা জামাইকে কে খাতির করবে শুনি?

স্বামী হেসে চোখ টিপে বল্লেন—ইঃ! রোজ রোজ রাত্তিরে খাজা খাওয়ার সময় তো খুব ভালো লাগে?

দু-একদিন পরে উনি চলে গেলেন। যাবার সময় আমার হাতে তেরো আনা পয়সা দিয়ে বলে গেলেন—এই পয়সা দিয়ে খাবার কিনে খেও। মাসখানেক থাকো; তারপর এসে নিয়ে যাবো।

আর আসেন নি তিনি। সেই মাসের শেষের দিকে পুরনো আমাশা রোগে তিনি আমার সিঁদুর আর হাতের শাঁখা ঘুচিয়ে ইহলোক ত্যাগ করলেন। বাবা চিঠি পেয়ে আমাদের প্রথমে কিছু বলেননি, তারপর দু'দিন পরে মাকে একদিন বল্লেন—হ্যাঁ একটা কথা, জামাইয়ের বড় অসুখ, চিঠি পেয়েচি।

মা আড়ষ্ট সুরে বলে উঠলেন—সে কি গো! এতক্ষণ বলনি কেন? হাটে চিঠি পেলে? কই দেখি চিঠি।

বাবা আমতা আমতা করে বলেন—তা—ইয়ে মনে ছিল না। তা নয়—ইয়ে—

আমি কান-খাড়া করে পাশের ঘরে বসে সব শুনচি। আমার বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করচে। মাথায় রক্ত উঠে যাচ্ছে যেন। জিব শুকিয়ে আসচে। আমি বুঝতে পেরেচি সব। বাবা অত্যন্ত ব্যস্তবাগীশ লোক, জামাইয়ের অসুখ-সংবাদে চুপ করে বসে থাকবার মানুষ নন। মা ছুটে হাঁপিয়ে বাবার কাছে এসে বল্লেন—তার কাছে এখুনি চলে যাও। মেয়ের যাবার কথা লেখেনি? ওকেও নিয়ে যাও—

বাবা শুষ্কমুখে বল্লেন—আর সেখানে গিয়ে কি হবে গিন্নী। সব শেষ হয়ে গিয়েচে।

মা মেঝের ওপর আছড়ে পড়লেন আর্ত চীৎকার করে। আমি কিন্তু বেশ সহজ ভাবেই কথাটা শুনলাম কারণ আমি আগেই বুঝতে পেরেচি বাবা কি বলবেন।

এইভাবে আমার বিবাহিত জীবনের ইতি হয়ে গেল। কি করবো, আমার অদৃষ্ট। বাবা তো বুড়োহাবড়া স্বামীর হাতে আমায় দেননি, ছোকরা দেখে দিয়েছিলেন, আমার কপালের লেখা, কারো দোষ নেই। আমার কিন্তু বিশেষ কোন দুঃখ নেই মনে। বিশেষ কিছু যে হারিয়েচি, বিশেষ কোন অভাববোধ নেই। লোকে বলচে আমার নাকি সর্বনাশ হয়ে গেল। কি সর্বনাশ হলো কিছু বুঝতে পারচি নে। মাছ খেতে পাবো না, না-ই বা পেলাম ; একাদশী করতে হবে, করবো। ভালো খাওয়া বা পরার দিকে আমার কখনো কোন ঝোঁক নেই। তবে মানুষটার ওপর মায়া জন্মেছিল বটে। তাকে আর দেখতে পাবো না, এইটুকু যা কষ্ট।

বিধবা হওয়ার পরে আমি অনেকবার শ্বশুরবাড়ী গেলাম।

শাশুড়ীর সেবা করি, মুখরা জায়ের সংসারে পুত্রহীনা বৃদ্ধার বড় কষ্ট, যত দূর পারি সেটুকু ঘোচাবার চেষ্টা করি। একাদশীর দিন শাশুড়ী-বৌয়ে নিরম্বু উপোস করি, সন্ধ্যের সময় তাঁর পায়ে তেল মালিশ করি।

খুড়শাশুড়ী সর্বদা শোনান, আমি অলুক্ষুণে বৌ, আমায় ঘরে এনেই তাঁর সোনার চাঁদ ছেলে, দুধের বাছা মারা গেল।

ভাসুরপোর ওপর এমন স্নেহ ভাসুরপোর জীবদ্দশায় কোনোদিন দেখেচি বলে মনে করতে পারলাম না। আশ্চর্য!

একবার বাপের বাড়ী এসে শুনলাম নসুমামা বাড়ী ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েচে। ছ' মাস পরে খবর এল হালিসহরের এক কালীমন্দিরে সে আছে, গঙ্গার তীরে দুখানা ভাঙা মন্দির, সেখানে সে পুজো-আচ্চা নিয়েই নাকি আছে।

খবরটা দিলে ও-পাড়ার বুধো গয়লার মা, ঘোষপাড়ার দোল দেখে দেশে ফেরবার

পথে সে হালিসহরে গিয়েছিল, সেইখানেই দেখা হয়েচে। আমি মনে মনে ভাবলাম ওর পক্ষে ভালোই হয়েচে। কি জানি কেন আমার মনে হয় নস্‌মামা যা করে তাই ভালো।

এইভাবে দিনের পর দিন কাটে। বৃদ্ধা শাশুড়ীকে কত যত্নে আগলে নিয়ে বেড়াই, বাপের বাড়ী গিয়ে বেশিদিন থাকতে পারিনে, পাছে বুড়ীর কষ্ট হয়। একদিন শাশুড়ী বল্লেন—চল মা, সান্যাল মশায়ের বাড়ী ভাগবত শুনে আসি—

—সে কে মা?

—পাড়ার বুড়ো স্যান্যাল দাদা, দ্যাখোনি বুড়োকে?

সান্যাল মশায়ের বাড়ী গেলাম। ওঁর অবস্থা বেশ ভালো বলে মনে হলো বাড়ীঘর দেখে, শুনলাম দুই ছেলে কলকাতায় চাকরি করে, তাদের স্ত্রী-পুত্র তাদেরই সঙ্গে কলকাতার বাসায় থাকে। সান্যাল মশায় বিপত্নীক। বয়স ছিয়াত্তর বছর, নিজেই বল্লেন। একটি বিধবা বোন বাড়ীতে থাকে ও রান্নাবান্না করে। আমাদের দেখে খুব যত্ন করলেন, আমাদের সামনে ভাগবত ব্যাখ্যা করে শোনালেন।

সেই থেকে সান্যাল মশায়ের বাড়ীতে রোজ যাই। আমায় তিনি বড় ভালোবাসেন, যোগবাশিষ্ঠ ও ভাগবত তাঁর প্রিয় বই। যদি দু'দিন না যাই, সান্যাল মশায় আমার শ্বশুরবাড়ী আসবেন। আমার শাশুড়ী তাঁর বৌমা। ডেকে বলেন—ও বৌমা?

বৃদ্ধা শাশুড়ী মাথায় কাপড় তুলে দিয়ে বলেন—কি দাদা?

—নির্মলা (আমার ভালো নাম) কোথায়? ডেকে দাও।

আমি বের হয়ে এসে বলি—কি দাদু?

—দাদু কি রে, তোমার জ্যাঠামশাই হই। তোমার শ্বশুরের চেয়ে এগার বছরের বড় আমি। আমার ওখানে ক'দিন যাওনি কেন? আজ অবিশ্যি যাবে।

আবার নিয়মিত ভাবে যাই। সান্যাল মশায় আজকাল আর কোন শ্রোতা চান না, আমার মধ্যে কি যে দেখেচেন—আমাকে পেয়ে খুব খুশি। যোগবাশিষ্ঠ পাঠ জমে না আমি না গেলে।

একদিন তাঁকে বল্লাম—জ্যাঠাবাবু আমি তো মুখ্যু মেয়েমানুষ, আমার মধ্যে কি পেলেন আপনি?

—কি পেলাম কি জানি। কিন্তু তুমি গেলে মা আমার গীতা আর যোগবাশিষ্ঠ জ্যান্ত হয়ে ওঠে। ওদের শ্লোকের মধ্যে থেকে নতুন ভাষ্য বেরিয়ে আসে। আনন্দ যদি শাস্ত্র-আলোচনার উদ্দেশ্য হয়, তবে সেটার ষোল আনাই পাই তুমি আস্‌লে মা।

আমি হেসে বল্লাম—তাহলে বলুন জ্যাঠামশাই, আমার মত শ্রোতা আপনি অনেকদিন পাননি?

—সত্য মা, এতদিন জানতাম না যে লোককে শুনিয়ে এত আনন্দ হয়। নিজেই চর্চা করতাম, এই পর্যন্ত। আজ কিন্তু অন্যরকম বুঝচি। উপযুক্ত শ্রোতা পেলে—

আমারও ভালো লাগে বলেই যাই। কেমন যেন মন বদলে যাচ্চে, যে মন আমার কোন কালেই সংসারে ছিল না—তা আরও নিরাসক্ত হয়ে পড়েচে। বন্ধনের মধ্যে কেবল বৃদ্ধা শাশুড়ী। বৃদ্ধা কাঁদেন, আমি বসে যোগবাশিষ্ঠের উপদেশ শোনাই। কিন্তু তাতে তাঁর মন ভেজে না। ঘোর বিষয়ী মন। এ বয়সেও কাঁটালের ভাগ নিয়ে, সজনে ডাঁটার ভাগ নিয়ে খুড়শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া। আমি বলি—মা, কি হবে আপনার এ'চড় আর সজনেডাঁটার চুলচেরা ভাগে। ওর কি সার্থকতা? ভগবানের নাম করুন।

বাতাবী লেবু ফুটলো ফাগুন মাসে—পথে পথে অপূর্ব সুগন্ধ ছড়িয়ে। ঘেঁটু-ফুলের বাঁশবনের তলা ভর্তি হয়ে গেল। কোকিলের ডাকে মন উদাস হয়ে ওঠে. কত

কথা ভাবি। বাল্যকালের কথা, মা-বাবার কথা, স্বামীর কথা—জীবনে কিছু না পেয়েই যেন সব-কিছু পেয়েচি। যদি কোনো হিসাবী বিষয়ী লোক বলে, কি পেয়েচ, হিসেব দেখাও—হয়তো কিছু দেখাতে পারবো না—কারণ বাইরে আমার অর্ধমলিন সরুপাড় ধুতি আর দুগাছি অতি সরু বিবর্ণ সোনার চুড়ির মধ্যে কেউ লাভের সন্ধানই খুঁজে পাবে না, আমার মন বলে কি-এক জিনিসের ঠিকানা মিলেচে, যার দরুন অফুরন্ত আনন্দের ভাণ্ডার আজ আমার কাছে খোলা। অন্য সব কিছু যেন তুচ্ছ হয়ে গিয়েচে।

একদিন আমার শাশুড়ী বল্লেন—ও বৌমা, তোমাদের গাঁয়ের একটি ছেলে আমাদের গ্রামে হরি কলুর বাড়ীতে এসে চাকরি করচে। বামুনের ছেলে, দিব্যি চেহারা। কিন্তু বাপু, কলুবাড়ী জল তোলে, গরুর জাব কাটে, এ আবার কেমন কথা! বড্ড গরীব বোধ হয়। আমি দেখিনি, কে কাল বলছিল ঘাটে। বল্লে, বৌমার দেশের লোক।

যেদিন শুনলাম, সেইদিনই পথে নসুমামার সঙ্গে দেখা। কিন্তু প্রথমটা চিনতে পারিনি। নসুমামার মাথায় বড় বড় চুল, পরনে শাড়ী, আধ-ঘোমটা দেওয়া, হাতে কাঁচের চুড়ি মেয়েলি বেশ, অথচ মুখে ঈষৎ গোঁফ-দাঁড়ি। আমার হাসি পেল ওর এই অপরূপ বেশ দেখে। আমায় দেখে মেয়েলি সুরে বল্লে—ও পাঁচী, ভাল আছিস তো ভাই?

আমি অবাক হয়ে বল্লাম—তোমার এ কি বেশ নসুমামা?

নসুমামা অদ্ভুত হাসি হেসে বল্লে—এই, থাকলেই হলো একরকম।

—তুমি নাকি কলুবাড়ী বাসন মাজো, জল তোলো?

—দোষ কি?

—তুমি যা ভালো বোঝো।

বৃদ্ধা শাশুড়ী সেই শ্রাবণ মাসে দেহ রাখলেন। দিন-দশেক জ্বরে ভুগে গভীর রাত্রে মৃত্যুর কিছু পূর্বে অশ্রুভরা চোখে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন—তোমাকে কার কাছে রেখে যাচ্চি মা?

বৃদ্ধার আকুল সুরে মনে ব্যথা বাজল আমার। তাঁর জ্বরশীর্ণ হাতদুটি ধরে বল্লাম—কেন, আমার সোনার চুড়ি আছে, এক বিঘে আমন ধানের জমি আছে—ভাবনা কি মা আমার? কিছু ভেব না আমার জন্যে।

বিষয়ী লোককে বিষয়ের ভাষায় সান্ত্বনা দিই। আমি জানি যাঁর কাছে আমি আছি, তিনি আমায় কোনোদিন ফেলবেন না, চরণে স্থান দেবেনই।

নসুমামার সঙ্গে দেখা আবার একদিন। সে একগাদা কাপড় সেদ্ধ নিয়ে ঘাটে যাচ্চে কাচতে। আমি বল্লাম—ও-সব কাজ আমায় দাও নসুমামা। আমি তোমায় করতে দেবো না।

জোর করে সেগুলো তার কাছ থেকে নিয়ে নিজে কেচে দিলাম। আমার চোখের সামনে ও-সব খাটুনি খাটতে দেবো না ওকে। বল্লাম—হরি কলুর বাড়ী গোয়াল-পরিষ্কার আমি করে দেবো।

—না পাঁচী, লক্ষ্মীটি, লোকে কি বলবে?

—আমি গ্রাহ্য করিনে।

—আমি করি।

—মিথ্যে কথা, তুমি কিছু গ্রাহ্য কর না, কলুবাড়ী বাসন মাজচো অথচ—

—পাঁচী, এ সব তুই বুঝবিনে। ওসব করিসনে কক্ষনো।

ওর কথা সান্যাল জ্যাঠাকে বলতে তিনি বড় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ওকে দেখবার জন্যে। হরি কলুর বাড়ীর পেছনে একটা পুকুর, পুকুরের চারিধারে আম কাঁঠালের বাগান। তারই একটা গাছতলায় দেখা গেল ও চোখ বুজে বসে। সেই থেকে সান্যাল মশায়ের সঙ্গে ওর ভাব হয়ে গেল। যোগবাশিষ্ঠের দলে ভিড়ে পড়লো।

সান্যাল জ্যাঠা বলেন—ছেলেটি শুদ্ধসত্ত্ব।

শীতের প্রথমে কলুপাড়ায় কলেরা দেখা দিলে। একদিনে আঠারোটার কলেরা হলো, পাঁচটা মরে গেল। নসুমামা কি ভীষণ পরিশ্রম করে সেবা শুরু করলে। হরি কলুর ছোট ভাই ওর সেবাতেই নাকি বেঁচে উঠলো। রাত্রে ঘুমোয় না। নিজে হাতে রোগীদের গা ও বিছানা পরিষ্কার করে।

কলেরায় কলুপাড়া উজোড় হয়ে গেল—ধরলে কিছু দূরে মুচিপাড়াকে। ভয়ে তখন মুচিপাড়ার অনেক লোক পালিয়েছে। বুড়ো হিরু মুচি একদিনের অসুখে মারা গেল। কিন্তু তখন এমন ভয় হয়ে গিয়েচে, মড়া ঘরের মধ্যে পড়ে রইল সারাদিন. কেউ ফেলতে চায় না। সন্ধ্যের পর নসুমামা একা গিয়ে ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে ফেলে দিয়ে এল খালের ধারে শ্মশানে।

যোগবাশিষ্ঠের আসরে একথা শুনে আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। আমিও যাবো নসুমামাকে সাহায্য করবো। লোকে যে যা বলে বলুক গে।

জ্যাঠামশায় হেসে বল্লেন—মা. এ কাজ তোমার নসুমামার। তোমার জন্যে নয়। সব কাজে অধিকারী-ভেদ আছে।

—কেন? আমার অধিকার জন্মায়নি?

—তোমার বুড়ো শাশুড়ী মরে গিয়েচে, জগতে আরও কি বুড়ো হাবড়া নেই?

—আপনি বলুন নসুমামাকে। ও আমাকে নিতে চায় না কোন কাজে। আমি যাবো জ্যাঠামশায়!

এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন নসুমামা গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। কলুপাড়ার সবাই হায় হায় করতে লাগলো। খুড়শাশুড়ী বল্লেন—ভালোই হলো, চলে গেল, সুবুদ্ধি হয়েচে। বামুনের মুখ অমন করে হাসাতে হয়? ছিঃ ছিঃ—

তারপর মুখ টিপে হেসে বল্লেন—বৌমার বাপের বাড়ীর লোক। খুব কষ্ট হয়েচে বৌমা তোমার—না? যখন-তখন দেখা হোত তো? অন্য গাঁ থাকতে এ গাঁয়ে এসেছিল সেজন্যেই হয়তো, তবুও তো দেশের ঘরের লোক আছে একটা।

ছিলে-খোলা ধনুকের মত সটাং সোজা হয়ে বলে উঠি—নিশ্চয়ই। আমার কষ্ট তো হবারই কথা।

হরি কলু একদিন সান্যাল জ্যাঠার কাছে বল্লে—অমন মানুষ হয় না। ছোট ভাইটা বেঁচে উঠলো, পায়ে ধরতে গেলাম, বলি তুমি ব্রাহ্মণ, আমার ঘরে হেনস্থা কাজ আর করতে দেবো না। দু'মাসের মাইনে বাকি, একটা পয়সাও নিয়ে গেল না যাবার সময়। হঠাৎ পালিয়ে গেলেন। আমায় যেন ক্ষ্যামা করেন তিনি।

হাত জুড়ে সে উদ্দেশে প্রণাম করলে।

আবার ফাগুনে বনে বনে ফুল ফুটেচে, আবার কোকিলের ডাক পথে পথে। মুচুকুন্দ চাঁপার সুগন্ধে ঘাটের রানা ভুরভুর করে। আমি একদিকে যেন সম্পূর্ণ নিঃস্ব। জ্যাঠামশায়ের বৈঠকখানায় যোগবাশিষ্ঠ শুনতে যাই রোজ বিকেলে। সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে রিক্ত হয়েই বোধ হয় সেখানে পৌঁছুতে হয়।

দৈবাৎ

গিরীন ঘোষের আড়ত বন্ধ হয় রাত নটায়। সারাদিন খাতা লেখা। ভাল লাগে এ কাজ? কখন খাইয়া-দাইয়া বাড়ী হইতে সে বাহির হইয়াছে। ছোট ছেলেটির অসুখ, বিনয়

ডাক্তারকে ডাকার কথা, গিয়াছিল কি না কে জানে। দু টাকা ভিজিট খরচ। তাছাড়া হয়তো ঔষুধ আনিতে বলিবে ডাক্তারখানা হইতে। ঔষধের দামও পড়িবে টাকা-দুই।

কালী চৌধুরী বিরক্তির সঙ্গে আড়ত বন্ধ করিল, দরজায় চাবি লাগাইয়া দিল। একজন খরিদ্দার বসিয়া ঢুলিতেছিল দাওয়ায়। তাহাকে ডাকিয়া বলিল—ওগো কর্তা, আজ তোমার দর ঠিক হবে না। আজ যাও, রাত হয়েছে। কাল সকালে এসে ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে কথা ব'লো।

ভাঙা সাইকেলটির চাবি খুলিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া চড়িয়া বসিল। ফুটফুটে জ্যোৎস্না-রাত, একটু একটু হাওয়া বহিতেছে মাঝে মাঝে। তাহার গ্রাম সাতবেড়ে, তিন মাইল পথ। বড় রাস্তা হইতে নামিয়া ফেঁসোহাটির মাঠের মধ্যে এক মাইল কাঁচা রাস্তা। বর্ষাকালে সাইকেল অচল, এখন কার্তিক মাসের শেষ, তাই ধুলো ঠেলিয়াও কোনরকমে চালানো চলে। আট টাকা মাহিনায় পোষায় এত? মাইল-টাক গিয়া মুচিপাড়া পার হইয়া বড় অশ্বত্থগাছটা ছাড়াইয়া কালী চৌধুরী সাইকেল হইতে নামিয়া পড়িল।

রাস্তার ওপর ওটা কি পড়িয়া আছে? নেকড়া-জড়ানো একটা বাণ্ডিলমত? কাছে গিয়া দেখিল নেকড়া-জড়ানো একটা বাণ্ডিলই বটে। ছোঁয়া ঠিক হইবে এই রাত্রিবেলা? শেষকালে বাড়ী ফিরিয়া স্নান করিয়া মরিতে হইবে নাকি?

সাত-পাঁচ ভাবিয়া শেষ পর্যন্ত দ্রব্যটি সে হাতে তুলিয়া লইল। নেকড়ার গেরো খুলিয়া কৌতূহলের সঙ্গে দেখিতে গেল—কাগজপত্র বলিয়া মনে হয়। দলিলপত্রের বাণ্ডিল কেহ ফেলিয়া গিয়াছে?

খুলিয়া দেখিয়া কিন্তু সর্বশরীর ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। হাত কাঁপিতে লাগিল। এই ঠাণ্ডা রাতেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। সর্বনাশ! একশ টাকার নোট—এক, দুই, তিন, চার...

কালী চৌধুরী সভয়ে রাস্তার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল। পল্লীগ্রামের পথ, এত রাত্রে সম্পূর্ণ নির্জন। হাটবার হইলেও বা দু-একজন মানুষ দেখা যাইত। কেহ কোন দিকে নাই আজ।

দশ...বিশ ত্রিশ...চল্লিশ...পঞ্চাশ...পঞ্চাশখানা এক শ' টাকার নোট। পঞ্চাশকে গুণ কর এক শ' দিয়া। শূন্য করতে শূন্য...না দূর কর—

উত্তেজনার মাথায় কালী চৌধুরী সহজ গুণ ভুলিয়া গেল—একবার হইল পাঁচ শ' একবার পঞ্চাশ হাজার। না, পাঁচ হাজারই বটে। বাণ্ডিলটা পুরানো নেকড়ায় জড়ানো। নোট ছাড়া এক টুকরাও অন্য কোন কাগজ নাই সঙ্গে। কাহারও নাম, কি কোনও চিঠি কি ঠিকানা—কিছু নাই। পাঁচ হাজার টাকা।

সে কুড়াইয়া পাইল এই অজ পল্লীগ্রামের পথে! কি সর্বনাশ! যে কালী চৌধুরী আট টাকা মাহিনায় গিরীন ঘোষের আড়তে চাকুরি করে, এই যুদ্ধের বাজারে যাহার দুবেলা পেট পুরিয়া ভাত জোটে না, একখানা তুলো-জমানো কম্বল সাড়ে তিন টাকায় মেলে হারাধন বক্সির কাপড়ের দোকানে কিন্তু পয়সার অভাবে কিনিয়া গায়ে দিতে পারে না—চারিটি ছেলেমেয়ে, বৌ, এক বৃদ্ধা পিসি, দুইটি গরু, তিনটি ছাগল, এক জোড়া পাতিহাঁস যাহার বাড়ীতে—সেই আধময়লা কুষ্টিয়ার চাদর গায়ে দেওয়া কালী চৌধুরীর হাতে পড়িল পঞ্চাশখানা এক শ' টাকার নোট—একটা আধুলি যাহার সঞ্চয় নাই, লক্ষ্মীর কাঠার মাথায় সিঁদুর মাখানো রুপোর টাকাটি ছাড়া!

বাণ্ডিলটা সে সন্তর্পণে কোঁচার কাপড়ে বাঁধিল। কেহ দেখে নাই তো? একবার সভয়ে চারিদিকে দেখিল।

না, রাস্তা সম্পূর্ণ জনহীন।

বাড়ী পর্যন্ত কোনরকমে সাইকেল চালাইয়া চলিয়া আসিল কালী। পা-হাত ঠিকমত নিজের বশে নাই। মাথার মধ্যে কেমন করিতেছে। মাথা গোলমাল হইয়া গিয়াছে। কালী চৌধুরী কিছু ভাবে নাই। পাঁচ হাজার টাকা তাহার কাপড়ের কোঁচায়, এই পর্যন্ত। এর বেশি আর সে কিছু ভাবিতে পারিতেছে না। মাথায় তার কিছুই নাই এর বেশি বর্তমানে।

কালীর স্ত্রীর নাম ননীবালা। বাপের বাড়ী পাশের গ্রামে, সনেকপুর। খাঁটি পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিতা মেয়েমানুষ, আগে যা হক চেহারা গড়ন-পিটন ভাল ছিল, এখন অসুখে ভুগিয়া ভুগিয়া তাও গিয়াছে।

কালীকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—হুঁশ-পব্বো হবে কবে? যাবার সময় পই-পই করে না বললাম সরষের তেলের বোতলটা নিয়ে যাও—তা বোতলটা ফেলে গিয়েছ কি বলে? রান্না হয় নি তেলের অভাবে। এত রাত গেল—

কালী চৌধুরী অন্যমনস্কভাবে বলিল—তেল নেই?

ননী রাগিয়া বলিল—থাকবে কোত্থেকে? পাঁচ ছটাক তেলে আজ দুবেলা চালাচ্ছি তিনটি দিন। তেল আনবার কথা তোমাকে বলে দিইনি? আজকাল কি গাঁজা ধরেছ নাকি? এ রকম করে সংসার করা আমার দ্বারা পোষাবে না বাপু! হ্যাঁগা, তোমার বগলে ওটা কি?

কালী চৌধুরী চমকিয়া উঠিয়া বলিল—ও কাগজ।

—আড়তের?

—হ্যাঁ। এগুলো আমার ওই কাঠের হাতবাক্সটাতে রেখে এস তো।

পাঁচ হাজার টাকার বাণ্ডিলটা সেই চাবিভাঙা বাক্সে হাতবাক্সটার মধ্যে দিনপনের পড়িয়া রহিল, ননীবালা কোন সন্দেহ করিল না, করিবার কথাও নয়। কালী চৌধুরীও যেন টাকার বাণ্ডিলের অস্তিত্ব ভুলিয়া গেল। তাহার সংসারে যেমন অভাব-অনটন চলিতেছিল, তেমনই চলিতে লাগিল। ও টাকায় হাত পড়িল না।

এই পনের দিনের মধ্যে কালী চৌধুরী অনেক কিছু ভাবিয়াছে। পরের টাকা ফেলিয়া গিয়াছে, যার টাকা সে যদি আসিয়া চায়, তবে এখনই বাহির করিয়া দিতে হইবে। নতুবা থানা পুলিশের হাঙ্গামা হইবে। খরচ করিয়া ফেলিলে, সে গরিব লোক, টাকা দিবে কোথা হইতে। দারোগা আসিয়া টানাটানি করিবে, হয়তো ঘরবাড়ী ক্রোক দিবে। না, ও টাকায় হাত দেওয়া হইবে না। ননীবালাকেও কোন কথা বলে নাই কালী চৌধুরী। মেয়েমানুষের মন, অতশত বুঝিবে না, টাকা খরচ করিবার তাগাদা দিয়া অস্থির করিয়া তুলিবে।

এই সময় আসিয়া পড়িল বিপদ। বড় খোকা অসুখে পড়িয়া বিছানার সঙ্গে মিশিয়া গেল। বাজারের বিনয় ডাক্তারেরর ডাক্তারখানায় পাঁচ ছ টাকা ওষুধের দাম বাকি পড়াতে সেখান হইতে ওষুধ আনা বন্ধ হইল। ননীবালার কানের একটা অল্প সোনার অলংকার বিক্রি করিয়া যাহা কিছু পাওয়া গেল, ডাক্তারের ভিজিটের দাম শোধ দিয়া সামান্যই অবশিষ্ট রহিল তার। অথচ ছেলের জ্বর বন্ধ হয় না।

এ অবস্থায় ননীবালা একদিন কাঁদিয়া পড়িল স্বামীর কাছে। ছেলেকে যে করিয়া হক বাঁচাইতে হইবে, জমিজমা সামান্য যাহা-কিছু আছে বিক্রি করিয়া ডাক্তার দেখানো হউক।

কালী বলিল—আছে তো মোটে দু বিঘে ধানের জমি।

—ওগো ধানের জমি যায় যাক গো, ভিক্ষে করে খাব। তুমি খোকাকে বাঁচাও।

তাহাই হইল শেষ পর্যন্ত। খোকাও বাঁচিল না, ধানের জমিও গেল।

ননীবালা পুত্রশোকে ভাঙিয়া পড়িল। অনাহারশীর্ণ শরীরে ঢুকিল জোর ম্যালেরিয়া, চিকিৎসাপত্র চলে না, পথ্য জুটানোও দুষ্কর। কালী চৌধুরী একদিন সাতপাঁচ ভাবিতে ভাবিতে নোটের বাণ্ডিল খুলিয়া ফেলিল। এক দুই তিন করিয়া গুনিল, পাঁচ হাজার টাকা ঠিক আছে। এ তহবিল হইতে আপাতত কিছু ধার লইলে কেমন হয়? কিন্তু শোধ হইবে কেমন করিয়া? দশ বিশ টাকা লইলে মাহিনার টাকা হইতে শোধ দিবার কোন উপায় নাই।

পুলিশ যখন আসিয়া বাড়ী ঘেরাও করিয়া ফেলিয়া টাকা চাহিবে, তখন?

সেদিন ননীবালা অনেক রাত্রে স্বামীকে ডাকিয়া বলিল—হ্যাঁগা, খোকা কদ্দিন গিয়েছে?

কালী চৌধুরী স্ত্রীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—কেন, সে কথা কেন এখন? ও কথা বলে না।

—বল না গো?

—তা দু মাস।

—তাকে কোথায় দিয়েছিলে?

—ঐ নদীর ধারে জামতলার শ্মশানে। তুমি ঘুমোও।

—না, শোন। তার ছিটের জামাটা গায়ে ছিল?

—সে কথা কেন এখন?

—বল না?

—ছিল।

—আমি জানি। শোন বলি।

—কি?

—খোকা এই জানলায় দাঁড়িয়ে ছিল, সেই ছিটের জামাটা গায়ে দিয়ে। সন্ধ্যেবেলা—

—ও সব কিছু না। তুমি ঘুমোও।

—আমি দেখলাম যে—

—ও কিছু না।

—খোকা আমায় ডাকছে। সে কি-একটা বলছে আমি বুঝতে পারছি নে।

—আঃ ঘুমোও না চুপটি করে। ও সব চোখের ভুল।

ননীবালা আর কোন কথা বলিল না। কালী চৌধুরী ঠিক করিল, কাল সকালে নোটের বাণ্ডিল হইতে দশটা টাকা বাহির করিয়া খরচ করিবে। নোট পাইয়াছে আজ চার মাস। কেহ খোঁজ করে নাই এ পর্যন্ত। বোধ হয় কেহ খোঁজ করিবেও না।

পরদিন সকালে উঠিয়া কালী চৌধুরী বিনয় ডাক্তারের ডাক্তারখানায় যাইবে, স্নান করিয়া আসিয়া নোটের বাণ্ডিল খুলিবে এমন সময় সাইকেল চড়িয়া একজন অপরিচিত লোক উঠানে আসিয়া সাইকেল হইতে নামিল।

কালী দাওয়া হইতে জিজ্ঞাসা করিল—কাকে চান?

লোকটা বলিল—এই কি কালীনাথ চৌধুরীর বাড়ী?

—হ্যাঁ, কেন?

আগন্তুক আসিয়া দাওয়ার উপর উঠিল। নীচু স্বরে বলিল—আপনি টাকা পেয়েছিলেন কুড়িয়ে? সে আমার টাকা।

কালী চৌধুরীর বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল। সে আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আপনার টাকা?

—হ্যাঁ, সে আমার টাকা। আপনি বনগাঁয়ে মতি পালের আড়তে বলেছিলেন, টাকা

কুড়িয়ে পেয়েছেন, যার টাকা সে এসে যেন নিয়ে যায়।

হ্যাঁ, তা বলে এসেছিলাম। কিন্তু আপনার টাকা কি করে জানব? কি ভাবে টাকা হারালেন আপনি?

—পাট বেচে যাবার সময় গেঁজে থেকে পড়ে গিয়েছিল।

—বেশ। কত টাকা?

লোকটি ভাবিয়া বলিল—তিন হাজার।

কালী চৌধুরী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আজ্ঞে না।

—আচ্ছা, বলছি। দু'হাজার—

—আজ্ঞে না—ও আপনার টাকা নয়। কিসে বাঁধা ছিল?

—ইয়ে—গেঁজেতে, না—রুমালে—

—আজ্ঞে না।

লোকটি উগ্রমূর্তি ধারণ করিল। কড়াস্বরে বলিল—তাহলে দেবেন না টাকা আপনি?

—না।

—বেশ, আমি থানায় গিয়ে বলি।

—যান। যার ন্যায্য টাকা আমি তাকে দেব বলে বসে আছি। নয় তো গল্প করে বেড়াতাম না টাকার কথা। আপনার টাকা ও নয়।

লোকটি চলিয়া গেল বটে, কিন্তু কালী চৌধুরীকে বড় ধাপ্পা দিয়াই গেল। থানা পুলিশের ভয় দেখাইল। লোক আনিয়া মারধোর করিবার ইঙ্গিতও করিল। সুতরাং লোকটা চলিয়া গেলে কালী চৌধুরী নোটের বাণ্ডিল হইতে দশটি টাকা বাহির করিয়া খরচ করিতে পারিল না। কালই পুলিশ আসিয়া যদি টাকা চায়, সে কোথা হইতে দিবে? পরের টাকা, তাহার তো নিজের নয়। কথায় বলে, 'পরের সোনা দিও না কানে।'

ননীবালা আরও দিন দশেক পরে ভুগিয়া ভুগিয়া ইহজগতের মায়া কাটাইল।

স্ত্রীর মৃত্যুর দু-দিন পূর্বে টাকার কথাটা স্ত্রীকে বলি বলি করিয়া অবশেষে বলিয়া ফেলিল! ননীবালা আশ্চর্য হইয়া বলিল—কত টাকা? পাঁচ হাজার?

—হ্যাঁ গো। পাঁচ হাজার।

—একটা কথা বলি। যখন ও টাকা খরচ কর নি এতকাল, তখন ওতে আর হাত দিও না। পরের টাকা। আমি তো বাঁচবই না—

—কেন, তুমি খুব বাঁচবে, বাঁচবে—

—ওগো, আমি বাঁচব না। খোকা আমায় ডেকেছে।

স্ত্রীর মৃত্যুর পরে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে তিনটি বৃদ্ধা পিসির হাতে মানুষ হইতেছিল, কিন্তু বৃদ্ধাও শোকের ঘায়ে কাবু হইয়া পড়িয়াছিল। বুড়ি একদিন বলিল—কালী, তুই আবার বিয়ে কর!

—কেন পিসি?

—তোর এমন বয়সটা কি? তা ছাড়া, এই বুড়ো বয়সে এত বড় সংসার আমি দেখতে পারি? বিয়ে কর তুই।

—খেতে দেব কি বিয়ে করে। তুই পাগল, পিসি? ও আর হচ্ছে না। ছেলেমেয়েগুলো পর হয়ে যাবে।

বৈশাখের প্রথমে বৃদ্ধা পিসি কোথা হইতে এক সম্বন্ধ জুটাইয়া আনিলেন। তাহারা বর ও ঘরবাড়ী দেখিয়া গেল। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল—মশাই, আপনি অনেক টাকা কুড়িয়ে পেয়েছেন, একথা সত্যি?

—হ্যাঁ, সত্যি।

—কত টাকা?

—তা বলব না। তবে অনেক টাকা।

—কতদিন পেয়েছেন?

—তা প্রায় এক বছর হতে চলল।

—কেউ আসেনি টাকা নিতে? আপনি তো অনেক জায়গায় বলেও রেখেছেন।

—মাঝে মাঝে লোক আসে। কিন্তু ঠিকমত বলতে পারে না কত টাকা। কি অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, তাও বলতে পারে না। তা ছাড়া, তাদের টাকা নয়, মুখ দেখলেই বোঝা যায়। ও সব জুয়োচোর।

—টাকা খরচ করেননি মোটেই?

—স্ত্রীর অসুখের সময় সামান্য কিছু। সে আমি যে করেই হোক পুরিয়ে দেব। ও টাকা আমার নয়, আমার স্ত্রী মৃত্যুর সময় বারণ করে গিয়েছে ও থেকে খরচ করতে। পরের টাকা গচ্ছিত আছে ভাবি। যার টাকা সে এসে নিয়ে যাক।

—আপনি বড় সাধুলোক দেখছি।

—সাধু-টাধু নই বাঁড়ুজ্যে মশাই। আগে খরচ করি নি পুলিশের ভয়ে। এখন খরচ করি নি—আমার স্ত্রীর মরবার সময়কার কথা, তাই। সে আমায় বলে গিয়েছে যার টাকা তাকে ফিরিয়ে দিতে।

কন্যাপক্ষ এই সব শুনিয়াই বিবাহের জন্য কোন আগ্রহ দেখাইল না। ওই টাকা বাদ দিলে কালী চৌধুরী নিঃস্ব লোক। একে দোজবরে পাত্র, তাহাতে গরীব লোক; এমন পাত্রে মেয়ে দিবার আগ্রহ যদি তাদের না থাকে, নিতান্ত দোষ দেওয়া চলে না।

একদিন পিসিমা বলিলেন—হ্যাঁরে কালী, এসব কি কথা শুনছি? তুই নাকি অনেক টাকা পেয়েছিস?

কালী বলিল—কে বললে?

—সকলেই বলছে। বলছে অত টাকা হাতে থাকতে ছেলেটা বউটাকে মেরে ফেললে। হ্যাঁরে, কথাটা সত্যি?

—হ্যাঁ পিসিমা।

বলিয়া কুড়ানো টাকার কথা সে সব ব্যক্ত করিল। পিসিমাও শুনিয়া বলিলেন, বউ যখন বারণ করেছে তখন আর ওতে হাত দিতে হবে না এখন।

এদিকে বছর ঘুরিয়া গেল, কিন্তু টাকা চাহিতে কোন লোক আসিল না বা থানা পুলিশের হাঙ্গামাও হইল না। দু-একজন গায়ে পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিতে আসিল, টাকাটা কোথায় আছে। কালী চৌধুরী বলিল—টাকা কি ঘরে রাখি? গিরীন ঘোষের আড়তে জমা আছে।

একবার তার বাড়ী সিঁদ হইয়া গেল।

আরও এক বছর ঘুরিয়া গেল। এই বছরে কালী চৌধুরীকে বিবাহ করিতে হইল পুনরায়। গরীবের ঘরের মেয়ে। কন্যাপক্ষ কালীকে দরিদ্র জানিয়াই বিবাহ দিল. ও পাঁচ হাজার টাকার কোন কথাই উঠিল না। টাকার বাণ্ডিল সেই ভাঙা হাতবাক্সের মধ্যেই রহিল, নববধূ ক্রমশ দুইটি ছেলেমেয়ের মা হইল, সেও জানিতে পারিল না টাকার কথা। বৃদ্ধা পিসিমাও ইতিমধ্যে স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

সুখে-দুঃখে এগারটি বছর কাটিয়া গিয়াছে।

কালী চৌধুরীর মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে। তাহার প্রথম পক্ষের ছেলে দুটি রেলের

চাকরিতে ঢুকিয়া দু-পয়সা আনিতেছে।

একদিন দুপুর বেলা কালী চৌধুরী স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল—শোন একটা কথা—

স্ত্রী বড়ি শুকাইতে দিয়া কাক তাড়াইতেছিল বাহিরের রোয়াকে। কাছে আসিয়া বলিল—কি?

—ওই হাতবাক্সটা নিয়ে এস তো।

তার পর পুরানো কাগজপত্রের ভিতর হইতে নোটের বাণ্ডিলটা বাহির করিয়া বলিল—এদিকে এস! গোন।

স্ত্রী অবাক হইয়া নোট গুনিতে গুনিতে চুপি চুপি বলিল—হ্যাঁগা, এত টাকা কোথায় পেলে? কিসের টাকা এ?—সেই টাকা?

—তুমি এ টাকার কথা জান?

—কানাঘুষো শুনেছিলাম যখন প্রথম বিয়ে হয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয়নি।

—আমায় জিজ্ঞেস করনি তো কোনদিন?

—না। পিসিমা বারণ করেছিলেন। দিদির নাকি বারণ ছিল এ টাকায় হাত দিতে।

—এখন তোমার কি মত?

—ভাগ্যিমানী স্বর্গে চলে গিয়েছেন বহুকাল। তাঁদের কাজে যখন আসেনি, তখন এ-টাকায় আর হাত দিও না। কার টাকা জানাও যায়নি?

—পরের ধন যক্ষির মত আগলে বসে আছি আজ এগার-বার বছর। এখন ভেবেছি কি শোন। যদি তুমি মত দাও, তবে গ্রামে বড় জলকষ্ট, একটা পুকুর করে দিই এই টাকায়।

গ্রামের লোকের এতদিনের জলকষ্ট ঘুচিল।

বিড়ম্বনা

বিষ্ণু অনেকদিন পরে দেশে ফিরল শীতকালে।

পৌষ মাসের প্রথম। স্টেশন থেকে নেমে গ্রামে যাওয়ার পথে কলাই-মুগের ক্ষেতে সুঁটি পেকে উঠেছে। কোন ক্ষেতে ফসল কাটা হয়ে খালি জমি পড়ে আছে। লোকের বাড়ীর উঠান পর্যন্ত ছোট এড়াঞ্চির ঝোপ। শীতের সময় সাদা সাদা থোকা থোকা ফুলে মাঠ বন ভর্তি। নতুন-কাটা খেজুর রসের সুগন্ধ পথের বাতাসে।

গ্রামের নাম ধুতরোবেড়ে—ছ ক্রোশ দূর স্টেশন থেকে। আজ গ্রামে পৌঁছনো যাবে না, বেলা পড়ে এসেছে। বেশি দূরও যাওয়া যাবে না, আরামডাংতা কিংবা সোনাখালি-বাকসা পর্যন্ত সন্ধ্যের আগে পৌঁছে আশ্রয় নিতে হবে কোথাও। বিষ্ণু দু বছর আগে দিন দশেকের জন্যে গ্রামে এসে দিন-কতক জ্ঞাতি ভাইপোর বাড়ীতে ছিল, তার আগে আসেনি বোধ হয় তের কি চৌদ্দ বছর। সে থাকে বহুদূর সম্বলপুর জেলা, টিটলাগড় বলে এক গ্রামে। ওখানকার এক উড়িয়া ব্রাহ্মণ জমিদারের ছেলের প্রাইভেট টিউটর। বয়স হয়েছে বটে, প্রাইভেট টুইশানি করার সময় এখন নয়—কিন্তু ভাগ্য এর চেয়ে কোন ভাল জিনিস ওকে দেয়নি। অনতিক্রম্য অদৃষ্ট কেবল দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে আজ কত বৎসর। উন্নতি হয়নি জীবনে, হবে যে কোনদিন তার আশাও কম। পরের বাড়ী থেকে থেকে পরের ছেলেকে মানুষ করে বয়স প্রায় চল্লিশের কোঠায় ঠেকল।

পথে মথুরাপুরের সতীশ কলু গরুর গাড়িতে ধানের বস্তার ওপর বসে আসছে।

সেই সতীশ কলু, ধুতরোবেড়ের হরি গুরুমশায়ের পাঠশালায় দু'জনে একসঙ্গে পড়ত—অনেক কাল পরে দেখা, তবুও বিষ্ণু চিনতে পারল।

—ও সতীশ, ভাল আছ? চিনতে পার?

সতীশের মাথার চুলে পাক ধরেছে, চেহারাখানি বেশ স্থূল ও হৃষ্টপুষ্ট। সে ঠাওর করে দেখে বলে উঠল—আরে, আমাদের সেই বিষ্ণু না? কোথায় আছ আজকাল?

—থাকি অনেক দূর, উড়িষ্যায় সম্বলপুর জেলা।

—সে আবার কোথায়?

—অনেক দূর। সে তুমি বুঝতে পারবে না।

—কোন্ রেলে যেতে হয়?

—হাওড়া থেকে উঠতে হয়।

—কি কর সেখানে? কত মাইনে পাও?

—ছেলে পড়াই। গোটা পঞ্চাশেক টাকা পাই।

সতীশ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে বললে—মোটে! এলতলা বেলতলা, শেষ বুড়ির বটতলা! তার চেয়ে যে আমরা দেশে থেকে ভালই করছি। এবার ধানের কাজ করে—তোমায় বলতে কি—চারটি হাজার টাকা তোমার মা-বাপের আশীর্বাদে—

সতীশের রোজগার-পুষ্ট ভুঁড়ির ভারে বিব্রত বলদ দুটি গাড়ী বহন করে ক্রমে দূরে চলে গেল। সে আর সতীশ কলু। একদিন ক্লাসে ভাল ছেলের অধিকারে গুরুমশায়ের নির্দেশ মত সে সতীশ কলুর কান মলে দিয়েছিল, হাতে নাড়ুগোপালের ইট তুলে দিয়েছিল। আজ সতীশ তার শোধ তুলে নিলে। তবুও তো সে সতীশকে আসল মাইনের চেয়ে কিছু বাড়িয়ে—বেশ কিছু বাড়িয়ে—বলেছে। পরের বাড়ীতে থাকা খাওয়া আর ত্রিশ টাকা মাইনে শুনলে সতীশ না জানি কি বলত!

অনেক দিন না এলেও সে চিনতে পেরেছে, দূরের ওই বটগাছটা সোনাখালিবাকসার কুঠিবাড়ীর বটগাছ। বেলা পড়ে এসেছে—সন্ধ্যে হবার দেরি নেই। সোনাখালিতে রাত্রে কারও বাড়ী থাকতে হবে। কিন্তু ও গ্রামে ভদ্রলোকের বাড়ী বেশি নেই বলে তার জানা আছে। যা হক, একজনের কারও বাড়ীতে থাকার যোগাড় করতেই হবে।

গ্রামে ঢুকে প্রথমেই তার নজরে পড়ল, রাস্তার বাঁ দিকে যেখানে আগে বাঁশবন ছিল, এখন সেখানে একটা ছোট ঘর। বাইরে লেখা আছে—ইউনিয়ন বোর্ড দাতব্য চিকিৎসালয়। নতুন ব্যাপারটা ; এ গ্রামের ত্রিসীমানায় কোনদিন ডাক্তারখানা ছিল না। একজন লোককে জিজ্ঞেস করে জানলে, একটু দূরে পুকুরপাড়ে যে খড়ের ঘর, সেটাই ডাক্তারবাবুর কোয়া-টার্স। ডাক্তারবাবু ব্রাহ্মণ শুনে বিষ্ণু ভাবলে অন্য কোথাও আশ্রয় প্রার্থনা করার চেয়ে ওখানে যাওয়া ভাল। ডাক্তারবাবুর বাসা খুঁজে বের করতে দেরি হল না। বাইরেই ডাক্তারবাবু বসে ছিলেন, হাত-কাটা ফতুয়া, ন-হাতি ধুতি পরনে। পাড়াগাঁয়ের ইউনিয়ন বোর্ডের ডাক্তার, ওর চেয়ে কি ভাল বেশভূষা বা হবে। বিষ্ণুকে বললেন—কোথা থেকে আসছেন?

—কলকাতা থেকে। একটু জায়গা দিতে হবে রাত্রে।

—আপনারা?

—ব্রাহ্মণ।

—স্বচ্ছন্দে থাকুন। আমার এই বাইরের ঘর খালিই পড়ে থাকে। যাবেন কোথায়?

—যাব আর ক্রোশ পাঁচছয় এদিকে। আপনি বোধ হয় বিদেশী, সব গ্রামের নাম জানেন না।

—আজ্ঞে না। আমি বিয়ে করেছি এই দেশেই, ধুতরোবেড়ে—

বিষ্ণুর মুখে কৌতূহলের রেখা ফুটে উঠল। বললে—ধুতরোবেড়ে? আপনার

শ্বশুরের নাম কি?

ডাক্তারবাবু বললেন—কেন, চেনেন নাকি কাউকে? ধুতরোবেড়ের কালিদাস বাঁড়ুজ্যে আমার শ্বশুর—

বিষ্ণু চমকে উঠল। হঠাৎ যেন চোখের সামনে কতকগুলো কি মাকড়সার জালের মত ভেসে উঠে মিলিয়ে গেল। কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—না, চিনি নে। আমি এমনি বলছি। আমিও নতুন এদেশে।

ডাক্তার তার পর কি সব বকে যেতে লাগল, বিষ্ণু কিছু কিছু বা শোনে, কিছু শোনে না—উত্তরগুলো বোধ হয় কিছু কিছু অসংলগ্ন হতে লাগল। ভাগ্যিস ডাক্তার কিছুক্ষণ বকুনির পর বাড়ীর ভেতর চলে গেল অতিথির ব্যবস্থা করতে তাই রক্ষে। নতুবা বিষ্ণু মুশকিলে পড়ে যেত।

এ তাহলে নন্দিকে বিয়ে করেছে!

কি অদ্ভুত ভাগ্যের বিপর্যয়। এতকাল পরে ঘুরতে ঘুরতে কিনা সে এখানে এসে হাজির হল একেবারে নন্দির স্বামীর বাড়ীতে!

কিন্তু তার চেয়েও বিপদ যে, সে এখানে এসেছে, সে কথা নন্দিকে জানতে দেবে, না দেবে না? না জানতে দেওয়াই ভাল। তাকে এক রাত্রের জন্যে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করে চলতে হবে। যদি বাড়ীর মধ্যে খেতে নিয়ে যায় ডাক্তার? ধুতরোবেড়ে গ্রামের সেসব স্বপ্নময় দিন কতকাল কেটে গিয়েছে। অদ্ভুত সব দিন, এখন মনে হয় তারা স্বপ্নের মত অবাস্তব। এই পৌষ মাসে ছোট এড়াঞ্চির সাদা ফুলের ভর্তি বনঝোপে মাখা দিনশেষের রাঙা রোদের সঙ্গে সেসব দিনের স্মৃতি জড়ানো আছে। এদের সঙ্গে যে সুন্দর মুখের সম্বন্ধ ছিল তার জীবনে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, অত্যন্ত বাস্তব—যা এতদিন ধরে মধুর স্মৃতির কুয়াসা সৃষ্টি করে রেখেছে—আজ তাকে সে চলে যেতে দেবে না। দিলে হয়তো সে ভুল করবে—কে জানে। প্রত্যক্ষ বাস্তবতার রূঢ় আঘাতে স্বপ্ন যদি ভেঙে যায়? সে নন্দি যদি না থাকে? ষোল বছর আগের সে নন্দি?

ষোল বছর দেখেনি সে তাকে। কত বিনিদ্র রজনী প্রথম সে যাপন করেছে, কত চোখের জল ফেলেছে যার কথা ভেবে, তার পর হয়তো বিস্মৃতির উপলেপনে শান্ত স্নিগ্ধ মধুর হয়ে এসেছিল যার স্মৃতি—আজ এতদিন পরে সে এভাবে এত কাছে এসে পড়বে, এ কে ভেবেছিল?

ডাক্তারবাবু এই সময় চা ও একটা বাটিতে দুটি চিঁড়েভাজা নিয়ে ঘরে ঢুকে বললেন—একটু চা খান। আর এই সামান্য কিছু মুখে দিন। পাড়াগাঁ জায়গা, কি বা আছে? নতুন পাটালি এনে দেব একটু? ভাল পাটালি আছে। আমার স্ত্রী বললে, যদি খান, জিজ্ঞেস করে এস।

বিষ্ণু হেসে বললে—আমাকে কি শহুরে বাবু পেয়েছেন? এ সময় খেজুরগুড়ের পাটালি তো দেবভোগ্য জিনিস—নিশ্চয় খাব।

নন্দি বলেছে তাকে পাটালি দিতে! সে কি জানে, এতদিন পরে কে এসে তার বাড়ীতে অতিথি হয়েছে? বিষ্ণুর মনে পড়ে অনেকদিন আগের বিকচোন্মুখ একটি রজনীগন্ধার ছড়ি, প্রভাতের সোনালি সূর্যালোক এসে পড়েছে শিশিরসিক্ত আধফোটা কুঁড়ির ওপর। এমনিতর জ্যোৎস্নারাতে ধুতরোবেড়ে গ্রামে আজ ষোল-সতের বছর আগে বাঁড়ুজ্যে-বাড়ীর বেলতলার একটি কিশোরীর ছবি আবার মনে আসে। তার স্বপ্নের মায়া-কাজল পরা ডাগর চোখের স্মৃতি হয়তো কিছু অস্পষ্ট হয়ে এসেছিল, কিন্তু আজ হঠাৎ এই সন্ধ্যায় সেগুলো এত স্পষ্ট হয়ে উঠল একেবারে এখানে এসে পড়েছে বলেই।

একবার তার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগল, ডাক্তারকে সে বলে—আপনি কালিদাস বাঁড়ুজ্যের

মেয়ে নন্দিনীকে বিয়ে করেছেন বুঝি?

তখুনি ডাক্তার অবাক হয়ে বলবে—আপনি, আপনি চেনেন নাকি?

—হ্যাঁ, আমি ওই গাঁয়েরই ছেলে—মানে, ছিলাম—

—ও বটে, বটে! মশায়ের নামটা কি?

—বলুন গিয়ে ধুতরোবেড়ের বিষ্ণু ঘোষাল এসেছে বাইরে।

নন্দি তখনি ছুটতে ছুটতে আসবে, কিশোরী নন্দিনী যেমন তার আসবার খবর পেলে বাড়ীর ভেতর থেকে ছুটে বাইরে আসত!

—বিষ্ণুদা?

—কি রে, নন্দি, কেমন আছিস?

—এতকাল পরে কোথা থেকে? তুমি কি করছ, কেমন আছ? গাঁয়ে আর যাও না কেন?

—সেসব কথার উত্তর দিচ্ছি—তুই বোস আগে, কথা বলি। ষোল বছর পরে দেখা, একগাদা কথা জমে রয়েছে।

—বল বিষ্ণু-দা, সব শুনব। কতকাল তোমার সংগে দেখা নেই। আগে তোমায় খাওয়াই, তার পর সারারাত বসে গল্প করব—কেমন তো?

কিন্তু এসব কি সত্যি হবে? নন্দি কি এখনও সেই চঞ্চলা তরুণী আছে, লঘু-গতি হরিণীর মত ত্রস্ত ব্যস্ত হবে তার পদক্ষেপ আজও? কিংবা নন্দির মেদভার-মন্থর মনে সে ব্যাকুলতা ক্ষিপ্রতা সজীবতা আজ যদি না থাকে? পাঁচ-ছটি ছেলেমেয়ের মা মোটাসোটা গিন্নিবান্নি নন্দির মধ্যে সেই বিকচোন্মুখ রজনীগন্ধাকে যদি খুঁজে না পায়?—বিষ্ণু ক্লান্তিতে চোখ বুজল।

ডাক্তার বললে—মশায়, ঘুম পাচ্ছে নাকি? বালিস এনে দেব?

—না না, এই তো সন্দে বেলা।

—রাস্তা হেঁটেছেন কিনা, তাই বলছি—

—তামাক খান?

—থাক, সে জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না। আচ্ছা, এ ছোট্ট গাঁ আপনার ভাল লাগে?

ডাক্তারবাবু হেসে বলে উঠল—দেখুন দিকি কান্ড, ভাল লাগা না লাগার তো কোন মানে হয় না। আমি করি চাকরি, পেটের দায়ে বন্দী—ভাল আমাকে লাগাতে হবে। যেখানে ভাত, সেখানে শান্তি।

—তা তো বটেই।

—আগে ভাল লাগত না, এখন সয়ে গিয়েছে। যা হক দু-পয়সা পাই এখানে। আশেপাশের আট-দশখানা গ্রামের লোক আমাকেই ডাকে। দু টাকা ফি করেছি আর বর্ষাকালে গরুর গাড়ীর ভাড়া। শীতকালে এখন সাইকেলে যাই। এই সব গ্রামের চাষীরা বছরে যা দেয়, তাতে একটা গোলা ভর্তি হয়ে যায়—খাবার সময় বাড়ীর মধ্যে গিয়ে দেখবেন এখন। ভাল কি সাধে লাগে?

স্থূল তৃপ্তিবোধে ডাক্তারের ছোট ছোট চোখ আরও যেন বুজে ছোট হয়ে আসে। বিষ্ণুর ভাল লাগে না সেটা। এ ধরনের স্থূল অনুভূতির প্রকাশ তার কাছে চিরকালই বিরক্তিকর। অন্য কথা পাড়বার চেষ্টায় সে বললে—এ জায়গায় ম্যালেরিয়া কেমন?

—ম্যালেরিয়া খুবই। ম্যালেরিয়াই লক্ষ্মী, আছে বলেই দু পয়সা যা হক রোজগার করি। একটি মেয়ে প্রায় বিয়ের বয়সে পা দেব দেব করছে—সামনের বছর বিয়ে দিতেই হবে।

বিষ্ণু নিজের অলক্ষিতে চমকে উঠল। একথা সে জিজ্ঞেস করেনি, জানতেও চায়নি। নন্দির মেয়ে বিবাহযোগ্য হয়ে উঠেছে!

কত বয়স হবে, ষোল সতের? না, এই সব পল্লীগ্রামের সমাজে বিবাহের উর্ধ্বতম বয়স তো অত নয়, সে ভুলে যাচ্ছে। তের চোদ্দ বছরের বালিকা হবে বোধ হয়। যাক—সে কথায় তার দরকার কি। অন্য কোন দরকার নয়—নন্দির বর্তমান চেহারা সে বুঝতে চাইছে তার ছেলেমেয়ের সংখ্যার মধ্যে দিয়ে।

এমন সময়ে বাইরে থেকে কে ডাকল—ডাক্তারবাবু আছেন?

ডাক্তার উঠে বাইরে গেল। একটু পরে ফিরে এসে বললে—আমাকে যে একবার চাঁপাবেড়ে যেতে হচ্ছে জরুরী কল-এ। তাই তো, শক্ত কেস। গরুর গাড়ীতে যাব আসব—তিন চার ক্রোশ দূর হবে। আমার তো থাকবার জো নেই। ফিরতে শেষরাত। আপনি রইলেন, আমি বাড়ীতে বলে যাচ্ছি, কোন অসুবিধা হবে না।

—না না, অসুবিধা কি।

—শক্ত কেস না হলে রাত্রে যেতাম না। আপনি থাকবেন, বেশ দুজনে গল্প করছিলাম—

—তাতে কি। তা বলে কল-এ যাবেন না? কোন ভাবনা নেই—যান আপনি।

—আমি যা হয়েছে দুটো খেয়ে নিই—আপনাকে এর পরে ওরা খাবার দেবে এখন, বাড়ীতে বলে যাচ্ছি।

ডাক্তার খানিক পরে সেজেগুজে স্টেথস্কোপ নিয়ে গরুর গাড়ীতে বার হয়ে চলে গেল।

বিষ্ণুর মনের অবস্থা অন্য রকম হয়ে গেল ডাক্তার চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। নিজেকে সংযত করে রাখা যে এত কঠিন, তা কোনদিন সে ভেবেছিল?

এই বাড়ীতে নন্দি থাকে, একবার খবর পেলেই সে ছুটে আসবে, ষোল বছর পরে আবার তার সঙ্গে দেখা হবে—এ চিন্তাকে সে প্রাণপণে দমন করে রাখতে চেষ্টা করে।

নন্দি তাদের গ্রামের মেয়ে, তার বাল্যসঙ্গিনী, এক বোঁটায় দুটি ফুলের মত জীবনে অনেক বছর কাটিয়ে এসেছিল। নন্দির সঙ্গে তার বিয়ে হতে পারে না এ সে জানত। তারা ঘোষাল বামুন, নন্দির বাবা নিকষ কুলীন। ঘোষাল না হয়ে চাটুজ্যে মুখুজ্যে হলেও বিশেষ কোন আশা ছিল না তার। তবুও সে চেষ্টা করেছিল।

কুমোরপাড়া থেকে হাঁড়ি কিনে সে ফিরছে—নন্দিদের বাড়ীর সামনের পথ দিয়ে। ওদের বেড়ার গায়ে নিমগাছটার তলায় নন্দি দাঁড়িয়ে। বিষ্ণুর মনে হল ও যেন তার জন্যই অপেক্ষা করছে। বিষ্ণু কাছে আসতেই নন্দি এদিক ওদিক তাকিয়ে নিচু সুরে বললে—বিষ্ণু-দা, একটা কথা আছে।

—কি?

—পিসিমার কাছে ও কথা বলেছ কেন? বাবাকে জান না?

বিষ্ণু চুপ করে রইল।

—মাঝে পড়ে কি হবে জান, আমি বকুনি খেয়ে মরব।

বিষ্ণু এ কথায় মনে আঘাত পেলে। এইটুকু আত্মত্যাগ সে নন্দির কাছে প্রত্যাশা করতে পারে না? নন্দির একথা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতও বটে।

সে শুধু বললে—ও।

নন্দি ঝাঁজের সঙ্গে বলে—'ও'! না? শুধু 'ও' বললে কি হবে? এ নিয়ে বাড়ীতে অনেক কাণ্ড হয়ে গিয়েছে তুমি জান না। আমাকে তো বকুনি খেতেই হচ্ছে তোমার সঙ্গে মিশি বলে—তা ছাড়া তোমার নিন্দেও আর যে আমি সহ্য করতে পারছি নে বিষ্ণু-দা? বিষ্ণু বিস্ময়ের সঙ্গে ওর মুখের দিকে চাইলে। নন্দির চোখে জল চক চক করছে, চোখের জলে গলার সুর আটকেছে। সে উত্তর দেবার আগেই নন্দি বললে—যাও,

তুমি পালাও—এখুনি এ পথে কে এসে পড়বে। বাবা বাড়ী নেই, মা-রা সব নদীর ঘাটে—তাই তোমাকে কথাটা বলতে এলাম।

—কি করে জানলি আমি এ পথে—?

—ছাদ থেকে দেখি তুমি হাঁড়ি হাতে আসছ। আচ্ছা চলি—খবরদার, কোন কথা আর যেন—

নন্দি মুখের কথা শেষ না করে পিঠের ওপর ঝোলানো লম্বা বেণী দুলিয়ে ছুটে পালাল। কিন্তু বিস্মিত বিষ্ণু কয়েক পা যেতে না যেতে নন্দি আবার ওকে ডেকে বললে—ও বিষ্ণু-দা, শোন একটা কথা, ও বিষ্ণু-দা—

—কি রে?

—শোন, সরে এস আর একটু—

—কি?

—তোমার সাহস আছে?

—কেন?

—আমায় নিয়ে পালিয়ে যেতে পার?

বিষ্ণু কথাটা ভাল করে যেন বুঝতে পারলে না, ইতস্তত করে বললে—পালিয়ে? ......কি রকম? তোকে নিয়ে?......তা

নন্দি ঘাড় দুলিয়ে বাঁকিয়ে এক অপূর্ব ভঙ্গি করে বললে—বুঝেছি। খুব পুরুষ মানুষ তুমি! সময় নেই, হাঁ কি না জবাব চাই। আমি যা বলব তুমি তাতে রাজি আছ? সাহস হয়?

—তা কেমন করে সম্ভব নন্দি?

—ও! কেন অসম্ভব শুনি?

—দূর পাগলী! তা হয় না।

—হয় না কেন?

—এ কি ছেলেখেলা নন্দি—কত কথা ভাবতে হবে। টাকা কোথায়? রাখব কোথা? মা-বাবা কি ভাববেন?

—যেন আমার কিছু ভাববার নেই! আমার মা-বাপ নেই? বুঝতে পেরেছি তোমাদের বিদ্যে। এই তুমি পুরুষ মানুষ! আচ্ছা তুমি যাও—

স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি বিষ্ণুকে আর কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই নন্দি একছুটে ওদের বাড়ীর খিড়কির দোরের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়ল।...

নন্দির সঙ্গে তার আর দেখা হয়নি, কেবল হয়েছিল অতি অল্পক্ষণের জন্যে বিয়ের রাত্রে। কন্যা-সম্প্রদান সমাধা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণু ওদের বাড়ী থেকে চলে এসেছিল, নিমন্ত্রণ খেতেও বসেনি গ্রামের নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের সঙ্গে।

বিয়ের পরদিন সকালে নন্দির ছোট বোন মালতী ওকে পথে দেখে বললে—কাল কোথায় পালালে বিষ্ণু-দা? দিদি দু বার তোমাকে ডাকতে পাঠালে। বাসর ঘরে আমায় চুপি চুপি বললে—বিষ্ণুদাকে ডেকে নিয়ে আয়। আমি তোমায় কোথাও দেখতে পেলাম না। বামুন খেতে বসবার সময়ে দিদি আবার বললে—এইবার নিশ্চয় বিষ্ণু-দা খেতে বসেছে, বলে আয়। আবার আমি বাইরে ছুটে এলাম তোমায় ডাকতে—কোথাও দেখলাম না। তুমি কাল খাও নি কেন আমাদের বাড়ী?

খাই নি কেন, তোর কাছে এখন কৈফিয়ৎ দিতে পারি নে, যাঃ—

মালতী ঘাড় দুলিয়ে বললে—আহা, কথার ছিরি দ্যাখো না! আমি ভালর জন্যে বলতে গেলুম—

—যা, ভালর জন্যে বলতে হবে না, খুব হয়েছে।

—বর দেখেছ?

—একবার এক চমক দেখেছিলাম। ময়দা মাখছিলাম গোয়ালের চালায় আমি আর নটবর—বর দেখি কখন? তোর দিদি চলে গিয়েছে?......

—এই এখন গেল। যাবার সময় দিদি বললে—দেখে আয় বিষ্ণু-দা বাইরে আছে কি না। আমি মরি ছুটোছুটি করে—একবার ঘর একবার বার। দিদি চোখের জল ফেলছিল তুমি যাও নি বলে—জান?

—হয়েছে, যা—

কতকালের কথা সব! তার পর সুদীর্ঘ ষোলটি বছর কেটে গিয়েছে। ধুতরোবেড়ে গ্রামের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নন্দির বিয়ের কয়েক মাস পরেই। বাবা মারা গেলেন, মামা এসে ওদের নিয়ে গেলেন তাঁদের দেশে। গ্রামের খড়ের ঘর অযত্নে ভেঙে-চুরে ধূলিসাৎ হল।

হঠাৎ বিষ্ণু চমকে উঠল।

চোদ্দ-পনের বছরের কিশোরী নন্দি দোরের কাছে দাঁড়িয়ে—সকালের মত মৃদু মধুর সুরে জিজ্ঞেস করছে, আপনাকে কি এখন খাবার দেওয়া হবে, মা জিজ্ঞেস করলেন—

—ও!......তা—

ওর চম্‌কে ওঠার ভাবে মেয়েটির বোধ হয় হাসি পেল। ঠোঁটের প্রান্তে হাসি চেপে বললে—খাবেন এখন?

—তুমি বুঝি ডাক্তারবাবুর মেয়ে?

—হ্যাঁ।

—নাম কি তোমার খুকি?

—তুলসী।

—এখানে একটু বস না। খাব এখন একটু পরে। আচ্ছা, তোমার বাবা মা এ কি রকম নাম রাখলেন তোমার? তুলসী হবে তোমার ঠাকুমা দিদিমার নাম। তোমার নাম তুলসী হলে কি মানায়? তোমার নাম হবে রেবা, রেখা, সিপ্রা, অনীতা, নিদেনপক্ষে সুকুমারী, সুলোচনা, নলিনী এই সব। তা না—তুলসী!—ছোঃ

বিষ্ণুর কথার ভঙ্গীতে মেয়েটি হেসে ফেললে। চোখ নীচু করে শান্ত সুরে বললে—ঠাকুরমা রেখেছিলেন। আমি যখন হই, ঠাকুরমা বেঁচে ছিলেন কিনা।

—তোমাদের দেশ কোথায়?

—নদে জেলা, মদনপুরের কাছে। দেশে বড় তো যাওয়া হয় না। বাবার যেখানে চাকরি সেখানেই থাকতে হয়।

—তুমি বড়? আর কটি ভাইবোন?

—আমার ছোট আর দুই বোন, ছোট আর একটি ভাই এই দু বছরের।

—বেশ। ?নক্রমেকহয়জ্রফতু

খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর মেয়েটি বললে—এইবার খাবেন?

বিষ্ণু বললে—মন্দ নয়। জায়গা এই বাইরের ঘরেই কর।

—কেন, ভেতরের রোয়াকে করি। রোয়াকের ওপর চালা আছে।

—না না—তুমি বাইরের ঘরে এখানেই জায়গা কর খুকি। বাড়ীর মধ্যে দরকার নেই।

মেয়েটি বাড়ীর মধ্যে চলে গেল. কিন্তু অনেকক্ষণ পরে এসে বললে—মা বললেন—এখানে খাওয়ার অসুবিধা হবে। রান্নাঘরের রোয়াকে জায়গা করে দিতে বললেন।

বিষ্ণু ব্যস্ত হয়ে বললে—না না—তুমি খুকি বাইরেই জায়গা করে দাও। কোন অসুবিধা হবে না। বাড়ীর মধ্যে আমার বাধ-বাধ ঠেকবে। এখানেই দাও।

খুকি বাড়ীর মধ্যে চলে গেল আবার।

বিষ্ণুর সমস্ত দেহমন চঞ্চল, উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। এই মেয়েটির মধ্যে পনের বছরের কিশোরী নন্দিকে কতকাল পরে আবার প্রত্যক্ষ করলে সে। সেই চোখ-মুখের ভঙ্গি, সেই হাসি! স্বপ্নের মত মনে হয় সব।

বাইরের ঘরেই খাবার জায়গা করে দেওয়া হল। তুলসী পরিবেশন করলে। দোরের বাইরে ফিস ফিস শব্দ শুনে বিষ্ণুর মনে হল, এর মা রান্নাঘর থেকে খাবার বয়ে নিয়ে এসে ওকে সাহায্য করছে। বিষ্ণু আগে থেকেই সতর্ক হয়ে দোরের দিকে পিছন ফিরে বসেছে। নন্দি যেন কিছুতেই জানতে না পারে আজ সে তার বাড়ীর অতিথি।

খাওয়া শেষ হয়ে গেল। রাত বেশি হয়নি। পাড়াগাঁয়ে শীতের রাত্রে সকাল সকাল লোকে আহারাদি চুকিয়ে ফেলে। বিষ্ণু একটা ব্যাপার বেশ বুঝতে পারলে আজ সে এখানে থাকলে নন্দিকে না ডেকে, তার সঙ্গে দেখা না করে থাকতে পারবে না। বার বার তাকে এ ইচ্ছা দমন করতে হয় প্রাণপণে। বার বার আবার অন্য পথ দিয়ে সেটা এসে মনকে চঞ্চল করে তোলে। ধমনীতে উন্মাদ রক্তস্রোত বইতে শুরু করছে। মন বলছে —নন্দিকে ডাক, জীবনে এমন অবসর আর পাবে না। কতদিন পরে! দেখা করবে না?

ঘুম অসম্ভব। না, সে একটিবার নন্দিকে খবর পাঠাবে। দেখা করতে দোষ কিছুই নেই, তুলসীকে ডেকে খবর পাঠাবে? কি ভাবে বলবে? তুলসী, তোমার মামার বাড়ী কোন্ গ্রামে? ধুতরোবেড়ে? তোমার মা তাহলে আমাদের গ্রামেরই মেয়ে। বল গে ধুতরো-বেড়ের শিবনাথ ঘোষালের ছেলে বিষ্ণু ডাকছে, দেখা করবে। না, ওভাবে নয়। তুলসীকে ডেকে, কথায় কথায় তাকে শুনিয়ে দেবে যে তার বাড়ী ধুতরোবেড়ে। এতে তুলসী নিশ্চয় বলবে যে তার মামার বাড়ীও সেই গ্রামে। ডাক্তারের সঙ্গে এ সম্বন্ধে যে কথা একবার হয়েছিল, তুলসী তার খবর রাখে না। তুলসী তখন তার মায়ের কাছে ঠিক গিয়ে বলবে, বাইরের ঘরে যিনি এসেছেন, তিনি ধুতরোবেড়ের লোক। নন্দি নিশ্চয়ই বলবে, নাম কি জিজ্ঞেস করে আয়। বাপের বাড়ীর গ্রামের লোক সম্বন্ধে নন্দি উদাসীন থাকতে পারবে না। সে বলবে—বল গিয়ে ধুতরোবেড়ের শিবনাথ ঘোষালের—ইত্যাদি। নন্দি ছুটতে ছুটতে আসবে বাইরের ঘরে।

বিষ্ণু বিছানা থেকে উঠে বসল। উত্তেজিত ভাবে কিছুক্ষণ পায়চারি করলে বাইরের দিকের রোয়াকে! তারপর ডাক দিলে তুলসী, তুলসী!

তুলসী ছুটে এল বাইরের ঘরে।

বিষ্ণু বললে—ডাক্তারবাবু কখন ফিরবেন খুকি?

গলার সুর অনেকটা নীচু করেই সে কথা বলছে অনেকক্ষণ থেকে। তুলসী বললে —তা তো জানি নে। মাকে জিজ্ঞেস করে আসব?

—আ, থাক। হ্যাঁ শোন, আমি এখুনি চলে যাব। বিশেষ জরুরী কাজ মনে পড়ল। ট্রেন ধরতে হবে গিয়ে। তোমরা বাইরের দোর বন্ধ করে দাও।

তুলসী অবাক হয়ে বললে, এত রাত্রিতে এই শীতে এখন যাবেন কেন? কাল সকালে উঠে—

বিষ্ণু ব্যস্তভাবে বললে—না—না, আমার খুব জরুরী দরকার। এই রাত বারোটার ডাউন খুলনা মেলেই যেতে হবে। তুমি বাড়ীর মধ্যে গিয়ে বলগে—

তুলসী তখুনি বাড়ীর মধ্যে গিয়েই আবার ফিরে এসে বললে—মা বারণ করছেন। এসব দেশ ভাল না। এত রাত্রিতে যাবেন না। বাবা রাত তিনটের মধ্যে আসবেন। আপনি

না হয় সেই গরুর গাড়ীতে যাবেন—হে'টে একা যাবেন না ইস্টিশানে।

নন্দি বারণ করে পাঠিয়েছে। কাকে বারণ করেছে না জেনেই বারণ করে পাঠিয়েছে। বিষ্ণু হঠাৎ যেন রূঢ় হয়ে উঠল। ঈষৎ রুক্ষ কর্কশ সুরে বললে—না—না, আমার কাজের ক্ষতি হবে। থাকবার জো নেই। বাইরের দরজা বন্ধ করে দাও।

বিষ্ণু সরলা গ্রাম্য বালিকাকে অবাক করে দিয়ে একরকম ছুটেই বাড়ীর বার হয়ে গেল। তার পর—নিঃসঙ্গ তারা-ভরা রাত্রি। মাঠের পর মাঠ। পৌষের কনকনে শীত। প্রস্ফুট সর্ষে ফুলের সুগন্ধ। বহুদিনের স্বপ্ন-ভরা প্রথম যৌবনের নেশা ওর শিরায় শিরায়।

আহ্বান

দেশের ঘরবাড়ী নেই অনেকদিন থেকেই। পৈতৃক বাড়ী যা ছিল ভেঙেচুরে ভিটেতে জঙ্গল গজিয়েছে। এ অবস্থায় একদিন গিয়েচি দেশে কিসের একটা ছুটিতে।

গ্রামের চক্কোত্তি মশায় বাবার পুরাতন বন্ধু। আমায় দেখে খুব খুশি হলেন। বল্লেন—কতকাল পরে বাবা মনে পড়লো দেশের কথা?

প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলাম। বললেন—এসো, এসো, বেঁচে থাকো, দীর্ঘজীবী হও। বাড়ীঘর করবে না?

—আজ্ঞে সামান্য মাইনে পাই—

—তাতে কি? গ্রামের ছেলে গ্রামে বাস করবে, এতে আর সামান্য মাইনে বেশি মাইনে কি? আমি খড়-বাঁশ দিচ্ছি, চালাঘর তুলে ফেলো, মাঝে মাঝে যাতায়াত করো। আহা নরেশের ছেলে, দেখেও সুখ। ক'দিনই বা আছি। বাস করো গাঁয়ে।

আরও অনেকে এসে ধরলে, অন্তত খড়ের ঘর একটা ওঠাতে হবে।

অনেক দিন পরে গ্রামে এসে লাগচে ভালোই। যাদের বাল্যকালে ছোট দেখে গিয়েচি, তাদের আর চেনা যায় না, যাদের যুবক দেখে গিয়েছিলাম, তারা হয়েচে বৃদ্ধ।

বড় আমবাগানের মধ্য দিয়ে বাজারের দিকে যাচ্ছি, আমগাছের ছায়ায় একটি বৃদ্ধার চেহারা ভারতচন্দ্র-বর্ণিত জরতীবেশিনী অন্নপূর্ণার মত। কোনো তফাৎ নেই, ডান হাতে নড়ি ঠুক্ ঠুক্ করতে করতে বোধ হয় বা বাজারের দিকেই চলেছে। বগলে একটা ছোট থলে।

বুড়ীকে দেখেই আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। এ ধরনের বুড়ীকে দেখে আমার বড় মায়া হয়—নারী-রূপের এক অপূর্ব পরিণতি।

জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় যাবে?

—বাজারে বাবা—

বুড়ী আমায় ভাল না দেখতে পেয়ে কিংবা না চিনতে পেরে ডান হাত উঁচিয়ে তালু আড়ভাবে চোখের ওপর ধরলে।

বল্লে—কে বাবা তুমি? চেনলাম না তো?

—চিনবে না। বাঁড়ুজ্যেপাড়ার নরেশ বাঁড়ুজ্যের ছেলে। আমি অনেকদিন গাঁয়ে আসিনি—

—তা হবে বাবা। আমি আগে তো এপাড়া-ওপাড়া যাতাম আসতাম না—তিনি থাকতি অভাব ছেলো না কোনো জিনিসের। গোলা পোরা ধান, গোয়াল পোরা গরু—

—তোমাকে তো চিনতে পারলাম না বুড়ী?

—আমার তো তেনার নাম করতি নেই বাবা। করাতের কাজ করতেন।

বলে সে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকে, অর্থাৎ আমি চিনতে পেরেচি কি না। কিন্তু আমার পক্ষে চেনা সম্ভব নয়, আমার বাল্যকালে কে এ গ্রামে করাতের কাজ করতো তা আমার মনে থাকবার কথা নয়। বল্লাম—তোমার ছেলে আছে?

—কেউ নেই বাবা, কেউ নেই। এক নাতজামাই আছে তো সে মোরে ভাত দেয় না। ওই আমার নাতনীকে রেখে মোর মেয়ে মারা যায়। আমার বড্ড কষ্ট, ভাত জোটে না সর্বদিন। বাজারে যাচ্ছি তিন পয়সার নুন কিনে আনবো—দুটো ক'টা চাল যোগাড় করিচি ও-বেলা।

বুড়ীকে পকেট থেকে কিছু পয়সা বার করে দিলাম।

ব্যাপারটা এখানেই চুকে যাবে ভেবেছিলাম, কিন্তু তা চুকলো না—উপরন্তু এই বুড়ীকে কেন্দ্র করে আমার জীবনে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার শুরু হলো। নিজের জীবনে না ঘটলে বিশ্বাস করতাম না এমন ঘটনা।

পরের দিন সকালে ঘুম ভেঙে উঠেচি, এমন সময় কালকার সেই বুড়ী লাঠি ঠুক ঠুক করতে করতে এসে হাজির উঠোনে। থাকি এক জ্ঞাতি খুড়োর বাড়ী। তিনি বল্লেন—ও হলো জমির করাতীর স্ত্রী—অনেকদিন মরে গিয়েচে জমির। তোমাদের খুব ছেলেবেলায়।

বুড়ী উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাকলে—ও বাবা—

সে বোধ হয় চোখে একটু কম দেখে। ও বয়সে সেটা অবশ্য তেমন আশ্চর্যই বা কি।

বল্লাম—এই যে আমি এখানে।

—কাল পয়সা কটা পেয়ে ভাবলাম যাই দিনি বাওনপাড়ার দিকি। কে পয়সা দিলে চিনতেও পারলাম না। বিকেলবেলা চোখে ঠাওর পাইনে।

আমার খুড়োমশায় বুড়ীকে বুঝিয়ে দিলেন আমি কে। সে উঠানের কাঁঠালতলায় বসে আপন মনে খুব খানিকটা বকে উঠে গেল। তার যাবার সময় আরও দু-একটা পয়সা দিলাম।

পরদিন কলকাতা চলে গেলাম, ছুটি ফুরিয়ে গেল। আমার জ্ঞাতি খুড়োকে কিছু টাকা দিয়ে এলাম আসবার সময়ে, আমার জন্যে ছোটখাটো দেখে একটি খড়ের ঘর তুলে রাখবার জন্যে।

কয়েক মাস পরে জ্যৈষ্ঠ মাসে গরমের ছুটিতে আমার সেই নতুন-তৈরী খড়ের ঘরখানাতে এসে উঠলাম। কলকাতাতে কর্মব্যস্ত এই ক'মাসের মধ্যে বুড়ীকে একবার মনেও পড়েনি বা এখানে এসেও হঠাৎ হয়তো হতো না, যদি সে তার পরের দিনই সকালে আমার ঘরের নিচু দাওয়ায় এসে না বসে পড়তো।

বল্লাম—কি বুড়ী, বসে আছো?

ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের প্রান্ত থেকে গোটাকতক আম খুলে আমার সামনে মাটিতে রেখে বল্লে—আমার কি মরণ আছে রে বাবা!

জিজ্ঞেস করলাম—ও আম কিসের?

দন্তহীন মুখে একটু হাসবার চেষ্টা করে বল্লে—অ গোপাল আমার, তোর জন্যি নিয়ে অ্যালাম। গাছের আম কড়া বেশ মিষ্টি, খেয়ে দেখো এখন।

আমি ওর সম্বোধনের নতুনত্বে কৌতুক অনুভব করলাম, কিন্তু কি জানি কেন বড় ভালো লাগলো। গ্রামে অনেকদিন থেকে আপনার জন কেউ নেই, একটা ঘনিষ্ঠ আদরের সম্বোধন করার লোকের দেখা পাইনি বাল্যকালে মা পিসিমা মারা যাওয়ার পর থেকে। প্রতিবেশিনীদের মধ্যে অত বেশি বয়সের স্ত্রীলোক কেউ নেই যে আমাকে 'গোপাল'

বলে ডাকে।

বুড়ী বল্লে—খাও কোথায় হ্যাঁ বাবা?

—খুড়োমশায়ের বাড়ী।

—বেশ যত্ন করে তো ওনারা?

—তা করে।

—দুধ পাচ্চ ভালো?

—ঘুঁটি গোয়ালিনী দেয়, মন্দ না।

—ও বাবা, ওর দুধ! অদ্ধেক জল—দুধ খেতি পাচ্চ না ভালো সে বুঝিচি।

পরদিন সকাল হয়েচে, সবে, বুড়ী দেখি উঠোনে এসে ডাকচে—অ গোপাল—

বিছানা ছেড়ে উঠে বল্লাম—আরে এত সকালে কি মনে করে? হাতে কি?

বৃদ্ধা হাতের নড়ি আমার দাওয়ার গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে বল্লে—এক ঘটি দুধ আনলাম তোর জন্যি।

—সে কি! দুধ এত পেলে কোথায় এত সকালে?

—আমায় মা বলে ডাকে ওই হাজরা ন্যাটার বৌ। তার কেউ নেই, মোর চালাঘরের পাশে ওর চালাঘর। ওরে কাল রাত্তিরে বলে রেখে দিয়েলাম, বলি বৌ, আমার গোপাল দুধ খেতি পায় না। সকালে চা না কি খায়, ওরে খুব ভোরে উঠে গাই দুয়ে দিতে হবে। তাই আজ কুঁকড়ো ডাকা ভোরে উঠে দেখি আমারে ডাকচে—মা ওঠো, তোমার গোপালের জন্যি দুধ নিয়ে যাও—

আচ্ছা কেন বলো তো তোমার এসব! ছিঃ—না এসব ভালো না। এ রকম আর কখনো এনো না। কত পয়সা দাম দিতে হবে বলো। কতটা দুধ?

আমার গলার সুর একটু রুক্ষ হয়ে উঠেছিল হয়তো, কারণ মুসলমানের বাড়ীর দুধ আমাদের গ্রামে চলে না, কে কোন্ দিক থেকে দেখে ফেলবে এই ছিল আমার ভয়। কেন আবার এসব ঝঞ্ঝাট জোটে!

বুড়ী আবার কণ্ঠস্বরের অপ্রত্যাশিত রূঢ়তায় যেন একটু ঘাবড়ে গেল, ভয়ে ভয়ে বল্লে—কেন বাবা, পয়সা কেন?

—পয়সা না তো তুমি দুধ পাবে কোথায়?

—ওই যে বল্লাম বাবা, আমার মেয়ের বাড়ী থেকে—

—তা হোক, তুমি পয়সা নিয়ে যাও। সেও তো গরীব লোক—

বুড়ী পয়সা নিয়ে চলে গেল বটে কিন্তু সে যে বেশ দমে গিয়েচে তার কথাবার্তার ধরনে বেশ বুঝতে পারলাম।

মনে একটু কষ্ট হোল বুড়ী চলে গেলে, পয়সা দিতে যাওয়া ঠিক হয়েচে কি? বুড়ীর কি রকম হয়তো মন পড়ে গিয়েচে আমার ওপর, স্নেহের দান—এমন করা ঠিক হয়নি।

বুড়ী কিন্তু এ অবহেলা গায়ে মাখলো না আদৌ। প্রতিদিন সকাল হতে না হতে সে এসে জুটবে।

—অ গোপাল, এই দুটো কচি শসার জালি মোর গাছের—এই ন্যাও। নুন দিয়ে খাও দিনি মোর সামনে?

—বুড়ী তোমার চলে কিসে?

—নাতজামায়ের দেবার কথা, তা সে সবদিন দেয় না। ওই যারে মেয়ে বলি, ও বড্ড ভালো। লোকের ধান ভানে, তাই চাল পায়, আমারে দুটো না দিয়ে খায় না।

—একা থাকো?

—তা একদিন মোর ঘরখানা না হয় দেখতি গেলে, অ মোর গোপাল! আমি নতুন খাজুরপাতার চেটাই বুনে রেখে দিয়েলাম তোমারে বসতি দেবার জন্য। বাউনের ছেলে, মোদের এ'টোকাঁটা মাদুরে কি বসবে? তাই বলি একটা নতুন চেটাই বুনে রাখি, যখন আসবে এখানেতেই বসবে।

সেবার বুড়ীর বাড়ীতে আমার যাওয়া ঘটে উঠলো না ওর এত আগ্রহ সত্ত্বেও। নানা-দিকে ব্যস্ত থাকি, তার ওপর আছে সমবয়সী বন্ধুবান্ধবদের দাবি। অনেকদিন পরে গ্রামে এসেছি তো! যে ক'দিন গ্রামে থাকি, বুড়ি রোজ সকালে একবার আসতে ভুলবে না। কিছু-না-কিছু আনবেই—কখনও পাকা আম, কখনও পাতি নেবু, কখনও এক ছড়া কাঁচকলা কি এক ফালি কুমড়ো। দু-আনা চার-আনা প্রায়ই দিই। একদিন কাপড় দিলাম। একটা জিনিস লক্ষ্য করে আসচি, বুড়ী কোনোদিন আমার কাছে কিছু মুখ ফুটে চায়নি। কখনও বলেনি, পয়সা দাও কি অমুক দাও। বরং তার উল্টো, শুধুহাতে কখনও আসে না।

একবার কলকাতা থেকে কয়েকটি বন্ধু গেলেন দেখা করতে।

তাদের নিয়ে ঘরে বসে চা খাচ্চি, স্টোভ ধরিয়ে ঘরেই চা নিজে করেচি, পল্লীগ্রামে এত সকালে কেউ উনুন ধরায় নি, বুড়ী লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করতে করতে এসে হাজির। বাইরে দাঁড়িয়ে ডাক দিল, অ মোর গোপাল!

হঠাৎ আমার লজ্জা করতে লাগলো। কলকাতার বন্ধু-বান্ধবদের সামনে, ও আজ না এলেই পারতো ছাই। ভাল বিপদ!

—অ মোর গোপাল! ঘরে আছিস নাকি?

ঈষৎ বিরক্তির সুরেই উত্তর দিলাম—হ্যাঁ, কেন?

—এই এয়েলাম, বলি যাই গোপালকে দেখে আসি একবার।

বন্ধুদের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করলেন—ও কে হে?

চাপা দেবার চেষ্টায় বল্লাম—ও এমনি গাঁয়ের লোক।

আর একজন বল্লে—তোমার ডাকনাম কি গোপাল নাকি হে গ্রামে?

—হ্যাঁ—না—এই—

বুড়ী বল্লে—কাল রাত্তিরে কি গরম পড়লো। গোপাল, ঘুমুতে পেরিলি কাল? মুই চোখ বুজিনি সারারাত।

বেশ করনি! ভাল বিপদেই পড়া গেল যে সকালবেলা। আজ না এলে কি চলতো না বুড়ীর?

বন্ধুটি পুনরায় বল্লে—ও গোপাল বলচে কাকে হে?

—ইয়ে—হ্যাঁ, আমাকেই বলচে—

কথা শেষ করে ঈষৎ হেসে মাথার দিকে দুটি আঙুল দেখিয়ে ইঙ্গিত করে বল্লাম —মাথাটা একটু—

বন্ধুটি বল্লেন—ও!

কথা অনুযায়ী কাজের সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে বুড়ীর দিকে চেয়ে যেমন সুরে লোকে দুর্দান্ত পাগলকে সান্ত্বনা দেবার ও স্তোকবাক্য প্রয়োগ করার চেষ্টা করে তেমনি সুরে বলি—আজ যাও, বড্ড ব্যস্ত আছি—বুঝলে? কলকাতার বন্ধুরা সব এসেচেন! হ্যাঁ—

ফল সুবিধেজনক হোল না। বুড়ি একগাল হেসে বল্লে—আজ কি এনিচি বলো দিকি গোপাল? এই দ্যাখো—

এতক্ষণ টের পাইনি যে বুড়ি তার পেছন দিকে একটা ময়লা কাপড়ের পুঁটুলি লুকিয়ে রেখেছে। সেটা সামনের দিকে এনে খুলতে খুলতে বল্লে—সেই যে মেয়েটা মোরে

মা বলে, সে দুটো চিঁড়ে কুটলো। আমি বল্লাম, ও কি কুটচিস্? ও বল্লে— কামিনী-সরু ধানের ভাল চিঁড়ে। তোমার গোপালের জন্যি দুটো নিয়ে যেও এখন, কাল বেন-বেলা। আমার মনডা বড্ড খুশি হলো—তা সেও আসচে। সেও তোমারে দেখতি চায়। বড্ড দুঃখী কাঙাল মেয়েডা। ধান ভেনে চিঁড়ে কুটে একরকম করে চালাচ্ছে।

একা রামে রক্ষা নেই, বুড়ির কথা শেষ হোতে না হোতে দেখি একটি আধফর্সা মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক অদূরে আমতলায়, এদিকেই আসচে। আরও বিপদে পড়লাম এই জন্যে যে, ঠিক সেই সময়ে আমার জ্ঞাতি খুড়োমশায়কেও এদিকে আসতে দেখা গেল! সর্বনাশ! তাঁর বাড়ীতে আমার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা, আর তিনি যদি জানতে পারেন যে এদের হাতে তৈরী চিঁড়ে বা খাবার জিনিস আমি খাই—তাহলেই তো এ পাড়াগাঁয়ে হয়েছে! চিঁড়ে যে ওরা আজই প্রথম এনেচে একথা কি তিনি বিশ্বাস করবেন? আজ দুধ, কাল চিঁড়ে—

রুক্ষ সুরেই বল্লাম—এখন যাও না—দেখচো না ব্যস্ত আছি?

—চিঁড়ে ক'টা নেবার একটা কিছু দ্যাও বাবা।

—ও সব এখন নিয়ে যাও—হ্যাঁ, হ্যাঁ—পরে হবে। এখন যাও—

বুড়ী একটু অবাক হয়ে বল্লে—তা চিঁড়ে ক'টা—

খুড়োমশায় প্রায় এসে পড়েচেন দাওয়ার ধারে।

হাত নেড়ে নেড়ে ফেলবার ভঙ্গিতে বুড়ীর দিকে চেয়ে বলি—আঃ নিয়ে যাও না —ভাল জ্বালা!

খুড়োমশায় বল্লেন—কি ওতে? কি বলচে জমিরের স্ত্রী?

—কিছু না। ইয়ে বিক্রি করতে এসেচে—যাও এখন—

ভগবান জানেন, বুড়ী আমার কাছে চিঁড়ের বদলে পয়সা নিতে আসেনি।

খুড়োমশায় বল্লেন—তোমার এখানে ওর বড্ড যাতায়াত—

কথাটা চাপা দেবার জন্যে বল্লাম—আমার এই বন্ধুরা একদিন মাছ ধরবার কথা বল ছিলেন, তা ভাদুড়ীদের পুকুরে কি সুবিধে হবে?

পুনরায় গ্রামে এলাম মাস পাঁচ-ছয় পরে আশ্বিন মাসের শেষে।

কয়েকদিন পরে ঘরে বসে আছি, বাইরের উঠোনে দাঁড়িয়ে কে ক্ষীণ নারীকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে—বাবু ঘরে আছেন গা?

বাইরে এসে দেখি গত জ্যৈষ্ঠ মাসে যাকে বুড়ীর সঙ্গে দেখেছিলাম সেই মধ্যবয়সী স্ত্রীলোকটি। আমায় দেখে সলজ্জভাবে মাথায় কাপড়টা আর একটু টেনে দেবার চেষ্টা করে সে বল্লে—বাবু কবে এসেচেন?

—দিন পাঁচ-ছয় হলো। কেন?

—আমিও তাই শোনলাম। বলি একবার যাই। আমার সেই মা পেটিয়ে দেলে, বল্লে দেখে এসো গিয়ে।

—কে?

—ওই সেই বুড়ী—এখানে যিনি আসতো। তেনার বড্ড অসুখ—এবার বোধ হয় বাঁচবে না। গোপাল কবে আসবে, গোপাল কবে আসবে—অস্থির. আমারে রোজ শুধোয়। আমি বলি, তিনি কলকাতায় চাকরি করেন, সব সময় কি আসতে পারেন? কি মায়া আপনার ওপর, আর-জন্মে বোধ হয় পেটে ধরেল। এ-জন্মে তাই এত টান—একবার দেখে আসুন গিয়ে।। বড্ড খুশি হবে তাহলি—

উদাসীনভাবে বল্লাম—ও!

মন তখন অন্য চিন্তায় বিব্রত। এবার কাউন্সিল ইলেকশনে দুটি বন্ধুর পক্ষ থেকে ভোট সম্বন্ধে গ্রামে গ্রামে বেড়িয়ে লোককে অনুরোধ করবার গুরুভার নিয়ে এসেচি। কাল থেকেই বেরুতে হবে, ওদের মোটর আসবে। কি ভাবে কি করা যায়, সে কথাই চিন্তা করছিলাম। কোথায় কোন বুড়ি অসুখ হয়ে আছে, ওসব দেখবার সময়াভাব।

স্ত্রীলোকটি বল্লে—ওবেলা যাবেন বাবু?

—আচ্ছা—তা—এখন ঠিক বলতে পারিচিনে—

স্ত্রীলোকটি অনুনয়ের সুরে বল্লে—একবার যাবেন বাবু ওবেলা। হয়তো বুড়ী বাঁচবে না—

বিকেলের দিকে বেড়াতে যাবার পথে দেখতে গেলাম বুড়ীকে। খুব উঁচু দাওয়া, সেকালের প্রণালীতে তৈরী পাঁচচালা ঘর। বুড়ীর স্বামীর আমলে আমার জন্মগ্রহণের পূর্বে এ ঘর তৈরী হয়েছিল, তখন এদের অবস্থা যে ভাল ছিল, এই প্রশস্ত পাঁচচালা ঘরখানাই তার নিদর্শন। কিন্তু ঘরখানার সংস্কার হয়নি অনেকদিন, খড় উড়ে পড়েচে চালা থেকে, দড়ি বাখারি ঝুলচে, মাটির দাওয়া নানা স্থানে ভেঙে পড়চে, বাঁশের খুঁটি নড়্‌বড়্ করচে!

বুড়ী শুয়ে আছে একটা ছেঁড়া মাদুরের ওপর, মাথায় তেলচিটে মলিন বালিশ। বুড়ীর সেই পাতানো মেয়েটি পাশে বসে ছিল, আমায় দেখে বুড়ীকে বল্লে—অ মা, কে এয়েচে দ্যাখো—অ মা—

আমি গিয়ে কাছে দাঁড়াতেই বুড়ী চোখ মেলে আমার দিকে চাইলে। পরে আমাকে চিনে ধড়্‌মড়্ করে বিছানা ছেড়ে ওঠবার চেষ্টা করতেই আমি বল্লাম—উঠো না, উঠো না—ওকি?

বুড়ী আহ্লাদে আটখানা হয়ে বল্লে—ভাল আছ অ মোর গোপাল? বসতে দে গোপালকে? বসতে দে গোপালকে—বসতে দে—

—বসবার দরকার নেই, ব্যস্ত হয়ো না। থাক্—

—ওখানা কেন দিচ্চিস্? গোপালের ওই খাজুরের চাটাইখানা পেতে দে—

পরে ঠিক যেন আপনার মা কি পিসিমার মত অনুযোগের সুরে বলতে লাগল—তোর জন্যি খাজুরের চাটাইখানা কদ্দিন আগে বুনে রেখেলাম। ওখানা পুরোনো হয়ে ভেঙে যাচ্চে। তুমি একদিনও এলে না গোপাল—অসুখ হয়েচে তাও দেখতে আস না—

আমি বল্লাম—আচ্ছা, চুপ করে শুয়ে থাকো। ব্যস্ত হয়ো না।

ইতিমধ্যে পাড়ার অনেক লোক এসে জড়ো হলো, আমি এসেচি দেখে। কেউ কেউ বল্লে—বুড়ী কেবল আপনার কথা বলে বাবু। আপনাকে দেখবার বড্ড ইচ্ছে। বুড়ী বোধ হয় এবার বাঁচবে না।

বুড়ীর দুচোখ বেয়ে জল পড়চে গড়িয়ে। আমায় বল্লে—গোপাল, যদি মরি আমার কাফনের কাপড় তুই কিনে দিস—

পাশের লোককে জিজ্ঞেস করলাম—সে কি?

জানেন না বাবু? মাটি দেবার সময় নতুন কাপড় কিনে পরিয়ে দিতে হয়—

—ও বুঝেচি।

আমাকে পেয়ে বুড়ী খুব খুশী হয়েচে। কত কি বলতে লাগলো—ওর নাতজামাই লোক কেমন খারাপ, এমন যে অসুখ একবার চক্ষু দিয়ে দেখেও যায় না। ঘর? তা দশ বছর, খড় পড়েনি চালে। পচে গলে গিয়েচে পুরনো খড়। নাতজামাইকে বলেছিল, সে জবাব দিয়েচে, অত বড় হাতী ঘর আমি ছাইতে পারবো না। পাশে একটা ছোট কুঁড়ে-ঘর-মত বেঁধে থাকো।

বুড়ী চোখের জল মুছে বলে—তা থাকতি পারি হ্যাঁ বাবা? কি নোকের পরিবার আমি। আজই না হয় কপাল পুড়েচে। তা বলে কুঁড়েঘরে থাকতি পারি মুই?

সান্ত্বনা দেবার সুরে বল্লাম—কথা ঠিকই তো।

—বলো তুমি গোপাল!

ঘাড় নেড়ে বলি—সত্যি তো।

আজও সে চালাঘর, সেই ম্লান সন্ধ্যা, ছেঁড়া মাদুরে শোওয়া বুড়ীকে আমার মনে পড়ে! ছেঁচতলায় একটা শীর্ণ লাউগাছ, পেছনে কয়েক ঝাড় বাঁশ, এক-আধটা খেঁকি কুকুরের আওয়াজ পাড়ায়। শান্ত ছায়া নেমে এসেছে সামনের সারা উঠোনটাতে। কতক-গুলো মেয়ে-পুরুষ দেখতে এসে দাওয়ার ছেঁচতলায় দাঁড়িয়ে আছে।

আসবার সময় বুড়ীর পাতানো মেয়েটির হাতে কিছু দিয়ে এলাম পথ্য ও ফলের জন্যে। হয়তো আর বেশিদিন বাঁচবে না, এই অসুখ থেকে উঠবে না। বুড়ী কিন্তু সেযাত্রা সেরে উঠলো। দিব্যি সেরে উঠলো। আমি কলকাতায় চলে যাবার আগে দু-একবার আমার কাছে লাঠি ধরে গেল। বসে বসে আপনার মনে কত কি বকে, তারপর চলে আসে।

বছর-দুই কাটলো। এই দুবছরের মধ্যে যখনই গিয়েছি গ্রামে, বুড়ী এসে বসে, কিছু-না-কিছু নিয়ে আসবেই। অসুখটা থেকে উঠে বড় দুর্বল হয়ে পড়েছিল, সে দুর্বলতা ওর আর সারলো না।

আমি বলতাম—কেন আসো রোজ রোজ অতদূর থেকে?

—এই পাকা নোনাডা ভাবলাম গোপালেরে দিয়ে আসি—

—তা হোক, তুমি কষ্ট করে এসো না এ রকম।

—তুই তো আমারে দেখতি যাবি নে কোনদিন—

—সময় পেলেই যাবো। এখন বাড়ী যাও।

কখনও বুড়ী বলত—অ গোপাল, তুই বিয়ে করলি নে কেন?

—মেয়ে পাওয়া যায় না। তা ছাড়া, বয়েস হয়ে গিয়েচে।

—কিচ্ছু বয়েস হয়নি। কাঁচা ছেলে তোমরা। (আমার বয়েস তখন চল্লিশ।)

—বেশ।

—ওই মুখুজ্যেদের বাড়ী একটা বড় মেয়ে আছে, তোমার মিল হবে। বল্লে দেখবানি ওদের।

—আমার ঘটকালি করবার লোকের যখন দরকার হবে, তখন তোমায় ডেকে পাঠাবো। এখন যাও।

কিন্তু বুড়ী আমার কথা শোনে না। একদিন মুখুজ্যেবাড়ীর নরু আমায় ডেকে বল্লে—ওহে, একটা কথা বলি। আজ জমির করাতীর বৌ-বুড়ী বাড়ীর মেয়েদের কাছে গিয়ে বলচে কি, গোপালের সঙ্গে তোমাদের পুঁটির বিয়ে দাও। মেয়েরা তো অবাক, গোপাল কে? শেষে জানা গেল—তুমি। ওরা তো শুনে আশ্চর্য। তা তুমি কিছু বলে-ছিলে নাকি এ সম্বন্ধে?

আমি নিজেকে নিতান্তই বিপন্ন ও অসহায় বোধ করলাম। বল্লাম—সে কি কথা! কক্ষনো না। তুমি কি বিশ্বাস কর—

—না—না, বিশ্বাস অবিশ্যি করিনি। যাই হোক, যদি কিছু বলেও থাকো বুড়ীকে বারণ করে দেবে আর না বলে। গ্রাম ভাল নয়, ও নিয়ে মেয়েটার নামে একটা কথাকথি যদি হয়—

—নিশ্চয়। তুমি বিশ্বাস করো ভাই, আমি এর বিন্দুবিসর্গ জানি নে।

বুড়ী তার পরদিন যেমন সকালে এসেচে বকলুম ওকে। কে তাকে এসব কাণ্ড করতে বলেচে? ঘটকালি করতে ডেকেছিল কেউ তাকে? গাঁয়ে এই নিয়ে শেষে একটা কথা উঠবে, পাড়াগাঁ জায়গা খারাপ। তুমি বাপু এখানে আর এসো না।

বুড়ী ফ্যাল্ ফ্যাল্ চোখ চেয়ে বল্লে—বকিস্ নে অ গোপাল. মোরে বকিস নে। তা তুই ও মেয়েডারে বিয়ে না করিস—অন্য কোনো মেয়ে বিয়ে কর। পুঁটিরে তোর পছন্দ হয়নি, না?

ধমকে উঠে বল্লাম—আবার ওইসব কথা!

নিতান্ত সরলা সেকেলে বুড়ী, কিছু বোঝেও না।

সত্যিই এই ঘটনা নিয়ে গ্রামে একটু কথাবার্তার সৃষ্টি হলো। বুড়ীর ওপর খুব চটে সকালবেলাটা আর ঘরেই থাকিনে, পাছে বুড়ী এসে জ্বালাতন করে। দশ-বারোদিন পরে একদিন ঘুমিয়ে উঠেচি, বাইরে বুড়ীর গলা শোনা গেল—অ মোর গোপাল।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বল্লাম—কি? আবার এসেচ কেন এখানে?

—একটা বাতাবী নেবু নিয়ে এয়েলাম তোমার জন্যি—

—দরকার নেই বাতাবী নেবুতে। যাও এখন—

বিরক্তি নিতান্ত অকারণ নয়। মাত্র চার-পাঁচদিন আগে মুখুজ্যেবাড়ীর ঘটনা নিয়ে আমার জ্ঞাতি খুড়ো আমায় দুকথা শুনিয়ে দিয়েচেন।

বছরখানেক আর গ্রামে যাইনি এর পরে। বোধ হয় দেড় বছরও হোতে পারে। একবার শেষ শরতে পুজোর ছুটির পর কাশী থেকে বেড়িয়ে ফিরে কলকাতায় এসে দেখি তখনও দিন-দুই ছুটি হাতে আছে। গ্রামেই গেলাম এই দুদিন কাটাতে। গ্রামে ঢুকতেই প্রথমে দেখা পরশু সর্দারের বৌ দিগম্বরীর সঙ্গে। দিগম্বরী অবাক হয়ে বল্লে—ও মা, আজই তুমি এলে বাবাঠাকুর? সে বুড়ী যে কাল রাতে মারা গিয়েচে। তোমার নাম করলে বন্ড। ওর সেই পাতানো মেয়ে আজ সকালে বলছেল—

আমি এসেচি শুনে বুড়ীর নাতজামাই দেখা করতে এল।—বাবু এসেছেন? সাহায্য করুন, কাফনের কাপড় কিনতি। যা দাম কাপড়চোপড়ের!

আমার মনে পড়লো বুড়ী বলেছিল সেই একদিন—আমি মরে গেলে তুই কাফনের কাপড় কিনে দিস্ বাবা। ওর স্নেহাতুর আত্মা বহুদূর বারাণসী থেকে আমায় কি ভাবে আহ্বান করে এনেচে। আমার মন হয়তো ওর ডাক এবার আর তাচ্ছিল্য করতে পারেনি।

কাপড় কেনবার টাকা দিলাম। নাতজামাই বলে গেল—মাটি দেওয়ার সময় একবার যাবেন এখন বাবু। বেলা বারোটা আন্দাজ যাবেন—

শরতের কটুতিক্ত গন্ধ ওঠা বনঝোপ ও মাকাললতা-দোলানো একটা প্রাচীন তিন্তিড়ি-রাজ গাছের তলায় বৃদ্ধাকে কবর দেওয়া হচ্ছে। আমি গিয়ে বসলাম। আবদুল. শুকুর মিঞা, নসর, আমাদের সঙ্গে পড়তো আবেদালি. তার ছেলে গনি—এরা সকলে গাছের ছায়ায় ব'সে। প্রবীণ শুকুর মিঞা আমায় দেখে বল্লে—এই যে বাবাঠাকুর. এসো। অমুক খাবা? বুড়ীর মাটি দেওয়ার দিন তুমি কনে থেকে এলে, তুমি তো জানতে না? তোমায় যে বড্ড ভালবাসতো বুড়ী। তোমার কাছে কাফনের কাপড় নিয়ে তবে ওর মহাপ্রাণীডা ঠান্ডা হলো। খাও তামুক—

একটি গরুর গাড়ীর পুরনো কাঠামোর ওপর বৃদ্ধাকে কাঁথামুড়ি দিয়ে শুইয়ে রেখেছে। দুজন জোয়ান ছেলে কবর খুঁড়চে। কবর দেওয়ার পরে সকলে এক এক কোদাল মাটি দিলে কবরের ওপর। শুকুর মিঞা বল্লে—দ্যাও বাবাঠাকুর, তুমিও দ্যাও—তুমি দিলে মহাপ্রাণী ঠান্ডা হবে—

দিলাম এক কোদাল মাটি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, ও বেঁচে থাকলে বলে উঠতো—অ মোর গোপাল।

শাবলতলার মাঠ

অনেক দিন পরে শাবলতলার মাঠ দেখলাম সেদিন। আমার পিসিমার বাড়ীর দেশে ছেলেবেলায় যখন পিসিমার বাড়ী থেকে দুর্গাপুর উচ্চ প্রাইমারি পাঠশালায় পড়তাম সে আজ পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেকার কথা। পিসিমা মারা যাওয়াতে সে গ্রামে আর যাই নি কখনও।

সেদিন আবার কার্যোপলক্ষে গরুর গাড়ী চড়ে যেতে যেতে শাবলতলার মাঠ চোখে পড়ল, কিন্তু মস্ত বড় কি এক কারখানা হচ্ছে সেখানে। রেল লাইন বসেছে মাঠের ওপর দিয়ে—বড় রেল লাইন। কত যে লোহালক্কড় যন্ত্রপাতি এসে পড়েছে! লোকজন কুলি-মজুরের ভিড়, দুমদাম শব্দ, সে এক বিরাট ব্যাপার।

চালাঘর ও তাঁবু চারিধারে। ইন্‌জিনিয়ার-ওভারসিয়ারের দল খেটে খেটে সারা হয়। পাঞ্জাবী কন্ট্রাক্‌টরের মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারের খুঁটি বসানো হচ্ছে. ইলেকট্রিকের ও টেলিফোনের তার খাটানো হবে। ইট-বোঝাই লরির ভিড় নতুন তৈরী চওড়া রাস্তাগুলোর ওপরে। চুনের ধুলো, সিমেণ্টের ধুলো উড়ছে বাতাসে।

আমার সেই ছেলেবেলাকার শাবলতলার মাঠ কোথায় গেল? সত্যিই তা নেই। তার বদলে আছে কতকগুলো তাঁবুর সারি, ইটখোলা, পাথুরে কয়লার স্তূপ, চুনের ঢিবি. কাঠের ঢিবি, লোকজনের হৈ চৈ লরির ভিড়।

আজ সকালে মার্টিন লাইনের ছোট স্টেশনে নেমেছি, গরুর গাড়ী করে চলেছি পিসিমার বাড়ীর গ্রামের পাশের একটা গ্রামে মেয়ের বিয়ের পাত্র খুঁজতে। রাস্তার ধারে পড়ে শাবলতলার মাঠ। হঠাৎ দেখি এই অবস্থা তার।

গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানকে বলি—হ্যাঁরে, এটা শাবলতলার মাঠ, না?

—হ্যাঁ বাবু।

—কি হচ্ছে এখানে?

—কি জানি বাবু, কলকারখানা বসছে বোধ হয়।

—কতদূর নিয়ে?

—তা বাবু অনেক দূর নিয়ে—উই বাজিতপুর, মনসাতলা, ছাওয়াল-মারি, বেদেপোতা, হাঁসখালির চড়া পর্যন্ত।

—গ্রামগুলো সব কোথায়?

—সব উঠিয়ে দিয়েছে।

মনে পড়ল আমার এগার বছর বয়সের একটি মধ্যাহ্নদিন। আর মনে পড়ল দুর্গাপুর উচ্চ প্রাইমারি স্কুলের উমাচরণ মাস্টারকে।

উমাচরণ মাস্টার কতদিন থেকে দুর্গাপুর ইউ পি পাঠশালায় হেডমাস্টারি করছিলেন তা আমি বলতে পারব না। গ্রামের রায় জমিদারদের ভাঙা কার্নিসে পায়রার বাসাওয়ালা বৈঠকখানার একপাশে সেকেলে তক্তপোশে ছিল তাঁর বাসা। দেওয়ালে তাঁর হুঁকো ঝুলত পেরেকের গায়ে, বাঁশের আলনায় তাঁর দুখানা আধময়লা ধুতি ও এক এবং অদ্বিতীয় পিরানটি আলতো করে ঝোলানো থাকত—আর থাকত তক্তপোশের নীচে একজোড়া কাঠের খড়ম। একটা টিনের বিবর্ণ তোরঙ্গ। একটা চটের-থলে-ভর্তি টুকিটাকি জিনিস। একখানা পাকা বাঁশের লাঠি এবং—সেইটেই বেশি করে মনে আছে—একগাছা তেলে-জলে

পাকানো বেত।

উমাচরণ মাস্টার আবার বই লিখতেন। আমি তখন অল্পবয়স্ক, লেখক বা সাহিত্যিকের যশোগৌরব সম্বন্ধে আমার ধারণা তখন খুবই অস্পষ্ট—তবুও মাস্টারমশায় যখন ক্লাসের টেবিলের ওপর পা তুলে গম্ভীরভাবে তাঁর, লেখা 'আক্কেল গুড়ুম' বই পড়তেন—তখন আমরা ক্লাসসুদ্ধ ছেলে বিস্ময় ও প্রশংসাভরা দৃষ্টিতে তাঁর দীর্ঘ-গুম্ফযুক্ত বসন্তের দাগ-আঁকা প্রৌঢ় মুখমণ্ডলের দিকে চেয়ে থাকতাম।

হ্যাঁ—তার বই-এর নাম ছিল 'আক্কেল গুড়ুম'—তিনি বলতেন 'প্রহসন'। আমার যা বয়স তখন তাতে 'আক্কেল গুড়ুম' বা 'প্রহসন' দুটো কথার একটারও মানে বুঝতাম না। মনে আছে বইএর মধ্যে একটি ইংরেজি-পড়া ছোকরার কথা আছে এবং পড়ার ভঙ্গিতে মনে হত উক্ত ইংরেজী-পড়া ছোকরা খুব ভাল লোক নয়।

উমাচরণ মাস্টার আমাদের দিকে চেয়ে সগর্বে বলতেন—এই বই পড়ে গোবরভাঙার সেজবাবুর শালা কি বলেছিলেন জান? বলেছিলেন, উমাচরণবাবু, আপনি কালে গিরিশ ঘোষের সমান লেখক হবেন।—বুঝলে?

আমি বলেছিলাম—গিরিশ ঘোষ কে পণ্ডিত মশাই মশাই?

উমাচরণবাবু অনুকম্পার হাসি হেসে আমার দিকে চেয়ে বলেছিলেন—গিরিশ ঘোষ? জান না? হুঁ। কি-ই বা জান?

আমি লজ্জায় চুপ করে থাকি। কি উত্তর দেব? যখন সত্যিই জানি নে গিরিশ ঘোষ কে। নামও কোনদিন শুনি নি! উমাচরণ তাঁর এই মূল্যবান প্রহসন আমাদের কাছে বিক্রি করবার চেষ্টা করতেন এবং বিক্রি অনেক করেছিলেনও। প্রত্যেক ছাত্রের বাড়ী এক-খানা বা দুখানা করে 'আক্কেল গুড়ুম' ছিলই। মাইনের টাকা দিলে খুচরো ফেরত দেওয়ার রীতি ছিল না তাঁর। বলতেন—কত বাকি? সাত আনা? নাও একখানা ভাল বই নিয়ে যাও। বাড়ী গিয়ে পড়তে দিও সবাইকে।

একদিন পিসিমা বললেন—হ্যাঁরে, মাইনের টাকা দিলাম, ন আনা পয়সা ফেরত দিলি নে?

—না পিসিমা। মাস্টার মশাই বই একখানা দিয়েছেন তার বদলে।

—কি বই?

—আক্কেল গুড়ুম।

—ওমা, সে আবার কি বই? তুই কি বলে সেই বই আনতে গেলি? যেমন পোড়ার-মুখো মাস্টার তেমনই পোড়ার-মুখো ছেলে! বইএর নাম শোন না—'আক্কেল গুড়ুম'। কেষ্টর শতনাম পাওয়া যায় তো একখানা আন্ গে বরং—ও বই ফিরিয়ে দিয়ে আয়।

—সে হবে না পিসিমা, তিনি ওসব বাজে বই লেখেন না। এ হল প্রহসন।

—সে আবার কি রে?

—সে তুমি বুঝবে না। গিরিশ ঘোষের নাম শুনেছ?

—সে কে আবার? আমাদের গাঁয়ে তো ও নামের কেউ নেই। দুর্গাপুরের লোক নাকি?

—সে তুমি বুঝবে না। তিনি আমাদের মাস্টার মশাইয়ের মত প্রহসন বই লেখেন।

পিসিমা ধমক দিয়ে বলতেন—তুই চুপ কর বাপু—বড্ড পণ্ডিত হয়েছিস তুই। আমি জানি নে—ওঁর গাল টিপলে দুধ বেরোয় উনি জানেন—ফাজিল কোথাকার! ওসব গিরিশ ঘোষ সতীশ ঘোষ বুঝি নে—কাল ও বই ফেরত দিয়ে কেষ্টর শতনাম আনতে পারিস ভাল, নয়তো ন আনা ফেরত আনবি—যা—

একদিন উমাচরণ মাস্টার মশায় আমাদের বুঝিয়ে বলেছিলেন, বড় বড় লেখকরা সবাই প্রথম জীবনে তাঁর মত ইস্কুল-মাস্টারি করেছিলেন। কথাবার্তার মাঝখানে আমাদের ক্লাসের সারদা হঠাৎ বলে বসল—আপনার বয়স কত মাস্টার মশাই?

—কেন রে?

—তাই বলছি।

উমাচরণ মাস্টার তাকে ধমক দিয়ে বসিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম ছেলেটার খটকা বাধছে কোথায়। এই বয়সেও যদি এখন উমাচরণ মাস্টার আমাদের এই স্কুলে মাস্টারি করতে রয়ে গেলেন, তবে কোন্ বয়সে গিয়ে তিনি কোথায় কি বড় কাজ করবেন? আমাদের ক্লাসের সতু কিন্তু বলত—মাস্টার মশাই খুব বড় পণ্ডিত। ওরকম হয় না।

আমি বললাম—কেন রে?

—উনি চালতাবাগানের মাঠের ধারে বসে বসে রোজ কি করেন! বোধ হয় লেখেন। কবিমানুষ কিনা।

আমি একদিন সতুর সঙ্গে দেখতে গেলাম ব্যাপারটা। চালতাবাগান বহু কালের প্রাচীন আম তেঁতুল গাছের ছায়ায় দিনমানেই সন্ধ্যার মত অন্ধকার। অনেক রকম মোটা লতা গাছে গাছে জড়াজড়ি করে আছে। বাগান পার হয়েই একটা ছোট মাঠ, উমাচরণ মাস্টার সেই মাঠের ধারে বসে আছেন, বাগানের ছায়ার আশ্রয়ে একটা ছেঁড়া মাদুর পেতে। মাদুরের ওপর কাগজ বই ছড়ানো। পাছে উড়ে যায় বলে মাটির ছোট ছোট ঢেলা চাপানো সেগুলোর ওপর। আমরা সেওড়া ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম, তিনি কখনও উপুড় হয়ে কি লিখছেন, কখনও সামনের মাঠের দিকে চেয়ে কি ভাবছেন, কখনও আপন মনে হাসছেন, বিড় বিড় করে কি বকছেন।

সতু সসম্ভ্রমে চুপি চুপি বললে—দেখলি? কবিমানুষ!

আমি বললাম—কি করছেন?

—লিখছেন।

—বিড় বিড় করে কি করছেন?

—ও রকম কবিরা করে থাকে।

দুজনে চুপ করে দাঁড়িয়ে কবির কাণ্ড অনেকক্ষণ দেখলাম। এই আমার জীবনে প্রথম একজন জীবন্ত কবির ক্রিয়াকলাপ দেখবার দুর্লভ সৌভাগ্য ঘটল। মনে আছে, সেওড়া ঝোপের পাশেই ছিল বড় একটা কতবেল গাছ, তলা বিছিয়ে পড়ে ছিল পাকা পাকা কতবেল। সেই বয়সের লোভ, বিশেষ করে কতবেলের ওপর লোভ দমন করেছিলাম কবি দেখবার আনন্দে ও বিস্ময়ে। উমাচরণ মাস্টারের বয়স তখন কত? আমার মনে হয় চল্লিশের ওপর। কারণ আমার মায়ের বড় ভাই, বড় মামা—যাঁর বয়স শুনতাম পঁয়ত্রিশ—তিনি মাস্টার মশায়কে 'দাদা' বলে ডাকতেন।

আমরা যেমন নিঃশব্দে সেখানে গিয়েছিলাম তেমনই নিঃশব্দে চলে এলাম মনে বিস্ময় ও আনন্দ নিয়ে।

এর পর উমাচরণ মাস্টার যখন পড়াতেন, তখন হাঁ করে তাঁর দিকে চেয়ে দেখতাম। একজন কবি বটে! উনি ঠিকই বলেছেন—বড় বড় লোকেরা প্রথম জীবনে মাস্টারি করে। ওঁর বয়স বেশি হয়েছে বটে কিন্তু উনি একজন কবিও তো হয়েছেন। সারদাটা কিছুই বোঝে না।

বছরখানেক কাটল। আমরা কটি ছেলে উচ্চ প্রাইমারি পরীক্ষা দেবার জন্যে তৈরি

হয়েছি। সেই বছর উমাচরণ মাস্টার আমাদের নিয়ে রানাঘাটে যাবেন পরীক্ষা দেওয়াতে। চারটি ছেলে—মনে আছে চক্কত্তিদের কানাই, আমি, সতু ও সারদা। দুর্গাপুর থেকে হেঁটে বেরিয়ে শাবলতলার মাঠে যখন পড়েছি, তখন দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে।

বড্ড মনে আছে সেই অপরাহ্নের কথাটি। তখন শাবলতলার মাঠে ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। মস্ত বড় মাঠের এখানে ওখানে কুলগাছ সেওড়া-ডাঁটা আর বনতুলসীর জঙ্গল। ধু ধু করছে মাঠ যেন সমুদ্রের মত, কূলকিনারা সেই কোনওদিকে! এত বড় মাঠ কখনও দেখি নি। দুর্গাপুর থেকে শাবলতলার মাঠ প্রায় দু ক্রোশ আড়াই ক্রোশ পথ। কাছাকাছি কোন গ্রাম নেই এ মাঠের কোনওদিকে। একটা সরু মেঠো পথ মাঠের মধ্যে দিয়ে দূরে কোথায় চলে গিয়েছে। কি একটা ফুলের গন্ধ বেরুচ্ছে দুপুরের রোদে। আমরা সবাই ছেলেমানুষ, ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। উমাচরণ মাস্টার বললেন—যাও সব গাছতলায় একটু বসে নাও।

আমাদের প্রত্যেকের কাঁধে একটা করে বোঁচকা। তার মধ্যে আমাদের বইপত্তর আছে, কাপড় গামছা ও কাঁথা আছে। থাকতে হবে নাকি হোটেলে। আমরা বোঁচকা নামিয়ে একটা কুলগাছের তলায় সবাই বসলাম। মাস্টার মশায় বললেন—দেখো তো কুল হয়েছে কিনা।

সতু দেখে বললে—কুল হয়েছে, ছোট ছোট—খাওয়া যায় না।

কানাইএর মা ওকে সেখানে গিয়ে খাবার জন্যে নারকোলের নাড়ু আর রুটি করে দিয়েছিলেন পুঁটুলিতে। সতু ওর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে খেলে। আমি চাইতে গেলাম, কানাই বললে, নেই।

আমরা একটু পরে সবাই বোঁচকা রেখে হুটোপাটি করে মাঠের মধ্যে বনতুলসীর জঙ্গলে খেলা করতে লাগলাম। কি সুন্দর যে লাগছিল। ক্ষুদ্র গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় খেলা করে বেড়াই, এত বড় মাঠের এত ফাঁকা জায়গায় খেলা করবার সুযোগ কখনও পাইনি। ওদের কেমন লাগছিল জানি না, আমার মনে হচ্ছিল যেন কোন নতুন রাজ্যে রূপকথার জগতে এসে পড়েছি—তুলসী মঞ্জরীর সুগন্ধভরা অপরাহ্নের বাতাসে যেন কোন্ সুদূরের ইঙ্গিত। যে দেশ কখনও দেখিনি, যার কথা কিন্তু আমার মনে সর্বদাই উঁকি দেয়, আজ এই শাবলতলার মাঠে এসে সেই দূর-দূরান্তরকে দেখতে পেলাম। ঝোপে ঝোপে শালিক আর ছাতারে পাখীর কলরব, এখানে ওখানে বেলে জমিতে খেঁকশেয়ালের গর্ত, রাঙা কেলেকোঁড়া ফুলের লতা জড়িয়ে উঠেছে বুনো কলুচটকা আর তিত্তিরাজ গাছে, জন-মানুষের বাস নেই, একটা কলা গাছ কি আম গাছ চোখে পড়ে না, যেন এ জগতে মানুষের বাস নেই, শুধুই বনঝোপের শুকনো পাতার ওপর দিয়ে মচ মচ করে পাতার ধুলো উড়িয়ে এ দেশে চলে যাও, লেখাপড়ার বিরক্তিকর বাধ্যতা এখানে নেই। খেলা ছেড়ে লেখাপড়া করতে কেউ বলবে না এ দেশে। উমাচরণ মাস্টার সেই পুরনো, একঘেয়ে, বালকের পক্ষে মহা বিরক্তিকর জগতের মানুষ, এ নতুন জীবনের উদাস মুক্তির মধ্যে, দিনরাতব্যাপী খেলা আর অবকাশের মধ্যে ওঁর স্থান নেই আদৌ।

বেলা পড়ে এসেছে। হঠাৎ সতু বললে—হ্যাঁরে, মাস্টার মশাই কোথায় রে?

আমি বললাম—কেন, কুলতলায় নেই?

—কতক্ষণ তো তাঁকে দেখছি নে। গেলেন কোথায়? আমাদের যেতে হবে না ইস্টিশনে? দু ঘণ্টার ওপর তো এখানে আছি। গাড়ী ধরতে হবে না?

আমার মনে হচ্ছিল গাড়ী ধরে আর কি রাজা হব আমরা! এই তো বেশ আছি, উচ্চ প্রাইমারি পরীক্ষার বিভীষিকার মধ্যে না-ই বা গেলাম। ইন্‌স্‌পেক্টর এসে সেবার স্কুলে বলে গিয়েছিল রানাঘাট গিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার নাকি নানা গোলমাল। খাতায় লিখে পরীক্ষা হয়, গার্ড আছে সেখানে ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে, একটু যে দেখাদেখি করবে কি

বলাবলি করবে তার কোন উপায় নেই। বলাবলি করলেই মহকুমার হাকিমের সামনে গিয়ে হাজির করবে, তিনি জেলেও দিতে পারেন, জরিমানাও করতে পারেন। একটু ফিসফাস করবার জো নেই সেখানে। নবমীর পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে ঢুকতে হবে হল-ঘরে। কি ভীষণ পরিণাম ছাত্রজীবনের।

সত্যি বলছি, শাবলতলার মাঠ দেখবার পরে, এখানে এসে এই দু ঘণ্টা ছুটোছুটি করে বেড়ানোর পরে আমি যেন জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছি। তা হচ্ছে এই রকম বিশাল মুক্ত বনময় ধূলিভরা মাঠের অবাধ শান্তি আর স্বাধীনতার মধ্যে খেলা করে বেড়ানো। পরীক্ষা দিয়ে কি হবে! কানাই এসেও বললে—আমরা যাব কখন? মাস্টার মশাই কোথায়?

সত্যিই তো, তাঁকে কোনওদিকে দেখা যাচ্ছে না। সবাই মিলে খুঁজতে বার হওয়া গেল। সতু ডাকতে লাগল—ও মাস্টার মশাই, মাস্টার ম-শা-ই—

কোনও সাড়া নেই।

সতু ভীতমুখে বললে—বাঘে নিয়ে গেল নাকি রে?

কানাই বললে—দূর, এখানে মানুষ-খেকো বাঘ থাকবে?

—না নেই! তোকে বলেছে!

—তবে গেলেন কোথায়?

আমি বললাম—তোমরা খুঁজে দেখ। আমি এখানে খেলা করি!

এমন সময় সারদা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে—শীগগির—শীগগির আয়—দেখে যা—

আমরা সবাই বলে উঠলাম—কি হয়েছে রে? বেঁচে আছেন তো?

কথা বলতে বলতেই আমরা সারদার পেছনে ছুটলাম। বেশ খানিকটা দূর দৌড়ে সারদা থেমে পড়ল এবং আঙুল দিয়ে সামনের দিকে দেখিয়ে আমাদের চুপ করতে বলে পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল।

একটা শুকনো খাল মত নীচু জায়গায় কুঁচঝোপের আড়ালে উমাচরণ মাস্টার বসে বসে ঝুঁকে পড়ে কি লিখছেন সেই আর-একদিনের মত। জায়গাটাতে খুব ছায়া পড়েছে। কুঁচঝোপটায় পাখীরা কিচির কিচির করছে—সামনে অনেকদূর ফাঁকা। সুন্দর জায়গাটি। এই মাঠের মধ্যে এই জায়গাটাই সব চেয়ে ভাল। কবি উমাচরণ মাস্টার ঝুঁকে পড়ে লিখতে লিখতে বিড় বিড় করে আপন মনে কি বকছেন, এমন কি আপন মনে ফিক ফিক করে হাসছেনও। যে কেউ দেখলে বলবে উন্মাদ পাগল। অমন তন্ময় হয়ে লিখতে আমরা তাঁকে কখনও দেখিনি, অমন ভাবে আপন মনে হাসতেও তাঁকে কখনও দেখিনি!

সতু মুগ্ধদৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে বললে—মাস্টার মশাই একজন আসল কবি।

সারদা ওর মতে মত দিয়ে বললে—ঠিক তাই।

কানাই ও আমি কোন কথা না বলে একদৃষ্টে এই সত্যিকার জীবন্ত কবিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। আমাদের কত ভাগ্যি যে আমরা এমন মাস্টার পেয়েছি!

কানাই একটু পরে বললে—কিন্তু ভাই, সন্ধ্যে হল। ওঁকে না ডাকলে আমাদের উপায় কি হবে? ডাকি ওঁকে। কি বলিস?

কেউ সাহস করে না।

সারদার মনে কবির প্রতি শ্রদ্ধা একটু ফিকে, সে দু-একবার আমাদের উপস্থিতি জ্ঞাপক কাসির আওয়াজ করলে।

সতু চুপি চুপি বললে—এই! আস্তে!

সারদা বললে—হ্যাঁ আস্তে বই কি! আমরা মরি এখন এই মাঠের মধ্যে সন্ধ্যেবেলা!

বাঘে ধরুক সবসুদ্ধ—বলে সজোরে একবার কাসির আওয়াজ করতেই উমাচরণ মাস্টার চমকে পেছন ফিরে চাইলেন।

সারদা বললে—আসুন মাস্টার মশাই, সন্ধ্যের দেরি নেই যে—ইষ্টিশান এখনও অনেকখানি রাস্তা—

উমাচরণ মাস্টার ব্যস্ত হয়ে খাতাপত্র গুটিয়ে বগলে করে নিয়ে আমাদের কাছে উঠে এলেন শুকনো খাল থেকে। অপ্রতিভের হাসি হেসে বললেন—তাই তো, বেলা গিয়েছে দেখছি। চল চল।

তার পর পেছন দিকে চেয়ে বললেন—জায়গাটা বড় চমৎকার—না?

সতু সশ্রদ্ধ সুরে বললে—ওখানে কি করছিলেন মাস্টার মশাই? কি আছে ওখানে?

উমাচরণ মাস্টার ধমক দিয়ে বললেন—সে কি তুই বুঝবি? সিনারি কাকে বলে জানিস? চমৎকার সিনারি ওখানটাতে। কবিতা লিখছিলাম। কি চমৎকার মাঠটা বুঝিস কিছু?

আমারও চোখে যে এই অপরাহ্নে এই মাঠ অদ্ভুত ভালো লেগেছে, মাস্টার মশায়ের কথার মধ্যে তার সায় পেয়ে আমার মন খুশিতে ভরে উঠল। আমি নতুন দৃষ্টি পেলাম সেই দিনটিতে, উচ্চ প্রাইমারি পরীক্ষা দিতে যাবার পথে। উমাচরণ মাস্টার কত বড় শিক্ষকের কাজ করলেন সেদিন—তিনি নিজেও কি তা বুঝলেন?

আমার কথা এইখানেই শেষ। উমাচরণ মাস্টারের ইতিহাসও এইখানেই শেষ। প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগের কথা সে সব। উমাচরণ আজ আর বোধ হয় বেঁচে নেই। বড় হয়ে উমাচরণ চক্রবর্তী বলে কোন কবির লেখা কোথাও পড়িনি বা কারও মুখে নামও শুনি নি। তাতে কিছু আসে যায় না। যশোভাগ্য সকলের কি থাকে।

আজ এতকাল পরে শাবলতলার মাঠে এসে আবার মনে পড়ে গেল বাল্যের সেই অপূর্ব অপরাহ্নের কথা, মনে পড়ে গেল উমাচরণ মাস্টারকে। দুঃখ হল দেখে—সে শাবলতলার মাঠ একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। মুছে গিয়েছে সে সৌন্দর্য, সে নির্জনতা। উমাচরণ মাস্টারের জন্যে মনটা এতদিন পরে যেন কেমন করে উঠল।

দুর্মতি

নিশ্চিন্তপুর গ্রামের প্রান্তে হরিচরণ রায়ের ছোট একখানা কোঠাবাড়ি ছিল। সংসারে থাকিবার মধ্যে তাহার স্ত্রী আর এক ছেলে। হরিচরণ রায়ের বয়স বছর ত্রিশেক, স্ত্রীর বয়স একুশ-বাইশ। হরিচরণ রায়ের লেখাপড়া এমন বিশেষ কিছুই জানা ছিল না, তাহার উপর নিতান্তই পাড়াগাঁয়ে মানুষ। কাজেই কোথাও না যাইয়া তিনি বাড়ি বসিয়া পৈতৃক আমলের সামান্য একটু জমিজমার খাজনা সাধিতেন। কচু কুমড়া বেগুন— আবাদ করিতেন ঠিক বলা চলে না—পুঁতিতেন; ইহাতেই তিন প্রাণীর একপ্রকার কষ্টে-সৃষ্টে সংসার চলিয়া যাইত।

পৌষ মাস। খুব শীত। সন্ধ্যার সময় এক দূর প্রজাবাড়ী হইতে খাজনা আদায় করিয়া হরিচরণ বাড়ী ফিরিয়া আসিল। স্ত্রী বীণাপাণি উঠানের তুলসীতলায় সন্ধ্যা দিতেছিল, স্বামীকে আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি তুলসীতলার প্রণাম সারিয়া, হাসিমুখে কাছে আসিয়া বলিল—তবে যে বলা হল ফিরতে অনেক রাত হবে? আমি এখনও ডাল বাটিনি।

হরিচরণ হাতের পুঁটুলি নামাইতে নামাইতে বলিল—এলাম চলে। খাজনা তো এক পয়সাও দেবে না, মিথ্যে হায়রান হওয়া।

বীণাপাণি হাতের প্রদীপ নামাইয়া রাখিয়া বলিল—একটু দাঁড়াও, আমি কুয়ো থেকে টাটকা জল তুলে দি, তবুও একটু গরম হবে এখন! এবার যে শীত পড়ল তাতে পুকুরের জলে আর কাজ চলবে না।

হরিচরণের ছেলে নীপু বাবার গলার স্বর পাইয়া ঘরের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল। মাকে নিশ্চিন্তমনে তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে দেখিয়া সে ঘরের মধ্যে তাকের হাঁড়ি হইতে আমসত্ত্ব চুরির কাজে ব্যাপৃত ছিল। বাবার গলার স্বরে বুঝিল বিপক্ষ সজাগ হইয়াছে। সে ক্ষুণ্নমনে বাহির হইয়া আসিয়া বাবার বড় পুঁটুলিটা দেখিয়া হঠাৎ নিজের অসাফল্যের দুঃখটা ভুলিয়া গেল। বাবাকে সে একটু ভয় করিত। হঠাৎ কাছে না আসিয়া আঙুল দিয়া পুঁটুলিটা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি বাবা এতে?

হরিচরণ বলিল—হ্যাঁরে, এই বাঁদর, এই শীতে একটা কিছু গায়ে দিতে নেই তোর? ওগো, নীপুর সে দোলাইখানা কোথায় গেল?

বীণাপাণি জলের বালতি নামাইয়া বলিল—সেই বিকেল বেলা থেকে বলছি ছেলেকে, ও কি কারুর কথা শোনে! গায়ে দিয়ে দিলেও গায়ে রাখবে না। ওই তো কাঠের আলনায় দোলাই রয়েছে।

হরিচরণ বলিল—হুঁ! সে বেতখানা কোথায় গেল?

নীপু প্রমাদ গনিয়া মার মুখের দিকে চাহিল। বীণাপাণি বলিল—থাক গো, আজ আর কিছু ব'লো না। তার পর ছেলেকে কাছে টানিয়া বলিল—এবার ফের কিন্তু যেদিন—

এক ঘণ্টা পরে দেখা গেল বীণাপাণি রান্নাঘরে বসিয়া ডাল বাটিয়া কি একটা পিঠা তৈয়ারির যোগাড় করিতেছে, বাহিরের কনকনে শীত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য হরি-চরণ উনানের পাশে বসিয়া তামাক টানিতেছে ও স্ত্রীর সহিত খোশগল্প করিয়া সমস্ত দিনের শ্রম নিবারণের চেষ্টা করিতেছে। নীপু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

বীণাপাণি ভুলই শুনুক কি যাই হক, স্বামী বাহির হইয়া যাইবার সময় সে শুনিয়া-ছিল তাঁহার ফিরিতে রাত হইবে, কাজেই যে ডাল পূর্বে বাটা উচিত ছিল তাহা সে এখন বাটিতে বসিয়াছে। ইহার পর কখন কি হইবে? বীণাপাণি অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি বাটিতে লাগিল।

হরিচরণ ভাল করিয়া এক কলিকা তামাক সাজিতে সাজিতে বলিল—অত করে তাড়া-তাড়ি করছিস কেন রে? না হয় একটু রাতই হবে এখন। এই তো সবে সন্ধ্যে, শেষে আঙুল-টাঙুল ছেঁচে ফেলবি?

নিতান্ত ঘরোয়া লোক হরিচরণের স্ত্রীর সহিত সম্ভাষণের রীতি এই রকমই। অবশ্য ছেলেপিলের সম্মুখে এবং বাহিরের লোকের কাছে সম্ভাষণের অন্য রীতি আছে। এটা নির্জনের একটু গাঢ় রকমের আদরের ডাক।

বীণাপাণি হাসিয়া বলিল—কেন? আঙুল কি রোজই ছেঁচি নাকি?

বীণাপাণি দেখিতে মন্দ নহে—রংটি খুব ফরসা না হইলেও উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুখের গড়নটি বেশ সুন্দর, চোখদুটিও ডাগর ডাগর। পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থবধূ, কাজকর্মে থাকে বলিয়া শরীরেও বেশ নিটোল স্বাস্থ্য।

হরিচরণ তামাক টানিতে টানিতে বলিল—না, সত্যি বৌ, দেখ কতদিন ভাবছি, এক-জোড়া ভালরকম অনন্ত তোকে গড়িয়ে দেব, তা 'এই হবে, এই হবে' করে—বুঝলি না?

বীণাপাণি একটুখানি হাসিয়া মুখ নীচু করিল। সে বিবাহের পর প্রথম শ্বশুরবাড়ী আসিয়া আজ দশ বৎসর ধরিয়া এ কথা শুনিয়া আসিতেছে। একজোড়া সোনার অনন্ত গড়াইয়া দেওয়া যে তাহার দরিদ্র স্বামীর পক্ষে কতটা অসম্ভব, তাহা সে বুঝিত। স্বামীকে

একটু ভুলাইবার জন্য সমদুঃখে বলিল—তা এবার তো হয়েও যেত ; ঐ সেটেলমেণ্টের খরচা দিতেই তো অনেকটা বেরিয়ে গেল।

হরিচরণের সামান্য যাহা কিছু জমিজমা ছিল, এবার সেটেলমেণ্টের খরচ বাবদ তাহার দরুন গভর্নমেণ্টের লোককে ত্রিশ টাকা দিতে হইয়াছিল। সে কিন্তু স্ত্রীর কাছে, ও যে-সব লোকে জমিজমার ধার ধারে না তাহাদের নিকট, প্রচার করিয়া বেড়াইত যে, তাহার পৈতৃক অনেক জমি লোকে ফাঁকি দিয়া খাইত, এখন সেটেলমেণ্টে সেগুলি সে ফিরিয়া পাইয়াছে, প্রায় 'শদাবধি' টাকা এজন্য তাহাকে খরচা দিতে হইয়াছে, সেটেলমেণ্টের ক্যাম্পে তাহার খুব খাতির হইয়াছে, ইত্যাদি। স্ত্রীর চোখে বড় হইতে সকলেই চাহে।

স্ত্রীর মুখে সেটেলমেণ্টের কথা শুনিয়া হরিচরণ আরম্ভ করিল—দেখ্‌ সেদিন তো ক্যাম্পে গেলাম। আমাদের গাঁয়ের অনেক সব বড় বড় (হরিচরণ আঙুল দিয়া দেখাইল) হুঃ—হুঃ—ডেকে জিজ্ঞাসাও করলে না কানুনগো। আমি যেতে মাত্রই কানুনগো একেবারে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, বললে 'আসুন জমিদার মশায়, আসুন!' সাতবেড়ের দরুন সেই জমার যে কাগজপত্র গোলমাল হয়েছিল বুঝলি তো—তা বলতেই কানুনগো মুহুরীদের সব বকে উঠল, বললে—'রায় মশায়, আমি না থাকলেই এরা সব গোলমাল করে ফেলে ; আপনি বসুন, আমি বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।'—সে খাতির কী!

স্ত্রীর ডাগর চোখের প্রশংসমান দৃষ্টিতে উৎসাহিত হইয়া হরিচরণ অধিকতর ভিত্তি-হীন কি একটা ফাঁদিতে যাইতেছিল, এমন সময় তাহাদের বাহিরের বাড়ীর সদর দরজায় কে যেন ঘা দিতেছে শোনা গেল।

বীণাপাণি বলিল—ওগো, দরজায় কে যেন ঘা দেয়?

হরিচরণ বলিল—কই না, এত রাত্রে কে ঘা দেবে?

সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় আঘাতের শব্দ ও কার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

বীণাপাণি বলিল—ঐ যে কে ডাকছে, দেখ না একবার?

হরিচরণ শঙ্কিত হইল। পূর্বেও যে আঘাতের শব্দ সে না শুনিয়াছিল এমন নহে। কিন্তু এই শুনিতে না পাওয়ার ভান করিবার মূলে একটু প্রত্নতত্ত্ব নিহিত আছে। আজ তিন বৎসর পূর্বে ঠিক এই পৌষ মাসেই সে রামনারায়ণপুরের হাটে এক কাবুলী আলোয়ানবিক্রেতার নিকট ধারে দশ টাকা মূল্যের একটা আলোয়ান খরিদ করিয়াছিল। হতভাগ্য কাবুলীওয়ালা দুই বৎসর যাবৎ হাঁটাহাঁটি করিয়াও এ পর্যন্ত টাকা পাওয়া তো দূরের কথা, হরিচরণের সাক্ষাৎ পর্যন্ত পায় নাই। হরিচরণ শঙ্কিত চিত্তে সামনের উঠানে গেল। সেই কাবুলীওয়ালাটা এত রাত্রে আসে নাই তো? বিচিত্র কি! সঙ্গে কি সে তাহার দুই একজন দেশভ্রাতাদের আনিয়াছে? তাহা হইলে উপায়?

সন্তর্পণে বাহির-বাটীর দরজার নিকট যাইতে যাইতে হরিচরণ শুনিতে পাইল দরজার বাহির হইতে বাংলায় কে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে—'রায় মশায় কি বাড়ী আছেন? যাক বাঁচা গেল। তাহা হইলে কাবুলীওয়ালাটা নয়।'

হরিচরণ খিল খুলিয়া দিল। দেখিল বাহিরে একজন অপরিচিত ভদ্রবেশী প্রৌঢ় দাঁড়াইয়া।

প্রৌঢ় জিজ্ঞাসা করিলেন—এইটেই কি হরিচরণ রায় মশায়ের বাড়ী?

হরিচরণ বলিল—আজ্ঞে আমারই নাম।

প্রৌঢ় বলিলেন—তা বেশ। বড় সন্তুষ্ট হলাম। আমি আসছি কলকাতা থেকে—এই ট্রেনেই আসছি। তোমার শ্বশুর রামজীবনবাবু আমার একজন খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তাঁর ওখানে একসময় আমার খুব যাতায়াত ছিল। তবে এখন আমিও বাইরে বাইরে থাকি, এইজন্যে ততটা আর—। তা বেশ বেশ, বড় সন্তুষ্ট হলাম বাবাজীবনকে দেখে। বীণা

এখানেই আছে তো?

হরিচরণ বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা আসুন বাড়ীর মধ্যে।

মুখে অভ্যর্থনা করিলেও মনে মনে সে অত্যন্ত চটিয়া গেল। দিব্য শীতের রাত্রে স্ত্রীর সহিত গল্প জমাইয়া আনিয়াছিল, তা নয়, এখন আবার রাঁধ ভাত, নিয়ে এস জল-খাবার—কোথায়ই বা পিঠা, আর কোথায় বা কি! শ্বশুরগিরি ফলাবার আর সময় পেলেন না। এর চেয়ে সে কাবুলীওয়ালাও যে ছিল ভাল! নাঃ—এই সব দুর্বৃত্তের জন্য দুনিয়ায় আর সুখশান্তি নাই।

প্রৌঢ় বলিলেন—বাবাজি, তোমার শ্বশুরের সঙ্গে আমার হরিহরাত্মা ছিল। আমার নাম শুনেছ কিনা জানি না—আমার নাম কৃষ্ণলাল গাঙ্গুলি। ছেলেবেলা থেকে বন্ধুত্ব—তার ছেলেপিলে সব আমার কোলেপিঠে মানুষ। তোমার যখন বিয়ে হয় তখন আমি লাহোরে চাকরি করি, কাজেই আসতে পারিনি। আহা, ছোকরা অল্প বয়সেই মারা গেল। সবই ভবিতব্য!

হরিচরণের বাড়ীর দালান ছিল নিতান্ত ছোট; পৈতৃক আমলের বাড়ী, অনেকদিন মেরামত হয় নাই। জানালার কবাট খুলিয়া পড়িয়াছে, কোন-কোনটি নারিকেলের ছোবড়ার দড়ি দিয়া গরাদের সহিত বাঁধা। হরিচরণ কৃষ্ণলালবাবুকে দালানে একটা ছোট টুলের উপর বসাইয়া বলিল—বসুন, আমি বাড়ীর মধ্যে বলি।

কৃষ্ণলালবাবু বসিয়া দেখিলেন, দালানের দরজা জানালা একটাও ভাল অবস্থায় নাই। সবগুলির ফাঁক দিয়াই হু হু করিয়া হিম আসিতেছে। বন্ধুর এ কন্যাটি সকলের ছোট, তিনটি মেয়ের বিবাহ দিবার পর সর্বস্বান্ত হইয়া তাহার বিবাহ দেন। সে যে ভাল পাত্রে পড়ে নাই তাহা তিনি জানিতেন। কৃষ্ণলালবাবু মনে মনে কষ্ট অনুভব করিলেন।

মিনিট চার-পাঁচ পরে উত্তরদিকের দরজা ঠেলিয়া বীণাপাণি দালানে প্রবেশ করিল।

কৃষ্ণলালবাবু তাড়াতাড়ি চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন—এস এস, বীণু মা আমার এস। ওঃ, সেই তোর বিয়ের আগে মা—তখন আমি।

বীণাপাণি গলায় আঁচল দিয়া কৃষ্ণলালবাবুকে প্রণাম করিল। কৃষ্ণলালবাবু তাহার হাত ধরিয়া তুলিলেন—এস এস, সাবিত্রী-সমান হও মা। দেখি মা বীণু মুখখানা তোর, কতদিন দেখিনি।

বীণাপাণির মাতাপিতা কেহ ছিল না। বাপের বাড়ী ভাই-এরা থাকিলেও পিতার মৃত্যুর পর তাহার বড় খোঁজখবর করিত না। আজ পাঁচ-ছয় বৎসর সে বাপের বাড়ী যায় নাই বা বাপের বাড়ীর কাহাকেও দেখে নাই। নির্জ্জনে তাহার মায়ের মুখ মনে পড়িত, বাপের মুখ মনে পড়িত, শৈশবের সাথীদের মুখ মনে পড়িত, উঠানের বকুলতলায় সেঁজুতি ব্রতের কথা মনে পড়িত। তার বিরহী প্রাণটি পুকুরের ঘাটের চালতাতলায়, শত শৈশবের স্মৃতিভরা তাহাদের পাড়ার ধূলামাটির পথে পথে, সেই বকুলফুলদের বুকে মুখ লুকাইয়া মনের সমস্ত দুঃখকষ্ট উজাড় করিয়া দিত—অসহ্য তৃষ্ণায়। ভাইএরা তাহার খোঁজও করে না। সে ভাবিত, আজ মা-বাপ বাঁচিয়া থাকিলে কি তাহাকে এরূপ করিয়া ফেলিয়া থাকিতে পারিতেন? হাজার হউক, মেয়েমানুষ—অনেক দিন পরে পিতৃসম পিতৃবন্ধুকে পাইয়া তাহার সেই অভিমানই সকলের চেয়ে প্রবল হইয়া উঠিল। ডাগর চক্ষু-দুটি ছাপাইয়া চোখের জল ঝরঝর করিয়া গড়াইয়া পড়িল।

কৃষ্ণলালবাবু তাড়াতাড়ি কোঁচার খুট দিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন—ছিঃ বীণু, মা আমার—কেঁদো না। কাঁদে কি মা, ছিঃ!

বীণাপাণি আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে কাঁদ-কাঁদ সুরে বলিল—এতদিন কোথায় ছিলেন জেঠামশায়?

—আমি তো লাহোরে ছিলাম অনেকদিন। তার পরে দেশে এসে সব শুনলাম। তোর বিয়ের সময়ও আমি চিঠি পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু আসতে পারলাম না। বড় জরুরী কাজ পড়ে গেল। এই তো সেদিনকার কথা—

—নরুদা ভাল আছে জেঠামশায়?

—নরু ভাল আছে, পড়ছে। এবার বি-এ পরীক্ষা দেবে।

—আমার কথা বলে নরুদা?

—বলে না মা! খুব বলে। নিজের বোন নেই, তোকেই বোনের মত ছেলেবেলা থেকে জানে। ছেলেবেলা খেলা হতে হতে তুই একবার ঝগড়া করে নরুর মুখ আঁচড়ে দিয়েছিলি, তোর মনে আছে বীণু?

বীণাপাণি একটুখানি হাসিল; সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু শৈশবের সাথী নরুদার কথা মনে পড়ায় তার চোখের পাতা পুনর্বার অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। বলিল—নরুদা আমায় একবারটি দেখতে আসে না কেন জেঠামশায়? আপনি গিয়ে একবার পাঠিয়ে দেবেন?

কৃষ্ণলালবাবু বলিলেন—দেব বই কি মা দেব। তবে এখন তো আসতে পারবে না, এবার যে তার পরীক্ষা কিনা। বি-এ পরীক্ষা হয়ে গেলে তখন একবার দেখে যাবে বলে দেব।

বীণাপাণির মনে পড়িল, রাত হইয়াছে, জেঠামশায়ের আহারাদির বন্দোবস্ত তো করিতে হইবে। সে বলিল—আপনি বসুন জেঠামশায়—

কৃষ্ণলালবাবু শশব্যস্ত প্রায় চৌকি হইতে উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন—শোন মা, শোন। আমার জন্যে রাত্রে কিছু রাঁধতে-টাধতে হবে না। আমি রাত্রে বরং—

বীণাপাণি ঘাড় বাঁকাইয়া জননীর মত শাসনের সুরে বলিল—আচ্ছা সে হবে, বসুন জেঠামশায়। আমি সে বুঝব।

কৃষ্ণলালবাবু হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। বীণাপাণির বড় ইচ্ছা হইল জেঠা-মশায়কে শীতের রাত্রে গরম গরম লুচি ভাজিয়া খাওয়ায়। কিন্তু পয়সা কই? তাহাতে এখনই তো প্রায় একটাকা খরচ। সংসারে অসচ্ছলতা যে কতদূর তাহা তো সে জানে। সে রান্নাঘরে গিয়া দেখিল স্বামী উনুনের পাড়ে বসিয়া আপন মনে তামাক টানিতেছে। স্ত্রীকে দেখিয়াই হরিচরণ বলিল—তা, কি, ভাত-টাত তো আবার রাঁধতে হবে?

বীণাপাণি বলিল—একটা কথা বলি, রাখবে? জেঠামশায়ের বয়স হয়েছে। আমার কাছে এসেছেন, এ সময় যদি একটু সেবা-যত্ন করতে না পারব তবে মেয়েজন্ম মিথ্যে নিয়েছিলাম। আমি ভাবছি জেঠামশায়কে খানকতক লুচি ভেজে দিই। তুমি তোমার সেটেলমেণ্টের টাকা থেকে একটা টাকা নিয়ে গিয়ে বিপিনের দোকান থেকে জিনিস কিনে নিয়ে এস না?—আনবে?

হরিচরণ কিছু পূর্বে স্ত্রীর নিকট যে জমিদারীগিরির আস্ফালন করিয়াছিল, আসন্ন বিপদের মুখে সে কথা ভুলিয়া গেল। মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—তা তো আনলে ভালই হত—মানে আনা তো কিছু উচিত ছিল, কিন্তু হয়েছে কি, এই চব্বিশের মধ্যে টাকা দাখিল না করলে আবার সার্টিফিকেট জারী হবে। ঐ যা যোগাড় করা আছে—তা থেকে—

বীণাপাণি উপায় ঠাওরাইয়া রাখিয়াছিল, বলিল—তুমি তার জন্যে ভেবো না, আমার কানের ছেঁদা ভাল হয়নি, মাকড়ি পরতে বড় ব্যথা হয়—আজই খুলে রাখতাম, তা নীপুর জন্মবার বলে খুলিনি। তুমি ঐ থেকে টাকা নিয়ে যাও, কাল সকালে বরং মাকড়ি বাঁধা দিয়ে দুটো টাকা কোথাও পাবে না? মাকড়ি তো সেই খুলতেই হবে?

ইহার পর আর কোন প্রতিবাদ করা ভাল দেখায় না বলিয়া হরিচরণ বলিল—তবে

একটা বাটি দাও, ঘিটা আনতে হবে। যাই দেখি—

হরিচরণ চলিয়া গেলে বীণাপাণি দালানে গিয়া দেখিল কৃষ্ণলালবাবু চামড়ার ব্যাগ খুলিয়া কি সব জিনিসপত্র বাহির করিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—মা বীণু শোন, এদিকে আয়। আমার একটা সাধ তোকে পুরোতে হবে মা।

বীণাপাণি হাসিয়া বলিল—কি জেঠামশায়?

—তুই ছেলেবেলা আমার কাছে বসে আমার জলখাবার থেকে তুলে খেতিস তোর মনে আছে? আমি কলকাতা থেকে খাবার এনেছি ব্যাগে করে, তোকে ছেলেবেলার মত খাওয়াব বলে। আয় এখানে বোস বীণু—তোকে কতদিন খাওয়াইনি! তখন এই সব খেতে তুই খুব ভালবাসতিস তোর মনে আছে? আয় মা, এখানে বোস দিকি।

জেঠামশায়ের কথা শুনিয়া বীণাপাণির খুব আমোদ অনুভব হইল। সংগে সংগে মনে হইল, বাপ-জেঠা ভিন্ন কি কেউ মেয়ের কষ্ট বোঝে? সে খাইতে ভালবাসে সত্য, কিন্তু সেজন্য এখানে তো কেউ কোনদিন তাহাকে আদর করিয়া ভাল কিছু খাইতে দেয় নাই, পূর্বে তো তাহার শ্বশুরশাশুড়ী বর্তমান ছিলেন! আর জেঠামশায় আজ কলিকাতা হইতে ব্যাগে বহিয়া খাবার আনিয়াছেন তাহাকে খাওয়াইবার জন্য! শুধু যত্ন ও স্নেহ দান করিতে করিতে তার মনটি যে গৃহিণী ও জননীর প্রবীণত্বে উপনীত হইতেছিল, আজ এই প্রৌঢ়ের সংস্পর্শে তাহার সে মনটি আবার দশ বৎসরের ছোট মেয়ের মত হইয়া গেল। তাহার পর তাহার ঘুমন্ত খোকা নীপুর কথা মনে পড়িল—সেও খাবার খাইতে ভালবাসে। এ পর্যন্ত জেঠামশায় নীপুর কথা কিছু বলেন নাই, বোধ হয় তাহার কথা তিনি জানেন না—জানিলে নিশ্চয় তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। নিজে বলিতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল।

বীণাপাণি আসিয়া জেঠামশায়ের কাছে গিয়া বসিল। কৃষ্ণলালবাবু আহ্লাদে আত্মবিস্মৃতপ্রায় হইলেন। বাম হাতে বীণাপাণির মাথার চুলগুলির মধ্যে আঙুল চালাইতে চালাইতে তিনি তাহাকে খাবার খাওয়াইতে লাগিলেন। স্নেহ মায়ায় তাঁহার মন পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তিনি বলিতে লাগিলেন—মা বীণু, সেই তুই ছেলেবেলায় আমার জল-খাবার থেকে জোর করে টপ টপ খাবার তুলে খেতিস, তোর মনে আছে কি? তখন তুই খুব ছোট। মা আমার কত রোগা হয়ে গিয়েছে (এ কথা সত্য নহে, কারণ বীণাপাণি পূর্বাপেক্ষা বরং সুস্থই ছিল)—আজ যদি রাম থাকত—! এইটে খেয়ে দেখ মা, একে রাজভোগ বলে—এ তুই কখনও খাসনি, এ কলকাতা ছাড়া সব জায়গায় বড় একটা মেলে না! কেমন ভাল নয়?

বীণাপাণির মনে হইল নীপু কখনও রাজভোগ খায় নাই। সে খাইতে খাইতে নতমুখে ঘাড় নাড়িল।

আরও কিছু খাইবার পর বীণাপাণি বলিল—জেঠামশায়, আর কত খাব?

—আচ্ছা, এই অমৃতিখানা শুধু খা। আর খাবারগুলো তুলে রেখে দে, জামাইকে—।
তার পর বলিলেন—একটু দাঁড়া, এই দেখ্ দিকি, এই ব্রেসলেট-জোড়াটা তোর জন্যে গড়িয়েছি মা, দেখ্ দিকি, হাতে হবে তো?

কৃষ্ণলালবাবুর নিজের মেয়ে ছিল না। বন্ধুকন্যাকে শৈশব হইতেই তিনি নিজের কন্যার ন্যায় দেখিতেন। বহুদিন দেশে আসেন নাই—বিদেশ হইতে দেশে আসিবার সময় প্রথমেই তাঁহার বীণাপাণির কথা মনে পড়িল। প্রায় দুই হাজার টাকা খরচ করিয়া দিল্লীতে তিনি বীণার জন্য এই ব্রেসলেট-জোড়া করাইয়াছিলেন। কৃষ্ণলালবাবু ব্রেসলেট-জোড়াটি বীণাপাণিকে দেখাইবার জন্য প্রদীপের সম্মুখে ধরিলেন। ক্ষীণ আলোয় তাহার চারিদিকের পাথরগুলি ঝক ঝক করিয়া উঠিল।

বীণাপাণি ব্রেসলেট দেখিয়া শুধু আশ্চর্য নয়, মুগ্ধ হইয়া গেল, সে এরূপ জিনিস কখনও দেখে নাই। ওগুলি কি জ্বলিতেছে, পাথর? পাথর ঐরকম জ্বলে নাকি?—ওমা! বিস্ময়ে তাহার মুখ দিয়া কথা সরিল না।

কৃষ্ণলালবাবু বলিলেন—দেখি মা, তোর হাত?

বীণাপাণির হাতের সবুজ ও লাল রঙের জারমান কাঁচের চুড়িগুলোকে বিদ্রূপ করিয়া ব্রেসলেটের দামী চুনি, পান্না, হীরা-জহরতগুলি যেন খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। প্রদীপের আলোক শতভাগে ভাগ করিয়া ব্রেসলেট-জোড়া বীণাপাণির হাতে যেন লাল সবুজ নীল আগুনের ফুলকি উড়াইয়া জ্বলিতে লাগিল।

বীণাপাণি নিজের হাতের দিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ চোখ ফিরাইতে পারিল না। গহনা আবার এ রকম হয় নাকি?

কৃষ্ণলালবাবু বীণাপাণির ভাব দেখিয়া বুঝিলেন যে গহনাটি তাহার পক্ষে অপ্রত্যাশিতরূপে সুন্দর হইয়াছে। ইহাতে তিনি মনে মনে অত্যন্ত খুশী হইলেন। আহা, গরীবের ঘরে পড়িয়া মেয়েটা কত কষ্টই পাইতেছে, তবু এ বুড়ো তো তাহাকে একটু আনন্দ দিতে পারিল।

এই সময় হরিচরণ দোকান হইতে ফিরিল। দালানের বাহিরে তাহার আসিবার শব্দ শুনিয়া বীণাপাণি দালান হইতে সরিয়া গেল। একটু পরে সে যখন রান্নাঘরে লুচি ভাজিতে বসিয়াছে, হরিচরণ সেখানে আসিলে বীণাপাণি হাসিতে হাসিতে বলিল—আজ কি দেখাব বল দিকি?

কৃষ্ণলালবাবু হরিচরণকে গহনার সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই, কারণ বলা তাঁহার পক্ষে একটু অশোভন হইত।

হরিচরণ বলিল—কি?

ব্রেসলেট পাইয়া বীণাপাণির আনন্দ আর ধরিতেছিল না। সে ব্রেসলেটটা স্বামীকে দেখাইবার জন্য কেসে পুরিয়া কেসটা রান্নাঘরে আনিয়াছিল। স্বামীর সঙ্গে একটু কৌতুক করিতে ইচ্ছা হইল, বলিল—আচ্ছা, একটুখানি চোখ বুজিয়ে থাক দিকি নি, আমি একটা ভেল্কি দেখাব।

হরিচরণ বলিল—কি, শুনি না?

বীণাপাণি বলিল—আচ্ছা, বোজাও না একটু চোখ, দেখাচ্ছি।

—আমি পিছন ফিরছি, কি দেখাবে দেখাও।

বীণাপাণি কেস খুলিয়া নিজের হাতে পরিল, তার পর হাসিমুখে বলিল—চেয়ে দেখ এদিকে।

হরিচরণ হঠাৎ চাহিয়া দেখিতেই যেন চমকাইয়া উঠিল। বলিল—কি ও?

বীণাপাণি বলিল—কি বল দেখি?

হরিচরণ নীচু হইয়া স্ত্রীর হাতের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে লাগিল। সেও দরিদ্রসন্তান, এরকম জিনিস কখনও দেখে নাই—হাঁ করিয়া অনেকক্ষণ ব্রেসলেট-জোড়ার দিকে চাহিয়া রহিল।

বীণাপাণি সকৌতুকে বলিল—কোথায় পেলাম বল দেখি?

হরিচরণ বলিল—উনি দিলেন বুঝি? দেখি—। তাহার পর ব্রেসলেটের পাথরগুলির উপর সন্দিগ্ধভাবে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—এগুলো বোধ হয় কাঁচ। এরকম কাঁচবসানো আংটি তো দেখেছি—কলকাতা থেকে হরিগাঁয়ের মেলায় বিক্রি করতে আনে—এর দাম বেশী নয়।

বীণাপাণি বিজ্ঞ জহুরীর মত মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল—হ্যাঁ, কাঁচ! এসব

পাথর, খুব দামী পাথর।

হরিচরণ বলিল—তুই কি করে জানলি পাথর? তুই পাথর চিনিস?

বীণাপাণি মুখ হইতে বিজ্ঞতার বোঝা ভাল করিয়া না নামাইয়াই বলিল—জেঠামশায় বললেন যে।

হরিচরণ ব্রেসলেট-জোড়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ভাল করিয়া দেখিল, তার পর বলিল—তা যদি হয় তাহলেও কিন্তু এর দাম তিন শ টাকার এক পয়সা বেশী নয়।

বীণাপাণি সন্দিগ্ধস্বরে বলিল—তুমি কি করে বুঝলে? জেঠামশায় যে বললেন পাথরগুলোর দাম খুব বেশি?

হরিচরণ বলিল—ঐ রকমই হবে। তিন শ না হক, সাড়ে তিন শ-ই হল—তার বেশি আর কত হবে। আজকাল পাথরের দাম কি। আর পাথরেই তো সব জায়গা ছেয়ে ফেলেছে, সোনা আর ওতে কতটুকু আছে!

বীণাপাণির একথা বিশ্বাস হইল না। এক জোড়া অনন্ত গড়াইতে সে শুনিয়াছে পাঁচশ টাকার বেশি পড়ে, আর এক জোড়া পাথরবসানো ব্রেসলেট যে তিন শ টাকায় হইবে, ইহা তাহার আদৌ সম্ভব বলিয়া মনে হইল না।

রাত্রি বেশি হইবার ভয়ে বীণাপাণি খুব শীঘ্র শীঘ্র খাবার প্রস্তুত করিয়া ফেলিল। তার পর জেঠামশায়কে ও স্বামীকে খাওয়াইয়া নিজে খাইয়া শুইতে গেল।

পরদিন ভোরে জেঠামশায় নীপুকে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হইলেন। সেদিনকার বীণু—তাহার ছেলে অত বড় হইয়াছে! সমস্ত সকাল নীপুর সঙ্গছাড়া হইলেন না, দুঃখ করিতে লাগিলেন, বীণুমার খোকা হইয়াছে জানিলে তিনি তাহার জন্য একটা চেন গড়াইয়া আনিতেন।

কলিকাতায় কৃষ্ণলালবাবুর জরুরী কাজ। দুপুরে ট্রেনে রওনা হইবার ইচ্ছা থাকিলেও, বীণাপাণির চোখের জল এড়াইতে না পারিয়া তিনি বৈকাল পর্যন্ত রহিয়া গেলেন। সন্ধ্যার পূর্বে হরিচরণ তাঁহাকে স্টেশনে পোঁছাইয়া দিতে গেল।

সাত-আট দিন হইয়া গেল।

বীণাপাণি ব্রেসলেট-জোড়া মাত্র বৈকালে কিছুক্ষণের জন্য পরিত, অন্য সময়ে বাসন মাজা, উঠান ঝাঁট, রান্নাবান্না করা—ইহার মধ্যে কখন সে ব্রেসলেট পরে। ব্রেসলেট-জোড়া তাহার কাছে যেন নিত্য নূতন ঠেকিত। প্রদীপের মৃদু আলোয়, নীল-লাল-সবুজ আলো যখন ব্রেসলেটের গা হইতে ঠিক্‌রাইয়া পড়িত, বীণাপাণি মুগ্ধদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত। তাহার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ সুগঠিত হাত দুটিতে ব্রেসলেট জোড়াটি বড় সুন্দর মানাইয়াছিল।

হরিচরণ একদিন রাত্রে খাইতে বসিয়া বলিল—বৌ, তোর হাতে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে কিন্তু। বীণাপাণির মুখ লজ্জায় ও আনন্দে রাঙা হইয়া উঠিল।

সাত-আট দিন পরে মাঘ মাসের মাঝামাঝি রায়-বাড়ীতে একটা বড় নিমন্ত্রণ উপস্থিত হইল। বীণাপাণির অনেক দিনের একখানা জরিপাড় কাপড় তোরঙ্গের ভিতর তোলা ছিল। নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে এই কাপড়খানা সে বাহির করিয়া পরিত। হরিচরণ মুখে যতই আস্ফালন করুক, স্ত্রীকে ভাল কাপড় কিনিয়া দিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। অত্যন্ত পুরাতন হইলেও বীণাপাণি কাপড়খানাকে অতি যত্নের সহিত ব্যবহার করিত। এই নিমন্ত্রণে যাইবার সময় কাপড়খানা সে বাহির করিয়া পরিল ও মেয়েমহলে দিগ্‌বিজয়ের লোভ সামলাইতে না পারিয়া ব্রেসলেট জোড়াও হাতে পরিয়া খাইতে গেল। তাহার ইচ্ছা নিজেকে লোকের চক্ষে বড় করা। আমাদের দেশের শিক্ষিত পুরুষদের জ্ঞান ও বিদ্যা

আছে, তাহারা লোকসমাজে তাহাই দেখাইয়া বেড়ান, কিন্তু বেচারী মেয়েদের সে সম্বল নাই, কাজেই তাহারা শুধু গহনা দেখাইয়া বড় হইতে চাহে।

সন্ধ্যার একটু পরে বীণাপাণি নিমন্ত্রণ হইতে ফিরিয়া আসিল। একাদশীর জ্যোৎস্না অল্প অল্প উঠিয়াছে, বাড়ীতে কেহ নাই—নীপুকে রায়-গৃহিণী ভালবাসিতেন, রাত্রের জন্য তাহাকে রাখিয়া দিয়াছেন—সকালে লোক দিয়া পাঠাইয়া দিবেন। বীণাপাণি ভাবিল স্বামী এখনও বাড়ী আসেন নাই, ততক্ষণ গা ধুইয়া ও কাপড়খানা কাচিয়া আসিয়া রান্না চড়াইয়া দিবে। পুকুরের ঘাটে যাইবার সময় দেখিল, বাগানের বেড়ার ওপারে বসিয়া স্বামী কি কাজ করিতেছেন। গা হাত ধুইয়া পুকুর হইতে উঠিবার সময় সে দেখিল স্বামী বেড়ার ধারে নাই, বোধ হয় উঠিয়া বাড়ী গিয়া হাত-পা ধুইতেছেন। বাড়ী আসিয়া দেখিল, দুয়ার যেমন তেমনই তালা লাগানো আছে—স্বামী বাড়ী নাই। ভাবিল বোধ হয় পাড়ায় কোথাও বেড়াইতে গিয়াছেন। জলের ঘড়া দালানের মুখে নামাইয়া সে ঘড়ার জলে হাত-পা ধুইয়া রকে উঠিল—কুলুঙ্গি হইতে চাবি লইয়া ঘর খুলিল, তার পর শুকনা কাপড় পরিয়া প্রদীপ জ্বালিল। জলের ঘড়া বাহির হইতে আনিয়া ভিতর হইতে দালানের দোর বন্ধ করিয়া রান্নাঘরে যাইবে, এমন সময় তাহার ব্রেসলেটের বাক্সের কথা মনে পড়িল। নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়া ব্রেসলেট খুলিয়া কেস-সুদ্ধ গহনা দালানের উপর রাখিয়াছিল, তুলিয়া রাখিবার জন্য সেখানে গিয়া বীণাপাণি দেখিল—ব্রেসলেটের কেস দালানে নাই! ভাবিল, তবে কি নীচে পড়িয়া গেল? আলো ধরিয়া দেখিল, সেখানেও নাই!

বীণাপাণির মুখ ভয়ে নীলবর্ণ হইয়া গেল। পরক্ষণেই মনে হইল বোধ হয় স্বামী ঘরে আসিয়া জিনিসটা অসাবধানে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দিয়া থাকিবেন। তাহার নিজের তোরঙ্গের চাবি নিজের কাছে—স্বামীর নিজস্ব একটা তোরঙ্গ ছিল, তাহার চাবি ছিল না, সেটা খুলিয়া দেখিল তাহাতেও নাই। এ-কুলুঙ্গি সে-কুলুঙ্গি খুঁজিল, বাক্সের উপর-নীচে দেখিল, ঘরের কোণে খুঁজিল—কোথাও নাই। গরিবের গৃহস্থালি, বাক্স-প্যাঁটরার সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। যাহা ছিল তাহার কোথাও ব্রেসলেটের কেস খুঁজিয়া পাইল না। বীণাপাণি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল—তাহা হইলে অন্য কেহ কি ঘরে ঢুকিয়া চুরি করিল? সে কথা ভাবিতেও পারিতেছিল না—ভাবিতেই তাহার বুক কেমন আড়ষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল।

চুরি গিয়াছে এ কথায় আমল না দিয়া সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল—তবে কি তাহার স্বামী কৌতুক দেখিবার জন্য গহনার বাক্স লুকাইয়া রাখিয়াছেন? নিশ্চয় তাই—নতুবা আর কে লইতে পারে?

হরিচরণের সেদিন বাড়ী ফিরিতে বেশ বিলম্ব হইল। সে কোনদিন এত রাত্রি করিয়া ফিরে না। যখন ফিরিয়া আসিল, তখন রাত অনেক। তাহার একহাঁটু ধুলিকাদা, যেন অনেক রাস্তা হাঁটিয়া আসিয়াছে। হরিচরণ ঢুকিয়াই বলিল—ওঃ, আজ যা ঘোরাঘুরি হল। সেই বেলা দুটোর সময় তুমি নেমন্তন্ন গেলেই বেরিয়েছি আর অনবরত ঘুরছি। তা তুমি এসেছ কখন?

বীণাপাণি স্বামীর কথা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল—আহা, আমি বুঝি কিছু বুঝতে পারিনি, কচি খুকি কিনা! সে তুমি বের হয়ে গেলেই আমি ধরেছি।

হরিচরণের মুখ হঠাৎ একেবারে কাগজের মত সাদা হইয়া গেল। একটু পরেই সে কথা বলিল বটে, কিন্তু সে যেন অনেক চেষ্টা করিয়া—কি বল দেখি? সত্যি বলছি আমি তো বাড়ী ছিলাম না। আমি সেই দুটোর সময়েই চলে গেছি খাজনা আদায় করতে। তুই কিসের কথা বলছিস?

তাহার স্বরে লেশমাত্র কৌতুকের আভাস ছিল না।

বীণাপাণি স্বামীর কথায় ও চোখমুখের ভাবে চিন্তিত হইল, বলিল—সেই ব্রেসলেটের বাক্স কোথায় গেল খুঁজে পাচ্ছি না। সন্ধ্যের আগে নেমন্তন্ন খেয়ে এসে দালানের ওপর রেখে গেলাম, তার পর ঘাট থেকে এসে দেখি আর নেই! তুমি সত্যি জান না? না, জান। সত্যি সত্যি বল লক্ষ্মীটি।

হরিচরণ লাফাইয়া উঠিল—অ্যাঁ, বল কি! ব্রেসলেটের বাক্স পাওয়া যাচ্ছে না? কি সর্বনাশ! অ্যাঁ! সে যে অনেক টাকার জিনিস। আমি কি করে জানব বল, আমি তো এখানে ছিলাম না। আমি কি মিথ্যে বলছি! সেই দুটোর সময় বেরিয়ে গিয়েছি—আমি তো কিছুই জানি না।

বীণাপাণি স্বামীর কথা শুনিয়া বুদ্ধি হারাইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল—বেলা দুইটার সময় বাহির হইয়া যাওয়ার কথাটা। স্বামী এত জোর করিয়া বলিতেছেন কেন? সে যে তাঁহাকে সন্ধ্যার পর বেড়ার পাশে গাবতলায় বসিয়া কঞ্চি কাটিতে দেখিয়াছে। স্বামীর আস্ফালন ও বিস্ময়ের মধ্যে একটা মিথ্যার ধ্বনি তাহার কানে আসিয়া যেন বাজিতে লাগিল।

হরিচরণ অত্যন্ত চীৎকার করিয়া হাত-পা নাড়িয়া বলিতে লাগিল—বল কি! সে তো এক-আধ টাকার জিনিস নয়; তুমিই বা সেটাকে ফেলে অমন করে যাও কেন? যাঃ—সর্বনাশ হয়ে গেল। ভাল করে ঘরদোর খুঁজেছ? চল দেখি, আমি একবার খুঁজে দেখি। ওসব মেয়েলি খোঁজার কাজ নয়—যাবে কোথায়, ঘরেই কোথাও পড়ে আছে।

বীণাপাণি দালানের মেঝেতে বসিয়া পড়িল। একটা নূতন রকমের ভয় তাহার মনের মধ্যে দেখা দিল। স্বামী মিথ্যা কথা বলিতেছে কেন? বীণাপাণি কখনও স্বামীকে অবিশ্বাস করে নাই—স্বামীর কথা এবারও সে অবিশ্বাস করিত না, যদি সে সন্ধ্যার সময় তাহাকে না দেখিত। বুদ্ধির দিক হইতে না হইলেও তাহার নারী-হৃদয়ের অনুভূতিশক্তি কেমন করিয়া বুঝিয়া ফেলিল, স্বামী প্রতারণা করিতেছে।

তাহার ভয়টা অস্পষ্ট রকমের। কিসের জন্য এ ভয় তাহা সে বুঝিল না। ব্রেসলেট তো তুচ্ছ—তাহার জন্য এ ভয় নয়। স্বামী মিথ্যা কথা বলিতেছে কেন? তবে কি—? কথাটা সে ভাবিতেও পারিল না, কিন্তু মনের মধ্যে সেকথা স্পষ্টভাবে গ্রহণ করিতে না পারিলেও একটা মহাযন্ত্রণাকর অনুভূতি মনের কোন্ গোপন তল হইতে যেন ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার কোন নির্দিষ্ট রূপ নাই—তাহা আবছায়ার মতই অস্পষ্ট, অথচ তীক্ষ্ণ ও কঠিন—রাত্রিশেষের হিমকণার মত ঠাণ্ডা তাহার গোপন সঞ্চার।

সেই তীক্ষ্ণ শৈত্য ক্রমে ক্রমে তাহার হৃৎপিণ্ডে পেঁছাইয়া সেখানকার উষ্ণ রক্তস্রোতকে যেন জমাট বাধাইয়া দিল। তাহার চোখের সামনে হরিচরণ হাঁকডাক করিয়া ঘর তোলপাড় করিতে লাগিল। বাক্সের নীচে, সিন্দুকের নীচে, চৌকির নীচে, এবং তাহা ছাড়া যত অসম্ভব স্থানে খুঁজিতে লাগিল—বীণাপাণি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। স্বামীকে কি বলিবে? একবার ভাবিল, বলে যে সে তাহাকে সন্ধ্যার সময় ঘাটে যাইবার পথে দেখিয়াছে—কিন্তু—নাঃ, ছিঃ......

সেদিন তো বটেই, পরের দিনও কাটিয়া গেল। ব্রেসলেটের কোন সন্ধান হইল না। হরিচরণ বলিতেছে যে, সে থানায় গিয়া ডায়েরি করিয়া আসিয়াছে, এখানে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিল—আর চলে না, ইত্যাদি।

শীতের সেই ঠাণ্ডা রাত্রি ধীরে ধীরে শেষ হইয়া আসিল—ভাঙা জানালার ফাঁক দিয়া চাঁদের আলো বিছানায় আসিয়া পড়িল। বিবাহের পর হইতে আজ পর্যন্ত যে মধুর

অনুভূতি তাহার মনের মধ্যে চিরজাগরিত ছিল, দুঃখে কষ্টে যাহা তাহার নীরব অবলম্বন, জানালার বাহিরের ঐ ভোরের জ্যোৎস্নার মত তাহা ধীরে ধীরে মন হইতে মিলাইয়া যাইতেছে। সংসারের শত অনটনেও মুখে যে হাসি তাহার চিরদিন ফুটিয়া থাকিত, এ কোন্ নিষ্ঠুর অপহারক তাহার সরল নারী-হৃদয়ের সে গোপন ঐশ্বর্য এক মুহূর্তে লুটিয়া লইল! আজ দশ বৎসর ধরিয়া তিল-তিল সঞ্চয়ের সে যে অমূল্য রত্নভাণ্ডার!

গাছে গাছে পাখীরা যখন জাগিয়া উঠিয়া কলরব করিতে লাগিল, বীণাপাণি বিছানা হইতে উঠিয়া তখন বাহিরে গেল। সমস্ত রাত না ঘুমাইয়া তাহার চোখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। বাঁশগাছের মাথা অন্যদিনের মত আজও ভোরের হিংগুলরাগে রাঙা, পুকুরের পথে কচি কচি দূর্বাদলে শিশিরের জলের আলো আজও রামধনুর রঙ ফলাইয়াছে—আস-শেওড়ার ঝোপের মাথায় রাঙালতার সাদা ফুলগুলি অন্যদিনের মতই নবপ্রস্ফুট; কিন্তু পৃথিবীর চেহারা একরাতেই তাহার কাছে বদলাইয়া গেল কিসে?

সমস্ত দিন কোনও রূপে কাটিল। বীণাপাণির মুখে ব্রেসলেটের সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কোন কথাই আর শোনা যায় নাই। চুপ করিয়া কলের পুতুলের মত সে সংসারের কাজ একে একে করিয়া গেল। রাত্রে শুইয়া তাহার আর ঘুম হইল না। তাহার সকল নির্ভরতা-ভরা নারীহৃদয় যেন নিষ্ঠুর আঘাতে একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে। সেদিন ভোরে যখন হরিচরণ উঠিল তখনও বীণাপাণি শুইয়া। হরিচরণ কাজে বাহির হইয়া গেল; ফিরিল যখন, দেখিল নীপু রকে বসিয়া কাঁদিতেছে। ঘরের মধ্যে গিয়া দেখিল বীণাপাণি তখনও বিছানায় শুইয়া। স্ত্রীকে গায়ে হাত দিয়া ডাকিতে গিয়া দেখিল তাহার গা জ্বরে পুড়িয়া যাইতেছে। সংজ্ঞা নাই—জ্বরের ঘোরে অঘোর-অচৈতন্য।

হঠাৎ অনুতাপের দংশনে হরিচরণের মন তীব্র বেদনায় ভরিয়া উঠিল। সেদিন সে-ই সন্ধ্যার সময় গহনা চুরি করিয়াছিল নানাদিকে দেনা ও পাওনাদারের জ্বালায় বিব্রত হইয়া। তাহার পূর্বে কয়েকদিন হইতেই তাহার স্ত্রীর ব্রেসলেট জোড়াটার উপর লোভ হয়। সেদিন সন্ধ্যাবেলা ঘরে ঢুকিয়াই সে দেখিল, দালানের উপর ব্রেসলেটের বাক্স। লোভ সামলাইতে না পারিয়া সে-ই ব্রেসলেট চুরি করিয়া রামনারায়ণপুরে এক মারোয়াড়ীর দোকানে গিয়া বিক্রয় করিল মোট সাত শত টাকায়! ভাবিয়াছিল, পরে না-হয় একদিন সব প্রকাশ করিবে।

স্ত্রীর মাথার কাছে গিয়া ডাকিল—বৌ, ও বৌ!

বীণাপাণি চোখ মেলিয়া চাহিল। চোখ জবাফুলের মত লাল! হরিচরণ পাগলের মত রামহরি ডাক্তারের বাড়ী ছুটিল। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন—জ্বরটা খুব বেশিই হয়েছে, তবে ভয়ের কোনও কারণ নেই। শিশিটা পাঠিয়ে দেবেন, ওষুধ দেব।

সেইদিন বৈকাল হইতে কিন্তু বীণাপাণির অবস্থা খুব খারাপ হইয়া উঠিল। শেষ-বেলা হইতেই ছটফট করিতে লাগিল। সন্ধ্যার পর হইতে জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকিতে লাগিল—ওগো, আমায় বললে না কেন? মুক্তোর মালাছড়াটা তোমায় এমনিই পরিয়ে দিতুম—আমি তো রাখতে চাইনি—

ডাক্তার বলিলেন—আজকের রাত আর টিকিবে কিনা সন্দেহ।

দশ-বারো বৎসর পরের কথা।

নীপু এখন বড় হইয়াছে। সে বেশ ভাল ছেলে হইয়া উঠিয়াছে। এইবার আই-এ পরীক্ষা দিবে। হরিচরণের দ্বিতীয় পক্ষের বৌ মেঘলতা তাহাকে নিজের ছেলের মতই বেশ আদরযত্ন করে। এ পক্ষে হরিচরণের আরও দুই ছেলেমেয়ে হইয়াছে। গ্রামে একখানা ছোট মুদিখানার দোকান করিয়া এখন তাহার একপ্রকার ভালই চলে। শীতের সন্ধ্যায়

চুপচাপ বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে অনেক সময় তাহার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কথা মনে পড়ে। অনেকদিন আগে রান্নাবাড়ীর উঠানে বীণাপাণি একটা ডালিমের চারা পুঁতিয়াছিল। শীতকালে যখন রাঙা রাঙা ফলের ভারে গাছটার ডালগুলি নুইয়া পড়ে, তখন ভাত খাইতে খাইতে সেদিকে চাহিয়া হরিচরণের গলায় ভাত বাধিয়া হঠাৎ বিষম লাগিয়া যায়। তাহার ছোট মেয়ে পুঁটি বলে—মা, তুমি তরকারিতে এত ঝাল দাও কেন? ঝালের চোটে বাবার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে!

ফকির

ইচু মন্ডলের আজ বেজায় সর্দি হয়েছে। ভাদ্রমাসের বর্ষণমুখর শীতল প্রভাত। তালি দেওয়া কাঁথা, ওর বৌ, তার নাম নিমি, শেষরাত্রে গায়ে দিয়ে দিয়েছিল। এমন সর্দি হয়েছে যেন মনে হচ্ছে সমস্ত শরীর ভারী। ইচু শুয়েই পা দিয়ে চালের হাঁড়িটা নেড়ে দেখলে, সেটা ওর পায়ের তলার দিকেই থাকে, হাঁড়িটাতে সামান্য কিছু চাল আছে মনে হল তার।

ইচু বললে—আজ আর জনে যাব না। একটু পানি দে দিকি।

ওর বৌ বললে—জনে যাবে না তবে চলবে কিসি?

—কেন, চাল তো রয়েছে তোর হাঁড়িতি, সজনে শাক-মাক সেদ্দ কর আর ভাত। নুন আছে?

—এট্টু অমনি পড়ে আছে মালাটার তলায়।

—তবে আর কি? পানি দে—নমাজ করি।

ইচু জল দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ওজু শেষ করে ফজরের নমাজে বসে গেল। এটি তার জীবনের অতি প্রিয় কাজ বাল্যকাল থেকেই। মজুরি করতে না যেতে পারে সে, কিন্তু নমাজ না করে সে দিনের কাজ কখনও আরম্ভ করেনি।

নিমি বললে—উঠেছ যখন, তখন জনে যাও। আজকাল যুদ্ধের বাজারি দশ আনা করে জন, অন্য সময় তিন আনা হত যে। হাঁড়িতে যদি চাল থাকতি দেখলে, তবে আর তুমি জনে যাবা না। ও ভাল না।

ইচু বললে—নমাজের সময় ঘ্যান ঘ্যান করিস নে বাপু, একটু চুপ কর।

নমাজ শেষ করে ইচু দা হাতে বেরিয়ে যেতে গিয়ে একটু থেমে বললে—খিদে পেয়েছে। কি আছে রে?

—কিছু নেই।

—দেখ না হাঁড়িটা—বড্ড খিদে পেয়েছিল।

—দুটো-কটা পানি দেওয়া ভাত পড়ে আছে, আর কিছু নেই।

—তাই দে। বেনবেলা না খেয়ে গেলি দুপুর বেলা এমন খিদে পায়, দা ধরতি হাত কাঁপে। কাজ করতি পারি নে।

শাইলিপাড়া গ্রামের পাশ দিয়েই রেল লাইন চলে গিয়েছে।

রেল লাইন পার হয়ে ফাঁকা মাঠ একদিকে, মাঠের মধ্যে বিল, ভরা ভাদ্রের বর্ষায় থৈ থৈ করছে তার জল, ধারে ধারে কাশ বনে সবে ফুল ফুটতে শুরু হয়েছে, জলে কলমি লতা জালের মত বিস্তৃত হয়ে আছে। বনখেজুর গাছের মাথায় তেলাকুচো লতার দুলুনি। টুকটুকে লাল তেলাকুচো ফল সবুজ পাতার আড়াল থেকে উঁকি মারছে। ফিঙে পাখী ঝুলছে রেলের তারে।

রামা গোয়ালা জন-মজুর নিয়ে ধান কাটছে তার নিজের জমিতে। ইচুকে দেখে বললে

—যাবা কোথায়?

—সনেকপুরের বিলি ধান কাটতি।

—কত করে জন দেচ্ছে?

—সাত সিকি করে বিঘে। তামাকের আগুন দেবা?

—নিয়ে যাও, ওই বেনা ঝোপের ধারে মালসা আছে।

—ভাত খেয়েই চলে আলাম, হাঁফ জিরুতে পারিনি। তামাক না খেলি কাজে মন বসে?

মালসা থেকে আগুন নিয়ে তামাক খেতে খেতে চলল ইচু।

ইচুর গ্রাম থেকে দু মাইল দূরে সনেকপুরের বিলে দেড়-শ দু-শ বিঘে জমিতে ভাদুই ধান পেকে গাছ শুয়ে পড়েছে। যেমন বর্ষা নেমেছে, দু-পাঁচ দিনে বিলের জল বেড়ে পাকা ধান ডুবিয়ে দেবে, তাই এবার মজুরির রেট এদিকে খুব বেশি। তার ওপর আছে মজুরদের একবেলা খোরাকি।

ইচুর বড় ভাল লাগে আল্লার কথা শুনতে। পায়রাগাছির ফকির এ অঞ্চলের মধ্যে নামজাদা সাধু। একবার ইচু তাঁকে দেখেছিল। বাল্যকাল থেকে ইচুর ঈশ্বরের দিকে কেমন এক টান। পায়রাগাছির ফকির সে টান আরও বাড়িয়ে দেন ওর। ইচু যেন কেমন হয়ে গিয়েছে তার পর থেকে। সংসারে মন দেয় না, মজুরি করে পয়সা রোজগারের দিকে বা খাওয়া-দাওয়ার দিকেও মন নেই। কাস্তে হাতে জমির ধান কাটতে কাটতে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। অনেকে ওকে তা নিয়ে খেপায়। বলে—ও ইচু, শেষকালে ফকির হবা নাকি গো? ইচু মুখে কিছু বলে না, চুপ করে থাকে। সে নিতান্ত ভালমানুষ, কারও কোন কথার প্রতিবাদ সে করতে পারে না।

মজুরির রেট নিয়ে দরাদরি করতে পারে না বলে অনেকে ওকে ঠকিয়ে কাজ আদায় করে। বিনি মজুরিতে অনেক সময় খাটিয়ে নেয়।

—ও ইচু, আমার বাড়ীর চালকুমড়োর মাচাটা তুমি থাকতে নষ্ট হয়ে যাবে?

—কেন, কি হয়েছে চাচা?

—খুঁটিগুলো সব পড়ে গিয়েছে।

—ওবেলা এসে করে দেবানি চাচা।

ইচু কথা ঠিক রাখত নিজের। যাকে যা বলবে, তা সে রাখবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করবে এটা সকলেই জানে। মহাজনে দু তিন বিশ ধান মুখের কথায় ওকে দিয়ে দিত, এ পর্যন্ত সে কারও টাকা বা ধান মেরে দেয়নি।

একবার পাশের গ্রামের মুখুজ্যেদের জমির ধান সে ভুল করে কেটে ফেলেছিল—বেশি নয়, কাঠাখানেক জমির পাকা ধান। মুখুজ্যেদের জমির পাশে তখন ওর নিজের ওটবন্দি জমি ছিল দু বিঘে। মুখুজ্যে মশায় যখন জানতে পারলেন তাঁর জমির ধান কে কেটে নিয়েছে, তখন খুব হৈ চৈ জুড়ে দিলেন। কে ধান কেটেছে সন্ধান করতে পারলেন না, কারণ সবারই তখন ধান কাটবার সময়, সকলেরই বাড়ীতে ধান—কার ধান তিনি গিয়ে ধরবেন? দিন-দুই পরে ইচু গিয়ে সন্ধ্যাবেলা তাঁর বাড়ী হাজির হল।

মুখুয্যে মশায় বললেন—কি রে ইচু, কি মনে করে?

ইচু বললে—সালাম বাবু! একটা বড্ড ভুল করে ফেলেছি!

—কি রে?

—আপনার জমির ধানডা কাঠাখানেক কেটে ফেলে ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলেলাম। তা বাবু, দেড়া সুদ দিয়ে সেই ধানডা আপনারে ফেরত দিতে চাই।

—ওঃ, তোর কাজ ইচু! আমি আকাশ-পাতাল হাতড়াচ্ছি।

—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু। সেদিন বড্ড বর্ষা, জমির আল ঠিক করতি পারলাম না। তার পর পরস্পর শুনলাম আপনার জমির ধান কে চুরি করেছে বলে আপনি খোঁজ করছেন। তখন ভাবলাম বাবুরে বলে আসি। ক্ষেতি লোকসান যখন অজান্তে করে ফেলেছি, তখন দেড়া বাড়ী সুদ দেব আপনারে।

মুখুজ্যে মশায় বিশ্বাস করলেন ওর কথা। ইচুকে অন্তত চোর বলে কেউ সন্দেহ করবে না। ইচু জন খেটে খায় বটে, কিন্তু আশেপাশে চার-পাঁচ গ্রামের লোক ওকে মনে মনে শ্রদ্ধা করে। মুখুজ্যে মশায় বললেন, তোকে সুদ দিতে হবে না ইচু, আমার ধান যা কেটেছিস ও আর ফিরিয়েও দিতে হবে না। ও তোকে দিলাম। ভুলে করে ফেলেছিস তা আর এখন কি হবে।

ইচু হাতজোড় করে বললে—তা হবে না মুখুজ্যে মশায়, ও ধান নিতি পারব না মাপ করবেন। ও ধান আমার গলা দিয়ে নামবে না। আল্লা যা আমায় হাতে তুলে দেবেন, তাই খেয়ে পরান বেঁচিয়ে রাখব—যা না দেবেন সে আমার হারাম।

মুখুজ্যে মশায় জানতেন ইচুকে। খুশী হয়ে বললেন,—যাক, দুটো চিঁড়ে নিয়ে যা, বাড়ীর মধ্যে তোর কাকীমার কাছ থেকে চেয়ে নে।

সনেকপুরের বিলে পৌঁছে ইচু দেখলে, জন-মজুর এখনও কেউ এসে পৌঁছয়নি। এটা পছন্দ করে না সে। বেশি রেটে মজুরি নেব অথচ কাজে আসব দেরি করে, মালিকের কাজে ফাঁকি দেব, এ তার ভাল লাগে না। ধান কাটে ঘড়ির কাঁটার মত। এ কাজে তার ফাঁকি নেই।

পথ-চলতি লোকে জিজ্ঞেস করে—কি ধান এটা গো?

—বেনাঝুপি।

—এবার ফসল কেমন?

—আড়াই বিশ থেকে তিন বিশ পড়তা হতি পারে।

—বিঘেয়?

—বিঘেয় না কি কাঠায়?

ইচু হা হা করে হাসে পথিকের অজ্ঞতায়। পথিকের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলে—কাঠায় আড়াই বিশ ধান ফলন হলিকি আমরা জন খেটে খাতাম গো কর্তা? হ্যা—হ্যা—হ্যা—

—বাড়ী কোথায় তোমার?

—শাইলপাড়া।

—নাম?

—ইচু মণ্ডল।

বেলা আড়াইটের গাড়ী দূরের রেল লাইন দিয়ে গড় গড় করে চলে গেল। জনমজুর-দের জন্যে জমির মালিক খাবার পাঠিয়েছে, একজন লোকে বাঁকে ঝুলিয়ে আধক্রোশ দূরবর্তী সনেকপুর গ্রাম থেকে কাঁসার জামবাটিতে সাজিয়ে এনেছে গরম ভাত, কুমড়োর ঘণ্ট ও কুচো চিংড়ি ভাজা। এ সময় ভাল খেতে দিয়ে মন খুশি করা মানে বেশি কাজ আদায় করা ওদের কাছ থেকে। জমির মালিকেরা তা জানে। আখের মণ্ডল খেতে খেতে বলে—আজ এট্টু সকাল সকাল যাব। মোর ঘরে নুন নেই—বাজার থেকে নুন না নিয়ে গেলি বাচ-কাচ খেতি পাবে না।

—নুন কনে পাবা? বাজারে কালও খোঁজ করিছি, নুন মেলে না।

—ওমা আলুনি খেয়ে খেয়ে মুখি তো পোকা পড়ে গেল।

—আর অন্ধকারে খেয়ে খেয়ে চকি ঢ্যালা বেরুল। কেরাচিনি তেলের মুখ দেখিনি কত-

কাল।

—কুমড়োর ঝালডা করেছে বেশ। সনেকপুরের এরা খেতি দেয় ভাল, পেটটা ভরি খেতি দেয়। কেরাচিনি পাবা কোথায়?

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আখের মণ্ডল দা-কাটা তামাক সাজালে কলকেতে। বেশ করে আগুন ধরিয়ে প্রবীণ রমজান মণ্ডলের হাতে দিয়ে বললে—হ্যাদে ধর চাচা।

ইচু বললে—চাচা, তোমার বয়স হল ক কুড়ি?

—তা যেবার জোড়া বন্যে হয়েল সেবার আমি গরু চরাতে পারি, তিরিশ কি চল্লিশ হল পেরায়—

কেউ বিশেষ বুঝতে পারলে না। জোড়া বন্যা কত বৎসর পূর্বে কোন্ সালে হয়েছিল কেউ জানে না। রমজানের বয়স কম হলেও সত্তর ছাড়িয়েছে। যখন সে গরু চরায় তখন এরা কেউ জন্মায় নি। সংখ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান এদের নিতান্তই সীমাবদ্ধ।

বেলা যায় যায়। পাঁচটার গাড়ী গড় গড় করে মাদলার বিলের ওপর দিয়ে চলে গেল। ঝিঙের ক্ষেতে ফুল ফুটেছে সনেকপুরের মাঠে। নোয়ালি সর্দার জাতে বুনো, সনেকপুরের মধ্যে অবস্থাপন্ন, গরুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে গ্রাম্যপথ ধরে। ইচু সন্ধ্যার নমাজ শেষ করে উঠতেই বেড়ার ধার থেকে নোয়ালি সর্দার বললে—ও ইচু, কাল আমায় জন দিতি পারবা?

—না গো।

—কেন?

—সনেকপুরওয়ালাদের বিলির ধান কাটা হচ্ছে।

—চল আমার বাড়ী, তামুক খেয়ে যাবা।

রমজান মণ্ডলকে ইচু ডাক দিলে।—ও চাচা, সর্দারের বাড়ী তামুক খাবা চল।

নোয়ালি সর্দারের তামুক খাওয়ানোর আসল উদ্দেশ্য মজুরির রেট সম্বন্ধে দর-দস্তুর করা। ইচু রমজানের পুত্রের বয়সী—সুতরাং দরদস্তুর সম্বন্ধে রমজান নেতা হয়ে কথাবার্তা চালালে।

—সাত সিকের কম পারব নি গো, এতে তুমি রাগ করো না সর্দার।

—রমজান চাচা, তার চেয়ে আমার গলায় পা দিয়ে মেরে ফেল না কেন?

—অনেয্য তো কিছু বলছি নে।

—অনেয্য নয় চাচা? যা ছেল চোদ্দ আনা তাই সাত সিকে? এট্টা ভেবে চিন্তে কথা বল। পাঁচ সিকে কর, আর চাল ডাল মাছ পেটিয়ে দেবানি তোমরা রান্না করে খেয়ো। মোদের রান্না তো তোমরা খাবা না। আমার পুকুরি এবার এই এত বড় বড় চ্যাং মাছ—

নোয়ালি সর্দার হাত দিয়ে কাল্পনিক মৎস্যের দৈর্ঘ্য নির্দেশ করলে, যদি লোভ দেখিয়ে এদের কাজে টানা যায়।

রমজান ঘাড় নেড়ে বললে—ও হবে না সর্দার। সাত সিকের কম করলি—

—আর এক কলকে ধরাও চাচা! হ্যাদে, গাছের জালি শসা গোটাকতক নিয়ে যাও। দুজনে খেয়ো।

—শসা পুঁতেছিলে? মাচার শসা, না মেঠো?

—মেঠো কোথায় পাব চাচা, এই উঠোনটাতে মাচা করে দিয়েলাম—সিম বরবটি শসা—কিনে খাবার তো ক্ষ্যামতা নেই মোদের, তরিতরকারির আগুন দাম।

—সে কথা আর বলো না। হাটে বাগুন কেনতাম পয়সায় দু সের তিন সের—তাই এখন বলে আট আনা সের। খাদ্য-খাদক উঠে গেল। ঝিঙে আছে?

—তা তোমার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে—দুটো কটা দেবানি তুলে, খেয়ো।
—যাক গে, পাঁচ সিকেই দিও সর্দার, কারও কাছে পেরকাশ করো না যেন এ কথা।

ইচু ও রমজান তামাক খেয়ে ঝিঙে ও শসা নিয়ে উঠে চলে এল। নোয়ালি সর্দারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। সে জানে রমজান জন-মজুরের নেতা, ওর কথায় দরদস্তুর ঠিক ঠিক হয়। ওকে খুশি রাখলেই হোল।

ইচুর বাড়ী ফিরতে রাত হয়ে গেল। নিমিকে বললে—ভাত রেঁধেছিস?

—এ বেলা শরীরডে খারাপ। পানি দেওয়া ভাত আছে, খাও।

—তরকারি?

—কিছু নেই।

—এই ঝিঙে কটা রেঁধে দে।

—রাঁধব কি দিয়ে, তেল কনে? পাঁচ পলা ধার করে এনেলাম আছিরন বিবির কাছ থে। এখনও শোধ দিতি পারিনি—আবার কি ধার করতি ছোটব?

—পোড়া?

নিমি খিল খিল করে হেসে উঠে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বললে—ও মা, মুই কনে যাবা গো! ঝিঙে পোড়া কেউ কখনও শুনিনি। খেতি পারিবা না।

—পারব পারব। দে তুই।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হোল পাকাটির আলো জেবলে। তেল নেই। অন্ধকার ঘরদোর। কে আসে, কে যায়, কিছু বোঝা যায় না। কচুঝাড়ে কেয়োঝাঁকার ঝোপে জোনাকি জবলছে, উঁচু-নীচু—উঁচু-নীচু। দেবতা ঝিলিক মারছে, রাত্রে বৃষ্টি হবে বোধ হয়। ভাদ্রের গুমট গরম। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পরে ইচু যেমন মাদুর পেতে শুয়ে পড়েছে তখনই রাজ্যের ঘুম এসেছে ওর চোখে। আর জ্ঞান নেই।

কতক্ষণ পরে সে জানে না, লোকজনের গোলমালে ইচু শেখের ঘুম ভাঙল। অনেক লোকের গলা বাইরে। ওরই বাড়ীর উঠোনে।

—ব্যাপারখানা কি?

পাড়ার মোড়ল হাফেজ বুড়োর গলা—ও ইচু, ইচু বাড়ী আছ?

বছিরদ্দি শেখ ডাকছে—ও ইচু, বলি ওঠ—শোন ইদিকি।

ভোর সবে হয়েছে। কাক-পক্ষী ডাকতে শুরু করেছে। ইচু ধড়মড় করে উঠে বসে চোখ মুছলে। ফজরের নমাজের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু এত লোক ওর উঠোনে কেন? তাকে ডাকাডাকিই বা কিসের এত সকালে। বাইরে এসে ঘুমচোখে উঠোনের দিকে চেয়ে ও অবাক হয়ে গেল। পাড়াসুদ্ধ মানুষ সব ওর উঠোনে। সে বিস্মিত সুরে বললে—কি হয়েছে গা মোড়লের পো?

বুড়ো হাফেজ মণ্ডল বললে—ইদিক এস।

—আগে নমাজটা করে নিই—দেরি হয়ে গিয়েছে।

ইচু ঘরের পেছনের নমাজ সেরে নিয়ে আবার সামনে এল। সবাই ওর দিকে একসঙ্গে এগিয়ে এল। সবাই মিলে যেন একসঙ্গে ওকে কি বলতে চায়। ইচু ক্রমেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে, ওর বুকের ভেতর ঢিপ ঢিপ করছে। ভয়ও হয়েছে ওর, নিমি এ সময়ে কোথায় গেল? হয়েছে কি?

অন্য সবাইকে থামিয়ে দিয়ে হাফেজ বললে—এস মোর সঙ্গে।

ইচ্নু শেখ ওদের পেছনে পেছনে কলের পুতুলের মত চলল। রেল লাইনের দিকে সকলেই যাচ্ছে। নাবাল ক্ষেতের একহাঁটু জল পার হয়ে সবাই রেল লাইনে উঠল। একটা খেজুর ঝোপের আড়ালে রেল লাইনের ওপর উঠে সবাই দাঁড়াল থমকে। হাফেজ ডেকে বললে—এখানে এস।

কি ব্যাপার? ইচ্নু এগিয়ে যা দেখলে তাতে তার মাথা ঘুরে গেল, সে নিজেকে পড়তে পড়তে সামলে নিলে। রেল লাইনের ওপরে একটা রক্তাক্ত মৃতদেহ—গলা সামনের দিকে গভীরভাবে কাটা, দেহের সঙ্গে একটি অস্বাভাবিক কোণের সৃষ্টি করে চিৎ হয়ে পড়ে আছে।

মৃতদেহ নিমির।

তার পর তার ভাল কিছু মনে পড়ে না। গ্রামের লোকে মিলে তাকে কত কিছু প্রশ্ন করতে লাগল। সে কোথায় ছিল, নিমি কতক্ষণ ঘরে ছিল, নানা প্রশ্ন। নিমি রেলে গলা দিয়ে মরেনি, তাকে নাকি খুন করে টেনে এনে রেলে শুইয়ে রাখা হয়েছে। তার চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। ইচ্নু বুঝতে পারলে তার ওপর অনেক সন্দেহ এসে পড়েছে। পাশের গাঁয়ে দফাদারদের সংবাদ দিতে লোক যাবে এখুনি, তার আগে ইচ্নুকে একবার জিজ্ঞেস করা দরকার, সে কোথায় ছিল তা জানা দরকার, সেইজন্যই গ্রামের লোক তার বাড়ীতে গিয়ে ডাকাডাকি করছিল।

ইচ্নু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে বললে—মুই কিছু বলতি পারি নে চাচা. আল্লা জানে। মুই মড়ার মত ঘুমুতি নেগেলাম।

—বউরি কিছু বলেলে? ঝগড়া হয়েল?

—কিছু না চাচা।

—বউ ঘরে শুয়েল?

ইচ্নুর মনে একটা ভয়ানক সন্দেহ উঁকি মারলে। এ প্রশ্ন করে কেন লোকে? বছিরুদ্দি শেখ এগিয়ে এসে ওকে উঠিয়ে বললে—মোর কথা সবাই শোন। ইচ্নু সে রকম লোক নয়। চল এখুনি বনগাঁয়ে ওকে নিয়ে মোক্তার বাবুদের কাছে। বিহিত কথা তাঁরা বলবে, তাঁদের পরামর্শটা লেওয়া দরকার। এখানে থাকলি এখুনি দফাদার এসে ওকে বাঁধবে। তার আগে চল মোরা ছ সাত জন ওকে নিয়ে বনগাঁয়ে যাই। পরামর্শ লিয়ে ফেলি। পুলিশ গ্রেপ্তার করবার আগেই। কে কে যাবা?

দেখা গেল প্রায় সকলেই যেতে চায়।

ইচ্নু ভগ্নস্বরে বলে—কিন্তু উকিল মোক্তার বাবুদের ট্যাকা মুই কন থে দেব? মোর হাতে একটা ট্যাকা আছে কালকার জনের দরুন। তাতে হবে?

হাফেজ বললে—ট্যাকার জন্যি তোমার ভাবনা হচ্ছে কেন। তোমার জান যদি বাঁচে কত ট্যাকা হবে। সে ভাবনা মোদের। তুমি চল দিনি। কি বল বছিরুদ্দি?

বছিরুদ্দি বললে—তা নিচ্চয়। টাকার জন্যি তুমি ভেবো না। সে মোরা দ্যাখব।

হাফেজ বললে—রেল লাইন ধরে চল যাওয়া যাক। সোজা রাস্তা দিয়ে গেলি পুলিশ ধরবে।

বেলা সাড়ে সাতটার মধ্যেই ওরা বনগ্রামের বড় মোক্তার রামলাল চাটুজ্যে মশায়ের বাসায় পৌঁছে গেল। রামলালবাবু বেশিক্ষণ ওঠেননি. সেরেস্তায় বসেই চা খাচ্ছেন এবং মুহুরী দুলাল চক্রবর্তীকে বিলম্ব করে আসার জন্যে তিরস্কার করছেন—কাল চলে গেলে কাছারি থেকে বাড়ী, জামিননামা দুটো সই করাতে হবে. তোমার সে খেয়াল থাকে না। এখন এলে আটটার সময়—এমন করলে কি করে আমি কাজ চালাই? ওদের দরখাস্তের নকল নেওয়া হয়েছে?

—আজ্ঞে, নকলের জন্যে দরখাস্ত করা হয়েছে। কাল বিনয়বাবু সকাল সকাল চলে গিয়েছিল, দেখা পাইনি।

—সকালে কাছারিতে গিয়ে আজ নকল দুখানা বার করে ফেল আগে—নইলে জেরাই হবে না। কে? কেথেকে আসা হচ্ছে?

হাফেজ মণ্ডল এগিয়ে এসে নীচু হয়ে ডান হাত তুলে কপালে ঠেকিয়ে বললে—সালাম, বাবু।

—কি ব্যাপার? বাড়ী কোথায়?

হাফেজ মণ্ডল বললে—বিপদে পড়ে অ্যালাম বাবুর কাছে। বড্ড বিপদে পড়ে গিয়েছি। খুনের ফ্যাসাদ।

রামলালবাবু প্রবীণ মোক্তার। মোক্তারী ব্যবসায় চুল পাকিয়েছেন—শক্ত কেসে লোক যখন পড়ে, তখন দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে পয়সা খরচ করে, ধীরভাবে সে পয়সা আদায় করতে হয়। সুতরাং একটা সিগারেট ধরিয়ে (প্রবীণ হলেও রামলালবাবু তামাক খান না, সিগারেটখোর) আরাম করে টান দিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন—খুন? কি রকম খুন?

হাফেজ ইচুর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—এই লোকের বৌ গলা কাটা অবস্থায় কাল রাতে রেল লাইনে পাওয়া গিয়েছে।

—ওর নাম কি?

—ইচু।

—ও রাত্রে কোথায় ছিল?

—বাড়ীতেই শুয়ে ছিল বাবু।

—বৌ-এর স্বভাবচরিত্র কেমন?

হাফেজ চুপ করে রইল। সে প্রবীণ লোক, গ্রামের মোড়ল—তার মুখ দিয়ে আর ও কথা বার হয় কেন? বছিরদ্দি শেখ পাশ থেকে ঈষৎ গলা খাঁকার দিয়ে বললে—বাবু, ভাল না।

ইচু অবাক হয়ে বছিরদ্দির মুখের দিকে চেয়ে রইল। নিমির স্বভাবচরিত্র ভাল ছিল না? কই, একদিনও তো সে কিছু জানে না! সে নিমির স্বামী, সে-ই কেবল জানে না, আর সবাই জানে!

হাফেজ চুপ করেই রইল। বছিরদ্দি বলে যেতে লাগল—বাবু, এ লোক বড্ড ভাল-মানুষ—নিরীহ ভালমানুষ। ও কিচ্ছু জানে না এসব কথা। খুনও ও করেনি।

রামলাল মোক্তার বাধা দিয়ে ধমকের সুরে বললেন—তুমি কি করে জানলে? তোমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে লোকে খুন করবে নাকি? যা তুমি জান তাই বল; যা জান না তা নিয়ে জ্যাঠামি করো না। যাও বস ওখানে।

পরে হাফেজের দিকে চেয়ে বললেন—তুমি কি জান বল মোড়ল।

বছিরদ্দির অবস্থা-বিপর্যয়ে হাফেজ একটু ভয় খেয়ে গেল। সমীহ করে সংযত হয়ে বললে—আজ্ঞে বাবু যা বলছেন, অতি লেহ্য কথা। তবে ইচু আমাদের লোক ভাল। সবাই এ কথা জানে। আপনি সব লোককে জিজ্ঞেস কর, সবাই একথা বলবে।

রামলালবাবু সিগারেটে টান দিয়ে বললেন—ঘটনা বল।

হাফেজ ঘটনা বর্ণনা করলে। ইচু মণ্ডলের মুখে যা সে শুনেছে। জন খেটে এসে অঘোরে ঘুমুচ্ছিল, সবাই গিয়ে ডেকে ওর ঘুম ভাঙায়। ও বলেছিল, রাত্রে ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়ে ছিল, কি হয়েছে না হয়েছে কিছু জানে না। শোবার আগে ওর স্ত্রী ওকে ভাত খেতে দিয়েছিল। ঝগড়া-বিবাদ হয়নি।

—আত্মহত্যা নয়?

—না বাবু। গলায় অস্তরের দাগ দেখলিই বোঝা যায়। গলা কেটে রেল লাইনি ফেলে রেখোছল।

রামলালবাবু বললেন—অন্তত তাই প্রিজামশন হবে। পুলিশেও তাই বলবে। লাশ দেখে কে আগে?

—বাবু, মোর ভাই আর নবি শেখ সকালে রেল লাইনির ধারে নালায় মাছ ধরতি যাচ্ছিল, তারাই দেখতি পায়। পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে আমারে খবর দেয়। মুই তখনি দৌড়লাম লাইনির ধারে।

—আচ্ছা আচ্ছা বুঝেছি, থাক। সুরতহাল আগে হয়ে যাক, তার পরে দেখা যাবে। গ্রামের দফাদারকে খবর দিয়ে এসেছ তো? বেশ করেছ। বড্ড শক্ত কেস। সন্দেহ গিয়ে ইচু মন্ডলের উপরই পড়বে। বৌ-এর স্বভাবচরিত্র খারাপ ছিল। ভালমানুষ লোক হঠাৎ রেগে উঠলে এসব ক্ষেত্রে ভয়ানক হয়ে ওঠে কিনা। তোমরা লুকিয়ে চলে এসেছ?

—হ্যাঁ বাবু।

—একটা কথা শিখিয়ে দিই। ইচু?

ইচু এগিয়ে গিয়ে সেলাম করে দাঁড়াল। তার পা-দুটো ঈষৎ কাঁপছে।

—বলি শোন। তুমি খুন করেছ কি না করেছ তা আমি তোমায় জিজ্ঞেস করব না। আমাদের তা কাজ নয়। আমরা ধরে নেব তুমি খুন করনি। কিন্তু পুলিশে তা শুনবে না। তোমাকে আজ সম্ভব রাস্তায় যেতে যেতেই গ্রেপ্তার করবে। তোমায় স্বীকার করাবার জন্যে নানারকম চেষ্টা হবে। কিন্তু কিছুতেই তুমি বলো না যে তুমি খুন করেছ। স্বীকার কিছুতেই করবে না। করেই থাক বা না-ই করে থাক। বুঝলে? যাও, সাবধানে যাও।

হাফেজ বললে বাবু, পুলিশি ধরলি রাখবে কনে ওরে?

—রাখবে হাজতে। যতদিন না বিচার শেষ হয়। তবে এখানে শেষ বিচার হবে না—দোষী প্রমাণ হলে দায়রায় চালান হবে যশোরে। সেখানে জজসাহেব বিচার করবে। বাড়ী গিয়ে পয়সা-কড়ি যোগাড় কর গিয়ে—বড্ড ফ্যাসাদে পড়ে গিয়েছ—অনেক টাকার খেলা।

হাফেজ ও বছিরদ্দি সব শুনে যেন মাটির মধ্যে বসে গেল। বনগাঁয়ে মোক্তারবাবুর টাকাই যোগাড় হয় না, আবার যশোর জেলায় কোর্টের উকিলবাবুদের টাকা গরিব গ্রামের লোকের চাঁদায় কি যোগাড় হয়ে উঠবে? ইচুকে বাঁচানো মুশকিল হয়ে উঠল।

এতক্ষণ পরে ইচু কথা বললে। এতক্ষণ সে একটি কথাও বলেনি। এইবার সে হাত জোড় করে বললে—বাবু, মোর একটি কথা বলবার আছে।

ওর মুখের দিকে সবাই চাইলে। মোক্তারবাবুও চাইলেন। এইবার বোধহয় সব প্রকাশ করতে চাইছে লোকটা। এই রকম ভাবেই বলে, তিনি জানেন। হাফেজ ও বছিরদ্দি মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। কি জানি ওর পেটে কি আছে। মানুষকে সব সময়ে বাইরে থেকে চেনা যায় না।

রামলাল মোক্তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলেন। ভাবটা এই রকম—বলে ফেল বাপু যা আছে পেটে। অমন অনেক ঘুঘুই আমরা দেখলাম, তুমি এখন বাকি আছে।

ইচু রামলালবাবুর পা-দুটো জড়িয়ে ধরে বললে—বাবু, মোর একটা দরবার আছে। যাতে হয় আপনি তা দেখবেন—মুই গরিব লোক, জন খেটে খাই, আপনার পয়সা হয়তো মুই দিতি পারব না, গরিব বলে দয়া করে আবদার রাখবেন মোর—আল্লা, দিন-দুনিয়ার মালিক, আপনার ভাল করবে।

—আহা-হা, পা ছুঁয়ো না—কি—কি বল—

—বাবু, যেখানে মোরে রাখে, ঝা করে ক্ষেতি নেই। কিন্তু বাবু, আপনি এইটে তাদের বলে দেবেন, ব্যবস্থা করে ঝেন পাঁচ-ওক্ত নমাজ আমি সেখানে পড়তি পারি—আর কিছু আমার বলবার নেই বাবু।

রামলালবাবুর সেরেস্তায় বজ্রপাত হলেও লোকে অতটা চকিত হোত না (সেকালের নভেলের বর্ণনা অনুযায়ী)। হাফেজ ও বছিরদ্দি আবার পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। ঘুঘু মোক্তার রামলাল চাটুজ্যে হাঁ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। এ রকম কথা এ সময় তিনি সামান্য একজন গ্রাম্য লোকের মুখ থেকে আশা করেননি, যে খুনের দায়ে আজ পথেই হয়তো পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হবে, আজ বাদে কাল যাকে দায়রায় চালান দেওয়া হবে—শত অসুবিধা, অর্থনাশ, নির্যাতন যার সামনে, আর আইনের খাঁড়া যার মাথার ওপর ঝুলছে—নিষ্ঠুর নিয়তির হৃদয়হীন রক্তাক্ত ইঙ্গিতের মত।

রামলালবাবুই সেদিন বার লাইব্রেরিতে গিয়ে গল্প করেছিলেন—সত্য অবাক হয়ে গেলাম ভায়া, যখন লোকটা ও কথা বললে। আজ যাকে পথেই অ্যারেস্ট করবে পুলিশে, কাল পুরবে হাজতে, যার সব যেতে বসেছে—সে যে ওই ধরনের রিকোয়েস্ট করতে পারে তা আমার মাথায় আসেনি! আমি আগে ভেবেছিলাম বুঝি কনফেস করবে। সামান্য একজন লোক—আমার চোখে জল এসে পড়ল ভায়া।

ওরা সব চলে গেল। ইচু শেখকে ওরা বাজার থেকে পেটভরে তেলেভাজা সিঙাড়া কচুরি আর মুড়ি খাওয়ালে। হাফেজ বললে—ওরে চাড্ডি হোটেলের ভাত খাইয়ে নিলি হোত। পুলিশি ধরলি কোথায় নিয়ে যাবে, আজ খাওয়া হবে কি না ঠিক তো নেই।

কিন্তু অত সকালে হোটেলে ভাত পাওয়া গেল না।

রাস্তা চলতে লাগল সবাই। দুপুরের কিছু দেরি আছে, ইচু পথের পাশে এক বটতলার ছায়ায় নমাজ পড়তে বসল। আর কোন কথা ওর মনে থাকে না। ঝিরঝিরে হাওয়ায় আজ পথের ধারের গাছতলায় অপূর্ব আনন্দ ও শান্তি নেমে আসে প্রাণে নমাজের সময়। সে সব ভুলে যায়। চোখে যেন জল আসে। নিমি কত ভাত রেঁধে দিয়েছে—কত আদর-যত্ন করেছে। তার চরিত্র খারাপ ছিল? সে কিছু জানে না। নিমির জন্যে বুকের মধ্যে একটা বেদনা। নিমিকে সে খুন করবে? কাউকে কখনও খুন করার কথা তার মনে আসেনি। আল্লা সাক্ষী আছেন সব কাজের। ভয় কি? মালিক যা করবেন তাই হবে।

রাস্তায় ওকে পুলিশে ধরলে না। বেলা দুটোর সময় বাড়ী ফিরে ওরা দেখলে পুলিশ দফাদার অপেক্ষা করছে ওদের পাড়ার বড় মোড়লের বাড়ী। লোক গিজগিজ করছে। ডাকহাঁক, সাক্ষীর জবানবন্দি হতে বিকেল হয়ে গেল। শাইলিপাড়া গ্রামের সবাই একবাক্যে দারোগার সামনে বললে ইচুর দ্বারা এ খুন হয়েছে তারা কেউ বিশ্বাস করে না। জবানবন্দিতে আরও প্রকাশ পেল। ইচুর স্ত্রী নিমি প্রায়ই রাত্রে স্বামীকে ঘুম পাড়িয়ে বাড়ী থেকে বেরুত। গ্রামের মধ্যে তার প্রেমিকের অভাব ছিল না। প্রেমের প্রতি-দ্বন্দ্বিতাও চলত। দারোগা ইচুকে সামনে ডাকিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করলেন। শেষে বললেন—তুমি কিছু জানতে না যে, তোমার স্ত্রীর চরিত্র খারাপ?

—না, দারোগাবাবু। কিছু জানি নে মুই।

—জান এতে চালান দিলে তোমার ফাঁসি হতে পারে?

—আল্লার ঝদি তাই মর্জি হয়, মোর মনে একটুকু খেদ থাকবে না দারোগাবাবু—তেনার ঝা মর্জি তাই তিনি করুক। মুই খুশি ছাড়া অখুশি হব না।

বুড়ো হাফেজ মন্ডল এগিয়ে এসে দৃঢ়কণ্ঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে—কাকে কি বলছেন বাবু? আল্লার কথা উঠলি ওর চোখ দিয়ে পানি পড়ে। অমন লোক এ দিগরে

নেই।

দারোগাবাবু বললেন—তুমি কাল রাত্রে কোথায় ছিলে?

—ঘরেই শুয়ে ছেলাম। মড়ার মত ঘুম এসেছে চকি, সনেকপুরের বিলি জন খাটেলাম সারাদিন। ওনারা ডাকলে সকালবেলা, তখন মুই ঘুম ভেঙে উঠি।

দারোগাবাবু অভিজ্ঞ লোক, পুলিশের চাকরি অনেকদিন করছেন। কে সাধু কে বদমাইস চেনেন. ইচুর দ্বারা এ কাজ হয়নি ওর মুখের দিকে চেয়ে তখনই বিদ্যুতের লেখা বাণীর মত তাঁর মনের মধ্যে এ সত্য উদয় হোল।

সেই সন্ধ্যায় ইচু নমাজ সেরে ভাঙা খালি ঘরে ঢুকতেই ওর প্রাণটা হা হা করে উঠল।

—নিমি, ও নিমি, মোরে ভাত এনে দে!

সে আপন মনেই ডাকল। নিমিকে সে কত ভালবাসত, যে যা বলে ওসব সে বিশ্বাস করে না। বিচার করবার সে কেউ নয়। নিমিকে সে ক্ষমা করেছে।

—নিমি, ও নিমি, মোরে ভাত এনে দিলি নে?

পরদিন গ্রামের লোক সকালে উঠে ইচুকে আর তার ঘরে দেখতে পেলে না সে এক-বস্ত্রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছে কখন। গৃহস্থালির কলসী, হাঁড়িকুড়ি, নারকোলের মালা, দু-একখানা পিতলের ঘটিবাটি সব ফেলে রেখে গিয়েছে।

খলসেখালি গ্রামের প্রান্তে নদীতীরে তেঁতুলগাছের তলায় পর্ণকুটিরে একজন ফকির কোথা থেকে এসেছে। সন্ধ্যায় আকাশের নীলপটে মেঘের রচনার সঙ্গে সঙ্গে সে খেজুর-চটা বিছিয়ে নদীর ধারে যখন নমাজ পড়ে, তখন লোকে সবিস্ময়ে তার মুখে দেখেছে এক অদ্ভুত আলো, প্রভাতী তারার মৃদু জ্যোৎস্নার মত। এক সন্ধ্যা ভিক্ষাই তার উপজীবিকা। সবাই ওকে মানে, ভক্তি করে। নাম ওর ইচু ফকির।

সুলোচনার কাহিনী

১

সন্ধ্যা হইয়াছে, সুকিয়া স্ট্রীট দিয়া যাইতেছি। ডাক্তারখানা খুলিতে দেরি হইয়া গিয়াছে, সময় হইয়া আসিল, সুতরাং হন হন করিয়াই চলিয়াছি—এমন সময়ে বাড়ীঘরের থামের ছায়ার আলো-আঁধারির মধ্যে একটি স্ত্রীলোককে দেখিয়াই আমি থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলাম।

এ যেন সেই সুলোচনার মা না? অবিকল সেই রকম দেখিতে, যদিও বহুকাল দেখি নাই। কিন্তু তাও কি সম্ভব? এতকাল পরে সুলোচনার মা বাঁচিয়া থাকিবে এবং কলিকাতা শহরেই থাকিবে?

একটু জোরগলায় ডাক দিলাম—শুনছেন? শুনছেন? বলি শুনছেন—এই যে! যে বৃদ্ধাটি ফিরিয়া দাঁড়াইল আমার ডাক শুনিয়া এবং হয়তো বা তাহাকেই কেহ ডাকিতেছে মনে করিয়া—বিস্ময়ের সহিত দেখিলাম সে সুলোচনার মা-ই বটে।

সুলোচনার মা কাছে আসিল। প্রথমে চিনিতে পারিল না, পরে পরিচয় দিতেই দন্ত-হীন মুখে এক গাল হাসিয়া বলিল—ও তুমি যদু! আহা কতকাল দেখিনি তোমাদের!—ইত্যাদি বা ঐ ধরনের কোন উক্তি।

আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের যবনিকা হঠাৎ সরিয়া গেল। গত মহাযুদ্ধেরও কয়েক বৎসর পূর্বের কলিকাতা······ঘোড়ার ট্রাম সবে মাত্র বন্ধ হইয়াছে ······তখনকার আমলের অতি সুন্দরী আধুনিকাদের মধ্যে যে আমার চোখে সর্বপ্রধান

সুন্দরী এবং সবচেয়ে আধুনিকা ছিল, কিছুকাল পরে যাহাকে জীবনে জনসমুদ্রে একদম হারাইয়া ফেলি,—সেই মেয়েটির মা।

তখনকার মেয়েদের চুল বাঁধিবার রীতি বা কাপড়-চোপড় পরিবার ধরন একালের মত ছিল না বটে, কিন্তু সত্যিকার সুন্দরী যে হয়, তাহাকে যে-কোন সাজে, যে-কোন ঢঙে, যে-কোন ভঙ্গিতে মানায়, এবং সুলোচনা ছিল সেই ধরনের সুন্দরী মেয়ে। তাহার সেই দীর্ঘ ঋজু চম্পকগৌর যৌবনদীপ্ত দেহ, লম্বা টানা কালো কালো ডাগর চোখ, কালো কোঁকড়া চুলের রাশি, নিটোল সুগঠিত বাহু দুটি, সুন্দর মুখশ্রী কলিকাতার পথেঘাটে, গলির আড়ালে আবডালে, পথের বাঁকে হঠাৎ ফিরিয়াই, কিম্বা কোন নির্জন পার্কে পাদ-চারণরত অবস্থায় কত দিন কল্পনানেত্রে দেখিতাম ; দেশে ফিরিয়া কত বর্ষণমুখর শ্রাবণ বা ভাদ্র রজনীতে এক-ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া প্রথম-যৌবনের রঙিন নেশায় যাহার মুখ কত বার মনে পড়িত—সেই সুলোচনার কোন খবর পাই নাই আজ এত বছর, ধীরে ধীরে কবে সে বিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছিল……আবার পুরানো যুগের সেই মেয়েটি ১৯৩০ সালের কলিকাতায় কোথা হইতে ফিরিয়া আসিল।

একটি প্রেমের কাহিনী। তবে সে প্রেমের নায়ক আমি নই, গোড়াতেই কথাটা বলিয়া রাখা ভাল। সব যুগেই মেয়েরা যেমন ভালবাসে, ভালবাসিয়া কষ্ট পায়, মুখ বুজিয়া সহ্য করে, তিলে তিলে নির্বোধের মত নিজের দেহ ক্ষয় করে, দুশ্চিন্তায়, দুর্ভাবনায়……অত রূপ লইয়াও সুলোচনা সে-দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি পায় নাই জানিতাম, তাই পরবর্তী সময়ে মেয়েদের যখন ভাল করিয়া জানিয়াছিলাম ও বুঝিয়াছিলাম তখন সেকালের তরুণী প্রেমিকা সুলোচনার জন্য মাঝে মাঝে মনটা কেমন করিয়া উঠিত।

যাক এখন সে-সব কথা। বর্তমানের কথাই আবার বলি।

সুলোচনার মা অত্যন্ত বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছে, আজ দেখিয়াই বুঝিলাম। কিন্তু সুলোচনার মা ভিক্ষা করিতেছেন কেন? সুলোচনা কোথায়? কারণ ভিক্ষাই সে করিতে-ছিল। থামের পার্শে দাঁড়াইয়া রাস্তার লোকের কাছে দু-একটি পয়সা চাহিতেছিল আমি লক্ষ্য করিয়াছি।

আমাকে পূর্বপরিচিত বলিয়া বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধা একটু সংকুচিত হইয়া পড়িল। তাহার সে-ভাবটা কাটাইয়া দিবার জন্য বলিলাম—এখানেই কোথাও বাসা বুঝি? দোকানে জিনিস কিনতে এসেছিলেন?—ভাল আছেন?

—আর বাবা, ভাল আর মন্দ! তুমিও যেমন!

কথাটা ভাল লাগিল না, সুতরাং যে প্রশ্নটি এতক্ষণ করিতে বাধ-বাধ ঠেকিতেছিল, সেটা করিয়া ফেলিলাম। ভাবিয়া দেখিলাম সুলোচনার বয়স এখন হিসাবমত প্রায় চল্লিশ-বিয়াল্লিশ—সুতরাং তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতে সংকোচের কারণ কি আছে? সে এখন আর ব্রীড়াবনতা সুন্দরী কিশোরী প্রণয়িনী নয় কারও।

—ইয়ে,—গিয়ে—সু—আপনার মেয়ে কোথায়?

—তাই তো বলছি বাবা, সে কি আর আছে? সে থাকলে আমার আজ এই…… বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি এ উত্তরের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। অপ্রতিভের মত বলিলাম—ও!……

দু-জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। পরে আমিই বলিলাম—আজকাল আছেন কোথায়?

—রাস্তায়—গবর্নমেণ্টের রাস্তায়।

সবই বুঝিলাম। বড় কষ্ট হইল এ-কথা বলিলে ঠিক কথা বলা হইবে না। কষ্ট হইলেও বুড়ীর জন্য হয় নাই। বুড়ীকে কিছু পয়সা দিয়া বিদায় করিয়া দিব ভাবিতেছি

এমন সময়ে সে বলিল—তোমার সঙ্গে দেখা হোল বড় ভাল হোল বাবা। আমার ঘাড়ে সব ফেলে দিয়ে হতভাগী তো পালাল, এখন তার দুটি ছেলে, একটির বয়েস ষোল আর একটি চোদ্দ, এদের নিয়ে আমার কি দুর্দশা ভাব দিকি এ বয়সে! একটা ঘরে আছি—এখনই ভাড়া দিতে না পারলে তাড়িয়ে দেবে বলেছে। তাই বলছি রাস্তা ছাড়া এখন যাব কোথায়?

—সুলোচনা কত দিন মারা গিয়েছে?

—এই চোদ্দ বছর। ঐ কোলের ছেলেটি যখন দু-মাসের—সেই থেকে মানুষ করছি।

আমার হঠাৎ একটি কথা মনে হইল। সুলোচনাকে আমি জানিতাম বটে, কিন্তু তার আসল ইতিহাস আমার কাছে রহস্যাবৃত ছিল। আমি খানিকটা বুঝিতাম, খানিকটা বুঝিতাম না—তাহার আর একটা কারণ, আমার বয়সও তখন কম ছিল। রূপসী সুলোচনা আমার কাছে চিরদিন নারীত্বের গহন রহস্যে প্রতীক হইয়া আছে। এই উত্তম সুযোগ। বড় কৌতূহল হইল উহার মায়ের মুখে তাহার ইতিহাস সব শুনিব।

বৃদ্ধাকে বলিলাম—আপনি শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বসে থাকবেন কাল বিকেল পাঁচটার সময়—আমি আসব। বাড়ীভাড়ার ব্যবস্থা যা হয় করা যাবে।

বুড়ী ছাড়িল না, তাহার বাসা দেখিতে হইবে এখনই। অগত্যা গেলাম। বাসা দেখিয়া মনে হইল, তেমন ঘরে মানুষ থাকিতে পারে না, গরু থাকিলেও কষ্ট পায়। একতলায় ছোট্ট অন্ধকূপের মত ঘর, একটি মাত্র দোর, যেটা দিয়া ঢুকিতে হয়—দ্বিতীয় দরজা বা জানালা নাই। এই পচা ভাদ্রে কি ভীষণ গুমট ঘরের মধ্যে।

সুলোচনার ছেলেরা একটু পরে আসিল। বড় সুন্দর ছেলে দুটি। সুলোচনার মুখ-চোখ ভুলিয়া গিয়াছিলাম; ইহাদের—বিশেষ করিয়া ছোট ছেলেটিকে দেখিয়া আবার সুলোচনাকে স্পষ্ট মনে পড়িল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যাত্রাদলে কৃষ্ণ সাজে একটি, অপরটি গান গায়।

হায় অভাগী সুলোচনা!......

তখনকার কালের শৌখিন মেয়ে, তখনকার কালের আধুনিকা স্মার্ট মেয়ে সুলোচনার মা ও ছেলেদের এ কি গৃহ, এ কি গৃহসজ্জা!......ছেঁড়া চটের বিছানা, চটের মধ্যে বিচুলির কুচিপোরা বালিশ, ভাঙা কলাইচটা এক-আধখানা সানকি, একটা মাটির কলসী আর দড়ির আলনায় অতি মলিন খান দুই-তিন কাপড় ও জামা। একখানা কেওড়া কাঠের হাত-দুই চওড়া তক্তপোশ আছে—ছেলেদুটি তাতে শোয়, বুড়ী শোয় মেঝেতে। তাও এই ঘরে আশ্রয় মিলিতেছে কই? এই আস্তাবল হইতেও বাড়ীওয়ালা নাকি ইহাদের তাড়াইয়া দিবে বলিতেছে।

এই কাহিনীটি আর বেশীদূর অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইবার পূর্বে সুলোচনা কে ছিল, তাহার সহিত আমার কি ভাবে আলাপ—ইহা বলিব। নতুবা গল্পের অংশও ভয়ানক খাপছাড়া ঠেকিবে।

২

১৯০৬ সালে দেশের ইস্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া কলিকাতার কলেজে পড়িতে আসিয়াছি। বেচু চাটুজ্জের স্ট্রীটে আমারই স্বগ্রামস্থ এক বন্ধুর বাবা ছেলে-পুলে লইয়া বাসা করিয়া থাকিতেন, সেইখানেই উঠিয়াছি। আমার বন্ধুটির দাদা তখন বি. এ. পড়েন এবং তাঁহারই সঙ্গে দেখা করিতে প্রকাশচন্দ্র বসু নামে তাঁহারই এক বন্ধু বাসায় ঘন ঘন যাতায়াত করিতেন। এই প্রকাশবাবু বড় অদ্ভুত লোক। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে মনেপ্রাণে যোগ দেওয়ার ফলে পুলিশের হাতে গুরুতর প্রহার খাইয়া নাকি কিছুদিন

হাসপাতালে এবং কিছুদিন জেলে ছিলেন। তিনি নিজের হাতে কাহাকেও বোমা মারিয়াছিলেন বলিয়া শুনি নাই—কিন্তু আলিপুর বোমার মামলার সময় পুলিশ দিনকতক তাঁহার পিছু পিছু ঘুরিয়াছিল। খুব বলিষ্ঠ, দীর্ঘ চেহারা, মুখের ভাবে বুদ্ধিমত্তা ও মননশীলতার ছাপ অতি সুস্পষ্ট। প্রেসিডেন্সি কলেজের বি-এ ক্লাসের ছাত্র, ছাত্র হিসাবেও যথেষ্ট মেধাবী।

আমরা প্রকাশদাকে যথেষ্ট খাতির করিয়া চলিতাম। তিনি বাড়ীতে আসিলে বাড়ীর মেয়েরা পর্যন্ত খুশী হইয়া উঠিতেন। প্রকাশের জন্য এ-খাবার করা, প্রকাশের জন্য ও-খাবার করা ; চা কোথায়, চেয়ারের উপর পাতিবার কুশন কোথায় ; মিনি তাহার হাতের উলের কাজ দেখাইতে ছুটিতেছে ; ডলি পড়া বলিয়া লইবার ছুতা করিয়া প্রকাশদার সঙ্গে দুটি কথা বলিবার সুযোগ খুঁজিতেছে—প্রকাশদার কাছে যেন বাড়ীসুদ্ধ লোকের মন বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিবার অধিকার ছিল না বাড়ীতে, তাহা হইলে সকলেই একসঙ্গে তুমুল প্রতিবাদ তুলিবে।

প্রকাশদার সঙ্গে মাঝে মাঝে সতীশ রায় বলিয়া তাঁহার এক বন্ধু আসিতেন, মেডিকেল কলেজের ছাত্র, খুব বড় বড় চোখ, শ্যামবর্ণ দোহারা চেহারা। ইঁহারা সবাই খুব স্ফূর্তিবাজ আমুদে ধরনের লোক—আসিবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী মাতাইয়া তুলিতেন হাসি গল্পে গানে। মাঝে মাঝে আবার কয় বন্ধুতে ঘরে খিল দিয়া কিসের পরামর্শ করিতেন—তখন আমাদের জানালা দিয়া উঁকিঝুঁকি মারাও নিষেধ ছিল।

কৌতূহল চাপিতে না পারিয়া একদিন বন্ধু শরৎকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ওরা ঘরে দোর দিয়ে কি করে রে?

শরৎ চুপিচুপি বলিল—কাউকে বলিস নি ভাই, ওরা সব অ্যানার্কিস্ট।

—তোর দাদাও?

—হ্যাঁ। ওরা দাদাকে দলে নিয়েছে।

শুনিয়া মনের মধ্যে একটা কৌতূহল ও উত্তেজনা অনুভব করিলাম। অ্যানার্কিস্টদের সঙ্গে এক বাসায় আছি ভাবিয়া ভয়ও হইল।

এইখানে একদিন প্রথম দেখিলাম সুলোচনার মাকে। নিজের ঘরটিতে বসিয়া পড়িতেছি, একটি প্রৌঢ়া বিধবা স্ত্রীলোক ঘরে ঢুকিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিল—প্রকাশ, এখানে কবে এসেছিল? আজ আসবার কথা আছে?

দেখিলাম স্ত্রীলোকটির পরনে সাদা থান, বয়স প'য়ত্রিশ-ছত্রিশের বেশি নয়, গায়ের রং খুব ধপধপে ফরসা, বয়স হইলেও মুখশ্রী দেখিতে ভাল। আমার মুখে প্রকাশবাবুর আসিবার সম্ভাবনা আছে শুনিয়া আমারই ঘরে সে বসিল। আমায় বলিল—তুমি কি কর ছেলে?

—পড়ি ফার্স্ট ইয়ারে।

—এটা তোমাদের বাড়ী?

—আমার বন্ধুর বাড়ী, আমি এখানে থাকি। বাড়ীতে মেয়েরা আছেন—চলুন না বাড়ীর মধ্যে, এখানে কেন বসে থাকবেন?

এই ভাবে সুলোচনার মার সঙ্গে বাড়ীর মেয়েদের আলাপ হইয়া গেল। সুলোচনার মা কিন্তু প্রকাশদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ছাড়া অন্য কার্যে কখনও আসে না, একদিন আমার এ কথা মনে হইল। বাড়ীর মধ্যে মেয়েরাও এ-কথা বলিতে শুরু করিল। স্ত্রীলোকটি যে প্রকাশবাবুর কাছে টাকা লইতে আসে, তাহাও সকলে জানিয়া গেল। ক্রমে আমাদের সামনেই সে প্রকাশবাবুকে বলিত—ও প্রকাশ, বাবা এ-মাসে আর দশটা টাকা না দিলে মেয়ের বই হবে না। ক্লাসে তাকে বকে, বই না কিনে ইস্কুলে যাবে কি করে?

আমার বন্ধুকে একদিন বললাম—ওঁর মেয়ে আছে তা তো এতদিন শুনিনি! ওঁরা প্রকাশদার কেউ হন? প্রকাশদা টাকা দেন কেন ও'দের?

বন্ধু বলিল—জানি ওঁর এক মেয়ে এখানে স্কুলে পড়ে। আমি শুনেছি মেয়েটি সধবা, কিন্তু তার স্বামীর কাছে থাকে না। মা ও মেয়ে কোথায় যেন বাসা করে থাকে, প্রকাশদা আর সতীশদা দুজনে খরচ দেন। দাদা এ-সব গল্প সেদিন মার কাছে করেছিল।

—তা প্রকাশদা আর সতীশদা টাকা দেন কেন?

—ওঁরা অ্যানার্কিস্ট কিনা, দেশের আর দশের সেবা ওঁদের কাজ, বিশেষ করে প্রকাশদার। দাদা বলে, প্রকাশদা বাড়ী থেকে যে টাকা পান, তার বেশির ভাগ ওদের দিয়ে দেন, নিজে অনেক সময় টাকা ধার করতে আসেন দাদার কাছে। দুটো টিউশানি করেন, সে-টাকাও ওদের দিয়ে দেন।

আমার ক্রমে মনে হইল বুড়ী প্রকাশদার কাছে নানা রকম ফন্দি ও ছুতায় টাকা আদায় করিতে আসে। আর সব সময়েই মেয়ের অজুহাতে। আজ আমার মেয়ের এ নাই, আজ আমার মেয়ের তা নাই, একটা না একটা ছুতা বুড়ীর লাগিয়াই আছে। প্রকাশদাও যেন কল্পতরু, 'না' বলিতে শুনিলাম না কোনদিন। বুড়ীর উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলাম। বুড়ী বলিলাম বটে কিন্তু সুলোচনার মা সে-যুগে বুড়ী ছিল না।

কতবার ভাবিতাম প্রকাশদাকে বলি, উহারা ফাঁকি দিয়া আপনার কাছে টাকা লইতেছে, আপনি যখনই যা চায় তা দেন কেন? কিন্তু প্রকাশদাকে শ্রদ্ধা-সম্মান করিতাম, কখনও সাহস করিয়া কথাটা বলিতে পারি নাই।

৩

এখানে একদিন সুলোচনা আসিল তাহার মায়ের সঙ্গে।

দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। রূপসী বটে। পাড়াগাঁ হইতে কয়েক মাস মাত্র আসিয়াছি, অমন রূপ কখনও দেখি নাই। বছর ষোল কি সতের বয়স, পিঠে দীর্ঘ কালো চুলের বিনুনি দোলানো, যেমন চোখ তেমনি ধপধপে গায়ের রং, তেমনই নিটোল স্বাস্থ্য, অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী।

বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে স্বভাবতই তার যথেষ্ট ভাব হইয়া গেল। তার পর প্রায়ই আসিতে লাগিল। বিশেষ করিয়া প্রকাশদার আসিবার সময়টাতেই আসে এবং বেশির ভাগ কথাবার্তা বলে প্রকাশদার সঙ্গেই। প্রকাশদা উপস্থিত থাকিলে সেই যে তাহার চেয়ারের পিছনটি ধরিয়া দাঁড়ায়, তিনি যতক্ষণ এ-বাড়ীতে থাকেন, বড় একটা অন্য কোথাও নড়িতে দেখি নাই।

প্রকাশদা উঠিয়া চলিয়া গেলে সুলোচনা আমাদের বড় বিরক্ত করিত। হয়তো বা আমাদের সে মানুষ বলিয়াই মনে করিত না, কে জানে। টেবিলে বসিয়া পড়িতেছি, সুলোচনা হঠাৎ আসিয়া বইখানা টানিয়া লইয়া গেল, নয়তো পিছন হইতে আসিয়া দুই হাত দিয়া চোখ চাপিয়া ধরিল, নয়তো ভূতের গল্প শুনিবার আবদার ধরিয়া বসিল। পড়িতে দিবে না কিছুতেই ; পড়া থাক, তাহার সঙ্গে ছাদে কে যাইবে? ডলির পুতুলের শুভ-বিবাহ এখনই ছাদে অনুষ্ঠিত হইবে তাহার পুতুলের সহিত—ইত্যাদি। এক-এক দিন এক-এক রকমের ব্যাপার।

কিন্তু প্রকাশদা থাকিলে সুলোচনা এ রকম করিত না। তখন তার অন্য মূর্তি। ধীর, স্থির, বেশি হাসিত না, বেশি বকিত না, কেমন যেন সলজ্জ, সকুণ্ঠ চোখমুখের ভাব, কতদিন দেখিয়াছি।

প্রকাশদা সুলোচনাকে 'সু' বলিয়া ডাকিতেন বলিয়া আমরাও সবাই তাকে 'সু' বলিতাম। একদিন সুলোচনা তাহাতে আপত্তি করিল। শরৎকে বলিল—প্রকাশদা যা বলেন তোমরাও তাই বলবে কেন? ও নামে ডেকো না, কানে ভাল লাগে না।······আমার বড় রাগ হইল। সুলোচনার চাল-দেওয়া ধরনের কথাবার্তা আমার সহ্য হইত না। আমার মনে হইত মেয়েটি অত্যন্ত গর্বিতা ও চালবাজ। রাগের ঝোঁকে বলিলাম—তাহলে তুমিও আমাদের সঙ্গে মিশতে এসো না। সুলোচনার সহিত আমাদের এ ধরনের খুনসুটি ঝগড়া প্রায়ই চলিত। তবে সে যে সব সময়ে আমাদের বাসায় আসিত তা নয়, মাসের মধ্যে দশ-বারো দিনের বেশি না। প্রকাশদা এখানে যে-যে দিন আসিবেন, এমন দিন ছাড়া সুলোচনার এখানে আসা কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিতাম। সতীশদার প্রতি সুলোচনা যেন তেমন সন্তুষ্ট নয়, অথচ সতীশদা সুলোচনা বলিতে অজ্ঞান ছিলেন। আমার বন্ধু শরৎ বলিত সুলোচনাদের কলিকাতার বাসাভাড়া ও বাসার সমস্ত খরচ নাকি সতীশদা দিতেন। কিন্তু সুলোচনা সতীশদাকে কেন যে দেখিতে পারিত না তাহা কি করিয়া বলিব?

একদিনের কথা বলি। সেদিন সতীশদা আসিবার কিছু পরে সুলোচনা তাহার মায়ের সঙ্গে আসিয়া হাজির। সুলোচনার মা বলিল—সতীশ, আমাকে দক্ষিণেশ্বরে ঘুরিয়ে আনবে বাবা? সুলোচনাও বলিল—হ্যাঁ মামা (সতীশবাবুকে সুলোচনা মামা বলিয়াই ডাকিত), চল আমিও যাব।

সতীশদা হাতে যেন স্বর্গ পাইয়াছেন, তাঁহার চোখমুখের খুশির ভাব দেখিয়া তাহাই মনে হইল। উৎসাহের সহিত বলিলেন—হাঁ হাঁ। বরং চল দক্ষিণেশ্বর থেকে আমরা বরানগরে স্বামী অবধূতানন্দের আশ্রম দেখে আসব—সেও বড় চমৎকার জায়গা গঙ্গার ধারে।

সুলোচনার মা বলিলেন—তাহলে অমনি পেনেটির দ্বাদশ শিবের মন্দিরও দেখে আসি চল না?

সুলোচনাও বলিল—বড্ড মজা হয় মামা। একখানা গাড়ী ডাক। সতীশদা গাড়ী ডাকিতে গিয়াছেন, এমন সময় প্রকাশদা আসিয়া পড়িলেন। সুলোচনা তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করিল তাহাদের সঙ্গে যাইবার জন্য। তিনি কেন যাইতে চাহিলেন না তাহা আমি জানি না, সঙ্গে সঙ্গে সুলোচনাও তাহার মাকে বলিল—সে কোথাও যাইবে না, মায়ের ইচ্ছা থাকিলে তিনি একাই যাইতে পারেন। সতীশদা ইতিমধ্যে গাড়ী আনিয়া উপস্থিত করিলেন কিন্তু ঘটনার নূতন পরিস্থিতি দেখিয়া বড় নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। প্রকাশদাও সুলোচনাকে যাইবার জন্য যথেষ্ট বলিলেন, এমন কি শেষে রাগও করিলেন, সুলোচনা কিন্তু কিছুতেই গেল না। অবশেষে বেচারী সতীশদার শুধু সুলোচনার মাকে লইয়াই যাইতে হইল। অবশ্য আমার বন্ধুর বাড়ীর মেয়েরা কেউ কেউ সঙ্গে গেলেন—এতগুলি মেয়ে গেল, তবুও সুলোচনা এক পাও নড়িতে চাহিল না।

বছর দুই এইভাবে নানা সুখদুঃখের ঘটনার মধ্য দিয়া কাটিয়া ১৯০৮ সালে আমাদের বাসা উঠিয়া গেল। আমি কলেজের হোস্টেলে আশ্রয় লইলাম। সুলোচনাদের সহিত সম্পর্ক ঘুচিয়া গেল। আমার ছাত্রজীবনের বাকি বৎসরগুলির মধ্যে সুলোচনা বা তাহার মায়ের সঙ্গে চোখের দেখাও নাই একদিনের জন্য। সতীশদাকেও আর কখনও দেখি নাই। ইহাদের না দেখিবার কারণও যথেষ্ট ছিল, পুলিশের চাপেই বাসা উঠাইতে হইয়াছিল।

তবে প্রকাশদার সম্বন্ধে বিশেষ ঘটনা এই যে আমার ছাত্রজীবনের তৃতীয় বৎসরে প্রকাশদা অদ্ভুতভাবে নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন! আর কেহ কোনদিন তাঁহাকে দেখে

নাই ; পূর্ববঙ্গের কোথায় স্বদেশী ডাকাতি করিতে গিয়া পুলিশের গুলিতে মারা পড়িয়াছেন, কয়েক বছর পরে বিশ্বস্তসূত্রে একথা শুনিয়াছিলাম।

বছর পাঁচ-ছয় পরের কথা। কলেজ হইতে বাহির হইয়া কলিকাতার বাহিরে চাকুরি করি। কি একটা ছুটি উপলক্ষে হাওড়া স্টেশনে নামিয়া শেয়ালদহ দিয়া বাড়ী ফিরিতেছি। তখনকার আমলে শেয়ালদহ নর্থ স্টেশন হয় নাই—যেখানে আজকাল নর্থ স্টেশনের সম্মুখে ভাড়াটে গাড়ীর আড্ডা, ওখানে অনেক চা পান শরবত ইত্যাদির দোকান ছিল। একটি দোকানে শরবত খাইতে গিয়াছি, দেখিলাম একটি ছোকরা এবং তাহার সহিত একটি সুবেশা তরুণী সেখানে দাঁড়াইয়া ভাঁড়ে করিয়া শরবত খাইতেছে। দু-একবার গোপনে মেয়েটির দিকে চাহিয়া দেখিলাম—বয়স বাইশ-তেইশ হইবে চোখ যেন ফিরানো যায় না তাহার দিক হইতে। না, অপূর্ব রূপসী বটে মেয়েটি!...আমিই শুধু চাহিয়া নাই, আশপাশের অনেকেরই দেখিলাম আমার দশা।

হঠাৎ আমাকে ভীষণ চমকিত ও আশ্চর্য করিয়া দিয়া তরুণী আমার একেবারে সামনে আসিয়া হাসিমুখে বলিল—আরে যদুদা যে!

বলিয়াই সে আমার পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল। চিনিতে অবশ্য বিলম্ব হইল না, বলিলাম—সুলোচনা যে! কোথা থেকে? তোমার মা কোথায়? কি করছ এখন?

সুলোচনা এ-সব কথার কোন উত্তর না দিয়া সর্বপ্রথম আমায় প্রশ্ন করিল—প্রকাশদার কোন খবর পেয়েছ?

প্রকাশদার মৃত্যুসংবাদ তখন আমি শুনিয়াছি, কিন্তু সেকথা বলিলাম না।

সুলোচনা আমায় ছাড়িতে চায় না, তখনকার পরিচিতদের মধ্যে এ কেমন আছে, ও কেমন আছে, আমার বন্ধু শরৎ এখন কোথায়, তাহার দাদা বিনোদ কি করে, তাহাদের বিবাহ হইয়াছে কিনা—নানা মেয়েলি প্রশ্ন। আমার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল—অনেকদিন পরে দেখা, খাওয়াও দেখি, চল তো রায় মশায়ের হোটেলে!

সেই পুরানো দিনের মতই নিঃসংকোচ ব্যবহার সুলোচনার, মেয়েমানুষ হইয়াও ছেলের মত ব্যবহার, ধরন-ধারণ, সেই সবই বজায় আছে অবিকল। তবে তাহার পরনে চওড়া জরিপাড় ফিকে নীল-শাড়ি ও ব্লাউজের বাহার, গলায় চিকচিকে সরু চেন ও পেন্‌ডেন্ট, পায়ে রুপালি ব্রোকেডের জুতা, সুগঠিত পেলব সুগৌর হাতে সোনার চুড়ির সংগে সরু-ফিতা-বাঁধা হাতঘড়ি প্রভৃতি দেখিয়া মনে হইল সুলোচনার অবস্থা ফিরিয়াছে। সুলোচনার শৌখিনতার প্রতি স্নেহ হইল—এমন সুন্দরী মেয়েরা বেশভূষা না করিবে, সেণ্ট-পাউডার না মাখিবে—তবে সেসব সৃষ্টি হইয়াছে কাহাদের জন্য? সুলোচনার অংগে শাড়ী ব্লাউজ অলংকার উঠিয়া নিজেরাই ধন্য হইয়া যায় নাই কি?

আমি বলিলাম—আরে ছাড় ছাড়, হাত ধরে ওরকম টানাটানি ক'রো না—রায়মশায় কেন, চল ট্রামে ন্যাশনাল হোটেলে যাই কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে। কিন্তু সংগের ছোকরাটি বাদ সাধিল, নতুবা সুলোচনাকে লইয়া যাওয়া কষ্টকর হইত না।

ঘড়ি দেখিয়া বলিয়া বসিল—ট্রেনের দেরি নাই, কোথায় যাবে এখন বৌদি? এস, চল,—বাঃ—! এমন কি, মনে হইল যে ছোকরা যেন সুলোচনার উপর জোর খাটাইতেছে। রাগ হইল—কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছ বাপু! সুলোচনাকে আমরা ছেলেবেলা হইতে জানি, তুমি তখন জন্মাও নাই। আজ আসিয়াছ আমাদের সামনে সুলোচনাকে ঘড়ি দেখিয়া টাইম বলিয়া দিতে! সুলোচনা যে খুব ভাল মেয়ে নয়, এ ধারণা আমার পূর্ব হইতেই ছিল, এখন সে-ধারণা আরও বদ্ধমূল হইল। বেচারী প্রকাশদা! মেয়েদের ভালবাসার এই তো মূল্য। অন্তত সুলোচনার মত মেয়েদের। মনটা অশ্রদ্ধায় পূর্ণ হইয়া গেল। সুলোচনাকে লইয়া ছোকরা স্টেশনের দিকে চলিয়া গেল।

সুলোচনা যাইতে যাইতে আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—দমদমায় বাসা আজকাল। যেও একদিন—মা আছেন বাসায়। বিস্কুটের কারখানার পিছনে নরেশ পালের বাগানবাড়ী—

বলা বাহুল্য, দমদমার নরেশ পালের বাগানবাড়ী খুঁজিয়া সেখানে যাইবার সুবিধা ও সময় আমার হইয়া উঠে নাই।

বছরখানেক পরে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব বৎসর ১৯১৩ সালে আমি সন্ধ্যার দিকে এসপ্ল্যানেডের মোড়ে ট্রাম ধরিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় একখানি ট্রাম আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ দেখিলাম প্রথম শ্রেণীর কামরায় একখানি বেঞ্চিতে সুলোচনা একা বসিয়া আছে। আমি তখনই বিন্দুমাত্র না ভাবিয়া ট্রামখানাতে উঠিয়া তাহার পাশে বসিয়া পড়িলাম। সুলোচনা প্রথমটা চমকিয়া উঠিয়াছিল, পরে আমাকে দেখিয়া ও চিনিতে পারিয়া ভারি খুশী হইল। বলিল—উঃ, যা ভয় দেখিয়ে দিয়েছিলে! আমি বলি কে এসে ঝুপ করে পাশে বসে পড়ল রে বাবা!—ভাল? কতদিন দেখা হয়নি—সেই শেয়ালদা স্টেশনে সেবার—দাঁড়াও, প্রণামটা করি।

কথাবার্তা বলিতে বলিতে চাঁদনির মোড়ে ট্রাম আসিল। সুলোচনা বলিল—নাম এখানে যদু-দা কুরুশ-কাঁটা কিনব আর ছেলেটার জন্যে হর্লিক কিনব। আমি উহার মুখের দিকে আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া আছি দেখিয়া সুলোচনা সলজ্জমুখে বলিল—আজকাল আমার স্বামী এসেছেন যে, আজ প্রায় বছরখানেক। এখন যে রোজগার করছি দু-পয়সা, আসবে বৈকি। এতদিন কেউ খোঁজও নেয়নি।

--আজকাল কি কর?

—বা রে, আজকাল তো ক্যাম্বেলে নার্সগিরি করি। এতদিন নার্সদের হোস্টেলে ছিলাম—এখন স্বামী ফিরে আসতে বাসা করেছি দমদমাতে। সেই আর বছর যখন তোমার সঙ্গে দেখা, তখন থেকে দমদমায় বাসা। এস না আজ, চল—আমার খোকাকে দেখে আসবে এখন—

—না, আজ থাক্, আর এক দিন হবে। চল—চা খাবে সুলোচনা?

—শোন বলি। তুমি হলে গিয়ে খোকার মামা, শুধু হাতে যেন যেও না। ওকে একটা হার কেন দাও না?

আমার বড় রাগ হইল। দম দিয়া টাকা আদায় করিয়া লইতে সুলোচনা মায়ের মতই পটু হইয়া উঠিয়াছে। আপন মামা হইলেও আজকালকার বাজারে শুধু টাকা দিয়া মুখ-দেখা সারে, আর আমি কোথাকার কে, হার কেন দিতে যাইব? বলিলাম—এখন যাব না তোমার বাসায়। বড় ব্যস্ত আছি।

ট্রাম হইতে নামিয়া আমরা একটা গ্যাসপোস্টের তলায় দাঁড়াইয়াছি, গ্যাসের আলোয় সুলোচনাকে দেখিয়া সত্যই মুগ্ধ হইয়া গেলাম। এ রকম রূপসী মেয়েকে লইয়া কোন চায়ের দোকানে ঢুকিতে সংকোচ মনে হয়—বিশেষত, মনে রাখবেন, ১৯১৩ সালের কলিকাতা, তখনকার দিনে মেয়েরা পথেঘাটে খুব কমই বাহির হইত। হইলও তাই, চায়ের দোকানসুদ্ধ লোক হাঁ করিয়া একদৃষ্টে সুলোচনার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার উপর সুলোচনার মুখে খই ফুটিতেছে কথার। সে চুপ করিয়া থাকিতে জানে না. আমি বড় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম।

আমায় বলিল—যাবে না বই কি, ইঃ! ভাগ্নের মুখ দেখনি, দেওয়ার ভয়ে বোনের বাড়ী যাবে না—লজ্জা করে না বলতে? যেতেই হবে, আমি নেমন্তন্ন করছি সামনের শনিবার যাবে, ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

ইহার সব ব্যাপারই রহস্যাবৃত; কোথায় এতদিন ইহার স্বামী ছিল, কোথা হইতে

বা আবার আসিল, এ-সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইলেও চাপিয়া গেলাম। তবে সুলোচনা কখনও মিথ্যা বলে না ইহা আমি জানিতাম। পূর্বেও দেখিয়াছি এমন সব অবস্থায় সত্য কথা বলিত যেখানে সত্য বলিলে তাহার নিজেরই ক্ষতির সম্ভাবনা। কাজেই সুলোচনার কথায় আমার অবিশ্বাস হয় নাই।

চা খাওয়া ও উলবোনার কাঁটা কেনার পরে আমি তাহাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিতে আসিলাম। গাড়ীর কামরায় বসিয়া সে তাহার পাশে বেঞ্চিতে হাত চাপড়াইয়া বলিল—এস, ব'স যদু-দা!

বলিলাম—আজ নয় সুলোচনা—মাপ কর। কাজ আছে।

সুলোচনা অভিমানের সুরে বলিল—না, থাক্ কাজ। এস—আসতেই হবে। কত কথা আছে তোমার সঙ্গে—রাস্তায় দেখা, কি কথাই বা হোল! পুরোনো দিনের কথা আর কার সঙ্গে কইব?

পরে হঠাৎ আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, প্রকাশদার আর কোনও খবর পাওনি?

বলিলাম—নাঃ, কই আর। মনে মনে ভাবিলাম—সে-কথা জেনে তোমার লাভই বা কি এখন।

—বেঁচে নিশ্চয়ই আছেন, তবে পুলিশের ভয়ে লুকিয়ে আছেন বলে মনে হয়। তাঁর কথা যে কইব, এমন আর লোক কই এক তুমি ছাড়া?

—কেন, সতীশদা কোথায়?

—মামা? মামা বিয়েথা করে দেশে দিব্যি সংসারী হয়ে বসেছে। তার মত মানুষ আর এর বেশি কি করবে। প্রকাশদার মত কি সবাই?

গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা দিল। সুলোচনা বিস্ময়ের সুরে বলিল—সত্যি, আসবে না নাকি যদু-দা? এস বস।

বলিয়া আমার হাত ধরিতে গেল।

কিন্তু আমার যাওয়া হইল না। যাইবার প্রবৃত্তি হইল না। তা ছাড়া সেই রাত্রেই আমাকে কর্মস্থানে ফিরিতে হইবে—সুলোচনার সঙ্গে গেলে ট্রেন ফেল করি। চাকরি বজায় রাখিয়া তবে অন্য কথা।

তখন কি জানি, সুলোচনার সহিত এই শেষ দেখা।

সতের-আঠার বৎসর পূর্বের কথা এ-সব।

৪

সুলোচনার মা পার্কে আসিল।

তাহাকে বাড়ীভাড়ার টাকা মিটাইয়া দিয়া বলিলাম—এখন বলুন তো, আমি অনেক কথাই জানতাম না আপনাদের সম্বন্ধে। যা জানি, ভাসা-ভাসা জানি। সবটা বলুন।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল। পার্কে ছেলেমেয়েরা দোলনায় দুলিতেছে, চেঁচামেচি করিতেছে, ঘুগনি চানাচুর কিনিতেছে।

সুলোচনার মায়ের নিকট হইতে নানারূপ জেরা করিয়া যে তথ্যটি উদ্ধার করিয়াছিলাম সেদিন, তাহা যেমন করুণ, জীবনের গভীর অনুভূতির দিক হইতেও তেমনই অপূর্ব। কিন্তু বৃদ্ধার কথায় বলিলে ঠিকমত গুছাইয়া বলা হইবে না। তাই নিজে খানিকটা গুছাইয়া বলিবার চেষ্টা করিলাম।

ওদের বাড়ী বর্ধমান জেলায়। সুলোচনার যখন আট বছর বয়স, তখন ওর বিবাহ হয় পাশের গ্রামে। স্বামীর বয়স তখন ত্রিশ-বত্রিশ, স্বামীর চেহারা ভাল ছিল না বলিয়া

ছেলেমানুষ মেয়ে তার কাছে বড় একটা যাইতে চাহিত না। স্বামী ছিল মূর্খ ও গোঁয়ার প্রকৃতির লোক, আট বছরের স্ত্রীর উপর মারধোর ও নানা রকম অত্যাচার শুরু করে। ফলে ওর মা দেশের জায়গা জমি বিক্রয় করিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া কলিকাতায় আসিল—তখন সুলোচনার বয়স দশ বৎসর। উদ্দেশ্য, মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইয়া স্বাধীনভাবে থাকিবার কোন সুবিধা করিয়া দিবে।

কিন্তু তখনকার কালে মেয়েদের লেখাপড়া শেখা বা স্বাধীন জীবিকা উপার্জন প্রভৃতিকে লোকে ভাল চোখে দেখিত না। মা মেয়ের হাত ধরিয়া নানা জায়গা বেড়াইল। হাতের পয়সা সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইয়া গেল—কিন্তু বিশেষ কোন সুবিধা হইল না। এদিকে আরও নূতন উপসর্গ, মেয়ে অপূর্ব রূপসী, দশ বছরের হইলে কি হয়, তাহাকে দেখায় তের-চৌদ্দ বছরের মত—দুষ্ট লোকের চোখ পড়িল মেয়ের উপর।

একদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরিয়া মা মেয়েকে বলিল—চল আজ গঙ্গায় ডুবে মরব দুজনে—এখানে আর কোনও সুবিধে নেই—এবার মান যাবে। গরিবের কেউ নেই।

মেয়ে তৎক্ষণাৎ রাজী হইল।

রাত নটার সময় মেয়ে বলিল—কখন আমরা ডুবব মা? অন্নপূর্ণার ঘাটে চল যাই।

মা বলিল—এখনও সব ঘাটে লোক। এখন না, দেরি কর—

রাত দশটার সময় মা মেয়ের হাত ধরিয়া বাগবাজারের অন্নপূর্ণার ঘাটে সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিতেছে—হ্যাঁ রে, পারবি তো? বল আগে থেকে, পারবি তো?

মেয়ে এতটুকু ভয় খায় নাই। সে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—তুমি সঙ্গে থাকলে মা ঠিক পারব।

সেই সময় যামিনী ঘোষ বলিয়া একটি ছোকরা, আপিসের কেরানী, ঘাটের কাছেই কোথায় বসিয়া হাওয়া খাইতেছিল। সে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনারা এত রাত্রে এখানে কেন? আর ব্যাপারই বা কি? কি বলাবলি করছেন আপনারা? বাসা কোথায় আপনাদের?

যামিনী ঘোষের প্রশ্নের স্বরে বালিকা থতমত খাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মা সব খুলিয়া বলাতে সে-রাত্রে যামিনী মা ও মেয়েকে নিজের বাসায় লইয়া গেল।

দিন পনের কাটিল মন্দ নয়। যামিনী ছেলেটি খুব ভাল, কিন্তু ইহার এক বন্ধু সম্ভবত যামিনীর মুখে ইহাদের ইতিহাস শুনিয়া একবার দেখিতে আসিল। সেই যে আসিল, আর সে বাড়ী ছাড়িতে চায় না। তার আসা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারের মধ্যে দাঁড়াইয়া গেল। সুলোচনাও সকলের সামনে চিরকাল বাহির হয়, তখন তো আরও ছেলেমানুষ।

ছোকরা মাথার পিছন দিকে চুল ফিরাইত বলিয়া সুলোচনা আড়ালে মার কাছে তাহার নাম রাখিয়াছিল—কাকাতুয়া। একদিন মেয়ে মাকে বলিল—মা, কাকাতুয়া ভারি দুষ্টু। আমাকে গহনার বাক্স দেখিয়ে বলে কিনা—আমার সঙ্গে যাবি? তোকে এই সব গহনা দেব—আমি ওর সামনে আর বেরব না।

মা বলিল.—হতচ্ছাড়া মেয়ে,তুই বা যাস কেন সকলের সামনে? বাড়ীর মধ্যে থাকবি. যার তার সামনে বেরনো, গল্প করা কি ভাল? আমরা গরিব লোক, আমাদের কত বিপদ জানিস?

যামিনীর আর এক বন্ধু ছিল, সতীশ রায়। সতীশ মা ও মেয়ের দুঃখ শুনিয়া তাহাদের নিজের বাসায় লইয়া আশ্রয় দিল বটে কিন্তু দিনকতক পরে সেখানেও গোল-যোগ বাধিল। সতীশ সুলোচনাকে দেখিয়া পাগল হইল। এমন কি, সতীশের মা সুলোচনা

বিবাহিতা জানিয়াও ছেলের সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিলেন; সুলোচনার মায়েরও অনিচ্ছা ছিল না, কিন্তু সুলোচনা একেবারে বাঁকিয়া বসিল। মাকে বলিল—মেয়েমানুষের ক-বার বিয়ে হয়? তোমাদের সব মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে—আমায় আর লেখাপড়া শেখাতে হবে না তোমায়—তুমি আমাকে আমার শ্বশুরবাড়ী রেখে এস, সেখানে বাঁচি আর মরি। ঢের হয়েছে।

এখানে এই সময় একদিন আসিলেন প্রকাশদা।

প্রকাশদা সতীশের বন্ধু এবং ছাত্রমহলে নাম-করা স্বদেশী। য়্যানার্কিস্ট বলিয়া খ্যাতিও তাঁহার যথেষ্ট রহিয়াছে তখন পুলিশের কৃপায়। প্রকাশদা সুলোচনার ইতিহাস সব শুনিলেন এবং প্রধানত তাঁহারই চেষ্টায় সুলোচনা বেথুন স্কুলে ভর্তি হইল। প্রকাশদা মাঝে মাঝে তাহার পড়াশুনার তত্ত্বাবধান করিতে আসিতেন।

এদিকে সতীশ বড় বিরক্ত করিয়া তুলিল। একই বাড়ীতে থাকা, সর্বদা দেখা-সাক্ষাৎ, সামনে না আসিয়া উপায় নাই। নানারকম দামী জিনিসপত্র কিনিয়া দিতে আরম্ভ করিল —সেণ্ট, সাবান, কাপড়-জামা ইত্যাদি। সুলোচনা বলিল—মামা, এ-সব কেন দিস? তুই বড় স্বার্থপর। এ-সব আমি নেব না।

মাকে বলিত—মা, অনেক মানুষ দেখলাম এ বয়সে, প্রকাশদার মত মানুষ এ পর্যন্ত আর দেখি নি। অন্য ধাতের একেবারে। উনি মানুষ না দেবতা তাই ভাবি।

সতীশ দিত দামী দামী কাপড়, একবার পূজায় একখানা ভাল বেনারসী শাড়ী দিল। প্রকাশদা দিলেন একজোড়া মোটা স্বদেশী তাঁতের শাড়ী। সুলোচনার কি আহ্লাদ প্রকাশদার দেওয়া সেই মোটা শাড়ী পরিয়া! সতীশদার দেওয়া ভাল শাড়ী সে কদাচিৎ ব্যবহার করতি, কিন্তু মোটা তাঁতের শাড়ী দু'খানা পরিয়া রোজ স্কুলে যাইত।

একদিন সে প্রকাশদাকে সতীশের ব্যবহার সব খুলিয়া বলিল। প্রকাশদা বলিলেন —এখানে তোমাদের আর থাকা উচিত না। তোমার লেখাপড়া এখানে থাকলে কিছু হবে না; অন্য জায়গায় বাসা কর, খরচ যা হয় আমি তার ব্যবস্থা করব।

সুলোচনার এক দূরসম্পর্কের ভগ্নীপতি কানাই ধরের গলিতে সস্ত্রীক বাসা করিয়া থাকিত। সুলোচনারা সেই বাসায় উঠিয়া আসিল। আসিবার সময় সুলোচনা প্রকাশদার দেওয়া মোটা শাড়ী পরিয়া, সতীশের দেওয়া দামী কাপড় জামা সেখানেই রাখিয়া আসিল। সতীশ এই ব্যাপারে দিনকতক নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বিবেচনা করিয়া প্রকাশদার সঙ্গে পর্যন্ত দেখাসাক্ষাৎ ছাড়িয়া দিল। মা মেয়েকে বলিল—কেন সতীশকে অমন করে চটিয়ে দিলি? ওর মনে কষ্ট দেওয়া হল না?

সুলোচনা বলিল—কষ্ট না পেলে মামার জ্ঞান হবে না মা। তা ছাড়া দেখছ না, আমাদের জন্যে ও সর্বস্বান্ত হতে বসেছিল, ওর দেওয়া জিনিস আর নেব না।

তা সত্ত্বেও সতীশ ওদের নূতন বাসায় যাতায়াত করিত, জিনিসপত্রও দিতে ছাড়িত না। সুলোচনা বলিত—মামা, আবার কেন আসিস? তুই বড় স্বার্থপর—স্বার্থের জন্যে সব করিস বলে আমার ভাল লাগে না। দেখ দিকি প্রকাশদাকে?

একদিন সতীশ বলিল—আচ্ছা, আমি কি করলে তুই খুশী হবি সুলোচনা? বল, আমি তাই করব।

সুলোচনা বলিল—তুই বিয়ে কর মামা। খুব খুশী হব তাহলে। আমায় যদি সন্তুষ্ট করবার তোর ইচ্ছে থাকে, খুব শীগ্‌গির একটি ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে করে ফেল।

নূতন বাসায় প্রকাশদা কিন্তু বেশি আসিতেন না এবং আসিতেন না বলিয়াই আমাদের বাসায় যেদিন প্রকাশদার আসিবার কথা থাকিত, সেদিন সুলোচনা এখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা করিত।

এই সময় আলিপুরের বোমার মামলা আরম্ভ হইল। কি করিয়া প্রকাশদা ইহার মধ্যে জড়াইয়া পড়েন সে-কথা সুলোচনার মা আমায় বলিতে পারে নাই। প্রকাশদা দীর্ঘদিন অনুপস্থিত রহিলেন। সুলোচনা বড় ব্যস্ত হইয়া ছটফট করিত বলিয়া তাহার মা একদিন কলেজে খোঁজ করিতে গিয়া জানিল কলেজেও প্রকাশদা বহুদিন যাবৎ অনুপস্থিত।

ছ মাস পরে প্রকাশদা হঠাৎ একদিন এক হাঁড়ি রসগোল্লা হাতে ওদের বাসায় আসিয়া হাজির। সুলোচনা তো খবর পাইয়াই ছুটিতে ছুটিতে বাহিরের ঘরে আসিল। বলিল—কোথায় ছিলে প্রকাশদা এতদিন? চেহারা এমন হয়েছে কেন তোমার।

প্রকাশদা বলিলেন—সে কথা জিজ্ঞেস করিস কেন সু। তা ছাড়া, এই শেষ। আমি স্বদেশীর আসামী, পুলিশ পেছনে ঘুরছে—আর আসতে হয়তো পারব না। যাবার সময় একটা কথা জিজ্ঞেস করে যাই—হয়তো আর দেখাই হবে না—সু, তুই আমায় কখনও ঘৃণা করবি নে বল?

সুলোচনা বলিল—তোমাকে অনেক ভালবাসি প্রকাশদা। যদি স্বামী না থাকত, তবে তোমার আরও নিকটে আসতুম। পা ছুঁয়ে বলছি—তা না হলে তোমার এই বিপদের সময়ে তোমার সঙ্গে চলে যেতুম!—একলা যেতে দিতুম না।

বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল।

সুলোচনার মা আমায় বলিল—মেয়ে আমার কখনও কাঁদত না। এই অনেকদিন পরে কাঁদল। যাবার সময় প্রকাশকে কড়ার করিয়ে নিলে বিপদ উদ্ধার হলেই আবার ফিরে এসে সকলের আগে ওর সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু প্রকাশ সেই যে গেল, আর কখনও ফিরে আসে নি।

আমি বলিলাম—তার পর? আপনাদের কি হল?

—তার পর প্রকাশ তো চলে গেল। শোন সব কথা, বিশ্বাস করবে না হয়তো। এই কলকাতা শহরে সেই পোড়ামুখী মেয়ের আগুনের মত রূপ নিয়ে সে কি কষ্ট, কি বিপদ গিয়েছে আমাদের! দেখেছিলে তো তাকে?

দেখিয়াছিলাম বই কি। আবার এই প্রায় কুড়ি-বাইশ বছর পরে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অপরাহ্নের মৃদু স্তিমিত রৌদ্রালোকে সুলোচনার সেই অপূর্বসুন্দর কিশোরীমূর্তি স্পষ্ট মনের চোখে ফুটিয়া উঠিল। তার সেই ডাগর ডাগর চোখ, ঘন-কালো চুলের রাশি ...কথার সেই ভঙ্গি...চমৎকার মুখের হাসি...সর্বোপরি তার অনিন্দ্য মুখশ্রী...

তখন সুলোচনাকে বুঝি নাই, চিনি নাই—অভিজ্ঞতার অভাবের দরুন সুলোচনাকে সে সময় চরিত্রহীনা, উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির মেয়ে বলিয়া ভাবিয়াছি। শুধু আমি নই, আমার বন্ধুর বাসায় মেয়েরা সুলোচনা সম্বন্ধে এই মন্তব্যই হৃদয়ঙ্গম করিত! আমিও বিশ্বাস করিতাম। মনে মনে পরলোকবাসিনীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম।

সুলোচনার মা বলিল—মেয়ে রোজ কাঁদে প্রকাশ চলে যাওয়ার পরে। জানলা খুলে চেয়ে থাকে। সতীশকে দু-চোখে দেখতে পারে না। এদিকে যে বাসায় আমরা ছিলাম, তারা ঠিকমত টাকা দিতে না পারাতে আমাদের রাখতে চাইলে না। কালীঘাটে আমরা উঠে গিয়ে ছোট্ট একটি খোলার ঘরে আশ্রয় নিলাম। একদিন সেখানে এল কোথাকার রাজার ম্যানেজার—দশ হাজার টাকার লোভ দেখালে। মেয়ের গা সোনায় মুড়ে দেবে। মেয়ে বললে—মা, চুলগুলো কেটে ফেলি, নয়তো আর পারি নে। আমি বাড়ী নেই, গুণ্ডার দল বাড়ী ঘিরে ফেলেছে—বললে বিশ্বাস করবে না—এই কালীঘাটে, ইংরেজ-রাজত্বের মধ্যে! মেয়ে মাথায় কেরোসিন তেল ঢেলেছে—চুলে আগুন জেলে মরবে। এমন সময় আমি গিয়ে পড়লাম—লোক-ডাকাডাকি করলাম, গুণ্ডার দল পালাল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—সতীশদা যেত না বাসায়?

—যেত, টাকা দিয়ে আসত আমার হাতে মেয়েকে লুকিয়ে। মেয়েও বড্ড নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে সতীশের সঙ্গে। একটা মুখের ভাল কথাও ইদানীং বলত না। আগে আগে ওর চিঠির এক-আধখানার উত্তর দিত—শেষে তাও বন্ধ করে দিলে। আমায় বলত —না মা ওকে আসতে দিও না। ও যে সর্বস্বান্ত হল আমাদের দিয়ে। কুকুরের মত আমরা ওর টাকা খাচ্ছি কেন? ও বিয়ে-থাওয়া করবে না আমাদের না ছাড়লে।

এই সময় পাড়ার এক সুহৃদয় প্রৌঢ় ডাক্তার নিজে চেষ্টা করিয়া সুলোচনাকে মেডিকেল কলেজে নার্সের কাজ শিখিবার জন্য ভর্তি করিয়া দিলেন—পাশ করিয়া প্রথমত সেই ডাক্তারের ডাক্তারখানাতেই কাজ পায়। কিছুদিন সেখানে কাজ করিবার পরে একদিন মাকে আসিয়া বলিল—মা, এ জগতে সব সমান। ওখানে আর আমার কাজ করা চলবে না। ছেড়ে দিয়ে এলুম।

মাস-দুই পরে ক্যাম্বেল হাসপাতালে কাজ জুটিল। তখন ওদের পটলডাঙায় বাসা। মা ক্যাম্বেলের গেট থেকে রোজ রাত এগারটার সময় মেয়েকে বাসায় আনে সঙ্গে করিয়া। তাহার মধ্যেও বহু বিপদ গেল। ক্যাম্বেলের নার্স সুলোচনার রূপের খ্যাতি তখন চারিদিকে ছড়াইয়াছে, ছাত্রমণ্ডলীর অনেকের বাসন্তী প্রেমের-স্বপ্ন সে—কত প্রলোভন তাহাকে যে প্রতিদিন এড়াইয়া চলিতে হইত! গুণ্ডার হাতে পড়িতে পড়িতে কতদিন বাঁচিয়া গিয়াছে। একদিন মাকে বলিল—প্রকাশদা ফিরে এসে এ রকম দেখে খুশী হবে না। সে দেখে অসন্তুষ্ট হয় এমন কাজ কখনও করব না। তুমি আলাদা ছোট বাসা কর—আমি ক্যাম্বেলে নার্সদের হোস্টেলে যাই।

তাহাই হইল। হোস্টেলে দুজনের নাম দিল যারা দেখা করিতে পারিবে—স্বামীর ও প্রকাশদার—আশা ছিল প্রকাশদা একদিন হঠাৎ আসিয়া পড়িবেই।

সুলোচনার মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আচ্ছা, কখনও এর পরে প্রকাশদার পত্র-টত্র আসত না?

বুড়ী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—কখনও না। মেয়ে প্রকাশদা বলতে অজ্ঞান। ভাবত, প্রকাশ আসবে ফিরে। আমায় কতদিন বলেছে এ-কথা। প্রকাশ দেখে খুশী হবে বলেই তো দমদমায় অতিথিশালা খোলা হল ওর স্বামীকে নিয়ে এসে।

আমি অবাক হইয়া বলিলাম—অতিথিশালা! সে কি রকম?

—মেয়ের খেয়াল! এদিকে প্রকাশের নাম ক্যাম্বেলের হোস্টেলে লেখানো, ওদিকে দমদমার অতিথিশালা খোলা প্রকাশকে খুশী করবার জন্যে—প্রকাশ তখন মরে ভূত হয়ে গিয়েছে।

—ওর স্বামীকে আনলেন বুঝি আবার?

—আমরা আনি নি বাবা। ক্যাম্বেলে একজন রুগী এসেছিল সুলোচনার শ্বশুরবাড়ীর গাঁ থেকে। সে গিয়ে খবর দিলে। স্বামী এসে পড়ল, মাপ চাইলে—আমরাও জায়গা দিলাম এই ভেবে যে স্বামী ভিন্ন বাইরে পদে পদে বিপদ। স্বাধীন হয়েও রূপ নিয়ে সর্বদা সশঙ্কিত। কেউ মিত্র নেই, সবাই শত্রু। আজ যে বন্ধু, কাল সে শত্রু। ওর স্বামীকে নিয়ে দমদমায় বাসা করা গেল। যে যায় সেই খায়, তাই নাম হল অতিথিশালা।

আমার সঙ্গে এই সময়েই সুলোচনার দেখা হইয়াছিল। সে-কথাও আমি বৃদ্ধাকে বলিলাম।

বৃদ্ধা বলিল—তোমার কথা বলেছিল এখন আমার মনে হচ্ছে বাবা। তার পর ও চাকরি ছেড়ে দিয়ে প্র্যাক্‌টিস করতে লাগল। বেশ দু-পয়সা আয় হল। দুটি ছেলে হল। জামাইয়ের এক কাঁড়ি দেনা ছিল দেশে, সব ও শোধ দিলে। সেই সময় একদিন কে এসে বললে দমদমার বাসায়—প্রকাশ মারা গিয়েছে। শুনেই মূর্ছা হয়ে পড়ে গেল—সেই থেকে

বুকের রোগ। তাতেই শেষে মারা গেল। খবরটা শোনার পর মোটে ছটি মাস বেঁচে ছিল।

দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

বৃদ্ধা অন্যমনস্কভাবে বলিল—সন্ন্যাসি হয়ে যাব বলে আপদ বিদেয় করবার জন্যে আট বছর বয়েসে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম। সে কোথায় চলে গিয়েছে আজ, আমি এই পঁয়ষট্টি বছর বয়সে এখনও ভুগছি বন্ধনে। সে স্বামীকে ভাল করলে, তাকে মদ ছাড়ালে, মানুষ করলে—করে মরে গেল। জামাইও মারা গিয়েছেন। এখন আমি যদি মরে যাই ছেলে দুটো নিরুপায়। কোথায় দাঁড়াবে! রাস্তায়—গবর্ণমেণ্টের রাস্তায়!

আমার দিকে চাহিয়া বলিল—ইদানিং আমাদের বড় সুখ হয়েছিল। সে তুমি দেখ নি। খাট, আলমারী, বাসন,—সুলোচনা প্র্যাক্‌টিসে বেশ রোজগার করত—টাকা জমিয়ে এ-সব করেছিল। শৌখিন ছিল খুব, সে তুমিও তো দেখেছ। ময়লা কি কুশ্রী জিনিস দু-চোখে দেখতে পারত না। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়ল—জামাইয়ের হাতে অনেক টাকা পড়ল মেয়ে মারা যাওয়ার পরে। জামাই তেজারতি করতে গিয়ে হাওড়ায় জমি বন্ধক রেখে দু হাজার টাকা ধার দিয়েছিল—তার পরে সেও তো মরে গেল। হ্যাণ্ডনোটখানা এখনও আছে, হ্যাঁ বাবা, তাতে কিছু হয়?

বুড়ীকে বলিলাম, চোদ্দ বছর পরে সে হ্যাণ্ডনোটে আর কিছু হইবে না। রাখিয়া ঘরের জঞ্জাল বৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোন সার্থকতা তার নাই।

হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়িল। বলিলাম—আচ্ছা, ওর সঙ্গে একটা ছোকরাকে বেড়াতে দেখেছিলাম। সে কে জানেন?

বুড়ী বলিল—শ্যামবর্ণ একহারা চেহারা তো? বছর বাইশ বয়েস? ও তো তার দেওর। পুনের জ্যাঠতুত ভাই—দমদমার বাসায় থেকে পড়ত।

আমার কতদিনের ভুল ভাঙিয়া গেল। কি অবিচার করিয়াছি সুলোচনার প্রতি।

সুলোচনা যে-যুগে বাহিরে চলাফেরা করিত, সে যুগে মেয়েদের অমন ভাব কেহ পছন্দ করিত না বলিয়াই তাহার নামে নানা কথা উঠিয়াছিল। সেই তরুণীর সচেতন অন্তরাত্মা যাহাকে ভালবাসিয়াছিল, তাহারই একনিষ্ঠ ধ্যানে সে দিনের পর দিন বৃথা অপেক্ষা করিয়া মরিত আশার কুহকে।

ক্যাম্বেলের সামনে দিয়া ট্রামে যাতায়াত করিবার সময় অভাগী সুলোচনার কথা আজকাল বড় মনে পড়ে।

বেচারী

কলিকাতায় বোমার হাঙ্গামা উপলক্ষে বহুদিনের কলিকাতা-বাসা ত্যাগ করিয়া সপরিবারে গিয়া ভগ্নীপতির বাড়ী আশ্রয় লইয়াছি।

একেবারে অজ পাড়াগাঁ। রেল স্টেশন হইতে সাত ক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া অথবা গরুর গাড়ীতে গেলে গ্রামে পেঁছনো যায়। ভগ্নীপতিদের মেটে বাড়ী, তাহাদেরই স্থান সংকুলান হয় না; তবে বিপদের দিনে, আপাতত বোমায় মরিতে বসিয়াছি দেখিয়া তাহারা নিজেদের অসুবিধা করিয়াও বাহিরের ঘরখানি আমাদের জন্য ছাড়িয়া দিল। আমরা গরুর গাড়ী হইতে নামিতেই দেখি বাহিরের ঘর হইতে তিনটি তোরঙ্গ, একটি বড় বিছানা, গোটা দুই পুঁটুলি স্থানান্তরিত হইতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম আমার ভগ্নীপতির মেজভাইয়ের শ্যালীপতি-ভ্রাতাও সপরিবারে ইছাপুর না দমদম হইতে সপ্তাহ খানেক পূর্বে আসিয়া এখানে আশ্রয় লইয়াছেন এবং বাহিরের ঘরে তাহারাই ছিলেন। বাড়ীর মধ্যে রান্নাঘরের পাশে যে নাতিক্ষুদ্র ভাঁড়ার ঘর আছে, আপাতত সেখানেই

তাঁহাদের থাকিবার ব্যবস্থা করা হইল।

বহুদিন কলিকাতায় বাসা করিয়া আছি, বাড়ী করিবার সংগতি অবশ্য নাই। সংগতি ছিল না এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম, জাপানী বোমার ঘায়ে সে বাড়ী কতক্ষণ টিকিত? আমার যে সব বন্ধুবান্ধবকে কলিকাতায় বাড়ী করিবার জন্য এতদিন হিংসা করিতাম, আজ তাহাদের প্রতি সে হিংসার ভাব করুণা ও সহানুভূতিতে পরিণত হইয়াছে। বেচারী-দের পয়সাগুলো অনর্থক নষ্ট হইল।

দু-একদিন কাটিয়া গেল।

চারিদিকে চাহিয়া দেখি গ্রামের মধ্যে ভীষণ জঙ্গল, খানা ডোবা বাঁশবন। শীতের শেষ, স্ত্রী একদিন আমায় আসিয়া বলিলেন, ওগো, কত চালতে পড়ে আছে বনের মধ্যে, দেখবে এস—

আমার স্ত্রী শহরের মেয়ে। পাড়াগাঁয়ের বনে বাগানে পাকা চালতে শীতকালে পড়িয়া থাকা বিশেষ আশ্চর্যের কথা নয়, তাহা না বলিয়া তাঁহার আনন্দটাকে আরো ঘনীভূত হইবার অবকাশ দিবার জন্য দুজনে বনের দিকে ছুটিয়া গেলাম।

—ওঃ তাই তো! এ যে অনেক দেখছি!

—এক একটা চালতের দাম কলকাতায় দু পয়সা—আর দেখ এখানে কিনতে হয় না। কুড়িয়ে নেব—হ্যাঁগো, কেউ কিছু বলবে না তো?

—কে আবার কি বলবে। বাগানে চালতে পড়ে আছে, কুড়িয়ে নেবে তা কে কি বলবে এসব পাড়াগাঁয়ে।

এমন সময় আমার স্ত্রী বলিলেন—ও কে গো?

চাহিয়া দেখি একটি বাইশ-তেইশ বছরের যুবক একটা ঝুড়ি হাতে ওদিক হইতে বন ঠেলিয়া গাছতলায় সম্ভবত চালতে কুড়াইতে আসিতেছে। আমাদের দুজনকে দেখিয়া সে একটু সমীহ করিয়া থমকিয়া পড়িল। আমি তাহাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলাম—চালতে গাছ কি তোমাদের? দুটো চালতে কুড়ুচ্ছি কিন্তু—

যুবক হাসিয়া বলিল—ইউ মে টেক, নট মাই ট্রি।

তাই তো, এ দেখিতেছি ইংরেজী-জানা লোক, নিতান্ত গ্রাম্য লোক নয় তাহা হইলে। যদিও আমার সংগে ইংরেজি বলার সার্থকতা কি তাহা বুঝিলাম না।

বলিলাম—আপনার বাড়ী এখানেই বুঝি?

—নো, আই ওয়াজ এ ক্লার্ক য়্যাট ক্যালকাটা, নাউ আই য়্যাম হিয়ার।

—বেশ বেশ, তাহলে আমাদের মতই অবস্থা দেখছি। জাপানী বোমার ভয়?

যুবক হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল, হাঁ না কিছুই বলিল না।

বৈকালের দিকে ছোকরার সংগে ভাল করিয়া আলাপ হইল। জানিলাম, তাহার নাম সুরেশ। আমার ভগ্নীপতির বাড়ীর পাশে যে মুখুজ্যেবাড়ী, সে সেই বাড়ীর রাসু মুখুজ্যের শ্যালক। মুখুজ্যেবাড়ীর অন্যান্য লোকে কলিকাতায় ও কলিকাতার বাহিরে বিভিন্ন স্থানে চাকরি করে, কখনও বাড়ীঘরে না আসার দরুন পৈতৃক সুবৃহৎ দোতলা বাড়ী ভাঙিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, বর্তমানে সেই বাড়ীর রাসু মুখুজ্যেই গবর্ণ-মেণ্টের দপ্তরখানায় কেরানীগীরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বাড়ী আসিয়া তিন বৎসর যাবৎ বাস করিতেছেন। গোটা পঞ্চাশেক টাকা পেনশন পান বলিয়া দেশে আছেন, নতুবা কলিকাতায় বাসা করিতেন।

বলিলাম—তুমি কি এই তিন বছরই এখানে আছ?

—হ্যাঁ দাদা। হোয়ার শ্যাল আই গো? এখন চাকরি নেই কিনা। তবে শীগগিরই

হবে।

—বেশ বেশ, খুব ভাল। তোমাদের দেশ কোথায়?

—দেশ ছিল ক্যালকাটার পাশেই—ইয়ে রাজবল্লভপুর, টালিগঞ্জের ওদিকে। এখন সেখানে কেউ নেই। মা এখানেই থাকেন, দিদি আছেন। আমিও এখানেই এখন আছি, তবে আই হোপ, এই মার্চ মাসেই আই উইল সিকিওর এ সার্ভিস। আই অ্যাম এ ম্যাট্রিক পাস্‌ড্‌।

—বাঃ, খুব ভাল।

ছোকরার সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে বেশ একটু কৌতুক বোধ করিতে লাগিলাম। বেশ চেহারা, মাথায় চেরা সিঁথিটি যত্নে তৈরি করা, পরনে আধময়লা ধুতি, গায়ে গেঞ্জি, বোধ হয় কিছুক্ষণ আগে বিড়ি টানিতেছিল, আমায় দেখিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, কারণ বিড়ির ধোঁয়ার গন্ধ বাতাসে।

—আপনি বুঝি স্যার, ক্যালকাটাতেই—

—হ্যাঁ, আমর কর্মস্থান কলকাতাতেই ছিল, স্কুলে মাস্টারি করতাম। এখন স্কুল সব বন্ধ, তাই এখানে—

—আপনি কি পাশ সার?

—এম-এ পাশ করেছিলাম।

ছোকরা বিনয়ে সম্ভ্রমে কাঁচুমাচু হইয়া বলিল—দেন্‌ ইউ আর এ কালচার্ড ম্যান সার—ভারি খুশী হলাম আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে। আই অ্যাম ওন্‌লি ম্যাট্রিক পাস্‌ড—কিন্তু দেখুন সার, লেখাপড়া আমি বড় ভালবাসি।

—সে তো খুব আনন্দের কথা। ভদ্রলোকের ছেলে, হবারই তো কথা।

—প্রেণ্টিস সাহেব দাদাবাবুদের বড়সাহেব। একদিন দাদাবাবুদের আপিসে গিয়ে চুপ করে বসে আছি, প্রেণ্টিস সাহেব যাচ্ছে বারান্দা দিয়ে। জানেন তো সার, প্রেণ্টিস সাহেব, চিফ সেক্রেটারি টু দি গভর্ণমেণ্ট অব বেঙ্গল—কি চেহারা! গটমট করে যাচ্ছে কি—সাহেব বাচ্ছা! দাদাবাবুর ঘরের সামনে দিয়ে গেল একেবারে। দেখেছেন প্রেণ্টিস সাহেবকে দাদা?

—না।

—মস্তলোক প্রেণ্টিস সাহেব। দেখুন কত বড় বড় লোকের সঙ্গে মিশে এসেছি, এখন এই পাড়াগাঁয়ে যত সব আনকাল্‌চার্ড লোকের সঙ্গে মেশা—আই ডু নট লাইক ইট।

যদিও বুঝিলাম না সে প্রেণ্টিস সাহেবের সঙ্গে মেলামেশা কি ভাবে এবং কখন করিল তবুও ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া বলিলাম, ঠিক কথা, ঠিক কথা।

বাড়ীতে আসিয়া স্ত্রীর কাছে সব বলিলাম। স্ত্রী বলিলেন—আহা, ছোকরাটি ভাল, এখানে ভগ্নীপতির বাড়ী পড়ে আছে কেন? অল্প বয়েস—চাকরি করে না কেন?

—বেকারের সংখ্যা তো জান না দেশের! কত বি-এ, এম-এ, ফ্যা-ফ্যা করছে এ বাজারে—ও তো সামান্য ম্যাট্রিক, ওকে চাকরি দিচ্ছে কে।

দিনকতক কাটিয়া গেল। একটি জিনিস খুব কৌতূহলের সহিত লক্ষ্য করিলাম, পাড়াগাঁয়ে লোকে সময় কি করিয়া কাটায়। এসব নির্জন পল্লীগ্রামে সময় কাটানো যে কত কষ্টকর, তা যাঁহার অভিজ্ঞতা নাই তিনি বুঝিবেন না। কলিকাতা হইতে আসিয়া নিতান্তই কষ্টে পড়িয়াছিলাম, অথচ দেখিলাম পেন্‌শন-প্রাপ্ত রাসু মুখুজ্যে সকালে উঠিয়া একখানা ন-হাতি কাপড় পরিয়া চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখস্থ জঙ্গল পরিষ্কার করিতেছেন, মানকচুর চারা এখান হইতে ওখানে পুঁতিতেছেন, মাঝে মাঝে তামাক

খাইতেছেন।

আমাকে দেখিয়া বলিলেন—নিতুবাবু যে? কোথায় চললে?

—যাব আর কোথায়! আপনার গ্রামে মোটে তিনঘর ভদ্রলোক, কার বাড়ী গিয়েই বা বসি?

—এস এস, আমার এখানে একটু বস। তামাক খাও?

—আজ্ঞে না।

তিনি আমার পাশে আসিয়া বসিলেন এবং কি করিয়া বাড়ীর পিছনের জমিতে আর-বছর কুমড়া লাগাইয়াছিলেন, এবার মানকচু কি রকম পুঁতিয়াছেন—এই সকল গল্প কিছু-ক্ষণ করিয়া আমায় বলিলেন—চা খাবে? ও সুরেশ—

রাসু মুখুজ্যের শ্যালক আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দুজনের চা আনিতে বলিয়া আমায় বলিলেন—এই গ্রামে ধর পঁচিশ বছর পরে এসে আজ তিন বছর বাস করছি—তা আছি বেশ। ঝঞ্ঝাট নেই—খাঁটি দুধটুকু বাড়ীর গরুর—

পল্লীগ্রামের সুখ-সুবিধার নানারূপ গল্প করিতে করিতে চা আসিয়া গেল।

ছোকরা চা দিয়া বলিল—গুড় আর চিনি নেই, দিদি বলে দিলে।

রাসু মুখুজ্যে কর্কশকণ্ঠে বলিলেন—নেই তা নিয়ে এস গে না বাজার থেকে… আমায় বলতে এসেছেন চিনি নেই! যাও, বাজার থেকে এনে রাখ। তোমার দিদির কাছ থেকে পয়সা নাও গে যাও— কুঁড়েমি আমি একেবারে দেখতে পারি নে।

ছোকরা মুখ কাঁচুমাচু করিয়া চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই দুইটি তেলের ভাঁড় আর একটা ছোট থলের প্যাকেট লইয়া আমাদের সামনে দিয়াই, বোধ হয় বাজারেই চলিল। বেলা প্রায় দশটা বাজে, নেউলের বাজার এখান হইতে যাতায়াতে সাত মাইল পথ—রাসু মুখুজ্যে যে তাঁহার শ্যালকটির উপর যথেষ্ট স্নেহশীল নহেন, তাহা এই ব্যাপার হইতেই বুঝিতে পারিলাম।

সন্ধ্যাবেলা দু ধারে জঙ্গলাবৃত সরু পথে একটু পায়চারি করিতেছি, রাসু মুখুজ্যের শ্যালক পিছন হইতে বলিল—সার?

—এই যে সুরেশ! খবর কি?

—ভাল লাগে না সার একটুও এখানে। আসুন কোথাও বসে গল্প করা যাক। আসুন আমার সঙ্গে।

কিছুদূর গিয়া একটা চারিদিক খোলা চালাঘর।

ছোকরা বলিল—এই হল গাঁয়ের বারোয়ারী ঘর, অর্থাৎ টাউন হল!

—ও।

—দেখুন তো যত সব চাষার কাণ্ড! এমন গাঁয়ে ভদ্রলোক থাকে?

—তা তো হল, এখানে বসবে নাকি? কি পেতে বসবে এখানে?

—দাঁড়ান, নবীনের বাড়ী থেকে দুটো বিচুলি নিয়ে আসি। তা ছাড়া আর কি পাতি বলুন।

কিছুক্ষণ পরে ছোকরা বিচালি হাতে ফিরিয়া বলিল, একটু চায়ের বন্দোবস্ত করে এলাম। নবীনের বাড়ী বলে এলাম—এখুনি করে দিয়ে যাবে। ওরা জাতে কাপালী। আপনি যেন দাদাবাবুকে বলবেন না গিয়ে। দাদাবাবু বড় বকে! আচার-বিচের খুব কিনা? বড্ড গোঁড়া—ভেরি অর্থোডক্স।

বলিলাম—ও।

ছোকরা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া হঠাৎ কোনও কথা মনে পড়িবার ধরনে বলিল

—আমি আজ পাড়াগাঁয়ে আছি বটে, কিন্তু দাদা বড় বড় লোকের সঙ্গে—আচ্ছা আপনি ল্যাম্বেথ সাহেবকে চিনতেন? আমি তাঁকে ক্যালকাটা পুলিশ ক্লাবে দেখেছি সাত হাতের মধ্যে। জে. সি. ল্যাম্বেথ, ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের স্পেশাল অফিসার ছিলেন, ইদানীং ডি আই জি-র পার্সোনাল য়্যাসিস্ট্যান্ট হয়েছিলেন—সাড়ে সাতশ টাকা মাইনে।

সবিস্ময়ে বলিলাম—বল কি! সাত হাতের মধ্যে? পুলিশ ক্লাবে কি জন্য গিয়েছিলে?

অতীত গৌরবের দিনের স্মৃতি মনে পড়াতে মানুষের মুখে যে আনন্দের রেখা ফুটিয়া ওঠে, ছোকরার সারা মুখমণ্ডলে তাহা পরিস্ফুট হইতে দেখিলাম। সে স্বপ্নভরা চোখ আকাশের দিকে তুলিয়া বলিল—কুণ্ডু য়্যাণ্ড সন্স কেটারার ছিল পুলিশ ক্লাবের য়্যানুয়েল গ্যাদারিং-এ; কুণ্ডুদের বড় ছেলে হরিচরণ আমার বুজম্ ফ্রেণ্ড কিনা! তারা একখানা করে কার্ড দিত, এতবড় কার্ড, সোনার জলে নাম লেখা। আমি দু বার গিয়েছি। গ্র্যাণ্ড হোটেলে গ্যাদারিং হত। আমি প্লেটে কেক দিতে গেলাম, আমায় হিউজেস বললে—নো মোর, থ্যাঙ্ক ইউ!

—হিউজেস সাহেব আবার কে?

—জোসেফ হিউজেস, ম্যাক-আর্থার কোম্পানির বড়সাহেব—ওই যে ক্লাইভ স্ট্রীটে পাঁচতলা মস্ত বড় বিল্ডিং—সাত শ ক্লার্ক খাটে তার আণ্ডারে। এই গোঁফ, চোখ দুটো দেখলে ভয় করে, বাঘের জাত। সে কিন্তু কেমন হেসে বললে—নো মোর, থ্যাঙ্ক ইউ। আচ্ছা, ওরা এমনি খুব ভদ্রলোক, কি বলেন?

—নিশ্চয় নিশ্চয়, বাঃ—

ছোকরার কিন্তু আমার উত্তরের দিকে আদৌ মন ছিল না, সে অন্যমনস্কভাবে পূর্ববৎ স্বপ্নময় চোখে বলিয়া চলিয়াছে। একবার রামনগরের মহারাজা কাউন্সিল হাউস হইতে বাহির হইতেছেন, সে কোন্ বারান্দার দুয়ারে দাঁড়াইয়া ছিল, একেবারে তাহার গা ঘেঁষিয়া মহারাজা চলিয়া যাইতেছেন, হঠাৎ মহারাজের হাতের সোনা-বাঁধানো বেতের গুঁতো তাহার গায়ে সামান্যভাবে লাগিতেই খোদ মহারাজা স্বয়ং তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিলেন—ও, আই য়্যাম সো সরি!—আজও তাহার কানে কথাগুলি লাগিয়া আছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—সেখানে কি জন্যে গিয়েছিলে?

—বা রে, দাদাবাবু তো সেখানেই টাইপিস্ট ছিলেন, দেখা করতে গিয়েছিলাম যে ওঁর সঙ্গে।

বলিলাম—বাঃ, তুমি তাহলে তো অনেক বড় বড় লোক দেখেছ!

ছোকরা উৎসাহের সুরে বলিল তা আপনার আশীর্বাদে সার, অনেক দেখেছি। আজই পড়ে আছি এই অজ পাড়াগাঁয়ে। আই হ্যাভ সীন মেনি মেনি বিগ পিপ্‌ল্—সেই জন্যে আমার ভাল লাগে না এসব জায়গা।

এই সময় একটি বিধবা স্ত্রীলোক একখানা কাঁসার থালায় দু পেয়ালা চা সাজাইয়া আনিয়া আমাকে দেখিয়া একটু সঙ্কোচবোধ করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

ছোকরা বলিল—এস না, দিয়ে যাও। ইনি পশুপতিবাবুর আত্মীয়। লজ্জা নেই, নিয়ে এস।

তবুও মেয়েটি না নড়াতে আমি বলিলাম—তুমি গিয়ে নিয়ে এস।

চা খাইতে খাইতে সুরেশ বলিল—আমার একটু ভাল লোকের সঙ্গে কথা বলবার ঝোঁক আছে চিরকাল। তা এই সব জায়গায় আপনি কোথায় পাবেন বলুন। সব মুখ্যু, নো ওয়ান ইজ ইভ্‌ন্ ম্যাট্রিক পাস্‌ড্। দুটো ভাল কথা বলি এমন মানুষ নেই। মন যেন কেমন হাঁপিয়ে উঠেছে।

—সময় কাটাও কি করে?

—বাড়ীর কাজ করি। বাজারে যাই, নবীনদের বাড়ী এসে মাঝে মাঝে বসি। তা নবীন বরং ভাল, দুটো ভাল কথা শুনতে চায়। ওকে সেদিন বললাম, তোরা এখানে কেমন করে থাকিস? আমি দেখেছি কলকাতায় বড় বড় লোকের বাড়ী আলাদা নাইবার ঘর আছে, তাকে বাথ-রুম বলে। গরম জল, ঠাণ্ডা জল। মেদিনীপুরের জমিদারের রডন স্ট্রীটে যে বড় বাড়ী আছে দেখেছেন? একবার আমি তাঁদের বাড়ী গিয়েছিলাম আমার এক বন্ধুর সঙ্গে। দোতলায় বাথ-রুম। বাড়ীখানা কি! বাথ-রুমে একখানা আয়না আছে, সমস্ত শরীর একসঙ্গে দেখা যায়। মেঝেতে আপনি কেন মুখ দেখুন না, এমনিই সুন্দর করে পালিশ করা। সকালবেলা গিয়েছিলুম, বাবুর জন্যে খাবার গেল—চেয়ে চেয়ে দেখলাম, ডিম সেদ্ধ, টোস্ট আর দুটি রসগোল্লা, দুটো কলা। আমাদের একমুঠো চাল ভাজা, তাও সবদিন জোটে না সকালে উঠে! তাই নীবনকে বললাম—তোরা বেঁচে আছিস ভূতের মত! মানুষ এমন করে বাস করে না। মানুষের মত বাস করতে হলে কলকাতায় গিয়ে দেখে আয়।—আপনি কি বলেন দাদা?

কথাটা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি, সুতরাং বলিলাম—সে কথা খুবই ঠিক। এসব জায়গায় বর্ষাকালে থাকা অসম্ভব। যেমন কাদা তেমনি মশা। চাহিয়া দেখিয়া বেশ আমোদবোধ করিলাম, বেশ জায়গাতে বসিয়া চা পান করিতেছি বটে! গ্রাম্য শেওড়া ভাট শিউলি গাছের জঙ্গলে একখানা চালাঘরে মাটির মেঝেতে বিচুলি বিছাইয়া আংটা-ভাঙা পেয়ালায় কাপালীদের বাড়ীর তৈরী চা খাইতে খাইতে দুজনে কলিকাতার সুখ-সুবিধার কথা আলোচনা করিতেছি!

ছোকরাও বোধ হয় একই কথা ভাবিতেছিল। কারণ সে এই সময় হঠাৎ বলিল—কতদিন কলকাতায় যে যাইনি! ঐ যেদিন, বললাম না, কুণ্ডু য়্যাণ্ড সন্স, পুলিশ ক্লাবে যারা খাবার সাপ্লাই করেছিল—প্লাম কেক, স্যাণ্ডউইচ, বিস্কুট, আরও সব মেলা কি কি—ওদের দোকান হল হগ মার্কেটে, কুণ্ডুদের বড় ছেলের সঙ্গে আমার ভাব—তা ওদের দোকানে সকালে বসে আছি, এমন সময় একজন মোটা মত ভদ্রলোক, দিব্যি চেহারা—দোকানে এসে কি চাইলে। কুণ্ডুদের ছেলে বললে—ইনি কে জান? আমি বললাম, না। বলল, মহারাজা অব নাটাগোড়। আমি তো অবাক! বলব কি আপনাকে, আমার গা শিউরে উঠল। কত নাম, কত টাকাকড়ি, খবরের কাগজে কত ছবি বার হয়—এই সেই মহারাজা অব নাটাগোড়, দেখি মহারাজার আরদালি জিনিস নিয়ে গিয়ে, ইয়া বড় মটর দাঁড়িয়ে আছে, তাতে তুললে। সেসব এক দিন গিয়েছে! এই আমি আর ওই মহারাজ! এখন এখানে বসে বাগদি-দুলে বাড়ী বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি। আজ আপনি এসেছেন, তাই আপনার সঙ্গে দুটো ভাল কথা বলছি, নইলে এতক্ষণ নবীন কাপালীর বাড়ী বসে গল্প করতে হত।

আহা, তোমার ভগ্নীপতি রাসুবাবু তো অনেক ভাল ভাল লোকের সঙ্গে মিশেছেন—তা এখন কি করে দিন কাটান?

ভগ্নীপতির উপর দেখিলাম ছোকরার অসীম শ্রদ্ধা। ভগ্নীপতির সঙ্গে কতবার তাঁর আপিসে গিয়া বড় বড় লোক দেখিয়াছে—ইডেন গার্ডেনের পাশে প্রকাণ্ড বাড়ী, এই বড় থাম,—আবার ছোকরা স্মৃতির সমুদ্রে ডুবিয়া গেল।

এক সময় কাপালীদের বাড়ী হইতে সেই স্ত্রীলোকটি আসিয়া পূর্ববৎ দূরে দাঁড়াইল। ছোকরা বলিল—পান নিয়ে এসেছে। চায়ের এগুলো দিয়ে আসি আর পান আনি।

একটা কাঁসার বাটিতে চার খিলি পান লবঙ্গ দিয়া মুড়িয়া পরিপাটি করিয়া সাজা।

ছোকরা বলিল—আমি পান খাই নে—আপনি খান।

তার পর আবার আমরা গল্প শুরু করিলাম। দেখিলাম ছোকরার অদ্ভুত ধরনের ক্ষমতা তার নিজেকে প্রতারণা করিবার। তার বর্তমান অবস্থাকে সে কেমন চমৎকার ভুলাইয়াছে ভবিষ্যৎ ও অতীতের সুখস্বপ্ন দ্বারা।

—চাকরি আমার হয়ে যাবে এই জানুয়ারি মাসে। আমার অনেক বড় বড় সহায় আছে কলকাতায়। এখান থেকে বেরুতে পারলে বাঁচি। একটা ভাল লোকের মুখ দেখতে পাই নি আজ তিন বছরের মধ্যে।

একথা তাহাকে অবশ্য জিজ্ঞাসা করি নাই, এতই যদি তাহার সহায়, তবে আজ তিন বছর এখানে পড়িয়া থাকিয়া ভগ্নীপতির বাজার-সরকারি করিতেছে কেন?

আরও কিছুদিন কাটিয়া গেল। একদিন চৈত্র মাসের দুপুর রোদে দেখি সে সাত মাইল দূরবর্তী বাজার হইতে প্রকাণ্ড একটি ভারী মোট ঝুলাইয়া আসিতেছে। খালের ধারে আমার সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখিয়া মোট নামাইয়া গাছের ছায়ায় একটু বসিল। বলিলাম—এতে কি?

—হাট-বাজার করে ফিরছি। আটা, ডাল, নুন, এই সব।

—রাসু মুখুজ্যে আজ সকালে বকাবকি করছিলেন কাকে?

—দাদাবাবুর মেজাজ বড় গরম। বাগ্‌দিপাড়ার এক প্রজাকে ডাকতে পাঠালেন, একটু দেরি হয়েছে ফিরতে আমার, আর অমনি বকাবকি শুরু করেছেন।

—তোমার দিদি কিছু বলেন না?

—দাদাবাবুকে দিদি বড় ভয় করে চলে।

ছোকরা চলিয়া গেল। সে রাত্রেই আমার স্ত্রী বলিলেন—আচ্ছা, রাসু মুখুজ্যের শাশুড়ি এখানে থাকেন কেন?

—তা কি করে বলব?

—বড় ভাল লোক। এমন হাতের রান্না! আমায় বিকেলে আজ জলখাবার খাইয়েছিলেন। যেমন মিষ্টি কথাবার্তা—বাবা, রাসুবাবু ওঁর শালাকে যা বকলেন আমার সামনে! বাজার থেকে কি জিনিস ভুলে আনে নি। একেবারে নন্‌সেন্স, বেরিয়ে যাও, বসে বসে গিলছ! এমন সব যা তা বললেন, মায়ের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

—মুখুজ্যে মশায়ের স্ত্রী কিছু বললেন না?

—ও বাবা, তিনি ভয়ে কাঁটা! মানে, একটু কিন্তু-কিন্তু মনেই হয় তো? এই বাজারে মনে ভাব, মা ভাই সংসারের গলগ্রহ তো? আচ্ছা, কেন ছেলেটিকে বল না কোথাও গিয়ে কিছু করতে? এর চেয়ে যে বেরিয়ে গিয়ে যা হয় একটা কিছু করাও ভাল। যতদূর বুঝলাম মায়ের মনে খুব দুঃখু। জামাইয়ের ভাত গলা দিয়ে নামে না।

শুনিয়া খুবই দুঃখিত হইলাম। ভাবিলাম কালই ছোকরাকে বুঝাইয়া বলি। অল্প বয়স, এই তো জীবনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া যুঝিবার সময়; সারাজীবন তার সামনে. বৃহত্তর ক্ষেত্রে অগ্রসর হোক বীরের মত—তবে তো সে নিজেকেও খুঁজিয়া পাইবে। এ বাঁচা তো জড় পদার্থের অচলত্ব, ইহা তাহাকে বুঝাইতেই হইবে।

পরদিন তাহার সঙ্গে আবার দেখা। সে নিজেই আমাকে বলিল,—দেখুন, একটা কাজ পাচ্ছি এখানেই বাড়ী বসে—নেব? কাপালীপাড়ার সবাই বলছে গ্রামের বারোয়ারী ঘরে একটা পাঠশালা খুলতে। ছাত্র-পিছু চার আনা দেবে। বিশ-পঁচিশটে ছাত্র আপাতত হবে। তার পর ওরা আরও জোগাড় করে দেবে বলেছে। কি বলেন? ভাল হবে?

—বসে না থেকে ভালই, যা পাও। তোমার পক্ষে বসে থাকাটা—

দিন কয়েক পরে বারোয়ারী ঘরের দিকে বেড়াইতে গিয়া দেখি ছাত্রছাত্রীরা সমস্বরে শটকে' পড়িতেছে—

দুয়ের পিঠে সাত দিলে সাতাশ হয়,
সাতাশের সাত নামে হাতে দুই রয়।

আমাকে দেখিয়া সুরেশ বলিল—আসুন সার, বসুন একটু।—সাতটি ছাত্র আর এই চারিটি ছাত্রী জুটেছে—আরও অনেক আসবে বলেছে সামনের মাস থেকে। নবীন, সাধু বাগ্‌দী, হরি কলু এরা সব ভরসা দিয়েছে।

আমি কিন্তু খুব ভরসা পাইলাম না। ছোকরা যে রকম খুশির সুরে পাঠশালাটিকে কেন্দ্র করিয়া স্বীয় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অঙ্কিত করিতে লাগিল, তাহাতে তাহার উপর বড় মায়া হইল। এই অতি সামান্য মোচার খোলায় সে সমুদ্রপারের যে কল্পনায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা যে কত ক্ষণভঙ্গুর সে সম্বন্ধে এই অনভিজ্ঞ যুবক কিছুই জানে না। পাড়াগাঁয়ের পাঠশালা! এইসব ধেড়ে ছাত্রেরা গরু চরাইত, লেখাপড়ায় ইহাদের মন নাই। দুর্গন্ধ মলিন বস্ত্র পরিয়া ভাঙা শেলেট ও কোণ-কোঁকড়ানো প্রথম ভাগ হাতে এই বয়সে বিদ্যালয়ে পড়িতে আসিয়াছে, তাহার কারণ—এখন মাঠে মাঠে ধান, গরু চরাইবার সুবিধা নাই—ভাদ্রের প্রথমে আউস ধান কাটিবার পর যেমন মাঠ ফাঁকা হইয়া যাইবে, ইহাদেরও ছাত্রজীবন সাঙ্গ হইয়া রাখাল-জীবনের শুরু হইবে। পাড়াগাঁয়ের ধাত জানিতে আমার বাকি নাই।

সুরেশ আমার কাছে বসিয়া হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিল—বি-এ পাশ করে চাকরি করার চেয়ে এ ঢের ভাল। আপনি দেখুন হিসেব করে, এরা দেবে চার আনা করে মাথা পিছু—পঞ্চাশটি ছাত্র হলেই পঞ্চাশ সিকে অর্থাৎ সাড়ে বার টাকা। তাছাড়া এরা ধানের সময় ধান দেবে, ক্ষেতে ডাল হলে ডাল দেবে, কলাটা মুলোটা—। বাড়ীর খেয়ে এ যে-কোন চাকরির চেয়ে ভাল। আমি কেবল ভাবছি এ আমি এতদিন করিনি কেন।

—রাসু মুখুজ্যে মশায় কি বলেন?

—তিনি বললেন বাড়ী বসে না থেকে ও খুব ভাল। আচ্ছা, ইন্‌স্‌পেক্টরের আপিসে লিখলে কিছু গ্র্যাণ্ট পাওয়া যাবে না? মর্গ্যান সাহেবকে আমি ধরতে পারি গিয়ে। মর্গ্যান সাহেবের সঙ্গে ডি. পি. আই. এর খুব আলাপ। দাদাবাবুর মামাতো ভাই মর্গ্যান সাহেবের আপিসে কাজ করে—তাকে দিয়ে ধরাতে পারি মর্গ্যান সাহেবকে।

—কে মর্গ্যান সাহেব?

—ক্যালকাটা ট্রেডিং কোম্পানির ম্যানেজার। নাম শোনেন নি? মস্ত লোক।

—তুমি তাকে দেখেছ নাকি?

ছোকরা আমার কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া উৎফুল্ল মুখে বলিল—আপনি বললে বিশ্বাস করবেন না, দাদাবাবুর মামাতো ভাই তো সেই অফিসে কাজ করেন, আমি একবার চিঠি নিয়ে গিয়েছিলাম তাঁর কাছে। ঢুকতেই বাঁ দিকের যে বড় ঘর, মাইকার পর্দা বসানো কাটা দরজা ঠেলুন, এমন স্প্রিং লাগানো আছে, তখনই বন্ধ হয়ে যাবে—সেই ঘরে মর্গ্যান সাহেব বসেন। আমি ফাঁক দিয়ে দেখি এমনি মোটা চুরুট খাচ্ছে! আচ্ছা ওসব চুরুটের দাম কত?

—অনেক। আচ্ছা, তুমি স্কুল কর আমি আসি বেরিয়ে।

যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। স্কুল উঠিয়া গেল দু মাসের মধ্যে। যত-দিন টিকিবে ভাবিয়াছিলাম, ততদিনও টিকিল না। একদিন দেখি সুরেশ বেলা একটার সময় বাড়ীর পাশের কাঁচকলার ঝাড়ে কোপ মারিয়া গাছ কাটিতেছে।

বলিলাম—স্কুলে যাও নি?

—ইয়ে—স্কুল উঠে গেল।

—সে কি! কেন?

—ছাত্র হল না। দু মাস দেখলাম, তার পর কেউ মাইনে দেয় না। ভূতের বেগার আর কতদিন খাটি বলুন। চাষার ছেলে, ওরা স্কুল-কলেজের মর্ম কি বুঝবে বলুন দেখি। নিউটন বলেছেন—আমি সমুদ্রের ধারে নুড়ি কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি। সার আইজাক নিউটন—একজন কত বড়দরের সাহেব, ভাবুন, তো—ওদের সেসব কথা বুঝিয়ে লাভ কি। মরুক গে, আমার ও ভূতের বেগার না খেটে—

রাসু মুখুজ্যে আমায় একদিন বলিলেন—ছোঁড়াটা একেবারে ওয়ার্থলেস। একটা কাজে পাঠাও, তিন ঘণ্টা দেরি করে আসবে। ও হয়েছে আমার একটা বোঝা।

—একটা কিছু চাকরিতে ঢুকিয়ে দিন না ওকে। এ রকম বসিয়ে রেখে—

—বসিয়ে রেখিছি কি সাধে! ম্যাট্রিক থার্ড ডিভিসনে পাশ—ওকে কোথায় ঢুকুই বল তো? বি.এ., এম.এ., এ বাজারে······আমার ঘাড়েই যত—

—কেন, এখানেও খাটে তো কম নয়। হাটে বাজারে যাচ্ছে, জিনিসপত্র বয়ে আনছে—

রাসু মুখুজ্যে অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন—ওইটেই সবাই দেখে। আমি কি তবে অত বড় ছেলেকে বসিয়ে বসিয়ে খেতে দেব? আমার তো সে অবস্থা নয়। আমি নিজে কত খাটি দেখ তো—সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত—

সুতরাং ছোকরার আবার চাকরের জীবন শুরু হইল। গরুর জাব কাটা, গরু মাঠে দিয়া আসা, হাট বাজার করা, আরও সংসারের যাবতীয় পরিশ্রমের কাজ। অথচ আশ্চর্য এই যে, ছোকরার স্বপ্ন তেমনি মায়াময়, কল্পনা তেমনি রঙিন রহিয়া গেল। বাস্তবকে সে স্বীকার করিতে আদৌ রাজী হইল না।

গ্রীষ্মকাল কাটিয়া আষাঢ় মাসের প্রথম সেই যে ভীষণ বর্ষা পড়িল, শ্রাবণ মাস যায় যায় সে বর্ষার বিরাম বিশ্রাম নাই। চারিধার জলে ডুবুডুবু, রাস্তাঘাট কাদায় হাবড়, বন জঙ্গলে উঠান ঢাকিয়া গেল। আমার স্ত্রী বলিলেন—ওগো, কলকাতায় সবাই ফিরেছে, চল আমরাও যাই—এখানে আর থাকা যায় না। মরি, সেখানে বোমা খেয়ে মরব। ভিজে কাঠে উনুন ধরিয়ে আর ফুঁ পেড়ে চোখ কানা হয়ে যাবার যোগাড় হয়েছে, এ আর সহ্য হয় না।

অতএব চলিয়া আসিলাম কলিকাতায়।

আশ্বিন মাসের প্রথমে এই সেদিন ভগ্নীপতির অসুখ উপলক্ষে একবার সেই গ্রামে গিয়েছিলাম। স্টেশনে নামিয়াই সেদিন ভীষণ বর্ষা। অতি কষ্টে সাত মাইল হাঁটিয়া প্রায় সন্ধ্যার পূর্বে গ্রামের মাঠে পৌঁছিলাম। তখনও সমানে বৃষ্টি পড়িতেছে, চারিধার ধোঁয়া ধোঁয়া। হঠাৎ চাহিয়া দেখি সেই দুর্যোগের মধ্যে সুরেশ এক বোঝা কাঁচা ঘাস মাথায় করিয়া কোথা হইতে আসিতেছে। আশ্চর্য হইয়া বলিলাম—সুরেশ যে! এত বাদলায়—

সুরেশ আমাকে দেখিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়াছে তাহার ধরন দেখিয়া বুঝিলাম। কতকটা কৈফিয়তের সুরে বলিল—এই বাদলায় গরুর খাবার নেই কিছু একেবারে। খালপারের মাঠ থেকে দু বোঝা কাঁচা ঘাস······আমি বলি, যাই নিয়ে আসি, দিদি বারণ করেছিল।

সাহস দিয়া বলিলাম—বেশ তো, ভালই তো। নিজের কাজ নিজে করবে এর মধ্যে কিছু······খুব ভাল। ছোকরার এতটা অভ্যাস নাই, দেখিলাম তাহার রীতিমত কষ্ট হইতেছে। ভগ্নীপতির অন্নদাস, না করিয়া উপায়ই বা কি। রাসু মুখুজ্যে বসিয়া

খাইতে দিবে না।

ছোকরা বলিল—কলকাতার অবস্থা কেমন?

—এখন ঢের ভাল। আবার যেমন তেমনিই হয়েছে।

—যুদ্ধের খবর কি? একখানা খবরের কাগজ আসে না যে পড়ি ।

—ঐ এক রকম চলছে।

—তাহলে এবার কলকাতায় গিয়ে একটা কাজে লেগে যাই, কি বলেন? বোমার হাঙ্গামা যখন অনেকটা মিটেছে চাকরি একটা জুটিয়ে নেবই। আর্মি এন্ড নেভি স্টোর্সের গ্রিফিথ সাহেব আমায় বললে—ইউ আর দি সন অব এ নোবেল ফ্যামিলি, গাঙ্গুলি। আই উইল সি ইউ ;—সেবার আমায় নিয়ে গিয়েছিল সেখানে—ওই যে কুন্ডু এন্ড সন্স, তাদের মেজ ছেলে কণ্ট্রাক্টর কি না ওখানকার, তাই। একেবারে স্পষ্ট বললে, আই উইল সি ইউ—

তাহাকে মনে করাইয়া দিলাম না যে, সে বোমার ভয়ে কলিকাতা হইতে পলাইয়া আসে নাই, আসিয়াছে তাহার তিন বৎসর পূর্বে। চাকরি এতদিন করে নাই কেন? ছোকরা এখনও স্বপ্নরাজ্যেই বাস করিতেছে—কিছুতেই সে রূঢ় বর্তমানকে স্বীকার করিতে চায় না—আমি তার স্বপ্ন ভাঙিয়া দিব কেন? তবুও কি জানি ছোকরার উপর কেমন সহানুভূতি ও করুণা হইল।

বেচারী!

সুহাসিনী মাসীমা

সুহাসিনী মাসীমাকে আমি দেখি নি। কিন্তু খুব ছোট বয়সে যখনই মামার বাড়ী যেতুম, তখন সকলের মুখে মুখে থাকত সুহাসিনী মাসীমার নাম।

—সুহাস কি চমৎকার বোনে! এই বয়েসে কি সুন্দর বুনুনির হাত!

—সুহাসিনী বললে, এস দিদি ব'স। বেশ মেয়ে সুহাসিনী।

—সেবার সুহাসিনীকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ালুম পূর্ণিমার দিন।

—সুহাসিনী ওসব অনেয্য দেখতে পারে না, তাই জন্যে তো মায়ের সঙ্গে বনে না।

সুহাসিনী গ্রামের সকলের যেন চোখের মণি। সুহাসিনী মাসীমা সম্বন্ধে কথা বলবার সময় সবারই অর্থাৎ আমার বুড়ী দিদিমার, গনু দিদিমার, মাসীমাদের, মায়ের, মামাদের গলার সুর বদলে যেত, চোখে কি রকম একটা আলাদা ভাব দেখা যেত। আর একটা কথা। রূপের কথা উঠলে সকলেই বলত আগে সুহাসিনী মাসীমার কথা, অমন রূপ কারও হয় না, কেউ কখনও দেখেনি।

শুনে শুনে আমার মনে অত্যন্ত কৌতূহল হল যে, সুহাসিনী মাসীমাকে একবার দেখব। দেখতেই হবে।

দিদিমাকে একদিন বললুম, সুহাসিনী মাসীমা এখানে কোথায় থাকেন?

—কেন রে?

—আমি একদিন দেখতে যাব।

—সে তোর ওই কানাই মামার বোন। ওপাড়ার মুখুজ্যেদের দোতলা বাড়ী পুকুর-ধারে দেখিসনি? তা সুহাস তো এখন এখানে নেই। শ্বশুরবাড়ী গিয়েছে।

—বিয়ে হয়ে গিয়েছে বুঝি?

—তা হবে না? উনিশ-কুড়ি বছর বয়েস হল, বিয়ে কোন্ কালে হয়েছে।

সুহাসিনী মাসীমার বিয়ে হওয়ার কথাটা যেন খুব ভাল লাগল না। কেন ভাল

লাগল না তা কি করে বলব। আমার বয়স ন' বছর আর সুহাসিনী মাসীমার বয়স উনিশ-কুড়ি ; বিয়ে হলেই বা আমার কি, না হলেই বা আমার কি।

মামার বাড়ীতে প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের ছুটিতে যাই, কিন্তু কোনও বার সুহাসিনী মাসীমার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। হয় তিনি বৈশাখের মাঝামাঝি চলে গিয়েছেন, নয়তো তিনি আসবেন শ্রাবণ মাসে শ্বশুরবাড়ী থেকে।

—ফাল্গুন মাসে এসেছিল সুহাস, বোশেখ মাসে চলে গেল। আজকাল থাকে ভাল জায়গায়। যেমন রং, তেমনিই রূপ, যেন একেবারে ফেটে পড়ছে।

অন্য লোকের প্রশ্নের উত্তরে দিদিমা কিংবা আমার মাসীমারা এ ধরনের কথা বলতেন, শুনতে পেতাম। আমি কোনও প্রশ্ন এ-সম্বন্ধে বড় একটা করতুম না, অথচ ইচ্ছে হত সুহাস মাসীমার সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু জানবার, আরও অনেক কথা শোনবার। কিন্তু কেমন যেন লজ্জায় গলার কথা আটকে যেত, জিগ্যেস করতে পারতুম না।

—না, তা কি করে থাকবে, সুহাসিনী না হলে শ্বশুর বাড়ীর একদিন চলে না—কাজেই চলে যেতেই হল, নইলে জষ্টি মাসে আম কাঁটাল খেয়ে যাবার তো ইচ্ছে ছিল। শাশুড়ি বলে—বৌমা এখানে না থাকলে যেন হাত পা আসে না—বৌমার মুখ সকালে উঠে না দেখলে কাজে মন বসাতে পারি নে।—তাই ছেলে পাঠিয়ে নিয়ে গেল।

—একদিন কি হল জান, দুপুরবেলা সুহাসের ফিট হয়েছে শুনে তো ছুটে গিয়ে দেখি রান্নাঘরের সামনে সানের রোয়াকে সুহাস অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে—আর তার মাথায় জল ঢালা হচ্ছে। মাথায় একরাশ কালো কুচকুচে ভিজে চুল, দেহ এলিয়ে পড়ে আছে। অমন রূপ কখনও দেখি নি মানুষের, কি রূপ ফুটেছে সুহাসের—সত্যি—

সুহাস মাসীমার রূপের ও গুণের প্রশংসায় এই গ্রামের সবাই পঞ্চমুখ। তারা জীবনে যেন এমন মেয়ে আর দেখে নি। ওদের মুখে মুখে সুহাসিনী মাসীমাও আমার মনে অত্যন্ত বেড়েই চললেন—কল্পনায়, চোখের দেখায় নয়।

অল্প বয়সে যখন মনের আকাশ একেবারে শূন্য, তখন লোকের মুখে শুনে শুনে ধীরে ধীরে একটি আদর্শ নারীমূর্তি আমার মনে গড়ে উঠেছিল—বহুকাল পর্যন্ত এই মানসী নারী প্রতিমার কষ্টিপাথরে বাস্তবজীবনে দৃষ্ট সমস্ত নারীর রূপ ও গুণ যাচাই করে নিতাম, অনেকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই বোধ হয়। সে মানসী প্রতিমা ও আদর্শ নারী ছিলেন সুহাসিনী মাসীমা—যাঁকে কখনও চোখে দেখলুম না।

তখন কলেজে পড়ি। কি একটা ছুটিতে মামার বাড়ী গিয়েছি। তখন অনেকটা গম্ভীর হয়ে পড়েছি আগেকার চেয়ে এবং রান্নাঘরের কোণে বসে দিদিমা ও মাসীমাদের মুখে মেয়েলি গল্প শোনার চেয়ে চণ্ডীমণ্ডপে মেজ দাদু ও মামাদের সঙ্গে জার্মান যুদ্ধের আলোচনা ও সে সম্বন্ধে নিজের সদ্য অধীত লজ এর মডার্ণ ইউরোপের ঐতিহাসিক জ্ঞান সগর্বে প্রদর্শন করবার ঝোঁক তখন অনেক বেশি। সকাল বেলা, আমি সমবেত দু-পাঁচ জন লোকের সামনে বিসমার্কের রাজনীতি ও জীবনী (লজ-এর 'মডার্ণ ইউরোপ' অনুযায়ী) সোৎসাহে বর্ণনা করছি, এমন সময়ে ওপাড়ার কানাই মামা (সুহাসিনী মাসীমার ছোট ভাই) এসে সেখানে দাঁড়াল।

মেজ দাদু জিজ্ঞেস করলেন—কি কানাই, কবে এলে কলকাতা থেকে?

কানাই বললে—আজই এলুম কাকাবাবু। দিদি আজ ওবেলার ট্রেনে আসবে কিনা। দাদাবাবু পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে আসবেন। তাই আমি সকালের গাড়ীতে চলে এলুম স্টেশনে গাড়ী পাঠানোর ব্যবস্থা করতে।

শুনে মনে কেমন একটা আনন্দ ও উত্তেজনা অনুভব করলুম। সুহাসিনী মাসীমা

আসবেন আজই, দেখব—এতকাল পরে সুহাসিনী মাসীমার সঙ্গে চাক্ষুষ দেখা হবে। আমার মনের সেই মানসী প্রতিমা সুহাসিনী মাসীমা! তার পর আবার নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলুম নিজের মনের ভাবে। আসেন আসুন, না আসেন না আসুন—আমার কি তাতে?

অথচ সন্ধ্যাবেলার দিকে কাঁটাতলাটায় পায়চারি করছিলুম, বোধ হয় কিছু উৎসুক ভাবেই। এই পথ দিয়েই সুহাসিনী মাসীমার গরুর গাড়ী স্টেশন থেকে আসবে। এই একমাত্র পথ।

সন্ধ্যার কিছু আগে গরুর গাড়ী স্টেশন থেকে ফিরে এল—কানাই মামার ছোট ভাই বীরু তাতে বসে।

জিজ্ঞেস করলুম—কোথায় গিয়েছিলি রে বীরু? গাড়ী গিয়েছিল কোথায়?

বীরু বললে—স্টেশনে। বড় দিদির আসবার কথা ছিল, এল না।

বললুম—রাত্রের ট্রেনে আসতে পারেন তো—

—না, তা আসবেন না। অন্ধকার রাত, মেঠো পথ দিয়ে আসা—রাত্রের গাড়ীতে কখনও আসবে না। কথাই আছে।

গাড়ী চলে গেল।

জীবনের গত দশ বছরের মধ্যে—তখন আমার বয়স ছিল নয়, এখন উনিশ—এই প্রথম বার সুহাসিনী মাসীকে দেখবার সুযোগ ঘটবার উপক্রম হয়েছিল, কিন্তু উপক্রম হয়েই থেমে গেল, ঘটল না।

সেদিন কেন, তার পর প্রায় এক মাস সেখানে ছিলাম—সুহাসিনী মাসীমা তার মধ্যেও আসেন নি।

কলেজ থেকে বার হয়ে ক্রমে চাকরিতে ঢুকে পড়লুম! বয়স হয়েছে চব্বিশ, ষোল বছর কেটে গিয়েছে বাল্যের সেই মামার বাড়ীর দিনগুলি থেকে। দিদিমা বেঁচে নেই, মামার বাড়ী যাওয়া আগের চেয়ে অনেক কমে গিয়েছে, সুহাসিনী মাসীমার কথা শুনতে পাই কেবল আমার মাসীমাদের মুখে। তাও তত বেশি করে নয় বা তত ঘন ঘন নয়, বাল্যকালে যেমন দিদিমার মুখ থেকে শুনতুম।

কিন্তু তা বলে সুহাসিনী মাসীমা কি আমার মনে ছোট হয়ে গিয়েছিলেন?

আশ্চর্যের বিষয়, তা মোটেই নয়।

বাল্যের সে মানসী প্রতিমা যেমন তেমনই ছিল, তার রূপের কোথাও এতটুকু ম্লান হয় নি। বন্ধুবান্ধবদের বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে কত নববধূকে সেই মানসী প্রতিমার কষ্টিপাথরে যাচাই করতে গিয়ে তাদের প্রতি অবিচার করেছি।

বয়স যখন ত্রিশ-বত্রিশ, তখন কলকাতায় এসে থাকতে হল কার্য উপলক্ষে। একদিন আমার মামার মুখে কথায় কথায় শুনলাম—সুহাসিনী মাসীমার স্বামী এখন বড় এঞ্জিনীয়ার, অনেক টাকা রোজগার করেন, বাগবাজারে নবীন বোসের লেনে সম্প্রতি বাসা করে আছেন। এমন কি মামা বললেন—যাবি একদিন? সুহাস দিদির সঙ্গে আমারও অনেকদিন দেখা হয় নি। তুই কখনও দেখেছিস কি? চল, কাল যাওয়া যাক, ঠিকানাটা আমার ডায়েরিতে লেখা আছে।

পরদিন আমার কি একটা গুরুতর কাজ ছিল, তাতেই যাওয়া হল না। মামাও আর সে সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন করলেন না। আমি ইচ্ছে করলে একাই যেতে পারতাম —মামা ঠিকানাটা আমায় বলেছিলেন তার পর, কিন্তু তারা আমায় কেউ চেনে না, এ অবস্থায় যেচে সেখানে যেতে বাধল।

আরও বছর দুই-তিন কেটে গেল। আমার বয়স চৌত্রিশ। সংসারী মানুষ, ছেলে-পুলে হয়ে পড়েচে অনেকগুলি। পশ্চিমের কর্মস্থান থেকে দেশে ঘন ঘন আসা ঘটে না। এ সময় একবার মামার বাড়ীর গ্রামের কানাই মামার সঙ্গে জামালপুর স্টেশনে দেখা। কানাই আমার বাল্যবন্ধু এবং সুহাসিনী মাসীমার ছোট ভাই।

—কি হে, কানাই মামা যে! এখানে কোথায়?

—আরে শচীন যে! তুমি কোথায়? আমি এখানে আছি বছরখানেক, ওয়ার্কশপে কাজ করি।

—বেশ, বেশ। বাসা করে মেয়েছেলে নিয়ে আছ?

—না, দিদি মুঙ্গেরে রয়েছে কিনা, জামাইবাবুর শরীর খারাপ, চেঞ্জে এসেছে। সেখান থেকেই যাতায়াত করি। এস না একদিন? বেলুন বাজারে, গঙ্গার কাছেই। কবে আসবে?

আমি থাকি সাহেবগঞ্জে। সর্বদা মুঙ্গেরের দিকে যাওয়া ঘটে না—তবু কানাই-এর কাছে কথা দিলাম একদিন সুহাসিনী মাসীমার বাসায় যাব মুঙ্গেরে।......সেটা কর্তব্যও তো বটে, দেশের লোক অসুস্থ হয়ে রয়েছেন দূর দেশে—আমরা যখন এদেশ-প্রবাসী—যাওয়া বা দেখাশুনো করা তো উচিতই।

সাহেবগঞ্জে ফিরে এসে স্ত্রীকে কথাটা বলতে সেও খুব উৎসাহ দেখালে।

বললে—চল না মাসীমার সঙ্গে দেখা করে সীতাকুণ্ডে স্নান করে আসা যাবে। কখনও মুঙ্গেরে যাই নি—ভালই হল, চল এই মকর-সংক্রান্তির ছুটিতে—

একথা ঠিকই যে, এই দীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর পরে সুহাসিনী মাসীমাকে দেখবার সে বাল্য ও প্রথম-যৌবন দিনের আগ্রহ ছিল না—তবুও কৌতূহলে এবং মনের পুরনো অভ্যেসের বশে একদিন মুঙ্গেরে গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করবার সংকল্প করলুম। কিন্তু পুনরায় বাধা পড়ল। পৌষ মাসের শেষের দিকে সাহেবগঞ্জে ভীষণ কলেরার প্রাদুর্ভাব হল—আমি ছুটি নিয়ে সপরিবারে দেশে পালালুম। দিন উনিশ-কুড়ি পরে যখন ফিরলুম তখন মকর-সংক্রান্তি পার হয়ে গিয়েছে, মুঙ্গেরে যাওয়ার কথাও চাপা পড়ে গিয়েছে।

এর মাস-চার পরে আবার কানাই-এর সঙ্গে দেখা জামালপুরে।

বললে—ওহে, তোমরা কই গেলে না? তোমাকে খবর দেব ভেবেছিলুম—কি বিপদ গেল যে! জামাইবাবু মারা গেলেন ও মাসের সতেরোই।

সুহাসিনী মাসীমা বিধবা!

বললুম—ওঁরা এখনও কি—

—না না। দেওর এসে নিয়ে গেল শ্বশুরবাড়ী। মস্ত ডাক্তার দেওর—য়্যাসিস্ট্যাণ্ট-সার্জন, গভর্নমেণ্ট সার্ভিস করে। জামাইবাবুর চেয়ে অনেক ছোট।

এইবার চার-পাঁচ বছরের ব্যবধান—যখন সুহাসিনী মাসীমার কথা কারও কাছে শুনি নি। তার পর একদিন আমার মাসীমা কাশী থেকে এলেন। বাল্যকালের সে দিনটি থেকে কতকাল চলে গিয়েছে—যে মাসীমা তখন ছিলেন তরুণী, তিনি এখন কাশীবাসিনী। আমারও বয়স উনচল্লিশ।

মাসীমা বললেন—দশাশ্বমেধ ঘাটে রোজ সুহাসিনীর সঙ্গে দেখা হত কিনা। চমৎকার মেয়ে সুহাসিনী দিদি, ওর সঙ্গে মিশে সময় যে কোথা দিয়ে কেটে যেত। মস্ত বড় সাধুর কাছে দীক্ষা নিয়েছে। কি সুন্দর গীতার ব্যাখ্যা করে। ওর মুখে গীতাপাঠ শুনতে শুনতে রাত যে কত হচ্ছে তা ভুলেই যেতুম। আহা, কি মেয়ে সুহাসিনী দিদি!

বহুকাল পরে সুহাসিনী মাসীমার আবার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনলাম।

সুহাসিনী মাসীমা চিরকাল লোকের প্রশংসা কুড়িয়ে গেল—কপাল এক-একজনের। আমার ঠোঁটের আগায় এ প্রশ্ন কতবার এল—সুহাসিনী মাসীমা আজকাল দেখতে কেমন?……বহুকাল তাঁর রূপের প্রশংসা কারও মুখে শুনি নি।

কিন্তু আমার মনের সেই বাল্যকালে গড়া মানসী রূপসী সমানই ছিলেন। বাল্যে তিনি ছিলেন শুধু রূপবতী, এখন রূপের সঙ্গে যোগ হল আধ্যাত্মিকতা। সুহাসিনী মাসীমা একেবারে দেবী হয়ে উঠলেন আমার মনে। আর এটাও মনে রাখতে হবে, দেবী-দের মধ্যে সবাই তরুণী—বৃদ্ধা দেবী কেউ নেই।

পরের বছরই আমার চাকরির কাজে আমায় কাশী যেতে হল তিন চার দিনের জন্যে। আমার বয়স চল্লিশ। মাসীমা যে বাড়ীটাতে থাকতেন, সেখানে মামার বাড়ীর গ্রামের আর একজন বৃদ্ধা থাকতেন। তাঁর নাম তারকের মা—তিনি জাতে কৈবর্ত, তাঁর ছেলে তারকের নৈহাটিতে বড় দোকান আছে। আমার ওপর ভার পড়ল, তারকের মায়ের কাছ থেকে মাসীমার একটা হাত-বাক্স নিয়ে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া।

বেলা দশটা। মন্দিরাদি দর্শন করার পরে দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করতে নামছি। সঙ্গে আছে তারকের মা।

তারকের মা স্নানার্থীদের ভিড়ের মধ্যে কাকে সম্বোধন করে বললে—দিদি ঠাকরুণের আজ যে সকাল সকাল হয়ে গেল?—যাকে উদ্দেশ করে বলা গেল তিনি কি উত্তর দিলেন আমি ভাল করে শোনার আগেই তারকের মা আমার দিকে চেয়ে বললে—চিনতে পারলে না শচীন? আমাদের গাঁয়ের কানাই-এর দিদি সুহাসিনী—চেন না?

বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক ছিলাম, কথাটা কানে যেতেই চমকে উঠে দেখি একজন মুণ্ডিকমস্তক, স্থূলকায়া বৃদ্ধা, এক ঘটি জল হাতে সিক্ত-বসনে উঠে চলে যাচ্ছেন। ফর্সা রং জ্বলে গেলে যেমন হয় গায়ের রং তেমনই, মুখের চামড়া কুঁচকে গিয়েছে—নিতান্ত নির্বোধ নিরীহ পাড়াগাঁয়ের বুড়িদের মত মুখের চোখের ভাব।

সেই সুহাসিনী মাসীমা'

আমি কি আশা করেছিলুম এই সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর পরেও সুহাসিনী মাসীমাকে রূপসী যুবতী দেখতে পাব? তবে কেন যে ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেলুম, কেন যে মন হঠাৎ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল—কে জানে।

বড় ক্লান্ত বোধ করলুম—ভীষণ ক্লান্ত ও নিরুৎসাহ। ভাবলুম কাশীর কাজ তো মিটে গিয়েছে, মাসীমার বাক্সটা নিয়ে ওবেলার ট্রেনেই চলে যাব। থেকে মিছামিছি সময় নষ্ট।

মেঘমল্লার

দশপারমিতার মন্দিরে সেদিন যখন সাপুড়ের খেলা দেখবার জন্য অনেক মেয়েপুরুষ মন্দির-প্রাঙ্গণে একত্র হয়েছিল, তারই মধ্যে প্রদ্যুম্ন প্রথমে লোকটিকে দেখে।

সেদিন ছিল জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি। চারি পাশের গ্রাম থেকে মেয়েরা এসেছিল দশপারমিতার পূজা দিতে। সেই উপলক্ষে অনেক সাপুড়ে গায়ক বাজিকর মন্দিরে একত্র হয়েছিল; অনেক মালাকার নানা রকমের সুন্দর সুন্দর ফুলের গহনা গ'ড়ে মেয়েদের কাছে বেচবার জন্যে এনেছিল। একজন শ্রেষ্ঠী মগধ থেকে দামী রেশমী শাড়ি এনেছিল বেচবার জন্য। তারই দোকানে ছিল সেদিন মেয়েদের খুব ভিড়। প্রদ্যুম্ন শুনেছিল, জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির উৎসব উপলক্ষে পারমিতার মন্দিরে একজন বিখ্যাত গায়ক ও বীণ-বাজিয়ে আসবেন। সে মন্দিরে গিয়েছিল তাঁরই সন্ধানে। সমস্ত দিন ধ'রে খুঁজেও কিন্তু প্রদ্যুম্ন

তাঁকে ভিড়ের মধ্যে থেকে বার করতে পারেনি।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মন্দিরের উঠোনে একজন সাপুড়ে অদ্ভুত-অদ্ভুত সাপের খেলা দেখাতে আরম্ভ করলে, আর তারই চারিধারে অনেকগুলি কৌতুকপ্রিয়া মেয়ে জমে গেল। ক্রমে সেখানে খুবই ভিড় হয়ে উঠল। প্রদ্যুম্নও সেখানে দাঁড়িয়ে গেল বটে, কিন্তু তার মন সাপখেলার দিকে আদৌ ছিল না। সে ভিড়ের মধ্যের প্রত্যেক পুরুষ -মানুষকে মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল যদি চেহারায় ও হাবভাবে বীণ-বাজিয়ে ধরা পড়েন। অনেকক্ষণ ধ'রে দেখবার পর তার চোখে পড়ল একজন প্রৌঢ় ভিড়ের মধ্যে তার দিকেই চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর পরনে অতি মলিন ও জীর্ণ পরিচ্ছদ। কি জানি কেন প্রদ্যুম্নের মনে হ'ল, এই সেই গায়ক। প্রদ্যুম্ন লোক ঠেলে তাঁর কাছে যাবার উদ্যোগ করতে তিনি হাত উঁচু ক'রে প্রদ্যুম্নকে ভিড়ের বাইরে যেতে ইঙ্গিত করলেন।

বাইরে আসতে প্রৌঢ় তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আমি অবন্তীর গাইয়ে সুরদাস, তুমি আমাকে খুঁজছিলে না?

প্রদ্যুম্ন একটু আশ্চর্য হ'ল। তার মনের কথা ইনি জানলেন কি ক'রে?

প্রদ্যুম্ন সসম্ভ্রমে জানালে, হ্যাঁ, সে তাঁকেই খুঁজছিল বটে।

প্রৌঢ় বললেন—তুমি আমার অপরিচিত নও। তোমার পিতার সঙ্গে একসময় আমার যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। আমি কাশী গেলেই তোমার পিতার সঙ্গে দেখা না ক'রে আসতাম না। তোমাকে ছেলেবেলায় দেখেছি, তোমার বয়স তখন খুব কম।

—আপনি এখানে এসে কোথায় আছেন?

—নদীর ধারে একটা ভাঙা মন্দির আছে জান?

—হ্যাঁ জানি। ওখানে একজন সন্ন্যাসী পূর্বে থাকতেন না?

—তিনি এখনও ওখানেই আছেন। তুমি যে-কোন একদিন গিয়ে ওখানে আমার সঙ্গে দেখা ক'রো। তুমি এখানে কোথায় থাক?

—এখানকার বিহারে পড়ি, তিন বছর আছি। আপনি মন্দিরে কতদিন থাকবেন?

—সে তোমাকে বলব। তুমি এরই মধ্যে একদিন যেও।

প্রদ্যুম্ন প্রণাম করে বিদায় নিল।

সন্ধ্যা তখনও হয়নি ; মন্দিরটা যে ছোট পাহাড়ের উপর ছিল, তারই দুপাশের ঢালু রাস্তা বেয়ে মেয়েরা উৎসব থেকে বাড়ি ফিরছিল। প্রদ্যুম্নের চোখ যেন কার সন্ধানে একবার মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে ইতস্তত ধাবিত হ'ল, পরেই সে আবার তাদের পিছনে ফেলে দ্রুতপদে নামতে লাগল। আচার্য শীলব্রত অত্যন্ত কড়া মেজাজের মানুষ, একেই তিনি প্রদ্যুম্নের মধ্যে অন্যান্য ছাত্রদের চেয়ে বেশি চঞ্চলতা ও কৌতুকপ্রিয়তা লক্ষ্য ক'রে তাকে একটু বেশি শাসনের মধ্যে রাখতে চেষ্টা করেন—তার উপরে সে রাত ক'রে বিহারে ফিরলে কি আর রক্ষা থাকবে?

বাঁক ফিরতেই বাঁ পাশের পাহাড়ের আড়ালটা সরে গেল। সেখানে সেদিকটা ছিল খোলা। প্রদ্যুম্ন দেখলে দূরে নদীর ধারে মন্দিরটার চূড়া দেখা যাচ্ছে। চূড়ার মাথার উপরকার ছায়াচ্ছন্ন আকাশ বেয়ে ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা পাখীর দল ডানা মেলে বাসায় ফিরছিল। আরও দূরে একখানা সাদা মেঘের প্রান্ত পশ্চিমদিকের পড়ন্ত রোদে সিঁদুরের মত রাঙা হয়ে আসছিল, চারিধারে তার শীতোজ্জ্বল মেঘের কাঁচুলি হাল্‌কা করে টানা।

হঠাৎ পিছন থেকে প্রদ্যুম্নের কাপড় ধ'রে কে ঈষৎ টানলে।

প্রদ্যুম্ন পিছন ফিরে চাইতেই যে কাপড় ধ'রে টেনেছিল তার চোখে কৌতুকের বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে কিশোরী, তার দোলন-চাঁপা রং-এর ছিপছিপে দেহটি বেড়ে' নীল

শাড়ী ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরা। নতুন কেনা একছড়া ফুলের মালা তার খোঁপাটিতে জড়ানো।

প্রদ্যুম্ন বিস্ময়ের সুরে ব'লে উঠল—কখন তুমি এসেছিলে, সুনন্দা! আমি তোমাকে এত খুঁজলাম, কৈ দেখতে পেলাম না তো?

প্রথমটা কিশোরীর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, তারপরে সে একটু অভিমানের সুরে বললে—আমাকেই খুঁজতে যেন এখানে এসেছিলে আর কি! যত রাজ্যের সাপুড়ে আর বাজিকরদের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ঘুরছিলে, সে আর আমি দেখিনি!

—সত্যি বলছি সুনন্দা, তোমাকে খুঁজেছি। নামবার সময় খুঁজেছি, এর আগেও খুঁজেছি ; তুমি কাদের সঙ্গে এলে?

এমন সময় দেখা গেল একদল মেয়ে পাহাড়ের উপর থেকে সেই পথে নেমে আসছে। সুনন্দার সেদিকে চোখ পড়তেই সে তখনি হঠাৎ প্রদ্যুম্নকে পিছনে ফেলে দ্রুতপদে নামতে লাগল।

পিছনেই একদল অপরিচিতা মেয়ে, এ অবস্থায় আর সুনন্দার অনুসরণ করা সংগত হবে না ভেবে সে প্রথমটা খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তার পর হতাশা-মেশানো ক্রোধে ঘাড় উঁচু ক'রে সে সদর্পে লাফিয়ে লাফিয়ে পথ চলতে লাগল।

সন্ধ্যার ঈষৎ অন্ধকার কখন মিলিয়ে গিয়েছে, অন্ধকারটাই তরল থেকে তরলতর হতে হতে হঠাৎ কখন জ্যোৎস্নায় পরিণত হয়েছে, অন্যমনস্ক প্রদ্যুম্ন তা মোটেই লক্ষ্য করেনি। যখন তার চমক ভাঙল, তখন পূর্ণিমার শুভ্রোজ্জ্বল জ্যোৎস্না পথ ঘাট ধুইয়ে দিচ্ছিল। দূর মাঠের গাছপালা জ্যোৎস্নায় ঝাপ্‌সা দেখাচ্ছিল। পড়াশুনা তার হয় কি ক'রে? আচার্য পূর্ণবর্ধন ত্রিপিটকের পাঠ অনায়ত্ত দেখে তাকে ভর্ৎসনা করলেই বা কি করা যাবে? এ রকম রাত্রে যে যুগেযুগের বিরহীদের মনোবেদনা তার প্রাণের মধ্যে জমে ওঠে, তার অবাধ্য মন যে এই সব পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নারাত্রে মহাকোট্‌ঠি বিহারের পাষাণ অলিন্দে মানসসুন্দরীদের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়ায়, এর জন্য সে-ই কি দায়ী।

দশপারমিতার মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টার ধ্বনি তখনও মিলিয়ে যায়নি, দূরে নদীর বাঁকের ভাঙ্গা মন্দিরে ক্ষীণ আলো জ্বলে উঠল, উৎসব-প্রত্যাগত নর-নারীর দল জ্যোৎস্না-ভরা মাঠের মধ্যে ক্রমে বহুদূরে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রদ্যুম্নের গতি দ্রুত হ'ল।

পথের পাশে একটা গাছ। গাছের নিকট যেতে প্রদ্যুম্নের মনে হ'ল গাছের আড়ালে কেউ যেন দাঁড়িয়ে আছে—আর একটু এগিয়ে গাছের পাশে যেতেই তার অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠের হাল্কা মিষ্টি হাসির ঢেউয়ে সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল,—দেখলে গাছতলায় সুনন্দা দাঁড়িয়ে আছে, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চিকচিকে জ্যোৎস্নার আলো প'ড়ে তার সর্বাঙ্গে আলো-আঁধারের জাল বুনেছে। প্রদ্যুম্ন চাইতেই সুনন্দা ঘাড় দুলিয়ে ব'লে উঠল—আর একটু হলেই বেশ হ'ত! গাছের তলা দিয়ে চ'লে যেতে অথচ আমায় দেখতে পেতে না!

সুনন্দাকে দেখে প্রদ্যুম্ন মনে মনে ভারি খুশী হ'ল, মুখে বললে—নাঃ, তা আর দেখব কেন? ভারি ব্যাপারটা হয়েছে গাছতলায় লুকিয়ে! আর না দেখতে পেলেই বা কি? আমি তোমার ওপর ভারি রাগ করেছি, সুনন্দা, সত্যি বলছি।

সুনন্দা বললে—দোষ করবেন নিজে আবার রাগও করলেন নিজে! সেদিন কি কথা বলেছিলে মনে আছে? তা না, যত রাজ্যের সাপুড়ে আর বাজিকর—মাগো! ওদের কাছে যাও কি ক'রে? এমন ময়লা কাপড় পরে! আমি ওদের ত্রিসীমানায় যাইনে।

প্রদ্যুম্ন বললে—তুমি বড়মানুষের মেয়ে—তোমার কথাই আলাদা—কিন্তু কথাটা কি ছিল বলছিলে?

সুনন্দা বললে—যাও! আর মিথ্যে ভানে দরকার নেই। কি কথা মনে ক'রে দেখ। সেই সেদিন বললে না?

প্রদ্যুম্ন একটুখানি ভেবে ব'লে উঠল—বুঝতে পেরেছি—সেই বাঁশী?

সুনন্দা অভিমানের সুরে বললে—ভেবে দেখ বলেছিলে কিনা। আমি দুপুর বেলা থেকে মন্দিরে এসে ব'সে আছি! এক্ষে ত এলেন বেলা ক'রে, তার ওপর—যাও!

প্রদ্যুম্ন এবার হেসে উঠল। বললে—আচ্ছা সুনন্দা, যদি তুমি আমায় দেখতেই পেয়েছিলে তো আমায় ডাকলে না কেন?

সুনন্দা বললে—আমি কি একা ছিলাম? দুপুর বেলায় আমি একা এসেছিলাম বটে, কিন্তু তখন ত আর তুমি আসনি? তার পর আমাদের গাঁয়ের মেয়েরা সব যে এল। কি ক'রে ডাকব?

প্রদ্যুম্ন বললে—আচ্ছা ধ'রে নিলাম আমার দোষ হয়েছে, তবে তুমি যে বার বার সাপুড়ে আর বাজিকরদের কথা বলছ সুনন্দা,—সাপুড়ে আর বাজিকরদের আমি খুঁজিনি। শুনেছিলাম অবন্তী থেকে একজন বড় বীণবাজিয়ে আসবেন; তুমি তো জানো, আমার অনেক দিন থেকে বীণ শেখবার বড় ইচ্ছা। তাই তাঁর সন্ধানে ঘুরছিলাম, তাঁর দেখাও পেয়েছি। তিনি এখানকার নদীর ধারের দেউলে থাকেন। ভালো কথা—তোমার বাবা কোথায়?

সুনন্দা বললে—বাবা তিন চার দিন হল কৌশাম্বী গিয়েছেন মহারাজের ডাকে।

প্রদ্যুম্ন হঠাৎ খুব উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল, বললে—ওহো তাই! নইলে আমি ভাবছি এত রাত পর্যন্ত সুনন্দা কি—

সুনন্দা তাড়াতাড়ি প্রদ্যুম্নের মুখে নিজের হাতদুটি চাপা দিয়ে লজ্জিত মুখে বললে—চুপ চুপ, তোমার কি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই? এখুনি যে সব আরতি দেখে লোক ফিরবে!

প্রদ্যুম্ন হাসি থামিয়ে বললে—এবার কিন্তু তোমার বাবা এলে ব'লে দেব নিশ্চয়—

সুনন্দা রাগের সুরে বললে—দিও ব'লে। এমনি আমি মন্দিরে আরতি পর্যন্ত থাকি, তিনি জানেন।

প্রদ্যুম্ন সুনন্দার সুগঠিত পুষ্পপেলব দক্ষিণ বাহুটি নিজের হাতের মধ্যে বেষ্টন করে নিলে, তারপর বললে—আচ্ছা থাক্, ব'লে দেব না। চল সুনন্দা, তোমায় বাঁশী শোনাই, আমার সঙ্গেই আছে—সত্যি বলছি, তোমায় শোনাবার জন্যেই এনেছিলাম। তবে ওঁকে খুঁজছিলাম, বীণটা ভালো ক'রে শিখব ব'লে।

নদীর ধারে এসে কিন্তু প্রদ্যুম্ন বড় নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল। সে বাঁশী বাজাল বটে, কিন্তু সে যেন ভাসা-ভাসা। সুরের সঙ্গে তাতে তার প্রাণের কোন যোগ রইল না। তারা দুজনে নির্জনে আরও কতবার বসেছে, প্রদ্যুম্নের বাঁশী শুনতে সুনন্দা ভালোবাসত ব'লে প্রদ্যুম্ন যখনই বিহার থেকে বাইরে আসত, বাঁশীটি সঙ্গে আনত। প্রদ্যুম্নের বাঁশীর অলস স্বপ্নময় সুরের মধ্যে দিয়ে কতদিন উভয়ের অজ্ঞাতে রোদভরা মধ্যাহ্ন গিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে, কিন্তু দুজনে এক হ'লে প্রদ্যুম্নের এ রকম নিরুৎসাহ ভাব তো সুনন্দা আর কখনো লক্ষ্য করেনি!

কি জানি কেন প্রদ্যুম্নের বার বার মনে আসছিল সেই জীর্ণ পরিচ্ছদপরা অদ্ভুত-দর্শন গায়ক সুরদাসের কথা। তাদের বিহারের কলাবিৎ ভিক্ষু বসুব্রতের আঁকা জরার চিত্রের মতই লোকটা কেমন কুশ্রী লোলচর্ম শীর্ণদর্শন! পুরাতন পুঁথির ভূর্জপত্রের মত ওর পরিচ্ছদের কেমন একটা অপ্রীতিকর মেটে লাল রং!

তার পরদিন সকালে প্রদ্যুম্ন নদীর ধারের ভাঙা মন্দিরে গেল। সেটার দেব-মূর্তি বহুদিন অন্তর্হিত। সমস্ত গায়ে বড় বড় ফাটল, সাপখোপের বাস। নিকটবর্তী গ্রাম-বাসীরা সেদিকে বড় একটা কেউ আসত না। একজন আজীবক সন্ন্যাসী আজ প্রায় সাত-

আট মাস হ'ল সেখানে বাস করছেন। তাঁর দু'চার জন অনুগত ভক্ত মাঝে মাঝে আসত যেত ব'লে মন্দিরের পথ আজকাল অপেক্ষাকৃত ভালো আছে।

অর্ধ-অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে প্রদ্যুম্নের সঙ্গে সুরদাসের সাক্ষাৎ হ'ল। সুরদাস প্রদ্যুম্নকে দেখে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন, তারপর বললেন—চল, বাইরে গিয়ে বসি, এখানে বড় অন্ধকার।

বাইরে গিয়ে সুরদাস আলোতে প্রদ্যুম্নের মুখ ভালো ক'রে দেখলেন, তার পর যেন আপন মনে বলতে লাগলেন—হবে, তোমার দ্বারাই হবে! আমি তা জানতাম।

প্রদ্যুম্ন সুরদাসের মূর্তি দূর থেকে দেখে যে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছিল তাঁর নিকটে এসে কিন্তু প্রদ্যুম্নের সে ভাব কেটে গেল। সে লক্ষ্য করলে সুরদাসের মুখশ্রী একটু কুদর্শন হলেও প্রতিভাব্যঞ্জক।

সুরদাস বললে—আমি ভাবছিলাম তুমি আজ আসবে। হ্যাঁ, তোমার পিতা তো একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন, তুমি নিজে কিছু শিখেছ?

প্রদ্যুম্ন লজ্জিত-মুখে উত্তর দিলে—একটু-আধটু বাঁশী বাজাতে পারি।

সুরদাস উৎসাহের সুরে বললেন—পারা তো উচিত। তোমার বাবাকে জানত না এমন লোক এদেশে খুব কম আছে। প্রতি উৎসবেই কৌশাম্বী থেকে তোমার বাবার নিমন্ত্রণ-পত্র আসত। হাঁ, আমি শুনেছি তুমি নাকি বাঁশীতে বেশ মেঘ-মল্লার আলাপ করতে পার!

প্রদ্যুম্ন বিনীতভাবে উত্তর দিলে—বিশেষ যে কিছু জানি তা নয়, যা মনে আসে তাই বাজাই, তবে মেঘ-মল্লার মাঝে মাঝে বাজিয়েছি।

সুরদাস বললেন—কই দেখি তুমি কেমন শিখেছ?

বাঁশী সব সময়েই প্রদ্যুম্নের কাছে থাকত। কখন কোন্ সময়ে সুনন্দার সঙ্গে দেখা হয়ে পড়ে বলা যায় না।

প্রদ্যুম্ন বাঁশী বাজাতে লাগল। তার পিতা তাকে বাল্যকালে যত্ন ক'রে রাগ-রাগিণী শেখাতেন, তা ছাড়া সঙ্গীতে প্রদ্যুম্নের একটা স্বাভাবিক ক্ষমতাও ছিল। তার আলাপ অতি মধুর হ'ল। লতাপাতা ফুলফলের মাঝখান বেয়ে উদার নীল আকাশ আর জ্যোৎস্না-রাতের মর্ম ফেটে যে রসধারা বিশ্বে সব সময় ঝরে পড়ছে, তার বাঁশীর গানে সে-রস যেন মূর্ত হয়ে উঠল; সুরদাস বোধ হয় এতটা আশা করেননি, তিনি প্রদ্যুম্নকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন—ইন্দ্রদ্যুম্নের ছেলে যে এমন হবে, সেটা বেশি কথা নয়। বুঝতে পেরেছি, তুমিই পারবে, এ আমি আগেও জানতাম।

নিজের প্রশংসাবাদে প্রদ্যুম্নের তরুণ সুন্দর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

অন্যান্য দু'এক কথার পর, প্রদ্যুম্ন বিদায় নিতে উদ্যত হ'লে, সুরদাস তাকে বললেন—শোন প্রদ্যুম্ন, একটা গোপনীয় কথা তোমার সঙ্গে আছে। তোমাকে একথা বলব ব'লে পূর্বেও আমি তোমার খোঁজ করেছিলাম; তোমাকে পেয়ে খুব ভালোই হয়েছে। কথাটা তোমাকে বলি, কিন্তু তার আগে তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, একথা তুমি কারুর কাছে প্রকাশ করবে না।

প্রদ্যুম্ন অত্যন্ত বিস্মিত হ'ল। এই প্রৌঢ়ের সঙ্গে তার মোটে একদিনের আলাপ, এমন কি গোপনীয় কথা ইনি তাকে বলবেন?

সে বললে—কি কথা না শুনে কি ক'রে—

সুরদাস বললে—তুমি ভেবো না, কোনো অনিষ্টজনক ব্যাপার হ'লে আমি তোমাকে বলতাম না।

কি কথা জানবার জন্যে প্রদ্যুম্নের অত্যন্ত কৌতূহলও হ'ল, সে প্রতিজ্ঞা করলে সুরদাসের কথা কারো কাছে প্রকাশ করবে না।

সুরদাস গলার স্বর নামিয়ে বলতে লাগলেন—নদীর ঐ বড় বাঁকে যে ঢিবিটা আছে জানো? তার সামনেই বড় মাঠ। ওই ঢিবিটায় বহু প্রাচীনকালে সরস্বতী দেবীর মন্দির ছিল ; শুনেছি এদেশের যত বড় বড় গায়ক ছিলেন, শিক্ষা শেষ ক'রে সকলেই আগে ওই মন্দিরে এসে দেবীর পূজা দিয়ে তুষ্ট না ক'রে ব্যবসা আরম্ভ করতেন না। সে অনেক দিনের কথা ; তার পর মন্দির ভেঙে-চুরে ওই দাঁড়িয়েছে। ঐ ঢিবিতে ব'সে আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে মেঘ-মল্লার নিখুঁতভাবে আলাপ করলে সরস্বতী দেবী স্বয়ং গায়কের কাছে আবির্ভূতা হন। এ সংবাদ এদেশে কেউ জানে না। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র এই তিন মাসের তিন পূর্ণিমায় প্রতিবার তাঁকে আনতে পারা যায়, তবে তাঁর বরে গায়ক সংগীতে সিদ্ধ হয়। তাঁর বরে সংগীত সংক্রান্ত কোনো বিষয় তখন গায়কের কাছে অজ্ঞাত থাকে না। তবে একটা কথা আছে, যে গায়ক বর প্রার্থনা করবে সে অবিবাহিত হওয়া চাই। তা আমি বলছিলাম, সামনের পূর্ণিমায় তুমি আর আমি এই বিষয়টা চেষ্টা ক'রে দেখব, তুমি কি বল?

সুরদাসের কথা শুনে প্রদ্যুম্ন অবাক হয়ে গেল। তা কি ক'রে হয়? আচার্য বসুব্রত কলাবিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে দিতে অনেক বার যে বলেছেন কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর যে মূর্তি হিন্দুরা কল্পনা করেন, সেটা নিছক কল্পনাই, তার সংগে বাস্তবের কোন সম্পর্ক নেই। সত্য সত্য তাঁকে দেখতে পাওয়া—এ কি সম্ভব?

প্রদ্যুম্ন চুপ ক'রে রইল।

সুরদাস একটু ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—এতে কি তোমার অমত আছে?

প্রদ্যুম্ন বললে—সে জন্যে না। কিন্তু আমি ভাবছিলাম, এটা কি ক'রে সম্ভব যে—

সুরদাস বললেন—সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিত থাকো। এর সত্যতা তুমি নিজের চোখে দেখো। তোমার অমত না থাকলে আমি সামনের পূর্ণিমায় সব ব্যবস্থা ক'রে রাখি।

সুরদাসের কথার পর থেকেই প্রদ্যুম্ন অত্যন্ত বিস্ময়ে ও কৌতূহলে কেমন একরকম হয়ে গিয়েছিল। সে ঘাড় নেড়ে বললে—আচ্ছা রাখবেন, আমি আসব।

সুরদাস বললেন—বেশ, বড় আনন্দিত হলাম। তুমি মাঝে মাঝে একবার ক'রে এখানে এস, তোমাকেও তৈরী হ'তে হ'লে দু-একটা কাজ করতে হবে, সে ব'লে দেবো।

প্রদ্যুম্ন আর একবার সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়বার পর সুরদাসের কাছে বিদায় চাইলে।

তারপর সে চিন্তিতভাবে বিহারের পথ ধরল।

তার মনে হচ্ছিল—দেবী সরস্বতী স্বয়ং। শ্বেতপদ্মের মত নাকি রংটি তাঁর, না জানি কত সুন্দর তাঁর মুখশ্রী! আচার্য বসুব্রত বলেন বটে······

ভদ্রাবতী নদীর ধারে শাল-পিয়াল-তমাল বনে সেবার ঘনঘোর বর্ষা নাম্‌ল। সারা আকাশ জুড়ে কোন্ বিরহিণী পুরসুন্দরীর অযত্নবিন্যস্ত মেঘবরণ চুলের রাশ এলিয়ে দেওয়া, প্রাবৃট-রজনীর ঘনান্ধকার তার প্রিয়হীন প্রাণের নিবিড় নির্জনতা, দূর বনের ঝোড়ো হাওয়ায় তার আকুল দীর্ঘশ্বাস, তারই প্রতীক্ষাশ্রান্ত আঁখি-দুটির অশ্রুভারে ঝরঝর অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ, মেঘমেদুর আকাশের বুকে বিদ্যুৎচমক তার হতাশ প্রাণে ক্ষণিক আশার মেঘদূত!

আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে প্রদ্যুম্ন সুরদাসের সংগে নদীর ঘাটে গেল। তারা যখন সেখানে পৌঁছল, তখন মেঘ নেমে সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, চারিদিক তরল অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে।

প্রদ্যুম্ন সুরদাসের কথামত নদী থেকে স্নান ক'রে এসে বস্ত্র পরিবর্তন করলে। সঙ্গীর ক্রিয়াকলাপে প্রদ্যুম্ন বুঝতে পারলে তিনি একজন তান্ত্রিক। তাদের বিহারে এক-

জন ভিক্ষু ছিলেন, তিনি যোগাচার্য পদ্মসম্ভরের শিষ্য। সেই ভিক্ষুর কাছে তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের কথা কিছু কিছু সে শুনেছিল। সুরদাস অনেকগুলো রক্তজবার মালা সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন, তার মধ্যে কতকগুলো তিনি নিজে পরলেন, কতকগুলো প্রদ্যুম্নকে পরতে বললেন। ছোট মড়ার মাথার খুলিতে তেল সল্‌তে দিয়ে প্রদীপ জ্বাললেন। তাঁর পুজোর আয়োজনে সাহায্য করতে করতে প্রদ্যুম্ন হাঁপিয়ে পড়ল। ব্যাপারটার শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায় দেখবার জন্য তার মনে এত কৌতূহল হচ্ছিল যে অন্ধকার রাতে এক-জন প্রায়-অপরিচিত তান্ত্রিকের সঙ্গে একা থাকবার ভয়ের দিকটা তার একেবারেই চোখে পড়ল না। অনেক রাত্রে হোম শেষ হ'ল।

সুরদাস বললেন—প্রদ্যুম্ন, তুমি এবার তোমার কাজ আরম্ভ করো, আমার কাজ শেষ হয়েছে। খুব সাবধান, তোমার কৃতিত্বের ওপর এর সাফল্য নির্ভর করছে।

তাঁর চোখের কেমন একটা ক্ষুধিত দৃষ্টি যেন প্রদ্যুম্নের ভালো লাগল না। কিন্তু তবু সে ব'সে একমনে বাঁশীতে মেঘ-মল্লার আলাপ আরম্ভ করলে।

তখন আকাশ বাতাস নীরব। অন্ধকারে সামনে মাঠটায় কিছু দেখবার উপায় নাই। শালবনের ডালপালায় বাতাস লেগে একরকম অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে! বড় মাঠের পারে শাল-বনের কাছে দিক্‌চক্রবালের ধারে নৈশ প্রকৃতি পৃথিবীর বুকের অন্ধকার পুষ্পশয্যায় তার অঞ্চল বিছিয়েছে। শুধু বিশ্রাম ছিল না ভদ্রাবতীর, সে কোন্ অনন্তের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেবার আকুল আগ্রহে একটানা বয়ে চলেছে, মৃদু গুঞ্জনে আনন্দসংগীত গাইতে গাইতে, কূলে তাল দিতে দিতে। হঠাৎ সামনের মাঠটা থেকে সমস্ত অন্ধকার কেটে গিয়ে সাদা মাঠটা তরল আলোকে প্লাবিত হয়ে গেল। প্রদ্যুম্ন সবিস্ময়ে দেখলে—মাঠের মাঝখানে শত পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত অপরূপ আলোর মণ্ডলে কে এক জ্যোৎস্না-বরণী অনিন্দ্যসুন্দরী মহিমাময়ী তরুণী। তাঁর নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাজি অযত্নবিন্যস্ত ভাবে তাঁর অপূর্ব গ্রীবাদেশের পাশ দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তাঁর আয়ত নয়নের দীর্ঘ কৃষ্ণপক্ষ্ম কোন স্বর্গীয় শিল্পীর তুলি দিয়ে আঁকা, তাঁর তুষারধবল বাহুবল্লী দিব্য পুষ্পাভরণে মণ্ডিত, তাঁর ক্ষীণ কটি নীল বসনের মধ্যে অর্ধলুক্কায়িত মণিমেখলায় দীপ্তিমান, তাঁর রক্তকমলের মত পা দুটিকে বুক পেতে নেবার জন্যে মাটিতে বাসন্তী পুষ্পের দল ফুটে উঠেছে……হাঁ, এই তে দেবী বাণী! এঁর বীণার মঙ্গলঝঙ্কারে দেশে দেশে শিল্পীদের সৌন্দর্যতৃষ্ণা সৃষ্টিমুখী হয়ে উঠেছে, এঁর আশীর্বাদে দিকে দিকে সত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হচ্ছে, এঁরই প্রাণের ভাণ্ডারে বিশ্বের সৌন্দর্যসম্ভার নিত্য অফুরন্ত রয়েছে, শাশ্বত এঁর মহিমা, অক্ষয় এঁর দান, চিরন্তন এঁর বাণী।

প্রদ্যুম্ন চেয়ে থাকতে থাকতে দেবীর মূর্তি অল্পে অল্পে মিলিয়ে গেল। জ্যোৎস্না আবার ম্লান হয়ে পড়ল, বাতাস আবার নিস্তেজ হয়ে বইতে লাগল।

অনেকক্ষণ প্রদ্যুম্নের কেমন একটা মোহের ভাব দূর হ'ল না। সে যা দেখলে—এ স্বপ্ন না সত্য? অবশেষে সুরদাসের কথায় তার চমক ভাঙল। সুরদাস বললে—আমার এখনও কাজ আছে, তুমি ইচ্ছা করলে যেতে পার—কেমন, আমার কথা মিথ্যা নয় দেখলে ত?

সুরদাসের কথা কেমন অসংলগ্ন বোধ হতে লাগল, তাঁর মুখের দিকে চেয়ে প্রদ্যুম্ন দেখলে, তাঁর চোখ দুটো যেন অর্ধ অন্ধকারের মধ্যে জ্বল্ জ্বল্ করছে।

তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে যখন বিহারের দিকে রওনা হ'ল পূর্ণিমার চাঁদকে তখন মেঘে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। একটু একটু জ্যোৎস্না যা আছে, তা কেমন হল্‌দে রং-এর ; গ্রহণের সময় জ্যোৎস্নার এ রকম রং সে কয়েকবার দেখেছে।

মাঠ খুব বড় পার হ'তে অনেকটা সময় লাগল। তারপর মাঠ ছাড়িয়ে বড় বনটা

আরম্ভ হ'ল। খুব ঘন বন, শাল দেবদারু গাছের ডালপালা নিবিড় হয়ে জড়াজড়ি ক'রে আছে, মধ্যে অন্ধকারও খুব। পাছে রাত ভোর হয়ে যায়, এই ভয়ে সে খুব দ্রুতপদে যাচ্ছিল। যেতে যেতে তার চোখে পড়ল বনের মধ্যে এক স্থান দিয়ে যেন খানিকটা আলো বেরুচ্ছে। প্রথম যেতে তার চোখে পড়ল বনের মধ্যে এক স্থান দিয়ে যেন খানিকটা আলো বেরুচ্ছে। প্রথম সে ভাবলে, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়ে থাকবে, কিন্তু ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখে সে বুঝলে যে, সে আলো জ্যোৎস্নার আলোর মতন নয়, বরং……কৌতূহল অত্যন্ত হওয়াতে পথ ছেড়ে সে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। যে পিপ্পল গাছের সারির ফাঁক দিয়ে আলো আসছিল, তার কাছে গিয়ে গাছের গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে প্রদ্যুম্ন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এ কি! এঁকেই তো সে এইমাত্র মাঠের মধ্যে দেখেছে, এই সেই অপরূপ সুন্দরী নারী তো!

অদ্ভুত! সে দেখলে যাঁকে এইমাত্র মাঠের মধ্যে দেখেছে, সেই অপরূপ দ্যুতি-শালিনী নারী বনের মধ্যে চারিধারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, জোনাকী পোকার হুল থেকে যেমন আলো বার হয়—তাঁর সমস্ত অঙ্গ দিয়ে তেমনি একরকম স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলো বেরুচ্ছে, অনেকদূর পর্যন্ত বন সে আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, আর একটু নিকটে গিয়ে সে লক্ষ্য করলে, তাঁর আয়ত চক্ষু দুটি অর্ধনিমীলিত, যেন কেমন নেশার ঘোরে তিনি চারিপাশে হাতড়ে পার হবার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু তা না পেয়ে পিপ্পল গাছ-গুলোর চারিধারে চক্রাকারে ঘুরছেন, তাঁর মুখশ্রী অত্যন্ত বিপন্নের মত।

প্রদ্যুম্নের হঠাৎ বড় ভয় হ'ল। সে ভাবলে মাঠে সরস্বতী দেবীর দর্শন থেকে আর এ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাটা আগাগোড়া ভৌতিক, এই নিশীথ রাত্রে শালের বনে নইলে এ কি কান্ড!

সে আর সেখানে মোটেই দাঁড়াল না। বন থেকে বার হয়ে দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে যখন সে বিহারের উদ্যানে এসে পৌঁছল, ম্লান চাঁদ তখন কুমারশ্রেণীর পাহাড়ের পিছনে অস্ত যাচ্ছে।

ভোর রাত্রে শয্যায় শুয়ে ঘুমিয়ে প'ড়ে সে স্বপ্ন দেখলে—ভদ্রাবতীর গভীর কালো জলের তলায় রাতের অন্ধকারে কে এক দেবী পথ হারিয়ে ফেলেছেন ; তিনি যতই উপরে ওঠবার চেষ্টা পাচ্ছেন, জলের ঢেউ তাঁকে ততই বাধা দিচ্ছে, নদীর জলে তাঁর অঙ্গের জ্যোতি ততই নিবে আসছে, অন্ধকার ততই তাঁর চারিপাশে গাঢ় হয়ে আসছে, নদীর মাছগুলো তাঁর কোমল পা দুখানি ঠুক্‌রে রক্তাক্ত ক'রে দিচ্ছে……ব্যথিতদেহা, বিপন্না, বেপথুমতী দেবীর দুঃখ দেখে একটা বড় মাছ দাঁত বার ক'রে হিংস্র হাসি হাসছে, মাছটার মুখ গায়ক সুরদাসের মত!

প্রদ্যুম্ন ভোরে উঠেই আচার্য পূর্ণবর্ধনের কাছে গিয়ে সুরদাসের সঙ্গে প্রথম দেখার দিন থেকে গত রাত্রি পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপার খুলে বললে। আচার্য পূর্ণবর্ধন বৌদ্ধ দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন, মঠের ভিক্ষুকদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বিজ্ঞ, এজন্য সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। তিনি সব শুনে বিস্মিত হলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখের দৃষ্টি শঙ্কাকুল হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করলেন—একথা আগে জানাওনি কেন?

—তিনি নিষেধ করেছিলেন—আমি তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা—

—বুঝেছি। তবে এখন বলতে এসেছ কেন?

—এখন আমার মনে হচ্ছে, আমি কার যেন কি অনিষ্ট করেছি।

পূর্ণবর্ধন একটুখানি কি ভাবলেন, তারপর বললেন—এই রকম একটা কিছু ঘটবে তা আমি জনতাম। পদ্মসম্ভব আর তার কতকগুলো কান্ডজ্ঞানহীন তান্ত্রিক শিষ্য দেশের

ধর্মকর্ম লোপ করতে বসেছে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য এরা না করতে পারে এমন কোন কাজই নেই—আর আমি বেশ দেখছি প্রদ্যুম্ন যে, তোমার এই অবাধ্যতা ও অযথা কৌতুকপ্রিয়তাই তোমার সর্বনাশের মূল হবে। তুমি কাল রাত্রে অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছ, তুমি দেবী সরস্বতীকে বন্দিনী করবার সহায়তা করেছ।

এবার প্রদ্যুম্নের বিস্মিত হবার পালা। তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বার হ'ল না। পূর্ণবর্ধন বললেন—এই সব কুসংসর্গ থেকে দূরে রাখবার জন্যেই আমি বিহারের কোনও ছাত্রকে বিহারের বাইরে যাবার অনুমতি দিইনে, কিন্তু যাক্, তুমি ছেলেমানুষ, তোমারই বা দোষ কি। আচ্ছা, এই সুরদাসকে দেখতে কি রকম বল দেখি?

প্রদ্যুম্ন সুরদাসের আকৃতি বর্ণনা করলে।

পূর্ণবর্ধন বললেন—আমি জানি। তুমি যাকে সুরদাস বলছ, তার নাম সুরদাস নয় বা তার বাড়ী অবন্তীতেও নয়। সে হচ্ছে প্রসিদ্ধ কাপালিক গুণাঢ্য। কার্যসিদ্ধির জন্য তোমার কাছে মিথ্যা নাম বলেছে—

প্রদ্যুম্ন অধীর ভাবে বলে উঠল, কিন্তু আপনি যে বলেছেন—

পূর্ণবর্ধন বললেন, সে ইতিহাস বলছি শোন। নদীর ধারে যে সরস্বতী মন্দিরের ভগ্নস্তূপ আছে, ওটা হিন্দুদের একটা অত্যন্ত বিখ্যাত তীর্থস্থান। প্রায় দু'শত বৎসর পূর্বে একজন তরুণ গায়ক ওখানে থাকত। তখন মন্দিরের খুব সমৃদ্ধির অবস্থা ছিল না। কিন্তু প্রবাদ এই যে, সে গায়কটি মেঘমল্লারে এমন সিদ্ধ ছিল যে, আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে তার আলাপে মুগ্ধা হয়ে দেবী সরস্বতী স্বয়ং তার কাছে আবির্ভূতা হতেন। সেই থেকে ওই মন্দির এক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান হয়ে ওঠে। সে গায়ক মারা যাওয়ার পরেও কিন্তু পূর্ণিমার রাতে সিদ্ধ গায়ক মল্লার আলাপ করলেই দেবী যেন কোন্ টানে তার কাছে এসে পড়েন। এই গুণাঢ্য একবার অবন্তীর প্রসিদ্ধ গায়ক সুরদাসের সঙ্গে ওই ঢিবিতে উপস্থিত ছিল। সুরদাস মেঘ-মল্লার-সিদ্ধ ছিলেন। তাঁর গানে নাকি সরস্বতী দেবী তাঁর সম্মুখে আবির্ভূতা হয়ে তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বলেন। সুরদাস প্রার্থনা করেন, তিনি যেন দেশের সংগীতজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হন। সরস্বতী দেবী তাঁকে সেই বরই দেন। তারপর দেবী যখন গুণাঢ্যকে বর প্রার্থনার কথা বলেন, তখন সে দেবীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকেই প্রার্থনা ক'রে বসে। সরস্বতী দেবী বলেছিলেন, তাঁকে পাওয়া নির্গুণের কাজ নয়, সে নামে গুণাঢ্য হ'লেও কার্যত তার এমন কোনো কলাতেই নিপুণতা নেই যে তাঁকে পেতে পারে, অনেক জীবন ধ'রে সাধনার প্রয়োজন। সরস্বতী দেবী অন্তর্হিত হওয়ার পর মূর্খ গুণাঢ্যের মোহ আরও বেড়ে যায়, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দেবীর উপর তার অত্যন্ত রাগ হয়। সে তন্ত্রোক্ত মন্ত্রবলে দেবীকে বন্দিনী করবার জন্যে উপযুক্ত তান্ত্রিক গুরু খুঁজতে থাকে। আমি জানি সে এক সন্ন্যাসীর কাছে তন্ত্রশাস্ত্রের উপদেশ নিত। সন্ন্যাসী কিছুদিন পরে তার তন্ত্রসাধনার হীন উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তাকে দূর করে দেন। এসব কথা এদেশের সকল প্রাচীন লোকেই জানেন। আমি অনেকদিন তারপর গুণাঢ্যের আর কোনও সংবাদ জানতাম না। ভেবে-ছিলাম সে এদেশ থেকে চলে গিয়েছে। কিন্তু এখন তোমার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে কাল রাত্রে সে কৃতকার্য হয়েছে বোধ হয়। এতদিন ঐ উদ্দেশ্যেই সে কোথাও তন্ত্রসাধনা করছিল। যাক্ তুমি এখনি গিয়ে সন্ধান করো মন্দিরে সে আছে কিনা, থাকে যদি আমায় সংবাদ দিও।

প্রদ্যুম্ন সেখানে আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। সে ছুটে গিয়ে বিহারের উদ্যানে পড়ল। তখন রোদ বেশ ফুটে উঠেছে, বিহারের পাঠার্থীদের সমবেত কণ্ঠের স্তোত্রগান তার কানে আসছিলঃ—

যে ধম্মা হেতুপ্পভবা
তেসং হেতুং তথাগতো আহ
তেসঞ্চ যে নিরোধো
এবংবাদী মহাসমনো...

যেতে যেতে সে দেখলে উদ্যানের এক প্রান্তে একটা বড় আমগাছের ছায়ায় চিত্রকর ভিক্ষু বসুব্রত হরিণচর্মের আসনে ব'সে বোধ হয় কি আঁকছেন, কিন্তু তাঁর মুখে অতৃপ্তি ও অসাফল্যের একটা চিহ্ন আঁকা।

প্রদ্যুম্ন যা ভেবেছিল তাই ঘটল। মন্দিরে গিয়ে সে দেখল—সেখানে কেউ নেই, গুণাঢ্য তো নেইই, সেই আজীবক সন্ন্যাসী পর্যন্ত নেই। দু'একটা যবাগুপানের ঘট, আগুন জ্বালবার জন্যে সংগৃহীত কিছু শুক্‌নো কাঠ মন্দিরের মধ্যে এদিক ওদিক ছড়ানো প'ড়ে আছে।

সেইদিন গভীর রাত্রে প্রদ্যুম্ন কাউকে কিছু না ব'লে চুপি চুপি বিহার পরিত্যাগ করলে।

তার পর এক বৎসর কেটে গিয়েছে।

বিহার পরিত্যাগ করবার পর প্রদ্যুম্ন একবার কেবল সুনন্দার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেছিল, সে বিশেষ কোন কাজে বিদেশে যাচ্ছে, শীঘ্রই ফিরে আসবে। এই এক বৎসর সে কাঞ্চী, উত্তর কোশল ও মগধের সমস্ত স্থান খুঁজেছে, কোথাও গুণাঢ্যের সন্ধান পায়নি।

তবে বেড়াতে বেড়াতে কতকগুলি কৌতূহলজনক কথা তার কানে গিয়েছে।

মগধের প্রসিদ্ধ ভাস্কর মিহিরগুপ্ত রাজার আদেশমত ভগবান্ তথাগতের মূর্তি তৈরী করতে আদিষ্ট হয়েছিলেন। এক বৎসর পরিশ্রম ক'রে তিনি যে মূর্তি গড়ে তুলেছেন, তার মুখশ্রী এমন রূঢ় ও ভাববিহীন হয়েছে যে তা বুদ্ধের মূর্তি কি মগধের দুর্দান্ত দস্যু দমনকের মূর্তি, তা সে দেশের লোক ঠিক বুঝতে পারছে না।

তক্ষশীলার বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত যমুনাচার্য মীমাংসাদর্শনের ভাষ্য প্রণয়ন করতে নিযুক্ত ছিলেন, হঠাৎ তাঁর নাকি এমন দুর্দশা ঘটেছে যে তিনি আর সূত্রের অর্থ ক'রে উঠতে না পেরে আবার বৈদিক ব্যাকরণের সুবন্ত প্রকরণ থেকে পড়তে আরম্ভ করেছেন!

মহাকোট্‌ঠি বিহারের চিত্রবিদ্যা-শিক্ষক ভিক্ষু বসুব্রত "বুদ্ধ ও সুজাতা" নামক তাঁর চিত্রখানা বৎসরাবধি চেষ্টা করেও মনের মত ক'রে এঁকে উঠতে না পেরে বিরক্ত হয়ে ওদিকে একেবারে ছেড়ে দিয়ে সম্প্রতি নাকি শাকুনশাস্ত্রের চর্চায় অত্যন্ত উৎসাহ দেখাচ্ছেন।

একদিন প্রদ্যুম্ন সন্ধান পেলে উরুবিল্ব গ্রামের কাছে একটা নির্জন স্থানে একজন গো-চিকিৎসক এসে বাস করছেন। তাঁর চেহারার বর্ণনার সঙ্গে সুরদাসের আকৃতির অনেকটা মিল হ'ল। তখনি সে গ্রামে গিয়ে অনেককে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু গো-চিকিৎসকের সন্ধান কেউ দিতে পারলে না।

সেদিন ঘুরতে ঘুরতে অবসন্ন অবস্থায় উরুবিল্ব গ্রামের প্রান্তের একটা বড় বট-গাছের ছায়ায় সে বসেছে। সন্ধ্যা তখনও নামেনি, ঝিরঝিরে বাতাসে গাছের পাতাগুলো নাচছে, পাশে মাঠে পাকা শস্যের শীষগুলো সোনার মত চিক্‌মিক্ করছে, একটু দূরে একটা ডোবার মত জলাশয়ে বিস্তর কুমুদ ফুল ফুটে আছে, অনেক বন্যহংস তার জলে খেলা করছে।

সামনে একটু দূরে একটা ছোট পাহড়। পাহাড়ের গায়ে একটা ঝরণা। পাহাড়ের নীচে এক জায়গায় ঝরণার জল খানিকটা আটকে গিয়ে ওই ডোবার মত জলাশয়টা তৈরী করেছে। প্রদ্যুম্নের হঠাৎ চোখ পড়ল, পাহাড়ের গা বেয়ে ধাপে ধাপে ঘটকক্ষে এক স্ত্রী-লোক নেমে আসছেন।

দেখে তার মনে কেমন সন্দেহ হওয়াতে সে এগিয়ে গেল। ডোবার একদিকের উঁচু পাড়ে গিয়ে দেখেই তার মাথাটা যেন ঘুরে উঠল—এই তো! এই তো তিনি! ভদ্রাবতীর তীরে শালবনে ইনিই তো পথ হারিয়ে ঘুরছিলেন, মাঠের মধ্যে জ্যোস্নারাতে এ'কেই তো সে দেখেছিল—তবে তাঁর অঙ্গের সে জ্যোতির এক কণাও আর নেই, পরনে অতি মলিন এক বস্ত্র। কিন্তু সেই চোখ, সেই সুন্দর গঠন।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে তার আর কোন সন্দেহ রইল না যে, এই তিনি। তার মনের মধ্যে গোলমাল বেধে গেল। সে উত্তেজনার মাথায় বিহার ছেড়ে সুরদাসের খোঁজ ক'রে বেড়াচ্ছিল বটে, কিন্তু দেখা পেলে কি করবে তা সে ভাবেনি। কাজেই সে একরকম লুকিয়েই সেখান থেকে চ'লে এল।

রোজ রোজ সন্ধ্যায় প্রদ্যুম্ন এসে বটগাছটার তলায় বসে। রোজ সন্ধ্যার আগে দেবী পাহাড়ের গায়ের পথ বেয়ে নেমে আসেন, আবার সন্ধ্যার সময় ঘটকক্ষে ধাপে ধাপে উঠে চ'লে যান—সে রোজ ব'সে দেখে।

এই রকম কিছুদিন কেটে গেল। একদিন প্রদ্যুম্ন মাঠের গাছতলায় চুপ ক'রে ব'সে আছে, সেই সময় দেবী জলাশয়ে নামলেন। সেও কি ভেবে ডোবার এদিকের পাড়ের দিকে দাঁড়াল—দেখলে দেবী ঘট নামিয়ে রেখে কুমুদ ফুল সংগ্রহে বড় ব্যস্ত। একটা বড় ফুল জলাশয়ের এপারের দিকে এগিয়ে বেশি জলে ফুটেছিল, তিনি সেটা সংগ্রহের জন্য খানিকটা বৃথা চেষ্টা করবার পর চোখ তুলে অপর পারে প্রদ্যুম্নকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ একটু অপ্রতিভের হাসি হাসলেন—তারপর হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে বললেন—ফুলটা আমায় তুলে দেবে?

—দিই যদি আপনি এক কাজ করেন।

—কি বলো?

—আমায় কিছু খেতে দেবেন? আমি সমস্ত দিন কিছু খাইনি।

দেবীর মুখে ব্যথার চিহ্ন দেখা দিল। বললেন—আহা! তা এতক্ষণ বলনি কেন?—এপারে এস, থাক্‌গে ফুল।

প্রদ্যুম্ন জলে নেমে ফুলটা সংগ্রহ ক'রে ওপারে গেল।

দেবী বললেন, তুমি মাঠের মাঝের ওই বড় গাছটার তলায় রোজ ব'সে থাক, না?

প্রদ্যুম্ন তাঁর হাতে ফুলটা দিয়ে বললে—হাঁ, আমিও দেখি আপনি সন্ধ্যার সময় রোজই জল নিয়ে আসেন।

দেবী হাসিমুখে বললেন, ওই পাহাড়ের ওপরই আমাদের ঘর—এস তুমি আমার সঙ্গে—তোমায় খেতে দিইগে।

হঠাৎ দেবী কেমন একপ্রকার বিহ্বল চোখে চারিদিকে চাইলেন। তারপর পাহাড়ের গায়ে কাটা ধাপ বেয়ে উঠতে লাগলেন, প্রদ্যুম্ন পিছনে পিছনে চলল। পাহাড়ের উপর উঠে গিয়ে—একটু দূরে বুনো বাঁশঝাড়ের আড়ালে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা ছোট কুটীর। দেবী বন্ধ দুয়ার খুলে ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রদ্যুম্নকে বল্‌লেন—এস।

প্রদ্যুম্ন দেখলে কুটীরে কেউ নেই, জিজ্ঞাসা করলে—আপনি কি এখানে একা থাকেন?

দেবী বললেন—না। এক সন্ন্যাসী আমায় এখানে সঙ্গে ক'রে এনেছেন, তিনি কি

সামনে একটু দূরে একটা ছোট পাহড়। পাহাড়ের গায়ে একটা ঝরণা। পাহাড়ের নীচে এক জায়গায় ঝরণার জল খানিকটা আটকে গিয়ে ওই ডোবার মত জলাশয়টা তৈরী করেছে। প্রদ্যুম্নের হঠাৎ চোখ পড়ল, পাহাড়ের গা বেয়ে ধাপে ধাপে ঘটকক্ষে এক স্ত্রীলোক নেমে আসছেন।

দেখে তার মনে কেমন সন্দেহ হওয়াতে সে এগিয়ে গেল। ডোবার একদিকের উঁচু পাড়ে গিয়ে দেখেই তার মাথাটা যেন ঘুরে উঠল—এই তো! এই তো তিনি! ভদ্রাবতীর তীরে শালবনে ইনিই তো পথ হারিয়ে ঘুরছিলেন, মাঠের মধ্যে জ্যোস্নারাতে এঁকেই তো সে দেখেছিল—তবে তাঁর অঙ্গের সে জ্যোতির এক কণাও আর নেই, পরনে অতি মলিন এক বস্ত্র। কিন্তু সেই চোখ, সেই সুন্দর গঠন।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে তার আর কোন সন্দেহ রইল না যে, এই তিনি। তার মনের মধ্যে গোলমাল বেধে গেল। সে উত্তেজনার মাথায় বিহার ছেড়ে সুরদাসের খোঁজ ক'রে বেড়াচ্ছিল বটে, কিন্তু দেখা পেলে কি করবে তা সে ভাবেনি। কাজেই সে একরকম লুকিয়েই সেখান থেকে চ'লে এল।

রোজ রোজ সন্ধ্যায় প্রদ্যুম্ন এসে বটগাছটার তলায় বসে। রোজ সন্ধ্যার আগে দেবী পাহাড়ের গায়ের পথ বেয়ে নেমে আসেন, আবার সন্ধ্যার সময় ঘটকক্ষে ধাপে ধাপে উঠে চ'লে যান—সে রোজ ব'সে দেখে।

এই রকম কিছুদিন কেটে গেল। একদিন প্রদ্যুম্ন মাঠের গাছতলায় চুপ ক'রে ব'সে আছে, সেই সময় দেবী জলাশয়ে নামলেন। সেও কি ভেবে ডোবার এদিকের পাড়ের দিকে দাঁড়াল—দেখলে দেবী ঘট নামিয়ে রেখে কুমুদ ফুল সংগ্রহে বড় ব্যস্ত। একটা বড় ফুল জলাশয়ের এপারের দিকে এগিয়ে বেশি জলে ফুটেছিল, তিনি সেটা সংগ্রহের জন্য খানিকটা বৃথা চেষ্টা করবার পর চোখ তুলে অপর পারে প্রদ্যুম্নকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ একটু অপ্রতিভের হাসি হাসলেন—তারপর হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে বললেন—ফুলটা আমায় তুলে দেবে?

—দিই যদি আপনি এক কাজ করেন।

—কি বলো?

—আমায় কিছু খেতে দেবেন? আমি সমস্ত দিন কিছু খাইনি।

দেবীর মুখে ব্যথার চিহ্ন দেখা দিল। বললেন—আহা! তা এতক্ষণ বলনি কেন?—এপারে এস, থাক্‌গে ফুল।

প্রদ্যুম্ন জলে নেমে ফুলটা সংগ্রহ ক'রে ওপারে গেল।

দেবী বললেন, তুমি মাঠের মাঝের ওই বড় গাছটার তলায় রোজ ব'সে থাক, না?

প্রদ্যুম্ন তাঁর হাতে ফুলটা দিয়ে বললে—হাঁ, আমিও দেখি আপনি সন্ধ্যার সময় রোজই জল নিয়ে আসেন।

দেবী হাসিমুখে বললেন, ওই পাহাড়ের ওপরই আমাদের ঘর—এস তুমি আমার সঙ্গে—তোমায় খেতে দিইগে।

হঠাৎ দেবী কেমন একপ্রকার বিহ্বল চোখে চারিদিকে চাইলেন। তারপর পাহাড়ের গায়ে কাটা ধাপ বেয়ে উঠতে লাগলেন, প্রদ্যুম্ন পিছনে পিছনে চলল। পাহাড়ের উপর উঠে গিয়ে—একটু দূরে বুনো বাঁশঝাড়ের আড়ালে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা ছোট কুটীর। দেবী বন্ধ দুয়ার খুলে ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রদ্যুম্নকে বল্‌লেন—এস।

প্রদ্যুম্ন দেখলে কুটীরে কেউ নেই, জিজ্ঞাসা করলে—আপনি কি এখানে একা থাকেন?

দেবী বললেন—না। এক সন্ন্যাসী আমায় এখানে সঙ্গে ক'রে এনেছেন, তিনি কি

করেন জানিনে, কিন্তু মাঝে মাঝে এখান থেকে চ'লে যান,—পাঁচ-ছ'দিন পরে আসেন। তুমি এখানে ব'সো।

দেবী মাটির ঘর পূর্ণ ক'রে তাকে যবাগূ পান করতে দিলেন, স্বাদ অমৃতের মত, এমন সুস্বাদু যবাগূ সে পূর্বে কখনো পান করেনি।

প্রদ্যুম্নের মনে হ'ল, যদি আচার্য পূর্ণবর্ধনের কথা সত্য হয়, আর যদি সে স্বচক্ষে যা দেখেছে তা ইন্দ্রজাল না হয়, তবে এই তো দেবী সরস্বতী তার সামনে। তার জানবার কৌতূহল হ'ল, ইনি নিজের সম্বন্ধে কি বলেন!

সে জিজ্ঞাসা করলে—আপনারা এর আগে কোথায় ছিলেন? আপনার দেশ কোথা?

দেবী কাঠের বড় পাত্রে সযত্নে সূপ ও অন্ন পরিবেশনে ব্যস্ত ছিলেন, প্রশ্ন শুনে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি প্রদ্যুম্নের দিকে চেয়ে বললেন—আমার কথা বলছ? আমার দেশ কোথায় জানিনে। আমি নাকি বিদিশার পথের ধারে এক ভাঙা মন্দিরে অচেতন অবস্থায় প'ড়ে ছিলাম, সন্ন্যাসী আমায় এখানে উঠিয়ে এনেছেন! সেই থেকে এখানেই আছি—তার আগে কোথায় ছিলাম তা' আমার মনে পড়ে না।

তিনি অন্যমনস্কভাবে বাইরে সাঁঝের রক্তিম আকাশে যেখানে উরুবিল্ব গ্রামের প্রান্তরে বনরেখার মাথার সূর্য হেলে পড়েছেন, সেই দিকে চেয়ে রইলেন—চেয়ে চেয়ে কি মনে আনবার চেষ্টা করলেন, বোধ হয় মনে এল না। হঠাৎ কি ভেবে তাঁর পদ্মের পাপড়ির মত চোখ দু'টি বেয়ে ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে জল ঝরে পড়ল।

তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছে তিনি প্রদ্যুম্নের সামনে অন্নে পূর্ণ কাঠের থালা রাখলেন। বললেন—খাবার জিনিস কিছুই নেই। তুমি রাত্রে এখানে থাকো, আমি পদ্মের বীজ শুকিয়ে রেখেছি, তাই দিয়ে রাত্রে পায়স তৈরী ক'রে খেতে দেব। সকালে যেও।

প্রদ্যুম্নের চোখে জল আসছিল।......ওগো বিশ্বের আত্মবিস্মৃতা সৌন্দর্যলক্ষ্মী, বিদিশার মহারাজের আর মহাশ্রেষ্ঠীর সমবেত রত্নভাণ্ডার তোমার পায়ের এক কণা ধুলোরও যোগ্য নয়, সে দেশের পথের ধুলো এমন কি পুণ্য করেছে মা, যে তুমি সেখানে প'ড়ে থাকতে যাবে?

খাওয়া শেষ হ'লে প্রদ্যুম্ন বিদায় চাইলে।

দেবীর চোখে হতাশার দৃষ্টি ফুটে উঠল, বললেন—থাকো না কেন রাত্রে! আমি রাত্রে পায়স রেঁধে দেব।

প্রদ্যুম্ন জিজ্ঞাসা করলে—আপনার এখানে একা রাত্রে থাকতে ভয় করে না?

—খুব ভয় করে। ওই বেতের বনে অন্ধকারে কি যেন নড়ে, ভয়ে আমি দোর খুলতে পারিনে। ঘুম হয় না, সমস্ত রাত ব'সেই থাকি।

প্রদ্যুম্নের হাসি পেল, ভাবলে রাত্রে একা থাকতে ভয় করে ব'লে পায়সের লোভ দেখিয়ে দেবী তাকে সঙ্গে রাখতে চান। সে বললে,—আচ্ছা রাত্রে থাক্‌ব।

দেবীর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হ'ল।

সমস্ত রাত সে কুটীরের বাইরে খোলা হাওয়ায় ব'সে কাটালে। দেবীও কাছে ব'সে রইলেন। বললেন—এমন জ্যোৎস্না, আমি কিন্তু ভয়ে বাইরে আসতে পারিনে, ঘরের মধ্যে ব'সে রাত কাটাই।

দেবীর ব্যাপার দেখে প্রদ্যুম্ন অবাক হয়ে গিয়েছিল। হ'লেই বা মন্ত্রশক্তি, এতটা আত্মবিস্মৃত হওয়া, এ যে তার কল্পনার বাইরের জিনিস।

নানা গল্পে সমস্ত রাত কাটল, ভোর হ'লে সে বিদায় চাইলে।

দেবী ব'লে দিলেন—সন্ন্যাসী এলে একদিন আবার এস।

সেই দিন থেকে প্রতি রাত্রে সে দেবীর অলক্ষিতে পাহাড়ের নীচে ব'সে কুটীরের দিকে

চেয়ে পাহারা রাখত। তার তরুণ বীর হৃদয় এক ভীরু নারীকে একা বনের মধ্যে ফেলে রাখার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তুলেছিল।

দশ-পনের দিন কেটে গেল।

এক-একদিন প্রদ্যুম্ন শুনত, দেবী অনেক রাত্রে একা গান গাইছেন—সে গান পৃথিবীর মানুষের গান নয়, সে গান প্রাণধারার আদিম ঝরণার গান, সৃষ্টিমুখী নীহারিকাদের গান, অনন্ত আকাশে দিক্‌হারা কোন পথিক তারার গান।

একদিন দুপুর বেলা কে তাকে বললে—তুমি যে গো-বৈদ্যের কথা বলছিলে, তাকে এইমাত্র দেখে এলাম, পথের ধারে পুকুরে সে স্নান করছে।

শুনে ছুটতে ছুটতে গিয়ে পুকুরের ধারে উপস্থিত হ'ল। দেখলে সত্যই গুণাঢ্য, পুকুরের ধারে বস্ত্রাদির পুঁটুলি নামিয়ে রেখে পুকুরে স্নান করতে নেমেছেন। সে অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু পরে গুণাঢ্য বস্ত্র পরিবর্তন ক'রে উপরে উঠে প্রদ্যুম্নকে দেখে কেমন যেন হয়ে গেলেন। বললেন—তুমি এখানে?

প্রদ্যুম্ন বললে—আমি কেন তা বুঝতে পারেন নি?

গুণাঢ্য বললেন—তুমি এখন বলছ ব'লে নয় প্রদ্যুম্ন, আমি এ-কাজ করবার পর যথেষ্ট অনুতপ্ত আছি। প্রতি রাত্রে ভয়ানক স্বপ্ন দেখি—কারা যেন বলছে, তুই যে কাজ করেছিস এর শাস্তি অনন্ত নরক। আমি এইজন্যই আজ এক পক্ষের ওপর আমার গুরু সেই আজীবক সন্ন্যাসীর কাছে গিয়েছিলাম। তাঁরই কাছে এ বশীকরণ মন্ত্র আমি শিক্ষা করি। এর এমনি শক্তি যে মনে করলে আমি যাকে ইচ্ছে বাঁধতে পারি, কিন্তু আনতে পারিনে। মন্ত্রের বন্ধনশক্তি থাকলেও আকর্ষণী শক্তি নেই। এইজন্যে আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়েছিলুম, আমি নিজে সঙ্গীতের কিছুই জানিনে যে তা নয়, কিন্তু আমি জানতাম যে তুমি মেঘ-মল্লারে সিদ্ধ, তোমার গানে দেবী ওখানে আসবেনই, এলে তারপর মন্ত্রে বাঁধব। এর আগে আমার বিশ্বাসই ছিল না যে, এমন একটা ব্যাপার হওয়া সম্ভব। অনেকটা মন্ত্রের গুণ পরীক্ষা করবার কৌতূহলেই আমি এ কাজ করি।

প্রদ্যুম্ন বললে—এখন?

গুণাঢ্য বললেন—এখন আমার গুরুর কাছ থেকেই আসছি। তিনি সব শুনে একটা মন্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন, এটা পূর্ব মন্ত্রের বিরোধী শক্তিসম্পন্ন। সেই মন্ত্রপূত জল দেবীর গায়ে ছড়িয়ে দিলে তিনি আবার মুক্ত হবেন বটে, কিন্তু তার কোন উপায় নেই।

প্রদ্যুম্ন জিজ্ঞাসা করলে—উপায় নেই কেন?

—যে ছিটিয়ে দেবে, সে চিরকালের জন্য পাষাণ হয়ে যাবে। আমার পক্ষে দুদিকই যখন সমান, তখন তাঁকে বন্দিনী রাখাই আমার ভালো। রাগ কোরো না প্রদ্যুম্ন, ভেবে দেখ, মৃত্যুর পর হয়তো পরজগৎ আছে, কিন্তু পাষাণ হওয়ার পর? তা আমি পারব না।

আত্মবিস্মৃতা বন্দিনী দেবীর চোখ দুটির করুণ অসহায় দৃষ্টি প্রদ্যুম্নের মনে এল। যদি তা না হয় তা হ'লে তাঁকে যে চিরদিন বন্দিনী থাকতে হবে!

যুগে যুগে যে উদার উচ্চ প্রেরণা আগে এসে তরুণদের নির্মল প্রাণে পৌঁছয়, আজও প্রদ্যুম্নের প্রাণের বেলায় তার ঢেউ এসে লাগল। সে ভাবলে, একটা জীবন তুচ্ছ। তাঁর রাঙা পা-দুখানিতে একটা কাঁটা ফুটলে তা তুলে দেবার জন্যে আমি শতবার জীবন দিতে প্রস্তুত।

হঠাৎ গুণাঢ্যের দিকে চেয়ে সে বললে—চলুন, আপনার সঙ্গে যাব, আমায় সে মন্ত্রপূত জল দেবেন।

গুণাঢ্য বিস্ময় প্রদ্যুম্নের দিকে চেয়ে বললেন—বেশ ক'রে ভেবে দেখ। এ ছেলেখেলা

নয়। এ কাজ—

প্রদ্যুম্ন বললে—চলুন আপনি।

তারা যখন কুটীরের নিকটবর্তী হ'ল তখন গুণাঢ্য বললেন—প্রদ্যুম্ন, আর একবার ভালো ক'রে ভেবে দেখ, কোন মিথ্যা আশায় ভুলো না, এ থেকে তোমায় উদ্ধার করবার ক্ষমতা কারুর হবে না—দেবীরও না। মন্ত্রবলে তোমার প্রাণশক্তি চিরকালের জন্য জড় হয়ে যাবে ; বেশ বুঝে দেখ। মন্ত্রশক্তি নির্মম অমোঘ, কাউকে রেহাই দেবে না।

প্রদ্যুম্ন বললে—আপনি কি ভাবেন আমি কিছু গ্রাহ্য করি?—কিছু না, চলুন।

কুটীরে তারা যখন গিয়ে উপস্থিত হ'ল, তখন রোদ বেশ প'ড়ে এসেছে। দেবী কুটীরের বাইরে ঘাসের উপর অন্যমনস্কভাবে চুপ ক'রে ব'সে ছিলেন—প্রদ্যুম্নকে আসতে দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, হাসিমুখে বললেন—এস, এস! আমি তোমার কথা প্রায়ই ভাবি। তোমায় সেদিন কিছু খেতে দিতে না পেরে আমার মন খুবই খারাপ হয়েছিল। এখন তুমি এখানে কিছুদিন থাকো।

তিনি দু'জনকে খেতে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে কুটীরের মধ্যে চ'লে গেলেন।

প্রদ্যুম্ন বললে—কই আমায় মন্ত্রপূত জল দিন তবে?

গুণাঢ্য বললেন—সত্যই তা হ'লে তুমি এতে প্রস্তুত?

প্রদ্যুম্ন বললে—আমায় আর কিছু বলবেন না, জল দিন।

দেবী কুটীরের মধ্যে আহারের স্থান ক'রে দু'জনকে খেতে দিলেন—আহারাদি যখন শেষ হ'ল তখন সন্ধ্যার আর বেশি দেরি নেই। বেতসবনে ছায়া নেমে আসছে, রাঙা সূর্য আবার উরুবিল্ব গ্রামের উপর ঝুলে পড়েছে।

গোধূলির আলোয় দেবীর মুখপদ্মে অপরূপ শ্রী ফুটে উঠল।

তারপর তিনি ঘটকক্ষে প্রতিদিনের মত নীচের ঝরণায় জল আনতে নেমে গেলেন।

গুণাঢ্য বললেন—আমি এখান থেকে আগে চ'লে যাই, তারপর এই ঘটপূর্ণ জল দেবীর গায়ে ছিটিয়ে দিও।

তাঁর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হ'ল। আবেগভরে তিনি প্রদ্যুম্নকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন—আমি কাপুরুষ, আমার সে সাহস নেই, নইলে—

তিনি কুটীরের মধ্যে তাঁর দ্রব্যাদি সংগ্রহ ক'রে নিলেন। তারপর সরু পথ বেয়ে বেতবনের ধার দিয়ে পাহাড়ের অপর পারে চ'লে গেলেন, তারই নীচে একটু দূরে মগধ থেকে বিদিশা যাওয়ার রাজবর্ত্ম।

প্রদ্যুম্ন চারিদিকে চেয়ে ব'সে ব'সে ভাবলে, ঐ নীল আকাশের তলে বিশ বৎসর আগে সে মায়ের কোলে জন্মেছিল, তার সে মা বারাণসীতে তাদের গৃহটিতে ব'সে বাতায়ন-পথে সন্ধ্যার আকাশের দিকে চেয়ে হয়তো প্রবাসী পুত্রের কথাই ভাবছেন—মায়ের মুখখানি একবারটি শেষবারের জন্যে দেখতে তার প্রাণ আকুল হয়ে উঠল। ঐ পূর্ব আকাশের নবমীর চাঁদ কেমন উজ্জ্বল হয়েছে! মগধ যাবার রাজপথে গাছের সারির মাথায় একটা তারা ফুটে উঠল। বেতবনের বেতডাঁটাগুলো তরল অন্ধকারে আর ভালো দেখা যায় না।

প্রদ্যুম্নের চোখ হঠাৎ অশ্রুপূর্ণ হ'ল।

সেই সময়ে সে দেখলে—দেবী জল নিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে আসছেন। মন্ত্রপূত জলপূর্ণ ঘট সে মাটিতে নামিয়ে রেখেছিল ; দেবীকে আসতে দেখে সে তা হাতে তুলে নিলে।

দেবী কুটীরের সামনে এলেন, তাঁর হাতে অনেকগুলো আধ-ফোটা কুমুদ ফুল।

প্রদ্যুম্নকে জিজ্ঞাসা করলেন—সন্ন্যাসী কোথায়?

প্রদ্যুম্ন বললে—তিনি আবার কোথায় চ'লে গেলেন। আজ আর আসবেন না।

তারপর সে গিয়ে দেবীর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম ক'রে বললে—মা, না জেনে তোমার ওপর অত্যন্ত অন্যায় আমি করেছিলাম, আজ তারই শাস্তি আমাকে নিতে হবে। কিন্তু আমি তার জন্যে এতটুকু দুঃখিত নই। যতক্ষণ জ্ঞান লুপ্ত না হয়ে যায়, ততক্ষণ এই ভেবে আমার সুখ যে, বিশ্বের সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে অন্যায় বাঁধন থেকে মুক্ত করার অধিকার আমি পেয়েছি।

দেবী বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রদ্যুম্নের দিকে চেয়ে রইলেন।

প্রদ্যুম্ন বললে—শুনুন, আপনি বেশ ক'রে মনে ক'রে দেখুন দেখি, আপনি কোথা থেকে এসেছিলেন?

দেবী বললেন—কেন, আমি ত বিদিশার পথের ধারে—

প্রদ্যুম্ন এক অঞ্জলি জল তাঁর সর্বাঙ্গে ছিটিয়ে দিলে।

সদ্যোনিদ্রোত্থিতার মত দেবী চমকে উঠলেন।

প্রদ্যুম্ন দৃঢ়হস্তে আর এক অঞ্জলি জল দেবীর সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিলে। নিমেষের জন্যে তার চোখের সামনে বাতাসে এক অপূর্ব সৌন্দর্যের স্নিগ্ধ প্রসন্ন হিল্লোল ব'য়ে গেল। তার সারা দেহমন আনন্দে শিউরে উঠল ; সঙ্গে সঙ্গে তার মনে এল—বারাণসীতে [illegible]দের গৃহে সন্ধ্যার-আকাশে-বন্ধ-আঁখি বাতায়নপথবর্তিনী তার মা!

কুমারশ্রেণীর বিহারে আচার্য শীলব্রতের কাছে একটি মেয়ে অল্প বয়সে দীক্ষা গ্রহণ করে। তার নাম সুনন্দা, সে হিরণ্যনগরের ধনবান্ শ্রেষ্ঠী সামন্তদাসের মেয়ে। পিতা-মাতার অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও মেয়েটি নাকি বিবাহ করতে সম্মত হয় নি। অত্যন্ত তরুণ বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করায় সে বিহারের সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে উঠেছিল। সেখানে কিন্তু কারো সঙ্গে সে তেমন মিশত না, সর্বদাই নিজের কাজে সময় কাটাত আর সর্বদাই কেমন অন্যমনস্ক থাকত।

জ্যোৎস্নারাত্রে বিহারের নির্জন পাষাণ অলিন্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে আপন মনে প্রায়ই কি ভাবত ; মাঠের জ্যোৎস্নাজাল কাটিয়ে অনেক রাতে কাউকে বিহারের দিকে আসতে দেখলে সে একদৃষ্টে সেদিকে চেয়ে থাকত, যেন কতদিন আগে তার যে প্রিয় আবার আসবে ব'লে চ'লে গিয়েছিল, তারই আসবার দিন গুণে গুণে এ শ্রান্ত শান্ত ধীর পথচাওয়া······প্রতি সকালে সে কার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে রইত, সকাল কেটে গেলে ভাবত বিকালে আসবে, বিকাল কেটে গেলে ভাবত সন্ধ্যায় আসবে—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এরকম কত সকাল সন্ধ্যা কেটে গেল—কেউ এল না···তবু মেয়েটি ভাবত, আসবে ······আসবে, কাল আসবে······পাতার শব্দে চমকে উঠে চেয়ে দেখত—এতদিনে বুঝি এল!

এক এক রাত্রে সে বড় অদ্ভুত স্বপ্ন দেখত। কোথাকার যেন কোন্ এক পাহাড়ের ঘন বেতের জঙ্গল আর বাঁশের বনের মধ্যে লুকানো এক অর্ধভগ্ন পাষাণমূর্তি। নিঝুম রাতে সে-পাহাড়ের বেতগাছ হাওয়ায় দুলছে, বাঁশবনে সির্‌সির্ শব্দ হচ্ছে, দীর্ঘ দীর্ঘ বেতডাঁটার ছায়ায় পাষাণমূর্তিটার মুখ ঢাকা পড়ে গেছে। সে অন্ধকার অর্ধরাত্রে জনহীন পাহাড়টার বাঁশগুলোর মধ্যে ঝোড়ো হাওয়া ঢুকে কেবল বাজছে মেঘ-মল্লার!······

ভোরে উঠে রাতের স্বপ্ন ভেবে আশ্চর্য হয়ে যেত—কোথায় পাহাড়, কোথায় বেতবন, কার ভাঙা মূর্তি, কিসের এসব অর্থহীন দুঃস্বপ্ন!

প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৩০

অধ্যয়ন শেষ ক'রে লোকনাথ যখন তাঁর আচার্যের কাছে বিদায় চাইলেন, আচার্য তাঁকে বলেছিলেন—একটা কথা সব সময় মনে রেখো তুমি, অনেক লোকের ওপরে "লোকনাথ" নামটি সার্থক ক'রে জীবনের পথে অগ্রসর হবে।

অলোকসামান্য প্রতিভাবান এবং প্রিয়তম ছাত্রকে বিদায় দিয়ে, আচার্য দু'তিন দিন পর্যন্ত মৌনী ছিলেন।

মঠ থেকে বার হয়ে লোকনাথ কোন বড় রাজসভায় গেলেন না। অধ্যাপনা করবার কোন আগ্রহ দেখালেন না, বিবাহ ক'রে সংসারী হবার বিষয়েও সম্পূর্ণ উদাসীন রয়ে গেলেন। কিছুদিন লক্ষ্যহীন অবস্থায় এদিক ওদিক ঘুরিবার পর শেষে পুণ্যভদ্রার নির্জন তীরভূমিতে কুটীর বেঁধে সেখানেই বাস ক'রতে সুরু করলেন। এতে বেশির ভাগ লোকই তাঁকে বললে পাগল।

বাল্যকাল থেকেই লোকনাথ একটু অন্য প্রকৃতির। যে দিন প্রভাতের আলো খুব ফুটত, বালক লোকনাথ তার গ্রামের ধারের মাঠে একা বেড়িয়ে বেড়াত, সমবয়সী অন্য কোন ছেলের সংগে সে মিশত না। সন্ধ্যার ধূসর আকাশের তলে গ্রামের অদূরে ছোট পাহাড়টা যখন বড় আকাশের গা থেকে খসে-পড়া বড় একখণ্ড মেঘস্তূপের মত দেখাত, লোকনাথ দণ্ডের পর দণ্ড ধ'রে মাঠের ধারের বনের কাছে বসে এক মনে কি ভাবত, তার অপলক শিশু নয়ন দু'টি দণ্ডের পর দণ্ড ধ'রে ও পাহাড়ের দিকে আবদ্ধ থাকত। তার বিশ্বাস ছিল, ওই পাহাড়টাই পৃথিবীর প্রান্তসীমার পাহাড়। 'আচ্ছা, যদি ও ছাড়িয়ে চ'লে যাই, দূরে দূরে,—ক্রমেই দূরে,—আরও দূরে,—খুব খুব দূরে—খুব খুব খুব খুব দূরে—তা হলে কোথায় গিয়ে পৌঁছব? দৃশ্যমান সীমাচিহ্ন ছাড়িয়ে অজ্ঞাত রাজ্যে—এতদূর যাবার কল্পনায় বালকের মন বিস্মিত অভিভূত হয়ে পড়ত, নিজের ঘর, নিজের ভাই-বোনের কথা সে ভুলে যেত, শুধু অস্পষ্ট সন্ধ্যার আলোকে পরিবর্তনশীল মেঘ রাজ্যের পেছনে, অনেক অনেক পেছনে সে কোন দেশ, যেখানে এই এমনি ধূসর, মৌন চারিদিক, সে দেশের কথা মনে হ'তেই তার মন অবশ হয়ে আসত। তার দিদিমা যে রামায়ণ মহাভারতের গল্প করেন, সে সব ঘটনা সেই দেশেই ঘটে, রাম-রাবণের যুদ্ধ সেখানে এখনও চলেছে, সে দেশের সীমাহীন গহন বনের মধ্যে গলাকাটা কবন্ধ এখনও অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে, যত অসম্ভব আজগুবি জিনিসের দেশ যেন সেটা!

কিন্তু সে সব অনেক দিনকার কথা। বড় হয়ে উঠে লোকনাথ অত্যন্ত রুক্ষদর্শন ও কঠোর প্রকৃতির লোক হয়ে উঠলেন। তাঁর নীরস শুষ্ক পাণ্ডিত্যের সংগে খাপ খাইয়ে চলবার জন্যে তাঁর আকৃতি দিন দিন লালিত্যহীন হয়ে উঠতে লাগল। যখন তাঁর প্রকাণ্ড মাথাটার অসংযত দীর্ঘ চুলের গোছা আর দীর্ঘ রুক্ষ দাড়ি বাতাসে উড়ত তখন সত্যই তাঁকে অত্যন্ত ভয়ানক ব'লে মনে হ'ত। তীক্ষ্ন ইস্পাতের মতন এক অস্বাচ্ছন্দ্যকর দীপ্ত নীল আভা তাঁর চোখে খেলতে দেখা যেত, কিন্তু এক এক সময় আবার সে দীপ্তি শান্ত হয়ে আসত, তাঁকে খুব সৌম্য, খুব সুদর্শন, খুব উদার ব'লে মনে হ'ত।

বয়স বাড়বার সংগে সংগে লোকনাথের বাল্যের সে সুদূর-পিয়াসী মন ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। ত্রিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হবার পূর্বেই দৃশ্যমান জগৎটা একটা প্রশ্নের রূপ নিয়ে তাঁর চোখের সামনে উপস্থিত হ'ল। জগতের সৃষ্টিকর্তা কেউ আছে কিনা এই আজগুবি প্রশ্ন নিয়ে লোকনাথ মহা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত অবস্থায়

কালাতিপাত করতে লাগলেন। তাঁর জীবনের লক্ষ্যও ছিল আজগুবি ধরণের। সাংসারিক সুখ-সুবিধা লাভের প্রচেষ্টাকে তিনি পূর্ব হ'তেই অবজ্ঞার চোখে দেখতেন, যশোলাভ বিষয়েও তিনি হয়ে উঠলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। একবার মঠের আচার্যের কাছে মগধ থেকে পত্র এল—মঠের অতীশদের মধ্যে আচার্য যাকে উপযুক্ত মনে করবেন, তাঁকে হস্তীর পৃষ্ঠে ক'রে সসম্মানে রাজধানীতে নিয়ে আসা হবে। রাজসভার সূরিপর্দাতিলক মহাচার্য জীবনসূরির সম্প্রতি দেহান্তর ঘটেছে। আচার্য একমাত্র লোকনাথকেই এ পদের উপযুক্ত ব'লে ভেবেছিলেন, কিন্তু লোকনাথ কিছুতেই মগধে যেতে রাজী না হওয়ায় তাঁর এক সতীর্থ মগধে প্রেরিত হলেন। এর কিছুকাল পরেই লোকনাথ মঠ পরিত্যাগ করলেন এবং এক বৎসরের মধ্যেই পুণ্যভদ্রার নির্জন তীরভূমি আশ্রয় করলেন।

সেই থেকে আজ ত্রিশ বৎসর তিনি এই নির্জন মাঠের মধ্যে এ কুটীরখানিতে একা বাস করছেন। জৈন ধর্মমণ্ডলীর পক্ষ থেকে প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট পরিমাণ তণ্ডুল ও দুখানা বহির্বাস তাঁকে দেওয়া হ'ত। মাঠের ধারের বুনো কাপাসের তুলা থেকে তিনি অন্য পরিধেয় নিজের হাতে প্রস্তুত ক'রে নিতেন। প্রথম প্রথম দু'একজন ছাত্রকে নিয়ে তিনি অধ্যাপনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ও উন্নতচরিত্রের আকর্ষণে যখন শিক্ষার্থীর ভিড় বাড়বার উপক্রম হ'ল, অধ্যাপনা তিনি তখন একেবারেই বন্ধ ক'রে দিলেন।

পুণ্যভদ্রার দুই তীরের নির্জন মাঠ তখন স্থানে স্থানে বনে ভরা ছিল। অনেক স্থানে এই সব বনে উপর-পাহাড়ের শাল ও দেবদারু গাছের বীজের চারা, কোন স্থানে নানা রকমের কাঁটাগাছ ও বনজ লতার ঝোপ। দক্ষিণের পাহাড় একটা অপরিসর উপত্যকায় দ্বিধা-বিভক্ত, পুণ্যভদ্রার একটা ক্ষীণ স্রোতঃশাখা এর মাঝখান দিয়ে পাহাড়ের ওপারে বেরিয়ে গিয়েছে, তার গৈরিক জলধারার উপর সব সময় দুই তীরের পত্রশ্যাম শিশুদেবদারুশ্রেণীর কালো ছায়া।

এখানেই ছিল লোকনাথের কুটীর।

লোকনাথের ছোট কুটীরখানি হস্তলিখিত পুঁথির একটা ভাণ্ডার বিশেষ ছিল। কাঠের ত্রিপট্ট শক্ত ক'রে বেত দিয়ে বেঁধে লোকনাথ এক রকম পুস্তকাধার প্রস্তুত করেছিলেন এবং বৃহৎ তালপত্র ও ভূর্জপত্রের পুঁথিকে স্থান দেবার জন্য তিনি ত্রিপট্টের মাঝখানে অনেকখানি ক'রে ফাঁক রেখেছিলেন। এই ত্রিপট্টটি পুঁথিতে ভরা থাকত—ষড়্‌দর্শন, উপনিষদ, বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, অশ্বলায়ন ও আপস্তম্বাদি সূত্র, পাণিনি ও অন্যান্য বৈয়াকরণদের গ্রন্থ, সংহিতা ও নানা কোষকারদের পুঁথি, প্রাচীন জ্যোতির্বিদদের কিছু কিছু পুঁথি, ইত্যাদি। তা ছাড়া আরও নানাপ্রকার পুঁথি মেঝেতে এমন যদৃচ্ছক্রমে ছড়ানো প'ড়ে থাকত যে, কুটীরের মধ্যে পা রাখবার স্থান পাওয়া দুষ্কর।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্নান ক'রেই লোকনাথ কুটীরের সামনের প্রাচীন নিম গাছটার ছায়ায় গিয়ে বসতেন এবং একমনে পড়তেন।

এক-দিন অবসন্ন গ্রীষ্ম-অপরাহ্ন ঈষত্তপ্ত বাতাসের সঙ্গে সদ্য-ফোটা নিমফুলের পরাগ মাখিয়ে এক অপূর্ব লোকের সৃষ্টি করত, সেখানে শুক্লকেশ আর্যভট্ট শিষ্য শকটায়নকে নীলশূন্যে খড়ি এঁকে গ্রহ নক্ষত্রের সংস্থান উপদেশ করতেন, বুনো পাখীরা অশ্রান্ত কাকলীর মধ্যে যাস্ক ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় ব্যস্ত থকতেন, দুর্বোধ্য জ্যামিতিক সমস্যার সামনে প'ড়ে সেখানে কুঞ্চিত-ললাটে পরাশর তাঁর অন্যমনস্ক দৃষ্টি অত্যন্ত একমনে সম্মুখস্থ বল্মীকস্তূপের দিকে আবদ্ধ করে রাখতেন—চমক ভেঙে উঠে লোকনাথের কাছে এটাও একটা কম সমস্যার বিষয় হয়ে উঠত না সে, কেন তিনি এতক্ষণে মনে মনে

ভাষাতত্ত্ব অলোচনাকারী যাস্কের মুখকে সম্মুখস্থ নদীজলে সন্তরণকারী বন্য হংসের মুখের মত কল্পনা করেছিলেন!

রাত্রে আকাশের নক্ষত্রগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে লোকনাথ ভাবতেন, এগুলো কি? প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণের পুঁথি এখানে তাঁকে বড় সাহায্য করত না। অবশেষে তিনি নিজে ভেবে ভেবে স্থির করলেন, নক্ষত্রসমূহ এক প্রকার বৃহৎ স্ফটিক পিন্ড। পৃথিবীতে আলো দেওয়ার জন্যে এগুলো আকাশে আছে, চন্দ্রকে তিনি নক্ষত্রদের অপেক্ষা বৃহত্তর স্ফটিক পিন্ড ব'লে ভেবেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর হস্তলিখিত একখানি পুঁথিতে দেখা যায় তিনি গ্রহনক্ষত্র সংক্রান্ত তাঁর এ মতবাদ লিপিবদ্ধ ক'রে রেখে গিয়েছেন। তাদের আলোর উৎপত্তি সম্বন্ধে লোকনাথ লিখেছিলেন যে, পৃথিবীতে স্ফটিক প্রস্তরের যে শ্রেণী দেখতে পাওয়া যায়, মহাব্যোমস্থ এই সমস্ত স্ফটিক তার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শ্রেণীর হওয়ায় তাদের অভ্যন্তর থেকে এক প্রকার স্বভাবজ জ্যোতি বার হয়ে থাকে। এ সংক্রান্ত বহু প্রমাণ ও বহু জ্যামিতিক রেখা ও অঙ্কন তাঁর ঐ পুঁথিখানিতে ছিল দেখা যায়, কিন্তু লোকনাথের প্রতিভা অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর হওয়ায় তিনি তাঁর মত সম্বন্ধে আদৌ গোঁড়া ছিলেন না, সকলকে তাঁর মত প'ড়ে দেখে বিচার করতে অনুরোধ করে-ছিলেন। তিনি মাঝামাঝি কিছু হওয়াটাকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। তিনি চাইতেন উচ্চ-জ্ঞান, নয় তো একেবারে মূর্খতা। ত্রিশঙ্কুর স্বর্গবাসের উপর তাঁর একটা আন্তরিক অশ্রদ্ধা ছিল। একবার তিনি কয়েক বৎসর ধ'রে বহু পরিশ্রম ক'রে সাংখ্যের এক ভাষ্য প্রণয়ন করেছিলেন। লেখা শেষ ক'রে তাঁর মনে হ'ল তিনি যেমনটি আশা করেছিলেন ভাষা তেমনটি হয়নি, অনেক খুঁত রয়ে গিয়েছে, অনেক চেষ্টা করেও লোকনাথ সে খুঁত কিছুতেই দূর করতে পারলেন না। একদিন সকালবেলা হস্তলিখিত পুঁথিখানা নিয়ে তিনি পুণ্যভদ্রার তীরে গিয়ে দাঁড়ালেন। জলের স্রোতে তীরলগ্ন শরবনগুলো তখন থর্ থর্ ক'রে কাঁপছে। লোকনাথ অনেক বৎসরের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ পুঁথিখানিকে টান্ মেরে নদীর মাঝখানে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, একখন্ড ইটের মতই সেখানা সেই মুহূর্তে ডুবে গেল, শুধু সাংখ্যের উগ্র পান্ডিত্যের সাংঘাতে বন্য নদীর নিরক্ষর বুকটি অল্পক্ষণের জন্য ভাববিহ্বল হয়ে উঠল মাত্র।

দিন যেতে লাগল। লোকনাথ পূর্বের মতন আর একস্থানে অনেকক্ষণ বসতে পারেন না। মনের শান্তি তিনি দিন দিন হারাতে লাগলেন। এক-একদিন সমস্ত দিন তিনি কিছুই খেতেন না, কি জানি কেন, শুধু কেবল নদীর ধারে ধারে সারা দিনমান ধ'রে উদ্‌ভ্রান্তের মতন ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। রাত্রে আকাশের দিকে চাইতেন না, যদি হঠাৎ উপরের দিকে চেয়ে ফেলতেন, কালো আকাশের ভাঙা ভাঙা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে যে সব নক্ষত্র জ্বল্ জ্বল্ করত, তাদের সন্ত্রস্ত দৃষ্টির সামনে তিনি অনভ্যস্তপাঠ অপরাধী বালক-ছাত্রের মতন সঙ্কুচিতভাবে দৃষ্টি নামিয়ে দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেলতেন। রাত্রে নির্জন মাঠে চারিধার থেকে অন্ধকারে রাশি রাশি প্রশ্ন জেগে উঠত। ভগবান্ উপবর্ষের বেদান্ত-সূত্রের মধ্যে এদের উত্তর মেলে না কেন?

লোকনাথ আবার অত্যন্ত একমনে দর্শনের পুঁথি পড়তে সুরু করলেন। কিন্তু তাঁর মুখ যদি সে সময় কেউ দেখত সে বেশ বুঝত যে, তৃপ্তির চেয়ে অসন্তোষই হয়েছে তাঁর বেশি। দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করবার যে সহজ উপায় দার্শনিকরা নিরূপণ ক'রে গিয়েছেন, প'ড়ে শুনে দেখে লোকনাথের দুঃখ যেন তাতে বেড়েই চলেছে! রাত্রে বাঁশের আড়ার পুস্তকাধার থেকে ভূর্জপত্রের পতঞ্জলি বক্রচক্রে গৌতমের দিকে চাইতেন, কপিল গর্বমিশ্রিত ব্যঙ্গহাস্যে জৈমিনির দিকে কৃপাদৃষ্টিতে চেয়ে রইতেন, মূর্খগুলোর সঙ্গে

এক আসনে বসতে হয়েছে ভেবে গভীর অপমানে ব্যাসদেব পুঁথির মধ্যে দিন দিন শুকিয়ে উঠতে থাকতেন। রাত দুপুরের সময় অধ্যয়ন-ক্লান্ত অবসন্ন মস্তিষ্কে শয্যাগ্রহণ ক'রে লোকনাথের মনে হ'ত অর্ধ অন্ধকারে ঘরের মধ্যে একটা খণ্ডপ্রলয় চলেছে। দর্শনাচার্যগণ যেন কেউ কারুর কথা না শুনে পরস্পর মহা তর্ক তুলেছেন, তাঁদের ভাষ্যকার ও উপ-ভাষ্যকারগণের বাগ্‌যুদ্ধ হাতাহাতিতে পরিণত হবার উপক্রম হয়ে উঠেছে, কথার উপর কথা চড়িয়ে দু'দিক থেকেই কথার পাহাড় গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা হচ্ছে। লোকনাথের আর ঘুম হ'ত না, পুরাতন ভূর্জপত্রের গন্ধে ভারাক্রান্ত বন্ধ বাতাসে তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসত, শয্যা ছেড়ে উঠে তিনি বাইরের নিমগাছটার তলায় এসে দাঁড়াতেন, হয়তো কোন দিন ভাঙা চাঁদের নীচে বিশাল মাঠ আলো-আঁধারে অস্পষ্ট দেখাত, কোন দিন কষ্টিপাথরের মতন কালো অন্ধকারে পথের তলায় ঘাসের মধ্যে থেকে কত কি কীট-পতঙ্গ বিচিত্র সুরে ডাকতে থাকত, বনঝোপের মাথায় জোনাকি পোকার ঝাঁক জ্বলত ......নদীর ঝির্‌ঝিরে ঠাণ্ডা বাতাসে একটু শান্তিলাভ করবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই সব নীরব নৈশ প্রশ্ন প্রেতের মতন তাঁকে পেয়ে বসত। এবার সেটা আসত অন্ধকারের রূপ ধ'রে। আলোর যদি সৃষ্টিকর্তা থাকে, তবে অন্ধকারের আর একটা সৃষ্টিকর্তার কি প্রয়োজন আছে? আলোর অভাবই যদি অন্ধকার হয়, অন্ধকার কি তবে স্বপ্রকাশ? স্বয়ম্ভু? ......সৃষ্টির পূর্বের জিনিস?

লোকনাথ আবার ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে ঢুকতেন, আবার তত্ত্বসমাসের পুঁথিখানা উঠিয়ে নিয়ে প্রদীপের শিখা আঙুল দিয়ে উজ্জ্বল করে তুলতেন।

সেদিন তিনি পড়ছিলেন না, সারাদিন কেবল চুপ ক'রে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে কি ভাবছিলেন। যে রহস্য ভেদ করবার জন্য তাঁর মন সর্বদাই আকুল, সে রহস্য ভেদ করবার আশা ক্রমেই যেন দূরে চ'লে যাচ্ছে, সব দিকেই অন্ধকার, কোন দিক থেকে কোন আলোক আসবার চিহ্ন দেখা যায় না।

কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁর মনে হ'ত কোন কোন আত্মস্থ ঋষি কোন্ প্রাচীন যুগে তাঁদের জীবনের কোন এক শুভ মুহূর্তে এ জীবনরহস্যের সন্ধান বোধ হয় পেয়েছিলেন। ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্য তাই তাঁরা আশ্বাসবাণী লিপিবদ্ধ ক'রে রেখে গিয়েছিলেন ......'পেয়েছি......পেয়েছি......'। তাঁর মনে হ'ল প্রথম যেদিন তিনি উপনিষদের এক জীর্ণ পুঁথির পাতায় এ কথার সন্ধান পেয়েছিলেন, তখন তাঁর বয়স এখনকার চেয়ে কুড়ি বৎসর কম। সে এক বর্ষার রাত্রিকাল, স্তব্ধ নিশীথ রাত্রে, নির্জন মাঠ বেয়ে সেদিন অশান্ত বাধা-বন্ধনহীন বাতাস হু হু ক'রে ঝড়ের বেগে বয়ে যাচ্ছিল, স্তিমিতপ্রদীপ কুটীরে একা বসে পুঁথির মধ্যে তার সন্ধান পেয়ে ক্ষণিকের জন্য লোকনাথের সমস্ত শরীর সর্পস্পৃষ্টের মতন শিউরে উঠেছিল......পুঁথি বন্ধ ক'রে ঘরের বাইরে চেয়ে তাঁর মনে হয়েছিল গাছপালা, দূর্বা, নদীজল, সব যেন তাঁরই মতন শিউরে শিউরে উঠছে। এখন তাঁর সে কথা মনে প'ড়ে হাসি পেল। অল্প বয়সের সেই কাঁচা, ভাবপ্রবণ মনের দিকে নীচু চোখে চেয়ে দেখে তাঁর বর্তমান সময়ের প্রবীণ মন সকৌতুক-স্নেহে রঞ্জিত হয়ে উঠল। মানুষের মন নির্দিষ্ট গণ্ডী অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হ'তে পারে না—যে বলে জেনেছি, হয় সে ভণ্ড, নয় সে আত্মপ্রতারক মূর্খ! কি বুঝতে হবে, সে সম্বন্ধে তার কিছু ধারণাই নেই।

হঠাৎ তাঁর অন্যমনস্ক দৃষ্টি দূরের নীল শৈলসানুলগ্ন প্রথম বসন্তের নবপুষ্পিত রক্ত পলাশের বনে আবদ্ধ হয়ে পড়ল।

অনেকদিন আগের কথা। তখন লোকনাথের বয়স একুশ বৎসর।

—কিছু না, মায়া লক্ষ্মীটি, আমি, এই ধরো সাত বছরের মধ্যেই আস্‌ব······পড়া শেষ হ'তে কি আর এর বেশী নেবে? বড় জোর সাত বছরই হোক। তোমায় ফেলে এর বেশি কি আর থাকতে পারব? বুঝলে?

সতের বৎসরের মায়া সলজ্জ হেসে বলে—সাত বচ্ছর······এত কম সময়? এ আর এমন বেশি কি?

লোকনাথ গাঢ়স্বরে উত্তর দেয়, সেই কথাই তো বলছি মায়া, সাত বছর কি আর বেশি আমাদের পক্ষে? তারপর মায়ার মুখে নির্ভরতার দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে—নয় কি, মায়া?

মায়া মুখে হাসি টিপে উত্তর দেয়—নাঃ, তা আর বেশি কি! মোটে সাত বছর—এবেলা ওবেলা—ব'লেই প্রগল্‌ভ উচ্চহাস্যে হেসে ওঠে।

লোকনাথ অপ্রতিভ মুখে বলেছিল—না, শোনো মায়া—আমি বলছি—না—আমার বল্‌বার কথা······

যে মায়ার অভয়-ভরা স্নিগ্ধ দৃষ্টি সেদিন তাঁকে প্রবাসের পথে সখীর মতন আগু বাড়িয়ে দিয়ে চোখের জলে নিজেকে নিজে হারিয়ে ফেলেছিল, আজ লোকনাথের প্রবীণ হৃদয়ে কোথায় সে মায়ার স্থান তা আমরা জানিনে, তবে এটুকু বোধ হয় ঠিক যে সে সময়ের মনোভাব এখন আর লোকনাথের ছিল না। জীবনের তুচ্ছ জিনিসে তাঁর কোন আসক্তি ছিল না।

মঠে থাকতেই লোকনাথের মন অন্যরকম হয়ে উঠেছিল, তিনি মায়ার কথা ভুললেন, জীবনের সুখকে মনে মনে ঘৃণা করতে শিখলেন। তাঁর জীবনে শুধু অনুসন্ধিৎসু ঋষিদার্শনিকদের যাতায়াত শুরু হল ; সে এক অন্য জগৎ, মনের সমস্ত আকাশটা জুড়ে সেখানে শুধু এক বিরাট রহস্যময় দার্শনিক······কে তুচ্ছ মায়া? মূর্খেই শুধু এত সামান্য জিনিসে এত বেশি আনন্দ পায়, হৃদয়ের চিরন্তন প্রশ্নপুঞ্জ তাদের মনে কস্মিন্‌-কালে জাগে না ব'লেই।

তবু কখনো কখনো, কোনো অসাবধান মুহূর্তে যজ্ঞভঙ্গকারী নিশাচরের মতন অতর্কিত ভাবে হঠাৎ এসে পড়ে। তাঁর বিশ বৎসরের যৌবন মায়ার মুখের লজ্জা-নম্র হাসিতে, তার প্রসন্ন ললাটের মহিমায় স্নিগ্ধ হয়েছিল, যৌবনলক্ষ্মীর বরণ-ডালির সেই প্রথম মাঙ্গলিক।

অনেক বৎসর পরে মঠে থাকতে লোকনাথ শুনেছিলেন, মায়া বিবাহ করেনি, কোন্‌ মঠে প্রব্রজ্যা গ্রহণ ক'রে ভিক্ষুণী হয়েছে। সেও অনেক দিনের কথা, তার পর তার আর কোনো সংবাদ তিনি রাখেন না, যেখানে যায় যাক, তিনি গ্রাহ্য করেন না।

সন্ধ্যার ছায়া মাঠের চারিধারে ঘন হয়ে এল। কুটীরে যেতে যেতে লোকনাথ আকাশের দিকে চাইলেন, মনে মনে বললেন—হে অদৃশ্য শক্তি, আমি দার্শনিকাচার্য লোকনাথ—অজ্ঞান, মূর্খ সাধারণ মানুষের মতন আমার যুক্তিপ্রণালী বা মানসিক ধারা নয়। আমি জানতে চাই, এই কার্যস্বরূপ দৃশ্যমান জগৎ কোন্‌ কারণ-প্রসূত। সাধারণ লোকে যাকে ঈশ্বর বলে, তার মূলে কিছু আছে কিনা। গ্রন্থের কথা আমি জানিনে, কারণ তার প্রমাণের ওপর আমার কোন আস্থা নেই। আমি তোমার কাছে প্রমাণ চাই, জানিনে তোমার শোনাবার ক্ষমতা আছে কি না, থাকে তো জানিও।······ভোলাবার চেষ্টা কোরোনা,—তাতে আমি ভুলবো না।

মহামণ্ডলীর মঠে প্রধান দার্শনিক বৈভাষিকপন্থী মাধবাচার্য বাস করতেন। লোক-নাথ তাঁর কাছে গিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। মাধবাচার্য বোঝাতে গিয়ে প্রথমত মুক্তি

কি, মুক্তি কয় প্রকার, মুক্তির ও নির্বাণের মধ্যে প্রভেদ কিছু আছে কিনা, প্রভৃতি এত বিস্তৃতভাবে বলতে লাগলেন ও এত শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত ক'রে তাঁর মতের পরিপোষণের চেষ্টা পেতে লাগলেন যে লোকনাথ অত্যন্ত পাণ্ডিত্য-প্রিয় হলেও তাঁর মনে হ'তে লাগল, মুক্তির একটি স্বরূপ তিনি বুঝেছেন, সেটি সম্প্রতি মাধবাচার্যের বাক্যজালের হাত এড়ানো।

স্নান করতে করতে একদিন তাঁর মনে হ'ল তাঁর পিঠে যেন কিসের লেজ ঠেকছে। তিনি তাড়াতাড়ি পিছনে ফিরে জলের মধ্যে হাত দিয়ে দেখলেন, লেজ নয়, একটা জলজ গাছের পাতা গায়ে ঠেকছে। গাছটাকে তিনি টান দিয়ে উপরে তুলে ফেললেন, দেখলেন একটা শেওলা-গাছ,—এ শেওলা নদীতে তিনি পূর্বে দেখেছেন, তেমন লক্ষ্য করেননি ভাল ক'রে, চোখ পড়তে দেখলেন যে, শেওলার ডাঁটার যে অংশটা তাঁর গায়ে সুড়সুড় ক'রে ঠেকেছিল, সেটা জলের নীচেকার অংশ, সে অংশের পাতাগুলি ঝাউপাতার মতন —কিন্তু জলের উপরের অংশের পাতাগুলি পানের মতন। জলের উপরের অংশের পাতা জলের উপরে ভাসে, নীচের অংশের পাতা ও রকম হলে স্রোতের তোড়ে ভেঙে যেত, কিন্তু চুলের গোছার মতন হওয়ায় তারা জলকে বাধা দেয় না, জল তাদের মধ্যে দিয়ে বেশ কেটে চ'লে যায়, যখন যেদিকে স্রোতের গতি পাতাগুলি তখন সেদিকে হেলে পড়ে। লোকনাথ অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে স্নান ক'রে ফিরলেন। একটা কি জিনিস যেন তিনি ধরেছেন।

তাঁর মনে হ'ল একই ডাঁটার উপরে নীচে দু'রকম পাতা হওয়ার মূলে প্রকৃতির মধ্যে একটা চৈতন্যসত্তা বেশ যেন ধরা পড়েছে—নইলে এই নগণ্য জলজ শেওলার পত্রবিন্যাসের মধ্যে এ নিপুণতা কোথা থেকে এল? পাছে ভেঙে যায়, এজন্যে কে এর জলের নীচের অংশের পাতা ঝাউপাতার মতন ক'রে গড়লে?

লোকনাথের আর একটা কথা মনে হ'ল। কয়েকদিন পূর্বে তিনি অত্যন্ত অধীর-ভাবে জাগতিক শক্তির কাছে তার চৈতন্যসত্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা প্রমাণ চেয়েছিলেন. তাঁর সেই প্রার্থনা কি এইভাবে কেউ পূর্ণ করলে?

ন্যায়যুক্তির দিক্ থেকে এ সিদ্ধান্ত এত বিপজ্জনক তাঁর মনে হ'ল যে তিনি এ কথা জোর ক'রে মন থেকে দূর ক'রে দিলেন। সাধারণ মানুষের মতন এত শীঘ্র তিনি কোন সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে পারেন না। তবু তিনি ভেতরে ভেতরে দিন দিন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে উঠতে লাগলেন। সেই জলজ শেওলার শুক্নো ডাঁটা-পাতা কুটীরের সামনে প্রায়ই পড়ে থাকতে দেখা যেত। পুঁথিপত্র তিনি আজকাল কমই খোলেন। নদীর ধারে ধারে যেখানে বন্যগাছের শ্যামপত্রসম্ভার স্রোতের জলে ঝুপসি হয়ে প'ড়ে থাকত. দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাসের ফুল স্তূপে স্তূপে ফুটে জলের ধার আলো ক'রে থাকত. পত্রনিবিড় ঝোপগুলির তলায় জলচর পক্ষীরা ডিমগুলি গোপনে শুকনো পাতা চাপা দিয়ে রাখত. লোকনাথ বেশির ভাগ সময় সেই সব স্থানে কি দেখে দেখে ফিরতে আরম্ভ করলেন। তাঁর কুটীরের সামনের মাঠে এক রকম ছোট ঘাসের কুচো কুচো সাদা ফুল রাশি রাশি ফুটত, লোকনাথকে দেখা যেত সেই ফুল তুলে তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে তাদের গঠন লক্ষ্য করছেন—ঘাসের ফুল সম্বন্ধে লোকনাথের মনে হ'ত যে সব ফুলগুলি একই গঠনের—পাঁচটি করে পাপ্ড়ি মধ্যে একটা বিন্দু। প্রকাণ্ড মাঠে এ রকম ফুল দু'হাজার, দশহাজার, দু'লক্ষ, দশলক্ষ ফুটে থাকত, লোকনাথ, যদৃচ্ছাক্রমে এখান থেকে ফুল তুলে দেখতেন, সবগুলির সেই একই গড়ন, সেই পাঁচটা ক'রে পাপ্ড়ির মধ্যে একটা বিন্দু।

লোকনাথের পিপাসা বিকারের রোগীর মত বেড়ে উঠল। কত কি প্রশ্ন তাঁর মনে আসে—অসাধারণ ভয়ানক বিভীষণ সব প্রশ্নদৈত্য। লোকনাথ বলতেন—জানাও হে

চৈতন্যময় কারণ-শক্তি, আমায় আরও জানাও। দিনকতক পরে সত্যই তাঁর অসহ্য যাতনা হ'তে লাগল। একটা বিশাল ঘনান্ধকার গুপ্ত রহস্যজগৎ দ্বারপার্শ্বে সংকীর্ণ ছিদ্রপথ দিয়ে ক্ষীণ একটুখানি আলোকরেখা যেন তাঁর চোখে ফেলেছিল, তাঁর বুভুক্ষু মন সমস্তটা একসঙ্গে দেখবার জন্যে ছট্‌ফট করতে লাগল ;—রাত্রে তাঁর নিদ্রা হ'ত না—কালো আকাশে চোখ তুলে বলতেন—চোখ খুলে দাও, হে মহাশক্তি চোখ খুলে দাও।

ইতিমধ্যে আবার একদিন তিনি দেখলেন—একটা কি পতঙ্গ আর একটা ছোট পতঙ্গ-কে শরীর-নিঃসৃত রসে অল্পে অল্পে অচেতন ক'রে ফেলেছে, বড় পতঙ্গটা হাতে তুলে নিয়ে লক্ষ্য ক'রে দেখে তাঁর মনে হ'ল সেটায় শুঁড়ের মত ছুঁচলো একটা প্রত্যঙ্গের খানিকটা অংশ ফাঁপা,—একপ্রকার বিষাক্ত রস শরীরের মধ্যে থেকে বার হয়ে ফাঁপা অংশ দিয়ে বেরিয়ে আসবার বেশ সুন্দর, সুনির্দিষ্ট বন্দোবস্ত আছে।......

লোকনাথের মন একমুহূর্তে আবার অন্ধকার হয়ে গেল। নিষ্ঠুর ধ্বংসের এ কি কৌশলময় আয়োজন! মূর্খ ভক্তিশাস্ত্রকার, এই বুঝি তোমার দয়ালু ঈশ্বর?

বসন্তের বাকী দিনগুলো এবং সারা গ্রীষ্মকালটা এই ভাবেই কেটে গেল। অবশেষে একদিন কৌতূহলপ্রদ এক ঘটনায় লোকনাথের দুঃখ, ব্যাকুলতা ও সন্দেহের এক অপ্রত্যাশিত রকমের উপসংহার ঘটল। সে সময়টা আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহ। বহুদিন বৃষ্টি হয়নি, অসহ্য রৌদ্রতাপে মাঠের ঘাসগুলো জ্ব'লে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে, বাতাস আগুনের ঝলকের মত তপ্ত। বৈকালের দিকে কিন্তু খুব জোরে বাতাস বইতে লাগল, এবং একটু পরে ঈশান কোণে খুব মেঘ জমল। নদীর বড় বাঁকটায় বড় বড় ঘাসের মধ্যে শুয়ে লোকনাথ পূর্ব দিক্‌চক্রবালে নবীন বর্ষার মেঘস্তূপের সজ্জা একমনে লক্ষ্য করছিলেন, হঠাৎ তাঁর ডান হাতে মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলির মাঝখানে কিসে যেন কামড়ালে। সেদিকে চোখ ফিরিয়ে হাত টেনে নিতেই দেখতে পেলেন একটা শঙ্খচূড় সাপ ফণা তুলে হাতের সেখানে মুহূর্তে আর একটা ছোবল মারবার উপক্রম করতে গিয়ে হঠাৎ মাথা নীচু ক'রে লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে বিদ্যুৎবেগে অদৃশ্য হল। কি করছি, না ভেবেই লোকনাথ সাপটার অদৃশ্যমান পুচ্ছটা তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে চেপে ধরতে গিয়ে একগোছা ঘাস মুঠার মধ্যে চেপে ধরলেন, সাপটা ততক্ষণে অদৃশ্য হয়েছে।

লোকনাথ তাড়াতাড়ি পরিধেয় বসন ছিঁড়ে হাতের কব্জিতে ও বাহুতে বাম হাতে পাকিয়ে পাকিয়ে দু'টো বাঁধন দিলেন, বাঁধন তেমন শক্ত হ'ল না, অনেকটা আল্‌গা রয়ে গেল। তাঁর মনে হল শ্বেত আকন্দের মূল সর্পাঘাতের মহৌষধ......মাঠের ইতস্তত শ্বেত আকন্দের সন্ধানে গেলেন, সে গাছ চোখে পড়ল না......হাতটা যেন অবশ হয়ে আসছে বলে তাঁর মনে হ'ল। বিষ তবে নিশ্চয়ই উপরে উঠছে......লোকনাথ সম্ভব অসম্ভব সমস্ত স্থান খুঁজতে লাগলেন, আরও দু'একটা সর্পাঘাতের ঔষধ মনে আনবার চেষ্টা করলেন,—কুসুম ফুলের বীজ, রক্তচন্দনের ছাল ইত্যাদি কোনটাই হাতের কাছে নেই। এদিক্‌ ওদিক্‌ খানিকক্ষণ খুঁজতে খুঁজতে লোকনাথের মনে হ'ল তিনি আর দাঁড়াতে পারছেন না, চোখে অন্ধকার দেখে একটা ঝোপের কোলে তিনি ব'সে পড়লেন—অসহ্য-দংশনবিষে তাঁর সর্বাঙ্গ তখন ঝিম্‌ ঝিম্‌ করছে।......

ধীরে ধীরে তাঁর মনের নিভৃততম অংশ কিসের আলোকে যেন আলোকিত হয়ে উঠতে লাগল......আসন্ন মরণের বজ্রকঠোর নির্মল করাল রৌদ্র সুর, দূরশ্রুত মুক্ত-স্রোত গিরিনির্ঝরের তালে যেন তাঁর কানে মুক্তির গান বাজাচ্ছে......তোমার পাষাণ-কারা এবার ভাঙ্‌ব—তোমার চোখের বাঁধন খুলব......

হে অনন্ত দেব, মহাব্যোমের অনন্ত শূন্যতার পারে কোন্‌ সুদূরতম, অপ্রকম্প রাজ্যের জ্যোতিঃসিংহাসন থেকে তুমি তোমার এই ব্যাকুল দীনতম প্রজার উপর লক্ষ্য

রেখেছ? তাই বুঝি সেদিন জলের মধ্যে আমায় পথ দেখিয়েছিলে? সেদিন তোমায়ও চিনিনি, তোমার পথও চিনিনি—আজ বোধ হয় বুঝেছি—হৃদয়ের অন্তরে সেই তুমি আমার আত্মা, পৃথিবীর অপেক্ষা মহান্, অন্তরীক্ষের অপেক্ষা মহান্, স্বর্গের অপেক্ষা মহান্, সর্বভূতের অপেক্ষা মহান্……মেঘ যেমন ওষধিগণের উপজীব্য তুমি তেমনি আমার প্রাণধারার উপজীব্য। তুমি আমার প্রাণের কথা শুনতে পাও? বেশ, তা হ'লে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চ'লো, দেব, এই অন্ধ রাজ্যের পারে, এই দিগন্তসীমার পারে, জীবন-মহাসমুদ্রের পারে।……কোথায় তোমার চিরবিকশিত জ্যোতিঃপ্রভাত, কোথায় দৈন্য-মুক্ত জ্ঞানসম্পদের অপরাজিত আয়তন দেখব……

হঠাৎ লোকনাথের মরণাভিভূত দার্শনিক বুদ্ধি মাথা তুলে ব'লে উঠল, তোমার বিচারশক্তি চ'লে যাচ্ছে,—বিষের যাতনায় যখন তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয় অবশ হয়ে আসছে, তখন তোমার যে বিচার, সে কি বিচার? মনের এই তরল ভাব দুর্বলতার পরিচায়ক. মন থেকে দূর ক'রে দাও……

লোকনাথ কিছুই ঠিক করলেন না, তাঁর মন আর যুদ্ধ করতে পেরে উঠছিল না ……আফিমের নেশার মত মরণের তন্দ্রা তাঁর ক্রমেই গাঢ় হয়ে এল……

কোথায় কোন্ দুটি বালক-বালিকা এক ক্ষুদ্র গ্রামের গ্রামসীমায় বুনো খেজুরের ঝোপে ঝোপে তলায়-পড়া খেজুর কুড়িয়ে খেয়ে বেড়াচ্ছে……সময়ের দীর্ঘ পাষাণ-অলিন্দের দূরতম সীমায় তাদের ছোট্ট ছোট্ট পাগুলির অস্পষ্ট শব্দ ক্রমেই অস্পষ্টতর হয়ে আসছে—ওধারে তারা দুটিতে ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে……

এক গ্রাম্য বনের মৌ-গাছের ডাল থেকে দু'জনে মৌ ফুল পেড়ে খাচ্ছে. বালিকাটি ভাল রসাল ফুল পেলেই বালকের হাতে তুলে দিচ্ছে—এই যে এটি, কি মিষ্টি দেখ. দেখ তুমি খেয়ে……

নীলব্যোমপথে দীর্ঘদেহ, শ্বেতশ্মশ্রু সমিধ্ বাহী, জ্যোতির্ময় ঋষিরা চলেছেন—তাঁদের মধ্যে কে যেন পিছন ফিরে সঙ্গীদের নিকট প্রস্তাব করেছেন—ওহে সঙ্গীগণ আমাদের কমণ্ডলু যা দিয়ে পূর্ণ করেছি, এস তা ফেলে দিয়ে পুনর্বার নূতন জল সংগ্রহ করি……এতদিন ভ্রমণের পর মিষ্ট জলের উৎসের সন্ধান পেয়েছি……তাঁদের কমণ্ডলু থেকে কালি গোলার মতো কি ঝরে পড়ছে!

পথের বাঁকে একদিনের মেঘভরা বৈকালে মেয়েটিকে কে খুব মেরেছে. তার এলো-মেলো চুলগুলি মুখের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—কাপড় কে টেনে ছিঁড়ে দিয়েছে—সে কেঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলছে—কেন তুমি মারবে? কেন আমায় মারবে তুমি?…… এ পাড়ায় আসি বলে?……আর কক্খনো আসব না…… দেখে নিও, আর কক্খনো যদি আসি……

লোকনাথের মরণাহত দৃষ্টি বিরাট বিশ্বের উপর সেই ভাবেই মুগ্ধ আবদ্ধ রইল. বহু বৎসর পূর্বের শৈশবকালে গ্রামসীমার মাঠে তাঁর অজ্ঞান শিশুনয়ন দুটি যে ভাবে আবদ্ধ রইত……প্রায়ান্ধকার জগৎটা আবার একটা বিরাট প্রশ্নের রূপ পরিগ্রহ ক'রে তাঁর মুখের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে রইল……প্রশ্নের কোন উত্তর তাঁর কাছে পাওয়া গেল না……

প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩১

নব-বৃন্দাবন

কর্ণপুর সংসার ছাড়িয়া বৃন্দাবন যাইতেছিলেন।

সংসারে তাঁহার কেহই ছিল না। স্ত্রী পাঁচ-ছয় বছর মারা গিয়াছে, একটি দশ বৎসরের পুত্র ছিল, সেও গত শরৎকালে শারদীয়া পূজার অষ্টমীর দিনে হঠাৎ বিসূচিকা রোগে দেহত্যাগ করিয়াছে। সংসারের অন্য বন্ধন কিছুই নাই। বিষয়-সম্পত্তি যাহা ছিল, সে-গুলি সব জ্ঞাতি-ভ্রাতাদের দিয়া অত্যন্ত পুরাতন তালপত্রে কয়েকখানি ভক্তিগ্রন্থ···জীর্ণ তসরের পুঁটুলিতে বাঁধিয়া লইয়া কর্ণপুর পদব্রজে বৃন্দাবন যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কর্ণপুরের জন্মপল্লী অজয় নদের ধারে। তিনি পরম বৈষ্ণবের সন্তান। অজয়ের জলের গৈরিক দুই তীরের বন-তুলসী মঞ্জরীর ঘ্রাণে কোন্ শৈশবেই তাঁর বৈষ্ণব ধর্মে মানসিক দীক্ষা হয়। তিনি গ্রামের টোলে উত্তমরূপে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। দুই-একটি ছাত্রকে কিছুকাল স্মৃতি ও বৈদ্যকশাস্ত্রও পড়াইয়াছিলেন। ছাত্রেরা দেখিত তাহাদের অধ্যাপক মাঝে মাঝে ঘরে দুয়ার বন্ধ করিয়া সমস্ত দিন কাঁদেন। পাগল বলিয়া অখ্যাতি রটাইতে ছাত্রেরা ছাড়িয়া গেল, প্রতিবেশীরা তাচ্ছিল্য করিতে শুরু করিল, তাহার উপর প্রথমে স্ত্রী, তৎপরে পুত্রের মৃত্যু। সংসারের উপর কর্ণপুর নিতান্তই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

যাইবার সময় জ্ঞাতি-ভ্রাতা রসরাজ আসিয়া মায়াকান্না কাঁদিল, গ্রামের এক ব্রাহ্মণ বহুদিন ধরিয়া কর্ণপুরের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহার পর হইতেই সে তাঁহাকে বাজিজ্ঞানে শত হস্ত দূরে রাখিয়া চলিয়া আসিতেছিল। আজ যখন সে দেখিল কর্ণপুর সত্য সত্যই বাহির হইয়া যাইতেছেন, ফিরিবার কোন আশংকাই নাই, তখন সে আসিয়া মহা পীড়াপীড়ি শুরু করিল—আর কয়েকটা মাস থাকুন, যে করিয়া পারি ঋণটা শোধ করিয়া ফেলি, কারণ ঋণ পাপ ইত্যাদি!······উদারচিত কর্ণপুর এসব কপট প্রবন্ধ বুঝিলেন না। তিনি রসরাজকে তাঁহার প্রার্থনা মত তাল-দীঘির পাড়ের আশুধান্যের এক-টুকরা উৎকৃষ্ট ভূমি দানপত্র করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ অধমর্ণকে বলিলেন—এক কড়া কড়ি আন ভায়া, গ্রহণ করিয়া তোমায় ঋণমুক্ত করি।

আপনার বলিতে কেহ না থাকায় গ্রাম ছাড়িয়া যাইবার সময় তাঁহার জন্য সত্যকার ভাবনা কেহই ভাবিল না। শৈশব-স্মৃতির প্রথম দিনটি হইতে পরিচিত মাটির চণ্ডী-মণ্ডপ, স্বহস্তরোপিত কত ফল-ফুলের গাছ, কত খেলাধূলার জন্মভিটার আঙিনা পিছনে ফেলিয়া চলিলেন, ফিরিয়াও চাহিলেন না, শুধু গ্রামসীমার অজয়ের ধারে গিয়া কর্ণপুর একটুখানি দাঁড়াইলেন।······অজয়ের ধারে প্রাচীন শিরীষ গাছের তলে গ্রামের শ্মশান, কয়েকমাস পূর্বে তিনি মাতৃহীন বালক পুত্রটিকে এইখানে দাহ করিয়া গিয়াছেন। অজয় আর বাড়ে নাই, সুতরাং সে চিতার চিহ্ন এখনও একেবারে বিলীন হয় নাই। তার কচিমুখের অবোধ হাসিটুকু মনে পড়িয়া গেল, মৃত্যুর পূর্বে শ্বাসকষ্টে বড় যন্ত্রণা পাইয়া-ছিল, সে সময়কার তার আতঙ্কে আকুল অসহায় দৃষ্টি মনে পড়িল। কর্ণপুর অবাক হইয়া অজয়ের ওপারে দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন।······ধূ ধূ গৈরিক বালুরাশির শয্যায় জীর্ণ-শীর্ণ নদ অবসন্ন দেহ প্রসারিত করিয়া দিয়াছে, উপরে এখানে-ওখানে এক-আধটা দিকহারা মেঘশিশু আকাশের কোন কোণ হইতে বাহির হইয়া তখনই আবার সুদূর অনন্তের পথে কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে, কোথাও কোন চিহ্ন রাখিয়া যাইতেছে না। খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। পৃষ্ঠে পুঁটুলিতে কয়েকখানি বস্ত্র, সামান্য কিছু তণ্ডুল ও অন্যান্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, দক্ষিণ হস্তে মাধবীলতার আঁকাবাঁকা একগাছি দৃঢ় যষ্টি, বাম হস্তে

একটি পিতলের ঘটি মাত্র লইয়া অজয় পার হইয়া কর্ণপূর পশ্চিম মুখে যাত্রা করিলেন। .....জীবনে যাহা কিছু প্রিয়, যাহা কিছু পরিচিত ছিল—সবই এপারে রহিয়া গেল।

দিনের পর দিন তিনি অবিশ্রান্ত পথ চলিতে লাগিলেন। এক-একদিন সন্ধ্যার সময় কোন গ্রামের চটিতে, নয়তো কোন গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপে আশ্রয় লইতেন। গ্রামপথে চলিবার সময় লোকে আদর করিয়া গৃহত্যাগী সৌমদর্শন ব্রাহ্মণের পুঁটুলি ভরিয়া খাদ্য-দ্রব্য দিত, পিতলের ঘটিটা পূর্ণ করিয়া নির্জলা খাঁটি দুগ্ধ দিত ; তিনি কোন দিন তাহার সামান্য অংশ খাইতেন, কোন দিন কোন দরিদ্র পথযাত্রী ভিক্ষুক বা কোন বুভুক্ষু কুকুরকে খাওয়াইতেন। কত গ্রাম, হাট, মাঠ, কত সমৃদ্ধশালী বাণিজ্যের গঞ্জ, কত নদী উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে যাইতে অবশেষে তিনি বসতি-বিরল খুব বড় বড় নির্জন মাঠ ও বনজঙ্গলের পথে আসিয়া পড়িলেন। চিরকাল নিতান্ত ঘরোয়া-ধরনের গৃহস্থ, বিদেশে কখনই বাহির হন নাই ; সূর্য ডুবিয়া যাওয়ার পরই দিগন্ত-বিস্তৃত জনহীন প্রান্তরে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিত ; কর্ণপূর একস্থানে দাঁড়াইয়া চারিদিকে লোকালয়ের অন্বেষণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন—লোকালয় মিলিত না, তাঁহার মনে অত্যন্ত ভয় হইত যদি কোন বনজন্তু বা কোন দস্যু আসিয়া আক্রমণ করে।......পরক্ষণে ভাবিতেন, আমি তো সন্ন্যাসী মানুষ, দস্যুতে আমার কি কাড়িয়া লইবে? অজয়ের ধারের বৃদ্ধ শিরীষ বৃক্ষতলে এক ধূসর হেমন্ত-সন্ধ্যার কথা মনে পড়িলেই অমনি কর্ণপূরের মন হইতে বন্যজন্তুর ভয় দূর হইত। বনের পথে চলিতে চলিতে অন্য খাদ্য মিলিত না, কোন দিন বুনো কুল, মহুয়া ফুল, কোন দিন বা ছোট তালচারার নবোদ্গত পত্রকোরক খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেন ; অঞ্জলি পূরিয়া পার্বত্য নদীর জলধারা পান করিতেন। মাঝে মাঝে আবার গ্রামও পাইতেন।

সন্ধ্যার সময় সেদিন তিনি একটি তালবনে আশ্রয় লইলেন। নিকটে লোকালয় নাই, পাথুরে মাটিতে অভ্রকণিকা চিক্ চিক্ করিতেছে, একটু পরে তালবনের পিছনে সূর্য ডুবিয়া গেল।......সন্ধ্যার আকাশে পঞ্চমীর এক ফালি চাঁদ।

সেদিন পথে এক ভিক্ষুকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হইয়াছিল, তিন-চার মাস পূর্বে জীবিকার চেষ্টায় বাড়ীর বাহির হইয়া কিছু উপার্জন করিয়া সেদিন সে বাড়ী ফিরিতেছে। বাড়ীতে তার ছোট ছোট দুটি মেয়ে ও একটি ছেলে আছে, তাদের মুখের দিকে চাহিয়া সে প্রবাসের কোন কণ্টকেই কষ্ট বলিয়া মনে করে নাই। ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলির মধ্যে রাঙা রাঙা পাথরের নুড়ি, নূতন ধরনের পাখীর রঙিন পালক, নানা তুচ্ছ জিনিস সযত্নে বাঁধিয়া লইয়া চলিয়াছে—বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের খেলনা করিতে।......কর্ণপূরের মনে হইয়াছিল সেদিন—দূর, মূর্খ সংসারাসক্ত জীব!......আজ কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁহার মনে জাগিল ঐ ভিক্ষুকটা তাঁহার চেয়ে সুখী। সে তো তবুও কতদিন পরে গৃহে ফিরিয়া চলিয়াছে, কিন্তু তাঁহার গৃহ কোথায়?......পরক্ষণেই দুর্বলতাটুকু বুঝিয়া ফেলিয়া অপ্রতিভ হইয়া ভাবিলেন, ভগবান দয়া করিয়াই সংসারের ভার তাঁহার স্কন্ধ হইতে নামাইয়া লইয়াছেন। ভালই তো, ইহাতে মন খারাপ করিবার কি আছে?

তাহার পর বসিয়া বসিয়া তিনি তাঁহার প্রিয় একটি শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তালবনের মাথার পঞ্চমীর চাঁদের দিকে চাহিয়া বার বার গাঢ়স্বরে শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে করিতে তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিতেছিল। রাত্রির পাতলা জ্যোৎস্নায়, মাঠের নির্জনতায়, শ্লোকের পদ-লালিত্যে তাঁহার মনে কি একটা অব্যক্ত ব্যথা যেন ক্রমেই মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল। সেটাকে চাপা দিবার জন্য তিনি বসিয়া ইষ্টদেবতার চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইষ্টদেবের মূর্তি কল্পনা করিতে গিয়া কর্ণপূরের মনে হইল, ঐ অনন্ত আকাশের মত উদার-প্রাণ ঐ জ্যোৎস্নার মত অনাবিল, চারিধারের প্রান্তর-বনের মত শান্ত

তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ। এই শ্লোকের ললিত শব্দের মত তাঁর বাণী মধুর, শ্যামায়মান বনভূমির মতই তাঁর স্নিগ্ধ কান্তি......কিন্তু তাঁহার মুখটি কল্পনা করিতে গিয়া কেমন করিয়া কর্ণপুর বার বার তাঁহার মৃতপুত্রের মুখটিই ভাবিতে লাগিলেন। তাহাকে দাহ করিবার সময় হইতে কর্ণপুর সে মুখটি কখনই ভোলেন নাই, মনে কেমন আঁটিয়া ছিল। সেই মুখ ছাড়া অন্য কোন মুখ তাঁহার ভাল লাগে না। নিজের কাছে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার না করিতে চাহিলেও কর্ণপুরের মনের গোপন কোণে একথা জাগিতেছিল, ইষ্টদেব যদি তাঁর পুত্রের রূপ ধরিয়া দেখা দেন, তবে না সুখ! যদি কখনও দেখা পান, তবে যেন পুত্রের সেই রূপেই পান।

শেষ রাতের স্বপ্নে কর্ণপুর দেখিলেন, জ্যোৎস্না দিয়া গড়া দেহ তাঁরই ছেলেটি আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়াছে......তাঁর মৃতপুত্রের মুখটি খুব সুশ্রী ছিল, তবুও তাহার মুখের যেখানে যাহা কিছু ছোটখাট খুঁত ছিল, সেই সুন্দর অতি-প্রিয় খুঁতগুলি ঠিক সেই ভাবেই আছে। বাম ভুরুর উপরে শান্তশিষ্টতার জয়-তিলকটি এখনও তো বিলীন হয় নাই, সেই রকম পাগলের হাসি।......আস্তে আস্তে সে তাঁর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপিচুপি ডাক দিল—বাবা!......অনেকদিন-হারা-পুত্রকে ক্ষুধার্ত ব্যগ্র দুই হাতে জড়াইয়া ধরিতে গিয়া কর্ণপুরের ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিলেন সকাল তো হইয়াছেই, তালবনের মাথায় রৌদ্রও উঠিয়া গিয়াছে।

সকালে উঠিয়া তিনি পুনরায় পথ চলিতে শুরু করিলেন। পথে কয়েকখানা গ্রাম পাইলেও তিনি কোথাও বিলম্ব করিলেন না। সারাদিন পথ চলিবার পরে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে দূর হইতে একটি ছোটখাট গ্রাম দেখা গেল। অত্যন্ত ক্লান্ত অবস্থায় সম্মুখে লোকালয় দেখিয়া কর্ণপুরের মনে বড় স্বস্তিবোধ হইল। আশ্রয় স্থান সন্ধানে তিনি গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গ্রামপ্রান্তের প্রথম দুই-চারিখানা বাড়ী ছাড়াইয়া গ্রামের ভিতর অল্প-দূর অগ্রসর হইতে হইতেই গ্রামের দৃশ্য যেন কর্ণপুরের কাছে কেমন কেমন ঠেকিল। কোন গৃহস্থবাড়ীতেই কোন সাড়াশব্দ নাই, কোন বাড়ী হইতেই রন্ধনের ধূম উঠিতেছে না, পথে পথিকের যাতায়াত নাই, জনপ্রাণী কোনদিকে চোখে পড়ে না। অধিকাংশ গৃহস্থবাটির বাহির দরজা খোলা—খোলা দরজা দিয়া চাহিলে বাটির ভিতর একখানা কাপড় পর্যন্ত দেখা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য বোধ হইলেও সারাদিনের পথশ্রমে কর্ণপুর এত ক্লান্ত হইয়াছিলেন যে—অতশত ভাবিবার, বুঝিবার বা ব্যাপার কি অনুসন্ধান করিবার অবস্থা তাঁহার ছিল না। তিনি সম্মুখে এক গৃহস্থ বাটীর বাহিরের ঘরে গিয়া উঠিলেন ও মোট পুঁটুলি নামাইয়া বিশ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।......দণ্ড দুই কাটিয়া গেল, অথচ বাড়ীর ভিতর হইতে কোন মনুষ্য-কণ্ঠধ্বনি তাঁহার কর্ণে আসিল না। সম্মুখের পথ দিয়া এই দুই দণ্ডের মধ্যে মানুষ তো দূরের কথা একটি গৃহপালিত পশুকে পর্যন্ত যাইতে দেখিলেন না। ততক্ষণে তিনি অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন ; ভাবিলেন, এই বাড়ীটার মধ্যেই ঢুকিয়া দেখা যাউক, লোকজনেরা কি করিতেছে।

বাড়ীর মধ্যে পায়ে পায়ে ঢুকিয়া যাহা তাঁহার চোখে পড়িল তাহাতে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, ঘরের মধ্যে তিনটি মৃতদেহ পাশাপাশি পড়িয়া আছে, মৃত্যু অনেক-ক্ষণ পূর্বে ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। পাশের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে গিয়া দেখিলেন, গৃহতলে একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ শয্যার উপর পড়িয়া আছে, মৃতদেহের পাশে একটি অনিন্দ্য-সুন্দর গৌরবর্ণ শিশু খল্‌বল্‌ করিয়া শয্যার পাশে বেড়াইতেছে ও ঘরের আড়া হইতে ঝুলিয়া পড়া একগাছি মাকড়সার জালের অগ্রভাগে দোদুল্যমান একটি মাকড়সার দিকে হাত বাড়াইয়া ধরিতে যাইতেছে এবং আপন মনে হাসিতেছে।

ভাবগতিকে কর্ণপুর অনুমান করিলেন কোন ভীষণ মহামারীর আবির্ভাবে দুই

একদিনের মধ্যে গ্রাম জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। ঘরে ঘরে মৃতদেহ রাশি হইয়া আছে, সৎকারের মানুষ নাই, দেখিবার মানুষ নাই, হয়তো যাহারা বাঁচিয়াছিল তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া প্রাণ লইয়া পলাইয়া গিয়াছে।

কর্ণপূরকে দেখিয়া শিশু একগাল হাসিয়া হাত বাড়াইল। তাহার মা যে খুব বেশীক্ষণ মারা যায় নাই, ইহা দুইটি বিষয়ে তাঁহার অনুমান হইল। প্রথমতঃ, এই ক্ষুদ্র শিশুটি ক্ষুৎপিপাসাক্রান্ত হইয়া পড়িলে এতক্ষণ এরূপ হাসিত না, কিছুক্ষণ পূর্বে তাহার মা জীবিতাবস্থায় তাহাকে স্তন্য পান করাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ মৃতদেহের এতটুকু বিকৃতি হয় নাই, শিশুর মা যেন এইমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আসন্ন মৃত্যু ও ঘনীভূত বিপদের সম্মুখে পড়িয়াও অবোধ শিশুর এই নিশ্চিন্ত হাসি ও ক্রীড়া দেখিয়া কর্ণপূরের মনে হইল, বাল্যকালে অজয়ের তীরের বনে তিনি এক প্রকার পতঙ্গকে লক্ষ্য করিতেন, সূর্যের আলোতে খেলা করিবার অধীর আনন্দে সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে কোথা হইতে রাশি রাশি আসিয়া জুটিত এবং খানিকক্ষণ রৌদ্রে উড়িয়া নাচিয়া খেলা করিবার পর রৌদ্র বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ-নৃত্য শেষ করিয়া মাটি ছাইয়া মরিয়া থাকিত······কর্ণপূরের মন মমতায় গলিয়া গেল, তিনি তাড়াতাড়ি তাহাকে কোলে উঠাইয়া লইলেন। ঘটিতে জল ছিল, বাহিরের ঘরে আসিয়া গণ্ডূষ করিয়া শিশুর মুখে ধরিতে পিপাসার তাড়নায় সে আগ্রহের সহিত উপরি উপরি বহু গণ্ডূষ জল খাইয়া ফেলিল।

তৎপরে তিনি শিশুর মাতার মুখে শুষ্ক তৃণ জ্বালাইয়া অগ্নি প্রদান করিলেন, মস্তকের কাছে কর রাখিয়া বিষ্ণুমন্ত্র জপ করিলেন। এইরূপে সংক্ষিপ্ত সৎকার কার্য শেষ করিয়া তিনি শিশুকে লইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে সে-বাড়ী হইতে বাহির হইলেন।

কর্ণপূর আবার পৈতৃক ভিটাতে ফিরিয়া আসিলেন। শুধু ফিরিয়া আসা নহে, তিনি এখন পুরামাত্রায় সংসারী। জ্ঞাতি রসরাজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-বিবাদ করিয়া বিষয়-সম্পত্তি ও ধান্য-রোপণের ভূমি কাড়িয়া লইয়াছেন, ব্রাহ্মণ অধমর্ণকে দুবেলা তাগাদা করেন। দুপুর-রৌদ্রে উত্তরীয় মাথায় জড়াইয়া নিজের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ধান্য বপনের তদারক করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান। বৃক্ষবাটিকায় স্বহস্তে বহুদিন পরে ফল-ফুলের চারা রোপণ করেন।

কুড়াইয়া পাওয়া সেই শিশুটি এখন তাঁহার চক্ষের পুতলি। তাহাকে একদণ্ড চোখের আড়াল করিতে পারেন না। সমস্ত সকালটি সেই বহির্বাটিতে বসিয়া শিশুকে পথের লোকজন, গরু, শিবিকা-যাত্রী নববিবাহিত দম্পতি—এই সব দেখাইয়া তাহাকে আমোদ দেন। লোকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলে, কর্ণপূরের কাণ্ড দেখ, তীর্থের পথ হইতে এক বন্ধন জুটাইয়া আনিয়াছে। হৃত সম্পত্তি রসরাজ পাড়ায় পাড়ায় বলিয়া বেড়ায়, মর্কট-বৈরাগ্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে চৈতন্য মহাপ্রভু যে উক্তি করিয়াছেন তাহা কি আর মিথ্যা হইবার? হাতের কাছে দেখিয়া লও প্রমাণ! শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুলোকে কর্ণপূরের পুনরাগমনে আনন্দ প্রকাশ করেন।

কর্ণপূর এসব কথা শুনিয়াও শোনেন না। শিশু আজকাল ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা বলিতে শিখিয়াছে—তাহার মুখে আধ আধ বুলি শুনিয়া তিনি দ্বাদশ বৎসর পূর্বের অন্তর্হিত আনন্দ আবার ফিরিয়া পান। তারও আগের কথা মনে হয়, যখন তাঁহার নববিবাহিতা পত্নী প্রথম ঘর করিতে আসিয়াছিল। পিতামাতা বর্তমানে প্রথম যৌবনের সেই সুখের দিনগুলো কত প্রভাতের বিহঙ্গকাকলীর সঙ্গে, কত পরিশ্রম-ক্লান্ত মধ্যাহ্নে প্রিয়ার হাতের অন্ন-ব্যঞ্জনের সুঘ্রাণের সঙ্গে, অবসন্ন গ্রীষ্মদিনের শেষে উঠানের পুষ্পভারনত বাতাবী লেবু গাছটির সঙ্গে পুরাতন দিনের কত হাসি আনন্দের স্মৃতি জড়ানো আছে। তার পরে তাঁহার পুত্রের জন্মোৎসব, স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া কোলের শিশুকে কেন্দ্র করিয়া কত সুখ-স্বর্গ গড়িয়া তোলা! আবার মনে হয়, জীবনটাকে বিশ

বছর পিছু হঠাইয়া দিয়া কে যেন পূর্ব অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি করাইতেছে।

শিশুকে সামলাইয়া রাখা দায়। অনবরত হামাগুড়ি দিয়া দাওয়ার ধারে আসিতেছে—হঠাৎ একবার অত্যন্ত ধারে আসিয়া হাত পিছলাইয়া মুখ থুবড়াইয়া নীচে পড়িয়া যাইতে বসিয়াছিল—তাড়াতাড়ি আসিয়া কর্ণপুর ধরিয়া ফেলিলেন। কি একটা বিপদ ঘটিবার অজানা ভয়ে পতনোন্মুখ শিশুর অবোধ চক্ষুদুটি ডাগর হইয়া উঠিয়াছে।...... এ নিজের ভালও বুঝে না, এই ভাবনায় তাঁহার মন এই ক্ষুদ্র পাগলের দিকে অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়।

বন্ধন এইরূপ করিয়াই জড়ায়। ক্রমে ক্রমে কয়েক বৎসর হইয়া গেল, শিশু এক্ষণে সাত-আট বৎসরের বালক। তাহার দুষ্টামির জ্বালায় কর্ণপুর দিনেরাত্রে একদণ্ড শান্তি পান না। এখানকার দ্রব্য ওখানে লইয়া গিয়া ফেলে, কখন কি করিয়া বসে। নিষিদ্ধ কার্য করিতেই তাহার আগ্রহ সর্বাপেক্ষা বেশী।

বর্ষার দিনে কর্ণপুর তাহাকে ঘরের মধ্যে বসাইয়া পড়ান। পড়িতে পড়িতে সে ছুটি লইয়া অল্পক্ষণের জন্য বাহিরে যায়। অনেকক্ষণ আসে না দেখিয়া কর্ণপুর দাওয়ায় আসিয়া দেখেন—বালক অবিশ্রান্ত বর্ষণের মধ্যে উঠানের এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্তে মহা খুশির সহিত নাচিয়া বেড়াইতেছে। কর্ণপুর তিরস্কারের সুরে বলেন—ছি বাবা নীলু, দুষ্টুমি ক'রো না। উঠে এসো।......আদর করিয়া বালকের নাম রাখিয়াছেন নীলমণি।

বালক বর্ষণ-ধৌত সুন্দর মুখখানি উঁচু করিয়া হাসিমুখে দাওয়ায় উঠিয়া আসে। শাসন করিতে কর্ণপুরের মন সরে না, মনে ভাবেন—কোথায় ছিল এর পাত্তা? সে সন্ধ্যা-বেলা যদি উঠিয়ে না আনতাম, মুখে জলের গণ্ডূষ না দিতাম—তবে?......মমতায় তাঁহার মন আর্দ্র হইয়া পড়ে। মুখে তিরস্কার করিতে করিতে বালকের সিক্তকেশ মুছাইয়া শুষ্কবস্ত্র পরাইয়া পুনরায় পড়াইতে বসেন।

আবার অন্যমনস্ক হইলে কোন্ ফাঁকে সে বাহির হয়। কর্ণপুর পুঁথি হইতে মুখ তুলিয়া বাহিরে গিয়া দেখেন সে দুই হাত জোড় করিয়া উঁচু করিয়া খড়ের চাল হইতে পতনোন্মুখ এক বিন্দু জল ধরিবার জন্য ঠায় দাঁড়াইয়া আছে। হাত ধরিয়া আবার তাহাকে ঘরের মধ্যে টানিয়া আনেন।

বালক উত্তমরূপে বুঝে, বাবা তাহাকে কখনো মারিবেন না।

নিজ পুত্রের শোক কর্ণপুর ইহাকে পাইয়া ভুলিয়াছেন। কেবল এক এক দিন নির্জন দ্বিপ্রহরে তাহার মুখের হাসি দূরাগত করুণ সংগীতের মত মনে আসে। মনের ইতিহাসে এই বালকের সে অগ্রজ, রৌদ্রভরা দ্বিপ্রহরে সে-ই আসিয়া তাহার দাবী জানায়। কর্ণপুর উঠিয়া গিয়া নিদ্রিত বালকের চুলগুলির মধ্যে আঙ্গুল চালাইয়া দেন। মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন।

শীঘ্রই কিন্তু বালককে লইয়া তাঁহার বড় বিপদ হইল। এত বেশী এবং এত বিনা-কারণে সে মিথ্যা কথা বলে যে কর্ণপুর রীতিমত বিপন্নবোধ করিতে লাগিলেন। নানা রকমে মিথ্যাকথনের দোষ ও সত্যভাষণের পুরস্কার সম্বন্ধে বহু গল্প উপদেশ বলিয়াও তাহাকে সংশোধন করিতে পারিলেন না। তাঁহার কাছে সে অনেক কথা আজকাল লুকায়—আগে তাহা করিত না। কর্ণপুর ইহাতে মনে মনে কষ্ট পান। তাহা ছাড়া তাহার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ প্রতিবেশীদের নিকট হইতে আসে। এ-গাছের লেবু, ও-গাছের আম ছিঁড়িয়া আনিয়াছে, অমুকের ছেলেকে মারিয়াছে। কর্ণপুর বসিয়া বসিয়া ভাবেন, কোন্ বংশের ছেলে, কি কুলগত স্বভাবচরিত্র লইয়া জন্মিয়াছে কে জানে! তাঁহার আপন ছেলের বেলায় এগারো বৎসরেও কোন অভিযোগ তাঁহাকে শুনিতে হয় নাই—কিন্তু এ ।

বালক তাঁহাকে এ কি মুস্কিলে ফেলিল?……ধর্মভীরু সরল-স্বভাব কর্ণপুর বালকের এসব ব্যাপারে মনে মনে বড় ব্যথিত হন। তাহার ভবিষ্যৎ কি হইবে ভাবিয়া সময় সময় ভীত হইয়া পড়েন। বালকস্বভাব-সুলভ চপলতা বলিয়া উড়াইয়া দিতে গিয়াও মনে মনে অস্বস্তি বোধ করেন; ভাবেন—উঠন্ত মূল পত্তনেই চেনা যায়—কোন্ বংশের ছেলে ঘরে আসিল! কি জানি গতিক কি দাঁড়াইবে?

অন্য সময় বসিয়া বসিয়া ভাবেন, তাঁহার অবর্তমানে বালকের ভরণপোষণের কি হইবে? যদি মানুষ করিয়া দিয়াও মারা যান, তাহা হইলেও একটা এমন ব্যবস্থা করিয়া যাইতে চাহেন যাহাতে তাহার ভবিষ্যতে সাংসারিক কষ্ট না ঘটে। কোন্ জমির কি ব্যবস্থা করিবেন, কুসীদ ব্যবসায় করিলে কিরূপ উপার্জন হইতে পারে ইত্যাদি চিন্তায় কর্ণপুর ব্যস্ত থাকেন।

এক এক সময় হঠাৎ যেন আত্ম-বিস্মৃতি ঘটিয়া যায়। বিষয় চিন্তা!

মনে মনে ভাবেন এ সব কি আসিয়া জুটিল? সারাদিন একদণ্ড ইষ্টচিন্তা করিতে পাই না, প্রৌঢ় বয়সে এ দুর্দৈব মন্দ নয়!

প্রতিবেশী রঘুনাথ ভট্টাচার্য অভিযোগ করিলেন, কর্ণপুরের পালিতপুত্র তাঁহার বাড়ীর ময়না পাখীর খাঁচা খুলিয়া পাখী উড়াইয়া দিয়াছে। বালক বাড়ী আসিলে কর্ণপুর জিজ্ঞাসা করিলেন—নীলু, শুনছি তুমি নাকি ওদের পাখী উড়িয়ে দিয়ে এসেছ?

বালক বলিল—না বাবা—আমি না……

একে অপরাধ লঘু নহে, তাহার উপর তাঁহার মনে হইল এ মিথ্যা কথা বলিতেছে। কর্ণপুরের ধৈর্যচ্যুতি হইল। তাহাকে খুব প্রহার করিলেন।

তাহার বাবা তাহাকে মারিবেন বালক ইহা ভাবে নাই—কারণ বাবার হাতে কখনো সে মার খায় নাই। তাহার চোখের সে বিস্ময় ও ভয়ের দৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া কর্ণপুর তাহাকে হাত ধরিয়া দরজার কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন—যাও, বাড়ী থেকে বেরোও—দূর হও—মিথ্যা কথা যে বলে তার স্থান নেই আমার বাড়ী……

বালকের ভরসা-হারা দৃষ্টি তাঁহাকে তীক্ষ্ন তীরের মত বিঁধিল, কিন্তু তিনি দৃঢ়-হস্তে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

অর্ধ দণ্ড পরে তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি বহির্দ্বার খুলিয়া দেখিলেন সেখানে বালক নাই। তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন, কিন্তু উত্তর পাইলেন না। বাড়ীর এদিক-ওদিক খুঁজিলেন—কোথাও দেখিতে পাইলেন না। নিকটবর্তী প্রতিবেশীদের বাড়ী খুঁজিলেন—কেহ তাহাকে দেখে নাই।

কর্ণপুর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। সন্ধ্যাকাল—বেশী দূর কোথায় গেল? তিনি নিজের হাতে রন্ধন করিতেন—বালক ভর্ৎসনা সহ্য করিয়াছে, তাহার জন্য দুই-একটা, সে যাহা খাইতে ভালবাসে, এমন ব্যঞ্জন করিবার কল্পনা করিতেছিলেন—আজ রাত্রে মিষ্ট কথায় কি কি উপদেশ দিবেন ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন। বালককে না পাইয়া তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। তন্ন তন্ন করিয়া পাড়ার সব বাড়ী খুঁজিলেন; কেহ সন্ধান দিতে পারে না। রঘুনাথ ভট্টাচার্যের পুত্র শিবানন্দ তাঁহার কাছে বৈদ্যক-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। সে তাঁহাকে বলিল—তিনি রন্ধন করুন, সে আর একবার ভাল করিয়া সকল স্থান খুঁজিতেছে। ইতিমধ্যে যদি বাড়ী ফিরিয়া থাকে দেখিবার জন্য বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু কোথায়? সে বাড়ী আসে নাই।

কি করিবেন চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় শুনিলেন উঠানের পার্শ্বের গোশালার মধ্যে শিবানন্দ বার বার বালকের নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। তাড়াতাড়ি গিয়া দেখেন, গোশালায় রক্ষিত তৃণরাশির উপর বালক কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—শিবানন্দের ডাকা-

ডাকিতে নিদ্রাজড়িত চোখে উঠিয়া ব্যাপার কি ঘুমের ঘোরে হঠাৎ না বুঝিতে পারিয়া, অর্থহীন দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতেছে। কর্ণপুর তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া আনিলেন। পরে খাওয়াইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন। অভিমানে বালক তাঁহার সহিত অনেকক্ষণ কথা কহিল না—বহু আদরের কথা বলিয়া ও কাটোয়ার ফেণী বাতাসা কিনিয়া দিবেন অঙ্গীকার করিয়া কর্ণপুর তাহাকে প্রসন্ন করিলেন।

সেদিন রাত্রে কর্ণপুর মনে মনে ভাবিলেন—কাল হইতে ইহাকে একটু একটু ভক্তি-গ্রন্থ পাঠ করিয়া শোনাই, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে এ স্বভাবটা শোধরাইয়া যাইবে।

পরদিন হইতে তিনি তাহাকে অবসর মত নানা ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিয়া শোনাইতে আরম্ভ করিলেন। নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা মুখস্থ করাইয়া দিলেন, প্রতি সকালে উঠিয়া বালককে তাঁহার সম্মুখে আবৃত্তি করিতে হয়। ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা পড়িয়া শোনান। সন্ধ্যার সময় বসিয়া বালককে ডাকিয়া বলেন—ঠাণ্ডা হয়ে বসো, একটা গল্প করি।

পরে মাধবেন্দ্রপুরী উপাখ্যান বর্ণনা করেন।

মহাভক্ত মাধবেন্দ্রপুরী বৃন্দাবনে গিয়া শৈল পরিক্রমা করিয়া গোবিন্দ কুণ্ডের বৃক্ষ-তলায় সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্জনে বসিয়া আছেন, এক গোপাল বালক একভাণ্ড দুগ্ধ লইয়া আসিয়া পুরীর সম্মুখে ধরিয়া বলিল, তুমি কাহারও কাছে কিছু চাও না কেন? বোধ হয় সারাদিন উপবাসী আছ—এই ধরো দুগ্ধ। পুরী আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি করিয়া জানিলে আমি উপবাসে আছি? বালক মৃদু হাসিয়া বলিল, গ্রামের মেয়েরা জল লইতে আসিয়া তোমাকে দেখিয়া গিয়াছে, এখানে কেহ উপবাসী থাকে না; তাহারাই এই দুগ্ধভাণ্ড দিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছে। ভাণ্ড রহিল, গরু দুহিয়া আসিয়া লইয়া যাইব।

বালক চলিয়া গেল, কিন্তু ভাণ্ড লইতে আর ফিরিল না।......রাত্রে পুরী স্বপ্ন দেখিলেন, সেই বালক আসিয়া নিকটবর্তী এক বনে তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া বলিতেছে, দেখ পুরী, আমি বহুদিন হইতে এই বনের মধ্যে আছি। যবনের আক্রমণের ভয়ে আমার সেবক এইখানে আমায় ফেলিয়া রাখিয়া পলাইয়া গিয়াছে, কেহ দেখে নাই; শীত-বৃষ্টি-দাবানলে বড় কষ্ট পাই, তুমি আমার একটা ব্যবস্থা ক'রো। অনেকদিন হইতে তোমার পথ চাহিয়া বসিয়া আছি—মাধব আসিয়া কবে আমার সেবা করিবে!

মাধবপুরী মঠ স্থাপন করিয়া সেখানে শ্রীগোপাল বিগ্রহ স্থাপন করিলেন।

পর বৎসর নীলাচল হইতে মলয়-চন্দন আনিয়া বিগ্রহের অঙ্গে লেপন করিয়া দিবেন ভাবিয়া ঝাড়খণ্ডের পথে পুরী নীলাচল যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে রেমুনাতে আসিয়া রাত্রিবাসের জন্য তথাকার গোপীনাথ বিগ্রহের মন্দিরে আশ্রয় লইলেন। তখন রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে, ঠাকুরের ভোগের সময় উপস্থিত। কথায় কথায় পুরী মন্দিরের পূজারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গোপীনাথের ভোগের কি ব্যবস্থা আছে? পূজারী বলিল, গোপীনাথের ভোগের জন্য অমৃতকেলি নামক ক্ষীর দ্বাদশমুখপাত্র ভরিয়া সন্ধ্যার পর দেওয়া হয়, অমৃতসমান তাহার আস্বাদ—গোপীনাথের ক্ষীর বলিয়া তাহা প্রসিদ্ধ—অন্য কোথাও তাহা পাওয়া যায় না। কথা বলিতে বলিতে ভোগের শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। পুরী মনে মনে ভাবিলেন, অযাচিতভাবে কিছু ক্ষীর প্রসাদ পাওয়া যায় না? তাহা হইলে কিরূপ আস্বাদ জানিয়া ঐরূপ ভোগ বৃন্দাবনের মঠে শ্রীগোপাল বিগ্রহের জন্য ব্যবস্থা করি। ভাবিতেই পুরীর মনে লজ্জা হইল—শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ করিয়া তিনি তথা হইতে বাহির হইয়া গ্রামের হাটে আসিয়া বসিলেন।

অযাচিত-বৃত্তি পুরী বিরক্ত-উদাস
অযাচিত পাইলে খান নহে উপবাস।

রাত্রে গোপীনাথের পূজারী স্বপ্ন পান—গোপীনাথ স্বয়ং তাহাকে বলিতেছেন, দেখ, এই গ্রামের হাটে এক সন্ন্যাসী বসিয়া আছে, তার নাম মাধবপুরী ; তাঁহার জন্য এক-খন্ড ভোগের ক্ষীর ধড়ায় আঁচলে ঢাকা রাখিয়া দিয়াছি, আমার মায়ায় তোমরা তাহা টের পাও নাই। সে সারাদিন কিছু খায় নাই, শীঘ্র মন্দিরের দ্বার খুলিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে দিয়া এসো।.....

পূজারী তখনই আসিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিল, সত্যই বিগ্রহের ধড়ার অঞ্চলে এক পাত্র ক্ষীর চাপা আছে বটে। কে এমন মহা ভাগ্যবান পুরুষ, যাহার জন্য স্বয়ং ঠাকুর ক্ষীর চুরি করিয়াছেন?......ক্ষীর-পাত্র লইয়া পূজারী গ্রামের হাটে আসিয়া তাঁহাকে খোঁজ করিয়া বাহির করিলেন। মাধবপুরী একা অন্ধকার হাটচালাতে বসিয়া বসিয়া নাম জপ করিতেছিলেন। পূজারী তাঁহার হাতে ক্ষীর-পাত্র তুলিয়া দিয়া পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, ত্রিভুবনে তোমার সমান ভাগ্যবান পুরুষ নাই ; পায়ের ধূলা দাও, উদ্ধার হইয়া যাই। তোমার জন্য স্বয়ং গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করিয়াছেন।

বালক এক মনে শান্তভাবে শোনে।

বার বার সে তাঁহাকে প্রশ্ন করে—বাবা, কৃষ্ণ কোথায় থাকেন? বৃন্দাবনে?

প্রতিদিন এক প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া কর্ণপুর বলেন—হাঁ হাঁ থাকেন।

ইহার পর হইতেই সে সুর ধরে—বৃন্দাবন কোথায় বাবা, আমি বৃন্দাবনে যাবো!

কর্ণপুর ভাবিলেন, ইহার কিছুই হইতেছে না দেখিতেছি—আমার পরিশ্রম সবই পন্ড হইতেছে, এ কিছুই বোঝে না, শুধু বাজে দুষ্টামির দিকে ঝোঁক।

বার বার তাগাদায় বালক কর্ণপুরকে বিরক্ত করিয়া তুলিল। কিছু দিন পরে দূর গ্রামে তাহার এক ধান্য-ক্ষেত্রের কার্য ধরাইবার জন্য কর্ণপুরের সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন হইল। পূর্ব হইতেই ঠিক করিয়াছিলেন, বালক যেরূপ দুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া চোখে চোখে রাখাই ভাল, এক কাজে দুই কাজ হইবে। কর্ণপুর বলিলেন—চল নীলু, আমরা বৃন্দাবনে যাই।

উৎসাহে বালকের রাত্রে নিদ্রাবন্ধের উপক্রম হইল। প্রতি রাত্রে সে জিজ্ঞাসা করে, যাইবার আর কয় দিন বাকি।......গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সেদিন রাত্রে শুইয়া সে কর্ণপুরকে বিরক্ত করিয়া তুলিল—আমি কৃষ্ণকে দেখতে যাব বাবা! কৃষ্ণ কোথায় গরু চরান বাবা? কাল সকালে উঠে যাব।

পরদিন স্বীয় ধান্যক্ষেত্রে যাইবার সময় কর্ণপুর তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন ও ক্ষেত্র হইতে কিছু দূরে পথের ধারে বসাইয়া রাখিয়া বলিলেন—এখানে চুপ ক'রে ব'সে থাক, কৃষ্ণ এই পথে যাবেন। উঠে এদিক-ওদিক গেলে কিন্তু আর দেখতে পাবে না। চুপ ক'রে ব'সে থাক।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে ক্ষেত্রের কার্য শেষ করিয়া কর্ণপুর বালককে লইতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সে মহা উৎসাহে বলিল- -দেখেছি বাবা, এই মাত্র কৃষ্ণ গরুর পাল চরিয়ে নিয়ে ফিরে গেলেন—তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তুমি দেখতে পেলে না!

কর্ণপুর বুঝিলেন, নির্বোধ বালক গ্রামের রাখালদিগকে গরুর পাল লইয়া ফিরিতে দেখিয়াছে। বলিলেন—চলো, বাড়ী চলো—আমি অনেক দেখেছি—তুমি দেখেছ তো, তাহলেই ভাল।

তার পরদিন হইতে বালক প্রায়ই বাবার সঙ্গে মাঠে যায় ও পথের ধারে নির্দিষ্ট

স্থানটিতে বসিয়া থাকে। রোজই বাপকে অনুযোগ করে, কেন বাবা এখানে সন্ধ্যার সময় থাকো না, কেন দেখো না! কোন কোন দিন বলে—কাল আমার দিকে চেয়ে কৃষ্ণ বললেন, আয় না গরু চরাবি! আমি তোমায় না জিজ্ঞাসা ক'রে যেতে পারিনি। যাবো বাবা কাল?

প্রতিদিন এক কথা শুনিয়া কর্ণপুরের মনে খটকা লাগিল। বালক যেভাবে কথাগুলো বলে তাহাতে মিথ্যা কথা বলিতেছে বলিয়াও মনে হয় না। ব্যাপারটা কি? একদিন বালককে বলিলেন, এবার সে-সময় যেন তাঁহাকে সে ক্ষেত্র হইতে ডাকিয়া লয়, তিনিও দেখিবেন।

সন্ধ্যার পূর্বে বালক ছুটিয়া আসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—শীগ্‌গির এসো বাবা, কৃষ্ণ আসছেন।

কর্ণপুর বালকের পাছু পাছু পথের ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন। কোথাও কেহ নাই, মাঠের ধারে নির্জন পথ·····কিন্তু বালক দুই হাত তুলিয়া মহা উৎসাহে বলিল—ঐ দেখ বাবা—গরুর দল। ঐ যে—ঐ দেখ······আসছেন······

কর্ণপুর বলিলেন—কৈ কৈ ······কোন কিছুই তাঁহার চোখে পড়িল না।

বালক বলিল—এইবার দেখেছ তো বাবা? দেখেছ কত গরু?·····ঐ দেখ, কৃষ্ণ কেমন পোশাক প'রে?······

কর্ণপুর বিস্মিত হইলেন। বালকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—সে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে উত্তেজিতভাবে জনশূন্য পথের দিকে চাহিয়া আছে। ভাবিলেন, ইহা মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ নয় তো?

হঠাৎ কিন্তু সেই নির্জন পথে কর্ণপুরের কানে গেল, সত্য সত্যই যেন একদল গরুর সম্মিলিত পদশব্দ হইতেছে, যেন অদৃশ্য একদল গরু কে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা অদৃশ্য বাঁশীর তান তাঁহার সম্মুখের পথ দিয়া একটানা বাজিয়া চলিয়াছে······খুব মৃদু বটে, কিন্তু বেশ স্পষ্ট!······

অপূর্ব মধুর তান! জীবনে সেরূপ কখনো তিনি শোনেন নাই।

কর্ণপুরের সর্ব শরীর শিহরিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

বাঁশীর সুর একটানা বাজিতে বাজিতে দূর হইতে দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে দূরে আরও দূরে গিয়া আম্‌শিমুলের বনের প্রান্তে মিলাইয়া গেল।

বালক বলিল—দেখলে বাবা? আমি বুঝি মিথ্যা কথা বলি?

কর্ণপুর চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বিচিত্রা ১ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩৩৫

প্রত্নতত্ত্ব

আমি এ গল্প আমার বন্ধু সুকুমারবাবুর মুখে শুনেছি।

ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে যাঁহারা কিছু আলোচনা করেছেন, তাঁদের সকলেরই কাছে ডাক্তার সুকুমার সেনের নাম সুপরিচিত। ডাক্তার সেন অনেক দিন গবর্ণমেণ্ট প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন। পাটনা excavation-এর সময়ে তিনি স্পুনার সাহেবের প্রধান সহকারী ছিলেন। মধ্যে দিনকতক তিনি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের Curator-ও ছিলেন। বৌদ্ধ Iconography-তেও তিনি সুপণ্ডিত। "প্রাগ্-গুপ্ত যুগের মূর্তি-শিল্প" ও "ভারতীয় মূর্তি-শিল্পের ক্রমবিকাশ" নামক তাঁর প্রসিদ্ধ বই দু'খানা ছাড়া এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রে এবং বহু দেশী সাময়িক পত্রিকায় এ

বিষয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখেছেন।

তাঁর পড়বার ঘরটায় নানা স্থানের ভাঙা পুরনো ইট, ভাঙা কাঠের তক্তিবসানো তুলট কাগজ ও তালপাতার পুঁথির স্তূপ এবং কালো পাথরের তৈরী দেবদেবীর মূর্তির ভিড়ে পা দেওয়ার স্থান ছিল না। এই সব মূর্তির শ্রেণীবিভাগ করতে তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করতেন। কোনো নতুন-আনা মূর্তি পেলে তিনি বেশ ভাল করে দেখতেন, তারপর টিকিট আঁটতেন "বৌদ্ধমূর্তি—তারা"। দিনকতক পরে এ বর্ণনা তাঁর মনঃপূত হোত না। তিনি আপন মনে বলতেন—উঁহু, ওটা ললিতক্ষেপ pose হোল যে, তারা কি করে হবে? তারপর আবার 'লেন্স' হাতে মূর্তিটার এ-পিঠ ও-পিঠ ভাল করে দেখতেন। মূর্তিটার যে হাত ভাঙা, সেটার দিকে চেয়ে বলতেন—এ হাতটায় নিশ্চয় পদ্ম ছিল। হুঁ--মানে—বেশ বোঝা যাচ্ছে কি না? তারপর আবার পুরানো টিকিটের ওপর নতুন টিকিট আঁটতেন "বৌদ্ধমূর্তি—জম্ভলা"। তাঁর এ ব্যাপার দেখে আমার হাসি পেত। আমার চেয়েও বিজ্ঞ লোকে ঘাড় নেড়ে বলতো—হ্যাঃ, ওসব চাকরিবাজী রে বাপু, চাকরিবাজী! নইলে কোথা-কার পাটলিপুত্র কোথায় চলে' গেল, ওঁরা আজ খোঁড়া ইটপাথর সাজিয়ে হুবহু বলে দিলেন—এটা অশোকের নাট-মন্দিরের গোড়া, ওটা অশোকের আস্তাবলের কোণ; দেখতে দেখতে এক প্রকান্ড রাজবাড়ী মাটির ভেতর থেকে গজিয়ে উঠলো!······চাকরি তো বজায় রাখা চাই? কিছু নয় রে বাপ, ও-সব চাকরিবাজী!

তবে এ-সব কথার মূল্য বড়ই কম; কারণ জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে আমার ও এ-সব বিজ্ঞ লোকের চিরদিন ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক।

সেদিন দুপুর বেলা ডাঃ সেন যখন তাঁর নিজের লাইব্রেরীতে সেনরাজাদের শাসন-কাল নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন, আমি তখন একটা রাষ্ট্রবিপ্লবের মত সেখানে গিয়ে হঠাৎ হাজির হলাম। আমাকে দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। খানিকক্ষণ খোশ-গল্প করে সেখানে সারাদিনের মানসিক পরিশ্রম দূর করতে বুঝলাম তিনি খুব ব্যগ্র হয়ে পড়েছেন। এ-কথা সে-কথার পর ডাঃ সেন বললেন—চা আনাই, একটা গল্প শোনো; এটা আমি কখনো কারুর কাছে বলিনি, তবে স্পুনার সাহেব কিছু কিছু শুনেছেন।

বাইরে সে দিন খুব শীত পড়েছিল। দরজা বন্ধ করে সুকুমার বাবুর গল্প শোনবার জন্য বসলাম। চা এল, চা খেতে খেতে সুকুমারবাবু তাঁর গল্প বলতে লাগলেন।

বিক্রমপুরের পুরানো ভিটার কথা বোধহয় কিছু কিছু শুনে থাকবে। এটা কতদিনের, তা সেখানকার লোকে কেউ বলতে পারে না। অনেক দিন ধরে ঢিবিটা ঐ রকমই দেখে আসছে—এটা কার বা কোন সময়ের তা তারা কিছুই বলতে পারে না।

ঢাকা মিউজিয়ম থেকে সেবার ঐ ঢিবিটা খোঁড়বার কথা উঠলো। এর পূর্বে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি ও ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ শাখা থেকে ওটা কয়েকবার খোঁড়বার প্রস্তাব হয়—কিন্তু টাকার যোগাড় করতে না পেরে তাঁরা পিছিয়ে যান। আমার কাছে যখন কথা উঠলো, তখন আমারও মত ছিল না। কারণ, আমার মনে মনে ধারণা ছিল খরচ যা পড়বে তার তুলনায় আমাদের এমন বিশেষ কিছু পাবার আশা নেই। অবশেষে কিন্তু আমার আপত্তি টিকলো না। ওটা খোঁড়বার জন্যে টাকা বরাদ্দ হোল। আমি বিশেষ অনুরোধে পড়ে তত্ত্বাবধানের ভার নিলাম।

গিয়ে দেখলাম, যে-ঢিবিটা কাটাতে হবে তার কাছে আর একটা ঠিক তেমনি ঢিবি আছে। এই ঢিবির কাছে একটা প্রকান্ড দীঘি আছে, তা প্রায় মজে এসেছে। ঢিবি দুটো খুব বড় বড়। ময়নাকাঁটার বন আর বড় বড় আগাছায় পশ্চিমদিকের ঢিবিটার ওপরের অংশ একেবারে দুর্গম। পূর্বদিকের ঢিবিটা একটু ছোট, তার পেছনের ঢালু দিকটায়

খানিকটা ফাঁকা ঘাসের জমি আছে। স্থানটা কতকটা নির্জন।

সাধারণতঃ খননকার্য আরম্ভ করবার সময় আমরা প্রথমটা প্ল্যান তৈরী করে নিয়ে কাজ আরম্ভ করি। তারপর কাজ এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কতকটা আন্দাজে কতকটা খুব ক্ষীণ সূত্র ধরে, আমরা সেই প্ল্যান ক্রমে ক্রমে বদলে চলি। পাটনা excavation-এর সময় এতে খুব কাজ হয়েছিল। কিন্তু ছোটো দুটো গ্রাম্য ঢিবি খুঁড়ে তুলতে আমি এ-সব করবার আবশ্যক দেখলাম না। আমাদের সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের খনন-কার্য চালিয়েছে এমন কোনো লোক ছিল না। তার কারণ এই যে, ওটা খোঁড়া হচ্ছিল ঢাকা P. W. D. থেকে।

এই ঢিবি দুটোর বড়টাকে ওখানকার লোকে বলে "নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা" ও ছোটটাকে বলে "টোলবাটীর ভিটা"। কারুর মতে এই নাস্তিক পণ্ডিত হলেন, বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্রকার বল্লভাচার্য। তিনি শেষ বয়সে বৈষ্ণব ধর্ম ত্যাগ করে, শাঙ্কর বেদান্তের ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। এজন্য দেশের লোকে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে নারাজ হয়। কেউ কেউ বলেন, লল্লভাচার্য বিক্রমপুরের ত্রিসীমানায়ও জন্মান নি। তাঁদের ওটা ষোড়শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের ভিটা। যাক সে কথা। আমি কিন্তু জানতে পেরেছি ওখানে কে বাস করতেন। আমি যা জানতে পেরেছি, পূর্বে কেউ তা আন্দাজ করেছিলেন, কিন্তু জোর করে' কিছু বলতে পারেন নি। আমি জোর করে বলতে পারি, কিন্তু বলি নি। কেন বলি নি, আর কেমন করে আমি তা জানলাম, সেই-টেই বলবো।

কিছুকাল ধরে' ঢিবির ওপরকার বন কাটানো হোল। তারপর প্রকৃতপক্ষে খননকার্য শুরু হোল। আমার সঙ্গে বন্ধু ঢাকা মিউজিয়মে'র ক—বাবু ছিলেন। তিনি শুধু প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন না, তিনি ছিলেন তার চেয়ে বেশী—প্রত্নতত্ত্বগ্রস্ত। প্রধানতঃ তাঁরই আগ্রহে ও উৎসাহে আমরা এ কাজে হাত দিই। দিনের পর দিন ঢিবি দুটোর সামনে একটা প্রকাণ্ড ঘোড়া-নিম গাছের ছায়ায় ক্যাম্প-চেয়ার পেতে আমরা তীর্থের কাকের মত বসে' থাকতাম। আমার বন্ধুর চোখ মুখের ভাব ও উৎসাহ দেখে আমার মনে হোত, তিনি আশা করেন, খুঁড়তে খুঁড়তে একটা পুরানো আমলের রাজবাড়ি-টাড়ি বা একটা তাল-পাতায় লেখা আস্ত বাংলা ইতিহাসের পুঁথি, অভাবপক্ষে সেই অজ্ঞাত নাস্তিক পণ্ডিতের fossil শরীরটাই বা মাটির মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়ে।

খুঁড়তে খুঁড়তে প্রথমে বেরুলো একটা মাটির ঘট। ও-রকম গড়নের ঘট এখন আর বাংলার কোনো জায়গায় তৈরী হয় কি না জানি না। ঘটের গলার নিচে থেকে তলা পর্যন্ত curve-টি যে দিয়েছিল, সে গ্রাম্য কুমোরটিকে আমি শ্রদ্ধা করি। ঘটটার মধ্যে প্রায় আধঘট কড়ি। হিন্দুরাজত্বে কেনা-বেচার জন্যে কড়ি ব্যবহার হোত তা জান তো? কোন্ অতীত দিনে গৃহস্বামী ভবিষ্যৎ দুর্দিনের ভয়ে কড়িগুলো সযত্নে ঘটে ভরে' মাটির মধ্যে পুঁতে রেখে দিয়েছিলেন, সে ভবিষ্যৎ কত দিন হোল সুদূর অতীতে মিলিয়ে গিয়েছে, সঞ্চিত অর্থের আর প্রয়োজন হয় নি। ক্রমে ক্রমে আরও অনেক জিনিস বেরুতে লাগলো। আরও মাটির অনেক ভাঙা ঘট, কলসী, একখানা মরিচাধরা লাল রঙের তলোয়ার, একটা প্রদীপ, ভাঙ্গা ইটের কুচো এবং সকলের শেষে বেরুলো একটা কালো পাথরের দেবীমূর্তি। এই মূর্তিটিকে নিয়েই আমার গল্প, অতএব এইটাই ভাল করে বলি।

দেবীমূর্তিটা পাওয়া যায় টোলবাড়ির ভিটায়। মূর্তিটি রাজমহলের কালো পাথরের তৈরী, চক্‌চকে পালিশ করা। বহু দিন মাটির তলায় থেকে সে পালিশ যদিও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মোটের ওপর তখনও যা ছিল, তা খুব কম মূর্তিতেই আমি দেখেছি।

মূর্তিটি সরস্বতী দেবী হলেও, তাতে বৌদ্ধ-ভাস্কর্যের কিছু প্রভাব আছে বলে মনে হয়েছিল। হাতে বীণা না থাকলেও দেবী না হয়ে দেবমূর্তি হলে, তাকে মঞ্জুশ্রী মূর্তি বলে অনায়াসে ধরে নেওয়া যেতে পারতো।

মূর্তিটা যখন পরিষ্কার করে আমার সামনে আনা হোল, তখন তার দিকে চেয়েই আমি চেয়ার থেকে উঠে পড়লাম। অনেক মূর্তি গত পনরো বৎসর ধরে পরীক্ষা করে আসছি—কিন্তু এ কি? বাটালির মুখে পাথর থেকে হাসি ফুটিয়ে তুলেছে কি করে! খানিকক্ষণ একদৃষ্টে মূর্তিটার দিকে চেয়ে রইলাম। আমি খুব কল্পনাপ্রবণ নই, কিন্তু সেদিন সেই নিস্তব্ধ দুপুরবেলায় পত্রবিরল ঘোড়া-নিম গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে আমার মনের মধ্যে কেমন গোলমাল হয়ে গেল। অল্পক্ষণ......অবশ্য খুব অল্পক্ষণের জন্যে মনের মধ্যে এক অপূর্ব ভাব......সৌন্দর্যে ঝলমল চক্‌চকে কালো পাথরের পালিশ করা নিটোল সে দেবীমূর্তির, তার মুখের দৃঢ়রেখাগুলির, দেহের গঠনের শিল্পভঙ্গির হাতের আঙগুলগুলি বিন্যাসের সুন্দর ধরনের......সকলের ওপর মূর্তির মুখের সে হাসি-মাখা জীবন্ত সৌন্দর্যের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। শিল্পের যে প্রভাব কালকে তুচ্ছ করে, যুগে যুগে মানুষের প্রাণ স্পর্শ করছে, তার সঙ্গে সত্যিকার পরিচয় সেই আমার প্রথম হোল। জয় হোক সে অতীত যুগের অজ্ঞাতনামা শিল্পীর ......জয় হোক তার মৃত্যুঞ্জয়ী প্রতিভার!

মূর্তিটাকে বাড়ি নিয়ে এসে, আমার লাইব্রেরীতে কাগজ-চাপা ধ্যানিবুদ্ধের দলের মধ্যে তাকে রেখে দিলাম। রোজ সকালে উঠে দেখতাম—দীর্ঘ ভ্রূ-রেখার নীচে বাঁশ-পাতার মত টানা চোখ দুটোর কোণ হাসিতে যেন দিনদিন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কয়েক-দিন ধরে নানা কথা মনে হতে লাগলো। খুঁড়তে খুঁড়তে এমন কোনো জিনিস পাই নি, যাতে মূর্তিটির বা ভিটার সময় নিরূপণ করতে পারি। তবে মূর্তিটি গুপ্তযুগের পরবর্তী সময়ের এবং পূর্ববঙ্গের শিল্পীর হাতে তৈরী, এটা আমি তার মাথার ওপর ছাতার মত চিহ্ন দেখে কতকটা আন্দাজ করতাম। পাথরের মূর্তির মাথার ওপর এই গোল ছাতার মত চিহ্ন, পূর্ববঙ্গের ভাস্কর্যের একটা রীতি—এ আমি অন্য অন্য মূর্তিতেও দেখেছি।

সেদিন রবিবার। সন্ধ্যাবেলাটা আমার এক প্রতিবেশী বন্ধুর সঙ্গে এক বাজী দাবা খেলে সকাল সকাল শুতে গেলাম।

এইবার যে কথা বলবো, সে কেবল তুমি বলেই তোমার কাছে বলছি—অপরের কাছে এ কথা বলতে আমার বাধে; কারণ, তাঁরা আমায় বিশ্বাস করবেন না। অনেক রাতে কি জানি কেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের মধ্যে কিসের অত্যন্ত সুগন্ধ পেলাম। পূজার মন্দিরে যেমন ধূপধুনো গুগ্‌গুল, ফুল, ঘি-চন্দন সবসুদ্ধ মিলে একটা স্নিগ্ধ সৌরভ পাওয়া যায়, এটা ঠিক সেই ভাবের। সুগন্ধটা আমার নিদ্রালস মস্তিষ্কের মধ্যে গিয়ে আমায় কেমন একটা নেশায় অভিভূত করে ফেললো। রাত ক'টা হবে ঠিক জানি না......মাথার কাছে ঘড়িটা টিক্‌টিক্ করছিল......হঠাৎ দেখলাম, খাট থেকে কিছু-দূরে ঘরের মেঝেয় কে একজন দাঁড়িয়ে......তাঁর মস্তক মুণ্ডিত, পরণে বৌদ্ধ পুরো-হিতের মত হলদে পরিচ্ছদ......মুখের হাতের অনাবৃত অংশের রং যেন সাদা আগুনের মত জ্বলছে......বিস্মিত হয়ে জোর করে চোখ চাইতেই সে মূর্তি কোথায় মিলিয়ে গেল!......বিছানায় তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম ঘড়িতে দেখলাম রাত দুটো......ভাল করে চোখ মুছলাম, ঘরে কেউ কোথাও নেই। ভাবলাম আরে গেল যা, রাত দুপুরের সময় এ যে দেখছি ছেলেবেলাকার সেই Abu Ben Adhem (may his tribe increase)! খানিকক্ষণ বিছানায় বসে থাকবার পর ঠিক করে নিলাম, ওটা ঘুমের ঘোরে কি রকম চোখের ধাঁধা দেখে থাকবো। তারপর আবার শুয়ে পড়লাম, একটু পরে বেশ ঘুম এল।

কতক্ষণ পরে জানি না, আবার কি জানি কেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল……ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সে সুগন্ধটা পেলাম……আবার সেই নেশা! এবার নেশাটা যেন আমায় পূর্বের চেয়েও বেশী অভিভূত করে' ফেললে……তার পরই দেখি, সেই মুণ্ডিত-মস্তক পীতবসন জ্যোতির্ময় বৌদ্ধ ভিক্ষু আমার খাটের অত্যন্ত কাছে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে আছেন!……

তারপর আরও কতকগুলো অদ্ভুত ব্যাপার খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটলো।

হঠাৎ আমার ঘরের দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল……দেখলাম, এক বিস্তীর্ণ স্থান, কত বাড়ি শ্বেত-পাথরের বাঁধানো কত চত্বর, কত গম্বুজ, দেউল ……অনেক মুণ্ডিত-মস্তক বৌদ্ধ-ভিক্ষুর মত পরিচ্ছদ-পরা লোকেরা এ-দিক ও-দিক যাতায়াত করছেন, অসংখ্য ছাত্র ঘরে ঘরে পাঠনিরত……একস্থানে অশোক-বৃক্ষের ছায়ায় শ্বেত-পাথরের বেদীতে একদল তরুণ যুবক পরিবৃত হয়ে বসে আমার পরিচিত সেই বৌদ্ধ-ভিক্ষু! দেখে মনে হোল, তিনি অধ্যাপনায় নিরত এবং যুবক-মণ্ডলী তাঁর ছাত্র। অশোক-কুঞ্জের ঘন পল্লবের প্রান্তস্থিত রক্ত-পুষ্পগুচ্ছের পাপড়ি গুরু ও শিষ্যবর্গের মাথার ওপর বর্ষিত হতে লাগলো।

দেখতে দেখতে সে দৃশ্য মিলিয়ে গেল……আমার তন্দ্রালস কানের মধ্যে নানা বাজনার একটা সম্মিলিত সুর বেজে উঠলো……এক বিরাট উৎসবসভা! উৎসববেশে সজ্জিত নরনারীতে সভা ভরে ফেলেছে……সব যেন অজন্তার গুহার চিত্রিত নরনারীরা জীবন্ত হয়ে উঠে বেড়াচ্ছে। কোন্ প্রাচীন যুগের হাবভাব, পোশাক পরিচ্ছদ……সভার চারিধারে বর্শাহাতে দীর্ঘদেহ সৈনিকরা দাঁড়িয়ে, তেজস্বী যুদ্ধের ঘোড়াগুলো মূল্যবান সাজ পরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ঠুকছে……সভার মাঝখানে রক্তাম্বর-পরণে চম্পক-গৌরী কে এক মেয়ে……মেয়েটির সামনে দাঁড়িয়ে উজ্জ্বল ইস্পাতের বর্ম আঁটা এক যুবক, তার কোমরে ঝক্‌ঝকে ইস্পাতের খাপে বাঁকা তলোয়ার দুলছে……গলায় ফুলের মালা ……মুখে বালকের মত সরল সুকুমার হাসির রেখা। মেয়েটির নিটোল সুন্দর হাতটি ধরে যুবকের দৃঢ় পেশীবহুল হস্তে যিনি স্থাপন করলেন—ভাল করে চেয়ে দেখলাম, তিনি আমার রাতের বিশ্রামের ব্যাঘাতকারী সেই বৌদ্ধ-ভিক্ষু।

বায়স্কোপের ছবির মত বিবাহ-সভা মিলিয়ে গেল। হঠাৎ আমার হাত-পা যেন খুব ঠাণ্ডা হয়ে উঠলো। শীতে দাঁতে দাঁত লাগতে লাগলো……পায়ের আঙুল যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। চোখের সামনে এক বিস্তীর্ণ সাদা বরফের রাজ্য,……ওপর থেকে বরফ পড়ছে—তুষার-বাষ্পে চারিধার অস্পষ্ট……সামনে পেছনে সুউচ্চ পর্বতের চূড়া…… সামনে এক সংকীর্ণ পথ এঁকে বেঁকে উচ্চ হতে উচ্চতর পার্বত্য প্রদেশে উঠে গিয়েছে। এক দীর্ঘদেহ ভিক্ষু সেই ভীষণ দুর্গমপথ বেয়ে ভীষণতর হিম-বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে মাতালের মত টলতে টলতে পথ চলছেন……তাঁর মাথা যেন ক্রমে নুয়ে বুকের ওপর এসে পড়েছে……কিন্তু তবু তিনি না থেমে ক্রমাগত পথ চলছেন……বহুদূরের এক উত্তুঙ্গ তুষারমণ্ডিত পর্বতচূড়া কিসের আলোয় রক্তাভ হয়ে দৈত্যের হাতের মশালের মত সে বিশাল তুহিন-রাজ্যের দূর প্রান্ত আলোকিত করে ধক্ ধক্ করে' জ্বলছে।……

তুষার-বাষ্প ঘন হতে ঘনতর হয়ে সমস্ত দৃশ্যটা ঢেকে ফেললো। তারপরই চোখের সামনে—এ যে আমারই চিরপরিচিত বাংলা দেশের পাড়াগাঁ……খড়ের ঘরের পেছনে ছায়াগহন বাঁশবনে বিকাল নেমে আসছে। বৈঁচি-ঝোপে শালিক পাখীর দল কিচ কিচ করচে! কাঁটালতলায় কোন গৃহস্থের গরু বাঁধা! মাটির ঘরের দাওয়ায় বসে এক তরুণ যুবক! তার সামনে আমার খুঁড়ে-বার-করা সেই দেবীমূর্তি!……দেখে মনে হোল যুবকের অনেক দিনের স্বপ্ন ঐ পাথরের মূর্তিতে সফল হয়েছে……বর্ষাসন্ধ্যার মেঘমেদুর

আকাশের নিচে ঘনশ্যাম কেতকী-পল্লবের মত কালো ভাবগভীর চোখদুটি মেলে সে পাথরের মূর্তির মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।......

হঠাৎ সে দৃশ্যও মিলিয়ে গেল। দেখি, আমি আমার ঘরে খাটেই শুয়ে আছি, পাশে সেই বৌদ্ধ-ভিক্ষু। এবার তিনি কথা বললেন। তাঁর কথাগুলো আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে। তিনি বললেন—তুমি যে মূর্তিটি মাটি খুঁড়ে বার করেছ, তারই টানে অনেক দিন পরে আজ আবার পৃথিবীতে ফিরে এলাম। নয় শ' বৎসর আগে আমি তোমার মতই পৃথিবীর মানুষ ছিলাম। যে স্থান তোমরা খুঁড়েছ, ওই আমার বাস্তুভিটা ছিল। তুমি জ্ঞানচর্চায় সমস্ত জীবন যাপন করেছ, এই জন্যেই তোমার কাছে আসা আমার সম্ভব হয়েছে ; এবং এই জন্যেই আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমার জীবনের কতকগুলি প্রধান প্রধান ঘটনা তোমাকে দেখালাম। আমি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান,—নয়পালদেবের সময়ে আমি নালন্দা মহাবিহারের সঙ্ঘস্থবির ছিলাম। ভগবান তথাগতের অমৃতময়ী বাণীতে আমার মন মুগ্ধ হয়েছিল ; সে জন্য দেশের হিন্দু-সমাজে আমার জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়। দেশের টোলের অধ্যাপনা ছেড়ে আমি নালন্দা যাই। বুদ্ধের নির্মল ধর্ম যখন তিব্বতে অনাচারগ্রস্ত হয়ে উঠেছিল, তখন ভগবান শাক্যশ্রীর পরে আমি তিব্বত যাই সে ধর্ম পুনরুদ্ধারের জন্যে। আমার সময়কার এক গৌরবময় দিনের কথা আজও আমার স্মরণ হয়। আজ অনেকদিন পরে পৃথিবীতে—বাংলায় ফিরে এসে সে-কথা বেশী করে মনে পড়েছে।......চেদীরাজ কর্ণ দিগ্বিজয়ে বার হয়ে দেশ জয় করতে করতে গৌড়-মগধ-বঙ্গের রাজা নয়পালদেবের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়ে যে-দিন সন্ধি করলেন, আমি তখন নালন্দায় অধ্যাপক। মনে আছে, উৎসাহে সে-দিন সারারাত্রি আমার নিদ্রা হয়নি। এই সন্ধির কিছুদিন পরেই কর্ণের কন্যা যৌবনশ্রীর সঙ্গে নয়পালদেবের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের যে বিবাহ হয়, আমিই সেই বিবাহের পুরোহিত ছিলাম।......অল্প বয়সে আমি একজন গ্রাম্য শিল্পীর কাছে পাথরের মূর্তি গড়তে শিখি এবং অবসর মত আমি তার চর্চা রাখতাম। তারপর আমি যখন পিতামহের টোলে সারস্বত ব্যাকরণের ছাত্র, তখন সমস্ত শক্তি ও কল্পনা ব্যয় করে জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর এক মূর্তি গড়ি। মূর্তিটি আমার বড় প্রিয় ছিল। ওই মূর্তিটির টানেই অনেক দিন পরে আবার পৃথিবীতে ফিরে এলাম। দেশের লোকে আমায় নাস্তিক বলতো ; কারণ, আমি একেই বৌদ্ধ ছিলাম, তার ওপর সাধারণভাবের ধর্মবিশ্বাস আমার ছিল না। যে অরুণচ্ছটারক্ত হিমবান্ শৃঙ্গ জনহীন তুষার-রাজ্যে আলোকিত করেছে—বা তোমায় দেখিয়েছি, তা সত্যের রূপ! সাধারণ লোকের পক্ষে সে-সত্য দুরধিগম্য। আমার কথা ধরি না, কারণ আমি নগণ্য। কিন্তু যে বিশাল সঙ্ঘারাম আমাদের সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে রেখেছিল, তার সমস্ত অধ্যাপকই সে উচ্চ দার্শনিক সত্যতে চিরদিন লক্ষ্য রেখে চলেছিলেন। আমিও অনেক বিপদ মাথা পেতে নিয়ে, সাধ্যমত তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলাম। যেখানে এখন আছি, সেখানে সে-সব যুগপূজ্য জ্ঞান-তাপস্বী আমার নিত্য সঙ্গী। তোমরাও অমৃতের পুত্র—সে লোক তোমাদের জন্যেও নির্দিষ্ট আছে।......অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযান জয়যুক্ত হোক।......

বৌদ্ধ-ভিক্ষু কোথায় মিলিয়ে গেলেন।......কিসের শব্দে চমক্ ভেঙে গিয়ে দেখি, ভোর হয়েছে বাইরের বারান্দায় চাকরের ঝাঁটার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

ডাঃ সেন গল্প শেষ করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—মূর্তিটা কোথায়?

ডাঃ সেন বললেন—ঢাকা মিউজিয়মে।

আমার জীবনে সেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার সেবার ঘটেছিল।

বছর তিনেক আগেকার কথা। আমাকে বরিশালের ওপারে যেতে হয়েছিল একটা কাজে।

এ অঞ্চলের একটা গঞ্জ থেকে বেলা প্রায় বারোটার সময় নৌকোয় উঠলুম। আমার সঙ্গে এক নৌকোয় বরিশালের এক ভদ্রলোক ছিলেন। গল্পে-গুজবে সময় কাটতে লাগল।

সময়টা পুজোর পরেই। দিনমানটা মেঘলা মেঘলা কেটে গেল। মাঝে মাঝে টিপ্‌টিপ্‌ ক'রে বৃষ্টিও পড়তে শুরু হ'ল। সন্ধ্যার কিছু আগে কিন্তু আকাশটা অল্প পরিষ্কার হয়ে গেল। ভাঙা ভাঙা মেঘের মধ্যে দিয়ে চতুর্দশীর চাঁদের আলো অল্প অল্প প্রকাশ হ'ল।......

সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বড় নদী ছেড়ে একটা খালে পড়লুম—শোনা গেল খালটা এখান থেকে আরম্ভ হয়ে নোয়াখালির উত্তর দিয়ে একেবারে মেঘনায় মিশেছে। পূর্ববঙ্গে সেই আমার নতুন যাওয়া, চোখে কেমন সব একটু নতুন ঠেকতে লাগল। অপরিসর খালের দুধারে বৃষ্টিস্নাত কেয়ার জঙ্গলে মেঘে আধোঢাকা চতুর্দশীর জ্যোৎস্না চিক্‌মিক করছিল। মাঝে মাঝে নদীর ধারে বড় বড় মাঠ। শটি, বেত, ফার্নগাছের বন জায়গায় জায়গায় খালের জলে ঝুঁকে পড়েছে।......বাইরে একটু ঠান্ডা থাকলেও আমি ছই-এর বাইরে ব'সে দেখতে দেখতে যাচ্ছিলুম......বরিশালের সে অংশটা সুন্দরবনের কাছাকাছি, ছোট ছোট খাল ও নদী চারিধারে, সমুদ্র খুব দূরে নয়, দশ-পনেরো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমেই হাতিয়া ও সন্দ্বীপ। আর একটু রাত হল। খালের দু'পাড়ের নির্জন জঙ্গল অস্ফুট জ্যোৎস্নায় কেমন যেন অদ্ভুত দেখাতে লাগল। এ অংশে লোকের বসতি একেবারে নেই ; শুধু ঘন বন আর জলের ধারে বড় বড় হোগলা গাছ।

আমার সঙ্গী বললেন—এত রাতে আর বাইরে থাকবেন না, আসুন ছই-এর মধ্যে। এসব জঙ্গলে—বুঝলেন না?

তারপর তিনি সুন্দরবনের নানা গল্প করতে লাগলেন। তাঁর এক কাকা নাকি ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টে কাজ করতেন, তাঁরই লঞ্চে ক'রে তিনি একবার সুন্দরবনের নানা অংশে বেড়িয়েছিলেন—সেই সব গল্প।

রাত প্রায় বারোটার কাছাকাছি হ'ল।

মাঝি আমাদের নৌকোয় ছিল মোটে একটি। সে ব'লে উঠল—বাবু, একটু এগিয়ে গিয়ে বড় নদী পড়বে। এত রাতে একা সে নদীতে পাড়ি জমাতে পারব না। এখানেই নৌকো রাখি।

নৌকো সেখানেই বাঁধা হ'ল। এদিকে বড় বড় গাছের আড়ালে চাঁদ অস্ত গেল, দেখলুম অপ্রশস্ত খালের দু'ধারেই অন্ধকারে ঢাকা ঘন জঙ্গল। চারিদিকে কোন শব্দ নেই, পতঙ্গগুলো পর্যন্ত চুপ করেছে।......সঙ্গীকে বললুম—মশায়, এই তো সরু খাল—পাড় থেকে বাঘ লাফিয়ে পড়বে না তো নৌকোর ওপর?

সঙ্গী বললেন—না পড়লেই আশ্চর্য হবো!

শুনে অত্যন্ত পুলকে ছই-এর মধ্যে ঘেঁষে বসলুম। খানিকটা ব'সে থাকবার পর সঙ্গী বললে—আসুন একটু শোয়া যাক। ঘুম তো হবে না, আর ঘুমোনো ঠিকও না, আসুন একটু চোখ বুজে থাকি।

খানিকটা চুপ ক'রে থাকবার পর সঙ্গীকে ডাকতে গিয়ে দেখি তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন, মাঝিও জেগে আছে ব'লে মনে হ'ল না ; ভাবলুম, তবে আমিই বা কেন মিথ্যে মিথ্যে চোখ চেয়ে চেয়ে থাকি—মহাজনদের পথ ধরবার উদ্যোগ করলুম।

তারপর যা ঘটল সে আমার জীবনের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। শুতে যাচ্ছি হঠাৎ আমার কানে গেল অন্ধকার বন-ঝোপের ওপাশে অনেক দূরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে কে যেন কোথায় গ্রামোফোন বাজাচ্ছে।······তাড়াতাড়ি উঠে বসলুম—গ্রামোফোন? এ বনে এত রাত্রে গ্রামোফোন বাজাবে কে? কান পেতে শুনলুম—গ্রামোফোন না। অন্ধকারে হিজল হিন্তাল গাছগুলো যেখানে খুব ঘন হয়ে আছে, সেখান থেকে কারা যেন উচ্চ কণ্ঠে আর্তকরুণ সুরে কি বলছে।······খানিকটা শুনে মনে হ'ল সেটা একাধিক লোকের সমবেত কণ্ঠস্বর। প্রতিবেশীর তেতলার ছাদে গ্রামোফোন বাজলে যেমন খানিকটা স্পষ্ট, খানিকটা অস্পষ্ট, অথচ বেশ একটা একটানা সুরের ঢেউ এসে কানে পৌঁছয়—এও অনেকটা সেই ভাবের। মনে হ'ল যেন কতকগুলো অস্পষ্ট বাংলা ভাষার শব্দও কানে গেল—কিন্তু ধরতে পারা গেল না কথাগুলো কি। শব্দটা মাত্র মিনিটখানেক স্থায়ী হ'ল, তারপরই অন্ধকার বনভূমি যেমন নিস্তব্ধ ছিল, আবার তেমনি নিস্তব্ধ হয়ে গেল······ তাড়াতাড়ি ছই-এর বাইরে এলুম। চারিপাশের অন্ধকার ঝিঙের বিচির মতন কালো। বনভূমি নীরব, শুধু নৌকোর তলায় ভাঁটার জল কল্‌কল ক'রে বাধছে, আর শেষ রাত্রের বাতাসে জলের ধারে কেয়া-ঝোপে এক প্রকার অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে। পাড় থেকে দূরে হিজল গাছের কালো গুঁড়িগুলোর অন্ধকারে এক অদ্ভুত চেহারা হয়েছে।

ভাবলাম সঙ্গীদের ডেকে তুলি। আবার ভাবলুম বেচারীরা ঘুমুচ্ছে, ডেকে কি হবে, তার চেয়ে বরং নিজে জেগে ব'সে থাকি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালুম ; তারপর আবার ছই-এর মধ্যে ঢুকতে যাব, এমন সময় সেই অন্ধকারে ঢাকা বিশাল বনভূমির কোন্ অংশ থেকে সুস্পষ্ট অতি উচ্চ আর্তকরুণ ঝিঁঝি পোকার রবের মত তীক্ষ্ণস্বর তীরের মতন জমাট অন্ধকারের বুক চিরে আকাশে উঠল—ওগো নৌকাযাত্রীরা, তোমরা কারা যাচ্ছ······আমরা শ্বাস বন্ধ হয়ে ম'লাম······আমাদের ওঠাও ওঠাও······ আমাদের বাঁচাও।

নৌকোর মাঝিটা ধড়মড় ক'রে জেগে উঠল। আমি সঙ্গীকে ডাকলুম—মশায়, ও মশায়, উঠুন উঠুন।

মাঝি আমার কাছে ঘেঁষে এল, ভয়ে তার গলার স্বর কাঁপছিল। বললে—আল্লা! আল্লা! শুনতে পেয়েছেন বাবু?

সঙ্গী উঠে জিজ্ঞাসা করলে—কি, কি মশায়? ডাকলেন কেন? কোন জানোয়ার-টানোয়ার নাকি?

আমি ব্যাপারটা বললুম। তিনিও তাড়াতাড়ি ছই-এর বাইরে এলেন। তিনজনে মিলে কান খাড়া ক'রে রইলুম। চারিদিক আবার চুপ······ভাঁটার জল নৌকোর তলায় বেধে আগের চেয়েও জোরে শব্দ হচ্ছিল।······

সঙ্গী মাঝিকে জিজ্ঞেস করলেন—এটা কি তবে······

মাঝি বললে—হ্যাঁ বাবু, বাঁয়েই কীর্তিপাশার গড়।

সঙ্গী বললেন—তবে তুই এত রাত্রে এখানে নৌকো রাখলি কেন? বেকুব কোথাকার!······

মাঝি বললে—তিনজন আছি ব'লেই রেখেছিলাম বাবু। ভাঁটার টানে নৌকো পিছিয়ে নেবার তো জো ছিল না।

কথাবার্তার ধরণ শুনে সঙ্গীকে বললুম—কি মশায়, কি ব্যাপার? আপনি কিছু

জানেন নাকি?

ভয়ে যত না হোক বিস্ময়ে আমরা কেমন হয়ে গিয়েছিলুম। সংগী বললেন—ওরে তোর সেই কেরোসিনের ডিবেটা জ্বাল্। আলো জেবলে ব'সে থাকা যাক—রাত এখনও ঢের।

মাঝিকে বললুম—তুই শব্দটা শুনতে পেয়েছিলি?

সে বললে, হ্যাঁ বাবু, আওয়াজ কানে গিয়েই তো আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি আরও দুবার নৌকো বেয়ে যেতে যেতে ও ডাক শুনেছি।

সংগী বললেন—এটা এ অঞ্চলের একটা অদ্ভুত ঘটনা। তবে এ জায়গাটা সুন্দরবনের সীমানায় ব'লে আর এ অঞ্চলে কোন লোকালয় নেই ব'লে, শুধু নৌকোর মাঝিদের কাছেই এটা সুপরিচিত। এর পেছনে একটা ইতিহাস আছে, সেটা অবশ্য নৌকোর মাঝিদের পরিচিত নয়—সেইটে আপনাকে বলি শুনুন।

তারপর ধূমায়িত কেরোসিনের ডিবার আলোয় অন্ধকার বনের বুকের মধ্যে ব'সে সংগীর মুখে কীর্তিপাশার গড়ের ইতিহাসটা শুনতে লাগলুম।

তিন শ' বছর আগেকার কথা। মুনিম খাঁ তখন গৌড়ের সুবাদার। এ অঞ্চলে তখন বারভূঁইয়ার দুই প্রতাপশালী ভূঁইয়া রাজা রামচন্দ্র রায় ও ঈশা খাঁ মশনদ-ই আলির খুব প্রতাপ। মেঘনার মোহানার বাহির সমুদ্র, যাকে এখন সন্দবীপ চ্যানেল বলে, সেখানে তখন মগ আর পর্তুগীজ জলদস্যুরা শিকারান্বেষণে শ্যেনপক্ষীর মত ওৎ পেতে ব'সে থাকত।

সে সময় এখানে এরকম জঙ্গল ছিল না। এ সমস্ত জায়গা তখন কীর্তি রায়ের অধিকারে ছিল। এইখানে তাঁর সুদৃঢ় দুর্গ ছিল—মগ জলদস্যুদের সংগে তিনি অনেকবার লড়েছিলেন। তাঁর অধীনে সৈন্যসামন্ত, কামান, যুদ্ধের কোষা সবই ছিল। সন্দ্বীপ তখন ছিল পর্তুগীজ জলদস্যুদের প্রধান আড্ডা। এদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে এ অঞ্চলের সকল জমিদারকেই সৈন্যবল দৃঢ় ক'রে গড়তে হ'ত। এ বনের পশ্চিম ধার দিয়ে তখন আর একটা খাল বড় নদীতে পড়ত বনের মধ্যে তার চিহ্ন এখনও আছে।

কীর্তি রায় অত্যন্ত অত্যাচারী এবং দুর্ধর্ষ জমিদার ছিলেন। তাঁর রাজ্যে এমন সুন্দর মেয়ে কমই ছিল, যে তাঁর অন্তঃপুরে একবার না ঢুকেছে। তা ছাড়া তিনি নিজেও এক প্রকার জলদস্যু ছিলেন। তাঁর নিজের অনেকগুলো বড় ছিপ ছিল। আশপাশের জমিদারী এমন কি নিজের জমিদারীর মধ্যেও সম্পত্তিশালী গৃহস্থের ধনরত্ন স্ত্রী-কন্যা লুঠপাট করা রূপ অসৎ কার্যে সেগুলি ব্যবহৃত হ'ত।

কীর্তি রায়ের পাশের জমিদারী ছিল কীর্তি রায়ের এক বন্ধুর। এ'রা ছিলেন চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায়দের পত্তনিদার। অবশ্য সে সময় অনেক পত্তনিদারের ক্ষমতা এখনকার স্বাধীন রাজাদের চেয়ে বেশী ছিল। কীর্তি রায়ের বন্ধু মারা গেলে তাঁর তরুণবয়স্ক পুত্র নরনারায়ণ রায় পিতার জমিদারীর ভার পান। নরনারায়ণ তখন নবে যৌবনে পদার্পণ করেছেন, অত্যন্ত সুপুরুষ, বীর ও শক্তিমান। নরনারায়ণ কীর্তি রায়ের পুত্র চঞ্চল রায়ের সমবয়সী বন্ধু।

সেবার কীর্তি রায়ের নিমন্ত্রণে নরনারায়ণ রায় তাঁর রাজ্যে দিনকতকের জন্যে বেড়াতে এলেন। চঞ্চল রায়ের তরুণী পত্নী লক্ষ্মী দেবী স্বামীর বন্ধু নরনারায়ণকে দেবরের মতন স্নেহের চক্ষে দেখতে লাগলেন। দু'একদিনের মধ্যেই কিন্তু সে স্নেহের চোটে নরনারায়ণকে বিব্রত হয়ে উঠতে হ'ল। নরনারায়ণ রায় তরুণবয়স্ক হলেও একটু গম্ভীর-প্রকৃতি। বিদ্যুৎ-চঞ্চলা তরুণী বন্ধুপত্নীর ব্যংগ-পরিহাসে গম্ভীর-প্রকৃতি নরনারায়ণের

মান বাঁচিয়ে চলা দুষ্কর হয়ে পড়ল। স্নান ক'রে উঠেছেন, মাথার তাজ খুঁজে পাওয়া যায় না, নানাজায়গায় খুঁজে হয়রান হয়ে তার আশা ছেড়ে দিয়ে ব'সে আছেন, হঠাৎ কখন নিজের বালিশ তুলতে গিয়ে দেখেন তার নীচেই তাজ চাপা আছে—যদিও এর আগেও তিনি বালিশের নীচে খুঁজেছেন।......তাঁর প্রিয় তরবারিখানা দুপুর থেকে বিকেলের মধ্যে পাঁচ বার হারিয়ে গেল, আবার পাঁচ বারই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে খুঁজে পাওয়া গেল। তাম্বুলে এমন সব দ্রব্যের সমাবেশ হ'তে লাগল, যা কোন কালেই তাম্বুলের উপকরণ নয়।......তরল-মস্তিষ্ক বন্ধুপত্নীকে কিছুতেই এঁটে উঠতে না পেরে অত্যাচার-জর্জরিত নরনারায়ণ রায় ঠিক করলেন তাঁর বন্ধুর স্ত্রীটি একটু ছিটগ্রস্ত। বন্ধুর দুর্দশায় চঞ্চল রায় মনে মনে খুব খুশি হ'লেও বাইরে স্ত্রীকে বললেন —দু'দিনের জন্য এসেছে বেচারী, ওকে তুমি যে রকম বিব্রত ক'রে তুলেছ, ও আর কখনো এখানে আসবে না।

দিন-কয়েক এ রকমে কাটবার পর কীর্তি রায়ের আদেশে চঞ্চল রায়কে কি কাজে হঠাৎ গৌড়ে যাত্রা করতে হ'ল। নরনারায়ণ রায়ও বন্ধুপত্নী কখন কি ক'রে বসে, সেই ভয়ে দিনকতক সশঙ্ক অবস্থায় কালযাপন করবার পর নিজের বজ্‌রায় উঠে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। যাবার সময় লক্ষ্মী দেবী ব'লে দিলেন—এবার আবার যখন আসবে ভাই, এমন একটি বিশ্বাসী লোক সঙ্গে এনো যে রাত-দিন তোমার জিনিসপত্র ঘরে ব'সে চৌকি দেবে—বুঝলে তো?

নরনারায়ণ রায়ের বজ্‌রা রায়মঙ্গলের মোহানা ছাড়িয়ে যাবার একটু পরেই জল-দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হ'ল। তখন মধ্যাহ্নকাল, প্রখর রৌদ্রে বজ্‌রার দক্ষিণ দিকের দিগ্বলয়-প্রসারী জলরাশি শানানো তলোয়ারের মত ঝক্‌ঝক্‌ করছিল, সমুদ্রের সে অংশে এমন কোনো নৌকো ছিল না—যারা সাহায্য করতে আসতে পারে। সেটা রায়মঙ্গল আর কালাবদর নদীর মুখ, সামনেই বার সমুদ্র—সন্দ্বীপ চ্যানেল, জলদস্যুদের প্রধান ঘাঁটি। নরনারায়ণের বজ্‌রার রক্ষীরা কেউ হত হ'ল, কেউ সাংঘাতিক জখম হ'ল। নিজে নর-নারায়ণ দস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে উরুদেশে কিসের খোঁচা খেয়ে সংজ্ঞা-শূন্য হয়ে পড়লেন।

জ্ঞান হ'লে দেখতে পেলেন তিনি এক অন্ধকার স্থানে শুয়ে আছেন, তাঁর সামনে কি যেন একটা বড় নক্ষত্রের মতন জ্বলছে।......খানিকক্ষণ জোরে চোখের পলক ফেলবার পর তিনি বুঝলেন, যাকে নক্ষত্র ব'লে মনে হয়েছিল, তা প্রকৃতপক্ষে একটি অতি ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে আগত দিবালোক। নরনারায়ণ দেখলেন তিনি একটি অন্ধকার কক্ষের আর্দ্র মেজের ওপর শুয়ে আছেন, ঘরের দেওয়ালের স্থানে স্থানে সবুজ শেওলার দল গজিয়েছে।

আরো ক'দিন আরো ক'রাত কেটে গেল। কেউ তাঁর জন্যে কোন খাদ্য আনলে না। তিনি বুঝলেন, যারা তাঁকে এখানে এনেছে, তাঁকে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলাই তাদের উদ্দেশ্য। মৃত্যু! সামনে নির্মম মৃত্যু!......

সে দিনমানও কেটে গেল। আঘাত-জনিত ব্যথায় এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় অবসন্ন-দেহ নরনারায়ণের চোখের সামনে থেকে গবাক্ষ-পথের শেষ দিবালোক মিলিয়ে গেল।...... তিনি অন্ধকার ঘরের পাষাণ-শয্যায় ক্ষুধা-কাতর দেহ প্রসারিত ক'রে অধীরভাবে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগলেন।......প্রকৃতির একটা ক্লোরোফর্ম আছে, যন্ত্রণা পেয়ে মরছে এমন প্রাণীকে মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে বাঁচাবার জন্যে সেটা মুমূর্ষু প্রাণীকে অভিভূত করে। ধীরে ধীরে যেন সেই দয়াময়ী মৃত্যু-তন্দ্রা এসে তাঁকেও আশ্রয় করলে। অনেকক্ষণ পরে, কতক্ষণ পরে তা তিনি বুঝতে পারলেন না—হঠাৎ আলো চোখে লেগে তাঁর তন্দ্রাঘোর কেটে গেল। বিস্মিত নরনারায়ণ চোখ মেলে দেখলেন, তাঁর সামনে প্রদীপ-হস্তে দাঁড়িয়ে

তাঁর বন্ধু পত্নী লক্ষ্মী দেবী। কথা বলতে গিয়ে লক্ষ্মী দেবীর ইঙ্গিতে নরনারায়ণ থেমে গেলেন। লক্ষ্মী দেবী হাতের প্রদীপটি আঁচল দিয়ে ঢেকে নরনারায়ণকে তাঁর অনুসরণ করতে ইঙ্গিত করলেন। একবার নরনারায়ণের সন্দেহ হ'ল—এসব স্বপ্ন নয় ত? কিন্তু ঐ যে দীপশিখার উজ্জ্বল আলোয় আর্দ্র ভিত্তিগাত্রের সবুজ শেওলার দল স্পষ্ট দেখা যায়।......

নরনারায়ণ শক্তিমান যুবক, ক্ষুধায় দুর্বল হয়ে পড়লেও নিশ্চিত মৃত্যুর গ্রাস থেকে বাঁচবার উৎসাহে তিনি দৃঢ়পদে অগ্রবর্তিনী, ক্ষিপ্রগামিনী বন্ধুপত্নীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চললেন। একটা বক্রগতি পাথরের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে একটি দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পার হবার পর তিনি দেখলেন যে তাঁরা কীর্তি রায়ের প্রাসাদের সামনের খাল-ধারে এসে পৌঁছেছেন। লক্ষ্মী দেবী একটা ছোট বেতেবোনা থলি বার ক'রে তাঁর হাতে দিয়ে বললেন—এতে খাবার আছে, এখানে খেও না, তুমি সাঁতার জানো, খাল পার হয়ে ওপারে গিয়ে কিছু খেয়ে নাও, তারপর যত শীগ্‌গির পারো পালিয়ে যাও।

ব্যাপার কি নরনারায়ণ রায় একটু একটু বুঝলেন। তাঁর বিস্তৃত জমিদারী কীর্তি রায়ের জমিদারীর পাশেই এবং তাঁর অবর্তমানে কীর্তি রায়ই দনুজমর্দনদেবের বংশ-ধরদের ভবিষ্যৎ পত্তনিদার। অত বড় বিস্তৃত ভূসম্পত্তি সৈন্যসামন্ত কীর্তি রায়ের হাতে এলে তিনি কি আর কিছু গ্রাহ্য করবেন? কীর্তি রায় যে মাথা নাচু ক'রে আছেন, তার এই কি কারণ নয় যে, তাঁর একপাশে বাক্‌লা, চন্দ্রদ্বীপ—অন্যপাশে ভুলুয়ার প্রতাপশালী ভূঁইয়া রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য?

প্রদীপের আলোয় নরনারায়ণ দেখলেন, তাঁর বন্ধুপত্নীর মুখে সে চটুল হাস্যরেখার চিহ্নও নেই, তাঁর মুখখানি সহানুভূতিতে-ভরা মাতৃমুখের মতন স্নেহ-কোমল হয়ে এসেছে। তাঁদের চারিপাশে গাঢ় অন্ধকার, মাথার ওপর আকাশের বুক চিরে দিগন্ত-বিস্তৃত উজ্জ্বল ছায়াপথ, নিকটেই খালের জল জোর ভাঁটার টানে তীরের হোগলা গাছ দুলিয়ে কল্‌কল্‌ শব্দে বড় নদীর দিকে ছুটেছে।......নরনারায়ণ আবেগপূর্ণ সুরে জিজ্ঞাসা করলেন—বৌ-ঠাকরুণ, চঞ্চলও কি এর মধ্যে আছে?

লক্ষ্মী দেবী বললেন—না ভাই, তিনি কিছু জানেন না। এসব শ্বশুরঠাকুরের কীর্তি। এই জন্যে তাঁকে অন্য জায়গায় পাঠিয়েছেন, এখন আমার মনে হচ্ছে। গৌড়-টৌড় সব মিথ্যে।

নরনারায়ণ দেখলেন, লজ্জায় দুঃখে তাঁর বন্ধুপত্নীর মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। লক্ষ্মী দেবী আবার বললেন—আমি আজ জানতে পারি। খিড়কি গড়ের পাইক সর্দার আমায় মা বলে, তাকে দিয়ে দুপুর রাতের পাহারা সব সরিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। তাই ......

নরনারায়ণ বললেন—বৌ-ঠাকরুণ, আমার এক বোন ছেলেবেলায় মারা গিয়েছিল—তুমি আমার সেই বোন, আজ আবার ফিরে এলে।

লক্ষ্মী দেবীর পদ্মের মতন মুখখানি চোখের জলে ভেসে গেল। একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললেন—ভাই, বলতে সাহস পাইনে, তবুও একটা কথা বলছি—বোন ব'লে যদি রাখ......

নরনারায়ণ জিজ্ঞাসা করলেন—কি কথা বৌ-ঠাকরুণ?

লক্ষ্মী দেবী বললেন—তুমি আমার কাছে ব'লে যাও ভাই যে শ্বশুরঠাকুরের কোন অনিষ্ট-চিন্তা তুমি করবে না?

নরনারায়ণ রায় একটুখানি কি ভাবলেন, তারপর বললেন—তুমি আমার প্রাণ দিলে বৌ-ঠাকরুণ, তোমার কাছে ব'লে যাচ্ছি—তুমি বেঁচে থাকতে আমি তোমার শ্বশুরের কোন অনিষ্ট-চিন্তা করব না।

বিদায় নিতে গিয়ে নরনারায়ণ একবার জিজ্ঞাসা করলেন—বৌ-ঠাকরুণ, তুমি ফিরে যেতে পারবে তো?

লক্ষ্মী দেবী বললেন—আমি ঠিক যাব, তুমি কিন্তু যত দূর পার সাঁতরে গিয়ে তারপর ডাঙায় উঠে চ'লে যেও।

নরনারায়ণ রায় সেই ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে খালের জলে প'ড়ে মিলিয়ে গেলেন······

লক্ষ্মী দেবীর প্রদীপটা অনেকক্ষণ বাতাসে নিবে গিয়েছিল—তিনি অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে শ্বশুরের গড়ের দিকে ফিরলেন। একটু দূরে গিয়েই তিনি দেখতে পেলেন, পাশের ছোট খালটায় দু'খানা ছিপ মশালের আলোয় সজ্জিত হচ্ছে—ভয়ে তাঁর বুকের রক্ত জ'মে গেল—সর্বনাশ! এরা কি তবে জানতে পেরেছে? দ্রুতপদে অগ্রসর হয়ে গুপ্ত সুড়ঙ্গের মুখে এসে তিনি দেখলেন সুড়ঙ্গের পথ খোলাই আছে। তিনি তাড়াতাড়ি সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

কীর্তি রায় বুঝতেন নিজের হাতের আঙুলও যদি বিষাক্ত হয়ে ওঠে তো তাকে কেটে ফেলাই সমস্ত শরীরের পক্ষে মঙ্গল।······পরদিন আবার দিনের আলো ফুটে উঠল, কিন্তু লক্ষ্মী দেবীকে আর কোন দিন কেউ দেখেনি। রাতের হিংস্র অন্ধকার তাঁকে গ্রাস ক'রে ফেলেছিল।······

নরনারায়ণ রায় নিজের রাজধানীতে ব'সে সব শুনলেন—গুপ্ত সুড়ঙ্গের দু'ধারের মুখ বন্ধ ক'রে কীর্তি রায় তাঁর পুত্রবধূর শ্বাসরোধ ক'রে তাঁকে হত্যা করেছেন। শুনে তিনি চুপ ক'রে রইলেন।······এর কিছুদিন পরে তাঁর কানে গেল······বাশুন্তার লক্ষ্মণ রায়ের মেয়ের সঙ্গে শীঘ্র চণ্ডলের বিয়ে।

সেদিন রাত্রে চাঁদ উঠলে নিজের প্রাসাদ-শিখরে বেড়াতে বেড়াতে চারিদিকের শুভ্র সুন্দর আলোয় সাগরের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে দৃঢ়চিত্ত নরনারায়ণ রায়েরও চোখের পাতা যেন ভিজে উঠল। তাঁর মনে হ'ল তাঁর অভাগিনী বৌ-ঠাকুরাণীর হৃদয়-নিঃসারিত নিষ্পাপ অকলঙ্ক পবিত্র স্নেহের ঢেউয়ে সারা জগৎ ভেসে যাচ্ছে······মনে হ'ল, তাঁরই অন্তরের শ্যামলতায় জ্যোৎস্না-ধৌত বনভূমির অঙ্গে অঙ্গে শ্যামল-সুন্দর শ্রী···নীরব আকাশের তলে তাঁরই চোখের দুষ্ট হাসিটি তারায় তারায় নব-মল্লিকার মতন ফুটে উঠেছে।······নরনারায়ণ রায়ের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন দুর্ধর্ষ ভূম্যাধিকারী দস্যু—হঠাৎ পূর্বপুরুষের সেই বর্বর রক্ত নরনারায়ণের ধমনীতে নেচে উঠল, তিনি মনে মনে বললেন—আমার অপমান আমি এক রকম ভুলেছিলাম বৌ-ঠাকরুণ, কিন্তু তোমার অপমান আমি সহ্য করব না কখনও।

কিছুদিন কেটে গেল। তারপর একদিন এক শীতের ভোর রাত্রির কুয়াসা কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, কীর্তি রায়ের গড়ের খালের মুখ ছিপে. সুলুপে. জাহাজে ভ'রে গিয়েছে। তোপের আওয়াজে কীর্তি রায়ের প্রাসাদ দুর্গের ভিত্তি ঘন ঘন কেঁপে উঠতে লাগল। কীর্তি রায় শুনলেন, আক্রমণকারী নরনারায়ণ রায়, সঙ্গে দুরন্ত পর্তুগীজ জলদস্যু সিবাষ্টিও গঞ্জালেস্। উভয়ের সম্মিলিত বহরের চল্লিশখানা কোষা খালের মুখে চড়াও হয়েছে, পুরা বহরের বাকি অংশ বাহির নদীতে দাঁড়িয়ে।

এ আক্রমণের জন্য কীর্তি রায় পূর্ব থেকে প্রস্তুত ছিলেন—কেবল প্রস্তুত ছিলেন না নরনারায়ণের সঙ্গে গঞ্জালেসের যোগদানের জন্য। রাজা রামচন্দ্র রায় এবং রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যের সঙ্গে গঞ্জালেসের কয়েক বৎসর ধ'রে শত্রুতা চ'লে আসছে, এ অবস্থায় গঞ্জালেস্ যে তাঁদের পত্তনিদার নরনারায়ণ রায়ের সঙ্গে যোগ দেবে—এ কীর্তি রায়ের

কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ঘটনা। তা হ'লেও কীর্তি রায়ের গড় থেকেও তোপ চলল।

গঞ্জালেস্ সুদক্ষ নৌ-বীর। তার পরিচালনে দশখানা সুলুপ চড়া ঘুরে গড়ের পাশের ছোট খালে ঢুকতে গিয়ে কীর্তি রায়ের নওয়ারার এক অংশ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হ'ল। গড়ের কামান সেদিকে এত প্রখর যে খালের মুখে দাঁড়িয়ে থাকলে বহর মারা পড়ে। গঞ্জালেস্ দু'খানা কামান-বাহী সুলুপ ছোট খালের মুখে রেখে বাকিগুলো সেখান থেকে ঘুরিয়ে এনে চড়ার পিছনে দাঁড় করালে। গঞ্জালেসের অধীনস্থ অন্যতম জলদস্যু —মাইকেল রোজারিও ডি ভেগা এই ছোট বহর খালের মধ্যে ঢুকিয়ে গড়ের পশ্চিম দিক আক্রমণ করবার জন্যে আদিষ্ট হ'ল।

অতর্কিত আক্রমণে কীর্তি রায়ের নওয়ারা শত্রু-বহর কর্তৃক ছিপি-আঁটা বোতলের মতন খালের মধ্যে আটকে গেল—বার নদীতে গিয়ে যুদ্ধ দেবার ক্ষমতা তাদের আদৌ রইল না। তবুও তাদের বিক্রমে রোজারিও অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিছু ক'রে উঠতে পারলে না। কীর্তি রায়ের নৌ-বহর দুর্বল ছিল না, কীর্তি রায়ের গড় থেকে পর্তুগীজ জল-দস্যুদের আড্ডা সন্দ্বীপ খুব দূরে নয়, কাজেই কীর্তি রায়ের নৌ-বহর সুদৃঢ় ক'রে গড়তে হয়েছিল।

বৈকালের দিকে রোজারিওর কামানের মুখে গড়ের পশ্চিম দিকটা একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।......নরনারায়ণ রায় দেখলেন প্রায় ত্রিশখানা কোষা জখম অবস্থায় খালের মুখে প'ড়ে, কীর্তি রায়ের গড়ের কামানগুলো সব চুপ, নদীর দু'পাড় ঘিরে সন্ধ্যা নেমে আসছে। ঊর্ধ্বে নিস্তব্ধ নীল আকাশে কেবলমাত্র এক ঝাঁক শকুনি কীর্তি রায়ের গড়ের উপর চক্রাকারে ঘুরছে......হঠাৎ বিজয়োন্মত্ত নরনারায়ণ রায়ের চোখের সম্মুখে বন্ধু-পত্নীর বিদায়ের রাতের সন্ধ্যার পদ্মের মতন বিষাদভরা ম্লান মুখখানি, কাতর মিনতিপূর্ণ সেই চোখ দুটি মনে পড়ল—তীব্র অনুশোচনায় তাঁর মন তখনি ভরে উঠল।......তিনি করেছেন কি! এই রকম করে কি তিনি তাঁর স্নেহময়ী প্রাণদাত্রীর শেষ অনুরোধ রাখতে এসেছেন?......

নরনারায়ণ রায় হুকুমজারি করলেন—কীর্তি রায়ের পরিবারের এক প্রাণীরও যেন প্রাণহানি না হয়।

একটু পরেই সংবাদ এল, গড়ের মধ্যে কেউ নেই। নরনারায়ণ রায় বিস্মিত হলেন। তিনি তখনি নিজে গড়ের মধ্যে ঢুকলেন। তিনি এবং গঞ্জালেস্ গড়ের সমস্ত অংশ তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন—দেখলেন সত্যিই কেউ নেই। পর্তুগীজ বহরের লোকেরা গড়ের মধ্যে লুঠপাট করতে গিয়ে দেখলে মূল্যবান দ্রব্যাদি বড় কিছু নেই। পরদিন দ্বিপ্রহর পর্যন্ত লুঠপাট চলল......কীর্তি রায়ের পরিবারের এক প্রাণীরও সন্ধান পাওয়া গেল না। অপরাহ্নে কেবলমাত্র দু'খানা সুলুপ খালের মুখে পাহারা রেখে নরনারায়ণ রায় ফিরে চলে গেলেন।

এই ঘটনার দিনকয়েক পরে, পর্তুগীজ জলদস্যুর দল লুঠপাট ক'রে চ'লে গেলে, কীর্তি রায়ের এক কর্মচারী গড়ের মধ্যে প্রবেশ করে। আক্রমণের দিন সকালেই এ লোকটি গড় থেকে আরও অনেকের সঙ্গে পালিয়েছিল। ঘুরতে ঘুরতে একটা বড় থামের আড়ালে সে দেখতে পেলে একজন আহত মুমূর্ষু লোক তাকে ডেকে কি বলবার চেষ্টা করছে। কাছে গিয়ে সে লোকটাকে চিনলে—লোকটি কীর্তি রায়ের পরিবারে এক বিশ্বস্ত পুরনো কর্মচারী। তাঁর মৃত্যুকালীন অস্পষ্ট বাক্যে আগন্তুক কর্মচারীটি মোটামুটি যা বুঝলে, তাতেই তার কপাল ঘেমে উঠল। সে বুঝলে কীর্তি রায় তাঁর পরিবারবর্গ এবং ধনরত্ন নিয়ে মাটির নীচের এক গুপ্তস্থানে আশ্রয় নিয়েছেন এবং এই লোকটিই একমাত্র তার

সন্ধান জানে। তখনকার আমলে এই গুপ্ত গৃহগুলি প্রায় সকল বাড়ীতেই থাকত এবং এর ব্যবস্থা এমন ছিল যে বাইরে থেকে কেউ এগুলো না খুলে দিলে তা থেকে বেরুবার উপায় ছিল না।......কোথায় সে মাটির নীচে ঘর, তা স্পষ্ট ক'রে বলবার আগেই আহত লোকটি মারা গেল। বহু অনুসন্ধানেও গড়ের কোন্ অংশে সে গুপ্ত-গৃহ ছিল তা কেউ সন্ধান করতে পারলে না।

এই রকমে কীর্তি রায় ও তাঁর পরিবারবর্গ অনাহারে তিলে তিলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গড়ের যে কোন্ নিভৃত ভূগর্ভস্থ কক্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন, তার আর কোন সন্ধানই হল না......সেই বিরাট প্রাসাদ-দুর্গের পর্বতপ্রমাণ মাটি-পাথরের চাপে হতভাগ্যদের সাদা হাড়গুলো কোন্ বায়ুশূন্য অন্ধকার ভূ-কক্ষে তিলে তিলে গুঁড়ো হচ্ছে, কেউ তার খবর পর্যন্ত জানে না।

ওই ছোট খালটা প্রকৃতপক্ষে সন্দ্বীপ চ্যানেলেরই একটা খাড়ি। খাড়ির ধার থেকে একটুখানি গেলে গভীর অরণ্যের ভিত কীর্তি রায়ের গড়ের বিশাল ধ্বংসস্তূপ এখনও বর্তমান আছে দেখা যাবে। খাল থেকে কিছু দূরে অরণ্যের মধ্যে দুই সার প্রাচীন বকুল গাছ দেখা যায়, এখন এ বকুল গাছের মধ্যে দুর্ভেদ্য জঙ্গল আর শুলোকাঁটার বন, তখন এখানে রাজপথ ছিল। আর খানিকটা গেলে একটা বড় দীঘি চোখে পড়বে। তারই দক্ষিণে কুচো ইঁটের জঙ্গলাবৃত স্তূপে অর্ধ-প্রোথিত হাঙ্গর-মুখো পাথরের কড়ি, ভাঙ্গা থামের অংশ—বারভুঁইয়াদের বাংলা থেকে, রাজা প্রতাপাদিত্য রায়ের বাংলা থেকে, বর্তমান যুগের আলোয় উঁকি মারছে। দীঘির যে ইষ্টক সোপানে সকাল-সন্ধ্যায় তখন অতীত যুগের রাজবধূদের রাঙা পায়ের অলক্তক রাগ ফুটে উঠত, এখন সেখানে দিনের বেলায় বড় বড় বাঘের পায়ের থাবার দাগ পড়ে, গোখুরা-কেউটে সাপের দল ফণা তুলে ঘুরে বেড়ায়।

বহুদিন থেকেই এখানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে থাকে। দুপুর রাতে গভীর বন-ভূমি যখন নীরব হয়ে যায়, হিন্তাল হিজল গাছের কালো গুঁড়িগুলো অন্ধকারে যখন বনের মধ্যে প্রেতের মত দাঁড়িয়ে থাকে......সন্দ্বীপ চ্যানেলের জোয়ারের ঢেউয়ের আলোকোৎক্ষেপী লোনা জল খাড়ির মুখে জোনাকির মতন জ্বলতে থাকে......তখন খাল দিয়ে নৌকো বেয়ে যেতে যেতে মোম-মধু সংগ্রাহকেরা কতবার শুনেছে, অন্ধকারে বনের এক গভীর অংশ থেকে কারা যেন আর্তস্বরে চীৎকার করছে—ওগো পথযাত্রীরা ওগো নৌকাযাত্রীরা......আমরা যে এখানে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেলাম......দয়া করে আমাদের তোল......ওগো আমাদের তোল......

ভয়ে বেশী রাত্রে এ-পথে কেউ নৌকো বাইতে চায় না।

প্রবাসী. আষাঢ়, ১৩৩১

বউ-চণ্ডীর মাঠ

গ্রামের বাঁওড়ের মধ্যে নৌকো ঢুকেই জল-ঝাঁঝির দামে আটকে গেল।

কানুনগো হেমেনবাবু বললেন—বাব্‌লা গাছটার গায়ে কাছি জড়িয়ে বেঁধে নাও......

বাইরের নদীতে ভাঁটার টান ধরেছে, নাটা-কাঁটার ঝোপের নীচের জল সরে গিয়ে একটু একটু করে কাদা বার হচ্ছে।

হেমেনবাবু বললেন—একটুখানি নেমে দেখবেন না কোথায় পিন খোলা হয়েছে? যত শীগ্‌গির খানাপুরীটা শেষ হয়ে যায়......

এমন সুন্দর বিকালটাতে আর কাজ করতে ইচ্ছা হ'ল না। পিছনের নৌকো থেকে

লোকজনেরা নেমে জায়গা ঠিক ক'রে সেখানে তাঁবু ফেলবে। জরিপের বড় সাহেবের শীগ্‌গির সদর থেকে আসবার কথা আছে, কাজেই যত তাড়াতাড়ি কাজ আরম্ভ হয়, সকলের সেই দিকে ঝোঁক। সাব ডেপুটি নৃপেনবাবু কাজ শেখবার জন্যে এইবার প্রথম খানাপুরীর কাজে এসেছিলেন। বয়স বেশী না, ছোকরা—কিন্তু মাঝনদীতে নৌকা দুললেই তাঁর অত্যন্ত ভয় হচ্ছিল। বোধ হয় ভয়কে ফাঁকি দেবার জন্যেই তিনি এতক্ষণ ছই-এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বার ভান ক'রে শুয়েছিলেন—এবার ডাঙ্গায় নৌকো লাগাতে তিনি ছই-এর ভেতর থেকে বার হয়ে এলেন এবং একটু পরে হেমেনবাবুর সঙ্গে কথায় কথায় কি নিয়ে বেশ একটু তর্ক শুরু করলেন।

নৃপেনবাবুকে বললুম—Tenancy Act কচ্‌কচিতে আর দরকার নেই, তার চেয়ে বরং চলুন নেমে তাঁবুর জায়গা ঠিক করা যাক—কাল সকালেই যাতে কাজ আরম্ভ করা যায়……

চৈত্র মাস যায় যায়। গ্রাম্য নদীটির দু'পাড় ভ'রে সবুজ লতানো গাছে নীল-পাপড়ি বন-অপরাজিতা ফুল ফুটে আছে। বাঁশ-ঝাড় কোথাও জলের ধারে নত হয়ে পড়েছে, তলায় আকন্দ ঘেঁটু ফুলের বন ফুলের ডালি মাথায় নিয়ে ঝিরঝিরে বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে। দু'ধারের রোদ-পোড়া কটা ঘাসওয়ালা মাঠের মাঝে মাঝে পত্র-বিরল বাব্‌লা গাছে গাঙ-শালিকের ঝাঁক কিচ্‌কিচ্‌ কচ্ছে—নদীর বাঁ পাড়ের গায়ে গর্তের মধ্যে তাদের বাসা। মাকাল-লতার ঝোপের তলায় জলের ধারে কোথাও উঁচু উঁচু বন-মুলোর ঝাড়, তাদের কুচো কুচো হলদে ফুল থেকে জায়ফলের মত একটা ঘন গন্ধ উঠছে।……

বেলা আর একটু পড়লে আমরা সেই বাঁওড়ের ধারের মাঠে তাঁবুর জায়গা কোথায় ঠিক হবে দেখতে গেলুম। নদীর ধার থেকে গ্রাম একটু দূরে হ'লেও গ্রামের মেয়েরা নদীতেই জল নিতে আসে। আমাদের যেখানে নৌকোখানা বাঁধা হয়েছিল, তার বাঁ-ধারে খানিকটা দূরে মাটিতে ধাপ কাটা কাঁচা ঘাট। গ্রামের একজন বৃদ্ধ বোধ হয় নদীতে গ্রীষ্মের দিনের বৈকালে স্নান করতে আসছিলেন, তাঁকে আমরা জিজ্ঞাসা করলুম—রসুলপুর কোন্ গাঁ-খানার নাম মশাই? সামনের এটা, না ওই পাশে?

তিনি বললেন—আজ্ঞে না, এটা হ'ল কুমুরে, পাশের ওটা আমডাঙ্গা—রসুলপুর হ'ল এ গাঁ-গুলোর পেছনে, কোশ দুই তফাৎ—আপনারা?

আমাদের পরিচয় শুনে বৃদ্ধ বললেন—এই মাঠটাতেই আপনারা তাঁবু ফেলবেন? আপনাদের জরিপের কাজ শেষ হ'তেও তো পাঁচ ছয় মাস……

আমরা বললুম—তা তো হবেই, বরং তার বেশী……

বৃদ্ধ বললেন—এখানটা একটা ঠাকুরের স্থান, গাঁয়ের মেয়েরা পুজো দিতে আসে, বরং আর একটু সরে গিয়ে নদীর মুখের দিকে তাঁবু ফেলুন, নইলে মেয়েদের একটু অসুবিধে……

বৃদ্ধের নাম ভুবন চক্রবর্তী। জরিপ আরম্ভ হয়ে গেলে নিজের দরকারে চক্রবর্তী মশায় দলিল-পত্র বগলে অনেকবার তাঁবুতে যাতায়াত শুরু ক'রে দিলেন, সকলের সঙ্গে তাঁর বেশ মেশামেশি ও আলাপ পরিচয় হয়ে গেল। তাঁর পৈতৃক জমা-জমি অনেকে নাকি ফাঁকি দিয়ে দখল করেছে, আমাদের সাহায্যে এবার যদি সেগুলোর একটা গতি হয়—এই সব ধরণের কথা তিনি আমাদের প্রায়ই শোনাতেন।

আমি সেখানে বেশীদিন ছিলুম না। খানাপুরীর কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, আমি সেদিনই জেলায় ফিরব—জোয়ারের অপেক্ষায় নৌকা ছাড়তে দেরী হ'তে লাগল। চক্রবর্তী মশায়ও সেদিন উপস্থিত ছিলেন। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলুম, এটাকে বউ-চণ্ডীর মাঠ বলে কেন চক্কত্তি মশাই? আপনাদের কি কোন……

নৃপেনবাবুও বললেন—ভাল কথা, বলুন তো চক্কত্তি মশাই, বউ-চন্ডী আবার কি কথা—শুনিনি তো কখনো!

আমাদের প্রশ্নের উত্তরে চক্রবর্তী মশায়ের মুখে একটা অদ্ভুত গল্প শুনলুম। তিনি বলতে লাগলেন—শুনুন তবে, এটা সেকালের গল্প। ছেলেবেলায় আমার ঠাকুরমার কাছ থেকে শোনা। এ অঞ্চলের অনেক প্রাচীন লোক এ গল্প জানে।

সেকালে এ গ্রামে এক ঘর সম্পন্ন গৃহস্থ বাস করতেন। এখন আর তাঁদের কেউ নেই, তবে আমি যে সময়ের কথা বলছি সে সময় তাঁদের বড় শরিক পতিতপাবন চৌধুরী মহাশয়ের খুব নামডাক ছিল।

এই পতিতপাবন চৌধুরী মহাশয় যখন তৃতীয় পক্ষের বিয়ে ক'রে বউ ঘরে আনলেন, তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গিয়েছে। এমন যে বিশেষ বয়স তা নয়, বিশেষতঃ ভোগের শরীর—পঞ্চাশ বছর বয়স হ'লেও চৌধুরী মহাশয়কে বয়সের তুলনায় অনেক ছোট দেখাত। বউ দেখে বাড়ীর সকলেই খুব সন্তুষ্ট হ'ল। তৃতীয় পক্ষের বিয়ে ব'লে চৌধুরী মশায় একটু ডাগর মেয়ে দেখেই বিয়ে করেছিলেন, নতুন বউয়ের বয়স ছিল প্রায় সতেরোর কাছাকাছি। বউয়ের মুখের গড়নটি বড় সুন্দর, মুখের ছাঁচ যেন হরতনের টেক্কাটির মত। চোখ দুটি বেশ ডাগর, ভাসা ভাসা মুখে চোখে ভারি একটা শান্ত ভাব। নতুন বউয়ের কাজ-কর্ম আর ধীর শান্ত ভাব দেখে পাড়ার লোকে বললে, এ রকম বউ এ গাঁয়ে আর আসেনি। সে মাটির দিকে চোখ রেখে ছাড়া কথা বলে না, অল্প বয়সের খুড়-শাশুড়ী দলের সামনেও ঘোমটা দেয়; সকলে বললে, যেমন লক্ষ্মীর মত রূপ তেমনই গুণ।

মাস দুই-তিন পরে কিন্তু একটা বড় বিপদ ঘটল। সকলে দেখলে বৌটির আর সব ভাল বটে, একটা কিন্তু বড় দোষ। সে কিছুতেই স্বামীর ঘেঁষ নিতে চায় না, প্রাণপণে এড়িয়ে চলতে চায়। প্রথম প্রথম সকলে ভেবেছিল, নতুন বিয়ে হয়েছে, ছেলেমানুষ, বোধহয় সেই জন্যই এ রকম করে! ক্রমে কিন্তু দেখা গেল, স্বামী কেন, যে কোন পুরুষ-মানুষ দেখলেই সে কেমন যেন ভয়ে কাঁপে। বাড়ীতে যেদিন যজ্ঞি কি কোন বড় কাজ-কর্মে বাইরের লোকের ভিড় হয়, সেদিন সে ঘর থেকে আর বারই হয় না। স্বামীর ঘরে কিছুতেই তো যেতে রাজী হয় না, মাসে দু'দিন কি একদিন সকলে আদর ক'রে গায়ে হাত বুলিয়ে পাঠাতে যায়, সে জনেজনের পায় প'ড়ে, এর-ওর কাছে কাকুতি মিনতি ক'রে, কিছুতেই বুঝ মানে না। পুরুষ মানুষের গলার স্বর শুনলেই কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে পড়ে।

অনেক ক'রে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সকলে তাকে একদিন স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে দোরে শিকল বন্ধ করে দিল। চৌধুরী মশায় অনেক রাত্রে ঘরে ঢুকে দেখেন, তাঁর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ঘরের এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে ভয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে। এর পর আর কিছুতেই কোন দিন সে স্বামীর ঘরে যেতে চাইত না, বাড়ী সুদ্ধ লোকের হাতে পায়ে প'ড়ে বেড়াতে লাগল; সকলকে বলে—আমার বড্ড ভয় করে, আমায় ওরকম ক'রে আর পাঠিও না……তোমাদের পায়ে পড়ি।……

বোঝাতে বোঝাতে বাড়ীর লোকে হয়রান হয়ে গেল।

দিনকতক গেল, একদিন তাকে সকলে মিলে জোর ক'রে স্বামীর ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বার থেকে দোর বন্ধ ক'রে দিলে। তারা ঠিক করলে এই রকম দিতে দিতে ক্রমে লজ্জা ভাঙ্গবে—নইলে কতদিন আর এ ন্যাকামি ভাল লাগে?……ভোরে উঠে সকলে দেখলে ঘরের মধ্যে বউ নেই, বাড়ীর কোথাও নেই। নিকটেই বাপের বাড়ীর গাঁ, সেখানে পালিয়ে

গিয়েছে ভেবে লোক পাঠানো গেল। লোক ফিরে এল, সে সেখানে যায়নি। তখন সকলে বললে—পুকুরে ডুবে মরেছে ; পুকুরে জাল ফেলা হয়, কোন সন্ধান মেলে না। বউয়ের কচি মুখের ও নিরীহ চোখের ভাব মনে হয়ে লোকের মনে অন্য কোন সন্দেহ জাগবার অবকাশ পেল না। কত দিকে কত সন্ধান ক'রে যখন কোন খোঁজই মিলল না, চৌধুরী মশায় মানসিক শোক নিবারণ করবার জন্যে চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী ঘরে আনলেন।

অজ পাড়া-গাঁ, নতুন কিছু একটা বড় ঘটে না, অনেকদিন এটা নিয়ে নাড়াচাড়া চলল। তারপর ক্রমে সেটা কেটে গিয়ে গ্রাম ঠাণ্ডা হ'ল। এই মাঠের পূবধারে গ্রামের মধ্যেই চৌধুরীদের বাড়ী ছিল। তখন এইখান দিয়েই নদীর স্রোত বইত—মজে বাঁওড় হয়ে গিয়েছে তো সেদিন, আমরা ছেলেবেলাতেও ধান বোঝাই নৌকা চলাচল হ'তে দেখেছি। ক্রমে চৌধুরীদের সব ম'রে হেজে গেল, শেষ পর্যন্ত বংশে একজন কে ছিল, উঠে গিয়ে অন্য কোথাও বাস করলে। এ সব অনেক বছর আগেকার কথা, সত্তর-আশী বছর খুব হবে। সেই থেকে কিন্তু আজ পর্যন্ত এই সব মাঠে বড় এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে শোনা যায়।

এই ফাল্গুন চৈত্র মাসে যখন খুব গরম পড়ে, তখন রাখালেরা গরু চরাতে এসে দূর থেকে কতদিন দেখেছে, মাঠের ধারে বনের মধ্যে নিভৃত দুপুরে বাঁশবনের ছায়ায় কে যেন শুয়ে আছে, কাছে গেলে কেউ কখনো দেখতে পায়নি।......কতদিন সন্ধ্যার সময় তারা গরুর দল নিয়ে গ্রামের মধ্যে যেতে যেতে শুনেছে, অন্ধকার ঝোপের মধ্যে যেন একটা চাপা কান্নার রব উঠছে।......সমুখ জ্যোৎস্না রাত্রে অনেকে নদীর ঘাট থেকে ফেরবার পথে ছাতিম গাছের নীচু ডালের তলা দিয়ে যেতে যেতে দেখেছে, দূর মাঠে সন্ধ্যার আবছায়া জ্যোৎস্নার মধ্যে দিয়ে সাদা কাপড় প'রে কে যেন ক্রমেই দূরে চ'লে যাচ্ছে—তার সমস্ত গায়ের সাদা কাপড়ে জ্যোৎস্না প'ড়ে চিক্‌মিক্ করতে থাকে।......মাঠে যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, তখন ফুলেভরা নাগকেশর গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ভাল ক'রে দেখলে মনে হয়, কে খানিকটা আগে এইখানে দাঁড়িয়ে ডাল নীচু ক'রে ফুল পেড়ে নিয়ে গিয়েছে......তার ছোট ছোট পায়ের দাগ, ঝোপ যেখানে বড় ঘন সেদিকেই চ'লে গিয়েছে।......

মাঠের ধারে এই ছাতিম গাছের তলায় উলো-চণ্ডীতলা। চৈত্র সংক্রান্তিতে গ্রামবধূরা পিঠে, কাঁচা দুধ আর নতুন আখের গুড় নিয়ে বউ-চণ্ডীর পুজো দিতে আসে। বউ-চণ্ডী সকলের মঙ্গল করেন, অসুখ হ'লে সারিয়ে দেন, নতুন প্রসূতির স্তনে দুধ শুকিয়ে গেলে, ওঁর কাছে পুজো দিলে আবার দুধ হয়। কচি ছেলের সর্দি সারে, ছেলে বিদেশে থাকবার সময় চিঠি আসতে দেরী হ'লে পুজো মানত করবার পরই শীগ্‌গির সুসংবাদ আসে। মেয়েদের বিপদে-আপদে তিনিই সকলকে বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার ক'রে থাকেন।......

চক্রবর্তী মহাশয়ের গল্প শেষ হ'ল। তারপর আরও নানা কথাবার্তার পর তিনি ও আর সকলে উঠে চ'লে গেলেন।

বেলা বেশ প'ড়ে এসেছে। সন্ধ্যার বাতাসে ছাতিম বনে সুর্ সুর্ শব্দ হচ্ছে। গ্রামের মাঠটা অনেকদূর পর্যন্ত উঁচু-নীচু ঢিবি আর ঘেঁটু ফুলের বনে একেবারে ভরা। বাঁদিকে দূরে একটা পুরনো ইটের পাঁজার খানিকটা ঘন জিউলি গাছের সারির মধ্যে দিয়ে চোখে পড়ে।

নৌকোর গলুই-এ ব'সে আসন্ন সন্ধ্যায় আশী বছর আগেকার পলাতকা গ্রাম্য-বধূর ইতিহাসটা ভাবতে লাগলুম। মাঠের মাঝে উঁচু ঢিবির ওপরকার ঘেঁটু ফুলের ঘন বনের দিকে চেয়ে মনে হ'ল যে—সারা দিনমান সে হয়ত ওর মধ্যে লুকিয়ে ব'সে থাকে, কেবল গভীর রাত্রে লুকোনো জায়গা থেকে বেরিয়ে আসে, মাঠের মধ্যের বটগাছের তলায় চুপ

ক'রে ব'সে আকাশের তারার দিকে চায়।......পাশের ঝোপের ফুটন্ত বন অপরাজিতা ফুলের রংএর সঙ্গে রং মিলিয়ে নদী ব'য়ে যায়......ছাতিম বনের পাখীরা ঘুমের ঘোরে গান গেয়ে ওঠে—ওপার থেকে হু-হু ক'রে হাওয়া বয়......সে ভয়ে ভয়ে মাঝে মাঝে পূব দিকে চেয়ে দেখে ভোরের আলো ফোটবার দেরী কত!......

সন্ধ্যা হয়ে গেল। বনের ওপর নবমীর চাঁদ উঠল। একটু পরেই জোয়ার পেয়ে আমাদের নৌকা ছাড়া হ'ল। জলের ধারের আধার-ভরা নিভৃত ঝোপের মধ্য থেকে সত্যিই যেন একটা চাপা কান্নার রব পাওয়া যাচ্ছিল--সেটা হয়ত কোন রাত-জাগা বনের পাখীর, কি কোন পতঙ্গের ডাক।

বাঁওড়ের মুখ পার হয়ে যখন আমরা বাইরের নদীতে এসে পড়েছি, তখন পিছন ফিরে চেয়ে দেখি নির্জন গ্রামের মাঠে সাদা কুয়াসায় ঘোমটা দেওয়া ঝাপ্সা জ্যোৎস্না রাত্রি অল্পে অল্পে লুকিয়ে চোরের মত আত্মপ্রকাশ করছে, অনেককাল আগেকার সেই লজ্জা-কুণ্ঠিতা ভীরু পল্লীবধূটির মত!......

বিচিত্রা, শ্রাবণ ১৩৩৪

আরক

লাহোর মিউজিয়ামে যখন চাকরী করতাম সে সময় লাহোরের বিখ্যাত "দেশবন্ধু" কাগজের সম্পাদক বিনায়ক দত্ত সিং মহাশয়ের সঙ্গে আমার যথেষ্ট আলাপ হয়। মিঃ সিং প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, তাঁদের আদি বাসভূমি পাঞ্জাবে নয়, রাজপুতানার কোটা রাজ্যে তিনপুরুষ পূর্বে তাঁর পিতামহ রাজকার্য উপলক্ষে এসে পাঞ্জাবে বাস করেন, সেই থেকেই তাঁরা দেশছাড়া। সন্ধ্যার পরে তাঁর বৈঠকখানায় গিয়ে বসতাম এবং দেওয়ালে টাঙানো পুরানো আমলের বর্ম, কুঠার, পতাকা, বল্লম প্রভৃতি রাজপুরে যুদ্ধাস্ত্র সম্বন্ধে নানা ইতিহাস ও আলোচনা শুনতে বড় ভালো লাগতো। রাজপুতানার, বিশেষ করে কোটা রাজ্যের ইতিহাস সম্বন্ধে মিঃ সিংয়ের জ্ঞান খুবই গভীর।

কিন্তু এ-সকল কথা নয়। আমি একটা আশ্চর্য ঘটনা বলবো। মিঃ বিনায়ক দত্ত সিংয়ের মত সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত লোকের মুখে না শুনলে আমিও এ কাহিনী হেসে উড়িয়ে দিতাম।

একদিন শীতকালে সন্ধ্যার পরে মিঃ সিংয়ের বৈঠকখানায় গিয়ে বসেচি। ভীষণ শীত সেদিন। দুপেয়ালা গরম চা পানের পর তাওয়ার তামাক টানচি (মিঃ সিং ধূম-পানে অভ্যস্ত নন)। হঠাৎ কি মনে করে জানিনে, আমি তাঁকে বল্লাম—মিঃ সিং, আপনি অপদেবতায় বিশ্বাস করেন?

মিঃ সিং একটু চিন্তা করে বল্লেন—হ্যাঁ, করি।

—দেখেচেন ভূতটুত?

মিঃ সিং গম্ভীর সুরে বল্লেন—না, এ আমার কথা নয়। আমার ছোট ঠাকুরদাদার জীবনের ঘটনা। যদি এ ঘটনা না ঘটতো আমাদের বংশে, তবে আজও আমরা কোটা রাজ্যে মস্ত বড় খানদানি তালুকদার হয়ে থাকতে পারতাম। লাহোরে এসে চাকরি করতে হ'ত না। সে বড় আশ্চর্য ঘটনা।

—আমি বল্লাম—কি রকম?

—শুনুন তবে। আমার ছোট ঠাকুরদা আমার পিতামহের আপন ভাই নন, বৈমাত্র ভাই। তিনি মস্ত বড় সৌখীন মানুষ ছিলেন—আর ছিলেন খুব সুপুরুষ।

আমি বিনায়ক দত্ত সিংহের দীর্ঘ, গৌরবর্ণ, বলিষ্ঠ দেহের দিকে চেয়ে সে কথা অবিশ্বাস করতে পারলাম না।

তারপর তিনি বলে যেতে লাগলেন—আমি যখন তাঁকে দেখেচি, তখন আমার বয়স খুব কম। কিন্তু তিনি তখন বদ্ধ উন্মাদ!—এক দম। কেন তিনি উন্মাদ হ'লেন, সেই ইতিহাসের মূলেই এই গল্প। তিনি উন্মাদ হওয়াতে কোটা রাজদরবারের আইন অনুসারে তাঁর ভাগের সমস্ত সম্পত্তি আমাদের হাতছাড়া—সে কথা যাক্ গে। আসল গল্পটা বলি—

বিনায়ক দত্ত সিং তাঁর অনবদ্য উর্দুতে সমস্ত গল্পটা বলে গেলেন। মধ্যে মধ্যে আমি তাঁকে নানা প্রশ্ন করেছিলুম, সে সব বাদ দিয়ে শুধু গল্পটাই আমার নিজের ভাষায় প্রকাশ করলাম।

আমাদের গ্রাম থেকে কিছুদূরে কোটা দরবারের একটা সৈন্যদের আড্ডা ছিল। আমার ঠাকুরদাদা সেই সৈন্যদের আড্ডায় মাঝে মাঝে যেতেন—মদ খেয়ে স্ফূর্তি করতে। তাঁর দু'একজন বন্ধু সেখানে ছিল, তাদের সঙ্গের নেশাতেই সেখানে যাওয়া! একবার জ্যোৎস্নারাত্রে তিনি আর তাঁর দুই বন্ধু খেয়ালের মাথায় বরী নদীতে স্নান করতে যাবেন বলে ঘোড়ায় করে বেরুলেন।

বরী নদী মরুভূমির মধ্য দিয়ে তিন শাখায় ভাগ হয়ে সাবলীল গতিতে বয়ে গিয়েচে। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন এই ত্রিস্রোতা নদীর প্রথম ধারাটিতে আদৌ জল ছিল না, মাঝের শাখাটিতে হাঁটুখানেক জল—তারপর মাইলটাক বিস্তৃত চড়া—তার ওপারে আসল ধারা, অনেকখানি জল তা'তে।

যাবার পথে একজন বন্ধুর খেয়াল হ'ল তিনি প্রথম ধারার বালির ওপর ঘোড়া থেকে নেমে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়লেন—আর কিছুতেই উঠতে চাইলেন না। বাকি বন্ধুটি আর আমার ঠাকুরদাদা অগত্যা তাঁকে সেখানেই বালুশয্যায় শায়িত অবস্থায় ফেলে চল্লেন এগিয়ে। বলা বাহুল্য, তিনজনের মধ্যে কেউই ঠিক প্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিলেন না।

আমার ঠাকুরদাদা বড় ধারা অর্থাৎ আসল বরী নদীর কাছে এসে পেছন ফিরে চেয়ে দেখলেন তাঁর বন্ধুটি ঘোড়া থামিয়ে বালির চড়ার পশ্চিম দিকে ভীত ও বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন।. ঠাকুরদাদা বল্লেন—ওদিকে কি দেখচ চেয়ে?

বন্ধু মুখে কিছু না বলে সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখালে আর ইঙ্গিতে ঠাকুরদাদাকে চুপ করে থাকতে বল্লে। ঠাকুরদা চেয়ে দেখলেন বালুর চড়ার ঠিক মাঝখানে অস্পষ্ট ধরণের কতকগুলি মনুষ্যমূর্তি—চক্রাকারে ঘুরচে! কিছুক্ষণ চেয়ে দেখে মনে হ'ল ওরা যেই হোক্, হাত ধরাধরি করে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করচে। সেই নির্জন স্থানে রাত্রিকালে কাদের এমন আমোদ লেগেচে যে লোকচলাচলের অন্তরালে নৃত্য করতে যাবে বুঝতে না পেরে তাঁরা দু'জনেই অবাক হয়ে রইলেন। কাছে কেউ কেন গেলেন না, সে কথা আমি বলতে পারব না, কারণ, শুনি নি। হয়তো এ'দের মত্ত অবস্থাই সব দৃশ্যটার জন্য দায়ী. এই ভেবে তাঁরাও কাউকে কথাটা বলেনও নি সেই সময়।

এর পরে আরও বছর তিনেক কেটে গেল।

ত্রিস্রোতা বরী নদীর প্রধান স্রোতোধারার তিন মাইল উত্তরে মরুভূমির মধ্যে একটা বড় লবণাক্ত জলের হ্রদ আছে. এর নাম 'নাহারা নিপট' অর্থাৎ ব্যাঘ্র হ্রদ। এই হ্রদের দূরে দূরে এ'কেবেঁকে প্রায় চারিদিক থেকে বেষ্টন করে পাহাড়শ্রেণী—এই পাহাড়শ্রেণী কোথাও হাজার ফুট উ'চু, কোথাও তার চেয়ে কিছু বেশী উ'চু। হ্রদ ও পাহাড় থেকে খনিজ লবণ পাওয়া যায় বলে কোটা দরবার থেকে মাঝে মাঝে এর ইজারা দেওয়া হ'ত

ব্যবসাদারদের।

আমার ঠাকুরদাদা পূর্বোক্ত ঘটনার প্রায় তিন বছর পরে একদিন এই হ্রদের জলে বালি-হাঁস শিকার করতে যাবেন ঠিক করলেন। গভীর রাত্রে বালি-হাঁসের দল হ্রদের জলে দলে দলে চরে' বেড়ায়, একথা তিনি শুনেছিলেন। একটা ঘাসের লতাপাতার ছোট্ট ঝুপড়ি বেঁধে তিনি তার মধ্যে লুকিয়ে থাকবেন দিনমান থেকে—কারণ মানুষ দেখলে হাঁসের দল আর নামবে না।

সব ঠিকঠাক হ'ল, কিন্তু দু'একজন বৃদ্ধলোক নিষেধ করলে, রাত্রিকালে নাহারা হ্রদের ত্রিসীমানাতেও যাওয়া উচিত নয়। কেন, তারা স্পষ্ট করে কিছু বল্লে না—শুধু বল্লে জায়গাটা ভালো নয়! ভৈজি নামে একজন বৃদ্ধ ভীল আমাদের প্রজা ছিল, সে বল্লে,—কোটা দরবারের নিমক মহালের ইজারাদার এক বেনিয়ার সে চাকর ছিল তার যৌবন বয়সে। উক্ত বেনিয়ার লবণের গুদাম আর আড়ৎ ছিল নাহারা হ্রদের পাড় থেকে মাইল খানেক দূরে পাহাড়ের কোলে। সে সময় সে দেখেচে হ্রদের ওপর আকাশ হঠাৎ গভীর রাত্রে যেন দিনের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠলো—কেমন যেন অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে হ্রদের জলে। মোটের উপর রাত্রে হ্রদের ধারে কেউ যায় না—অনেক দিন থেকেই স্থানীয় লোকেদের মধ্যে এ ভয় রয়েচে। একবার এক মেষপালক রাত্রিকালে হ্রদের ধারে কাটিয়েছিল, সকালবেলা তাকে সম্পূর্ণ উন্মাদ অবস্থায় নিমকের গুদামের কাছে পায়চারী করতে দেখা যায়।

আমার ঠাকুরদাদা এ সব গালগল্প শুনবার লোক ছিলেন না। তিনি বুঝতেন স্ফূর্তি, শিকার, হল্লা, হৈচৈ। লোকটাও ছিলেন দুঃসাহসী ও একগুঁয়ে ধরণের। তিনি যাবেনই ঠিক করলেন।

বৃদ্ধ ভীল তাঁকে বল্লে—হুজুর, হাঁসের দল যদি জলে নামে, তবে সে রাত্রে কোনো ভয় নেই জানবেন! ঠাকুরদাদা জিজ্ঞেস করলেন—কিসের ভয়? বাঘের?

—তার চেয়েও ভয়ানক কোনো জানোয়ার হতে পারে—কি জানি হুজুর, আমার শোনা কথা মাত্র। ঠিক বলতে পারিনে—

—তুই সঙ্গে থাক না? বকশিশ দেবো—

—মাপ করবেন, হুজুর। এক শো রুপেয়া দিলেও না, রাত কাটাবে কে নাহারা নিপটের ধারে? প্রাণের ভয় নেই? আমরা ভীল, বাঘের ভয় রাখি নে—এই হাতে তীরে কত বাঘ মেরেচি, কিন্তু হুজুর, বাঘের চেয়েও ভয়ানক কোনো জীব কি দুনিয়ায় নেই?

আমার ঠাকুরদাদা নাহারা হ্রদ ভালো জানতেন না। ঠিক আমাদের অঞ্চলে হ্রদটা নয়, আমাদের গ্রাম থেকে চল্লিশ মাইল দূরে। তখনই তিনি ভীলদের গ্রাম থেকে রওনা হয়ে সাত আট মাইল হেঁটে পাহাড় ডিঙিয়ে সমতল ভূমিতে নামলেন, দূরে মস্ত বড় হ্রদটার লবণাক্ত জলরাশি প্রখর সূর্যতাপে চক্ চক্ করচে। জনপ্রাণী নেই কোনো দিকে।

বেলা তখনও অনেকখানি আছে, এমন সময় ঠাকুরদাদা হ্রদের ধারে পেঁাছে গেলেন এবং নলখাগড়া ও শুকনো ঘাস দিয়ে সামান্য একটু আবরণ মত তৈরি করে নিলেন জলের ধারেই, যার আড়ালে তিনি বন্দুক নিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারেন. হাঁসের দল তাঁকে না টের পায়।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল—রাঙা রোদ দূরের পাহাড়ের গা থেকে মিলিয়ে গিয়েচে অনেকক্ষণ। সুন্দর চাঁদ উঠলো পূবের পাহাড় ডিঙিয়ে, কৃষ্ণপক্ষের আঁধার রাত্রি। একদল সবুজ বনটিয়া জলের ধারে নেমে আবার উড়ে গেল।

নির্জন নিস্তব্ধ মরুভূমি আর হ্রদ।

দুই দন্ড পরে জ্যোৎস্না ফুটে উঠলো হ্রদের বুকে। ধবধবে জ্যোৎস্না—কৃষ্ণা

দ্বিতীয়ার। দুদিন মাত্র আগে হেমন্তপূর্ণিমা চলে গিয়েচে—যত রাত বাড়ে, তত শীত নামে।

শীতের মুখে বালি-হাঁস আসবার সময়—কিন্তু কই একটা হাঁসও আজ নামচে না কেন?

বৃদ্ধ ভীলের কথা মনে পড়লো ঠাকুরদাদার। হাঁসের দল যদি নামে তবে সে রাত্রি বিপদহীন বলে জানবেন।—যদি না নামে তবে কিসের বিপদ? বাঘ জল খেতে আসে পাহাড় থেকে?

রাত্রি ক্রমে গভীর হ'ল। অপূর্ব জ্যোৎস্নালোকে হ্রদের জল, মরুভূমির নোনা বালি রহস্যময় হয়ে উঠেচে—কোনো শব্দ নেই কোনো দিকে। ঠাকুরদাদা যথেষ্ট দুঃসাহসী হ'লেও তাঁর যেন গা ছম্‌ছম্ করে উঠলো—জ্যোৎস্নার সে ছন্নছাড়া অপার্থিব রূপে। তিনি চামড়ার বোতল বের করে কিছু আরক সেবন করলেন।

হঠাৎ হ্রদের তীরের পশ্চিমাংশে চেয়ে দেখে তাঁর মন আনন্দে দুলে উঠলো। জ্যোৎস্না-লোকেও আকাশের নীচে একদল বালি-হাঁস নামচে। জ্যোৎস্না পড়ে তাদের সাদা দুধের মত পাখাগুলো কি অদ্ভুত দেখাচ্ছে! দেখতে দেখতে তারা নেমে এসে হ্রদের ধারে বালির চরে বসলো।

জায়গাটা ঠাকুরদাদার ঝুপড়ি থেকে দু'শো গজের মধ্যে কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশি।

এতদূর থেকে বন্দুকের পাল্লা পাবে না, বিশেষ এই জ্যোৎস্নারাত্রে। ঠাকুরদাদা ভাবলেন, দেখি ওরা কাছে আসে কিনা, বা আরও হাঁসের দল নামে কিনা। শিকারীর পক্ষে ধৈর্যের মত গুণ আর কিছু নেই। একদৃষ্টে হাঁসগুলোকে লক্ষ্য করাই ভালো। কিন্তু পরক্ষণেই ঠাকুরদাদা বিস্ময়ে নিজের চোখ বার বার মুছলেন। আরক খেয়েচেন বটে, কিন্তু তাতে জ্ঞানহারা হবার বা চোখে অত ভুল দেখবার কি কারণ আছে এখনই?

অতঃপর যা ঘটল তা বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছা মিষ্টার ব্যানার্জি, কিন্তু এ গল্প আমি বাবার মুখে অনেকবার শুনেচি—আমাদের বংশের ঘটনা—কাজেই আমি আপনাকে মিথ্যে বল্‌চি বানিয়ে, অন্তত এটুকু ভাববেন না। ঠাকুরদাদা দেখলেন, সেই হাঁসগুলো সাধারণ হাঁসের মত নয়—অনেক বড় অনেক—অনেক বড়। হাঁসের মত তাদের চালচলন নয়। তার পরেই মনে হ'ল সেগুলো হাঁসই নয় আদপে। সেগুলো মানুষের মত চেহারা বিশিষ্ট। বেচারী ঠাকুরদাদা আবার চোখ মুছলেন। আরক ঐটুকু খেয়েই আজ আবার এ কি দশা। পরক্ষণেই সেই জীবগুলি জলে নামলো এবং হাঁসের মত সাঁতার দিয়ে, তিনি যেখানে লুকিয়ে আছেন, তার কাছাকাছি জলে এসে গেল। কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নাতে বিস্মিত, ভীত চকিত, দুঃসাহসী, আরকসেবনকারী ঠাকুরদাদা দেখলেন, তারা সত্যিই হাঁস নয়—একদল অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ে! শুভ্র তাদের বেশ—জ্যোৎস্না পড়ে চিক্‌চিক্ করচে; তাদের হাসি, মুখশ্রী সবই অতি অদ্ভুত ধরণের সুন্দর। কতক্ষণ ধরে তারা নিজেদের মধ্যে খেলা করলে জলে, রাজহংসের মত সুঠাম ধরনে, নিঃশব্দে, সুন্দর ভঙ্গিতে হ্রদের বুকে সাঁতার দিতে লাগলো। তারপর কতক্ষণ পরে—তা ঠাকুরদাদার আন্দাজ ছিল না। কারণ, তখন ঠাকুরদাদা সময়ের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেচেন—ওরা সবাই জল থেকে উঠলো এবং অল্পপরেই জ্যোৎস্নাভরা আকাশ দিয়ে ভেসে হাঁসের মতই শুভ্র পাখা নেড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল—হ্রদের তীরের বাতাস তখনও তাদের অপূর্ব দেহগন্ধে ভরপুর।

আমার ঠাকুরদাদা নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখলেন তিনি জেগে আছেন কিনা। তখন তাঁর আরকের নেশা ছুটে গিয়েচে। একটু পরে রাত ফর্সা হয়ে জ্যোৎস্না মিলিয়ে গেল। তিনি উদ্‌ভ্রান্ত মস্তিষ্কে হ্রদের পার থেকে হেঁটে চলে এলেন পাহাড়ের কোলে।

সেখান থেকে পৌঁছলেন ভীলদের গ্রামে।

বৃদ্ধ ভীল ভৈঁজি তাঁকে বল্লে—হুজুর, হাঁস নেমেছিল কাল?

ঠাকুরদাদা মিথ্যা কথা বলেন। হাঁস নেমেছিল, কিন্তু একটাও মারতে পারেন নি।

কেন মিথ্যা বল্লেন শুনুন।

কি এক দুর্বার মোহ তাঁকে টানতে লাগলো দুপুরের পর থেকেই—আবার তাঁকে যেতে হবে, নাহারা হ্রদের তীরে রাত্রিকালে। ভৈঁজিকে সত্য কথা বল্লে পাছে সে বাধা দেয়।

কিন্তু সে রাত্রে বুনো বালি-হাঁসের দল নামলো হ্রদের জলে। আসল হাঁসের দল।

পর পর কয়েক রাত্রি শুধু বন্য-হংসের দল নামে খেলা করে। আমার ঠাকুরদাদা ঝুপড়ির মধ্যে শুয়ে থাকেন, বন্দুকের গুলি করতে তাঁর মন সরে না।

তারপর আর একদিন শেষরাত্রের জ্যোৎস্নায় বন্যহংসের বদলে নামলো সেই অদ্ভুত জীবের দল।

এদিন তারা আরও কাছে এল, বন্য রাজহংসের মত সাঁতার দিয়ে বেড়াল জলজ ঘাসের বনের পাশে পাশে—তাদের অপূর্ব সুন্দর মুখশ্রী জ্যোৎস্নালোকে ঠাকুরদাদার মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে কতবার পড়লো। রাত ভোর হবার বেশি দেরী নেই, তখনও কিন্তু জ্যোৎস্না আছে; আমার ঠাকুরদাদা কি ভেবে, আরকের নেশায় কিংবা ভালো অবস্থায় জানি নে ঝুপড়ি থেকে উঠে ছুটে জলের ধারে চল্লেন। বোধ হয় ওদের কাউকে ধরতে গেলেন। অমনি ত্রস্ত বন্যহংসের মত সেই অলৌকিক জীবের দল তাড়াতাড়ি সাঁতরে কে কোথায় দূরে চলে গেল এবং পরক্ষণেই শেষরাত্রের বিলীয়মান চন্দ্রালোকে তাদের লঘু দেহ ভাসিয়ে আকাশপথে অদৃশ্য হ'ল।

পরদিন দুপুরবেলায় আমার ঠাকুরদাদাকে উন্মাদ অবস্থায় হ্রদের ধারের বালির চড়ায় লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখে জনৈক জেলে তাঁকে ভীলদের গ্রামে পৌঁছে দেয়। বৃদ্ধ ভৈঁজি ঘাড় নেড়ে বল্লে—আমি বলেছিলাম হাঁসের দল যেদিন না নামে সেদিন বড় ভয়।

ঠাকুরদাদা মাঝে মাঝে ভাল হতেন, আবার উন্মাদ হয়ে যেতেন। ভাল অবস্থায় বাড়ীতে এ গল্প করেছিলেন, একবার নয় অনেকবার। মৃত্যুর প্রায় দশ বছর আগে থেকে তাঁর মোটেই ভাল অবস্থা আসেনি। বদ্ধ উন্মাদ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘটে।

বিনায়ক দত্ত সিং গল্প শেষ করলেন। আমি বললাম—খুব অদ্ভুত ঘটনা, তবে—

মিঃ সিং বললেন—তবে বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বাস করা শক্ত। সে আমিও জানি। আমাদের দেশেও সবাই বিশ্বাস করে না। এ আজ পঞ্চাশ বছর আগেকার ঘটনা বলচি। কেউ বলে ঠাকুরদাদার অতিরিক্ত আরক সেবনের ফলে ওই সব চোখের ভুল দেখা, বন্যহংসকে ভেবেচেন আকাশ-পরী; আবার কেউ বলে, না—আকাশপরী দেখলেই লোকে পাগল হয়। সেই বৃদ্ধ ভীল ভৈঁজি সেই কথাই বলতো। কি করে বলব কোন্‌টা সত্যি. কোনটা মিথ্যে। তখন আমার জন্মই হয় নি।

শারদীয়া মৌচাক, আশ্বিন ১৩৪৯

হাসি

স্টেশনের ওয়েটিং-রুমের ভেতরে বাইরে কোথাও অন্য লোক ছিল না, বেয়ারাটাকেও ডেকে ডেকে পাওয়া গেল না। অগত্যা চায়ের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে আমরা কয় বন্ধুতে বেশ ক'রে র‍্যাগ টেনে নিয়ে ইজি-চেয়ারে শুয়ে পড়লাম।

মাঘের শেষ যদিও, শীত কিন্তু বাংলা দেশের পৌষ মাসের চেয়েও বেশী। রমেন বললে—ওহে, তোমরা যা বোঝো করো, আমি কিন্তু চা নইলে রাত কাটাতে পারবো না। বসো তোমরা, একটা ব্যবস্থা দেখি......

দোর খোলার সংগে সংগে এক ঝলক তীক্ষ্ন শীতল পশ্চিমে বাতাস তীরের মত ঘরে ঢ্কতেই আমরা হাঁ-হাঁ ক'রে উঠলাম......রমেন ততক্ষণে চলে' গিয়েছে। খোলা দোরটা বন্ধ করে দিতে গিয়ে চেয়ে দেখি বাইরে বেজায় কুয়াসা। পৃথ্বীশ আমাদের দলের দার্শনিক। এতক্ষণ সে র‍্যাগ দিয়ে আপাদমস্তক আবৃত করে শুয়েছিল, হঠাৎ মুখ খুলে গম্ভীরভাবে বললে—দেখ, আমার কিন্তু একটা Uncanny Sensation হচ্ছে, কেন বল তো?

আমি বললাম—কি ভাবের Uncanny? ভূত টুত?

সে র‍্যাগ খুলে ফেলে ইজি-চেয়ারে উঠে বসলো। চারিধারে চেয়ে দেখে বললে—তা ঠিক জানিনে, কিন্তু কেমন যেন......

আমরা সকলেই ততক্ষণে পুনরায় খাড়া হয়ে উঠে বসেছি। সলিল বললে—বিচিত্র নয়। আমি একটা ব্যাপার জানি, এই রকম একটা স্টেশনের ওয়েটিং রুমে রাত দশটার পরে লোক থাকতে পারতো না। শুধু তাই নয়, একবার অনেক রাত্রের ট্রেনে এক ভদ্রলোক নেমে রাত্রের মত স্টেশনের ওয়েটিংরুমেই ছিলেন—সকালেও তিনি ওঠেন না দেখে সকলে তুলতে গিয়ে দেখলো তিনি অচৈতন্য অবস্থায় মুখ উপুড় করে পড়ে আছেন। তারপর অনেক যত্নে তাঁর জ্ঞান হয়। তিনি সকলের কাছে বলেন, শেষরাত্রির দিকে এক সাহেব এসে তাঁকে ওঠায়। পরে হঠাৎ সে পকেট থেকে একটা ক্ষুর বার করে নিজের গলায় বসিয়ে এমন জোরে টানতে থাকে যে কাঁচা চামড়া কাটার অস্বস্তিকর খ্যাঁচ খ্যাঁচ আওয়াজে তাঁর সারা শরীর শিউরে ওঠে। তিনি চীৎকার করে লোক ডাকতে যেতেই দেখেন কেউ কোথাও নেই, সাহেবের চিহ্নও নেই ঘরে—তারপর কি হোল তিনি আর জানেন না। সেই স্টেশনে ওয়েটিংরুমের বাথরুমটার মধ্যে এক ছোকরা সাহেব এঞ্জিনীয়র কি জন্যে একবার ঠিক ওই ভাবে গলায় ক্ষুর বসিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। তারপর থেকেই এই ব্যাপার......

আমরা সকলে আমাদের বাথ-রুমটার দিকে চেয়ে দেখলাম। লুপ-লাইনের নির্জন পাহাড়ে জংগলের ধারে, লাইনের ও-পারে কেবল স্টেশন-মাস্টারের কোয়ার্টারটা এবং লেভেল-ক্রসিং-এর ফটকে দারোয়ানের গুমটি। ওয়েটিংরুমের বাইরে স্টেশনের হাতার পরেই একটা ছোট্ট পান-সিগারেটের ও চা-এর দোকান। দিনমানে এমন কি......সন্ধ্যার একটু পর পর্যন্তও দেখেছিলাম, তার পর থেকেই আর দোকানীর পাত্তা নেই—দোকান বন্ধ করে চলে গিয়েছে।

গল্প ভাল করে জমতে না জমতে হঠাৎ দোরটা খুলে গেল। একটা কুলীর হাতে কাঁসার থালার ওপর গোটা আষ্টেক পেয়ালা ভর্তি চা নিয়ে ঢুকলো হাসিমুখে রমেন। ঢুকেই বললে—দেখছো? Where there is a will, there is away। বলেছিলাম না চায়ের ব্যবস্থা করবোই? স্টেশন-মাস্টারের সংগে আলাপ হয়ে গেল, তাঁর বাড়িও আমাদের জেলায়। তিনি বললেন—বিলক্ষণ, আপনারা ভদ্রলোকের ছেলে, বাঙালী. চা খাবেন এ তো সৌভাগ্য। ছাড়লেন না কিছুতেই, নিজের বাসা থেকে তৈরী করে পাঠিয়ে দিলেন......

রমেনের কথা শেষ হতে না হতে দোর ঠেলে এক ভদ্রলোক ঢুকলেন। রমেন প্রায় খেলার পুতুলের মত লাফিয়ে উঠে বললে—এই যে মিত্তির-মশায়,—আসুন অসুন। পরে আমাদের দিকে চেয়ে বললে—ইনিই এখানকার স্টেশনমাস্টার হরিদাসবাবু। আসুন

বসুন।

ততক্ষণে হরিদাসবাবু টেবিলের সামনের হাতলশূন্য বেতের কেদারাটাতে আমাদের সকলের উদ্দেশে অভিবাদনের জন্যে হাত উঁচু করে গরুড়ের মত বসে আছেন। মিত্তির-মশায়ের বয়স পঁতাল্লিশের কম নয়, দোহারা গড়ন, কানের পাশের চুলগুলোতে বেশ পাক ধরেছে—গোঁপ-দাড়ি কামানো। পশ্চিমের আটা-জলে বেশ স্বাস্থ্যবান শরীর।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি এখানে কত দিন আছেন মিত্তির-মশায় ?

—আজ্ঞে, এই আসছে ফেব্রুয়ারীতে দেড় বছর হবে। বড় কষ্ট মশাই, মাছ তো একেবারে মেলে না, বাঙালীর মুখ মোটে দেখতে পাওয়া যায় না। তাই আপনারা আজ এসেছেন শুনে ভারী আনন্দ হোল। উনি চায়ের কথা যেমন তুললেন, আমি বললাম—তার আর কি, আমার বাসা যখন নিকটেই রয়েছে, তখন কি আর......তা আপনারা কতদূর যাবেন সব ?

—আমরা সাইকেলে দিল্লী যাবো বলে বেরিয়েছি, ও-পার থেকে আসছি কি না ? এইখানে নদী পার হয়ে ভাগলপুরের পথ ধরে গিয়ে গ্র্যান্ডট্রাঙ্ক রোডে উঠবো ইচ্ছে আছে—ভাগলপুরের গাড়িটা ঠিক এখানে ক'টায় পাওয়া যাবে কাল সকালে ?

তারপর অনেক কথাবার্তা ও আমাদের ভ্রমণ সম্বন্ধে অনেক কৌতূহলপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর এবং কথিত ট্রেন-ঘটিত নানা আবশ্যকীয় সংবাদের আদানপ্রদানের পর কথাবার্তার বেগ মন্দীভূত হয়ে পড়লো।

কারুরই ঘুম পাচ্ছিল না, বিশেষ করে গরম চা খাবার পরেই আলস্য ও তন্দ্রার ভাবটা কেটে গিয়ে সকলেরই শরীর যেন বেশ তাজা হয়ে উঠেছিল। নির্বাণোন্মুখ কথাবার্তার শিষটাকে পুনরায় খোঁচা দিয়ে প্রতীপ্ত করার জন্যেই আমি হঠাৎ বলে উঠলাম—হ্যাঁ মশাই, আপনাদের এ ওয়েটিংরুমের বাথ-রুমে ভূতটুত নেই তো ? এ প্রশ্নের পরে সলিলের সেই অজ্ঞাত স্টেশনটির বাথ-রুম ও ছোকরা এঞ্জিনীয়র সাহেবের গল্প পুনরায় ফিরে এল। পুনরায় আমাদের একচোট হাসি হোল এবং কেউ কেউ এমন ভাবের ভান করলেন যে এ-স্টেশনের বাথ-রুম সম্বন্ধেও তাঁরা ভয়ের ধারণা পোষণ করেন।

রমেন বললে—যত সব গাঁজাখুরি......

হরিদাসবাবু অনেকক্ষণ কোনো কথা বলেন নি। আমাদের উপহার দেওয়া সিগারেটের চতুর্থটির ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে তিনি হাই তুলে খাড়া হয়ে বসলেন। বললেন—আপনারা হাসবেন হয়তো কিন্তু আমার নিজের জীবনের একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা এখানে বলছি শুনুন।

পরে তিনি পঞ্চম সিগারেটটি ধরিয়ে নিজের অদ্ভুত গল্পটি বলে' গেলেন।

অনেকদিনের কথা। আমার বয়স তখন খুব বেশী না হলেও বারো-তেরোর কম নয়। আমার এক কাকা ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টে কাজ করতেন এবং সে সময়ে তিনি খুলনা মরেলগঞ্জ আউট-পোস্টে থাকতেন। একবার কি উপলক্ষে তা এখন ঠিক স্মরণ হয় না, আমি আমাদের বাড়ির সকলের সঙ্গে কাকার কাছে বেড়াতে যাই। কাকা তখন ছিলেন খুলনার বাসাতে, সেইখানেই অনেকদিন আমরা ছিলাম। বেশীদিন থাকবার কথাবার্তা হওয়াতে আমি সেখানকার একটা স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলাম।

আমরা পুজোর পরটাতেই সেবার খুলনা যাই। কয়েক মাস পড়বার পরে গ্রীষ্মের ছুটি হোল প্রায় একমাসের ওপর। কাকাকে ধরলাম তাঁর সঙ্গে তাঁর কার্যস্থান মরেলগঞ্জে যাবো। কাকা আমায় নিয়েও গেলেন। সেই সময়টা মোম-মধু সংগ্রাহকদের লাইসেন্স নতুন করে করবার সময়। কেউ ফাঁকি দিয়ে পুরানো লাইসেন্সের বলে জঙ্গলে মোম-

মধু সংগ্রহ করে কিনা পাহারা দেবার জন্যে ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের বোট ও স্টীমলঞ্চ সব সময় সুন্দরবনের নদী, খাড়ি ও খালের মধ্যে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিত। কতবার আমি কাকার সঙ্গে এই সরকারী বোটে সুন্দরবনের মধ্যে বেড়াতে গিয়েছি!

আমার মনে এই সুন্দরবনের একটা অপূর্ব স্বপ্নছবি মুদ্রিত আছে। তখন আমি ছেলেমানুষ, সবে তেরো—শহর থেকে গিয়েছি। সুন্দরবনের অপূর্ব বন্য সৌন্দর্য এই এক মাসের প্রতিদিন আমার ক্ষুধার্ত ব্যগ্র বালক-মনে কি আনন্দের বার্তা বয়ে আনতো তা আমি মুখে আপনাদের বোঝাতে পারি না। আর কখনও সে-দেশে যাইনি, অনেক-দিনের কথা হলেও এখনো মাঝে মাঝে সুন্দরবনের—বিশেষ ক'রে জ্যোৎস্না-ওঠা সুন্দর-বনের ছবি......অপরিসর খালের শঠির জঙ্গলে ভরা ঢালু পাড়......নতুন পাতা-ওঠা গাব-গাছের ও বন্য গোল-গাছের সারি......খাড়ির মুখে জোয়ারের শব্দ, যখনই মনে হয়, একটা জিনিসের জন্যে বেদনায় এই বয়সেও মনটা কেমন করে ওঠে।

সেদিনের কথাটা আমার বেশ মনে আছে। সুন্দরবনের সেই অংশটা তখন জরীপ হচ্ছিল—তাদের একটা বড় লঞ্চ বড়-গাঙের মাঝখানে বাঁধা থাকতো। দুপুরবেলা সেদিন সেই লঞ্চটাতে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। চার-পাঁচজন আমীন, একজন কানুনগো, একজন কেরানী—সবাই বাঙালী, সবসুদ্ধ সাত-আটজন লোক লঞ্চটাতে। খাওয়া-দাওয়াটা খুব গুরুতর রকমের হোল, তারপর একটু গান-বাজনাও হোল। বেলা পড়ে গেলে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে আমাদের বজরাটা ছাড়লাম।

ক্রমে রাত হোল, জ্যোৎস্না উঠলো। খালের দু'ধারের নতুন পাতা-ওঠা বনের মাথাটা জ্যোৎস্নায় চিক্‌চিক্‌ করছিল। দূর থেকে নৈশ পাখীর দু'একটা অদ্ভুত রকমের ডাক কানে আসছিল। জোয়ারের জলে মগ্ন গোল-গাছের আনত শাখাগুলো ভাঁটার পরে একটু একটু করে জল থেকে উঠতে লাগলো......বাঘের উপদ্রবের ভয়ে সব সময় আমাদের বজরাতে দু'জন বন্দুকধারী সিপাহী থাকতো, তারা বজরার ও-ধারের তোলা-উনুনে রান্না চাপিয়ে দিলে।

রাতটা বড় গরম, গুমোট ধরনের। গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ছিল না, চারিদিকে একটা নীরব থমথমে ভাব। ছই-এর ভেতরে থাকবার উপায় নেই। বজরার ছাতে তক্তার পাটাতনের ওপর এ-সব গ্রীষ্মের রাতে শুয়ে থাকতে খুব আরাম বটে, কিন্তু অপরিসর খালের দু'ধারের ঘন বন থেকে বাঘ লাফিয়ে পড়বার ভয়ে সেখানে থাকবার যো ছিল না। ছই-এর মধ্যে বসে কাকা ও বিনোদবাবু দাবা খেলছিলেন। ছই-এর ঘুলঘুলিগুলো সব খোলা, আমি নিকটে বসে বই পড়ছি।

খেলতে খেলতে রাত হয়ে গেল দশটার বেশী। সিপাহীদের রান্না হয়ে গেল।

কাকা কি-একটা কঠিন চাল সামলাবার কথা একমনে ভাবছেন—আমি মিটমিটে আলোতে আখ্যান-মঞ্জরী পড়ছি—বিনোদবাবু খেলোয়াড়কে সমস্যায় ফেলবার আত্মপ্রসাদে তাকিয়া ঠেস দিয়ে ঘুলঘুলির বাইরে ভাঁটার টান ধরা জলের দিকে চেয়ে আছেন। দীর্ঘ বন-গাছের ছায়া পড়েছে জলের ওপর।

এমন সময় একটা ব্যাপার ঘটলো।

সামনের ঘন বনের মধ্যে অনেক দূর থেকে একটা উচ্চ সুস্পষ্ট কর্কশ অট্টহাসির রব উঠলো—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ......

অবিকল মানুষের গলার আওয়াজের মত হলেও মনে হোল যেন এটা অমানুষিক অস্বাভাবিক স্বর। আমরা কিছু ভাববার পূর্বেই সেইরকম আর একবার এবং তারপর আবার।......হাসির শব্দটা এত উচ্চ ও তীক্ষ্ণ যে মনে হোল বনের গাছগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে......মাটি যেন কাঁপছে......বোটটা যেন দুলছে!

সিপাহীরা তাড়াতাড়ি খাওয়া ছেড়ে উঠে এল। কাকা, বিনোদবাবু, আমি সকলেই ছই-এর বাইরে এলাম। গাছপালা ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও হাওয়া নেই, পাতাটি পর্যন্ত নড়ে না—সম্মুখে জ্যোৎস্না রাতের চাঁদ বন-গাছের আড়ালে ঢলে পড়ছে।......

বিনোদবাবু বললেন—কি মশাই রামবাবু? ব্যাপারটা কি?

মাঝিরা ভারি ভয় পেয়ে গিয়েছে। তারা বজরার মাস্তুলের তলায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে বনের দিকে চেয়ে আছে।

আমরা সকলে ছই-এর মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় আবার সেই হাসির শব্দটা উঠলো— হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ......

শব্দটা এত ক্রূর ও মর্মস্পর্শী যে আমাদের সকলের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। মাঝিরা দুই কানে হাত দিয়ে বলে উঠলো—আল্লা! আল্লা! কাকা ও বিনোদবাবু ছই-এর মধ্যে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। কাকা বললেন—কি মশাই, হায়েনা নাকি? কিন্তু তাঁর মুখ দেখে ও গলার সুরে মনে হলো, তিনি কথাটা নিজেই বিশ্বাস করেন না। তারপর পরামর্শ হোল নৌকোটা সেখান থেকে সরানো যায় কি না। কিন্তু ভাঁটার টান এত বেশী যে, বড়-গাঙের টান ঠেলে তত রাত্রে কোন মতেই অত ভারী বজরাটা উজানে নেওয়া চলে না। অগত্যা সেইখানেই রাত কাটাতে হোল। সবাই জেগে রইলো, কারুর চোখে ঘুম এল না সে রাত্রে।

শেষরাত্রে আর একবার শব্দটা শুনলাম। বনভূমি তখন নিস্তব্ধ—চাঁদ ডুবে গিয়ে নদী আকাশ বন সব অন্ধকারে একাকার! আমার চোখ ঘুমে ঢুলে এসেছে, এমন সময় অন্ধকার-ভরা গভীর বনভূমির দিক থেকে আর একবার সেই বিকট হাসির রোল উঠলো। শেষ রাত্রের চাঁদ-ডোবা অন্ধকারে সেটা এত অমানুষিক, এত পৈশাচিক ঠেকলো যে তখন আমার বালক-বয়স হলেও হাসিটার প্রকৃত রূপ বুঝে বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল।

সকালে জোয়ারের মুখে বজরা ছেড়ে আমরা দুপুরের সময় স্টীমলঞ্চে ফিরে এলাম। সেখানে সব কথা শুনে প্রধান সারেং খালাসীদের মধ্যে কেউ কেউ বললে, ঐ শব্দটা এর আগেও তারা শুনেছে, তবে স্থানটা বড় গভীর বনের মধ্যে বলে' সে-দিকটায় লোক চলাচল খুব কম। শোনা গেল, ঐ বনের মধ্যে নাকি অনেক দূর গেলে প্রাচীন কালের ঘরবাড়ির চিহ্ন পাওয়া যায়। জঙ্গলের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ বৃদ্ধ বকুল-গাছের সারি দেখে মনে হয় কোনো সময়ে সে-সব স্থানে লোকের বাস ছিল।

সে যাই থাকুক—আজও এতদিন পরে যখনই কথাটা মনে পড়ে তখনই এই কথাটাই মনে হয়, গভীর রাত্রির অন্ধকারে জনহীন জনপদের ধ্বংসস্তূপের চারিপাশে ঘূর্ণায়-মান কোন অভিশপ্ত অশরীরী আত্মার পৈশাচিক উল্লাসভরা অট্টহাসিই সেদিন কানে গিয়েছিল।......তাই হাসির রোলটা যখনই মনে আসে, আজও এতকাল পরেও যেন সারা শরীর শিউরে ওঠে।

খুঁটি দেবতা

ঘোষ-পাড়ায় দোলের মেলায় যাইবার পথে গঙ্গার ধারে মঠটা পড়ে।

মঠ বলিলে ভুল বলা হয়। ঠিক মঠ বলিতে যাহা বুঝায়, সে ধরনের কিছু নয়। ছোট খড়ের ঘর খান চার পাঁচ মাঠের মধ্যে। একধারে একটা বড় তেঁতুল গাছ। গঙ্গার একটা ছোট খাল মাঠের মধ্যে খানিকটা ঢুকিয়া শুকাইয়া মজিয়া গিয়াছে। জোয়ারের

সময়ে তবুও খালটা কানায় কানায় ভরিয়া উঠে। ঠিক সেই সময় জেলেরা দোয়াড়ী পাতিয়া রাখে। জোয়ারের তোড়ের মুখে মাছ খালে উঠিয়া পড়ে, ভাঁটার টানে নামিবার সময় দোয়াড়ীর কাঠিতে আটকাইয়া আর বাহির হইতে পারে না। কাছেই একটু দূরে শংকরপুর বলিয়া ছোট গ্রাম।

কিছুকাল পূর্বে রেল-কোম্পানী একটা ব্রাঞ্চ লাইন খুলিবার উদ্দেশ্যে খানিকটা জমি সার্ভে করাইয়া মাটির কাজ আরম্ভ করাইয়াছিলেন, কোনো কারণে লাইন বসানো হয় নাই। মাঠের উত্তর-দক্ষিণে লম্বা প্রকান্ড উঁচু রেলওয়ে বাঁধটাই দুই পাশের ঢালুতে নানাজাতীয় কাঁটাগাছ, আকন্দ ও অন্যান্য বুনো গাছপালা গজাইয়া বন হইয়া আছে। আকন্দ গাছটাই বেশী।

খুঁটি দেবতার অপূর্ব কাহিনী এইখানেই শুনিয়াছিলাম।

গল্পটা বলা দরকার।

শংকরপুর গ্রামের পাশে ছিল হেলেঞ্চা-শিবপুর। এখন তাহার কোন চিহ্ন নাই। বছর পনেরো পূর্বে গঙ্গায় লাটিয়া গিয়া মাঝ-গঙ্গার ওই বড় চরটার সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্ব-স্থলীর চৌধুরী জমিদারদের সহিত ওই চরার দখল লইয়া পুরনো প্রজাদের অনেক দাঙ্গা ও মকদ্দমা হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত প্রজারাই মামলায় জেতে বটে, কিন্তু চরটা চিরকালই বালুময় থাকিয়া গেল, আজ দশ বৎসরের মধ্যে চাষের উপযুক্ত হইল না। পাঙ্গা দখলে আসিলেও চরটা প্রজাদের কোন উপকারে লাগে না, অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়াই থাকে। আজকাল কেহ কেহ তরমুজ, কাঁকুড় লাগাইতেছে দেখা যায়।

এই গ্রামে রাঘব চক্রবর্তী পূজারী বামুন ছিলেন।

রাঘব চক্রবর্তীর কেহ ছিল না। পৈতৃক আমলের খড়ের বাড়িতে একা বাস করিতেন ; একাই নদীর ঘাট হইতে জল আনিয়া, বনের কাঠ কুড়াইয়া রাঁধিয়া-বাড়িয়া খাইতেন। গায়ে শক্তিও ছিল খুব, পিতামহের আমলের সেকেলে ভারী পিতলের ঘড়া ভরিয়া দুটি বেলা এক পোয়া পথ দূরবর্তী গঙ্গা হইতে জল আনিতেন। ক্লান্তি বা আলস্য কাহাকে বলে জানিতেন না।

রাঘব চক্রবর্তী পয়সা চিনিতেন অত্যন্ত বেশী। বাঁশের চটার পাখা তৈয়ারী করিয়া কুড়ি দরে ডোমেদের কাছে ঘোষ-পাড়ার দোলে বিক্রয় করিতে পাঠাইয়া দিতেন। অবসর সময়ে ঝুড়ি, কুলো ডালা বুনিয়া বিক্রয় করিতেন। মাটির প্রতিমা গড়িতে পারিতেন। উলু-খড়ের টুপি, ফুল-ঝাঁটা তৈয়ারী করিতেন। সুন্দর কাপড় রিপু করিতে পারিতেন। এ-সব তাঁহার উপরি আয়ের পন্থা ছিল। সংসারের কেহই নাই, না স্ত্রী, না ছেলেমেয়ে—কে তাঁহার পয়সা খাইবে, তবুও রাঘব টাকা জমাইয়া যাইতেন। একটা মাটির ভাঁড়ে পয়সাকড়ি রাখিতেন, সপ্তাহে একবার বা দুইবার ভাঁড়টি উপুড় করিয়া ঢালিয়া সব পয়সাগুলি সযত্নে গুনিতেন। ভাঁড়ের মধ্যে যাহা রাখিতেন পারতপক্ষে তাহা আর বাহির করিতেন না। গ্রামের সবাই বলিত, রাঘব চক্রবর্তী বেশ দু'পয়সা গুছাইয়া লইয়াছেন।

একদিন দুপুরে পাক সারিয়া রাঘব আহারে বসিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে একখানা ছই-ঘেরা গরুর গাড়ী আসিয়া তাঁহার উঠানে থামিল। গাড়ি হইতে একটি পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবক বাহির হইয়া আসিল। রাঘব চিনিলেন, তাঁর দূর-সম্পর্কীয় ভাগিনেয় নন্দলাল।

নন্দলাল আসিয়া মামার পায়ের ধুলা লইল।

রাঘব বলিলেন—এস বাবা। ছই-এর মধ্যে কে?......

নন্দলাল সলজ্জমুখে বলিল—আপনার বউমা।

—ও! তা কোথায় যাবে? ঘোষ-পাড়ার দোল দেখতে বুঝি?

নন্দলাল অপ্রতিভের সুরে বলিল—আজ্ঞে না। আপনার আশ্রয়েই—আপাততঃ—মানে, বামুনহাটির বাড়িঘর তো সব গিয়েছে। গত বছর মাঘমাসে বিয়ে—তা এতদিন বাপের বাড়িতেই ছিল—সেখান থেকে না আনলে আর ভাল দেখাচ্ছে না। তাই নিয়ে আজ একেবারে এখানেই......

রাঘব বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি চিরকালই একা থাকিয়া আসিয়াছেন, একা থাকিতেই ভালবাসেন। এ আবার কোথা হইতে উপসর্গ আসিয়া জুটিল, দ্যাখো কান্ড!

যাহাহউক, আপাততঃ বিরক্তি চাপিয়া তিনি ভাগিনেয়-বধূকে নামাইয়া লইবার ও পূর্বদিকের ভিটার ছোট ঘরখানাতে তাহাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করিলেন।

সন্ধ্যার পরে ভাগিনেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—এখানে নিয়ে তো এলে, হাতে কিছু আছে-টাছে তো? আমার এখানে আবার বড় টানাটানি। ধান অন্যবার যা হয়, এবার তার সিকিও পাইনি। যজমানদের অবস্থাও এবার যা——

নন্দ এ-কথার কিছু সন্তোষজনক জবাব দিতে পারিল না।

রাঘব বলিলেন—বউমার হাতে কিছু নেই?

—ও কোথায় পাবে! তবে বিয়ের দরুণ গয়না কিছু আছে! ওর ওই হাতবাক্সটাতে আছে যা আছে।

—জায়গা ভালো নয়। গয়নাগুলো বাক্সে রাখাই আমি বলি বেশ। পাঁচজন টের না পায়। আমি আবার থাকি গাঁয়ের এক কোণে পড়ে—আর এই তো সময় যাচ্ছে। ও-গুলো আগে সাবধান করা দরকার।

দিন দুই পরে নন্দলাল মামাকে বলিল—আমাকে আজ একবার বেরুতে হচ্ছে মামা। একবার বীজপুর যাবো। লোকো-কারখানায় একটা সন্ধান পেয়েছি—একটু দেখে আসি।

নন্দলাল ইতিপূর্বেও বীজপুরের কারখানায় কাজ খুঁজিয়াছে কিন্তু তেমন লেখা-পড়া জানে না বলিয়া কাজ জোটাইতে পারে নাই। বলিল—লোকো-কারখানায় যদি মুগুর ঠ্যাঙাতে পারি তবে এক্ষুনি কাজ জোটে, ভদ্দরলোকের ছেলে, তা তো আর পেরে উঠি নে। এই আমার সঙ্গে পাঠশালায় পড়তো মহেন্দ্র, তারা জেতে যুগী। সে বাইস-ম্যানি করছে, সাড়ে সাত টাকা হপ্তা পায়—দিব্যি আছে। কিন্তু তাদের ও-সব সয়। আমাকে বলেছিল হেড মিস্ত্রির কাছে নিয়ে যাবে, তা আমার দ্বারা কি আর হাতুড়ি পিটুনো চলবে?

পরদিন খুব ভোরে নন্দলাল বাটি আসিল। সে রাত্রেই স্টেশনে নামিয়াছিল কিন্তু অন্ধকারে এতটা পথ আসিতে না পারিয়া সেখানে শুইয়াছিল, শেষরাত্রের দিকে জ্যোৎস্না উঠিলে রওনা হইয়াছে।

নন্দলাল বাড়ি ফিরিয়া দেখিল তখনও মামা উঠেন নাই, পুবের ভিটার ঘরে স্ত্রীও তখন ঘুমাইতেছে। স্ত্রীকে জাগাইতে গিয়া দেখিল, গহনার বাক্স ঘরের মধ্যে নাই। স্ত্রীকে উঠাইয়া বলিল—গহনার বাক্স কোথায়?

স্ত্রী অবাক হইয়া গেল। বলিল—আহা, ঠাট্টা করা হচ্ছে বুঝি? এই তো শিয়রে এইখেনে ছিল। লুকিয়েছ বুঝি?......

কিছুক্ষণ পরে স্বামী-স্ত্রী দুইজনেই মাথায় হাত দিয়া বসিল। ঘরের কোথাও বাক্স নাই। খোঁজাখুঁজি অনেক করা হইল। মামাও বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিলেন। চুরির কথা শুনিয়া অবাক হইলেন, নিজে চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বাক্সের বা চোরের খোঁজ করিতে লাগিলেন। প্রতিবেশীরাও আসিল, থানাতেও খবর গেল—কিছুই হইল না।

নন্দলালের স্ত্রীর বয়স কুড়ি একুশ। রং টকটকে ফরসা, মুখ সুশ্রী, বড় শান্ত ও সরল মেয়েটি। তার বাপের বাড়ির অবস্থা বেশ ভাল, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তৃতীয় পক্ষে

বিবাহ করিয়া তার বাপ পূর্ব দুই পক্ষের সন্তানসন্ততিদিগকে এখন আর দেখিতে পারেন না। বিবাহের সময় এই গহনাগুলি তিনিই মেয়েকে দিয়াছিলেন ; এই হিসাবে দিয়াছিলেন যে, গহনাগুলি লইয়া মেয়ে যেন বাপের বাড়ির উপর সকল দাবী-দাওয়া ত্যাগ করে। পিতার কর্তব্য এইখানেই তিনি শেষ করিলেন।

নন্দলালের অবস্থা কোনো কালেই ভাল নয়, বিবাহের পর যেন তাহা আরও খারাপ হইয়া পড়িল। ওই গহনা কয়খানি দাঁড়াইল সংসারের একমাত্র সম্বল। গহনাগুলির উপর নন্দলাল বার দুই ঝোঁক দিয়াছিল একবার পাটের ব্যবসা ফাঁদিতে, আর একবার মুদীর দোকান খুলিতে সিমুরালির বাজারে। কিন্তু নন্দলালই শেষ পর্যন্ত কি ভাবিয়া দুইবারই পিছাইয়া যায়। বউও বলিয়াছিল—দ্যাখো ওই তো পুঁজিপাটা, আর তো নেই কিছু—যখন আর কোন উপায় থাকবে না, তখন ওতে হাত দিও। এখন থাক।

গহনার বাক্স চুরি যাওয়ার দিন পাঁচ সাত পরে একদিন নন্দলাল ভোরে উঠিয়া দেখিল স্ত্রী বিছানায় নাই। বাহিরে আসিয়া দেখিল, বউ পাশের ছাইগাদা ঘাঁটিয়া কি দেখিতেছে! স্বামীকে দেখিয়া কেমন এক ধরনের হাসিয়া বলিল—ওগো, এসো না গো, একটু খোঁজো তো এর মধ্যে? তুমি উত্তর দিকটা থেকে দ্যাখো।

নন্দলাল সস্নেহে স্ত্রীকে ধরিয়া দাওয়ায় আনিয়া বসাইল। পাতকুয়ার ঠাণ্ডা জল দিয়া স্নান করাইয়া দিল, নানারকমে বুঝাইল, কিন্তু সেই যে বউটির মস্তিষ্ক-বিকৃতির শুরু হইল—এ আর কিছুতেই সারানো গেল না। পাছে স্বামী বা কেহ টের পায় এই ভয়ে যখন কেউ কোনোদিকে না থাকে, তখন চুপিচুপি ছাইগাদা হাতড়াইয়া খুঁজিয়া কি দেখিতে থাকিবে! এই একমাত্র ব্যাপার ছাড়া তাহার মস্তিষ্ক-বিকৃতির কিন্তু অন্য কোনো লক্ষণ ছিল না। অন্যদিকে সে যেমন গৃহকর্মনিপুনা, সেবাপরায়ণা কর্মিষ্ঠা গৃহস্থ-বধূ তেমনই রহিল।

একদিন সে মামাশ্বশুরের ঘরে সকালে ঝাঁট দিতে ঢুকিয়াছে, মামাশ্বশুর রাঘব চক্রবর্তী তখন ঘরে ছিলেন না ; ঘরের একটা কোণ পরিষ্কার করিবার সময় সে একখানা কাগজ সেখানে কুড়াইয়া পাইল। কে যেন দলা পাকাইয়া কাগজখানাকে কোণটাতে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। কাগজখানা দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল! এ যে তার গহনার বাক্সের তলায় পাতা ছিল, পাতলা বেগুনী রঙের কাগজ, সেকরারা এই কাগজে নূতন-তৈয়ারী সোনার গহনা জড়াইয়া দেয়।......এ কাগজখানাও সেইভাবে পাওয়া, সেকরার দোকান হইতে আসিয়াছিল, সেই হইতে তাহার গহনা বাক্সের তলায় পাতা থাকিত—সেই কোণছেঁড়া বেগুনী রঙের পাতলা কাগজখানি!......

বউটি কাহাকেও কিছু বলিল না—স্বামীকেও নয়। মনের সন্দেহ মুখে কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে পারিল না। কিন্তু ভাবিয়া ভাবিয়া শেষে তাহার খুব অসুখ হইল। জ্বর অবস্থায় নির্জন ঘরে একা বিছানায় শুইয়া তক্তপোশের একটা বাঁশের খুঁটিকে সম্বোধন করিয়া সে কড়জোড়ে বার বার বলিত—ওগো খুঁটি, আমি তোমার কাছে দরখাস্ত করছি, তুমি এর একটা উপায় করে দাও, পায়ে পড়ি তোমার। একটা উপায় তোমায় করতেই হবে। আর কাউকে বলতে পারি নে তোমাকেই বলছি......

বাঁশের খুঁটিটা ছাড়া তার প্রাণের এ আগ্রহ-ভরা কাতর আকুতি আর কেহই শুনিত না। কতবার রাত্রে, দিনে নির্জনে খুঁটিটার কাছে এ নিবেদন সে করিত—কি বুঝিয়া করিত সে-ই জানে।

তাহাদের বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড মাঠ গঙ্গার কিনারা পর্যন্ত সবুজ ঘাসে ভরা, তারপরেই খাড়া পাড় নামিয়া গিয়া জল ছুঁইয়াছে। জল সেখানে অগভীর চওড়াতেও হাত দশ বারো মাত্র, পরেই গঙ্গার বড় চরাটা। সারাবছরেই চরায় জলচর পক্ষীর ঝাঁক

চরিয়া বেড়ায়। চরার বাহিরের গভীর বড় গঙ্গার দিকে না গিয়া তারা গঙ্গার এই ছোট অপরিসর অংশটা ঘেঁষিয়া থাকে। কণ্ঠিকারীর বনে চরার বালি প্রায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, বারো মাস বেগুনী ফুল ফুটিয়া নির্জন বালির চরা আলো করিয়া রাখে। মাঠে কোনো গাছপালা নাই ছেলেদের ফুটবল খেলার মাঠের মত সমতল ও তৃণাবৃত ; দক্ষিণে ও বাঁয়ে একদিকে বড় রেলওয়ে-বাঁধটা ও অন্যদিকে দূরবর্তী গ্রামসীমার বনরেখার কোল পর্যন্ত বিস্তৃত। দুই এক সারি তালগাছ এখানে ওখানে ছাড়া এই বড় মাঠটাতে অন্য কোনো গাছ চোখে পড়ে না কোনো দিকে!

এই বিশাল মাঠে প্রতিদিন সকাল হয়, সূর্য মাঝ-আকাশে দুপুরে আগুন ছড়ায়, বেলা ঢলিয়া বৈকাল নামিয়া আসে, গোধূলিতে পশ্চিম দিক কত কি রঙে রঞ্জিত হয়। চাঁদ ওঠে—সারা মাঠ, চরা, রেলওয়ে বাঁধ, ও-পাশের বড় গঙ্গাটা জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হইয়া যায়। কিন্তু কখনও কোনো কালে রাঘব চক্রবর্তী বা তাহার প্রতিবেশীরা এই সুন্দর পল্লীপ্রান্তরের প্রকৃতির লীলার মধ্যে কোনো দেবতার পুণ্য আবির্ভাব কল্পনা করেন নাই, প্রয়োজন বোধও করেন নাই—সেখানে আজ সর্বপ্রথম এই নিরক্ষরা বিকৃত-মস্তিষ্কা গ্রাম্যবধূটি বৈদিক-যুগের মন্ত্রদ্রষ্টা বিদুষীর মত মনে প্রাণে খুঁটি-দেবতার আবাহন করিল।......

আমি এই মাঠেই বৈকালে দাঁড়াইয়া কথাটা ভাবিতেছিলাম। কথাটার গভীরতা সেদিন সেখানে যতটা উপলব্ধি করিয়াছিলাম, এমন আর বোধহয় কোথাও করিব না।

নন্দলাল স্ত্রীর অবস্থা দেখিয়া বড় বিব্রত হইয়া পড়িল। সে স্ত্রীকে ভালবাসিত ; নানারকম ঔষধ, জড়ি বুটি, শিকড়-বাকড় আনিয়া স্ত্রীকে ব্যবহার করাইল। তিরোলের পাগলী-কালীর বালা পরাইল ; যে যাহা বলে তাহাই করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতে কিছু হয় না। একটা সুফল দেখিয়া সে খুশী হইল যে আজকাল স্ত্রী সকালে উঠিয়া ছাইগাদা হাতড়াইতে বসে না। তবুও সংসারের কাজকর্মগুলি কেমন অন্যমনস্কভাবে করে, হয়তো বা তরকারী পুড়াইয়া ধরাইয়া ফেলে, নয়তো ডালে খানিকটা বেশী নুন দেয়, ভাল করিয়া কথা বলে না—ইহাই রহিল তাহার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ।

মাস দুই কাটিয়া গেল। শ্রাবণ মাস। বর্ষার ঢল নামিয়া বড় গঙ্গা ও ছোট গঙ্গা একাকার করিয়া দিল, চর ডুবিয়া গেল। কূলে কূলে গেরিমাটির রঙের জলে ভর্তি। এই সময় নন্দলালের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া উঠিল! হাতে পূর্বে যাহা কিছু ছিল, সবই খরচ হইয়া গিয়াছে—এদিকে চাকরিও জুটিল না।

রাঘব চক্রবর্তী ভাগিনেয়কে খুঁটিনাটি লইয়া বকুনি শুরু করিলেন। ভাগিনেয়কে ডাকিয়া বলিলেন—কোনো কিছু একটা দেখে নিতে তো পারলে না। তা দিনকতক এখন না হয় বউমাকে বাপের বাড়ি রেখে তুমি কলকাতার দিকে গিয়ে কাজকর্মের ভালো করে' চেষ্টা করো, নইলে আমি আর কি করে' চালাই বলো। এই তো দেখছো অবস্থা —ইত্যাদি।

নন্দলাল পড়িয়া গেল মহা বিপদে। না আছে চাকরি, না আছে কোন সম্বল—ও-দিকে অসুস্থা তরুণী-বধূ ঘরে। বীজপুরের কারখানায় কয়েকবার যাতায়াতের ফলে একজন রঙের মিস্ত্রির সঙ্গে বন্ধুত্ব হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে বলিয়া কহিয়া তাহার বাসায় বউকে লইয়া গিয়া আপাততঃ তুলিল। দুইটি মাত্র ঘর, একখানা ঘরে মিস্ত্রি একলা থাকে, অন্য ঘরখানি নন্দলালকে ছাড়িয়া দিল! মিস্ত্রি গাড়িতে অক্ষর লেখে—সে চেষ্টা করিয়া সাহেবকে ধরিয়া নন্দলালের জন্য একটা ঠিকা কাজ জুটাইয়া দিল। একটা বড় লম্বা রেক আগাগোড়া পুরানো রং উঠাইয়া নূতন রং করা হইবে, নন্দলাল জমির রং করিবার জন্য এক মাসের চুক্তিতে নিযুক্ত হইল।

রাঘব চক্রবর্তী কিছুকালের জন্য হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। হঠাৎ একদিন তিনি অনেকজন মজুর ধরিয়া বাড়ির উঠান পরিষ্কার করাইতে লাগিলেন। শখ করিয়া এক-জোড়া হরিণের চামড়ার জুতা কিনিয়া আনিলেন, এমন কি পূজার সময় একবার কাশী বেড়াইতে যাইবার সংকল্প করিয়া ফেলিলেন।

আশ্বিনের প্রথমে বর্ষা একটু কমিল। রাঘব চক্রবর্তী বাড়ির চারিধারে পাঁচিল গাঁথিবার মিস্ত্রী খাটাইতেছিলেন, সারাদিন পরিশ্রমের পর গঙ্গায় গা ধুইয়া আসিয়া সন্ধ্যার পরই তিনি শুইয়া পড়িলেন।

অত পরিশ্রম করিবার পর তিনি শুইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ঘুম আদৌ আসিল না। ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টায় সারারাত্রি ছটফট করিয়া শেষ রাত্রে উঠিয়া তামাক খাইতে বসিলেন। দিনমানেও দুপুরে ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই ঘুম হইল না। সারাদিনের মজুর খাটাইবার পরিশ্রমের ফলে শরীর যা গরম হইয়াছে! সেদিনও যখন রাত্রে ঘুম আসিল না, তখন পাঁচিল-গাঁথার জনমজুরকে বলিয়া দিলেন—এখন দিন দুই কাজ বন্ধ থাকুক।

পরদিন রাত্রে সামান্য কিছু আহার করিয়া ঠাণ্ডা জল মাথায় দিয়া ও হাত-পা ধুইয়া সকাল সকাল শুইয়া পড়িলেন। প্রথমটা ঘুম না আসাতে ভাবিলেন, ঘুমের সময় এখনও ঠিক হয় নাই কিনা, তাই ঘুম আসিতেছে না। এ-পাশ ও-পাশ করিতে লাগিলেন। দশটা......এগারোটা......বারোটা......রাঘব প্রাণপণে চক্ষু বুজিয়া রহিলেন, নানাভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া শুইয়া দেখিলেন—ঘুম এখনও আসে না কেন? আরও ঘণ্টা দুই কাটিয়া গেল—ঘুমের চিহ্নও নাই! চাঁদ ঢলিয়া পড়িল, জানালা দিয়া যে বাতাস বহিতেছে তাহা আগেকার অপেক্ষা ঠাণ্ডা!......রাঘবের কেমন ভয় হইল—তবে বোধহয় আজও ঘুম হইবে না! ভাবিতেও বুকটা কেমন করিয়া উঠিল। আজ রাত্রে না ঘুম হইলে কাল তিনি বাঁচিবেন কি করিয়া?......উঠিয়া মাথায় আর একবার জল দিলেন—আবার শুইলেন, আবার প্রাণপণে ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এই ভাবিয়া তাঁহার মাথা গরম হইয়া উঠিল—ঘুম......ঘুম যদি না আসে! তাহা হইলে?......রাত্রি ফরসা হইয়া কাককোকিল ডাকিয়া উঠিল, তখনও হতভাগ্য রাঘব চক্রবর্তী বিছানায় ছটফট করিতে করিতে ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছেন!

ঠিক এইভাবে কাটিয়া গেল আরও আট দিন। এই আট দিনের মধ্যে কি দিনে, কি রাতে রাঘবের চোখে একটুকু ঘুম আসিল না পলকের নিমিত্ত—রাঘব পাগলের মত হইলেন—যে যাহা বলিল তাহাই করিয়া দেখিলেন। ডাব খাইয়া ও পুকুরের পচা পাঁক মাথায় দিনরাত দিয়া থাকিতে থাকিতে নিউমোনিয়া হইবার উপক্রম হইল। অবশেষে বাঁশবেড়ের মনোহর ডাক্তারের ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখিলেন!

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। আরও দিন ছয় সাত কাটিয়া গেল। রাঘব সন্ধ্যার পরই হাত-পা ধুইয়া মন স্থির করিয়া শুইতে যান। কিন্তু বালিশে মাথা দিয়াই বুকের মধ্যে গুর্ গুর্ করে—আজও বোধহয় ঘুম......

বাকীটা আর রাঘব ভাবিতে পারেন না।

রাজমিস্ত্রীর দল কাজ শেষ না করিয়াই চলিয়া গেল। উঠানে জঙ্গল বাধিয়া উঠিল! রাঘব স্নানাহার করিতে চান না, চলাফেরা করিতে চান না, সব সময়েই ঘরের দাওয়ায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। তামাক খাইবার রুচিও ক্রমে হারাইয়া ফেলিলেন। লোক-জনের সঙ্গে ভাল করিয়া কথাবার্তা কহিতে ভালবাসেন না, পয়সার ভাঁড় উপুড় করিয়া গণিয়া দেখিবার স্পৃহাও চলিয়া গেল।

চিকিৎসা তখনও চলিতেছিল। গ্রামের বৃদ্ধ শিব কবিরাজ বলিলেন—তোমার রোগটা

হয়েছে মানসিক। ঘুম হবে না এ-কথা ভাবো কেন শোবার আগে? খুব সাহস করবে, মনে মনে জোর করে' ভাববে—আজ ঘুম হবে, নিশ্চয়ই হবে, আজ ঠিক ঘুমুবো—এ রকম করে' দ্যাখো দিকি? আর সকাল সকাল শুতে যেও না—যে সময় যেতে, সেই সময় যাবে।

কবিরাজের পরামর্শ মত রাঘব সন্ধ্যার পর পুরানো দিনের মত রন্ধন করিয়া আহার করিলেন। দাওয়ায় বসিয়া গুন্‌গুন্‌ করিয়া গানও গাহিলেন। তারপর ঠান্ডা জলে হাত-পা ও মাথা ধুইয়া শয়ন করিতে গেলেন। মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করিলেন—আজ তিনি নিশ্চয়ই ঘুমাইবেন—নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই।

কিন্তু বালিশে মাথা দিয়াই বুকটা কেমন যেন করিয়া উঠিল! ঘুম যদি না হয়? ......পরক্ষণেই মন হইতে সে-কথা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিলেন—নিশ্চয়ই ঘুম হইবে। পাশ ফিরিয়া পাশ-বালিশটা আঁকড়াইয়া শুইলেন। ঘরের দেওয়ালের একখানা বাঁধানো রাধা-কৃষ্ণের ছবি বাতাস লাগিয়া ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ করিতেছে দেখিয়া আবার বিছানা হইতে উঠিয়া সেখানা নামাইয়া রাখিলেন। পুনরায় শুইয়া পড়িয়া জোর করিয়া চোখ বুজিয়া রহিলেন। আধঘণ্টা......এক ঘণ্টা......এইবার তিনি নিশ্চয়ই ঘুমাইবেন......বুকের মধ্যে গুর্‌গুর্‌ করিতেছে কেন?......না......এইবার ঘুমাইবেনই।

দুই ঘণ্টা—তিন ঘণ্টা।......রাত একটা, গ্রাম নিষুতি, কোনো দিকে সাড়াশব্দ নাই —কাওরা-পাড়ায় এক আধটা কুকুরের ঘেউ ঘেউ ছাড়া।

না—রাত বেশী হইয়াছে, আর রাঘব জাগিয়া থাকিবেন না, এইবার ঘুমাইবেন। বাঁ-দিকে শুইয়া সুবিধা হইতেছে না, হাতখানা বেকায়দায় কেমন মুচড়াইয়া আছে, ডানদিক ফিরিয়া শুইবেন। ছারপোকা?......না, ছারপোকা তো বিছানায় নাই?......যাহা হউক জায়গাটা একবার হাত বুলাইয়া লওয়া ভাল।—যাক, এইবার ঘুমাইবেন। এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হইলেন। রাত দুইটা!

কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। একটা হাট কি মেলা কোথায় যেন বসিয়াছে, রাঘব দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। সব লোক চলিয়া গেল, তবুও দু'দশজন এখনও হাটচালিতে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া শুঁট্‌কী চিংড়ি মাছের দর কষাকষি করিতেছে—ইহারা বিদায় হইলেই রাঘব নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইবেন। একটা লোক চলিয়া গেল—দুইটা—তিনটা—এখনও জন সাত লোক বাকী। রাঘব তাহাদের নিকট গিয়া চলিয়া যাইবার অনুরোধ করিতেছেন, অনুনয়-বিনয় করিতেছেন, হাত জোড় করিতেছেন—তিনি একটু এইবার ঘুমাইবেন, দোহাই তাহাদের, তাহারা চলিয়া যাক্‌। এখনও জন তিনেক বাকী। ......রাঘবের মনে উল্লাস হইল, আর বিলম্ব নাই।......এখনও দুইজন। এই দুইজন চলিয়া গেলেই ঘুমাইবেন। আর একজন মাত্র......মিনিট পনেরো দেরী—তাহা হইলেই ঘুমাইবেন।

হঠাৎ রাঘব বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। হাট তো কোথাও বসে নাই? কিসের হাট? কোথাকার হাট?......এ সব কি আবোলতাবোল ভাবিতেছেন তিনি? ঘুম তাহা হইলে বোধ হয়......

রাঘব কথাটা ভাবিতেও সাহস করিলেন না।

কত রাত?......ওটা কিসের শব্দ?......বীজপুরের কারখানায় ভোরের বাঁশি বাজিতেছে নাকি?......সে তো রাত চারটায় বাজে। এখনই রাত চারটা বাজিল? অসম্ভব! যাক্‌, যথেষ্ট বাজে কথা ভাবিয়া রাত কাটাইয়াছেন। আর নয়। এইবার তিনি ঘুমাইবেন।

অল্প একটু ঘোর আসিয়াছিল কিনা কে জানে? ভোরের ঠান্ডা বাতাসে হয়তো

একটু আসিতেও পারে। কিন্তু রাঘবের দৃঢ় বিশ্বাস তিনি একটুকু ঘুমান নাই—চোখ চাহিয়াই ছিলেন। হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটিল। বিস্মিত রাঘব দেখিলেন, তাঁহার খাটের পাশের বাঁশের খুঁটিটা যেন ধীরে ধীরে একটা বিরাটকায় মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার মাথার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল ; ব্যঙ্গের সুরে অঙ্গুলি হেলাইয়া বলিল—মূর্খ! ঘুমোবার ইচ্ছা থাকে তো কালই গহনার বাক্স ফেরত দিস। ভাগ্নে-বউয়ের গহনা চুরি করেছিস, লজ্জা করে না?......

বীজপুরের কারখানার বাঁশির শব্দে রাঘবের ঘোর কাটিয়া গেল। ফরসা হইয়া গিয়াছে! রাঘবের বুক ধড়ফড় করিতেছে,- চোখ জ্বালা করিতেছে, মাথা যেন বোঝা, শরীর ভাঙিয়া পড়িতে চাহিতেছে! না, তিনি একটুও ঘুমান নাই—এতটুকু না। বাঁশের খুঁটি-টুটি কিছু না—ও-সব মাথা গরমের দরুন......

কিন্তু ঠিক একই স্বপ্ন রাঘব পর পর দুইদিন দেখিলেন। ঠিক একই সময়ে, ভোর-রাত্রে, বীজপুরের কারখানার বাঁশি বাজিবার পূর্বে।......ঘুমান নাই তবে স্বপ্ন কোথা হইতে আসিবে?

বীজপুরের বাসায় অন্য কেহ তখন ছিল না। নন্দলাল কাজে বাহির হইয়াছে, নন্দলালের স্ত্রী সাবান দিয়া কাপড় কাচিতেছিল। হঠাৎ রুক্ষ চুল, জীর্ণ চেহারার মামাশ্বশুরকে বাসায় ঢুকিতে দেখিয়া সে বিস্মিত মুখে একবার চাহিয়াই লজ্জায় ঘোম্‌টা দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রাঘব চক্রবর্তী একবার চারিদিকে চাহিয়াই কাছে আসিয়া ভাগিনেয়-বধূর পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন—মা তুমি মানুষ নও, তুমি কোনো ঠাকুর-দেবতা হবে। ছেলে বলে আমায় মাপ করো।

তারপর পুঁটুলি খুলিয়া সব গহনাগুলি ভাগিনেয়-বধূর হাতে প্রত্যর্পণ করিলেন, কিন্তু বাসায় থাকিতে রাজি হইলেন না।

—নন্দলালের কাছে কিছু বলবার মুখ নেই আমার। তুমি মা—তোমার কাছে বলতে লজ্জা নেই, বুঝলে না? কিন্তু তার কাছে......

ইহার মাস পাঁচ ছয় পরে রাঘব চক্রবর্তীর গুরুতর অসুখের সংবাদ পাইয়া নন্দলাল সস্ত্রীক গরুর গাড়ি করিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেল। ইহারা যাইবার দিন সাতেক পরে রাঘবের মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁহার যাহা কিছু জমিজমা সব উইল করিয়া ভাগিনেয়-বধূকে দিয়া গেলেন। কিছু পোঁতা টাকার সন্ধানও দিয়া গেলেন।

নন্দলালের স্ত্রীকে কাছে বসাইয়া নিজের স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিয়া গেলেন। বলিলেন—এই যে দেখছো ঘর, এই যে বাঁশের খুঁটি, এর মধ্যে দেবতা আছেন মা। বিশ্বাস করো আমার কথা......

ভাগিনেয়-বধূ শিহরিয়া উঠিল। সেই ঘর, সেই বাঁশের খুঁটি!......

রাঘবের মৃত্যুর পরে ষোলো-সতেরো বৎসর নন্দলাল মামার ভিটাতে সংসার পাতাইয়া বাস করিয়াছিল। বধূটি ছেলেমেয়েদের মা হইয়া সচ্ছল ঘরকন্নার গৃহিণীপনা করিতে করিতে প্রথম জীবনের দুঃখকষ্টের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে খুঁটি-দেবতার কথাও ভুলিয়াছিল। হয়তো দুঃখের মধ্য দিয়া যে আন্তরিকতাপূর্ণ আবেগকে জীবনে একবার মাত্র লাভ করিয়াছিল, আর কখনও জীবন-পথে তাহার সন্ধান মেলে নাই!......

বছর সতেরো পরে নন্দলালের স্ত্রী মারা গেল। নন্দলালের বড় ছেলের তখন বিবাহ হইয়াছে ও বধূ ঘরে আসিয়াছে। বিবাহের বৎসর চারেকের মধ্যে এই বউটি দুরন্ত ক্যান্‌সার রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। ক্যান্‌সার হইল জিহ্বায়, ক্ষত ক্রমে গভীর হইতে লাগিল—কত রকম চিকিৎসা করা হইল, কিছুতে উপকার দেখা গেল না। সে

শুইয়া শুইয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিত, ইদানীং কথা পর্যন্ত কহিতে পারিত না। তাহার যন্ত্রণা দেখিয়া সকলে তাহার মৃত্যু কামনা করিত। কিন্তু বছর কাটিয়া গেল—মৃত্যুর কোনো লক্ষণ নাই, অথচ নিজে যন্ত্রণা পাইয়া, আরও পাঁচজনকে যন্ত্রণা দিয়া সে জীবন্মৃত অবস্থায় বাঁচিয়া রহিল।

বউটি শাশুড়ীর কাছে খুঁটি-দেবতার গল্প শোনেও নাই, জানিতও না। একদিন সে সারারাত রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিল। শ্রাবণ মাস। শেষরাতের দিকে ভয়ানক বৃষ্টি নামিল, ঠাণ্ডাও, খুব, বাহিরে জোর বাতাসও বহিতেছিল। মাথার শিয়রে একটা কাঁসার ছোট ঘটিতে জল ছিল, এক চুমুক জল খাইয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইতেই একটু তন্দ্রা মত আসিল।

তাহার মনে হইল, পাশের খুঁটিটা আর খুঁটি নাই। তাহাদের গ্রামে শ্যামরায়ের মন্দিরের শ্যামরায় ঠাকুর যেন সেখানে দাঁড়াইয়া মৃদু হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন। ছেলেবেলা হইতে কতবার সে শ্যামরায়কে দেখিয়াছে, কতবার বৈকালে উঠানের বেলফুলের গাছ হইতে বেলফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া বৈকালীতে ঠাকুরের গলায় দিয়াছে। শ্যামরায়ের মূর্তি তাহার অপরিচিত নয়—তেমনি সুন্দর, সুঠাম, সুবেশ কমনীয় তরুণ দেবমূর্তি!......

বিশ্বাসে মানুষের রোগ সারে, হয়তো বধূটির তাহাই ঘটিয়াছিল। হয়তো সবটাই তার মনের কল্পনা। রাঘব চক্রবর্তী যে বিরাটাকার পুরুষ দেখিয়াছিলেন সে-ও তাঁহার অনিদ্রা-প্রসূত অনুতাপ-বিদ্ধ মনের সৃষ্টিমাত্র হয়তো—কারণ খুঁটির মধ্যে দেবতা সেই রূপেই তাহার সম্মুখে দেখা দিয়াছিলেন, যার পক্ষে যে রূপের কল্পনা স্বাভাবিক।

সত্য মিথ্যা জানি না—কিন্তু খুঁটি দেবতা সেই হইতে এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন।

পেয়ালা

সামান্য জিনিস। আনা তিনেকের দামের কলাই-করা চায়ের ডিস-পেয়ালা।

যেদিন প্রথম আমাদের বাড়িতে ওরা ঢুকল, সেদিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। শীতকাল ; সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে লেপের মধ্যে যাওয়ার চেষ্টা করচি, এমন সময় কাকার গলার স্বর শুনে দালানের দিকে গেলাম। কাকা গিয়েছিলেন দোকান নিয়ে কুলবেড়ের মেলায়। নিশ্চয় ভাল বিক্রী-সিক্রী হয়েছে!

উঠোনে দুখানা গরুর গাড়ী। কৃষাণ হরু মাইতি একটা লেপ-তোশকের বাণ্ডিল নামাচ্চে। একটা নতুন ধামায় একরাশ সংসারের জিনিস—বেলুন, বেড়ী, খুন্তী, ঝাঁঝরি, হাতা। খানকতক নতুন মাদুর, গোটা দুই কাঁঠাল কাঠের নতুন জল-চৌকী। এক বোঝা পালংশাকের গোড়া, দু-ভাঁড় খেজুর গুড়, আরও সব কি কি।

কাকা আমায় দেখে বললেন—নিবু, একটা লণ্ঠন নিয়ে আয়—এটায় তেল নেই।

আমি এক দৌড়ে রান্নাঘরের লণ্ঠনটা নিয়ে এলাম। পিসিমা হাঁ-হাঁ ক'রে উঠলেন ; কিন্তু তখন কে কথা শোনে?

কাকাকে জিজ্ঞেস করলাম—মেলায় এবার লোকজন কেমন হ'ল কাকা?

কাকা বললেন—লোকজন প্রথমটা মন্দ হয়নি, কিন্তু হঠাৎ কলেরা শুরু হয়ে গেল. ওই তো হল মুশকিল! সব পালাতে লাগল, বাঁওড়ের জলে রোজ পাঁচটা ছ'টা মড়া ফেল্‌ছিল, পুলিস এসে বন্ধ করে দিলে, খাবারের যত দোকান ছিল সব উঠিয়ে দিলে. কিছুতেই কিছু হয় না, ক্রমে বেড়ে চলল। শেষে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলাম। বিক্রিসিক্রী

কাঁচকলা, এখন খোরাকি, গাড়ীভাড়া উঠলে বেঁচে যাই।

খেতে বসে কাকা মেলার গল্প করছিলেন, বাড়ির সবাই সেখানে বসে। কি ক'রে প্রথমে কলেরা আরম্ভ হ'ল, কত লোক মারা গেল, এই সব কথা।

—আহা সামটা-মানপুর থেকে কে একজন, যদু চক্কোত্তি না কি নাম—একখান ছই-এর গাড়ি পুরে বাড়ির লোক নিয়ে এসেচে মেলা দেখতে। ছেলে-মেয়ে, বৌ ঝি, সে একেবারে গাড়ি বোঝাই। বাঁওড়ের ধারের তালতলায় গাড়ি রেখে সেখানেই সব রেঁধে খায়-দায়, থাকে। দু-দিন পরে রাত পোয়ালে বাড়ি ফিরবে, রাত্তিরেই ধরল তাদের একটা ন-বছরের মেয়েকে কলেরায়। কোথায় ডাক্তার, কোথায় ওষুধ, সকাল দশটায় সেটা গেল তো ধরল তার মাকে। রাত আটটায় মা গেল তো ধরল বড় ছেলের বৌকে। তখন এদিকেও রোগ জেঁকে উঠেচে, কে কাকে দ্যাখে—তারপর সে যা কাণ্ড। এক-একটা ক'রে মরে, আর পাশেই বাঁওড়ের জলে ফেলে—আদ্ধেক গাড়ি খালি হয়ে গেল। ব্রাহ্মণের যা সর্বনাশ ঘটল আমাদের চোখের সামনে, উঃ!

কাকা ভুষি-মালের ব্যবসা করেন। প্রায় চল্লিশ মণ সোনামুগ মেলায় বিক্রীর জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন, মণ বারো, না তেরো কাটাতে পেরেছিলেন, বাকী গরুর গাড়িতে ফিরে আস্চে, কাল সকাল নাগাত পৌঁছুবে। গাড়িতে আছে আমাদের আড়তের সরকার হরিবিলাস মান্না।

কাকা খেয়ে উঠে যাবার একটু পরেই কাকার ছোট মেয়ে মনু একটা কলাই-করা পেয়ালা রান্নাঘরে নিয়ে এসে বললে, এই দ্যাখো জ্যাঠাই-মা, বাবা এনেছেন, কাল আমি এতে চা খাব কিন্তু। হাতে তুলে সকলকে দেখিয়ে বললে—বেশ, কেমন, না? মেলায় তিন আনা দরে কেনা—

এই প্রথম আমি দেখলুম পেয়ালাটা।

সে আজ চার বছরের কথা হবে।

তারপর বছর দুই কেটে গেল। আমি কাজ শিখে এখন টিউবওয়েলের ব্যবসা করি। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ডের কাজ সংগ্রহ করবার জন্যে এখানে-ওখানে বড় ছুটো-ছুটি ক'রে বেড়াতে হয়; বাড়িতে বেশীক্ষণ থাকা আজকাল আর বড় ঘটে না।

সেদিন সন্ধ্যার গাড়িতে কলকাতা আসব, আমার বিছানাপত্র বেঁধে রান্নাঘরে চায়ের জন্যে তাগাদা দিতে গিয়েচি—কানে গেল আমার বড় ভাই-ঝি বলচে—ও পেয়ালাটাতে দিও না পিসিমা, বাবা মারা যাওয়ার পর মা ও পেয়ালাটাকে দেখতে পারে না দু-চোখে—

আমি বল্লুম—কোন্ পেয়ালাটা রে? কি হয়েচে পেয়ালার?

আমার ভাই-ঝি পেয়ালা নিয়ে এল, মনে হ'ল কাকার কেনা অনেক দিনের সে পেয়ালাটা।

সে বল্লে—বৌদির অসুখের সময় এই পেয়ালাটা ক'রে দুধ খেতেন. তারপর বাবার সময়ও এতে ক'রে ওঁর মুখে সাবু ঢেলে দেওয়া হ'ত—মা বলে, আমি ওটা দেখতে পারি নে—

আমার এই জ্যাঠতুতো ভাইয়ের স্ত্রী কলকাতা থেকে আমাদের এখানে বেড়াতে এসে অসুখে পড়েন এবং তাতেই মারা যান। এর বছর দুই পরে কাকাও মারা যান পৃষ্ঠব্রণ রোগে। কিন্তু এর সঙ্গে পেয়ালাটার সম্পর্ক কি? যত সব মেয়েলি কুসংস্কার!

পরের বছর থেকে আমার টিউবওয়েলের কাজ খুব জেঁকে উঠল, জেলা বোর্ডের অনেক কাজ এল আমার হাতে। আমার নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই, দূর-দূরান্তের পাড়াগাঁয়ের নানা স্থানে টিউবওয়েল বসানো ও মিস্ত্রী খাটানোর কাজে মহা ব্যস্ত—

বাকী সময়টুকু যায় আর-বছরের বিলের টাকা আদায়ের তদ্বিরে।

সংসারেও আমাদের নানা গোলযোগ বেধে গেল। কাকা যত দিন ছিলেন কেউ কোনো কথাটি বলতে সাহস করে নি সংসারের পুরানো ব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে। এখন—সবাই হয়ে দাঁড়াল কর্তা, কেউ কাউকে মেনে চলতে চায় না।

ঠিক এই সময় আমার ছোট ছেলের ভয়ানক অসুখ হলো। আমার আবার সেই সময় কাজের ভিড় খুব বেশী। জেলা বোর্ডের কাজ শেষ হয়ে গিয়েচে, কিন্তু টাকার তাগাদা করতে হবে ঠিক এই সময়টাতে। নইলে বিল চাপা পড়তে পারে ছ-মাস বা সাত মাসের জন্যে। আমি আজ জেলা, কাল মহকুমা ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগলুম, —এ-মেম্বর ও-মেম্বরকে ধরি, যাতে আমার বিলের পাওনাটা চুকিয়ে দিতে তাঁরা সাহায্য করেন।

কাজ মিটিয়ে যখন বাড়ি ফিরলুম, তখন ওদিকেও কাজ মিটে গিয়েচে। ছেলেটি মারা গিয়েচে—অবিশ্যি চিকিৎসার ত্রুটি হয় নি কিছু, এই যা সান্ত্বনা।

বছরের শেষে আমি শহরে বাসা ক'রে স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের সেখানে নিয়ে এলাম। বাড়ির ওই সব দুর্ঘটনার পরে সেখানে আমাদের কারুর মন বসে না, তাছাড়া আমার ব্যবসা খুব জেঁকে উঠেচে—সর্বদা শহরে না থাক্‌লে কাজের ক্ষতি হয়।

টিউবওয়েলের ব্যবসাতে নেমে একটা জিনিস আমার চোখে পড়েচে যে, আমাদের দেশের, বিশেষ ক'রে পাড়াগাঁয়ের লোকেদের মত অলস প্রকৃতির জীব বুঝি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। অত অল্পে সন্তুষ্ট মানুষ যে কি ক'রে হতে পারে সে যাঁরা এদের সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁদের ধারণাতেও আসবে না। নিশ্চিত মৃত্যুকেও এরা পরম নিশ্চিন্তে বরণ ক'রে নেবে, সকল রকম দুঃখ দারিদ্র্য অসুবিধাকে সহ্য করবে কিন্তু তবু দু-পা এগিয়ে যদি এর কোন প্রতিকার হয় তাতে রাজী হবে না। তবে এদের একটা গুণ দেখেচি, কখনো অভিযোগ করে না এরা, দেশের বিরুদ্ধেও না, দৈবের বিরুদ্ধেও না।

বাইরে থেকে এদের দেখে যাঁরা বলবেন এরা মরে গিয়েচে, এরা জড় পদার্থমাত্র, ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখলে কিন্তু তাঁরা মত বদ্‌লাতে বাধ্য হবেন। এরা মরেনি, বোধ হয় মরবেও না কোন কালে। এদের জীবনীশক্তি এত অফুরন্ত যে, অহরহ মরণের সঙ্গে যুঝে এবং পদে পদে হেরে গিয়েও দমে যায় না এরা, বা ভয় পায় না, প্রতিকার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে না। সহজভাবেই সব মেনে নেয়, সব অবস্থা।

খারাপ বিলের পাটপচানো জল খেয়ে কলেরায় গ্রাম উৎসন্ন হয়ে থাকে, তবু এরা টিউবওয়েলের জন্যে একখানা দরখাস্ত কখনও দেবে না বা তদ্বির করবে না। কে অত ছুটোছুটি করে, কে-ই বা কষ্ট করে? শুধু একখানা দরখাস্ত করা মাত্র, অনেক সময় দরকার বুঝলে জেলা বোর্ড থেকে বিনা খরচায় টিউবওয়েল বসিয়ে দেয়—কিন্তু ততটুকু হাঙ্গামা করতেও এরা রাজী নয়।

বাসায় একদিন বিকেলে চা খাওয়ার সময়ে লক্ষ্য করলুম, আমার ছোট মেয়েটি সেই কলাই করা পেয়ালাটা ক'রে চা খাচ্ছে।

যদিও ওসব মানি নে, তবুও আমার কি-জানি-কি মনের ভাব হ'ল—চা খাওয়া-টাওয়া শেষ হয়ে গেলে পেয়ালাটা চুপি চুপি বাইরে নিয়ে গিয়ে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম পাঁচিলের ওধারের জঙ্গলের মধ্যে।

কাকার বড় মেয়েটির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, ছোট মেয়েটির বয়স দশ বছর, খুব বুদ্ধিমতী। শহরের মেয়ে-স্কুলে লেখাপড়া শেখাব বলে ওকে বাসায় এনে রেখেছিলুম, স্কুলেও ভর্তি করে দিয়েছিলুম।

মাস পাঁচ-ছয় কাট্‌ল। বৈশাখ মাস।

এই সময়েই আমার টিউবওয়েলের কাজের ধুম। আট দশ দিন একাদিক্রমে বাইরে কাটিয়ে বাসায় ফিরি কিন্তু তখনই আবার অন্য একটা কাজে বেরিয়ে যেতে হয়। এতে পয়সা রোজগার হয় বটে, কিন্তু স্বস্তি পাওয়া যায় না। স্ত্রীর হাতের সেবা পাই নে, ছেলেমেয়েদের সঙ্গ পাই নে, শুধু টো টো ক'রে দূরদূরান্তর চাষাগাঁ ঘুরে ঘুরে বেড়ানো—শুধুই এস্টিমেট কষা, মিস্ত্রী খাটানো। মানুষ চায় দু-দন্ড আরামে থাক্‌তে, আপনার লোকেদের কাছে বসে তুচ্ছ বিষয়ে গল্প করতে, নিজের সাজানো ঘরটিতে খানিকক্ষণ ক'রে কাটাতে, হয়তো একটু বসে ভাবতে, হয়তো ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একটু ছেলেমানুষী করতে—শুষ্ক টাকা রোজগারে এসব অভাব তো পূর্ণ হয় না।

হঠাৎ চিঠি পেয়ে বাসায় ফিরলাম, কাকার ছোট মেয়েটির খুব অসুখ।

আমি পৌঁছলাম দুপুরে, একটু পরে রোগীর ঘরে ঢুকে আমি থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেলুম। আমার পিসিমা সেই কলাই-করা পেয়ালাটাতে রোগীকে সাবু না বার্লি খাওয়াচ্চেন।

আমি আমার মেয়েকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম—ও পেয়ালাটা কোথা থেকে এল রে? খুকী বললে—ওটা কুকুরে না কিসে বনের মধ্যে নিয়ে ফেলেছিল বাবা, মনুদি দেখতে পেয়ে নিয়ে এসেছিল। সে তো অনেকদিনের কথা, পাঁচিলের বাইরে ওই যে বন, ওইখানে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

আমি বিস্মিত সুরে জিজ্ঞেস করলুম—মনু নিয়ে এসেছিল? জানিস্ ঠিক তুই?

খুকী অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—হ্যাঁ বাবা, আমি খুব জানি। তুমি না হয় মাকে জিজ্ঞেস করো; আমাদের সেই যে ছোকরা চাকরটাকে কুকুরে কাম্‌ড়েছিল না, ঐ দিন সকালে মনুদি পেয়ালাটা কুড়িয়ে আনে। ওই পেয়ালাতে তাকে কিসের শেকড়ের পাঁচন খাওয়ানো হ'ল আমার মনে নেই।

আমি চমকে উঠলুম, বললুম—কাকে রে? রামলগনকে?

—হ্যাঁ বাবা, সেই যে তারপর এখান থেকে চলে গেল দেশে, সেই ছেলেটা।

আমার সারা গা ঝিম্‌ঝিম্ করছিল—রামলগন কুকুরে কামড়ানোর পর দেশে চলে গিয়েছিল—কিন্তু সেখানে যে সে মারা গিয়েছে, এ খবর আমি কাউকে বলি নি। বিশেষ ক'রে গৃহিণী তাকে খুব ভালবাসতেন বলেই সংবাদটা আর বাসায় জানাই নি। আমাদের টিউবওয়েলের মিস্ত্রী শিউশরণের শালীর ছেলে সে—সে-ই খবরটা মাসখানেক আগে আমায় দেয়।

মনুর অসুখ তখনও পর্যন্ত খুব খারাপ ছিল না, ডাক্তারেরা বল্‌ছেন, ভয়ের কোন কারণ নেই। আমার কিন্তু মনে হ'ল ও বাঁচবে না।

ও পেয়ালাটার ইতিহাস এ বাসায় আর কেউ জানে না, অসুখের সময় যে ওতে করে কিছু খেয়েছে সে আর ফেরে নি। জান্‌ত কেবল কাকার বড় মেয়ে, সে আছে শ্বশুরবাড়ি।

পেয়ালাটা একটু পরেই আবার চুপি চুপি ফেলে দিলুম—হাত দিয়ে তোলবার সময় তার স্পর্শে আমার সারা দেহ শিউরে উঠল—পেয়ালাটা যেন জীবন্ত, মনে হল যেন একটা ক্রূর, জীবন্ত বিষধর সাপের বাচ্চার গায়ে হাত দিয়েচি, যার স্পর্শে মৃত্যু ...যার নিঃশ্বাসে মৃত্যু...

পরদিন দুপুর থেকে মনুর অসুখ বাঁকা পথ ধরল, ন' দিনের দিন মারা গেল।

আমি জানতুম ও মারা যাবে।

মনুর মৃত্যুর পরে পেয়ালাটা আবার কুড়িয়ে এনে ব্যাগের মধ্যে পুরে কাজে বেরুবার

সময় নিয়ে গেলুম। সাত-আট ক্রোশ দূরে একটা নির্জন বিলের ধারে ফেলে দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

শোকের প্রথম ঝাপ্টা কেটে গিয়ে মাস দুই পরে বাসা একটু ঠাণ্ডা হয়েচে তখন। কথায় কথায় স্ত্রীর কাছে একদিন এমনি পেয়ালাটার কথা বলি। তিনি আমার গল্প শুনে যেন কেমন হয়ে গেলেন, কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন, মুখ দিয়ে তাঁর কথা বেরুল না। আমি বললুম—বোধ হয় অত খেয়াল ক'রে তুমি কখনো দ্যাখো নি, তাই ধরতে পার নি—আমি কিন্তু বরাবর—

আমার স্ত্রী বিবর্ণমুখে বললেন—বলব একটা কথা? আমার আজ মনে পড়ল—একটু চুপ করে থেকে বললেন—

—খোকা যখন মারা যায় আর বছর আষাঢ় মাসে, সেই কলাই-করা পেয়ালাটাতে তাকে ডাবের জল খাওয়াতুম। আমি নিজের হাতে কত বার খাইয়েচি। তুমি তো তখন বাইরে বাইরে ঘুরতে, তুমি জানো না।

আমার কোন উত্তর খানিকক্ষণ না পেয়ে বললেন, জান্‌তে তুমি এ কথাটা?

—না, জানতুম না অবিশ্যি। কিন্তু অন্যমনস্ক হয়ে আর একটা কথা মনে তোলা-পাড়া করছিলুম—পেয়ালাটা আমাদের ছেড়েচে তো? ওটাকে কেন তখন ভেঙে চুরমার করে নষ্ট ক'রে দিই নি? আবার কোনো উপায়ে এসে এ বাড়িতে ঢুকবে না তো?

তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প

সন্ধ্যা হইবার দেরী নাই। রাস্তায় পুরোনো বইয়ের দোকানে বই দেখিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময় আমার এক বন্ধু কিশোরী সেন আসিয়া বলিল, এই যে, এখানে কি? চল চল জ্যোতিষীকে হাত দেখিয়ে আসি। তারানাথ জ্যোতিষীর নাম শোন নি? মস্ত বড় গুণী।

হাত দেখানোর ঝোঁক চিরকাল আছে। সত্যিকার ভাল জ্যোতিষী কখনও দেখি নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম—বড় জ্যোতিষী মানে কি? যা বলে তা সত্যি হয়? আমার অতীত ও বর্তমান বলতে পারে? ভবিষ্যতের কথা বললে বিশ্বাস হয় না।

বন্ধু বলিল—চলই না। পকেটে টাকা আছে? দু-টাকা নেবে, তোমার হাত দেখিও। দেখ না বলতে পারে কি না। কাছেই একটা গলির মধ্যে একতলা বাড়ীর গায়ে টিনের সাইন বোর্ডে লেখা আছে—

তারানাথ জ্যোতির্বিনোদ

এই স্থানে হাত দেখা ও কোষ্ঠীবিচার করা হয়। গ্রহশান্তির কবচ তন্ত্রোক্ত মতে প্রস্তুত করি। আসুন ও দেখিয়া বিচার করুন। বড় বড় রাজা-মহারাজার প্রশংসাপত্র আছে। দর্শনী নামমাত্র।

বন্ধু বলিল—এই বাড়ী।

হাসিয়া বলিলাম—লোকটা বোগাস্। এত রাজা-মহারাজা যার ভক্ত তার এই বাড়ী?

বাহিরের দরজায় কড়া নাড়িতেই ভিতর হইতে একটি ছেলে বলিয়া উঠিল—কে?

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল—জ্যোতিষীমশায় বাড়ী আছেন?

ভিতর হইতে খানিকক্ষণ কোন উত্তর শোনা গেল না। তারপর দরজা খুলিয়া গেল। একটা ছোট ছেলে উঁকি মারিয়া আমাদের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে খানিকক্ষণ চাহিয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কোথা থেকে আসছেন?

আমাদের আসিবার উদ্দেশ্য শুনিয়া সে আবার বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ কাহারও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

আমি বলিলাম—ব্যাপার যা দেখছি, তোমার জ্যোতিষী পাওনাদারের ভয়ে দিনরাত দরজা বন্ধ করে রাখে। ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিয়েছে আমরা পাওনাদার কি না দেখতে। এবার ডেকে নিয়ে যাবে।

আমার কথা ঠিক হইল। একটু পরেই ছেলেটি দরজা খুলিয়া বলিল, আসুন ভেতরে।

ছোট একটা ঘরে তক্তাপোশের উপর আমরা বসিলাম। একটু পরে ভিতরের দরজা ঠেলিয়া একজন বৃদ্ধ প্রবেশ করিল। কিশোরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—পণ্ডিতমশায় আসুন।

বৃদ্ধের বয়স ষাট-বাষট্টির বেশি হইবে না। রং টকটকে গৌরবর্ণ, এ-বয়সেও গায়ের রঙের জৌলুস আছে। মাথার চুল প্রায় সব উঠিয়া গিয়াছে। মুখের ভাবে ধূর্ততা ও বুদ্ধিমত্তা মেশানো, নিচের চোয়ালের গড়ন দৃঢ়তাব্যঞ্জক। চোখ দুটি বড় বড়, উজ্জ্বল। জ্যোতিষীর মুখ দেখিয়া আমার লর্ড রেডিঙের চেহারা মনে পড়িল—উভয় মুখাবয়বের আশ্চর্য সৌসাদৃশ্য আছে। কেবল লর্ড রেডিঙের মুখে আত্মপ্রত্যয়ের ভাব আরও অনেক বেশি। আর ইহার চোখের কোণের কুঞ্চিত রেখাবলীর মধ্যে একটু ভরসা-হারানোর ভাব পরিস্ফুট। অর্থাৎ যতটা ভরসা লইয়া জীবনে নামিয়াছিল, এখন তাহার যেন অনেকটাই হারাইয়া গিয়াছে, এই ধরনের একটা ভাব।

প্রথমে আমিই হাত দেখাইলাম।

বৃদ্ধ নিবিষ্টমনে খানিকটা দেখিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আপনার জন্মদিন পনেরই শ্রাবণ, তের-শ পাঁচ সাল। ঠিক? আপনার বিবাহ হয়েছে তের-শ সাতাশ সাল, ঐ পনেরই শ্রাবণ। ঠিক? কিন্তু জন্মমাসে বিয়ে তো হয় না, আপনার হ'ল কেমন ক'রে এরকম তো দেখি নি। কথাটা খুব ঠিক। বিশেষ করিয়া আমার দিনটা মনে ছিল এইজন্য যে, আমার জন্মদিন ও বিবাহের দিন একই হওয়াতে বিবাহের সময় ইহা লইয়া বেশ একটু গোলমাল হইয়াছিল। তারানাথ জ্যোতিষী নিশ্চয়ই তাহা জানে না, সে আমাকে কখনও দেখে নাই, আমার বন্ধু কিশোরী সেনও জানে না—তবে তার সঙ্গে আলাপ মোটে দু-বছরের, তাও এক ব্রিজ খেলার আড্ডায়, সেখানে ঘনিষ্ঠ সাংসারিক কথাবার্তার কোন অবকাশ ছিল না।

তারপর বৃদ্ধ বলিল—আপনার দুই ছেলে, এক মেয়ে। আপনার স্ত্রীর শরীর বর্তমানে বড় খারাপ যাচ্ছে। ছেলেবেলায় আপনি একবার গাছ থেকে প'ড়ে গিয়েছিলেন কিংবা জলে ডুবে গিয়েছিলেন—মোটের উপর আপনার মস্ত বড় ফাঁড়া গিয়েছিল, তের বছর বয়সে। কথা সবই ঠিক। লোকটার কিছু ক্ষমতা আছে দেখিতেছি। হঠাৎ তারানাথ বলিল, বর্তমানে আপনার বড় মানসিক কষ্ট যাচ্ছে, কিছু অর্থনষ্ট হয়েছে। সে টাকা আর পাবেন না, বরং আরও কিছু ক্ষতিযোগ আছে। আমি আশ্চর্য হইয়া উহার মুখের দিকে চাহিলাম। মাত্র দু-দিন আগে কলুটোলা স্ট্রীটের মোড়ে ট্রাম হইতে নামিবার সময় পাঁচখানা নোটসুদ্ধ মনিব্যাগটা খোয়া গিয়াছে। লজ্জায় পড়িয়া কথাটা কাহাকেও প্রকাশ করি নাই। তারানাথ বোধ হয় থট্-রীডিং জানে। কিন্তু আরও ক্ষতি হইবে তাহা কেমন করিয়া বলিতেছে? এটুকু বোধ হয় ধাপ্পা। যাই হোক, সাধারণ হাতদেখা গণকের মতো মন বুঝিয়া শুধু মিষ্টি মিষ্টি কথাই বলে না।

আমার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা সেদিন সে বলিয়াছিল। লোকটার উপর আমার শ্রদ্ধা হইল। মাঝে মাঝে তার ওখানে যাইতাম। হাত দেখাইতে যাইতাম তাহা নয়,

প্রায়ই যাইতাম আড্ডা দিতে।

লোকটার বড় অদ্ভুত ইতিহাস। অল্প বয়স হইতে সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে সে এক তান্ত্রিক গুরুর সাক্ষাৎ পায়। তান্ত্রিক খুব ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাঁর কাছে কিছুদিন তন্ত্রসাধন করিবার ফলে তারানাথও কিছু ক্ষমতা পাইয়াছিল। তাহা লইয়া কলিকাতায় আসিয়া কারবার খুলিল এবং গুরুদত্ত ক্ষমতা ভাঙাইয়া খাইতে শুরু করিল।

শেয়ার মার্কেট, ঘোড়দৌড়, ফাট্‌কা ইত্যাদি ব্যাপারে সে তাহার ক্ষমতা দেখাইয়া শীঘ্রই এমন নাম করিয়া বসিল যে, বড় বড় মাড়োয়ারীর মোটর গাড়ীর ভিড়ে শনিবার সকালে তার বাড়ীর গলি আটকাইয়া থাকিত—পয়সা আসিতে শুরু করিল অজস্র। যে-পথে আসিল, সেই পথেই বাহির হইয়াও গেল। হাতে একটি পয়সাও দাঁড়াইল না।

তারানাথের জীবনে তিনটি নেশা ছিল প্রবল—ঘোড়দৌড়, নারী ও সুরা। এই তিন দেবতাকে তুষ্ট রাখিতে কত বড় বড় ধনীর দুলাল যথাসর্বস্ব আহুতি দিয়া পথের ফকির সাজিয়াছে, তারানাথ তো সামান্য গণৎকার ব্রাহ্মণ মাত্র। প্রথম কয়েক বৎসরে তারানাথ যাহা পয়সা করিয়াছিল, পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহা কর্পূরের ন্যায় উবিয়া গেল, এদিকে ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে করিতে ক্ষমতাটুকুও প্রায় গেল। ক্ষমতা যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সত্যকার পসার নষ্ট হইল। তবুও ধূর্ততা, ফন্দিবাজি, ব্যবসাদারি প্রভৃতি মহৎ গুণরাজির কোনটিরই অভাব তারানাথের চরিত্রে না থাকাতে, সে এখনও খানিকটা পসার বজায় রাখিতে সমর্থ হয়েছে।

কিন্তু বর্তমানে কাবুলী তাড়াইবার উপায় ও কৌশল বাহির করিতেই তারানাথের দিবসের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়, তন্ত্র বা জ্যোতিষ আলোচনার সময়ই বা কই?

আমার মতো গুণমুগ্ধ ভক্ত তারানাথ পসার নষ্ট হওয়ার পরে যে পায় নাই, একথা খুবই ঠিক। আমাকে পাইয়া তাহার নিজের উপরে বিশ্বাস ফিরিয়া আসিয়াছে। সুতরাং আমার উপর তারানাথের কেমন একটা বন্ধুত্ব জন্মিল।

সে আমায় প্রায়ই বলে, তোমাকে সব শিখিয়ে দেব। তোমাকে শিষ্য ক'রে রেখে যাব, লোকে দেখবে তারানাথের ক্ষমতা কিছু আছি কি না। লোক পাই নি এতকাল যে তাকে কিছু দিই।

একদিন বলিল—চন্দ্রদর্শন করতে চাও? চন্দ্রদর্শন তোমায় শিখিয়ে দেব। দুই হাতের আঙুলে দুই চোখ বুজিয়ে চেপে রেখে দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে কান জোর করে চেপে চিত হয়ে শুয়ে থাক। কিছুদিন অভ্যেস করলেই চন্দ্রদর্শন হবে। চোখের সামনে পূর্ণচন্দ্র দেখতে পাবে। ওপরে আকাশে পূর্ণচন্দ্র আর নিচে একটা গাছের তলায় দুটি পরী। তুমি যা জানতে চাইবে, পরীরা তাই ব'লে দেবে। ভালো ক'রে চন্দ্রদর্শন যে অভ্যেস করেছে, তার অজানা কিছু থাকে না।

চন্দ্রদর্শন করি আর না করি, তারানাথের কাছে প্রায়ই যাইতাম। লোকটা এমন সব অদ্ভুত কথা বলে, যা পথে ঘাটে বড় একটা শোনা তো যায়ই না, দৈনন্দিন খাটিয়া খাওয়ার জীবনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কও নাই। পৃথিবীতে যে আবার সে-সব ব্যাপার ঘটে, তার তো কোনদিন জানা ছিল না।

একদিন বর্ষার বিকাল বেলা তারানাথের ওখানে গিয়াছি। তারানাথ পুরাতন একখানা তুলোট কাগজের পুঁথির পাতা উল্টাইতেছে, আমাকে দেখিয়া বলিল—'চল বেলেঘাটাতে একজন বড় সাধু এসেছেন দেখা করে আসি। খুব ভালো তান্ত্রিক শুনেছি।' তারানাথের স্বভাবই ভালো সাধু-সন্ন্যাসীর সন্ধান করিয়া বেড়ানো—বিশেষ করিয়া সে সাধু যদি আবার তান্ত্রিক হয়, তবে তারানাথ সর্ব কর্ম ফেলিয়া তাহার পিছনে দিনরাত

লাগিয়া থাকিবে।

গেলাম বেলেঘাটা। সাধুর ক্ষমতার মধ্যে দেখিলাম, তিনি আমাকে যে-কোন একটা গন্ধের নাম করিতে বলিলেন, আমি বেলফুলের নাম করিতেই তিনি বলিলেন—পকেটে রুমাল আছে? বার করে দেখ।

রুমাল বার করিয়া দেখি তাহাতে বেলফুলের গন্ধ ভুর-ভুর করিতেছে। আমি সাধুর নিকট হইতে পাঁচ-ছয় হাত দূরে বসিয়াছি এবং আমার পকেটে কেহ হাত দেয় নাই, ঘরে আমি, তারানাথ ও সাধু ছাড়া অন্য কেহই নাই, রুমালখানাতে আমার নামও লেখা—সুতরাং হাতসাফাইয়ের সম্ভাবনা আদৌ নাই।

কিছু যে আশ্চর্য না হইলাম এমন নয়, কিন্তু যদি ধরিয়াই লই সাধুবাবাজী তান্ত্রিক-শক্তির সাহায্যেই আমার রুমালে গন্ধের সৃষ্টি করিয়াছেন, তবুও এত কষ্ট করিয়া তন্ত্রসাধনার ফল যদি দুই পয়সার আতর তৈরি করায় দাঁড়ায়, সে সাধনার আমি কোন মূল্য দিই না। আতর তো বাজারেও কিনিতে পাওয়া যায়।

ফিরিবার সময় তারানাথ বলিল—নাঃ, লোকটা নিম্নশ্রেণীর তন্ত্রসাধনা করেছে, তারই ফলে দু-একটা সামান্য শক্তি পেয়েছে।

তাই বা পায় কি করিয়া? বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃত্রিম আতর প্রস্তুত করিতেও তো অনেক তোড়জোড়ের দরকার হয়, মুহূর্তের মধ্যে একজন লোক দূর হইতে আমার রুমালে যে বেলফুলের গন্ধ চালনা করিল—তাহার পিছনেও তো একটা প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক অসম্ভাব্যতা রহিয়াছে, contact at a distance-এর মোটা সমস্যাটাই ওর মধ্যে জড়ানো। যদি ধরি হিপ্‌নটিজ্‌ম্‌, সাধুর ইচ্ছাশক্তি আমার উপর ততক্ষণ কার্যকরী হইতে পারে, যতক্ষণ আমি তাহার নিকট আছি। তাহার সান্নিধ্য হইতে দূরেও আমার উপর যে হিপ্‌নটিজ্‌মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, সে প্রভাবের মূলে কি আছে, সেও তো আর এক গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়।

তারানাথের সঙ্গে তাহার বাড়ীতে গিয়া বসিলাম। তারানাথ বলিল—তুমি এই দেখেই দেখছি আশ্চর্য হয়ে পড়লে, তবুও তো সত্যিকার তান্ত্রিক দেখ নি। নিম্নশ্রেণীর তন্ত্র এক ধরনের জাদু, যাকে তোমরা বলো ব্ল্যাক্‌ম্যাজিক। এক সময়ে আমিও ও-জিনিসের চর্চা যে না করেছি, তা নয়। ও আতরের গন্ধ আর এমন একটা কি, এমন সব ভয়ানক ভয়ানক তান্ত্রিক দেখেছি, শুনলে পরে বিশ্বাস করবে না। একজনকে জানতুম সে বিষ খেয়ে হজম করত। কিছুদিন আগে কলকাতায় তোমরাও এ-ধরনের লোক দেখেছ। সালফিউরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড খেয়েও বেঁচে গেল, জিভে একটু দাগও লাগল না। এসব নিম্ন ধরনের তন্ত্রচর্চার শক্তি, ব্ল্যাক্‌ম্যাজিক ছাড়া কিছু নয়। এর চেয়েও অদ্ভুত শক্তির তান্ত্রিক দেখেছি।

কি হ'ল জান? ছেলেবেলায় আমাদের দেশ বাঁকুড়াতে এক নামকরা সাধু ছিলেন। আমার এক খুড়ীমা তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন, আমাদের ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ী প্রায়ই আসতেন। তিনি আমাদের খুব ভালোবাসতেন, আমাদের বাড়ী এলেই আমাদের নিয়ে গল্প করতে বসতেন, আর আমাদের প্রায়ই বলতেন—দুই চোখের মাঝখানে ভুরুতে একটা জ্যোতি আছে, ভালো ক'রে চেয়ে দেখিস, দেখতে পাবি। খুব একমনে চেয়ে দেখিস। মাস দুই-তিন পরে আমার একদিন জ্যোতি দর্শন হ'ল। মনে ভাবলাম—চন্দ্র-দর্শনের মতো নাকি? মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ধরনের জ্যোতি?

—ঠিক নীল বিদ্যুৎশিখার মতো। প্রথম একদিন দেখলাম সন্ধ্যার কিছু আগে—বাড়ীর পিছনে পেয়ারাতলায় ব'সে সাধুর কথামত নাকের উপর দিকে ঘণ্টাখানেক চেয়ে থাকতাম. —সব দিন ঘটে উঠ্‌ত না, হপ্তার মধ্যে দু-তিন দিন বসতাম। মাস-তিনেক পরে প্রথম

জ্যোতি দর্শন হ'ল নীল, লিক্‌লিকে একটা শিখা, আমার কপালের মাঝখানে ঠিক সামনে খুব স্থির, মিনিটখানেক ছিল প্রথম দিন।

এই ভাবে ছেলেবেলাতেই সাধু-সন্ন্যাসী ও যোগ ইত্যাদি ব্যাপারে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। বাড়ীতে আর মন টেকে না। ঠাকুরমার বাক্স ভেঙে একদিন কিছু টাকা নিয়ে পালিয়ে গেলাম একেবারে সোজা কাশীতে।

একদিন অহল্যা বাঈয়ের ঘাটে বসে আছি, সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয় নি, মন্দিরে মন্দিরে আরতি চলেছে, এমন সময় একজন লম্বা-চওড়া চেহারার সাধুকে খড়ম পায়ে দিয়ে কমণ্ডলু হাতে ঘাটের পৈঠায় নামতে দেখলাম। তাঁর সারা দেহে এমন কিছু একটা ছিল, যা আমাকে আর অন্যদিকে চোখ ফেরাতে দিলে না। সাধু তো কতই দেখি, চুপ ক'রে আছি, সাধুবাবাজী জল ভ'রে পৈঠা বেয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে খাসা বাংলায় বললেন—বাবাজীর বাড়ী কোথায়?

আমি বললাম, বাঁকুড়া জেলায় মালিয়াড়া-রুদ্রপুর।

সাধু থমকে দাঁড়ালেন। বললেন—মালিয়াড়া-রুদ্রপুর? তারপর কি যেন একটা ভাবলেন, খুব অল্পক্ষণ একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। তারপর বললেন—রুদ্রপুরের রামরূপ সান্ন্যালের নাম শুনেছ? তাদের বংশে এখন কে আছে জান?

আমাদের গ্রামে সান্ন্যালেরা এক সময়ে অবস্থাপন্ন ছিল, খুব বড় বাড়ী-ঘর, দরজায় হাতি বাঁধা থাকতো শুনেছি—কিন্তু এখন তাদের অবস্থা খুব খারাপ। কিন্তু রামরূপ সান্ন্যালের নাম তো কখনও শুনি নি! সন্ন্যাসীকে সসম্ভ্রমে সে কথা বলতে তিনি হেসে বললেন—তোমার বয়েস আর কতটুকু! তুমি জানবে কি ক'রে! খেয়াঘাটের কাছে শিবমন্দিরটা আছে তো?

খেয়াঘাট! রুদ্রপুরে নদীই নেই, মজে গিয়েছে কোন্‌কালে, এখন তার ওপর দিয়ে মানুষ-গরু হেঁটে চলে যায়। তবু পুরোনো নদীর খাতের ধারে একটা বহু প্রাচীন জীর্ণ শিবমন্দির জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে আছে বটে। শুনেছি সান্ন্যালদেরই কোন পূর্ব-পুরুষ ঐ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এসব কথা ইনি কি ক'রে জানলেন?

বিস্ময়ের সুরে বললাম—আপনি আমাদের গাঁয়ের কথা অনেক জানেন দেখছি?

সন্ন্যাসী মৃদু হাসলেন, এমন হাসি শুধু স্নেহময় বৃদ্ধপিতামহের মুখে দেখা যায়, তার অতি তরুণ, অবোধ পৌত্রের কোন ছেলেমানুষি কথার জন্য। সত্যি বলছি, সে হাসির স্মৃতি আমি এখনও ভুলতে পারি নি, খুব উঁচু না হ'লে অমন হাসি মানুষ হাসতে পারে না। তারপর খুব শান্ত, সস্নেহ কৌতুকের সুরে বললেন—বাড়ী থেকে বেরিয়েছিস্‌ কেন? ধর্মকর্ম করবি বলে?

আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই তিনি আবার বললেন—বাড়ি ফিরে যা, সংসারধর্ম করগে যা। এ পথ তোর নয়, আমার কথা শোন্‌।

বললাম—এমন নিষ্ঠুর কথা বলবেন না, কিছু হবে না কেন? আমার সংসারে মন নেই। সংসার ছেড়েই এসেছি।

তিনি হেসে বললেন—ওর নাম সংসার ছাড়া নয়। সংসার তুই ছাড়িস্‌ নি, ছাড়তে পারবিও নে। তুই ছেলেমানুষ, নির্বোধ। কিছু বোঝবার বয়েস হয় নি। যা বাড়ী যা। মা-বাপের মনে কষ্ট দিস্‌ নে।

কথা শেষ ক'রে তিনি চলে যাচ্ছেন দেখে আমি বললুম—কিন্তু আমাদের গাঁয়ের কথা কি ক'রে জানলেন বলবেন না? দয়া ক'রে বলুন—

তিনি কোন কথার উত্তর না দিয়ে জোরে জোরে পা ফেলে চলতে লাগলেন—আমিও নাছোড়বান্দা হয়ে তাঁর পিছু নিলাম। খানিক দূরে গিয়ে তিনি আমাকে দাঁড়িয়ে বললেন

—কেন আসছিস্ ?

আপনাকে ছাড়ব না। আমি কিছু চাই নে, আপনার সঙ্গ চাই।

তিনি সস্নেহে বললেন—আমার সঙ্গে এলে তোর কোন লাভ হবে না। তোকে সংসার করতেই হবে। তোর সাধ্য নেই অন্য পথে যাবার। যা চলে যা—তোকে আশীর্বাদ করছি সংসারে তোর উন্নতি হবে।

আর সাহস করলুম না তাঁর অনুসরণ করতে, কি-একটা শক্তি আমার ইচ্ছাসত্ত্বেও যেন তাঁর পিছনে পিছনে যেতে আমায় বাধা দিলে। দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পরে সামনের দিকে চেয়ে দেখি তিনি নেই। বুঝতে পারলুম না কোন্ গলির মধ্যে তিনি ঢুকে পড়েছেন বা কোন্ দিকে গেলেন।

প্রসঙ্গক্রমে ব'লে নিই, অনেক দিন পরে বাড়ী ফিরে এসে দেশের খুব বৃদ্ধ লোকদের কাছে খোঁজ নিয়েও রামরূপ সান্ন্যালের কোন হদিস মেলাতে পারলাম না। সান্ন্যালদের বাড়ীর ছেলেছোকরার দল তো কিছুই বলতে পারে না। ওদের এক শরিক জলপাই-গুড়িতে ডাকঘরে কাজ করতেন, তিনি পেন্সন নিয়ে সেবার শীতকালে বাড়ী এলেন। কথায় কথায় তাঁকে একদিন প্রশ্নটা করাতে তিনি বললেন—দেখ, আমার ছেলেবেলায় বড় জ্যাঠামশায়ের কাছে একখানা খাতা দেখেছি, তাতে আমাদের বংশের অনেক কথা লেখা ছিল। বড় জ্যাঠামশায়ের ঐ সব শখ ছিল, অনেক কষ্ট ক'রে নানা জায়গায় হাঁটা-হাঁটি ক'রে বংশের কুলজী যোগাড় করতেন। তাঁর মুখে শুনেছি চার-পাঁচ পুরুষ আগে আমাদেরই বংশে রামরূপ সান্ন্যাল নদীর ধারে ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রামরূপ সাধক পুরুষ ছিলেন, বিবাহ করেছিলেন, ছেলেমেয়েও হয়েছিল—কিন্তু সংসারে তিনি বড় একটা লিপ্ত ছিলেন না। রামরূপের বড় ভাই ছিলেন রামনিধি, প্রথম যৌবনেই অবিবাহিত অবস্থায় তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন, আর কখনও দেশে ফেরেন নি। অন্ততঃ দেড়-শ বছর আগের কথা হবে!

জিজ্ঞাসা করলুম—ঐ শিবমন্দিরটা ও-রকম মাঠের মধ্যে বেখাপ্পা জায়গায় কেন?

—তা নয়। ওখানে তখন বহতা নদী ছিল। খুব স্রোত ছিল। বড় বড় কিস্তি চলত। কোন্ নৌকা একবার ওই মন্দিরের নিচের ঘাটে মারা পড়ে ব'লে ওর নাম লা-ভাঙার খেয়াঘাট!

প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলুম, খেয়াঘাট?

তিনি অবাক্ হয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন—হ্যাঁ, জ্যাঠামশায়ের মুখে শুনেছি, বাবার মুখে শুনেছি, ত ছাড়া আমাদের পুরোনো কাগজপত্রে আছে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লা-ভাঙার খেয়াঘাটের ওপর। কেন বল তো, এসব কথা তোমার জানবার কি দরকার হ'ল? বই-টই লিখছ নাকি?

ওদের কাছে কোন কথা বলি নি, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল এবং সে বিশ্বাস আজও আছে যে, কাশীর সেই সন্ন্যাসী রামরূপের দাদা রামনিধি নিজেই। কোন অদ্ভুত যৌগিক শক্তির বলে দেড়-শ বছর পরেও বেঁচে আছেন।

বাড়ী থেকে কিছুদিন পরে আবার সাধু-সন্ন্যাসীর সন্ধানে বেরই। বীরভূমের এক গ্রামে শুনলাম সেখানকার শ্মশানে এক পাগলী থাকে, সে আসলে খুব বড় তান্ত্রিক সন্ন্যাসিনী। পাগলীর সঙ্গে দেখা করলাম, নদীর ধারে শ্মশানে। ছেঁড়া একটা কাঁথা জড়িয়ে পড়ে আছে, যেমন ময়লা কাপড়-চোপড় পরনে, তেমনই মলিন জটপাকানো চুল। আমাকে দেখেই সে গেল মহা চটে। বললে—বেরো এখান থেকে, কে বলেছে তোকে এখানে আসতে?

ওর আলুথালু বিকট মলিন চেহারা দেখে মনে যে ভাব এসেছিল, সেটাকে অতি

কণ্ঠে চেপে বললাম—মা, আমাকে আপনার শিষ্য ক'রে নিন্, অনেক দূর থেকে এসেছি, দয়া করুন আমার ওপর। পাগলী চেঁচিয়ে উঠে বললে—পালা এখান থেকে। বিপদে পড়বি।

আঙুল দিয়ে গ্রামের দিকে দেখিয়ে বললে—যা—

নির্জন শ্মশান, ভয় হ'ল ওর মূর্তি দেখে, কি জানি মারবে টারবে নাকি—পাগল মানুষকে বিশ্বাস নেই। সেদিন চলে এলাম, কিন্তু আবার গেলাম তার পরদিন।

পাগলী বললে—আবার কেন এলি?

বললাম—মা, আমাকে দয়া কর—

পাগলী বললে—দূর হ—দূর হ, বেরো এখান থেকে—

তারপর রেগে আমায় মারলে এক লাথি। বললে—ফের যদি আসিস্, তবে বিপদে পড়বি, খুব সাবধান।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, না, এখান থেকে চলে যাই, আর এখানে নয়। কি এক পাগলের পাল্লায় পড়ে প্রাণটা যাবে দেখছি কোন্‌দিন।

শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম পাগলী এসে যেন আমার সামনে দাঁড়িয়েছে, সে চেহারা আর নেই, মৃদু হাসি-হাসি মুখে আমায় যেন বললে—লাথিটা খুব লেগেছে, না রে? তা রাগ করিস্ নে, কাল যাস্ আমার ওখানে। সকালে উঠেই আবার গেলাম। ও মা, স্বপ্ন-টপ্ন সব মিথ্যে। পাগলী আমায় দেখে মারমূর্তি হয়ে শ্মশানের একখানা পোড়া-কাঠ আমার দিকে ছুঁড়ে মারলে। আমিও তখন মরীয়া হয়েছি, বললাম—তুমি তবে রাত্রে আমায় বলতে গিয়েছিলে কেন স্বপ্নে? তুমিই তো আসতে বললে তাই এলাম।

পাগলী খিলখিল ক'রে হেসে উঠল—তোকে বলতে গিয়েছিলাম স্বপ্নে? তোর মুণ্ডু চিবিয়ে খেতে গিয়েছিলাম। হি—হি—হি—যা বেরো—

কেন জানি না, এই পাগলী আমাকে অদ্ভুত ভাবে আকৃষ্ট করেছে, আমি বুঝলাম তখনি সেখানে দাঁড়িয়ে। এ যতই আমাকে বাইরে তাড়িয়ে দেবার ভান করুক, আমার মনে হ'ল ভেতরে ভেতরে এ আমায় এক অজ্ঞাত শক্তির বলে টানছে।

হঠাৎ সে বললে—বোস্ এখানে।

আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলে, তার আঙুল তুলে দেখিয়ে দেবার ভঙ্গিটা যেন খুব রাজা-জমিদারের ঘরের কর্ত্রীর মতো—তার সে হুকুম পালন না ক'রে যেন উপায় নেই।

কাজেই বসতে হ'ল।

সে বললে—কেন এখানে এসে বিরক্ত করিস্ বল্ তো? তোর দ্বারা কি হবে, কিছু হবে না। তোর সংসারে এখনও পুরো ভোগ রয়েছে। আমি চুপ করেই থাকি। খানিকটা বাদে পাগলী বললে—আচ্ছা কিছু খাবি? আমার এখানে যখন এসেছিস্, তার ওপর আবার বামুন, তখন কিছু খাওয়ান দরকার। বল কি খাবি?

পাগলীর শক্তি কত দূর দেখবার জন্য বড় কৌতূহল হ'ল। এর আগে লোকের মুখে শুনে এসেছি, যা চাওয়া যায় সাধু-সন্ন্যাসীরা এনে দিতে পারে। কলকাতায় গন্ধ-বাবাজীর কাছে খানিকটা যদিও দেখেছি, সে আমার ততটা আশ্চর্য ব'লে মনে হয় নি। বললাম—খাব অমৃতি জিলিপি, ক্ষীরের বরফি আর মর্তমান কলা। পাগলী এক আশ্চর্য ব্যাপার করলে। শ্মশানের কতকগুলো পোড়াকয়লা পাশেই পড়েছিল, হাতে তুলে নিয়ে বললে—এই নে খা, ক্ষীরের বরফি—

আমি তো অবাক্! ইতস্ততঃ করছি দেখে সে পাগলের মতো খিলখিল করে কি এক রকম অসম্বন্ধ হাসি হেসে বললে—খা—খা—ক্ষীরের বরফি খা—

আমার মনে হ'ল এ তো দেখছি পুরো পাগল, কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, এর কথায়

মড়া পোড়ানো কয়লা মুখে দেব—ছিঃ ছিঃ—কিন্তু আমার তখন আর ফেরবার পথ নেই, অনেক দূর এগিয়েছি। দিলাম সেই কয়লা মুখে পুরে, যা থাকে কপালে! পরক্ষণেই থু থু করে সেই বিশ্রী, বিস্বাদ চিতার কয়লার টুকরো মুখ থেকে বার ক'রে ফেলে দিলুম। পাগলী আবার খিলখিল করে হেসে উঠল।

রাগে দুঃখে আমার চোখে তখন জল এসেছে। কি বোকামি করেছি এখানে এসে—এ পাগলই, পাগল ছাড়া আর কিছু নয়, বদ্ধ উন্মাদ, পাড়াগাঁয়ের ভূতেরা সাধু বলে নাম রটিয়েচে।

পাগলী হাসি থামিয়ে বিদ্রূপের সুরে বল্‌লে—খেলি রাবড়ি, মর্তমান কলা? পেটুক কোথাকার। পেটের জন্যে এসেছে শ্মশানে আমার কাছে? দূর হ জানোয়ার—দূর হ। আমার ভয়ানক রাগ হ'ল। অমন নিষ্ঠুর কথা আমায় কখনও কেউ মুখের ওপর বলে নি। একটিও কথা না ব'লে আমি তখনই সেখান থেকে উঠে চলে এলাম। বললে বিশ্বাস করবেন না, আবার সেদিন শেষ রাত্রে পাগলীকে স্বপ্নে দেখলাম, আমার শিয়রের দিকে দাঁড়িয়ে হাসিহাসি মুখে বলছে—রাগ করিস্ নে। আসিস্ আজ, রাগ করে না, ছিঃ—

এখনও পর্যন্ত আমার সন্দেহ হয় পাগলীকে স্বপ্নে দেখেছিলাম, না জাগ্রত অবস্থায় দেখেছিলাম।

যা হোক্, জেগে উঠে আমার রাগ আর রইল না। পাগলী আমায় যাদু করলে নাকি?

গেলাম আবার দুপুরে। এবার কিন্তু তার মূর্তি ভারী প্রসন্ন! বললে—আবার এসেছিস্ দেখছি। আচ্ছা নাছোড়বান্দা তো তুই?

আমি বললাম—কেন বাঁদর নাচাচ্ছ আমায় নিয়ে? দিনে অপমান ক'রে বিদেয় ক'রে আবার রাত্রে গিয়ে আসতে বল। এ রকম হয়রান ক'রে তোমার লাভ কি?

পাগলী বললে—পারবি তুই? সাহস আছে? ঠিক যা বলব তা করবি? বললাম—আছে। যা বলবে তাই করব। দেখই না পরীক্ষা ক'রে। সে একটা অদ্ভুত প্রস্তাব করলে। সে বললে—আজ রাত্রে আমায় তুই মেরে ফেল্। গলা টিপে মেরে ফেল্। তারপর আমার মৃতদেহের ওপর ব'সে তোকে সাধনা করতে হবে। নিয়ম ব'লে দেব। বাজার থেকে মদ কিনে নিয়ে আয়। আর দুটো চাল-ছোলা ভাজা। মাঝে মাঝে আমার মৃতদেহ হাঁ ক'রে বিকট চিৎকার ক'রে উঠবে যখন, তখন আমার মুখে এক ঢোক মদ আর দুটো চাল-ছোলা ভাজা দিবি। ভোর-রাত পর্যন্ত এমনি মড়ার ওপর ব'সে মন্ত্রজপ করতে হবে। রাত্রে হয়ত অনেক রকম ভয় পাবি। যারা এসে ভয় দেখাবে তারা কেউ মানুষ নয়। কিন্তু তাদের ভয় ক'রো না। ভয় পেলে সাধনা তো মিথ্যা হবেই, প্রাণ পর্যন্ত হারাতে পার। কেমন রাজী?

ও যে এমন কথা বলবে তা বুঝতে পারি নি। কথা শুনে তো অবাক্ হয়ে গেলাম। বললাম, সব পারব কিন্তু মানুষ খুন করা আমায় দিয়ে হবে না। আর তুমিই বা আমার জন্যে মরবে কেন?

পাগলী রেগে বললে—তবে এখানে মরতে এসেছিলি কেন মুখপোড়া, বেরো, দূর হ—

আরও নানা রকম অশ্লীল গালাগাল দিলে। ওর মুখে কিছু বাধে না, মুখ বড় খারাপ। আমি আজকাল ওগুলো আর তত গায়ে মাখি নে, গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। বললাম—রাগ করছ কেন? একটা মানুষকে খুন করা কি মুখের কথা? আমি না ভদ্রলোকের ছেলে?

পাগলী আবার মুখ বিকৃত ক'রে বললে—ভদ্দর লোকের ছেলে! ভদ্দর লোকের ছেলে তবে এ পথে এসেছিস্ কেন রে, অলপ্পেয়ে ঘাটের মড়া? তন্ত্র-মন্ত্রের সাধনা

ভদ্দর লোকের ছেলের কাজ নয়—যা গিয়ে কামিজ চাদর প'রে হোসে চাকরি কর্ গিয়ে —বেরো—

বললাম—তুমি শুধু রাগই কর। পুলিসের হাঙ্গামার কথাটা তো ভাবছ না। আমি যখন ফাঁসি যাব, তখন ঠেকাবে কে?

মনে মনে আবার সন্দেহ হ'ল, না, এ নিতান্তই পাগল, বদ্ধ উন্মাদ। এর কাছে এসে শুধু এতদিন সময় নষ্ট করেছি ছাড়া আর কিছু না।

তখনই মনে পড়ল পাগলীর মুখে শুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক শুনেছি, তন্ত্রের কথা শুনেছি। সময়ে সময়ে সত্যই এমন কথা বলে যে, ওকে বিদুষী ব'লে সন্দেহ হয়।

সেইদিন থেকে পাগলী আমার ওপর প্রসন্ন হ'ল। বিকেলে যখন গেলাম, তখন আপনিই ডেকে বললে—আমার রাগ হ'লে আর জ্ঞান থাকে না, তোকে ওবেলা গালাগাল দিয়েছি, কিছু মনে করিস নে। ভালোই হয়েছে, তুই সাধনা করতে চাস্ নি। ও সব নিম্ন-তন্ত্রের সাধনা। ওতে মানুষের কতকগুলো শক্তি লাভ হয়। তা ছাড়া আর কিছু হয় না।

বললাম—কি ভাবে শক্তি লাভ হয়? পাগলী বললে—পৃথিবীতে নানা রকম জীব আছে তাদের চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। মানুষ ম'রে দেহশূন্য হ'লে চোখে দেখা যায় না, আমরা তাদের বলি ভূত। এ ছাড়া আরও অনেক রকম প্রাণী আছে, তাদের বুদ্ধি মানুষের চেয়ে কম, কিন্তু শক্তি বেশি। এদেরও দেখা যায় না। তন্ত্রে এদের ডাকিনী, শাঁখিনী এই সব নাম। এরা কখনও মানুষ ছিল না, মানুষ ম'রে যেখানে যায়, এরা সেখানকার প্রাণী। মুসলমান ফকিরেরা এদের জিন্ বলে। এদের মধ্যে ভালো-মন্দ দুই-ই আছে। তন্ত্রসাধনার বলে এদের বশ করা যায়। তখন যা বলা যায় এরা তাই করে। করতেই হবে, না ক'রে উপায় নেই। কিন্তু এদের নিয়ে খেলা করার বিপদ আছে। অসাবধান তুমি যদি হয়েছ, তোমাকে মেরে ফেলতে পারে।

অবাক্ হয়ে ওর কথা শুনছিলাম। এসব কথা আর কখনও শুনি নি। এর মতো পাগলের মুখেই এ-কথা সাজে। আর যেখানে বসে শুনছি, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাও এই কথার উপযুক্ত বটে। গ্রাম্য শ্মশান, একটা বড় তেঁতুলগাছ আর এক দিকে কতকগুলো শিমুল গাছ। দু-চার দিন আগের একটা চিতার কাঠকয়লা আর একটা কলসী জলের ধারে পড়ে রয়েছে। কোনদিকে লোকজন নেই। অজ্ঞাতসারে আমার গা যেন শিউরে উঠল।

পাগলী তখনও ব'লে যাচ্ছে। অনেক সব কথা, অদ্ভুত ধরনের কথা!

—এক ধরনের অপদেবতা আছে, তন্ত্রে তাদের বলে হাঁকিনী। তারা অতি ভয়ানক জীব। বুদ্ধি মানুষের চেয়ে অনেক কম, দয়া মায়া ব'লে পদার্থ নেই তাদের। পশুর মতো মন। কিন্তু তাদের ক্ষমতা সব চেয়ে বেশি। এরা যেন প্রেতলোকের বাঘ-ভালুক। ওদের দিয়ে কাজ বেশি হয় ব'লে যাদের বেশি দুঃসাহস, এমন তান্ত্রিকেরা হাঁকিনী-মন্ত্রে সিদ্ধ হবার সাধনা করে। হ'লে খুবই ভালো, কিন্তু বিপদের ভয়ও পদে পদে। তাদের নিয়ে যখন তখন খেলা করতে নেই, তাই তোকে বারণ করি। তুই বুঝিস্ নে, তাই রাগ করিস্।

কৌতূহল আর সংবরণ করতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি তা'হলে হাঁকিনীমন্ত্রে সিদ্ধ, না? ঠিক বল।

পাগলী চুপ করে রইল।

আমি তাকে আর প্রশ্ন করলাম না, বুঝলাম পাগলী এ-কথা কিছুতেই বলবে না। কিন্তু এ-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ রইল না।

পরদিন গ্রামের লোকে আমাকে পাগলীর সম্বন্ধে অনেক কথা বললে। বললে—আপনি ওখানে যাবেন না অত ঘন ঘন। পাগলী ভয়ানক মানুষ, ওর মধ্যে এমন শক্তি আছে, আপনার একেবারে সর্বনাশ ক'রে দিতে পারে। ওকে বেশি ঘাঁটাবেন না মশায়। গাঁয়ের লোক ওর কাছেও ঘেঁষে না। বিদেশী লোক, মারা পড়বেন শেষে?

মনে ভাবলাম, কি আমার করবে, যা করবার তা করেছে। তার কাছে না গিয়ে থাকবার শক্তি আমার নেই।

তার পরে একদিন যা হ'ল, তা বিশ্বাস করবেন না। একদিন সন্ধ্যের পরে পাগলীর কাছে গিয়েছি, কিন্তু এমন ভাবে গিয়েছি পাগলী না টের পায়। পাগলীর সেই বটতলায় গিয়ে হঠাৎ অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বটতলায় পাগলী বসে নেই, তার বদলে একটি ষোড়শী বালিকা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে রয়েছে। চোখের ভুল নয় মশায়, আমার তখন কাঁচা বয়েস, চোখে ঝাপ্‌সা দেখবার কথা নয়, স্পষ্ট দেখলাম।

ভাবলাম, তাই তো! এ আবার কে এল? যাই কি, না যাই?

দু-এক পা এগিয়ে সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, মা, তিনি কোথায় গেলেন?

মেয়েটি হেসে বললে, কে?

—সেই তিনি, এখানে থাকতেন।

মেয়েটি খিলখিল ক'রে হেসে বললে—আ মরণ, কে তার নামটাই বল্ না—নাম বলতে লজ্জা হচ্ছে নাকি?

আমি চমকে উঠলাম। সেই পাগলীই তো! সেই হাসি, সেই কথা বলবার ভঙ্গি। এই ষোড়শী বালিকার মধ্যে সেই পাগলী রয়েছে লুকিয়ে! সে এক অদ্ভুত আকৃতি, ভেতরে সেই পরিচিতা পাগলী, বাহিরে এক অপরিচিতা রূপসী ষোড়শী বালিকা।

মেয়েটি হেসে ঢ'লে পড়ে আর কি। বললে—এস না, ব'স না এসে পাশে—লজ্জা কি? আহা, আর অত লজ্জায় দরকার নেই। এস—

হঠাৎ আমার বড় ভয় হ'ল। মেয়েটির রকম-সকম আমার ভালো ব'লে মনে হ'ল না—তা ছাড়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল, এ পাগলীই, আমায় কোন বিপদে ফেলবার চেষ্টায় আছে।

ফিরে চলে যাচ্ছি, এমন সময়ে পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালাম, দেখি বটতলায় পাগলী বসে আছে—আর কেউ কোথাও নেই।

আমার তখনও ভয় যায় নি। ভাবলাম, আজ আর কিছুতেই এখানে থাকব না, আজ ফিরে যাই।

পাগলী বললে—এস, ব'স।

বললাম—তুমি ও রকম ছোট মেয়ে সেজেছিলে কেন? তোমার মতলবখানা কি?

পাগলী বললে—আ মরণ, ঘাটের মড়া, আবোল-তাবোল বকছে।

বললাম—না, সত্যি কথা বলছি, আমায় কোন ভয় দেখিও না, যখন তোমায় মা ব'লে ডেকেছি।

পাগলী বললে—শোন্ তবে। তুই সে-রকম নস্। তন্ত্রের সাধনা তোকে দিয়ে হবে না, অত সাধু সেজে থাকবার কাজ নয়। থাক, তোকে দু-একটা কিছু দেব, তাতেই তুই ক'রে খেতে পারবি। একটা মড়া চাই। আসবে শিগ্গির অনেক মড়া, এই ঘাটেই আসবে। ততদিন অপেক্ষা কর্। কিন্তু যা ব'লে দেব, তাই করবি। রাজী আছিস্? শবসাধনা ভিন্ন কিছু হবে না।

তখন আমি মরীয়া হয়ে উঠেছি। আমি ভীতু লোক ছিলাম না কোন কালেই, তবুও

কখনও মড়ার উপর ব'সে সাধনা করব এ-কল্পনাও করি নি। কিন্তু রাজী হ'লাম পাগলীর প্রস্তাবে। বললাম—বেশ, তুমি যা বলবে তাই করব। কিন্তু পুলিসের হাঙগামার মধ্যে যেন না পড়ি। আর সব তাতে রাজী আছি।

একদিন সন্ধ্যের কিছু আগে গিয়েছি। সেদিন দেখলাম পাগলীর ভাবটা যেন কেমন কেমন। ও আমায় বললে—একটা মড়া পাওয়া গিয়েছে, চুপি চুপি এস।

জলের ধারে বড় একটা পাকুড় গাছের শেকড় জলের মধ্যে অনেকখানি নেমে গিয়েছে। সেই জড়ানো পাকানো জলমগ্ন শেকড়ের মধ্যে একটা ষোল-সতের বছরের মেয়ের মড়া বেধে আছে। কোন্ ঘাট থেকে ভেসে এসেছে বোধ হয়।

ও বললে, তোল্ মড়াটা—শেকড় বেয়ে নেমে যা। জলের মধ্যে মড়া হাল্‌কা হবে। ওকে তুলে শেকড়ে রেখে দে। ভেসে না যায়।

তখন কি করছি জ্ঞান ছিল না। মড়ার পরনে তখনও কাপড়, সেই কাপড় জড়িয়ে গিয়েছে শেকড়ের মধ্যে। আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না, অল্প চেষ্টাতেই সেটা টেনে তুলে ফেললাম।

পাগলী বললে—মড়ার ওপর ব'সে তোকে সাধনা করতে হবে—ভয় পাবি নে তো? ভয় পেয়েছ কি মরেছ।

আমি হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে চিৎকার ক'রে উঠলাম। মড়ার মুখ তখন আমার নজরে পড়েছে। সেদিনকার সেই ষোড়শী বালিকা। অবিকল সেই মুখ, সেই চোখ, কোন তফাত নেই।

পাগলী বললে—চেঁচিয়ে মরছিস্ কেন, ও আপদ?

আমার মাথার মধ্যে কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েছে তখন। পাগলীকে দেখে তখন আমার অত্যন্ত ভয় হ'ল। মনে ভাবলাম, এ অতি ভয়ানক লোক দেখছি। গাঁয়ের লোকে ঠিকই বলে।

কিন্তু ফিরবার পথ তখন আমার বন্ধ। পাগলী আমায় যা যা করতে বললে, সন্ধ্যে থেকে আমাকে তা করতে হ'ল।

শবসাধনার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে সব কথা তোমায় বলবারও নয়। সন্ধ্যের পর থেকেই আমি শবের ওপর আসন ক'রে বসলাম। পাগলী একটা অর্থশূন্য মন্ত্র আমাকে বললে—সেটাই জপ করতে হবে অনবরত। আমার বিশ্বাস হয় নি যে, এতে কিছু হয়। এমন কি, ও যখন বললে—যদি কোন বিভীষিকা দেখ, তবে ভয় পেয়ো না। ভয় পেলেই মরবে।—তখনও আমার মনে বিশ্বাস হয় নি।

রাত্রি দুপুর হ'ল ক্রমে। নির্জন শ্মশান, কেউ কোন দিকে নেই, নীরন্ধ্র অন্ধকারে দিগবিদিক্ লুকিয়েছে। পাগলী যে কোথায় গেল, তাও আমি আর দেখি নি।

হঠাৎ এক পাল শেয়াল ডেকে উঠল নদীর ধারে একটা কষাড় ঝোপের আড়ালে। শেয়ালের ডাক তো কতই শুনি, কিন্তু সেই ভয়ানক শ্মশানে একটা টাটকা মড়ার ওপর ব'সে সেই শেয়ালের ডাকে আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল।

ঠিক সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ব্যাপার ঘটল। বিশ্বাস করা-না-করা তোমার ইচ্ছে—কিন্তু তোমার কাছে মিথ্যে ব'লে কোন স্বার্থ নেই। আমি তারানাথ জ্যোতিষী, বুঝি কেবল পয়সা—তুমি আমাকে এক পয়সা দেবে না। সুতরাং তোমার কাছে মিথ্যে বলতে যাব কেন?

শেয়াল ডাকার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হ'ল, শ্মশানের নিচে নদীজল থেকে দলে-দলে সব বৌ-মানুষরা উঠে আসছে—অল্পবয়সী বৌ, মুখে ঘোমটা টানা, জল থেকে উঠে এল অথচ কাপড় ভিজে নয় কারো। দলে দলে—একটা, দুটো, পাঁচটা, দশটা,

বিশটা।

তারা সকলে এসে আমায় ঘিরে দাঁড়াল—আমি একমনে মন্ত্র জপ করছি। ভাবছি—যা হয় হবে।

একটু পরে ভালো ক'রে চাইতে গিয়ে দেখি, আমার চারপাশে একটাও বৌ নয়, সব কর্‌রা পাখি, বীরভূম নদীর চরে যথেষ্ট হয়। দু-পায়ে গম্ভীর ভাবে হাঁটে ঠিক যেন মানুষের মতো।

এক মুহূর্তে মনটা হাল্‌কা হয়ে গেল—তাই বল! হরি হরি! পাখি!

চিন্তাটা আমার সম্পূর্ণ শেষ হয়নি—পরক্ষণে আমার চারপাশে মেয়েগলায় কারা খলখল ক'রে হেসে উঠল।

হাসির শব্দে আমার গায়ের রক্ত আরও হিম হয়ে জমে গেল যেন। চেয়ে দেখি তখন একটাও পাখি নয়, সবই অল্পবয়সী বৌ। তারা তখন সবাই একযোগে ঘোমটা খুলে আমার দিকে চেয়ে আছে।...আর তাদের চারদিকে, সেই বড় মাঠের যেদিকে তাকাই, অসংখ্য নরকঙ্কাল দূরে, নিকটে, ডাইনে, বাঁয়ে, অন্ধকারের মধ্যে সাদা সাদা দাঁড়িয়ে আছে। কত কালের পুরোনো জীর্ণ হাড়ের কঙ্কাল, তাদের অনেকগুলোর হাতের সব আঙুল নেই, অনেকগুলোর হাড় রোদে জলে চটা উঠে ক্ষয়ে গিয়েছে, কোনটার মাথার খুলি ফুটো, কোনটার পায়ের নলির হাড় ভেঙে বেঁকে আছে। তাদের মুখও নানাদিকে ফেরানো—দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে মনে হয়, কেউ যেন তাদের বহু যত্নে তুলে ধ'রে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। কঙ্কালের আড়ালে পেছন থেকে যে লোকটা এদের খাড়া ক'রে রেখেছে, সে যেই ছেড়ে দেবে, অমনি কঙ্কালগুলো হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়ে গিয়ে জীর্ণ ভাঙাচোরা তোবড়ানো, নোনা-ধরা, হাড়ের রাশি স্তূপাকার হয়ে উঠবে। অথচ তারা যেন সবাই সজীব, সকলেই আমাকে পাহারা দিচ্ছে, আমি যেন প্রাণ নিয়ে এ শ্মশান থেকে পালাতে না পারি। হাড়ের হাত বাড়িয়ে একযোগে সবাই যেন আমার গলা টিপে মারবার অপেক্ষায় আছে।

উঠে সোজা দৌড় দেব ভাবছি, এমন সময় দেখি আমার সামনে এক অতি রূপসী বালিকা আমার পথ আগলে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। এ আবার কে? যা হোক্, সব রকম ব্যাপারের জন্যে আজ প্রস্তুত না হয়ে আর শবসাধনা করতে নামি নি। আমি কিছু বলবার আগে মেয়েটি হেসে হেসে বললে—আমি ষোড়শী, মহাবিদ্যাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমায় তোমার পছন্দ হয় না?

মহাবিদ্যা-টহাবিদ্যার নাম শুনেছিলাম বটে পাগলীর কাছে, কিন্তু তাঁদের তো শুনেছি অনেক সাধনা ক'রেও দেখা মেলে না, আর এত সহজে ইনি...বললাম—আমার মহাসৌভাগ্য যে আপনি এসেছেন...আমার জীবন ধন্য হ'ল—

মেয়েটি বললে—তবে তুমি মহাডামরী সাধনা করছ কেন?

—আজ্ঞে, আমি তো জানি নে কোন্ সাধনা কি রকম। পাগলী আমায় যেমন ব'লে দিয়েছে, তেমনি করছি।

—বেশ, মহাডামরী সাধনা তুমি ছাড়। ও মন্ত্র জপ ক'রো না। যখন দেখা দিয়েছি তখন তোমার আর কিছুতে দরকার নেই। তুমি মহাডামরী ভৈরবীকে দেখ নি—অতি বিকট তার চেহারা...তুমি ভয় পাবে। ছেড়ে দাও ও মন্ত্র।

সাহসে ভর ক'রে বললাম—সাধনা ক'রে আপনাদের আনতে হয় শুনেছি, আপনি এত সহজে আমাকে দেখা দিলেন কেন?

—তোমার সন্দেহ হচ্ছে?

আমার মনে হ'ল এই মুখ আমি আগে কোথাও দেখেছি, কিন্তু তখন আমার মাথার

গোলমাল হয়ে গিয়েছে, কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। বললাম—সন্দেহ নয়, কিন্তু বড় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি। আমি কিছুই জানি নে কে আপনারা।...যদি অপরাধ করি মাপ করুন, কিন্তু কথাটার জবাব যদি পাই—

বালিকা বললে—মহাডামরীকে চেন না? আমাকেও চেন না? তা হ'লে আর চিনে কাজ নেই। এসেছি কেন জিজ্ঞেস করছ? দিব্যোঘ পথের নাম শোননি তন্ত্রে? পাষণ্ড-দলনের জন্যে ঐ পথে আমরা পৃথিবীতে নেমে আসি। তোমার যন্ত্রে দিব্যোঘ পথে সাড়া জেগেছে। তাই ছুটে দেখতে এলাম।

কথাটা ভালো বুঝতে পারলাম না। ভয়ে ভয়ে বললাম, তবে আমি কি খুবই পাষণ্ড?

বালিকা খিলখিল করে হেসে উঠল।

বললে—তোমার বেলা এসেছি সম্প্রদায় রক্ষার জন্যে...অত ভয় কিসের! আমি না তোকে লাথি মেরেছি? শ্মশানের পোড়া কাঠ ছুঁড়ে মেরেছি? তোকে পরীক্ষা না ক'রে কি সাধনার নিয়ম ব'লে দিয়েছি তোকে?

আমি ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি, বলে কি?

মেয়েটি আবার বললে—কিন্তু মহাডামরীর বড় ভীষণ রূপ, তোর যেমন ভয়, সে তুই পারবি নে—ও ছেড়ে দে—

—আপনি যখন বললেন তাই দিলাম।

—ঠিক কথা দিলি?

—দিলাম। এ সময়ে যে-শবদেহের উপর বসে আছি, তার দিকে আমার নজর পড়ল। পড়তেই ভয়ে ও বিস্ময়ে আমার সর্বশরীর কেমন হয়ে গেল!

শবদেহের সঙ্গে সম্মুখের ষোড়শী রূপসীর চেহারার কোন তফাত নেই। একই মুখ, একই রং, একই বয়েস।

বালিকা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে—চেয়ে দেখছিস্ কি?

আমি কথার উত্তর দিলাম না। কিছুক্ষণ থেকে একটা সন্দেহ আমার মনে ঘনিয়ে এসেছিল, সেটা মুখেই প্রকাশ ক'রে বললাম—কে আপনি? আপনি কি সেই শ্মশানের পাগলীও নাকি?

একটা বিকট বিদ্রূপের হাসিতে রাত্রির অন্ধকার চিরে ফেড়ে চৌচির হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মাঠময় নরকঙ্কাল হাড়ের হাতে তালি দিতে দিতে এঁকে বেঁকে উদ্দাম নৃত্য শুরু করলে। আর অমনি সেগুলো নাচের বেগে ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল। কোন কঙ্কালের হাত খসে গেল, কোনটার মেরুদণ্ড, কোনটার কপালের হাড়, কোনটার বুকের পাঁজরাগুলো—তবুও তাদের নৃত্য সমানেই চলেছে—এদিকে হাড়ের রাশি উঁচু হয়ে উঠল, আর হাড়ে হাড়ে লেগে কি বীভৎস ঠক্ ঠক্ শব্দ!

হঠাৎ আকাশের এক প্রান্ত যেন জড়িয়ে গুটিয়ে গেল কাগজের মতো, আর সেই ছিদ্রপথে যেন এক বিকটমূর্তি নারী উন্মাদিনীর মতো আলুথালু বেশে নেমে আসছে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে চার পাশের বনে শেয়ালের দল আবার ডেকে উঠল, বিশ্রী মড়া পচার দুর্গন্ধে চারদিক পূর্ণ হ'ল, পেছনের আকাশটা আগুনের মতো রাঙা-মেঘে ছেয়ে গেল, তার নিচে চিল, শকুনি উড়ছে সেই গভীর রাত্রে! শেয়ালের চিৎকার ও নর-কঙ্কালের ঠোকাঠুকি শব্দ ছাড়া সেই ভয়ানক রাতে বাকি সব জগৎ নিস্তব্ধ, সৃষ্টি নিঝুম!

আমার গা শিউরে উঠল আতঙ্কে। পিশাচীটা আমার দিকেই যেন ছুটে আসছে! তার আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলন্ত দু-চোখে ঘৃণা, নিষ্ঠুরতা ও বিদ্রূপ মেশানো, সে

কি ভীষণ ক্রুর দৃষ্টি! সে পূতিগন্ধ, সে শেয়ালের ডাক, সে আগুন-রাঙা মেঘের সঙ্গে পিশাচীর সেই দৃষ্টিটা মিশে গিয়েছে একই উদ্দেশ্যে—সকলেই তারা আমায় নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করতে চায়।

যে শবটার ওপর ব'সে আছি—সে শবটা চিৎকার করে কেঁদে উঠে বললে—আমায় উদ্ধার কর, রোজ রাত্রে এমনি হয়—আমায় খুন ক'রে মেরে ফেলেছে ব'লে আমার গতি হয় নি—আমায় উদ্ধার কর। কতকাল আছি এই শ্মশানে! ছাপ্পান্ন বছর...কাকেই বা বলি? কেউ দেখে না।

ভয়ে দিশাহারা হয়ে আমি আসন ছেড়ে উঠে দৌড় দিলাম। তখন পূবে ফরসা হয়ে এসেছে।

বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। জ্ঞান হ'লে চেয়ে দেখি আমার সামনে সেই পাগলী ব'সে মৃদু মৃদু ব্যঙ্গের হাসি হাসছে...সেই বটতলায় আমি আর পাগলী দু-জনে।

পাগলী বললে—যা তোর দৌড় বোঝা গিয়েছে। আসন ছেড়ে পালিয়েছিলি না?

আমার শরীর তখনও ঝিমঝিম করছে।

বললুম—কিন্তু আমি ওদের দেখেছি। তুমি যে ষোড়শী মহাবিদ্যার কথা বলতে, তিনিই এসেছিলেন।

পাগলী মুখ টিপে হেসে বললে—তাই তুই ষোড়শীর রূপ দেখে মন্ত্রজপ ছেড়ে দিলি। দূর, ওসব হাঁকিনীদের মায়া। ওরা সাধনার বাধা। তুই ষোড়শীকে চিনিস্ না, শ্রীষোড়শী সাক্ষাৎ ব্রহ্মশক্তি।

'এবং দেবী ত্র্যক্ষরী তু মহাষোড়শী সুন্দরী।'

ক'হাদি সাধনা ভিন্ন তিনি প্রকট হন না। ক'হাদি উচ্চতন্ত্রের সাধনা। তুই তার জানিস্ কি? ওসব মায়া।

আমি সন্দিগ্ধস্বরে বললাম—তিনি অনেক কথা বলেছিলেন যে! আরও এক বিকট-মূর্তি পিশাচীর মতো চেহারা নারী দেখেছি।

আমার মাথার ঠিক ছিল না; তার পরেই মনে পড়ল, পাগলীর কথাও কি একটা তার সঙ্গে যেন হয়েছিল—কি সেটা?

পাগলী বললে, তোর ভাগ্য ভালো। শেষকালে যে বিকটমূর্তি মেয়ে দেখেছিস্, তিনি মহাডামরী মহাভৈরবী—তুই তাঁর তেজ সহ্য করতে পারলি নে—আসন ছেড়ে ভাগলি কেন?

তারপরে সে হঠাৎ হি হি ক'রে হেসে উঠে বললে—মুখপোড়া বাঁদর কোথাকার! উনি দেখা পাবেন ভৈরবীদের! আমি যাদের নাম মুখে আনতে সাহস করি নে—হাঁকিনীদের নিয়ে কারবার করি। ওরে অলপ্পেয়ে, তোকে ভেল্কি দেখিয়েছি। তুই তো সব সময় আমার সামনে ব'সে আছিস বটতলায়। কোথায় গিয়েছিলি তুই? সকাল কোথায়, এখন যে সারারাত সাধনা ক'রে আসন ছেড়ে এলি? এই তো সবে সন্ধ্যে—!

—অ্যাঁ!

আমার চমক ভাঙল। পাগলী কি ভয়ানক লোক! সত্যিই তো সবেমাত্র সন্ধ্যা হয়-হয়। আমার সব কথা মনে পড়ল। এসেছি ঠিক বিকেল ছ-টায়। আষাঢ় মাসের দীর্ঘ বেলা। মড়া ডাঙায় তোলা, শবসাধনা, নরকঙ্কাল, ষোড়শী, উড়ন্ত চিল-শকুনির ঝাঁক, —সব আমার ভ্রম!

হতভম্বের মতো বললাম—কেন এমন ভোলালে? আর মিথ্যে এত ভয় দেখালে?

পাগলী বললে—তোকে বাজিয়ে নিচ্ছিলাম। তোর মধ্যে সে-জিনিস নেই, তোর কর্ম

নয়, তন্ত্রের সাধনা। তুই আর কোনদিন এখানে আসবার চেষ্টা করবি নে। এলেও আর দেখা পাবি নে।

বললাম, একটা কথার শুধু উত্তর দাও। তুমি তো অসাধারণ শক্তি ধরো। তুমি ভৈরব নিয়ে থাক কেন? উচ্চতন্ত্রের সাধনা কর না কেন?

পাগলী আবার একটু গম্ভীর হ'ল। বললে—তুই সে বুঝবি নে। মহাষোড়শী, মহাডামরী, ত্রিপুরা, এঁরা মহাবিদ্যা। ব্রহ্ম শক্তির নারীরূপ। এঁদের সাধনা এক জন্মে হয় না—আমার পূর্বজন্ম এমনি কেটেছে—এ জন্মও গেল। গুরুর দেখা পেলাম না—যা তুই ভাগ, তোর সঙ্গে এ-সব ব'কে কি করব, তোকে কিছু শক্তি দিলাম, তবে রাখতে পারবি নে বেশি দিন। যা পালা—

চলে এলাম। সে আজ চল্লিশ বছরের কথা। আর যাই নি, ভয়েই যাই নি। পাগলীর দেখাও পাই নি আর কোনদিন।

তখন চিনতাম না, বয়েস ছিল কম। এখন আমার মনে হয় যে, পাগলী সাধারণ মানবী নয়। সংসারের কেউ ছিল না, লোকচক্ষুর আড়ালে থাকবার জন্যে পাগল সেজে কেন যে চিরজন্ম শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়াত—তুমি আমি সামান্য মানুষে তার কি বুঝবে? যাক সে-সব কথা। শক্তি পাগলী দিয়েছিল, কিন্তু রাখতে পারি নি। ঠিকই বলেছিল, আমার মনে অর্থের লালসা ছিল, তাতেই গেল। কেবল চন্দ্রদর্শন এখনও করতে পারি। তুমি চন্দ্রদর্শন করতে চাও? এস চিনিয়ে দেব। দুই হাতের বুড়ো আঙুলে দিয়ে—

আমি দেখিলাম তারানাথের বকুনি থামিবে না, যতক্ষণ এখানে আছি। উঠিয়া পড়িলাম, বেলা বারোটা বাজে। আপাততঃ চন্দ্রদর্শন অপেক্ষা গুরুতর কাজ বাকি। তারানাথের কথা বিশ্বাস করিয়াছি কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? ইহার আমি কোনো জবাব দিব ন।

রঙ্কিণী দেবীর খড়গ

জীবনে অনেক জিনিস ঘটে, যাহার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—তাহাকে আমরা অতিপ্রাকৃত বলিয়া অভিহিত করি। জানি না, হয়তো খুঁজিতে জানিলে তাহাদের সহজ ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কারণ বাহির করা যায়। মানুষের বিচার, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতালব্ধ কারণগুলি ছাড়া অন্য কারণ হয়তো তাহাদের থাকিতে পারে—ইহা লইয়া তর্ক উঠাইব না, শুধু এইটুকু বলিব, সেরূপ কারণ যদিও থাকে—আমাদের মতো সাধারণ মানুষের দ্বারা তাহার আবিষ্কার হওয়া সম্ভব নয় বলিয়াই তাহাদিগকে অতি-প্রাকৃত বলা হয়।

আমার জীবনে একবার এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহার যুক্তিযুক্ত কারণ তখন বা আজ কোনদিনই খুঁজিয়া পাই নাই—পাঠকদের কাছে তাই সেটি বর্ণনা করিয়াই আমি খালাস; তাঁহারা যদি সে রহস্যের কোনো স্বাভাবিক সমাধান নির্দেশ করিতে পারেন, যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিব।

ঘটনাটা এইবার বলি।

কয়েক বছর আগেকার কথা। মানভূম জেলার চেরো নামক গ্রামের মাইনর স্কুলে তখন মাস্টারি করি।

প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি, চেরো গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য এমনতর যে এখানে কিছুদিন বসবাস করিলে বাঙলাদেশের একঘেয়ে সমতলভূমির কোনো পল্লী আর চোখে ভালো

লাগে না। একটি অনুচ্চ পাহাড়ের ঢালু সানুদেশ জুড়িয়া লম্বালম্বি ভাবে সারা গ্রামের বাড়ীগুলি অবস্থিত—সর্বশেষ সারির বাড়ীগুলির খিড়কি দরজা খুলিলেই দেখা যায় পাহাড়ের উপরকার শাল, মহুয়া, কুরচি, বিল্ববৃক্ষের পাতলা জঙ্গল, একটা সুবৃহৎ বটগাছ ও তাহার তলায় বাঁধানো বেদী, ছোট বড় শিলাখণ্ড ও ভেলা-কাঁটার ঝোপ।

আমি যখন প্রথম ও-গ্রামে গেলাম তখন একদিন পাহাড়ের মাথায় বেড়াইতে উঠিয়া এক জায়গায় শালবনের মধ্যে একটি পাথরের ভাঙা মন্দির দেখিতে পাইলাম।

সঙ্গে ছিল আমার দুটি উপরের ক্লাসের ছাত্র—তাহারা মানভূমবাসী বাঙালী। একটা কথা—চেরো গ্রামে বেশির ভাগ অধিবাসী মাদ্রাজী, যদিও তাহারা বেশ বাংলা বলিতে পারে, অনেকে বাংলা আচার-ব্যবহারও অবলম্বন করিয়াছে। কি করিয়া মানভূম জেলার মাঝখানে এতগুলি মাদ্রাজী অধিবাসী আসিয়া বসবাস করিল, তাহার ইতিহাস আমি বলিতে পারি না।

মন্দিরটি কালো পাথরের এবং একটু অদ্ভুত গঠনের। অনেকটা যেন চাঁচড়া রাজ-বাড়ীর দশমহাবিদ্যার মন্দিরের মতো ধরনটা—এ অঞ্চলে এরূপ গঠনের মন্দির আমার চোখে পড়ে নাই—তা ছাড়া মন্দিরটি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত ও বিগ্রহশূন্য। দক্ষিণের দেওয়ালে পাথরের চাঁই কিয়দংশ ধ্বসিয়া পড়িয়াছে, দরজা নাই, শুধু আছে পাথরের চৌকাঠ। মন্দিরের মধ্যে ও চারিপাশে বনতুলসীর ঘন জঙ্গল—সান্ধ্য আকাশের পটভূমিতে সেই পাথরের বিগ্রহহীন ভাঙা মন্দির আমার মনে কেমন এক অনুভূতির সঞ্চার করিল। আশ্চর্যের বিষয়, —অনুভূতিটা ভয়ের। ভাঙা মন্দির দেখিয়া মনে ভয় কেন হইল একথা তারপর বাড়ী ফিরিয়া অবাক হইয়া ভাবিয়াছি। তবুও অগ্রসর হইয়া যাইতেছিলাম ভালো করিয়া দেখিতে, একজন ছাত্র বাধা দিয়া বলিল, "যাবেন না স্যার ওদিকে..."

"কেন?"

"জায়গাটা ভালো না। সাপের ভয় আছে সন্ধ্যেবেলা। তা ছাড়া লোকে বলে অনেক রকম ভয়ভীত আছে—মানে অমঙ্গলের ভয়। কেউ ওদিকে যায় না।"

"ওটা কি মন্দির?"

"ওটা রঙ্কিণী দেবীর মন্দির, স্যার। কিন্তু আমাদের গাঁয়ের বুড়ো লোকেরাও কোনো দিন ওখানে পুজো হ'তে দেখে নি—মূর্তিও নেই বহুকাল। ওইরকম জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে আমাদের বাপ-ঠাকুরদার আমলেরও আগে থেকে।...চলুন স্যার নামি।"

ছেলে দুটো যেন একটু বেশি তাড়াতাড়ি করিতে লাগিল নামিবার জন্য।

রঙ্কিণী দেবী বা তাহার মন্দির সম্বন্ধে দু-একজন বৃদ্ধ লোককে ইহার পর প্রশ্নও করিয়াছিলাম—কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি, তাহারা কথাটা এড়াইয়া যাইতে চায় যেন, আমার মনে হইয়াছে রঙ্কিণী দেবী সংক্রান্ত কথাবার্তা বলিতেও তাহারা ভয় পায়।

আমিও আর সে বিষয়ে কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করা ছাড়িয়া দিলাম।

বছর খানেক কাটিয়া গেল।

স্কুলে ছেলে কম, কাজকর্ম খুব হাল্কা, অবসর সময়ে এ-গ্রামে ও-গ্রামে বেড়াইয়া এ অঞ্চলের প্রাচীন পট, পুঁথি, ঘট ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। এ বাতিক আমার অনেকদিন হইতেই আছে। নূতন জায়গায় আসিয়া বাতিকটা বাড়িয়া গেল।

চেরো গ্রাম হইতে মাইল পাঁচ-ছয় দূরে জয়চণ্ডী পাহাড়। এখানে খাড়া উঁচু একটা অদ্ভুত গঠনের পাহাড়ের মাথায় জয়চণ্ডী ঠাকুরের মন্দির আছে। পৌষ মাসে বড় মেলা বসে। বি-এন-আর লাইনের একটা ছোট স্টেশনও আছে এখানে।

এই পাহাড়ের কাছে একটি ক্ষুদ্র বস্তিতে কয়েক ঘর মানভূমপ্রবাসী উড়িয়া

ব্রাহ্মণের বাস। ইহাদের মধ্যে চন্দ্রমোহন পাণ্ডা নামে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমার খুব আলাপ হইয়া গেল—তিনি বাঁকা বাঁকা মানভূমের বাংলায় আমার সঙ্গে অনেক রকমের গল্প করিতেন। পট, পুঁথি, ঘট সংগ্রহের অবকাশে আমি জয়চণ্ডীতলা গ্রামে চন্দ্রমোহন পাণ্ডার নিকট বসিয়া তাঁহার মুখে এদেশের কথা শুনিতাম। চন্দ্র পাণ্ডা আবার স্থানীয় ডাকঘরের পোস্টমাস্টারও। এদেশে প্রচলিত কত রকম আজগুবী ধরনের সাপের, ভূতের, ডাকাতের ও বাঘের (বিশেষ করিয়া বাঘের—কারণ বাঘের উপদ্রব এখানে খুব বেশী) গল্প যে বৃদ্ধ চন্দ্র পাণ্ডার মুখে শুনিয়াছি এবং এই সব গল্প শুনিবার লোভে কত আষাঢ়ের ঘন বর্ষার দিনে বৃদ্ধ পোস্টমাস্টারের বাড়ীতে গিয়া যে হানা দিয়াছি, তাহার হিসাব দিতে পারিব না।

মানভূমের এই সব অরণ্য সভ্যজগতের কেন্দ্র হইতে দূরে অবস্থিত, এখানকার জীবনযাত্রাও একটু স্বতন্ত্র ধরনের। যতই অদ্ভুত ধরনের গল্প হউক, জয়চণ্ডী পাহাড়ের ছায়ায় শালবনবেষ্টিত ক্ষুদ্র গ্রামে বসিয়া বৃদ্ধ চন্দ্র পাণ্ডার বাঁকা বাঁকা মানভূমের বাংলায় সেগুলি শুনিবার সময় মনে হইত—এদেশে এরূপ ঘটিবে ইহা আর বিচিত্র কি? কলিকাতা বালিগঞ্জের কথা তো ইহা নয়।

কথায় কথায় চন্দ্র পাণ্ডা একদিন বলিলেন, "চেরো পাহাড়ে রঙ্কিণী দেবীর মন্দির দেখেচেন?" আমি একটু আশ্চর্য হইয়া বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিলাম।

রঙ্কিণী দেবী সম্বন্ধে এ পর্যন্ত আমি আর কোনো কথা কাহারও মুখে শুনি নাই, সেদিন সন্ধ্যায় আমার ছাত্রটির নিকট যাহা কিছু শুনিয়াছিলাম, তাহা ছাড়া।

বলিলাম, "মন্দির দেখেচি, কিন্তু রঙ্কিণী দেবীর কথা জানবার জন্যে যাকেই জিগ্যেস্ করেচি সে-ই চুপ করে গিয়েচে কিংবা অন্য কথা পেড়েচে—এর কারণ কিছু বলবেন?"

চন্দ্র পাণ্ডা বলিলেন, "রঙ্কিণী দেবীর নামে সবাই ভয় খায়।"

"কেন বলুন তো?"

"মানভূম জেলায় আগে অসভ্য বুনো জাত বাস করতো। তাদেরই দেবতা উনি। ইদানীং হিন্দুরা এসে যখন বাস করলে, উনি হিন্দুদের ঠাকুর হয়ে গেলেন। তখন তাদের মধ্যে কেউ মন্দির করে দিলে। কিন্তু রঙ্কিণী দেবী হিন্দু দেব-দেবীর মতো নয়, অসভ্য বন্য জাতির ঠাকুর—আগে ওই মন্দিরে নরবলি হ'ত—ষাট বছর আগেও রঙ্কিণী মন্দিরে নরবলি হয়েচে। অনেকে বিশ্বাস করে রঙ্কিণী দেবী অসন্তুষ্ট হ'লে রক্ষা নেই—অপমৃত্যু আর অমঙ্গল আসবে তাহ'লে। এরকম অনেকবার হয়েচে নাকি। একটা প্রবাদ আছে এ অঞ্চলে, দেশে মড়ক হবার আগে রঙ্কিণী দেবীর হাতের খাঁড়া রক্তমাখা দেখা যেত। আমি যখন প্রথমে এদেশে আসি, সে আজ চল্লিশ বছর আগের কথা—তখন প্রাচীন লোকদের মুখে একথা শুনেছিলাম।"

"রঙ্কিণী দেবীর বিগ্রহ দেখেছিলেন মন্দিরে?"

"না, আমি এসে পর্যন্ত ওই ভাঙা মন্দিরই দেখচি। এখান থেকে কারা বিগ্রহটি নিয়ে যায়, অন্য কোন্ দেশে। রঙ্কিণী দেবীর এসব কথা আমি শুনতাম ওই মন্দিরের সেবাইত বংশের এক বৃদ্ধের মুখে। তাঁর বাড়ী ছিল ওই চেরো গ্রামেই। আমি প্রথম যখন এদেশে আসি—তখন তাঁর বাড়ী অনেকবার গিয়েচি। দেবীর খাঁড়া রক্তমাখা হওয়ার কথাও তাঁর মুখে শুনি। এখন তাঁদের বংশে আর কেউ নেই। তার পর চেরো গ্রামেও আর বহুদিন যাই নি—বয়েস হয়েচে, বড় বেশি কোথাও বেরুই নি।"

"বিগ্রহ মূর্তি কি?"

"শুনেছিলাম কালীমূর্তি। আগে নাকি হাতে সত্যিকার নরমুণ্ড থাকতো অসভ্যদের আমলে। কত নরবলি হয়েচে তার লেখা-জোখা নেই—এখনও মন্দিরের পেছনে জঙ্গলের

মধ্যে একটা ঢিপি আছে—খুঁড়লে নরমুণ্ড পাওয়া যায়।"

সাধে এদেশের লোক ভয় পায়! শুনিয়া সন্ধ্যার পরে জয়চণ্ডীতলা হইতে ফিরিবার পথে আমারই গা ছমছম করিতে লাগিল।

আরও বছর দুই সুখে-দুঃখে কাটিল। জায়গাটা আমার এত ভালো লাগিয়াছিল যে হয়তো সেখানে আরও অনেকদিন থাকিয়া যাইতাম—কিন্তু স্কুল লইয়াই বাঙালীদের সঙ্গে মাদ্রাজীদের বিবাদ বাধিল। মাদ্রাজীরা স্কুলের জন্য বেশি টাকাকড়ি দিত, তাহারা দাবী করিতে লাগিল কমিটিতে তাহাদের লোক বেশি থাকিবে—ইংরাজির মাস্টার একজন মাদ্রাজী রাখিতেই হইবে, ইত্যাদি। আমি ইংরাজি পড়াইতাম—মাঝে হইতে আমার চাকুরি রাখা দায় হইয়া উঠিল। এই সময়ে আমাদের দেশে একটি হাই স্কুল হইয়াছিল, পূর্বে একবার তাহারা আমাকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, ম্যালেরিয়ার ভয়ে যাইতে চাহি নাই—এখন বেগতিক বুঝিয়া দেশে চিঠি লিখিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব কারণে চেরো গ্রামের মাস্টারি আমায় ছাড়িতে হয় নাই। কিসের জন্য ছাড়িয়া দিলাম পরে সে কথা বলিব।

এই সময় একদিন চন্দ্র পাণ্ডা চেরো গ্রামে কি কার্য উপলক্ষে আসিলেন। আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম আমার বাসায় একটু চা খাইতে হইবে। তাঁহার গরুরগাড়ী সমেত তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বাসাবাড়ীতে আনিলাম।

বৃদ্ধ ইতিপূর্বে কখনও আমার বাসায় আসেন নাই ; বাড়ীতে ঢুকিয়াই চারিদিকে চাহিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিলেন, "এই বাড়ীতে থাকেন আপনি?"

বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ছোট্ট গাঁ, বাড়ী তো পাওয়া যায় না—আগে স্কুলের একটা ঘরে থাকতাম। বছর খানেক হ'ল স্কুলের সেক্রেটারি রঘুনাথন্ এটা ঠিক করে দিয়েচেন।"

পুরানো আমলের পাথরের গাঁথুনির বাড়ী। বেশ বড় বড় তিনটি কামরা, একদিকে একটা সরু যাতায়াতের বারান্দা। জবরদস্ত গড়ন, যেন খিলজিদের আমলের দুর্গ কি জেলখানা—হাজার ভূমিকম্পেও এ বাড়ীর একটু চুন বালি খসাইতে পারিবে না। বৃদ্ধ বসিয়া আবার বাড়ীটার চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। ভাবিলাম বাড়ীটার গড়ন তাঁহার ভালো লাগিয়াছে, বলিলাম, "সেকালের গড়ন, খুব টন্‌কো—আগাগোড়া পাথরের।"

চন্দ্র পাণ্ডা বলিলেন, "না, সেজন্য নয়। আমি এই বাড়ীতে প্রায় ত্রিশ বছর আগে যথেষ্ট যাতায়াত করতাম—এই বাড়ীই হ'ল রুক্মিণী দেবীর সেবাইত বংশের। ওদের বংশে এখন আর কেউ নেই। আপনি যে এ বাড়ীতে আছেন তা জানতাম না।...তা বেশ বেশ। অনেকদিন পরে বাড়ীটাতে ঢুকলাম কিনা, আমার বড় অদ্ভুত লাগচে। তখন বয়েস ছিল ত্রিশ, আর এখন হ'ল প্রায় ষাট।" তারপর অন্যান্য কথা আসিয়া পড়িল। চা পান করিয়া বৃদ্ধ গরুর গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন।

আরও বছর খানেক কাটিয়াছে। দেশের স্কুলে চাকুরির আশ্বাস পাইলেও আমি এখনও যাই নাই, কারণ এখানকার বাঙালী-মাদ্রাজী সমস্যা একরূপ মিটিয়া আসিয়াছে, আপাততঃ আমার চাকুরিটা বজায় রহিল বলিয়াই তো মনে হয়।

চৈত্র মাসের শেষ।

পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূরবর্তী এক গ্রামে আমারই এক ছাত্রের বাড়ীতে অন্নপূর্ণা পূজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম—মধ্যে রবিবার পড়াতে শনিবার গরুর গাড়ী করিয়া রওনা হই, রবিবার ও সোমবার থাকিয়া মঙ্গলবার দুপুরের দিকে বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

বলা আবশ্যক বাসায় আমি একাই থাকি। স্কুলের চাকর রাখহরি আমার রাঁধে,

এ কয়দিন স্কুলের ছুটি ছিল, রাখহরিকে আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। বাহিরের দরজার তালা খুলিয়াই রাখহরি বলিয়া উঠিল, "এঃ, বাবু, এ কিসের রক্ত! দেখুন..."

প্রায় চমকিয়া উঠিলাম।

তাই বটে! বাহিরের দরজায় চৌকাঠের ঠিক ভিতর দিক হইতেই রক্তের ধারা উঠান বাহিয়া যেন চলিয়াছে। একটানা ধারা নয়, ফোঁটা ফোঁটা রক্তের একটা অবিচ্ছিন্ন সারি। একেবারে টাটকা রক্ত—এইমাত্র সদ্য যেন কাহারও মুণ্ড কাটিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

আমি তো অবাক্। কিসের রক্তের ধারা এ! কোথা হইতেই বা আসিল, আজ দুদিন তো বাসা বন্ধ ছিল—বাড়ীর ভিতরের উঠানে রক্তের দাগ আসে কোথা হইতে—তাহার উপর সদ্য তাজা রক্ত!

অবশ্য কুকুর, বিড়াল ও ইঁদুরের কথা মনে পড়িল। এক্ষেত্রে পড়াই স্বাভাবিক। চাকরকে বলিলাম, "দেখ তো রে, রক্তটা কোন্ দিকে যাচ্ছে—এ সেই বড় হুলো বেড়ালটার কাজ..."

রক্তের ধারাটা গিয়াছে দেখা গেল সিঁড়ির নিচের চোরকুঠুরির দিকে। ছোট্ট ঘর, ভীষণ অন্ধকার এবং যত রাজ্যের ভাঙাচোরা পুরনো মালে ভর্তি বলিয়া আমি কোনো-দিন চোরকুঠুরি খুলি নাই। চোরকুঠুরির দরজা পার হইয়া বন্ধ ঘরের মধ্যে রক্তের ধারাটার গতি দেখিয়া ব্যাপার কিছু বুঝিতে পারিলাম না। কতকাল ধরিয়া ঘরটা বাহির হইতে তালা বন্ধ, যদি বিড়ালের ব্যাপারই হয়, বিড়াল ঢুকিতেও তো ছিদ্রপথ দরকার হয়।

চোরকুঠুরির তালা লোহার শিকের চাড় দিয়া খোলা হইল। আলো জ্বালিয়া দেখা গেল ঘরটায় পুরনো, ভাঙা, তোবড়ানো টিনের বাক্স, পুরানো ছেঁড়া গদি, খাটের পায়া, মরিচাধরা সড়কি, ভাঙা টিন, শাবল প্রভৃতি ঠাসা বোঝাই। ঘরের মেঝেতে সোজা রক্তের দাগ এক কোণের দিকে গিয়াছে—রাখহরি খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "এ কি বাবু! এতে কি করে এমনধারা রক্ত লাগল..."

তারপর সে কি একটা জিনিস হাতে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "দেখুন কাণ্ডটা বাবু..." জিনিসটাকে হাতে লইয়া সে বাহিরে আসিতে তাহার হাতের দিকে চাহিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম।

একখানা মরিচাধরা হাতলবিহীন ভাঙা খাঁড়া বা রাম দা— আগার দিকটা চওড়া ও বাঁকানো—বড় চওড়া ফলাটা তাজা রক্তে টক্‌টকে রাঙা! একটু আধটু রক্ত নয়, ফলাতে আগাগোড়া রক্ত মাখানো, মনে হয় যেন খাঁড়াখানা হইতে এখনি টপটপ করিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িবে!

সেই মুহূর্তে এক সঙ্গে আমার অনেক কথা মনে হইল। দুই বৎসর পূর্বে চন্দ্র পাণ্ডার মুখে শোনা সেই গল্প। রুক্মিণী দেবীর সেবাইত বংশের ভদ্রাসন বাড়ী এটা। পুরানো জিনিসের গুদাম এই চোরকুঠুরিতে রুক্মিণী দেবীর হাতের খাঁড়াখানা তাহারাই রাখিয়াছিল হয়তো!...মড়কের আগে বিগ্রহের খাঁড়া রক্তমাখা হওয়ার প্রবাদ।

আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল।

মড়ক কোথায় ভাবিতে পারিতাম যদি সময় পাইতাম সন্দেহ করিবার। কিন্তু তাহা পাই নাই। পরদিন সন্ধ্যার সময় চেরো গ্রামে প্রথম কলেরা রোগীর খবর পাওয়া গেল। তিনদিনের মধ্যে রোগ ছড়াইয়া মড়ক দেখা দিল—প্রথমে চেরো, তারপর পাশের গ্রাম কাজরা, ক্রমে জয়চণ্ডীতলা পর্যন্ত মড়ক বিস্তৃত হইল। লোক মরিয়া ধুলধাবাড় হইতে

লাগিল। চেরো গ্রামের মাদ্রাজী বংশ প্রায় কাবার হইবার যোগাড় হইল।

মড়কের জন্য স্কুল বন্ধ হইয়া গেল। আমি দেশে পলাইয়া আসিলাম ; তারপর আর কখনো চেরোতে যাই নাই— গ্রীষ্মের বন্ধের পূর্বেই দেশের স্কুলের চাকুরিটা পাইয়াছিলাম।

সেই হইতে রুক্মিণী দেবীকে মনে মনে ভক্তি করি। তিনি অমঙ্গলের পূর্বাভাস দিয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দেন মাত্র। মূর্খ জনসাধারণ তাঁহাকে অমঙ্গলের কারণ ভাবিয়া ভুল বোঝে।

মৌচাক. আশ্বিন ১৩৪৭

মেডেল

কয়েক বছর পূর্বে এ ঘটনা ঘটেচে, তাই এখন মাঝে মাঝে আমার মনে হয় ব্যাপারটা আগাগোড়া মিথ্যে ; আমারই কোন প্রকার শারীরিক অসুস্থতার দরুন হয়তো চোখে ভুল দেখে থাকবো বা ওই রকম কিছু।—কিন্তু আমার মন বলে, তা নয়, ঘটনাটা মিথ্যে ও অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেওয়ার কোনো কারণ ঘটে নি। আমার তখনকারের অভিজ্ঞতাই সত্যি, এখন যা ভাবচি, তাই মিথ্যে।

ঘটনাটা খুলে বলা দরকার।

প্রসঙ্গক্রমে গোড়াতেই একথা বলে রাখি যে, গত দশ বৎসরের মধ্যে আমার শরীরে কোনো রোগ-বালাই নেই। আমার মন বা মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ সুস্থ আছে এবং যে সময়ের কথা বলচি, এখন থেকে বছর চারেক আগে, তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। আমার স্কুলমাস্টারের জীবনে অত্যাশ্চর্য বা অবিশ্বাস্য ধরনের কখনও কিছু দেখি নি। অন্য পাঁচজন স্কুলমাস্টারের মতোই অত্যন্ত সাধারণ ও একঘেয়ে রুটিন-বাঁধা কর্তব্যের মধ্যে দিয়েই দিন কাটিয়ে চলেছি আজ বহু বৎসর।

সে বছর বর্ষাকালে, গরমের ছুটির কিছু পরে একদিন ক্লাসে পড়াচ্ছি, এমন সময় একটি ছেলে আর একটি ছেলের সঙ্গে হাত-কাড়াকাড়ি করে কি একটা কেড়ে বা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করচে, আমার চোখে পড়ল। আমি ওদের দুজনকে অমনোযোগিতার জন্যে ধমক দিতে, অন্য একটি ছেলে বলে উঠলো, "স্যার, কামিখ্যে সুধীরের মেডেল কেড়ে নিচ্ছে..."

"কার মেডেল? কিসের মেডেল?"

সুধীর নামে ছেলেটি দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "আমার মেডেল, স্যার!"

অন্য ছেলেটির দিকে চেয়ে বললুম, "ওর মেডেল তুমি নিচ্ছিলে, কামিখ্যে?"

কামিখ্যে ওরফে কামাখ্যাচরণ মৌলিক নামে ছেলেটি বললে, "নিচ্ছিলুম না স্যার, দেখতে চাইছিলুম ; তা, ও দেবে না..."

"ওর মেডেল যদি ও না দেয় ; তোমার কেড়ে নেবার কি অধিকার আছে? বোসো, ও রকম আর করবে না..."

কথা শেষ করে সুধীরের দিকে চেয়ে ক্লাসের ছেলেদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও সখ্য থাকার ঔচিত্য সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা দেবার পরে ঈষৎ কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলুম, "কই, কি মেডেল দেখি? কোথায় পেলে মেডেল?"

ভেবেছিলুম আজকাল কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় যে সব ব্যাডমিণ্টন্ খেলা, সাঁতারের বা দৌড়ের প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তারই কোন কিছুতে সুধীর হয়তো চতুর্থ স্থান বা ওই ধরনের কোনো সাফল্যলাভ করে ছোট্ট এতটুকু একটা আধুলির

মতো মেডেল পেয়ে থাকবে—এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে, সে সেটা ক্লাসে এনে পাঁচ-জনকে গর্ব-ভরে দেখাতে চাইবে ; এমন কি এই ছুতো অবলম্বন করে ক্লাসসুদ্ধ হেড-মাস্টারের কাছে দলবদ্ধ হয়ে গিয়ে একবেলার জন্যে ছুটিও চাইতে পারে। সুতরাং মেডেলটা যখন আমার হাতে এসে পৌঁছুলো, তখন সেটাকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই হাত পেতে নিলুম ; কিন্তু মেডেলটার দিকে একবার চেয়ে দেখেই চেয়ারে সোজা হয়ে বসলুম। না, এ তো পাড়ার ব্যাডমিণ্টন্ ক্লাবের বাজে মেডেল নয়, মেডেলটা পুরনো, বড় ও ভারি চমৎকার গড়ন!—কি জিনিস দেখি?

মেডেলের গায়ে কি লেখা রয়েচে, আধ-অন্ধকার ক্লাসরুমে ভালো পড়তে পারলুম না—ও-পিঠ উল্টে দেখি, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অল্প-বয়সের মূর্তি খোদাই করা। পকেটে চশমা নেই, মনে হ'ল অফিস ঘরের টেবিলে ফেলে এসেচি। ইতিমধ্যে অনেকগুলি ছেলে ভিড় করেচে আমার চেয়ারের চারিপাশে—মেডেল দেখবার জন্যে। তাদের ধমক দিয়ে বললুম, "যাও, বোসোগে সব, ভিড় কোরো না এখানে।"

একটা ছেলেকে বললুম, "কি লেখা আছে মেডেলের গায়ে পড়ো তো?"

ক্লাস ফোরের ছেলে—অতি কষ্টে ধীরে ধীরে পড়লে, "ক্রাইমিয়া, সিবাস্টোপোল, ভিক্টোরিয়া রেজিনা...।"

"ও পিঠে?"

"সার্জেণ্ট এস্. বি. পার্কিন্‌স্, সিক্সথ ড্রাগন্ গার্ডস্—আঠারো শ চুয়ান্ন সাল..."

দস্তুরমতো অবাক্ হয়ে গেলুম। ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের সময় সিবাস্টোপোলের রণক্ষেত্রে কোনো সাহসের কাজ করবার জন্যে এই মেডেল দেওয়া হয়েছিল ইংলণ্ডের সামরিক দপ্তর থেকে ড্রাগন্ গার্ডস্ সৈন্যদলের সার্জেণ্ট পার্কিন্‌স্‌কে। এ তো সাধারণ জিনিস মোটেই নয়!

ক্রাইমিয়া...সিবাস্টোপোল?...চার্জ অফ্ দি লাইট্ ব্রিগেড! কিন্তু কলকাতার নীল-মণি দাসের লেনের সুধীর সাহার কাছে সে মেডেল কোথা থেকে আসে?

"এদিকে এসো, এ মেডেল কোথায় পেয়েচ?"

"ওটা আমার স্যার!"

"তোমার তা বুঝলুম। পেলে কোথায়?"

"আমার দাদু দিয়েচেন স্যার।"

"তোমার দাদু কোথায় পেয়েছিলেন জানো?"

"হ্যাঁ, স্যার, জানি। আমার দাদুর বাবার কাছে এক সাহেব জমা রেখে গিয়েছিল।"

"কি ভাবে?"

"আমাদের মদের দোকান ছিল কিনা, স্যার! মদ খেয়ে টাকা কম পড়লে ওটা বাঁধা রেখে গিয়েছিল, আর নিয়ে যায় নি—দাদুর মুখে শুনেছি।"

হিসেব করে দেখলুম ছিয়াশি বছর উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েচে। সেই বছরটি থেকে, যে বছরে সার্জেণ্ট পার্কিন্‌স্ (সে যে-ই হোক্) এ মেডেল পায়। তখন তার বয়স যদি কুড়ি বছরও থেকে থাকে, এখন তার বয়স হওয়া উচিত একশো ছয়। সুতরাং সে মরে ভূত হয়ে গেছে কোন্ কালে।

সেদিন ছিল শনিবার,. সকাল সকাল স্কুল ছুটি হবে এবং অনেক দিন পরে সেদিন দেশে যাবো পূর্বেই ঠিক করে রেখেছিলুম। আমার এক গ্রাম-সম্পর্কে জ্যাঠামশায় ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, বেশ পড়াশুনো আছে, গ্রামেই থাকেন। ভাবলুম, তাঁকে মেডেলটা দেখালে খুশি হবেন খুব। সুধীরের কাছ থেকে মেডেলটি চেয়ে নিলুম, সোমবারে ফেরত দোব বললুম। স্কুলের ছুটির পরে বাসা থেকে সুটকেস্ নিয়ে শিয়ালদা স্টেশনে

এসে আড়াইটের গাড়ী ধরলুম। দেশের স্টেশনে যখন নামলুম, তখন বেলা সাড়ে পাঁচটা। দু'মাইল রাস্তা হেঁটে বাড়ী পোঁছুতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। সন্ধ্যার আগেই হয়তো পোঁছুতে পারা যেত—কিন্তু আমি খুব জোরে হাঁটি নি।

ভাদ্র মাসের শেষ, অথচ বৃষ্টি তত বেশী না হওয়ায় পথ-ঘাট বেশ শুকনো খট্‌খটে। পথের ধারের বর্ষা-শ্যামল গাছপালা চোখে বড় ভালো লাগছিল অনেক দিন কলকাতা বাসের পরে—তাই জোরে পা না চালিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছিলুম। এখানে প্রথমেই বলি, আমার বাড়ীতে কেউ থাকে না। পাশের বাড়ীর এক বৃদ্ধা, আমি গেলে রান্না করে দিয়ে আসতেন বরাবর। আমার এক বাল্যবন্ধু বৃন্দাবন, অনেক বছর ধরে বিদেশে থাকে, পিসিমার মুখে শুনলুম, আজ দিন পনরো হ'ল বৃন্দাবন বাড়ী এসেচে। শুনে বড় আনন্দ হ'ল, সন্ধ্যার পরেই ওর সঙ্গে দেখা করবো ঠিক করে, চা খেয়ে নদীর ধারে বেড়াতে বার হলুম—যাবার সময় সুটকেসটা খুলে মেডেলটা পকেটে নিলুম, বৃন্দাবনকেও দেখাবো।

নদীর ধারে গিয়ে দেখি—বর্ষার দরুন নদীর জল ভয়ানক বেড়েচে, নদীর জল কূল ছাপিয়ে দু'ধারের মাঠে পড়েচে। অনেকক্ষণ বসে রইলুম, সন্ধ্যার অন্ধকার নামল একটু একটু, বাদুড়ের দল বাসায় ফিরচে। কেউ কোনো দিকে নেই।—এক জায়গায় বর্ষার তোড়ে নদীর পাড় ভেঙে গিয়েচে। অনেকটা উঁচু পাড়, নিচে খরস্রোতা বর্ষার নদী। জায়গাটা দিয়ে যেতে যেতে একবার কি-রকম ভেঙেচে দেখবার ইচ্ছে গেল। পাহাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে নিচে জলের আবর্ত দেখচি, পাড়টা সেখানে অনেকখানি উঁচু, জল অনেক নিচে—হঠাৎ আমার মনে একটা অদ্ভুত ইচ্ছা জেগে উঠলো—আমি লাফ দিয়ে পাড় থেকে জলে পড়বো! দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ইচ্ছাটা যেন ক্রমে বেড়ে উঠচে... লাফাই...দিই লাফ...! অথচ বর্ষার খরস্রোতা নদী, কুটো ফেললে দু'খানা হয়ে যায়। আমি সাঁতার জানি না,—গভীর জল পাড়ের নিচেই। ইচ্ছাটা কিছুতেই যেন সামলাতে পারচিনে! এমন কি আমার মনে হ'ল আর কিছুক্ষণ থাকলে লাফ দিতেই হবে, নইলে আমার জীবনের সুখ চলে যাবে!...

তাড়াতাড়ি নদীর পাড় থেকে এক রকম জোর করেই চলে এলুম। কারণ যেন মনে হচ্ছিল এর পর আমার আর যাওয়ার ক্ষমতা থাকবে না, পা দুটো যেন ক্রমশ সীসের মত ভারি হয়ে উঠচে—এর পর ওই বিপজ্জনক নদীর পাড় থেকে পা দুটোকে নাড়াবার ক্ষমতা চলে যাবে আমার!...

নদীর ধার থেকে বৃন্দাবনদের বাড়ী আসবার পথে ওসব ইচ্ছে আর কিছু নেই! আমি নিজের মনোভাবে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলুম—কি অদ্ভুত! এ রকম হওয়ার মানে কি? ট্রেনে বসে অতিমাত্রায় ধূমপান করেছিলাম মনে পড়লো। এই ভাদ্র মাসের গরমে অত ধূমপান করা ঠিক হয় নি, তার ওপর বাড়ী এসে দু'তিন পেয়ালা চা খেয়েচি। এসবেই ওরকমটা হয়ে থাকবে।—নিশ্চয়ই তাই।

বৃন্দাবনের বাড়ী গেলুম। বৃন্দাবনকে অনেক দিন পরে দেখে সত্যিই আনন্দ হ'ল। দু'জনে অনেক রাত পর্যন্ত বসে অনেক গল্প করলুম। অনেক বছর ধরে জমানো অনেক সুখ-দুঃখের কাহিনী। বড় গরম আজ, কোথাও এতটুকু বাতাস নেই। ভাদ্র-মাসের গুমোট গরম। বৃন্দাবন বললে, "চল্ ভাই, ছাদে গিয়ে বসে গল্প করি, তবুও একটু হাওয়া পাওয়া যাবে।...তুই আমাদের এখানে খেয়ে যাবি—মা বলে দিয়েচেন। তোদের বাড়ীতেও খবর দেওয়া হয়েচে।"

দুজনে ছাদে উঠলুম। বাড়ীটা দো-তলা। দোতলার ছাদের ওপর একখানা মাত্র ঘর আছে। আমি জানতুম, বৃন্দাবনের কাকা ওই ঘরটায় থাকেন। দোতলার ছাদে উঠে

দেখলুম—বাড়ীর পেছন দিক্‌টায় বাঁশের ভারা বাঁধা। বললুম, "বাড়ীতে রাজমিস্ত্রি খাটচে বুঝি, বৃন্দাবন?"

"হ্যাঁ ভাই, কাকার ঘরটা মেরামত হবে; উত্তর দিকে দেওয়ালটার গা থেকে নোনা ধরা ইটগুলো বার করা হচ্ছে।"

বৃন্দাবন দোতলার ঘরটার মধ্যে ঢুকলো—আমার কিন্তু মনে কেমন একটা অস্থির ভাব! খানিকক্ষণ ঘরের মধ্যে গল্প করে আমি একটু জল খেতে চাইলুম। বৃন্দাবন জল আনতে নিচে নেমে গেল, আমি ছাদে পায়চারি করতে লাগলুম। ছাদে কেউ নেই। অন্ধকার ছাদটা।...যে দিকটায় রাজমিস্ত্রিরা ভারা বেঁধে কাজ করচে, পায়চারি করতে করতে সেখানটাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখচি, হঠাৎ আমার মনে হ'ল—ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়িনে কেন?

বেশ হবে!...লাফ দেবো? প্রায় দুর্দমনীয় ইচ্ছা হ'ল লাফ দেবার। লাফ দেওয়াই ভালো।...লাফ দিতে হবে।...দিই লাফ?...এমন সময় বৃন্দাবন ছাদের ওপর এসে বললে, "আয় ঘরের মধ্যে, মা চা পাঠিয়ে দিচ্চেন; ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?..."

আরও প্রায় আধ-ঘণ্টা কথা বলবার পরে, নিচে থেকে চা ও খাবার এসে পৌঁছুলো। আমরা দুই বন্ধুতে অনেক রাত পর্যন্ত গল্পগুজব করলুম। তার পর বৃন্দাবন খাওয়ার কতদূর যোগাড় হ'ল দেখতে নিচে চলে গেল।

ঘরের মধ্যে বড় গরম—আমি বাইরের ছাদে খোলা হাওয়ায় আবার বেড়াতে লাগলুম। রাজমিস্ত্রিদের ভারার কাছে এসে দাঁড়িয়ে আমার মনে হ'ল—লাফ এবার দিতেই হবে! কেউ নেই ছাদে। কেউ বাধা দিতে আসবে না—এই উপযুক্ত অবসর! সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের গভীর তলায় কে যেন বলচে—'লাফ দিও না, মূর্খ! লাফ দিও না, পড়ে চূর্ণ হয়ে যাবে।'...আমার মাথার মধ্যে কেমন ঝিমঝিম করচে!...

কতক্ষণ পরে জানিনে, এবং কিসে থেকে কি হ'ল তাও জানিনে,—হঠাৎ বৃন্দাবনের চীৎকারে আমার চমক ভাঙলো! দেখি, বৃন্দাবন আমাকে হাত ধরে টেনে তুলচে!

"একি সর্বনাশ! তুই লাফ দিয়ে পড়লি দেখলুম যেন! ভাগ্যিস্, বাঁশে পা বেধে গিয়েচে তাই রক্ষে...কি হ'ল তোর?"

আমার মাথা যেন কেমন ঘুরছিল, গা ঝিম্‌ঝিম্ করছিল। বৃন্দাবনকে বললুম, "আমি ভাই কিছুই জানিনে তো?"

বৃন্দাবন ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আমায় শুইয়ে দিলে। সকলে বললে ট্রেনে আসার দরুন আর গরমে শরীর কি রকম খারাপ হয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলুম। আমি জানি মাথা ঘুরে পড়ে আমি যাই নি, লাফ আমি ইচ্ছে করেই দিয়েছিলুম--তবে ঠিক যে সময়টাতে আমি লাফ দিয়েচি সে সময়ের কথাটা আমি অনেক চেষ্টা করে কিছুতেই মনে করতে পারলুম না।

বিছানায় শুয়ে বেশ সুস্থ বোধ করলুম। পাশ ফিরতে হঠাৎ যেন কি একটা শক্ত জিনিস বুকের কাছে ঠেকলো। পকেটে হাত দিয়ে দেখি—সুধীরের সেই মেডেলটা।

আশ্চর্য, এটার কথা এতক্ষণ একেবারে ভুলেই গিয়েছিলুম! বৃন্দাবনকে সেটা দেখালুম। ওদের বাড়ীর সকলে মেডেলটা হাতে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে।

রাত্তিরে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম। আমার বাড়ীতে কেউ নেই বর্তমানে, একাই থাকি এক ঘরে। একটা জিনিস লক্ষ্য করচি; যখন থেকে বৃন্দাবনের বাড়ী থেকে বার হয়ে পথে পা দিয়েছি, তখন থেকেই কেমন এক ধরনের ভয় করচে আমার! বাড়ীতে যখন ঢুকলুম, তখন ভয়টা যেন বাড়লো। একা ঘরে কতবার এর আগে শুয়েচি—এমন ভয় হয় নি মনে কোন দিন।...না, শরীরটা সত্যিই খারাপ। শরীর খারাপ থাকলে মনও

দুর্বল হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লুম। আমার শিয়রের কাছে একটা বড় জানলা—জানলা দিয়ে বাড়ীর পেছনের বন-বাগান চোখে পড়ে। বেশ জ্যোৎস্না উঠেচে—কৃষ্ণ-পক্ষের একাদশীর জ্যোৎস্না। হাওয়া আসবে বলে জানলা খুলে রেখেচি। কতক্ষণ ঘুম হয়েছিল জানি নে, ঘণ্টা-খানেকের বেশি হবে না—হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। মনে হ'তে লাগলো 'আমার শিয়রের দিকের জানলায় কে দাঁড়িয়ে! যেন মাথা তুলে সেদিকে চেয়ে দেখলেই তাকে দেখা যাবে! কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ভয় হ'ল। অথচ কিসের যে ভয় জানিনে। এমন ভয় যে, কিছুতেই শিয়রের জানলার দিকে তাকাতে পারলুম না। চোখে না দেখলেও আমার বেশ মনে হ'ল, জানলার গরাদেতে দুটো হাত রেখে কে দাঁড়িয়ে আছে—জ্বলন্ত চোখে সে আমার দিকে চেয়ে রয়েচে—আমি ওদিকে চাইলেই দেখতে পাবো।

প্রাণপণে চোখ বুজে শুয়ে রইলুম—কিছুতেই চাইবো না। ঘুমুবার চেষ্টা করলুম,—কিন্তু ঘরের মধ্যে কোথাও কি ইঁদুর পচেছে? কিসের পচা গন্ধ? যেন আয়োডিন্, লিণ্ট, মলম প্রভৃতি উগ্র গন্ধের সঙ্গে পচা ক্ষতের গন্ধ মেশানো? এতকাল বাড়ীতে থাকা নেই, যার ওপর বাড়ী-ঘর পরিষ্কার রাখার ভার, সে কিছুই দেখাশোনা করে না বোঝা গেল...

কে যেন আমার মনের ভেতর বলচে, "চেয়ে দেখ, তোমার মাথার শিয়রের জানলার দিকে চেয়ে দেখ না?"

ঘরের চারিধারে কিসের যেন একটা প্রভাব—কোনো অমঙ্গলজনক, হিংস্র, উগ্র, অশান্ত ধরনের ব্যাপারটা,—ঠিক বলে বোঝানো যায় না। আমি যেন ভয়ানক বিপদগ্রস্ত! সে এমন বিপদ, যা আমাকে মরণের দোর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে—এমন কি সে দোরের চৌকাঠ পার করে অন্ধকার মৃত্যুপুরীর হিমশীতল নীরবতার মধ্যে ডুবিয়ে দিতেও পারে!...

...আমি চাইবো না...কিছুতেই চাইবো না শিয়রের জানলার দিকে।

কিন্তু যে প্রভাবই হোক্, আমার ঘরের মধ্যে, দেওয়ালের এ পিঠে তার অধিকার নেই। বহুকাল ধরে পূর্বপুরুষেরা বাস্তু শালগ্রামের অর্চনা করেচেন এ ঘরে...এর মধ্যে কারো কিছু খাটবে না। আমার মনই আবার এ কথাগুলি যেন বললে! অন্ধকার রাত্রে নির্জন ঘরে মন কত কয়!

জানলার ধারে কি যেন একটা শব্দ হ'ল।

অদ্ভুত ধরনের শব্দটা। কে যেন জানলার গরাদের ওপর টোকা দিয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইচে!...একবার...দুবার, তিনবার...ভয়ে আমার বুকের মধ্যে ঢিপ্‌ঢিপ্ করতে লাগলো...কাউকে ডাকবো চীৎকার করে?...একবার চেয়ে দেখবো জানলার দিকে জিনিসটা কি? হঠাৎ আমার মনে পড়লো একটা ধাড়ী বেঁজী অনেকদিন থেকে বাইরের দেওয়ালে, কড়িকাঠের খোলে বাসা বেঁধে আছে...আজ বিকেলেও সেটাকে একবার দেখেচি। জানলার ওপরকার কাঠে সেটা পোকামাকড় বা জোনাকি ধরছে...এ তারই শব্দ।

কথাটা মনে হ'তেই মনের মধ্যে সাহস আবার ফিরে এলো।...উঃ, ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল যেন!...শরীর অসুস্থ থাকলে কত সামান্য কারণ থেকে ভয় পায় মানুষ! পাশ ফিরে এবার ঘুমুবার চেষ্টা করলুম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। কিন্তু আমার এ ভাব বেশীক্ষণ স্থায়ী হ'ল না। এ ধারণা আমার মন থেকে কিছুতেই গেল না যে, আজ রাত্রে আমি একা নই—আরও কে এখানেই আছে! নিদ্রাহীন চোখে সে আমার ওপর খরদৃষ্টি দিয়ে পাহারা রেখেচে—আমায় সে নিরাপদে বিশ্রাম করতে দেবে না

আজ।...

বার বার ঘুম আসে, আবার তন্দ্রা ছুটে যায়, অমনি জেগে উঠি ; কিন্তু চোখ চাইতে বা বিছানার ওপর উঠে বসতে সাহস হয় না...আর সেই শব্দটা মাঝে মাঝে জানলার গরাদের ওপর হ'তে শুনি—খুব মৃদু করাঘাতের শব্দ যেন!...যেন শব্দটা বলচে—"চেয়ে দেখ...পেছন ফিরে জানলার দিকে চেয়ে দেখ..."

ঘামে দেখি বিছানা ভেসে গিয়েচে, ভাদ্রের গুমট গরম কিনা! এই অবস্থায় ভোর হ'ল। দিনের আলো ফুটল, লোকজনের শব্দ কানে যেতে রাত্রের ভয়টা মন থেকে কোথায় গেল মিলিয়ে! নিশ্চিন্ত মনে বেলা ন'টা পর্যন্ত পড়ে ঘুম দিলুম। তার পর উঠে, চা খেয়ে, পাড়ায় বেড়াতে বার হওয়া গেল।

এই সময় একটা ঘটনা ঘটলো—তখন আমি তার বিশেষ কোন মূল্য দিই নি—কিন্তু পরে সব কথা মনে মনে আলোচনা করে দেখে সেটা ভারী আশ্চর্য বলেই মনে হয়েছিল। ও-পাড়ার পথে আমার সেই জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখা, তাঁকে দেখাবার জন্যে আমি মেডেলটা কাল রাত্রে সঙ্গে নিয়েই বেরিয়েছিলুম—কিন্তু বৃন্দাবনদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণের জন্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি নি...

আমায় দেখে তিনি বললেন, "এই যে সুরেন, ভালো আছ? কাল তুমি এসেচ দেখলুম, তখন অনেক রাত, তা আর ডাকলুম না। বোধ হয় বৃন্দাবনের বাড়ী থেকে ফিরছিলে? আমি তখন ছাদে পায়চারি করচি, যে গরম গিয়েচে বাবা কাল রাত্তিরে... তোমার সঙ্গে লোক রয়েচে দেখে আরও ডাকলুম না। ও লোকটি কে? খুব লম্বা বটে—যেন শিখ কি পাঞ্জাবীর মতো লম্বা—তোমার বন্ধু বুঝি? বাঙালীর মধ্যে এমন চেহারা—বেশ, বেশ!"

আমি অবাক্ হয়ে জ্যাঠামশায়ের মুখের দিকে চেয়ে বললুম, "আমার সঙ্গে লম্বা লোক কাল রাত্তিরে! সে কি জ্যাঠামশায়?"

জ্যাঠামশায় আমার চেয়েও অবাক্ হয়ে বললেন, "তোমার সঙ্গে লোক ছিল না বলচো? একা যাচ্ছিলে? আমার চোখের দৃষ্টি একেবারে কি এত খারাপ হয়ে যাবে বাবা..."

আমি হেসে বললুম, "তাই হবে, জ্যাঠামশায়। চোখে কি রকম ঝাপ্সা দেখে থাকবেন। বয়েস হয়েচে।...আমার সঙ্গে কেউ ছিল না, তাছাড়া আপনাদের বাড়ীর সামনের আম-গাছটার ছায়া...কি রকম আলো-আঁধার দেখেচেন চোখে...অমন ভুল হয়।"

জ্যাঠামশায় যেন রীতিমত হতভম্ব হয়ে গেলেন! বললেন, "কি আশ্চর্য কাণ্ড? এতটা ভুল হবে চোখে? আমগাছের এদিকে যখন তুমি টর্চ জ্বাললে, তখন দেখলুম তুমি আর তোমার পেছনে একজন লম্বা মতো লোক...তার পর তুমি টর্চ নিবিয়ে আম-গাছের ছায়ার মধ্যে ঢুকলে, তখনও জ্যোৎস্নার আলো আর আমগাছের ছায়ার অন্ধকারে আমি বেশ দেখতে পেলুম লোকটি তোমার পেছনে পেছনে যাচ্ছে...তোমার মাথার চেয়েও যেন এক হাত লম্বা...তোমার একেবারে ঠিক পেছনে...তবে খুব ভালো তো দেখতে পেলুম না...অতদূর থেকে আর আলো-অন্ধকারের মধ্যে স্পষ্ট কিছু দেখা গেল না তো! এমন কি একবার এ পর্যন্ত মনে হ'ল তোমায় ডেকে জিজ্ঞেস করি তোমার বন্ধুটি কে?...একেবারে এত ভুল হবে চোখে?"

জ্যাঠামশায়কে পুনরায় বুঝিয়ে বললুম, আমার সঙ্গে কাল কেউ ছিল না। আমি একাই ছিলুম, সুতরাং তাঁর দৃষ্টিশক্তির গোলমাল ছাড়া এ-ব্যাপারের অন্য কোনো সিদ্ধান্ত করা চলে না।

সারাদিন বৃন্দাবনের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে কাটানো গেল। গতকাল রাত্রের ভয়ের ব্যাপার

দিনের আলোয় এত হাস্যকর বলে আমার নিজের মনে হ'ল যে, বৃন্দাবনকে সে কথাটা বলিও নি।

রাত্রের ট্রেনে কলকাতায় ফিরবো। বৃন্দাবনদের বাড়ী থেকে চা খেয়ে বাড়ী এসে সুটকেসটা নিয়ে স্টেশনের দিকে রওনা হয়েচি, তখনই সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ নেমেচে। বাউরিপাড়ার বড় বাগানটার মধ্যে দিয়ে আসচি...বাগানটা পার হ'তে প্রায় পাঁচ-ছ মিনিট লাগে—মস্ত বড় বাগান।

বাগানের ঠিক মাঝামাঝি এসে হঠাৎ পেছন ফিরে চাইলুম কি ভেবে। সঙ্গে সঙ্গে আমার সারা দেহে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। আচমকা ভয়ে আমার সর্বশরীর কাঠ হয়ে গেল।

কে ওটা ওখানে দাঁড়িয়ে?

রাস্তা থেকে একটু পাশে আগাছার জঙ্গলের মধ্যে আধ-অন্ধকারে এক অদ্ভুত মূর্তি। খুব লম্বা, তার মাথায় ঘোড়ার বালামচির সেই এক লম্বা ধরনের টুপি, পাতলা লোহার চেন দিয়ে থুতনির সঙ্গে বাঁধা—ছবিতে গোরা সৈনিকদের মাথায় যে ধরনের টুপি দেখা যায়! মূর্তিটা যেন নিশ্চল নিস্পন্দ অবস্থায় আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে! আমার কাছ থেকে মাত্র দশ গজ কি তারও কম দূরে! মরীয়ার মতো আর একটু এগিয়ে গেলুম। এই ভয়ানক কৌতূহল আমাকে চরিতার্থ করতেই হবে যেন! মূর্তি নড়ে না—যেন নিশ্চল পাথরের মূর্তি। কিন্তু বেশ স্পষ্ট দেখচি সাত আট গজ মাত্র দূরে তখন মূর্তিটা। আর ঘোড়ার বালামচির লম্বা টুপি ও ইস্পাতের চেনের স্ট্র্যাপ্ স্পষ্ট দেখতে পেলুম।

আমার পা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো, সারা দেহ কেমন অবশ হয়ে আসচে, মাথাটা হঠাৎ বড় হালকা হয়ে গিয়েচে! বোধ হয় আর আধ মিনিট এ-ভাবে থাকলে মূর্ছিত হয়ে পড়ে যেতুম—কারণ সেই ভীষণ মূর্তিটার মুখোমুখি আমি দাঁড়িয়ে—আমার পা দুটো বেজায় ভারী হয়েচে—নাড়বার উপায় নেই মূর্তির সামনে থেকে...

কিন্তু ঠিক সেই সময়ে বাউরিবাগানের পথে লণ্ঠন নিয়ে কারা ঢুকলো। দু-তিন জন লোকের গলার শব্দ শুনে আমার সাহস ফিরে এলো। আমি ওদের ডাক দিলুম চীৎকার করে। ওরা ছুটে এলো। আমায় ওখানে বনের মধ্যে দেখে তারা খুব আশ্চর্য হয়ে বললে, "ওখানে কি বাবু? কি হয়েচে?..."

তারপর লণ্ঠন তুলে ওরা আমার মুখ দেখে বললে, "ও আপনি? কি হয়েছে আপনার? মুখ একেবারে সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েচে—ভয়টয় পেলেন নাকি? বাউরি-বাগান জায়গাটা ভালো না। সন্ধ্যের পর এখানে অনেকে ভয় পায়।"

ওদের লণ্ঠনটা যখন উঁচু করে তুলে ধরলে আমার মুখে, সেই আলোয় দেখলুম—সামনের মূর্তিটা তখনও সেখানে ঠিক সেই রকম দাঁড়িয়ে! একজন বললে, "কি দেখ-ছিলেন এখানে দাঁড়িয়ে বাবু—এই ষাঁড়াগাছটা?"

আর একজন বললে, "গাছটার ডালপালা কেটে মাথায় ঝোপের মতো করে রেখেচে, যেন মানুষ বলে অন্ধকারে ভুল হয় বটে...চলে আসুন বাবু!"

আমিও দেখলুম ষাঁড়াগাছই বটে। মাথার দিকের পাতাগুলো ছেঁটে গাছটাকে দেখতে হয়েচে ঠিক হর্স্‌গার্ড্‌সদের ঘোড়ার বালামচির টুপি! লোকের চোখের কি ভুলই হয়? কাল আমি আবার জ্যাঠামশায়কে চশমা নিতে বলছিলুম! ভেবে লজ্জা হ'ল মনে মনে। তিনি বৃদ্ধ লোক, তাঁর চোখের ভুল তো হ'তেই পারে—আমারই যখন এই অবস্থা!

ওরা আমায় আলো ধরে স্টেশনে পেঁৗছে দিলে।

পরের দিন স্কুলে সুধীরের মেডেলটা ফেরত দিলুম।

সুধীর বললে, "আপনাকে দাদু একবার ডেকেচেন, আমার সঙ্গে ছুটির পর আমাদের বাড়ী আসুন। নিয়ে যেতে বলেচেন।"

সুধীরের দাদু বললেন, "যাক, আমার বড় ভয় হয়েছিল, মাস্টারবাবু! সুধীরের কাছ থেকে মেডেলটা নিয়ে গিয়েছেন দেশে শুনলাম কিনা? আপনার দেশের ঠিকানা জানতুম না—তা'হলে একটা তার করে দিতুম।...ও মেডেলটা আমার বাবাকে একজন গোরা সৈন্য দিয়ে যায়—আমি তখন জন্মাই নি। বাঁধা দিয়েছিল আর উদ্ধার করতে পারে নি। বেজায় মাতাল আর গোঁয়ার ছিল লোকটা। ও মেডেলের বিপদ হচ্ছে—আমাদের বংশের লোক ছাড়া অন্য কেউ নিলে তার বড় বিপদ ঘটে। আমার এক ভগ্নীপতি একবার কিছুতেই শুনলে না—অনেক কাল আগের কথা—বাড়ী নিয়ে গেল মেডেল দেখাতে; সেই দিনই সন্ধ্যের সময় ছাদ থেকে পড়ে মারা গেল। মৃতদেহের পকেট থেকে মেডেলটা বেরুলো।..."

আমি কলের পুতুলের মতো শুধু বললুম, "ছাদ থেকে?...পকেটে মেডেল পাওয়া গেল?..."

"হ্যাঁ, মাস্টারবাবু। আমার নিজের ভগ্নীপতি, মিথ্যে কথা তো বলবো না। আজ সাতাশ-আটাশ বছর আগের কথা।...ওটা আরও দু-এক জন নিয়েচে—তক্ষুনি ফেরত দিয়ে গিয়েচে। বলে রাতে ভয় পায়, গা ছমছম করে। কে যেন পেছনে ফলো করচে বলে মনে হয়! ও বাইরের লোকের সহ্য হয় না। প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন হয়।...তাই ভাবছিলুম একটা তার করে দেবো..."

একটা কথা বলা দরকার। মাসখানেক পরে আমি আবার দেশে যাই। বাওঁরিবাগানে ঢুকে যেখানে সে-রাত্রে ভয় পেয়েছিলুম, সেদিকে চেয়ে দেখে সে ষাঁড়াগাছটা কোথাও আমার চোখে পড়লো না। যে আমগাছটার ধারে ষাঁড়াগাছটা দেখেছিলুম, সেখানে দিন-মানে বেশ ভালো করে দেখেছি—কোথাও সে ষাঁড়াগাছ নেই—বা গাছ কেটে নিলে যে গুঁড়িটি থাকবে, তারও কোন চিহ্ন নেই। কস্মিন্‌কালে সেখানে একটা বড় ষাঁড়াগাছ ছিল বলে মনেও হয় না জায়গাটা দেখে।...

'মায়ামুকুর', দেবসাহিত্য কুটির শারদীয়া, ১৩৪৭

মসলাভূত

বড়বাজারের মসলাপোস্তায় দুপুরের বাজার সবে আরম্ভ হয়েচে। হাজারি বিশ্বাস প্রকাণ্ড ভুঁড়িটি নিয়ে দিব্যি আরামে তার মসলার দোকানে বসে আছে। বাজার একটু মন্দা। অনেক দোকানেই বেচা-কেনা একেবারে নেই বললেই চলে, তবে বিদেশী খদ্দেরের ভিড় একটু বেশি। হাজারির দোকানে লোকজন অপেক্ষাকৃত কম। ডান হাতে তাল-পাতার পাখার বাতাস টানতে টানতে হাজারি ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছিলো, এমন সময়ে হঠাৎ কার পরিচিত গলার স্বর শুনে সে চমকে উঠলো।

—"বলি ও বিশ্বেস,—বিশ্বেস মশাই!"—বার দুই হাঁক ছেড়ে যতীন ভদ্র তার ডান হাতের লাঠিটি একটা কোণে রেখে দিয়ে সম্মুখের খালি টুলটার উপর ধপাস্ করে বসলো।

যতীন হাজারি বিশ্বাসের সমবয়স্ক—অনেক দিনের বন্ধু। ভাগ্যলক্ষ্মী এতকাল তার ওপর অপ্রসন্ন ছিল। হালে সে হাজারির পরামর্শে মসলার বাজারে দালালী আরম্ভ করেচে। দু'পয়সা পাচ্ছেও সে। যতীনের মোটা গলার কড়া আওয়াজ পেয়ে হাজারি খুব

আগ্রহান্বিত হয়ে উঠে বসলো। হাজারি বিলক্ষণ জানতো যে, যতীন যখনই আসে কোন একটা দাঁও বিষয়ে পাকাপাকি খবর না নিয়ে সে আসে না। তাই সে যতীনকে খুবই খাতির করে।

যতীন বললে, "দেখ, শুধু দোকানদার হয়ে খদ্দেরের আশায় রাস্তার দিকে হাঁ করে বসে থাকলে তাতে আর টাকা আসে না—ঘুমই আসে। পাঁচটা খবরাখবর রাখতে হয়, বুঝলে?"

হাজারি বললে, "এসো এসো, যতীন। ভালো আছ? অনেক দিন দেখি নি। কিছু খবর আছে নাকি?"

"সেই খবর দিতেই তো আসা। এ-বাজারে শুধু গণেশের পায়ে মাথা ঠুকলেই টাকা করা যায় না—। অনেক হদিস জানতে হয়—অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তবে টাকা, বুঝলে? ...এখন কি দেবে বলো। জানই তো যতীন ভদ্র বকে একটু বেশি, কিন্তু খবর যা আনে তা একদম পাকা। যাক্, এখন আসল কথা তোমায় যা বলি মন দিয়ে শোন..."

যতীন অতঃপর হাজারিকে কাছে বসিয়ে চুপি চুপি তার কথাটা বলে গেল। যতীনের কথায় টাকার গন্ধ পেয়ে হাজারি কান খাড়া করে এমনি একাগ্রভাবে শুনে যেতে লাগলো যে. সত্যনারায়ণের পাঁচালীও লোকে অতটা মন দিয়ে শোনে না।

ব্যাপারটি এই।—

গ্রেহাম্ ট্রেডিং কোম্পানীর একটা মস্ত মাল-জাহাজ এস্. এস্. রেঙ্গুন, ডাচ্ ইস্ট্ ইন্ডিজের কোন এক বন্দর থেকে প্রচুর মাল নিয়ে কলকাতায় আসছিলো। যতরকম মাল বোঝাই ছিল, তার মধ্যে মসলার বস্তাই সব চেয়ে বেশি। লঙ্কা, হলুদ, জিরে, তেজপাতা প্রভৃতি কত রকমের মসলা। প্রতি বস্তাটি ওজনে আড়াই মণের কম নয়। এরকম শত শত বস্তার গাদায় জাহাজখানা আগাগোড়া ঠাসা। সেই মালজাহাজখানি গঙ্গার ভেতরে ঢুকতেই ঘন কুয়াশার মধ্যে শেষ রাত্রির ভাঁটার মুখে গঙ্গার চোরাবালির চড়ায় ধাক্কা খেয়ে ডুবে যায়। জাহাজ যখন সবে ডায়মন্ড হারবার্ পেরিয়ে গঙ্গায় এসেচে—তখন এই ব্যাপার। সারেঙ্গ শত চেষ্টা করেও কিছুতে সামাল দিতে পারলে না। জাহাজডুবির সঙ্গে কতক লোকও জলে ডুবে মারা যায়। জাহাজের কতক মাল নষ্ট হয়ে যায় আর বাদবাকী মাল সব গঙ্গার জলে ভাসতে থাকে। মসলার বস্তাগুলো প্রায়ই ডোবে নি—বিশেষ ক্ষতিও হয় নি। দূর থেকে ঐ মসলাবস্তার গাদাগুলো ভেসে যেতে দেখে পোর্ট-কমিশনারের লোকেরা সে সব তুলে পারে টেনে নেয়। কাল সাড়ে আটটার সময় নিলাম ডেকে সেই বস্তাবন্দী মসলাগুলো বিক্রী করা হবে।

ধড়িবাজ হাজারি বিশ্বাস যতীনের কথাবার্তা শুনে চট করে সব বুঝে নিলে। কত লোককে চরিয়ে কত পাকা ধানে মই দিয়ে তবে সে আজ এত টাকার মালিক। কথাবার্তা তখনই সব ঠিক হয়ে গেল। যাবার সময় যতীন আবার হাজারিকে বেশ করে মনে করিয়ে দিয়ে বললে, "দেখো ভায়া! টাকা যদি পিটতে চাও তবে এ সুযোগ কিছুতেই ছাড়া নয়। জলের দামে মাল বিকিয়ে যাচ্ছে। কাল সকাল সাড়ে আটটায় নিলেম। আমি সাতটার সময়েই এসে তোমাদের সঙ্গে দেখা করবো।"

পরদিন হাজারি যতীনকে নিয়ে যথাসময়ে খিদিরপুরের দিকে রওনা হয়ে গেল। নিলামের জায়গায় পেঁছুতে আর বেশী দেরি নেই, দূর থেকে কলরব শোনা যাচ্ছে। যতীন আগে আগে চলেছে—হাজারি পেছনে পেছনে ছুটছে। এতবড় সস্তার কিস্তিটা ফস্কে না যায়। হাজারি যতীনকে বরাবর নিলামের কাছে বস্তাগুলো গুনতি করতে পাঠিয়ে দিয়েই নিজে সটান এক দৌড়ে সাহেবের কাছে গিয়ে মস্ত বড় এক সেলাম করলে। সাহেবের সঙ্গে দুমিনিট ফিসফাস করে কি কথাবার্তা বলে হাজারি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে

এসে নিলামের ডাক বন্ধ করে দিলে।

যতীন বললে, "কি খবর ভায়া—সুবিধে করতে পেরেছ তো?"

হাজারি খুব ব্যস্তসমস্ত ভাবে বললে, "পরে বলবো। কাজ হাসিল। এখন কত বস্তা গুনলে বলো দেখি?"

"একশো বস্তা গোনা হয়ে গেছে।"

বাস্তবিক, উঁচু উঁচু গাদা-করা মসলার বস্তাগুলোর দিকে চেয়ে হাজারির চোখ জুড়িয়ে গেল। সে যে দিকেই তাকায়, দেখে যে অগুন্তি বস্তা সারবন্দী থামের মতো রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। উঃ, এমন দাঁও জীবনে কারো ভাগ্যে একবার বই দুবার আসে না! এখন মসলাপোস্তায় কোনরকমে তার গুদোমে এগুলো চালান দিতে পারলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

"আর দেরি নয়"—হাজারি যতীনকে তাড়া দিয়ে ডেকে বললে, "ওহে ভায়া, শুভ কাজে আর বিলম্ব কেন? এখন লরী ডেকে তাড়াতাড়ি মাল বোঝাই করে পোস্তায় চালান দিয়ে দাও। আমি ততক্ষণ এগিয়ে যাই।"

একেবারে সব মাল লরীতে ধরলো না। দ্বিতীয় ক্ষেপ বস্তা চাপিয়ে যতীন যখন পোস্তায় ফিরে গেল তখনও বিকেল আছে। সে এসে দেখে, সবই অব্যবস্থা। রাশীকৃত বস্তার গাদা হাজারির দোকানের সামনে ফুটপাতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। মাত্র তিনটি লোক এতগুলো মাল তোলবার জন্যে লাগানো হয়েচে। চতুর্দিকে লোকের মহা ভিড়—হৈ হৈ ব্যাপার! এদিকে পুলিস তাড়া দিচ্ছে—"জল্‌দি মাল হঠাও!" হাজারি কেবল চেঁচাচ্ছে। সে যেন কিছুই গোছগাছ করে উঠতে পারছে না।

কান্ডকারখানা দেখে যতীন নিজেই কোমর বেঁধে লেগে গেল। প্রাণান্ত পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার পূর্বেই সব মাল তোলা হয়ে গেল। বস্তাগুলি পাশাপাশি সাজিয়ে দেখা গেল ঘরে আর কুলোয় না। তখন বস্তার ওপর বস্তা চাপিয়ে দিয়ে কড়িকাঠ পর্যন্ত মাল ঠাসা হ'ল। গম্বুজের মতো এক একটা ফুলো ফুলো বস্তা, আর বস্তাগুলো উঁচুও কি কম! এই ভাবে বস্তা ভরাট করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, যতীন আর হাজারি যখন বাড়ী ফিরলো তখন রাত দশটা। সে রাত্রে গুদামে তালা লাগিয়ে দিয়ে প্রতিদিনের মতো হাজারির চাকর বাইরে শুয়ে রইলো।

শেষ রাত্রে মসলার গুদামে কি একটা শব্দ শুনতে পেয়ে আশে-পাশের দোকান-দারদের ঘুম ভেঙে গেল। তারা চোরের আশংকা করে চাকরটাকে ডেকে তুললে। চাকরটা শশব্যস্ত হয়ে আলো জেবলে বেশ পরখ করে এদিক-ওদিক দেখতে লাগলো। কিন্তু চোর ঘরে ঢুকলো কি করে? গুদোমের দরজার তালা বন্ধ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। খানিক বাদে আবার দুম্‌ দুম্‌ শব্দ! সকলে কান খাড়া করে রইলো। বেশ মনে হ'ল এবারকার শব্দটা যেন হাজারির মসলার গুদোমের ভেতর থেকেই আসচে। অথচ ঘরের দোর-জানলা বন্ধ, বাইরে থেকে মোটা তালা দেওয়া। কি আশ্চর্য, চোর ভেতরে যাবেই বা কি করে? আর চোরটোর যদি না এলো তবে শব্দও বা করে কে? মাঝে মাঝে মনে হ'তে লাগলো, ঘরের ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসবার জন্যে কারা ভেতর দরজায় ধাক্কা মারচে। শেষ রাতের বাকী সময়টা এইভাবেই শব্দ শুনে কেটে গেল। আরও আশ্চর্য, ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই গুদোমঘর থেকে শব্দও আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। সে রাত্রি এই পর্যন্ত।

পরদিন সকালে মসলাপট্টির দোকানদারদের মুখে মুখে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে হাজারির দোকানে বিষম কান্ড, ভীষণ চুরি! আসলে সত্যি যা নয় তার দশগুণ বাড়িয়ে দিয়ে মিথ্যে রটাতে লাগলো। ক্রমে কথাটা হাজারির কানে উঠলো। হাজারি বিশ্বাস খবর

পাওয়া মাত্র দৌড়ে এসে তালা খুলে গুদোমে ঢুকে দেখে বস্তাগুলো ঠিকই আছে, একটি মালও বেহাত হয়নি। কি ব্যাপার? তখন সে ভাবলে কিছু নয়; তার মসলা-বস্তাগুলো দেখে যাদের চোখ টাটিয়ে ছিল—এ নিশ্চয়ই সেই বদমাশদের মিথ্যে কারসাজি; তারাই মজা দেখবার জন্যে চুরির গুজব রটিয়েচে, কিন্তু হরে চাকরটাও যে বললে, ভীষণ শব্দ শোনা যাচ্ছিল? এই শব্দ-রহস্যটা হাজারি কিছুতেই কিনারা করতে পারলে না। চোর যদি এসেই থাকবে, তবে কিছু নিলেও না, উপরন্তু শব্দ করে জানান দিয়ে চলে গেল—এ কি ব্যাপার? তবে কি তাকে ভয় দেখাবার জন্যেই রাত্রিবেলা দুর্বৃত্তেরা এই সব আয়োজন করচে? সাতপাঁচ ভেবে হাজারি সেদিনকার মতো কথাটা চেপে গেল, ভাবলে আজ রাতে আর বাড়ী না গিয়ে নিজেই দোকান পাহারা দেবে!

করলেও তাই। রাত্রে ঘুমোবার আগে হাজারি বেশ করে চাকরটাকে নিয়ে গুদোমের উপর থেকে আরম্ভ করে নিচে পর্যন্ত পাতি পাতি প্রত্যেকটি বস্তার গাদা দেখতে লাগলো। তারপর ভেতর থেকে জানলাটা খুলে রেখে ঘরে তালা লাগিয়ে দিল। তবে, আজ একটা নয়—হবসের চার লিভারের দুটো মস্ত ভারী তালা। হাজারি চাকরটাকে নিয়ে ঘরের সামনে শুয়ে নানা কথাবার্তার পর যখন ঘুমিয়ে পড়লো তখন রাত দুপুর।

শেষ রাত্রের দিকে কি একটা শব্দ হ'তেই হাজারির ঘুম ভেঙ্গে গেল। হরে চাকরটা আগেই একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিল। গত রাত্রের ব্যাপারও তার বেশ মনে আছে। তাই সে নিজে আর কোন কথা না বলে চুপ করেই পড়ে ছিল। কিন্তু খানিক বাদেই ও আবার কিসের শব্দ? ধপাস্—ধুপ্—দুম্—দুম্—দাম্! ঘরের ভেতর বস্তায় বস্তায় কি বিষম ধস্তাধস্তি! যেন দৈত্য দানবে লড়াই বেধেচে। হরে আর হাজারি তখন ধড়মড় করে এক লাফে বিছানা ছেড়ে আলো জ্বালিয়ে দেখতে লাগলো তালা ঠিক আছে কিনা। তালা দুটো ঠিকই আছে। হাজারি জানলার ফাঁকে চোখ তাকিয়ে দেখতে পেলে—দুটো প্রকাণ্ড বস্তা ঘরের ভেতর থেকে দরজায় ঢু মারছে। ভয়ে হাজারির চোখ দুটো ডাগর হয়ে উঠলো। বস্তা জীবন্ত হয়ে উঠলো নাকি? না, সে চোখে ভুল দেখছে? না, অনিদ্রায় আর দুর্ভাবনায় তার মাথার ঠিক নেই? হাজারি ভয়ে ভয়ে খানিকটা চোখ বুজে রইলো।

হাজারি চোখ যখন খুললে তখন ভোরের আলো জানলার গরাদ দিয়ে ঘরে স্পষ্ট দেখা গিয়েচে। সঙ্গে সঙ্গে শব্দ-টব্দও থেমে গিয়েচে। হরে অমনি বলে উঠলো, "বাবু সেদিনও দেখেচি—ভোর হতেই শব্দ থেমে যায়।" হাজারি আর দ্বিরুক্তি না করে তালা খুলে ঘরে ঢুকে দেখলে কোথাও কিছু নেই। মালপত্র ঠিকই আছে, তবে কালকের থেকে আজ তফাত এই যে বস্তাগুলো যেটি যে জায়গায় দাঁড় করানো ছিল, সেটি ঠিক সেখানে নেই। প্রত্যেক বস্তাটিই যেন সরে সরে তফাত হয়ে গেছে। একটা বস্তা আর একটার ঘাড়ে কাত হয়ে পড়েচে। বিশেষ করে পেছন দিকের কতগুলো বস্তা হান্ডুল-বান্ডুল অবস্থায় পড়ে রয়েছে!—হাজারি মহা ভাবনায় পড়ে গেল! চোরই যদি হয় তবে শব্দের সৃষ্টিপাত কেন? আর চোর ঢোকেই বা কোথা থেকে? আর বেরিয়েই বা যায় কেমন করে? অসম্ভব! তবে কি জাহাজডুবির লোকগুলো ডুবে মরে ভূত হয়ে মসলাবস্তায় যে যার ঢুকে বসে আছে?

লাটের মাল কিনে অবধি দু'রাত্রি তো এই ভাবে কাটলো। আজ তৃতীয় রাত্রি। হাজারির রোখ অসম্ভব বেড়ে গেছে! আজ সে মরীয়া হয়ে দুজন লোক নিয়ে সারা রাত্রি গুদামের বাইরে জেগে বসে রইলো। হাতের কাছে যাকেই সে পাবে, কিছুতেই আজ আর তাকে আস্ত রাখবে না। তার এই অভীষ্টসিদ্ধি করার জন্যে দিনমানেই সে খুব ঘুমিয়ে নিয়েচে—পাছে রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ে। টং টং টং টং—পাশের ঘরের ঘড়িতে

চারটে বেজে গেল। হাজারির চোখের পাতা পড়ে না। সে ঠায় জেগে আছে। কোথাও কিছু নেই, কিন্তু হঠাৎ এ কি কান্ড! শত শত লোক একত্র খুব দম দিয়ে নিঃশ্বাস টেনে ছেড়ে দিলে যেমন একটা ঝড়ের মতো সাঁই সাঁই করে শব্দ হয়—অবিকল তেমনি একটা শব্দ শোনা গেল।

হাজারি আলো জ্বালিয়ে দিয়েই এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠলো! দরজার দোরগোড়ায় যে দুটো লোক শুয়ে ছিল, হাজারি চট্ করে তাদের জাগিয়ে দিয়ে বললে, "তোরা শীগ্‌গির ঘরের পেছনটায় দৌড়ে গিয়ে দেখ দেখি—চোরেরা সেখানে কোন সিঁধ কেটেচে নাকি।" তারপর হাজারি গুদোমের তালা খুলে ফেলল।

কিসের সিঁধ, আর কোথায় বা চোর! বস্তাগুলো যে সব হাই ছেড়ে সারবন্দী দাঁড়াতে লাগলো! হরে চাকরটা ভয়ের সুরে বললে, "বাবু এদিকে চেয়ে দেখুন!"—হাজারি দুই চোখ বিস্ফারিত করে চেয়ে বললে, "এ্যাঁ, বলে কি? আমার মসলার বস্তারা নাচ্‌চে?" চাকর দুজন এ দৃশ্য দেখেই ভয়ে দে চম্পট।

তখন এক অদ্ভুত কান্ড!

বস্তাগুলো সব একটির পর একটি ঠক্ ঠক্ করে ঠিক্‌রে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। সৈন্ধব লবণের প্রকান্ড জাঁদরেল গোছের বস্তাটা তো সর্বাগ্রে বেরিয়ে পড়েই সটান্ গঙ্গার দিকে দে ছুট্। অন্য বস্তাগুলো সব সারি দিয়ে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ধিনিক্ ধিনিক্ করে খানিকটা নেচে নিয়ে তারপর সামনে লাফিয়ে মার্চ করে স্ট্র্যান্ড রোড ট্রামের রাস্তা ছাড়িয়ে চলতে লাগলো। নিলামে কেনা বস্তাগুলো দলের অগ্রণী হয়ে চলেচে, পেছনে পেছনে চলচে সারবন্দী গুদামের অন্য অন্য বস্তা। এই ভাবে হাজারির মসলার গুদোম উজাড় হয়ে গেল।

শেষ রাত্রি। আকাশে ভাসা ভাসা মেঘ। গঙ্গার জলে মেটে জ্যোৎস্না। হাজারি বিশ্বাস একা দাঁড়িয়ে। একি সত্যি, না স্বপ্ন! নির্বাক হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে সে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখচে। লোক ডেকে চেঁচিয়ে উঠবে সে শক্তিও তার লুপ্ত। সারবন্দী মসলার বস্তা-গুলো গঙ্গার ধারে পৌঁছলো এবং গঙ্গার উঁচু বাঁধানো পোস্তার ওপর থেকে ধপাস ধপাস করে নিচে গঙ্গার জলে দিল ডুব। এইভাবে পরপর সমস্ত বস্তা একে একে গঙ্গার জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো। এবারেও আগে ডুবলো নিলামের বস্তাগুলো—তারপর গুদোমের অন্য অন্য বস্তা।

এক রাত্রির মধ্যে হাজারি বিলক্ষণ নিঃস্ব হয়ে গেল।

এই ঘটনা শোনার পর হাজারির প্রতিবেশী দোকানদারেরা সকলেই বিজ্ঞের মতো ঘাড় নেড়ে একবাক্যে বললে, "হুঁ হুঁ, আমরা অনেক আগেই জানতুম। ভরা অমাবস্যায় জাহাজ-ডুবি। আর সেই লাটের মাল কিনলে কিপ্টে হাজারি বিশ্বেস! ভাগ্যিস বুদ্ধি করে আমরা ঘেঁষি নি। এ মাল কিনলে আমাদেরও কি রক্ষা থাকতো!"

গঙ্গাধরের বিপদ

অনেকদিন আগেকার কথা। কলকাতায় তখন ঘোড়ার ট্রাম চলে। সে সময় মসলা-পোস্তায় গঙ্গাধর কুন্ডুর ছোটখাট একখানা মসলার দোকান।

গঙ্গাধরের দেশ হুগলি জেলা, চাঁপাডাঙ্গার কাছে। অনেক দিনের দোকান, যে সময়ের কথা বলচি গঙ্গাধরের বয়েস তখন পঞ্চাশের ওপর। কিন্তু শরীরটা তার ভালো যাচ্ছিল না। নানারকম অসুখে ভুগতো প্রায়ই। তার ওপর ব্যবসায়ে কিছু লোকসান দিয়ে লোকটা একেবারে মুষড়ে পড়েছিল। দোকানঘরের ভাড়া দু-মাসের বাকি, মহাজন-

দের দেনা ঘাড়ে—দুপুর বেলা দোকানে বসে থেলো হুঁকো হাতে নিয়ে নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবছিল। আজ আবার সন্ধ্যের সময় গোমস্তা ভাড়া নিতে আসবে বলে শাসিয়ে গিয়েচে। কি বলা যায় তাকে!

এক পুরোনো পরিচিত মহাজনের কথা মনে পড়ে গেল। তার নাম খোদাদাদ খাঁ, পেশোয়ারী মুসলমান, মেটেবুরুজে থাকে। আগে গঙ্গাধরের লেনদেন ছিল তার সঙ্গে। কয়েকবার টাকা নিয়েছে, শোধও করেচে, কিন্তু সুদের হার বড় বেশী বলে ইদানীং বছর কয়েক গঙ্গাধর সেদিকে যায় নি।

ভেবেচিন্তে সে মেটেবুরুজেই রওনা হ'ল। সুদ বেশি বলে আর উপায় কি? টাকা না আনলেই নয় আজ সন্ধ্যের মধ্যে।

মেটেবুরুজে গিয়ে খোদাদাদ খাঁয়ের নতুন বাসা খুঁজে বার করতে, টাকা নিতে দেরি হয়ে গেল। খিদিরপুরের কাটিগঙ্গা পার হয়ে এসে ট্রাম ধরবে, হনহন করে হেঁটে আসচে—এমন সময়ে একজন লোক তাকে বললে, "এ সাহেব, ইধার শুনিয়ে তো জরা..."

সন্ধ্যে হয়ে গিয়েচে। যেখান থেকে লোকটা তাকে ডাকলে সেখানে কতকগুলো গাছ-পালার বেশ একটু অন্ধকার। স্থানটা নির্জন, তার ওপর আবার তার সঙ্গে রয়েচে টাকা। গঙ্গাধরের মনে একটু সন্দেহ যে না হ'ল এমন নয়। কিন্তু উপায় নেই, লোকটা এগিয়ে এলো। ওই গাছগুলোর তলায়—সে যেন তারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিল।

লোকটা খুব লম্বা, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁড়কা চুল ঘাড়ের ওপর পড়েচে, মুখটা ভালো দেখা যাচ্ছে না। পরনে ঢিলে ইজের ও আলখাল্লা। সে কাছে এসে সুর নিচু করে হিন্দীতে ও ভাঙা বাংলায় মিলিয়ে বললে, "বাবু, সস্তায় মাল কিনবেন?"

গঙ্গাধর আশ্চর্য হয়ে বললে, "কি মাল?"

লোকটা চারিদিকে চেয়ে বললে, "এখানে কথা হবে না বাবু, পুলিস ঘুরচে, আমার সঙ্গে আসুন..."

ঝুপ্সি গাছের তলায় এক জায়গায় অন্ধকার খুব ঘন। সেখানে গিয়ে লোকটা বললে, "জিনিসটা কোকেন। খুব সস্তায় পাবেন। ডিউটি-ছুট মাল—লুকিয়ে দেব!"

গঙ্গাধর চমকে উঠলো।

সে কখনো ও ব্যবসা করে নি। ডিউটি-ছুট কোকেন—কি সর্বনেশে জিনিস! ভালো লোকের পাল্লায় সে পড়েচে! না—সে কিনবে না।

লোকটা সম্ভবতঃ পাঞ্জাবী মুসলমান। বাংলা বলতে পারে—তবে বেশ একটু বাঁকা। অনুনয়ের সুরে বললে, "বাবু, আপনি নিন। আপনার ভালো হবে। সিকি কড়িতে দেবো...আমার মুশকিল হয়েচে আমি মাল বিক্রির লোক খুঁজে পাচ্ছিনে। ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি কত জায়গায়—আবার সব জায়গায় তো যেতে পারিনে, পুলিসের ভয় তো আছে? কেউ কথা কইচে না আমার সঙ্গে; সেই হয়েচে আরও মুশকিল। হঠাৎ শহরে এত পুলিসের ভয় হ'ল যে কেন বাবু তা বুঝিনে। আগে যারা এ ব্যবসা করতো, তাদের কাছে যাচ্ছি, তারা আমার দিকে চেয়েও দেখচে না।...আপনি গররাজি হবেন না বাবু—মাল দেখুন পরে দামদস্তুর হবে..."

লোকটার গলার সুরে একটা কি শক্তি ছিল, গঙ্গাধরের মন খানিকটা ভিজলো। কোকেনের ব্যবসাতে মানুষ রাতারাতি বড় লোক হয়েচে বটে। বিনা সাহসে বিপদ এড়িয়ে চলে বেড়ালে কি লক্ষ্মীলাভ হয়? দেখাই যাক না।

হঠাৎ গঙ্গাধর চেয়ে দেখলে যে লোকটা নেই সেখানে। এই তো দাঁড়িয়েছিল, কোথায় গেল আবার? পাছে কেউ শোনে এই ভয়ে বেশী জোরে ডাকতেও পারবে না। চাপা গলায় বাঙালী-হিন্দীতে ডাকলে, "কোথায় গিয়া, ও খাঁসাহেব?"

এদিকে ওদিকে চাওয়ার পর সামনে চাইতেই দীর্ঘাকৃতি আলখাল্লাধারী খাঁসাহেবকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। গঙ্গাধর বললে, "জলদি চলো, অনেক দূর যানে হোগা।"

কি একটা যেন ঢাকবার জন্যে লোকটি প্রাণপণে চেষ্টা করচে। "আমার সঙ্গে এসো, মাল দেখাবো।"

দুজনে কাটিগঙ্গার ধারে ধারে অনেক দূর গেল। যে সময়ের কথা বলচি, তখন ওদিকে অত লোকজন ছিল না। মাঝে মাঝে জোয়ার নেমে যাওয়াতে বড় বড় ভড় ও নৌকো কাদার ওপর পড়ে আছে, দু-একটা করাতের কারখানা, তাও দূরে দূরে—জলের ধারে নোনা চাঁদাকাঁটার বন, পেছনে অনেক দূরে খিদিরপুর বাজারের আলো দেখা যাচ্ছে।

পথে যেতে যেতে খাঁসাহেব একটা বড় অদ্ভুত প্রশ্ন করলে। গঙ্গাধরের দিকে চেয়ে বললে, "আমায় দেখতে পাচ্ছ তো?..."

"কেন পাবো না? এমন বয়েস এখনো হয়নি যে এই সন্ধ্যেবেলাতেই চোখে ঠাওর হবে না।"

একবার গঙ্গাধর জিজ্ঞেস করলে, "তোমার ডেরা কোথায়, খাঁসাহেব?"

লোকটা চকিতে পেছনে ফিরে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, "কেন, সে তোমার কি দরকার? পুলিসে ধরিয়ে দেবে ভেবে থাকো যদি, তবে ভালো হবে না জেনো। মাল দেবো, তুমি টাকা দেবে—মাল নিয়ে চলে যাবে,—আমার বাসার খোঁজে তোমার কি কাজ?"

লোকটার চোখের চাউনি অদ্ভুত! গঙ্গাধর অস্বস্তি বোধ করলো; খুব ভালো দেখা যায় না, কিন্তু ওর দুই চোখে যেন ইস্পাতের ছুরি ঝলসে উঠলো। না, তার সঙ্গে টাকা রয়েচে—এ-অবস্থায় একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত অজ্ঞাতকুলশীল লোকের সঙ্গে একা এই সন্ধ্যেবেলাতে সে এতদূর এসে পড়েচে? লোভে মানুষের জ্ঞান থাকে না—তার ভেবে দেখা উচিত ছিল। কিন্তু যখন এসেইচে, তখন আর চারা নেই। বাড়বে বই কমবে না। ছুরি বার করে বসলে তখন আর উপায় থাকবে না।

অনেক দূর গিয়ে মাঠের মধ্যে একটা গুদামঘর। একটা গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে, গুদামঘরের দরজা থেকে একটু দূরে। তার ওপর গঙ্গাধরকে বসতে বলে লোকটা কোথায় চলে গেল। গঙ্গাধর বসে চারিধারে চেয়ে দেখলে গুদামঘরের আশেপাশে সর্বত্র আগাছার অনুচ্চ জঙ্গল, নিকটে কোথাও লোকজনের সাড়াশব্দ নেই।

অন্ধকার হ'লেও মাঠের মধ্যে বলে অন্ধকার তত ঘন নয়; সেই পাতলা অন্ধকারে চেয়ে দেখে গঙ্গাধরের মনে হল গুদামঘরটা পুরোনো এবং যেন অনেককাল অব্যবহার্য হয়ে পড়ে আছে। বাঁশের বেড়া খসে পড়েচে জায়গায় জায়গায়, চালের খোলা উড়ে গিয়েচে মাঝে মাঝে, সামনের দোরটা উই-ধরা, ভেঙে পড়তে চাইচে যেন।...

গঙ্গাধরের কেমন একটা ভয় হ'ল। কেন সে এখানে এলো এই সন্ধ্যায়? এরকম জায়গায় একা মানুষে আসে, বিশেষ করে এতগুলো টাকা সঙ্গে করে? সে আসতো না কখনই, সে কলকাতায় আজ নতুন নয়, তার ওপরে ঝুনো ব্যবসাদার, বাঙলা দেশ থেকে নতুন আসে নি। ওই লোকটির কথার সুরে কি জাদু আছে, গঙ্গাধরকে যেন টেনে এনেচে, সাধ্য ছিল না যে সে ছাড়ায়। একথা এখন তার মনে হ'ল।

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে খাঁসাহেবের মূর্তি দেখা গেল। লোকটার যাওয়া-আসা এমন নিঃশব্দ ও এমন অদ্ভুত ধরনের, যেন মনে হয় অন্ধকারে ওর চেহারা মিলিয়ে গিয়েছিল, আবার ফুটে বেরুলো। কোথাও যে চলে গিয়েছিল এমন মনে হয় না। পাকা আর ঝুনো খেলোয়াড় আর কি!

খাঁসাহেব দোর খুলে গুদামঘরে ঢুকলো। গঙ্গাধরকেও যখন পেছনে আসতে বললে তখন ভয়ে গঙ্গাধরের হাত-পা ঝিমঝিম করচে, বুক ঢিপঢিপ করচে। এই অন্ধকার

গুদামঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ঠিক ও লোকটা ওর ওই লম্বা হাতে গলা টিপে ধরবে কিংবা ছুরি বুকে বসাবে—সেই ফন্দিতে এতদূর ভুলিয়ে এনেচে। লোকটা নিশ্চয়ই জানতো যে তার কাছে টাকা আছে, অনুসন্ধান রেখেছিল। কে জানে খোদাদাদ খাঁয়ের লোক কিনা! গঙ্গাধরের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিলে। একবার সে ভাবলে, দৌড়ে পালাবে? কিন্তু সে বুড়ো মানুষ, এই জোয়ান পাঞ্জাবী মুসলমানের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লায় তার পক্ষে পেরে ওঠা অসম্ভব।

কলের পুতুলের মতো গঙ্গাধর গুদামঘরের মধ্যে ঢুকল। আশ্চর্য! গুদামের ওদিকের দেওয়ালটা যে একেবারে ভাঙা। গুদামের সর্বত্র দেখা যাচ্ছে সেই অস্পষ্ট অন্ধকার। এক জায়গায় দুটো খালি পিপে ছাড়া কোথাও কিছু নেই। মাকড়সার জাল সর্বত্র, অন্ধকারে দেখা যায় না বটে, কিন্তু নাকে মুখে লাগে। একটা কি রকম ভ্যাপ্‌সা গন্ধ গুদামের মধ্যে, মেজেটা স্যাঁতসেতে, কতকাল এর মধ্যে যেন মানুষ ঢোকে নি।

এদিকে আবার খাঁসাহেব কোথায় গেল? লোকটা থাকে থাকে যায় কোথায়?

অল্পক্ষণ...মিনিট দুই হবে, কেউ কোথাও নেই, শুধু গঙ্গাধর একলা...আবার সেই ভয়টা হ'ল। কেমন এক ধরনের ভয়...যেন বুকের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে। এই বা কি রকম ভয়? আর গুদামঘরটার মধ্যে কনকনে ঠান্ডা হাওয়ার যেন একটা স্রোত বইচে মাঝে মাঝে।

মিনিট-দুই পরেই খাঁসাহেব—এই তো আধ-অন্ধকারের মধ্যে সামনেই দাঁড়িয়ে।...

হঠাৎ একটা অদ্ভুত কথা বললে খাঁসাহেব। বললে, "তুমি কালা নাকি? এতক্ষণ কথা বলচি, শুনতে পাচ্ছ না? কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন? কোকেন যে জায়গায় আছে বললাম, তা দেখতে পেয়েচ? শাবলের চাড় দিয়ে তুলতে বললাম পিপে দুটো। হাঁ করে সঙের মতো দাঁড়িয়ে কেন?"

বা রে! এত কথা কখন বলেচে লোকটা? পাগল নাকি? গঙ্গাধর কেমন ভ্যাবাচাকা হয়ে গিয়েছে, মূঢ়ের মতো দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, "কখন তুমি দেখালে কোকেনের জায়গা —কই কোথায় শাবল?"...

কথা বলতে বলতে গঙ্গাধর সম্মুখস্থ খাঁসাহেবের মুখের দিকে চাইলে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হ'ল তার বিভ্রান্ত, বিমূঢ়, আতঙ্কাকুল দৃষ্টির সামনে খাঁসাহেবের মুখ, গলা, বুক, হাত-পা, সারা দেহটা যেন চুরচুর হয়ে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে পড়চে...সব যেন ভেঙে বাতাসে উড়ে উড়ে যাচ্ছে...খাঁসাহেব প্রাণপণে দাঁতমুখ খামুটি করে বিষম মনের জোরে তার দেহের চূর্ণায়মান অণুগুলো যথাস্থানে ধরে রাখবার জন্যে চেষ্টা করচে। কিন্তু পেরে উঠচে না...সব ভেঙে গেল, গুঁড়িয়ে গেল, উড়ে গেল...এক...দুই...তিন... চার...

আর কোথায় খাঁসাহেব? চারিপাশের অন্ধকারের মধ্যে সে মিশিয়ে গিয়েচে...একটা ঠান্ডা কনকনে বাতাসের ঝাপ্‌টা এলো কোথা থেকে, সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাধর আর্তরবে চীৎকার করে গুদামঘরের স্যাঁতসেতে মেঝের ওপর মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

একটা দেশী ভড় কাছে কোথায় বাঁধা ছিল, তার মাঝিরা এসে গঙ্গাধরকে অচেতন অবস্থায় তাদের ভড়ে নিয়ে যায়। তারাই তাকে দোকানে পৌঁছে দেয়। গঙ্গাধরের টাকা ঠিক ছিল, কানাকড়িও খোয়া যায় নি। তবে শরীর শুধরে উঠতে সময় নিয়েছিল, অনেকদিন পর্যন্ত অন্ধকারে সে একা কিছুতেই থাকতে পারতো না।

মাস দুই পরে মেটেবুরুজে খোদাদাদ খাঁর কাছে টাকা শোধ দিতে গিয়ে গঙ্গাধর টাকা নিয়ে যাবার দিন কি ঘটনা ঘটেছিল সেটা বললে। খোদাদাদ খাঁ গল্প শুনে গম্ভীর হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "সাহজী, ও হ'ল আমীর খাঁ। চোরাই কোকেনের খুব বড় ব্যবসাদার ছিল। আজ বছর পনেরো আগেকার কথা, রমজান মাসে বেশ কিছু মাল হাতে পায়। তক্তাঘাটের কাছে একখানা জাহাজ ভিড়েছিল, সেখান থেকে রাতারাতি সরিয়ে ফেলে, জাহাজের লোকের সঙ্গে যড় ছিল। কোথায় সে মাল রাখতো কেউ জানে না। সেই মাসের মাঝামাঝি সে খুন হয়। কে বা কেন খুন করলে জানা যায় নি, কেউ ধরা পড়ে নি। তবে দলের লোকই তাকে খুন করেছিল এটা বোঝা কঠিন নয়। এই পর্যন্ত আমীর খাঁর ঘটনা আমি জানি। আমার মনে হয় আমীর খাঁ সেই থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার মাল বিক্রী করার জন্যে ; ওর পুরোনো কোকেনের বাক্স হয়েছে দোজখের বোঝা।...তা বাবু সে গুদাম ঘরটা কোথায় তুমি দেখাতে পারবে?"

গঙ্গাধর অন্ধকারে কোথা দিয়ে সেখানে গিয়েছিল তা তার মনে নেই, মনে থাকলেও সে যেতো না।

পথে আসতে আসতে গঙ্গাধরের মনে পড়লো, পুরোনো ভাঙা গুদামঘরটার অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে আমীর খাঁয়ের মুখের সেই হতাশ ও অমানুষিক চেষ্টা করেও হেরে যাবার দৃষ্টিটা। হতভাগ্য এতদিনেও কি বোঝে নি সে মারা গিয়েচে?...কে উত্তর দেবে? ভগবান তার আত্মাকে শান্তি দিন।

মৌচাক, কার্তিক ১৩৪১

পৈতৃক ভিটা

মধুমতী নদীর ওপরেই সেকালের প্রকান্ড কোঠাবাড়ীটা।

রাধামোহন নদীর দিকের বারান্দাতে বসে একটা বই হাতে নিয়ে পড়বার চেষ্টা করল বটে, কিন্তু বইএ মন বসাতে পারলে না।

কেমন সুন্দর ছোট্ট গ্রাম্য নদীটি, ওপারে বাঁশবন, আমবন—বহুকালের। ফলের বাগান যেন প্রাচীন অরণ্যে পরিণত হয়েছে। একা এতবড় বাড়ীতে থাকতে বেশ লাগে। খুব নির্জন, পড়াশুনা করবার পক্ষে কিংবা লেখাটেখার পক্ষে বেশ জায়গাটি। তাদেরই পৈতৃক বসতবাটী বটে, তবে কতকাল ধরে তাদের কেউ এখানে আসেনি, কেউ বাস করেনি।

রাধামোহনের বাবা শ্যামাকান্ত চক্রবর্তী তাঁর বাল্যবয়সে এ গ্রাম ছেড়ে চলে যান। মেদিনীপুরে তাঁর মামার বাড়ী। সেখান থেকে লেখাপড়া শিখে মেদিনীপুরে ওকালতি করে বিস্তর অর্থ উপার্জন করেন এবং সেখানে বড় বাড়ীঘর তৈরী করেন। স্বগ্রামে যে একেবারেই আসেননি তা নয়, তবে সে দু-একবারের জন্যে। এসে বেশি দিন থাকেনওনি। অতবড় পয়সাওয়ালা উকিল, থাকলে তাঁর চলত না।

গ্রামের বাড়ীতে জ্ঞাতি-ভাইরা এতদিন ছিল, তারা সম্প্রতি এখান থেকে উঠে গিয়ে অন্যত্র বাস করছে, কারণ গ্রামে বসে থাকলে আর সংসার চলবার কোন উপায় হয় না।

যা কিছু জমিজমা আছে, না দেখলে থাকে না। বাড়ীটারও একটা ব্যবস্থা করতে হয়। নইলে বাড়ীঘর সব নষ্ট হয়ে যাবে।

রাধামোহন নিজে গত বৎসর ওকালতি পাশ করে পরলোকগত পিতৃদেবের পসারে বসেছে। এবার দেশের চিঠি পেয়ে পুজোর ছুটিতে একাই গ্রামে এসেছে বাড়ীঘর এবং জায়গা-জমির একটা বিলি-ব্যবস্থা করতে।

পাশের বাড়ীর বৃদ্ধ ভৈরব বাঁড়ুজ্যে দুদিন খুব দেখাশুনা করছেন। তিনি জোর করে তাঁর বাড়ীতে রাধামোহনকে নিয়ে গিয়ে কদিন খাইয়েছেন। নইলে রাধামোহন নিজেই রেঁধে খাবে পৈতৃক ভিটেতে, এই ঠিক করেই এসেছিল।

ভৈরব বাঁড়ুজ্যের বড়ছেলে কেষ্ট এসে বললে—দাদা, চা খাবেন, আসুন।

—তুই নিয়ে আয় এখানে কেষ্ট। বেশ লাগছে সন্ধ্যেবেলাটা নদীর ধারে।

—আনব?

—সেই ভাল, যা।

গ্রামের সবাই অবিশ্যি আত্মীয়তা করেছে, ভালবেসেছে। বৃদ্ধ লোকেরা বলেছে—আহা তুমি শ্যামাকান্ত দা'র ছেলে, কেন হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে যাবে। আমরা তো মরিনি এখনও। এস আমাদের বাড়ী।

রাধামোহন সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ।

কেষ্ট চা দিয়ে কিছুক্ষণ গল্প করে চলে গেল। তার পর রাধামোহন আবার একলা। অন্ধকার রাত্রি, মধুমতীর জলে তারাভরা আকাশের ছায়া পড়েছে। রাধামোহন বসে বসে ভাবছে, এই এতবড় বাড়ীটা তার ঠাকুরদাদা তৈরি করেছিলেন কেন এখানে? সেকালের পুলিশের দারোগা ছিলেন তিনি। অনেক পয়সা রোজগার করেছেন বটে কিন্তু বৈষয়িক বুদ্ধি ছিল না সেকালের লোকের। এই বনজঙ্গলে-ভরা গ্রামে কেউ পয়সা খরচ করে বাড়ী করে? কি কাজে আসছে এখন?

আচ্ছা সুরকির কলওয়ালারা বাড়ীটা নেয়? তাহলে পুরনো ইঁটের দরে বাড়ীটা বিক্রি করা যায়।

খুট্ করে কিসের শব্দ শোনা গেল।

রাধামোহন দেখলে, একটি দশ এগার বছরের টুকটুকে ফর্সা মেয়ে ঘরের দাওয়ার আড়াল থেকে উঁকি মারছে। ঘরের মধ্যে হ্যারিকেন জ্বলছে, বারান্দাতে সামান্য আলো এসে পড়েছে, সুতরাং একেবারে অন্ধকারে সে বসে নেই।

ভৈরব বাঁড়ুজ্যে একবার ছেলে পাঠায়, একবার মেয়ে পাঠায়, লোকটা খুব যত্ন করছে বটে।

ও বললে—কি খুকি, ভাত হয়েছে বুঝি?

একটু পরে মেয়েটি সংকোচের সঙ্গে বাইরে এসে দাঁড়ায়।

রাধামোহন বললে—তোমার নাম কি?

—লক্ষ্মী।

—বেশ নাম। পড়?

—উঁহু।

—গান জান?

—উঁহু।

রাধামোহন হেসে বললে—তবে তো মুশকিল দেখছি, বিয়ের বাজারে তুমি যে বিপদে পড়বে। রান্না?

বালিকা ঘাড় নেড়ে জানায় সে জানে।

—ওই একটা গুণ রয়েছে তোমার। কি কি রান্না জান?

—স-ব।

—সব? বাঃ বেশ খুকি তুমি। বস।

বালিকা সলজ্জ ভাবে ঘাড় নেড়ে বললে—না, বসব না।

—কেন? কাজ আছে?

—না।

—তবে বস।

—না আমি যাই। তুমি খেয়ে এস।

—যাচ্ছি। ভাত হয়েছে?

—তোমার খুব খিদে পেয়েছে—না? যাও খেয়ে এস।

রাধামোহন কি একটা বলতে গিয়ে পেছন ফিরে দেখলে খুকি কখন চলে গিয়েছে। সে একটু পরে বাঁড়ুজ্যে-বাড়ী খেতে গেল।

ভৈরব বাঁড়ুজ্যে বললেন—এস বাবাজি, এস। রান্নাও হয়ে এল প্রায়।

রাধামোহন বললে—হ্যাঁ, আপনার মেয়ে ডাকতে গিয়েছিল যে—

খাওয়া-দাওয়া করে রাধামোহন চলে এল। একা নির্জন বাড়ীতে তার বেশ লাগে। তার পূজ্যপাদ পিতৃপুরুষেরা যেন অদৃশ্যচরণে এখানে বিচরণ করেন। এই বাড়ীতে তার পিতামহ বাল্যকালে খেলে বেড়িয়েছেন। তার পিতামহী নববধূরূপে প্রথম এসে দুধে-আলতায় পা রেখে দাঁড়িয়েছেন এ-বাড়ীর প্রাঙ্গণে। আজ তারা বিদেশে গিয়ে বড় বাড়ী ফেঁদে বাস করছে, দেশকে ভুলেছে।

গভীর রাত্রে ঘুমের ঘোরে সব পূর্বপুরুষেরা যেন এসে অনুযোগ করেন—কেন আমাদের ছেড়ে চলে গেলে? কি করেছিলাম আমরা?

পরদিন সকালে উঠে সে নিজের জমিজমা নিয়ে ব্যস্ত রইল, সারাদিন কাটল সে-ভাবে। রাত্রে বারান্দাতে বসেছে, আবার সেই খুকিটি এসে দরজার আড়ালে দাঁড়াল। প্রথমটা রাধামোহন টের পায়নি—বড় লাজুক মেয়ে, নিঃশব্দচরণে কখন এসে যে দাঁড়ায়!

রাধামোহন বললে—ও খুকি?

—উঁ?

—ভাত হয়েছে নাকি?

—আজ দেরী হবে। মাংস রান্না হচ্ছে তোমার জন্যে।

—সত্যি? তবে তো আজ 'ফীস্ট'এর ব্যবস্থা। ও, তুমি বুঝি 'ফীস্ট' বুঝতে পারলে না? ভোজ যাকে বলে। কি বল?

খুকি হেসে চুপ করে রইল। বেশ মেয়েটি! বেশি কথা বলে না, শান্ত সলজ্জ ব্যবহার।

রাধামোহন বললে—তোমার মামার বাড়ী কোথায় খুকি?

—ভুলে গিয়েছি।

—ভুলে গিয়েছি কি রকম? সেখানে যাও না?

খুকি ঘাড় নেড়ে বললে—না।

রাধামোহনের হাসি পেলে খুকির কথায়। বেশ নিঃসংকোচ ভাব ওর।

খুকি আবার বললে—তুমি একা এসেছ কেন?

রাধামোহন হাসতে হাসতে বললে—কেন বল তো?

—বৌঝিদের নিয়ে এস। এত বড় বাড়ী পড়ে আছে। আমোদ করুক।

—তোমার তাই ইচ্ছে খুকি?

—খু-উ-ব। আমি তো তাই চাই।

—কেন?

—কতকাল এ বাড়ী এমনই পড়ে আছে না! কেউ পিদিম দেয় না।

এ কথাটা ওর মুখ থেকে শুনে রাধামোহনের আশ্চর্য লাগল। এতটুকু মেয়ের মুখে এমন কথা! পাকা গিন্নীর মত।

ও কৌতুকের সঙ্গে বললে—তোমার তাতে খারাপ লাগে নাকি খুকি?

—বাঃ, লাগে না! তোমরা সবাই এস, বাড়ীতে শাঁক বাজুক, সন্ধ্যের পিদিম দেওয়া

হক।

কথা শেষ করেই সে ব্যস্তভাবে বললে—তোমার খুব খিদে পেয়েছে, না? বড্ড রাত হয়ে গেল।

—না না, এমন আর বেশি রাত কি।

—তোমার আবার সকালে খাওয়া অব্যেস।

—তুমি কি করে জানলে খুকি?

অস্ফুট হাসির স্বর মাত্র শোনা গেল, কোন উত্তর এল না।

একটু পরে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে খুকি বললে—ভাল লাগে, বড্ড ভাল লাগে।

রাধামোহন ওর দিকে চেয়ে বললে—কি ভাল লাগে খুকি?

—এই তুমি আজ এসেছ। কেউ তো কখনও আসে না এ বাড়ীতে। তুমি যাও, মাংস রান্না হয়ে গিয়েছে।

—হয়ে গিয়েছে! তুমি কি করে জানলে?

খুকি হেসে বললে—আমি জানি যে! যাও তুমি।

—দাঁড়াও, আমি মুখটা ধুয়ে আসি। একসঙ্গে যাব।

মুখ ধুয়ে এসে কিন্তু রাধামোহন খুকিকে আর দেখতে পেলে না। চঞ্চল মন ছেলেমানুষের, আগেই চলে গিয়েছে। বেশ খুকিটি, কেমন পাকা পাকা কথা বললে। হাসতে হাসতে প্রাণ যায়।

ভৈরব বাঁড়ুজ্যে ওকে দেখে বললে—এস এস বাবাজি। . এই তোমায় ডাকতে পাঠাচ্ছিলাম। আজ একটু রাত বেশি হয়ে গেল. একটু মাংস নেওয়া হল আজ। বলি রোজ রোজ ডাল ভাত ওরা খেতে পারে না। আমার বাড়ী আজ দুদিন খাচ্ছে. সে আমার ভাগ্যি। নইলে ওদের অভাব কি। তাই আজ—

রাধামোহন সলজ্জভাবে বললে—না না, সে কি কথা! যা জুটবে তাই খাব। পর ভাবেন নাকি কাকা? আমি তো বাড়ীর ছেলে।

পরদিনও আবার খুকি সন্ধ্যার সময় এসে হাজির।

রাধামোহন বললে—এস খুকি তোমার কথাই ভাবছিলাম।

খুকি হেসে বললে—আমার কথা?

—সত্যি তোমার কথা!

খুকি ছেলেমানুষী ভাবে ঘাড় দুলিয়ে বললে—কেন. আমি জানি।

—তুমি জান?

--জানি। কিন্তু বলব না।

রাধামোহন আজ খানিকটা সন্দেশ আনিয়ে রেখেছে, খুকিকে দেবে বলে। অবিশ্যি আনিয়েছিল হরি নন্দীর চাকর অমূল্যকে দিয়ে, ইসলামকাটির বাজার থেকে। ইসলাম-কাটির সন্দেশ এ অঞ্চলে বিখ্যাত। অমূল্য দেখা যাচ্ছে গল্প করে বেড়িয়েছে। রাধা-মোহন মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠল অমূলার উপর। খুকিকে হঠাৎ খুশি করে দেবে সন্দেশ হাতে দিয়ে ভেবেছিল। সেটা আর হল কই।

তবুও রাধামোহন বললে—না. তুমি জান না খুকি। কি বল তো?

খুকি মৃদু মৃদু হেসে বললে—জানি আমি।

ওর হাসির মধ্যে এমন একটা বিজ্ঞতা আছে যে রাধামোহন আর কোন প্রশ্ন করলে না এ নিয়ে। ও জানে। ওর মৃদু হাসির মধ্যে দিয়েই সে কথা বোঝা গেল।

অমূল্যটা আচ্ছা তো! পাড়াগাঁয়ের লোকের পেটে কোন কথা থাকে!

খ্নকি আবদারের স্নরে বললে—কই, দাও আমাকে সন্দেশ?

রাধামোহন ব্যস্ত হয়ে ওকে সন্দেশ দিতে গেল, কিন্তু ওকে আর সেখানে দেখা গেল না। চঞ্চলা বালিকা, কখন হঠাৎ চলে গিয়েছে। ওর ধরন বড় আশ্চর্য রকমের!

আহারের সময় ভৈরব বাঁড়্নজ্যের বাড়ীতে ও সন্দেশটা নিয়েই গেল! বললে—খ্নকি বড় লাজ্নক, তখন চলে এল, ওকে একট্ন এই—

ভৈরব বাঁড়্নজ্যে হেসে বললে—খ্নকি ব্নঝি তোমার কাছে গিয়েছিল?

—রোজই যায়। গল্প-সল্প করে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, ও একট্ন লাজ্নক বটে! খ্নব ছেলেমান্নষ তো!

পরদিন সন্ধ্যায় খ্নকি আবার নির্দিষ্ট স্থানটিতে এসে দাঁড়াল বারান্দাতে।

রাধামোহন বললে—কাল অমন করে চলে গেলে কেন তুমি? আমি ভারি রাগ করেছিলাম কিন্তু।

খ্নকি হেসে চ্নপ করে রইল।

—খেয়েছিলে সন্দেশ?

—বা রে, যখন তুমি বললে, ওই তো আমার খাওয়া হলে গেল।

পরক্ষণেই সে যেন স্নেহের স্নরে বললে—তুমি এই এসেছ, আমার কত ভাল লাগছে! বাড়ীতে পিদিম জ্বলছে। একা একা ভাল লাগে?

—শহরে যাবে? চল আমার সঙ্গে। চল—

—আমার এখানেই ভাল। ওসব আমার ভাল লাগে ব্নঝি?

—বাঃ, কত টকি-ছবি, কত খাবার-দাবার—

—হক গে। আমার তাতে কি! তুমি আবার আসবে বল।

—আসব নিশ্চয়ই। কেন আসব না।

—এতদিন তো আসনি। ভিটেতে সন্ধ্যের সময় পিদিম জ্বলেনি তো? আচ্ছা আসি আজ। তুমি তো মঙ্গলবারে যাবে?

রাধামোহন একট্ন আশ্চর্য হল। মঙ্গলবারে সে যাবে, বলেছিল ভৈরব বাঁড়্নজ্যেকে। ভৈরব কাল আবার বাড়ীতে গল্প করেছে!

তার পর দ্ন দিন রাধামোহন বৈষয়িক কাজে অন্য গ্রামে গিয়ে রইল। সোমবার অনেক রাত্রে নৌকাযোগে স্বগ্রামে ফিরল বটে, কিন্তু ভৈরব বাঁড়্নজ্যের বাড়ীর কারও সঙ্গে অত রাত্রে আর দেখা করলে না। ঘরে চিঁড়ে ছিল, তাই খেয়ে রাত কাটালে।

পরদিন সে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে, ভৈরব এসে বললে—বাবাজি, কাল কত রাত্রে এলে? খেলে কোথায়? আমাদের ডাকা তোমার উচিত ছিল। তুমি তো ঘরের ছেলে। এত লজ্জা কর কেন? ছিঃ—

রাধামোহন বললে—আপনার খ্নকিটিকে একবার ডেকে দিন না?

—বেশ বেশ। এখ্ননি ডাকছি—দাঁড়াও—

একট্ন পরে একটি আট বছরের কালো-মত মেয়ের হাত ধরে ভৈরব বাঁড়্নজ্যে সেখানে নিয়ে এলেন। রাধামোহন বললে—এ খ্নকি তো নয়, এর দিদি।

ভৈরব বাঁড়্নজ্যে বললেন—এর দিদির তো বিয়ে হয়ে গিয়েছে। সে তো শ্বশ্নরবাড়ী আছে। তুমি তাকে দেখনি।

—তবে আপনার বাড়ীর অন্য কোন মেয়ে—

—আমার বাড়ীতে বাবাজি আর কোন মেয়ে নেই। তবে অন্য কোন মেয়ে—কিন্তু না, আর কোন মেয়ে এ-পাড়ায় নেই ও বয়সের। দু-ঘর তো মোটে ব্রাহ্মণের বাস। বয়স কত?

রাধামোহনের হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বললে—ওর নাম বলেছিল লক্ষ্মী।

—লক্ষ্মী? সে আবার কে? কই, ও-নামের মেয়ে এ গ্রামেই নেই। তোমার শুনতে টুনতে ভুল হয়ে থাকবে বাবাজি।

—শুনতে ভুল হতে পারে নামটা, কিন্তু সে খুকীটি কে? সে তো আর ভুল হবে না।

—কই বাবাজি, বুঝতে তো পারলাম না। ও-বয়সের ও-নামের মেয়ে আমাদের পাড়ায় কেউ নেই ঠিকই।

রাধামোহন চিন্তিত মনে বিদায় নিলে। আশ্চর্য ব্যাপার, খুকিই বা আর দেখা করতে এল না কেন?

স্বগ্রাম থেকে ফেরবার দু বছর পরে রাধামোহন তার পিসির বাড়ী গিয়েছে জব্বলপুরে। সেখানে পুরনো ফটো-অ্যালবাম খুলে দেখতে দেখতে একটি মেয়ের ফটো চোখে পড়ল। এই মেয়েটিকে সে যেন কোথায় দেখেছে! ঠিক মনে পড়ল না।

পিসিমাকে ডেকে ফটোটা দেখাতে তিনি বললেন—একে তুই দেখবি কোথায়! ও তো আমার ছোট বোন। তোর ছোট পিসি। বার বছর বয়সে মারা যায়, তখন তুই কোথায়? তোর মার বিয়েই হয়নি। আমরা তখন সব আমাদের গাঁয়ের বাড়ীতেই থাকি।

তারপর পিসিমা যেন কতকটা আপনমনেই বললেন—আহা, একটু একটু মনে হয় ওকে। বেশ দেখতে ছিল। সে আজ চল্লিশ বছরের কথা। তার পর তোর বাবাও দেশ ছেড়ে মেদিনীপুর চলে এল। দেশের বাড়ীতে যাওয়াই হয়নি। বিয়ের পর আমি একবার মোটে গিয়েছিলাম, সেও আজ বিশ বছর আগের কথা।

রাধামোহন অবাক হয়ে চেয়ে রইল অ্যালবামখানা হাতে করে। হঠাৎ মনে পড়াতে বললে—কি নাম ছিল ছোট পিসিমার?

পিসিমা উত্তর দিলেন—লক্ষ্মী।

অভিশাপ

—"এই সেই প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ী।"

আমি সবিস্ময়ে সেই ভগ্নস্তূপের পানে দেখিলাম। এই সেই প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ী? সহজে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিলাম না। দিনান্তের অস্পষ্ট আলোক যাই যাই করিয়াও আকাশের পশ্চিমপ্রান্তে তখনও অপেক্ষা করিতেছিল। পরিশ্রান্ত বিহগকুলের অবিশ্রাম কূজন ধ্বনি রহিয়া রহিয়া তখনও আকাশ-বাতাস মথিত করিয়া দিতেছিল। গঙ্গার অপূর্ব তরঙ্গভঙ্গ চিত্তলোকে এক অজ্ঞাত চেতনার সঞ্চার করিতেছিল। সেই প্রদোষের ম্লান দ্যুতিবিকাশের অন্তরালে আমি প্রাতঃস্মরণীয় সুবিখ্যাত প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর প্রাসাদের পানে চাহিয়া দেখিলাম। গঙ্গার ঠিক তীরভূমিতে অগণিত লতাপল্লবে মণ্ডিত হতশ্রী প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর প্রাসাদ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে। নদীস্রোতের অবিরাম আঘাতে সে প্রাসাদের অনেকখানিই ভাঙিয়া চুরিয়া কোন্ অনির্দেশের পথে বহিয়া গিয়াছে। অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপ যাহা এখনও বর্তমান আছে, তাহা সেই হতগৌরবের কঙ্কালবিশেষ; এখন যেন সেখানে সেই দুর্দান্তপ্রতাপ প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর প্রেতাত্মা বিরাজ করিতেছে। প্রকৃতি তাহাকে আজ নিজের হাতে সাজাইয়া দিয়াছে, অনাড়ম্বর সৌন্দর্য তাহাকে শ্যামল করিয়া রাখিয়াছে। গঙ্গার বক্ষে

একটি নৌকা পাল তুলিয়া পাশ দিয়া বহিয়া চলিয়াছিল। একটি মাঝি গান গাহিতেছিল। তাহার সেই ক্লান্ত কণ্ঠস্বর সন্ধ্যাপ্রকৃতির নিঃশব্দতার বক্ষ চিরিয়া চিরিয়া কোন্ দূরান্তরের এক অপূর্ব সাড়া বহিয়া আনিতেছিল।

পলাশপুরের প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর নাম শোনে নাই এমন লোক খুব কমই আছে। একদা তাঁহার প্রতাপে সারা পলাশপুর তটস্থ হইয়া থাকিত। কিংবদন্তী আছে যে সেকালে নাকি বাঘে গরুতে নির্বিবাদে একই ঘাটে জল পান করিত। অতবড় ক্ষমতাশালী বর্ধিষ্ণু প্রতিপত্তিশালী জমিদার সেকালে খুব কমই ছিলেন। ইংরেজ-রাজত্বের সূচনার দিন হইতে পলাশপুরের চৌধুরীবংশের উদ্ভব। ইংরেজ-বাহাদুরকে সর্বপ্রকার সাহায্য করার পুরস্কার স্বরূপ ধূর্জটিনারায়ণ চৌধুরী এই পলাশপুরের জমিদারি লাভ করেন। ধূর্জটিনারায়ণ চৌধুরী চৌধুরী-বংশের আদিপুরুষ। তাঁহারই পৌত্র বিজয়নারায়ণ চৌধুরী সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে বারাকপুরের বিদ্রোহদমনে ইংরেজদের যথেষ্ট সহায়তা করেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় ক্যাপ্টেন লরেন্স সপরিবারে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন। ইতিহাসে সেসব কথা নাই বটে তবে সকলেই সে কথা জানিত। ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসের শেষদিকে যখন দুর্যোগের ঘনঘটা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশ কালো করিয়া দিয়াছিল, বিজয়নারায়ণ সে সময়ে বারাকপুরে। সেদিনও এমন ছিল। ক্যাপ্টেন লরেন্স বিজয়নারায়ণ চৌধুরীর কর্মকুশলতায় তাঁহাকে স্বীয় তরবারি উপহার দিয়াছিলেন। বহুকাল সেই তরবারি চৌধুরী বংশের প্রাচীরে অতি সন্তর্পণে অতীত-গৌরবের চিহ্নস্বরূপ টাঙানো ছিল।

বেলেডাঙার কমল হালদারের সঙ্গে গ্রীষ্মের ছুটিতে তার দেশে গিয়াছিলাম বেড়াইতে। সন্ধ্যাকালে গঙ্গার তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে পলাশপুরের চৌধুরীবাড়ীর নিকট আসিয়া পড়িলাম। কমল বলিল, এই সে প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ী।

ইতিপূর্বে চৌধুরীবংশের অতীত কাহিনীর আমি অনেক কিছুই শুনিয়াছি। তাঁহাদের সেই বিরাট প্রাসাদের এই দুর্দশা দেখিয়া বাক্‌শূন্য হইয়া গেলাম। এখন মানুষ সেখানে বাস করে না। সেটি এখন হিংস্র পশুর লীলাভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিজয়নারায়ণ চৌধুরীর পুত্র প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর সময় চৌধুরীবংশের গৌরব চরমে উঠিয়াছিল। চতুর্দিকে চৌধুরীবংশের প্রতিপত্তি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। প্রতাপনারায়ণের সময়ে যেমন চৌধুরীবংশের গৌরব চরমে উঠিয়াছিল, সেই প্রতাপনারায়ণের সময়েই তাহার আবার ভাঙন শুরু হয়। অমানুষিক দুশ্চরিত্রতা ও প্রচুর মকদ্দমার ফলে তাঁহার পতন শুরু হয় মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বেই। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মোগল-সাম্রাজ্য যেমন চরম সীমায় উঠিয়াছিল, সেই ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালেই আবার তাহার পতন শুরু হয়। বৃদ্ধ সম্রাট বহু দুঃখেই দূরে দক্ষিণাপথে প্রাণত্যাগ করেন। ঔরঙ্গজেব ছিলেন চরিত্রবান ও ধার্মিক, আর প্রতাপনারায়ণ ছিলেন ঠিক তাহার বিপরীত। তাঁহার অভিধানে চরিত্র বলিয়া কোন শব্দ ছিল না। মদ ও মেয়েমানুষ তাঁহার জীবনের একমাত্র উপাস্য। আর এ ছাড়া যেটুকু সময় পাইতেন তাহাতে মামলা-মকদ্দমার তদ্‌বির করিতেন। তাঁহার ন্যায় নিখুঁত ভাবে মকদ্দমা তদ্‌বির করিতে সেকালে খুব কম লোকই পারিত। অথচ লেখাপড়ার তিনি ধার ধারিতেন না, আইন তো দূরের কথা। কত সতীরমণীর আর্তক্রন্দনে নিঃশব্দরাত্রে চৌধুরীবংশের সুদীর্ঘ রঙমহল যে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহাদের সেই ব্যাকুল কণ্ঠধ্বনি ঝিল্লীরবের সহিত তালে তালে শব্দিত হইয়া মরিতেছে। তাহাদের বিকট অট্টহাস্য হয়তো এখনও ভগ্নপ্রাসাদের প্রাচীরে আঘাত খাইয়া খাইয়া ফিরিতেছে।

তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন ক্ষীরোদাসুন্দরীকে আর ভালবাসিয়াছিলেন পত্নীর বিধবা ভগিনী আভাময়ীকে। ক্ষীরোদাসুন্দরীর প্রতিবাদ করিবার সাহস হয় নাই। আর বাল-বিধবা আভাময়ী প্রতাপনারায়ণের প্রেমের তরঙ্গে সংক্ষুব্ধ হইয়া আত্মীয়-স্বজনের বিষদৃষ্টি হইতে আত্মগোপন করিবার জন্য উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন। এ ঘটনার পর প্রতাপনারায়ণ আর ক্ষীরোদাসুন্দরীর মুখদর্শন করেন নাই। সেই অভাগী রমণী চার মাসের শিশুপুত্র সূর্যনারায়ণ চৌধুরীকে বুকে লইয়া স্বামীর দৃষ্টিপথের অন্তরালে জীবন কাটাইয়া দিতে লাগিলেন। আর প্রতাপনারায়ণের উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রা গেল বাড়িয়া। তিনি বাহিরবাড়ীতেই দিন কাটাইয়া দিতে লাগিলেন। আভাময়ীর প্রতি সমাজের এই অসহনীয় অত্যাচারের প্রতিকার-স্বরূপ তিনি তাঁহার প্রজাদের শান্তির সংসারে দিতে লাগিলেন আগুন জ্বালাইয়া। গৃহস্থবধূ বা গৃহস্থকন্যা তাঁহার ক্ষুধিত দৃষ্টি হইতে অতিকষ্টে আত্মরক্ষা করিত। সারাদিন পথে পথে পাখীমারা বন্দুক কাঁধে লইয়া পাখী মারিয়া ফিরিতেন। সে পথে কোন স্ত্রীলোকের বাহির হইবার সাহস ছিল না। আর তাঁহার সঙ্গে থাকিত কানা কালু সর্দার। কানা হইলে কি হয়, চক্ষুষ্মানকেও সে হার মানাইতে পারিত। তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির বলে প্রতাপনারায়ণের ক্ষুধা নিবৃত্ত হইত সহজেই। ইংরেজ-রাজত্বের এমন ধরাবাঁধা আইন তখন ছিল না। প্রতাপনারায়ণের মহল্লায় তাঁহার বিখ্যাত লাঠিয়ালদের দৌলতে কাহারও টুঁ শব্দটি করিবার সামর্থ্য ছিল না। লাঠির জোরেই রাজ্যজয় হইত আর লাঠির জোরেই রমণীর সতীত্বলুণ্ঠন হইত। কিন্তু প্রতাপনারায়ণ স্ত্রীলোকদের ঘৃণা করিতেন সর্বান্তঃকরণে। নারী নরকের দ্বার। এই নারীই তাঁহার জীবনে দিয়াছিল দাবানল জ্বালাইয়া।

সেবার দুরন্ত বর্ষার এক অবিশ্রান্ত ধারাপতনের দিনে কালু কোথা হইতে এক অজ্ঞাতনামা রমণীকে বহিয়া আনিল। রাত্রি তখন দশটা। চারিদিকে সেই বর্ষাপ্রকৃতির গুঞ্জন কোন্ এক বিরহিণীর আর্তক্রন্দনের ন্যায় ধ্বনিত হইতেছিল। কাহাকে হারানোর বেদনা যেন সারা বিশ্ব মথিত করিয়া রাখিয়াছিল। প্রতাপনারায়ণ তখন সুর্মা দিয়া তাঁহার নয়নপ্রান্তে রেখাপাত করিতেছিলেন। কালু আসিয়া ডাকিল,—মহারাজ!

প্রতাপনারায়ণ হাঁকিলেন, কে?...ও।

—এসেছে।

—বিশ্রাম করতে বল্।—কতদূর থেকে আসছে?

—সাত ক্রোশ।

—কেমন?

—আপনার প্রসাদ পাবার উপযুক্ত।

—উত্তম।

প্রতাপনারায়ণ দ্রুত সাজ সমাধা করিয়া প্রমোদগৃহে উপস্থিত হইলেন। অভাগিনী তখন সেই বিলাসগৃহের এক কোণে বস্ত্রখণ্ডে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া কাঁদিয়া মরিতেছিল। মনুষ্যপদশব্দে সে প্রতাপনারায়ণের পানে চাহিয়াই বিকট শব্দে আঁতকাইয়া উঠিল। তাহার আয়ত আঁখি, সর্বোপরি তাহার সেই ভীতিসুন্দর দেহলতা প্রতাপনারায়ণের প্রাণে এক উন্মাদনা জাগাইয়া দিল। প্রতাপনারায়ণ তাহার নিকট গিয়া প্রশ্ন করিলেন, তোমার নাম?

কোন উত্তর পাইলেন না। পুনরায় বলিলেন, এই যে বিরাট প্রাসাদ, এই অতুল বিভব, সবই তোমার। তুমি আজ আমার রানী।

সেই রমণী কহিল, না—না, আমি রানী হ'তে চাই না। আমায় ভিখিরি থাকতে দিন।

আপনার দুটি পায়ে পড়ি, আপনি আমাকে আমার স্বামী-পুত্রের কাছে ফিরে যেতে দিন।

কথা শেষে সে প্রতাপনারায়ণের পদপ্রান্তে পড়িল। প্রতাপনারায়ণ উৎকট হাসি হাসিয়া উঠিলেন—বলিলেন, অসম্ভব।

জীবনে এমন নিখুঁত রূপ প্রতাপনারায়ণ আর দ্বিতীয়টি দেখেন নাই। তাহার সেই বিনাইয়া বিনাইয়া কান্না প্রতাপনারায়ণের নিকট বড় মধুর বলিয়া বোধ হইল। সেই রমণী কহিল, আমায় ছেড়ে দিন, আপনার ভাল হবে।

প্রতাপনারায়ণ হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন—আমার ভাল আমি চাই না।

—আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন। আপনার সর্বনাশ হবে। আমার অভিশাপে এ বাড়ীঘর জ্বলে পুড়ে যাবে।

প্রতাপনারায়ণ শিহরিয়া উঠিলেন। সে পুনরায় বলিল, যদি আমি যথার্থ সতী হয়ে থাকি তবে আমার অভিশাপ কখনও সহ্য করতে পারবেন না। আপনি নির্বংশ হবেন।

অবলা রমণীর যে এমন করিয়া মানুষকে অভিশাপ দিবার ক্ষমতা আছে ইহা ছিল প্রতাপনারায়ণের বিশ্বাসের অতীত। কিন্তু তিনি পরিণামদর্শী ছিলেন না আদৌ। তিনি ঐ অবলার সাবধান-বাণী শুনিলেন না। এই তাঁহার জীবনের শেষ শিকার।

পরদিন সারা প্রাসাদে একটা দুরপনেয় বিষাদের ছায়াপাত হইল। সেদিন হইতে সেই রমণী আর উঠিল না বা আহার গ্রহণ করিল না। দুই দিন পূর্ব হইতেই সে উপবাস করিতেছিল। তিল তিল করিয়া সে শুকাইয়া মরিতে লাগিল। সকলে মূক বিস্ময়ে অভাগীর পানে চাহিয়া রহিল। প্রতাপনারায়ণ ভয়-ব্যাকুলচিত্তে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। উহার বিষাক্ত দীর্ঘশ্বাস সহ্য করিবার সাহস তাঁহার ছিল না। তিন দিন তিন রাত্রি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অভাগিনী প্রাণত্যাগ করিল। পরিশেষে রানী শ্রীক্ষীরোদা-সুন্দরীও তাঁহার দীর্ঘকালের শুচিতা ত্যাগ করিয়া এই নরককুণ্ডে আসিয়াছিলেন অভাগিনীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে স্বামীর কল্যাণ-কামনায়। কিন্তু তাঁহার সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। 'যদি আমি যথার্থ সতী হয়ে থাকি তো চৌধুরী-বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে'—এই বলিয়া সেই তেজস্বিনী নারী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

এই ঘটনার সাতদিন পর প্রতাপনারায়ণ ফিরিয়া আসিলেন—কিন্তু জীবিত নয়, মৃত। পথে তাঁহার সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে।

সূর্যনারায়ণও পিতাকে অনুসরণ করিতে চলিলেন! অল্প বয়সে সম্পত্তির মালিক হইয়া মোসাহেবের সহায়তায় তাঁহার ক্ষয়িষ্ণুপ্রায় সম্পত্তি ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হইয়া আসিতে লাগিল। পিতার ন্যায় তিনিও ছিলেন অপরিণামদর্শী। ভবিষ্যতের কথা ভাবিবার অবকাশ তাঁহার ছিল না। পর-স্ত্রীতে লোভ তাঁহার ছিল না সত্য, তবে তাঁহারও নেশা ছিল। শহর অঞ্চল হইতে সব বিখ্যাত বিখ্যাত বাইজি আনার নেশা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তাহার জন্য তিনি মুক্তহস্তে ধনব্যয় করিয়া যাইতেন। লখনউ, দিল্লী, আগ্রা, লাহোর, বোম্বাই, কলিকাতা ইত্যাদি সকল শহরের সুপ্রসিদ্ধা বাইজি-কুলের পদরেণুপাতে তিনি তাঁহার পিতৃপিতামহের পবিত্র প্রাসাদ ধন্য করিতে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি দিনরাত তাহাদের সুরলহরী ও রূপমাধুরীতে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। বিবাহ করিয়াছিলেন যথাসময়ে। যদিও পিতার ন্যায় তিনি তাঁহার পত্নীকে ঘৃণা করিতেন না তথাপি তাঁহার দিন কাটিত বাহির-বাড়ীতে। গভীর রাত্রে অতিরিক্ত তাগাদার ফলে মাঝে মাঝে টলিতে টলিতে অন্দর-বাড়ীতে উঠিয়া যাইতেন নিতান্ত অনিচ্ছায়। অধিকাংশ রাত্রিই তাঁহার এই বাহির-বাড়িতে কাটিত। তাহা ছাড়া দেশভ্রমণ তাঁহার জীবনের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল। একটির পর একটি করিয়া তিনি দেশ দেখিয়া বেড়াইতেন।

কত তীর্থক্ষেত্রে গিয়াছেন, অথচ দেবতা দর্শন করেন নাই। দেবমন্দিরের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বলিতেন, জীবনে তো অনেক পাপ করেছি, মিথ্যে পবিত্র দেবমন্দির আর কলুষিত করি কেন!

অকস্মাৎ একদিন সূর্যনারায়ণ কাহাকেও কিছু না বলিয়া না কহিয়া অতি অসময়ে বিসূচিকা রোগে দেহত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার নাবালক পুত্র শংকরনারায়ণ চৌধুরীকে দেনার দায়ে আকণ্ঠ ডুবাইয়া যাইতে কুণ্ঠিত হন নাই।

শংকরনারায়ণ যখন সাবালক হইলেন তখন তিনি তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে তাঁহাদের প্রাচীন বসতবাটি ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। চারিদিকের আয়ের পথ রুদ্ধ হইয়াছিল। বনেদী বংশের ধ্বংসাবশেষ লইয়া চৌধুরীপরিবার বিভীষিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। গহনা বিক্রি করিয়া শংকরনারায়ণ মানুষ হইয়া উঠিলেন। তিনি কিন্তু মানুষ হইলেন তাঁহার পিতা বা পিতামহের বিপরীত প্রকৃতি হইয়া। ইংরেজি শিক্ষার তিনি ধার ধারিলেন না। তবে অবিচলিত চিত্তে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার মধ্যে কেমন যেন ধর্মভাব জাগিয়া উঠিল ; তিনি অল্প বয়স হইতেই ধার্মিক হইয়া পড়িলেন। সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দনের পূজায় ক্রমে ক্রমে তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। কাহারও সঙ্গে বড় একটা কথা কহিতেন না। বাড়ীতে থাইতেন আর ত্রিতলের ঘরে বসিয়া থাকিতেন। কোথাও বাহির হইতেন না। রুদ্রাক্ষের মালা গলায় পরিয়া গেরুয়া বসনে সর্বাঙ্গ মণ্ডিত করিয়া তিনি সন্ন্যাস-জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। অবসর সময়ে তিনি তাঁহার প্রিয় বেহালাখানায় বসিয়া ছড়ি ঘষিতেন। রাত্রির নিঃশব্দতার বক্ষ চিরিয়া সেই রাগিণী কোন বন্দিনী বিরহিণীর আর্তক্রন্দনের ন্যায় শুনাইত। ক্ষয়িষ্ণু চৌধুরীবাড়ীর গৃহলক্ষ্মী যেন ঐ ভাষায় গুমরাইয়া গুমরাইয়া কাঁদিয়া মরিত।

শংকরনারায়ণও তাঁহাদের বংশের ধারা বজায় রাখিয়া অল্প বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং খুব অল্প বয়সেই তাঁহার পুত্র হইয়াছিল। তাঁহার পিতৃপুরুষদিগের ন্যায় তিনি তাঁহার পত্নী কল্যাণীকে ঘৃণা করেন নাই সত্য, তবে তাঁহাকে যে ভালবাসিতেন একথা হলফ করিয়া বলা যায় না। তিনি পত্নীর প্রতি তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন করিতেন মাত্র। সারাদিন প্রায় তাঁহার গৃহদেবতার ধ্যানধারণায় কাটিত। তিনি নিত্য অত্যন্ত শুচিতা সহকারে দেবতার আরাধনা করিতেন। গভীর রাত্রে পূজায় বসিতেন। যাহা জুটিত সেই সামান্য দুটি শাকান্ন মুখে দিয়া তিনি আবার তাঁহার সেই ত্রিতলের গৃহে যাইতেন। বাড়ী হইতে বাহির হইতেন না আদৌ। দিনদিন চৌধুরীবংশ যে নিশ্চিহ্ন হইবার পথে আগাইয়া যাইতেছে তাহা দেখিয়া তিনিও ধীরে ধীরে শুকাইতে লাগিলেন। আর ততই গৃহদেবতার পূজার মাত্রাও বাড়িয়া যাইতে লাগিল। তিনি পাগলের মত হইয়া গেলেন। তাঁহার জীবনের একমাত্র কামনা হইল—বিত্ত চাই, অর্থ চাই, ঐশ্বর্য চাই। তিনি কেবল প্রার্থনা করিতেন দেবতা আবার যেন চৌধুরী-বংশের নষ্ট-সম্পদ ফিরাইয়া দেন।

এহেন কালে একদা চৈত্রের এক অমাবস্যা রজনীতে শংকরনারায়ণ স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাঁহাদের গৃহলক্ষ্মী চৌধুরীবংশ ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। তাঁহার অপূর্ব জ্যোতিতে বিশ্বভুবন আলোকিত। একটা সুস্নিগ্ধ সুবাসে দিগন্ত ভরিয়া গিয়াছে। শংকরনারায়ণ ত্বরিতপদে উঠিয়া গিয়া দেবীর পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। দেবী তাঁহার বিষণ্ণ মুখে যেন বলিলেন, বাছা, পথ ছাড়্, আমায় যেতে দে।

শংকরনারায়ণ কাঁদিতে লাগিলেন,—মা, আমাদের এমনি করে ছেড়ে যাচ্ছ মা?

দেবী নিষ্ঠুরভাবে হাসিলেন।

—নিত্য না খেয়ে তোমার পূজার আয়োজন করেছি মা, তবু তোমার ক্ষুধা দূর হয় নি?

—না। আমি রক্ত চাই!

—কার রক্ত মা?

—তোর ছেলের।

দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। অমনি শংকরনারায়ণের ঘুম ভাঙিয়া গেল। ঘামে তাঁহার সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছিল। তিনি উঠিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসী, এ কি পরীক্ষা তোর! তখনও তাঁহার সেই গৃহে দেবীর পদ্মগন্ধ বিচ্ছুরিত হইতেছিল। শংকরনারায়ণ বিচলিত হইলেন না। চৌধুরীবংশ তাঁহার পুত্রের চেয়ে অধিক মূল্যবান। তিনি বলিলেন, তাই হবে মা, তাই হবে। তুমি এ অভাগাকে ত্যাগ করো না।

তার পর তিনি ধীরপদক্ষেপে তাঁহার শয়নগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অতি সন্তর্পণে। কল্যাণী তখন ঘুমাইতেছিলেন আর তাঁহার পুত্র মাতার স্তন্যপান করিতে-ছিল ঘুমন্ত অবস্থায়। শংকরনারায়ণ অত্যন্ত ধীরে ধীরে সেই খোকাকে মাতার বক্ষ হইতে ছিনাইয়া আনিলেন। কল্যাণী সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইতেছিলেন। তিনি একবার পাশ ফিরিয়া শুইলেন মাত্র। শংকরনারায়ণ খোকাকে পরম স্নেহে তাঁহার বুকের মধ্যে করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সোঁ-সোঁ শব্দে সারা প্রকৃতি যেন উন্মাদ তান্ডবে মাতিয়া উঠিয়াছিল। খোকা পিতার বাহুমধ্যে ঘুমাইতে লাগিল। তার পর খোকাকে গৃহদেবীর সম্মুখে নিজ হাতে বলি দিলেন। একবার হয়তো সে কাঁদিয়াছিল ; কিন্তু বাহিরের সেই ঝড়জলের মধ্যে সে কান্না হয়তো শোনা যায় নাই। রক্তধারায় সারা-গৃহ ছাইয়া গেল। ভয়ে বিস্ময়ে তিনি কিন্তু দিশাহারা হইলেন না বা বেদনায় মুষড়াইয়া পড়িলেন না। হোমের জন্য যে বালি ছিল তাহা আনিয়া সারারাত্রি তিনি সেই রক্তচিহ্ন মুছিতে লাগিলেন। চৌধুরীবংশ বড় হইবে জীবনের এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা আজ তাঁহার পূরণ হইয়াছে, এই সান্ত্বনায় পরম তৃপ্তিতে সেই বালির উপরই রাত্রিশেষের দিকে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। দিনের আলো ফুটিতে না ফুটিতে কল্যাণী উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া স্বামীকে জাগাইলেন, ওগো, খোকা কোথা গেল?

শংকরনারায়ণ স্ত্রীর পানে চাহিতে পারিলেন না। খোকার মৃতদেহ তখন ভাগীরথীর খরস্রোতে কোন্ দূরান্তরে ভাসিয়া গিয়াছে। সেই রক্তমাখা বালুকারাশিই তাহার শেষ চিহ্ন। কল্যাণী আবার ডাকিলেন, ওগো, কথা কও, কথা কও! আমার খোকাকে এনে দাও!

শংকরনারায়ণ আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। জীবনে আর তিনি খুব কমই কথা বলেন। যাহা হোক ব্যাপারটা আর চাপা রহিল না। বুদ্ধিমতী কল্যাণী ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যাপারই অবগত হইলেন। সারাদিন তিনি আর উঠিলেন না, খাইলেন না। সেইদিন রাত্রে তিনিও কূলপ্লাবিনী জাহ্নবীর পুণ্যস্রোতে আত্মবিসর্জন দিয়া তাঁহার বড় আদরের খোকার সহিত মিলিত হইলেন।

ব্যাপারটা ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

এ ঘটনার কিছুদিন পর শংকরনারায়ণ চৌধুরীকেও আর পাওয়া গেল না। আজও পর্যন্ত তাঁহাকে পাওয়া যায় নাই!

সে আজ পঞ্চাশ বছরের কথা। গৃহলক্ষ্মী এখনও সেই ভগ্নপ্রায় বংশহীন চৌধুরী বাড়ীর অন্তরালে বন্দিনী আছেন কিনা জানি না। তবে মাঝে মাঝে ঐ ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে একটা চাপা হাসি পরম পরিতৃপ্তির সহিত বাহির হইয়া আসে। সেদিনও

এমনি ঝড় উঠিয়াছিল ; সেদিনও পশ্চিমের আকাশে একটা কালো মেঘ দিগন্ত ছাইয়া রহিয়া রহিয়া কাঁদিয়া মরিতেছিল, সেদিনও হয়তো ঐ শ্মশানঘাটের নিষ্পত্র ঝাউগাছ-টার মাথায় বসিয়া একটা শকুন আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া মরিতেছিল।

উইলের খেয়াল

দেশ থেকে রবিবারে ফিরছিলাম কল্‌কাতায়।। সন্ধ্যার আর বেশী দেরি নেই, একটু আগে থেকেই প্ল্যাটফর্মে আলো জেবলেচে, শীতও খুব বেশী। এদিকে এমন একটা কাম্‌রায় উঠে বসেচি, যেখানে দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই যার সঙ্গে একটু গল্পগুজব করি। আবার যার তার সঙ্গে গল্প ক'রেও আনন্দ হয় না। আমার দরের কোনো লোকের সঙ্গে গল্প ক'রে কোনো সুখ পাই নে, কারণ তারা যে কথা বলবে সে আমার জানা। তারা আমারই জগতের লোক, আমার মতই লেখাপড়া তাদেরও, আমারই মত কেরানী-গিরি কি ইস্কুল-মাস্টারী করে, আমারই মত শনিবারে বাড়ী এসে আবার রবিবারে কলকাতায় ফেরে। তারা নতুন খবর আমায় কিছুই দিতে পারবে না, সেই এক-ঘেয়ে কলকাতায় মাছের দর, এম্. সি. সি'র খেলা, ইস্টবেঙ্গল সোসাইটির দোকানে শীত-বস্ত্রের দাম, চণ্ডীদাস কি সাবিত্রী ফিলমের সমালোচনা—এসব শুনলে গা বমি-বমি করে। বরং বেগুনের ব্যাপারী, কি কন্যাদায়গ্রস্ত বৃদ্ধ পাড়াগেঁয়ে ভদ্রলোক, কি দোকান-দার—এদের ঠিকমত বেছে নিতে পারলে, কথা বলে আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু বেছে নেওয়া বড় কঠিন—কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক ভেবে যাঁর কাছে গিয়েছি, অনেক সময় দেখেছি তিনি ইন্‌সিওরেন্সের দালাল।

একা বসে বিড়ি খেতে খেতে প্ল্যাটফর্মের দিকে চেয়ে আছি, এমন সময় দেখি, আমার বাল্যবন্ধু শান্তিরাম হাতে একটা ভারী বোঁচকা ঝুলিয়ে কোন্ গাড়িতে উঠবে ব্যস্তভাবে খুঁজে বেড়াচ্চে। আমি ডাকতেই 'এই যে!' ব'লে একগাল হেসে আমার কামরার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—বোঁচকাটা একটুখানি ধর না ভাই কাইন্ডলি—

আমি তার বোঁচকাটা হাত বাড়িয়ে গাড়িতে তুলে নিলাম—পেছনে পেছনে শান্তিরামও হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে আমার সামনের বেঞ্চিতে মুখোমুখি হয়ে বসলো। খানিকটা ঠান্ডা হয়ে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললে—বিড়ি আছে? কিন্‌তে ভুলে গেলাম তাড়াতাড়িতে। আর ক'মিনিট আছে? পৌনে ছ'টা না রেলওয়ের? আমি ছুটছি সেই বাজার থেকে—আর ঐ ভারী বোঁচকা! প্রাণ একেবারে বেরিয়ে গিয়েচে। কলকাতায় বাসা করা গিয়েচে ভাই, শনিবারে শনিবারে বাড়ি আসি। বাগানের কলাটা, মুলোটা যা পাই নিয়ে যাই এসে—সেখানে তো সবই—হুঁ—হুঁ—বুঝলে না? দাঁতন-কাঠিটা এস্তেক তাও নগদ পয়সা। প্রায় তিন চার দিনের বাজার খরচ বেঁচে যায়। এই দ্যাখো, ওল, পুঁই শাক, কাঁচা লঙ্কা, পাটালি...দেখি দেশলাইটা—

শান্তিরামকে পেয়ে খুশী হ'লাম। শান্তিরামের স্বভাবই হচ্চে একটু বেশী বকা। কিন্তু তার বকুনি আমার শুনতে ভাল লাগে। সে বকুনির ফাঁকে ফাঁকে এমন সব পাড়া-গাঁয়ের ঘটনার টুকরো ঢুকিয়ে দেয়, যা গল্প লেখায় চমৎকার—অতি চমৎকার উপাদান। ওর কাছে শোনা ঘটনা নিয়ে দু-একটা গল্প লিখেচিও এর আগে। মনে ভাবলাম, শান্তি-রাম এসেচে ভালই হয়েচে, একা চার ঘণ্টা রাস্তা যাব, তাতে এই শীত। তা ছাড়া এই শীতে ওর মুখের গল্প জমবেও ভাল।

হঠাৎ শান্তিরাম প্ল্যাটফর্মের দিকে মুখ বাড়িয়ে ডাকতে লাগল—অবনী ও অবনী, এই যে, এই গাড়িতে এস, কোথায় যাবে?

গ্রুটি তিন-চার ছেলেমেয়ে, এক পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের স্বাস্থ্যবতী ও সুশ্রী একটি পাড়াগাঁয়ের বউ আগে আগে, পিছনে একটি ফর্সা একহারা চেহারার লোক, সবার পিছনে বাক্স পেঁটরা মাথায় জন দুই কুলি। লোকটি আমাদের কামরার কাছে এসে দাঁড়িয়ে হেসে বল্‌লে—এই যে দাদা, কল্‌কাতা ফিরচেন আজই! আমি? আমি একবার এদের নিয়ে যাচ্চি পাঁচঘরার ঠাকুরের থানে। মসলন্দপুর স্টেশনে নেমে যেতে হবে; বাস্‌ পাওয়া যায়। দলটি আমাদের গাড়ির পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে খালি একটা ইণ্টার ক্লাস কামরায় উঠল।

শান্তিরাম চেয়ে চেয়ে দেখে বল্‌লে—তাই অবনী এখানে এল না। ইণ্টার ক্লাসের টিকিট কিনা? আঙুল ফুলে কলাগাছ একেই বলে! ওই অবনীদের খাওয়া জুটত না, আজ দল বেঁধে ইণ্টার ক্লাসে চেপে বেড়াতে যাচ্ছে...ভগবান যখন যাকে দ্যান্‌,—আমাদের বোঁচকা বওয়াই সার।

গাড়ি ছাড়লো। সন্ধ্যার পাতলা অন্ধকারে পাম্পিং এঞ্জিনের শেড, কেবিনঘর, ধূমাকীর্ণ কুলীলাইন, সট সট ক'রে দু-পাশ কেটে বেরিয়ে চলেচে, সামনে সিগন্যালের সবুজ বাতি, তারপর দু-পাশে আখের ক্ষেত, মাঠ, বাব্‌লা বন। শান্তিরামের গলার সুর শুনে বুঝলাম, সে গল্প বলার মেজাজে আছে, ভাল ক'রে আলোয়ান গায়ে দিয়ে বসলাম, উৎসুক মুখে ওর দিকে চেয়ে রইলাম।

শান্তিরাম বল্‌লে—অবনীকে এর আগে কখনো দেখ নি? নিশ্চয়ই দেখেছ ছেলেবেলায়, ও আমাদের নীচের ক্লাসে পড়তো আর বেশ ভাল ফুটবল খেলতো—মনে নেই? ওর বাবা কোর্টে নকলনবিশী করতেন, সংসারের অভাব-অনটন টানাটানি বেড়েই চলেছিল। সেই অবস্থায় অবনীর বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে আন্‌লেন। বল্‌লেন—কবে মরে যাব, ছেলের বৌয়ের মুখ দেখে যাই। বাঁচলেনও না বেশীদিন, এক পাল পুষ্যি আর একরাশ দেনা ছেলের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সংসার থেকে বিদায় নিলেন।

তারপর কি কষ্টটাই গিয়েচে ওদের। অবনী পাস করতে পারলে না, চাকরিও কিছু জুটলো না, হরিণখালির' বিলের এক অংশ ওদের ছিল অনেক কাল আগে থেকে—শোলা হ'ত সেখানে, সেই বিলের শোলা ইজারা দিয়ে যে কটা টাকা পেত, তাই ছিল ভরসা।

ওদের গাঁয়ে চৌধুরী-পাড়ায় নিধিরাম চৌধুরী বলে একজন লোক ছিল। গাঁয়ে তাকে সবাই ডাকতো নিসু চৌধুরী। নিসু চৌধুরীর কোন কুলে কেউ ছিল না, বিয়ে করেছিল দু-দুবার, ছেলেপুলেও হয়েছিল কিন্তু টেঁকে নি। ওর বাবা সেকালে নিম্‌কির দারোগা ছিল, বেশ দু-পয়সা কামিয়ে বিষয় সম্পত্তি ক'রে গিয়েছিল। তা শালিয়ানা প্রায় হাজার বারো-শ টাকা আয়ের জমা, আম-কাঁটালের বাগান, বাড়িতে তিনটে গোলা, এক একটা গোলায় দেড়পাট দু-পাট ক'রে ধান ধরে, দুটো পুকুর, তেজারতি কারবার। নিসু চৌধুরী ইদানীং তেজারতি কারবার গুটিয়ে ফেলে জেলার লোন অফিসে নগদ টাকাটা রেখে দিত। সেই নিসু চৌধুরীর বয়স হ'ল, ক্রমে শরীর অপটু হয়ে পড়তে লাগল, সংসারে মুখে জলটি দেবার একজন লোক নেই। আবার পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার জান তো? পয়সা নিয়ে বাড়িতে কাউকে খেতে দেওয়া—এ রেওয়াজ নেই। তাতে সমাজে নিন্দে হয়, সে কেউ করবে না। নিসু চৌধুরী এখন একবার অসুখে পড়ে দিনকতক বড় কষ্ট পেলে—এ-সব দিকের পাড়াগাঁয়ের জান তো ভায়া, না পাওয়া যায় রাঁধুনী বামুন, না পাওয়া যায় চাকর, পয়সা দিলেও মেলানো যায় না। দিন দশ-বারো ভুগবার পর উঠে একটু সুস্থ হয়ে নিসু চৌধুরী অবনীকে বাড়িতে ডাকলে। বল্‌লে—বাবা অবনী, আমার কেউ নেই, এখন তোমরা পাঁচজন ভরসা। তা তোমার বাবা আমায় ছোট

ভাইয়ের মত দেখতেন, তোমাদের পাড়ায় তখন যাতায়াতও ছিল খুব। তারপর এখন শরীরও হয়ে পড়েচে অপটু, তোমাদের যে গিয়ে খোঁজখবর করবো, তাও আর পারি নে! তা আমি বলচি কি, আমার যা আছে সব লেখাপড়া ক'রে দিচ্চি তোমাদের, নাও—নিয়ে আমাকে তোমাদের সংসারে জায়গা দেও। তুমি আমার দীনুদার ছেলে, আমার নিজের ছেলেরই মত। তোমাকে আর বেশী কি বল্‌বো বাবা?

অবনী আশ্চর্য হয়ে গেল। নিসু চৌধুরীর নগদ টাকা কত আছে কেউ অবিশ্যি জানে না, কিন্তু বিষয় সম্পত্তির আয়, ধান,—এ-সব যা আছে, এ গাঁয়ে এক রায়েদের ছাড়া আর কারু নেই। সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিতে চায় নিসু চৌধুরী তার নামে!... অবনীর মুখ দিয়ে তো কথা বেরুলো না খানিকক্ষণ। তারপর বল্‌লে—আচ্ছা কাকা, বাড়িতে একবার পরামর্শ ক'রে এসে কাল বল্‌ব।

নিসু চৌধুরী বল্‌লে—বেশ বাবা, কিন্তু এ-সব কথা এখন যেন গোপন থাকে। পরদিন গিয়ে অবনী জানালে এ প্রস্তাবে তাদের কোন আপত্তি নেই। নিসু চৌধুরী বল্‌লে—বৌমা তাহলে রাজী হয়েছেন? দ্যাখ তা হলে আমার একটা সাধ আছে, সেটা বলি। আমার এত বড় বাড়িখানা পড়ে আছে, অনেক দিন এতে মা-লক্ষ্মীদের চরণ পড়ে নি, ঠিকমত সন্ধ্যে পড়ে না। তোমাদের ও-বাড়িটাও তো ছোট, ঘর-দোরে কুলোয় না; তা ছাড়া পুরোনোও বটে। তোমরা আমার এখানে কেন এস না সবসুদ্ধ? তোমারই তো বাড়িঘর হবে, তোমাকেই সব দিয়ে যখন যাব, তখন এখন থেকে তোমার নিজের বাড়ি তোমরা না দেখলে নষ্ট হয়ে যাবে যে!

এ প্রস্তাবেও অবনী রাজী হ'ল, একটা ভাল দিন দেখে সবাই এ বাড়িতে চলে এল। অবনীর বৌ নিসু চৌধুরীর বাড়ি কখনো দেখে নি, কারণ সে ও-পাড়ার বউ, এ-পাড়ায় আসবার দরকার তেমন হয় নি কখনো। ঘর-বাড়ি দেখে বৌ যেমন অবাক্ হয়ে গেল, তেমনি খুশী হ'ল। নিসু চৌধুরীর বাবা রোজগারের প্রথম অবস্থায় শখ ক'রে বাড়ি উঠিয়েছিলেন—তখনকার দিনে সস্তাগণ্ডার বাজার ছিল, দেখে অবাক্ হবার মত বাড়িই করেছিলেন বটে, পাড়াগাঁয়ের পক্ষে অবিশ্যি। কল্‌কাতার কথা ছেড়ে দেও। মস্ত দোতলা বাড়ি, ওপরে নীচে বড় বড় সাত-আটখানা ঘর, বারান্দা, প্রকাণ্ড ছাদ, সান-বাঁধানো উঠোন, ভেতর বাড়িতেই পাকা রান্নাঘর, ইঁদারা, বাইরে প্রকাণ্ড বৈঠকখানা। বাড়ির পেছনে ফলের বাগান, ছোট একটা পুকুর, বাঁধানো ঘাট—পাড়াগাঁয়ে সম্পন্ন গেরস্ত বাড়ি যেমন হয়ে থাকে।

ওরা বাড়িতে উঠে এসে জাঁকিয়ে সত্যনারায়ণের পুজো দিলে, লোকজন খাওয়ালে, লক্ষ্মীপুজো করলে। সবাই বল্‌লে অবনীর বৌয়ের পয় আছে, নইলে অমন বিষয়-সম্পত্তি পাওয়া কি সোজা কথা আজকালকার বাজারে! আবার অনেকেরই চোখ টাটালো।

এ-সব হ'ল গিয়ে ও-বছর ফাল্গুন মাসের কথা। গত বছর বোশেখ মাসে নিসু চৌধুরী মারা গেল। জ্বর হয়েছিল, অবনী ভাল ভাল ডাক্তার দেখালে, খুলনা থেকে নৃপেন ডাক্তারকে নিয়ে এল—বিস্তর পয়সা খরচ করলে, অবনীর বৌ মেয়ের মত সেবা করলে—কিন্তু—কিছুতেই কিছু হ'ল না। অবনী বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করলে খুব ঘটা ক'রে, সমাজ খাওলালে, তা সবাই বল্‌লে দেখে শুনে যে নিজের ছেলে থাকলে নিসু চৌধুরীর —সেও এর বেশী আর কিছু করতে পারত না। তারপর এখন ওরাই সম্পত্তির মালিক, অবনী নিজেই খাটিয়ে ছেলে, কোনো নেশা-ভাঙ করে না, অতি সৎ। কাজেই বিষয় উড়িয়ে দেবে সে ভয় নেই, দেখে শুনে খাবার ক্ষমতা আছে।

তাই বল্‌ছিলাম ভগবান যাকে দেন, তাকে এম্‌নি করেই দেন। ওই অবনীর বৌ আঁচল পেতে চাল ধার ক'রে নিয়ে গিয়েছে আমার মাসীমাদের বাড়ি থেকে, তবে হাঁড়ি

চড়েচে—এমন দিন গিয়েচে ওদের। আমার মাসীমার বাড়ি ওদের একই পাড়ায় কিনা? তাঁরই মুখে সব শুনতে পাই। আর তাঁরাই এখন দেখো ইণ্টার ক্লাসে—ভগবান যখন যাকে—

অবনীর বউটি খুব ভাল, অত্যন্ত গরীব ঘরের মেয়ে ছিল, পড়েছিলও তেমনি গরিবের ঘরে। সে নাকি মাসীমার কাছে বলেচে, যা কোনদিনও স্বপ্নেও ভাবি নি দিদি তাই যখন হ'ল, এখন ভাবি, ভগবান সব বাঁচিয়ে বর্তে রাখলে হয়। গরীব লোকের কপাল, ভরসা করতে ভয় পাই দিদি। প্রথম যে-দিন বাড়িতে ঢুকলাম, দেখি এ যেন রাজবাড়ি, অত ঘরদোর অত বড় জানলা দরজা, এতে আমার ছেলে-মেয়েরা বাস কত্তে পারবে, জান তো কি অবস্থায় ছিলাম। তোমার কাছে আর কি লুকবো? এ যেন সবই স্বপ্ন বলে মনে হয়েছিল। এখন ব্রতটা নাম্‌টো ক'রে, দু-দশজন ব্রাহ্মণের পাতে দু-মুঠো ভাত দিয়ে যদি ভালোয় ভালোয় দিনগুলো কাটাতে পারি, তবে তো মুখ থাকে লোকের কাছে। সেই আশীর্বাদ করো তোমরা সকলে।

সন্ধ্যার অন্ধকার চারিধারে খুব গাঢ় হয়েছে। ট্রেন হু-হু ক'রে অন্ধকার মাঠ, বাঁশবন, বিল, জলা, আখের ক্ষেত, মাঝে মাঝে ঘন অন্ধকারের মধ্যে জোনাকি-জ্বলা ঝোপ পার হয়ে উড়ে চলেচে, মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম, খড়ে-ছাওয়া বিশ-ত্রিশটা চালাঘর এক জায়গায় জড়াজড়ি ক'রে আছে, দু-চার-দশটা মিট্‌মিটে আলো জ্বলে অন্ধকারে ঢাকা গাছপালায় ঢাকা গ্রামগুলোকে কেমন একটা রহস্যময় রূপ দিয়েচে।

একটা বড় গ্রামের স্টেশনে অবনী তার বৌ ও ছেলেমেয়েকে নিয়ে নেমে গেল। স্টেশনের বাইরে একখানা ছইওয়ালা গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, বোধ হয় ওদেরই জন্যে। অবনীর বউকে এবার প্ল্যাটফর্মের তেলের লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোয় দেখে আরও বেশী ক'রে মনে হ'ল যে মেয়েটি সত্যিই সুশ্রী। বেশ ফর্সা রং, সুঠাম বাহু দুটির গড়ন, চলনভঙ্গী ও গলার সুরের সবটাই মেয়েলি। এমন নিখুঁত মেয়েলি ধরনের মেয়ে দেখবার একটা আনন্দ আছে, কারণ সেটা দুষ্প্রাপ্য। ট্রেনখানা প্রায় দশ মিনিট দাঁড়িয়ে রইল; একজন লোক হারিকেন লণ্ঠন নিয়ে ওদের এগিয়ে নিতে এসেছিল, ওরা তার সঙ্গে স্টেশনের বাইরে যেতে গিয়ে ফটক খোলা না পেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কারণ যিনি স্টেশন-মাস্টার তিনিই বোধ হয় টিকিট নেবেন যাত্রীদের কাছ থেকে—ফটকে চাবী দিয়ে তিনি গার্ডকে দিয়ে প্ল্যাটফর্মের মধ্যে আঁধারে লণ্ঠনের আলোয় কি কাগজপত্র সই করাচ্ছিলেন।

তারপর ট্রেন আবার চলতে লাগল—আবার সেই রকম ঝোপ-ঝাপ, অন্ধকারে ঢাকা ছোটখাটো গ্রাম, বড় বড় বিল, বিলের ধারে বাগ্‌দীদের কুঁড়ে। আমার ভারি ভাল লাগছিল—এই সব অজানা ক্ষুদ্র গ্রামে ঘরে ঘরে অবনীর বৌয়ের মত কত গৃহবধূ ভারবাহী পশুর মত উদয়াস্ত খাট্‌চে, হয়ত পেটপুরে দু-বেলা খেতেও পায় না, ফর্সা কাপড় বছরে পরে হয়ত দু-দিন কি তিনদিন, হয়ত সেই পুজোর সময় একবার, কোন সাধ-আহ্লাদ পুরে না মনের, কিছু দেখে না, জানে না, বোঝে না, মনে বড় কিছু আশা করতে শেখে নি, বাইরের দুনিয়ার কিছু খবর রাখে না—পাড়াগাঁয়ের ডোবার ধারের বাঁশবাগানের ছায়ায় জীবন তাদের আরম্ভ, তাদের সকল সুখ-দুঃখ, আনন্দ, আশা-নিরাশার পরিসমাপ্তিও ঐখানে।

অবনীর বৌ গৃহস্থ বধূদেরই একজন। অন্ততঃ ওদের একজনও তার সাধের স্বর্গকে হাতে পেয়েচে। অন্ধকারের মধ্যে আমি বসে বসে এই কথাই ভাবছিলাম। আমি কল্পনা করবার চেষ্টা করলাম অবনীর বৌকে, যখন সে প্রথম নিসু চৌধুরীর বাড়িতে এল—কি ভাবলে অত বড় বাড়িটা দেখে...অত ঘরদোর!...যখন প্রথম জানলে যে সংসারের দুঃখ দূর হয়েচে, প্রথমে যখন সে তার ছেলেমেয়েদের ফর্সা কাপড় পরতে দিতে পারলে, আমি

কল্পনা করলাম দশঘরার হাট থেকে অবনী বড় মাছ, সন্দেশ, ছানা কিনে বাড়িতে এসেচে... অবনীর বৌ এই প্রথম সচ্ছলতার মুখ দেখলে। তার সে খুশী-ভরা চোখমুখ অন্ধকারের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি।...

ট্রেন আর একটা স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েচে। শান্তিরাম আলোয়ান মুড়ি দিয়ে জড়সড় হয়ে বসে আছে, মাঝে মাঝে ঢুলচে। স্টেশনে পানের বোঝা উঠচে। শান্তিরামকে বললাম —শান্তিরাম, ঘুমুচ্চ নাকি? আমি একটা গল্প জানি এই রকমই, তোমার গল্পটা শুনে আমার মনে পড়েচে সেটা, শুন্‌বে?...

কিন্তু শান্তিরাম এখন গল্প শুনবার মেজাজে নেই। সে আরামে ঠেস্ দিয়ে আরও ভাল ক'রে মুড়িসুড়ি দিয়ে বস্‌লো। সে একটু ঘুমুবে।

পূর্ণবাবুর কথা আমার মনে পড়েচে, শান্তিরামের গল্পটা শুন্‌বার পরে এখন। পূর্ণবাবু আমিন ছিল, পাটনায় আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। পূর্ণবাবুর বয়স তখন ছিল পঞ্চাশ কি বাহান্ন বছর। লম্বা রোগা চেহারা, বেজায় আফিম খেতো—দাঁত প্রায় সব পড়ে গিয়েছিল, মাথার চুল সাদা,—নাক বেশ টিকলো, অমন সুন্দর নাক কিন্তু আমি কম দেখেছি, রং না-ফর্সা না-কালো। পূর্ণবাবু কম মাইনে পেত, এখানে কোন রকমে চালিয়ে বাড়িতে তার কিছু টাকা না পাঠালেই চলবে না—কাজেই তার পরনে ভাল জামা-কাপড় একদিনও দেখি নি। পূর্ণবাবু নিজে রেঁধে খেত। একদিন তার খাবার সময় হঠাৎ গিয়ে পড়েচি—দেখি পূর্ণবাবু খাচ্চে শুধু ভাত—কোন তরকারী, কি শাক, কি আলুভাতে—কিছু না, কেবল একতাল সবুজ পাতালতা বাটা-ওষুধের মত দেখতে —কি একটা দ্রব্য ভাতের সঙ্গে মেখে মেখে খাচ্চে। জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌লাম, সবুজ রঙের দ্রব্যটা কাঁচা নিমপাতা বাটা। পূর্ণবাবু একটু অপ্রতিভের সুরে বললেন নিমপাতা-বাটা এত উপকারী, বিশেষ ক'রে লিভারের পক্ষে। ভাত দিয়ে মেখে যদি খাওয়া যায়—আমি আজ দু বছর ধ'রে—আজ্ঞে দেখবেন খেয়ে, শরীর বড় ঠান্ডা—তা ছাড়া কি জানেন, লোভ যত বাড়াবেন ততই বাড়বে—

উপকারী দ্রব্য তো অনেকই আছে, ডাল ঝোলের বদলে কুইনাইন মিক্‌শ্চার ভাতের সঙ্গে মেখে দু-বেলা খাওয়ার অভ্যেস করতে পারলে দেশের ম্যালেরিয়া সমস্যার একটা সুসমাধান হয়, তাও স্বীকার করি। কিন্তু জীবনে বড় বড় উপদেশগুলো চিরকাল লঙ্ঘন ক'রে চলে এসে এসে আজ নীতি ও স্বাস্থ্যপালন সম্বন্ধে এত বড় একটা সজীব আদর্শ চোখের সাম্‌নে পেয়ে খানিকক্ষণের জন্যে নির্বাক হয়ে গেলাম। আর একদিন দু-দিন নয়, দু-বছর ধ'রে চলচে এ ব্যাপার!

একদিন পূর্ণবাবু নিজের জীবনের অনেক কথা বললেন। কল্‌কাতায় তাঁদের বাড়ি, ভবানীপুরে। তাঁর একজন পিসিমা আছেন, একটু দূর সম্পর্কের। সেই পিসিমার মৃত্যুর পরে তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন পূর্ণবাবু। কিন্তু পিসিমা মরি-মরি করচেন আজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর।

পূর্ণবাবুর বিবাহ হয় বাগবাজারে সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ের সঙ্গে—তবে তখন তাঁদের অবস্থা খুব ভাল ছিল না। পূর্ণবাবুদের পৈতৃক বাড়িও নেই কল্‌কাতায়, ভবানীপুরে খুব আগে নাকি প্রকাণ্ড বাড়ি পুকুর ছিল, এখন তাঁদের দু-পুরুষ ভাড়াটে বাড়িতে থাকে। পূর্ণবাবুর আঠার-উনিশ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়, তিনি ছেলের জন্য শুধু যে কিছু রেখে যান নি তা নয়, ছেলেটিকে লেখাপড়াও শেখান নি। কারণ তিনিও জানতেন এবং সবাই জানত যে তার দরকার নেই, অত বড় সম্পত্তির যে মালিক হবে দু-দিন পরে—তার কি হবে লেখাপড়ায়?

ছেলেটিও জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত তাই জান্‌ত বলে লেখাপড়া শেখবার কোন চেষ্টাও ছিল না। পূর্ণবাবুর শ্বশুরও তাই ভেবে মেয়েকে ঐ গরীব ঘরে দিয়েছিলেন।

পূর্ণবাবুর বাবা তো মারা গেলেন, পূর্ণবাবুর ঘাড়ে রেখে গেলেন সংসার, নব-বিবাহিত পুত্রবধূ, অল্প কিছু দেনা। কিন্তু পূর্ণবাবুর ক্রেডিট তখন পুরোমাত্রায়—কি বাজারে কি বন্ধু-বান্ধব মহলে। টাকা হাত পাত্‌লেই পাওয়া যায়—ধারে দোকানে জিনিস পাওয়া যায়, নিত্য নূতন বন্ধু জোটে। পূর্ণবাবু খুশী, পূর্ণবাবুর তরুণী বৌ খুশী, আত্মীয়-স্বজন খুশী, বন্ধু-বান্ধব খুশী। কারণ, সবাই জানে বুড়ী আর ক'দিন? না হয় মেরে কেটে আর পাঁচটা বছর!

অবিশ্যি পূর্ণবাবুর তখন বয়স অনেক কম, সংসারে কিছুই বোঝেন না, জানেন না—মনে উৎসাহ, আশা অদম্য, আনন্দের উৎস—চোখের সামনে দীপ্ত রঙীন ভবিষ্যৎ—যে ভবিষ্যতের সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই, আশঙ্কা নেই, যা একদিন হাতের মুঠোয় ধরা দেবেই—এ অবস্থায় যে যা বুঝিয়েচে পূর্ণবাবু তাই-ই বুঝেচেন, টাকাকড়ি ধার ক'রে দু-হাতে উড়িয়েচেন, বন্ধুবান্ধবদের সাহায্য করেচেন, ধারে যতদিন এবং যতটা নবাবি করা চলে, বাকী রাখেন নি।

কিন্তু ক্রমে বছর যেতে লাগল, দু-তিন বছর পরে আর ধার মেলে না—সকলেই হাত গুটিয়ে ফেললে। পাওনাদারের যাতায়াত শুরু হ'ল এইজন্যে—আরও বিশেষ ক'রে পূর্ণ-বাবু বাজারে ক্রেডিট হারিয়ে ফেললেন যে, সবাই দেখলে পূর্ণবাবুর পিসিমা ওঁদের আদৌ বাড়িতে ডাকেন না, পূর্ণবাবুকেও না, পূর্ণবাবুর বৌ ছেলেমেয়ে কাউকে না।

পিসিমার কাছে খাতির পেলে বাজারেও পূর্ণবাবুর খাতির থাক্‌তো—অনেকে বল্‌তে লাগলো পূর্ণবাবুর পিসিমা ওদের দেখতে পারে না, সমস্ত সম্পত্তি হয়ত দেবোত্তর ক'রে দিয়ে যাবে—একটি পয়সাও দেবে না ওদের।

পূর্ণবাবুর পিসিমার বিশ্বাস যে এরা তাঁকে বিষ খাইয়ে মারবে—যত বয়স হচ্ছে এ বিশ্বাস আরও দিন দিন বাড়চে—এতে ক'রে হয়েচে এই যে পূর্ণবাবুর, কি পূর্ণবাবুর স্ত্রীর, কি পূর্ণবাবুর ছেলেমেয়ের পিসিমার বাড়ির ত্রি-সীমানায় ঘেঁষবার যো নেই। কাজেই অতবড় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েও পূর্ণবাবু আজ ত্রিশ টাকা মাইনের আমীন-গিরি করচেন।

আমি পূর্ণবাবুর এ গল্প বিশ্বাস করি নি। কিন্তু সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পে আমরা এক-সঙ্গে দেড় বছরের উপর ছিলাম—এই দেড় বছরের প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যায় কি রাত্রে একসঙ্গে বস্‌বার সুযোগ হলেই পূর্ণবাবু আমায় তাঁর পিসিমার সম্পত্তির গল্প করতেন। কখন কোন্‌টা হয়ত বলে ফেলেচেন ছ-মাস আগে তাঁর মনে থাক্‌বার কথা নয়, আবার আজ যখন নতুন কথা বল্‌চেন ভেবে বল'লেন তখন খুঁটিনাটি ঘটনাগুলোও ছ-মাস আগের কাহিনীর সঙ্গে মিলে যেত—নানা টুকরো কথার জোড়াতালি মিলিয়ে এই দেড় বছরে পূর্ণবাবুর সমস্ত গল্পটা আমি জেনেছিলুম—একদিন তিনি বসে আগাগোড়া গল্প আমায় করেন নি, সে ধরনের গল্প করার ক্ষমতাও ছিল না পূর্ণবাবুর।

সেই থেকে পূর্ণবাবুর দুর্দশার সূত্রপাত হ'ল। বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে গেল, শ্বশুর-বাড়িতে খাতির কমে গেল, সংসারে দারিদ্র্যের ছায়া পড়ল। দু-একজন হিতৈষী বন্ধুর পরামর্শে পূর্ণবাবু আমীনের কাজ শিখতে গেলেন—বৌ-ছেলেকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

এ সব আজ ত্রিশ বছর আগেকার কথা।

এই ত্রিশ বছরে পূর্ণবাবু আমোদপ্রিয়, শৌখীনচিত্ত, অপরিণামদর্শী যুবক থেকে কন্যাদায়গ্রস্ত, রোগ-জীর্ণ, অকাল-বৃদ্ধ, দারিদ্র্যভারে কুব্জদেহ ত্রিশটাকা মাইনের আমীনে

পরিণত হয়েচেন—এখন আর মনে তেজ নেই, শরীরে বল নেই, খেলে হজম করতে পারেন না, চুল অধিকাংশই পেকে গিয়েচে, কষের অনেকগুলো দাঁত পড়ে গেলেও পয়সা অভাবে বাঁধাতে পারেন না বলে গালে টোল খেয়ে যাওয়ায় বয়সের চেয়েও বুড়ো দেখায়।

বাড়ির অবস্থাও ততোধিক খারাপ। পনেরো টাকা ভাড়ার এঁদো ঘরে বাস করার দরুণ স্ত্রী ছেলেমেয়ে সকলেই নানারকম অসুখে ভোগে—অথচ উপযুক্ত চিকিৎসা হয় না। তিনটি মেয়ের বিয়েতে পূর্ণবাবু একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েচেন, অথচ মেয়ে তিনটির প্রথম দুটি ঘোর অপাত্রে পড়েচে। বড় জামাই বৌবাজারে দরজীর দোকান করে, ঘোর মাতাল, কুচরিত্র—বাড়িতে স্ত্রীকে মারপিট করে প্রায়ই, তবুও সেখানে মেয়েকে মুখ-গুঁজে প'ড়ে থাকতে হয়—বাপের বাড়ি এলে শোবার জায়গাই দেওয়া যায় না। মেজ জামাই মাতাল নয় বটে, কিন্তু তার এক পয়সা রোজগারের ক্ষমতা নেই—রেলে সামান্য কি চাকুরি করে, সে সংসারে সবাই একবেলা খেয়ে থাকে, তাই নাকি অনেক দিন থেকে নিয়ম। আর একবেলা সকলে মুড়ি খায়। মেজ মেয়ের দুঃখ পূর্ণবাবু দেখতে পারেন না বলে মাঝে মাঝে তাকে বাড়িতে আনিয়ে রাখেন ; সেখানে এলে তবু মেয়েটা খেতে পায় পেট পুরে দু-বেলা। আজকাল প্রায়ই জ্বরে ভোগে, শরীরও খারাপ হয়ে গিয়েচে, ডাক্তারে আশঙ্কা করচে থাইসিস। বুড়ী পিসিমা কিন্তু এখনও বেঁচে। এখনও বুড়ী গঙ্গাস্নানে যায়। নিজের হাতে রেঁধে খায়, বয়স নব্বুই-এর কাছাকাছি, কিন্তু এখনও চোখের তেজ বেশ, দাঁত পড়ে নি, বুড়ী একেবারে অশ্বত্থামার পরমায়ু নিয়ে জন্মেছে, এদিকে যারা তার মরণের পানে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, তাদের জীবন ভাঁটিয়ে শেষ হতে চলল।

সেটেলমেণ্টের কাজ ছেড়ে পাটনা থেকে চলে এলাম। পূর্ণবাবু তখনও সেখানে আমীন। বছর তিনেক পরে একদিন গয়া স্টেশনে পূর্ণবাবুর সঙ্গে দেখা। দুপুরের পর এক্সপ্রেস আসবার সময় স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করচি, একটু পরেই ট্রেনটা এসে দাঁড়ালো। পূর্ণবাবু নামলেন একটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরা থেকে, অন্য কামরা থেকে দু-জন দারোয়ান নেমে এসে জিনিসপত্রের তদারকে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। পূর্ণবাবুর পরনে দামী কাঁচি ধুতি, গায়ে সাদা সিল্কের পাঞ্জাবি, তার ওপরে জমকালো পাড় ও কল্কাদার শাল, পায়ে প্যারিস গার্টার আঁটা সিল্কের মোজা ও পাম্প-শু, চোখে সোনার চশমা, হাতে সোনার ব্যাণ্ডওয়ালা হাতঘড়ি।

আমি গিয়ে আলাপ করলাম। পূর্ণবাবু আমায় চিনতে পেরে বললেন—এই যে রাম-রতনবাবু, ভাল আছেন? তারপর, এখন কোথায়?

আমি বললাম—আমি এখানে চেঞ্জে এসেচি মাস-তিনেক, আপনি এদিকে—ইয়ে—

তাঁর অদ্ভুত বেশভূষার দিকে চেয়ে আমি কেমন হয়ে গিয়েছিলাম। পূর্ণবাবুকে এ বেশে দেখ্‌তে আমি অভ্যস্ত নই, আমার কাছে সুতীর ময়লা-চিট্ সোয়েটার ও সবুজ আলোয়ান গায়ে পূর্ণবাবু বেশী বাস্তব,—তা-ছাড়া চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন বছরের বৃদ্ধের এ কি বেশ!

কি ব্যাপারটা ঘটেছে তা অবশ্য পূর্ণবাবু বলবার আগেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

জিনিসপত্র গুছিয়ে পূর্ণবাবু ওয়েটিংরুমে ঢুকলেন ; তিনি সাউথ বিহার লাইনের গাড়িতে যাবেন। গাড়ির এখনও ঘণ্টা-দুই দেরি। একজন দারোয়ানকে ডেকে বল্‌লেন—ভূপাল সিং, এখানে ভাল সিগারেট পাওয়া যায় কিনা দেখে এস—নইলে কাঁচি নিয়ে এস এক বাক্স—

আমায় বললেন—ওঃ. অনেক দিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা। আর বলেন কেন, বিষয় থাকলেই হাঙ্গামা আছে। সাম্‌নে আস্‌চে জানুয়ারী কিস্তি—তহশীলদার বেটা এখনও এক পয়সা পাঠায় নি, লিখেচে এবার নাকি কলাই ফসল সুবিধে হয় নি। তাই

নিজে যাচ্ছি মহালে, মাসখানেক থাক্‌বো। গাড়িটা এখানে আসে কটায়? ভাল কথা, এখানে টাইম্‌টেবল কিন্‌তে পাওয়া যাবে? কিন্‌তে ভুল হয়ে গেল হাওড়ায়—

আমি জিজ্ঞেস করলাম—আপনার পিসিমা?

দারোয়ান সিগারেট নিয়ে এল। পূর্ণবাবু একটা সরু ও সুদীর্ঘ হোল্ডার বার করলেন, আমার দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বললেন, আসুন।

তারপর সিগারেট ধরিয়ে আরামে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—পিসিমা মারা গিয়েচেন আর-বছর কার্তিক মাসে। তারপর থেকেই বিষয়-আশয়ের ঝঞ্ঝাটে পড়েচি—নিজে না দেখলে কি জমিদারী টেঁকে? আর এই বয়সে ছুটোছুটি ক'রে পারি নে, একটা ভাল কাজ জানা লোকের সন্ধান দিতে পারেন রামরতনবাবু? টাকা-চল্লিশ মাইনে দেব, খাবে থাকবে—

ওয়েটিং রুমে বসে পূর্ণবাবু দু-বোতল লেমনেড খেলেন এই শীতকালে! একবার দারোয়ানকে দিয়ে গরম জিলিপী আনালেন দোকান থেকে, একবার নিম্‌কী বিস্কুট আনালেন। আর একবার নিজে স্টেশনের বাইরের দোকান থেকে এক ডজন কমলালেবু কিনে আনলেন। আমায় প্রতিবারেই খাওয়ানোর জন্য পীড়াপীড়ি করলেন, কিন্তু আমার শরীর খারাপ, খেতে একেবারেই পারি নে, সে কথা জানিয়ে ক্ষমা চাইলাম। একটু পরেই পূর্ণবাবুর ট্রেন এসে পড়ল।

দিন পনেরো কুড়ি পরে আবার বেড়াতে গিয়েচি স্টেশনে। সেদিন শীত খুব পড়েচে, বেশ জ্যোৎস্না, রাত আটটার কম নয়। স্টেশনের রাস্তা যেখানে ঠেকেছে সেখানে চপকাটলেট চায়ের দোকান থেকে কে আমার নাম ধ'রে ডাকলে—ও রামরতনবাবু—এই যে—এদিকে—ফিরে চেয়ে দেখি পূর্ণবাবু একটা কোণে টেবিলে বসে। পূর্ণবাবুর মাথায় একটা পশমের কান-ঢাকা টুপি, শালের কম্ফর্টার গলায় জড়ানো, হাতে দস্তানা। আমায় বল্‌লেন—আসুন, বসুন—কিছু খাওয়া যাক। আজ ফিরে এলাম মহাল থেকে—এই রাতের গাড়িতে ফিরব কলকাতায়—কিছু খাবেন না?...না, না, খেতেই হবে কিন্তু, সেদিন তো কিছু খেলেন না—এই বয়, ইধার আও—

আমাকে জোর ক'রে পূর্ণবাবু চেয়ারে বসালেন। তারপর তাঁর নিজের জন্যে যা খাবার দিলে, তা দেখে আমার তো হৃৎকম্প উপস্থিত হ'ল! এত খাবেন কি করে পূর্ণ-বাবু এই বয়েসে? আর একটা অতি বাজে দোকানে, খানআষ্টেক চপ্, খানচারেক কাটলেট, এক প্লেট মাংস, পাঁউরুটি, ডিমের মামলেট, পুডিং, কেক, চা তিনি কিছু বাদ দিলেন না। আমাকে দেখিয়ে বল্‌লেন—এই, বাবুকো ওয়াস্তে এক প্লেট মাটন্ আউর তিন্ পিস্—

আমি সবিনয়ে বললাম—আমার শরীর তো জানেন পূর্ণবাবু, ওসব কিছু আমি—

—আরে, তা হোক্, শরীর শরীর করলে কি চলে! খান্ খান্—মাংসটা বেশ করেছে—কল্‌কাতায় মাংস রাঁধতে জানে না মশাই রেস্টোরেণ্ট—আমি ঝাল পছন্দ করি, কল্‌কাতায় শুধু মিষ্টি—খেয়ে দেখুন মাংসটা—কাট্‌লেটে এরা কাঁচালঙ্কা-বাটা দিয়েচে—ভারি চমৎকার খেতে—এই বয়, আউর দুটো কাটলেট—

কথাটা শেষ হবার আগেই তাঁর বেজায় কাশির বেগ হ'ল—কাশতে কাশতে দম আটকে যায় আর কি!

একটু সাম্‌লে বললেন—বড্ড ঠান্ডা লেগেছে মহালে—সেই জন্যে বেশ একটু গরম চা—চপ খেয়ে দেখবেন? ভারি চমৎকার চপ করেছে! এই বয়,—

আমি কথাটা মুখ ফুটে বল্‌লাম—পূর্ণবাবু, আপনার শরীরে এসব খাওয়া উচিত নয়—আর এ ধরনের দোকান তো খুব ভাল নয়! চা বরং এক কাপ খান, কিন্তু এত—এগুলো খেলে—

পূর্ণবাবু হেসে উড়িয়ে দিলেন—খাবো না বলেন কি রামরতনবাবু, খাবার জন্যেই সব। শরীরকে ভয় করলেই ভয়, ওসব ভাবলে কি আর—আপনিও যেমন।

রেস্টোরেণ্ট থেকে বার হয়ে এসে আমায় নীচু স্বরে বল্‌লেন—কিছু মনে কর্‌বেন না রামরতনবাবু, একসঙ্গে অনেক দিন কাজ করেছি এক জায়গায়। এখানে কোন ভাল বাইজীর বাড়ী-টাড়ি জানা আছে? থাকে তো চলুন না আজ রাতটা, শুনেছি পশ্চিমে নাকি ভাল ভাল—কলকাতায় না হয় আজ না-ই গেলাম—

আমি বুঝিয়ে বল্‌লাম, পশ্চিমের যে সব জায়গায় ভাল বাইজী থাকে, গয়া সে তালিকায় পড়ে না। বিহারের কোথাও নয়। কাশী, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, ওদিকেই সত্যিকার বাইজী বল্‌তে যা বোঝায়, তা আছে।

পূর্ণবাবু বললেন—পাটনাতে নেই?

—আমার তাই মনে হয়।

—এদিকে আর কোথাও নেই? না হয় এম্‌নি আর কোথাও—

—কোথাও কিছু নেই। আমি ঠিক জানি।

পূর্ণবাবু ওয়েটিং-রুমে ঢুকে আমায় বসতে বললেন। পূর্ণবাবুকে আরও বেশী বৃদ্ধ দেখাচ্ছিল। আমি তাঁর বাড়িতে কে কেমন আছে জিজ্ঞেস করলাম। থাইসিসের রোগী সেই মেয়েটিকে বাড়িতে চিকিৎসা করাচ্ছেন, বড় ছেলেটি বাপের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েচে আজ বছর দুই—সম্পত্তি পাবার আগেই। কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে তার খোঁজ করেচেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত এসব গল্প শুনলাম বসে বসে। পূর্ণবাবু গল্পের মধ্যে আরও দু-বার চা আনিয়ে খেলেন, ব্যাগ খুলে ওষুধ খেলেন তিন-চার রকম, কোনটা কবিরাজী, কোনটা বিলিতি পেটেণ্ট ওষুধ। দু-প্যাকেট সিগারেট শেষ করলেন।

দেখলাম পূর্ণবাবু চিরবঞ্চিত জীবনের সর্বগ্রাসী তৃষ্ণার ভোগলালসা মেটাতে উদ্যত হয়েচেন বিকারের রোগীর মত। চারিধারে ঘনায়মান মৃত্যুর ছায়ার মধ্যে, স্বল্পতৈল জীবনদীপের আলো যত সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর জ্যোতিঃবৃত্তের সৃষ্টি করচে, উনি ততই উন্মাদ আগ্রহে যেখানে যা পাবার আছে পেতে চান—যা নেবার আছে নিতে চান। জীবনে ওঁর যখন সুবৃষ্টি এল, জল না পেয়ে তখন তা আধ-মরা। সেই এল—কিন্তু এত দেরি করে ফেললে!

*　　　　*　　　　*

আমায় বললেন—একটু কিছু বাড়াবাড়ি খেলেই, ওষুধ খেয়ে রাখি। আর হজম করতে পারিনে এখন। আমাদের পাড়ায় আছে গদাধর কবরেজ—খুব ভাল চিকিচ্ছে করে, একহপ্তার ওষুধ নেয় দু'টাকা—তারই কাছে ভাবছি এবার—। পূর্ণবাবুর সেই নিমপাতা-বাটা মেখে ভাত খাওয়ার কথা আমার মনে পড়ল, আরও মনে পড়ল পূর্ণবাবুর প্রথম জীবনের শৌখীনতার কথা। এখন তিনি বুঝেছেন আর বেশীদিন বাঁচবেন না, চিরবঞ্চিত জীবনের সর্বগ্রাসী তৃষ্ণায় ভোগলালসা তাঁর—বিকারের রোগীর মত অসংযত, অবুঝ।

শান্তিরামকে গল্পটা বলব ভাবছিলাম, কিন্তু সে দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে।

তিনদিন ধরিয়া কলিকাতায় বেজায় বর্ষা নামিয়াছে। এ ধরনের বর্ষা এ বছর পড়ে নাই। ছাতিতে জল আটকায় না—কারণ সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া তেমনি। রাস্তায় রাস্তায় জল বাধিয়া গিয়াছে। ট্রামে দিনের বেলা আলো জ্বালানো, দোকানে দোকানে সামনের দিকে তেরপল ফেলা, পথেঘাটে লোকজনও খুব বেশী চলাফেরা করিতেছে এমন নয়।

আপিসে যাইতেছি, বেলা দশটা কি বড় জোর দশটা পনেরো। ট্রামে যাইতে পারিতাম কিন্তু এ বর্ষায় হাঁটিয়া যাইতে বড় ভাল লাগিতেছিল, ট্রাম লাইন পার হইয়া হাঁটা পথ ধরিলাম।

বৌবাজারের মোড়ে কে পিছন হইতে ডাকিয়া বলিল—দাদা,—ও দাদা—দাদা শুনুন—

আমাকেই ডাকিতেছেন নাকি? ফিরিয়াই চাহিয়া দেখিলাম। যে ডাকিতেছিল, সে কাছে আসিল। বছর পনেরো ষোল বয়স, পরনের কাপড় যৎপরোনাস্তি ময়লা, গায়ে চার-পাঁচ জায়গায় ছেঁড়া কোট, মাথার চুল রুক্ষ, ঝাঁক্ড়া, খালি পা; রাঙা রাঙা দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল—চিনতে পাচ্ছেন না দাদা, আমি বদ্দিনাথ।

ও! সেজ মামার ছেলে বোদে! এর বয়স যখন বছর দশেক তখন ইহাকে দেখিয়াছিলাম, তারপর বছর পাঁচ-ছয় আর দেখি নাই। কিন্তু না দেখিলেও ইহার বিষয় সব শুনিয়াছি। অতি বদ্ ছোকরা, দশ বছর বয়সে বাড়ি হইতে পলাইয়া হুগলীতে কোন্ যাত্রার দলে ঢোকে, বছর খানেক খোঁজখবর ছিল না, হঠাৎ রাজসাহী হইতে এক বেয়ারিং পত্র পাওয়া যায় যে, বদ্দিনাথ টাইফয়েডে মর-মর, শেষ দেখা করিতে হইলে কালবিলম্ব না করিয়া ইত্যাদি। সেজ মামার ছেলের উপর তত টান ছিল না। তিনি দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া কায়েমী সংসার পাতাইয়াছেন—প্রথম পক্ষের অবাধ্য ছেলে বাঁচুক বা মরুক, তাঁর পক্ষে সমান কথা। কিন্তু বদ্দিনাথের পিসি কাঁদা-কাটা শুরু করাতে তিনি দ্বিতীয় পক্ষের বড় শালাকে রাজসাহীতে পাঠাইয়া দেন। সেযাত্রা বদ্দিনাথ বাঁচিয়া উঠিল, চুল-ওঠা জীর্ণ-শীর্ণ চেহারা লইয়া বাড়িও ফিরিল কিন্তু মাস তিনেকের মধ্যেই আবার উধাও, আবার নিখোঁজ। এবারও আর এক যাত্রাদলে বছরখানেক ঘুরিয়া বোদে নগদ সতেরোটি টাকা হাতে করিয়া বাড়ি আসিল ও সৎমায়ের কাছে জমা রাখিল। অত বড় ছেলে বাড়ি বসিয়া খায় ও দু'তিনদিন অন্তর সৎমায়ের কাছে পয়সা চাহিয়া লয়, আজ আট আনা, কাল তিন আনা, তার পরদিন এক টাকা। চুল ছাঁটিতে হইবে, শার্ট তৈরী করিতে দিতে হইবে, বন্ধু-বান্ধবে খাইতে চাহিয়াছে, নানা অজুহাত। আসলে জানা গেল যে, বিড়ি সিগারেটেই বদ্দিনাথের মাসে চারি-পাঁচ টাকা লাগে। তাছাড়া চা, বাবুগিরি, সাবান, কলিকাতায় যাওয়া ইত্যাদি আছে। সে সতেরো টাকার মধ্যে টাকা দুই সংসারের সাহায্যে লাগিয়াছিল, বাকীটা বদ্দিনাথের ব্যক্তিগত শখের খরচ যোগাইতে ব্যয়িত হয়। সেজ মামার সংসারে অবস্থা খুব সচ্ছল নয়, দুই টাকায় যখন বদ্দিনাথ সাত মাস বসিয়া খাইল এবং নিজের টাকা ফুরাইলে জোর-জুলুম গাল-মন্দ করিয়া বিমাতার নিকট হইতে আরও দু'চার টাকা আদায় করিল—তখন সেজমামা স্পষ্ট জানাইয়া দিলেন, তাহাকে এরূপ ভাবে বসিয়া খাওয়াইতে তিনি পারিবেন না। বদ্দিনাথ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া আরও সাত মাস বসিয়া সংসারের অন্নধ্বংস করিল, খুব নিশ্চিন্ত মনেই করিল—আরও কয়েক টাকা সৎমায়ের নিকটে আদায় করিল, বৈমাত্র ভাইবোনের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ মার-ধোর করিল—শেষে সেজমামার বাড়ির (শ্বশুরবাড়ির গ্রামেই সেজমামা ইদানীং বাস করিয়াছিলেন) কাহার পকেট হইতে টাকা

চুরি করিয়া একদিন দুপুরে আহারাদির পরে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। সে আজ বছর-দুই আগেকার কথা।

কিন্তু এ সকল কথাই আমি শুনিয়াছিলাম এক তরফা—বন্দিনাথের শত্রুপক্ষের মুখে। অর্থাৎ তার সৎমা ও বাবার মুখে। বন্দিনাথের স্বপক্ষেও হয়ত অনেক কথা বলিবার আছে, কিন্তু সে কথা আমি শুনি নাই। বন্দিনাথকে আজ এ অবস্থায় দেখিয়া মনে মনে তাহার উপর সহানুভূতি হইল—বলিলাম—ভিজচিস্ কেন? আয় ছাতির মধ্যে। তারপর এ অবস্থায় কোথা? শ্রীরামপুরে যাস্ নি আর?

শ্রীরামপুরেই সেজমামার শ্বশুরবাড়ি।

বন্দিনাথ রাঙা দাঁত বাহির করিয়া একগাল হাসিল।—না দাদা, সেখানে বাবা বাড়ি ঢুকতে দ্যায় না। বলে, টাকা রোজগার করবি নে তো বসে বসে তোকে খাওয়ায় কে? গেছলুম আষাঢ় মাসে। বাবা হুকুম দিয়ে দিলে আমার ভাত বন্ধ করে দিতে। রাত্তিরে ইস্কুল ঘরে শুয়ে থাকতুম। বাবা দোকানে খাতা লিখতে বেরিয়ে গেলে মাকে গিয়ে বলতুম, ভাত দাও নৈলে কি আমি না খেয়ে মরবো? মা চুপি চুপি খাইয়ে দিত। আবার এসে সারাদিন ইস্কুল ঘরে শুয়ে থাকতুম। এ রকম কোরে ক'দিন কাটে? সতেরোই আষাঢ় বাড়ি থেকে বেরিয়েচি আবার।

বলিলাম—এ ক'দিন ছিলি কোথায়?

—গাড়িতে গাড়িতে বেড়াচ্চি। পরশু দিল্লী এক্সপ্রেসে গেছ্‌লুম, আজ এই এলুম। পথে পথেই ঘুরচি ক'দিন—আমার তো আর টিকিট লাগে না। ধরবে কে? এ গাড়িতে চেকার এল, ও গাড়িতে গিয়ে বসলুম। নিতান্ত ধরলে বল্লুম, গরীব ভিখারী, পয়সা নেই। বল্লে নেমে যাও। নিতান্ত গালমন্দ দিলে তো নেমে গিয়ে পরের ট্রেনে আবার চড়লুম। গাড়ির মধ্যে বসে থাকলে তবু তো বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচি।

বৃষ্টিটা আবার জোরে আসিল। দু'জনে একটা গাড়ি-বারান্দার নীচে দাঁড়াইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোর মামার বাড়ি যাস্ নে কেন, শুনেচি তাদের নাকি বেশ অবস্থা ভালো?

—ভালো তো, কিন্তু তারা আমায় দেখতে পারে না। সেবার বসিরহাটে আমাদের দলের গাওনা ছিল তো, ওখান থেকে মামার বাড়ি গেলুম। বড় মামা বল্লে—এখানে কি জন্যে এলি? দিদিমা বল্লে—যাকে নিয়ে সম্বন্ধ, সে-ই যখন চলে গিয়েছে তখন তোর সঙ্গে আর সুবাদ কিসের? তুই আর এখানে আসিস্ নে। সেই থেকে আর যাই নে।

একটা খাবারের দোকানে বসাইয়া বন্দিনাথকে কিছু খাওয়াইলাম। সে যেরূপ গোগ্রাসে খাইতে লাগিল, তাহাতে বুঝিলাম কয়েকদিন তাহার অদৃষ্টে আহার জোটে নাই বোধ হয়। মনে কষ্ট হইল—ছোঁড়াটার নিতান্ত অদৃষ্ট মন্দ, এই বৃষ্টি বর্ষায় ছেঁড়া কাপড় পরিয়া খালি পেটে আশ্রয়-অভাবে আজ দিল্লী, কাল বেনারস করিয়া রেলে রেলে বেড়াইতেছে, দূর দূর করিয়া শেয়াল-কুকুরের মত সবাই তাড়াইয়া দিতেছে, এমন কি নিজের বাবা পর্যন্ত! বেচারী তবে যায় কোথায়? বলিলেই তো হইল না!

ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলাম—এক কাজ কর বোদে, তুই রাণাঘাটে আমার বাসায় গিয়ে থাক্। চল আমি তোকে টিকিট কেটে গাড়িতে উঠিয়ে দিচ্ছি—সেখানে বাড়ির ছেলের মতন থাকবি, কোন কষ্ট হবে না, চল্।

টিকিট কিনিয়া গাড়িতে উঠাইয়া দিয়া বন্দিনাথের হাতে আনা দুই পয়সা দিয়া বলিলাম—পথে যদি দরকার হয় রইল তোর কাছে।

শনিবার রাণাঘাটে গিয়া দেখিলাম বন্দিনাথ বাড়িতে মেয়েদের কাছে খুব আদর-

যত্ন পাইতেছে। কাপড়-জামা মেয়েরা সাবান দিয়া কাচিয়া দিয়াছে, বদ্দিনাথের চেহারারও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মাথার চুল দশ আনা ছ' আনা ছাঁটা, বেশ টেরী কাটা, পথের মোড়ে সাঁকোর উপর বসিয়া বিড়ি খাইতেছিল, আমায় দেখিয়া তাড়াতাড়ি ফেলিয়া দিল।

দাদার ছোট মেয়ে পাঁচীর জন্য একখানা সাবান আনিয়াছিলাম, দুপুরের পরে সেখানা ব্যাগ হইতে বাহির করিয়া তাহাকে দিতেছি, বদ্দিনাথ ব্যগ্রভাবে হাত বাড়াইয়া বলিল—ও সাবান কি করবে দাদা, দিন্—দিন্ না?...

আমি একটু অবাক হইয়া গেলাম। ষোল-সতেরো বছরের ছেলে, নিতান্ত খোকাটি নয়—সাত-আট বছরের মেয়ে, সম্পর্কে তার ছোট ভাইঝি হয়—তার জিনিস কাড়িয়া লইতে যায়, আর বিশেষ করিয়া আমার হাত হইতে! পাঁচীকে বলিলাম—পাঁচী, এ সাবানখানা তোর কাকাকে দে—তোর জন্যে এখানকার বাজার থেকে আর একখানা আনিয়ে দেবো'খন। কেমন তো?

পাঁচী আমার কথার প্রতিবাদ করিল না। নীরবে কাঁদো কাঁদো মুখে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। সাবানখানা বদ্দিনাথ লোভ-লোলুপ ব্যগ্রতার সহিত আমার হাত হইতে একরূপ লুফিয়াই লইল। মনটা আমার কেমন অপ্রসন্ন হইয়া গেল।

দু'দিন পরে দেখিলাম বদ্দিনাথ বাড়ির ছেলে-মেয়েদের সকলকে শাসন করিতে শুরু করিয়াছে। কাহাকেও বলিতেছে হাড় ভাঙিয়া গুঁড়া করিব, কাহাকেও বলিতেছে, পিঠে জলবিছুটি দিব ইত্যাদি। হয়তো কেউ খাবারের জন্য বাড়িতে বিরক্ত করিতেছে, কেহ বা বলিতেছে সে আজ কিছুতেই চুল ছাঁটিবে না, কেহ বা তেতো ওষুধ খাইতে চাহিতেছে না, কিংবা হয়তো নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়াছে—এই সব তাহাদের অপরাধ। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কেহ বকুনি, মার-ধর করে—এ আমি একেবারেই পছন্দ করি না। বদ্দিনাথকে ডাকিয়া বলিয়াছিলাম—ওদের কথায় তোর থাক্‌বার দরকার কি রে বোদে?... ওরা যা খুশি করুক্ না, তুই ওরকম করে বকিস নে ওদের।

মাঝে আর একবার রাণাঘাটে গেলাম। বদ্দিনাথকে বাড়িতে না দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—বদ্দিনাথ কোথায় দেখ্‌চিনে যে?

শুনিলাম সে বাড়িতে প্রায় থাকে না, দুবেলা খাওয়ার সময় হাজির হয় মাত্র, স্টেশনের কাছে—কোন্ পাঁউরুটির দোকানে তার আড্ডা—সেখানে দিনরাত বসিয়া ইয়ার্কি দেয়। বাড়ির ছেলেমেয়েরা তাহার নামে নানা অভিযোগ উত্থাপিত করিল। দাদার মেয়ে বলিল—আমার সে সাবানখানা বদ্দিনাথ কাকা কেড়ে নিয়েচে, বল্লে—যদি না দিস্ তোকে মেরে চিংড়ি মাছ বানাবো।

সন্ধ্যার সময়ে মোহিত ডাক্তারের ডিস্‌পেন্‌সারিতে বসিয়া চা খাইতেছি—বদ্দিনাথ আসিয়া বলিল—চার আনা পয়সা দিন্, বৌদি বলে দিলেন বাজার থেকে আলু নিয়ে যেতে হবে। বদ্দিনাথের উপর মনটা তত প্রসন্ন ছিল না, কিন্তু পয়সা দিতে গিয়া মনে মনে ভাবিলাম—যাই হোক্, দুষ্টুমিই করুক আর যাই করুক, বাসার একটু-আধটু সাহায্য তো ওকে দিয়ে হচ্ছে। বয়েস কম, দুষ্টুমি একটু-আধটু করেই থাকে!

দু'তিন দিন পরে বৌদি আবার কতকগুলি অভিযোগ বদ্দিনাথের বিরুদ্ধে যখন আনিলেন—তখন ওই কথাই আমি বলিলাম। বৌদি বলিলেন—কবে কোন কাজ করে ও? কে বলেছে তোমায় ঠাকুর-পো? শুধু খাওয়া আর পাঁউরুটির দোকানে না কোথায় বসে ইয়ার্কি দেওয়া, এ ছাড়া আর কি কাজ ওর?

বলিলাম—কেন, হাট-বাজার তো প্রায়ই করে। এই তো সেদিনও তুমিই ওকে বাজার কর্তে দিয়েছিলে, আলু না কি—এর আগেও তো অনেকবার—

বৌদিদি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—আমি! কবে—কৈ আমার তো মনে হয় না, কে বল্লে?

আমি বলিলাম—বল্‌বে আবার কে? আচ্ছা দাঁড়াও, ভজিয়ে দিচ্চি।

আমার মনেও কেমন সন্দেহ হইল। বন্দিনাথকে ডাকাইলাম কিন্তু তাকে বাড়িতে পাওয়া গেল না। বৌদিদি বলিলেন, তিনি দিব্য করিতে প্রস্তুত আছেন যে, বন্দিনাথকে কখনও কিছু কিনিয়া আনিতে তিনি দেন নাই। তখন মনে পড়িল বন্দিনাথ এটা-ওটা বাড়ির ফরমাশের ছুতায় আমার নিকট হইতে দু' আনা চার আনা অনেকবার আদায় করিয়াছে, প্রায়ই যখন মোহিত ডাক্তারের ডিস্‌পেন্‌সারিতে বসিয়া আড্ডা দিই, সেই সময় গিয়া চায়—উঃ. ছোকরা কি ধড়িবাজ, ঠিকই বুঝিয়াছিল যে আমি যখন আড্ডায় মশগুল, তখন পয়সা চাহিলেও আমি তাহার কাছে কোন কৈফিয়ৎ চাহিব না, কেন পয়সা, কিসের জন্য পয়সা—অথবা বাড়িতেও সে বিষয়ের উল্লেখ করিতে ভুলিয়া যাইব।

ভাবিলাম, ছোঁড়াকে এমন শিক্ষা দিব যাহাতে ওপথে আর কখনো না যায় কিন্তু সেদিন আমি আহারাদি করিয়া রাত্রের ট্রেনে যখন কলিকাতা রওনা হইলাম, তখন পর্যন্ত বন্দিনাথ বাড়ি ফেরে নাই।

পুনরায় বাড়ি আসিলাম মাসখানেক পরে।

বন্দিনাথের কথা তখন নানা কাজে একরূপ চাপা পড়িয়া গিয়াছে—তাহার উপর রাগটাও পড়িয়া গিয়াছে। পূজার অল্পই দেরি, রাণাঘাটের বাজারেই প্রতি বছর কাপড়-চোপড় কিনি, কে বহিয়া আনে কলিকাতা হইতে? হইল না হয় দু'এক পয়সা দর বেশী। বাড়ির ছেলেমেয়ে সঙ্গে লইয়া কাপড়ের দোকানে গিয়া পছন্দসই জিনিস কিনিবার বেশ একটা আনন্দ আছে. কলিকাতা হইতে মোট বাঁধিয়া কাপড় কিনিয়া আনিলে সে আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। বন্দিনাথ আর্জি পেশ করিল তাহার কাপড় চাই. জুতা চাই, শার্ট চাই. গামছা চাই, একটা টিনের তোরঙ্গ চাই।

দেখিলাম অনেক টাকার খেলা। তোরঙ্গের কি দরকার এখন? থাক এখন, পূজোর পর দেখা যাইবে। দু'জোড়া কাপড় কেন, এখন এক জোড়াই চলুক, একটা শার্টেই পূজা কাটিয়া যাইবে এখন। জুতা একেবারেই নাই? পায়ের মাপটা দিলে বরঞ্চ আস্‌চে শনিবার চীনে বাড়ি—

পূজার সপ্তমীর দিন একটা ঘটনা ঘটিল। বৈঠকখানায় বসিয়া দৈনন্দিন বাজার-হিসাব লিখিতেছি, বাহির হইতে অপরিচিত চড়া গলায় কে বলিল—এইটে কি সামন্ত পাড়ার বিনোদ চৌধুরীর বাড়ি?

জানলা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিলাম—আমারই নাম। কি চাই?

মড়ুইপোড়া বামুনের মত চেহারা একটা পাকাসিটে গড়নের লোক ঘরে প্রবেশ করিল। মাথার চুল কাঁচায়-পাকায় মেশানো, আর লম্বা লম্বা, গায়ে আধ ময়লা গেঞ্জির ওপরে একটা চাদর। হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—ভালোই হলো, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। প্রণাম হই চৌধুরী মশায়। কথাটা বল্‌তেই হয় শেষকালটা। আপনার ছোট ভাই সুরেন আমাদের দোকান থেকে—

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—আমার ছোট ভাই সুরেন?

—হ্যাঁ, ঐ যে লম্বা, একহারা কালোমত চেহারা, ছোক্‌রা, ষোল-সতেরো বছর বয়স—

বুঝিতে বিলম্ব হইল না লোকটা কাহার কথা বলিতেছে। বলিলাম—হ্যাঁ. কি করেচে শুনি?

—কি আর করবে, সর্বনাশ করেছে মশাই। আমাদের ঐ ইস্টিশানের মোড়ে রুটি-

বিস্কুটের কারখানা আর দোকান—দেখেচেন বোধ হয়, বাবু তো ওইখান দিয়েই যান আসেন। আমার নাম রতন ঠাকুর, শ্রীরামরতন বাঁড়ুয্যে। আজ্ঞে পরিচয় দিতে লজ্জা হয়, কি করি, পেটের দায়ে—

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—তারপর কি হয়েচে বলছিলেন?

সে এক লম্বা গল্প করিয়া গেল। বদ্দিনাথ ওখানে বসিয়া আড্ডা দিত, আমার সহোদর ভাই এবং নাম সুরেন এই পরিচয় দিয়া সেখানে খুব খাতির জমাইয়াছিল। বলিত, দাদার সঙ্গে বনিতেছে না, শীঘ্রই সে নাকি পৃথক হইবে। রাধাবল্লভতলায় একখানা বাড়ি আছে, তাহারই ভাগে পড়িবে সেখানা। তখন সে-ও রতন ঠাকুরের রুটি-বিস্কুটের ব্যবসায় যোগ দিবে, কিছু মূলধন ফেলিতেও রাজী আছে। রতন ঠাকুর তাহাকে বিশ্বাস করিয়া দোকানে বসাইয়া মাঝে মাঝে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নিজের ভেন্ডারদের কাছে যাইত—এরকম আজ মাস দুই চলিয়া আসিতেছে, রতন কোন অবিশ্বাস করিত না। ইদানীং রতন তাহারই উপর কেনা-বেচার ভার দিয়া হয়তো দু'পাঁচ ঘণ্টার জন্য দোকানে অনুপস্থিত থাকিত। গত কল্য রতন চাকদায় গিয়াছিল কি কাজে ; বদ্দিনাথকে দোকানে বসাইয়া গিয়াছিল। আজ সকালে ক্যাশ মিলাইতে গিয়া রতন দেখে ছাব্বিশ টাকা তেরো আনা ক্যাশ বাক্স হইতে উধাও হইয়াছে। নিশ্চয়ই এ বদ্দিনাথ ছাড়া আর কাহারও কাজ নয়, হইতেই পারে না, তাই সে সকালেই ছুটিয়া আমার কাছে আসিয়াছে।

কোনো রকমে বুঝাইয়া ভরসা দিয়া রতন ঠাকুরকে বিদায় দিলাম। যখন আমার সহোদর ভাই বিশ্বাসে রতন ঠাকুর তাহাকে প্রশ্রয় দিয়াছে, তখন সে আমার যেই হোক্—টাকা মারা যাইবে না রতনের। না হয় আমি নিজেই দিব।

বদ্দিনাথকে রতনের সামনে ডাকানো আমি উচিত বিবেচনা করিলাম না। ঘরের ভিতর তর্কাতর্কি কথা-কাটাকাটি আমি পছন্দ করি না।

রতন চলিয়া গেলে বদ্দিনাথকে ডাকাইয়া বলিলাম—আমার এখানে থাকা তোমার পোষাবে না বদ্দিনাথ, তুমি অন্য জায়গা দেখে নাও।

বিকালে বদ্দিনাথ পোঁটলা-পুঁটলি লইয়া বিদায় হইল। এর পরে বদ্দিনাথকে দেখি নাই আর অনেক দিন।

•

মাস পাঁচ ছয় পরে ট্রেনে কলিকাতা হইতে ফিরিতেছি, ব্যারাকপুরের প্ল্যাটফর্মে হঠাৎ দেখি অতি মলিন এক কাচা গলায় বদ্দিনাথ। ব্যাপার কি? সেজমামা ও মামীমা দিব্য সুস্থ দেহে বর্তমান আছেন, গত শনিবারেও দেখা করিয়া আসিলাম, তবে বদ্দি-নাথের গলায় কাচা কিসের? ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিবার পূর্বেই বদ্দিনাথ আমার গাড়ির দরজাতে আসিয়া পৌঁছিল এবং ইনাইয়া বিনাইয়া যাত্রীদের কাছে বলিতে লাগিল যে, সম্প্রতি তাহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছে, তাহার আর কেহ নাই, কি করিয়া মাতৃদায় হইতে উদ্ধার হইবে ভাবিয়া ভাবিয়া রাত্রে ঘুম হয় না, অতএব—ইত্যাদি।

আমি দেখিলাম, আমার কামরায় আসিল বলিয়া, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি সে কামরা হইতে নামিয়া অন্য একখানা গাড়িতে গিয়া উঠিলাম। কি বিপদ! কি বিপদ! এমন বিপদেও মানুষে পড়ে!

একদিন বড় মামার বাসায় গিয়া গল্পটা করিলাম। বড়মামা বলিলেন—ওর কথা আর বোলো না। মধ্যে কি মাসটা এখানে তো এল। তোমার মামীমা বল্লেন, বোদে তুই তো এলি—তোর পকেটে তো একটা পয়সা নেই দেখ্ছি—আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে রে। বোদে বল্লে, আমারও ভয় হচ্ছে জ্যাঠাইমা, টুনুর গলার হার, ছোট খুকীর বালা সামলে রাখো। তোমার মামীমা তখ্খুনি তাদের হার বালা সব খুলে ট্রাঙ্কের মধ্যে পুরলেন। খুব

সকালে বদ্দিনাথ চলে গেল, আমি তখনও মশারীর মধ্যে শুয়ে। একটু বেলা হোলে দেখি, আমার বাঁধানো হুঁকোটা ঘরের কোণে নেই। খোঁজ্ খোঁজ্—আর খোঁজ্!...কার কীর্তি বুঝতে বাকী রইল না। সেই থেকে আর তাকে দেখিনি। ছোক্‌রাটা এমন করে উচ্ছন্ন গেল! ওর বাবারও দোষ নেই। ওকে মানুষ করবার চেষ্টা যথেষ্ট করেছিল কিন্তু যে মানুষ না হবার, তাকে মানুষ করে কার সাধ্যি?

পুজোর পরে সেজোমামার পত্রে জানিলাম, দত্তপুকুরের জমিদার কাছারী হইতে একখানা পুরানো কাপড় চুরি করিবার ফলে বদ্দিনাথের জেল হইয়াছে তিন মাস। জেল হইতে বাহির হইবার অনেক দিন পরে সে একবার রাণাঘাটে আমার বাসায় আসিল। সবারই মুখে শুনিতে পাইলাম বদ্দিনাথ ভাল হইয়া গিয়াছে, কি করিয়া তাহারা এ কথা জানিল, আমি তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু হঠাৎ দেখি বদ্দিনাথকে বাড়ির সবাই খুব যত্ন আদর করিতেছে। দিন দুই-তিন বাসায় থাকিল, একদিন সকালে বদ্দিনাথ চা খাইতে খাইতে আমারই সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছে, বৌদিদি আসিয়া বলিলেন,—বোদে, এই বাটি রইলো আর ঠাকুরপোর কাছ থেকে দশটা পয়সা নিয়ে মোড়ের দোকান থেকে সর্ষের তেল নিয়ে আসিস্ তো! বদ্দিনাথকে পয়সা বাহির করিয়া দিলাম চা খাওয়ার পরে। বদ্দিনাথ কাঁসার বাটিটা হাতে করিয়া পয়সা ট্যাঁকে গুঁজিয়া বাহির হইয়া গেল। সকাল সাড়ে সাতটার বেশী নয়।

বদ্দিনাথের সঙ্গে পুনরায় দেখা বছরখানেক পরে, হঠাৎ একদিন কলকাতায়, সীতারাম ঘোষের স্ট্রীটের মধ্যে একটা গলির মোড়ে। জীর্ণ, মলিন, ছন্নছাড়া মূর্তি—খালি পা, বড় বড় ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল, যেমন ময়লা কাপড় পরনে ততোধিক ময়লা জামা গায়ে।

প্রথম কথাই আমার মুখ দিয়া কি জানি বাহির হইয়া গেল, হ্যাঁরে বোদে, বাটিটা কি করলি রে?

এই একবৎসর যেন ওই কথাটা জানিবার জন্যই হাঁ করিয়া ছিলাম। বদ্দিনাথ বিপন্নমুখে কি একটা জবাব দিবার দু'-একবার চেষ্টা করিতে গিয়া যেন বিষম খাইল এবং হঠাৎ সুড়ুৎ করিয়া পাশের গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

লেখক

রবিবার। মধ্যাহ্নভোজন সমাধা ক'রে একটু ঘুমুবার উদ্যোগ করবো ভাবচি—এমন সময় বাইরে কে ডাকলে—সীতানাথবাবু বাড়ী আছেন?

কে আবার রবিবার দুপুরে বিরক্ত করতে এল?

ছেলেকে ডেকে বল্লুম—নিয়ে আয় এখানে, আমি আর উঠতে পারচিনে। একটু পরে ছেলের পিছু পিছু চশমা চোখে ছিপছিপে ফরসা চেহারার একটি ছোকরা ঘরে ঢুকে বিনীত ভাবে প্রণাম করে বলল—আপনারই নাম সীতানাথ বাবু—?

বললুম—বসুন, কোথা থেকে আসছেন?

—আজ্ঞে, এই আপনার কাছেই এলাম। আজ সকালে—ওই ডাক্তারখানায় বসে ছিলেন, আমি আর দাদা নাইতে যাচ্ছি, দাদা বললেন—আপনি একজন লেখক। তখন তেল মেখেছিলুম, সে অবস্থায় আপনার কাছে যেতে সাহস করিনি। শুনলুম, আপনি শনি-রবিবারে এখানে আসেন, আজই আবার কলকাতা চলে যাবেন ওবেলা। তাই এখন দেখা করতে এলুম।

আসার উদ্দেশ্য শুনে মনটা প্রসন্ন হ'ল না। নিশ্চয়ই লেখা চাইতে এসেচে। এ পাড়াগাঁয়ের টাউনে কোন কাগজের উৎপাত ছিল না তো জানি—তবে কি এখানেও কাগজ বার হ'ল?

ছোকরা বিনয়ে সংকুচিত হয়ে আস্তে আস্তে চেয়ারে বসল, কিন্তু আমি লক্ষ্য করে দেখলুম, এতক্ষণ সে একবারও আমার মুখ থেকে চোখ ফেরায়নি—চশমার ভেতর দিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। একটুখানি চুপ করে থেকে ছেলেটি বললে—আপনার কাছে এলাম, যদি মনে কিছু না করেন ত'হলে বলি।

—বলুন না?

—আমাকে একটু করে লেখা শেখাবেন? আমি এবার বাংলা নিয়ে বি-এ পাস করেচি। এখানকার স্কুলে চাকরি পেয়ে এসেচি। আমার দাদা এখানকার সাবরেজিস্ট্রার। আমার বড় ইচ্ছে আমি লেখক হই। কিছু কিছু লিখেছিলামও, সেগুলো এনেচি সংগে করে—আপনার সময় হবে দেখবার?

আমার সম্মতি পেয়ে ছোকরা একখানা খাতা ভয়ে ভয়ে আমার হাতে দিয়ে বললে—আই-এ পড়বার সময় লিখেছিলুম! চার-পাঁচটা ছোট গল্প, কতকগুলো কবিতা আর গান আছে।

ও দেখি আমার মুখের দিকে আগ্রহ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমি কি মত দিই তাই শোনবার জন্যে। বললুম—মন্দ হয়নি, বেশ লাগল—তবে আপনার গানগুলো—ভালোই হয়েচে!

ছোকরা উৎসাহে ও আগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—আপনার ভালো লেগেচে?...আচ্ছা, গল্পগুলো? ওগুলোর মধ্যে কিছু দেখলেন?

বিশেষ কোনো ধরা-ছোঁয়া না দিয়ে বললুম—বেশ প্রেমিস্ আছে। আপনার বয়েস কম, লিখতে লিখতে হবে।

ছেলেটি যেন আনন্দ কোথায় রাখবে ভেবে পেলে না। বললে, দেখুন আমার অনেক-দিন থেকে সাধ আমি একজন লেখক হবো। আমি বি-এতে বাংলা নিয়েছিলুম ব'লে বাড়ীতে সবাই বকে। আমার খুড়তুতো ভাইয়েরা বড় বড় চাকরি করে—তারা ভালো ইংরেজী জানে। তারা দাদার কাছে চিঠি লিখলে—ওকে এখন বাংলা ভুলতে বলো। বাংলা শিখে জীবনে কি হবে? এখন একটু ইংরিজির দিকে মন দিতে বলো, যদি কিছু উন্নতি করতে চায়। আমি এ সব লিখি ব'লে বাড়ীর কেউ সন্তুষ্ট নয়। আমি আবার বাড়ীর ছোট ছেলে কিনা। আমি যা লিখি দাদারা দেখতে চায়, লিখতে দেখলে বকাবকি করে। বলে, ওর মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়েচে। ও-সব লিখে মিথ্যে সময় নষ্ট করচে।

আমি মনে মনে তাদের খুব দোষী করতে পারলাম না একথা বলার জন্যে।

ছেলেটি আপনমনেই ব'লে যেতে লাগল—এখানে মাস্টারিটা পেয়ে গেলাম, গেজেট যেদিন বার হয়েচে, সেই দিনই চাকরি হ'ল আমার। এখানে এসে একা একা বেড়াই; এক-জনও এমন কেউ নেই যে, দুটো ভালো কথা বলে, কি সৎচর্চা করে। সাহিত্য বিষয়ে কেউ খবরও রাখে না। বড় ব্যাক্ওয়ার্ড জায়গা। আপনার সন্ধান পেয়ে ভাবলুম ওঁর কাছে যাই, উনি আমায় লেখা-সম্বন্ধে উপদেশ দিতে পারবেন। তাই এলাম। কারো কাছে উৎসাহ না পেয়ে আমি এমন দমে গিয়েছি, আজ এক বছর লিখিই নি।

তারপর ছোকরা আমায় বেশ বোঝাবার চেষ্টা করলে, সে বর্তমান সাহিত্যের খবর রাখে বা সে সাধারণ মানুষের পর্যায়ের মধ্যে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, ইবসেন, শ' টলস্টয়, তরুণ-সাহিত্য, বৈষ্ণব কবিতা—ইত্যাদি হু হু করে মুখস্থ বিদ্যার মতো বলে গেল।

—আচ্ছা, তরুণ-সাহিত্যেকদের মধ্যে রামচন্দ্র সরকারের লেখা-সম্বন্ধে আপনার মত কি?

আমি বিপদে পড়ে গেলুম, তরুণ সাহিত্যিকদের বই কিছু কিছু পড়লেও রামচন্দ্র

সরকারের লেখা-সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই নেই। কিন্তু ছেলেটি যেমন আগ্রহের সঙ্গে এ-সব কথা পেড়েছে, তাতে বেশ বোঝা যায়, অনেক দিন পরে একটু উচ্চ বিষয়ে চর্চা করতে পেরে ও খুব খুশি। হয়তো এমন শ্রোতা ওর অনেকদিন জোটে নি।

এ অবস্থায় তাকে নিরুৎসাহ করতে না পেরে রামচন্দ্র সরকার সম্বন্ধে একটা কাল্পনিক মত দেবার চেষ্টা করলুম। আমার কথা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনলে। বললে, আপনি ঠিক বলেছেন। আমার কি মনে হয় জানেন? ইবসেন বলেছেন—তারপর সে খানিকক্ষণ ধরে ইবসেন, মেটারলিঙ্ক, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেক নাম অনর্গল আবৃত্তি ক'রে, তাদের নানা মত উদ্ধৃত ক'রে নিজের একটা যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করলে—তার ভাবে মনে হল এ ধরনের কথা বলতে সে বিশেষ আনন্দ পাচ্ছে—কথা বলতে বলতে আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখে—বোধ হয় আমার মুখের ভাব দেখে বোঝবার চেষ্টা করে আমি তার তর্কের ক্ষমতা, পাণ্ডিত্য ও যুক্তির সারবত্তা সম্বন্ধে কি ভাবচি।

আমি বললাম, এখানে কত দেয় আপনাকে?

—ঊনত্রিশ টাকা। এখন একরকম কুলিয়ে যায়, দাদার বাসাতে থাকি। কিন্তু দাদা বদলি হ'য়ে গেলে তখন মুশকিল হবে। আমার বাড়ীতে কিছু না দিলে তো চলবেই না—

—কেন, আপনার দাদারা রয়েছেন?

—আমার আপনার দাদা কেউ নেই। ওঁরা সব খুড়তুতো—জেঠতুতো ভাই। আমার বাবা অন্ধ, আমি তাঁর একমাত্র ছেলে, আর একটি বোন, আমার ছোট, তার এখনও বিয়ে হয়নি। দাদারা সব যে যার পৃথক। এক বাড়ীতে থাকলেও এক অন্নে নেই।

ও বললে—আমার ছেলেবেলা থেকে সাধ যে, আমার লেখা কাগজে বেরোয়। যখন বড় বড় লেখকের লেখা দেখতাম, আমার ইচ্ছে হত একদিন আমিও এই রকম লিখব। আমার এক ক্লাসফ্রেণ্ড ছিল কান্তি বসু—কলকাতায় তার সঙ্গে দেখা এই মাঘ মাসে! আমায় দেখালে "ভারতবর্ষে" তার একটা গল্প বেরিয়েছে। মনে মনে বললুম, বা রে! আমার এমন কষ্ট হ'ল, ওরা সব লেখক হয়ে গেল, ওদের লেখা ছাপা হচ্ছে, কত লোক পড়ছে, ভাবুন—কত নাম বেরুবে!

সে খানিকক্ষণ জানলার বাইরে আকাশের দিকে কেমন একটা মুগ্ধ-আকুল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, তারপর চোখ নামিয়ে বিষণ্ণ মুখে বললে—আর আমার কিছুই হ'ল না।

ওর আন্তরিকতা ও আগ্রহ আমার বড় ভালো লাগল। একটু অন্য ধরনের ছেলে বটে—হয়তো বা একটু মাথা খারাপ আছে। ও যতক্ষণ বসেচে, আমি কেবল লক্ষ্য করচি ওর মুখের ভাবের নানা রকম পরিবর্তন। নির্ভরতা, ভয়, শ্রদ্ধা, আশা, আগ্রহ, স্বপ্ন, বিষণ্ণতা, বিভিন্ন ভাব ওর মুখে কেমন চমৎকার ফুটে ওঠে। খুব সাধারণ ধরনের লোকের এ রকম হয় না। পাথর-গড়া মুখের মতো তাদের মুখ হয়—দৃঢ়, অপরিবর্তনীয়—ভাব-প্রবণতার বালাই তাদের নেই। ওকে উৎসাহ দেবার জন্যে বললাম—আপনি এর পরে নিশ্চয়ই ভালো লিখতে পারবেন। এরই মধ্যে বেশ লেখা বেরিয়েচে আপনার হাত থেকে। এখন আপনার তো বয়েস কম, সারা জীবন পড়ে রয়েছে আপনার সামনে—আমার তো মনে হয়, কালে আপনি একজন ভালো লেখক হবেন—আপনার লেখা পড়ে আমরা এক সময় আনন্দ পাব।

ছোকরা সলজ্জ হাসিমুখে আমার দিকে চেয়ে বললে—কি যে বলেন! আপনারা আনন্দ পাবেন আমার লেখা থেকে!...আচ্ছা, আপনার মনে হয় সত্যি আমার কিছু হবে?

—কেন হবে না? না হবার কিছু দেখলুম না—খুব হবে।

—কান্তি বসু আমারই ক্লাসফ্রেণ্ড, আমারই মতো বয়েস—ও এরই মধ্যে নাম করে ফেলেচে। আচ্ছা, নাম করতে কতদিন যায়? নাম করবার নিয়ম কি?

আমার দুপুরের বিশ্রামটুকু একেবারেই মাটি হ'ল দেখছি। কি করব উপায় নেই—

একে দু'চার কথায় বিদায় দেব ভেবেছিলুম, কিন্তু এর কথা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে, আবার কোথা থেকে নাম করবার নিয়ম এনে ফেললে। অথচ কেমন একটা অনুকম্পা হ'ল ওর ওপর, ভালো মনে কথার জবাব না দিয়েও পারলুম না। বললাম—তার কি কোন নিয়ম আছে, তা নেই। দু'চারটে ভালো লেখা বেরুতে বেরুতে ক্রমশঃ নাম বেরোয়! লোকে আপনার লেখা প'ড়ে যদি খুশি হয়, তবে নাম বেরুতে আর কি দেরি হবে?

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে আমার দিকে চেয়ে আনন্দসুরে বললে—অনেকদিন থেকে আমার ইচ্ছে কোন লেখকের সঙ্গে আলাপ করি। কলকাতায় থাকতে একবার দেবব্রত মুখুয্যের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তখন দেবব্রত বাবুর 'অপরিণত' বইটা সবে বেরিয়েচে—সারা রাত ধরে জেগে বইখানা পড়লাম, এমন ভালো লাগল আর এমন একটা ইনস্পিরেশন্ পেলাম—তার পরদিন আমিও একখানা ওই রকম নভেল লিখব ভাবলাম। আট-দশ চ্যাপ্টার লিখেও ফেললাম। কান্তিকে দেখাতে গেলাম, সে বললে এর প্লট, ভাব, ভাষা, সব নাকি দেবব্রত বাবুর বইখানার মতো হচ্চে। আমার ঐ এক দোষ—যখন যে বই পড়ি, লিখতে বসলে সেই বইখানার মতো প্লট আর ভাষা হ'য়ে যায়। তা সেদিন দেবব্রত বাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল না, তিনি ওপর থেকে বলে পাঠালেন তিনি বড় ব্যস্ত।

তাকে উৎসাহ দেবার জন্যে তার একটা গান আবার উল্টে পড়তে লাগলাম। সে হাসি-হাসি মুখে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। ও গানটা সম্বন্ধে আমার প্রশংসার পুনরাবৃত্তি, অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দের সঙ্গে শুনলে—জীবনে বোধ হ'ল এই সর্বপ্রথম নিজের লেখার প্রশংসা শুনচে। কথাবার্তার মধ্যেও একবার ঘরের চারিধারে আর একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে খুশির সুরে বললে—আমি কোন লেখকের এত কাছে ব'সে কখনো গল্প করিনি। এত বেশীক্ষণ আমার সঙ্গে কেউ কথাও বলেনি।

আর মিনিট কুড়ি পরে সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও খাতা-পত্র গুটিয়ে নিয়ে উঠল—ভাবলে বোধ হয় আর বেশীক্ষণ থাকলে আমি পাছে বিরক্ত হই।

দাঁড়িয়ে উঠতে গিয়ে কি ভেবে আবার বসল, ভয়ে ভয়ে বললে—একটা কথা বলব? কথাটা বলতে সাহস হয় না। অত কম টাকায় কি আপনি রাজী হবেন? আমি আপনাকে দশ টাকা ক'রে মাসে মাসে দিলে, আমাকে লেখা শিখিয়ে দেবেন?

ওর এই কথাটায় কেমন একটা কষ্ট হ'ল ওর জন্যে। মাত্র ঊনত্রিশ টাকা মাইনে থেকে আমায় দশ টাকা দিতে রাজী—বাকি উনিশ টাকাতেই এখানকার ও বাড়ীর খরচ চালাতে রাজী—লেখক হবার এতই সাধ।

আমি তাকে বললাম—তার কোন টাকাকড়ি লাগবে না। আমি সব ছুটিতে এখানে আসিনে, যখন আসব, তখন আমার দ্বারা যতদূর উপকার হয়, খুশির সঙ্গে করব।

সে মহা আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে খাতা-পত্র বগলে নিয়ে প্রণাম ক'রে ঘর থেকে বার হয়ে গেল। বাইরে গিয়ে আবার জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বললে—তা হ'লে আমার হবে? না হবার কিছু দেখলেন কি?

—হবে নিশ্চয়ই, না হবার কিছুই দেখিনি। তবে সাধনা চাই।

ভগবান আমায় যেন ক্ষমা করেন—এই মিথ্যে বলবার জন্যে। আমি কেমন ক'রে ওর মুখের উপর বলবো যে, ওর লেখার মধ্যে কিছুই পাইনি—ওর গল্প, কবিতা নিতান্ত বাজে হয়েচে, বিশেষ কোনো ক্ষমতার অঙ্কুরও তার লেখার মধ্যে কোথাও নেই! মিথ্যা যেখানে মানুষকে সুখী করে, সেখানে নিষ্ঠুর সত্য ব'লে কিইবা লাভ?

আমার তখন বয়স নয় বছর। গ্রামের উচ্চ-প্রাইমারী স্কুলে পড়ি এবং বয়সের তুলনায় একটু বেশী পরিপক্ক। বিনু একদিন ক্লাসে একখানা বই আনিল, ওপরে সোনালী ফুল হাতে একটি মেয়ের ছবি (ত্রিশ বছর আগেকার কথা বলিতেছি মনে রাখিবেন), রাঙা কাগজের মলাট, বেশী মোটা নয়, আবার নিতান্ত চটি বইও নয়।

আমি সেই বয়সেই দু-একখানা সুগন্ধি তেলের বিজ্ঞাপনের নভেল পড়িয়া ফেলিয়াছি ; পূর্বেই বলি নাই যে বয়সের তুলনায় আমি একটু বেশী পাকিয়াছিলাম? সেজন্য বিনু আমাকে ক্লাসের মধ্যে সমঝদার ঠাওরাইয়া বইখানি আমার নাকের কাছে উঁচাইয়া সগর্বে বলিল, "এই দ্যাখ, আমার দাদা এই বই লিখেছেন, দেখেছিস?"

বলিলাম, "দেখি কি বই?"

মলাটের ওপরে লেখা আছে 'প্রেমের তুফান'। হাতে লইয়া দেখিলাম, লেখকের নাম, শ্রীভূষণচন্দ্র চক্রবর্তী। দিনাজপুর, পীরপুর হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, দাম আট আনা।

"তোর দাদার লেখা বই, কি রকম দাদা?"

বিনু সগর্বে বলিল, "আমার বড়মামার ছেলে, আমার মামাতো ভাই।"

এই সময়ে নিতাই মাস্টার মহাশয় ক্লাসে ঢোকাতে আমাদের কথা বন্ধ হইয়া গেল। নিতাই মাস্টার আপন মনে থাকিতেন, মাঝে মাঝে কি এক ধরনের অসংলগ্ন কথা বলিতেন আর আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া হাসিতাম। জোরে হাসিবার উপায় ছিল না তাঁর ক্লাসে।

অমনি তিনি বলিয়া বসিতেন, "এই তিনকড়ি, এদিকে এস, হাসছ কেন? ছানা চার আনা সের, কেরোসিন তেল ছ-পয়সা বোতল—"

এই সব মারাত্মক ধরনের মজার কথা শুনিয়াও আমাদের গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে, হাসিয়া ফেলিলেই মার খাইয়া মরিতে হইবে।

বর্তমানে নিতাই মাস্টার ক্লাসে ঢুকিয়াই বলিলেন, "ও-খানা কি বই নিয়ে টানাটানি হচ্ছে সব? তিনটের গাড়ী কাল এসেছিল তিনটে পঁচিশ মিনিটের সময়, পঁচিশ মিনিট লেট—অমুক বিস্কুট পয়সায় দশখানা—"

আমরা হাসি অতি কষ্টে চাপিয়া মেজের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

নিতাই মাস্টার বইখানা হাতে লইয়া বলিলেন, "কার বই?"

বিনু সগর্বে বলিল, "আমার বই, স্যার। আমার দাদা লিখেছেন, আমাদের একখানা দিয়েছেন—"

নিতাই মাস্টার বইখানা নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া বলিলেন, "হুঁ, থাক্ একটু পড়ে দেখব।"

পরের দিন বইখানা ফেরৎ দিবার সময় মন্তব্য করিলেন, "লেখে ভাল বেশ বই। ছোকরা এর পর উন্নতি করবে।"

বিনু বাধা দিয়া বলিল, "ছোকরা নন স্যার তিনি, আপনাদের বয়সী হবেন—"

নিতাই মাস্টার ধমক দিয়া বলিলেন, "বেশী কথা কইবে না, চুপ করে বসে থাকবে। আবার কথার ওপর কথা! পুরানো তেঁতুলে অম্বলের ব্যথা সারে, আশ্বিন মাসে দুর্গা পুজো হয়।"

পুরানো তেঁতুলে অম্বলের ব্যথা সারুক আর নাই সারুক; নিতাই মাস্টারের

সার্টিফিকেট্ শুনিয়া বিনুর দাদার বইখানা পড়িবার অত্যন্ত কৌতূহল হইল ; বিনুর নিকট যথেষ্ট সাধ্যসাধনা করিয়া সেখানা আদায় করিলাম। বাড়ীতে বাবা ও বড়দার চক্ষু এড়াইয়া বইখানাকে শেষ করিয়া বিনুর এই অদেখা দাদাটির প্রতি মনে মনে ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া গেলাম। একটি মেয়েকে কি করিয়া দুষ্ট লোক ধরিয়া লইয়া গেল, নানা কষ্ট দিল, অবশেষে মেয়েটি কিভাবে জলে ডুবিয়া মরিল, তাহারই অতি মর্মন্তুদ বিবরণ। পড়িলে চোখে জল রাখা যায় না।

কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে, একদিন বিনু বলিল, "জানিস পাঁচু, আমার সেই দাদা. যিনি লেখক, তিনি এসেছেন কাল আমাদের বাড়ী।"

অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম। "কখন এসেছেন? এখনও আছেন?"

"কাল রাতের ট্রেনে এসেছেন, দু-তিন দিন আছেন।"

"সত্যি? মাইরি বল—"

"মা-ইরি, চল বরং, আয় আমাদের বাড়ী—"

আমার ন-দশ বৎসর বয়সে ছাপার বই কিছু কিছু পড়িয়াছি বটে, কিন্তু যাহারা এই লেখে তাহারা কিরূপ জীব কখনো দেখি নাই। একজন জীবন্ত গ্রন্থকারকে স্বচক্ষে দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না ; বিনুর সহিত তাহার বাড়ী গেলাম।

বিনুদের ভেতর-বাড়ীতে একজন একহারা কে বসিয়া বিনুর মার সঙ্গে গল্প করিতেছিল, বিনু দূর হইতে দেখাইয়া বলিল, 'উনিই'। আমি কাছে যাইতে ভরসা পাইলাম না। সম্ভ্রমে আপ্লুত হইয়া দূর হইতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। লোকটি একহারা, শ্যামবর্ণ, অল্প দাড়ি আছে, বয়স নিতাই মাস্টারের চেয়ে বড় হইবে তো ছোট নয়, খুব গম্ভীর বলিয়াও মনে হইল। লোকটি সম্প্রতি কাশী হইতে আসিতেছে, বিনুর মায়ের কাছে সবিস্তারে সেই ভ্রমণ-কাহিনীই বলিতেছিল। প্রত্যেক কথা আমি গিলিতে লাগিলাম ও হাত পা নাড়ার প্রতি ভঙ্গীটি কৌতূহলের সহিত লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

লেখকরা তাহা হইলে এই রকম দেখিতে।

সেই দিনই গ্রামে বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গেল, বিনুর বাবা মুখুজ্যেদের চণ্ডীমণ্ডপে গল্প করিয়াছেন, তাঁহার বড় শালার ছেলে বেড়াইতে আসিয়াছে, মস্ত একজন লেখক, তার লেখার খুব আদর। ফলে গ্রামের লোক দলে দলে দেখা করিতে চলিল। বিনুর মা মেয়ে-মহলে রাষ্ট্র করিয়া দিলেন, 'প্রেমের তুফানে'র লেখক তাঁদের বাড়ী আসিয়াছেন। উক্ত বইখানি ইতিমধ্যে পুরুষেরা যত পড়ুক আর না পড়ুক মেয়ে-মহলে হাতে হাতে ঘুরিয়াছে খুব, অনেক মেয়ে পড়িয়া ফেলিয়াছে, বিনুর মা ভ্রাতুষ্পুত্রগর্বে স্ফীত হইয়া নিজে যাচিয়াও অনেককে পড়াইয়াছেন, সুতরাং মেয়েমহলেও ভাঙিয়া আসিল একজন জলজ্যান্ত লেখককে দেখিবার জন্য। বিনুদের বাড়ী দিনরাত লোকের ভিড় ; একদল যায়, আর একদল আসে। অজ পাড়াগাঁ, এমন একজন মানুষের—যার বই ছাপার অক্ষরে বাহির হইয়াছে, দেখা পাওয়া আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতই দুর্লভ।

কদিন কি খাতির এবং সম্মানটাই দেখিলাম বিনুর দাদার! এর বাড়ী নিমন্ত্রণ. ওর বাড়ী নিমন্ত্রণ, বিনুর মা সগর্বে মেয়ে-মহলে গল্প করেন, 'বাছা এসে ক'দিন বাড়ীতে ভাত মুখে দিলে? নেমন্তন্ন খেতে খেতেই ওর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে—'

ভাবিলাম—সত্য, সার্থক জীবন বটে বিনুর দাদার! লেখক হওয়ার সম্মান আছে।

ভূষণদার সহিত এইভাবে আমার প্রথম দেখা।

অত অল্প বয়সে অবশ্য ভূষণদাদার নিকটে ঘেঁষিবার পাত্তা পাই নাই—কিন্তু বছর দুই পরে তিনি যখন আবার আমাদের গ্রামে আসিলেন, তখন তাঁহার সহিত মিশিবার

অধিকার পাইলাম—যদিও এমন কিছু ঘনিষ্ঠভাবে নয়। তিনি যে মাদৃশ বালকের সঙ্গে কথা কহিলেন, ইহাতেই নিজেকে ধন্য মনে করিয়া বাড়ী গিয়া উত্তেজনায় রাত্রে ঘুমাইতে পারিলাম না।

সে কথাও অতি সাধারণ ও সামান্য।

দাঁড়াইয়া আছি দেখিয়া ভূষণদাদা বলিয়াছিলেন, "তোমার নাম কি হে? তুমি বুঝি বিনুর সঙ্গে পড়?"

শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমজড়িত কণ্ঠে উত্তর করিলাম "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কি নাম তোমার?"

"শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।"

"বেশ।"

কথা শেষ হইয়া গেল। দুরু দুরু বক্ষে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। প্রথম দিনের পক্ষে এই-ই যথেষ্ট। পরদিন আরও ভাল করিয়া আলাপ হইল। নদীর ধারে বিনু, আমি, আরও দু-একটি ছেলে তাঁর সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। ভূষণদাদা বলিলেন, "বল তো বিনু, এ দম্ভোলি বৃত্রাসুর শিরচ্ছিন্ন যাহে'—দম্ভোলি মানে কি? পারলে না? কে পারে?"

পূর্বেই বলিয়াছি, আমি বয়সের তুলনায় পাকা ছিলাম। তাড়াতাড়ি উত্তর করিলাম, "আমি জানি, বলব...বজ্র।"

"বেশ বেশ, কি নাম তোমার?"

কালই নাম বলিয়াছিঃ এ দীনজনের নাম তিনি মনে রাখিয়াছেন, এ আশা করাও আমার মত অর্বাচীন বালকের পক্ষে ধৃষ্টতা। সুতরাং আবার নাম বলিলাম।

"বেশ বাংলা জান তো। বই-টই পড় নাকি?"

এ সুযোগ ছাড়িলাম না, বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার বই সব পড়েছি।"

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, ইতিমধ্যে ভূষণদার আরও দুইখানি উপন্যাস ও একখানি কবিতার বই বাহির হইয়াছিল—বিনুদের বাড়ী সেগুলিও আসিয়াছিল ; বিনুর নিকট হইতে আমি সবগুলিই পড়িয়াছিলাম।

ভূষণদাদা বিস্ময়ের সুরে বলিলেন, "বল কি? সব বই পড়েছ? নাম কর তো?"

"প্রেমের তুফান, রেণুর বিয়ে, কমলকুমারী আর দেওয়ালী।"

"বাঃ বাঃ, এ যে বেশ দেখছি! কি নাম বললে?"

বিনীতভাবে পুনরায় নিজের নাম নিবেদন করিলাম।

"বেশ ছেলে! দ্যাখ তো বিনু, তোর চেয়ে কত বেশী জানে!"

গর্বে আমার বুক ফুলিয়া উঠিল। একজন লেখক আমার প্রশংসা করিয়াছেন! তারপর ভূষণদাদা (বিনুর সুবাদে আমিও তাঁহাকে তখন 'দাদা' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছি) নবীন সেন এবং হেমচন্দের কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন, সাহিত্য, কবিতা এবং তাঁহার নিজের রচনা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন ; তার কতক বুঝিলাম কতক বুঝিলাম না—এগারো বছরের ছেলের পক্ষে সব বোঝা সম্ভব ছিল না।

বছরের পর বছর কাটিয়া গেল। আমি হাই-স্কুলে ভর্তি হইলাম। একদিন ভূষণদাদা সম্বন্ধে আমি এক বিষম ধাক্কা পাইলাম আমাদের স্কুলের বাংলা মাস্টারের নিকট হইতে। কি উপলক্ষে মনে নাই, মাস্টারমশায় আমাদের ক্লাসের ছেলেদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাংলা দেশের আরও দু-একজন বড় লেখকের নাম করতে কে পারে?"

একজন বলিল, "নবীনচন্দ্র", একজন বলিল, "সুরেন ভট্চাজ" (তখনকার কালে মস্ত

নাম), একজন বলিল, "রজনী সেন" (তখন সবে উঠিতেছেন)—আমি একটু বেশী জানিবার বাহবা লইবার জন্য বলিলাম—"ভূষণচন্দ্র চক্রবর্তী।"

মাস্টারমশায় বলিলেন, "কে?"

"ভূষণচন্দ্র চক্রবর্তী। আমি পড়েছি তাঁর সব বই, আমার সঙ্গে আলাপ আছে।"

"সে আবার কে?"

আমি মাস্টারমশায়ের অজ্ঞতা দেখিয়া অবাক হইলাম।

"কেন, ভূষণচন্দ্র চক্রবর্তী খুব বড় লেখক—প্রেমের তুফান, কমলকুমারী, দেওয়ালী, রেণুর বিয়ে—এই সব বইয়ের—"

মাস্টারমহাশয় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, ক্লাসের ছেলেদের বেশীর ভাগই না বুঝিয়া সে হাসিতে যোগ দিল। উহাদের সম্মিলিত হাসির শব্দে ক্লাসরুম ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

আমার কান গরম হইয়া উঠিল, রীতিমত অপদস্থ বিবেচনা করিলাম নিজেকে। কেন? ভূষণদাদা বড় লেখক নন? বা রে!

মাস্টারমশায় বলিলেন, "তোমার গাঁয়ের আত্মীয় বলে আর তোমার সঙ্গে আলাপ আছে বলেই তিনি বড় লেখক হবেন তার কি মানে আছে? কে তাঁর নাম জানে? ও রকম বলো না।"

ভূষণদাদার সাহিত্যিক যশ ও খ্যাতি সম্বন্ধে আমি এ পর্যন্ত কেবল একতরফা বর্ণনাই শুনিয়া আসিয়াছি বিনুর মায়ের মুখে, বিনুর মুখে, বিনুর বাবার মুখে, ভূষণদাদার নিজের মুখে। তাহাই বিশ্বাস করিয়াছিলাম, সরল বালক মনে। এই প্রথম আমার তাহার উপর সন্দেহের ছায়াপাত হইল।

এতদিন গাঁয়ে থাকিয়া কেবল সুগন্ধি তেলের বিজ্ঞাপনের নভেলই পড়িয়াছি—ক্রমে স্কুল লাইব্রেরী হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের ও আর অন্যান্য বড় লেখকের বই লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ভাল মন্দ বুঝিবার ক্ষমতাও জন্মিল—ফলে বছর চার-পাঁচ স্কুলে পড়িবার পরে আমার উপরে ভূষণচন্দ্র চক্রবর্তীর প্রভাব যে অত্যন্ত ফিকে হইয়া দাঁড়াইবে, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার।

আমি যেবার ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কলেজে ভর্তি হইয়াছি, সেবার শ্রাবণ মাসে বিনুর ভগ্নীর বিবাহ উপলক্ষে ভূষণদাদা আবার আমাদের গ্রামে আসিলেন। তখন আমার চোখে তিনি আর ছেলেবেলার সে বড় লেখক ভূষণচন্দ্র নন, বিনুর ভূষণদাদা, সুতরাং আমারও ভূষণদাদা। তখন বেশ সমানে সমানে কথাবার্তা বলিলাম, দাদারও আর সে মুরুব্বিয়ানা চাল নাই, থাকিবার কথাও নয়। তিনিও সমানে সমানেই মিশিলেন।

একখানা বই দেখিলাম, বিবাহ-বাটির কুটুম্বসাক্ষাৎদের হাতে ঘুরিতেছে, কবিতার বই, নাম,—'প্রতিমা-বিসর্জন'! দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীর মৃত্যুতে শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া ভূষণদাদা কবিতা লিখিয়া বই ছাপাইয়াছেন বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

বিনুও তো আর বাল্যের সেই বিনু নাই। সে বলিল—"মজার কথা শোন্, আগের বৌদিদি ষোল বছর ঘর করে ছেলেপুলের মা হয়ে মরে গেল বেচারী, তার বেলা শোকের কবিতা বেরুলো না। দ্বিতীয় পক্ষের বৌদি—দু-তিন বছর ঘর করে ডব্‌কা বয়সেই মারা গেল কি না—দাদার তাই শোকটা বড্ড লেগেছে—একেবারে—প্র—তি—মা—বি—স—র্জ—ন!"

ভূষণদাদা আমাকেও একখানা বই দিয়াছিলেন, দু-তিন দিন পরে আমায় বলিলেন —"প্রতিমা-বিসর্জন কেমন পড়লে হে?"

অতি সাধারণ ধরণের কবিতা বলিয়া মনে হইলেও বলিলাম, "বেশ চমৎকার!"

ভূষণদাদা উৎসাহের সহিত বলিলেন, "বাংলাদেশে 'উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম'-এর পরে আমার মনে হয়, এ ধরণের বই আর বেরোয় নি। নিজের মুখে নিজের কথা বলছি বলে কিছু মনে করো না—তবে তোমাদের ছোট দেখেছি, তোমাদের কাছে বলতে দোষ নেই।"

ভূষণদাদার দাড়ি চুলে বেশ পাক ধরিয়াছে, তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলি, সুতরাং প্রতিবাদ না করিয়া চুপ করিয়া গেলাম। যদিও 'উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম'-এর প্রতি আমার যে খুব শ্রদ্ধা ছিল তাহা নয়, তবুও ভূষণদাদার কথা শুনিয়া সমালোচনা-শক্তির প্রতি বিশ্বাস হারাইলাম।

ভূষণদাদার আর্থিক অবস্থা খুব ভাল নয়, অনেকদিন হইতে জানি। তিনি ক্যাম্বেল স্কুল হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া দিনাজপুরের এক সুদূর পল্লীগ্রামে জমিদারদের দাতব্য-চিকিৎসালয়ে চাকুরি করিতেন, স্বাধীন ব্যবসা কোনদিন করেন নাই।

এবার শুনিলাম ভূষণদাদার সে চাকুরিটাও যায়-যায়। বিনুই এ সংবাদ দিল।

ভূষণদাদা আসার পরদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে, তোমরা তো কলকাতায় ছাত্রমহলে ঘোর, পাঁচটা কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে দেখা হয়, ছাত্রমহলে আমার বই সম্বন্ধে কি মতামত কিছু শুনেছ?"

হঠাৎ বড় বিব্রত হইয়া পড়িলাম, আম্‌তা আম্‌তা সুরে বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ—তা মত বেশ ভালই—"

বলেন কি ভূষণদাদা! বিব্রত ভাবটা কাটিয়া গিয়া এবার আমার হাসি পাইল। কলকাতায় ছাত্রমহলে ভূষণ চক্রবর্তীর নামই কেউ জানে না, তার বই পড়া, আর সে সম্বন্ধে মতামত!

ভূষণদাদা উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "কি, কি, কি-রকম বলে? আমার কোন্ বইটার কথা শুনেছ, পাষাণপুরী না দেওয়ালী?"

অকূলে কূল পাইলাম। ভূষণদাদার বইয়ের নাম কি আমার একটাও মনে ছিল ছাই! বলিলাম, "হ্যাঁ, ওই পাষাণপুরীর কথাই যেন শুনেছি।"

ভূষণদাদা আর আমায় ছাড়িতে চান না। কি শুনিয়াছি, কোথায় শুনিয়াছি, কাহার কাছে শুনিয়াছি? পাষাণপুরী তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। তবুও তো তিনি পাবলিশার পান নাই, সব বই-ই নিজে ছাপাইয়াছেন, দিনাজপুরের অজ পাড়াগাঁয়ে বসিয়া বই বিক্রী ও বিজ্ঞাপনের কোন সুবিধা করিতে পারেন নাই।

বিনু আমায় আড়ালে বলিল, "এই অবস্থা, পঞ্চাশটি টাকা মাইনে পান ডাক্তারী করে, সংসারই চলে না, তা থেকে খরচ করেন ওই সব বাজে বই ছাপতে। ভূষণদাদার চিরকালটা এক রকম গেল। বাতিক যে কত রকমের থাকে।"

ইহার পর আরও ছ-সাত বছর কাটিয়া গেল।

আমি পাশ করিয়া বাহির হইয়া নানারকম কাজকর্ম করি এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু লিখিও।

ভূষণদার প্রভাব আমার জীবন হইতে সম্পূর্ণ যায় নাই, মনের তলে কোথায় চাপা ছিল, লেখক হওয়া একটা মস্ত বড় কিছু বুঝি! সেই যে আমাদের গ্রামে বাল্যকালে সেবার ভূষণদাদাকে সম্মান পাইতে দেখিয়াছিলাম, সেই হইতেই বোধ হয় লেখক হওয়ার সাধ মনে বাসা বাঁধিয়া থাকিবে, কে জানে?

আমার লেখক-জীবন যখন পাঁচ-ছ বছরের পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে, দু-চারখানা ভাল মাসিক পত্রিকায় লেখা প্রায়শঃ বাহির হয়, কিছু কিছু আরও হইতেছে, সে সময় কি একটা ছুটিতে দেশে গেলাম। বিনুদের বাড়ীতে গিয়া দেখি, ভূষণদাদা অসুস্থ অবস্থায়

সেখানে সপরিবারে কিছুদিন হইতে আছেন। আমায় বলিলেন, "পাঁচু, শুনলাম আজকাল লিখছ? কোন্ কোন্ কাগজে লেখা বেরিয়েছে?"

কাগজগুলির কয়েকখানি আমার সঙ্গেই ছিল, ইতিমধ্যে গ্রামের অনেকেই সেগুলি দেখিয়াছে। ভূষণদাদাকেও দেখাইলাম—দেখাইয়া বেশ একটু গর্ব অনুভব করিলাম।

ভূষণদাদা কাগজ কখানা উল্টাইয়া দেখিয়া বলিলেন, "এইসব কাগজে লিখছ? বেশ বেশ। এসব তো বেশ নাম-করা পত্রিকা! একটু ধরাধরি করতে হয়, না? তুমি কাকে ধরেছিলে? একটু ধরাধরি না করলে আজকাল কিছুই হয় না। গুণের আদর কি আর আছে? এই দেখ না কেন, আমি পাড়াগাঁয়ে থাকি বলে নিজেকে পুশ্ করতে পারলাম না। আমার 'নারদ'-কাব্য পড় নি? দু-বছর ধরে খেটে লিখেছি, প্রাণ দিয়ে লিখেছি। কিন্তু হলে হবে কি, ওই ধরাধরির অভাবে বইখানা নাম করতে পারছে না।"

বৈকালে নদীর ধারে বসিয়া ভূষণদাদার মুখে তাঁহার 'নারদ'-কাব্যের অনেক ব্যাখ্যা শুনিলাম। অমিত্রাক্ষর ছন্দ হইলেও তাহার মধ্যে নিজস্ব কি একটা ঢুকাইয়া দিয়াছেন ভূষণদাদা, অমন দার্শনিকতা আধুনিকতা কোন বাংলা গ্রন্থে নাই, এ কথা তিনি জোর করিয়া বলিতে পারেন।

বলিলাম, "বইখানা ছেপেছে কারা?"

"আমিই ছেপেছি। লোকের দোরে দোরে বেড়িয়ে ছাপানোর জন্যে খোশামোদ করা—ওসব আমার দ্বারা হবে না।"

মনে হইল ভূষণদাদা আমারই প্রতি যেন বক্রকটাক্ষ করিতেছেন এই সব উক্তি দ্বারা। যাহা হউক, কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

বছরখানেক পরে আমি আমার কর্মস্থলে একটা বুকপোস্ট পাইলাম। খুলিয়া দেখি, ভূষণদাদা সেই 'নারদ'-কাব্যখানি আমায় পাঠাইয়াছেন, সঙ্গে একখানা বড় চিঠি। 'নারদ'-কাব্যখানির উচ্চ প্রশংসা করিয়া বহুলোক ইতিমধ্যে চিঠি লিখিয়াছেন। চিঠিগুলি তিনি পুস্তিকাকারে ছাপিয়া ঐ সঙ্গে আমায় পাঠাইয়াছেন। আমি যেন কলিকাতায় কোন নামকরা কাগজে বইখানির ভাল ও বিস্তৃত সমালোচনা বাহির করিয়া দিই, এই ভূষণদাদার অনুরোধ।

ছাপানো প্রশংসাপত্রগুলি পড়িয়া আমার খুব ভক্তি হইল না। একজন মফঃস্বলের কোন শহরের প্রধান ডাক্তার লিখিয়াছেন, কবি নবীনচন্দ্রের রৈবতক কাব্যের পরে আর একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য আবার বাংলা সাহিত্যে বাহির হইল বহুকাল পরে। আর একজন কোথাকার প্রধান উকিল লিখিতেছেন, কে বলে বাংলা ভাষার দুর্দিন? বাংলা সাহিত্যের দুর্দিন? যে দেশে আজও 'নারদ'-কাব্যের মত কাব্য রচিত হয়ে থাকে (মনে ভাবিলাম, ভদ্রলোক কি বাংলা কবিতার কিছুই পড়েন নাই?) সে দেশে—, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মন দিয়া 'নারদ'-কাব্য পড়িলাম। নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক'-এর ব্যর্থ অনুকরণ। লম্বা লম্বা বক্তৃতা—মাঝে মাঝে 'ভূমা', 'প্রপঞ্চ', 'ক্ষর', 'অক্ষর', 'শাশ্বত', 'অব্যয়' প্রভৃতি শব্দের ভীষণ ভিড়—ইহাকে 'নারদ'-কাব্য না বলিয়া গীতা বা শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যে ব্যাখ্যা বলিলেও চলিত।

আমি চিঠির উত্তরে লিখিলাম, 'নারদ' বেশ লাগিয়াছে, তবে কলিকাতার কোন নামকরা মাসিক পত্রিকায় ইহার বিস্তৃত সমালোচনা বাহির করা আমার সাধ্যায়ত্ত নয়। সে চিঠির উত্তরে ভূষণদাদা আমায় আরও দুই-তিনখানি পত্র লিখিলেন—যদি বইখানি আমার ভাল লাগিয়া থাকে, তবে সে কথা ছাপাইয়া প্রকাশ করিবার সৎসাহস থাকা আবশ্যক ইত্যাদি। সে সব চিঠির উত্তর দিলাম না।

ইহার বছরখানেক পরে আমি আমার বিদেশের কর্মস্থান হইতে কলিকাতায় আসিয়াছি।

শ্রাবণ মাস, তেমন বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে। দিনে রাত্রে বৃষ্টির বিরাম নাই। এ-বেলা একটু ধরিয়াছে বলিয়াই বাহির হইয়াছি। গোলদীঘির কাছাকাছি আসিয়া একখানা হ্যাণ্ড-বিল হাতে পড়িল। হ্যাণ্ডবিলখানা ফেলিয়া দেওয়ার পূর্বে অন্যমনস্কভাবে সেখানার উপর একটু চোখ বুলাইয়া লইতে গিয়া দস্তুরমত বিস্মিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম। উহাতে লেখা আছে—

'নারদ'-কাব্যের খ্যাতনামা কবি
বঙ্গভারতীর কৃতি সন্তান
শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র চক্রবর্তীকে (বড় বড় অক্ষরে)
সম্বর্ধনা করিবার জন্য কলিকাতাবাসিগণের
জনসভা (আধইঞ্চি লম্বা অক্ষরে)
স্থান—ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল, সময়— সন্ধ্যা ৬॥টা।
সভাপতিত্ব করিবেন
একজন খ্যাতনামা নামজাদা প্রবীণ সাহিত্যিক।

ব্যাপার কি? চক্ষুকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিলাম না—ভূষণদাদাকে সম্বর্ধনা করিবার জন্য কলিকাতাবাসিগণ (কি ভয়ানক ব্যাপার!) জনসভা আহ্বান করিয়াছেন ইউ-নিভার্সিটি ইন্স্টিটিউট হলে অতবড় নামজাদা সাহিত্যিকের সভাপতিত্বে! কই 'নারদ'-কাব্যের এতাদৃশ জনপ্রিয়তা তো পূর্বে মোটেই শুনি নাই? যাহা হউক, হইলে খুব ভাল কথা, কিন্তু কলিকাতাবাসিগণ কি ক্ষেপিয়া গেল হঠাৎ?

হ্যাণ্ডবিলের তারিখ লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা সভা। সাড়ে ছটার বেশী দেরি নাই, যদি লোকের খুব ভিড় হয়, পৌনে ছ'টায় ইনস্টিটিউটে গিয়া ঢুকিলাম। তখনও কেহ আসে নাই—অতবড় হল একেবারে খালি। এক পাশে গিয়া বসিলাম! ছ'টা বাজিল, জনপ্রাণীরও দেখা নাই—এই সময় আবার জোরে বৃষ্টি নামিল, সওয়া ছ'টা—কেহই নাই, সাড়ে ছ'টার দু-এক মিনিট পূর্বে দেখি ভূষণদাদা অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে একতাড়া কাগজ বগলে হলে প্রবেশ করিতেছেন, পিছনে চার-পাঁচটি ভদ্র-লোক—তাঁহাদের কাহাকেও চিনি না। তখন সভার সাফল্য সম্বন্ধে আমার ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, এ অবস্থায় ভূষণদাদার সহিত দেখা করিলে তিনি অপ্রতিভ হইতে পারেন—সুতরাং হলের বাহিরে গা ঢাকা দিয়া রহিলাম।

পৌনে সাতটা—জনপ্রাণী না, সভাপতিও অনুপস্থিত। সাতটা, তথৈবচ। এমন জন-শূন্য জনসভা যদি কখনও দেখিয়াছি। ভূষণদাদার অবস্থা দেখিয়া বড় কষ্ট হইল। তিনি ও তাঁহার সঙ্গে ভদ্রলোক কয়জন কেবল ঘর-বাহির করিতেছেন, নিজেদের মধ্যেই উত্তেজিত-ভাবে কি পরামর্শ করিতেছেন—আবার একবার করিয়া ইন্স্টিটিউট-এর গেটের কাছে যাইতেছেন। সওয়া সাতটা—কাকস্য পরিবেদনা। সাড়ে সাতটা—পূর্ববৎ অবস্থা। কলিকাতা-বাসিগণের জনসভায় কলিকাতাবাসিগণই আসিতে ভুলিয়া গেলেন কেমন করিয়া?

পৌনে আটটার সময় ভূষণদাদা সঙ্গীদের লইয়া বাহির হইয়া গেলেন—অল্পক্ষণ পরে আমিও হল পরিত্যাগ করিলাম।

পরদিন বিনুর মেসোমশায় তারিণীবাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি আমাকে চেনেন খুব ভালই—বিনুর সঙ্গে কতবার সিমলা স্ট্রীটে তাঁর বাড়ীতে গিয়াছি। কুশল প্রশ্নাদির পরে তিনি বলিলেন, "ভূষণ যে এখানে এসেছে হে. আমার বাসাতেই, আজ আট দশ দিন আছে। কি একখানা বই নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে. ওর মাথা আর মুণ্ডু! এদিকে এই অবস্থা, সতের আঠার বছরের মেয়ে একটা, পনের বছরের মেয়ে একটা—পার করবে কোথা থেকে তার সংস্থান নেই—আবার কাল দেখি নিজের পয়সায় একগাদা কি মিটিং না

ফিটিং-এর হ্যান্ডবিল ছেপে এনেছে ; আর বল কেন, একেবারে মাথা খারাপ!"

বলিলাম, "হ্যাঁ—হ্যাঁ, দেখেছিলুম বটে একখানা হ্যান্ডবিলে—জনসভা না—কি—"

"জনসভা না ওর মুণ্ডু। ও নিজেই তো পরশু দুপুরে বসে বসে ওখানা লিখলে! আমার বাড়ীতে দুজন বেকার ভাই-পো আছে, তাদের নিয়ে কোথায় সব ঘুরছে কদিন দেখতে পাই—সাড়ে সতের টাকা প্রেসের বিল কাল দিলে দেখলাম আমার সামনে—এদিকে শুনি, বাড়ীতে নিতান্ত দুরবস্থা...অতবড় সব আইবুড়ো মেয়ে গলায়, এক পয়সার সংস্থান নেই—তার বিয়ে!"

মাঘ মাসের শেষে আমি কার্যোপলক্ষে জলপাইগুড়ি যাইতেছি, পার্বতীপুর স্টেশনে দেখি, ভূষণদাদা একটি ব্যাগ হাতে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করিতেছেন। আমি গিয়া প্রণাম করিতেই বলিলেন, "আরে পাঁচু যে! ভাল তো? সেই পশ্চিমেই আজকাল চাকুরি কর তো? কোথায় যাচ্ছ এদিকে?"

"আজ্ঞে একটু জলপাইগুড়িতে। আপনি কোথায়?"

"আমি একটু যাচ্ছি কলকাতায়। হ্যাঁ, তোমাকে বলি—শোনোনি বোধ হয়, আমার 'নারদ'-কাব্যের খুব আদর হয়েছে। এর মধ্যে কলকাতায় ইন্‌স্টিটিউট হলে প্রকাণ্ড সভা হয়ে গেল তাই নিয়ে। অমুক বাবু সভাপতি ছিলেন। খুব উৎসাহ দেখলাম লোকজনের মধ্যে, খুব ভিড়—দেখবে? এই দেখ।" বলিয়াই ভূষণদাদা ব্যাগ খুলিয়া জনসভার ছাপানো হ্যান্ডবিল একখানা আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "পড়ে দেখ।"

পাঁচুমামার বিয়ে

বাবা যখন মারা গেলেন, তখন দাদার উনিশ, আমার সতেরো। অবস্থা আমাদের ছিল দিব্বি সচ্ছল, বড় বড় পাঁচ গোলা ধান তখন বাড়ীতে, এক একটা গোলায় দু পৌটি আড়াই পৌটি ধান মজুত। জমিজমার আয়ও বার্ষিক হাজার দুই টাকার কম নয়, এ বাদে ঠাকুরমার হাতে নগদ টাকা ও মায়ের গায়ের সোনার গহনাও বেশ ছিল। আর ছিল গ্রামের মধ্যে প্রচুর মান, খাতির রবরবা নাম-ডাক।

রাখাল মাস্টারের পাঠশালায় লোয়ার প্রাইমারী পড়বার সময় ইতিহাসে পড়েছিলাম. কে একজন বাংলার সুলতানের পুত্র "পিতার মৃতুর পরে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেখিলেন তাঁহার রাজকোষে দুই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, তিন লক্ষ হস্তী, পাঁচ লক্ষ অশ্ব, দশ লক্ষ পদাতিক ও বিশ লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য আছে"...অতএব তাঁর মাথা ঘুরে গেল এবং দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা অস্বীকার করে বসলেন। আমাদেরও হলো তেমনি অবস্থা।

মা ছিলেন নিরীহ ভাল মানুষ, ঠাকুরমা পিতৃহীন নাতিদের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহ-প্রবণ, সুতরাং আমাদের মাথার ওপর কড়া শাসন করবার বা রাশ টেনে ধরবার তো কেউ ছিল না—এ অবস্থায় আমাদের মুণ্ডু ঘুরে যাবে, এ আর বিচিত্র কি?

দাদাই অগ্রজের অধিকারে পথ দেখালেন প্রথম। আগে মুণ্ডু ঘুরে গেল তাঁরই।

সে ইতিহাস রীতিমত বিচিত্র।

কাঁচড়াপাড়ার কাছে বন্দিপুর গ্রামে আমার এক দূর সম্পর্কের মামা থাকতেন. তাঁকে পাঁচুমামা বলে আমরা ডাকতুম। বাবা বেঁচে থাকতে তিনি দু-একবার আমাদের বাড়ী যাতায়াত করেছিলেন বটে, কিন্তু বাবার মৃত্যুর পরে তাঁর যাতায়াত. বিশেষ করে দাদার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা যেন হঠাৎ খুব বেড়ে গেল।

পাঁচুমামা দাদার চেয়েও চার-পাঁচ বছরের বড়। কাজেই আমি পাঁচুমামাকে খুব সমীহ

করে চলতুম। পাঁচুমামাও আমার চেয়ে দাদার সঙ্গে বেশী করে মিশতো। একবার পাঁচু-মামা এসে দাদাকে সঙ্গে করে বন্দিপুর নিয়ে গেল।

বন্দিপুর থেকে দিন পনেরো পরে ফিরে এসে দাদা ঠাকুরমাকে বল্লেন, ঠাক্‌মা, আমার দুশো টাকা বড় দরকার এখুনি। কলাই মুগের ব্যবসা করছি, পাঁচুমামা সস্তায় মাল বাঁধাই করছে, চাষাদের দিতে হবে—টাকাটা এখুনি চাই। মোটা লাভ হবে দু'মাস পরে। ঠাকুরমার হাতে নগদ টাকা কত ছিল তা মা'র জানা ছিল না, তবে নগদ টাকা যে মন্দ ছিল না—এটা দাদাও জানতেন, আমিও জানতাম। ঠাকুরমা টাকাটা দিয়ে দিলেন, দাদা টাকা নিয়ে মাল খরিদ করতে চলে গেলেন।

দিন কুড়ি পরে পাঁচুমামাকে সঙ্গে নিয়ে দাদা আবার এসে শ' দুই টাকা চাইলেন। মাল যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছে সস্তায়। পাঁচুমামার বাড়ী মাল গোলাজাত করা হচ্ছে, টাকার দরকার সেজন্যেই।

পাঁচুমামাও দাদার কথা সমর্থন করলেন। মাল সস্তার মুখে বেশী পরিমাণে খরিদ করে রাখতে পারলেই লাভ। টাকাটার দরকার বটে।

ঠাকুরমা জিগ্যেস করলেন—কত মাল কেনা হলো?

পাঁচুমামা বল্লে—তা দুশো মণের ওপর। এই টাকাটা পেলে আরও দুশো মণ খরিদ করা হবে। মণ পিছু আট আনা করে ধরলেও দুশো টাকা লাভ।

দিলেন টাকা ঠাকুরমা।

দাদা ও পাঁচুমামা টাকা নিয়ে চলে গেল—এরপরে মাস খানেক তাদের আর কোন পাত্তা রইল না। ঠাকুরমা ব্যস্ত হয়ে একখানা চিঠিও লেখালেন—তারও উত্তর এল না।

চিঠির উত্তরের বদলে আরও দিন দশেক পরে এলেন পাঁচুমামার এক ভগ্নিপতি নারাণ-বাবু। নারাণবাবু বৃদ্ধ ব্যক্তি, বন্দিপুরে তাঁরও বাড়ী। আমি তাঁকে কখনও আমাদের বাড়ী আসতে দেখিনি।

নারাণবাবুকে হঠাৎ আসতে দেখে বাড়ীসুদ্ধ সবাই শঙ্কিত হয়ে উঠল। দাদা ভালো আছেন তো? ব্যাপার কি?

নারাণবাবু হাত-পা ধুয়ে সুস্থ ঠাণ্ডা হয়ে ঠাকুরমাকে বল্লেন—মা, আপনি পটলকে কত টাকা দিয়েছেন এ পর্যন্ত?

—চারশো টাকা।

নারাণবাবু অবাক হয়ে বল্লেন—এত টাকা কেন দিলেন? কি বলে টাকা নিয়েছিল আপনার কাছ থেকে?

ঠাকুরমা বল্লেন,—কেন বলো তো বাবা এসব কথা জিগ্যেস করছো? সে তো মুগ কলাই-এর ব্যবসা করবে বলে টাকা নিয়েছে। কেন, পাঁচুও তো সেবার এসে ওই কথাই বলে গেল।

নারাণবাবু রাগে জ্বলে উঠে কাঁপতে কাঁপতে বল্লেন—পাজী বদমাইস্. ছুঁচো!...সেই রাস্কেলটাই তো যত নষ্টের গোড়া। অত বড় বদমাইশ কি আর আছে নাকি? সেই তো পটলাকে ভালমানুষ পেয়ে নষ্ট করবার চেষ্টা করছে। ওই জন্যেই আমার সামনে বেরোয় না। ব্যবসা না মুণ্ডু। টাকা নিয়ে দুলে-পাড়ায় রাজি দুলেনী বলে এক মাগী আছে. তারই ওখানে দুজনে যাতায়াত করে—এর মধ্যে বোধ হয় সব টাকাই তার পাদপদ্মে ঢেলেছে। ব্যবসা!

মা আর ঠাকুরমা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। দাদা যে এমন ব্যাপার করতে পারে এ সবারই ধারণার অতীত।

নারাণবাবু বল্লেন—আমিই কি আগে ছাই জানতাম। জানলে এমনতরো হয়? আমার

সামনে তো দুজনের কেউ-ই বড় একটা আসে না, পরম্পরে শুনলাম এই ব্যাপার চলছে। শুনলাম খুব টাকা ওড়াচ্ছে। জোড়া জোড়া শাড়ী আসছে রানাঘাটের বাজার থেকে মাগীর জন্যে। আজ খাবার, কাল খাগড়াই বাসন। বোধ হয় মদও ধরেছে। তাই ভাবলাম আপনাকে একবার কথাটা জিগ্যেস করা দরকার যে, আপনি টাকা দিয়েছেন কিনা। তাই আজ এলুম।

ঠাকুরমা মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। বাবার বহুকষ্টে উপার্জন করা পয়সা—ছেলেরা সব মূর্খ ও নাবালক—যা কিছু আছে, সংসারের অসময়ে কাজে লাগবে বলেই আছে। এখনও আমার দুই বোনের বিয়ে দিতে বাকী! এ অবস্থায় বিধবার পুঁজি সামান্য টাকার মধ্যে চারশো টাকা এক দুলে মাগীর পেছনে এভাবে ওড়ানো?

সমস্ত রাত পরামর্শ করার পরে ধার্য হলো যে, পরদিন সকালে নারাণবাবু আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবেন বন্দিপুরে এবং কালই দাদাকে আমি ঠাকুরমার অসুখ হয়েছে এই কথা বলে বাড়ী ফিরিয়ে আনব।

বন্দিপুর যেতে হয় মদনপুর স্টেশনে নেমে। মাঠের মধ্যে দিয়ে ক্রোশ দুই হেঁটে তো বিকেলে বন্দিপুর পৌঁছানো গেল। বাড়ী থেকে খেয়েই বেরিয়েছিলুম। পাঁচুমামা বাড়ীতে নেই, দাদাও নেই—শুনলাম তারা কানসোনার বাজারে গিয়েছে।

আমি পাঁচুমামার বাড়ীর সামনে একটা বেলগাছতলায় বসে আছি, কে একজন মোটা-সোটা কুচকুচে কালো স্ত্রীলোক সামনের ঘর দিয়ে মেটে কলসী কাঁখে নিয়ে জল আনতে যাচ্ছিল—নারাণবাবু তার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লেন—ওই দ্যাখো, ওই বেটি সেই রাজি দুলেনী—ওরই পাদপদ্মে তোমার দাদা সব টাকা ঘুচিয়েচে।

একটু পরে দাদা ও পাঁচুমামা বাড়ী ফিরল। আমাদের দেখে দুজনেই প্রথমটা অবাক হয়ে যেন থতমত খেয়ে গেল, তারপর দাদা জিগ্যেস করলে—কিরে নগা, কি মনে করে?

নারাণবাবু বল্লেন—ও এসেছে তোমায় বাড়ী নিয়ে যেতে। তোমার ঠাকুরমার বড় অসুখ যে!

—অসুখ? কি অসুখ?

দাদা আমার মুখের দিকে চাইলে। দাদার হঠাৎ-ভয়-পাওয়া হঠাৎ-ম্লান মুখের দিকে চাইতে পারলুম না। বড় কষ্ট হলো, একবার মনে হলো, সত্য কথাটা বলে ফেলি। কিন্তু তা হলে দাদা যদি বাড়ী না যায়?

সেই রাত্রেই দাদাকে নিয়ে বাড়ী ফিরলাম।

বাড়ী এসে দাদা খুব বকুনি খেলে ঠাকুরমা ও মায়ের কাছে। তার উত্তরে সে নারাণ-বাবুকে গালমন্দ দিয়ে যা-তা বলে গেল। কে বলেছে সে সর্ষে কেনে নি? এখনও বিশ মণ সর্ষে ঘরে মজুত রয়েছে—আর সব মাল চাষাদের ঘরে রেখে দেওয়া হয়েছে, দরকার হলেই,—রাজি দুলেনী কে? রাজি দুলেনীকে দাদা চেনেও না। নারাণবাবুর মত কুটিল, ধড়িবাজ লোক দুনিয়ায় আর নেই। তিনি টাকা চেয়েছিলেন, দাদা দেয়নি, তাই তিনি দাদার বিরুদ্ধে এই সব মিথ্যে রটনা করে বেড়াচ্ছেন।

বলা বাহুল্য, মা বা ঠাকুরমা দাদার এসব কথা কিছু বিশ্বাস করলেন না। মাস খানেক পরে পাঁচুমামা আবার একদিন এসে হাজির আমাদের বাড়ীতে। ঠাকুরমা বল্লেন—পেঁচো শোন। হতভাগা, আমার যে এক রাশ টাকা চেয়ে পাঠালি পটলাকে দিয়ে ব্যবসা করবি বলে, কই ব্যবসার হিসেব দেখা তো আমায়? দেখি কোথায় গেল এতগুলো টাকা!

পাঁচুমামার মুখে চিরদিন তুবড়ি ছোটে। হাত পা নেড়ে সে বুঝিয়ে দিলে, টাকা ডোবানো তো দূরের কথা—আর মাস দুই পরে ঐ চারশো টাকার অন্ততঃ দেড়শোটি টাকা লাভ দাঁড়াবে। তখন লাভে মূলে একসঙ্গে টাকাটা এনে দেবে এখন। পাঁচুর অদৃষ্ট খারাপ, সে যার জন্য চুরি করে—সেই নাকি পাঁচুকে চোর বলে। যাক্, তার জন্যে সে

দুঃখিত নয়—আসল টাকাটা কোন রকমে ঠাকুরমায়ের হাতে তুলে দিতে পারলেই সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। ততদিন পর্যন্ত রাত্রে ঘুম নেই তার।

পাঁচুমামার বক্তৃতায় ঠাকুরমার বিশ্বাস ফিরে এল। ফলে পাঁচুমামা আমাদের বাড়ীতে রয়েই গেল। দাদাকে এর আগেই সে নষ্ট করেছিল, এবার আমার পিছনে লাগল এবং অদ্ভুতভাবে সাফল্য অর্জন করল। এমন কি, কিছুদিন পরে আমারই মনে হলো, আমি দাদাকে বুঝি ছাড়িয়েই যাই।

তখন আমার বিবাহ হয়নি—দাদার সবে হয়েছে। আমি নানা ছুতোয় ঠাকুরমার কাছ থেকে টাকা আদায় করি আর পাঁচুমামার পরামর্শ মত খরচ করি। মহকুমা শহর ছিল নিকটেই। নানা ছুতোনাতায় মহকুমা গিয়ে আমি আর পাঁচুমামা প্রায়ই রাত্রে বাড়ী ফিরতুম না। ধাপে ধাপে শেষে এতদূর পর্যন্ত নেমেছিলুম।

পাঁচুমামাকে সত্যি আমি অদ্ভুতকর্মা মানুষ বলে ভাবতাম। যেমন জানে ব্যবসা, তেমনি রাখে দুনিয়ার খবর ; যেমনি বোঝে মোকদ্দমা, তেমনি পারে ফুর্তি করতে। পাঁচুমামার হাতে টাকাগুলি তুলে দিয়ে বলতাম, এর মধ্যে থেকে যা যা দরকার খরচ করো।

যত টাকাই দিই, তিন-চার দিনের মধ্যে সব খরচ করে ফেলে আবার আমার কাছে চাইতেন। বলতেননগা, বুড়ীর হাতে মোটা টাকা আছে। তা তোমার দ্বারা কিছু যে হবার নয়, আমি বুড়ীর নাতি হলে দেখতিস।

মামার কাছে কখনো টাকার হিসেব নিইনি—অসীম শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা ছিল আমার পাঁচুমামার ওপরে। কিভাবে ও কোথায় সে সব টাকা ব্যয় হতো, সে কথা আর বলব না—তবে এইটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে যে মাঘ মাস থেকে আশ্বিন মাসের মধ্যে প্রায় চার-পাঁচ শো টাকা পাখীর মত উড়ে গেল বেমালুম। ঠাকুরমা হাত গোটালেন, মায়ের গহনা বন্ধক পড়তে লাগল। এই অবস্থায় পাঁচুমামা একদিন তেওটা বন্দিপুরে বিশেষ কাজ আছে বলে চলে গেলেন, আর এলেন না।

মাস দশেক পরে একদিন শীতের রাত্রে মুড়িসুড়ি দিয়ে দালানে বসে আছি, এমন সময় পাঁচুমামা আমাদের বাড়ী এসে আবার হাজির।

আমায় বল্লেন—এই যে, ভাল আছিস নগা? পটলা কোথায়?

বল্লুম—দাদা ওপাড়ায় গাঙ্গুলি-বাড়ী গিয়েছে বোধ হয়। তার পরে, এতদিন কোথায় ছিলে মামা? এসো বসো—বড্ড শীত।

পাঁচুমামা দরজা ভেজিয়ে আমার কাছে এসে বসল। বলল—শোন্, একটা কথা বলতে এলুম তোদের। কাল এখানে এক ভদ্রলোক আসবে সকালের গাড়ীতে। যদি তোদের কিছু জিগ্যেস করে তবে বলবি, তোদের এখানকার বিষয়-সম্পত্তিতে আমার পাঁচ আনা অংশ আছে। বলতে পারবি তো? 'পটলা কোথায় গেল—তাকে কথাটা শিখিয়ে রাখি।

কৌতূহল ও আগ্রহের সঙ্গে বল্লুম—কি, কি ব্যাপার মামা? কে আসবে?

ব্যাপার যা শুনলাম তা সংক্ষেপে এই। পাঁচুমামার বিবাহ, কাল তাকে দেখতে আসবেন মেয়ের বাপ নিজে। আসলে তো পাঁচুমামার কিছু নেই তেওটা-বন্দিপুরে, যা ছিল তা উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে অনেককাল। কিছু না দেখালে মেয়ে দেবেই বা কেন? মেয়ের বাপের নাম হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে, মদনপুরের কাছেই কি গাঁয়ে বাড়ী, গরীব অবস্থার লোক। তিনটি মেয়ে তাঁর, মেয়ে তিনটি অপরূপ সুন্দরী—এইটি বড়। পাঁচুমামা এই মেয়েটিকে দেখে নাকি পাগল হয়েছেন, বিয়ে যে কোন উপায়ে হোক হওয়াই চাই।

রাত্রে দাদা ফিরলে দাদাকে বলা হলো সব কথা। দাদা বল্লে—পাঁচ আনা অংশ কেন

আছে যদি জিগ্যেস করে?

—তবে বলবে তোমার বাপ আমার বাবার কাছে টাকা ধার নিয়েছিল—সেই দেনার দায়ে সম্পত্তির অংশ বিক্রী করে যায়।

আমরা রাজী। কিন্তু ভদ্রলোক যদি গাঁয়ের আর কাউকে জিগ্যেস করেন? তবেই তো মিথ্যে কথা ফাঁক হয়ে যাবে; পাঁচুমামা সেকথাও ভেবে এসেছেন। গ্রামের যে ক'জন লোক আমাদের পয়সায় ফুর্তি করেন, যেমন হারু সান্যাল, ওপাড়ার আশু চক্কোত্তি, এ'দের বয়েস আমাদের চেয়ে বেশী—এ'দেরও কথাটা বলে রাখতে হবে। আমরা বল্লে কেউ 'না' বলতে পারবে না। কাল মেয়ের বাপের সামনে তাঁদের হাজির করতে হবে। তাঁরাও আমাদের কথায় সায় দেবেন।

পরদিন সকালে আমাদের দলের লোক যাঁরা, তাঁদের একথা বলা হলো। তাঁরা সকলেই রাজী হলেন, না হয়ে উপায় ছিল না।

দুটোর কিছু আগে মেয়ের বাপ হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে এলেন। ছেলে দেখে পছন্দ করলেন। তারপর ছেলের কি আছে না আছে সে কথা উঠল।

পাঁচুমামা বল্লে, আমাদের জমিজমার সে পাঁচ আনার মালিক। আমরা তাতে সায় দিলাম। হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে নিতান্ত সরল, গ্রাম্য লোক এবং ভাবে মনে হলো নিতান্ত গরীব। জমিজমা সংক্রান্ত ব্যাপারের কিছু বোঝেন না। কেবল একবার জিগ্যেস করলেন—আপনারা তো ভাগ্নে, ভাগ্নের সম্পত্তিতে আপনাদের মামার অংশ কি করে এল?

এর উত্তরে বাক্‌পটু পাঁচুমামা একটি যে মিথ্যা কথা বানিয়ে বল্লে, আমরা পর্যন্ত অবাক হয়ে গেলাম—আমাদেরই মনে হলো, পাঁচুমামা যা বলছে তাই বুঝি সত্যি। কবে আমার বাবা পাঁচুর বাবার কাছে টাকা ধার করেছিলেন, সুদে আসলে তা কত টাকা দাঁড়ায়, তারই বদলে আমার বাবা পাঁচুর বাবাকে পাঁচ আনা সম্পত্তির উপস্বত্ব দিয়ে যান।

যে কোন বিষয়ী বুদ্ধিমান লোক হলে এ উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হতো, কিন্তু হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যের মনে কোন সন্দেহ জাগল না। আমাদের এখানে আহারাদি করে বৈকালের দিকে বাঁড়ুজ্যে মশায় চলে গেলেন। যাবার আগে পাত্র আশীর্বাদের দিনস্থির করেই গেলেন।

উভয় পক্ষের আশীর্বাদের পরে বিবাহের দিন স্থির হলো। নির্দিষ্ট দিনে আমরা সবাই বরযাত্রী গেলাম। বলা বাহুল্য, পাঁচুমামার চালচুলো পর্যন্ত ছিল না—জমিজমা থাকা তো দূরের কথা—সুতরাং আমাদের বাড়ী থেকেই বর বিয়ে করতে রওনা হলো এবং কথা হলো যে বউ নিয়ে আবার পাঁচুমামা আমাদের বাড়ীতে ফিরে আসবে।

কনের বাপের বাড়ী একখানা মাত্র খড়ের ঘর, তারই দাওয়ায় সম্প্রদানের আসর, কারণ বর্ষাকাল, বৃষ্টি যখন তখন আসতে পারে। বরযাত্রী থাকবার বন্দোবস্ত হয়েছিল কিছু দূরে এক প্রতিবেশীর চণ্ডীমণ্ডপে।

কন্যাপক্ষের নিমন্ত্রিতের সংখ্যা খুবই কম, সবসুদ্ধ জন পনেরো। বাড়ীর ভিতরের উঠানে সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে, তারই তলায় আমরা বসে গেলাম। লগ্ন ছিল বেশী রাত্রে। আমাদের খাওয়া-দাওয়া তার আগেই শেষ করে দেওয়ানো হলো।

হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যের অবস্থা কত খারাপ তা বোঝা গেল একটু পরেই। তিনি নগদ বর-পণ স্বরূপ একুশটি মাত্র টাকা দিতে চেয়েছিলেন, এখন বিবাহ সভায় দেখা গেল তিনি মাত্র এগারোটি টাকা থালার উপর সাজিয়ে রেখেছেন। বরকর্তা ছিলেন আমাদের গ্রামের দাশু চক্রবর্তী, প্রবীণ লোক বলে তাঁকেই আমরা সঙ্গে নিয়েছি-কর্তা সাজিয়ে নইলে পাঁচুমামার তরফ থেকে বরকর্তা হবার কোন মানুষ নেই তো!

দাশু চক্রবর্তী আমাদের উপদেশ মত বল্লেন—একুশ টাকার কথা ছিল, এগারো টাকা

কেন? বাকী টাকা না দিলে বর সভাস্থ করবার অনুমতি দেব না।

হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে হাত জোড় করে বল্লেন—আর যোগাড় করতে পারিনি—ওই নিয়ে আমায় মাপ করতে হচ্ছে বেহাই মশায়। আমার অবস্থার কথা আপনাকে আর কি বলব, ঘরের চালে দেবার জন্যে খড় কিনে রেখেছিলাম—সেই খড় বেচে ফেলে দিয়ে তবে ওই এগারো টাকা যোগাড় করেছি। সামনে বর্ষা আসছে, ঘরের মধ্যে এসে দেখুন চাল ফুটো—আলো আসছে। ঘর সারাবার আর কোন সঞ্চয় নেই। আর টাকা হলেও এই জষ্টি মাসে খড় পাব কোথায়?

এর পরে আমরা তর্ক চালাতাম, ছাড়তাম না। তোমার চালে খড় নেই তা আমাদের কিরে বাপু? মেয়ের বিয়ে দিতে এসেছ, আগে থেকে তোড়জোড় করনি কেন? রইল তোমার বিয়ে-থাওয়া—আমরা বর সভা থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাব।

এসব কথা বলা চলতো, কিন্তু পাঁচুমামা দেখি ছট্‌ফট্ করছে—তার ইচ্ছে নয় টাকার জন্যে আমরা বিয়ে ভেঙে দিই বা কোন বাধা সৃষ্টি করি। সে আমায় ডেকে কানে কানে বল্লে, কি ছেলেমানুষি হচ্ছে! তার চোখমুখের করুণ ভাব দেখে আমি তো আর হেসে বাঁচিনে। সে কেবল ভাবছে, তার বিয়েটা বুঝি আমরা পাঁচজনে মিলে ভেস্তে দিলাম। যাই হোক, পাঁচুমামার অবস্থা দেখে আমরা আর বেশীদূর ব্যাপার গড়াতে দিলাম না; বর সভাস্থ করা হলো। মেয়েকে যখন আনা হলো, মেয়ের রূপ দেখে আমরা তো অবাক। এমন রূপসী মেয়ের সঙ্গে পাঁচুমামার বিয়ে হচ্ছে তা তো জানতাম না! কি গায়ের রং—কি সুন্দর গড়নপিটন, আর তেমনি মুখশ্রী! অমন রূপের ডালি মেয়ে কালেভদ্রে চোখে পড়ে। তাই পাঁচুমামা ক্ষেপে উঠেছে এই বিয়ের জন্যে—তাই এত জুয়োচুরি, এত আটঘাট বাঁধা, এত দুর্ভাবনা—পাছে এমন মেয়ে হাতছাড়া হয়ে যায়!

মনে মনে ভাবলাম—পাঁচুমামার অদৃষ্টটা দেখছি বেজায় ভালো। নইলে এমন মেয়ে ওর জোটে! ওর চাল নেই, চুলো নেই, তিন কুলে কেউ নেই—অজমূর্খ, গাঁজা খায়, নেশাভাঙ করে, কোন্ বদ্‌মাইশিটা ওর বাকী আছে জিগ্যেস করি। আমার দাদাকে আর আমাকে তো ও-ই নষ্ট করেছে! তার ওপর পাঁচুমামা ঘোর জুয়াচোর আর ঘোর মিথ্যা-বাদী। লোককে ঠকাতে এমন ওস্তাদ আর দুটি নেই। এই বিয়েই তো করছে জুয়োচুরি করে। আমাদের বিষয়ে ওর পাঁচ আনা অংশ আছে না ছাই আছে। সত্যি কথা জানলে বিয়ে দিত মেয়ের বাপ? বিশেষ করে যখন এমন সুন্দরী মেয়ে!

যাক্, সে সব কথায় দরকার কি আমাদের। বিয়ে-থাওয়া মিটে গেল, বরকনে আমাদের বাড়ী এসে উঠল। বৌভাত কিন্তু আমাদের বাড়ীতে হবে না একথা ছিল আগে থেকেই। কারণ আমাদের এখানে বৌভাত করতে গেলে আমাদের নামডাকের উপযুক্ত জাঁকজমকের সঙ্গে বৌভাত করতে হয়—নইলে আমাদের নিন্দে হবে। সে খরচ দেয় কে, কাজেই ঠাকুরমা বলেছিলেন—বৌ এখানে তুলে তারপর তুমি পৈতৃক ভিটেতে নিয়ে যেও। সেখানে কাজকর্ম ক'রো গিয়ে। এখানে ওসব হবে না।

পাঁচুমামা বৌ নিয়ে নিজের বাড়ী চলে গেল।

আমার মা ছিলেন বড় খাঁটি লোক। তিনি জানতেন না যে পাঁচুমামা বিয়ের আগে কি জুয়াচুরির আশ্রয় নিয়েছিল, আমাদের বিষয়ে তার পাঁচ আনা অংশ থাকা নিয়ে।

মা বল্লেন—পাঁচুর বৌটি যেন হয়েছে দুর্গাপ্রতিমা,—কিন্তু মেয়েটার অদৃষ্ট ভাল নয়। আমার জ্ঞাতি ভাই হলেও আমি বলছি—ওরকম পাত্রে অমন রূপের ডালি মেয়ে কি দেখে যে বুড়ো দিল, সে-ই জানে। ওই বাঁদরের গলায় ওই মুক্তোর মালা!

মা জানতেন না এর মধ্যে আসল কথাটা কি! পাত্রীর বাবার কোন দোষ ছিল না, যত সব জুয়োচোরের পাল্লায় পড়ে সরল বৃদ্ধ তাঁর সুন্দরী মেয়েটিকে হাত-পা বেঁধে

জলে ফেলে দিয়েছেন। সে জল যে কত গভীর জল, প্রথম থেকেই তা বুঝতে নববধূ বা তার বাপ, কারও বাকী রইল না। পাঁচুমামা বৌ নিয়ে পৈতৃক বাড়ী বন্দিপুরে চলে গেল বটে—কিন্তু বৌভাত হলো না সেখানে। পয়সা কোথায় পাঁচুমামার যে বৌভাত হবে?

বন্দিপুর বড় কখনো যেতাম না—এখান থেকে পাঁচুমামা চলে যাওয়ার পরে আমার সঙ্গে আর অনেক দিন ওদের দেখা হল না—বিয়ে করার পরে এখানে আসাটা যেন পাঁচু-মামার কমে গেল। দাদা মাঝে মাঝে যেত বন্দিপুরে—এসে গল্প করত, পাঁচুমামার সংসার অতি কষ্টে চলছে। নতুন বৌয়ের গায়ে এক আধখানা গহনা যা তার বাবা দিয়েছিলেন, এরই মধ্যে পাঁচুমামা বেচে ফেলেছে। বৌটি কিন্তু খুব ভালো, সে ইচ্ছে করে গহনা খুলে দিয়েছে—ইত্যাদি।

বছর তিন-চার কাটল। তারপর একদিন খবর এল পাঁচুমামা মারা গিয়েছে। আগে থেকে নেশা-ভাঙ্ খায়, লিভার ছিল খারাপ, নেফ্রাইটিস্ হয়ে মারা পড়েছে, চিকিৎসাপত্র বিশেষ কিছু হয়নি।

দিন পনেরো পরে একদিন সকালে আমি বাইরের উঠানে একগাছা ছিপ চাঁচতে বসেছি —দাদা বাড়ী নেই, কোথায় বেরিয়েছে—ঠাকুরমা নদীর ঘাটে নাইতে গিয়েছেন—এমন সময় আমাদের বাড়ীর সামনে একখানা গরুর গাড়ী এসে দাঁড়াল।

গাড়ী থেকে নামলেন হৃষীকেশ বাঁড়ুজ্যে এবং তাঁর বিধবা মেয়ে।

আমি ছুটে কাছে এলুম—পাঁচুমামার বিধবা স্ত্রীকে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলুম, বাঁড়ুয্যে মশায়কেও করলুম। রূপসী বটে এই বিধবা মেয়েটি। মেয়ে না অগ্নিশিখা! বিয়ের সময়েও তো এতটা রূপ দেখিনি মামীমার! আমি মামীমাকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে মার কাছে রেখে হৃষীকেশ বাঁড়ুজ্যের কাছে এসে বসলাম।

তিনি বল্লেন—যা হবার তো হয়ে গিয়েছে, তার আর চারা নেই। মেয়েটার এই সবে উনিশ বছর বয়েস—ওর মুখের দিকে তো চাইতে পারা যায় না। এখন এমন অবস্থা যে দিন চলে না, পাঁচু একটি পয়সা রেখে যায়নি যে মেয়েটা একদিন সেখানে হাঁড়ি চড়িয়ে খায়। ধার দেনা করে কোন রকমে তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধ সেরে শুদ্ধ করিয়েছি দাদা। ভাবলাম, আগে তো মেয়েটাকে শুদ্ধ করি, তারপর পাঁচুর বিষয়ের যে অংশ আছে এখানে, তা থেকে দেনা শোধের কথা ভাবা যাবে পরে। তাই আজ এলাম মেয়েটাকে নিয়ে। ওরও তো ঘোর দুরবস্থা। বন্দিপুরে একবেলা খায় এমন অবস্থা নেই। পরনে কাপড় ছিল না, দেনা করে একখানা সরুপাড় কাপড় কিনে দিয়েছিলাম শ্রাদ্ধের পরে, তাই পরে এসেছে। আমার তো অবস্থা সবই জানো—এখন দুই মেয়ের বিয়ে দিতে বাকী, এক পাল কুপুষ্যি—তাদেরই খেতে দিতে পারিনে, তা আবার বিধবা মেয়ে নিয়ে গিয়ে রাখি বা কোথায়, খেতে বা দিই কি? এখন বিষয়ের পাঁচুর যা অংশ এখানে আছে—তা থেকে মেয়েটার একটা হিল্লে তো হোক। দেনাটা শেষ করে দিয়ে না হয় তার উপস্বত্ব থেকে এখানেই একখানা খড়ের ঘর তুলে দিই ওকে। ও তো মেয়েমানুষ, কিছু বোঝে না—আমি সঙ্গে করে আনলাম। মেয়েও বল্লে—বাবা, চলো সেখানে—তুমি দাঁড়িয়ে থেকে আমার একটা ব্যবস্থা করে রেখে এসো। আর তাঁরাও ভাল লোক—তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিষয়ের অংশের যা আয় দাঁড়ায়—তা থেকে আমার একটা বিলিব্যবস্থা—আর বন্দিপুরে থেকেই বা কি হবে, সেখানে তো এক ভাঙ্গা খড়ের ঘর ছাড়া আর কিছুই নেই—যখন বিষয় এখানে, সম্পত্তি এখানে, তখন এখানেই যা হয় একটা ঘরদোর বেঁধে—

আমি এই লম্বা বক্তৃতায় বাধা দিয়ে একটু আশ্চর্য হবার সুরে বল্লুম, কিসের বিষয়? কিসের অংশের কথা বলছেন?

হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে বল্লেন—ওই যে পাঁচুর যে অংশ আছে এখানকার বিষয়ে, তা তো ধরো এখন আমার মেয়েরই অর্শেছে। তোমাদের এত বড় বিষয়ের পাঁচ আনা অংশ কি কম? ওর এক বেলা একমুঠো আলোচালের ভাত আর বছরে চারখানা কাপড় তা থেকে হেসে খেলে চলে যাবে—

আমি বিনীত শান্ত হাসিমুখে ভদ্রতার সুরে বল্লাম—আপনি ভুল করেছেন বাঁড়ুয্যে মশায়, এখানকার বিষয়ে পাঁচুমামার কোন অংশ নেই।

—অ্যাঁ, সে কি কথা?

হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে প্রথমটা তো হতভম্ব হয়ে গেলেন, পরক্ষণেই—কি ভেবে সামলে নিয়ে চিৎকারের সুরে বল্লেন—অংশ নেই কেমন কথা? বিয়ের আগে তো তোমরাই বলেছিলে পাঁচ আনা অংশ আছে—বলো নি? আর এখন বলছ নেই। আমার মেয়েকে ছেলেমানুষ পেয়ে এখন ফাঁকি দেওয়ার মতলব? বরাবর শুনে আসছি অংশ আছে. আর এখন অংশ নেই বল্লেই হলো?

আমারও রাগ চড়ে গেল মাথায়। আমি বল্লুম—আপনি মিছে চেঁচামেচি করেন কেন? আপনি বিষয় সম্পত্তির কিছুই বোঝেন না তাই ওকথা বলছেন। এ তো শোনাশুনির কথা নয়। দলিল দস্তাবেজের কথা, পড়চা কোবালার কথা। বিষয় সম্পত্তি গাছের ফল নয় যে—যে কুড়িয়ে পায় সে-ই খায়। আমার বাবা যদু চক্কত্তির নামে সাত-খানা গাঁয়ের প্রজা কাঁপত—তিনি কি দুঃখে তেওটা বন্দিপুরের পাঁচু রায়ের বাবার কাছে বিষয়ের পাঁচ আনা বেচতে যাবেন? ও সব ভুলে যান। যা শুনেছেন, ভুল শুনেছেন। বিশ্বাস না হয় আমার কথা. রেজিস্ট্রি আপিসে দুটাকা ফি জমা দিয়ে খুঁজে দেখুন গিয়ে সেখানে এমন কোন দলিল আছে কিনা। আমরা দলিল গোপন করতে পারি, সেখানে তো গোপন থাকবে না?

চেঁচামেচি শুনে পাড়ার দু-পাঁচজন জড় হলো। তারাও হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যের সরলতা দেখে কোনক্রমে হাসি চেপে রইল। যারা সেবার সাক্ষী দিতে এসেছিল যে পাঁচুমামার বিষয়ের অংশ আছে, তারাই বলে গেল পাঁচুর এখানকার বিষয়ের অংশ আছে এমন কথা কস্মিন্‌কালে তারা শোনেও নি।

সব শুনে হৃষীকেশের বিশ্বাস হলো শেষ পর্যন্ত যে এদের কথাই সত্যি।

তিনি তো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন—তারপরেই হঠাৎ কোথাও কিছু নেই. ডুক্‌রে মেয়েমানুষের মত কেঁদে উঠলেন—আমি মেয়েটার সর্বনাশ করেছি নিজের হাতে —তখন কি জানি এমন জুয়োচুরি আমার সঙ্গে সবাই করবে—আমার অমন সোনার পিরতিমে মেয়েটা—আমায় ভালমানুষ পেয়ে—

ভাল হাঙ্গামাতেই পড়া গেল দেখছি সকালবেলা!

বুড়োর কান্না শুনে পাড়ার লোক জড় তো হলোই, বাড়ীর মধ্যে থেকে মা, ঠাকুরমা ছুটে এলেন. এমন কি পাঁচুমামার স্ত্রী পর্যন্ত সেই সঙ্গে ছুটে এলেন দেখতে যে তাঁর বাবাকে বুঝি আমি মারধর করেছি।

সে এক কান্ড আর কি!...

ঠাকুরমা তো বুড়োকে অনেক অনুরোধ করে তাঁর কান্না থামিয়ে তাঁকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গেলেন। অনেক কি সব বোঝালেন-সোজালেন। আমায় ডেকে খুব বকুনি দিলেন : আমি নাকি লোকের সঙ্গে কথা কইতে জানি নে।

আমি বল্লাম—এর আর কথা কইতে জানাজানি কি, আমি যা সত্যি কথা তাই বলেছি। তুমিই বলো না কেন, আমাদের বিষয়ে পাঁচুমামার কি পাঁচ আনা অংশ ছিল?

মা শুনে অবাক. তিনি এসব ব্যাপার কিছুই জানতেন না। বল্লেন—সে কি কথা! পাঁচুর এদের বিষয়ে অংশ কেন থাকবে? এ কি রকম কথা. এ তো বুঝতে পারছি নে?

ক্রমে তিনি সব শুনলেন। আমার ও দাদার ওপর খুব রাগ করলেন শুনে। বল্লেন—বেশ, আমার ছেলেরা যখন এ জুয়োচুরির মধ্যে আছে, তখন আমি পাঁচুর বৌয়ের ভরণ-পোষণের ভার নিলুম। মেয়েকে এ বাড়ীতে রেখে চলে যান। আজ থেকে ও আমাদের ঘরের লোক।

হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে বল্লেন—জিগ্যেস করে দেখুন আপনার ছেলেকে? ওই তো দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে। বিয়ের আগে পাত্র আশীর্বাদের দিন একথা বলেছিল কিনা! আমি মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম আপনাদের দেখে। আমি তো পাঁচুকে দেখে দিই নি। ভাবলাম আপনাদের আত্মীয়, আপনাদের বিষয়ের অংশীদার—তাই আমি সম্বন্ধ করি। তখন কি করে জানব এর মধ্যে এত জুয়োচুরি!

আমি বল্লাম—এ কথা আপনি নিতান্ত ছেলেমানুষের মত বলছেন। যদি কেউ বলে মণীন্দ্র নন্দীর জমিদারীতে আমার অংশ আছে—অমনি তার অংশ হয়ে যাবে?

ঠাকুরমা আমায় আবার ধমক দিয়ে চুপ করালেন। হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যেকে স্নান করতে পাঠালেন, তারপর খাইয়ে-দাইয়ে তাঁকে সুস্থ করলেন। যাবার সময়ে হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে ঠাকরমায়ের হাতে ধরে বল্লেন—আমার মেয়েকে আপনি রেখে দিন। আমার সংসারে একপাল পুষ্যি, খেতে দিতে পারি নে। আপনাদের হাত ঝাড়লে পর্বত, আমার মেয়েকে একবেলা একমুঠো আলোচালের ভাত—

মা ও ঠাকুরমা বল্লেন—তার আর কি, বৌমা থাকুন এইখানেই। পাঁচুর বৌ আমাদের তো আর পর নয়, কপালই না হয় পুড়েছে সকাল সকাল।

সেই থেকে পাঁচুমামার স্ত্রী আমাদের সংসারে রয়ে গেলেন। প্রথমে ছিলেন বেশ সুখেই, যতদিন মা ঠাকুরমা বেঁচেছিলেন। তারপর তাঁরা একে একে গেলেন স্বর্গে। দাদার বিয়ে আগেই হয়েছিল, আমারও বিয়ে হলো। হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে ওদিকে মারা গেলেন। পাঁচু-মামার স্ত্রীরও আর বাপের বাড়ী যাবার জায়গা রইল না।

নতুন বৌয়ের দল নিজের সুবিধামত সংসার সাজিয়ে নিয়েছিল। পাঁচুমামার স্ত্রীর এ-সংসারে থাকাটা তারা গোড়া থেকেই অনধিকার-প্রবেশ বলে ধরেছিল, এইবার সামান্য পান থেকে চুন খসলেই পাঁচুমামার স্ত্রীকে অপমান করা শুরু করলে। এর আর একটা কারণ ছিল। পাঁচুমামার স্ত্রী ছিলেন অসামান্য রূপবতী বিধবা মানুষ, একবেলা খেতেন, একখানা নরুন পাড় কাপড় পরতেন—তাতেই তাঁর রূপ ধরতো না। বয়সের সঙ্গে সে রূপ ম্লান হওয়া তো দূরের কথা, দিন দিন বাড়তেই লাগল।

নতন বৌয়েরা দেখতে অমন সুন্দরী নয় কেউ-ই। তাদের মনে পাঁচুমামার স্ত্রীকে কেন্দ্র করে নানা হিংসে, ঘোর সন্দেহ এসে জুটতে লাগল।

পাঁচুমামার স্ত্রী তো এ বাড়ীতে থাকতেন বিনি মাইনের রাঁধুনী ঝি চাকরাণীর মত। কিন্ত তাঁর ওপর অত্যাচার অবিচার তাতেও কম ছিল না।

আমার সত্যিই কষ্ট হতো পাঁচুমামার স্ত্রীর জন্যে। যে সহানুভূতি পাঁচুমামার ওপর কখনও হয় নি, পাঁচুমামার শ্বশুরের ওপর হয় নি—তা হয়েছিল এই অসহায় বিধবা নারীর ওপর।

কিন্ত আমার কথা কওয়ার কোন উপায় ছিল না। তা হলেই আমার স্ত্রী সন্দেহ করবেন, কেন আমি পাঁচুমামার স্ত্রীর পক্ষে এত কথা বলছি। আমার পূর্বেকার রেকর্ড খুব ভাল ছিল না সুতরাং স্ত্রী পদে পদে আমায় সন্দেহ করতেন, আমিও যে না বুঝতাম এমন নয়। সুতরাং পারিবারিক শান্তিভঙ্গের ভয়ে মুখ বুজেই থাকতাম।

এত সাবধান থেকেও একবার বড় বিপদে পড়ে গেলাম। সে দিনটা একাদশী। দেখি বেলা এগারটায় সময়ে পাঁচুমামার স্ত্রী এক রাশ বাসন মেজে ডোবা থেকে উঠে আসছেন।

আমি বড় বৌ অর্থাৎ আমার বৌদিদিকে বল্লাম,—বৌদিদি, মামীমাকে আজ বাসন মাজতে দিয়েছে কে? আজ একাদশীর দিনটা, তোমরা একটু দেখো শোন না সংসারের কাজের কি হয় না হয়?

বৌদিদি ঝঙ্কার দিয়ে উঠে বল্লেন—ও সব লোক দেখানো ঢং! কে বললে বাসন মাজতে? অন্যদিন বল্লেও তো কাজ করতে দেখিনে—আর আজ বাসন না মেজে আনলে দরদ কুড়ানো যাবে কি করে? ওসব কি আর বুঝি নে? তা বুঝি।

বৌদিদি কি বোঝেন জানি নে, কিন্তু সেদিন রাত্রে আমার স্ত্রী আমায় বল্লে—ওগো, শোন একটা কথা বলি! কথা রাখবে বলো?

—কি কথা বলো?

—তুমি ওকে বাড়ীতে রাখতে পারবে না।

আমি আশ্চর্য হয়ে বল্লেম—কাকে গো? ভেঙেই বলো না?

—ওই যে তোমাদের মামীমাকে। ওকে এখুনি তাড়াও।

—কেন, মামীমা কি করেছেন?

—সোজা কথা বলি, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি নে। সে তো তোমাদের আপন মামীমা নয়—বিশেষ কোন সম্পর্কও কিছু না। সামান্য পাতানো সম্পর্ক। আর ওই রূপ, আর ওই বয়েস। তোমাকে আমি চিনি—মিছে অশান্তি কেন সৃষ্টি করবে? সরাও ওকে এখান থেকে। আমি গতিক ভাল দেখছি নে।

বুঝলাম, সেই যে দুপুরবেলা পাঁচুমামার স্ত্রীর পক্ষ হয়ে একটা কথা বলেছিলাম বড় বৌয়ের কাছে, তিনিই লাগিয়েছেন সমস্ত কথা ছোট বৌকে। কি বিশ্রী মন এই সব পাড়াগাঁয়ের মেয়েমানুষদের! অস্বীকার করি নে যে আমার রেকর্ড ভাল না, আমিই জানি আমি কি বা আমি কি নই। কিন্তু একজন আশ্রিতা অসহায়া তরুণী বিধবা, যার প্রতি সত্যিই আমার সহানুভূতি ও অনুকম্পা, যাঁকে মামীমা বলে ডাকি—তাঁর সম্বন্ধে এই সব—

আমার মন একমুহূর্তে বিরূপ হয়ে উঠলো সংসারের ওপর, স্ত্রীর ওপর, বৌদিদির ওপর, সমস্ত ব্যাপারটার ওপর, এমন কি পাঁচুমামার স্ত্রীর ওপর।

বল্লাম—বেশ ভালো, আজই যেতে বলছি।

মনে ভাবলাম, এমন করে বলবো যে স্ত্রী পর্যন্ত দুঃখিত ও অপ্রতিভ হয়ে উঠবে।

পরদিন সকালেই পাঁচুমামার স্ত্রীকে ডেকে বললাম—আপনার আর এখানে থাকা হবে না। আপনাকে নিয়ে সংসারে অশান্তি বাধছে, আপনি এখুনি আমাদের বাড়ী থেকে অন্যত্র যান।

বড় বৌ বল্লেন—সে কি কথা! কাল গিয়েছে একাদশী, আজ দ্বাদশীর দিন। না খেয়ে কোথায় যাবেন উনি! কাল সারা দিনরাত নিরম্বু উপোস গিয়েছে। সংসারের অকল্যাণ হবে যে!

মনে মনে ভাবলাম—সেইটেই বোঝ। আর একটা গরীব অসহায় মেয়ের যে কি হবে তা মনেও উঠে না। তোমাদের ভালো করেই কল্যাণ করাচ্ছি।

পাঁচুমামার বৌ কথাটি বল্লেন না। নিজের পুঁটলি গুছিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। আমি জানি তাঁর কোথাও যাবার জায়গা নেই—বাপের বাড়ী এক গাঁজাখোর বেকার ছোটভাই আছে, সেখানে একমুঠো খাওয়াও জুটবে না এক বেলা। কিন্তু সব জেনেও বড় রূঢ় ও কঠিন হয়ে উঠলাম আজ। একাদশীর পরদিন না খেতে দিয়েই তাড়াবো! করাচ্ছি সংসারের কল্যাণ তোমাদের!

সেই সকালেই চা খেয়ে বসে আছি, পাঁচুমামার বৌ দুটি পান সেজে কাঁসার বাটিতে

আমার সামনে রেখে দিয়ে পুঁটলি বগলে করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমি মুখে কিছু বলিনি. কেবল স্টেশন পর্যন্ত সঙ্গে যাবার জন্যে আমাদের মুহুরী বৃদ্ধ গোপাল মিত্রকে পাঠিয়ে দিলাম এবং আপদ চুকে গেল ভেবে আরামের নিঃশ্বাস ফেললাম। পাঁচুমামার বৌয়ের তারপর থেকে আর কোন খবর রাখি নি।

ঠাকুরদা'র গল্প

অনেক দিন আগের কথা।

একালে সে জিনিস শুনলে ভাববে গল্পকথা বুঝি, কিন্তু সেকালে দেশের সামাজিক অবস্থা ছিল অন্যরকম, তখন ওরকম সম্ভব ছিল।

যাক আসল গল্পটা বলিঃ

আমার তখন বয়স কুড়ি-একুশ—একহারা চেহারা, মাথায় বাবরি চুল, গায়ে যথেষ্ট শক্তি রাখি। খেতেও পারি খুব। ভোজসভায় নাম-করা খাইয়ে ছিলেন সেকালের আমার পিতামহ তোমাদের বৃদ্ধপ্রপিতামহ ৺বিষ্ণুরাম রায়, সারসার জমিদারবাড়ীতে দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণে পুরো খাওয়ার পর এক হাঁড়ি রসগোল্লা খেয়ে ধুতি চাদর আদায় করে এনেছিলেন। সকলে বলতো নিমাই বংশের নাম রাখবে। তাঁর ডাকনাম ছিল নিমাই।

আষাঢ় মাসের শেষ, ঘোর বর্ষা সেবার। বাবা তার আগের বছর মারা গিয়েছেন সুতরাং বাইশ বিঘে ব্রহ্মোত্তর আমন ধানের জমিতে ধান রোয়ার ভার পড়লো আমার ঘাড়ে। বড়দাদা কুসঙ্গে মিশে অল্পবয়সে গাঁজা ধরেছিলেন, পাড়াগাঁয়ে যা হয়ে থাকে. গাঁজা খাওয়ার দলে তাঁরই সমবয়সী লোক ছিল অনেক. তারা কুপরামর্শ দিয়ে আমাদের পৈতৃক জমি ফাঁকি দিয়ে মৌরসী নেবার চেষ্টা করলে।

একদিন দাদা এসে বল্লেন—খালপারের জমিটা মৌরসী চাইচে একজন, বেশ মোটা সেলামী! দিবি? আমি দাদার নির্বুদ্ধিতা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আমার চেয়ে বয়সে বড়—অথচ তাঁর বুদ্ধি এরকম। কে এমন সুপরামর্শ দিয়েচে কি জানি। বল্লাম—কত সেলামী দিচ্ছে?

—পনেরো টাকা বিঘে।

—জমিগুলো কিন্তু চিরদিনের মত হাত-ছাড়া হয়ে যাবে!

—তাতে কি? এখন সত্তর আশি টাকা হাতে আসবে—

—আমার ওতে মত নেই দাদা।

এই থেকেই দাদার সঙ্গে আমার মতভেদ হয়ে গেল। তিনি আর আমার সঙ্গে কথা বলেন না, মার সঙ্গে বলেন, তাঁর অংশের জমি তিনি আলাদা করে নেবেন. নিজের জমি যা খুশী করবেন, এতে কার কি বলবার আছে—ইত্যাদি।

আমরা চাষীবাসী গৃহস্থ। ধান ছাড়া অন্য আয় নেই. জমি ছাড়া অন্য সম্পত্তি নেই। আষাঢ় মাস এল, ধান রোয়ার সময়। দাদা কিন্তু জমির দিকে একবারও গেলেন না. এক পয়সা সাহায্যও করলেন না। আমি ভেবে চিন্তে মুস্তফাপুরের কাজী সাহেবদের বাড়ী গিয়ে হাজির হোলাম। মুস্তফাপুরের কাজীরা বেশ অবস্থাপন্ন, তবে বুড়ো কাজী সাহেব শুনেছিলাম খুব রুক্ষ মেজাজের মানুষ—কিন্তু আমার তখন আর কোনো উপায় ছিল না।

কাজী সাহেবের বাড়ী বেশ দোমহলা কোঠা, বাইরে লম্বা বৈঠকখানা। কাজী আবদুর রহমান বসে হুঁকোয় তামাক খাচ্ছিলেন। আমায় দেখে বল্লেন—কোথা থেকে আসা হচ্চে? তারপর আমার পরিচয় পেয়ে বল্লেন—ও, আপনি বিষ্ণুরাম রায়ের নাতি। তা কি মনে

করে ?

—আমায় কিছু টাকা ধার দিতে হবে দয়া করে. বিশেষ দরকার। রোয়ার খরচ নেই কিছু হাতে।

—টাকা হবে না।

—কাজী সাহেব, না দিলে আমার কোনো উপায় নেই। এই তিন ক্রোশ রাস্তা রোদ্দুরে হেঁটে এসেচি, আমার দাদা মানুষ নন, তিনি কিছু দেখাশুনা করলে আজ এই কষ্ট হয় আমার! ধান রোয়া না হ'লে সারা বছর চালাবো কি করে বলুন।

কাজী সাহেব বল্লেন—আপনাকে এখানে আহারাদি করতে হবে। ছেলেমানুষ, এতখানি হেঁটে এসেচেন—এমন সময়. বাড়ী ফিরে যাবেন সে হবে না। আমাদের প্রজা আছে একঘর নাপিত. এই পাশেই বাড়ী তাদের, গোয়ালে রান্নাবান্না করুন, আমি জিনিসপত্তর পাঠিয়ে দিচ্চি। তারাই জলটল তুলে দেবে। নতুন হাঁড়ি কুমোর বাড়ী থেকে আনিয়ে দিচ্চি। আহারাদি করে সুস্থ হোন, ওবেলা কথাবার্তা হবে। স্নান সেরে আসুন দীঘি থেকে।

দিব্যি সরু চালের ভাত, কই মাছের ঝোল, গাওয়া ঘি, টাটকা দুধ, মর্তমান কলা, আখের গুড়ের পাটালি ইত্যাদি দিয়ে পরিতোষপূর্বক ভোজনপর্ব সমাধা হ'ল। কাজী সাহেবের আতিথ্যের ও সৌজন্যের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিতে গেলাম দুপুরের পর। তিনি সে কথায় কান না দিয়ে বল্লেন, কত টাকা হ'লে জমি রোয়া হয়? কত বিঘে জমি? বল্লাম, এগারো।

হিসেব করে টাকা গুনে আমার হাতে দিয়ে বল্লেন—না। যখন জমি ছাড়া ভরসা নেই তখন আমার পরামর্শ শুনুন। লাঙল গোরু কিনুন, পরের লাঙলের ভরসায় চাষ চলে না। হাতিয়ার না থাকলে কি লড়াই হয়?

আমি বল্লাম—টাকা কোথায় পাই বলুন। লাঙল গোরু করতে এখন অন্তত শ'খানেক টাকা দরকার।

—আচ্ছা যেদিন আপনি আজকের টাকা শোধ দিতে আসবেন, সেদিন এ সম্বন্ধে কথাবার্তা বলা যাবে, আজ নয়।

বাড়ী ফিরে আসতেই মা সব শুনে বল্লে—খুব ভদ্দর লোক তো ওরা। আমার দুগাছা বালা আছে, বাঁধা দিয়ে কাজী সাহেবের টাকা দিয়ে আয়।

আমি বল্লাম—বেশ কথা মা।

সেই টাকা ফেরৎ দিতে গিয়ে কাজী সাহেব গোরু কিনবার জন্যে আমায় একশো টাকা ধার দিলেন আবার। আমায় বল্লেন—আজ তেত্রিশ বছর লোককে টাকা আর ধান কর্জ দাদন দিয়ে আসচি, এই আমাদের সাত পুরুষের ব্যবসা! যে মহাজন খাতক চেনে না. সে মহাজন নয়। আপনি টাকা নিয়ে যান. দলিল দিতে হবে না।

এই ভাবে সে আষাঢ় মাসে ধান রোয়া আমিই নিজের চেষ্টায় শেষ করলাম। বাংলা ১২৮২ সাল। তখন সাড়ে তিনটাকায় উৎকৃষ্ট আমন চাল একমণ পাওয়া যায়, পাকি ওজনের গাওয়া ঘি এই গ্রামে বসেই বারো আনা সের কিনেচি। দুধ ষোল সের টাকায়। সে সব এখন বল্লে রূপকথা বলে মনে হবে।

গ্রামে পীতাম্বর ঘোষ বলে একজন প্রজা ছিল আমাদের। গোরু কেনা সম্বন্ধে তার সঙ্গে পরামর্শ করলাম। সে বল্লে—বাবা ঠাকুর. গঙ্গাপারে একটা হাট আছে, সেখানে সস্তায় বলদ পাওয়া যায়। একবার আমি সেখান থেকে গোরু কিনে এনেছিলাম। চলুন সেখানে। আমিও যাবো।

মার সম্মতি নিয়ে পীতাম্বরের সঙ্গে হাঁটাপথে রওনা হলাম। সঙ্গে কাজী সাহেবের

দেওয়া সেই একশো টাকা। গেঁজের মধ্যে কাঁচা টাকা নিয়ে কোমরে বেঁধে নিয়েচি পীতাম্বরের পরামর্শে। তখনকার আমলে রাস্তাঘাটে চোর-ডাকাতের বিশেষ ভয় ছিল, মা পীতাম্বরকে তুলসী গাছ ছুঁইয়ে দিব্যি করিয়ে নিলেন সে যেন আমাকে একা রেখে পথের মধ্যে কোনো দরকারেও কোথাও না যায়।

মা জানতেন না এই যাত্রার কি পরিণাম, কে-ই বা জানতো! আজও ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই এমন একটা ঘটনা একদিন কি করে ঘটেছিল আমার বাইশ বৎসরের জীবনে।

চাঁদুড়ের গঙ্গাতীর আমাদের গ্রাম থেকে সাত ক্রোশ। বেলা দুটোর সময় খেয়ায় গঙ্গা পার হলাম। পীতাম্বর বল্লে, বাবাঠাকুর, এখান থেকে কোশ-চারেক দূরে একখানা গ্রাম আছে, সেখানে আমাদের স্বজাতির বাস আছে অনেক। সন্ধ্যে পর্যন্ত হাঁটতে পারবেন?

তখন আমার জোয়ান বয়েস। বল্লাম, খুব।

পীতাম্বর বল্লে—তবে চলুন বাবা ঠাকুর।

সন্ধ্যার অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক পরে আমরা সে গ্রামে পৌঁছে গেলাম। ষাট বছর আগের সে সব কথা আজও বেশ মনে আছে আমার। আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে পীতাম্বর বাসার সন্ধানে কোথায় চলে গেল, আমি একটা নিমগাছের তলায় দাঁড়িয়েই আছি অন্ধকারে। পীতাম্বর আর ফেরে না। আধঘন্টা পরে দেখি পীতাম্বর এসে ডাকচে, আছেন নাকি বাবাঠাকুর? চলুন—

তারপর একটা খড়ের ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে তুল্লে। মনে হলো সেটা কোনো গৃহস্থের বাইরের চন্ডীমন্ডপ হবে। একপাশে কতকগুলো বিচালি, অন্যদিকে ধানের বস্তা। একটা মাদুর পর্যন্ত পাতা নেই মাটির মেজেতে। তার ওপর অস্পষ্ট অন্ধকার। আলো নেই। বাড়ীর লোকেরা এমন অভদ্র যে একবার খোঁজ পর্যন্ত নিলে না আমাদের।

পীতাম্বরকে বল্লাম—দেশলাই জ্বালি, একবার দেখে নিই সাপ-খোপ কোথাও আছে কিনা। এমন বাড়ীতেও নিয়ে এসেছ তুমি।

—বাবু এ রাঢ় দেশ। বড় খারাপ জায়গা। বিদেশী মানুষকে জায়গা দেয় না। এরা বোধহয় জানেও না যে আমরা বাইরের ঘরে আছি।

কোনো রকমে রাত কাটিয়ে ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়া গেল দুজনে। শাঁকমুড়ি বলে একটা ছোট বাজারে চিঁড়ে দই কিনে আমরা ফলার করলাম—আগের রাত্রে অনাহারে আছি, তার ওপর আমার জোয়ান বয়সের খিদে! আধসের চিঁড়ে আর আধসের দই, পোয়াটাক গুড় ও এক ছড়া কলা এক একজনে চক্ষের নিমেষে উড়িয়ে দিলাম।

পীতাম্বরের মহৎ দোষ ছিল তামাক খেতে বসলে সে হঠাৎ উঠতো না। মুদীর দোকানে আহারান্তে তামাক খেতে বসলো তো বসলোই। এদিকে বেলা পড়ে আসতে আমি একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

মুদীর দোকানে পয়সা মিটিয়ে আমরা আবার পথ হাঁটি। বেলা যখন বেশ গড়িয়ে এসেচে, তখন উপর দিক থেকে খুব মেঘ করে এল। পীতাম্বর বল্লে—বাবাঠাকুর, আগে সিজে-ডুমুর দ' বলে গ্রাম। অনেক বামুনের বাস। কিন্তু জায়গাটাতে যাবো কিনা তাই ভাবচি—

—কেন?

—বিখ্যাত ডাকাতের জায়গা। বামুনরাই ডাকাত। গঙ্গা দিয়ে একসময় বিদেশী মাল বোঝাই নৌকো যাওয়ার উপায় ছিল না। আজকাল তেমনটা নেই—তবুও বাবাঠাকুর বিশ্বেস নেই। সঙ্গে অতগুলো টাকা।

--গ্রামের মধ্যে ঢোকা ভালো বাইরের মাঠে থাকার চেয়ে। মাঠের মধ্যেও ডাকাতি করে নিতে পারে তো? চলো কোনো ব্রাহ্মণের বাড়ী আশ্রয় নিই।

--কিন্তু বাবাঠাকুর, কোন রকমে যেন জানতে দেবেন না যে আমাদের কাছে টাকা আছে। সিজে-ডুমুর দ' জায়গা ভালো না।

সন্ধ্যার আগে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে দু'তিনটি ব্রাহ্মণ-বাড়ী গেলাম—কিন্তু কেউ জায়গা দিল না। আমরা বাইরের রোয়াকে শুয়ে থাকতে চাইলাম—রাত্রে কিছু খাবো না বল্লুম, কিন্তু কেউ আমাদের কথায় কর্ণপাত করলে না।

অবশেষে একটা দেউড়িওয়ালা উঁচু পাঁচিল-তোলা পুরোনো আমলের কোঠাবাড়ীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে ভাবচি, এখন কি করা যায়—একজন বৃদ্ধ হঠাৎ দরজা খুলে বাইরে এলেন। আমায় বল্লেন, কে?

—আজ্ঞে, আমাদের বাড়ী এখানে নয়।

—এখানে কি মনে করে?

—বিদেশী লোক, রাত্রে একটু থাকবার জায়গা খুঁজচি।

—তোমরা?

—আজ্ঞে ব্রাহ্মণ।

—কি ব্রাহ্মণ। উপাধি কি?

—রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, উপাধি রায়।

বৃদ্ধ একবার আমার আপাদমস্তক তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে বল্লে—এসো বাপু। সঙ্গে কেউ আছে? তাকেও ডাকো!

এভাবে আশ্রয় পেয়ে প্রথমটা খুব খুশী হয়ে উঠেছিলাম বটে কিন্তু পরে সদর দেউড়ি পার হয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে সেই পুরানো আমলের বাড়ীর চেহারা দেখে কেমন ভয় ভয় হ'ল। নির্জন বাড়ীটায় কেউ যেন কোথাও নেই—এখানে যদি এরা টাকার জন্যে আমাদের খুন ক'রে পুঁতে রাখে, তবে লাস সনাক্ত করবার মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ভেতরে গিয়ে দুমহল পার হয়ে তৃতীয় মহলে ঢুকে নারীকণ্ঠের স্বর শুনে একটু ভরসা হ'ল। মেয়েদের সামনে খুনটা অন্তত করতে পারবে না। চটাওঠা একটা খুব বড় রোয়াকের একপাশে বর্ষার জলে আগাছা গজিয়ে রীতিমত বন হয়েচে। আমার ভয় হ'ল ওখানে নিশ্চয়ই সাপ লুকিয়ে থাকে। সেই রোয়াকে আমাদের বসবার জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকলো।

পীতাম্বর চাপা গলায় বল্লে—বাবাঠাকুর, এ কি-রকম জায়গা? চলো সরে পড়ি।

আমি ভরসা পেয়েচি মেয়েদের দেখে। বল্লাম—বনেদী গেরস্ত, অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েচে এখন। কোনো ভয় নেই।

একটু পরে বৃদ্ধ ফিরে এসে বল্লে—তোমার সঙ্গের লোকটি কি জাত? গোয়ালা? বেশ। ওকে এই পেছনের পুকুর থেকে এক ঘড়া জল আনতে হবে, তোমাদের হাত পা ধোবার জন্যে। আমার বাড়ীতে লোকের অভাব।

আমি বল্লাম—যাও পীতাম্বর—

পীতাম্বর দেখি আমায় চোখ টিপচে। আমি ধমক দিয়ে বল্লাম—যাও না—বসে কেন?

অগত্যা সে চলে গেল। আমি একা পড়ে গেলাম অতবড় বাড়ীর মধ্যে। পীতাম্বরের সন্দেহের অর্থ বুঝিনি এমন নির্বোধ নই আমি। খুব সতর্ক হয়ে রইলাম—নিজের বশ হাতের মধ্যে কোনো অপরিচিত লোককে আসতে দিচ্চিনে—কাউকে বিশ্বাস নেই এখানে। প্রসিদ্ধ ডাকাতের জায়গা সিজে-ডুমুর দ'।

বৃদ্ধ দেখি আবার আসচে। আমি উঠে দাঁড়ালাম। ওর হাতে লুকোনো সড়কি নেই

তো? উঠে দাঁড়ালে তবুও ছুট দিতে পারবো।

বৃদ্ধ বল্লে—দাঁড়িয়ে কেন, বোসো বোসো। তোমাদের বাড়ী কোথায় বল্লে?

—আজ্ঞে সনাতনপুর, নদে' জেলা।

—বাপের নাম কি?

—ভূষণচন্দ্র রায়।

—কি কর? বয়স কত? ছেলেমানুষ বলে মনে হচ্চে।

বৃদ্ধ একটা আশ্চর্য প্রশ্নও করলে হঠাৎ। বল্লে—গায়ত্রী মন্ত্র বলো তো?

ব্যাপার কি? বৃদ্ধ পাগল-টাগল নয় তো? রাত্তিরটা কাটলে বাঁচি।

কি করি, আবৃত্তি করে গেলাম গায়ত্রী।

একটু পরে জল নিয়ে পীতাম্বর ফিরে এল, আমরা হাত পা ধুয়ে বিশ্রাম করলাম। রাত্রের আহারাদিও শেষ হ'ল। আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে টানা বারান্দার একপাশে একটা ঘরে বৃদ্ধ আমার শোয়ার জায়গা দেখিয়ে দিলে।

বিছানায় সবে শুয়েচি। এমন সময় একটি স্ত্রীলোক আমার ঘরে ঢুকলেন। স্ত্রীলোকটির রং বেশ ফর্সা, বয়স চল্লিশের কম নয়, হাতে মোটা সোনার বালা, পরনে রাঙাপাড় শাড়ী। আমার মায়ের বয়সী। দেখে আমি একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়লাম। উঠে বসবার চেষ্টা করলাম বিছানা থেকে।

তিনি বল্লেন—না না থাক, তুমি শোও। বড্ড কষ্ট করে এসেচ, কিছু খাওয়া তো হ'ল না—কিই বা ঘরে আছে?

এমন সময় আবার বৃদ্ধটি ঘরে ঢুকে এমন একটি কথা বল্লেন, যাতে আমি আবার ভাবলাম বৃদ্ধটির মাথা নিশ্চয়ই খারাপ। তিনি স্ত্রীলোকটির দিকে চেয়ে বল্লেন—কেমন, পছন্দ হয়?

স্ত্রীলোকটি বল্লেন—সে কথা এখন কেন! বাছা ঘুমুক। চলো আমরা যাই এখন।

ওরা চলে গেলে আমি ভাবলাম, পীতাম্বরকে ডাক দেবো নাকি। কি ব্যাপার এদের? নরবলি-টলি দেবে না তো আমায়? পছন্দ কিসের হবে? রাত্রি বোধ হয় কাটলো না।

সকালে পীতাম্বরকে ডাক দিয়ে বল্লাম—চলো সকালেই বেরুনো যাক।

—তা যেমন আপনি বলেন বাবা ঠাকুর। একটা কথা বলবো?

—কি?

—কাল আমি শোবার পরে সেই বুড়ো আমার কাছে গিয়ে অনেক খোঁজ খবর নিলেন। আপনার বাড়ী কোথায়, কে আছে, অবস্থা কেমন, কিসে চলে—সে অনেক কথা। এ জায়গা ভাল নয়, এখুনি এখান থেকে যাওয়া ভালো।

বৃদ্ধ কিন্তু পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, কাল রাত্রে আমাদের খাওয়া-দাওয়া ভালো হয় নি, আজ এখানে থাকতেই হবে। আমার সঙ্গে তাঁর নাকি একটা কথাও আছে।

—কি কথা?

—আহারাদি ক'রে নাও, ওবেলা হবে এখন সে সব—

বৃদ্ধকে যেন বড় ব্যস্ত বলে মনে হ'ল। বৃদ্ধ পিছন ফিরতেই পীতাম্বর আমায় এসে চুপি চুপি বল্লে—বাবা ঠাকুর, বড় বিপদ।

—কি রে?

—এরা ডাকাত। সদর দেউড়ি বন্ধ করে দিয়েচে। টাকার সন্ধান পেয়ে গিয়েচে। বাইরে যেতে দেবে না।

—সত্যি?

—দেখে আসুন নিজের চোখে সদর দেউড়িতে তালা লাগানো।

কথাটি কিন্তু আমার মনে লাগলো না। রাত্রির অন্ধকারে এরা যে কাজ অনায়াসে শেষ করতে পারতো, তার জন্যে দিনমানে দেউড়ি বন্ধ করে গোলমাল বাধাবার চেষ্টা পাবে কেন? পীতাম্বর হাজার হোক গোয়ালার ছেলে, আশি বৎসরে সাবালক হয় না।

রাত্রের সেই স্ত্রীলোকটি একটু পরে এসে বল্লেন—বাবা, কুয়োর জল তুলে দিচ্চি। বেশ করে নেয়ে নাও। কিন্তু এবেলা কিছু খেয়ো না যেন!

আশ্চর্য হয়ে বল্লাম—খাবো না কেন মা?

এ নিশ্চয়ই নরবলি না হয়ে যায় না!

স্ত্রীলোকটি বল্লেন—মা বলে ডেকেচ তো? তা হ'লেই হয়ে গেল। কর্তার কাছে সব শুনো।

বলতে বলতে বৃদ্ধ এসে হাজির। বল্লে—সোজা কথা বলি শোনো। আমার একটি নাতনী আছে, সেটিকে তোমায় বিয়ে করতে হবে। সুন্দরী মেয়ে—তোমাকে এক্ষুনি দেখানো হচ্চে। কোনো অনিষ্ট হবে না তোমার। মেয়ে কানা খোঁড়া নয়, দেখলেই বুঝতে পারবে। তোমার সঙ্গে চমৎকার মানাবে বলেই এ সম্বন্ধ স্থির করেছি।

আমার সামনে বজ্রপাত হলেও বোধহয় তত আশ্চর্য হ'তাম না। বিয়ে করতে হবে, সে কেমন কথা।

বল্লাম—সে কি! তা কেমন করে হয়?

—কেন হবে না? তোমরা আমাদেরই পালটি ঘর। মেয়ে ভালো। তোমার অমতের কারণ কি? গহনাপত্র সবই দেওয়া হবে।

—আজ্ঞে তা হয় না।

বৃদ্ধের মুখচোখের ভাব বদলে গেল। হঠাৎ অত্যন্ত কর্কশ ও রুক্ষস্বরে বলে উঠলো, —তা হয় না? তা হ'তে হবে। আমি কে জানো? আমার নাম ঈশ্বর রায়। আমার নামে সিজে-ডুমুর দ' থেকে মগরার খাল পর্যন্ত লোকে থরহরি কাঁপতো একদিন। বিয়ে না করে এখান থেকে যাবার জো নেই তোমার। দেউড়িতে চাবি দেওয়া, ঘাড়ে ধরে বিয়ে দেওয়াবো, যদি সোজা আঙুলে ঘি না ওঠে। গোঁফদাড়ি ওঠেনি, ছোকরা কার সঙ্গে কি বলচো তোমার খেয়াল নেই?

আমি কাঠের পুতুলের মত বসে রইলাম। বৃদ্ধ সেই স্ত্রীলোকটির দিকে চেয়ে বল্লে—যাও, জগদ্ধাত্রীকে নিয়ে এসো।

স্ত্রীলোকটি ঘরের মধ্যে ঢুকলেন এবং একটু পরে যখন মেয়েকে নিয়ে এলেন হাত ধরে, তখন সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মতই তার রূপ ফুটে উঠলো আমার মূঢ় চোখের সামনে। যেমনি গড়ন, তেমনি লম্বা, তেমনি রং। নামেও জগদ্ধাত্রী, রূপেও জগদ্ধাত্রী ব্যবহারেও তাই।

এর পরে গল্প খুব সংক্ষিপ্ত। এই মেয়েই তোমাদের ঠাকুরমা 'জগদ্ধাত্রী দেবী। পুণ্যবতী, সিঁথের সিঁদুর নিয়ে চলে গিয়েচে আজ কত কাল, তোমাদের বাপ তখন ছ' বছরের।

আর সেই ডাকাতের সর্দার ঈশ্বর রায় ছিলেন আমার দাদাশ্বশুর।

গল্পটি শেষ করে ঠাকুরদা একবার শ্রোতাদের মুখের দিকে চাইলেন, কিন্তু কারুর মুখ দেখে বোঝা গেল না যে তারা কেউ এটা বিশ্বাস করেচে।

তখন তামাকের নলটায় একটি জোরে টান দিয়ে বল্লেন, আগেই তো বলেচি এটা সত্যি বলে তোমরা কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না। কিন্তু জেনো, এটা সত্যি—বুড়ো বয়সে মিথ্যা কথা বলে নাতিদের ঠকিয়ে আমার লাভ কি বলো!

আপিসে পানের আর জর্দার কৌটো দুই-ই ফেলে এসেছেন গোপীকৃষ্ণবাবু।

বৌবাজারের মোড়ে এসে মনে পড়লো। ছাতিটা আজ আবার আনেননি, বৃষ্টি হবে না ধারণা ছিল, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ছাতি না এনে ভুল করেছেন, মেঘ জমে আছে সেণ্ট্রাল এভিনিউর বড় বড় বাড়ীগুলোর মাথায়। পানের কৌটো ফেলা চলে না, টেবিল থেকে কে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। আবার আপিসে ফিরলেন, ইনচার্জ বাবু তখনও কাজ করছেন একমনে, অথচ কেউ নেই ডিপার্টমেণ্টে, খোশামুদে কোথাকার, মরুক খেটে! দেড়শো টাকা মাইনের মত কাজ দেখানো চাই তো সাহেবদের, নইলে যদি তাড়িয়ে দেয়? দিনকাল ভাল না। তাঁদের যে পঞ্চাশটি টাকা সেই পঞ্চাশটি টাকা। কেউ নেবে না, কেউ বাড়তি দেবেও না! এই যুদ্ধের বাজার। চালানো যে কত দায় হয়ে উঠেছে, সে বোঝে যে চালায়। পঞ্চাশটি টাকা মাইনে, এক পয়সা উপরি নেই। ওভারটাইম খাটলে একটাকা দৈনিক পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ওভারটাইম ক'দিন হয় মাসে? আপিস থেকে রেশন দেয় তাই রক্ষে নইলে না খেয়ে মরতে হতো সপরিবারে। খিদে পেয়েছে বড়। মোড়ের ওই দোকানখানায় এবার পানের কৌটো নিতে আসবার সময় দেখে এসেছেন বেশ বড় বড় কচুরী ভাজছে। নিশ্চয় চার পয়সায় একখানা। খেতে ইচ্ছে তো হয়, পয়সায় কুলোয় কই? একটা দোকানে বসে আধ পেয়ালা চা দু পয়সা দিয়ে কিনে খেয়ে একটা বিড়ি ধরিয়েই আপাতত খিদের শান্তি করলেন গোপীকৃষ্ণবাবু।

পাশের ওই লাল বাড়ীটা তখন মেস ছিল, পঞ্চাশের দুই ধন্বন্তরি বোসের লেন। গোপীকৃষ্ণবাবু মনে মনে হিসেব করলেন। তেত্রিশ বছর আগের কথা। বঙ্গবাসী কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়েন উনি তখন। সে-সব দিনের কথা—হায়রে হায়, সেই বিপিন, কানু, বিনোদবাবু, শীল, মতি, ক্যাঙলা, ট্যারা শম্ভু, সুশোভন মিত্তির, কত বন্ধুত্ব, কত গলাগলি, কত ভাবের আদান-প্রদান! কত বড় বড় আশা ছিল মনে, বোম্বেতে গিয়ে চাকরি করবো, দেশের সংগে সম্পর্ক রাখবো না, সাহেব হয়ে যাবো, এমন কি পার্শী মেয়েকে বিয়ে করবো। পার্শী মেয়েকে বিয়ে করবার বড় শখ ছিল তখন, কে জানে কেন। প্রথম যৌবনের নেশায় ইডেন গার্ডেনে দু-চারটি পার্শী তরুণীকে বেড়াতে দেখবার ফলেই বোধ হয়। আর একটা বড় শখ ছিল, বিলেত যাবার। সেটা অবিশ্যি তখনই একটু দুরাশার মতই ছিল, তবুও নিতান্ত দুরাশা ছিল না। সম্মুখে বিস্তৃত জীবন পড়ে আছে। কেন হবে না, হলেও তো হতে পারে। এখন কিন্তু তার আকাশ-কুসুমত্ব যতটা ফুটে বেরিয়েছে তখন ততটা হয়নি।

ট্যারা শম্ভু (শম্ভুনাথ চক্রবর্তী এম. বি.—হোমিও, স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত, বিনামূল্যে সমাগত দরিদ্র রোগীগণের চিকিৎসা করেন) বৌবাজারের মোড়ে একটা ছোট্ট ঘরে ডিসপেন্-সারী ফেঁদে বসে আছেন আজ বহু বৎসর—বিশেষ কিছু হয় বলে মনে হয় না।

গোপীকৃষ্ণবাবু মাঝে মাঝে আপিস ফেরত সেখানে বসে চা খান, চায়ের পয়সা বাঁচে। আজও গেলেন। শম্ভু ডাক্তারের ডাক্তারখানায় রোগীর ভিড় নেই এই একটা সুবিধে। শম্ভু বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছে, গোপীবাবুকে দেখে কাগজ রেখে বললে—এসো, এসো, একটা খবর দেখেছ—জাপানীরা আবার ছ' মাইল—

—আরে ভাই, ওসব রেখে দাও। নিজেরা মরছি নানান তালে, আবার পরের খবর রাখতে গেলে বাঁচি কেমন করে? চা খাওয়া ফিনিশ?

—না, বোসো, চা আনাই।

—কেন, স্টোভ কি হলো?

—পিন পাচ্ছি নে, স্টোভটার কি যে হয়েছে কাল থেকে—চা আনাই। ও মধু—। ডিস্‌পেনসারীর চাকর মধু পাশের দোকান থেকে দু-পেয়ালা চা নিয়ে এল ঘরের কেট্‌লি নিয়ে। দু-পেয়ালা ভর্তি করে কেট্‌লিতে একটু বাড়তি চা রইল, সেটুকু আবার পরে ঢেলে দিলে। চা খেতে খেতে শম্ভু ডাক্তার ও গোপীকৃষ্ণবাবু বিদেশ-ভ্রমণের গল্প করেন—অর্থাৎ ভ্রমণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, করা উচিত বা করলে ভাল হয় সেকথা বলেন। এটা এ'রা দুজনে প্রায়ই করে থাকেন, দুই বন্ধুরই খুব বেড়ানোর শখ কিন্তু সংসার নিয়ে জড়িয়ে পড়েছেন, টাকাপয়সায় কুলোয় না, কোথাও কখনও যাওয়া ঘটে না, বলেই দুখ। শম্ভু ডাক্তার পশ্চিমে গিয়েছে মগরা পর্যন্ত, তাও অনেক কাল আগে, সেখানে ছিল মাসীর বাড়ী। গোপীকৃষ্ণ তার চেয়ে একটু বেশি, বর্ধমান পর্যন্ত। দুই বন্ধুর পশ্চিম-ভ্রমণের এই পর্যন্ত ইতি।

তবে প্রতি বৎসর পুজোর আগে দুজনে বসে বিদেশ-ভ্রমণের প্ল্যান আঁটেন নানারকম—এবার কোথাও যাওয়া যাক—বুঝলে? কত পয়সা তো কতদিকে খরচ হচ্ছে। টাকা চল্লিশ হলে একবার কাশীটা ঘুরে আসা হয়। তখন তর্ক বাধে দুজনে। কাশী না গয়া কিংবা সাঁওতাল পরগণা। অবশেষে সেদিন ব্যাপার মুলতুবী থাকে। পরদিন আবার শুরু হয় আলোচনা—কি বল, তা হলে ভাগলপুরই ঠিক করা যাক্‌। পাহাড় কখনও দেখা হয়নি। ভাগলপুরে কি পাহাড় আছে? ঠিক সংবাদ দুজনের কেউ জানেন না। এমনিভাবে পুজো এসে পড়ে, এই একমাসে বহু নাম উচ্চারিত হয় ভ্রমণ সম্পর্কে—পেশোয়ার, কাশ্মীর থেকে শুরু করে দিল্লী, জয়পুর, বৃন্দাবন, শিলং, এমন কি বীরভূম জেলার নলহাটি পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত কোনও বার কোথাও যাওয়া ঘটে না, শম্ভু ডাক্তারের তিন মাসের দোকানভাড়া বাকি পড়তে বাড়ীওয়ালা নালিশের ভয় দেখায়. গোপীকৃষ্ণবাবুর ছোট ছেলে টাইফয়েডে পড়ে—যায় সব ভেস্তে।

বহু বৎসর ধরেই এমন চলেছে। তবুও এ'রা ছাড়বার বা দমবার পাত্র নন। শ্রাবণ মাসের শেষ থেকে শুরু করে পুজোর সময় পর্যন্ত ভ্রমণের সম্বন্ধে আলোচনা এ'দের কামাই নেই। এতে তো পয়সা খরচ হয় না, অথচ টাইমটেবিল ঘেঁটে পাঁচটা দূরের নাম পড়ে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়।

আজও গোপীকৃষ্ণবাবু চা খেতে খেতে বললেন—আর মাসখানেক বাকি পুজোর! এবার কিন্তু কোথাও যাওয়া নিতান্ত দরকার। ঠিক করে ফেলা যাক্‌ আজই, বুঝলে? টাইমটেবিল আছে তো? টাইমটেবিল তৈরী। যারা কখনও কোথাও বেড়ায় না, তাদের টেবিলে সর্বদা টাইমটেবিল মজুত থাকে। শম্ভু ডাক্তার খাপ থেকে চশমা খুলে টাইম-টেবিলের পাতা ওলটান।

—আচ্ছা, চিত্রকূট জায়গাটা নাকি খুব ভাল! তুমি জানো কিছু?

এক অন্ধ আর এক অন্ধকে পথ দেখায়। গোপীকৃষ্ণবাবু বলেন—হ্যাঁ—তা বেশ ভাল জায়গা।

—ভাড়াটা দেখ হে—এবার ভাই আর অমত করো না। চলো চিত্রকূটই যাওয়া যাক্‌।

গোপীকৃষ্ণবাবু ন্যায্যপক্ষেই বলতে পারতেন, তাঁর মতামতের অভাবেই যে এতকাল ভ্রমণ বন্ধ আছে একথা সত্যি নয়। কিন্তু তিনি কোনও প্রতিবাদ করেন না। চিত্রকূটের ভাড়া বেরুলো টাইমটেবিল খুঁজে। শম্ভু ডাক্তার বললেন—ওর ওপর ধরো আরও কুড়িটে টাকা—খাওয়া-দাওয়া—পান-সিগারেট—যুদ্ধের বাজার, বুঝলে না?

—সে তো বটেই।

—তা হলে এবার আর অমত কোরো না। এখন রেডি হওয়া যাক্‌, কি বলো? পুজো

তো এলো।

দুই বন্ধুতে আরও ঘণ্টা দুই বসে ভ্রমণের নানা পরামর্শ করেন। বাড়ী থেকে খাবার তৈরি করে নেওয়া উচিত। সব জিনিস আক্রা। বেডিং কি কি সঙ্গে নেওয়া যায়? শম্ভু ডাক্তার মুখে মুখে বলতে লেগে গেলেন—ধরো একটা মশারি, বালিশ—

গোপীকৃষ্ণবাবু অধীর ভাবে বললেন—আহা—আহা—মুখে কেন, কাগজে লিখে ফেলো না? কাজ পাকা করা দরকার। মশারি, বালিশ—তারপর? গায়ে দেবার কম্বল—

—কম্বল!

—সুজনি।

একজন লোক ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বললে—এটা কি ডাক্তারখানা?

শম্ভু ডাক্তার হাতের কলম ফেলে ব্যস্ত-সমস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ—ডাক্তারখানা—ডাক্তারখানা—কি দরকার?

লোকটা বললে—হোমিওপ্যাথিক?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—হোমিওপ্যাথিক—ভাল হোমিওপ্যাথিক—কার অসুখ?

—অসুখ কারো না। এমনি জিজ্ঞেস করছি—

সে চলে গেল। শম্ভুবাবু আবার এসে টেবিলে বসে কলম ধরলেন, বিরক্তির সুরে বললেন—মিছিমিছি জ্বালায়! যেমন সব কাণ্ড—হ্যাঁ—তারপর বলো, সুজনি—

রাত দশটার সময় ব্যাপারটি অমীমাংসিত ও মুলতুবী রেখে দুই বন্ধু বাড়ী রওনা হন। কথা হয় আগামীকাল আবার বিকেলে একত্র হয়ে পুনরায় আজকার খেই ধরা হবে। চলবে পরামর্শ। বাড়ী ফিরে গোপীকৃষ্ণবাবু আহারাদি করে শয়ন করেন, কিন্তু উত্তেজনায় ঘুম আসে না। চিত্রকূট কতদূর না জানি! কত পাহাড় জঙ্গল দিয়ে যাওয়া! অনেক দূরের ট্রেন-জার্নি! কত মজা হবে রাস্তায়! ভাল কথা, এক টিন ভাল সিগারেট নিতে হবে সঙ্গে। কত পয়সা তো কত দিকে যাচ্ছে! জীবনের একটা সুখ। বড় বড় পাহাড় দেখা যাবে পথে। পাহাড়ই কখনও দেখা হয়নি। ছুটির আর কতদিন দেরি? গোপীকৃষ্ণবাবু ক্যালেণ্ডার দেখলেন উঠে। ছাব্বিশ দিন বাকি মোটে। টাকার যোগাড় দেখতে হয় এখন থেকেই।

গোপীকৃষ্ণবাবুর স্ত্রীর পিত্রালয় কোলাঘাটের কাছে। তাঁর এক শ্যালক মিলিটারিতে কি চাকরি পেয়ে কানপুরে চলে গিয়েছিল, আজ দুদিন যাবৎ চিঠি এসেছে যে সে শ্যালকটি বাড়ী এসেছে। তার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া দরকার। গোপীকৃষ্ণবাবুর স্ত্রী স্বামীকে তাগাদা দিতে লাগলেন। কবে সেখানে যাওয়া হচ্ছে? এবার পুজোর সময়ে কোলাঘাট নিয়ে চল। কতদিন তো যাওয়া হয়নি। ভাইটার সঙ্গে দেখা হবে। গোপীকৃষ্ণবাবু বিরক্ত হয়ে বল্লেন—হ্যাঁ, যাচ্ছি এখন তোমার সেই অজ গণ্ডমুখ্খু ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে সেই ধপ্‌ধপি জায়গায়—

গোপীকৃষ্ণবাবুর স্ত্রী ঝাঁঝালো সুরে বলে উঠলেন—হোক গণ্ডমুখ্খু, তোমার চেয়ে আর তোমার সেই হোমাপ্যাথি জল-বেচা ডাক্তার বন্ধুর চেয়ে অনেক ভাল। সে তবুও আছে কানপুরে—দেড়শো টাকা রোজগার করছে। তুমি বি-এ পাশ করে ষাট টাকায় ঘষছো, আজ সেই আমার বিয়ে হয়ে পর্যন্ত। বেলুড়ের ওদিক কখনও মাড়ালে না দুজনে। তোমাদের চেয়ে সে অনেক ভাল।

মেয়েমানুষের সঙ্গে তর্ক করে কোনও লাভ নেই। গোপীকৃষ্ণবাবু চুপ করে শুয়ে পড়লেন।

পরদিন আবার আপিস থেকে ফেরবার পথে গেলেন শম্ভু ডাক্তারের ওখানে। চা পানের পর আবার দুজনের নিবিড় পরামর্শ শুরু। কত টাকা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায়, তার

একটা নিট হিসেব করে ফেলতে হবে। শম্ভু ডাক্তার বলেন—আশু সান্ডেল কাল এসেছিল তুমি যাওয়ার পরে। তার মুখে শুনলাম পথে নিমিয়াঘাট বলে একটা স্টেশনে নেমে পরেশনাথ পাহাড়ে ওঠা যায়। চলো না কেন এক ঢিলে দুই পাখী মারা যাক্।

—পরেশনাথ পাহাড়?

—হ্যাঁ। হাইয়েস্ট হিল অন দি বেঙ্গল প্লেন। সেটা দেখা—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—খুব ভাল। তাই যাওয়া যাবে।

—টাকাটার হিসেব ধরো এবার। যাতায়াতে ধরো—রেলভাড়া, খোরাকী—

—টুকিটাকি জিনিসপত্তর কেনা—

—কিনতে গেলে হাতী কেনা যায়—জিনিস কেনা বাদ দ্যাও। শুধু নিট খরচ যেটা—

এইভাবে সেদিনও কেটে গেল। পরদিন আবার পরামর্শ-সভা বসে। এদিন কথা ওঠে কি কি জিনিস সঙ্গে নেওয়া যাবে। মশারি নেওয়া যাবে কি না এ তর্কের সেদিন কোনও মীমাংসা হলো না। শম্ভু ডাক্তার বলেন—যেখানেই যাও, মশা থাক না থাক মশারি সঙ্গে থাকাই ভাল। মশা কামড়ালেই ম্যালেরিয়া হয়, ফাইলেরিয়া হয়, আরও কত কি। মশারি নেওয়াটা এসেনশিয়াল। গোপীবাবুর মতে অতদূর পশ্চিমে পাহাড়ের দেশে মশা-ফশা নেই—এ কি আর বাংলাদেশের খানাডোবাভরা পাড়াগাঁ? মিছিমিছি ভারবোঝা বাড়ানো। ট্রাভেল লাইট। একগাদা বোঁচকা-বুঁচকি ঘাড়ে করে বেড়ানোর কোনও মানে হয় না।

রাত দশটা। দুই বন্ধু সভা ভঙ্গ করে সেদিনের মত যে যার বাড়ী চলে গেলেন।

আবার পরদিন দুজনে মিললেন। আজকার তর্কের বিষয় খাবার জিনিস কি কি সঙ্গে নেওয়া যাবে। বাড়ীতে লুচি-পরোটা করে নেওয়াই ভাল। খাওয়ার জিনিসের আগুন দর। এক টাকার খাবার খেলে পেট ভরে না। কি কি খাবার নেওয়া যায়? লুচি না পরোটা? আলুর তরকারি নেওয়ার দরকার নেই, বড্ড দাম আলুর। কুমড়োর ছোঁকা আর কচুর ঘণ্ট দিব্যি তরকারি।

আরও কয়েক দিন এই ভাবে কাটাবার পরে পুজো নিকটে এসে পড়লো। গোপীকৃষ্ণবাবুর মনে আনন্দ আর ধরে না। স্ত্রীকে বললেন—সব ঠিক যেন থাকে। ছোট মশারিটা সেলাই করে দাও। আর একটা ছোট ঘটী—

দিন সাতেক পরে পুজোর ছুটি হবে। গোপীকৃষ্ণবাবুর ডাক পড়লো একদিন বড়বাবুর ঘরে। বড়বাবু বললেন—একটা কথা বলি। পুজোর বোনাসের লিস্ট হয়েছে, তাতে কিন্তু আপনার নাম নেই।

—আজ্ঞে, কেন?

—আর-বছর আপনারা ক'জন লিফট্ পেয়েছিলেন। এ বছর আবার তাদের বোনাস দিলে অন্য সবার ওপর অবিচার করা হয়। তাই ঠিক হয়েছে—

—স্যার, এ কেমন যুক্তি হলো? সন্তুষ্ট হয়েই তো আপনারা লিফট্ দিয়েছিলেন, এ বছর তবে এমন কি অপরাধ হলো আমাদের—

বাঙালীর আপিস। যা মনিবের রায়, সেই অনুসারে কাজ হবে। মনিব যা ভাল বোঝেন। যুক্তি-টুক্তি এখানে খাটবে না। হলোও তাই। অন্য সকলে দেড় মাসের মাইনে বোনাস পেয়ে গেল, গোপীকৃষ্ণবাবুর অদৃষ্টে জুটলো শুধু মাইনেটি। সেইদিনই গোপীবাবু অগ্রিম কিছু টাকার দরখাস্ত করলেন, মঞ্জুর হোল মাত্র পনেরোটি টাকা। তাও বজায় রাখা গেল না, দেশের বাড়ী থেকে চিঠি এসে হাজির, বন্ধ্যা পিসিমা লিখেছেন—চৌকিদারি ট্যাক্স বাকি পড়েছে অনেক দিনের, এবার না দিলে ঘরবাড়ী ক্রোক হবে। পত্রপাঠ আট টাকা তের আনা ছ' কোয়ার্টারের ট্যাক্স বাবদ যেন পাঠানো হয়। গোপী-

কৃষ্ণবাবু প্রথমে রাগ করেছিলেন, যায় যাকগে ক্লোক হয়ে। ভারি তো ভাঙা পৈতৃক বাড়ী, মশা আর জঙ্গলে ভর্তি। কেন, পিসিমা বাঁশ, আম, কাঁঠালের উপস্বত্ব ভোগ করেছেন, চৌকিদারি ট্যাক্সটা তিনি দিতে পারেন না? আমার ঘাড়ে কেন চাপিয়েছেন? আমি কি সেখানে বাস করি? পাঠাবো না টাকা।

পরে তাঁর স্ত্রী বোঝালেন চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খেয়ে কি লাভ? তাঁরই দুটি ছেলে, বেঁচে থাকলে ও-সম্পত্তি তাদেরই থাকবে। বুড়ী পিসিমা চোখ বুজবেন আজ বাদে কাল, বাড়ীঘর বজায় রাখবার গরজ তাঁর তত থাকবার কথাও নয়।

শম্ভু ডাক্তারের বৈঠকখানায় গোপীকৃষ্ণবাবু ঢুকলেন একটু মন-মরা ভাবে। দেখলেন শম্ভু ডাক্তারের মনের অবস্থাও তেমন সুবিধে নয়। চা এল, ভ্রমণ বিষয়ে কোনোও কথাই ওঠে না, অন্যান্য কথাই চলে। গোপীবাবু সাহসে ভর করে বল্লেন—তারপর যাওয়া সম্বন্ধে কি ঠিক করলে? শম্ভু ডাক্তার বল্লেন—ভাই, এ মাসে যা কিছু পেয়েছিলাম, সব গেল ছেলেমেয়ের কাপড়-চোপড় কিনতে। আগে তো ভাবিনি অত টাকা কাপড়ে খরচ হবে, একখানা করে কাপড় কিনতে তেতাল্লিশ টাকা খরচ হয়ে গেল। আর হাতে টাকা নেই। তবে পাঁচদিন এখনও বাকি, দেখি যদি এর মধ্যে কোনও শক্ত কেস্‌টেস্‌ এসে যায় ভগবানের দয়ায়—

গোপীকৃষ্ণবাবুও নিজের টানাটানির কথা ব্যক্ত করেন। তবে এখনও পাঁচদিন বাকি ঐ যা ভরসা। যদিও এটা মনকে চোখ ঠারা মাত্র, পাঁচ দিনে গোপীকৃষ্ণবাবু কি আর ত্রিশ হাজার টাকা লটারিতে পাবেন, তা কিছু নয়।

শম্ভু ডাক্তার বল্লেন—আচ্ছা, চিত্রকূট যদি না-ও হয়—অতদূর—

—টাইমটেবিলে একটা জায়গা বলছে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম, লুপ লাইনের কাজরা স্টেশন থেকে ছ' মাইল। সিনারি বেশ বলে লিখেছে—

—আজ আমার শালীও বলছিল, গ্র্যান্ডকর্ড লাইনের নিমিয়াঘাট বলে একটা স্টেশন থেকে পরেশনাথ পাহাড় যাওয়া যায়। তাই যাবে? খরচ কম হয়।

আবার রাত দশটা পর্যন্ত আলোচনা। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম, না পরেশনাথ পাহাড়? কোন্‌টা সস্তা? হিসেব করে টাইমটেবিল পড়ে দেখা গেল তাতেও পঁচিশ থেকে ত্রিশ টাকা খরচ পড়বে জন পিছু। তার কম হবে না।—ও একরকম করে যোগাড় হয়ে যাবে এখন, বললেন শম্ভুবাবু।

আশ্চর্যের বিষয়, রোগী এবং রোগ দুই হঠাৎ কলকাতা শহরে বড্ড কমে গেল। সারা-দিনে আগে তবুও দুটো টাকাও হতো এখন পাঁচ আনার নক্স-ভমিকাও বিক্রি হয় না। রোগী দেখা দূরের কথা, ওষুধ বিক্রি পর্যন্ত বন্ধ। তার ওপর শম্ভু ডাক্তারের মামাতো ভাই বিধু এসে হাজির, সঙ্গে তার স্ত্রী। দেশে চলছে না আদৌ, এতবড় ডাক্তার পিস্‌তুতো ভাই থাকতে তারা কি না খেয়ে মরবে?

গোপীকৃষ্ণবাবুর অবস্থাও যে ভাল তা নয়। ইতিমধ্যে একদিন তাঁর ভাইঝি-জামাই দুটো ইলিশ মাছ পাঁচ টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে হাজির। গোপীবাবুর স্ত্রী এসে বললেন—ওগো শুনছো, জামাইয়ের ও-মাছের টাকা দিয়ে দিও যাবার সময়।

গোপীবাবু রেগে উঠে বললেন—কেন? আমি কি বলেছিলাম আমার বাসায় মাছ কিনে না আনলে আমরা সবাই না খেয়ে মরতে বসেছি? পাঁচ টাকা খরচ করে একজোড়া মাছ না আনলে চলছিল না?

—ছিঃ ও-কথা বলতে নেই। জামাই মানুষ, এনে ফেলেছেন যখন তখন সে দাম দিতেই হবে। সবাই মিলে মাছটা তো খাওয়া হয়েছে? জামাই একা খাননি।

—খাননি তাই কি? আমার সংসারে এক পো খয়রা মাছ কিনলে চলে যায় ছ' আনা

দিয়ে। পাঁচ টাকার মাছ কিনে একদিন খেয়ে আমার লাভটা কি হলো বলতে পার?

যতই উল্টো তর্ক করুন, তাঁকে শেষ পর্যন্ত সুবোধের মত মাছের দামটা জামাই বাবাজির হাতে গুঁজে দিতে হলো যখন তিনি যাচ্ছেন। মিটে গেল ব্যাপার। আটটা টাকা বুক করে রাখা ছিল, তার মধ্যে ইলিশ মাছের ঠ্যালায় গেল পাঁচটা টাকা অকারণে বেরিয়ে।

শম্ভু ডাক্তারের ডিস্‌পেন্‌সারিতে বসে দুই বন্ধু কথা বলছেন। এবার কিন্তু ভ্রমণের আলোচনা নয়, কোথাও যাওয়া তাঁদের হবে না দুজনেই বুঝেছেন। বোটানিক্যাল গার্ডেনের বস্তাপচা আটা ময়দার কথা উঠেছে। ভ্রমণের সম্বন্ধে একটা কথাও কেউ বলেননি আজ। কাল ষষ্ঠী।

হঠাৎ গোপীকৃষ্ণবাবু উস্‌খুস্‌ করতে করতে পকেট থেকে একখানা রঙীন কার্ড বের করে বললেন—হ্যাঁ—এই বলছিলাম কি, আমাদের আপিসের বঙ্কু সরকার কাল আপিস বন্ধের দিন এখানা দিয়ে গেল। ওদের গ্রাম লাঙলপোতায় সর্বজনীন দুর্গোৎসব হবে তারই নেমন্তন্ন। রামায়ণ-গান হবে, চণ্ডী হবে দুরাত। যাবে? বেশি দূর নয়, বারাসত স্টেশনে নেমে দু মাইল। চলো, পুজোর ছুটিটা তবুও কলকাতার বাইরে—আর সে বেশ জায়গা, ছেলে-ছোকরাদের দল মিলে রাস্তা করেচে, ঘাট করেচে, জঙ্গল কেটেচে। একটা পুরনো শিবমন্দির আছে নাকি অনেককালের। তাহলে কাল সকাল সাত-টায় শেয়ালদ' থেকে দত্তপুকুর লোক্যাল ছাড়বে—ওতেই চলো যাওয়া যাক্। দেখবার মত জায়গা।

শম্ভু ডাক্তার উৎসাহের সঙ্গে বললেন—বেশ, বেশ, সে বেশ বেড়ানো হবে এখন। চলো তাই, আমি ঠিক সময়ে রেডি হয়ে স্টেশনে হাজির হবো কাল।

পরবর্তী তিনদিন দুই বন্ধুর পরম আনন্দে লাঙলপোতায় কাটে।

সত্যি বেশ জায়গা। অনেক কিছু দেখবার আছে। একটা পুরনো শিবমন্দির। চৌধুরীদের বড় মজা দীঘি। গাঁয়ের ছেলে-ছোকরাদের নিজেদের তৈরী মেটে রাস্তা, শনিবার সোমবারে হাট বসে—বেগুন-কুমড়ো-ঝিঙে রাঙা আলু বিক্রী হয়। রামায়ণ গান হলো নবমীর রাত্রে। পরদিন হলো গ্রামের দলের কেষ্ট যাত্রা। খাওয়া-দাওয়াও কদিন বেশ হোল। বঙ্কু সরকার অতিথিবৎসল লোক।

খুব খুশী গোপীকৃষ্ণবাবু ও শম্ভু ডাক্তার।

দেশ, অগ্রহায়ণ, ১৩৫১

আইনস্টাইন ও ইন্দুবালা

আইনস্টাইন কেন যে দার্জিলিং যাইতে যাইতে রানাঘাট নামিয়াছিলেন বা সেখানে স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল হলে "On......ইত্যাদি ইত্যাদি" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে উৎসুক হইয়াছিলেন—একথা বলিতে পারিব না। আমি ঠিক সেই সময়ে উপস্থিত ছিলাম না। কাজেই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ আমি আপনাদের নিকট সরবরাহ করিতে অপারগ, তবে আমি যেরূপ অপরের নিকট হইতে শুনিয়াছি সেরূপ বলিতে পারি।

আসল কথা, নাৎসী জার্মানী হইতে নির্বাসিত হওয়ার পর হইতে বোধ হয় আইন-স্টাইনের কিছু অর্থাভাব ঘটিয়াছিল, বক্তৃতা দিয়া কিছু অর্থ উপার্জন করার উদ্দেশ্যেই তাঁর ভারতবর্ষে আগমন। বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছিলেনও একথা সকলেই জানেন, আমি নূতন করিয়া তাহা বলিব না।

কৃষ্ণনগর কলেজের তদানীন্তন গণিতের অধ্যাপক রায়বাহাদুর নীলাম্বর চট্টোপাধ্যায় একজন উপযুক্ত লোক ছিলেন। সেনেট হলে আইনস্টাইনের অদ্ভুত বক্তৃতা "On the

Unity & Universality of Forces" শুনিয়া অন্য পাঁচজন চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মত তিনিও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার কলেজে আইনস্টাইনকে আনাইয়া একদিন বক্তৃতা দেওয়াইবার খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রিন্সিপাল আপত্তি উত্থাপন করিলেন।

তিনি বলিলেন—"না রায় বাহাদুর, আমার অন্য কোন আপত্তি নেই, কিন্তু এমন দিনে একজন জার্মান—"

রায় বাহাদুর উত্তেজিত হইয়া বলিলেন (যেমন ধরনের উত্তেজিত হইয়া তিনি উঠিতেন সন্ধ্যায় রামমোহন উকিলের বৈঠকখানায় ভাগবত পাঠের সময়, অন্য কেহ যদি কোন বিরুদ্ধ তর্ক উত্থাপন করিত)—"সে কি মহাশয়! জার্মান কি? জার্মান? আইনস্টাইন জার্মান? ওঁদের মত মহামানবের, ওঁদের মত ঋষি বৈজ্ঞানিকের দেশ আছে? জাতের গণ্ডি আছে? আমি বলি—"

প্রিন্সিপাল বলিলেন—"আমিও বলছি নে যে তা আছে। কিন্তু বর্তমানে যেমন অবস্থা—" দুই প্রবীণ অধ্যাপকে ঘোর তর্ক বাধিয়া গেল।

প্রিন্সিপাল দর্শন শাস্ত্রে পণ্ডিত, তিনি মধ্যযুগের স্কলাস্টিক দর্শনের প্রধান আচার্য জন স্কোটাসের উদাহরণ দেখাইলেন। আয়র্লণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াও নবম শতাব্দীর গোঁড়াদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া ফ্রান্সে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। আয়র্লণ্ডে আর ফিরিতে পারিয়াছিলেন কি? আসল মানুষটাকে কে দেখে! তাঁর মতামতেরই মূল্য দেয় লোকে।

যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত যখন প্রিন্সিপাল রাজি হইলেন না তখন রায় বাহাদুরকে বাধ্য হইয়া নিরস্ত হইতে হইল। ইতিমধ্যে তাঁহার কানে গেল আইনস্টাইন শীঘ্রই দার্জিলিং যাইবেন। ভারতবর্ষে আসিয়া অবধি নানাস্থানে বক্তৃতা দিতে ব্যস্ত থাকার দরুন তিনি হিমালয় দেখিতে পারেন নাই, এইবার এত কাছে আসিয়া আর দার্জিলিং না দেখিয়া ছাড়িতেছেন না।

রায় বাহাদুর ভাবিলেন দার্জিলিঙের পথে রানাঘাটে নামাইয়া লইয়া সেখানে এক সভায় আইনস্টাইনকে দিয়া বক্তৃতা দেওয়াইলে কেমন হয়?

রায় বাহাদুর গ্র্যাণ্ড হোটেলে আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করিলেন।

আইনস্টাইন বলিলেন, "ভারতবর্ষের দর্শনের কথা আমায় কিছু বলুন।"

রায়বাহাদুর প্রমাদ গনিলেন। তিনি গণিতের অধ্যাপক; দর্শন, বিশেষত ভারতীয় দর্শনের কোন খবর রাখেন না, তবুও ভাগ্যে গীতা মাঝে মাঝে পড়া অভ্যাস ছিল; সুতরাং অকূল সমুদ্রে গীতারূপ ভেলা (কোন আধ্যাত্মিক অর্থে নয়) অবলম্বন করিয়া দু-এক কথা বলিবার চেষ্টা করিলেন। 'বাসাংসি জীর্ণানি' ইত্যাদি।

আইনস্টাইন বলিলেন, "ম্যাক্সমূলারের বেদান্তদর্শনের উপর প্রবন্ধ পড়ে এক সময়ে সংস্কৃত শেখবার বড় ইচ্ছে হয়। দর্শনে আমি স্পিনোজার মানসশিষ্য। স্পিনোজার দর্শন গণিতের ফর্মে ক্রমানুসারে সাজানো। স্পিনোজার মন গণিতজ্ঞ স্রষ্টার মন, সেজন্য আমি ওঁর দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। কিন্তু বেদান্ত সম্বন্ধে ম্যাক্সমূলারের প্রবন্ধ পড়ে আমি নতুন এক রাজ্যের সন্ধান পেলাম। ইউক্লিডের মত খাঁটি বস্তুতান্ত্রিক মন স্পিনোজার, সেখানে কূটতর্কও বাঁধা পথে চলে। আমি কিন্তু ভেতরে ভেতরে কল্পনাবিলাসী—।"

রায় বাহাদুর অবাক হইয়া আইনস্টাইনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি!"

আইনস্টাইন মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কেন, আমার কালের সঙ্গে ক্ষেত্রের একত্র মিলনকে আপনি কল্পনার ছাঁচে ঢালাই-করা বিবেচনা করেন না নাকি?"

রায় বাহাদুর আরও অবাক। আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "নতুন ডাইমেনশানের সন্ধানদাতা আপনি, নিউটনের পর নববিশ্বের আবিষ্কারক আপনি—আপনাকে কল্পনা-

বিলাসী বলতে—”

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান যুগের এই শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানীর কবিসুলভ দীর্ঘ কেশ ও স্বপ্নভরা অপূর্ব চোখের দিকে চাহিয়া রায় বাহাদুরের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। কল্পনা প্রখর না হইলে হয়তো বড় বৈজ্ঞানিক হওয়া যায় না, রায় বাহাদুর ভাবিলেন। কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, আইনস্টাইন পাশের ছোট টেবিল হইতে চুরুটের বাক্স আনিয়া রায় বাহাদুরের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। নিজের হাতে একটি মোটা চুরুট বাহির করিয়া ছুরি দিয়া ডগা কাটিয়া রায় বাহাদুরের হাতে দিলেন। রায় বাহাদুরের বাঙালী মন সংকুচিত হইয়া উঠিল। অত বড় বৈজ্ঞানিকের সামনে সিগার ধরাইবেন তিনি, জনৈক হেঁজিপেঁজি অঙ্কের মাস্টার? তাছাড়া সাহেবও তো বটে, সেটাও দেখিতে হইবে তো। সাহেব জাত কাঁচাখেগো দেবতার জাত। রায় বাহাদুর একটা সিগার তুলিয়া বলিলেন—“আপনি?”

—“ধন্যবাদ। আমি ধূমপান করি নে।”

—“ও!”

—“আমি একটা কথা ভাবছি।”

—“কি, বলুন।”

—“রানাঘাটে সভা করলে কেমন লোক হবে আপনার মনে হয়? কেমন জায়গা রানাঘাট?”

—“জায়গা ভালই। লোকও হবে।”

—“কিছু টাকা এখন দরকার। যা ছিল জার্মানিতে রেখে এসেছি। ব্যাঙ্কের টাকা এক মার্কও তুলতে দিলে না, একরকম সর্বস্বান্ত।”

—“আমি রানাঘাটে বিশেষ চেষ্টা করছি, সার।”

—“ওখানে বড় হল পাওয়া যাবে কি?”

—“তেমন নেই। তবে মিউনিসিপ্যাল হল আছে, মন্দ নয়, কাজ চলে যাবে।” রায় বাহাদুর কিছুক্ষণ পরে বিদায় লইতে চাহিলেন, ভাবিলেন এত বড় লোকের সময়ের ওপর অত্যাচার করিবার দরকার নাই।

আইনস্টাইন বলিলেন—“আমার কিছু ছাপা কাগজ ও বিজ্ঞাপন নিয়ে যান। যে বিষয়ে বক্তৃতা হবে, সে আপনাকে পরে জানাব, টিকিটের দাম কত করব?”

—“খুব বেশি নয়—এই ধরুন—”

—“তিন মার্ক—দশ শিলিং?”

—“আজ্ঞে না সার। সর্বনাশ! এ সব গরিব দেশ। দশ শিলিং আজকাল দশ টাকার কাছাকাছি পড়বে। ও-দামে টিকিট কেনবার লোক নেই এদেশে, সার।”

—“পাঁচ শিলিং?”

—“আচ্ছা, তাই করুন। ছাত্রদের জন্য এক শিলিং।”

আইনস্টাইন হাসিয়া বলিলেন, “ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের টিকিট কিনতে হবে না। আমি নিজেও স্কুল-মাস্টার। আমার ওপর তাদের দাবি আছে। বম্বে ও বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতেও তাই হয়েছিল। ছাত্রদের টিকিট কিনতে হবে না। এই নিয়ে যান ছাপা হ্যাণ্ডবিল ও কাগজপত্র—”

রায় বাহাদুর হ্যাণ্ডবিল হাতে পাইয়া পড়িয়া দেখিতে গিয়া বিষন্নমুখে বলিলেন—“এ কি সার? এ যে ফরাসী ভাষায় লেখা!”

—“ফরাসী ভাষায় তো বটেই। প্যারিসে বক্তৃতা দেওয়ার সময় ছাপিয়েছিলাম। কেন, ফরাসী ভাষা বুঝবে না কেউ? আমি তো সেদিন শুনলাম এখানে ইউনিভার্সিটিতে

পড়ানো হয়?"

—"আজ্ঞে না। সে হয়তো এক-আধজন বুঝতে পারে। সেভাবে ফরাসী ভাষা পড়ানো হয় না। এখানে ইংরিজিটাই চলে। কেউ বুঝবে না সার।"

—"তাই তো! আপনি ইংরিজিতে অনুবাদ করে নিয়ে ওখানে কোনও প্রেসে ছাপিয়ে নেবেন দয়া করে?"

—"তা—ইয়ে—তা—আচ্ছা সার।"

রায় বাহাদুর মনে মনে ভাবিলেন—এখান থেকে বালিগঞ্জে গিয়ে বিনোদের শরণাপন্ন হইগে। ছোকরা ভাল ফ্রেঞ্চ জানে। কাঁহাতক আর একজন এত বড় লোকের সামনে 'জ্যানি নে মশাই' বলা যায়!

বিনোদ চৌধুরী তাঁর বড় শালা। পণ্ডিত লোক। অনেক রকম ভাষা তার জানা আছে। সে উৎসাহের সঙ্গে হ্যাণ্ডবিলগুলির বাংলা ও ইংরিজি অনুবাদ করিয়া দিয়া বলিল, —"আমি চাটুয্যে মশায়, রানাঘাট যাব সেদিন। আমার থিওরি অব রিলেটিভিটির সঙ্গে পরিচয় অবিশ্যি লিণ্ডেন বুলটনের পপুলার বই থেকে। তবুও আইনস্টাইনকে আমি এ যুগের ঋষি বলে মানি। সত্যকার দ্রষ্টা ঋষি। সত্যকে যাঁরা আবিষ্কার করেন, তাঁরাই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। লম্বা লম্বা মার্কা ইকোয়েশন বুঝতে না পারি, কষতে না পারি, কিন্তু কে কি দরের সেটুকু—।"

রায় বাহাদুর দেখিলেন চতুর শ্যালকটি তাঁহাকে ঠেস দিয়া কথা বলিতেছে। হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"অর্থাৎ সেই সঙ্গে আমার দরটাও বুঝি ঠিক করে ফেললে বিনোদবাবু? বেশ, বেশ।"

—"রামো! চাটুয্যে মশায়, ছি, ছি, তেমন কথা কি আমি বলি?"

—"বল না?"

—"স্পেস—টাইম—কনটিনিউয়ামের মোহজালে পড়ে কোন্‌টা কখন কি অবস্থায় বলেছি, তা কি সব সময় হলফ নিয়ে বলা যায় চাটুয্যে মশায়? এবেলা এখানে থেকে যাবেন না?"

—"না না, আমার থাকবার জো নেই। অনেক কাজ বাকি। যাতে দুপয়সা হয় ভদ্রলোকের, সে ভার আমার ওপর। দেখি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যানদের একটু ধরাধরি করিগে। ঘুঘু সব। হলটা যদি পাওয়া যায়—"

—"কি বলেন আপনি চাটুয্যে মশায়! আইনস্টাইনের নাম শুনলে হল না দিয়ে কেউ পারবে? আহা, শুনলেও কষ্ট হয়, অত বড় বৈজ্ঞানিককে আজ এ বৃদ্ধ বয়সে পয়সার জন্যে বক্তৃতা করে অর্থ সংগ্রহ করতে হচ্ছে—দি ওয়ার্লড ডাজ নট নো ইট্‌স গ্রেটেস্ট—"

—"তুমি এখনও ছেলেমানুষ বিনোদ। ঐ যা শেষকালে বললে ঐ কথাটাই ঠিক। অনেক ধরাধরি করতে হবে। পাঁচটা চাল্লশের ট্রেনেই যাই।"

ইহার পরের কয়েকদিন রায় বাহাদুর অত্যন্ত ব্যস্ত রহিলেন। রানাঘাট মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, স্কুলের হেডমাস্টার, উকিল, মোক্তার, সরকারী কর্মচারী ও ব্যবসাদারগণের সঙ্গে দেখা করিয়া সব বলিলেন। আশ্চর্যের বিষয় লক্ষ্য করিলেন, সকলেরই যথেষ্ট উৎসাহ, সকলেরই যথেষ্ট আনন্দ। যেন সবাই আকাশের চাঁদ হাতে পাইতে চলিয়াছে।

বৃদ্ধ মোক্তার অভয়বাবু বলিলেন,—"কি নামটি বললেন মশাই সাহেবের? আ—কি? আ—ইন্ স্টাই—ন্? বেশ বেশ। হাঁ, বিখ্যাত নাম। সবাই জানে সবাই চেনে। ওরা হলেন গিয়ে স্বনামধন্য পুরুষ—নাম শোনা আছে বইকি।"

রায় বাহাদুর রাগে ফুলিয়া মনে মনে বলিলেন—তোমাদের মুণ্ডু শোনা আছে, ড্যাম ওল্ড ইডিয়ট! এ তুমি কাপুড়ে মহাজন শ্যামচাঁদ পালকে পেয়েছ? স্বনামধন্য! তিন জন্ম কেটে গেলে যদি এ নাম তোর কানে পেঁছয়। মিথ্যে সাক্ষী শিখিয়ে তো জন্ম খতম করলি, এখন আইনস্টাইনকে বলতে এসেছে স্বনামধন্য পুরুষ! ইডিয়সির একটা সীমা থাকা চাই।

নির্দিষ্ট দিনে রায় বাহাদুর কৃষ্ণনগর কলেজের কয়েকটি ছাত্র সংগে লইয়া সকালের ট্রেনে রানাঘাটে নামিলেন। তাঁর শালা বিনোদ চৌধুরী দুঃখ করিয়া চিঠি লিখিয়াছে, বিশেষ কার্যবশত তাহার আসা সম্ভব হইল না, আইনস্টাইনের বক্তৃতা শোনা কি সকলের ভাগ্যে ঘটে, ইত্যাদি। সেজন্য রায় বাহাদুরের মনে দুঃখ ছিল, ছোকরা সত্যিকার পণ্ডিত লোক, আজকার এমন সভায় বেচারীর আসিবার সুযোগ মিলিল না। ভাগ্যই বটে।

রানাঘাট স্টেশনের বাহিরে আসিয়া সম্মুখের প্রাচীরে নজর পড়িতে রায় বাহাদুর থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। একি ব্যাপার! প্রাচীরের গায়ে লটকানো ঢাউস এক দু-তিন-রঙা বিজ্ঞাপন। তাতে লেখা আছে—

বাণী সিনেমা গৃহে (নীল)
আসিতেছেন! আসিতেছেন!! (কালো)
আসিতেছেন!!! (কালো)
কে?? (কালো)
কবে?? (কালো)
সুপ্রসিদ্ধ চিত্রতারকা ইন্দুবালা দেবী (লাল)
অদ্য রবিবার ২৭শে কার্তিক সন্ধ্যা ৫৷৷০ টায় (নীল)
জনসাধারণকে অভিবাদন করিবেন!! (কালো)
প্রবেশমূল্য ৫, ৩, ২, ও ১ টাকা (কালো)
মহিলাদের ৫ ও ২ টাকা (কালো)
এমন সুযোগ কেহ হেলায় হারাইবেন না। (লাল)

কি সর্বনাশ!

রায় বাহাদুর রুমাল বাহির করিয়া কার্তিক মাসের শেষের দিকের সকালেও কপালের ঘাম মুছিলেন। তাহার পর একবার ভাল করিয়া পড়িলেন তারিখটা। না, আজই। আজ রবিবার ২৭শে কার্তিক।

অন্যমনস্কভাবে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন অন্য একখানা সেই বিজ্ঞাপন। ক্রমে যতই যান, সর্বত্রই সেই তিনরঙা বিজ্ঞাপন। মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান মহাশয়ের বাড়ী পর্যন্ত যাইতে অন্তত ছত্রিশখানা সেই বিজ্ঞাপন আঁটা দেখিলেন বিভিন্ন স্থানে।

ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীগোপালবাবু ফুলবাগানের সামনে ছোট বারান্দায় বসিয়া তেল-ধুতি পরনে তেল মাখিতেছিলেন। রায় বাহাদুরকে দেখিয়া ভাল হইয়া বসিলেন। হাসিয়া বলিলেন—"খুব সৌভাগ্য দেখছি। এত সকালে যে?—নমস্কার!"

—"নমস্কার, নমস্কার! চানের জন্য তৈরী হচ্ছেন! ছুটির দিনে এত সকাল যে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, চানটা সকালেই করি।"

—"বাড়ীতে?"

—"আজ্ঞে না, চূর্ণীতে যাই। ডুব দিয়ে চান না করলে—অভ্যেস সেই ছেলেবেলা থেকেই। বসুন, বসুন। আজ যখন এসেছেন তখন দুপুরে গরীবের বাড়ীতেই দুটো ডাল-ভাত—"

—"সেজন্যে কিছু না। নো ফরম্যালিটি। আমার মাসতুতো ভাই নীরেনের ওখানে না গেলে রাগ করবে। সেবার তো যাওয়াই হোল না।"

—"তাহলে চা চলবে তো?"

—"তাতে আপত্তি নেই সে হবে এখন। আসল যে জন্যে আসা—তা এ এক কি হাঙ্গামা দেখছি? কে ইন্দুবালা দেবী আসছে বাণী সিনেমাতে আজই—"

—"হ্যাঁ, তাই তো দেখছিলাম বটে"

—"দিন বুঝি আজই?"

—"তাই তো—আমিও তাই ভাবছিলাম। ক্ল্যাশ করবে কিনা?"

—"এখন তো আমরা দিন বদলাতে পারি না। সব ঠিকঠাক। আমাদেরও হ্যান্ডবিল বিলি, বিজ্ঞাপন বিলি, সব হয়ে গিয়েছে। আইনস্টাইন আসবেন এই দার্জিলিং মেলে।"

—"আমিও তো ভেবেছি। তাই তো—"

—"তবে আমার কি মনে হয় জানেন? যারা সিনেমাতে ইন্দুবালাকে দেখতে যাবে-তারা সাহেবদের লেকচার শুনতে আসবে না। সাহেবদের সভায় যারা আসবে, তারা ঠিকই আসবে।"

আইনস্টাইনকে 'সাহেব' বলিয়া উল্লেখ করাতে রায় বাহাদুর মনে মনে চটিয়া গেলেন। এমন জায়গাতেও তিনি আনিতে চলিয়াছেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনকে! এ কি পাটকলের ম্যানেজার, না রেলের টি. আই., যে 'সাহেব' 'সাহেব' করিবি? বুঝে-সুঝে কথা বলতে হয় তো!

মুখে বলিলেন,—"হাঁ, তা বটে।"

ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীগোপালবাবু তাঁর অমায়িক আতিথেয়তার জন্যে রানাঘাটে প্রসিদ্ধ। চা আসিল, সঙ্গে এক রেকাবি খাবার আসিল। রায় বাহাদুর চা-পানান্তে আরও নানা স্থানে ঘুরিবেন বলিয়া বাহির হইলেন। অনেকের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে, অনেক কিছু ঠিক করিতে হইবে!

যাইবার সময় বলিলেন—"মিউনিসিপ্যাল হলের চাবিটা—"

শ্রীগোপালবাবু বলিলেন—"আমাদের হলের চাকর রাজনিধিকে এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমার বাসার চাকরও যাবে। ওরা হল খুলে সব ঠিক করবে। সেখানে ফ্রী রীডিং রুম আছে, সকালে আজ ছুটির দিন খবরের কাগজ পড়তে লোকজন আসবে। তাদের মধ্যে যারা ছেলে-ছোকরা তাদের ধরে বেঞ্চি সাজিয়ে নিচ্ছি। কিছু ভাববেন না।"

শ্রীগোপালবাবু স্নান করিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতেই তাঁহার বড় মেয়ে (শ্রীগোপাল-বাবু আজ তিন বৎসর বিপত্নীক, বড় মেয়েটি শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়াছে, সে-ই সংসার দেখাশুনা করে) বলিল,—"বাবা, আমাদের পাঁচখানা টিকিট করে এনে দাও।"

—"কিসের টিকিট?"

—"বা রে, বাণী সিনেমায় ওবেলা ইন্দুবালা আসছে—নাচগান হবে। সবাই যাচ্ছে আমাদের পাড়ার!"

—"কে যাচ্ছে?"

—"সবাই! এই মাত্তর রাণু, অলকা, টেঁপি, যতীন কাকার মেয়ে ঢেঁড়স—এরা এসে-ছিল। ওরা সব বক্স নিচ্ছে একসঙ্গে—বক্স নিলে মেয়েদের আড়াই টাকা করে রিজার্ভ টিকিট দিচ্ছে। আমাদের জন্যে একটা বক্স নাও।"

শ্রীগোপালবাবু বিরক্তির সুরে বলিলেন,—"হ্যাঁ ভারি—আবার একটা বক্স! বড্ড টাকা দেখেছিস আমার। সেই ১৯০৩ সাল থেকে জোয়াল কাঁধে নিয়েছি, সে জোয়াল আর নামল না। কেবল টাকা দাও আর টাকা দাও—"

অপ্রসন্ন মুখে দেরাজ খুলিয়া মেয়ের হাতে একখানা দশ টাকার নোট ও কয়েকটি খুচরা টাকা ফেলিয়া দিলেন।

একটু পরে প্রতিবেশী রাধাচরণ নাগ আসিয়া বৈঠকখানায় উঁকি মারিয়া বলিলেন —"কি হচ্ছে শ্রীগোপালবাবু?"

—"আসুন ডাক্তারবাবু, খবর কি? যাচ্ছেন তো ও বেলা?"

—"হ্যাঁ, তাই জিজ্ঞেস করতে এসেছি। আপনারা যাচ্ছেন তো?"

—"যাব বই কি। রানাঘাটের ভাগ্য অমন কখনও হয়নি। যাওয়া উচিত নিশ্চয়।"

—"আমিও তাই বলছিলাম বাড়ীতে। টাকা-খরচ—ও তো আছেই। কিন্তু এমন সুযোগ—বাড়ীর সবাই ধরেছে, দিলাম দশটা টাকা বের করে। বলি বয়েস তো হোল ছাপ্পান্নর কাছাকাছি, কোন্‌দিন চোখ বুজব, তার আগে—"

—"নিশ্চয়। জীবনে ওসব শোনবার সৌভাগ্য কবার ঘটে? আমাদের রানাঘাটবাসীর বড় সৌভাগ্য যে উনি আজ এখানে আসবেন।"

—"আমিও তাই বলছিলাম বাড়ীতে। বয়েস হয়ে এল, দেখে নিই, শুনে নিই—গেলই না হয় গোটাকতক টাকা।"

—"তা ছাড়া, অত বড় বিখ্যাত একজন—"

—"সে আর বলতে! আজকাল সব জায়গায় দেখুন ইন্দুবালা দেবী, সাবানের বিজ্ঞাপনে ইন্দুবালা, গন্ধতেলের বিজ্ঞাপনে ইন্দুবালা, শাড়ির বিজ্ঞাপনে ইন্দুবালার ছবি! তাকে চোখে দেখবার সৌভাগ্য—বিশেষ করে রানাঘাটের মত এঁদোপড়া জায়গায়—সৌভাগ্য নয়? নিশ্চয় সৌভাগ্য!"

শ্রীগোপালবাবু হাঁ করিয়া নাগ মহাশয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন, প্রথমটা তাঁর মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। ঝাড়া মিনিট-দুই পরে আমতা আমতা করিয়া বলিলেন—"আমি কিন্তু সে কথা বলছি নে। আমি বলছি সায়েবের লেকচারের কথা, মিউনিসিপ্যাল হলে।"

রাধাচরণবাবু ভুরু কুঁচকাইয়া বলিলেন—"কোন্ সায়েব?"

—"কেন, আপনি জানেন না? আইনস্টাইন—মিঃ আইনস্টাইন!"

রাধাচরণবাবু উদাসীন সুরে হঠাৎ মনে পড়িয়া যাওয়ার ভঙ্গিতে বলিলেন,—"ও, সেই জার্মান না ইটালিয়ান সায়েব? হ্যাঁ—শুনেছি, আমার জামাই বলছিল। কি বিষয়ে যেন লেকচার দেবে? তা ওসব আর আমাদের এ বয়সে—লেখাপড়ার বালাই অনেকদিন ঘুচিয়ে দিয়েছি। ওসব করুগগে কলেজের ইস্কুলের ছেলে-ছোকরারা—হ্যাঁঃ!"

শ্রীগোপালবাবু ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে কি বলিতে যাইতেছিলেন, রাধাচরণবাবু পুনরায় বলিলেন,—"তা আপনি কি করবেন শুনি?"

—"আমার বাড়ীর মেয়েরা তো যাচ্ছে সিনেমায়। তবে আমাকে যেতেই হবে সায়েবের বক্তৃতায়। রায় বাহাদুর নীলাম্বরবাবু এসে খুব ধরাধরি করছেন—"

—"কে রায় বাহাদুর? নীলাম্বরবাবুটি কে?"

—"কৃষ্ণনগর কলেজের প্রোফেসার। তাঁরই উদ্যোগে সব হচ্ছে। তিনি এসে বিশেষ—"

রাধাচরণবাবু চোখ মিটকি মারিয়া বলিলেন,—"আরে ভায়া, একটা কথা বলি শোন। একটা দিন চল দেখে আসা যাক! ছবির ইন্দুবালা আর জ্যান্ত ইন্দুবালাতে অনেক ফারাক। ইহজীবনে একটা কাজ হয়ে যাবে। ওসব সায়েব-টায়েব ঢের দেখা হয়েছে। দুবেলা রানাঘাট ইস্টিশানে দাঁড়িয়ে থাক দার্জিলিং মেল শিলং মেলের সময়ে—দেখ না কত সায়েব দেখবে। কিন্তু ভায়া এ সুযোগ—বুঝলে না?"

শ্রীগোপালবাবু অন্যমনস্কভাবে বলিলেন,—"তা—তা—কিন্তু, তবে রায় বাহাদুরকে

কথা দেওয়া হয়েছে কিনা, তিনি কি মনে করবেন—"

রাধাচরণবাবু মুখ বিকৃত করিয়া খিঁচাইবার ভঙ্গিতে বলিলেন,—"হ্যাঁঃ! কথা দেওয়া হয়েছে রায় বাহাদুরকে! ভারি রায় বাহাদুর! এত কি ওবলিগেশন আছে রে বাবা। বলো এখন, বাড়ীর মেয়েরা সব গেল তাই আমায় যেতে হোল। তারা ধরে বসল তা এখন কি করা। বলি কথাটা তো নিতান্ত মিথ্যে কথাও নয়!"

শ্রীগোপালবাবু অন্যমনস্কভাবে বলিলেন—"তা—তা—তা তো বটেই। সে কথা তো—"

রাধাচরণবাবু বলিলেন,—"রায় বাহাদুর এলে বলো এখন তাই। তাঁকেও অনুরোধ কর না বাণী সিনেমায় যেতে।"

—"চললেন?"

—"চলি। ওবেলা আসব ঠিক সময়ে।"

রায় বাহাদুর স্থানীয় জমিদার নীরেন চাটুয্যের বাড়ীতে বসিয়া সভা সম্বন্ধে পরামর্শ ও আয়োজন করিতেছিলেন।

নীরেনবাবু রায় বাহাদুরের মাসতুতো ভাই, স্থানীয় জমিদার ও উকিল। উকিল হিসাবে হয়তো তেমন কিছু নয়, কিন্তু জমিদারির আয় ও পূর্বপুরুষসঞ্চিত অর্থে রানাঘাটের মধ্যে অনেকেই তাঁহার সঙ্গে পারিয়া উঠেন না। শিক্ষিত লোকও বটে।

রায় বাহাদুর গুরুভোজন করিয়া উঠিয়াছেন মধ্যাহ্নে। ধনী মাসতুতো ভাই-এর বাড়ীতে মধ্যাহ্নভোজন রীতিমত গুরুতর। দু-একবার নিদ্রাকর্ষণ হইতেও ছিল, কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে শুইতে পারেন নাই।

নীরেনবাবু বলিলেন,—"আচ্ছা দাদা, বক্তৃতায় মোট কথাটা কি হবে আজকের?"

—"তা ঠিক জানি নে। On the unity of forces—এই বিষয়বস্তু। এ থেকে ধরে নাও।"

—"উনি Space-এর অবস্থা শোচনীয় করে তুলেছেন, কি বলুন?"

—"অর্থাৎ?"

—"Space বলেছেন সীমাবদ্ধ। আগেকার মত অসীম অনন্ত space আর নেই।"

—"তোমার ম্যাথমেটিক্স ছিল এম-এসসি-তে? Geometry of Hyperspaces পড়েছ?"

—"মিক্সড ম্যাথমেটিক্স ছিল। আপনি যা বলছেন, তা আমি জানি।"

—"খুব খুশি হলুম দেখে নীরেন যে শুধু জমিদারি কর না, জগতের বড় বড় বিষয়ে একটুআধটু সন্ধান রাখ। খুব বেশি সন্ধান হয়তো নয়, তবুও the very little that you know is unknown to many."

—"আচ্ছা দাদা, উনি কি আজই চলে যাবেন?"

—"সম্ভব। দার্জিলিং যাবেন বলছিলেন। দার্জিলিঙের পথে এখানে নামবেন। যাতে ওঁর দুপয়সা হয়, সেদিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।"

—"আজ সভার পরে আমার বাড়ীতে আনুন না একবার দাদা? এখানে রাতের জন্যে রাখতেও আমি পারি। আজ দার্জিলিঙের গাড়ী নেই। রাত্রে এখানে থাকুন। কোন অসুবিধা হবে না।"

—"বেশ, বলব এখন।"

—"যাতে থাকেন তাই করুন। কালই খবরের কাগজে একটা রিপোর্ট করিয়ে দেব এখন। ফ্রী প্রেসের আর আনন্দবাজারের রিপোর্টার এখানে আছে।"

রায় বাহাদুর বুঝিলেন তাঁর মাসতুতো ভাইটির দরদ কোথায়। সেসব কথা বলিয়া

কোন লাভ নাই, এখন কোন রকমে কার্যসিদ্ধি হইলেই হয়। কোন রকমে আজ মিটিং চুকিলে বাঁচেন।

বাড়ীর ভিতর হইতে নীরেনবাবুর মেয়ে মীনা আসিয়া বলিল,—"ও জ্যাঠামশায়, বাবাকে বলে আমাদের টিকিটের টাকা দিন।"

নীরেনবাবু ধমক দিয়া বলিলেন,—"যা যা বাড়ীর মধ্যে যা, এখন বিরক্ত করিসনি। ব্যস্ত আছি।"

মীনা আবদারের সুরে বলিল,—"তোমাকে তো বলিনি বাবা, জ্যাঠামশাইকে বলছি।"

রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিসের টিকিট রে মীনু?"

মীনা বলিল,—"আপনি কোথায় থাকেন যে সর্বদা! আমাদের পাশের বাড়ীর সবিতা আপনাদের কলেজে পড়ে, সে বলে আপনি নাকি পথ চলতে চলতে অংক কষেন। সত্যি, হ্যাঁ জ্যাঠামশাই?"

নীরেনবাবু পুনরায় ধমকের সুরে বলিলেন—"আঃ, জ্যাঠা মেয়ে! যা এখান থেকে। জ্বালালে দেখছি। কিসের টিকিট জানেন দাদা, ঐ যে ইন্দুবালা নাকি আজ আসছে আমাদের এখানকার বাণী সিনেমাতে, নাচগান হবে, কি নাকি বক্তৃতাও দেবে, তাই পাড়া-সুদ্ধু ভেঙে পড়েছে দেখবার জন্যে। মেয়েরা তো সকাল থেকে জ্বালালে।"

—"তা দাও না ওদের যেতে। আইনস্টাইনের লেকচারে আর ওরা কি যাবে। তবে দেখে রাখলে একটা বলতে পারত সারাজীবন। কি রে মীনু, কোথায় যাবি?"

—"আমরা জ্যাঠামশাই সিনেমাতেই যাই। 'মিলন' ফিলমে ইন্দুবালাকে দেখে পর্যন্ত বড্ড একটা ইচ্ছে আছে ওকে দেখব। রানাঘাটে অমন লোক আসবে—"

রায় বাহাদুর বাকিটুকু যোগাইয়া বলিলেন,—"স্বপ্নের অগোচর! তাই না মীনু? টিকিটের দাম দিয়ে দাও মেয়েকে, ওহে নীরেন।"

মীনা এবার সাহস পাইয়া বলিল,—"আপনাকে আর বাবাকে যেতে হবে আমাদের নিয়ে। সে শুনছি নে। বাবার মনে মনে ইচ্ছে আছে জ্যাঠামশায়। শুধু আপনার ভয়ে—"

নীরেনবাবু তাড়া দিয়া বলিলেন,—"তবে রে দুষ্ট মেয়ে—"

মীনা হাসিতে হাসিতে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

যাইবার সময় বলিয়া গেল,—"বাবা, তোমাকে যেতেই হবে আমাদের নিয়ে। ছাড়ব না বলে দিচ্ছি।"

দার্জিলিং মেলের সময় হইয়াছে। বেলা সাড়ে পাঁচটা।

রায় বাহাদুর ও কয়েকজন ছাত্র, নীরেনবাবু ও শ্রীগোপালবাবু স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু—একি?

এত ভিড় কিসের? প্ল্যাটফর্মের চারিদিকে এত ছোকরা ছাত্র, লোকজনের ভিড়! সত্যই কি আজ আইনস্টাইনের উপস্থিতিতে এখানকার সকলের টনক নড়িয়াছে? ইহারা সকলেই দার্জিলিং মেলের সময় আসিয়াছে তাঁহাকে নামাইয়া লইতে? অত বড় বৈজ্ঞানিকের অভ্যর্থনা বটে! লোকে লোকারণ্য প্ল্যাটফর্ম। হৈ হৈ কান্ড। রায় বাহাদুর পুলকিত হইলেন। সশব্দে মেলট্রেন আসিয়া প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিল।

একটি সেকেন্ড ক্লাস কামরা হইতে ছোট একটি ব্যাগ হাতে দীর্ঘকেশ আয়তচক্ষু আইনস্টাইন অবতরণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাশের একটি ফার্স্ট ক্লাস কামরা হইতে জনৈক সুন্দরী তরুণী, পরনে দামী ভয়েল শাড়ী, পায়ে জরিদার কাশ্মীরী স্যান্ডাল—হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলাইয়া নামিয়া পড়িলেন। তরুণীর সঙ্গে আরও দুটি তরুণী, দুটিই শ্যামাঙ্গী—দুজন চাকর, তারা লগেজ নামাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

কে একজন বলিয়া উঠিল,—"ঐ যে নেমেছেন! ঐ তো ইন্দুবালা দেবী—"

মুহূর্তমধ্যে প্ল্যাটফর্মসুদ্ধ লোক সেদিকে ভাঙিয়া পড়িল। সেই ভীষণ ভিড়ের মধ্যে রায় বাহাদুর অতিকষ্টে আইনস্টাইনকে লইয়া গেটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

আইনস্টাইন অত বুঝিতে পারেন নাই, তিনি ভাবিলেন তাঁহাকেই দেখিবার জন্য এত লোকের ভিড়। রায় বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এরা সবাই কি স্থানীয় ইউনিভারসিটির ছাত্র? এদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবেন না মিঃ মুখার্জি?"

রায় বাহাদুর এই উদার সরলপ্রাণ বিজ্ঞানতপস্বীর ভ্রম ভাঙাইবার চেষ্টা করিলেন না। রানাঘাটে আবার ইউনিভার্সিটি! হায় রে, এ দেশ কোন্ দেশ তা ইনি এখনও বুঝিতে পারেন না। সবাই ইউরোপ নয়।

নীরেনবাবু চাহিয়া-চিন্তিয়া স্থানীয় প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ধনী গোপাল পালেদের পুরোনো ১৯১৭ সনের মডেলের গাড়ীখানি যোগাড় করিয়াছিলেন! তাহাতেই সকলে মিলিয়া চড়িয়া মিউনিসিপ্যাল হলের দিকে অগ্রসর হইলেন। গাড়ীতে উঠিবার সময় দেখা গেল তখনও বহুলোক স্টেশনের গেটের দিকে ছুটিতেছে। একজন কে বলিতেছিল, —"গাড়ী অনেকক্ষণ এসেছে, ঐ দেখ লেগে আছে প্ল্যাটফর্মে। শীগগির ছোট।" ভিড়ের মধ্যে কে উত্তর দিলে,—"এখান দিয়েই তো বেরুবেন. আর ভিড়ের মধ্যে গিয়ে দরকার নেই। বড্ড ভিড়। ও তো চেনা মুখ। দেখলেই চেনা যাবে। কত ছবিতে দেখা আছে। সেদিনও 'মিলন' ফিলমে—"

আইনস্টাইন কৌতুকের সঙ্গে বলিলেন,—"এরাও ছুটছে স্টেশনে বুঝি? ওরা জানে না যাকে দেখতে চলেছে সে তাদের সামনেই গাড়ীতে উঠেছে। বেশ মজা. না? মিঃ মুখার্জি, এখানে ইউনিভার্সিটি কোন্ দিকে?"

সৌভাগ্যক্রমে ভিড়ের মধ্যের একটা লোক আইনস্টাইনের গাড়ীর সামনে আসিয়া চাপা পড়-পড় হওয়াতে হঠাৎ ফুটব্রেক কষার কর্কশ শব্দের ও 'এই এই' 'গেল গেল' রবের মধ্যে তাঁহার প্রশ্নটা চাপা পড়িয়া গেল। স্টেশন ও ভিড় ছাড়াইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইতেই মোড়ের মাথায় শ্রীগোপালবাবু ও নীরেনবাবু নামিয়া গেলেন। রায় বাহাদুর বলিলেন,—"এখুনি আসবেন তো?"

শ্রীগোপালবাবু কি বলিলেন ভাল বোঝা গেল না। নীরেনবাবু বলিলেন. "ওখানে ওদের পৌঁছে দিয়েই আসছি। আর কেউ বাড়ীতে লোক নেই মেয়েদের নিয়ে যেতে। টিকিটে এতগুলো টাকা যখন গিয়েছে—"

ঐ সামনেই মিউনিসিপ্যাল হল। স্টেশনের কাছেই। কিন্তু এ কি? সাড়ে পাঁচটা সময় দেওয়া ছিল। পৌনে ছটা হইয়াছে, কেউ তো আসে নাই। জনপ্রাণী নয়। কেবল মিউনিসিপ্যাল অফিসের কেরানী জীবন ভাদুড়ি একটা ছোট টেবিলে অনেকগুলি টিকিট সাজাইয়া শ্রোতাদের কাছে বিক্রয়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

মোটর হলের সামনে আসিয়া দাঁড়াইতে আইনস্টাইনের হাত ধরিয়া নামাইলেন রায় বাহাদুর। মুখে হাসি ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন,—"হে বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ. সুস্বাগতম্। আমাদের রানাঘাটের মাটিতে আপনার পদার্পণের ইতিহাস সুবর্ণ অক্ষরে অক্ষয় হয়ে বিরাজ করুক—আমরা রানাঘাটবাসীরা আজ ধন্য!"

চকিত ও উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে শূন্যগর্ভ হলের দিকে চাহিয়া দেখিলেন সঙ্গে সঙ্গে। লোক কই? রানাঘাটবাসীদের অন্যান্য প্রতিনিধিবর্গ কোথায়?

আইনস্টাইন বিস্মিত দৃষ্টিতে জনশূন্য হলের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"এখনও আসেনি কেউ? সব স্টেশনে ভিড় করছে। মিঃ মুখার্জি, একটা ব্ল্যাক-বোর্ডের ব্যবস্থা করতে হবে যে। বক্তৃতার সময় ব্ল্যাক-বোর্ডে আঁকবার দরকার হবে।"

আর ব্ল্যাকবোর্ড! রায় বাহাদুর স্থানীয় ব্যক্তি। নাড়ীজ্ঞান আছে এ জায়গার। তিনি শূন্য ও হতাশ দৃষ্টিতে চারিদিক চাহিতে লাগিলেন।

জীবন ভাদুড়ি কাছে আসিয়া চুপি চুপি বলিল,—"মোটে তিন টাকার বিক্রি হয়েছে। তাও টাকা দেয়নি এখন। কি করব বলুন সার? আমাকে কতক্ষণ থাকতে হবে বলুন। আমার আবার বাসার ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাণী সিনেমায় যেতে হবে। কলকাতা থেকে ইন্দুবালা এসেছেন—বাড়ীতে বড্ড ধরেছে সব। পঁয়ত্রিশ টাকা মোটে মাইনে—তা বলি, থাক গে, কণ্ট তো আছেই। ওঁদের মত লোকে তো রোজ কলকাতা থেকে আসবেন না। যাক, পাঁচ টাকা খরচ হলে আর কি করছি বলুন। আমায় একটু ছুটি দিতে হবে সার। এ সায়েব কে? এ সায়েবের লেকচারে আজ লোক হবে না— কে আজ এখানে আসবে সার!"

জীবন ভাদুড়ি ক্যাশ বুঝাইয়া দিয়া খসিয়া পড়িল। হলের মধ্যে দেখা গেল চেয়ার বেঞ্চির জনহীন অরণ্যে মাত্র দুটি প্রাণী—আইনস্টাইন ও রায় বাহাদুর।

আইনস্টাইন ব্যাগ খুলিয়া কি জিনিসপত্র টেবিলের উপর সাজাইতে ব্যস্ত ছিলেন, সেগুলি তাঁহার বক্তৃতার সময় প্রয়োজন হইবে—সেই সুযোগে রায় বাহাদুর একবার বাহিরে গিয়া রাস্তার এদিক ওদিক উদ্বিগ্ন ভাবে চাহিতে লাগিলেন।

লোকজন যাইতেছে, ঘোড়ার গাড়ীতে মেয়েরা সাজগোজ করিয়া চলিয়াছে, দ্রুতপদে পথিকদল ছুটিয়াছে—সব বাণী সিনেমা লক্ষ্য করিয়া।

রায় বাহাদুরের একজন পরিচিত উকিলবাবু ছড়িহাতে দ্রুতপদে জনসাধারণের অনুসরণ করিতেছিলেন, রায় বাহাদুরকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন,—"এই যে! সায়েব এসেছেন? লোকজন কেমন হয়েছে ভেতরে? আজ আবার আনফরচুনেটলি ওটার সঙ্গে ক্ল্যাশ করল কিনা? অন্যদিন হলে—না, আমার জো নেই—বাড়ীর মেয়েরা সব গিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে কেউ নেই। বাধ্য হয়ে আমাকে—কাজেই—"

রায় বাহাদুর মনে মনে বলিলেন—হ্যাঁ, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। সাড়ে ছটা। পৌনে সাতটা। সাতটা।

জনপ্রাণী নাই।

বাণী সিনেমা গৃহ লোকে লোকারণ্য। টিকিট কিনিতে না পাইয়া বহু লোক বাহিরে দাঁড়াইয়া জটলা করিতেছে। একদল জোর-জবরদস্তি করিয়া ঢুকিবার চেষ্টা করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়াছে। মেয়েদের বসিবার দুই দিকের ব্যালকনির অবস্থা এরূপ যে আশঙ্কা হইতেছে ভাঙিয়া না পড়ে। স্টেজে যবনিকা উঠিয়াছে। চিত্রতারকা ইন্দুবালা সম্মুখে দাঁড়াইয়া গান গাহিতেছেন—তাঁরই গাওয়া 'মিলন' ছবির কয়েকখানি দেশবিখ্যাত গান, বালক বৃদ্ধ যুবার মুখে মুখে গীত গান—'জংলা হাওয়ায় চমক লাগায়', 'ওরে অচিন দেশের পোষা পাখী', 'রাজার কুমার পক্ষীরাজ' ইত্যাদি।

এমন সময় রায় বাহাদুর নীলাম্বর চট্টোপাধ্যায় ভিড় ঠেলিতে ঠেলিতে টকিহলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে শ্রীগোপালবাবুকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। পাশেই অদূরে নীরেনবাবু বসিয়া। বলিলেন—"বা রে, আপনিও এখানে!"

হঠাৎ-ধরাপড়া চোরের মত থতমত খাইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে শ্রীগোপালবাবু বলিলেন,—"আসার ইচ্ছে ছিল না, কি করি, কি করি—মেয়েরা—ওদের আনা—ইয়ে—সাহেবের লেকচার কেমন হল? লোকজন হয়নি?"

—"কি করে হবে? আপনারা সবাই এখানে। লোক কে যাবে?"

—"সায়েব কোথায়? চলে গেলেন?"

—"এই যে—"

রায় বাহাদুরের পিছনেই দাঁড়াইয়া স্বয়ং আইনস্টাইন।

শ্রীগোপালবাবু শশব্যস্তে উঠিয়া আইনস্টাইনের হাত ধরিয়া খাতির করিয়া নিজের চেয়ারে বসাইলেন।

একটি খবরের কাগজের কাটিং রাখিয়াছিলাম। এটি এখানে জানাইয়া দেওয়া গেল—

এখানে আলুর দর ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ধানের দর কিছু কমের দিকে। ম্যালেরিয়া কিছু কিছু দেখা দিয়াছে। স্থানীয় সুযোগ্য সাবডিভিসনাল অফিসার মহোদয়ের চেষ্টায় স্বাস্থ্যবিভাগের কর্মচারীদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে।

গত সপ্তাহে স্থানীয় বাণী সিনেমা গৃহে সুপ্রসিদ্ধ চিত্রতারকা ইন্দুবালা দেবী শুভাগমন করেন। নৃত্যকলা-নৈপুণ্যে ও কিন্নরকণ্ঠের সংগীতে তিনি সকলের মনোহরণ করিয়াছেন। বিশেষত 'কালো বাদুড় নৃত্যে' তিনি যে উচ্চাঙ্গের শিল্প-সংগীত প্রদর্শন করিয়াছেন, রানাঘাটবাসিগণ তাহা কোনদিন ভুলিবে না। এই উপলক্ষে উক্ত সিনেমা গৃহে অভূতপূর্ব জনসমাগম হইয়াছিল—সেও একটি দেখিবার মত জিনিস হইয়াছিল বটে। লোকজনের ভিড়ে মেয়েদের ব্যালকনির নীচে বরগা দুমড়াইয়া গিয়াছিল। ঠিক সময়ে ধরা পড়াতে একটি দুর্ঘটনার হাত হইতে সকলে বাঁচিয়া গিয়াছেন।

বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন গতকল্য দার্জিলিং যাইবার পথে এখানে মিউনিসিপ্যাল হলে বক্তৃতা দিতে নামিয়াছিলেন। তাঁহাকেও সেদিন বাণী সিনেমা গৃহে ইন্দুবালার নৃত্যের সময় উপস্থিত থাকিতে দেখা গিয়াছিল!

বাক্স বদল

প্রতুলের বাবার যা কাণ্ড, তাঁর ব্যস্ততার জন্যে সব মাটি। আজ তার রওনা না হলে এমন কিছু ক্ষতি হোত না। সব স্কুল-কলেজ কাল খুলবে, পুজোর ছুটির পরে, সারা ট্রেনে মোটরবাসে এই বলে লোক। প্রতুলের সে তাড়া নেই, তবে আজই এই ভীষণ ভিড় সহ্য করে জনতার চাপে উদ্ব্যস্ত হয়ে না গেলে কি চলত না?

হিলি স্টেশন তেইশ মাইল রাস্তা। লোকে মোট-ঘাট ওঠাচ্ছে বাসের ছাদে। বাক্স, সুটকেস, বিছানা। হৈ চৈ গোলমাল। বেশীর ভাগ কলেজের ছাত্র, তারা নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেসে কলকাতা যাচ্ছে, প্রতুল যাবে আসাম মেলে বা ডাউন নর্থ-বেঙ্গলে।

বাস ছাড়ল, প্রতুলের দুপাশে দুটি দোকানদার, তারা তামাকের ব্যবসা করে, সেই বিষয়ে কথাবার্তা বলতে বলতে যাচ্ছে। সামনের বেঞ্চিতে একটি ভদ্রলোক স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে নিয়ে বসে। একখানা বেঞ্চি ওঁরা জুড়ে বসে আছেন। ছেলেমেয়ে তিন-চারটি, তারা ভীষণ উৎপাত জুড়ে দিয়েছে বাসের মধ্যেই। তদের দুষ্টুমি ও চেঁচামেচিতে প্রতুলের মাথা ধরে যাবার উপক্রম হয়েছে।

প্রতুল যেখানটিতে অতিকষ্টে একটু জায়গা করে নিয়েছে, ছোট ছেলেটা অনবরত সেখানে এসে প্রতুলের কোলের ওপর বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে চাইছে। এতে কষ্ট ও অসুবিধা যথেষ্ট হলেও ভদ্রতার খাতিরে বিরক্তি চেপে যেতে হচ্ছে প্রতুলের।

যুদ্ধের সবে আরম্ভ। বাসের ওদিকে তিন-চারটি ভদ্রলোক যুদ্ধ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনায় ব্যস্ত। তাঁদের কথা শুনে প্রতুলের মনে হোল যুদ্ধ-সম্পর্কিত পরিস্থিতি তাঁদের নখদর্পণে, হিটলার বা চেম্বারলেন অপেক্ষাও তাঁরা জিনিসটা ভাল বোঝেন, কারণ তর্কের মধ্যে উভয় পক্ষের ভুল-ভ্রান্তি তাঁর বিশদভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করে পর-

স্পরকে দেখিয়ে দিচ্ছেন।

ড্রাইভারের ঠিক পিছনে বাসের সামনের দিকটাতে গোটাকতক রিজার্ভ সিট। দুটি মেয়ে সেখানে বসে, তাদের সঙ্গে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক, সম্ভবতঃ মেয়ে দুটির অভিভাবক। মেয়ে দুটির মধ্যে একটির বয়স আঠার-উনিশ বছর, অন্য মেয়েটির বয়স বাইশ-তেইশ হবে। বয়সে ছোট যে মেয়েটি, সে দেখতে বেশ সুন্দরী, অন্যটির রঙ শ্যামবর্ণ, মুখশ্রীও খুব ভাল বলা চলে না, তবুও তার সারাদেহে কেমন এক ধরনের লাবণ্য মাখানো। প্রতুল দু'একবার অল্পক্ষণের জন্যে চেয়ে দেখেছে।

কয়েক মাইল পরে বালুরঘাট টাউনে এসে বাস দাঁড়াল। এখানে একটি মেয়ে উঠল, পুরুষ যাত্রীও অনেকগুলি। একেই বাসে নেই স্থান, তার ওপর এতগুলি যাত্রী কোথায় বসে? অনেক নবাগত যাত্রী অগত্যা দাঁড়িয়ে রইল, রিজার্ভ সিটে মেয়েটির জায়গা হয়ে গেল।

এরই মধ্যে আবার এক কানা ভিখিরি ভিক্ষে করতে আরম্ভ করেছে। সে উঠল বালুর-ঘাট থেকে সাড়ে এগার মাইল চলে এসে সদরডিহি বলে গ্রামে ; রাজ-কাছারি আছে বলে এখানে বাস দশ মিনিট দাঁড়ায়।

সামনের ভদ্রলোকটি ছোট ছেলেটির হাতে একটি পয়সা দিয়ে বললেন,—দে, যা ভিখিরির হাতে দে।

ছেলেটি এগিয়ে গিয়ে বললে,—এই নাও ভিখিরি!

ভদ্রলোক ধমক দিয়ে বললেন—ও কি, অমন বলতে নেই, ভিখিরি বলতে নেই। ছিঃ!

কানা ভিখিরি পয়সাটা নিয়ে একগাল হেসে ওঁর দিকে চেয়ে বললে,—পোলাপানের কথা, ওদের এখন গেয়ান কি হয়েছে বাবু? খোকাবাবুর নাম কি, ও খোকাবাবু?

বেজায় ধুলো উড়ে পেছন দিকটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। প্রতুল ভাবছে, বাসের ছাদে তার বিছানার পুঁটলিটার ওপর সাত-পুরু ধুলো জমে গেল এতক্ষণ।

রাস্তাও যে ফুরোতে চায় না। বড় বড় মাঠের ওপর রাস্তা, মাঝে মাঝে বিল আর ধানক্ষেত আর দু'একটা চাষা-গাঁ।

কার্তিক মাসের মাঝামাঝি, তেমন গরম নেই তাই নিস্তার, নইলে বাসে যা ভিড়, গরমে ভীষণ কষ্ট হোত, চলন্ত বাসেও গরম কাটত না। প্রতুল একবার মুখ বাড়িয়ে দেখলে স্টেশন চোখে পড়ে কিনা।

বালুরঘাট থেকে যে মেয়েটি উঠেছে তার হাত থেকে একখানা বই হঠাৎ পড়ে গেল, বাসের ঝাঁকুনিতে। কোন একজনের পায়ের ঠোক্কর লেগে বইখানা বেঞ্চির ফাঁক দিয়ে গলে একেবারে এসে পড়ল প্রতুলের বেঞ্চির পায়ার কাছে। প্রতুল বইখানা নীচু হয়ে তুলে দেখলে, কলেজ-পাঠ্য ইংরেজী বই—'এট্ ভিক্টোরিয়ান পোয়েট্স'। ও সেখানা উঁচু করে তুলে ধরে মেয়েটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললে,—"আপনার বইখানা পড়ে গিয়েছে, এই যে!" হাতে হাতে বইখানা মেয়েটির হাতে গিয়ে পেঁছিল।

প্রতুল এতক্ষণ ভাল করে লক্ষ্য করেনি, বাসে যে কটি মেয়ে আছে, সব চেয়ে এই মেয়েটি সুন্দরী, গায়ের রঙ ধপ্‌ধপে ফরসা, বয়স কুড়ির বেশি নয়, এখনও বিয়ে হয়নি! কলেজের ছাত্রী তা তো বোঝাই গেল।

কোন্ কলেজে পড়ে? নাম কি মেয়েটির? বালুরঘাটে কার মেয়ে?

—হিলি! হিলি!

বড় বড় টিনের চালা ও শিরীষ গাছের সারি দেখা দিয়েছে—হিলির বাজার! স্টেশনের সিগন্যাল দেখা যাচ্ছে!

—ওরে, নে, জুতো পরে নে সব, হিলি এসেছে। হ্যাঁ গা, সে পনের কৌটোটা কোথায়? দেখ দেখ, বোঁচ্কার তলায় পড়ে গিয়েছে। ব'স্ না চুপ করে, গাড়ী দেখাব তো ইস্টিশান আসুক। কটা জিনিস গুনে নাও। এক, দুই, তিন, চার—গাড়ীর ছাদে আছে এক, দুই, তিন। আসাম মেলের ডাউন দিয়েছে।

হুড়মুড় করে যাত্রীরা সব নামতে আরম্ভ করেছে, বাসের ছাদ থেকে কণ্ডাক্টর মাল নামিয়ে কুলিদের মাথায় চাপাচ্ছে, গোলমাল সেখানটাতে যেমন, ভিড়ও তেমনই।

—আরে, ওই লাল সুটকেসটা, ওই যে গামছা-বাঁধা, দাও নামিয়ে।

—সামাল সামাল, এই ভাল করে ধর, কাঁচের জিনিস আছে ভেতরে।

—ওটা না ওটা না, ওই টিনেরটা, লেখা আছে—আর সি ডি,—হ্যাঁ ওইটে—

আসাম মেল এসে দাঁড়াল। যাত্রীর দল মোটঘাট নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। প্রতুলের মোটে একটা টিনের সুটকেস আর একটা বিছানা, তত ভারীও নয়, নিজেই সেটা হাতে করে ছুটল টিকিটঘরের দিকে—কুলির হাতে দিলেই এখুনি আবার চারটে পয়সা।

আসাম মেলে তত ভিড় ছিল না, কিন্তু পার্বতীপুর থেকে যে শিলং মেল ছাড়ল, সেটা আসছে লখনউ বা কানপুর থেকে ; হিন্দুস্থানী যাত্রীরা আসামের দিকে চলেছে শীতকালের প্রথমে বিভিন্ন চা-বাগানে কাজ করতে, তাদের ভিড়ে দাঁড়াবার জায়গা পর্যন্ত নেই ট্রেনে।

রঙিগয়া জংশনে ভোরবেলা ট্রেন পেঁছিল। এখান থেকে ষোল মাইল দূরে ভাটখালি চা-বাগান। প্রতুল ডাক্তারী করে, বছর-খানেক এই চাকরিটাতে ঢুকেছে, ফ্রী কোয়ার্টার দিয়েছে চা-বাগান থেকে, জিনিসপত্র সস্তা, এক রকম চলে যাচ্ছে।

রঙিগয়ায় নেমে আবার মোটর-বাস। বাগানের দু মাইল তফাৎ দিয়ে রাঙাপাড়া রোড দিয়ে বাস চলে গেল। এইটুকু পথ একজন কুলির মাথায় সুটকেসটা চাপিয়ে বেলা সাড়ে নটা আন্দাজ প্রতুল চা-বাগানে নিজের কোয়ার্টারে এসে উঠল।

বড় নির্জন জায়গা। দূরে অনুচ্চ নীল পাহাড় মেঘের মত দেখা যায়। একদিকে খুব বড় একটা জলা, নলখাগড়া বনে ঘেরা। হেমন্তের সকাল বেলা একটা আর্দ্র অপ্রীতিকর বাষ্প যেন উঠছে জলাটা থেকে। ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের ডিপো এই চা-বাগানগুলো। প্রতুল নিজেও কয়েকবার ম্যালেরিয়ায় পড়েছে এখানে এসে পর্যন্ত।

ডাক্তারখানায় আসামী কম্পাউণ্ডার শিবনাথ ভট্টাচার্য একাধারে ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডার ও প্রতুলের পাচক। প্রতুল নিজে রাঁধতে জানেও না, ওকাজ তার পোষায়ও না, সুতরাং শিবনাথকে খোরাকি দিয়েও রাখতে হয়েছে। ডাক্তারখানার চাকর ছুটে এল ডাক্তারবাবুকে দেখে। প্রতুল তাকে জিজ্ঞেস করে জানলে, শিবনাথ তার বাড়ী গিয়েছে দু দিনের ছুটি নিয়ে, পরশু আসবে। শুধু বাবার তাড়াতাড়িতে আজ আসতে হোল প্রতুলের, নয়তো পরশুই তো সে আসত।

ডাক্তারখানার চাকরকে বললে—ওরে ভীম, তুই জল তুলে দে আমার নাইবার আর রান্না করবার। যখন কষ্ট পেতে হবে দু দিন, তাড়াতাড়ি যা—। কোন কেস ছিল এ কদিন? ছিল না? চাবিটা নিয়ে গিয়ে ডাক্তারখানা ঝাঁট দিয়ে রাখ গে।

স্নানের পূর্বে স্যুটকেস খুলতে গিয়ে সে দেখলে স্যুটকেসের গায়ে অন্য কি একটা তালা লাগানো, তার চাবি নেই ওর কাছে। আঃ কি বিপদ, এ ঠিক তার বোন কমলার কাজ। সে-ই কাল আসবার সময়ে বাক্স গুছিয়ে দিয়েছিল, কিসের তালা কিসে লাগিয়ে বসে আছে!

অনেক কষ্ট করে লোহার সরু সিক দিয়ে চাড় দিতেই তালাটা খুলে গেল।

স্যুটকেসের ডালাটা তুলে নিজের ধুতি গামছা বার করতে গিয়ে সে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল স্যুটকেসের ভিতরটাতে চেয়ে। এ কার জিনিসপত্র? শাড়ী কিসের?

বাক্সের ওপরের দিকে থাকে থাকে সাজানো রঙ-বেরঙের শাড়ী, তার নীচে ব্লাউজ গোটা ছ-সাত, সায়া দুটি ; এছাড়া পাউডারের কৌটো, ক্রিম, আরও লম্বা ও গোল আকারের ছোট বড় সুদৃশ্য কৌটো, শিশি—সাবানের কেস, লেখার প্যাড, ফাউনটেন পেনের কালি—এক তাড়া চিঠি, আয়না, চিরুনি, আরও কত কি। সর্বনাশ!—কার বাক্স এটা?

প্রথমটা তার মনে হোল, তার বোন কমলার স্যুটকেসটা কি ভুলে গোলমাল হয়ে—কিন্তু না, তা নয়। এ রকম শৌখিন শাড়ী ও জিনিসপত্র কমলার নেই। তা ছাড়া এ তো কোন জায়গায় যাওয়ার প্রাক্কালে গুছিয়ে নেওয়া বাক্স ; কমলা বাড়ী বসে আছে, তার বাক্স এমন গোছালো থাকবার কথা নয়।

হতবুদ্ধি প্রতুল বাক্সের জিনিসগুলো তুলে হাতে নিয়ে দেখতে লাগল। একটা মখমলের বড় কৌটোর মধ্যে লকেটওয়ালা একটা হার, একটি আংটি, দুটি বড় বড় কানের পাশা, সোনার বড় সেফটিপিন একটা, গাছ-কয়েক সরু সোনার চুড়ি ; নতুনওঠা কাঁচের চুড়িও দু গাছা, খুব বড় বড়, ঝকঝকে কাঁচ বসানো, কাজ-করা। একটা মানিব্যাগে চারখানা দশ টাকার নোট, কিছু খুচরো। সম্পূর্ণ মেয়েলী স্যুটকেস। পুরুষের নাম-গন্ধ নেই স্যুটকেসের কোন জিনিসে বা তার আবহাওয়ায়।

প্রতুল দশ হাত মাটির তলায় সেঁদিয়ে গেল সব ব্যাপারটা বুঝে দেখে। স্যুটকেস বদল হয়েছে বেশ বোঝা গেল, কিন্তু কোথায় বদল হোল? ট্রেনে, না বালুরঘাট থেকে আসবার পথে মোটর-বাসে? মোটর-বাসেই হওয়া সম্ভব, কারণ ট্রেনে তার কামরায় কোনও মেয়ে তো ছিল না ; পার্বতীপুর থেকে সে ট্রেনের যে কামরায় উঠেছিল, তাতে হিন্দুস্থানী ও মাড়োয়ারী যাত্রী বোঝাই ছিল ; তাদের মধ্যে এ স্যুটকেস কারও নয়। এ বাঙালী মেয়ের স্যুটকেস।

আচ্ছা, মোটর-বাসে যদি বদল হয়ে থাকে, তবে কোন্ মেয়েটির বাক্সের সঙ্গে হওয়া সম্ভব?—তা ভেবেই বা কি মীমাংসা হবে, কারণ যে-কোনও মেয়ের স্যুটকেসের সঙ্গেই সম্ভব হতে পারে, যখন সকলের বাক্স ছিল মোটর-বাসের ছাদে। যাক্, সে কথা পরে ভাবা যাবে, তার যথেষ্ট সময় আছে। এখন মুশকিল হয়েছে এই যে, যা পরনে আছে তা ছাড়া আর তার দ্বিতীয় ধুতি নেই, গামছা নেই, সাবান নেই, ক্ষুর নেই, লুঙি নেই—কিচ্ছু নেই। আর এই বিজন চা-বাগানও যা, ফরাসী ইকোয়েটোরিয়াল আফ্রিকাও তাই—কিছু মেলে না এখানে। এখান থেকে সাত মাইল দূরে একটি ছোট বাজারে কেঁয়েদের দোকান আছে কাপড়ের, তবে সেখানে বাঙালী ভদ্রলোকের উপযুক্ত জামা-কাপড় পাওয়া যাবে না।

এখন আপাতত স্নান করে উঠে সে পরে কি, গায়ে দেয় কি? গামছা কোথায়? দাড়ি কামায় কিসে? নাপিত আছে বটে, কিন্তু তার সে কুলিক্ষুরে প্রতুল কখনও কামাবে না, দাড়ি বেড়ে নারদ মুনির মত হয়ে গেলেও না।

এমন বিপদে সে জীবনে কখনও পড়েনি। কি এখন সে করে?

নাঃ, উপায় নেই। অনেক ভেবে-চিন্তে সে দেখলে এই স্যুটকেস যারই হোক, এর মধ্যের গামছাখানি আর একখানি শাড়ি আপাতত তাকে ব্যবহার করতেই হবে--নিরুপায়!

শাড়ী বার করতে গিয়ে আরও বিপদ। সাদা শাড়ী যা আছে সব জরিপাড় ; আর তাঁতের দামী শাড়ী শান্তিপুরী কি ফরাসডাঙা ; মোটা আটপৌরে গোছের শাড়ী যা আছে, তার সব রঙিন। দামী শাড়ী আছে এ ছাড়া। এখুনি একবার আপিসে যেতে হবে,

কি পরে যাওয়া যায়? জরিপাড় শান্তিপুরী শাড়ী? আর সাদা ব্লাউজ?

নাঃ, ভেবে এর কূল-কিনারা নেই। একটা যা হোক করতেই হবে। রঙিন একখানা শাড়ী পরে স্নান সেরে, রেলে ব্যবহৃত যে আধ-ময়লা জামা-কাপড় বর্তমানে গায়ে আছে তাই পরেই যেতে হবে আপিসে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে। ম্যানেজারকে সব কথা খুলে বলে এর একটা পরামর্শ চাইতে হবে।

দাড়ি কামানো হোল না। রঙিন শাড়ী পরে স্নান সেরে সে রেলের জামাকাপড়ই অঙ্গে চাপিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

ম্যানেজার ইংরেজ, নাম সিমসন। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা-ঝোপের ছাঁটাই তদারক করছিল, প্রতুলকে দেখে পাইপ মুখ থেকে নামিয়ে বললে,—হ্যালো ডক্টর, গুডমর্নিং, ইউ আর হিয়ার অলরেডি! থট ইউ ওন্‌'ট বি হিয়ার বিফোর টুমরো।

প্রতুল বললে,—এসেছি বটে, কিন্তু আমার বড় বিপদ সার।

—ওয়েল, হোয়াট'স অ্যামিস?

সব শুনে সাহেব হো হো করে হেসে উঠল।

—সে ডক্টর, ইউ আর এ ডগ আফটার উইমেন, হোয়াট, সে ইট উইথ দি রোজ? ইফ আই ওয়্যার ইউ—

—না সার, হাসি নয়, মুশকিলে পড়েছি; একখানা কাপড় নেই, জামা নেই, দাড়ি কামাবার ক্ষুর পর্যন্ত নেই।

সাহেব হাসতে হাসতে বললে,—সে বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। আমার স্যুট একটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। শেভিং সেট বাড়তি আছে, নিয়ে যাও। ইয়ংম্যান তোমরা, তোমাদের রোমান্সে সাহায্য করব না এমন বেরসিক নই আমি। তোমাদের বয়সে—

—রোমান্স কোথায় সার, বিপদ খুব। সোনার গহনা, মনিব্যাগে টাকা—পুলিসে একটা খবর দেওয়া উচিত নয় কি? শেষকালে—

—এখন থাক। আমায় বললে তো, এতেই হোল। তোমায় চোর বলে কেউ ধরতে পারবে না। আমার সামনে বাক্সের জিনিসের একটা লিস্ট করা যাবে এখন ওবেলা। চল আমার বাংলোয়, জিনিসগুলো দিই তোমায়। দিব্যি রোমান্স বাধিয়ে বসে আছ—

—ধন্যবাদ সার। আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি বড়ই—

—কিছু বলবার আবশ্যক নেই। চল।

নিজের কোয়ার্টারে এসে খেয়ে-দেয়ে সুস্থ হয়ে প্রতুল একটা সিগারেট ধরালো। তার পর শুয়ে পড়ল ঘুমিয়ে নেবার জন্যে বটে, কিন্তু ঘুম আসে না কিছুতেই। এই অদ্ভুত ঘটনার কথা ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে উঠল। প্রতুলের বয়স এই পঁচিশ। সবে ডাক্তারি পাশ করে চা-বাগানের চাকুরিটা পেয়েছে। বিবাহ হয়নি। বিশেষ ভাবে কোনও মেয়ের সম্পর্কে আসেনি। যাকে রোমান্স বলে, গল্পে উপন্যাসে কতই যা সে পড়েছে, তার নিজের জীবনে—না, কই, ঘটেনি। ডাক্তারী পড়বার সময় এক-আধজন নার্সের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বটে, কিন্তু সে কিছু নয়। দিশি নার্স, তাদের দিকে তাকানো যায় না, তায় রোমান্স!

কিন্তু তার জীবনে এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। আচ্ছা, কোন্ মেয়েটির সঙ্গে স্যুটকেস বদল হোল? বালুরঘাট থেকে যে মেয়েটি উঠল তার সঙ্গে, না ওই যে দুটি মেয়ে আগে থেকে বসে ছিল তাদের কারও সঙ্গে?

বালুরঘাটের মেয়েটি বেশ সুন্দর। কলেজের ছাত্রী বটে—ওর সেই বইখানা 'এট্‌ ভিক্টোরিয়ান পোয়েট্‌স্‌' থেকে তা বোঝা গিয়েছে। কি নাম? কি জাত? ব্রাহ্মণ না

কায়স্থ না বৈদ্য?

হঠাৎ তার মনে পড়ল স্যুটকেসটার মধ্যে নীল ফিতে দিয়ে বাঁধা একতাড়া চিঠি ছিল বটে। মেয়েটির নাম নিশ্চয়ই তাতে পাওয়া যাবে। এতক্ষণ এ কথা মনে হওয়া উচিত ছিল তার।

উঠে সে স্যুটকেসটা খুলে ফেললে—শাড়ীর নীচে একপাশে চিঠির তাড়াটা ছিল, সে সেটা হাতে করে বিছানার ওপর এসে বসল।

চিঠি খান-পনের। একজনেরই হাতের বেশ শৌখিন নীল লিনেন পেপারের খামের ওপর ঠিকানা লেখা—অমিয়া মজুমদার, C/o সি. আর. পাল, ২২/৬ নীলমণি দত্তের লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

যাক, বাঁচা গেল, এই তো দিব্যি ঠিকানা পাওয়া গেল। আর ভাবনা নেই। কালই একখানা চিঠি লিখে দেওয়া যাবে। মেয়েটিরও নিশ্চয়ই ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। বেচারীর একখানা শাড়ী নেই ব্লাউজ নেই, তার ওপর টাকা আর গহনা হারানোর দুশ্চিন্তা। মেয়েটি এতক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে।

তার ওপর যদি তারই স্যুটকেস মেয়েটি নিয়ে গিয়ে থাকে তবে তো স্যুটকেস খুলে মেয়েটি মূর্ছা যাবে! দেশ থেকে এখানে খাবার জন্যে সে কিছু পাটালি আর চিঁড়ে আনছিল ওই স্যুটকেসের মধ্যে! তা ছাড়া একটা ছোট মানকচু আছে, আর আছে—এক জোড়া জুতো, নূতনও তেমন নয়। এ সব বাদে তার ধুতি শার্ট পাঞ্জাবি প্রভৃতি তো আছেই।

ওর মধ্যেকার একটি জিনিসও মেয়ের কোন উপকারে আসবে না।

মজুমদার? মজুমদার? মজুমদার কি জাত? কায়স্থ না বৈদ্য না ব্রাহ্মণ? না অন্য কিছু?

চিঠিগুলো পড়ে দেখবার ইচ্ছে হল প্রতুলের, কে লিখেছে, মেয়ে না পুরুষ। শেষ পর্যন্ত সে ইচ্ছা সে দমন করলে। দরকার নেই পরের চিঠি পড়বার। ওটা অন্যায়।

সারা দিনরাত কেটে গেল বটে, কিন্তু প্রতুলের মন থেকে মেয়েটির চিন্তা কিছুতেই যেতে চায় না। যত সে অন্যদিকে মন দেবার চেষ্টা করে ততই সেই একই চিন্তা—সেই বালুরঘাটের মেয়ে, তার স্যুটকেস।

পরদিন সে মেয়েটিকে একখানা চিঠি দিলে। 'মাননীয়াসু' পাঠ ব্যবহার করে সে স্যুটকেস বদলের সব অবস্থা খুলে জানালে। স্যুটকেসের মধ্যে যা যা ছিল, গহনা টাকা বস্ত্রাদির একটি তালিকাও দিলে চিঠিতে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য মার্জনাভিক্ষাও বাদ গেল না। সে যে কি ভীষণ লজ্জিত ও দুঃখিত হয়েছে এজন্যে, অন্তত তিনবার সেকথা লিখলে তিন জায়গায়। তার নিজের স্যুটকেসটি কি ওখানে আছে?

চিঠি ডাকে দিয়ে দু তিন দিন দুরু দুরু বক্ষে উত্তরের প্রতীক্ষায় রইল প্রতুল। না জানি কি উত্তর আসে, খুব রাগ করে কি চিঠি লিখবে? পুলিসে খবর দেবার ভয়-টয় দেখিয়ে?

নয় দিনের দিন উত্তর এল।—

মান্যবরেষু,

মহাশয়ের পত্রে অবগত হইলাম, হিলি স্টেশনে মোটর হইতে নামিবার সময় আমার ভাগিনেয়ী শ্রীমতী অমিয়ার স্যুটকেসটি ভ্রমক্রমে আপনার সহিত বদল হইয়া গিয়াছে। আপনার স্যুটকেসটিও আমার ভাগিনেয়ীর সহিত আসিয়াছে। জিনিসপত্রাদির কথা যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, স্যুটকেসের মধ্যে উহার অতিরিক্ত কিছুই ছিল না। মহাশয় ভদ্রলোক, আপনাকে এই অসুবিধায় ফেলিবার নিমিত্ত আমার ভাগিনেয়ী যথেষ্ট লজ্জিতা, তাহার পক্ষ হইতে আমিও আপনার নিকট বার বার ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। বাক্সটি ইনসিওর্ড

আনপেড রেলওয়ে পার্সেলে পাঠাইয়া দিবেন। আপনার স্যুটকেসটিও সেইভাবে পাঠাইব। রেলের রসিদটা উপরের ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

বিনীত
শ্রীভবতারণ চক্রবর্তী

পত্র পেয়ে প্রতুলের যে কিছু আশা-ভঙ্গ না হয়েছিল এমন নয়। প্রথম তো এ মেয়েটি যে কোন্‌টি তা বোঝা গেল না। বালুরঘাটের সেই মেয়েটিই যে এই অমিয়া মজুমদার, তার কোন প্রমাণ নেই। চিঠি একখানা মেয়েটির কাছ থেকে আসবে এমন আশা করা নিতান্ত অসংগত ছিল না, কোথা থেকে আবার মেয়ের মামা শ্রীভবতারণ চক্রবর্তী এসে জুটল মাঝখানে! তবে মামা থাকাতে একটা ব্যাপার খানিকটা পরিষ্কার হয়ে গেল, মেয়েটি ব্রাহ্মণ। সেও ব্রাহ্মণ। তাতে অবিশ্যি এমন কিছু সুবিধে যে কি, প্রতুল ভাল করে যখন ভাবলে, তখন বুঝেই পেল না।

পরদিন লোক পাঠিয়ে সে স্যুটকেসটি রেলে বুক করে দিলে এবং তার নিজের স্যুটকেসটিও সে-সপ্তাহের শেষে একদিন অক্ষত অবস্থায় কুলির মাথায় চেপে তার কোয়ার্টারে এসে পৌঁছল। জিনিসপত্র নাড়াচাড়া হয়েছে বটে, কিন্তু ঠিক আছে, এমন কি চিঁড়ে ও তালের পাটালি পর্যন্ত।

ব্যাপারটা বেমালুম মিটে গেল।

এর পর আর কি ঘটতে পারে? কিছুই না।

প্রতুল কিন্তু কিছুতেই মেয়েটির কথা একেবারে ভুলতে পারলে না। তার তরুণ জীবনে এই প্রথম নারী-সংক্রান্ত ঘটনা। রোমান্স না হলেও রোমান্সের কল্পনা মনে জাগে বই কি! বিশেষত চা-বাগানের এই নির্জন জীবনে। তা ছাড়া, কোন্‌ মেয়ে ছিল এটি? সেই বালুরঘাটের?

মেয়েটির কাছ থেকে একখানা ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি আসবে এ আশাও প্রতুলের ছিল। তা আসেনি।

পাঁচ মাস পরে প্রতুল আবার ছুটি নিয়ে বাড়ী রওনা হোল। অনেকদিন দেশে যায়নি, মনটা ব্যাকুল ছিল আত্মীয়স্বজনকে দেখবার জন্যে। ওর বোন কমলাকে ও বড় ভালবাসে। কমলার বিবাহের কথাবার্তা চলছে, সামনের বৈশাখেই বোধ হয় বিয়ে হয়েও যাবে। তার আগে কমলাকে নিজের মধ্যে আপন ভাবে দিনকতক পেতে চায়। সেজন্যে আরও বিশেষ করে বাড়ী যাওয়া দরকার।

হিলি স্টেশনে নেমে বসে থাকতে হোল। একখানি আপ ট্রেন এলে তারও যাত্রী নিয়ে তবে মোটর-বাস ছাড়বে।

প্ল্যাটফর্মে কিছুক্ষণ পায়চারি করতে করতে কলকাতার ট্রেন এসে পৌঁছল। যাত্রীর ভিড় তেমন ছিল না, কয়েকটি মাত্র লোক ট্রেন থেকে নামল।

হঠাৎ প্রতুল থমকে দাঁড়াল—বালুরঘাটের সেই তরুণী কলেজের ছাত্রীটি একা ট্রেন থেকে নামছে। ওর হাতের দিকে চেয়ে কিন্তু সে চক্ষে অন্ধকার দেখলে কিছুক্ষণের জন্যে। ট্রেনের দরজা থেকে কুলি যে স্যুটকেসটাকে মাথায় চাপিয়ে নিলে মেয়েটির—সেটি তার অত্যন্ত পরিচিত সে স্যুটকেসটি নয়। সেটি ছিল টিনের, আর এটি চামড়ার বড় একটা স্যুটকেস।

মোটর-বাস ছাড়বার সময় নেই বেশি। প্ল্যাটফর্মে নেমে মেয়েটি একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলে, যেন একটু হতাশ হয়ে পড়ল।

মোটর-বাসে ওঠবার সময় প্রতুল শুনলে মেয়েটি কণ্ডাকটারকে বললে—বালুরঘাটের সাবডেপুটিবাবুর বাড়ী থেকে কোনও লোক আসেনি?

কণ্ডাকটার বললে—ডেপুটি সাব? নেহি মাইজি। আপ উঠিয়ে, হরজ কেয়া, বালুরঘাট মে উত্তার দেগা।

বাস চলছে। মেয়েটির প্রতি ঔদাসীন্য এসে গিয়েছে প্রতুলের, সে অন্য দিকে চেয়ে আছে, অন্য কথা ভাবছে। বাক্সের অদল-বদল হয়েছিল বলেই তার মন বালুরঘাটের মেয়েটির প্রতি আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিল, মেয়েটি সুন্দরী বলে নয়, সুন্দরী মেয়ে সে অনেক দেখেছে।

এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল যে মেয়ের সম্পর্কে, তার প্রতি মন আকৃষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক। প্রতুল কেন, সকলেরই হয়—আরও বেশি করে হয় এর ওপরেও যদি মেয়েটি সুন্দরীর পর্যায়ে পড়ে।

কিন্তু এ যখন সে-মেয়ে নয়, প্রতুল ওর স্যুটকেস দেখেই তা যখন বুঝলে, সেই মুহূর্তে প্রতুলের মন থেকে মেয়েটি একদম মুছে গিয়েছে। যাকে নিয়ে তার মন নিভৃতে কত স্বপ্নজাল বুনেছিল এক সময় ভাটিখালি চা-বাগানের বনানীবেষ্টিত নির্জন বাংলোতে —এ সে মেয়ে নয়।

যাত্রীদের ভিড় বেশি নেই। ভদ্রলোকও নেই সে আর মেয়েটি ছাড়া। ড্রাইভারের ঠিক পিছনে, রেলিং দিয়ে অন্য যাত্রীদের বসবার জায়গা থেকে পৃথক করা রিজার্ভ সিটে মেয়েটি বসে আছে। প্রতুল তার ঠিক পিছনের লম্বালম্বি ভাবে পাতা বেঞ্চির প্রথমেই বসেছে, রিজার্ভ সিটের পিতলের গরাদে ঠেস দিয়ে।

একটা ছোট বাজারে বাস দাঁড়াল। দু-একজন যাত্রী ওঠা-নামা করল। প্রতুল লক্ষ্য করলে মেয়েটি তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে, কি যেন বলবার আছে ওর, কিন্তু বলতে বাধো-বাধো ঠেকছে, ভাবটা এই রকম। কি বলবার থাকতে পারে মেয়েটির? সে কি এগিয়ে গিয়ে মেয়েটির সঙ্গে কথা কইবে?

মোটর-বাস ছাড়বার কিছুক্ষণ পূর্বে মেয়েটি ওর দিকে ফিরে বললে,—আপনি কি বালুরঘাট যাবেন?

প্রতুল চমকে উঠে বললে, বালুরঘাট? হ্যাঁ—তা না—বালুরঘাট? কেন বলুন তো?

প্রতুলের উত্তর দেওয়ার ধরণ ও অবস্থা দেখে তরুণীর সুন্দর মুখে হাসির অতি ক্ষীণ অস্পষ্ট রেখা ঈষৎ ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। সে বললে,—দেখুন, আমি বড় মুশকিলে পড়ে গেছি। রাত হয়ে গেল, বালুরঘাটে আমার কাকা গভর্নমেণ্ট অফিসার। বাসা থেকে লোক আসবার কথা আছে নর্থ-বেঙ্গলের সময়, আমি একটা ট্রেন আগে এসে পড়েছি, কি করে বাসায় যাব? তা ছাড়া আপনি যদি আগে নেমে যান তবে গাড়ীতে আর দ্বিতীয় ভদ্রলোক নেই, এই অন্ধকার রাত—এ পথে ভয়ও তো আছে জানি।

মেয়েটি যেন অসহায়ভাবে ওর মুখের দিকে চাইলে।

প্রতুল লাফিয়ে উঠল প্রায়। বললে—কোন ভয় নেই—আমি আপনাকে পৌঁছে দেব বাড়ী, আমিও ওখানেই যাব—চলুন।

মেয়েটি যেন সাহস ও আশ্বাস পেয়ে মনের বল ফিরিয়ে পেলে। কিন্তু মুখে বললে,—আপনাকে সে বড় কষ্ট দেওয়া হবে। আপনি বালুরঘাটে নেমে দয়া করে আমাকে একখানা গাড়ীতে তুলে—

—কিছু না। আপনি সেজন্য কিছু মনে করবেন না। কার বাসায় যাবেন আপনি?

—আমার কাকা ওখানকার সাবডেপুটি, সুধাংশুকুমার মজুমদার।

প্রতুলের বুকের মধ্যে হঠাৎ যেন দুলে উঠল—যে কথাটা ভুলে ছিল এতক্ষণ, সেটা

আবার ওর মনে সাড়া জাগাল।

—একটা কথা বলব? যদি কিছু মনে না করেন, আপনার নামটি কি জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

—আজ্ঞে আমার নাম অমিয়া মজুমদার।

প্রতুলের মাথা ঘুরে উঠল। বাস, লোকজন, গাছপালা, পৃথিবী, আকাশ, বাতাস দুলে উঠল। যেন বিরাট একটা ভূমিকম্প।...অমিয়া মজুমদার! অমিয়া মজুমদার!

অতি কষ্টে নিজেকে সামলে বললে—আর একটা কথা বলব, কিছু যদি মনে না করেন। আপনার সঙ্গেই আমার স্যুটকেস বদল হয়েছিল গত পুজোর ছুটির সময়—আমারই নাম প্রতুল ভট্টাচার্য, আমিই ভাটিখালি চা-বাগানে থাকি—ডাক্তার—

মেয়েটির ডাগর চোখে বিস্ময় ও কৌতূহলের দৃষ্টি ফুটে উঠল। অল্পক্ষণ চুপ করে ওর দিকে চেয়ে থেকে বললে, ও! আপনি প্রতুলবাবু! আপনাকে আমি চিনি।

—আমাকে? আমাকে চেনেন কি ভাবে?

—সেবার বাসে আমার একখানা বই পড়ে যাওয়াতে আপনি আমায় কুড়িয়ে দিয়েছিলেন —না?

প্রতুল হেসে বললে,—হ্যাঁ, ঠিক বটে। মনে পড়েছে। কিন্তু বাক্স-বদলের চেনাটা বড় বেশি রকম করে চেনা নয় কি? ওঃ কি কষ্ট দিয়েছিলুম আপনাকে, মনে থাকবে চিরকাল।

মেয়েটি প্রতিবাদের সুরে হাসিমুখে বললে,—না না, তা আর কি, অমন ভুল তো হয়েই থাকে। আমারই দোষ—

—আপনার কি দোষ? আমার দোষ, যতই তাড়াতাড়ি হোক, নিজের জিনিস দেখে নেওয়া উচিত ছিল। আপনি কোন্ কলেজে পড়েন?

—স্কটিশ চার্চ-এ।

—এবার দেবেন বুঝি বি-এ?

—থার্ড ইয়ার শেষ হবে এবার—সামনের বারে দেব।

—আপনার মামার নাম বুঝি ভবতারণবাবু? মামার বাড়ী থাকেন বুঝি?

—না, মামার বাড়ী ওটা নয়। মামা একা থাকেন, উনি জ্যোতিষী, কেউ নেই বাসায়, আমি রাঁধি, মামা আর আমি থাকি।

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় বালুরঘাটে বাস এল। প্রতুল মেয়েটিকে বললে—আপনাদের বাসা কতদূর? একখানা গাড়ী করি?

মেয়েটি বললে—গাড়ী করতে হবে না। কুলির মাথায় দিয়ে চলুন যাই, ওই মোড় ঘুরলে তিন মিনিটের পথ।

এরা বাসায় পৌঁছুতেই একদল বালক-বালিকার উল্লাস-সূচক কলরবের মধ্যে ওদের অভ্যর্থনা হোল। মেয়েটির কাকা সুধাংশুবাবু প্রতুলকে যথেষ্ট আপ্যায়িত করলেন। প্রতুল তখনই চলে যেতে চাইলে—সে কথায় তিনি কর্ণপাতও করলেন না; রাত্রে তিনি কোথাও তাকে যেতে দেবেন না, কাল সকালে সে পরামর্শ হবে কখন যাওয়া যায় না যায়। আপাতত হাতমুখ ধুয়ে বিশ্রাম করে একটু চা খেলে কৃতার্থ হবেন।

ইতিমধ্যে বাড়ীর মধ্যে মেয়েটির দ্বারাই রাষ্ট্র হয়ে গেল যে, এই সেই লোক, যার সঙ্গে তার বাক্স-বদল হয়েছিল।

এতক্ষণ পর্যন্ত প্রতুল ছিল মাত্র জনৈক সহৃদয় পথিক ভদ্রলোক, যিনি তাদের অমিয়াকে একা আসতে দেখে দয়া করে তাকে বাসায় পৌঁছে দেবার কষ্ট স্বীকার করেছেন।

কিন্তু এ কথা প্রকাশ হবার পরে প্রতুল বাসাসুদ্ধ সকলের নতুনতর কৌতূহল ও প্রশংসার কেন্দ্র হয়ে উঠল। মেয়েটির কাকা বাড়ীর মধ্যে থেকে এ কথা শুনে এসে তাকে

বললেন—আপনার সম্বন্ধে যে কথা শুনলুম অমির মুখে তাতে আপনাকে আর সাধারণ ভদ্রলোক বলে ভাবতে পারি নে তো। আপনি অতি মহৎ লোক। এভাবে যে আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে যাবে এ ধারণার অতীত। বেশি কিছু আমি আপনার সামনে আপনার সম্বন্ধে বলব না, তবে এইটুকু বলছি যে, আমরা বাসার সকলেই আপনাকে পরমাত্মীয় বলে গণ্য করি প্রতুলবাবু। অমিও বাড়ীর মধ্যে ওর কাকীমার কাছে বলছিল, আপনার সম্বন্ধে ওর যথেষ্ট উঁচু ধারণা।

প্রতুলের মুখ লজ্জায় ও সংকোচে লাল হয়ে উঠল, বিশেষ করে সুধাংশুবাবুর এই শেষের দিকের উক্তিতে।

একটু পরে চা ও খাবারের রেকাবি হাতে মেয়েটিই বাইরের ঘরে ঢুকে প্রতুলের সামনে টেবিলের ওপর সেগুলো রেখে বললে,—হাতমুখ ধুয়েছেন? একটু চা খেয়ে নিন।

সুধাংশুবাবুর হঠাৎ কি-একটা কাজের কথা মনে পড়ে যাওয়াতে তিনি বললেন—অমি, তুই এখানে বস্ একটু, ওঁকে আর এক পেয়ালা চা এনে দিস, আসছি আমি আধ-ঘণ্টার মধ্যে।

সুধাংশুবাবুকে আর বাইরের ঘরে দেখা গেল না।

প্রতুল ইতিমধ্যে মেয়েটির সম্বন্ধে অনেক কথা জেনে ফেললে। ওর বাবা-মা নেই, অনেকদিন মারা গেছেন। কাকা মানুষ করছেন বহুদিন থেকে। আই-এ-তে মেয়েটি কুড়ি টাকা স্কলারশিপ পেয়েছিল, কলেজে ও ফাইন আর্টস সোসাইটির সেক্রেটারি। কলেজে গানের প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে মেডেল পেয়েছে এ বৎসর। কলেজ ম্যাগাজিনে ওর লেখা ছোট গল্প বেরিয়েছে। বি-এ পাশ করে ও নিশ্চয়ই এম-এ পড়বে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মেয়েটি সরাসরি ভাবে এসব সংবাদ প্রতুলকে বলেনি। প্রতুলের প্রশ্নে, কতকটা নিজে থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এমন ভাবে বলেছিল যে প্রতুলের তথ্যগুলি অজ্ঞাত রইল না আধ-ঘণ্টা সময় শেষ হবার পূর্বেই।

সুধাংশুবাবু পুনরায় বাইরের ঘরে ঢুকতেই অমিয়া উঠে চলে গেল। পরদিন সকালে উঠে প্রতুল যাবার উদ্যোগ করতেই সুধাংশুবাবু ওকে জানালেন—বাড়ীর মধ্যে বলছে এ বেলা যাওয়া হবে না তার। খেয়ে-দেয়ে ও-বেলা ধীরে সুস্থে গেলেই চলবে।

প্রতুলের সম্বন্ধেও সুধাংশুবাবু অনেক কথা জানলেন কথায় কথায়। সে এম. বি. পাশ করেছে আর বছর, চা-বাগানে চাকরি করে, এক-শ'টি টাকা মাইনে। ওরা রাঢ়ী-শ্রেণী ব্রাহ্মণ, বাবা-মা. বেঁচে আছেন, দেশে জায়গা-জমি আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাঙালীর সংসার, বাপ-মা-মরা বয়স্থা মেয়ে কাকার ঘাড়ে, পাত্র হিসাবে প্রতুল ভালই. সম্মুখে শুভ বৈশাখ মাস। অতএব, এর পরে আর খুব বেশি কিছু বলবার নেই, থাকবার কথাও নয়।

ভাটিখালি চা-বাগানের সেই কোয়ার্টারে প্রতুল একদিন তার তরুণী পত্নীকে ঠাট্টার সুরে বলেছিল—কি, আর বাক্স-বদল করবে? অমিয়া ক্রোধে ঘাড় বেঁকিয়ে উত্তর দিয়েছিল, ব'লো না! কি কষ্ট সেদিন আমার! কলেজে যাব—বাক্স খুলে দেখি ধুতি, গেঞ্জি, লুঙি, শার্ট! মাগো, আমার চোখে জল এল! কি পরি তখন বুঝি নে। বাড়ীতে দ্বিতীয় মেয়েমানুষ নেই, নেয়ে উঠে কি পরি তার নেই ঠিক। কি বিপদ গিয়েছে সেদিন আমার! আর বাক্স-বদল হোল নাকি একজন গেঁয়ো লোকের সঙ্গে! বাক্সের মধ্যে আবার ছেঁড়া, গড়, পুরনো তালি-দেওয়া জুতো—উঃ মাগো!

প্রতুল বললে—হায়, হায়, বাক্স-বদল তো পদে আছে, সেই গেঁয়ো লোকটার সঙ্গে একদিন মালা-বদল হয়ে যাবে তা কি আর তখন জানতে!

মূলো - র‍্যাডিশ —হর্স র‍্যাডিশ

নবীনবাবু ঘুম হইতে উঠিয়া কয়লা চাকরকে ডাকাডাকি করিতেছেন শুনিতে পাইয়াও আবার চাদর মুড়ি দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া এবং তার একটু পরে বোধ হয় ঘুমাইয়াও পড়িয়াছি। জানালার ফাঁক দিয়া পাশের আতাগাছের ডাল যখন দেওয়ালের গায়ে অনেকখানি রোদের মধ্যে ছায়া সৃষ্টি করিয়াছে, তখন কয়লার ডাকে তন্দ্রা ভাঙিল।

—বাবুজি, চা তৈয়ার!

—চা? এখানে নিয়ে আয়, বিছানায়।

নবীনবাবু বোধ হয় প্রাতর্ভ্রমণ সারিয়া আমার ঘরের পাশের সরু করিডোর দিয়া গট্‌গট্ করিয়া চলিয়া গেলেন, আমার আলস্যের প্রতি কটাক্ষ করিয়াই বেশ জোরে জোরে পা ফেলিয়া গেলেন! চা-পান বিছানায় বসিয়াই শেষ করিয়া উঠিব উঠিব ভাবিতেছি, এমন সময় নবীনবাবু তাড়াতাড়ি আসিয়া আমার বিছানার পাশের দিকের জানালায় দাঁড়াইয়া বলিলেন—উঠুন মশাই, যোধপুরী মূলো এসেছে র‍্যাডিশ।

আমি চটি পায়ে দিতে দিতে বলিলাম—হর্স র‍্যাডিশ। একা, না মিস সোরাবজিকে নিয়ে?

নবীনবাবু রাগ করিয়া বলিলেন—আসুন না, উঠেই আসুন না। মিস সোরাবজির বাবা-মার দায় পড়েছে ওর সঙ্গে মেয়েকে পাঠাতে সকাল বেলা। একাই এসেছে।

পরে পিছন ফিরিয়া বলিলেন—আচ্ছা, রোজ রোজ কেন সকালে এসে জোটে বলুন তো? কি কাজ এখানে বাপু তোর? বিরক্ত করলে! আর আপনিও আটটার আগে বিছানা ছেড়ে উঠবেন না একদিনও—

বলিলাম—আপনার উক্তি দুটির মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধটা কি ভাল বুঝলাম না নবীনদা—

—বুঝবেন বুঝবেন—শীগগিরই বুঝবেন। যদি সকালে সকালে বেরিয়ে যাই, তাহলে তো আর এ হাঙ্গামা এসে জোটে না সকালবেলা। এখন চা কর রে, খাওয়াও রে, ভ্যাজ ভ্যাজ করে বকো রে—

—নবীনবাবু, শিওরলি ইউ ডোণ্ট গ্রাজ ইওর গেস্ট এ কাপ অব টি!

—থাক থাক হয়েছে—গেস্ট! ভারি আমার গেস্ট রে!

যাহার অভ্যর্থনার আয়োজন এত হৃদ্যতাপূর্ণ, সে বেচারী নির্বিকার ভাবে হাসিমুখে বাংলোর বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল। আমায় দেখিয়াই হাত বাড়াইয়া পরম বন্ধুত্বের সুরে বলিল—গুডমর্নিং মিস্টার রায়!

আমি হাত ঝাঁকাইতে ঝাঁকাইতে পরিপূর্ণ অমায়িকতার সঙ্গে বলিলাম—গ্ল্যাড ইউ হ্যাভ কাম মিঃ শুকরাম—গুডমর্নিং।

নবীনবাবু উদাসীনভাবে অতিথির করমর্দন করিয়া ইংরেজিতে বলিলেন, বসুন মিঃ শুকরাম। আমি একবার জেনারেল পোস্টাপিস থেকে একটা তার করে আসি, আপনি ততক্ষণ চা খান।

আমার দিকে চাহিয়া বাংলায় বলিলেন—মূলোকে শীগ্‌গির ভাগাবার চেষ্টা করুন। আজ এখুনি আমাদের বেরুতে হবে, কাজ আছে অনেক।

মূলো যাহাকে বলা হইয়াছে সে বাংলার একবর্ণও বোঝে না তাই রক্ষা। আমাদের মধ্যে কথাবার্তা ইংরেজিতেই হয়।

মূলো জাঁকিয়া বসিয়া আমায় বলিল—বাঙালীদের মত লুচি কবে খাওয়াচ্ছেন মিঃ

রায়? ও আমার বড় ভাল লাগে। আমি বাঙালীদের সংগে একবার মিশেছিলাম—লুচি খাইয়েছিল। সে এখনও ভুলিনি।

শুনিয়া মনে মনে বলিলাম—নবীনদার পিত্তি জ্বলে যেত—যদি কথাটা শুনত। ভাগ্যিস নেই এখানে। যে অভ্যর্থনার ঘটা তাঁর! কয়লা চাকরকে ডাকিয়া খানকতক লুচি ভাজিতে বলিতে গিয়া শুনিলাম ঘি ও ময়দা বাজার হইতে না আনিলে চলিবে না, ফুরাইয়া গিয়াছে। বুঝিলাম অতিথির অদৃষ্টে লুচি নাই। নবীনবাবু হয়তো ইতিমধ্যে আসিয়া পড়িতে পারেন। দরকার নাই সেসব হাঙ্গামায়। চা ও টোস্ট খাওয়াইয়া দিলাম মুলোকে। মুলো তাহার স্বভাব-সিদ্ধভাবে বকিতে শুরু করিয়া দিল। বকুনি আর থামায় না, বেলা নটা বাজিয়া গেল, তবুও তাহার হুঁশ নাই। ইতিমধ্যে নবীনবাবু আসিয়া পড়িলেন, মুলোকে তখনও বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিরক্তির সহিত অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—মুলোটা এখনও যায়নি? হর্স র‍্যাডিশটা?

—না গেলে তো তাড়িয়ে দিতে পারি নে! ও বলছে আমাদের সঙ্গে খিন্‌সি লেক দেখতে যাবে।

—মাটি করেছে! সারলে দেখছি।

মুলো আমাদের কথাবার্তা বুঝিতে না পারিয়া বলিল—মিঃ রায়, খিন্‌সি লেক সম্বন্ধে কি বলছেন?

নবীনবাবু তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, অবশ্য ইংরেজিতে—খিন্‌সি লেক সম্বন্ধে একটা পরামর্শ করছি ওর সঙ্গে। আপনি আসবেন নাকি আমাদের সঙ্গে?

—নিশ্চয় মিঃ বোস, খুব খুশীর সঙ্গে।

—বেশ বেশ। বড় আনন্দ হোল। বড় খুশী হোলাম।

আমি বলিলাম—মিঃ শুকরামের মত সংগী পেলে তো খিন্‌সি তো খিন্‌সি, উত্তর মেরুতে গিয়েও সুখ আছে।

নবীনবাবু ইংরেজিতে সায়সূচক কথা বলিয়া আমায় বাংলাতে বলিলেন—স্বর্গেও যদি যাও মুলোকে নিয়ে স্বর্গের হাওয়া পর্যন্ত তেতো হয়ে উঠবে, ওকে ভাগাবার চেষ্টা কর।

মুলো বলিল—তাহলে কখন রওনা হব আমরা, মিঃ বোস?

—রওনা? সে তো এখনও ঠিক হয়নি, দেখি—

—যদি বলেন আমার এক জানাশোনা গাড়ী আছে—পেট্রোলের খরচা দিলেই রাজী হয়ে যাবে। বলব তাকে?

—বলুন না, বেশ বেশ!

আমরা সবাই বেশ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম।

পরদিন মুলোর চেষ্টাতে গাড়ীর যোগাড় হইয়া গেল। আহারাদি সারিয়া আমরা তিন-জনে শহর হইতে চল্লিশ মাইল দূরবর্তী খিন্‌সি হ্রদ দেখিতে রওনা হইলাম। নাগপুর জব্বল-পুর রোডের যে স্থান হইতে খিন্‌সি হ্রদের রাস্তা বাহির হইল, ঠিক সেই জায়গাটিতে পড়ে মান্‌সারের ম্যাঙ্গানিজ খনি।

মুলো আমাদের সঙ্গে আসিতে পাইয়া বড়ই খুশী হইয়া উঠিয়াছে এবং ভীষণ বকুনি শুরু করিয়াছে। নবীনবাবু বাংলায় বলিলেন—মুলোটা তো বড্ড জ্বালাচ্ছে হে! ওকে ওই ম্যাঙ্গানিজের মাইনে রেখে গেলে কেমন হয়?

মুলো জিজ্ঞাসা করিল—কি, মিঃ বোস?

তাহার সব বাংলা কথার মানে জানা চাই।

নবীনবাবু উত্তর দিলেন—এই ম্যাঙ্গানিজ খনিটা ইণ্ডিয়ার মধ্যে একটা বড় খনি

তাই বলছি।

নাগপুরে আমরা দুজনে আসিয়াছি বেড়াইতেও বটে, কিছু ইনসিওরের আসামী যোগাড় করিতেও বটে। সিভিল লাইনে কোতোয়াল সাহেবের বাংলো ভাড়া লইয়া যেদিনটা বারান্দায় ক্যানভাসের আরাম-কেদারা পাতিয়া বসিয়া একটি সিগারেট ধরাইয়াছি—সেদিন এবং সেই মুহূর্তে এই লোকটি আসিয়া আমাদের সঙ্গে গায়ে পড়িয়া আলাপ করিয়াছে। একটি তরুণ যুবককে বাড়ীর হাতায় ঢুকিতে দেখিয়া আমি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া আগাইয়া গেলাম এবং ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করিলাম—কাকে চান?

যুবকটির চেহারা একহারা, দাঁত উঁচু, শ্যামবর্ণ, মুখে দুই একটা বসন্তের দাগ, ছোট ছোট চোখ, পরনে নিখুঁত সাহেবী পোশাক। সে একগাল হাসিয়া বলিল—আপনারা এই বাসা ভাড়া নিয়েছেন? বাঙালী? সে আমি দেখেই বুঝেছি। সেইজন্যই এলাম—বাঙালীর সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে আমার অনেক দিন থেকে আছে।

বলিলাম—আসুন বসুন। এইখানেই বাড়ী বুঝি?

যুবক পাশের চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল—দেশ আমার যোধপুর। এখানে কলেজে পড়ি—ফোর্থ ইয়ারে।

—বেশ বেশ। একটু চা খান—

সেই হইতে ইহার যাতায়াত শুরু। এমন একটি দিন যায় নাই, যেদিন ছোকরা দুবেলা আসে নাই এবং নানাপ্রকার আলোচনার অবতারণা করে নাই। দিন কয়েক পরেই নবীনবাবু এবং আমি আবিষ্কার করিলাম যে ছোকরা কিছু স্থূলবুদ্ধি, ঠিক সকালে ও বিকেলে চা পানের আগে আসিয়া জুটিবে এবং দুপুর পর্যন্ত বসিয়া বসিয়া শুধু বকিবে—উঠিবার নামটি করিবে না। বাধ্য হইয়া প্রায়ই দুপুর রাত্রে—কোন কোন দিন দুবেলাই তাহাকে খাইতে বলিতে হইয়াছে। সে খাইয়াছেও। এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিলেও সে বুঝিতে পারে না।

হয়তো নবীনবাবু বলিলেন—মিঃ শুকরাম (তাহার নাম রত্নাকর শুকরাম জৈন), ওবেলা আমরা একটু হাইল্যান্ড ড্রাইভে বেড়াতে যাব, বিকেলটাতে থাকব না।

—বেশ বেশ, আমি সন্ধ্যের পর আসব।

—ও, তা বেশ। তবে বোধ হয় ফিরতে একটু দেরিই হবে।

—না হয় আমি একটু রাত করেই আসব এখন। আপনারা অনেক উঁচু বিষয়ে কথাবার্তা বলেন—আমার শুনতে বড় ভাল লাগে। এই জন্যেই আমি বাঙালীদের সঙ্গে মিশতে বড় ভালবাসি। তা এখানে বাঙালী বেশি নেই—যাঁরা আছেন, তাঁরা বড় মেশেন না।

এই ধরনের নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়ার দরুন আমরা তাহাকে 'মুলো' আখ্যা দিলাম এবং তাহার সাক্ষাতে পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে বাংলায় তাহাকে 'মুলো' বলিয়া উল্লেখ করিতাম। কখনও কখনও 'মুলো'র ইংরেজি অনুবাদ করিয়া তাহার সামনেই তাহাকে 'র‍্যাডিশ', কখনও 'হর্স র‍্যাডিশ' বলিতাম। বেচারা আমাদের বাংলা কথার অর্থ একবর্ণও বুঝিত না। 'মুলো' কথার ইডিয়মগত অর্থই বা বুঝিবে কিরূপে। মাঝে মাঝে আমাদের মুখে 'র‍্যাডিশ', 'হর্স র‍্যাডিশ' শুনিয়াও কিছু না বুঝিয়া হয়তো ভাবিত—ইহারা এ তিনটা কথা এত ব্যবহার করে কেন?

আমরা আর একটি জিনিস লক্ষ্য করিলাম। ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র বটে, কিন্তু 'মুলো'র বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় বিশেষ নয়, একজন ভাল বাঙালী ম্যাট্রিক ছাত্র তাহার অপেক্ষা অনেক কিছু জানে। বলা বাহুল্য অবাঙালী ছাত্রদের সম্বন্ধে ধারণা স্বভাবত খুব উচ্চশ্রেণীর নয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়? রামোঃ, এখানে মানুষ

আছে কে?

আমাদের এই মনোভাবের পটভূমিকায় আসিয়া উপস্থিত হইলে মুলোর ন্যায় একজন স্থূলবুদ্ধি ছাত্রের যে দুর্দশা এরূপ দাঁড়াইবে আমাদের বিচারের মাপকাঠিতে ইহা আর বেশি কথা কি!

মজার ব্যাপার এই, যাহাকে লইয়া এই ব্যাপার সে কিছুই বুঝিত না। বরং ভাবিত, আমাদের মত অমায়িক বাঙালী ভদ্রলোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সে লাভবান হইয়াছে। এজন্য সে মাঝে মাঝে গর্বও করিত।

মুলোর মুখে শুনিয়াছিলাম ম্যাঙ্গানিজ খনির ম্যানেজারের সঙ্গে তার আলাপ আছে। গাড়ী জব্বলপুর রোডের উপর খনির সামনে দাঁড়াইতেই সে দোর খুলিয়া ছুটিয়া গেল ম্যানেজারকে খবর দিতে। যেন আমরা লাটসাহেব আসিয়াছি মান্সারের ম্যাঙ্গানিজ খনি দর্শন করিতে—এমনভাবে সে হন্তদন্ত অবস্থায় আমাদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল। ইনি মিঃ বোস, ইনি মিঃ রায়—বাঙালী, খুব পণ্ডিত লোক এঁরা দুজনেই। আমার বিশেষ বন্ধু।

কি মুশকিল! পাণ্ডিত্যের মধ্যে তো আমরা করি ইন্সিওরেন্সের দালালি! অবশ্য আমাদের প্রাচীন কীর্তি ও পুরাতত্ত্বের ওপর কিছু ঝোঁক আছে—কিন্তু সে ফটোগ্রাফি দিক হইতে, বিদ্যা বা পাণ্ডিত্যের দিক হইতে নয়।

মুলোর কাণ্ড দেখিয়া আমরা মনে মনে কৌতুক অনুভব করিলাম।

ম্যানেজার নাগপুরের লোক, ছিন্দাওয়ারা জেলার অধিবাসী, বেশ ইংরেজি বলে। জব্বলপুর রোডে গাড়ী দাঁড় করাইয়া আমরা প্রায় দু'শ ফুট চড়াই ভাঙিয়া খনির মুখে গিয়া পোঁছিলাম। একটা ক্ষুদ্র ডন্কি এঞ্জিনে খাদের জল তুলিয়া লম্বা রবার ও তারের নল দিয়া পাহাড়ের পাশ দিয়া ফেলিয়া দেওয়াতে ছোটখাটো একটা জলপ্রপাতের সৃষ্টি হইয়াছে—সেটা দেখিয়া আমরা সকলে খুশী হইলাম।

ম্যানেজার আমাদের চা পান করিতে বলিলে আমরা অস্বীকার করিয়া আবার নীচে নামিয়া আসিয়া মোটরে উঠিলাম। ম্যানেজারকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিলাম, কষ্ট করিয়া আমাদের সব দেখাইবার জন্য। গাড়ী পুনরায় চলিল।

নবীনদা কহিলেন—মুলো বড্ড গণ্ডগোল করে! আমাদের নিয়ে এমন করছিল...!

মুলো জিজ্ঞাসা করিল—কি, মিঃ বোস?

তাহার আবার সকল কথারই মানে জানা চাই।

নবীনদা বলিলেন,—চমৎকার খনিটা, তাই বলছিলাম।

—ও, তা র‍্যাডিশের কথা কি বলছিলেন? এখানে তো র‍্যাডিশ পাওয়া যায় না!

আমরা দুজনে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। নবীনদা বলিলেন,—ওটা একটা বাংলা ইডিয়ম মিঃ শুকরাম। ভাল জিনিসকে বাংলায় আমরা মুলো বলি।

—তাই নাকি? হাউ ইণ্টারেস্টিং!

আমি বাংলায় বলিলাম,—তোমার মুণ্ডু—বোকারাম কোথাকার!

নবীনদা বলিলেন,—মুলো আর সাধে বলে! একেবারে হর্স র‍্যাডিশ!

রামটেকের পাহাড় বাঁদিকে রাখিয়া কিছু দূর গিয়া রিজার্ভ ফরেস্টের নিবিড় ছায়া-ভরা বীথিপথে চড়াই-উৎরাই ভাঙিয়া মোটর অপেক্ষাকৃত ধীরে চলিতেছে। শরৎ-অপরাহ্নের অপূর্ব শোভা বনতলে। কোথায় যেন পাকা আতার গন্ধ, দু-একটা বনফুলের সুবাসের সঙ্গে যেন শেফালির পরিচিত সুবাস ভাসিয়া আসিতেছে বাতাসের ঝাপ্টায়। এমন শোভার মধ্যে বসিয়া আমরা কিছুক্ষণের জন্য ইন্সিওরেন্সের দালালি বিস্মৃত

হইয়া গেলাম।

খিন্‌সি হ্রদে উঠিবার সময় পাহাড়ের পাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পথ। অনেক দূর উঠিয়া গেলে শৈলবেষ্টিত হ্রদের শান্ত জলরাশি দৃষ্টিগোচর হয়। চতুর্দিকের শৈলসানু ঘন বনে সমাকীর্ণ, স্থানটা নিতান্ত নির্জন। একদিকে অপরাহ্নের ছায়া, অপর পারের পাহাড়ের গায়ে হলুদ রঙের রোদ। হ্রদের এপারের ডাকবাংলোয় গিয়া আমরা চৌকিদারকে ডাকিয়া চেয়ার বাহির করাইয়া বসিলাম। চৌকিদার আমাদের নির্দেশমত চায়ের জল চড়াইতে ছুটিল।

নবীনদা ও আমি হ্রদের জলে স্নান করিবার জন্য নামিলাম। বনের মধ্যকার সরু পথ ধরিয়া ধরিয়া কতদূর নামিয়া গেলাম দুজনে। মুলো এসব ভালবাসে না, সে ডাকবাংলোর বারান্দাতে বসিয়াই রহিল। জলের উপরে বুনো শিউলি ফুলের রাশি সকালের রোদে ঝরিয়া পড়িয়াছে—দু তিন দিনের জমানো ফুলের রাশ। আমরা জলের ঢেউ দিয়া একপাশে সরাইয়া স্নান করিলাম।

নবীনদা বলিলেন,—বাঘ নেই তো? বড্ড জংগল চারিধারে—

—আশ্চর্য নয় কিছু।

—মুলোটাকে বাঘে না নিয়ে যায়। একা বসে আছে—

—কেন, ড্রাইভার?

—ও চৌকিদারের সংগে গিয়েছে। বলে গেল ফিরতে আধঘণ্টা দেরী হবে, দুধ আনতে গেল। ভয়ে ভয়ে উপরে উঠিয়া দেখি মুলো নির্বিকারচিত্তে খবরের কাগজ পড়িতেছে। নাগপুর হইতে আনা বম্বে ক্রনিক্‌ল্‌, আগের তারিখের। আমাদের দেখিয়া বলিল—আমেদাবাদের দুটো মিলে স্ট্রাইক হয়েছে বড় জোর—

নবীনদা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—মুলোর কাণ্ড শোন—এমন একটা জায়গায় এসে ওর এখন আমেদাবাদের মিলের কথা বড্ড দরকারী হোল!

কিছুক্ষণ থাকিতে ইচ্ছা ছিল কিন্তু ড্রাইভার তাড়াতাড়ি করিতে বলিল। পাহাড়ের পথ, তাহার গাড়ীর আলোটা ভাল নাই—আমরা দেরি করিলে শেষে মুশকিলে পড়িতে হইবে।

মুলো বলিল—চলুন মিঃ বোস। আজ যাওয়া যাক, আর কি দেখবেন, দেখা তো হয়ে গেল—

নবীনদা বলিলেন—তোর মুণ্ডু হোল—হতভাগা হর্স র‍্যাডিশ!

মুলো বলিল—কি?

—মানে, আমাদের এখন যাওয়াই দরকার তাই বলছি।

—হোয়াট হ্যাজ হর্স র‍্যাডিশ টু ডু উইথ ইট?

—বাংলা ইডিয়ম—ওর মানে মুলো খেতে যেমন ঝাল, অথচ দেখতে রাঙা তেমনি এ জায়গা যতই ভাল হোক—মানে—এই গিয়ে—

আমি নবীনদার সাহায্যে অগ্রসর হইয়া বলিলাম—ঠাণ্ডা লাগতে পারে তাই তাড়াতাড়ি যাওয়া উচিত—বাংলা ইডিয়ম। মুলো হাসিতে লাগিল। বলিল—ফ্যানি, দ্যাট র‍্যাডিশ ইজ অলওয়েজ মিক্সড্‌ উইথ ইওর বেংগলি ইডিয়ম্‌স্‌।

খিন্‌সি হ্রদের পাহাড় হইতে নামিয়া রিজার্ভ ফরেস্টের কুসুমাস্তৃত পথে আমরা রামটেক পাহাড়ের তলদেশে পৌঁছিলাম। নবীনদার আদেশে ড্রাইভার নাগপুরের রাস্তা ছাড়িয়া বন্য আতাবৃক্ষ শোভিত রামটেক পাহাড়ের ঘোরানো পথ ধরিল। মুলোর এ জিনিসটা মনঃপূত হইল না। সে দু-একবার মৃদু প্রতিবাদও করিল, বিশেষ কোনও ফল হইল না। আসল কথাটা আমরা জানিতাম। মিস সোরাবজি নামে একটি পার্শী তরুণীর

সঙ্গে মুলো ভাব জমাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে আজ মাস ছ-সাত ধরিয়া। মেয়েটির বাবা নাগপুরের ডাক্তার, তাহাদের বাড়ী সন্ধ্যাবেলাটা কাটানো মুলোর অনেক দিনের অভ্যাস, যদিও মেয়ের বাপ-মা তাহা যে খুব পছন্দ করেন তাহা নয়। মুলোর মুখে শুনিয়াই বুঝিয়াছি তাঁহারা মুলোকে এমন ইঙ্গিতও করিয়াছেন যে, এত ঘন ঘন সে যেন তাঁহাদের বাড়ী না আসে। কিন্তু মুলোর বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তির স্থুল আবরণ তাঁহারা ভেদ করিতে সমর্থ হন নাই।

পাহাড়ের নীচে গাড়ি রাখিয়া আমরা সিঁড়ি বাহিয়া উপরিস্থিত রামসীতার মন্দিরে উঠিতেছিলাম।

মুলো বলিল,—মিঃ রায়, একদিন মিস সোরাবজি বলেছিল রামটেকের মন্দির দেখবে, বড় ভাল হোত যদি আজ আনতাম।

নবীনদা আমার গা টিপিলেন। আমার হাসি পাইতেছিল, অতি কষ্টে চাপিলাম!

পাথরে বাঁধানো অনেকগুলি সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে উঠিলাম। সিঁড়ির দু-ধারে অসংখ্য বন্য আতা, পড়াসি ও তিন্দুক গাছের নিবিড় বন। ডান দিকে অনাবৃত পর্বতগাত্র হেলিয়া থাকিয়া দৈত্যপুরীর মাইলস্টোনের মত দেখাইতেছে। সন্ধ্যার ধূসর ছায়ামাখা নিস্তব্ধতার মধ্যে পেশোয়াদের নির্মিত এই শৈলমন্দির দুর্গটি ভারতের অতীত গৌরবের বার্তা বহন করিয়া আনিয়া দিতেছিল আমাদের কানে কানে। শুধু সে গাম্ভীর্যময় নিস্তব্ধতার তপোভঙ্গ হইতেছিল মুলোর অসম্ভব বকুনি দ্বারা। উপরে উঠিয়া আমরা বিগ্রহ দর্শন করিলাম। সামান্য কিছু প্রসাদ ও চরণামৃত পাইলাম। উঁচু পাহাড়ের উপর মন্দির, অনেক নীচে একদিকে রামটেকের বাজার।

মুলোর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা হইত, যদি সে এখানে আসিয়া মিস সোরাবজি সম্বন্ধে কিছু বলিত—আমরা ভাবিতাম লোকটার প্রাণে তবুও কবিত্ব আছে। কিন্তু মন্দির-দুর্গের চওড়া প্রাচীরের উপর বসিয়া আমরা যখন দূরের জ্যোৎস্নালোকিত খিন্‌সি হ্রদের দিকে চাহিয়া আছি, মন্দিরে প্রাচীন মারাঠী পুরোহিত রামসীতার আরতি করিতেছেন, পেশোয়া-দের আমলের প্রথানুযায়ী আরতির সময় গম্ভীর নির্ঘোষে রণবাদ্য দামামা ও ডগর বাজিতেছে, ঐদিকে বহুদূরে কাম্‌টি ক্যাণ্টনমেণ্টের ক্ষীণ সারি, তখন যদি সে তাহার প্রণয়িনীর কথা তুলিত—আমরা ভাবিতাম এই রামগিরি আশ্রমে জনকতনয়ার স্নান হেতু পুণ্যোদকের স্পর্শে হর্স র‍্যাডিশ বুঝি কালিদাসের বিরহী যক্ষের দশা পাইয়া বসিল। কিন্তু তাহা হইবার নয়, সে মহাড়ম্বরে গল্প জুড়িয়া দিল—দেশের এক মিউনিসিপ্যাল কমিশনারকে সে কি করিয়া ভোট যোগাড় করিয়া দিয়াছিল। তাহা হইতে নামিল তাহাদের দেশে কি করিয়া 'ফুটেরি' তৈরি করে। আমরা কহিলাম—ফুটেরি কি?

মুলো হাত দিয়া গোলাকার জিনিস দেখাইবার ইঙ্গিতে বলিল—এই এত বড় বড়, আটার তৈরি, ভেতরে ছাতু, ঘুঁটের আগুনে সেঁকে ঘি দিয়ে খায়, আলুর চোখা আর বেগুনের ভর্তার সঙ্গে।

নবীনদা বলিলেন—মুলোর সঙ্গে নয়?

—নো, র‍্যাডিশ ইজ নট ইট্‌ন্—

—আশ্চর্য!

—হোয়াই আশ্চর্য? র‍্যাডিশ ইজ মাচ রেলিশ্‌ড্ ইন বেঙ্গল ইট সিম্‌স্—বাট নট সো ইন আওয়ার কাণ্ট্রি।

—বুঝলাম।

—আচ্ছা, এই দুর্গের পাঁচিলটা এত চওড়া কেন?

মুলোর স্থুল বুদ্ধিতে আর কতটুকু বোঝা সম্ভব? তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম,

পেশোয়াদের সময়ে এই মন্দিরটি দুর্গের মত করিয়াই তৈরি হয়—আসিবার পথে অত-গুলি ফটক দেখিয়া তাহা সে নিশ্চয়ই কিছু আন্দাজ করিয়াছে। পেশোয়া বালাজি বিশ্বনাথ এই মন্দির-দুর্গ নির্মাণ করিয়া এখানে একটি গুপ্ত ধনাগার স্থাপন করেন। আকস্মিক রাষ্ট্রবিপ্লবের দিনে নাগপুর হইতে বিশ-বাইশ ক্রোশ দূরবর্তী এই অরণ্যাবৃত পাহাড়ের চূড়ায় রামসীতার মন্দিরে তাঁহার ধনভাণ্ডার অনেকটা নিরাপদ থাকিবার ভরসাতেই এটি নির্মিত হয়। বিশেষত তখনকার যুগে না ছিল রেল, না ছিল এখনকার দিনের মত চওড়া মোটর রোড! রামটেকের পাহাড় ছিল দুর্গম অরণ্যভূমির অন্তরালে—শত্রু সন্দেহ করিবে না যে জংগলের মধ্যে কোথায় কোন্ পাহাড়ে রামসীতার মন্দির—সেখানে আবার ধনভাণ্ডার থাকিতে পারে। তবুও সাবধানের মার নাই ভাবিয়া বালাজি বিশ্বনাথ মন্দিরটিকে দুর্গের মত করিয়াই নির্মাণ করেন—মন্দিরকে মন্দির, দুর্গকে দুর্গ। আবশ্যক হইলে কিছুকাল ধরিয়া এখানে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করাও চলিতে পারিত। জলের অভাব দূর করিবার জন্য পাহাড়ের নীচে একটি পুষ্করিণী খনন করা হয়—আসিবার সময় যে পুকুরটা ডান দিকে পড়িয়াছিল। মুলো আমার মুখে রামটেকের ইতিহাস শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে বলিল—আপনি এসব নিয়ে খুব নাড়াচাড়া করেছেন দেখছি, বহুৎ পড়াশুনো করেছেন। এইজন্যেই তো বাঙালীদের আমি বড় ভালবাসি—বাঙালীর সংগে আলাপ করলে আমার মন বড় খুশী হয়।

মন্দিরের আরতি থামিয়াছিল। আমি বলিলাম—এখানে একটা অস্ত্রাগার আছে বইয়ে পড়েছি—চলুন সেটা দেখে আসি সবাই, এখনও আছে বলে জানি।

মন্দিরের পুরোহিত বৃদ্ধ রংড়ে ব্রাহ্মণ, পূর্বেই পরিচয় পাইয়াছিলাম। তিনি প্রথমে মৃদু আপত্তি তুলিলেন, রাত্রে অস্ত্রাগার দেখানোর নিয়ম নাই—অবশেষে আমাদের নিতান্ত নাছোড়বান্দা দেখিয়া, বিগ্রহ যেখানে থাকেন তাহার পাশের একটা কুঠুরি খুলিয়া দিলেন। আমরা টর্চের আলোয় সেখানে মারাঠী যোদ্ধাদের প্রকাণ্ড চওড়া দুধার তলোয়ার, সাতহাত লম্বা বন্দুক, বিশাল ঢাল, লোহার জালের টুপি ও বর্ম, নানা রকমের তীর, আরও কত কি অস্ত্রশস্ত্র দেখিলাম। যোদ্ধৃজাতির যুদ্ধের উপকরণ পাঁচ-রকম থাকিবে—ইহার মধ্যে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। প্রশংসার ভাব মনে জাগিত হয়তো, যদি বর্গির হাঙ্গামার কথা মনে না উঠিত।

মুলো বলিল—এ আর কি, যোধপুর ওল্ড ফোর্টে একটা মিউজিয়াম আছে, সে এর চেয়ে অনেক বড়।

কোন কিছু দেখিয়া আশ্চর্য হইবার ক্ষমতা একটা বড় ক্ষমতা—এ ক্ষমতা সকলের থাকে না, মুলোর মধ্যে তাহা থাকিবার আশা করি নাই ; সুতরাং বিস্মিত হইলাম না।

নবীনদা বলিলেন—আপনাদের দেশে যোধপুরে একবার নিয়ে যাবেন আমাদের? অস্ত্রাগার দেখে আসব।

—নিশ্চয়ই। ইন ফ্যাক্ট. আমাদের নিজ বাড়ীতেই একটি অস্ত্রাগার আছে, আমার পূর্বপুরুষের আমলের।

—বলেন কি মিঃ শুকরাম!

—হাঁ। আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ছিলেন আওরঙজেবের আমলের লোক। তাঁর নাম—আচ্ছা নোটবুক দেখে বলব। আমরা হলাম ডোগরা রাজপুত—ওয়ারিয়ার ক্ল্যান ডোগরা রাজপুত জানেন তো? আমাদের সেই পূর্বপুরুষ. তিনি লড়েছিলেন জয়সিংহের সৈন্যদলে। এখনও অস্ত্রাগারের পুজো হয় আমাদের বাড়ী। ধুপধুনো জ্বালাতে হয়. সিঁদুর মাখাতে হয়—

নবীনদা বাংলায় বলিলেন—সাবাস মুলো! ডোগরা রাজপুত হয়ে মরতে এসেছ কেন

ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি নিতে? ও কি তোমার হবে?

আমিও বাংলায় জবাব দিলাম—বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া, মুলোর দুকূলই গিয়েছে। অস্ত্র ধরবার ক্ষমতা নেই, লেখাপড়ারও বুদ্ধি নেই—একে বলে হর্স র‍্যাডিশ।

মুলো বলিল—কি?

নবীনদা বলিলেন—কি রকম বড় বংশে জন্ম আপনার তাই বলছি—ডোগরা রাজপুত যোদ্ধা জাত কিনা!

মুলো বলিল—যাক, মিঃ বোস, একটু চা খাওয়ার যোগাড় হয় না? চা না খেলে আর তো চলে না।

মন্দির হইতে নামিয়া রামটেকের বাজারে চায়ের দোকানে চা পান করিয়া নাগপুরে ফিরিলাম। এত ভাল ভাল জিনিস যে সারাদিন ধরিয়া দেখিলাম মুলো সেসব সম্বন্ধে একটি কথাও বলিল না। তাহার যতসব বাজে গল্প আর অনবরত বকুনির জন্য আমরা নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করিবার অবকাশ পাইলাম না।

পরদিন সকালবেলা মুলো আসিয়া হাসিমুখে বলিল—আপনাদের ওবেলা আমার সঙ্গে যেতে হবে।

জিজ্ঞেস করিলাম—কোথায়?

—মিস সোরাবজির বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ।

—আমরা কেন?

—আপনাদের নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে অনুরোধ করেছেন ওঁর বাবা।

আমরা বিকালে সাজগোজ করিয়া বসিয়া আছি, মুলো আর কিছুতেই আসে না। নবীনবাবু বলিলেন,—ওহে, মুলোটার মৃতলর শুনে আমাদের হাইল্যান্ড ড্রাইভে বেড়াতে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল দেখছি। ও এল না।

এমন সময় মুলো আসিয়া হাজির হইল—সে নিখুঁত সাজপোশাক করিয়া কোটের বোতামে গোলাপ ফুল গুঁজিয়া রুমালে এসেন্স ঢালিয়া আসিয়াছে এবং বোঝা গেল যে সে কিছু পূর্বে নাপিতের দোকান হইতে চুলও কাটিয়া আসিয়াছে।

মিস সোরাবজির পিতা এখানকার ডাক্তার। পূর্ব হইতেই তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয় ছিল—বৃদ্ধ অতি অমায়িক লোক। দেখিলাম তিনি শুধু আমাদের তিনজনকে চা-পার্টিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন তাহা নহে, শহরের আরও আট-দশটি ভদ্রলোককে বলিয়াছেন—তাঁহার পুত্রের জন্মতিথি উৎসব চা-পার্টির আসল কারণ।

মিস সোরাবজি আঠার-উনিশ বছরের একহারা মেয়ে, আমরা তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছি। খাঁড়ার মত উঁচু সুচাল নাকের জন্য কোনদিনই মিস সোরাবজিকে বিশেষ সুন্দরী বলিয়া আমার মনে হয় নাই—যদিও রং বেশ ফরসা ও গলার সুর কষ্টকৃত মেমসাহেবিয়ানার দোষমুক্ত না হইলেও মন্দ নয়। মেয়েটি নাকি লেখাপড়াতে ভাল।

একটা জিনিস লক্ষ্য করিলাম আমরা দুজনেই। মিস সোরাবজি মুলোর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট—অন্তত হাবভাবে আমাদের তাহাই মনে হইল। বাহিরের বারান্দায় দুজনে নির্জনে মাঝে মাঝে যাইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। মুলোর এতটুকু ইচ্ছাও যেন মিস সোরাবজি তখনই পূর্ণ করিতে ব্যগ্র। অতিথির প্রতি যতটুকু কর্তব্য করা উচিত শেষ করিয়া মেয়েটি মুলোকে লইয়া সব সময় ব্যস্ত রহিল।

চা-পার্টি হইতে ফিরিবার পথে মুলো কি আমাদের ছাড়ে—সঙ্গে সঙ্গে আসিল!

কিন্তু তাহার যা স্বভাব—মিস সোরাবজি সম্বন্ধে একবারও একটি কথাও বলিল না। চা-পার্টির কথাই যেন তাহার মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে এটুকু সময়ের মধ্যে।

নবীনদা বাংলায় বলিলেন—বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা! কলেজের বেশ ভাল মেয়ে বলে শুনেছি—র‍্যাডিশটার মধ্যে কি পেলে খুঁজে!

দু দিন মুলো কি জানি আমাদের বাংলোতে আসিল না। তৃতীয় দিন সকালবেলা একখানা মোটরগাড়ী বাসার সামনে দাঁড়াইতেই আমি আগাইয়া গেলাম—নবীনদা তখন বাসায় নাই। মোটর হইতে নামিলেন ডাঃ সোরাবজি। আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—শুকরাম কি এখানে এসেছিল? একটা জরুরী কথা আছে। আপনারা ওকে কতদিন জানেন?

—খুব বেশি দিন নয়। কেন বলুন তো?

—ও আমার কাছে কিছু বলে না। কিন্তু আমার মেয়ের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেছে। আমি ওকে বাড়ী ঢুকতে দেব না। ওকে আপানারা বারণ করে দেবেন।

মুলোর হইয়া ওকালতি করিবার ইচ্ছা হইল। বলিলাম—ওকে কি উপযুক্ত পাত্র বলে বিবেচনা করেন না?

ডাক্তার সোরাবজি রাগের সঙ্গে বলিলেন, ও একটা লোফার—ওর সঙ্গে আমাদের মেয়ের বিয়ে হবে কেন? ওরা হল ডোগরা—আমি আর্মিতে ছিলাম, ওরা সেখানে সাধারণ সেপাই-এর কাজ করে। সুবাদার হতে কাউকে দেখিনি। কেন জানেন?

বলিলাম—কি?

—খুব সাহস আছে, যা বলবেন তাই করবে—কিন্তু—

বলিয়া ডাক্তার সোরাবজি আঙুল দিয়া নিজের মাথায় দু-তিনবার টোকা দিয়া ঘাড় নাড়িলেন।

—তাহলে বলে দেবেন দয়া করে।

—আজ্ঞে ওটা বলা আমাদের পক্ষে একটু শক্ত, বুঝতেই পারেন।

—আমি বললে একটু রূঢ় হয়ে যাবে।

—কিন্তু একটা কথা বলি যদি কিছু মনে না করেন—মিস সোরাবজির মনোভাব কেমন মিঃ শুকরামের ওপর, সেটা একবার—

—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। ওর মত একটা বাজে অপদার্থ লোকের হাতে মেয়ে দেব? ও কোনওকালে বি-এ পাশ করতে পারবে? কোনদিন নয়। আমার মেয়ে অনার্স ক্লাসের ছাত্রী, সকলের চেয়ে ভাল ছাত্রী—ওর সঙ্গে তার বিয়ে! হাসির কথা।

পরদিন সকালে মুলো আমার কাছে আসিয়া গোপনে বলিল, মিঃ রায়, সব ঠিক হয়ে গেল।

—কি ঠিক হয়ে গেল মিঃ শুকরাম?

—জালুর সঙ্গে বিয়ের। অবিশ্যি ওর সঙ্গেই কথা হোল—ওর বাবা এখনও জানেন না।

—খুব খুশী হলাম শুনে। তবে ডাক্তার সোরাবজিকে একবার বলুন।

—সে হয়ে যাবে। তা—বললেও হয়।

নবীনদা শুনিয়া বলিলেন—বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার—মুলোর সঙ্গে অমন একটি চমৎকার মেয়ের বিয়ে!

ইতিমধ্যে মুলোর পরীক্ষা পড়িল—সে বি-এ পরীক্ষা দিয়া কিছুদিনের জন্য দেশে গেল। আমাদের বার বার অনুরোধ করিয়া গেল, আমরা যেন তাহাকে না ভুলি—চিঠি দিলে যেন উত্তর দিই।

দুই মাস কাটিয়া গেল।

হঠাৎ একদিন আমাদের অত্যন্ত আশ্চর্য করিয়া দিয়া ডাক্তার সোরাবজি তাঁহার কন্যার বিবাহে আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। শুনিলাম পাত্র পুণার মেডিকেল অফিসার, আই এম এস পদবীর লোক। মোটা বেতন পান।

আমরা বন্ধুর প্রতি কর্তব্য স্মরণ করিয়া বলিলাম,—ও, আমরা জানতাম মিঃ শুকরাম—

বৃদ্ধ ডাক্তার রাগত-ভাবে বলিলেন, সে একটা লোফার, আগেই বলেছি। গেজেটটা দেখেছেন! তার নাম খুঁজে দেখবেন কোথাও নেই। আর আমার মেয়ে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেয়েছে।

আমরা সত্যিই দুঃখিত হইলাম মুলোর জন্য।

এত কথার পর বিকেলে যখন মুলো আসিয়া জানাইল মিস সোরাবজি ও আমাদের লইয়া সে পরদিন পিকনিকে যাইবে, তখন একটু আশ্চর্য হইয়া গেলাম। নবীনদা হাঙ্গামায় পড়ার ভয়ে প্রথমটা যাইতে চাহিলেন না—কিন্তু শেষে যখন মুলোর মুখে শুনিলাম, মিস সোরাবজির ভাইও এই সঙ্গে যোগ দিবে তখন আমাদের যাইতে কোন আপত্তি রহিল না।

গোরেওয়াড়া হ্রদের ধারে পিকনিক ঠিক হইয়াছিল। পরদিন সকালে দল বাঁধিয়া দুখানা মোটরে হ্রদের ধারে গিয়া পেঁৗছিলাম। নাগপুরের পাহাড়ের মধ্যে যতগুলি হ্রদ আছে, এটি সর্বাপেক্ষা বড়, দৃশ্যও চমৎকার। আমরা উত্তর পাড় ধরিয়া হ্রদের ওপারে অনুচ্চ পাহাড়ের তলায় বড় বড় তিন্দুক গাছের ছায়াতে আমাদের বনভোজনের স্থান নির্দেশ করিলাম। মিস সোরাবজির ভাইটির বয়স চোদ্দ-পনেরর বেশি নয়, বালক মাত্র—তাহার মনে দেখিলাম খুব ফূর্তি, হ্রদের জলে সাঁতার কাটিবার জন্য সে স্নানের পোশাক পর্যন্ত সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে।

মিস সোরাবজি মেয়েটিকে ঠিক বোঝা কঠিন। এদিনও দেখিলাম মুলোর প্রতি তাহার যথেষ্ট আকর্ষণ, তাহার এতটুকু সুখ-সুবিধার জন্য মেয়েটির কি উদ্বেগ। অবশ্য আমাদের দুজনেরও সঙ্গে সে ভাল ভাবেই মিশিল। এতটুকু অহংকার নাই, বাঙালী মেয়ের মতনই সরলতা, পরের সুখ-সুবিধা দেখার অভ্যাস, নিজের হাতে সেবা করিবার ঝোঁক। সে যে বি-এ ক্লাসের ভাল ছাত্রী, তাহার কথাবার্তা হইতে এতটুকু তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

আমাকে বলিল—মিঃ রায়, একটা বাংলা গান করুন না?

আমি গান গাহিতে ভালই পারিতাম। এখন চর্চার অভাবে গলায় সুর নাই—সে আপত্তি বলা বাহুল্য টিকিল না, পর পর তিনটি রবীন্দ্রনাথের গান গাহিতে হইল। বাঙালী-সমাজ নয়, বিশেষত কলিকাতা হইতে বহুদূরে, কাজেই ভুল ধরিবার কেহ নাই—বেপরোয়া হইয়া গাহিলাম। প্রশংসাও অর্জন করিলাম মুলো ও মিস সোরাবজির কাছে।

মুলো বলিল—ওয়ান্ডারফুল। এমন গান যে আপনি গাইতে পারেন, তা জানতাম না বাস্তবিক।

মিস সোরাবজি বলিল—টাগোরের কবিতা মুখস্থ আছে?

—দু-একটা—

—আবৃত্তি করুন না! আমাদের কলেজে মিঃ সেনের মেয়ে একবার করেছিল, বড় ভাল লেগেছিল আমার।

'জীবনদেবতা' কবিতাটি মুখস্থ ছিল ভাল, আমার মুখে শুনিয়া মিস সোরাবজি উচ্ছ্বসিত সুরে বলিল—ভারি সুন্দর!

তাহার পর সে তাহার শুভ্র গ্রীবাটি দুলাইয়া আবদারের সুরে বলিল—মিঃ রায়,

আর একটা আবৃত্তি করবেন দয়া করে?

—আগে আপনি একটা ইংরেজি আবৃত্তি করুন!

—করবেন তাহলে?

মিস সোরাবজির খড়্গের মত সূক্ষ্ম ও উগ্র নাসিকাকে ক্ষমা করিলাম, মেয়েটি অত্যন্ত চালবিহীন ও অমায়িক, তখনই সে ব্রাউনিঙের 'বৈয়াকরণের শবযাত্রা' নামে বিখ্যাত কবিতাটি সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিয়া আমাদের মুগ্ধ করিল।

পুনরায় আমাকে একটি রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করিতে হইল। এবার হাত-মুখ নাড়িয়া শিশির ভাদুড়ীর অনুকরণে 'বন্দীবীর' আবৃত্তি করিয়া ইংরেজিতে ভাবার্থ বুঝাইয়া দিলাম। পূর্বের কবিতাটি অপেক্ষা এইটিই মিস সোরাবজির বেশি ভাল লাগিয়াছে, তাহা তাহার কথার সুরে ও চোখ-মুখের ভাবে আমার বুঝিতে দেরি হইল না। আমায় বলিল—দেখুন রায়, টাগোরের কবিতার ইংরিজি অনুবাদ পড়েছি কিন্তু বাংলা ভাষার ধ্বনি আর ঝংকারের মধ্য দিয়ে যে ওসব কবিতা এমন চমৎকার শোনায়, তা আমি আজ এই প্রথম জানলাম। এর আগে একবার বাংলা আবৃত্তি শুনেছিলাম কলেজে, সে তেমন কিছু নয়। আমার বাংলা শেখার বড় ইচ্ছে, কি করে শেখা যায় বলতে পারেন?

মুলো দেখিলাম খুব খুশী হইয়াছে—কবিতা শুনিয়া নয়, কারণ সে সূক্ষ্ম রসবোধ তাহার ছিল না—বাংলা কবিতা ও প্রকারান্তরে বাঙালীর প্রশংসা করা হইতেছে, এইজন্য। লোকটা অন্ধ বাঙালীভক্ত।

বলিল—জালু, তুমি মিঃ রায়ের কাছে কেন বাংলা শেখ না? বেশ ভাল হবে—

মিস সোরাবজি পুনরায় আবদারের ভঙ্গিতে তাহার সুঠাম শুভ্র গ্রীবাটি দুলাইয়া বলিল—শেখাবেন আমাকে মিঃ রায়? আমি রোজ আপনার বাসায় আসব এক ঘণ্টা করে?

মুলো পরম উৎসাহের সুরে বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ বেশ, বেশ!

নবীনদা বাংলায় বলিলেন—ওর তাহলে বড় সুবিধে হয়, দুবেলা দেখা হয় কিনা। মুলোর কান্ড দেখ—সাধে কি বলে হর্স র‍্যাডিশ!

মুলো মিস সোরাবজির সঙ্গে কথা কহিতে অনমনস্ক ছিল, নবীনদার বাংলা কথা শুনিতে পাইল না—নতুবা বলিত, হোয়াট? কি বললে বাংলাতে?

আমি ভদ্রতা বজায় রাখিয়া বলিলাম—শেখালে তো বেশ হোত—কিন্তু আমাদের সময় নেই কিনা! দুজনকে টো টো করে সারাদিন নিজের কাজে বেড়াতে হয়, নইলে এ তো বড় আনন্দের কথা।

আমরা গোরেওয়াড়ার জলে নামিয়া সবাই স্নান করিলাম, মিস সোরাবজি পর্যন্ত। দুপুর ঘুরিয়া গিয়া একদিকে ছায়া পড়িয়াছে—এখনও সেদিনকার সেই দিনটি চোখের সামনে যেন ভাসিতেছে—একদিকে অনুচ্চ কালো পাথরের পাহাড়, অন্যদিকে শিউলি ও তিন্দুক গাছের সারি, দু-দশটা বড় বড় শালও আছে। আকাশে খর রৌদ্র, দুপুরের রোদে ঝক-ঝক করা চোখ-ঠিকরানো ছোট ছোট ঢেউ-এর সারি হ্রদের বুকে, অথচ এপার অনেকখানি ছায়াসিক্ত। আঁটসাট স্নানের পোশাকে শুভ্রদেহ কৃশাঙ্গী ভেনাসের মত পার্শী তরুণী জালু শৈলবেষ্টিত হ্রদের নীল জল হইতে উঠিতেছে—দূরে ওপারে গোরেওয়াড়ার উঁচু পাড়ের উপর একটা বাংলো ধরনের বাড়ী, বোধ হয় এক ডাকবাংলো।

আমরা রান্না করিয়া স্নান করিতে গিয়াছিলাম, মিস সোরাবজির নিজের হাতের রান্না ভাত ও ডাল, কিছু মাংস, দু'একটা ভাজা। পার্শী ধরনের নুন দিয়া রান্না ভাত ও মশলাবিহীন সাদা রঙের মাংসের স্টু ও বেশনে টোমাটো ভাজা—সবগুলিই আমার মুখে সমান অখাদ্য। ভাগ্যে বুদ্ধি করিয়া নবীনদা কিছু আচার আনিয়াছিলেন—তাই দিয়া গ্রাস কয়েক ভাত খাওয়া গেল। মুলো পোষা কুকুরটির মত মিস সোরাবজির পিছনে

পিছনে ঘুরিতে লাগিল এবং তাহার রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল।

একটা জিনিস লক্ষ্য করিবার মত বটে—দেখিলাম তাহার বাঙালী-প্রীতি তাহার প্রণয়িনীর প্রতি ভালবাসা অপেক্ষা কম নয়। বাঙালীর সব-কিছুর সে আজ ভক্ত, আমাদের কত কি ব্যাপারের প্রশংসা সে শতমুখে যদি বলিতে পারিত তাহার প্রণয়িনীর নিকট—তবে যেন তাহার তৃপ্তি হইত। বলিল, জান জালু, ওঁরা বাংলাতে মুলো কথার বস্তু ব্যবহার করেন, প্রায়ই ওঁরা বলেন র‍্যাডিশ—আমি শিখে নিয়েছি, একটা বাংলা ইডিয়ম, মানে 'খুব ভাল'।

নবীনদা অনুচ্চ স্বরে বলিলেন, মরেছে হতভাগা!

মিস সোরাবজি আমাদের দিকে চাহিয়া কৌতূহলের সুরে বলিল—ও, হাউ ইণ্টারেস্টিং। সত্যি মিঃ রায়—আপনারা বুঝি—ইত্যাদি।

মেয়েটিকে যা তা বুঝাইয়া ও অন্য কথা পাড়িয়া চাপা দিলাম জিনিসটা।

বেলা তিনটার সময় আমাদের মোটর নাগপুর হইতে ফিরিয়া গোরেওয়াড়ার ওপারে আসিয়া ভেঁপু দিল। সকালে পৌঁছাইয়া দিয়া গাড়ী দুখানা চলিয়া গিয়াছিল। আমরা যাওয়ার উদ্যোগ করিতে মিস সোরাবজি বলিল—সূর্যাস্তটা দেখে যাবেন না?

—ওদিকে দেরি হয়ে যাবে ফিরতে—আপনার বাবা কি ব্যস্ত হয়ে উঠবেন না?

—কিছু না মিঃ রায়, ভাববেন না। আমি বলে এসেছি—আমি ওই পাথরের ওপার থেকে দেখব সূর্যাস্তটা। তুমি এস না শুকরাম।

—যেমন ইচ্ছে আপনার। শীগগির আসবেন।

অদ্ভুত সূর্যাস্ত। এখানে আসিয়া অবধি হাইল্যাণ্ড ড্রাইভ হইতে সাতপুরা শৈল-মালার দিকে প্রায়ই দেখিতেছি। সন্ধ্যার ছায়া নামে, আমি সামান্য শৈত্যের জন্য গরম আলোয়ান ভাল করিয়া গায়ে টানিয়া দিই, হাইল্যাণ্ড ড্রাইভে সাহেব মেমদের মোটরের ভিড় বাড়ে, আম্বাসিরি লেকে পার্কে দলে দলে সুসজ্জিতা নরনারীরা বেড়াইতে আসিতে আরম্ভ করে, আমি বড় একটা শাল গাছের তলায় নির্জন প্রস্তরখণ্ডে বসিয়া দেখি ধীরে ধীরে সাতপুরা শৈলশ্রেণীর আড়ালে লাল সূর্যটা নামিয়া পড়িতেছে। আজও দেখিলাম। গোরেওয়াড়া হ্রদের বিস্তীর্ণ জলরাশি যেন আবীর-গোলা টকটকে লাল। যেমন সূর্য অস্ত গেল, অমনি চারিধারে ঘনছায়া নামিল, মোটর দুখানা অধীরভাবে ভেঁপু বাজাইতে লাগিল, বাদুড়ের দল পাহাড়ের দিকে ফিরিতে লাগিল, ক্রমে ছায়া ঘন হইয়া অন্ধকার নামিল।

নবীনদা বলিলেন,—কই, মিস সোরাবজি কোথায়?

—এই তো ছিল, সূর্যাস্ত ভাল দেখা যাবে বলে পাথরটার ওপারে গিয়েছে বোধ হয়।

এমন সময় মুলোর সঙ্গে মিস সোরাবজি পাথরের ওপাশের ঘাট থেকে উঠিয়া আসিল। উভয়েই স্নান করিয়া আসিল এই অবেলায়, দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম।

মুলো কৈফিয়তের সুরে বলিল—বড় গরম, তাই জালু বললে, বেশ স্নান করা গেল।

নবীনদা বাংলায় বলিলেন—তার পর তোমার জালুর নিউমোনিয়া হলে তার বাবা দেখে নেবে তোমাকে—মুলোগিরি খাটবে না তখন—

মুলো বলিল—কি?

আমি উত্তর দিলাম, জালু নামটা বড় চমৎকার! মিঃ বোসের মতে। অবশ্য আমারও সেই মত।

মিস সোরাবজি সলজ্জ হাসিয়া মেমসাহেবী সুরে বলল—ও, ইউ হরিড ক্রিচার্স্!

আমরা গাড়ীতে উঠিয়া চলিলাম।

সাউথ টাইগার গ্যাপ রোডের কিছু পূর্বে পাহাড়ী ঢালুতে অনেক বনশিউলি ফুল

ফুটিয়া আছে দেখিয়া মেয়েটি বলিল—ও মিঃ রায়, কি চমৎকার ফুল ফুটেছে! শেফালি—না?

মোটর থামাইয়া মুলো গোটাকয়েক ডাল ভাঙিয়া আনিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, জ্যোৎস্নার ক্ষীণ লেশ মাটির বুকে। সাউথ টাইগার গ্যাস রোডের এদিকটা নির্জন, এ সময় খুব বেশী লোকজন নাই। হঠাৎ মেয়েটি বলিল—চলুন, আম্বাসিরি লেক দেখে আসি। এ জ্যোৎস্নায় বেশ লাগবে।

আমরা সকলেই হতবুদ্ধি। আম্বাসিরির দিকে যাইতে হইলে আবার পাহাড়ে উঠিতে হইবে। বিপদে ফেলিল দেখিতেছি খেয়ালী পার্শী মেয়েটা। কি করা যায়, সুন্দরী তরুণীর আবদার উপেক্ষা করিবার সাধ্য নাই আমাদের—মোটর ঘুরাইয়া আবার সবাই পাহাড়ে উঠিয়া আম্বাসিরির দিকে ছুটিলাম। সেখানে, লেকের ধারে পার্কে বিভিন্ন বেঞ্চিতে তখনও কেহ কেহ বসিয়া আছে। ক্রমে সুন্দর জ্যোৎস্না উঠিয়া হ্রদের জলে পরিয়া সেদিনকার খিনুশি লেকের স্মৃতি মনের মধ্যে আনিয়া দিল। পাহাড়ের উপর হু হু ঠান্ডা বাতাসে সমস্ত শরীরের কাঁপুনি ধরিল। জনবিরল হ্রদ-তীরের পার্কটিতে দূরে দূরে দু-একটি নরনারী বেড়াইতেছে। ঠান্ডা লাগার ভয়ে সবাই নামিয়া চলিয়া গিয়াছে বলিয়াই আরও চমৎকার লাগিতেছিল, নতুবা সাধারণত আম্বাসিরিতে বিকালের দিকে বড় ভিড় থাকে।

মিস সোরাবজিকে বলিলাম—কেমন লাগছে?

সে মেমসাহেবী সুরে সরু মিষ্টি গলায় টানিয়া বলিল—ও, ইট্'জ ফা-ই-ন!

'ফা' হইতে 'ন' পর্যন্ত টানিয়া সুরের নামা-ওঠা করিয়া উচ্চারণ করিতে প্রায় পাঁচ সেকেন্ড সময় লইয়া মধুর ধরনে গ্রীবা বাঁকাইয়া মৃদু হাসির সঙ্গে কথাটা বলিল। এই তো কলেজের ছাত্রী, কতই বা বয়স, কুড়ি-একুশের বেশি নয়—এ সব শিখিল কোথা হইতে কে জানে। নবীনদা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বাংলায় বলিল—মেয়েটার আবার ভাবন দেখছ?

আমিও বাংলায় বলিলাম—আমেরিকান ফিল্ম থেকে হলিউডের অ্যাক্‌ট্রেসদের সুর নকল করেছে কষ্ট করে। গলা মিষ্টি বলে মানিয়েছে।

মুলোর মনে কোনও কবিত্ব নাই। সে দেখিলাম মেয়েটির সহিত সুতা ও চরকা-কাটা সম্পর্কে কি কথা বলিতেছে। মিস সোরাবজি আমার কাছে আসিয়া বলিল,—একটা কবিতা বলতে হবে—বলুন। এমন জায়গায় টাগোরের কবিতা একটি শুনব!

আবৃত্তি করিলাম—কি আর করি। মেয়েটির প্রাণে দেখিলাম সত্যই কবিত্ব আছে। সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল প্রশংসায়। কিছু না বুঝিলেও ভাষার ধ্বনিতে ও ঝংকারে সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় শেলির একটি কবিতা আবৃত্তি করিল।

বলিলাম—গান করুন না একটা!

মিস সোরাবজি হাসিয়া বলিল—ইংরিজি গান জানি, আপনাদের পছন্দ হবে না।

—ভারতীয় মেয়ে, দিশি গান শেখেননি কেন?

—আমাদের কমিউনিটির সাহেবিয়ানা এজন্যে দায়ী মিঃ রায়। বাবা গভর্নেস রেখে ছেলেবেলায় পড়িয়েছেন, গান শিখিয়েছেন—তারা যে পথে নিয়ে গিয়েছে, সেই পথে যেতে হয়েছে আমায়। এখন জ্ঞান হয়ে সব বুঝতে পারি। এখন আমি গান্ধীবাদী, তা জানেন? খদ্দর পরি অনেক সময়, মা পরতে দেন না—এই হোল কথা। ইচ্ছে হয় আমি শিখি ভারতীয় গান—খুব ভাল লাগে আমার।

নবীনদা হাসিয়া মনের আনন্দে একটা ভাটিয়ালি গান বেসুরে গাহিয়া ফেলিলেন। মিস সোরাবজিকে ইংরিজিতে তাহার অর্থও বুঝাইয়া দেওয়া হইল। গানে, গল্পে, কবিতা-

আবৃত্তিতে, হাসিখুশিতে সারাদিনটা কাটাইয়া রাত্রে যখন বাড়ী আসিয়া শুইয়া পড়িলাম—তখন যেন মাথার মধ্যে উগ্র মদের নেশা। নবীনদারও তাই, কারণ—তিনি আসিয়া পর্যন্ত গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতেছিলেন।

মিস সোরাবজির বিবাহের অল্পদিন পরেই আমরা দুই বন্ধু নাগপুর হইতে চলিয়া গেলাম। বছরখানেক পরে আবার একবার বিশেষ কাজে নাগপুরে আসি।

সংবাদ লইয়া শুনিলাম বৃদ্ধ ডাক্তার সোরাবজি ইতিমধ্যে মারা গিয়াছেন। তাঁহার পরিবারবর্গ কেহই এখানে নাই—বৃদ্ধের মৃত্যুর পরে তাহারা বোম্বাই চলিয়া গিয়াছে।

মুলোর খবর জানিবার বিশেষ ইচ্ছা সত্ত্বেও আমরা কাহাকে তার কথা জিজ্ঞাসা করিব বুঝিতে পারিলাম না। ডাক্তার সোরাবজি শহরের বিশিষ্ট নাগরিক হিসাবে সকলের নিকটই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু মুলো জনৈক বিদেশী তরুণ ছাত্র—অমন ছাত্র নাগপুরে বহু আছে—কে কাহার খবর রাখে! আমরা ছাড়া আর সে কাহার সঙ্গে মিশিত জানি না, সুতরাং মুলোর খোঁজ লইবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও উপায় হইল না।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সপ্তাহখানেকের মধ্যে একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে গোরেওয়াড়া হ্রদে বেড়াইতে গিয়া মুলোর দেখা পাইলাম। নবীনদা তাহাকে প্রথম দেখেন। একখানা পাথরে ঠেস দিয়া কে একজন নির্জনে বসিয়া আছে দেখিয়া নবীনদাই বলিলেন—ওখানে কে দেখ তো হে!

গোরেওয়াড়া শহর হইতে বহুদূরে, এত দূরে কেহ বেড়াইতে আসে না সাধারণত—স্থানটাও নির্জন পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে। আমি একটু কাছে গিয়া দেখি—মুলো! নিখুঁত সাহেবী পোশাক পরা সেই রকমই, তবে দাড়ি কামায় নাই, মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা।

ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম—মুলো একখানা খাতাতে কি লিখিতেছে। এত নিবিষ্টমনে লিখিতেছে যে, আমার পদশব্দ সে শুনিতে পাইল না। কবি হইয়া গেল নাকি ছোকরা?

তাহার পর আমাদের সঙ্গে সে নাগপুরে ফিরিল। শুনিলাম সে এবারও পরীক্ষায় পাশ করিতে পারে নাই। আমাদের পাইয়া মুলো ছেলেমানুষের মত খুশী। চাপেবার দুগ্ধমন্দিরে লইয়া গিয়া আমাদের মিষ্টান্ন শরবত খাওয়াইয়া দিল। শুনিলাম দেশে তাহার মা মারা গিয়াছেন এই বৎসরেই।

বলিল—বড্ড একলা বোধ করি এখানে। মিশব কার সঙ্গে? এখানে মেশবার লোক নেই। বাঙালীদের সঙ্গে মিশে আরাম। গোরেওয়াড়া লেকে মাঝে মাঝে গিয়ে বসে থাকি। বেশ লাগে। একদিন ওখানে বেশ কেটেছিল। মনে আছে সেই আমাদের পিকনিক? ওরা কোথায় যে তা তো জানি নে।

দেখিলাম মুলোর চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল একটা ছবি—কয়েক শত বৎসর পূর্বের রাজপুতানায় বিশাল মরুভূমির মধ্যে উটের পিঠে চড়িয়া ইহার সেই বীর পূর্ব-পুরুষ চলিয়াছে জয়সিংহের সৈন্যদলের সহিত দেওধার যুদ্ধে, সেলিমগড়ের যুদ্ধে—চওড়া গালপাট্টাওয়ালা রুক্ষ-দর্শন মুখাবয়ব, দীর্ঘ দেহ, পাশে খোলা দীর্ঘ দুধার তলোয়ার, হাতে সাত হাত লম্বা বন্দুক—মৃদুতা নাই, ভয় নাই—কবাটের মত বিশাল বক্ষে জ্বলন্ত দুঃসাহস—কাহার সাধ্য ছিল তাহার মনোনীত কন্যাকে স্পর্শ করে! সে ছিনাইয়া আনিত তাহার প্রণয়িনীকে যে কোন লোকের হাত হইতে। লড়িত, খুন করিত।

আধুনিক যুগের আবহাওয়ায় জয়সিংহের সৈন্যদলের সেই বীর নায়কের বংশধর এই

সাহেবী পোশাক-পরা, নিখুঁত টাই বাঁধা, ঘাড়চাঁচা, ক্লিন শেভ্‌ড, হাতে রিস্টওয়াচ বাঁধা ছোকরা নিতান্ত নিরুপায়। কবিতা লেখা বা চোখের জল ফেলা ছাড়া সে হারানো প্রণয়িনীর জন্য কি করিতে পারে? বিশেষত যখন দুইবার ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী না পাইয়া সে আরও দমিয়া গিয়াছে।

ছোকরার জন্য এই সর্বপ্রথম দুঃখ হইল।

বঙ্গশ্রী, কার্তিক ১৩৪৭

অভয়ের অনিদ্রা

অভয়ের সারারাত্রি ঘুম হইল না। শত চেষ্টা করিয়াও সে তাহার চক্ষু নিমীলিত করিতে পারিল না। সেই যে আচমকা কিসের যেন শব্দে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল, তার পর আর কিছুতেই সে ঘুমাইতে পারিল না। চক্ষু যেন তাহার ঠিকরাইয়া বাহির হইবার উপক্রম হইল। বেশ শান্তিতে সে ঘুমাইতেছিল, অকস্মাৎ কে যেন তাহার দ্বারে করাঘাত করিয়া গেল। সেই শব্দে অভয়ের সুপ্ত চেতনা জাগিয়া উঠিল। অভয় ধীরে ধীরে তাহার শয্যার উপর উঠিয়া বসিল, ধীরে ধীরে ক্ষীণপ্রায় হ্যারিকেনটি উজ্জ্বল করিয়া দিল, ধীরে ধীরে চারিদিকে সাবধানে চাহিয়া দেখিল। না, কোথাও এতটুকু অসামঞ্জস্য ঘটে নাই। যেখানকার জিনিসটি যেমন ছিল তাহা ঠিক সেখানেই আছে, একটুকু নড়ে নাই। অভয় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ভয় তাহার নিশ্চয় অহেতুক। সে প্রথমে ভাবিয়াছিল হয়তো ডাকাত পড়িয়াছে, কিন্তু পরক্ষণেই স্মরণ হইল ইহা কলিকাতা, ডাকাত পড়িবার সম্ভাবনা নাই আদৌ। তার পর মনে পড়িল হয়তো চোর পড়িয়াছে। অনেকক্ষণ কান খাড়া করিয়া রহিল। চোরের আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তবে কিসের এই বিকট শব্দ? অভয় ভাবিয়া ভাবিয়া আকুল হইল।

মুহূর্তে তাহার পাশের শূন্য বিছানায় নজর পড়িল। সাতদিন আগে ঐ শয্যা পূর্ণ ছিল। সাতদিন আগে তাহার এ গৃহ এমন মহাশূন্যতা প্রকট করিয়া খাঁ খাঁ করিত না। মনে পড়িল বেচারা বকুলের কথা—তাহার সহধর্মিণী, তাহার স্ত্রী, অগ্নিসাক্ষী করিয়া যাহাকে গৃহলক্ষ্মীরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিল। তিন বছর পূর্বে এই শ্রাবণের এক শুভলগ্নে বকুলকে সে সগোত্রের গণ্ডির মধ্যে টানিয়া আনিয়াছিল। সেদিনও আকাশে এমনি করিয়া পূর্ণিমার চাঁদ উঠিয়াছিল। তখন তাহার মা ছিলেন। দিন বেশ সুখেই কাটিতেছিল। তার পর একদা পরপার হইতে মার ডাক পড়িল। বকুল নিপুণ হস্তে সংসারের হাল টানিয়া ধরিল। অভয় তাহার পানে তন্ময় হইয়া চাহিয়া রহিল। মাতার অভাব বকুলকে দিয়া পূরণ করা হইল। প্রথম প্রথম বকুলকে অবশ্যই বেগ পাইতে হইয়াছিল ; কিন্তু অচিরেই সে অভ্যস্ত হইয়া গেল। সংসারের হিসাবপত্র হইতে আরম্ভ করিয়া রান্না পর্যন্ত তাহাকে নিজ হস্তে করিতে হইত।

কালক্রমে বকুল স্বামীর বিরাট বহুবিস্তৃত সংসারের সহিত এমনভাবে জড়িত হইয়া গেল যে তাহার অভাব একদিনও সহ্য করা যাইত না। বাপের বাড়ী যাইবার ফুরসত সে পাইত না। ভোর হইতে উঠিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত কর্মে তাহার বিশ্রাম ছিল না। কলের পুতুলের ন্যায় সে অক্লান্ত কর্ম করিয়া যাইত। একবেলা তাহার অসুখ করিলে সংসার অচলপ্রায় হইয়া যাইত। ছেলেমেয়েদের পেট ভরিয়া খাওয়া হইত না। অতিথি-অভ্যাগত ফিরিয়া যাইত। খাদ্যদ্রব্য এমনই অখাদ্য হইত যে কাহারও মুখে তুলিবার রুচি হইত না। পাশের বাড়ীর চাঁপা একদা মধ্যাহ্নে বেড়াইতে আসিয়াছিল। সে বকুলকে দেখিয়া বলিল, দিদির চেহারা কি বিশ্রী হয়ে গেল।

বকুল কহিল, হবে না ভাই? যা খাটুনি।

চাঁপা কহিল, খাটুনি একটু কম করতে পার!

বকুল মৃদু হাসিল, তাহার মুখে প্রশান্তির ছায়াপাত হইল। সে বলিল, খাটুনি কম করব কি করে ভাই। নিজের সংসার, পর তো আর কেউ নয়। একটুকু বিশ্রামের ফুরসত নেই। আজ যদি যম আমায় নিতে আসে তাহলে তাকে বলব, একটু বোস, আমার এখনও অনেক কাজ বাকি।

চাঁপা কহিল, বালাই ষাট, ওকি অলক্ষুণে কথা ভাই!

বকুল কহিল, আমার আবার লক্ষণ অলক্ষণ! আমি যমের অরুচি।

এহেন বকুলকে পাইয়া অভয়ের বিপর্যস্ত সংসারের মধ্যে বেশ একটা সুশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, অভয় বকুলকে নিঃশব্দে চুপিচুপি নাকি ভালবাসিয়াও ফেলিয়াছিল। কেন না, যে অভয় বন্ধুদের ফেলিয়া একদণ্ড কাটাইতে পারিত না, সেই কিনা বিবাহের পর সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির হইয়া গেল। গৃহকেই সে যথাসর্বস্ব জানিয়া ফেলিল। বন্ধুরা বিদ্রূপ করিতে কসুর করে নাই। বলিল, বৌদি তোকে এমন করে তুক করে ফেলবে জানলে কখনও বিয়ে করতে দিতুম না।

কেহ বলিল, বৌদির দেওয়া খাবার-টাবার দেখে খাস বাবা।

কেহ বলিল, কামরূপ-কামিখ্যের ভেড়া হয়ে যাস নে যেন।

অভয় কেবল হাসিতে লাগিল। কাহারও কথায় সে জবাব দিল না।

এমনি করিয়া অভয়ের দিন কাটিতে লাগিল। বন্ধুরা ধীরে ধীরে তাহার নিকট হইতে সরিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল। ধীরে ধীরে তাহাকে সকলে বিস্মৃত হইল। আপিসের ছুটি হইলে সন্ধ্যায়, বা রবিবারে, কেহ তাহার বাড়ী আর তাস পাশা খেলিতে আসিত না। তাহার বহুদিনের বৈঠকখানা অনাদৃত হইয়া পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যায় আলো জ্বলিল না, বৈকালে ঝাঁট পড়িল না, অভয় হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বকুল একদিন জিজ্ঞাসা করিল, ওরা আর তাস খেলতে আসে না কেন?

অভয় মুক্তির হাসি হাসিতে হাসিতে বলিল, অমন বিলাসিতা করবার সঙ্গতি আমার নেই।

বকুল কহিল, এতদিনের অভ্যেস!

—অভ্যেস বলে তো সব-কিছু করা যায় না। পয়সা চাই—চকচকে পয়সা। তাস চাই, আলো চাই, চা চাই, বিস্কুট চাই। পয়সা দিয়ে তো অমন বন্ধুত্ব কিনতে পারি না বকুল। পয়সা কোত্থেকে আসে সে কথা কি কোনদিন চিন্তা করেছ একবার।

কথা শেষে অভয় হা হা করিয়া তাহার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে হাসিতে লাগিল। বকুল বলিল, আমার বিয়ের পর তার এমনি করে যবনিকাপাত করলে আমায় লোকে দুষবে, এটা জান তো?

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ, লোকে মনে করবে তাদের এ আনন্দ রুদ্ধ হয়েছে আমারই ষড়যন্ত্রে।

অভয় আবার সেইরূপ সারা ঘরটি কাঁপাইয়া হাসিতে লাগিল। তার পর বলিল, ওঃ! দুষবে তো তোমায়? তা যত খুশি দোষ দিক। তুমি তো আর শুনতে যাচ্ছ না। তাতে আর কোন ক্ষতি নেই।

দুই মাস অভয়ের সহিত ঘর করিয়া বকুল বেশ বুঝিয়াছিল যে তাহার স্বামীর হাত-টানটা বেশই আছে। হাতের আঙুল নাকি তাহার ফাঁক হয় না! বিবাহের পর এই সুযোগে সে বন্ধু-বান্ধবকে ফাঁকি দিয়া বসিল। সাবান স্নো কিনিয়া দিতে বলিলে সে হাসিয়া উড়াইয়া দিত, সেকালের দোহাই পাড়িয়া স্ত্রীকে আধুনিকতার বিশেষণে জর্জরিত করিতে

কুণ্ঠিত হইত না। সেই হারানো যুগের সোনার দিনের বর্মে নিজেকে আবৃত করিয়া সে আত্মরক্ষা করিত। বকুলের মুখে আর কোন কথা সরিত না। আর তাহার বলিবারই বা কি থাকিত? তখন তাহার সবেমাত্র বিবাহ হইয়াছে।

ধীরে ধীরে দীর্ঘ তিনটি বৎসর কোন্ ফাঁকে কাটিয়া গিয়াছে তাহার হিসাব নাই। অকস্মাৎ একদিন বকুলের সামান্য অসুখের সামান্যভাবেই সূত্রপাত হইল। বুধবার রাত্রি দুইটায় সে অভয়কে সহসা ডাকিতে লাগিল। অভয় জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি?

বকুল বলিল, আমার বড্ড শীত করছে। উঃ হুঃ হুঃ! জানালা দরজা সব বন্ধ করে দাও। আমার ঘাড়ের ওপর লেপ দাও, গায়ের কাপড় দাও, তোশক দাও, গদি দাও, যা কিছু আছে সব দাও।

অভয় লেপ দিল, গায়ের কাপড় দিল। বকুলের শীত তবুও তিলার্ধ কমিল না। সে হি-হি করিয়া কাঁপিতে লাগিল, চীৎকার করিতে লাগিল—আরও দাও, আরও দাও।

দিবার আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না, তথাপি বকুল কাঁপিতে লাগিল। অভয় তার কপালে হাত দিয়া দেখিল গা যেন পুড়িয়া যাইতেছে। স্ত্রীর অবস্থা দেখিয়া সে মাথায় হাত দিয়া বসিল। এখন এই গভীর রাত্রে সে কি করিবে, করিবার তাহার কিই বা আছে? সে কি ডাক্তার ডাকিবে? ডাক্তারের কথা স্মরণ হইলে তাহার মনে শিহরণ জাগিল। ডাক্তার কবিরাজ ডাকা তো বিলাসিতার নামান্তর। আর রাত্রে নাকি ডাক্তারের ডবল ভিজিট। না, এ সামান্য জ্বরে মানুষের কোন ক্ষতি হয় না। একবার ভাবিল মাথায় আইসব্যাগ দিবে বা কপালে জলপটি দিবে। কিন্তু কোথায় আইসব্যাগ, কোথায় ওডিকোলন! এদিকে বকুল চীৎকার করিতে লাগিল—আমার মাথা জ্বলে গেল, পুড়ে গেল।

অভয় বলিল, বেশ তো ভালমানুষ খাওয়া-দাওয়া করে শুলে। হঠাৎ এমন কিই বা অসুখ করল বল দিকি? এ নিশ্চয়ই ম্যালেরিয়া। আমি হলফ করে বলতে পারি এ ম্যালেরিয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

বকুল তখন গান জুড়িয়া দিয়াছে, অনর্গল এলোমেলো বকিয়া চলিয়াছে, সজনি, কি পুছসি...ঐ যমুনার কূলে...শ্যাম কালো, তার কালো মাথার চূড়া, তার মোহন বাঁশি...

অভয় বিপদ গনিল। সারারাত্রি স্ত্রীর মাথায় পাখার বাতাস করিতে লাগিল। নিজের শরীরের উপর দিয়া যাহা কিছু করা যায় তাহা সে করিতে প্রস্তুত। শুধু এই রাত্রে অযথা সে খামোকা পয়সা খরচ করিতে পারিবে না। পয়সা তাহার বুকের বত্রিশখানা হাড়ের সামিল। বকুল সারারাত্রি হাসিয়া-কাঁদিয়া-গাহিয়া চীৎকার করিয়া কাটাইয়া দিল। জ্বর কমিল না। ভোর হইলে বাড়ীর অন্যান্য লোকজন আসিয়া হাজির হইল। যথাসময়ে পাড়ার একজন ডাক্তার ডাকিয়া আনা হইল। ডাক্তার অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, টাইফয়েড। রোগ বড় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন রীতিমত চিকিৎসার প্রয়োজন।

অভয় প্রমাদ গনিল। বিপদ কি মানুষের এমনি করিয়াই হয়? তাহার বড় ইচ্ছা হইল সে ডাক ছাড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদে। কিন্তু কাঁদিল না, বরং স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য জলের মত না বলিয়া না কহিয়া দশটি টাকা খরচ করিয়া বসিল। হিসাবের খাতায় খরচের অংকটা হয়তো আরও বড় হইবে; কিন্তু স্ত্রী তাহার ভাগ্যবতী স্বামী-সোহাগিনী, 'পতি পরম গুরু'কে অযথা ব্যয়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি দিল। পরের দিনই সে ইহজগতের মায়া কাটাইয়া গোলোকধামে চলিয়া গেল, কেহ তাহাকে বাধা দিতে পারিল না।

অভয় পত্নীশোকে ধূলিতলে আছড়াইয়া পড়িল। সে আর্তকণ্ঠে বিনাইয়া বিনাইয়া

রমণীর ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। তাহার অত সাধের তাসের ঘর মরণের তীব্র আঘাতে ভাঙিয়া চুরিয়া লন্ডভন্ড হইয়া গেল। সে প্রতিরোধ করিতে পারিল না, কেবল তীব্র সুরে শোকপ্রকাশ করিয়া চলিল। সেইসব পুরনো দিনের হারানো বন্ধুরা আজ বিপদ দেখিয়া আসিয়া জুটিল। সেই হাবু, পটল, রমেন, ভূপেশ, বিপিন—সকলেই একে একে দেখা দিল। দীর্ঘ তিন বৎসর যাহারা অভয়ের ছায়া পর্যন্ত মাড়াইত না, সকলে যাহার মুখ দেখিলে অযাত্রা বলিয়া ঘোষণা করিত, অযথা হাঁড়ি ফাটিবার আশঙ্কায় সারাদিন সচকিত থাকিত, আজ সেই অভয়ের বিপদে আর তাহারা, বেচারার হাত দিয়া জল গলে না বলিয়া, দূরে সরিয়া রহিল না। অভয় তাহাদের দেখিয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইল। তাহারা অভয়ের কান্না দেখিয়া নিজেরাই কাঁদিয়া ফেলিল। তাহারা জানে অভয় তাহার স্ত্রীকে কি দারুণ ভালবাসে, স্ত্রীর অভাবে তাহার জীবন কিরূপ বিষময় হইয়া যাইবে। অগত্যা তাহারা তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

সন্ধ্যায় শবদাহ শেষ করিয়া সকলে গৃহে ফিরিল।

সত্যই নাকি অভয় তাহার স্ত্রীকে নিবিড়ভাবে ভালবাসিত। সে ভালবাসায় নাকি এতটুকু গলদ ছিল না। উঠিতে বসিতে সব সময়ে সে 'বকুল' 'বকুল' বলিয়া অস্থির হইত। বকুল হাসিয়া বলিত, আমি মলে তুমি কি করবে বল তো?

—শুভ্র তাজমহল।

বকুল হাসিমুখেই বলিত, ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি তুমি অত খরচ করো না।

অভয় কহিত, পয়সা-কড়ি তো সবই তোমার। তোমার পয়সা তোমার জন্যে খরচ করব, তাতে পায়ে পড়ে বাহাদুরি কেনবার কি এমন আছে।

—বেশ, মানলুম সমস্ত পয়সাকড়ি আমার, আমার কলকাতা শহরে চোদ্দখানা বাড়ী. তার মাসিক আটশ' টাকা ভাড়া। এখন আপাতত দয়া করে আমার জন্যে একখানা লালা-বাই সাবান এনে দাও দিকি।

অভয় তাহার স্ত্রীকে প্রবোধ দিল, পাগল নাকি! ফেনা করে সাড়ে চার আনা পয়সা জলে দেবে? না, ও বিলাসিতা আমাদের এখানে চলবে না।

সেই স্ত্রীর মৃত্যুশোকে মুহ্যমান হইয়া অভয় ছয় দিন ছয় রাত্রি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল। বন্ধুরা সকলে বিপদ গনিল। এই নিদারুণ শোকাবেগের হাত হইতে কি করিয়া তাহাকে রক্ষা করিবে। সকলে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল, প্রিয়জনের মৃত্যুজনিত বিরহে কাতর মানুষটিকে সেই বহুশ্রুত দার্শনিক মতবাদ দিয়া বুঝাইবার হাস্যকর প্রচেষ্টা। সেই—মানুষ মরণশীল, মৃতব্যক্তির জন্য শোকপ্রকাশ করা নাকি দুর্বলতার লক্ষণ, রাজর্ষি জনকের নির্লিপ্ততার দৃষ্টান্ত, সরিষা আনিবার জন্য বুদ্ধের উপদেশ, যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধর্মরাজ বকের প্রশ্ন—ইত্যাদি ইত্যাদি নানাবিধ কথায় তাহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিল। অভয় তবুও প্রথমটা ভোলে নাই।

ছয় দিন ছয় রাত্রির পর আজ সবে সে পত্নীশোক কিঞ্চিত বিস্মৃত হইয়া সামান্য ঘুমাইয়াছে, এহেন সময়ে সেই বিকট শব্দ হইল। অভয় একদৃষ্টে বকুলের শূন্য শয্যার পানে চাহিয়া রহিল। বুকখানার ভিতর হু হু করিয়া উঠিল। ডাকাত নয়, তবে চোর হইলে হইতে পারে।

কিন্তু চোর বলিয়াও তো বোধ হইতেছে না।

তবে এ কিসের শব্দ? অভয় দরজার একটি গর্ত দিয়া দেখিল ফুটফুটে জ্যোৎস্না, আকাশের মাঝে উজ্জ্বল চাঁদ সাদা, দীপ্তিময়ী তারকারাশি। অভয় বিছানায় আসিয়া ঝুপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

কিসের এ শব্দ?

আচমকা মনে পড়িল হয়তো তাহার মৃত স্ত্রীর কীর্তি, হয়তো বেচারী এ জগতের মায়াপাশ ছিন্ন করিয়াও স্বামীকে ভুলিতে পারে নাই। তাই কি নিঃশব্দ রাত্রে স্বামীর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে? তৎক্ষণাৎ ভয়ে তাহার গা ডোল হইয়া শিহরিয়া উঠিল। না, স্ত্রীর এই উৎকট ভালবাসা সে কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারিবে না। ক্রমে ক্রমে তাহার সমস্ত চেতনা লোপ পাইতে লাগিল। বকুলের শূন্য শয্যার পানে চাহিবার সাহস আর তাহার রহিল না। সমস্ত শোক-দুঃখ-বেদনা ভয়ে ও ভাবনায় রূপান্তরিত হইল। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া শয্যার উপর অবশভাবে বসিয়া রহিল। কি সে করিবে? চিৎকার করিবে, না জ্ঞান হারাইয়া ফেলিবে? ভাবিয়া সে কূল-কিনারা পাইল না। সে ছেলেবেলায় কত ভৌতিক কাহিনী পড়িয়াছে, আজ কেমন যেন সেই সব নানা ভৌতিক ব্যাপার জীবন্ত হইয়া উঠিল। সে বন্ধ জানালা-দরজার পানে সচকিত চিত্তে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। কে জানে কোন্ মুহূর্তে দম্‌কা বাতাসে জানালা-দরজাগুলি হুড়মুড় করিয়া খুলিয়া যায়।

অকস্মাৎ আবার সেই পূর্বের ন্যায় দ্বারে শব্দ হইল। বাহির হইতে মানুষে যেন দ্বার ঠেলিতেছে। অভয় ছুটিয়া দ্বারপ্রান্তে গিয়া সেই ফুটা দিয়া বাহিরে তাকাইল। কিন্তু আশ্চর্য, স্থূল দৃষ্টিতে দেখিল একটি হৃষ্টপুষ্ট ভিটামিনের মাপকাঠির চিহ্ন-স্বরূপ পাঞ্জাবী ইঁদুর হন্‌হন্‌ করিয়া তাহার রুদ্ধদ্বারে মাথা খুঁড়িয়া পলাইয়া গেল।

বিপুল বিস্ময়ে অভয়ের মুখে কোন কথা সরিল না, কেবল তৃপ্তির ও প্রশান্তির হাসি খেলিয়া গেল। যাহা হউক, যদি ডাকাতই পড়িত বা চোরই আসিত! কতদিন হইতে সে ভাবিয়াছে গহনাপত্র পয়সা-কড়ি অন্যত্র সাবধানে রাখিয়া দিবে, কিন্তু ফুরসত পায় নাই। তাই আজ গুপ্তস্থান হইতে চাবি বাহির করিয়া সিন্দুক খুলিয়া দেখিবে তাহার সব-কিছু মজুত আছে কিনা। ধীরে ধীরে সে সিন্দুক খুলিয়া ফর্দ মিলাইয়া তাহার সম্পত্তি দেখিতে লাগিল। ফর্দ মিলাইতে মিলাইতে তাহার তৃষ্ণা পাইয়া গেল। ভাবিল বকুলকে জগ আনিতে বলে, হয়তো বলিতও তাহাকে, যদি-না তৎক্ষণাৎ মনে পড়িত তাহার মৃত্যুর কথা। না, একটা চাকর ও একটা ঝি না রাখিলে চলিবে না। বকুল আসিয়া পর্যন্ত সে উহাদের বিদায় করিয়াছিল; কিন্তু আজ তো তাহাদের না হইলে অভয়ের আদৌ চলে না। কম করিয়াও খাওয়া-পরা বাদে তাহাদের জন্য অভয়কে মাসে অন্তত দশটা টাকা ব্যয় করিতে হইবে, বৎসর শেষে এই দশটি টাকা আবার এক শ' কুড়ি টাকায় পরিণত হইবে! বাৎসরিক মোটা অংকটা দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল।

যথাসময়ে রাত্রি দুইটা বাজিল। অভয় তখন বাক্স হাতড়াইতেছে। তাহার চুল উস্কো-খুস্কো হইয়া গিয়াছে, চক্ষু যেন ঠিকরাইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, ঘন ঘন অস্বস্তির নিঃশ্বাস পড়িতেছে। গভীর রাত্রেই সে স্ত্রীর শূন্য শয্যায় আসিয়া আছড়াইয়া পড়িল। আবার সে বিনাইয়া বিনাইয়া চাপা-কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল। দেওয়ালে টাঙানো স্ত্রীর ফটোখানার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ফটো দেখিয়া বকুলকে চেনা মুশকিল। কোন্ মান্ধাতার আমলে ঐখানি তোলা হইয়াছিল। তার পর ফটো তুলিবার প্রয়োজন বা সদিচ্ছা আর তাহার হয় নাই।

দুইটা তিনটা করিয়া রাত্রি ধীরে ধীরে কাটিয়া যাইতে লাগিল। অভয়ের চোখে তখনও ঘুম নাই। তখনও সে তাহার দীর্ঘ চুলের মধ্যে অংগুলিচালনা করিয়া কি যেন আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। হয়তো সে পত্নীশোকে বিবশ হইয়া গিয়াছে। শয্যা

হইতে উঠিয়া অভয় ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিল। খোলা জানালা দিয়া বাহিরে আকাশের পানে অনিমেষে চাহিয়া রহিল। চাঁদ অনেকটা হেলিয়া পড়িয়াছে, তারায় তারায় আকাশ ছাইয়া গিয়াছে। তাহার বুকের ভিতর সহসা হু হু করিয়া উঠিল। কয়েক বিন্দু অশ্রু তাহার গণ্ড বাহিয়া ঝরিয়া পড়িল। কিছুতেই সে ঘুমাইতে পারিল না। ঘুম দূরের কথা, সে তাহার বিছানায় শুইতেই পারিল না। শয্যা তাহাকে কাঁটার ন্যায় বিঁধিতে লাগিল।

একবার ভাবিল যে লোটাকম্বল লইয়া যেখানে দুচোখ যায়, ,সেখানে চলিয়া যাইবে। আর সে সংসার করিতে পারে না। সে হয়তো পাগল হইয়া যাইবে। পাগল হইবার তাহার বাকিই বা কি আছে! বিপদ যখন আসে তখন সে তো আর একা একা চুপি চুপি আসে না। এমন করিয়া অঘটন ঘটিলে সে কি করিয়া বাঁচিবে?

আজ সে যে শোক পাইয়াছে তাহার কাছে তাহার মৃত্যুজনিত শোক সম্পূর্ণ তুচ্ছ। স্ত্রীর শোক সে ভুলিতে পারে; কিন্তু এ শোক তো সে কখনও কোন কালে ভুলিতে পারিবে না! গত ছয় দিন ছয় রাত্রি এই দারুণ উদ্বেগে কাটিয়াছে, যতটা স্ত্রীর বিরহে না হউক, তাহার বেশি ওই বৎসরে এক শ' কুড়ি টাকা খরচের ভয়ে। সেই ভয়েই তাহার ছয় দিন ছয় রাত্রি ঘুম হয় নাই। বকুল ছিল সংসারে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাহার মৃত্যুতে সংসার একেবারে বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে; কি দিয়া অভয় সে সংসারকে সুশৃঙ্খলার মধ্যে আনিবে? ভাবিয়া ভাবিয়া অভয় আজ ছয় দিন ধরিয়া হদিস পায় নাই। স্ত্রী মানুষের মরে, অভয়ের তাহাতে তত দুঃখ নাই। কিন্তু ঐ যে কথা আছে, ভাগ্যবানের বউ মরে, অভাগার ঘোড়া মরে—তবে স্ত্রীর মৃত্যুর পর অভয় ভাগ্যবান হইল কই?

স্ত্রীর মৃত্যুতে তাহার আদৌ দুঃখ নাই। সে তাহার স্ত্রীর গহনার বাক্সটি আবার ফর্দ মিলাইয়া দেখিল। না, সে জিনিসটি নাই। অভয়ের চোখ দিয়া হু হু করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মানুষ মানুষকে কি এমন করিয়াই ফাঁকি দেয়? লোকসানের পর এমন করিয়া লোকসান হইলে সে কি করিয়া সহ্য করিবে? না, এই লোকসান সহিয়া সে কখনও সংসারের মধ্যে পড়িয়া থাকিবে না। গহনার বাক্সটির পানে সে শ্যেনদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। স্ত্রীর ব্যবহৃত গহনার সব কিছুই আছে, সব কিছুই সে নিপুণ হস্তে মৃত বকুলের গা হইতে খুলিয়া লইয়াছে। কাশী হইতে তাহার ছোট বোন সেই যে কারুকার্যখচিত কাচের চুড়ি চারগাছি পাঠাইয়াছিল, সেগুলিও সে সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছে। সব তুলিয়াছে, কিন্তু ভুল করিয়াছে বকুলের কানের ফুল দুটি খুলিতে! এক আনা সোনা দিয়া সে দুটি সে গড়াইয়াছিল। চুলের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া সে দুটি শবদেহের সহিত গিয়া চিতায় ভস্মীভূত হইয়াছে।

সেই কারণে অভয়ের আজ সারারাত্রি ঘুম হইল না। স্ত্রীর মৃত্যু সে সহ্য করিতে পারে; কিন্তু এই লোকসানের আঘাত সে ভুলিবে কেমন করিয়া? যতবার সে ঘুমাইতে যায়, ততবারই ঐ ফুল দুটির হিংস্র উজ্জ্বলতা যেন ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে মাথায়। আর অভয় কিছুতেই ঘুমাইতে পারে না।

সারারাত্রি সে জাগিয়া বসিয়া রহিল, সারারাত্রি সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। স্ত্রীর মৃত্যুতে কেন সে ভাগ্যবান হইল না?

পুঁই মাচা

সহায়হরি চাটুজ্যে উঠানে পা দিয়াই স্ত্রীকে বলিলেন—একটা বড় বাটি কি ঘটি যা হয় কিছু দাও তো, তারক খুড়ো গাছ কেটেছে, একটু ভাল রস আনি।

স্ত্রী অন্নপূর্ণা খড়ের রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া শীতকালের সকালবেলা নারিকেল তেলের বোতলে ঝাঁটার কাটি পুরিয়া দুই আঙ্গুলের সাহায্যে ঝাঁটার কাটিলগ্ন জমানো তৈলটুকু সংগ্রহ করিয়া চুলে মাখাইতে ছিলেন। স্বামীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় একটু টানিয়া দিলেন মাত্র, কিন্তু বাটি কি ঘটি বাহির করিয়া দিবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ তো দেখাইলেনই না, এমন কি বিশেষ কোন কথাও বলিলেন না।

সহায়হরি অগ্রবর্তী হইয়া বলিলেন—কি হয়েছে, ব'সে রইলে যে? দাও না একটি ঘটি? আঃ ক্ষেন্তি-টেন্তি সব কোথায় গেল এরা? তুমি তেল মেখে বুঝি ছোঁবে না?

অন্নপূর্ণা তেলের বোতলটি সরাইয়া স্বামীর দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, পরে অত্যন্ত শান্ত সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি মনে মনে কি ঠাউরেছ বলতে পার?

স্ত্রীর অতিরিক্ত রকমের শান্ত সুরে সহায়হরির মনে ভীতির সঞ্চার হইল—ইহা যে ঝড়ের অব্যবহিত পূর্বের আকাশের স্থিরভাব মাত্র, তাহা বুঝিয়া তিনি মরিয়া হইয়া ঝড়ের প্রতীক্ষায় রহিলেন। একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিলেন—কেন...কি আবার ...কি—

অন্নপূর্ণা পূর্বাপেক্ষাও শান্তসুরে কহিলেন—দেখ রঙ্গ কোর না বলছি—ন্যাকামি করতে হয় অন্য সময় কোর। তুমি কিছু জান না, নাকি খোঁজ রাখ না? অতবড় মেয়ে যার ঘরে, সে মাছ ধরে আর রস খেয়ে দিন কাটায় কি করে তা বলতে পার? গাঁয়ে কি গুজব রটেছে জান?

সহায়হরি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন, কি গুজব?

—কি গুজব জিজ্ঞাসা করো গিয়ে চৌধুরীদের বাড়ী। কেবল বাগ্‌দী-দুলে-পাড়ায় ঘুরে ঘুরে জন্ম কাটালে ভদ্দরলোকের গাঁয়ে বাস করা যায় না।—সমাজে থাকতে হলে সেই রকম মেনে চলতে হয়।

সহায়হরি বিস্মিত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, অন্নপূর্ণা পূর্ববৎ সুরেই পুনর্বার বলিয়া উঠিলেন—একঘরে করবে গো তোমাকে একঘরে করবে, কাল চৌধুরীদের চন্ডীমন্ডপে এসব কথা হয়েছে। আমাদের হাতে ছোঁয়া জল আর কেউ খাবে না। আশীর্বাদ হয়ে মেয়ের বিয়ে হ'ল না,—ও নাকি উচ্ছুগ্‌গু করা মেয়ে—গাঁয়ের কোন কাজে তোমাকে আর কেউ যেতে বলবে না—যাও, ভালই হয়েছে তোমার। এখন গিয়ে দুলে-বাড়ী বাগ্‌দী-বাড়ী উঠে বসে দিন কাটাও।

সহায়হরি তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন—এই! আমি বলি, না জানি কি ব্যাপার। একঘরে! সবাই একঘরে করেছেন, এবার বাকী আছেন কালীময় ঠাকুর!—ওঃ!......

অন্নপূর্ণা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন—কেন, তোমাকে একঘরে করতে বেশী কিছু লাগে নাকি? তুমি কি সমাজের মাথা না একজন মাতব্বর লোক? চাল নেই চুলো নেই, এক কড়ার মুরোদ নেই, চৌধুরীরা তোমায় একঘরে করবে তা আর এমন কঠিন কথা কি?—আর সত্যিই তো এদিকে ধাড়ী মেয়ে হয়ে উঠল।...হঠাৎ স্বর নামাইয়া বলিলেন—হ'ল যে পনেরো বছরের, বাইরে কমিয়ে ব'লে বেড়ালে কি হবে, লোকের চোখ নেই?...পুনরায় গলা উঠাইয়া বলিলেন—না বিয়ে দেবার গা, না কিছু। আমি কি যাব পাত্তর ঠিক করতে?

সশরীরে যতক্ষণ স্ত্রীর সম্মুখে বর্তমান থাকিবেন, স্ত্রীর গলার সুর ততক্ষণ কমিবার কোন সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া সহায়হরি দাওয়া হইতে তাড়াতাড়ি একটি কাঁসার বাটি উঠাইয়া লইয়া খিড়কি-দুয়ার লক্ষ্য করিয়া যাত্রা করিলেন—কিন্তু খিড়কি-দুয়ারের একটু এদিকে কি দেখিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন এবং আনন্দপূর্ণ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—এসব কি রে? ক্ষেন্তি মা, এসব কোথা থেকে আনলি? ওঃ! এ যে...

চোদ্দ-পনেরো বছরের একটি মেয়ে আর দুটি ছোট ছোট মেয়ে পিছনে লইয়া বাড়ী ঢুকিল। তাহার হাতে এক বোঝা পুঁইশাক, ডাঁটাগুলি মোটা ও হল্‌দে হল্‌দে, চেহারা দেখিয়া মনে হয় কাহারা পাকা পুঁই গাছ উবড়াইয়া ফেলিয়া উঠানের জঙ্গল তুলিয়া দিতেছিল ; মেয়েটি তাহাদের উঠানের জঞ্জাল প্রাণপণে তুলিয়া আনিয়াছে—ছোট মেয়ে দু'টির মধ্যে একজনের হাত খালি, অপরটির হাতে গোটা দুই-তিন পুঁইপাতা জড়ানো কোন দ্রব্য।

বড় মেয়েটি খুব লম্বা, গোলগাল চেহারা, মাথার চুলগুলো রুক্ষ ও অগোছালো—বাতাসে উড়িতেছে, মুখখানা খুব বড়, চোখ দু'টা ডাগর ডাগর ও শান্ত। সরু সরু কাঁচের চুড়িগুলা দু'পয়সা ডজনের একটি সেফটিপিন দিয়া একত্র করিয়া আটকানো। পিনটার বয়স খুঁজিতে যাইলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে গিয়া পড়িতে হয়। এই বড় মেয়েটির নামই বোধ হয় ক্ষেন্তি, কারণ সে তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া তাহার পশ্চাদ্বর্তিনীর হাত হইতে পুঁইপাতা জড়ানো দ্রব্যটি লইয়া মেলিয়া ধরিয়া বলিল—চিংড়ি মাছ, বাবা। গয়া খুড়ীর কাছ থেকে রাস্তায় নিলাম, দিতে চায় না, বলে—তোমার বাবার কাছে আর দিনকার দরুণ দুটো পয়সা বাকী আছে। আমি বললাম—দাও পিসী, আমার বাবা কি তোমার দু'টো পয়সা নিয়ে পালিয়ে যাবে—আর এই পুঁইশাকগুলো...ঘাটের ধারের রায় কাকা বললে, নিয়ে যা...কেমন মোটা মোটা...

অন্নপূর্ণা দাওয়া হইতে অত্যন্ত ঝাঁজের সহিত চীৎকার করিয়া উঠিলেন—নিয়ে যা, আহা কি অমর্তই তোমাকে তারা দিয়েছে—পাকা পুঁইডাঁটা কাঠ হয়ে গিয়েছে, দু'দিন পরে ফেলে দিত...নিয়ে যা...আর উনি তখন আগাছা উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন—ভালোই হয়েছে, তাদের আর নিজেদের কষ্ট ক'রে কাটতে হ'ল না...যত পাথুরে বোকা সব মরতে আসে আমার ঘাড়ে...ধাড়ী মেয়ে, ব'লে দিয়েছি না তোমায় বাড়ীর বাইরে কোথাও পা দিও না? লজ্জা করে না এ-পাড়া সে-পাড়া ক'রে বেড়াতে! বিয়ে হলে যে চার ছেলের মা হতে! খাওয়ার নামে আর জ্ঞান থাকে না, না?...কোথায় শাক, কোথায় বেগুন—আর একজন বেড়াচ্ছেন কোথায় রস, কোথায় ছাই, কোথায় পাঁশ—ফেল্‌ বলছি ওসব...ফেল্‌।...

মেয়েটি শান্ত অথচ ভয়-মিশ্রিত দৃষ্টিতে মার দিকে চাহিয়া হাতের বাঁধন আলগা করিয়া দিল, পুঁইশাকের বোঝা মাটিতে পড়িয়া গেল। অন্নপূর্ণা বকিয়া চলিলেন—যা তো রাধী, ও আপদগুলো টেনে খিড়কির পুকুরের ধারে ফেলে দিয়ে আয় তো—যা, ফের যদি বাড়ীর বার হতে দেখেছি, তবে ঠ্যাং যদি খোঁড়া না করি তো...

বোঝা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। ছোট মেয়েটি কলের পুতুলের মতন সেগুলি তুলিয়া লইয়া খিড়কি অভিমুখে চলিল, কিন্তু ছোট মেয়ে অত বড় বোঝা আঁকড়াইতে পারিল না, অনেকগুলি ডাঁটা এদিকে ওদিকে ঝুলিতে ঝুলিতে চলিল।...সহায়হরির ছেলে-মেয়েরা তাহাদের মাকে অত্যন্ত ভয় করিত!

সহায়হরি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিতে গেলেন—তা এনেছে ছেলেমানুষ খাবে ব'লে...তুমি আবার...বরং...

পুঁইশাকের বোঝা লইয়া যাইতে যাইতে ছোট মেয়েটি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মার মুখের দিকে চাহিল। অন্নপূর্ণা তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—না না, নিয়ে যা, খেতে হবে

না—মেয়েমানুষের আবার অত নোলা কিসের? এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় নিয়ে আসবে দুটো পাকা পুঁইশাক ভিক্ষে ক'রে! যা, যা তুই যা, দূর ক'রে বনে দিয়ে আয়...

সহায়হরি বড় মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন তাহার চোখ দু'টা জলে ভরিয়া আসিয়াছে। তাঁর মনে বড় কষ্ট হইল। কিন্তু মেয়ের যতই সাধের জিনিস হোক, পুঁই-শাকের পক্ষাবলম্বন করিয়া দুপুর বেলা স্ত্রীকে চটাইতে তিনি আদৌ সাহসী হইলেন না।—নিঃশব্দে খিড়কি-দোর দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বসিয়া রাঁধিতে রাঁধিতে বড় মেয়ের মুখের কাতর দৃষ্টি স্মরণে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অন্নপূর্ণার মনে পড়িল—গত অরন্ধনের পূর্বদিন বাড়ীতে পুঁইশাক রান্নার সময় ক্ষেন্তি আবদার করিয়া বলিয়াছিল—মা, অর্ধেকগুলো কিন্তু একা আমার, অর্ধেক সব মিলে তোমাদের!

বাড়ীতে কেহ ছিল না, তিনি নিজে গিয়া উঠানের ও খিড়কি-দোরের আশেপাশে যে ডাঁটা পড়িয়াছিল, সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া আসিলেন—বাকীগুলা কুড়ানো যায় না, ডোবার ধারের ছাই-গাদায় ফেলিয়া দিয়াছে। কুচো চিংড়ি দিয়া এইরূপে চুপিচুপিই পুঁইশাকের তরকারি রাঁধিলেন।

দুপুরবেলা ক্ষেন্তি পাতে পুঁইশাকের চচ্চড়ি দেখিয়া আনন্দপূর্ণ ডাগর চোখে মায়ের দিকে ভয়ে ভয়ে চাহিল। দু'এক বার এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া আসিতেই অন্ন-পূর্ণা দেখিলেন উক্ত পুঁইশাকের একটুকরাও তাহার পাতে পড়িয়া নাই। পুঁইশাকের উপর তাঁহার এই মেয়েটির কিরূপ লোভ তাহা তিনি জানিতেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—কিরে ক্ষেন্তি, আর একটু চচ্চড়ি দিই? ক্ষেন্তি তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া এ আনন্দজনক প্রস্তাব সমর্থন করি। কি ভাবিয়া অন্নপূর্ণার চোখে জল আসিল, চাপিতে গিয়া তিনি চোখ উঁচু করিয়া চালের বাতায় গোঁজা ডালা হইতে শুকনা লঙ্কা পাড়িতে লাগিলেন।

কালীময়ের চণ্ডীমণ্ডপে সেদিন বৈকাল বেলা সহায়হরির ডাক পড়িল। সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ফাঁদিবার পর কালীময় উত্তেজিত সুরে বলিলেন—সে সব দিন কি আর আছে ভায়া? এই ধরো কেষ্ট মুখুয্যে...স্বভাব নইলে পাত্রে দেব না, স্বভাব নইলে পাত্রে দেব না ক'রে কি কাণ্ডটাই করলে—অবশেষে কিনা হরির ছেলেটাকে ধ'রে প'ড়ে মেয়ের বিয়ে দেয় তবে রক্ষে! তার কি স্বভাব? রাম বলো, ছ'সাত পুরুষে ভঙ্গ, পচা শ্রোত্রীয়! পরে সুর নরম করিয়া বলিলেন, তা সমাজের সেসব শাসনের দিন কি আর আছে? দিন দিন চ'লে যাচ্ছে। বেশী দূর যাই কেন, এই যে তোমার মেয়েটি তেরো বছরের...

সহায়হরি বাধা দিয়া বলিতে গেলেন—এই শ্রাবণে তেরোয়...

—আহা-হা, তেরোয় আর ষোলোয় তফাৎ কিসের শুনি? তেরোয় আর ষোলোয় তফাৎটা কিসের? আর সে তেরোই হোক, চাই ষোলোই হোক, চাই পঞ্চাশই হোক, তাতে আমাদের দরকার নেই, সে তোমার হিসেব তোমার কাছে। কিন্তু পাত্তর আশীর্বাদ হয়ে গেল, তুমি বেঁকে বসলে কি জন্যে শুনি? ও তো একরকম উচ্ছুগ্গু করা মেয়ে। আশীর্বাদ হওয়াও যা বিয়ে হওয়াও তা, সাতপাকের যা বাকী, এই তো?...সমাজে ব'সে এসব কাজগুলো তুমি যে করবে আর আমরা ব'সে ব'সে দেখব, এ তুমি মনে ভেব না। সমাজের বামুনদের যদি জাত মারবার ইচ্ছে না থাকে মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত ক'রে ফেল। ...পাত্তর পাত্তর! রাজপুত্তুর না হলে কি পাত্তর মেলে না?...গরীব মানুষ, দিতে থুতে পারবে না ব'লেই শ্রীমন্ত মজুমদারের ছেলেকে ঠিক ক'রে দিলাম। লেখাপড়া নাই বা জানল? জজ-মেজেস্টার না হলে কি মানুষ হয় না?—দিব্যি বাড়ী বাগান পুকুর—শুনলাম এবার নাকি কুঁড়ির জমিতে চাট্টি আমন ধানও করেছে, ব্যস্—রাজার হাল! দুই

ভাইয়ের অভাব কি?...

ইতিহাসটা হইতেছে যে, মণিগাঁয়ের উক্ত মজুমদার মহাশয়ের পুত্রটি কালীময়ই ঠিক করিয়া দেন। কেন কালীময় মাথা-ব্যথা করিয়া সহায়হরির মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ মজুমদার মহাশয়ের ছেলের সংগে ঠিক করিতে গেলেন, তাহার কারণ নির্দেশ করিতে যাইয়া কেহ কেহ বলেন যে, কালীময় নাকি মজুমদার মহাশয়ের কাছে অনেক টাকা ধারেন, অনেক দিনের সুদ পর্যন্ত বাকী—শীঘ্র নালিশ হইবে, ইত্যাদি। এ গুজব যে শুধু অবান্তর তাহাই নহে, ইহার কোন ভিত্তি আছে বলিয়াও মনে হয় না। ইহা দুষ্ট পক্ষের রটনা মাত্র। যাহাই হউক, পাত্রপক্ষ আশীর্বাদ করিয়া যাওয়ার দিনকতক পরে সহায়-হরি টের পান, পাত্রটি কয়েক মাস পূর্বে নিজের গ্রামে কি একটা করিবার ফলে গ্রামের এক কুম্ভকার-বধূর আত্মীয়-স্বজনের হাতে বেদম প্রহার খাইয়া কিছুদিন নাকি শয্যাগত ছিল। এ রকম পাত্রে মেয়ে দিবার প্রস্তাব মনঃপূত না হওয়ায় সহায়হরি সে সম্বন্ধ ভাঙিয়া দেন।

দিন দুই পরের কথা। সকালে উঠিয়া সহায়হরি উঠানে বাতাবিলেবুর গাছের ফাঁক দিয়া যেটুকু নিতান্ত কচি রাঙা রৌদ্র আসিয়াছিল, তাহারই আতপে বসিয়া আপন মনে তামাক টানিতেছেন। বড় মেয়ে ক্ষেন্তি আসিয়া চুপি চুপি বলিল—বাবা, যাবে না? মা ঘাটে গেল...

সহায়হরি একবার বাড়ীর পাশের ঘাটের পথের দিকে কি জানি কেন চাহিয়া দেখিলেন, পরে নিম্নস্বরে বলিলেন, যা শীগ্‌গির শাবলখানা নিয়ে আয় দিকি! কথা শেষ করিয়া তিনি উৎকণ্ঠার সহিত জোরে জোরে তামাক টানিতে লাগিলেন এবং পুনরায় একবার কি জানি কেন খিড়কির দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ইতিমধ্যে প্রকান্ড ভারী একটি লোহার শাবল দুই হাত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া ক্ষেন্তি আসিয়া পড়িল—তৎপরে পিতা-পুত্রীতে সন্তর্পণে সম্মুখের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। ইহাদের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল—ইহারা কাহারো ঘরে সিঁদ দিবার উদ্দেশ্যে চলিয়াছে।

অন্নপূর্ণা স্নান করিয়া সবে কাপড় ছাড়িয়া উনুন ধরাইবার যোগাড় করিতেছেন, মুখুজ্যেবাড়ীর ছোট খুকী দুর্গা আসিয়া বলিল, খুড়ীমা, মা ব'লে দিলে, খুড়ীমাকে গিয়ে বল্—মা ছোঁবে না, তুমি আমাদের নবান্নটা মেখে আর ইতুর ঘটগুলো বার ক'রে দিয়ে আসবে?

মুখুজ্যে-বাড়ী ও পাড়ায়—যাইবার পথের বাঁ ধারে এক জায়গায় শেওড়া, বনভাঁট, রাংচিতা, বনচাল্‌তা গাছের ঘন বন। শীতের সকালে এক প্রকার লতাপাতার ঘন গন্ধ বন হইতে বাহির হইতেছিল। একটা লেজ-ঝোলা হল্‌দে পাখী আমড়া গাছের এ-ডাল হইতে ও-ডালে যাইতেছে।

দুর্গা আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, খুড়ীমা খুড়ীমা, ঐ যে কেমন পাখীটা!—পাখী দেখিতে গিয়া অন্নপূর্ণা কিন্তু আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিলেন। ঘন বনটার মধ্যে কোথায় এতক্ষণ খুপ্ খুপ্ করিয়া একটা আওয়াজ হইতেছিল...কে যেন কি খুঁড়িতেছে ...দুর্গার কথার পরেই হঠাৎ সেটা বন্ধ হইয়া গেল। অন্নপূর্ণা সেখানে খানিকক্ষণ থমকিয়া দাঁড়াইলেন, পরে চলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা খানিকদূর যাইতে না যাইতে বনের মধ্যে পুনরায় খুপ্ খুপ্ শব্দ আরম্ভ হইল।

কাজ করিয়া ফিরিতে অন্নপূর্ণার কিছু বিলম্ব হইল। বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন, ক্ষেন্তি উঠানের রৌদ্রে বসিয়া তেলের বাটি সম্মুখে লইয়া খোঁপা খুলিতেছে। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়া রান্নাঘরে গিয়া উনুন ধরাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মেয়েকে বলিলেন—এখনও নাইতে যাসনি যে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

ক্ষেন্তি তাড়াতাড়ি উত্তর দিল—এই যে যাই মা, এক্ষুনি যাব আর আসব।

ক্ষেন্তি স্নান করিতে যাইবার একটুখানি পরেই সহায়হরি সোৎসাহে পনেরো ষোল সের ভারী একটা মেটে আলু ঘাড়ে করিয়া কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সম্মুখে স্ত্রীকে দেখিয়া কৈফিয়তের দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন—ওই ও পাড়ার ময়শা চৌকিদার রোজই বলে—কর্তাঠাকুর, তোমার বাপ থাকতে তবু মাসে মাসে এদিকে তোমাদের পায়ের ধুলো পড়ত, তা আজকাল তো তোমরা আর আসো না, এই বেড়ার গায়ে মেটে আলু ক'রে রেখেছি, তা দাদাঠাকুর বরং...

অন্নপূর্ণা স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—বরোজপোতার বনের মধ্যে ব'সে খানিক আগে কি করছিলে শুনি?

সহায়হরি অবাক হইয়া বলিলেন—আমি! না আমি কখন? কক্ষনো না, এই তো আমি...সহায়হরির ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল তিনি এইমাত্র আকাশ হইতে পড়িয়াছেন।

অন্নপূর্ণা পূর্বের মতই স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—চুরি তো করবেই, তিন কাল গিয়েছে এক কাল আছে, মিথ্যা কথাগুলো আর এখন বলো না।...আমি সব জানি। মনে ভেবেছিলে আপদ ঘাটে গিয়েছে, আর কি...দুর্গার মা ডেকে পাঠিয়েছিল, ও পাড়ায় যাচ্ছি, শুনলাম বরোজপোতার বনের মধ্যে কি সব খুপ্ খুপ্ শব্দ... তখনি আমি বুঝতে পেরেছি, সাড়া পেয়ে শব্দ বন্ধ হয়ে গেল, যেই আবার খানিকদূর গেলাম আবার দেখি শব্দ...তোমার তো ইহকালও নেই পরকালও নেই, চুরি করতে, ডাকাতি করতে, যা ইচ্ছে কর, কিন্তু মেয়েটাকে আবার এর মধ্যে নিয়ে গিয়ে ওর মাথা খাওয়া কিসের জন্যে?

সহায়হরি হাত নাড়িয়া, বরোজপোতায় তাঁহার উপস্থিতি থাকার বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রমাণ উত্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে গেলেন; কিন্তু স্ত্রীর চোখের দৃষ্টির সামনে তাঁহার বেশী কথাও যোগাইল না বা কথিত উক্তিগুলির মধ্যে কোন পৌর্বাপর্য সম্বন্ধও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।...

আধ ঘণ্টা পরে ক্ষেন্তি স্নান সারিয়া বাড়ী ঢুকিল। সম্মুখস্থ মেটে আলুর দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়াই নিরীহমুখে উঠানের আলনায় অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কাপড় মেলিয়া দিতেছিল।

অন্নপূর্ণা ডাকিলেন—ক্ষেন্তি, এদিকে একবার আয় তো, শুনে যা...

মায়ের ডাক শুনিয়া ক্ষেন্তির মুখ শুকাইয়া গেল—সে ইতস্তত করিতে করিতে মা'র নিকট আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—এই মেটে আলুটা দু'জনে মিলে তুলে এনেছিস, না?

ক্ষেন্তি মা'র মুখের দিকে একটুখানি চাহিয়া থাকিয়া একবার ভূপতিত মেটে আলু-টার দিকে চাহিল, পরে পুনরায় মা'র মুখের দিকে চাহিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্র-দৃষ্টিতে একবার বাড়ীর সম্মুখস্থ বাঁশঝাড়ের দিকেও চাহিয়া লইল; তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

অন্নপূর্ণা কড়া সুরে বলিলেন—কথা বলছিস নে যে বড়? এই মেটে আলু তুই এনেছিস কিনা?

ক্ষেন্তি বিপন্ন চোখে মা'র মুখের দিকেই চাহিয়া ছিল, উত্তর দিল, হাঁ।

অন্নপূর্ণা তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, পাজী, তোমার পিঠে আমি আস্ত কাঠের চেলা ভাঙব তবে ছাড়ব, বরোজপোতার বনে গিয়েছো মেটে আলু চুরি করতে? সোমত্ত মেয়ে, বিয়ের যুগ্যি হয়ে গেছে কোন্ কালে, সেই একগলা বিজন বন, তার মধ্যে দিনদুপুরে বাঘ লুকিয়ে থাকে, তার মধ্যে থেকে পরের আলু নিয়ে এল

তুলে! যদি গোসাঁইরা চৌকিদার ডেকে তোমায় ধরিয়ে দেয়? তোমার কোন্ শ্বশুর এসে তোমায় বাঁচাত? আমার জোটে খাব, না জোটে না খাব, তা ব'লে পরের জিনিসে হাত? এ মেয়ে নিয়ে আমি কি করব, মা?

দু'তিন দিন পরে একদিন বৈকালে ধুলামাটি মাখা হাতে ক্ষেন্তি মাকে আসিয়া বলিল—মা মা, দেখবে এস...

অন্নপূর্ণা গিয়া দেখিলেন, ভাঙা পাঁচিলের ধারে যে ছোট খোলা জমিতে কতকগুলো পাথরকুচি ও কণ্টিকারীর জঙ্গল হইয়াছিল, ক্ষেন্তি ছোট বোনটিকে লইয়া সেখানে মহা উৎসাহে তরকারির আওলাত করিবার আয়োজন করিতেছে এবং ভবিষ্যসম্ভাবী নানাবিধ কাল্পনিক ফলমূলের অগ্রদূত-স্বরূপ বর্তমানে কেবল একটিমাত্র শীর্ণকায় পুঁই-শাকের চারা কাপড়ের ফালির গ্রন্থি-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া ফাঁসি হইয়া যাওয়া আসামীর মতন ঊর্ধ্বমুখে এক খন্ড শুষ্ক কঞ্চির গায়ে ঝুলিয়া রহিয়াছে। ফলমূলাদির অবশিষ্টগুলি আপাততঃ তাঁর বড় মেয়ের মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, দিনের আলোয় এখনও বাহির হয় নাই।

অন্নপূর্ণা হাসিয়া বলিলেন, দূর পাগলী, এখন পুঁইডাঁটার চারা পোঁতে কখনো? বর্ষাকালে পুঁততে হয়। এখন যে জল না পেয়ে ম'রে যাবে!

ক্ষেন্তি বলিল—কেন, আমি আমি রোজ জল ঢালব?

অন্নপূর্ণা বলিলেন—দেখ, হয়ত বেঁচে যেতেও পারে! আজকাল রাতে খুব শিশির হয়।

খুব শীত পড়িয়াছে। সকালে উঠিয়া সহায়হরি দেখিলেন, তাঁহার দুই ছোট মেয়ে দোলাই গায়ে বাঁধিয়া রোদ উঠিবার প্রত্যাশায় উঠানের কাঁঠালতলায় দাঁড়াইয়া আছে। একটা ভাঙা ঝুড়ি করিয়া ক্ষেন্তি শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে মুখুজ্যে-বাড়ী হইতে গোবর কুড়াইয়া আনিল। সহায়হরি বলিলেন—হাঁ মা ক্ষেন্তি, তা সকালে উঠে জামাটা গায় দিতে তোর কি হয়? দেখ দিকি, এই শীত!

—আচ্ছা দিচ্ছি বাবা, কই শীত, তেমন তো...

—হাঁ দে মা, এক্ষুনি দে—অসুখ-বিসুখ পাঁচ রকম হতে পারে, বুঝলি নে?—সহায়হরি বাহির হইয়া গেলেন, ভাবিতে ভাবিতে গেলেন, তিনি কি অনেক দিন মেয়ের মুখে ভাল করিয়া চাহেন নাই? ক্ষেন্তির মুখ এমন সুশ্রী হইয়া উঠিয়াছে?

জামার ইতিহাস নিম্নলিখিত রূপ। বহু বৎসর অতীত হইল, হরিপুরের রাসের মেলা হইতে সহায়হরি কালো সার্জের এই আড়াই টাকা মূল্যের জামাটি ক্রয় করিয়া আনেন। ছিঁড়িয়া যাইবার পর তাহাতে কতবার রিপু ইত্যাদি করা হইয়াছিল, সম্প্রতি গত বৎসর হইতে ক্ষেন্তির স্বাস্থ্যোন্নতি হওয়ার দরুণ জামাটি তাহার গায়ে হয় না। সংসারের এসব খোঁজ সহায়হরি কখনও রাখিতেন না। জামার বর্তমান অবস্থা অন্নপূর্ণারও জানা ছিল না—ক্ষেন্তির নিজস্ব ভাঙা টিনের তোরঙ্গের মধ্যেই উহা থাকিত।

পৌষ সংক্রান্তি। সন্ধ্যাবেলা অন্নপূর্ণা একটা কাঁসিতে চালের গুঁড়া ময়দা ও গুড় দিয়া চটকাইতে ছিলেন—একটি ছোট বাটিতে একবাটি তেল। ক্ষেন্তি কুরুনির নীচে একটা কলার পাতা পাড়িয়া এক মালা নারিকেল কুরিতেছে। অন্নপূর্ণা প্রথমে ক্ষেন্তির সাহায্য লইতে স্বীকৃত হন নাই, কারণ সে যেখানে সেখানে বসে, বনে বাদাড়ে ঘুরিয়া ফেরে, তাহার কাপড়-চোপড় শাস্ত্রসম্মত ও শুচি নহে। অবশেষে ক্ষেন্তি নিতান্ত ধরিয়া

পড়ায় হাত-পা ধোয়াইয়া ও শুদ্ধ কাপড় পরাইয়া তাহাকে বর্তমান পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ময়দার গোলা মাখা শেষ হইলে অন্নপূর্ণা উনুনে খোলা চাপাইতে যাইতেছেন, ছোট মেয়ে রাধা হঠাৎ ডান হাতখানা পাতিয়া বলিল, মা, ঐ একটু...

অন্নপূর্ণা বড় গামলাটা হইতে একটুখানি গোলা তুলিয়া লইয়া হাতের আঙুল পাঁচটি দ্বারা একটি বিশেষ মুদ্রা রচনা করিয়া সেটুকু রাধার প্রসারিত হাতের উপর দিলেন। মেজো মেয়ে পুঁটি অমনি ডান হাতখানা কাপড়ে তাড়াতাড়ি মুছিয়া লইয়া মা'র সামনে পাতিয়া বলিল—মা, আমায় একটু...

ক্ষেন্তি শুচিবস্ত্রে নারিকেল কুরিতে কুরিতে লুব্ধনেত্রে মধ্যে মধ্যে এদিকে চাহিতেছিল, এ সময় খাইতে চাওয়ায় মা পাছে বকে, সেই ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন—দেখি, নিয়ে আয় ক্ষেন্তি ঐ নারকেল মালাটা, ওতে তোর জন্যে একটু রাখি।...ক্ষেন্তি ক্ষিপ্র হস্তে নারিকেলের উপরের মালাখানা, যাহাতে ফুটা নাই, সেখানে সরাইয়া দিল, অন্নপূর্ণা তাহাতে একটু বেশী করিয়া গোলা ঢালিয়া দিলেন।

মেজো মেয়ে পুঁটি বলিল—জেঠাইমারা অনেকখানি দুধ নিয়েছে, রাঙাদিদি ক্ষীর তৈরী করছিল, ওদের অনেক রকম হবে।

ক্ষেন্তি মুখ তুলিয়া বলিল—এ বেলা আবার হবে নাকি? ওরা তো ওবেলা ব্রাহ্মণ নেমন্তন্ন করেছিল সুরেশ কাকাকে আর ও পাড়ার তিনুর বাবাকে। ওবেলা তো পায়েস, ঝোল পুলি, মুগতক্তি, এই সব হয়েছে।

পুঁটি জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ মা, ক্ষীর নইলে নাকি পাটিসাপ্টা হয় না? খেঁদি বলছিল, ক্ষীরের পুর না হলে কি আর পাটিসাপ্টা হয়? আমি বললাম, কেন, আমার মা তো শুধু নারকেলের ছাঁই দিয়ে করে, সে তো কেমন লাগে!

অন্নপূর্ণা বেগুনের বোঁটায় একটুখানি তেল লইয়া খোলায় মাখাইতে মাখাইতে প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজিতে লাগিলেন।

ক্ষেন্তি বলিল—খেঁদির ওই সব কথা। খেঁদির মা তো ভারি পিঠে করে কিনা? ক্ষীরের পুর দিয়ে ঘিয়ে ভাজলেই কি আর পিঠে হ'ল? সেদিন জামাই এলে ওদের বাড়ী দেখতে গেলুম কিনা, তাই খুড়ীমা দুখানা পাটিসাপ্টা খেতে দিলে, ওমা কেমন একটা ধরা-ধরা গন্ধ, আর মা'র পিঠেতে কখনো কোন গন্ধ পাওয়া যায়? পাটিসাপ্টায় ক্ষীর দিলে ছাই খেতে হয়!

বেপরোয়াভাবে উপরোক্ত উক্তি শেষ করিয়া ক্ষেন্তি মা'র চোখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মা, নারকোল-কোরা একটু নেবো?

অন্নপূর্ণা বলিলেন—নে, কিন্তু এখানে বসে খাসনে। মুখ থেকে পড়বে না কি হবে. যা ঐদিকে যা।

ক্ষেন্তি নারকেলের মালায় এক থাবা কোরা তুলিয়া লইয়া একটু দূরে গিয়া খাইতে লাগিল। মুখ যদি মনের দর্পণস্বরূপ হয়, তবে ক্ষেন্তির মুখ দেখিয়া সন্দেহের কোন কারণ থাকিতে পারিত না যে, সে অত্যন্ত মানসিক তৃপ্তি অনুভব করিতেছে।

ঘণ্টাখানেক পরে অন্নপূর্ণা বলিলেন—ওরে, তোরা সব এক এক টুকরো পাতা পেতে বোস তো দেখি! গরম গরম দিই। ক্ষেন্তি, জল দেওয়া ভাত আছে ওবেলার. বার ক'রে নিয়ে আয়।

ক্ষেন্তির নিকট অন্নপূর্ণার এ প্রস্তাব যে মনঃপূত হইল না. তাহা তার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল। পুঁটি বলিল—মা, বড়দি পিঠেই খাক। ভালবাসে। ভাত বরং থাকুক. আমরা কাল সকালে খাব!

খানকয়েক খাইবার পরেই ছোট মেয়ে রাধা আর খাইতে চাহিল না। সে নাকি অধিক মিষ্ট খাইতে পারে না। সকলের খাওয়া শেষ হইয়া গেলেও ক্ষেন্তি তখনও খাইতেছে। সে মুখ বুজিয়া শান্তভাবে খায়, বড় একটা কথা কহে না। অন্নপূর্ণা দেখিলেন, সে কম করিয়াও আঠারো-উনিশখানা খাইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন—ক্ষেন্তি, আর নিবি?... ক্ষেন্তি খাইতে খাইতে শান্ত ভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। অন্নপূর্ণা তাহাকে আরও খানকয়েক দিলেন। ক্ষেন্তির মুখ চোখ ঈষৎ উজ্জ্বল দেখাইল, হাসি-ভরা চোখে মা'র দিকে চাহিয়া বলিল—বেশ খেতে হয়েছে, মা। ঐ যে তুমি কেমন ফেনিয়ে নেও, ওতেই কিন্তু...সে পুনরায় খাইতে লাগিল!

অন্নপূর্ণা হাতা, খুন্তি, চুলী তুলিতে তুলিতে সস্নেহে তাঁর এই শান্ত নিরীহ একটু অধিক মাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে ভাবিলেন—ক্ষেন্তি আমার যার ঘরে যাবে, তাদের অনেক সুখ দেবে। এমন ভালমানুষ, কাজ-কর্মে বকো, মারো, গাল দাও, টুঁ শব্দটি মুখে নেই, উঁচু কথা কখনো কেউ শোনেনি...

বৈশাখ মাসের প্রথমে সহায়হরির এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের ঘটকালিতে ক্ষেন্তির বিবাহ হইয়া গেল। দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিলেও পাত্রটির বয়স চল্লিশের খুব বেশী কোন মতেই হইবে না। তবুও প্রথমে এখানে অন্নপূর্ণা আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু পাত্রটি সঙ্গতিপন্ন, শহর অঞ্চলে বাড়ী, সিলেট চুন ও ইঁটের ব্যবসায়ে দু'পয়সা নাকি করিয়াছে—এরকম পাত্র হঠাৎ মেলাও বড় দুর্ঘট কিনা!

জামাইয়ের বয়স একটু বেশী, প্রথমে অন্নপূর্ণা জামাইয়ের সম্মুখে বাহির হইতে একটু সংকোচ বোধ করিতেছিলেন, পরে পাছে ক্ষেন্তির মনে কষ্ট হয়, এই জন্য বরণের সময় তিনি ক্ষেন্তির সুপুষ্ট হস্তখানি ধরিয়া জামাইয়ের হাতে তুলিয়া দিলেন—চোখের জলে তাঁহার গলা বন্ধ হইয়া আসিল, কিছু বলিতে পারিলেন না।

বাড়ীর বাহির হইয়া আমলকীতলায় বেহারারা সুবিধা করিয়া লইবার জন্য বরের পাল্কি একবার নামাইল। অন্নপূর্ণা চাহিয়া দেখিলেন, বেড়ার ধারের নীল রং-এর মেদিফুলের গুচ্ছগুলি যেখানে নত হইয়া আছে, ক্ষেন্তির কম দামের বালুচরের রাঙা চেলীর আঁচলখানা পাল্কির বাহির হইয়া সেখানে লুটাইতেছে।...তাঁর এই অত্যন্ত অগোছালো, নিতান্ত নিরীহ, একটু অধিক মাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটিকে পরের ঘরে অপরিচিত মহলে পাঠাইতে তাঁর বুক উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল। ক্ষেন্তিকে কি অপরে ঠিক বুঝিবে?

যাইবার সময় ক্ষেন্তি চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে সান্ত্বনার সুরে বলিয়াছিল—মা, আষাঢ় মাসেই আমাকে এনো...বাবাকে পাঠিয়ে দিও...দু'টো মাস তো...

ওপাড়ার ঠানদিদি বলিলেন—তোর বাবা তোর বাড়ী যাবে কেন রে, আগে নাতি হোক—তবে তো...

ক্ষেন্তির মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। জলভরা ডাগর চোখের উপর একটুখানি লাজুক হাসির আভা মাখাইয়া সে একগুঁয়েমির সুরে বলিল—না, যাবে না বৈকি? দেখো তো, কেমন না যান্!

ফাল্গুন-চৈত্র মাসের বৈকাল বেলা উঠানের মাচায় রৌদ্রে দেওয়া আমসত্ত্ব তুলিতে তুলিতে অন্নপূর্ণার মন হু-হু করিত...তার অনাচারী লোভী মেয়েটি আজ বাড়ীতে নাই যে, কোথা হইতে বেড়াইয়া আসিয়া লজ্জাহীনার মতন হাতখানি পাতিয়া মিনতির সুরে অমনি বলিবে—মা, বল্‌ব একটা কথা, ঐ কোণটা ছিঁড়ে একটুখানি...

এক বছরের উপর হইয়া গিয়াছে। পুনরায় আষাঢ় মাস। বর্ষা বেশ নামিয়াছে। ঘরের দাওয়ায় বসিয়া সহায়হরি প্রতিবেশী বিষ্ণু সরকারের সহিত কথা বলিতেছেন। সহায়হরি তামাক সাজিতে সাজিতে বলিলেন--ও তুমি ধ'রে রাখো, ও-রকম হবেই দাদা। আমাদের অবস্থার লোকের ওর চেয়ে ভাল কি আর জুটবে?

বিষ্ণু সরকার তালপাতার চাটাইয়ের উপর উবু হইয়া বসিয়া ছিলেন, দূর হইতে দেখিলে মনে হইবার কথা, তিনি রুটি করিবার জন্য ময়দা চট্‌কাইতেছেন। গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন,—নাঃ, সব তো আর...তা ছাড়া আমি যা দেব নগদই দেব। তোমার মেয়েটির হয়েছিল কি?

সহায়হরি হুঁকাটায় পাঁচ-ছটি টান দিয়া কাশিতে কাশিতে বলিলেন—বসন্ত হয়েছিল শুনলাম। ব্যাপার কি দাঁড়াল, বুঝলে? মেয়ে তো কিছুতে পাঠাতে চায় না। আড়াইশো আন্দাজ টাকা বাকী ছিল, বললে, ও টাকা আগে দাও তবে মেয়ে নিয়ে যাও।

—একেবারে চামার...

—তারপর বললাম, টাকাটা ভায়া ক্রমে ক্রমে দিচ্ছি। পুজোর তত্ত্ব কম ক'রেও ত্রিশটে টাকার কমে হবে না ভেবে দেখলাম কি না! মেয়ের নানা নিন্দে ওঠালে...ছোটলোকের মেয়ের মতন চাল, হাভাতে ঘরের মত খাই খাই...আরও কত কি! পৌষ মাসে দেখতে গেলাম—মেয়েটাকে ফেলে থাকতে পারতাম না, বুঝলে?

সহায়হরি হঠাৎ কথা বন্ধ করিয়া জোরে জোরে মিনিট-কতক ধরিয়া হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ দুজনের কোন কথা শোনা গেল না।

অল্পক্ষণ পরে বিষ্ণু সরকার বলিলেন—তারপর?

—আমার স্ত্রী অত্যন্ত কান্নাকাটি করাতে পৌষ মাসে দেখতে গেলাম। মেয়েটার যে অবস্থা করেছে! শাশুড়ীটা শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, না জেনে শুনে ছোটলোকের সঙ্গে কুটুম্বিতে করলেই এ রকম হয়, যেমনি মেয়ে তেমনি বাপ, পৌষ মাসের দিন মেয়ে দেখতে এলেন শুধু হাতে!...পরে বিষ্ণু সরকারের দিকে চাহিয়া বলিলেন—বলি আমরা ছোটলোক কি বড়লোক, তোমার তো সরকার খুড়ো জানতে বাকী নেই, বলি পরমেশ্বর চাটুজ্যের নামে নীলকুঠির আমলে এ অঞ্চলে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেয়েছে—আজই না হয় আমি...প্রাচীন আভিজাত্যের গৌরবে সহায়হরি শুষ্কস্বরে হা-হা করিয়া খানিকটা শুষ্ক হাস্য করিলেন।

বিষ্ণু সরকার সমর্থন-সূচক একটা অস্পষ্ট শব্দ করিয়া বারকতক ঘাড় নাড়িলেন।

—তারপর ফাল্গুন মাসেই তার বসন্ত হ'ল। এমন চামার—বসন্ত গায়ে বেরুতেই টালায় আমার এক দূর-সম্পর্কের বোন আছে, একবার কালীঘাটে পুজো দিতে এসে তার খোঁজ পেয়েছিল—তারই ওখানে ফেলে রেখে গেল। আমায় না একটা সংবাদ, না কিছু। তারা আমায় সংবাদ দেয়। তা আমি গিয়ে...

—দেখতে পাওনি?

—নাঃ! এমনি চামার——গহনাগুলো অসুখ অবস্থাতেই গা থেকে খুলে নিয়ে তবে টালায় পাঠিয়ে দিয়েছে...যাক, তা চলো, যাওয়া যাক, বেলা গেল। চার কি ঠিক করলে? ...পিঁপড়ের টোপে মুড়ির চার তো সুবিধা হবে না।...

তারপর কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। আজ আবার পৌষ-পার্বণের দিন। এবার পৌষ মাসের শেষাশেষি এত শীত পড়িয়াছে যে অত্যন্ত বৃদ্ধ লোকেরাও বলাবলি করিতেছেন যে, এরূপ শীত তাঁহারা কখনো জ্ঞানে দেখেন নাই।

সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরের মধ্যে বসিয়া অন্নপূর্ণা সরুচাক্‌লি পিঠার জন্য চালের গুঁড়াব

গোলা তৈয়ারী করিতেছেন। পুঁটি ও রাধী উনানের পাশে বসিয়া আগুন পোহাইতেছে।

রাধী বলিতেছে—আর একটু জল দিতে হবে মা, অত ঘন করে ফেললে কেন?

পুঁটি বলিল—আচ্ছা মা, ওতে একটু নুন দিলে হয় না?

—ওমা দেখ মা, রাধীর দোলাই কোথায় ঝুলছে, এখুনি ধরে উঠবে...

অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিলেন—স'রে এসে ব'সো না, আগুনের ঘাড়ে গিয়ে না বসলে কি আগুন পোহানো হয় না? এই দিকে আয়।

গোলা তৈয়ারী হইয়া গেলে খোলা আগুনে চড়াইয়া অন্নপূর্ণা গোলা ঢালিয়া মুচি দিয়া চাপিয়া ধরিলেন...দেখিতে দেখিতে মিঠে-আঁচে পিঠা টোপরের মতন ফুলিয়া উঠিল।

পুঁটি বলিল—মা দাও, প্রথম পিঠাখানা কানাচে ষাঁড়া-ষষ্ঠীকে ফেলে দিয়ে আসি।

অন্নপূর্ণা বলিলেন—একা যাসনে, রাধীকে নিয়ে যা।

খুব জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল, বাড়ীর পিছনে ষাঁড়াগাছের ঝোপের মাথায় তেলাকুচো লতার থোলো থোলো সাদা ফুলের মধ্যে জ্যোৎস্না আটকিয়া রহিয়াছে।...

পুঁটি ও রাধী খিড়কি-দোর খুলিতেই একটা শিয়াল শুকনো পাতায় খস্ খস্ শব্দ করিতে করিতে ঘন ঝোপের মধ্যে ছুটিয়া পলাইল। পুঁটি পিঠাখানা জোর করিয়া ছুঁড়িয়া ঝোপের মাথায় ফেলিয়া দিল। তাহার পর চারিধারের নির্জন বাঁশবনের নিস্তব্ধতায় ভয় পাইয়া ছেলেমানুষ পিছু হটিয়া আসিয়া খিড়কি-দরজার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

পুঁটি ও রাধী ফিরিয়া আসিলে অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন—দিলি?

পুঁটি বলিল—হ্যাঁ মা, তুমি আর বছর যেখান থেকে নেবুর চারা তুলে এনেছিলে সেখানে ফেলে দিলাম...

তারপর সে রাত্রে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। পিঠে গড়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে ...রাতও তখন খুব বেশী।...জ্যোৎস্নার আলোয় বাড়ীর পিছনের বনে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা কাঠ্‌ঠোকরা পাখী ঠক্-র্-র্-র্ শব্দ করিতেছিল, তাহার স্বরটাও যেন ক্রমে তন্দ্রালু হইয়া পড়িতেছে...দুই বোনের খাইবার জন্য কলার পাতা চিরিতে চিরিতে পুঁটি অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—দিদি বড় ভালবাসত...

তিনজনেই খানিকক্ষণ নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর তাহাদের তিনজনেরই দৃষ্টি কেমন করিয়া আপনা-আপনি উঠানের এক কোণে আবদ্ধ হইয়া পড়িল...যেখানে বাড়ীর সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায়-পাতায় শিরায়-শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁইগাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে... বর্ষার জল ও কার্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি-কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে...সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর!...

প্রবাসী, মাঘ, ১৩৩১

জলসত্র

বৃদ্ধ মাধব শিরোমণি মশায় শিষ্য-বাড়ি যাচ্ছিলেন।

বেলা তখন একটার কম নয়। সূর্য মাথার উপর থেকে একটু হেলে গিয়েছে। জ্যৈষ্ঠমাসের খররৌদ্রে বালি গরম, বাতাস একেবারে আগুন, মাঠের চারিধারে কোনদিকে

কোন সবুজ গাছপালার চিহ্ন চোখে পড়ে না। এক-আধটা বাবলা গাছ যা আছে তাও পত্রহীন। মাঠের ঘাস রোদপোড়া—কটা। ব্রাহ্মণের কাপড়-চোপড় গরম হাওয়ায় আগুন হয়ে উঠলো, আর গায়ে রাখা যায় না। এক-একটা আগুনের ঝলকের মত দমকা হাওয়ায় গরম বালি উড়ে এসে তাঁর চোখে-মুখে তীক্ষ্ণ হয়ে বিঁধছিল। জ্যৈষ্ঠমাসের দুপুরবেলা এ-মাঠ পার হতে যাওয়া যে ইচ্ছে করে' প্রাণ দিতে যাওয়ার সামিল, এ-কথা নবাবগঞ্জের বাজারে তাঁকে অনেকে বলেছিল, তবুও যে তিনি কারুর কথা না শুনে জোর করেই বেরুলেন, সে কেবল বোধহয় কপালে দুঃখ ছিল বলেই।

পশ্চিম দিকে অনেক দূরে একটা উলুখড়ের ক্ষেত গরম বাতাসে মাথা দোলাচ্ছিল। যেদিকে চোখ যায়, সে-দিকেই কেবল চক্চকে খরবালির সমুদ্র। ব্রাহ্মণের ভয়ানক তৃষ্ণা পেল, গরম বাতাসে শরীরের সব জল যেন শুকিয়ে গেল, জিব জড়িয়ে আসতে লাগলো। তৃষ্ণা এত বেশী হোল যে, সামনে ডোবার পাতাপচা কালো জল পেলেও তা তিনি আগ্রহের সংগে পান করেন। কিন্তু নবাবগঞ্জ থেকে রতনপুর পর্যন্ত সাড়ে চার ক্রোশ বিস্তৃত এই প্রকাণ্ড মাঠটার মধ্যে যে কোথাও জল পাওয়া যায় না, তা তো তাঁকে কেউ কেউ বাজারেই বলেছিল। এ কষ্ট তাঁকে ভোগ করতেই হবে।

ব্রাহ্মণ কিন্তু ক্রমেই ঘেমে উঠতে লাগলেন। তাঁর কান দিয়ে, নাক দিয়ে নিঃশ্বাসে যেন আগুনের ঝলক বেরুতে লাগলো। জিব জোর করে' চুষলেও তা থেকে আর রস পাওয়া যায় না, ধুলোর মত শুকনো। চারিদিকে ধু-ধু মাঠ খররৌদ্রে যেন নাচছে... চক্চকে বালিরাশি রোদ ফিরিয়ে দিচ্ছে...মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঘূর্ণি হাওয়া গরম বালি-ধুলো-কুটো উড়িয়ে নাকে-মুখে নিয়ে এসে ফেলছে।...অসহ্য পিপাসায় তিনি চোখে ধোঁয়া-ধোঁয়া দেখতে লাগলেন। মনে হোতে লাগলো—একটু ঘন সবুজ মত যদি কোন পাতাও পাই তা হলে চুষি...জীবনে তিনি যত ঠাণ্ডা জল খেয়েছিলেন তা' এইবার তাঁর একে একে মনে আসতে লাগলো। তাঁর বাড়ির পুকুরের জল কত ঠাণ্ডা...পাহাড়-পুরের কাছারির ইঁদারার জল সে তো একেবারে বরফ...কবে তিনি শিষ্যবাড়ি গিয়েছিলেন, বৈশাখ মাসের দিন তারা তাঁকে বড় সাদা কাঁসার ঘটি করে নতুন কলসীর জল খেতে দিয়েছিল, সে জল একেবারে হিম, খাবার সময় দাঁত কনকন করে। আচ্ছা, এখন যদি সেই রকম এক ঘটি জল কেউ তাঁকে দেয়?...তাঁর তৃষ্ণাটা হঠাৎ বেড়ে গিয়ে বুকের কল্জে পর্যন্ত যেন শুকিয়ে উঠলো। এ মাঠটাকে এ অঞ্চলে বলে কচু-চুষির মাঠ। তাঁর মনে পড়লো তিনি শুনেছিলেন, এ জেলার মধ্যে এত বড় মাঠ আর নেই ; আগে আগে অনেকে নাকি বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরে এ মাঠ পার হতে গিয়ে সত্যি সত্যি প্রাণ হারিয়েছে, গরম বালির ওপর তাদের নির্জীব দেহ লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। অসহ্য জল-তৃষ্ণায় তারা আর চলতে অক্ষম হয়ে গরম বালির ওপর ছটফট করে প্রাণ হারিয়েছে! ...সত্যিই তো!...এখনও তো দু-ক্রোশ দূরে গ্রাম...যদি তিনিও?...

শুধু মনের জোরে তিনি পথ চলতে লাগলেন। এই পথ হাঁটার শেষে কোথায় যেন এক ঘটি ঠাণ্ডা কনকনে হিমজল তাঁর জন্যে কে রেখে দিয়েছে, পথ হাঁটার বাজী জিতলে, সেই জলঘটিটাই যেন তাঁর পুরস্কার, এই ভাবেই তিনি কলের পুতুলের মত চলছিলেন। আধক্রোশটাক পথ চলে উলুখড়ের বনটা ডাইনে ফেলেই দেখলেন, বোধহয় আর আধ ক্রোশ পথ দূরে একটা বড় বটগাছ। গাছটার তলায় কোন পুকুর হয়তো থাকতে পারে, না থাকে, ছায়াও তো আছে?

বটতলায় পেঁাছে দেখলেন একটা জলসত্র। চার-পাঁচটা নূতন জালায় জল, এক পাশে একরাশি কাঁচ ডাব! এক ধামা ভিজে ছোলা, একটা বড় জায়গায় অনেকটা নতুন আখের গুড়, একটা ছোট ধামায় আধ ধামা বাতাসা! বাঁশের চেরা একটা খোল কাতার দড়ি

দিয়ে আর একটা বাঁশের খুঁটির গায়ে বাঁধা। একজন জালা থেকে জল উঠিয়ে চেরা বাঁশের খোলে ঢেলে দিচ্ছে। আর লোকে বাঁশের খোলের এ-মুখে অঞ্জলি পেতে জল পান করছে।

গাছতলায় যারা বসেছিল, ব্রাহ্মণ দেখে শিরোমণি মহাশয়কে তারা খুব খাতির করলে। একজন জিজ্ঞাসা করলে—ঠাকুর মশায়ের আগমন হচ্ছে কোথা থেকে?

একজন বলল—আহা, সে কথা রাখো, বাবা-ঠাকুর আগে ঠান্ডা হোন।

শিরোমণি মশায় যেখানে বসলেন, সেখানে প্রকাণ্ড বটগাছটা প্রায় দু'তিন বিঘা জমি জুড়ে আছে। হাতীর শুঁড়ের মত লম্বা লম্বা ঝুরি চারিদিকে নেমেছে। একজন তাঁকে তামাক সেজে দিয়ে একটা বটপাতা ভেঙে নিয়ে এল নল করবার জন্যে।...আঃ, কি ঝিরঝিরে হাওয়া! এই অসহ্য পিপাসা ও গরমের পর এমন ঠান্ডা ঝিরঝিরে বাতাস ও তৈরী-তামাকে তাঁর তৃষ্ণাও যেন অনেকটা কমে গেল।

তামাক খাওয়া শেষ হোল। একজন বললে—ঠাকুর মশায়, হাত-পা ধুয়ে ঠান্ডা হোন। ভাল সন্দেশ আছে ব্রাহ্মণদের জন্যে আনা, সেবা করে একটু জল খান, এই রোদে এখন আর যাবেন না—বেলা পড়ুক।

তারপর শিরোমণি মশায় জিজ্ঞাসা করলেন—এ জলসত্র কাদের?

—আজ্ঞে ঐ আমডোবের বিশ্বেসদের। শ্রীমন্ত বিশ্বেস আর নিতাই বিশ্বেস, নাম শুনেছেন?

শিরোমণি মশায় বললেন—বিশ্বেস? সদ্‌গোপ?

—আজ্ঞে না, কলু।

সর্বনাশ! নতুন মাটির জালা ভর্তি জল ও কাঁচ ডাবের রাশি দেখে পিপাসার্ত শিরোমণি মশায় যে আনন্দ অনুভব করেছিলেন, তা তাঁর এক মুহূর্তে কর্পূরের মত উবে গেল। কলুর দেওয়া জলসত্রে তিনি কি করে জল খাবেন? তিনি নিজে এবং তাঁর বংশ চিরদিন অশূদ্রে প্রতিগ্রাহী; আজ কি তিনি—ওঃ! ভাগ্যে কথাটা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।—নইলে এখনি তো...

শিরোমণি মশায় জিজ্ঞাসা করলেন—এ জলসত্র কতদিনের দেওয়া?

—তা আজ প্রায় পনেরো-ষোল বছর হবে। শ্রীমন্ত বিশ্বেসের বাপ তারাচাঁদ বিশ্বেস এই জলসত্র বসিয়ে যায়। সে হয়েছিল কি বলি শুনুন। বলে লোকটা সেই কাহিনী বলতে আরম্ভ করলে।

আমডোবের তারাচাঁদ বিশ্বেস যখন ছোট, চোদ্দ-পনেরো বছর বয়স তখন তার বাপ মারা যায়। সংসারে কেবল ন'-দশ বছরের একটি বোন ছাড়া তারাচাঁদের আর কেউ ছিল না। ভাই-বোনে মাথায় করে কলা বেগুন কুমড়ো এইসব হাটে বিক্রি করতো; এতেই তাদের সংসার চলতো। সেবার বোশেখ মাসের মাঝামাঝি তারাচাঁদ ছোট বোনটিকে নিয়ে নবাবগঞ্জের হাটে তালশাঁস বিক্রি করতে গিয়েছিল। ফেরার সময় তারাচাঁদ মাঠের আর কিছু ঠিক পায় না—নবাবগঞ্জ থেকে রতনপুর পর্যন্ত এই মাঠটা সাড়ে চার ক্রোশের বেশী হবে তো কম নয়। কোথাও একটা গাছ পর্যন্ত নেই। বোশেখ মাসের দুপুর রোদে মাঠ বেয়ে আসতে তারাচাঁদের ছোট বোনটা অবসন্ন হয়ে পড়লো। তারাচাঁদের নিজের মুখে শুনেছি, ছোট বোনটি মাঠের মাঝামাঝি এসে বললে—দাদা, আমার বড় তেষ্টা পেয়েছে, জল খাবো।

তারাচাঁদ তাকে বোঝালে, বললে—একটু এগিয়ে চল, রতনপুরের কৈবর্ত পাড়ায় জল খাওয়াবো।

সেই 'একটু আগিয়ে' মানে দু'ক্রোশের কম নয়। আর খানিকটা এসে মেয়েটা তেষ্টায় রোদে অবসন্ন হয়ে পড়লো। বার বার বলতে লাগলো—ও দাদা, তোর দুটি পায়ে পড়ি,

দে আমায় একটু জল...

তারাচাঁদ তাকে কোলে তুলে নিয়ে এই বটগাছটার ছায়ায় নিয়ে এসে ফেললে। ছোট মেয়েটা তখন আর কথা বলতে পারছে না। তারাচাঁদ তার অবস্থা দেখে তাকে নামিয়ে রেখে ছুটে জলের সন্ধানে গেল। এখান থেকে আধক্রোশ তফাতে রতনপুরের কৈবর্ত-পাড়া থেকে এক ঘটি জল চেয়ে এনে দেখে, তার ছোট বোনটা গাছতলায় মরে পড়ে আছে, তার মুখে একটা কচুর ডগা! এই বটগাছটা তখন ছোট ছিল, ওরই তলায় অনেক কচুবন ছিল। তেষ্টায় যন্ত্রণায় মেয়েটা সেই বুনো কচুর ডগা মুখে করে তার রস চুষেছিল— সেই থেকে এই মাঠটার নাম হোল কচু-চুষির মাঠ।

তারাচাঁদ বিশ্বেস ব্যবসা করে বড়লোক হয়েছিল। শুনেছি নাকি তার সে বোন তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলতো—দাদা, ঐ মাঠের মধ্যে সকলের জল খাবার জন্য তুই একটা জলসত্র করে দে!...তাই তারাচাঁদ বিশ্বেস এখানে এই বটগাছ পিতিষ্ঠে করে জলসত্র বসিয়ে গেছে—সে আজ পনেরো-ষোল কি বিশ বছরের কথা হবে। ঠাকুরমশায়, কচু-চুষির মাঠের এ জলসত্র এদিকের সকলেই জানে। বলবো কি বাবা ঠাকুর, এমনও শুনেছি যে মাঠের মধ্যে জলতেষ্টায় বেঘোরে পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে, এমন লোক নাকি কেউ কেউ দেখেছে একটা ছোট মেয়ে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলছে—ওগো আমি জল দেবো, তুমি আমার সঙ্গে এস।...

লোকটা তার কাহিনী শেষ করলে ; তারপর বললে—সত্যি-মিথ্যে জানি নে ঠাকুর-মশায়, লোকে বলে তাই শুনি, বোশেখ মাসের দিন ব্রাহ্মণের কাছে মিথ্যে বলে কি শেষকালে...

লোকটা দুই হাতে নিজের কান মলে কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে এক প্রণাম করলে।

বেলা পড়ে এল। কত লোক জলসত্রে আসতে-যেতে লাগলো। একজন চাষা পাশের মাঠ থেকে লাঙ্গল ছেড়ে বটতলায় উঠলো। ঘেমে সে নেয়ে উঠেছে। একটু বিশ্রাম করে সে তৃপ্তির সঙ্গে ছোলা, গুড় আর জল খেয়ে বসে গল্প করতে লাগলো।

এক বুড়ী অন্য গ্রাম থেকে ভিক্ষা করে ফিরছিল। গাছতলায় এসে সে ঝুলি নামিয়ে একটু জল চেয়ে নিয়ে হাত-পা ধুলে। একজন বললে—আবদুলের মা, একটা ডাব খাবা?

আবদুলের মা একগাল হেসে বললে—তা দ্যাও দিকি মোরে, আজ অ্যাকটা খাই। মরবো তো, খেয়েই মরি।

একজন লোক পরনে টাট্‌কা কোরা কাপড়ের ওপর নতুন পাটভাঙা ধপধপে সাদা টুইলের শার্ট, হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তোলা পায়ে এক-পা ধুলো, বটতলায় এসে হতাশ-ভাবে ধপ করে বসে পড়লো। কেউ জিজ্ঞাসা করলে—ছমিরুদ্দি মিঞা যে, আজ ছানির দিন ছিল না?

ছমিরুদ্দি সম্পূর্ণ ভদ্রতাসঙ্গত নয় এরূপ একটি বাক্য উচ্চারণ করে ভূমিকা ফেঁদে তার মকদ্দমার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করে গেল এবং যে উকীলের হাতে তার কেস ছিল, তার সম্বন্ধে এমন কতকগুলো মন্তব্য প্রকাশ করলে যে, তিনি সেখানে উপস্থিত থাকলে ছমিরুদ্দির বিরুদ্ধে আর একটা কেস হোত। তারপর সে পোয়াটাক আখের গুড়ের সাহায্যে আধসের আন্দাজ ভিজে-ছোলা উদরসাৎ করে একছিলিম তামাক খেয়ে বিদায় নিলে।

ক্রমে রোদ পড়ে গেল। বৈকালের বাতাসে কাছেরই একটা ঝোপ থেকে ডাঁশা খেজুরের গন্ধ ভেসে আসছিল। হলুদ রংএর সোঁদালী ফুলের ঝাড় মাঠের পেছনটা আলো করে ছিল। একটা পাখী আকাশ বেয়ে ডানা মেলে চলেছিল—বৌ কথা-ক'—বৌ কথা-ক'।

শিরোমণি মশায়ের বসে বসে মনে হোল, বিশ বছর আগে, তাঁর আট বছরের পাগলী

মেয়ে উমার মতই ছোট একটি মেয়ে এই বটতলায় অসহ্য পিপাসায় জল অভাবে বনো কচুর ডাঁটার কটু রস চুষেছিল, আজ তারই স্নেহ করুণা এই বিরাট বটগাছটার নিবিড় ডালপালায় বেড়ে উঠে এই জলকষ্টপীড়িত পল্লী-প্রান্তরের একধারে পিপাসার্ত পথিকদের আশ্রয় তৈরী করেছে।...এরই তলায় আজ বিশ বছর ধরে সে মঙ্গলরূপিণী জগদ্ধাত্রীর মত দশহাত বাড়িয়ে প্রতি নিদাঘ-মধ্যাহ্নে কত পিপাসাতুর পল্লী-পথিককে জল যোগাচ্ছে! চারিধারে যখন সন্ধ্যা নামে...তপ্ত মাঠ পথ যখন ছায়া-শীতল হয়ে আসে...তখনই কেবল সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সে মেয়েটি অস্ফুট জ্যোৎস্নায় শুভ্র-আঁচল উড়িয়ে কোন অজ্ঞাত ঊর্ধ্বলোকে তার নিজের স্থানটিতে ফিরে চলে যায়!...তার পৃথিবীর বালিকা-জীবনের ইতিহাস সে ভোলে নি।...

যে লোকটা জল দিচ্ছিল, তার নাম চিনিবাস, জাতে সদ্‌গোপ। শিরোমণি মশায় তাকে বললেন—ওহে বাপু, তোমার ঐ বড় ঘটিটা বেশ করে মেজে এক ঘটি জল আমায় দাও, আর ইয়ে—ব্রাহ্মণের জন্য আনা সন্দেশ আছে বললে না?

কনে দেখা

সকাল বেলা বৈঠকখানার গাছপালার হাটে ঘুরছিলাম।

গত মাসে হাটে কতকগুলি গোলাপের কলম কিনেছিলাম, তার মধ্যে বেশীর ভাগ পোকা লেগে নষ্ট হয়ে গেছে। নার্সারির লোক আমার জানাশুনো, তাদের বল্লাম.—কি রকম কলম দিয়েছিলে হে! সে যে টবে বসাতে দেরি সইল না! তা ছাড়া আবদুল কাদের বলে বিক্রী করলে, এখন সবাই বল্যছে আবদুল কাদের নয় ও অত্যন্ত মামুলি জাতের টী রোজ্। ব্যাপার কি তোমাদের?

নার্সারির পুরোনো লোকটাই আজ আছে। সেদিন এ ছিল না, তাই ঠকেছিলাম। এই লোকটা খুব অপ্রতিভ হলো। বল্লে—বাবু, এই হয়েছে কি জানেন? বাগানের মালিকেরা আজকাল আছেন কল্‌কাতায়। আমি একা সব দিক দেখ্‌তে পারি নে, ঠিকে উড়ে মালী নিয়ে হয়েছে কাজ। তাদের বিশ্বাস কল্লে চলে না, আবার না কল্লেও চলে না। আমি তো সর্বদিন হাট সাম্‌লাতে পারি নে বাবু! ওদেরই ধরে পাঠাতে হয়, আমি গুনেছিলাম টী রোজ তিন-ডজন, আমি তো তার কাছ থেকে টী রোজেরই দাম নেবো? এখানে এসে যদি আবদুল কাদের বলে বিক্রী করে তো তারই লাভ। বাড়্‌তি পয়সা আমার নয়, তার। বুঝলেন না বাবু?

বাজার খুব জেঁকেছে। বর্ষার নওয়ালির মুখ, নানা ধরনের গাছের আমদানী হয়েচে। বড় বড় বিলিতি দোপাটি, মতিয়া বেল, অতসীলতা, রাস্তার ধারের সারিতে নানা ধরনের পাম্, ছোট ছোট পাম্ থেকে ফ্যান্ পাম্ ও বড় টবে ভাল এরিকা পামও আছে। সূর্য-মুখীর যদিও এ সময় নয়, কিন্তু সূর্যমুখী এসেছে অনেক। তা ছাড়া কল্‌কাতার রাস্তায় অনভিজ্ঞ লোকদের কাছে অর্কিড্ বলে যা বিক্রী হয়, সেই নারকোলের ছোব্‌ড়া ও তার-বাঁধা ফার্ন ও রঙীন আগাছা যথেষ্ট বিক্রী হচ্ছে। লোকের ভিড়ও বেশ।

হঠাৎ দেখি আমার অনেকদিন আগেকার পুরোনো রুমমেট্ হিমাংশু। ৭।৩ নং কানাই সরকারের লেনের মেসে তার সঙ্গে অনেক দিন একঘরে কাটিয়েছি। সে আজ সাত আট বছর আগেকার কথা—তারপর সে কলকাতা ছেড়ে চলে যায়। আর তার কোনো খবর রাখি নি আজকাল।

—এই যে হিমাংশু? চিন্‌তে পারো?

হিমাংশু চম্‌কে পেছন ফিরে চাইলে এবং কয়েক সেকেন্ড সবিস্ময়ে আমার দিকে

চেয়ে থাকবার পরে সে আমায় চিনলে। হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল হাসিমুখে।

—আরে জগদীশবাবু যে! তারপর? ওঃ, আপনার সঙ্গে একযুগ পরে—ওঃ! তারপর আছেন কেমন বলুন!

আমি বল্লাম—তোমার গাছপালার শখ দেখচি আছে হিমাংশু, সেই মনে আছে দুজনে কতদিন এখানে হাটে আসতাম?

হিমাংশু হেসে বল্লে—তা আর মনে নেই? সেই আপনি দার্জিলিংয়ের লিলি কিনলেন? আপনার তো খুব শখ ছিল লিলির। এখনও আছে? আসুন, আসুন, অন্য কোথাও গিয়ে একটু বসি। ও মেসটার কোনো খবর আর রাখেন নাকি? আচ্ছা সেই অনাদিবাবু কোথায় গেল খোঁজ রাখেন? আর সেই যে মেয়েটি স্টোভ জ্বালাতে গিয়ে গা হাত পুড়িয়ে ফেল্লে, মনে আছে? তার বিয়ে হয়েচে?

দুজনে গিয়ে একটা চায়ের দোকানে বসলাম। এ গল্প ও গল্প—নানা পুরোনো দিনের কথা। তার কথাবার্তার ভাবে বুঝলাম সে কলকাতায় এসেচে অনেক দিন পরে।

জিজ্ঞেস কল্লাম—আজকাল কোথায় থাকো হিমাংশু?

সে বল্লে—বি. এন. আর-এর একটি স্টেশনে বুকিং-ক্লার্ক ছিলাম। টাটানগরের ওদিকে, কিছুদিন থাকবার পর দেখলাম জায়গাটার মাটিতে ভারী চমৎকার ফুল জন্মায়, জমিও সস্তা। সেখানেই এখন আছি—ফুলের বাগান করেচি—তুমি তো জানো বাগানের শখ আমার চিরকাল। কিছু চাষবাসের জমি নিয়েচি তাতেই চলে যায়। কিন্তু সেসব কথা থাক—আজ এখন একটা গল্প করি শোনো। গল্পের মত শোনাবে, কিন্তু আসলে সত্যি ঘটনা। আর আশ্চর্য এই, দশ বছর আগে যখন তোমাদের মেসে থাকতাম তখন এ গল্পের শুরু, এবং এর সমাপ্তি ঘটেছে গতকাল। আমি বল্লাম—ব্যাপার কি, তোমার কথা শুনে মনে হচ্চে নিশ্চয়ই প্রেমের কাহিনী জড়ানো আছে এর সঙ্গে। বলো বলো—। সে বল্লে—না, সে সব নয়। অন্য এক ব্যাপার, কিন্তু আমার পক্ষে কোনোও প্রণয়কাহিনীর চেয়ে তা কম মধুর নয়। শোনো বলি। আচ্ছা তোমার মনে আছে—মেসে থাকতে আমি একটা এরিকা পাম্ কিনেছিলাম, আমাদের ঘরের সাম্‌নে টবে বসানো ছিল, মনে আছে? আচ্ছা তা হোলে শোনো।

তারপর আধঘণ্টা বসে হিমাংশু তার গল্পটা বলে গেল। আমরা আরও দুবার চা খেলাম, একবাক্স সিগারেট্ পোড়ালাম। বৌবাজারের মোড়ে গির্জা ঘড়িটায় সাড়ে নটা যখন বাজ্‌ল, তখন হিমাংশু গল্প শেষ করে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

তার গল্পটা আমি আমার নিজের কথায় বল্‌বো, কেননা হিমাংশু সম্বন্ধে কিছু জানা থাকা দরকার,—গল্পটা ঠিক বুঝতে হোলে, সেটা আমাকে গোড়াতেই বলে দিতে হবে।

হিমাংশু যখন আমার সঙ্গে থাকতো, তখন তার চালচলন দেখলে মনে হবার কথা যে, সে বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। সে যে আহার-বিহারে বা বেশভূষায় খুব বেশী শৌখীন ছিল তা নয়, তার শখ ছিল নানা ধরনের এবং এই শখের পেছনে সে পয়সা ব্যয় করতো নিতান্ত বে-আন্দাজী।

তার প্রধান শখ ছিল গাছপালা ও ফুলের। আমার ফুলের শখটা হিমাংশুর কাছ থেকেই পাওয়া একথা বলতে আমার কোনো লজ্জা নেই। কারণ যত তুচ্ছ, যত অকিঞ্চিৎকর জিনিসই হোক না কেন, যেখানে সত্যি কোনো আগ্রহ বা ভালবাসার সন্ধান পাওয়া যায়—তাকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না।

হিমাংশুর গাছপালার ওপর ভালবাসা ছিল সত্যিকার জিনিস। সে ভালো খেতো না, ভাল কাপড় জামা কখনো দেখি নি তার গায়ে—কিন্তু এ ধরনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তার কাম্যও ছিল না। তার পয়সার সচ্ছলতা ছিল না কখনো, টুইশানি করে দিন চালাতো,

তাও আবার সব সময় জুটতো না, তখন বন্ধুবান্ধবদের কাছে ধার করতো। যখন ধারও মিল্‌তো না, তখন দিনকতক চন্দননগরে এক মাসীর বাড়ি গিয়ে মাসখানেক, মাস-দুই কাটিয়ে আসতো। কিন্তু পয়সা হাতে হলে কাপড় জামা না কিনুক, খাওয়া-দাওয়ায় ব্যয় করুক না করুক, ভালো গাছপালা দেখ্‌লে কিন্‌বেই।

মেসে আমাদের ঘরের সামনে ছোট একটা অপরিসর বারান্দাতে সে তার গাছপালার টবগুলো রাখতো। গোলাপের ওপর তার তত ঝোঁক ছিল না, সে ভালবাসতো নানা জাতীয় পাম্—বিশেষ করে বড় জাতীয় পাম্—আর ভালবাসতো দেশী-বিদেশী লতা—উইস্টারিয়া, অতসী, মাধবীলতা, বোগেন্‌ভিলিয়া ইত্যাদি। কত পয়সাই যে এদের পেছনে খরচ করেছে!

সকালে উঠে ওর কাজই ছিল গাছের পাট কর্তে বসা। শুক্‌নো ডালপালা ভেঙে দিচ্ছে, গাছ ছেঁটে দিচ্ছে, এ টবের মাটি ও টবে ঢাল্‌চে। পুরোনো টব ফেলে দিয়ে নতুন টবে গাছ বসাচ্চে, মাটি বদ্‌লাচ্চে। আবার মাঝে মাঝে মাটির সঙ্গে নানা রকমের সার মিশিয়ে পরীক্ষা কর্ত। এ সব সম্বন্ধে ইংরিজি বাংলা নানা বই কিনতো—একবার কি একটা উপায়ে ও একই লতায় নীলকলমী ও সাদাকলমী ফোটালে। ভায়োলেটের ছিট্ ছিট্ দেওয়া অতসী অনেক কষ্টে তৈরী করেছিল। বেগুনী রং-এর ক্রাইসেন্‌থিমামের জন্যে অনেক পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করেছিল, সুবিধে হয়নি।

তাছাড়া ও ধরনের মানুষ আমি খুব বেশী দেখি নি, যে একটা খেয়াল বা শখের পেছনে সমস্ত মন প্রাণ ঢেলে দিতে পারে। মানুষের মনের শক্তির সে একটা বড় পরিচয়। হিমাংশু বলতো—সেদিন একটা পাড়াগাঁয়ে একজনদের বাড়ি গিয়েচি, বুঝ্‌লেন?...তাদের গোলার কাছে তিন বছরের পুরোনো নারকেল গাছ হয়ে আছে। সে যে কি সুন্দর দেখাচ্চে! একটা প্রকান্ড তাজা, সতেজ, সবুজ পাম্। সমুদ্রের ধারে নাকি নারকেলের বন আছে—পাম্-এর সৌন্দর্য দেখতে হলে সেখানে যেতে হয়।

হিমাংশু প্রায়ই পাম্ আর অর্কিড্ দেখতে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে যেতো। আর এসে তাদের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা করতো।

একবার সে একটা এরিকা পাম্ কিনে আনলে। খুব ছোট নয়, মাঝারি গোছের মাটির টবে বসানো—কিন্তু এমন সুন্দর, এমন সতেজ গাছ বাজারে সাধারণতঃ দেখা যায় না। সে সন্ধান করে করে দম্‌দমায় কোন বাগানের মালীকে ঘুষ দিয়ে সেখান থেকে কেনে। কলকাতার মেসের বারান্দায় গাছ বাঁচিয়ে রাখা যে কত শক্ত কাজ, যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা সহজেই বুঝতে পারবেন। গোবি মরুভূমিতে গাছ বাঁচিয়ে রাখা এর চেয়ে সহজ। একবার সে আর আমি দিন-কুড়ি-বাইশের জন্যে কলকাতার বাইরে যাই ; চাকরকে আগাম পয়সা পর্যন্ত হিমাংশু দিয়ে গেল গাছে জল দেবার জন্যে, ফিরে এসে দেখা গেল ছ'সাতটা ফ্যান পাম্ শুকিয়ে পাখা হয়ে গেছে।

সকালে বিকালে হিমাংশু বাল্‌তি বাল্‌তি জল টান্‌তো একতলা থেকে তেতলায় টবে দেবার জন্যে। গাছ বাড়চে না কেন এর কারণ অনুসন্ধান কর্তে তার উদ্বেগের অন্ত ছিল না। অন্য সব গাছের চেয়ে কিন্তু ওই এরিকা পাম্ গাছটার ওপর তার মায়া ছিল বেশী, তার খাতা ছিল—তাতে লেখা থাকতো কোন্ কোন্ মাসে কত তারিখে গাছটা নতুন ডাল ছাড়লে। গাছটাও হয়ে পড়ল প্রকান্ড, মাটির টব বদলে তাকে পিপে-কাটা কাঠের টবে বসাতে হোল। মেসের বারান্দা থেকে নামিয়ে একতলায় উঠোনে বসাতে হোল। এ সবে লাগলো বছর পাঁচ ছয়।

সেবার বাড়িওয়ালার সঙ্গে বনিবনাও না হতে আমাদের মেস্ ভেঙে গেল।

দুজনে আর একত্র থাকবার সুবিধে হোল না, আমি চলে গেলাম ভবানীপুর।

হিমাংশু গিয়ে উঠ্‌লো শ্যামবাজারে আর একটা মেসে। একদিন আমায় এসে বিমর্ষ মুখে বল্লে—কি করি জগদীশবাবু, ও মেসে আমার টবগুলো রাখবার জায়গা হচ্ছে না—অন্য অন্য টবের না হয় কিনারা কর্তে পারি, কিন্তু সেই এরিকা পাম্‌টা সেখানে রাখা একেবারে অসম্ভব। একটা পরামর্শ দিতে পারেন? অনেকগুলো মেস্‌ দেখলাম, অত বড় গাছ রাখবার সুবিধে কোথাও হয় না। আর টানাটানির খরচাও বড় বেশী।

আমি তাকে কোনো পরামর্শ দিতে পারি নি বা তারপর থেকে আমার সঙ্গে আজকার দিনটি ছাড়া আর কোনদিন দেখাও হয় নি।

বাকীটা হিমাংশুর মুখে আজই শুনেচি।

কোনো উপায় না দেখে হিমাংশু শেষে কোন্‌ বন্ধুর পরামর্শে ধর্মতলার এক নীলাম-ওয়ালার কাছে এরিকা পামের টবটা রেখে দেয়। রোজ একবার করে গিয়ে দেখে আস্‌তো, খদ্দের পাওয়া গেল কিনা। শুধু যে খদ্দেরের সন্ধানে যেতো তা নয়, ওটা তার একটা অজুহাত মাত্র—আসলে যেত গাছটা দেখ্‌তে।

হিমাংশু কিন্তু নিজের কাছে সেটা স্বীকার কর্তে চাইত না। দু'দিন পরে যা পরের হয়ে যাবে, তার জন্যে মায়া কিসের?

তবুও একদিন যখন দেখ্‌লে, গাছটার সে নধর, সতেজ শ্রী যেন ম্লান হয়ে এসেচে, নীলামওয়ালারা গাছে জল দেয় নি, তেমন যত্ন করে নি—সে লজ্জিত মুখে দোকানের মালিক একজন ফিরিঙ্গি ছোক্‌রাকে বল্লে—গাছটার তেমন তেজ নেই—এই গরমে জল না পেলে, দেখ্‌তে ভাল না দেখালে বিক্রী হবে কেন? জল কোথায় আছে আমি নিজে না হয়—কারণ দু'পয়সা আসে, আমারই তো আসবে—

তারপর থেকে যেন পয়সার জন্যেই করচে, এই অছিলায় রোজ বিকেলে নীলামওয়ালার দোকানে গিয়ে গাছে জল দিত। এক একদিন দেখ্‌তো দোকানের চাকরেরা আগে থেকেই জল দিয়েচে।

রোজ নীলামের ডাকের সময় সে সেখানে উপস্থিত থাকতো। তার গাছটার দিকে কেউ চেয়েও দেখে না—লোকে চেয়ার, টেবিল, সোফা, আলমারী কিন্‌চে, ভাঙা পুরোনো ক্লক্‌ ঘড়ি পর্যন্ত বিক্রী হয়ে গেল, কিন্তু গাছের শখ খুব বেশী লোকের নেই, গাছটা আর বিক্রী হয় না। একদিন নীলামওয়ালা বল্লে—বাবু, গাছটার তো সুবিধে হচ্ছে না, তুমি নিয়ে যাবে ফেরত?

কিন্তু ফেরত নিয়ে গিয়ে তার রাখ্‌বার জায়গা নেই, থাক্‌লে এখানে সে বিক্রীর জন্যে দিয়েই বা যাবে কেন? সে সময় তার অত্যন্ত খারাপ সময় যাচ্চে, চাকুরির চেষ্টায় আকাশ, পাতাল হাতড়ে কোথাও কিছু মিলচে না—নিজের থাকবার জায়গা নেই তো পিপে-কাটা কাঠের টবে বসানো অত বড় গাছ রাখে কোথায়?

মাসখানেক পরে হিমাংশুর অবস্থা এমন হোল যে আর কলকাতায় থাকাই চলে না। কলকাতার বাইরে যাবার আগে গাছটার একটা কিনারা হয়ে গেলেও মনে শান্তি পেত। কিন্তু আজও যা, কালও তাই—নীলামওয়ালাকে কমিশনের রেট আরও বাড়িয়ে দিতে হয়েচে গাছটা রাখ্‌বার জন্যে, নৈলে সে দোকানে রাখতে চায় না। কিন্তু হিমাংশুর দুর্ভাবনা এই যে, ও কলকাতা ছেড়ে চলে গেলে গাছটার আর যত্ন হবে না, নীলামওয়ালার দায় পড়েচে, কোথাকার একটা এরিকা পাম্‌ গাছ বাঁচ্‌ল কি মোলো—অত তদারক করবার তার গরজ নেই।

কিন্তু শেষে বাধ্য হয়ে কলকাতা ছাড়তে হোল হিমাংশুকে।

অনেকদিন পরে সে আবার এল কলকাতায়। নীলামওয়ালার দোকানে বিকেলে গেল গাছ দেখ্‌তে। গাছটা নেই, বিক্রী হয়ে গিয়েচে, সাড়ে সাত টাকায়। কমিশন বাদ দিয়ে

হিমাংশুর বিশেষ কিছু রইল না। কিন্তু টাকার জন্যে ওর তত দুঃখ নেই, এত দিন পরে সত্যি সত্যিই গাছটা পরের হয়ে গেল।

তার প্রবল আগ্রহ হোল গাছটা সে দেখে আসে। নীলামওয়ালা সাহেব প্রথমে ঠিকানা দিতে রাজী নয়, নানা আপত্তি তুললে—বহু কষ্টে তাকে বুঝিয়ে ঠিকানা যোগাড় করলে। সার্কুলার রোডের এক সাহেবের বাড়িতে গাছটা বিক্রী হয়েচে, হিমাংশু পরদিন সকালে সেখানে গেল। সার্কুলার রোডের ধারেই বাড়ি, ছোট গেট্-ওয়ালা কম্পাউন্ড, উঠোনের একধারে একটা বাতাবী নেবু গাছ, গেটের কাছে একটা চারা পাকুড় গাছ। সাহেবের গাছ-পালার শখ আছে—পাম্ অনেক রকম রেখেছে, তার মধ্যে ওর পাম্টাই সকলের বড়। হিমাংশু বলে, সে হাজারটা পামের মধ্যে নিজেরটা চিনে নিতে পারে। কম্পাউন্ডে ঢুকবার দরকার হোল না, রাস্তার ফুটপাত থেকেই বেশ দেখা যায়, বারান্দায় উঠ্বার পৈঠার ধারেই তার পিপে-কাটা টবসুদ্ধ পাম্গাছটা বসানো রয়েচে। গাছের চেহারা ভালো—তবে তার কাছে থাকবার সময় আরও বেশী সতেজ, সবুজ ছিল।

হিমাংশুর মনে পড়ল এই গাছটার কবে কোন্ ডাল গজালো—তার খাতায় নোট করা থাকতো। ও বলতে পারে প্রত্যেকটি ডালের জন্মকাহিনী—একদিন তাই ওর মনে ভারী কষ্ট হোল, সেদিন দেখলে সাহেবের মালী নিচের দিকের ডালগুলো সব কেটে দিয়েচে। মালীকে ডাকিয়ে বল্লে—ডালগুলো ওরকম কেটেচ কেন? মালীটা ভাল মানুষ। বল্লে—আমি কাটি নি বাবু, সাহেব বলে দিল নীচের ডাল না কাটলে ওপরের কচি ডাল জোর পাবে না। বল্লে, টবের গাছ না হলে ও ডালগুলো আপনা থেকেই ঝরে পড়ে যেতো।

হিমাংশু বল্লে—তোমার সাহেব কিছু জানে না। যা ঝরে যাবার তা তো গিয়েচে, অত বড় গুঁড়িটা বার হয়েচে তবে কি করে? আর ভেঙো না।

বছর তিন চার কেটে গেল। হিমাংশু গাছের কথা ভুলেচে। সে গালুডি না ঘাটশিলা ওদিকে কোথাও জমি নিয়ে বসবাস করে ফেলেচে ইতিমধ্যে।

গাছপালার মধ্যে দিয়েই ভগবান তার উপজীবিকার উপায় করে দিলেন। এখানে হিমাংশু ফুলের চাষ আরম্ভ করে দিলে সুবর্ণরেখার তীরে। মাটির দেওয়াল তুলে খড়ের বাংলো বাঁধলে। একদিকে দূরে অনুচ্চ পাহাড়, নিকটে, দূরে শালবন, কাঁকর মাটির লাল রাস্তা, অপূর্ব সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত।

ফুলের চাষে সে উন্নতি করে ফেল্লে খুব শিগ্গীর। ফুলের চেয়েও বেশী উন্নতি করেচে চীনা ঘাস ও ল্যাভেন্ডার ঘাসের চাষে। এই জীবনই তার চিরদিনের কাম্য ছিল, ও জায়গা ছাড়া শহরে আসতে ইচ্ছেও হোত না। বছর দুই কাটলো আরও, ইতিমধ্যেই সে বিবাহ করেচে, সস্ত্রীক ওখানেই থাকে।

আজ তিন দিন হোল সে কলকাতায় এসেচে প্রায় পাঁচ ছ'বছর পরে।

কাজকর্ম সেরে কেমন একটা ইচ্ছে হোল, ভাবলে—দেখি তো সেই সাহেবের বাড়িতে আমার সেই গাছটা আছে কি না?

বাড়িটা চিনে নিতে কষ্ট হোল না কিন্তু অবাক হয়ে গেল—বাড়ির সে শ্রী আর নেই। বাড়িটাতে বোধ হয় মানুষ বাস করে নি বছর দুই—কি তার বেশী। উঠোনে বন হয়ে গিয়েচে। পৈঠাগুলো ভাঙা, বাতাবী নেবু গাছে মাকড়সার জাল, বারান্দার রেলিংগুলো খসে পড়েচে। তার সেই এরিকা পাম্টা আছে, কিন্তু কি চেহারাই হয়েচে! আরও বড় হয়েচে বটে কিন্তু সে তেজ নেই, শ্রী নেই, নীচের ডালগুলো শুকিয়ে পাখা হয়ে আছে, ধুলো আর মাকড়সার জালে ভর্তি। যায়-যায় অবস্থা। টবও বদলানো হয় নি আর।

হিমাংশু বল্লে—ভাই, সত্যি সত্যি তোমায় বলচি, গাছটা যেন আমায় চিনতে পারলে।

আমার মনে হলো ও যেন বলচে, আমায় এখান থেকে নিয়ে যাও, আমি তোমার কাছে গেলে হয়তো এখনও বাঁচবো! ছেড়ে যেও না এবার! আমায় বাঁচাও!

রাত্রে হিমাংশুর ভাল ঘুম হ'ল না। আবার সার্কুলার রোডে গেল, সন্ধান নিয়ে জানলে সাহেব মারা গিয়েছে। বুড়ী মেম আছে ইলিয়ট রোডে, পয়সার অভাবে বাড়ী সারাতে পারে না, তাই ভাড়াও হচ্চে না। এই বাজারে ভাঙা বাড়ী কেনার খদ্দেরও নেই।

মেমকে টাকা দিয়ে গাছটা ও কিনে নিলে। এখনও সার্কুলার রোডের বাড়ীটাতেই আছে, কাল ও গালুডিতে ফিরে যাবে, গাছটাকে নিয়ে যাচ্চে সঙ্গে করে।

বিদায় নেবার সময় হিমাংশু বল্লে—বৈঠকখানা বাজারে এসেছিলাম কেন জানো? আমার সাধ হয়েচে ওর বিয়ে দেবো। তাই একটা ছোটখাটো, অল্পবয়সের, দেখতে ভাল পাম্ খুঁজছিলাম। হি-হি—পাগল নয় হে পাগল নয়, ভালবাসার জিনিস হোত তো বুঝতে।

বুধীর বাড়ী ফেরা

ঘোর দুঃস্বপ্ন হইতে বুধী জাগিয়া উঠিল।

সে একটু ঘুমাইয়াছিল কি? হয়তো তার খেয়াল নাই।

এ কোন্ ভীষণ জায়গায় তাহাকে আনিয়া ফেলা হইয়াছে? চারিদিকে বিশ্রী ইঁটের দেওয়াল ও ময়লা...ময়লা...অপরিষ্কার মেঝে। একটু আলো বা হাওয়া আসিবার উপায় নাই। আর কি ভিড়! এত ভিড়, এত ঠাসাঠাসি বুধীর জীবনে কখনো দেখে নাই—এত ভিড়ে আর এই গুমট গরমে প্রাণ যে তার বাহির হইয়া গেল। এত ভিড়ে, এই ঠাসাঠাসির মধ্যে কি ঘুম হয়?

নতুন নতুন অপরিচিত মুখ। কাহাকেও সে দেখে নাই...নিষ্ঠুর, লোভার্ত মুখ, বুধী দেখিলেই বুঝিতে পারে...বুঝিতে পারিয়া বুধীর গা শিহরিয়া ওঠে...মনে যে কি দুঃখ আর অস্বস্তি বোধ হয়।

সে বেশ বোঝে এখানে কেহ তাহাকে ভালবাসে না, যেমন সেই ছোট খুকী তাহাকে ভালবাসিত, যত্ন করিয়া খাওয়াইত, গলা ধরিয়া কত আদরের কথা বলিত।...কোথায় গেল ছোট খুকীটা? কেন তাহাকে এখানে আনা হইয়াছে! কেন আনা হইয়াছে, তাহা সে বুঝিতেই পারে না। কেবল সে এইটুকু জানে কতদিন ধরিয়া দীর্ঘ, কঠিন পথ বাহিয়া তাহাকে এখানে আসিতে হইয়াছে—সঙ্গে বহু সঙ্গী ছিল, কিন্তু অপরিচিত. কারো সঙ্গে বুধীর আলাপ হয় নাই তেমন, আলাপ করিবার মত মনের অবস্থাও তাহার ছিল না।

কেহ যত্ন করিয়া তাহাকে খাওয়ায় নাই। এখানকার খাবার মুখে দিবার উপায় নাই। কেমন যেন ভ্যাপসা গন্ধ, ভাল আস্বাদ তো নাই-ই ভাল গন্ধ পর্যন্ত নাই খাবারের। বুড়ী তাহাকে যত্ন করিয়া খাওয়াইত, একথা অস্বীকার করতে পারিবে না। হয়তো সে ছোট খুকীর মত ভালবাসিত না অতটা—কিন্তু সন্ধ্যার সময় পেট পুরিয়া খাইবার ব্যবস্থা করিতে কখনও ত্রুটি করে নাই।

সত্যি, এ যে কোন্ জায়গায় আসিয়াছে, তাহার আদৌ কোনো ধারণাই নাই। এমন অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর জায়গা তার অভিজ্ঞতার বাহিরে ছিল এত দিন। কি হট্টগোল, নানারকম নতুন নতুন বিকট বিকট শব্দ জায়গাটাতে! তাহার মন আরও পাগল হইয়া উঠিল এ শব্দে ও আওয়াজে। জীবনে কখনো এত অদ্ভুত ধরনের সব আওয়াজ সে শুনে নাই। অথচ তাহার বয়স কম হয় নাই। বুধীর জীবন কাটিয়াছে এই বিশ্রী জায়গা হইতে বহু দূরে। কত দূর তাহার ঠিক ধারণা নাই, কিন্তু মোটের ওপর বহু বহু

দূরে অন্য এক স্থানে, যেখানে অবারিত সবুজ মাঠ আছে, অপূর্ব সুঘ্রাণে ভরা কোমল সরস ঘাসে ঢাকা। কি সুন্দর স্বাদ সে ঘাসের! মাঠের ধারে কলস্বনা নদী, নদীর কিনারায় জলের ধার পর্যন্ত নানা জাতীয় ঘাসের ও জলজ শাকের বন—ঠান্ডা, নরম, তাজা—কি অপূর্ব তাদের সুগন্ধ। স্বাদ তো আছেই ভাল কিন্তু সেই নতুন-ওঠা বর্ষা-সতেজ কচি ঘাস ও কলমিলতার তাজা গন্ধের কথা যখনই মনে হয় তখন মনে পড়ে এক হাঁটু দীর্ঘ ঘনশ্যাম তৃণরাজির মধ্যে মুখ ডুবাইয়া পেট ভরিয়া সে তৃপ্তির ভোজ—হু-হু উন্মুক্ত বাতাস ও দূরপ্রসারী প্রান্তরের মধ্যে যে মুক্তির আনন্দ—তখন বুধী সত্যই ক্ষেপিয়া যায় —তাহার জ্ঞান থাকে না। মুক্তির জন্য সে উন্মাদ হইয়া উঠে। জীবনের বহুদিন সেখানে সে কাটাইয়াছে। বহুদিন। কত দিন তাহা সে জানে না। বয়স তো তার কম হয় নাই... প্রথম জীবনের কথা প্রায় কিছুই তাহার মনে নাই—যা একটু আধটু মনে পড়ে—সব আবছায়া ধোঁয়া—কেবল খুব বড় বড় সবুজ মাঠ, তলায় ফল-বিছিয়ে-থাকা বড় বড় গাছ, সুপেয় শীতল স্রোতের জল, সাঁজালের ধোঁয়ার মৃদু গন্ধ-ভরা আবাসস্থান, এই সব মনে পড়ে।

আজকাল কিন্তু বেশী করিয়া মনে পড়ে ছোট খুকীর কথা—খুকী তাহাকে সত্যই ভালবাসিত।

এটা কোন্ জায়গা? এক একবার বুধীর মনে হয় হয়তো বা এটা পাউন্ড ঘর। কিন্তু বুধী জীবনে তো কতবার পাউন্ড ঘরে কত বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছে—এ ধরনের পাউন্ড ঘর তো দেখে নাই! সেখানে তো বাঁশের বেড়া ঘেরা খোলা জায়গায় তাহাকে থাকিতে হইয়াছে, মাথার ওপর সেখানে নীল আকাশ, সবুজ গাছপালাও চোখে পড়ে, পাখীর ডাকও শুনা যায়—এমন বিশ্রী আওয়াজ তো সে সব জায়গায় শুনে নাই। এমন কঠিন ইঁটের দেওয়াল দিয়া ঘেরা নয় সে জায়গা।

পাখীর কথায় বুধীর মনে পড়িল অনেকদিন আগেকার এক ঘটনা। কতদিন আগে তাহা সে বলিতে পারিবে না। মাঠের ধারে সে ঘাস খাইতেছিল ; একটা কি পাখী বনের ডাল হইতে উড়িয়া আসিয়া তাহার শিংএর উপর বসিল। শিংএর উপর পাখী বসা সে পছন্দ করে না—সুতরাং শিং নাড়া দিতেই পাখীটা উড়িয়া বসিল তাহারই সামনেকার উলুঘাসে ভরা বাচড়ার উপর। তখন উলুঘাসের শীষ গজাইয়াছে, শীষের মাথায় সাদা সাদা ফুল অজস্র অজস্র। পাখীটা সেই উলুফুলের মধ্যে বসিয়া পালক ফুলাইয়া পায়চারি করিতে লাগিল। কি সুন্দর গায়ের রং, কি নরম রঙীন পালকের বোঝা তার গায়ে, কেমন রঙীন ঠোঁটখানি।

বুধীর মন সুন্দর পাখীটার প্রতি ভালবাসায় ভরিয়া গেল। সুতরাং খানিকটা পরেই যখন পাখীটা আবার তার শিংএর উপর চড়িয়া বসিল, এবার সে শিং নাড়া দিল না। এই রকম করিয়া পাখীটার সঙ্গে তার ভাব জমিয়া গেল। পাখীটার ভাষা ছিল তার শিংএর উপর চটুল পা দুইখানির নাচুনি—কত নির্জন রৌদ্রভরা দুপুরে বুধী হয়ত মাঠে দাঁড়াইয়া উত্তাপে ও তৃষ্ণায় ঝিমাইতেছে—অমনি ছোট্ট পাখীটা নিকটবর্তী বনভূমি হইতে উড়িয়া তাহার শিংএ আসিয়া বসিত। বুধীর নিঃসঙ্গতা অমনি দূর হইয়া যাইত —তাহাদের কত কথা কত গল্প চলিত সন্ধ্যা পর্যন্ত—তারপর নামিত অন্ধকার। বুড়ী আসিয়া খোঁটা উপড়াইয়া তাহাকে বাড়ী লইয়া যাইত—পাখী যাইত উড়িয়া। একদিন সেই মাঠে ফাঁদ পাতিয়া কাহারা পাখী ধরিতে আসিল। পোষা ডাহুকের ডাক শুনিয়া বন্য পাখীটা খাঁচার নিকটে যাইতেই ফাঁদে পড়িয়া গেল। শিকারীরা তাহাকে খাঁচায় পুরিয়া লইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময়ে ছোট পাখীটার কি করুণ আর্তনাদ।

মাঝে মাঝে বুধীর সন্তান হইত। বেশ ছোট ছোট বাচ্চাগুলি ছুটিয়া, লাফাইয়া,

নাচিয়া বেড়াইত সারা মাঠ। প্রথম প্রথম তাহাদের বড় ভাল লাগিত কিন্তু বড় হইয়া গেলে তাহারা কোথায় চলিয়া যাইত—তাহাদের কথা বুধীর আর বড় একটা মনে পড়িত না।

...কত কথাই মনে হয়। এই বিকট আওয়াজে ভরা নোংরা, কুশ্রী ইঁটের দেওয়ালে ঘেরা এই জায়গাটা—আজ ক'দিন আসিয়া সে মরিয়া যাইতেছে...আর একটা ব্যাপার...

বুধী রক্তের গন্ধ পায় কেন এখানে! সন্দেহের সহিত সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়াছে, কিছু টের পায় নাই, তবে দূর হইতে রক্তের গন্ধ ভাসিয়া আসে তাহা সে বেশ বুঝিতে পারে।

প্রথম প্রথম তাহার মনে হইত—এও এক রকমের পাউন্ড ঘর—একদিন বুড়ীর ছেলে আসিয়া তাহাকে বাড়ি লইয়া যাইবে। কিন্তু পাউন্ড ঘরের অভিজ্ঞতা হইতে বুধী জানে যে, সেখানে একদিন বা বড় জোর দু'দিন থাকিতে হয়—তার পরেই বুড়ীর ছেলে আসিত দড়ি হাতে তাহাকে বাড়ি লইয়া যাইতে। আর এখানে আসিয়াছে আজ পাঁচ ছ'দিন কি তারও বেশী। না—এ পাউন্ড ঘর নয়, তার চেয়েও গুরুতর বিপদে এবার সে পড়িয়াছে।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। আর একটা জিনিস বুধী লক্ষ্য করিয়াছে আজ ক'দিন। প্রতিদিন বৈকালে দু'জন লোক আসিয়া এই গরুর ভিড়ের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি গরুর গায়ে কি ছাপ মারিয়া যায়—পরদিন শেষরাত্রের দিকে সেই গরুগুলিকে কোথায় যেন লইয়া যায়—তারা আর ফেরে না।

কেন ফেরে না, কোথায় যায় তারা?

আর ঐ রক্তের গন্ধটা...তাজা রক্তের গন্ধ। যেদিন বাতাস ওই কোণ হইতে বয়, সেদিন রক্তের গন্ধটা আসে। ভয়ে সন্দেহে বুধীর বুক উড়িয়া যায়। সাথী ছোট খুকী...কত-দিন তোমাদের সাথে দেখা হয় নাই, বন্ধু হিসাবে আসিয়া এ বিপদ হইতে রক্ষা করো। এমন বিপদে জীবনে কখনো সে পড়ে নাই।

এই সব সাত পাঁচ ভাবিয়া বুধীর রাত্রে ভাল ঘুম হইল না। এদিকে সকাল বেলা হইতেই চারিধারে বিকট আওয়াজ শুরু হইল। বুধীর সঙ্গেই একটি অল্পবয়স্ক প্রতিবেশী আজ কয়েক দিন ধরিয়া আছে, প্রথম প্রথম বুধী তাকে পছন্দ করিত না। সে যেন একটু বেশী চাল দেখাইতে চায়—বুধী পাড়াগেঁয়ে বলিয়া যেন তাহাকে আমল দিতেই চাহিত না। কিন্তু এ ভয়ঙ্কর নির্বান্ধব স্থানে চাল কদিন খাটে? শীঘ্রই তাহার অল্পবয়স্ক প্রতিবেশীটিকে সমস্ত চাল বিসর্জন দিতে হইল।

একদিন বুধী দেখিল সে কাঁদিতেছে।

বুধীর মনে কষ্ট হইল। আহা ছেলেমানুষ! তাহার সন্তান এতদিন ওই বয়সের হইয়াছে—বড় হইলে বুধী তাহাকে আর দেখে নাই। কে জানে কোথায় গিয়াছে? বাঁচিয়া আছে কি না তাই বা কে জানে?

সহানুভূতি প্রকাশ করিবার উপায় নাই। বুধীর ইচ্ছা হইল সঙ্গীটির সে গা চাটে। কিন্তু দু'জনের মধ্যে তারের বেড়া। বুধী তবুও তাহাকে যতদূর সম্ভব সান্ত্বনা দিয়াছিল সেদিন। ছেলেমানুষ, বেশ নধর গড়ন, তবুও এই ভয়ানক স্থানে পেট ভরিয়া না খাইতে পাইয়া রোগা হইয়া গিয়াছে।

সেই হইতে দু'জনে বেশ ভাব। আজ সকালে উঠিয়া বুধী তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল, সে খাবার খাইতেছে। ছেলেমানুষ, খাইবার লোভই বেশী।

খাওয় শেষ করিয়া তাহার তরুণ বন্ধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল-হাম্বা-আ-আ।

বুধী বলিল—চুপ করো। ছি. মন খারাপ ক'রো না। কিন্তু তাহার নিজের মন দিয়া

তো বুঝিতেছে, কি দারুণ অশান্তিতে কাটিতেছে এখানে, তবুও ছেলেমানুষকে মিথ্যা সান্ত্বনা দেওয়াও ভালো।

বুধী বলিল—খাও খাও। যা পড়ে আছে, ও দুটি খেয়ে ফেল। এমন সময়ে দুজন যমদূতের মত লোক তাহাদের কাঠরায় ঢুকিল। বুধীদের কাঠরায় তাহারা প্রায় জন কুড়ি আছে। এই কুড়ি জনের অধিকাংশই প্রৌঢ়বয়স্ক। একজন তো আছে, বৃদ্ধের দলে তাকে অনায়াসেই ফেলা চলে।

এদের মধ্যে বুধীর বন্ধুটি অল্পবয়স্ক এবং বেশ নধর দেখিতে। যমদূতের মত লোকদুটি তাহার গায়ে কি একটা ছাপ মারিয়া চলিয়া গেল—কাঠরায় আরও দু'টি প্রৌঢ় সঙ্গীর গায়েও তাহারা ছাপ দিল। একটু পরে দু'জন লোক আসিয়া কাঠরায় ঢুকিল এবং ছাপমারা সঙ্গীগুলিকে দড়ি খুলিয়া কোথায় যেন লইয়া গেল।

সকাল গড়াইয়া দুপুর, দুপুর গড়াইয়া বৈকাল হইয়াছে। বুধীর তরুণ বন্ধু ফিরিল না। ছাপ-মারা সঙ্গীদের কেহই ফিরিল না। বুধীর মনে ভয়ানক সন্দেহ হইল—সেই সঙ্গে কি একটা অজানা ভয়ে ওর গলা পর্যন্ত শুকাইয়া উঠিল। সেই রক্তের গন্ধ... টাটকা তাজা রক্তের গন্ধ...এখানে কোণাকুণি হাওয়া বহিলেই যেটা পাওয়া যায়—সেই গন্ধের কথা হঠাৎ মনে আসিতেই ভয়ে আতঙ্কে বুধীর সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। ভয়ে মরীয়া হইয়া সে গলার দড়িতে এক হেঁচকা টান মারিতেই সেটা গেল ছিঁড়িয়া।

বুধী উন্মাদের দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল। কাঠরায় ঢুকিবার কাঠের মোটা গরাদে বসানো নীচু ফটকটা বন্ধ। নিকটে কেহ কোথাও নাই। পাড়াগাঁয়ে সে 'মানুষ', উঁচু উঁচু বাঁশের বেড়া টপ্‌কানো তার আজীবন অভ্যাস—এক লাফে ফটকটা ডিঙাইয়া সে কাঠরার বাহিরে আসিল। তারপর বড় উঠান পার হইয়া বড় ফটকের নিকট পৌঁছিল—সেটাও খোলা। সে ছুটিতে ছুটিতে বড় ফটকটাও পার হইয়া গেল।

পরবর্তী পনের মিনিটের কথা তাহার ঠিক স্পষ্ট মনে নাই—চওড়া রাস্তা—লোকের ভিড়—বড় বড় কি এক ধরণের গাড়ি রাস্তা দিয়া ছুটিতেছে—বড় বড় বাড়ি—একটা খাল—একটা পুল—আর লোকজন—একজোড়া মহিষ—সেই বিকট আওয়াজ সর্বত্র—দিশাহারার মত ছুটিতে ছুটিতে বুধী রাস্তার পর রাস্তা পার হইতে লাগিল—কত রাস্তা। এদেশে রাস্তার কি শেষ নাই? আবার বাড়িঘর—আবার রাস্তা—দু'-দুবার সে গাড়ি চাপা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেল!—আবার বড় একটা পুল—দূরে রেলগাড়ি যাইতেছে—রেলগাড়ি সে চেনে—তাদের গ্রামে দক্ষিণ মাঠে ট্যাংরার ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়া বাঁধা উঁচু সড়ক বাহিয়া রেলগাড়ি যায়।

এখানে উপরে রেলরাস্তা—নীচে দিয়া রাস্তা—ছুটিয়া পুলের তলা দিয়া সে রেল-রাস্তাও পার হইল।—আবার দৌড়। দৌড়! বৃদ্ধ শরীর, সে হাঁপাইয়া পড়িল। যখন তাহার দিশেহারা ভাবটা কাটিয়া জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে, তখন সে দেখিল একটা জলার ধারে খুব বড় মাঠের মধ্যে সে একা দাঁড়াইয়া। সামনের প্রকাণ্ড জলাটি কচুরি-পানায় বোঝাই, সেখান দিয়া পথ বন্ধ। আর ভিড় নাই, রাস্তার গোলকধাঁধা নাই, গাড়ির ঘড় ঘড় আওয়াজ নাই। এখানে অনেক দূর পর্যন্ত আকাশ দেখা যাইতেছে—হু হু হাওয়া বহিতেছে জলার দিক হইতে...যেন তাহাদের গ্রামের নদীর ধারের মাঠের মত।

মুক্ত! মুক্ত! সে মুক্ত!

তবুও নিজেকে সে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করিতে পারিল না—স্থির হইয়া এক জায়গায় দাঁড়াইতে পারিল না। কি জানি যদি লোকজন আসিয়া আবার তাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া সেই পাঁচিল-ঘেরা বড় বাড়িটায় পুরিয়া রাখে!

বহু ঘুরিয়া পরে সে ক্লান্ত হইয়া একটা গাছতলায় রাত্রির জন্য আশ্রয় লইল। সে শুইয়া পড়িল একেবারে—কোনদিকে লোক নাই, তবু সে ভাল ঘুমাইতে পারিল না। যখন ঘুম ভাঙিল, তখন ভোর হইয়াছে। সে চলিতে আরম্ভ করিল। দুপুর পর্যন্ত দিগ্‌ভ্রান্তের মত এদিক ওদিক কতদিক ঘুরিতে ঘুরিতে একটা গাছের তলায় দাঁড়াইয়াছে, হঠাৎ তাহার মনে হইল দূরে যে বড় রাস্তা চলিয়া গিয়াছে,—যার দু'ধারে বড় বড় গাছের ছায়া—ওই রাস্তা সে ইতিপূর্বে আর একবার দেখিয়াছে!

সেদিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিতে তাহার মনে পড়িল—অদ্ভুতভাবে পুরানো স্মৃতিটা মনে পড়িল হঠাৎ!

ওই রাস্তাটা দিয়াই তাহাদের একটা বড় দলের সঙ্গে সে আসিয়াছিল মাসখানেক আগে! সেই রাস্তাটা!

বুধী ছুটিয়া গিয়া বড় রাস্তাটায় উঠিল। হাঁ, ঠিক চিনিতে পারিয়াছে, সেই রাস্তাটাই তো! কোনো ভুল নাই। সে অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া রহিল—মুক্তি মিথ্যা, এত প্রচুর নরম কচি ঘাস মিথ্যা, নীল আকাশের তলায় বড় বড় মাঠের নিরঙ্কুশ, নিরাপদ নির্জনতা আর হু হু উন্মুক্ত হাওয়া সব মিথ্যা—যদি সে তাহার আজন্ম সুপরিচিত সেই গ্রামটিতে না ফিরিতে পারে, ছোট্ট খুকীর দুটি ছোট্ট স্নেহ-হস্তের স্পর্শ পুনরায় সে না পায়।

জীবনপণ—বুধী যে করিয়াই হউক, তাহার গ্রামে তাহার খুকীর কাছে ফিরিয়া যাইবেই।

একটা পথ-চল্‌তি গরুর গাড়ি হইতে একটা বিচুলির আঁটি পড়িয়া গেল—বুধী গিয়া সেটা মুখে তুলিয়া লইল। শুধুই একঘেয়ে সবুজ ঘাস খাইতে কি মুখে লাগে? মাঝে মাঝে এই ধরনের সুখাদ্য খাইয়া মুখ বদলাইয়া লইতে হয় বৈকি! তারপর বুধী সোজা রাস্তা বাহিয়া চলিল—একদিন, দু'দিন, তিনদিন। খাদ্যের ভাবনা নাই—দু'ধারে মাঠ সবুজ হইয়া উঠিয়াছে, নববর্ষায় সুন্দর নিবিড় সবুজ ঘাসে ও আউশ ধানের জাওলায়। আমন ধান আজও রোয়া হয় নাই। জলেরও নাই অভাব. রাস্তার দু'দিকের খানায় প্রচুর টাটকা বৃষ্টির জল।

যাইতে যাইতে একদিন একটা মজার ঘটনা ঘটিল। একটা গাছতলায় দুপুর বেলা সে বিশ্রাম করিতেছে—একটা ছেলে আসিয়া গলায় দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে লইয়া চলিল হঠাৎ। বুধী তো অবাক!

ছেলেটি তাহাকে একটি গ্রামের মধ্যে একটি খড়ের ঘরে—সেখানে লইয়া গিয়া খুঁটির গায়ে বাঁধিল। বাড়িতে তখন কেহ নাই—ছেলেটিও কোথায় চলিয়া গেল। বুধী লক্ষ্য করিল একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ঘরের দাওয়ায় বসিয়া আপনমনে কি বকিতেছে আর দুলিতেছে। বাড়ির উঠানে একটি খেজুর গাছ, একটা পেয়ারা গাছ, বাড়ির পেছনে একটা ডোবা। একটু পরে একটা বৌ ডোবা হইতে একরাশ বাসন মাজিয়া আনিয়া দাওয়ার এক কোণে নামাইয়া বৃদ্ধাকে বলিল—তুমি একটু চুপ করবে কি না সকালবেলা. আমি জিগ্যেস করি। বাড়ির সবাই পাগল, পাগলা গারদের মধ্যে থেকে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেচে, আর পারিনে বাবু, মরণ হোলেও বাঁচতাম! ফের তুমি যদি ওরকম বকবে মা. তবে হাঁড়িকুঁড়ি থাকবে পড়ে, ভাতের পিণ্ডি কে খেতে দেয় দেখবো এখন আজগে! এই সময় বুধীর দিকে নজর পড়িতে বৌটি বলিল—ছেলেটা বুঝি গরুটা এনেচে তা হলে! বাবা! কাল থেকে কি কম খোশামোদটা করচি ওকে? গরুটা হারালো, দ্যাখ কোথাও কেউ পণ্টে পাঠালে, কি কেউ বেঁধে রাখলে—তা আমার কথা কি কেউ—গরুটারও হাল হয়েচে দ্যাখো—

কথা বলিতে বলিতে তাহার সামনে আসিয়া বৌটি বলিয়া উঠিল—এ তো আমাদের নয়!...কার আবার পরের গরু ধরে এনেচে দ্যাখো! নাঃ, ছেলেটাকে নিয়ে আর পারি নে—এ যেন মনে হচ্ছে ও পাড়ার ভুবনের মার গরু—মাগী এসে আমার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করবে এখন, যদি টের পায়—

বৌটি তার গলার দড়ি খুলিয়া তাহাকে কিছু দূর তাড়াইয়া উঠানের বাহির করিয়া দিল—সম্ভবতঃ এই জন্য যে, ভুবনের মা এখন হঠাৎ আসিয়া পড়িলে গরু যে এখানেই বাঁধা ছিল, ইহার কোন চিহ্ন না পায়।

গ্রামের বাহিরে এক জায়গায় প্রকাণ্ড বড় একটা গাছ। গাছের তলায় সে একটু দাঁড়াইল। চারিদিকে মাঠ, কচি কচি আউশের জাওলায় মাঠ ঘন সবুজ, বুধীর ভয়ানক লোভ হইল, মাঠে নামিয়া সে ধান-গাছ খায়—কিন্তু বিদেশ-বিভুঁই জায়গা, যদি এখানে পাউণ্ড-ঘরে দেয়—তবে কে আসিয়া পয়সা দিয়া তাহাকে উদ্ধার করিবে? না—সে কোথাও আর আবদ্ধ থাকিতে চায় না। উঃ, বুকের রক্ত হিম হইয়া যায়, এখনও সেই বড় বাড়ি, সেই উঁচু পাঁচিল, সেই গরাদওয়ালা কাঠরা, সেই বিশ্রী আওয়াজ—সকলের ওপর, সেই রক্তের গন্ধের কথা মনে উঠিলে...!

মুক্তির আনন্দ আজ নবযৌবনের সঞ্চার করিয়াছে বুধীর দেহে—সে ভুলিয়া গিয়াছে তাহার বয়েস আঠারো-উনিশের কম নয়—সে প্রৌঢ়, সাত-আটটি সন্তানের জননী, তার ওপরে গত পনের-কুড়ি দিনের উদ্বেগে, কষ্টে, উপবাসে শীর্ণদেহা...তার স্নায়ুতন্ত্রীও ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে—তার মনে বল নাই...শরীরে সামর্থ্য নাই...

কিন্তু উদার নীল আকাশে প্রভাতের সূর্য উঠিয়াছে; যেমন উঠিত তাহার জন্মভূমিতে, পাখীরা কলধ্বনি করিতেছে, যেমন করিত তাহাদের নদীর ধারের মাঠের অনেক দিনের সেই পক্ষী বন্ধুটি, বাঁশতলায় প্রথম বর্ষার জলে পুষ্ট হইয়া পিপুল লতা বাড়িয়া উঠিয়াছে, অনন্তমূলের চারা বাহির হইয়াছে, গ্রামে গ্রামে 'বৌ-কথা-কও' পাখীর সেই সুন্দর আবাল্য পরিচিত ডাক...সম্মুখে অনেক দূরে কোথায় তাহাদের গ্রামখানি, ছোট্ট নদীটা—সুগন্ধি অনন্তমূলের কচি পাতার কি চমৎকার আস্বাদ!...এই তো জীবনকে সে আবার খুঁজিয়া পাইয়াছে...কত কালের পরে মুক্তি আসিয়াছে...এখন মরিলেও তার দুঃখ নাই—শিয়াল শকুনে তার জীর্ণ দেহটা খাইয়া ফেলিলেও দুঃখ নাই—তবে ছোট্ট খুকীটাকে একবার দেখিয়া সে মরিবে—

আবার সে রাস্তা খুঁজিয়া বাহির করিল—এই মাঠের ধারেই একদিন তাহার দলের সঙ্গীদের সঙ্গে এই গাছতলায় রাত্রে শুইয়াছিল বটে। যাহারা তাহাদের তাড়াইয়া আনিতেছিল, এই গাছতলাতেই তাহারা রাত্রে রাঁধিয়া খাইয়াছিল।

আবার পথ...চলিয়াছে, চলিয়াছে...পথের শেষ নাই—প্রভাত দুপুরে পরিণত হইল—দুপুর গড়াইয়া বিকাল হইল। ক্ষুধা পাইয়াছিল, এক জায়গায় পথের ধারে ছোট বিল—বিলের ধারে ভারী চমৎকার সবুজ ঘাস! বুধীর লোভ হইল—সে রাস্তা হইতে নামিয়া বিলের ধারে গেল—নরম কচি ঘাসে মুখ ডুবাইয়া সে গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল।

বিলের ধারে আরও কয়েকটি গরু চরিতেছিল।

একজন বলিল—এ বুড়ী কোত্থেকে এসে জুটলো হে? একে তো চিনিনে!

আর একজন বলিল—চেহারা দেখ না—যেন কসাইখানার ফেরতা! হাড়পাঁজরা গুনে নেওয়া যাচ্ছে! মরি মরি, কি যে রূপ! বলি, ওগো, তোমার বাড়ি কোথায়?

ইহারা বুধীর সন্তানের বয়সী, ইহাদের ফাজলামি তাহার ভাল লাগিল না। সে কথার কোন উত্তর না দিয়া গম্ভীর মুখে আপন মনে ঘাস খাইতে লাগিল। নিজের মান নিজের কাছে। তাহাতেও নিস্তার নাই। বেয়াদব ছোকরা আগাইয়া আসিয়া বলিল—বলি, কথা

বলচো না কেন বুড়ী? কসাইখানা থেকে পালিয়ে আসচো নাকি? এমন চেহারা কেন?

বুধীর ভয় হইল। কসাইখানা কি জিনিস? পালাইয়া তো আসিয়াছেই বটে—আর সে সেখানে দাঁড়ানো নিরাপদ মনে করিল না। লোভনীয় কচি ঘাসগুলি ফেলিয়া ছুট দিয়া রাস্তার ওপর আসিয়া উঠিল।

পিছন হইতে একজন বলিয়া উঠিল—আরে বাবা, কোথাকার অসভ্য জানোয়ার! ভদ্রলোকের কথার উত্তর দিতে হয় তাও জানে না?

চলিতে চলিতে একদিন বুধী কি করিয়া বুঝিতে পারিল সে ভুলপথে চলিতেছে। এ রাস্তা বাহিয়া এতদূর সে আসে নাই। মাঠের মধ্যে একটা কাঁচা রাস্তা কোথা দিয়া যেন নামিয়া গিয়াছিল—সেই মেটে রাস্তা দিয়া আসিয়া সেবার তাহাদের দল উঠিয়াছিল বড় রাস্তাটায়। বুধী ঠিক ঠাহর করিতে পারে নাই, কোথায় সেই মেটে রাস্তা বড় রাস্তা হইতে নামিয়া গিয়াছে।

ঠিক তাহাই ঘটিল। সম্মুখে একটা নদী পড়িল। এ নদী সে দেখে নাই। সে পথ ভুল করিয়াছে।

সে বড় রাস্তা হইতে নামিয়া পড়িল—মাঠের মাঝখানে বাহিয়া কত সরু সরু রাস্তাই চলিয়াছে—এর একটাও পূর্ব পরিচিত নয়। কতকগুলি গন্ধ ও কতকগুলি বিশেষ ছবি বুধীর মনে আছে সেই আগের রাস্তাটা সম্পর্কে। সে ছবি ও সে গন্ধের সঙ্গে এ রাস্তা খাপ খাইতেছে না। একটা প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে সে ক্রমে আসিয়া পড়িল। দিশাহারা হইয়া গিয়াছে সে। আর কোন কিছুরই ঠিক নাই তার। এসব জায়গায় কখনও সে আসে নাই, এসব পথে হাঁটে নাই।

মাঠের মধ্য দিয়া অন্যমনস্কভাবে উদ্‌ভ্রান্তের মত চলিতে চলিতে হঠাৎ ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ শুনিয়া চমকিয়া পাশের দিকে চাহিল। একটা মস্ত বড় কালকেউটে ফণা বিস্তার করিয়া দুলিতেছে। ছোবল মারিবার দেরি চক্ষের পলক মাত্র—বুধী থমকিয়া দাঁড়াইয়া বিদ্যুৎবেগে পিছু হাঁটিয়া আসিল—পরক্ষণেই দৌড় দিল খানা, ডোবা, পগার ভাঙিয়া। কেউটেটা কিছুদূর তাহার পিছু পিছু আসিয়া একটা কাঁটাঝোপে আটকাইয়া থামিয়া গেল।

কাঁটাঝোপের ওপাশেই ছোট্ট ডোবাতে দু'টি ছেলে মেয়ে ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিতেছে। বুধী হুট্-পাট্ করিয়া তাহাদের সামনে গিয়া পড়িতেই তাহারা ভয়ে ছিপ ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বুধী মানুষ দেখিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইল অনেক আগেই। সাপটা দেখা যায় না পিছনে, চকিতে পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল।

মেয়েটি ছেলেটির হাত চাপিয়া ধরিয়া বড় বড় ভয়ার্ত চোখে বুধীর দিকে চাহিয়া বলিল—ও দাদা, গুঁতিয়ে দেবে—কাদের গরু।

আহা, তাদের গ্রামের তার সেই খুকীটির মত। স্নেহে বুধীর মন গলিয়া গেল। বুধী বলিতে চাহিল—গুঁতিয়ে দেবো কেন, খুকী—সোনা আমার, মানিক আমার—আমি কিছু বলবো না—ভয় কি? ধরো, তোমরা মাছ ধরো।

ছেলেটি ছিপ উঁচাইয়া মারিবার ভঙ্গিতে বলিল—যাঃ বেরো—যাঃ—এ আপদ কোথা থেকে এসে জুটলো আবার—যাঃ—যাঃ—

বুধীর ইচ্ছা ছিল কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া ওদের মাছ ধরা দেখে—খুকীটাকে দেখে। কিন্তু খুকীর দাদা ছিপ গুটাইয়া দাঁড়াইয়া আছে, মারিবে বোধ হয়। সেখান হইতে সে সরিয়া পড়িল।

নিকটে একটা গ্রাম। কাহাদের বাড়ির উঠানে প্রকাণ্ড এক বিচালির গাদা। উঠানে বড় বড় নাদায় কতকগুলি গরু খোলা-মাখা বিচালি ও ভুষির জাব্ খাইতেছে। প্রকাণ্ড

নাদাগুলি হইলে উত্থিত সুমিষ্ট খোলের গন্ধে বুধীর জিহ্বা জলসিক্ত হইয়া উঠিল। শুধু ঘাস আর জল, জল আর ঘাস...সেখানে সেই বড় বাড়িটাতে বন্দীশালায় থাকিবার সময় শুকনো বিচালি খাইয়া মরিয়াছে কতদিন।

খোল মাখানো জাব্ কতকাল সে যে খায় নাই!

বুধীর বড় লোভ হইল—সে দেখিল একটা ছোট নাদায় দুটি বাছুর জাব্ খাইতেছে। এই তাহার সুযোগ—সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—উঠানটাতে লোক নাই—অন্ধকারও বেশ ঘন। বুধী চট্ করিয়া বাছুরের পাশে আসিয়া নাদাটাতে মুখ ডুবাইয়া খাইতে আরম্ভ করিল। আঃ, কতকাল পরে খোল-মাখা জাবের আস্বাদ আবার সে পাইল!...

ছোট বাছুরটা বিস্মিত ও ভীত হইয়া ডাকিল—মা—আ—আ। কে এসে খাচ্ছে দেখ—

কিছু দূরের নাদাটা হইতে মুখ তুলিয়া তাহার মা বুধীকে দেখিতে পাইয়া বলিল—কে রে? দূর হ—দূর হ—আপদ—

কথা শেষ করিয়াই বাছুরের মা শিং নাড়া দিয়া বুধীকে গুঁতাইতে আসিল। বুধী তখন মাত্র কয়েক গ্রাস খাইয়াছে—ভয়ে সে খাওয়া ফেলিয়া দৌড় দিল।

একটা বড় গরু বলিয়া উঠিল—আস্পর্ধা দ্যাখো না ভিখিরীটার!...

বুধী বড় অপমান বোধ করিল। জগৎটা যে এত খারাপ তাহা সে আগে জানিত না। এতটুকু সহানুভূতি সে স্বজাতীয়ের কাছে আশা করিতে পারে না? আবার ভিখিরী বলিয়া অপমান করা? গ্রামের বাহিরে আসিয়া সে হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছে জগৎ কি নিষ্ঠুর! তখন অন্ধকার খুব ঘন হইয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, গাছতলার মধ্যে জোনাকী জ্বলিতেছে। মশায় খাইয়া ফেলিয়া দেয় বলিয়া বুধী এই সব গাছতলায় শুইতে পারে না যেখানে সেখানে। সারাদিনের পরিশ্রমে শরীর তাহার ভাঙিয়া পড়িতে চাহিতেছে। বরাবর তাহার সাঁজালের ধোঁয়ায় শোয়ার অভ্যাস। এই সময়ে প্রতিদিন মনে পড়ে তাহার আবাল্য পরিচিত নিজস্ব গোহালঘরটির কথা। তাহার ক্ষুদ্র জগতের কেন্দ্র সেখানে। সেই তাহার গৃহ। আজ তারই অভাবে সে গৃহহীন, ছন্নছাড়া হইয়া পথে পথে বেড়াইতেছে। আর কখনো কি সেখানে ক্লান্ত শরীরকে এলাইয়া দিবার সৌভাগ্য তাহার ঘটিবে?

গ্রামের বাহিরে ফাঁকা মাঠে তবুও মশা অনেক কম। এইখানেই একটু ভাল জায়গা দেখিয়া বুধী শুইয়া পড়িল। খানিক রাত্রে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। মাঠের মধ্যে ফেউ ডাকিতেছে। বাঘ বাহির হইলেই ফেউ ডাকে, বুধীর জানা আছে। ভয়ে তাহার শরীর অবশ হইয়া গেল—সর্বনাশ! যদি বাঘ আসিয়া পড়ে? যদি তাহাকে দেখিতে পায়? সারারাত দূরে দূরে ফেউ ডাকিল। বুধীর ঘুম হইল না। একবার ভাবিল গাঁয়ের মধ্যে কোন গোহালে গিয়া আশ্রয় লওয়া যাক্। পরক্ষণেই ভাবিল, পরের টিট্কারী সে সহ্য করিতে পারিবে না—বিশেষতঃ স্বজাতীয়দের ঠাট্টা-বিদ্রূপ অসহ্য—তার চেয়ে বাঘের পেটে যাওয়াও ভালো।

শেষ জীবনে এত দুর্দশাও তাহার কপালে ছিল! কেহ ভালবাসে না, কেহ এক আঁটি বিচালি দিয়া আদর করে না, আপনার জন বলিতে কেহ নাই—যাহারা ছিল, তাহারা যে কোথায়, কত দূরে, কোন্ দিকে—কে তাহাকে পথ-নির্দেশ করিবে?

পথে পথে যে কতদিন কাটিল বুধীর তাহার হিসাব নাই। কত মাঠ, কত গ্রাম, কত বিলবাঁওড়ের ধারের বাবলা বন, কত কচুরীপানায় ভর্তি মজাগাঙ। কচুরীপানার পাতা খাইলে মুখ চুলকায় সবাই জানে, বুধী কখনো এর আগে খায় নাই—কিন্তু সব জায়গার ঘাস ভাল নয়—বিশেষত বন্যায় ডোবা পচা ঘাস খাইলে গলা ফুলিয়া মারা পড়িতে হয়,

একথা বুধী জানে। বাধ্য হইয়া সুতরাং কচুরীপানার পাতাই এবার খাইতে হইল। এক জায়গায় পথের ধারে একটা কামারের দোকান। চাষালোক লাঙলের ফলা জোড়াইতে আসিয়াছে। বুধীকে দেখিয়া একজন লোক বলিল—গরুডো কাদের হ্যাঁ?

আর একজন বলিল—ফয়জদ্দি বিশ্বেসের গোরুডোর মত দেখ্‌তি—না মামু?

পূর্বের লোকটি বলিল—সে তো ধুঁজি শিংয়ে গাই—এডার মত নয়। বুধীকে একজন আসিয়া ধরিয়া ফেলিল। বুধী তখন অত্যন্ত ক্লান্ত, সাধ্য নাই যে পলায়।

সবাই মিলিয়া দেখিয়া বলিল—এডা ভিন্ গায়ের গরু, ছাড়ান দাও, কি কত্তি কি হবে, দরকার কি পরের গরু বেঁধে, শেষকালে কি একটা থানাপুলিসির হ্যাংগামায় পড়্‌তি যাবা? ছাড়ান দাও। দলের মধ্যে একটা লোক ছিল, সে মানুষের মত মানুষ, তার হৃদয় আছে। সে বলিল, আহা কাদের গোরুডো? হাড়সার হয়ে গিয়েচে। এডা বোধ করি মামু, চালানের পাল থেকে পালিয়ে আসচে। বাড়ি নিয়ে দুটো সানি খেতে দিইগে—তারপর ছাড়ান দেবানে।

কিন্তু অন্য লোক তাহাকে বাধা দিল। বাড়ি লইয়া যাইতে দিল না। বুধী সেখান হইতে গ্রামের বাহিরের রাস্তা ধরিল। তারপর একদিন আসিল ভীষণ বিপদ। বুধীর ভীষণ তৃষ্ণা পাইয়াছে—কোথাও জল পায় না। অবশেষে একটা কি নদী পাওয়া গেল। তৃষ্ণায় তাহার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল—সে জলের ধারে জল খাইতে গিয়া নরম পাঁকে পুঁতিয়া গেল। এ পা-খানা উঠাইতে যায় তো ওখানা ডুবিয়া যায়। ক্লান্ত বুধী সে গভীর হাবড় হইতে নিজেকে কিছুতেই উদ্ধার করিতে পারিল না। জলও খাওয়া গেল না—তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে অথচ দু'হাত দূরে টলটলে কালো জল। সে ক্রমশঃ পাঁকে পুঁতিয়া যাইতে লাগিল—শেষের দিকে বুধীর আর জ্ঞান রহিল না—শকুনিতে তাহার চক্ষু দুটি ঠুক্‌রাইয়া বাহির করিয়া ফেলিবে, মুচিরা ছাল ছাড়াইয়া লইয়া যাইবে, হাড়গোড় সাদা হইয়া পড়িয়া থাকিবে জলের ধারে, হাড়-বোঝাই-নৌকা একদিন কুড়াইয়া নৌকায় বোঝাই দিবে—মাংস খাইবে শিয়াল-শকুনিতে—এ নিষ্ঠুর, অনতিদূর ভবিষ্যতের ছবি বুধীর চোখের সামনে কতবার সে কালরাত্রির অন্ধকারে ভাসিয়া উঠিল—কতবার মিলাইয়া গেল যে!

সকাল হইল, বেলা হইল। বুধীর তৃষ্ণার্ত আধ-অচেতন চক্ষুদুটি তখন নদীর কালো জলের দিকে চাহিয়া আছে একদৃষ্টে। একটু জল কেউ যদি দিত!...

খররৌদ্র চড়িল। উলুর ফুল ফুটিয়া আছে হাবড়ের ওপরকার চরে। দু'একটা গাঙ-শালিক বুধীর নিকটে আসিয়া বুধীর দিকে কৌতূহলের সঙ্গে চাহিয়া দেখিল—কিছু বুঝিতে না পারিয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ বোধ হয় বুধীর ভাল জ্ঞান ছিল না। যখন তার চৈতন্য আবার ফিরিয়া আসিল, তখন সে দেখিল, একখানা ছইওয়ালা নৌকা তাহার সামনে দিয়া চলিয়া যাইতেছে—এতক্ষণ পরে এই মানুষের চিহ্ন! বুধী অতিকষ্টে আর্তস্বরে এক আবেদন পাঠাইল—ওগো আমাকে বাঁচাও—কে তোমরা—

নৌকায় ছইয়ের বাহিরে একটি তরুণী বৌ বসিয়া ছিল—হঠাৎ তাহার চোখ পড়িল বুধীর দিকে। বৌটি ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—ওগো, বাইরে এসো—একবার এদিকে এসো—

একটি লোক বাহিরে আসিয়া বলিল—কি—! কি হয়েচে?

—ওগো দ্যাখো, একটা গরু হাবড়ে পড়েছে। আহা, কতক্ষণ হয়তো পড়ে আছে, উঠতে পাচ্ছে না—ওকে উঠিয়ে দিতে হবে।

লোকটি তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল—ওঃ এই! আমি বলি কি না কি। ও কিছু না,

যাদের গরু তারা এসে উঠিয়ে নিয়ে যাবে এখন।

বুধী বৌটির চোখে মুখে দয়া ও মনুষ্যত্ব দেখিতে পাইয়াছিল আগেই—সে মানুষ চেনে। বুধী আকুলনেত্রে আর্ত আবেদনের দৃষ্টিতে বৌটির দিকে চাহিল। বৌটি বলিল—ওই দ্যাখো না, কেমন করে চাইচে—না, ওকে না তুলে দিয়ে যাওয়া হবে না—এই চরে এখানে মানুষজন কোথায় যে ওকে তুলবে?

নৌকার মাঝিরাও বলিল। এর নাম চাঁপাবেড়ের চর। এ তল্লাটে মনিষ্যি নেই বাপু! মা-ঠাকরুণ ঠিকই বলচেন।

লোকটি বিরক্তি প্রকাশ করিল। নানা ওজর-আপত্তি তুলিল, কিন্তু বৌটি নাছোড়বান্দা। গরুটাকে না তুলিয়া যাওয়া হইতেই পারে না। বলিল—দ্যাখো, যাওয়া হচ্ছে একটা মঙ্গলের কাজে—গোড়াতেই একটা অমঙ্গল দিয়ে শুরু করা চলে? এই বুড়ো গরুটার চোখের চাউনি আমি সারাদিন ভুলতে পারবো না—ও মরে যাবে এই হাবড়ে যদি কেউ না তোলে।

লোকটি বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিল— তোমায় নিয়ে বেরুলেই একটা না একটা হাঙ্গামা পোয়াতেই হবে এই ধরণের—এখন কোথায় লোকজন পাই যে গরু তুলি! বাঁশ চাই, দড়ি চাই, লোক চাই—ও কি সোজা পুঁতে গিয়েচে, দেখচো না?

ঘণ্টাখানেক নৌকা সেখানে বাঁধা রহিল। নৌকার মাঝিরা নামিয়া কোথা হইতে জনকতক লোক ডাকিয়া আনিল—আরও ঘণ্টাখানেক টানাটানির পরে সকলে মিলিয়া বুধীকে টানিয়া তুলিল হাবড় হইতে!...জল! জল—সে একটু জল খাইবে!

বৌটি বলিল—আহা, কি তেষ্টাটাই পেয়েছিল দেখলে? চোঁ চোঁ করে এক গাঙ্ জল খেয়ে ফেললে—বুড়ো গরু! দেখ না ওর পা কাঁপচে, দাঁড়াতে পারচে না।

লোকটি খিঁচাইয়া বলিল—মরুক গে। ট্রেনটা ফেল হোল তো এখন? কোথাকার এক ছেঁড়া ল্যাঠা জুটিয়ে দু'টি ঘণ্টা দিলে কাটিয়ে। চলো এখন—স্টেশনে বসে থাকো রাত দশটা পর্যন্ত।

নৌকা চলিয়া গেল। বুধী কি বলিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইবে?

...ওগো অপরিচিতা, জীবনের বড্ড শেষের দিকে তুমি এলে। তোমার মত মানুষের সঙ্গে যদি আগে দেখা হোত।...যাও যেখানে যাবে।

গরুর আশীর্বাদে মানুষের কোন কাজ হয় কিনা জানি না—শুভ হোক তোমার জীবনের যাত্রাপথ।

তারপর আরও কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছে। একদিন বুধীর সারাদিন ভয়ানক কষ্ট গেল। সেদিন যেমন দারুণ বর্ষা, তেমনি ঝড়। তেমনি একটা বড় গাছও পাওয়া গেল না যাহার নীচে এই ভীষণ ঝড়বৃষ্টিতে সে আশ্রয় নেয়। একটা বাঁশঝাড়ের তলায় আরও কয়েকটি গরুর সঙ্গে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটাইয়া সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িল।

সকাল হইতেই বুধীর ঘুম ভাঙ্গিল। সারা গায়ে জোঁক লাগিয়া তাহার অর্ধেক রক্ত চুষিয়া খাইয়াছে; এমন ভয়ানক জায়গা। ঝড়বৃষ্টি থামিয়াছে; রৌদ্র উঠিল।

হঠাৎ কিছু দূরে একটা পুকুর ও তার পাশের আমবাগান দেখিয়া তাহার মনে কেমন সন্দেহ হইল।

জায়গাটা যেন পরিচিত মনে হইতেছে।

বুধী আগাইয়া গিয়া দেখিল। এই আমবাগান তো সে ইহার আগেও দেখিয়াছে; যে দলটির সঙ্গে সে সেবার গিয়াছিল—এই আমবাগানে তাহারা একদিন রাত্রি কাটায়; পাশে পথটা—ওটাও সে চেনে।

বুধী সেই পথ বাহিয়া আগ্রহের সহিত হাঁটিয়া চলিল—যতই যায় ততই তাহার

বেশ মনে পড়িতে লাগিল, এই পথ তাহার পরিচিত। এ পথে সে আগে আসিয়াছে। এমন কি একদিন মনে হইল, তাহাদের গ্রাম আর বেশী দূরে নাই। ওই পথে সে পাউণ্ড-ঘর হইতে ফিরিয়াছে দু'তিনবার। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বুধীর মনে হইল তার হৃদ্-স্পন্দন বুঝি বন্ধ হইয়া যাইবে! ওই তো তাহাদের গ্রাম, তাহাদের গ্রামের সেই ক্ষেত—ক্ষেতের পাশেই তাহাদের নদী ; ওই তো গ্রামের ভাগাড়, ভাগাড়ের পাশে ভাঙ্গা ইঁটখোলা।

বুধী দৌড় দিল ; তখন আনন্দে সে প্রায় জ্ঞানশূন্য।

সন্ধ্যা হইবার দেরি নাই। বুধী দূর হইতে বাড়ি দেখিতে পাইল। গাবতলায় যে আনারসের জমি ছিল, বুধী আনন্দে উৎসাহে আনারসের ক্ষেতের বেড়া ভাঙিয়া ছুটিতে ছুটিতে বাড়ির উঠানে গিয়া পেঁাছিতেই কোথা হইতে এক তীক্ষ্ম মিষ্টি ক্ষুদ্র মেয়েলি কণ্ঠের আনন্দ ও বিস্ময়ভরা চীৎকার শোনা গেল—"ও মা, ও ঠাকুরমা, শীগ্গির এসে দ্যাখো কে এসেচে—শীগ্গির এসো—"

পরক্ষণে বুধী তার গলায় দু'টি নরম কচি হাতের সাগ্রহ নিবিড় বেষ্টন অনুভব করিল। খুকীর মা বাহিরে আসিয়া বলিলেন, কে এসেছে বলছিস্ খুকী?...ওমা, ও কে, বুধী না?

খুকীর ঠাকুরমা আসিয়া বলিল—বুধী এলো কোত্থেকে! আহা, কি হাড়সার হয়ে গিয়েচে ; ওকে যে আর চেনা যায় না।

খুকীর মা বলিলেন—ও কি করে পালিয়ে এলো আজ দু'মাস পরে। ঠিক দু'মাস হয়েচে। আমি তখন বলেছিলুম চালানে পালে গরু বেচে না ওরা—শুনিচি নাকি কলকাতায় কসাইখানায় নিয়ে গিয়ে বিক্রী করে। সত্যি মিথ্যে জানি নে বাপু। এইরকম কিন্তু সবাই বলে। তোমরা তখন শুনলে না—ভাবলে বুড়ো গরু দুধ তো আর দেবে না—বেচে ফেলে আপদ মিটিয়ে দিই। সংসারের মঙ্গল হোত ভাবচো ওই গরু যদি বেঘোরে মারা যেতো? ও কি করে পালিয়ে এলো তাই ভাবি! বোধ হয় রাস্তা থেকে পালিয়েছে পাল থেকে, কি হাড়সার হয়ে গিয়েচে, মা গো মা!

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বুধী গোহালে শুইয়া পড়িয়াছে। এই তাহার আপনার গৃহ—এখনও তাহার বিশ্বাস হইতেছে না যে সে সত্যিই বাড়ি ফিরিয়াছে। এই তাহার আবাল্য পরিচিত গোহাল, এই সেই বিচালির গাদা, সেই রকম ঘন সাঁজালের ধোঁয়ায় গোহাল অন্ধকার—একটাও মশা নাই, বড় বাছুরটা একপাশে সানি খাইতেছে। খুকীদের রান্নাঘরে খুকীর মা রাঁধিতেছে, খুকীর উচ্চকণ্ঠ শোনা যাইতেছে। কাল সকালে নদীর ধারে তার প্রিয়, পরিচিত মাঠটিতে সে ঘাস খাইতে যাইবে। আর একটা সাথী বন্ধু জুটিয়া যাওয়াও বিচিত্র নয়।

কথাশিল্প, ১৩৫৩

বুড়ো হাজরা কথা কয়

সকালবেলা পাঁচুদাসী বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল।

সারাদিন নৌকো বেয়েছে মাঝি, সন্ধ্যায় বনগাঁ ইস্টিশানে এসে পেঁাছোয়। কতদূরে যেতে হবে তা সে জানতো না। কত জলকচুরির দামের উপর পানকৌড়ি বসে থাকা, ঝিরঝিরে হাওয়ায় দোলা বাঁশবনের তলা দিয়ে দিয়ে নৌকো বেয়ে আসা ; জলকচুরির নীল ফুলের শোভায় গলুসি-বন্দিপুরের চর আলো করে রেখেচে ; কত বনো-ঝুড়োর গাছে গাছে ঠাণ্ডা নদীজলের আমেজে বকের দল, পানকৌড়ির দল বসে ঠিক যেন ঝিমুচ্ছে।

পাঁচুদাসীর স্বামী উদ্ধব দাস বেশ জোয়ান মদ্দ লোক। বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই ওর—শক্ত হাত-পা, এই লম্বা এই চওড়া বুক, এই হাতের গুলি, এই বাবরি চুল। জাতে কাপালী, বন-জঙ্গল উড়িয়ে তরিতরকারির আবাদ করে সোনা ফলায়। দক্ষিণ অঞ্চল থেকে ওরা এসে এখানে বাস করচে আজকাল সেইসব গাঁয়ে, যেখানে দশবছর আগেও ছিল কাঁটাবন, ঝোপ জঙ্গল। যা হোক দু'পয়সা রোজগারও করে, বিশেষ করে আজকাল যুদ্ধের দরুণ তরিতরকারির যা দাম।

উদ্ধব বল্লে স্ত্রীকে—চিঁড়ে কতগুলো আনলি?

পাঁচুদাসী বেশ শক্ত-সমর্থ মেয়েমানুষ। একহারা, লম্বা, শ্যামল, উনিশ-কুড়ি বয়েস, মুখের ভাবে বেশ একটা কাঁচা লাবণ্য মাখানো—অথচ একা সংসারের সব কাজ মুখ বুজে করে যাবে, চার-পাঁচটা হালের গরুর ডাবায় জল তুলবে কুয়ো থেকে, বাইরের বড় গোয়াল পরিষ্কার করবে, দশ গণ্ডা বিচালির আঁটি কাটবে—তারপর আবার রান্নাবাড়া করবে—স্বামীর মাঠের পান্তভাত, গরমভাত, জনমজুরের ভাত—এসো-জন বসো-জন গেরস্থর সবই তো থাকে। রাতদুপুরে লোক-কুটুম্ব এলে পাকি আড়াই-সেরা কাঠার এক কাঠা ডবল-নাগরা চালের ভাত বড় তোলো হাঁড়িটায় চড়িয়ে দেয় এক নিমেষে। দেখতে নরম-সরম হোলেও লোহার মত শক্ত হাত-পা।

পাঁচুদাসী একটা ছোট থলে নৌকোর খোল থেকে টেনে বার করে হাতে আন্দাজ করে বল্লে—কাঠা দুই—

—ওতেই হবে!

—আমি তো উপোস। শুধু তুমি আর মাঝি ছোঁড়া খাবে—

—তেঁতুল এনেছিস্ তো?

—হুঁ-উ-উ।

স্বামীর দিকে বঙ্কিম-কটাক্ষে চেয়ে বলে—যত পারো—

তারপর আবার নৌকো চললো উলুটি বাড়োর কিনারায় কিনারায়, নদীর ঠাণ্ডা শ্যামল জলধারা যেখানে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেচে ভাঁটার টানে সাতভেয়েতলার বড় বটগাছের দিকে। উদ্ধব দাস তামাক খাবার জন্যে চকমকি ঠুকচে, মাঝিকে বলচে—ইদিকি এবার বাগুনের বীজপাতা দেওয়া হয়নি দেখচি—হ্যাঁ রে, এ ক্ষেতটা কি জেড়ো কুমড়োর?

মাঝি বল্লে—জেড়ো কুমড়ো না হলে কি অত বড়ডা হয়—দ্যাখচো না?

—চত্তির মাসের শেষ—এখনো ক্ষেতে শীতের কুমড়ো কাটেনি—কেমনধারা চাষা এরা? ...তামুক খাবা?

মাঝি ছোঁড়া ঘাড় নেড়ে বল্লে—খাইনে।

—তোর দাদা মনিন্দর তো খায়।

—খায় না? বলে হুঁকো শোষে। দাদা খায় বলে কি আমাকেও খেতে হবে?

—না তাই বলচি।

—কি চর এডা? আর কদ্দুর?

—চর পোলতা। আর দু'খানা বাঁক।

—বাঁকের মুড়োয়, না বাঁকের মাজায়?

—এক্কেবারে ও মুড়োয়—

—তাহ'লে এখনো দেড় ঘণ্টা দু ঘণ্টা—

পাঁচুদাসী দেখতে দেখতে যাচ্ছে, বেশ ভাল লাগছে ওর। বাড়ি থেকে কত দিন একটু বেরুনো হয়নি, শুধুই গোয়াল পরিষ্কার, ক্ষার কাচা, বাসন মাজা, তোলো তোলো ধানসিদ্ধ, গরুর ডাবায় জল তোলা...এ যেন মুক্ত দিনের লীলায়িত অবকাশ! দিন-

শেষের হলদে রোদে আকাশ কেমনতর হয়ে উঠচে, নৌকোর গলুইয়ে চলমান নদীর ছল-ছল রাগিণীর ছন্দ বাজচে, গলা-লম্বা কি পাখী শেওলার মধ্যে জেলেদের পাতা তেঁতুল ডালের হুড়ির ওপর বসে নৌকোর দিকে চেয়ে আছে, নলখাগড়ার বনের গত শীতকালের তিতপল্লার ফল শুকিয়ে শুকিয়ে ঝুলচে, ভুস ভুস করে শুশুক ডুবচে উঠছে জলে নৌকোর এপাশে ওপাশে।

—হ্যাঁগো, ওগুলো কি, শুশুক না কচ্ছপ?

—শুশোক—

—আহা-হা, শুশোক বুঝি?—শুশুক তো বলে। বাঙাল কোথাকার।

পাঁচুদাসী নাগরিকতার আভিজাত্যে ঘাড় বেঁকিয়ে হাসির ঝিলিক দিয়ে স্বামীর দিকে চায়।

—নাও, নাও, ওই হোল, শুশুকই হোল—

—খিদে পেয়েচে?

—পাইনি? সে তুই বুঝচিস্ নে? তোকে বলতে হবে?

ঠিক ঠিক। পাঁচুদাসীর ভুল হয়ে গিয়েচে। ওর বড় খিদে, জোয়ান মরদ পুরুষ ভুতের মত খাটে দিন-রাত, মাটির সঙ্গে কাজকারবার। একটি কাঠা তার নাম। চিঁড়ে আর তেঁতুল আর লবণ আর আখের গুড়। এক নিঃশ্বাসে কাবার করবে। ওর খাওয়া একটা দেখবার মত জিনিস বটে।

বালাই ষাট, চোখ দিতে নেই।

—আঙট পাতায় দেবো তো!

—ভিজিয়েচ?

—না, এই গামছায় বেঁধে দিচ্চি—নৌকো থেকে জলে ডুবিয়ে খানিকটা বসে থাকো! বাঁশমলা ধানের চিঁড়ে, এখুনি ভিজে কাদা হয়ে যাবে। ওই মাঝি ছোঁড়াকেও দিই ওই সঙ্গে—তাকেও বলো—

চর পোলতা ছাড়িয়ে দু'ধারে বনজঙ্গল, ঘাটবাঁওড়ের চর। ওরা একমনে খেয়ে যাচ্চে, মাঝি নৌকো বেঁধেছে একটা ষাঁড়া ঝোপের কোলে। বড় কুবো পাখি পাখা ঝট্‌পট্ করচে আলোকলতার জালের আর কুঁচ কাঁটার জটিল ডালপালার নিবিড়তায়। কাল রাতের সে স্বপ্নটার কথা মনে পড়ায় পাঁচুদাসীর সারা গা আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো।

আর ঠিক কি কাল রাতেই!

যে ভোরবেলা নৌকো ছাড়বে নিশেনখালি যাবার জন্যে, ঠিক তার আগের রাতেই!

সারা গা যেন শিউরে ওঠে আনন্দে ও বিস্ময়ে।

স্বপ্ন দেখলে সে যেন তাদের বাড়ির উত্তরদিকে যে কলুদীঘি আছে, তার উঁচু পাড়ে বড় ঘোড়া-নিমগাছটার তলায় অকারণ দাঁড়িয়ে আছে। ঘেঁটু ফুল দুটি আলো করেছে দীঘির পাড়, এখন চৈত্র মাসে তার মাঝে মাঝে কালো শুঁটি ধরেছে—সেখানটাতে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এমন সময়ে একটি ছোট্ট ছেলে বনের দিকের কোথা থেকে যেন এল। এসে ওর হাঁটু ধরে দাঁড়ালো, ওর মুখের দিকে চাইলো—ওর হাতে একটা পাকা বেগুন ঝোলানো, তাদের ক্ষেতে বীজপাতা দেওয়ার জন্যে যেমন বেগুন টাঙানো থাকে বাইরের চণ্ডীমণ্ডপের আড়ায়। বল্লে—তোর কাছে আমি আসবো মা?

পাঁচুদাসীর নিঃসন্তান বুভুক্ষু প্রাণ বলে উঠলো—আসবি খোকা? আসবি? তোর হাতে ও কি?

—বাগুন। তোদের ক্ষেতে নিড়েন পাট করে পুঁতে দেবানি—

—ওরে আমার সোনা! ক'নে ছিলে এমন মানিক? আয় আয়—

কি চমৎকার মুখখানা খোকার! ওই ছিরু ঘোষের মেজ নাতির মত দেখতে। পাঁচুদাসীর বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলো স্বপ্নের কথা ভেবে। কোথায় হারিয়ে গেল সে মুখ। স্পষ্ট মুখখানা মনে পড়ে এখনো! চোখে জল এসে পড়ে পাঁচুদাসীর।

সত্যি যেন এ স্বপ্ন! সত্যি হবে?

আজই বিশেষ করে ও-স্বপ্ন কেন?

আজ পাঁচটি বছর বিয়ে হয়েছে, একটি ছেলে নেই, মেয়ে নেই। নিঃসন্তান দাম্পত্য সংসারের আকাশে বাতাসে আড়ালে অবকাশে নিষ্ঠুর কালো ছায়া ফেলে থমথমিয়ে থাকে, অথচ অভাব তো নেই সংসারে। গোলাভরা ধান, ডোলভরা মুসুরি, ছোলা, ক্ষেতপোরা বেগুন, কুমড়ো, ঢেঁড়শের চারা ঠেলে উঠেছে কানিজোলের ক্ষেতে। গত শীতকালে সাত-গন্ডা ভাঁড় খেজুর গুড়ে ভর্তি করে আড়ায় তুলে রেখেছে বর্ষাদিনের জন্যে। হাটুরা হাট চার পাঁচ টাকা শুধু বেগুন কুমড়ো বিক্রি। লাউ কী মাচায়! যেমন তেজালো লতা, তেমনি তার ফলন! সূর্যমুখী লঙ্কা ক্ষেতে দুদিকে মুখ করে যেন চোদ্দ পিদিম জ্বালিয়ে রেখেছিল মাঘের শেষেও।

উদ্ধব দাস খাওয়া শেষ করে থালা ধুয়ে ফেল্লে নদীর জলে। মাঝি ছাড়লে ডিঙি। পশ্চিম আকাশে মেঘ জমে আসচে, কালবোশেখীর দিন, উদ্ধব বল্লে—ও মাঝি, হাত চালিয়ে নাও—ওই দ্যাখো—

মাঝি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ঈশান কোণের আকাশে চেয়ে বল্লে—তাতমেঘা। জল হবে না।

—তোকে বলেচে!

—দেখে নিও মোড়ল। তাতের মেঘ, বাতাস উঠতি পারে, জল হবে না।

—বাতাস উঠলেও তো মুশকিল। হাত চালিয়ে নাও—এবার ক'খান বাঁক?

—আর একখানা। ওই পাইকপাড়ার বটগাছ থেকে শুরু হোল বাঁকখান। ওর ও মুড়োয়—

পাঁচুদাসীর মজা লাগে ওদের কথাবার্তা শুনতে।

বাড়ি থেকে বেরুলে দুশো রগড়। আজ চরের কাশবনে চড়ুইভাতি চাঁদের আলোর তলায়। বাঁশের চোঙে ফুঁ পেড়ে ধোঁয়াভরা রান্নাঘরে ভাত রান্না নয়। কি বিশ্রী এবারকার তেত্তি বীজ গাছের চ্যালাগুলো। আগুন ধরতে কি চায়! ফুঁ পেড়ে পেড়ে চোখ রাঙা হয়ে যায় একেবারে। সেই ছোট্ট খোকা যেন ওই চরে কাশের ডগায় ডগায় ফড়িং প্রজাপতি ধরে বেড়াচ্ছে। তাকেই ও দেখচে সর্বত্র। সব সময়ই তার কথা মনে পড়চে।

স্বপ্ন কি সত্যি হয়?

যদি সত্যি হয়! কে বলতে পারে?

ওর সারা গা আবার যেন শিউরে ওঠে।

সন্ধ্যার আর দেরি নেই। ওর দূরে বাঁ-দিকের পাড়ে একটা ইটের পাঁজা। অন্যদিকে হলদে রঙের কোঠাবাড়ি একটা। বড় বড় গাছের তলায় আরও দু'একটা বাড়ি চোখে পড়ে। পাঁচুদাসী জিগ্যেস করলে—হ্যাঁগা, ওই বাড়িটা কাদের? ভালো বাড়ি!

মাঝি বল্লে—ওটারে বলে ডাক-বাংলা। সাহেবরা এসি থাকে।

উদ্ধব দাস বল্লে—সেবার বাগুন বিক্রি করতি এসে দেখি ওর বারান্দায় গোরা সাহেব পিলপিল করচে। এই সঙ্গে মটোর গাড়ি দাঁড়িয়ে। ভিড় কি! সাহেবের ছেলেরা ছুটো-ছুটি করচে ইদিক ওদিক।

পাঁচুদাসী কি ভেবে বল্লে—হ্যাঁগা, সাহেবদের ছেলেরা দেখতি কেমন?

—খুব ফরসা।

—কেমনধারা ফরসা?

—সে কি বোঝাবো তোরে? তুই পাড়াগেঁয়ে ভূত। সাহেবের কি বুঝিস্?

—আহা-হা! আর উনি একেবারে শহুরে বাবু! সেই একবার বাগুন বেচতি তো এসিছিলে—বলে জন্মের মধ্যি কম্ম, চত্তির মাসে রাস!

ওরা ডাঙ্গায় জিনিসপত্র নামালো। হেঁটে যেতে হবে ইস্টিশানে—আধ-কোশটাক ডাক-বাংলার ঘাট থেকে। একটা ভারি বোঁচকা, এক বোঝা ডাঁটা আর কুমড়ো শাক এই সঙ্গে। পাঁচুদাসী বোঁচকা কাঁখে পেছনে পেছনে চললো—আগে আগে উদ্ধব দাস। মাঝি রইল ঘাটেই, ঝাউতলায় সে রেঁধে-বেড়ে খাবে, নৌকোতে শুয়ে থাকবে রাত্রে—আবার কাল রাত দশটার সময় ওরা ফিরবে, নৌকো ছাড়া হবে তখন।

উদ্ধব দাস বল্লে—তোমার কি কি লাগবে বল, কিনে দিয়ে যাই—

—হাঁড়ি একটি, সরা একটি,—আর খলি মাছ যদি বাজারে পাই, মাছের দামটা দিয়ে যাও।

—মুসুরি ডাল খাবা। এক সের ডাল দিইচি আবার মাছের পয়সা ; ভারি বড়নোক দেখচো মোরে!

মাঝি অনুনয়ের সুরে বল্লে—দিয়ে যাও মোড়ল। আমাদের ওদিকি খয়রা মাছ খেতি পাইনে। যদি কাল বাজারে খয়রা মাছ পাই—চার আনা দ্যাও।

পাঁচুদাসী স্বামীকে ধমক দিয়ে বল্লে—দ্যাও না গো ওকে। ছেলেমানুষ। যাচ্ছি একটা শুভ কম্মে। যা খেতি চায় ওর প্রাণ, দাও ওকে। চারগণ্ডা পয়সা দাও মাছের আর দু-আনা দাও রসগোল্লার—

উদ্ধব দাসকে অগত্যা নগদ ছ'আনা পয়সা দিতে হোল মাঝির হাতে। মেয়েমানুষের নাই পেলে কি আর রক্ষে রাখে লোকে? যাকগে।

কখন গাড়ি আসে নাভারনের ওরা কিছুই জানে না। স্টেশনে গিয়ে জিগ্যেস ক'রে জানা গেল নাভারনের গাড়ি আসবে কাল ভোরবেলা। কেউ জানে না সেকথা। পাঁচুদাসী স্বামীকে বকলে, না জেনেশুনে আসা কেন? নৌকোতে রাত কাটালে দিব্যি হোত। এখানে কি শোবার জায়গা আছে? এত ভিড়, এত লোকের চিৎকার—মাগো, ইস্টিশান নয়—যেন কুঁদিপুরের গাজনতলায় আড়ং বসেচে।

উদ্ধব দাস অভিজ্ঞতার অটুট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলে—তুই থাম দিকি। তুই চিনিচিস্ কেবল কুঁদিপুরের গাজনতলার আড়ং—দেখলি বা কি জীবনে?

—তুমি খুব দেখেচো তো? তা হোলেই হোলো—

—তোর চেয়ে তো বেশি। আমি আসিনি বনগাঁ ইস্টিশান? শেয়ালদ' গিইচি আলু পটলের আড়তে। এই রেলে চড়ে যেতি হয়। সাড়ে চোদ্দ আনা ভাড়া। এই দিকি—

উদ্ধব দাস আঙ্গুল দিয়ে কোলকাতা লাইনের ডিসট্যান্ট সিগন্যালটা দেখালে।

উদ্ধব দাস জিগ্যেস করে একজন কুলীকে—বলি শোনো, একটু ভালো জল পাওয়া যায় ক'নে?

কুলী আধা বাংলা আধা হিন্দিতে যা বলে গেল তার অর্থ এই—ভালো জল আমি পাব কোথায়? নিজে খুঁজে দ্যাখো।

একজন ওদের বলে দিলে, ওভারব্রিজের ওপর বিছানা করে শুতে। ওখানে হাওয়া আছে, মশা লাগবে না, প্ল্যাটফর্মে বেজায় মশা।

ওরা তাই করলে বটে, কিন্তু রাতে পাঁচুদাসীর মোটে ঘুম হলো না। হৈ-চৈ চিৎকার, রেলগাড়ি আসচে সারা রাত ধরে। কত কষ্টে ভোর হোল। রাত আর পোহায় না।

ঘুমজড়িত কণ্ঠে পাঁচুদাসী বল্লে—হ্যাঁগো, ওই চা কি লোকের খাবার সময় অসময় নেই গা? সারা রাতই চা গরম! লোকে ঘুমুবে না চা খাবে? চক্ষেও কি ওদের ঘুম নেই? এমন অনাছিষ্টি কাণ্ডও যদি কখনো দেখে থাকি!

ভোরে নাভারনের ট্রেন এল। লোকজন সব উঠলো। ওরাও উঠল। আবার সেই ছোট খোকার মুখ মনে পড়লো পাঁচুদাসীর। সেই ছোট্ট সুন্দর মুখখানি, সম্মুখের এক অজানা দিনের কোণ থেকে উঁকি মারচে, কিসের আড়াল ওদের দুজনের মাঝখানে? হাজরাতলার বুড়ো হাজরা ঠাকুর কি সে আড়াল দূর করতে পারবেন!

নাভারন ছোট্ট ইস্টিশান।

সামনের চওড়া পাকা রাস্তা গিয়ে ওধারে বড় রাস্তায় মিশেচে। বড় বিলিতি চটকা-গাছের সারি পথের দুধারে। পাঁচুদাসী বল্লে—ও রাস্তা কোথাকার গো?

উদ্ধব দাস জানে না। বল্লে—কি জানি? বলতে পারিনে।

একজন গাড়োয়ান ধানের বস্তা নামাচ্ছিল গরুর গাড়ি থেকে; সে বল্লে—ওই রাস্তা? ও গিয়েছে যশোর, ইদিকে কলকাতায়। ওর নাম যশোর রোড।

যশোর রোড! যশোর রোড! পাঁচুদাসীর মুখে হাসি এসে পড়ে অকারণে! কি নাম যে বাপু!

উদ্ধব দাস সেই গাড়ির গাড়োয়ানকে বললে—নিশেনখালির হাজরাতলায় নিয়ে যাবা?

—তা যেতি পারি। ক'জন?

—দুজন। এই তো দেখতে পাচ্ছ।

—আজ পরবের দিন, সেখানে বড্ড ভিড় হয়, কত দেশ থেকে হাজরাতলায় পুজো দিতি লোক আসে। পাঁচটি টাকা ভাড়া লাগবেক যাতায়াতে।

এমন সময় পাঁচুদাসী লক্ষ্য করলে দামী শাড়ি পরনে একটি সুন্দরী বৌ স্টেশনের বাইরে জামতলাটায় ওদের কাছে এসে দাঁড়ালো। ওর সংগে ফরসা জামাকাপড় পরা ভদ্র-লোক, চোখে চশমা, হাতে ঘড়ি। পেছনে পেছনে একটা চাকর গোছের লোক, তার হাতে চামড়ার একটি বাক্স। বৌটি তাকে বল্লে—তুমি কোথায় যাবে?

পাঁচুদাসী সংকোচের সুরে তাকে বল্লে—নিশেনখালির হাজরাতলায়—

বৌটি পেছন ফিরে তার সংগী ভদ্রলোককে বল্লে—ওগো, এরাও সেখানে যাচ্ছে—

ভদ্রলোকটি উদ্ধব দাসকে বল্লে—তোমরাও হাজরাতলায় যাবে?

—হ্যাঁ বাবু। আপনারাও সেখানে যাবেন?

—আমরাও সেখানে যাচ্ছি। কত দূর?

—তা তো বাবু জানিনে। আমরা নতুন যাচ্চি। আজ মংগলবার, সেখানে আজ পুজো দিতে হয়, তাই যাবো। আমাদের বাড়ি অনেকদূর এখান থে।

—তাই তো! এ যে অজ পাড়াগাঁ দেখছি। কোথায় কতদূর যেতে হবে না জানলে এখন করি কি—

—বাবু, এই গরুরগাড়ি সেখানে যাবে বলছে। পাঁচ টাকা ভাড়া। চলেন ওই গাড়িতেই সবাই যাই। আপনারা এখন গাড়ি পাবেনই বা ক'নে, মাঠাকরুণ না হয় গাড়িতে উঠুন. আমি হেঁটে যাবো এখন।

বেলা বারোটার সময় ওরা একটা আধমজা নদীর ধারে এসে হাজির হোল। নদীর নাম ব্যাং নদী—দুধারে বনজাম আর হিজল বাদামের বন, বাঁশনি বাঁশের বন আর বেত-ঝোপ। অত বেলা হোলেও রোদ নেই নদীর এপারে, দিব্যি ঘন ছায়া। গাড়োয়ানের মুখে শোনা গেল নদী পার হয়ে আধক্রোশটাক গেলেই নিশেনখালির হাজরাতলা।

ইতিমধ্যে বৌটির সংগে পরিচয় হয়ে গিয়েছে পাঁচুদাসীর। ওর নামটি বড় কটোমটো,

মুখ দিয়ে উচ্চারণ হওয়া কঠিন—ম-ন-জু-লা। কলকাতায় শ্বশুরবাড়ি, সঙ্গে যিনি এসেছেন উনিই স্বামী, কলকাতায় চাকুরি করেন। পয়সাওয়ালা লোক, কলকাতায় নিজেদের বাড়ি আছে। বিয়ে হয়েচে আজ চার বছর, ছেলেপুলে না হওয়াতে হাজরাতলায় পুজো দিতে চলেছে ওদেরই মত।

ম-ন-জু-লা বলছে—আচ্ছা ভাই, ঠাকুর খুব জাগ্রত, না?

—শুনেছি তো দিদি। আমারও তো সেইজন্যিই আসা। যদি উনি মুখ তুলি চান—

—আমারও তাই। তোমায় বলতে কি, সব আছে কিন্তু মনে সুখ নেই। উনি আবার এসব মানেন না, আমি জোর করে নিয়ে এসেছি। বলি চলো, পাঁচ জায়গায় দেখতে হয়—এতে আর কষ্ট কি? আমার তো দিব্যি লাগছে ভাই। কি চমৎকার নদীর ধারটা—কলকাতা থেকে কতকাল কোথাও বার হইনি ভাই—মধুপুর যাওয়া হয়েছিল সেবার পুজোয়—দু' বছর হোল—

—সে কোথায় দিদি? মধুপুর?

—পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণায়। পাহাড় আছে, শালবন আছে সেখানে। বেশ ভালো জায়গা—কিন্তু এ জায়গাও আমার বেশ ভালো লাগচে—কত পাখীর ডাক!—পাখীর ডাক শুনে যেন বাঁচলাম কত দিন পরে। কেমন সুন্দর, না?

পাঁচুদাসী বৌটির কথাবার্তার ভঙ্গিতে কৌতুক অনুভব করলে। পাখীর ডাক শুনে শুনে তার কান পচে গেল। সে আবার কি একটা জিনিস এমন তা তো জানা নেই! যত আজগুবি কান্ড। ভদ্রতার খাতিরে সে বল্লে—হ্যাঁ দিদি, ঠিক। চলুন আমার সঙ্গে আমাদের গাঁয়ে ঝিটকিপোতায়। দিনরাত পাখীর কিচিরমিচির শোনোবো।

তারপর ওরা ব্যাং নদী জীর্ণ খেয়ায় পার হয়ে ওপারে চলে গেল। আরও কয়েক দলের সঙ্গে দেখা হোল—আশপাশের গ্রাম থেকে তারাও চলেছে, আজ মঙ্গলবারে হাজরাতলায় পুজো দিতে। গাড়ি নদীর ওপারেই রয়ে গেল। এ পথটুকু হেঁটেই যেতে হবে। নদীর ধার দিয়ে খানিকটা গিয়ে একটা যজ্ঞিডুমুর গাছের তলা দিয়ে বনঝোপের পাশ কাটিয়ে পথ চলেছে উত্তরমুখে—বাবলা গাছে ভর্তি সবুজ মাঠের মাঝখান বেয়ে।

পাঁচুদাসীর বড় আমোদ লাগছিল। কত লোকের সঙ্গে দেখা, কত দেশ-বিদেশ। কলকাতার বৌটিকে ওর বড় ভালো লেগেছে—হোক না কটোমটো নাম, কি ভালো মেয়ে, কি মিষ্টি কথা, অমায়িক ব্যবহার।

আর একটি বৌ এসেছে। ওর নাম তারা, জাতে সদগোপ। বাড়ী বনগাঁর কাছে হরিদাসপুর। তার ছেলে হয়ে মরে যাচ্ছে—গত পৌষ মাসেও একটি ছেলে হয়ে মারা গিয়েছে ওর—সেই ছেলের কথা বলে আর কাঁদে।

ম-ন-জু-লা বোঝাচ্ছে—কেঁদো না ভাই। সবই ভগবানের ইচ্ছে। আবার কোলজোড়া খোকা পাবে বই কি—এখনো তুমি ছেলেমানুষ—তাঁর নাম করে চলো, কাজ হবে ঠিক। কি বলো ভাই?

ও পাঁচুদাসীর দিকে চেয়ে শেষের প্রশ্নটা করলে। কিন্তু পাঁচুদাসীর মন তখন অনেক দূরে চলে গিয়েছে সেই কলুদীঘির ধারে বড় তুঁততলায়—হাতে পাকা বীজবেগুন, চাঁদমুখখানা ওর দিকে উঁচু করা, কত বিঘের ক্ষেতের বীজ!—দুহাতে ছড়ানো...ও ধন সোনামণি, তুমি আসবা, আসবা আমার কুঁড়েঘরে আমার কোলজোড়া হয়ে! আসবা আঁধার পক্ষের শেষ রাতের অন্ধকারে, পাখীপক্ষী যখন ডেকে উঠবে আমবনে, বাঁশবনে, কুল্লো পাখী ডাকবে শিমুল গাছের মগডালে, বিলবাঁওড়ে মাছ ভেসে উঠবে কেউটে পানার দামের মধ্যি! বুড়ো হাজরার দোহাই, পেঁচোপাঁচীর দোহাই...এসো খোকা এসো...

একজন কে বলচে—আঁচল পাততে হয় হাজরাতলায়—নদীতে নেয়ে আঁচল পেতে ঠাকুরতলায় বসে থাকতে হয়—

পাঁচুদাসী বল্লে—কেন?

—আঁচলে ফল পড়ে, ফুল পড়ে—যার যা হবে তাই পড়ে।

কথা চাপা পড়ে গেল। সবাই বলচে ওই হাজরাতলা দেখা যাচ্চে—

ওরা পেঁছে গেল।

নদীর ধারে মাঠের মধ্যে চারিধারে বহু প্রাচীন ষাঁড়াগাছের সারি। নিবিড় ঝোপ তৈরী করেচে ওরা জড়াজড়ি করে। বেড়ার মত আড়াল করেচে...ওর ওদিকে কিছু চোখে পড়ে না। সেই ষাঁড়া ঝোপের বেড়ার ধারে একটা বড় ষাঁড়া গাছই হচ্চে হাজরাতলা, বৃদ্ধ হাজরা ঠাকুরের স্থান।...

সেই গাছতলায় পুজোর যোগাড় হয়েছে...পুরুতঠাকুর বসে আছেন। চাল, কলা, ছোলাভিজে, পেঁপে...ফুলের রাশ। লোকে লোকারণ্য হাজরাতলায়। দশ-পনেরোখানা গরুরগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে—এপার থেকে যারা এসেছে তাদের গাড়ি।

ষাঁড়া ঝোপ ঘেরা মাঠের বাইরে দোকান বসেচে...মুড়িমুড়কি, ফুলুরি, কাটিভাজা, ছোলাভাজা। পিঁ-পিঁ বাঁশী বাজচে ছোট ছেলেমেয়েদের মুখে...খেলনা বিক্রি হচ্চে। মাটির ছোবা, পুতুল, রাধাকেষ্ট, শিবঠাকুর, ঘোড়া—মণিহারি দোকানে ফিতে, কাঁচের চুড়ি, চিরুনি বিক্রি হচ্চে...দু'তিনখানা দোকানে পাঁপরভাজা হচ্চে। তেমনি খদ্দেরের ভিড়—বেশির ভাগ ছোট ছেলেমেয়ে আর গরুর গাড়ির গাড়োয়ানেরা। আশপাশের গ্রাম থেকেও অনেক ঝি-বৌ বিনা কারণেই পুজো দেখতে এসেচে হাজরাতলায়।

বেলা দুপুর ঘুরে গিয়েচে। পুজোর বাজনা বেজে উঠলো।

পুরুতঠাকুর বল্লেন—যাও মা-ঠাকরুণরা, স্নান করে এসে ভিজে কাপড়ে সব হাজরা তলায় আঁচল বিছিয়ে বসো—

কলকাতার বৌটি আর পাঁচুদাসী একসঙ্গে নেয়ে উঠলো নদী থেকে। এক নিঃশ্বাসে ডুব দিতে হবে, উত্তরমুখ হয়ে হাজরা ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করতে হবে।

—ম-ন-জু-লা চুপি চুপি বল্লে—ভাই, আমার বুক কাঁপচে।

—কেন দিদি?

—আমার বড় সাধ—তোমাকে বলচি ভাই। বুকখানা দুরদুরু করে মাঝে মাঝে। আমার সঙ্গে আমার সমবয়সী যাদের বিয়ে হয়েছিল, সবার একটি দুটি সন্তান হয়ে গিয়েচে—ওঁর মনে বড় কষ্ট—

—বাবার দয়া দিদি। হয়ে যাবে, চলো শীগগির করে যাই—

পাঁচুদাসীর বড় মায়া হয় বৌটির ওপর। কি চমৎকার মানিয়েছে ওকে নীল রং-এর ফুল তোলা ভিজে শাড়ি পরে...দুদণ্ড চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। অনেকেই চেয়ে চেয়ে দেখছিলও ওকে...সুন্দরী বটে...পাড়াগাঁয়ের হাটে-মাঠে অমন সুন্দরী মেয়ে চক্ষে পড়ে কখনো? আহা, মোমের গড়ন হাত দুটি কখনো কি গোবরের ঝুড়ি ধরতে পারবে? গড়ে ধান ভেনে দিতে পারবে?—আঙুল ছেঁচে যাবে তা হোলে। ও-হাত ধান ভেনে দেওয়ার জন্যে তৈরি হয়নি।

অন্ততঃ পঁচিশ-ত্রিশ জন বৌ, সবাই তরুণী, ভিজে কাপড়ে সারি বেঁধে হাজরা-তলায় দাঁড়িয়ে। পুরুতঠাকুর সকলের মাথায় কুশিতে করে জলের ছিটে দিয়ে বল্লেন—যাও সব মায়েরা, এইবার আঁচল পেতে বসো গে—

একজন বল্লে,—কতক্ষণ বসে থাকবো বাবাঠাকুর?

—চোখ বুজে বসবে সবাই। যতক্ষণ না আঁচলে কিছু পড়ে ততক্ষণ বসবে মা তোমরা।

চোখ চেও না কেউ, আসন ছেড়ে উঠে পড়ো না যেন অধৈর্য হয়ে।

চৈত্র মাসের খররোদে মাঠ তেতে উঠেচে—বাতাস যেন আগুনের হলকা, তবুও হাজরাতলায় বেশ ছায়া আছে তাই রক্ষে—পাঁচুদাসীর জলতেষ্টা পেয়েচে। জল খাওয়ার কথা এখন ভাবতে নেই। বুড়ো হাজরা দয়া করুন। ঢোল বাজচে কাঁসি বাজচে। ট্যাং ট্যাং—কাঁইনানা, কাঁইনানা...না, ও সব ভাবতে নেই...হাজরাঠাকুর অপরাধ যেন না নেন। পাঁচুদাসী আবার মনকে স্থির করবার চেষ্টা করল।

কতক্ষণ কেটে গেল।

পাঁচুদাসী এর মধ্যে বার তিনেক চোখ চেয়ে দেখেচে আশেপাশে হাজরাঠাকুরের কোন মন্দির বা মূর্তি নেই। একটা মস্তবড় ষাঁড়া গাছ অনেকদূর জুড়ে ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তলায় ছড়িয়ে পড়া শুকনো পাতার উপর তরুণী বৌয়ের দল চোখ বুজে আঁচল বিছিয়ে বসে...কোনো লোক নেই এদিকে...পুরুতঠাকুর রয়েছেন দূরে ও গাছের তলায় পুজোর জায়গায়। ও ভাল করে চেয়ে দেখলে গাছতলায় একখানা সিঁদুর মাখানো ইট পর্যন্ত নেই।

পাঁচুদাসী আবার চোখ বুজলো।

হঠাৎ ওদের সারিতে একটি বউ অস্পষ্ট স্বরে বলে উঠলো—আমার আঁচলে একটা কি পড়লো!

পাশের একজন উপদেশ দিলে—চোখ চেয়ে দ্যাখো না কি!

—একটা ষাঁড়া ফল।

বৌটি সারি থেকে উঠে চলে গেল পুরুতঠাকুরের কাছে, যেখানে পুজো হচ্চে। সর্বাঙ্গ শিউরে উঠলো পাঁচুদাসীর এবং সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকও কেঁপে উঠলো। কি জানি ভাগ্যে কি আছে!

আরও দুটি বৌ সারি থেকে উঠে গেল—একজনের ফুল আর একজনের ফল পড়েছে। ইতিমধ্যে আর একজন কেঁদে উঠলো ডুকরে। সবাই বল্লে—কি হোল গো, কি হোল?

—আমার আঁচলে চুল আর ঢিল পড়েছে গো। পোড়া কপাল গো!

সে কাঁদতে কাঁদতে উঠে গেল সারি থেকে। বুড়ো হাজরা নিষ্ঠুর, দয়া করলেন না তার উপর। কি অপরাধ হোল বাবার চরণে। পাঁচুদাসীর বুক কেঁপে ওঠে আবার। বুকের ভেতর যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে। একটা বৌ ঢিপঢিপ করে মাথা কুটছে মাটিতে ওর সারিতে। ওর আঁচলেও তাহলে চুল আর ছাই পড়েছে।

—দয়া করো বাবা হাজরা, বুড়ো হাজরা দয়া করো!

বেলা ঘুরে গিয়েছে। আরও কতক্ষণ কাটলো। হঠাৎ পাঁচুদাসীর বুকের স্পন্দন যেন বন্ধ হবার উপক্রম হোল। টপ করে একটা কি পড়লো ওর আঁচলে। ফল? ষাঁড়া ফল? চুল বা ছাইয়ের পড়বার শব্দ কি অমন! ঢিল!

—বাবা হাজরাঠাকুর!

সবাই মিলে ব্যাং নদীর খেয়া পার হচ্ছে। উদ্ধব দাস স্ত্রীকে বল্লে—তুই কি পেলি?

পাঁচুদাসী বল্লে—ফল, একটা ষাঁড়া ফল। হাজরাঠাকুরের দয়া গো—

ওর মন ভালো না। ম-ন-জু-লা ফিরে গিয়েছে আগের খেয়ায়। পেয়েছিলো জট-পাকানো চুলের নুড়ি। পুরুতঠাকুর আর একবার বসতে বলেছিলেন আঁচল পেতে। আবারও সেই চুলই পড়েছে তার আঁচলে। পুরুতঠাকুর বলেছেন—মা, আমি কি করবো, আমার ওতে হাত নেই। তোমার অদৃষ্টে সন্তান থাকলে ফুল-ফলই পড়তো—বাড়ি ফিরে যাও মা—কি করবো বলো—

ম-ন-জু-লার কান্না দেখে ওর নিজের চোখেও জল এসেছিল। সত্যি কত আশা করে এসেছিল! হাজরাঠাকুর কি করবেন? যা অদৃষ্টে আছে তাই তিনি বলে দেবেন মাত্র। বেচারী ম-ন-জু-লা! অত টাকা ওদের!

সূর্য অস্ত যাচ্ছে ব্যাং নদীর পশ্চিম গায়ে বনজাম আর হিজল আর বেত ঝোপের আড়ালে। পাঁচুদাসীর মন আনন্দে ভরে উঠলো হঠাৎ। খোকা আসছে, হাতে তার বীজ-বেগুন, কত ক্ষেতে ক্ষেতে শক্ত হাতে সে লাঙল দেবে, বেগুনের চারা তুলে পুঁতবে হাপর থেকে, সোনা ফলাবে মাটির বুকে। বুড়ো হাজরা বলবার আগে স্বপ্ন দেখেছে তার আসবার। সে আসছে।

কথাশিল্প, ১৩৫৩

প্রত্যাবর্তন

কাকীমা তাহাকে গবাক্ষ বলিয়াই ডাকিতেন। গোবিন্দ নামটি উচ্চারণ করিতে তাঁহার নাকি কষ্ট হইত, তাই তিনি শব্দটিকে সরল করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, কি বিদঘুটে নাম বাপু! বেছে বেছে নাম রেখেছেন গো-বি-ন্দ। উচ্চারণ করতে মুখ ব্যথা হয়ে যায়। ভেবেছেন ঐ নামে ডেকে বুঝি ভবনদী পার হয়ে যাবেন। মরে যাই আশা দেখে!

আর মাস্টারেরা তাহার নাম দিয়াছিলেন 'গোবরা', কেন না বুদ্ধি বলিয়াই নাকি কোন পদার্থ হতভাগার মাথায় ছিল না। আহার সারা মাথাটি নাকি গোবরে ভরিয়া ছিল। মাস্টারদের শিক্ষাগুণে আর সকলেই তাহাকে গোবরা বলিতেই শিখিয়াছিল।

সেদিন বিকালে স্কুল হইতে ফিরিয়াই তাহার কাকার ছোট ছেলে চীৎকার করিয়া উঠিল, মা, গোবরা আজ ভয়ানক মার খেয়েছে!

বয়সে সে গোবিন্দের চেয়ে তিন বছরের ছোট হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে বড় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে সে দ্বিধা বোধ করিত। কাকীমা হাসিয়া বলিলেন, তাতে আর আশ্চর্য কি? দুশো বার বলেছিলুম, হতভাগাটাকে ইস্কুলে ভর্তি করে কাজ নেই, তবু যদি এ অভাগীর কথা শুনবে। মাগী মরুক চেঁচিয়ে, ওনার বয়ে গেছে! কথায় আছে না, কানে দিয়েছি তুলো আর পিঠে বেঁধেছি কুলো। ওনারও সেই দশা হয়েছে! কেন মার খেয়েছে রে সেন্টু?

সেন্টু সগৌরবে কহিল, পড়া পারে নি মা। কোন দিনও পড়া পারে না।

সেন্টু ও গোবিন্দ এক ক্লাসে পড়ে।

কাকীমা গম্ভীরকণ্ঠে ডাকিলেন, গবাক্ষ, এদিকে আয়।

বলির পশুর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে গবাক্ষ কাকীমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। কাকীমা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, পড়া পারিস নে কেন রে গবাক্ষ? টাকাগুলো কি খোলামকুচি পেয়েছিস? ইস্কুলের মাইনে, বাড়ীর মাস্টারের মাইনে, আমাদের কি তালুক-মুলুক আছে বাছা? হ্যাঁ, যদি বুঝতুম কিছু হচ্ছে তা হলে নয় এক কথা। তা নয়, এ শুধু ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ!

সেন্টু কহিল, পিঠে বেতের দাগ বসে গেছে মা। জামা তুলে দেখ।

কাকীমা জামা তুলিয়া দেখিলেন। তারপর ধীরে ধীরে রায় প্রকাশ করিলেন, আচ্ছা, উনি আসুন আগে বাড়ী।

মকদ্দমা যেন দায়রায় সোপর্দ হইল।

গোবিন্দ পড়া পারে না সত্য, কিন্তু তাহার পশ্চাতে একটি অতি সত্য নিহিত ছিল।

বাড়ীতে সে পড়িবার সময় পায় না। সারাদিন কাকীমার ফাইফরমাশ খাটিতে খাটিতে তাহার নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় থাকিত না। না বলিবার যো নাই। তাহা হইলে হয়তো বাড়ী হইতে দূর করিয়াই দিবেন তৎক্ষণাৎ। প্রায়ই তো তিনি বলেন, বিদি হয়ে যা, বিদি হয়ে যা ; আর জ্বালাতন করিস নে আমাদের। মাগী একটা ফ্যাচাং দিয়েছে দেখ না!

সেদিন সকালবেলা সবে পড়িতে বসিয়াছে এমন সময়ে কাকীমা আসিয়া তাহাকে একটি আনি দিয়া বলিলেন, ওরে গবাক্ষ, চট করে দুপয়সার চিনি নিয়ে আয় তো। দয়া করে দুটো পয়সা ফিরিয়ে আনতে ভুলিস না যেন। তোর আবার যে ভুলো মন!

গবাক্ষ তখন বাংলা দেশে কয়টি বিভাগ আছে তাহাই মুখস্থ করিতে ব্যস্ত। পড়া না করিলে সতীশবাবু তাহাকে মারিয়া রসাতল করিবেন। আশ্চর্য এই সতীশবাবু! গাঁট্টা মারিতে তিনি অত্যন্ত পটু। প্রথম দিন হইতে তিনি গবাক্ষকে চিনিয়া রাখিয়াছেন। প্রথমেই তিনি চোখ বুজিয়াই ডাকিয়া বসেন, গোবরা, এদিকে আয়।

ঐ ডাক শুনিয়াই গোবিন্দর রক্ত শুকাইয়া যায়। তারপর তিনি হয়তো প্রশ্ন করিলেন, বল, বাংলা দেশের রাজধানী কি? আর সেখানে কি কি দেখবার জিনিস আছে?

এই ভূগোল পড়াটা তাহার কোনদিনই হয় না। সতীশবাবু বলেন, তুই কি প্রতিজ্ঞা করেছিস, পড়বি না? ছেড়ে দে বাবু, ছেড়ে দে!

ভূগোল পড়িবার কথা সকালে, আর প্রতিদিন সকালে তাহার কোন না কোন ব্যাঘাত ঘটিবেই ঘটিবে। সেদিন সে ভূগোল পড়িবার দুর্জয় পণ করিয়া বসিয়াছিল। কাকীমার আনিটা মাটিতে রাখিয়া সে পড়িতে লাগিল, রাজসাহী, চট্টগ্রাম,...

এমন সময়ে নীচ হইতে কাকীমা গর্জন করিয়া উঠিলেন, ওরে ও বিদ্যাসাগর, আর জজ ম্যাজিস্টার হস্‌নে। এদিকে চায়ের জল ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে রে।

অগত্যা তাহাকে বইখাতা গুটাইয়া উঠিতে হইল। চিনি আনিয়াই কিন্তু সে নিষ্কৃতি পাইল না। চিনির পর তাহাকে বাজার যাইতে হইল। কাকীমা বলিলেন, এক পয়সার পলতা আনিস দিকিনি, আলু দেখে কিনবি, কালকের মত যেন পোকা না থাকে, আর গুচ্ছির পাকা ঢ্যাঁড়স আনিস নে যেন, বুঝলি?

বাজার করিয়া ফিরিতেই তাহার বেলা নয়টা হইয়া গেল। কাকীমা হিসাব নিলেন। চারটি পয়সা কম পড়িল। কাকীমা চোখ পাকাইলেন, বলিলেন, বার কর বলছি পয়সা।

গোবিন্দ কহিল, আর তো কোন পয়সা ফেরে নি কাকীমা!

কাকীমা বলিলেন, আর মিছে কথা বলিস নে রে গবাক্ষ। হিসেব শেখাচ্ছিস তুই আমায়? বাজারের পয়সা চুরি! ওমা, আমি কোথায় যাব! বাড়তে বাড়তে তুই যে বেড়ে উঠেছিস! না, আজ আর তোর নিস্তার নেই। ডাক তোর কাকাকে।

গবাক্ষকে আর ডাকিতে হইল না, সেণ্টুই তাহার হইয়া কাজটি করিয়া দিল। কাকীমা বলিলেন, ওগো, দেখ তোমার গুণমণির কীর্তি। ডানা উড়েছে! চুরি শিখেছে! চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা। আজ বাজারের পয়সা চুরি করবে, কাল বাক্স ভাঙবে, পরশু সিন্দুক ভাঙবে। এখন হয়েছে কি! আদরের ভাইপো তোমার ভিটেয় ঘুঘু চরাবে। দোষ যে আমার!

কাকা নিজে হিসাব লইলেন। তথাপি সেই চারিটি পয়সা কম পড়িল। শত চেষ্টা করিয়াও গোবিন্দ ঐ চারিটি পয়সার হিসাব দিতে পারিল না। সহ্যেরও একটা সীমা আছে। কাকা সহ্য করিয়া করিয়া সেই চরম সীমায় সেদিন পৌঁছিলেন। তিনি অকস্মাৎ মুহূর্তের মধ্যে অতিরিক্ত রাগিয়া উঠিলেন। তিনি উকিল। আজ দীর্ঘ বারো বছর ধরিয়া স্থিরভাবে ছোট আদালতে প্র্যাকটিস করিয়াছেন। চুরি জিনিসটার উপর তাঁহার দৃষ্টি সচরাচর সহজেই নিবদ্ধ হয়। তিনি গোবিন্দকে গুটিকয়েক জেরা করিয়া সাব্যস্ত

করিলেন, সে পয়সা চারিটি আত্মসাৎ করিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রাগিলে তিনি ভীষণ হইয়া ওঠেন। তিনি বলিলেন, দেখি তোর ট্যাঁক।

অগত্যা তাহার ট্যাঁক দেখা হইল, কিন্তু পয়সা সেখানে পাওয়া গেল না। তখন কাকীমা হাসিয়া বলিলেন, এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি ওকালতি কর? বলিহারি যাই। ও এত বোকা যে পয়সা তোমার জন্যে ট্যাঁকে রেখে দেবে, না?

কথা-শেষে তিনি হাসিলেন, কাকা আরও জ্বলিয়া উঠিলেন, দুম্‌দাম করিয়া তাহাকে প্রহার শুরু করিয়া দিলেন। কাকার নিকট গোবিন্দ এই প্রথম মার খাইল। কাকাই যা এতদিন তাহাকে সুনজরে দেখিতেন, আজ তিনিও তাহার প্রতি বিরূপ হইলেন। তিনি চীৎকার করিলেন, হারামজাদার জন্যে দুশো দিন আমায় কথা শুনতে হবে। দূর হয়ে যা, দূর হয়ে যা! দুধকলা দিয়ে আমি যেন কালসাপ পুষেছি। দূর করে দিয়ে তবে ছাড়ব!

চীৎকার করিতে করিতেই তিনি অবিশ্রান্ত প্রহার করিতে লাগিলেন। কাকীমা বকিয়া চলিলেন, দোষ দাও যে আমায়, দেখ এবার ভাইপোর গুণ। গোড়াতেই আমি বলেছিলুম ওসব ঝঞ্ঝাট পুষো না—পুষো না। তখন যদি এ দাসীবাঁদীর কথা শোন। মনে রেখো, গরীবের কথা বাসী হলে খাটে।

পরিশেষে কাকা প্রহার করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। গোবিন্দ কিন্তু কাঁদিল না। মারিয়া কাটিয়া ফেলিলেও গোবিন্দ নাকি কাঁদে না। ইহা তাহার ছেলেবেলাকার অভ্যাস। তথাপি সেদিন কিন্তু তাহার মনটা বড় বিষণ্ণ হইয়া গেল। কলিকাতা তাহার নিকট ভাল লাগে না। প্রথম যেদিন তাহার বিধবা মা তাহার কাকাকে কহিলেন, ঠাকুরপো, এখেনে বসে থেকে থেকে তো গোবিন্দ দিন দিন গোল্লায় যাচ্ছে, তুমি যদি নিয়ে যাও তোমার ওখেনে তাহলে ভারী ভাল হয় ভাই। তোমার সেণ্টু মেণ্টুর সঙ্গে ও একটু তাহলে পড়তে পারে। নইলে ওকে এই এতটুকু বয়সেই লেখাপড়া ছাড়াতে হয়! কি করব বল? পেটে খেতে পাই না, তা আবার ছেলেকে বোর্ডিঙে রেখে লেখাপড়া শেখাব! তবে তুমি যদি দয়া কর তা আলাদা কথা।

কাকা রাজী হইয়া গেলেন। গোবিন্দ যেন সেদিন হাতে স্বর্গ পাইল। কলিকাতা তাহার শিশুকালের স্বপ্ন। এই তীর্থস্থান দেখিবার জন্য শিশুকাল হইতে তাহার মনে অদম্য পিপাসা জাগিয়াছে। সেই স্বপ্ন তাহার সফল হইবে। বেশ মনে আছে সেদিন সে যেন হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়াইয়াছিল। সারাদিন গ্রামময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার পরম সৌভাগ্যের কথা ঘোষণা করিয়া মরিয়াছিল। নিঃশব্দে মধ্যাহ্নে ছিপ হাতে সোনা-দীঘির পাড়ে বসিয়া মাছ ধরিতে ধরিতে তাহার সেই কলিকাতার কথা মনে পড়িল। সেই বুড়ো ফণি-মনসার গাছটি তাহার নিকট তখন অতি সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। তাহাকে যেন নতুন করিয়া রঙীন কাচের মধ্যে দিয়া দেখিতে লাগিল। দীঘির ধারে অসংখ্য তালগাছ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাতাস যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। জলের উপর একটি স্পন্দন পর্যন্ত ছিল না। ওপাশে সারি বাঁধিয়া পদ্ম ফুটিয়া ছিল। পদ্মের পাতায় দীঘির কালো জল ঢাকিয়া গিয়াছিল। দীঘির ধার দিয়া দুটি পাতিহাঁস পাশা-পাশি সাঁতার কাটিয়া চলিয়াছিল। দূরে একটি কাঠঠোকরা অবিরত ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছিল। সেদিন বনশোভা দেখিয়া গোবিন্দর চোখ অশ্রুতে ভরিয়া গেল। তাহার ফাৎনা ডুবিয়াছে কি ভাসিতেছে, তাহার ছিপে টান পড়িল কিনা সেদিকে তাহার হুঁশ ছিল না। সে পরক্ষণেই কাপড় দিয়া তাহার অবোধ অশ্রুকণাগুলি চুপি চুপি মুছিয়া ফেলিল। কিন্তু তাহার শহরে যাওয়ার আনন্দ তাহার গ্রাম ত্যাগের দুঃখের চেয়ে গভীর হইয়াছিল।

কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া তাহার দীর্ঘদিনের মধুর স্বপ্ন ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। তাহার মনোরাজ্যের কলিকাতাকে সে ফিরিয়া পাইল না। এখানে আকাশ নাই, বাতাস নাই, সবুজ ঘাস নাই, সন্ধ্যার সূর্যের অগণিত রঙের খেলা নাই। এখানে মানুষ মানুষকে ভালবাসে না। মানুষ মানুষকে হিংসা করে, ঘৃণা করে। এখানে আছে কেবল 'পড়' 'পড়'। উঠিতে বসিতে সর্বক্ষণ সে শুনিতেছে 'পড়' 'পড়'—পড়ার যূপকাষ্ঠে এখানকার সকলেই বলিপ্রদত্ত। এখানকার পাঁচিলঘেরা ক্ষুদ্রপরিসর গৃহকোণে পড়িয়া থাকিয়া বন্দীজীবন কাটাইতে সে সহসা হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়াইবার স্থান এখানে নাই। কলিকাতা তাহার নিকট কারাগার বোধ হইল।

সেদিন স্কুলে গিয়া সে তলাইয়া তলাইয়া অতীতকে দেখিতে লাগিল। সকলেই তাহাকে দূর করিবার জন্য উন্মুখ। এখানে তাহার ঠাঁই নাই। কিন্তু সে পয়সা চুরি করে নাই। আলুওয়ালাই তাহাকে ঠকাইয়া চারিটি পয়সা লইয়াছে। তাহার স্পষ্টবাদী কাকীমার কাছে এই মারাত্মক সত্য স্বীকার করিতে তাহার সাহস হয় না। তাই তাহাকে মিথ্যা মার খাইতে হইল। তারপর স্কুলে সতীশবাবু প্রশ্ন করিলেন, বাংলা দেশে কটা জেলা?

গোবিন্দের মুখে কোন কথা সরিল না। ইতিমধ্যে সে তাহার পাঠ রীতিমত ভুলিয়া গিয়াছে। ভূগোল তাহার চক্ষুর সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল। তাহার ফল স্বরূপ সতীশবাবু তাহার পিঠে দাগ বসাইয়া দিতে ভোলেন নাই। গোবিন্দকে তিনি গাঁট্টা মারিয়া মারিয়া কাহিল হইয়া গিয়াছিলেন। সে কাঁদে নাই। অগত্যা তিনি সেদিন তাঁহার বিখ্যাত গাঁট্টার পরিবর্তে ম্যাপে দেখাইবার লাঠিটা ব্যবহার করিলেন। আরও বলিলেন, ছেড়ে দে বাবা, আমাদের ছেড়ে দে, দেশে গিয়ে চাষবাস করগে!

বাড়ীতে ফিরিতেই কাকীমা তাহাকে আপ্যায়িত করিলেন, মানিক আমার, সোনা আমার, এস। লিখে পড়ে এসেছ, একবাটি দুধ খাও।

সেই প্রথম গোবিন্দ প্রতিবাদ করিয়া বলিল, না, আমি খাব না।

কাকীমাও বলিলেন, ও বাবা! কুলোপনা চক্কর! না খাবি তো আমার ভারী বয়ে গেছে। আমার সাধবার গরজ!

কাকীমা সাধিলেন না, গোবিন্দও খাইতে চাহিল না। সে চুপি চুপি চিলকুঠিতে উঠিয়া গেল। চারিদিক নিঃশব্দ। সন্ধ্যা তখন ঘনীভূত হইয়াছিল। মাথার উপর নক্ষত্রখচিত নীল আকাশ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া রহিল। আকাশের এককোণে একফালি চাঁদ উঠিয়াছিল। তাহার পশ্চাতে একটি বৃহদাকার নক্ষত্র ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। দক্ষিণের উদাস বাতাস ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছিল। গোবিন্দর অনেক কথাই মনে পড়িল। ছেলেবেলা হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক কাহিনীই তাহার স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করিয়া উঠিতে লাগিল। সুখ দুঃখ মিশ্রিত কত ক্ষণস্থায়ী দিনের মনোরম ইতিহাস। দূরান্তর হইতে সেই গ্রামের আহ্বান আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। সেই পাকা সোনার ধানক্ষেত... নিস্তব্ধ সোনাদীঘি, আশেপাশে তালের বন, সবুজ বাঁশের ঝাড়, হলদে পাতায় ভরা বনপথ, মর্মর শব্দ, হাস্যোজ্জ্বল শিমুল গাছ, চিক্কণ পত্রশোভিত তেঁতুল গাছ, সব কিছু মিলিয়া তাহার নিকট অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। সেই যে প্রতিদিন পাঠশালা হইতে ফিরিবার সময়ে পথের ধারের কলকে ফুল হইতে মধু চুষিয়া খাইত সেটিই যেন আজ তাহার নিকট বড় প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইল। তাহার সোনার দেশ, সোনার মাটি। ইছামতীর ধীর কলধ্বনি, দু-একখানি জেলে ডিঙি, সন্ধ্যায় কম্পমান জলের উপর সহস্র সূর্যমূর্তি, নিঃশব্দ প্রকৃতি তাহার নিকট বড়ই মধুর বোধ হইল। তাহার মার কথা মনে পড়িল, সেই স্নেহময়ী জননী। দুঃখিনী কত আশা করিয়াই না তাহাকে শহরে

পাঠাইয়াছিলেন। যদি তিনি ঘুণাক্ষরেও জানিতেন শহর কি বিষাক্ত, কি বিশ্রী, কি বিস্বাদ! মার কথা মনে পড়িতেই গোবিন্দ কাঁদিয়া ফেলিল। অশ্রু আর সে রোধ করিতে পারিল না। আজ তাহার জন্মদিন। ভাদ্র মাসে এক শুক্রবারে তাহার জন্ম। এই দিন মা তাহাকে পরমান্ন রাঁধিয়া দেন, খাইবার সময়ে তাহার সামনে প্রদীপ জ্বালিয়া দেন, শাঁখ বাজান। আজ তাহার জীবনের একটি বিশেষ দিন। ভাদ্র মাসের এই শেষ শুক্রবার। এ বৎসর তাহার জন্মদিন বৃথাই কাটিল। কতদিন সে তাহার মার সংবাদ পায় নাই। তিনি কেমন আছেন তাহা জানিবার জন্য তাহার মন সহসা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সন্ধ্যায় পড়িবার সময় তাহার অতিবাহিত হইতেছে। না, সে আজ আর পড়িতে যাইবে না। সেই তো ছোট ঘরখানিতে বসিয়া চীৎকার করিয়া পড়িতে হইবে। এতটুকু থামিবার অবকাশ নাই, তাহা হইলেই মাস্টারের শাসনদণ্ড। সেই বিশ্রী ট্রান্সলেশন, সেই উৎকট গ্রামের কসরৎ। এসব কিছু তাহার ভাল লাগে না। না, সে লেখাপড়া শিখিতে চায় না। এইরূপ কত কি আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে কখন সে নিজের অজ্ঞাতসারে ঘুমাইয়া পড়িল। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিল তাহা হুঁশ নাই, সে স্বপ্ন দেখিল, সে যেন দেশে ফিরিয়া গিয়াছে। তাহার মা যেন বকিতেছেন, কেন এলি? বেশ তো ছিলি!

তিনি জানেন না তো তাঁহার ছেলে কি সুখে আছে। জানিলে তিনি নিশ্চয় গোবিন্দকে এই মরুভূমিতে পাঠাইয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেন না! তাহার যখন ঘুম ভাঙিল তখন কত রাত্রি তাহা বুঝিতে পারিল না। কেবল এইটুকু বুঝিল, রাত্রি গভীর হইয়াছে। সকলেই যে যার গৃহে নিঃশব্দে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। তাহাকে কেহই পড়িতে বা খাইতে ডাকে নাই। না কাকা না কাকী। এমন সময় নিকটের গীর্জার ঘড়িতে সুর করিয়া পাঁচটা বাজিয়া গেল। গোবিন্দ তাহার চক্ষু মুছিল। ওঃ, রাত্রি তো ভোর হইল প্রায়। এই পাঁচটার পর ছয়টায় তাহাদের দেশের একটি ট্রেন আছে। বাড়ীর কথা মনে পড়িতেই সে সহসা উঠিয়া বসিল। না, সে আর এখানে থাকিবে না। সে এই ছয়টার গাড়ীতেই দেশে ফিরিয়া যাইবে। চুপিচুপি তাহার ছোট্ট ক্যাশ-বাক্সটি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। আসিবার সময়ে এই বাক্সটি তাহাকে তাহার মা দিয়াছিলেন।

সে যখন বাড়ী পৌঁছিল তখন বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছিল। চারিদিকে খররৌদ্র পড়িয়াছিল। ভোরবেলা হয়তো একপশলা বৃষ্টি হইয়াছিল। একটি রাখাল বালক বটের ঝুরি ধরিয়া নিবিড় আরামে দোল খাইতেছিল। পাশ দিয়া একটি গরুর গাড়ী চাকার শব্দ করিতে করিতে চলিয়া গেল। দুটি শালিকপাখী ডাকাডাকি করিয়া মাঠের উপর লুকোচুরি খেলিতে লাগিল।

বাড়ী পৌঁছিয়া দেখিল তাহার মা উনানে আগুন দিতেছেন। ফুঁ দিয়া দিয়া তাঁহার চক্ষু জ্বালা করিতে লাগিল। অজস্রধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তিনি অকস্মাৎ গোবিন্দকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন. জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরে, চলে এলি যে বড়?

গোবিন্দ মার বুকের মধ্যে মাথা গুঁজিল। তারপর বলিল, তোমায় ছেড়ে আমি আর কখ্খনো সেখানে যাব না।

মা তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, তাই হবে বাবা। আমি আর তোমায় হাতছাড়া করছি না। এ কি হয়েছে চেহারার ছিরি!

গোবিন্দ একটি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার মুখ দিয়া আর কোন কথা সরিল না।

দু'দিন থেকে জিনিসপত্র গুছনো চললো। পাড়ার মধ্যে আছে মাত্র তিনঘর প্রতিবেশী—কারো সঙ্গে কারো কথাবার্তা নেই। পাড়ার চারিধারে বনজঙ্গল, পিটুলি গাছ, তেঁতুল গাছ, বাঁশঝাড়, বহু পুরনো আমকাঁঠালের বাগান। দ্রব ঠাকরুণের বাড়ীর চারিধারে বনে বনে নিবিড়, সূর্যের আলো কস্মিন্‌কালে ঢোকে না, তার ওপর বাড়ীর সামনে একটা ডোবা, বর্ষার জলে টইটম্বুর, দিনরাত 'যাঁওকো' 'যাঁওকো' ব্যাঙের একঘেয়ে ডাক, দিনেরাতে মশার বিন্‌বিনুনি।

দ্রব ঠাকরুণের নাতি বল্লে—ঠাক্‌মা, সাবু আছে ঘরে, না বাজার থেকে আনবো?

দ্রব ঠাকরুণের কণ্ঠস্বর অতি ক্ষীণ শোনাল, কারণ আজ দু'মাস কাল তিনি ম্যালেরিয়ায় ভুগছেন—পালাজ্বর, ঘড়ির কাঁটার নিয়মে তা আসবে একদিন অন্তর অন্তর ঠিক বিকেল বেলাটিতে। দ্রব ঠাকরুণ পুরোনো কাঁথা-লেপ চাপা দিয়ে পড়বেন, উঃ আঃ করবেন—জ্বরের ধমকে ভুল বকবেন।

ও বাড়ীর ন'ঠাকরুণ এসে জিজ্ঞেস করবেন জানালার কাছে দাঁড়িয়ে—বলি ও দিদি, অমন করচ কেন? জ্বর এল নাকি?

—আর ন'বৌ। মলেই বাঁচি। নিত্যি জ্বর, নিত্যি জ্বর—ওরে মা রে, হাত-পা কি কামড়ানটা কামড়াচ্চে!...একটু উঠে হেঁটে বেড়াতে দেবে না—এ কি কাণ্ড, হ্যাঁ গা?

পরে মিনতির সুরে বললেন—ও ন'বৌ, নক্ষ্মী দিদি, শীত তো আজ ভাঙলো না, কাঁথা গায়ে দিইচি, নেপ গায়ে দিইচি—তুমি ওই বাঁশের আল্‌নায় পুরনো তোশকটা পেড়ে আমার গায়ে যদি দিয়ে দ্যাও—

—চেপে ধরবো, হ্যাঁ দিদি?

—ধ-রো—ন-বৌ—চেপে ধ-রো—আমার হ-য়ে গেল!

—ভয় কি, অমন ক'রো না, ছিঃ। টেবু আসবে চিঠি পেলেই, কানু আসবে, বিন্দে আসবে—তোমার নাতিরা বেঁচে থাক্, অমন সোনার চাঁদ নাতি সব, ভাবনা কি তোমার দিদি?

—কে-উ—আ-মা-কে—দে-খে-না—ন-বৌ—

—কেন দেখবে না দিদি—সবাই দেখবে। তুমি বেশি বোকো না, চুপটি করে শুয়ে থাকো—

—আমার গো-রু! গো-রু উ-ত্ত-র মা-ঠে—

—কোথায় গোরু দিয়ে এসেছিলে?

—জ-টে গ-য়-লা-র অ-ড়-ল ক্ষে-তে-র পাশে—

—আচ্ছা আমি এনে দেবো এখন গোরু। আমারও গোরু রয়েচে জটে গোয়ালার জমির কাছেই। তুমি শুয়ে থাকো।

আরও ঘণ্টাখানেক পরে বৃদ্ধা ন'ঠাকরুণ আবার এসে জানালায় দাঁড়িয়ে বল্লেন—কম্প থেমেচে দিদি?

ক্ষীণস্বরে লেপ-কাঁথার ছেঁড়া স্তূপের মধ্যে থেকে জবাব এল—গোরু! আমার গোরু তো—

—কোনো ভয় নেই। সে আমি এনেচি। কম্প থেমেচে?

—হুঁ।

সারা বর্ষা দ্রবময়ী এমনি ম্যালেরিয়ায় ভোগেন। তাঁর বড় নাতি শ্রীশচন্দ্র ওরফে টেবু কাজ করে ইছাপুরে বন্দুকের কারখানায়, মেজ নাতি পাকশীতে ই. বি. আর-এ—ছোট নাতিও ওদিকে যেন কোথায় থাকে। বড় নাতি ছাড়া অন্য দুটি অবিবাহিত, বড় নাতির আবার একটি ছেলেও হয়েচে। আজ বছর পাঁচ-ছয় আগে বড় নাতি ছেলে বৌ নিয়ে বাড়ী এসে দিন সাতেক ছিল। নাতবৌ মনোরমা হুগলী জেলার মেয়ে, সে এখানে এসে নাক সিঁটকে থাকে, 'বাড়ী তো ভারি, মোটে একখানা চালাঘর, ছেঁচার বেড়া, এমনিধারা জংগল যে, দিনমানেই বুনো শুওর লুকিয়ে থাকে—মশার তো ঝাঁক। মাগো, কি কাদা ঘাটের পথে! এখানে কি মানুষ থাকে নাকি?' মনোরমার খাঁড়ার মত নাক আরও উঁচু ও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। সাতদিন পরে দ্রবময়ীকে নাতির ছেলে খোকনমণির মায়া কাটাতে হয়। তাঁর চোখের জলে বুক ভেসে যায়।

ন'ঠাকরুণকে বলেন—সুদের সুদ, ও যে কি মিষ্টি তা তোমাকে কি বোঝাব ন'বৌ—

দ্রবময়ীর আকুল ক্রন্দনের মধ্যে যে কত কালের পিপাসিত প্রতীক্ষা সুদূর ভবিষ্যতের দিকে নিষ্পলকে চেয়ে আছে, স্বামীহীনা বন্ধ্যা বিধবা ন'ঠাকরুণ তা বুঝতে না পেরে কেমন অবাক হয়ে যান, হয়তো বা ভাবেন—দিদির সবই বাড়াবাড়ি!

ন'ঠাকরুণ আপনার জন কেউ নয়—পাড়ার পাশের বাড়ীর প্রতিবেশিনী মাত্র। বছরের মধ্যে গড়ে তিন-চার মাস দুই বৃদ্ধার মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যায়, মুখ দেখাদেখি থাকে না—তবুও ঝগড়া কেটে গেলে পাড়ার মধ্যে একমাত্র ন'ঠাকরুণই দ্রবময়ীকে দেখা-শুনো করেন সব চেয়ে বেশি, জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে থাকলে তাঁর গোরুটাও নিজের গোরু দুটোর সঙ্গে মাঠে বেঁধে দিয়ে আসেন, একটু সাবু হয়তো করে নিয়ে আসেন, অন্তত জানালায় উঁকি মেরে দু'একটা কথাও বলেন।

কিন্তু এবার দ্রবময়ী যেন ভুগচেন একটু বেশি।

আষাঢ় মাসের প্রথম থেকে জ্বর শুরু হয়েচে, মাঝে মাঝে প্রায়ই ভোগেন।

শরীর দুর্বল হয়ে পড়েচে—ঘোর অরুচি তার ওপর। পালাজ্বরে ধরেচে আজ মাস-খানেক।

সন্ধ্যার দিকে দ্রবময়ী লেপ তোষক ফেলে ঝেড়ে উঠলেন। পালাজ্বরের কম্প থেমে গিয়েচে। জ্বর যদিও এখনো যায় নি—মুখ তেতো, মাথা ভার, শরীর ঝিম্‌ঝিম্ করচে।

ডাক দিলেন—ন'বৌ, গোরু এনেচ দিদি?

দু'তিনবার ডাকের পর ন'ঠাকরুণ উত্তর দিলেন—কে ডাকে? দিদি? ঠেলে উঠেচ?

—বলি আমার গোরুডো কি এনেচ মাঠ থেকে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। গোরু গোরু করেই ম'লে শেষকালডা? জ্বর ছেড়েচে?

—ছেড়েচে—ছেড়েচে। বলি গোরু কোথায় বেঁধে রাখলে?

—গোয়ালে গো গোয়ালে—ক্ষেপলে যে গোরু গোরু করে—

কেরোসিন তেল একটা টেমিতে একটুখানি ছিল, দ্রব ঠাকরুণ টেমিটা জ্বালালেন। আমড়া গাছে একটা তেড়ো পাখী আর একটা তেড়ো পাখীর সঙ্গে কথাবার্তা কইচে। দ্রব ঠাকরুণের জ্বরতপ্ত মস্তিষ্কে মনে হ'ল পাখী দুটো বলচেঃ—

প্রথম। কুৎলি, কুৎলি—
দ্বিতীয়। ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁ—
প্রথম। কুৎলি, কুৎলি—
দ্বিতীয়। ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁ—
প্রথম। কুৎলি, কুৎলি—

দ্রব ঠাকরুণ বিরক্ত হয়ে উঠলেন। কি একঘেয়ে আওয়াজ রে বাপু! চালাচ্ছে তো

চালাচ্চেই, আধঘণ্টা হয়ে গেল—একে মাথা ধরে আছে, ভালো লাগে? থাম্ না বাপু। মানুষে জানোয়ারে সবাই মিলে পেছনে লাগলে কি করে বাঁচি—

গোহালে গিয়ে দ্রব ঠাকরুণ মুংলি গোরুকে দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা করলেন। মুংলি না খেলে তাঁর খাওয়া হয় না, এই বনজঙ্গলে ঘেরা নির্জন স্বামীর ভিটে আঁকড়ে পড়ে আছেন, সবাই ছেড়ে গিয়েচে তাঁকে, কতক স্বর্গে কতক বা বিদেশে। তাঁর দুই ছেলে, দুই মেয়ে, নাতি, নাতনী—একঘর বড় গেরস্ত, যদি সবাই থাকতো আজ বজায়!

কেউ নেই আজ। মুংলিকে নিয়ে তিনি একা পড়ে আছেন গোপীনাথপুরের ভিটেতে। তাই গোরুটাকে অত ভালোবাসেন, মাঠে বেঁধে দিয়ে বার বার করে দেখে আসেন, নদীতে জল খাওয়াতে নিয়ে যান।

সকালে উঠে দ্রব ঠাকরুণের মনে হ'ল খিদের চোটে তিনি দাঁড়াতে পারচেন না। বাড়ীর পেছনে জঙ্গলের মধ্যে একটা ডুমুর গাছ থেকে ডুমুর পেড়ে আনলেন, দুটো সজনে শাক পাড়লেন উঠোনের গাছ থেকে। ঘাটের পথে মুখুজ্যে গিন্নীর সঙ্গে দেখা। মুখুজ্যে গিন্নীর ছেলে ক'টি লেখাপড়া শেখে নি, গাঁজা খেয়ে বেড়ায়—দ্রব ঠাকরুণের ক'টি নাতি চাকুরে, এজন্যে দ্রব ঠাকরুণের প্রতি তাঁর অন্তরে অন্তরে হিংসে বেশ।

জিজ্ঞেস্ করলেন—জ্বর হয়েছিল নাকি শুনলাম খুড়ীমার?

—হ্যাঁ মা, আজ দুটো ভাত রাঁধবো। তাই সকাল সকাল ঘাটে যাচ্চি—

—আর মা, তোমার থাকতেও নেই—অমন সব নাতি নাতনী থাকতেও তোমার এই দুর্দশা—সবই কপাল!

অর্থাৎ, দুই চাকুরে নাতি আছে বলে তোমার গুমর করবার কিছু নেই। তুমি যে তিমিরে সেই তিমিরে।

নদীর ঘাটে যাবার পথে দুধারে শুধু বন আর বাগান। কোন বাগানে বেড়া দেওয়া নেই, ঘন আশসেওড়া ও বনচালতে গাছের ডালপালা স্নানার্থীদের গায়ে লাগে বলে দু'একজন 'শুচিবাইগ্রস্তা বিধবা পথের নিতান্ত পাশের ডালগুলো হাত দিয়ে ভেঙে ভেঙে রেখেচেন। দ্রব ঠাকরুণ বনের মধ্যে ঢুকে উঁকি মেরে কি দেখচেন, এমন সময় মুখুজ্যেদের সেজ বৌ পেছন থেকে বললে—কি দেখছেন, ও খুড়ীমা?

—এই খয়েরখাগী কাঁঠালগাছটাতে কাঁঠাল আছে কি-না এক আধটা মা—একটা গাছ কাঁঠাল, সব্বনেশেদের জন্যে যদি মা তার কিছু ঘরে উঠলো—নিজে থাকি অসুখে পড়ে—

—কে কাঁঠাল নিলে খুড়ীমা?

—কে নিয়েচে আমি কি চৌকি দিতে গিয়েচি বসে বসে? এই পাড়ার মধ্যেই চোরের ঝাড়—দ্যাখ তোর, না দ্যাখ মোর। সব্বনেশে কলিকালে কি ধম্মো জ্ঞান আছে মা?

—চলুন খুড়ীমা ঘাটে যাই—

দ্রব ঠাকরুণ বকতে বকতে ঘাটের দিকে চলেন। স্নান সেরে এসে দুটো আলোচাল ফুটিয়ে ডুমুরের চচ্চড়ি করে ভাত বেড়ে নিয়ে খেতে বসেচেন এমন সময় দেখলেন বাড়ীর পেছনে কাগজী লেবু গাছটার তলায় কি খস্ খস্ শব্দ হচ্চে।

দ্রব ঠাকরুণ হাঁক দিলেন—কে রে নেবুতলায়?

ক্ষীণ বালিকাকণ্ঠে উত্তর এল—এই আমি কনক, ঠাকুমা—

—কেন, ওখানে কি শুনি? কি হচ্চে ওখানে? বের হয়ে আয় ইদিকে, সামনে আয়।

একটি ম্যালেরিয়াশীর্ণ এগারো বছরের বালিকামূর্তি অকুণ্ঠপদবিক্ষেপে লেবু ঝোপের আড়াল থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে উঠোনে এসে দ্রব ঠাকরুণের ক্রুদ্ধ-দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়ালো।

—এই আমার মার মুখে অরুচি—কিছু খেতে পারে না, তাই গিয়ে বল্লে—যা তোর

ঠাকুরমার নেবুগাছ থেকে একটা নেবু—

দুব ঠাকরুণ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বল্লেন—হ্যাঁ যা--তোর বাবা নেবু গাছ পুঁতে রেখে গিয়েচে, যা তুলে নিয়ে আয় গিয়ে! যত সব চোর ছ্যাঁচড় নিয়ে হয়েচে--তোর মার অরুচি, তা হাটে নেবু কিনতে পারিস নে? এখানে কি? তোর বাবার গাছ আছে এখানে?

বালিকা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

দুব ঠাকরুণ আপনমনে বকে যেতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পরে বালিকা ভয়ে ভয়ে বল্লে—ও ঠাকুরমা—

—কি রে? কি?

—আমি চলে যাব?

—কেন, তোকে কি বেঁধে রেখেচি নাকি? যা—

—নেবু দেবেন না?

দুব ঠাকরুণ চুপ করে আপনমনে বড় বড় কয়েকটি ভাতের গ্রাস মুখে পুরে দিলেন, বাঁ হাতে ঘটি নিয়ে ঢক্ ঢক্ করে খানিকটা জল খেয়ে অপেক্ষাকৃত নরমসুরে জিজ্ঞেস করলেন—তোর পরনের কাপড় কাচা? ঐ কলসীটা থেকে আমায় একটু খাবার জল গড়িয়ে দে দেখি—

মেয়েটি তাই করল। দুব ঠাকরুণ বল্লেন—অরুচি কেন? তোর মার কি ছেলেপিলে হবে নাকি?

—তা তো জানিনে ঠাক্‌মা।

—যা, নিয়ে যা—তবে একটার বেশি নিবি নে—বুঝলি?

দুব ঠাকরুণ খেয়ে উঠে মাদুর পেতে একটু শুয়েচেন, এমন সময় মুখুজ্যে বাড়ীর বড় ছেলে অতুল এসে বল্লে—ও ঠাক্‌মা. শুয়েচেন নাকি?

—হ্যাঁ, কে? অতুল? কি ভাই?

—আপনার পিটুলি গাছ আছে? কলকাতা থেকে দেশলাইয়ের কারখানার লোক এসেচে গাঁয়ের পিটুলি আর শিমুল গাছ কিনতে। আপনার যদি থাকে—বেশ দর দিচ্চে—

—না বাপু, আমার নেই।

—কেন. আপনার বাড়ীর পেছনে হরি রায়ের দরুণ জংগলে তো বেশ বড় বড় পিটুলি গাছ আছে—

—না, আমি বেচবো না।

আসলে দুব ঠাকরুণের গাছপালার ওপর বড় মায়া, স্বামীর আমলের যা কিছু যৎ-সামান্য জমিজমা, তা প্রায়ই জংগলাবৃত এবং বড় বড় বাজে গাছে ভর্তি। জ্বালানি কাঠ হিসেবে বিক্রী করলেও এ কয়লার দুর্মূল্যতার দিনে দু' পয়সা পাওয়া যায়, কিন্তু গাছের একটা ডাল কাটতেও তাঁর মায়া। না খেয়ে কষ্ট পাবেন, তবুও গাছ বিক্রীর কথা তুলতেও দেবেন না। একজনের শুঁয়োপোকা লাগাতে সে ডুমুরপাতা পাড়তে এসেছিল. কারণ ডুমুর পাতা দিয়ে শুঁয়ো-লাগা জায়গাটা ঘষলে শুঁয়ো ঝরে যায়, কিন্তু দুব ঠাকরুণ তাকে ডুমুর পাতা পাড়তে দেন নি। হয়তো এটা অতিরঞ্জিত গল্প মাত্র. তবে এর দ্বারা তাঁর মনের অবস্থা অনেকটা বোঝা যাবে।

বৈকালের দিকে দুব ঠাকরুণ বেশ ভালোই বোধ করলেন। পাড়ার এক প্রান্তে জংগলে ঘেরা বাড়ী, বড় কেউ এদিকে বেড়াতে আসে না, এক নঠাকরুণ ছাড়া কেউ উঁকি মেরে বড় একটা দেখে না, দুব ঠাকরুণ কিন্তু লোকজন. আড্ডা. মজলিস প্রভৃতি ভালোই বাসেন। কেউ এসে গল্প করে, এটা তাঁর খুবই ইচ্ছে—কিন্তু ও বেলার সেই বালিকাটি ছাড়া বিকেলে আর কেউ এল না। সেও এসেচে নিজের স্বার্থে।

—ঠাকুরমা, একটা নেবু দেবেন?

—কেন রে, কেন? ওবেলা তো—

—ওবেলার নেবু ওবেলা ফুরিয়েচে, এবেলা একটা দরকার—মা বল্লে—

—আচ্ছা, আয় উঠে বোস একটু—

বালিকাটি অনিচ্ছাসত্ত্বেও এসে বসে। নয়তো লেবু পাওয়া যায় না। বুড়ীর কাছে বসতে তার ইচ্ছে হয় না, তার সমবয়সী বালিকারা রায়পাড়ার পুকুরধারে এতক্ষণ ফুল তোলাতুলি খেলা আরম্ভ করে দিয়েচে...তার প্রাণ রয়েচে সেখানে পড়ে। কিন্তু দ্রব ঠাকরুণের নিঃসঙ্গ মন যাকে আঁকড়ে ধরতে চায় এই নির্জন বৈকাল বেলাটিতে...তবুও দুটো কথা বলবার লোক তো বটে।

দ্রব ঠাকরুণ আপন মনেই বকে চলেচেন, নাতবোয়ের মন্দ ব্যবহারের কথা, নাতির ছেলে খোকনের অলৌকিক গুণাবলী, ছোট নাতি পরেশ তাঁকে কি রকম ভালোবাসে...এই ধরণের নানা কথা শুনতে শুনতে ক্ষুদ্র শ্রোতাটির হাই ওঠে, সে করুণ স্বরে বলে—ঠাকুমা, মা সাবু চড়িয়ে আমায় বল্লে, নেবু নিয়ে আয়, বেলা গেল—

—হ্যাঁ হচ্চে হচ্চে—তারপর শোন্ না...

—মা বক্‌বে—নেবু নইলে সাবু খেতে পারবে না—

—আচ্ছা, শোন্—তারপর খোকন্মণি সেই পেয়ারা তো খাবেই, কিছুতেই ছাড়ে না—ওর মাও দেবে না—বড্ড হেজলদাগড়া মেয়ে ওর মা, আমি বলি, বৌ—চাচ্চে খেতে, এক টুকরো ওকে দ্যাও—তা আমায় বললে—আপনি চুপ করে থাকুন, আপনি কি বোঝেন ছেলেমেয়ে মানুষ করার—একালের মাও অন্য রকম, আপনাদের সেকাল গিয়েচে। ...আমি জানিনে ছেলেমেয়ে মানুষ করতে—তবে তুই তোর বর পেলি কোথা থেকে রে আবাগের বেটি?

—আমি এবার যাই ঠাক্‌মা—নেবু একটা—

—আচ্ছা তা যা নিয়ে একটা নেবু—শুনলি তো সব কাণ্ডখানা? দিদিশাশুড়ী বড় মন্দ—

এমন সময়ে বাড়ীর বাইরে একখানা গোরুর গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। খুকী, কৌতূহলে চোখ বড় বড় করে বল্লে—ও ঠাক্‌মা, কে যেন এল গাড়ী করে—তোমার ওই তুঁত-তলায় গাড়ী দাঁড়ালো—

বলতে বলতে দ্রব ঠাকরুণের মেজ নাতি নীরদচন্দ্র দুটি ভারী মোট দু'হাতে ঝুলিয়ে বাড়ী ঢুকে ডাক দিলে—ও ঠাক্‌মা—

দ্রব ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে একগাল হেসে বল্লেন—কানু? আয়, আয় ভাই—ভালো আছিস্?

কানু এসে মোট নামিয়ে পিতামহীকে প্রণাম করলে, বালিকাটির দিকে চেয়ে বল্লে—এ হরিকাকার মেয়ে কনক না? ওঃ কত বড় হয়ে গিয়েচে—ভালো আছিস কনকী? নে দাঁড়া—একখানা গজা নিয়ে যা—

পুঁটুলি খুলে মেয়েটির হাতে একখানা বড় গজা দিতে সে নিঃশব্দ হাসিমুখে হাত পেতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, বড় মোটটার মধ্যে আরও কি কি জিনিস আছে দেখবার আগ্রহে। তাদের বাড়ীতে এমন কেউ নেই যে বিদেশে চাকুরি করে—নিতান্তই অল্পবিত্ত গৃহস্থের সংসার—চাকুরে বাবুরা বাড়ী আসবার সময় কি কি অপূর্ব জিনিস না-জানি নিয়ে আসে!

দ্রব ঠাকরুণ জিজ্ঞেস করলেন—তারপর, কি মনে করে? হঠাৎ যে বুড়ীকে মনে পড়েচে তা হোলে? বাবাঃ, সারা আষাঢ় মাস অসুখে ভুগে ভুগে—তাই এখনও কি সেরেচি।

এমন একটা লোক নেই যে, এক ঘটি জল এগিয়ে দ্যায়—ওই ন'বৌ ছিল তাই—এত চিঠি দিলাম, না এল টেবু, না এল বিন্দে, না এলে তুমি—

সন্ধ্যার পরে নঠাকরুণ খবর পেয়ে ছুটে এলেন। গ্রামের ছেলে, জন্মাতে দেখেছেন, অনেক দিন পরে দেখে খুব খুশি। কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞেস করার পর বল্লেন—হ্যাঁ কানু, তা তোমরা সোনার চাঁদ সব নাতি থাকতে বুড়ী এখানে বেঘোরে মারা যাবে? পালা-জ্বরে ধরেচে—এই আজ ভালো আছে, কাল এমন সময় লেপ-কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়বে। কে দ্যাখে, কে শোনে—তার ওপর আবার গোরু—একটা বিহিত করে যাও যা হয়—নইলে—

কানু বল্লে—সে সব জন্যেই তো আসা। চিঠি পেয়েচি অনেক দিন, সায়েব ছুটি দিতে চায় না—পরের চাকরি—তাই দেরি হোল।

দুব ঠাকরুণ বল্লেন—ভালো কথা, ও ন'বৌ, দুখানা গজা নিয়ে যাও, জল খেয়ো—কানু এনেচে আমার জন্যে—তা ও যেমন পাগল, আমার কি দাঁত আছে যে গজা খাবো? নিয়ে যাও ন'বৌ।

—তা দ্যাও দুখানা, নিয়ে যাই। ভালোটা মন্দটা এ পাড়াগাঁয়ে তো চক্ষেই দেখতে পাইনে দিদি—বেঁচে থাক্ তোমার সোনার চাঁদ নাতিরা, তোমার ভাবনাটা কিসের? বিশেষ করে কানুর মত ছেলে নেই এ গাঁয়ে—আমি যা বলবো তা মুখের ওপরেই বলবো বাপু—

ফলে ন'বৌ দুখানার জায়গায় চারখানা গজা হাতে খুশি মনে বাড়ীর দিকে চল্লেন আর কিছুক্ষণ পরে।

নাতি-ঠাকুরমার পরামর্শ হ'ল রাত্রে। কানু এক মতলব ফেঁদে এসেচে। ঠাকুরমাকে সে কাশী নিয়ে গিয়ে রেখে আসবে। তার একজন কে বন্ধুর মা কাশীতে থাকেন, সেই একই বাড়ীতে ঠাকুরমাকে রাখবে। পরদিন সকালে ন'বৌ শুনে খুব খুশি, অমন সব নাতি থাকতে ভাবনা কি? তীর্থধর্ম করার সময়ই তো এই। তাঁর যদি আজ ছেলেটাও বেঁচে থাকতো।

আজ প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে সাত মাস বয়সে নঠাকরুণের সে ছেলে মারা গিয়েচে—সেই প্রথম, সেই শেষ। তাঁর আর ছেলেপুলে হয় নি।

যাবার দিন দুব ঠাকরুণ প্রিয় মুংলি গোরুটার ভার দিয়ে গেলেন ন'বৌকে। বার বার মাথার দিব্য দিলেন, মুংলিকে যেন যত্ন করা হয়। বল্লেন—ও গোরু তোমারই হয়ে গেল ন'বৌ, আমায় আশীর্বাদ করো যেন কাশীতে হাড় ক'খানা রাখতে পারি—নাতিদের ঘাড়ের বোঝা যেন নেমে যাই—আমার বড় নাতির ভাবনা কি, তার সচ্ছল অবস্থা, লুচি পরটা জলখাবার, তেল ঘিয়ে কলকলে করে পাঁচ ব্যান্নুন রান্না—আমি বুড়ী হয়েচি, ওদের সংসারে সেকেলে মতের লোকের জায়গা আর হয় না এখন—

ঘরের আড়ায় শুকনো নারকোল পাতার আঁটি, পাকাটির বোঝা যোগাড় করা ছিল, বর্ষায় উনুন ধরানোর কষ্ট বলে সুগৃহিণী দুব ঠাকরুণ যে-সময়ের-যা সঞ্চয় করে রাখতেন। কাশীবাস করতে যাচ্ছেন, পেছনটান থাকলে তীর্থবাস হয় না—সে সব দান করে গেলেন কতক ন'ঠাকরুণকে, কতক একে ওকে।

কনক একটা পাকা শসা হাতে এসে বল্লে—শসা খাবে ঠাক্মা?

—তুই এক বোঝা পাকাটি নিয়ে যা কনকী—ঠাক্মাকে মনে রাখবি তো? হ্যাঁ-রে?

কনক অনেকখানি ঘাড় নেড়ে বল্লে—হুঁ-উঁউ—

ন'ঠাকরুণ চোখের জল ফেললেন যাবার সময়ে।

দ্রব ঠাকরুণ ট্রেনে কোনো রকমে শুচিতা বজায় রেখে কাশী এসে পৌঁছুলেন। একটা গলির মধ্যে দোতলা একটা বাড়ীর নীচের তলার ঘরে কানুর সেই বন্ধুর মা কাশীবাস করচেন। পাশেই আর একখানা ছোট ঘর ভাড়া নেওয়া হয়েছে দ্রব ঠাকরুণের জন্যে। অপর বৃদ্ধাটির কাছে চাবি ছিল ঘরের, তিনি চাবি খুলে দিলেন। দ্রব ঠাকরুণ নিজের জিনিসপত্র নিয়ে সেই ঘরে অধিষ্ঠান হোলেন।

দ্রব ঠাকরুণ ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সভয়ে আবিষ্কার করলেন, তাঁর প্রতিবেশিনী নদে' জেলার লোক। কথাবার্তার ধরণ ও সুর শহুরে ও সম্পূর্ণ মার্জিত। যশোর জেলার মানুষ দ্রব ঠাকরুণের ভয় পাবারই কথা বটে। তিনি এসে দ্রব ঠাকরুণের ঘরে ঢুকে বল্লেন —আপনার রান্নাবান্নার ব্যবস্থা কাল থেকে করলেই হবে—আজ আমার ঘরে দুধ আর মিষ্টি আছে, আপনার জন্যে রাখলুম কিনা।

দ্রব ঠাকরুণ ভয়ে ভয়ে বল্লেন—ও!

প্রতিবেশিনী নিজের ঘর থেকে খাবার এনে বল্লেন—আপনার লোমবস্ত্র বার করুন—

দ্রব ঠাকরুণ ভালো বুঝতে না পেরে বল্লেন—কি বল্লেন?

দ্রব ঠাকরুণ 'বল্লেন' এই কথায় 'ব'-এর উচ্চারণ যশোর জেলার উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী প্রসারিত উচ্চারণ, প্রতিবেশিনী বৃদ্ধার উচ্চারণে এই সব স্থানের উচ্চারণ যতদূর সম্ভব আকুঞ্চিত। 'বল্লেন'-এর উচ্চারণ 'বোল্লেন'—'ও' কার-এর উচ্চারণও যতদূর সম্ভব ঘোরালো।

—বোলচি, লোমবস্ত্র বের করে পরুন, একটু কিছু মুখে দিতে হবে তো?

লোমবস্ত্র কি জিনিস, পাড়াগাঁয়ের মানুষ দ্রব ঠাকরুণ কখনো শোনেন নি—তবে জিনিসটা যে বস্ত্রজাতীয় দ্রব্য তা বুঝতে পারলেন, বল্লেন—সে তো আমার নেই!

—লোমবস্ত্র নেই? আপনি জপ করেন কি পোরে?

—এই সাদা থান প'রেই জপ করি, আর কোথায় কি পাবো?

বাড়ীখানা গলির মুখে হ'লেও প্রায় সদর রাস্তার ওপরে। অনেক রাত পর্যন্ত গাড়ী-ঘোড়া রাস্তার গোলমাল থামে না। নিরিবিলি বনজঙ্গলের মধ্যে বাড়ীতে একা থাকা দ্রব ঠাকরুণের চিরদিনের অভ্যাস, এত গোলমালে বড়ই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন তিনি। উঃ, কি মুস্কিলেই পড়া গেল! নাঃ, কাশীর লোক ঘুমোয় কখন?

কানু তার পরদিন বন্ধুর মা'র হাতে পল্লীবাসিনী পিতামহীকে সমর্পণ করে কর্মস্থানে চলে গেল, তার ছুটি ফুরিয়েচে। বন্ধুর মার নাম নীরজাবাসিনী, দ্রব ঠাকরুণের চেয়ে তাঁর বয়স দু'পাঁচ বছর কম হবে, মাথার চুল এখনও পাকে নি—তবে সেটা স্বাস্থ্যের গুণেও হতে পারে।

দ্রব ঠাকরুণ এর সঙ্গে দশাশ্বমেধ ঘাটে বিকেলে বেড়াতে গেলেন—খুব লোকজনের ভিড়, গান, বক্তৃতা, কথকতা। এক গেরুয়া কাপড় পরা সন্নিসির চারিপাশে খুব ভিড়, নীরজা সেখানে জুটলেন গিয়ে। কর্মবাদ, সেবাধর্ম ইত্যাদি নিয়ে সন্নিসি কি সব কথা বলে যাচ্ছেন, দ্রব ঠাকরুণ অতশত বুঝতে পারলেন না। ফিরবার পথে দ্রব ঠাকরুণ জিজ্ঞেস করলেন—উনি কেডা?

—উনি রামকৃষ্ণ মঠের একজন বড় ইয়ে—স্বামী সেবানন্দ।

—কি মঠ?

—কেন, রামকৃষ্ণ মঠের কথা শোনেন নি? ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের—মস্ত বড় কাণ্ড ওঁদের—

—রাম আর কৃষ্ণ দুই ঠাকুরের নামে বুঝি?

নীরজা বিস্ময়ে দ্রব ঠাকরুণের দিকে চেয়ে বল্লেন—আপনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের

নাম শোনেন নি?

—না। কে তিনি—কই না—এখানে আছেন?

নীরজা আর কোন কথা বল্লেন না। এমন বর্বরের সঙ্গেও তিনি বেড়াতে বেরিয়েছেন যে রামকৃষ্ণদেবের নাম পর্যন্ত জানে না। দ্রব ঠাকরুণের কোনো দোষ নেই, তিনি অজ্ঞ সেকেলে লোক, অজ পল্লীগ্রাম ছেড়ে জীবনে কখনো কোথাও যাননি। গোপীনাথপুরের জঙ্গলে ও-নাম কখনো কারো মুখে শোনেনও নি। তিনি জানেন, রাম, কৃষ্ণ, রাধা, দুর্গা, লোচনপুরের জাগ্রত কালী, কালীঘাটের কালী ইত্যাদি। অতবড় কোনো ঠাকুরের কথা কই—কেউ তো তাঁকে বলে নি?

দ্রব ঠাকরুণ ভয়ে ভয়ে থাকেন। তাঁর সঙ্গিনী তাঁকে নিতান্ত নাস্তিক, অজ্ঞ, মুর্খ বলে না ঠাওরান।

দিন কয়েক যেতে না যেতেই দ্রব ঠাকরুণ বুঝে নিলেন সঙ্গিনীটি ধর্মবাতিকগ্রস্তা। সাধু-সন্নিসির ভক্ত। যদি কোথাও নতুন ধরণের সাধু মন্দিরে কি ঘাটে বসে আছে, তবে আর নিস্তার নেই। সেখানে বসে অমনি গরুড়ের মত হাত জোড় করে বক্‌বক্ বকুনি জুড়ে দেবে। আর কি-সব জিজ্ঞেস করবে, কর্মফল কি, পুনর্জন্ম কি হেনো তেনো। রাস্তা-ঘাটে বেরুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়, বাসায় ফেরবার নামটি নেই। এত বিরক্ত ধরে দ্রব ঠাকরুণের—কিন্তু তিনি কি করবেন? কাশীর রাস্তা চেনেন না—একাও বাসায় ফিরতে পারেন না সঙ্গিনী না ফিরলে।

একদিন বিশ্বনাথের মন্দিরে সন্ধ্যার আরতি দেখতে গেলেন দুজনেই।

সেখানে এক সন্ন্যাসিনী নাটমন্দিরে বসে আছেন, গেরুয়া কাপড় পরনে, মাথায় জটা, অনেক মেয়েছেলের ভিড় হয়েচে সেখানে। নীরজা তো সাধু-সন্ন্যাসী দেখলে সর্বদা এক-পায়ে খাড়া, চারিপাশের ভক্তের দলে গেল মিশে তাঁকে নিয়ে। দ্রব ঠাকরুণ শুনতে লাগলেন কেউ জিজ্ঞেস করচে, মাইজি, ঠাকুরের দেখা পাওয়া যায়?

কেউ বলচে—মাইজি, আমার মেয়ের মাদুলি দেবেন তো আজ?

—আজ আমার হাতখানা দয়া করে দেখবেন কি?

নীরজা জিজ্ঞেস করলেন—মাইজি, আমার ভক্তি হচ্ছে না কেন?

দ্রব ঠাকরুণ শুনে মনে মনে হেসে আর বাঁচেন না। সর্বদা সাধুসন্নিসি নিয়েই আছো, এখানে প্রণাম, ওখানে ধন্না, দু'ঘণ্টা ধরে নাক টেপা—এতেও যদি তোমার ভক্তি না হয়ে থাকে, গঙ্গার জলে ডুবে মরো গিয়ে—ঢং দেখে আর বাঁচি নে! মরণ আর কি!

তারপর সবাই চলে গেল—নীরজা সেই যে সেখানে চোখ বুজে ধ্যানে না কি যোগে বসলো আর ওঠে না। দ্রব ঠাকরুণও কিছু বলতে সাহস পান না। এদিকে তাঁর মনে পড়লো সুজি একদম নেই, সেকথা এতক্ষণ মনে ছিল না, এত রাত হয়ে গেল কোথায় বা সুজি কেনা হবে। রাত্রে একটু মোহনভোগ খাওয়া, তাও আজ ধর্মের ভিড়ে বুঝি বা হয় না।

বসে বসে দ্রব ঠাকরুণ বিরক্ত হয়ে উঠলেন। মন্দির থেকে বাঙালী মেয়েরা প্রায় সব চলে গিয়েচে, এদেশী লোক যারা হিন্দি মিন্দি বলে, তাদের দলই যাচ্ছে আসচে। কি জানি ওদের কথা তিনি কিছুই বুঝতে পারেন না, বলতেও পারেন না।

আজ মাস তিনেক গ্রাম থেকে এসেচেন। বেশ শীত পড়ে গিয়েচে কাশীতে। মুংলি গোরুটার কথা এত করেও আজকাল মনে পড়চে! শীতের রাত্রে পাছে মুংলির কষ্ট হয় বলে তিনি গোয়ালে আগুন করে রাখতেন। তাঁর গাছটাতে খুব ডুমুর হয়েচে নিশ্চয়, কে জানে একটা গাছ ডুমুর কারা খাচ্চে? কম ডুমুর হয় গাছটাতে! আহা, ন'বৌ কি

মুংলিকে অত যত্ন করচে?—তাঁর মত? তিনি যে পেটের মেয়ের মত...না, তাঁর চোখে জল এসে পড়ে।

আজই এতকাল পরে ন'বৌয়ের পত্র এসেচে দেশ থেকে...তাই বেশি করে মনে পড়চে দেশের কথা। ন'বৌ লিখেচে মুংলি ভালো আছে, শীগগির বাছুর হবে। তাঁর বাড়ীর দাওয়ার খুঁটি না বদলালে নয়। কানু বা বিন্দেকে যেন চিঠি লেখা হয় সেজন্যে।

নীরজা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ধ্যান ভংগ করে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন—দিদি, চলো যাই ...সত্যি কি পবিত্র স্থান, না? ইচ্ছে হয় না যে আবার সংসারে ফিরে যাই, রাঁধি খাই।

দ্রব ঠাকরুণ মনে মনে বল্লেন—মরো না এখানে শুকিয়ে হত্যে দিয়ে—কে মাথার দিব্যি দিয়েছে রাঁধতে খেতে!

নীরজা বল্লেন—করন্যাসটা অভ্যেস করচি কি না, প্রায় হয়ে এল—

দ্রবময়ী নীরব। মাগীটা পাগল নাকি? কি সব বলে বোঝাও যায় না। রাত দুপুর বাজলো, বাবা, এখন বাসায় চল্ দিকি!

বাসায় এসেও কি তাই নিস্তার আছে?

নীরজা ডাকবেন তাঁর ঘর থেকে—ও দিদি, একটু গীতাপাঠ কবি শোনো—

নিতান্ত অনিচ্ছার সংগে তাঁকে যেতে হয়। গীতা-টীতা ওসব তিনি বোঝেন না। সুবচনীর ব্রতকথা, সত্যনারায়ণের পাঁচালী, শিবরাত্রির ব্রতকথা এসব শোনা তাঁর অভ্যেস আছে, বেশ দিব্যি বুঝতেও পারেন—এসব শক্ত শক্ত কথার কি কাণ্ডমাণ্ড, এক বর্ণও যদি তিনি বোঝেন। আর মাগীর চোখ উল্টে, কান্না কান্না মুখের ভাব করে পড়বার ভঙ্গিই বা কি! দ্রব ঠাকরুণ না পারেন হাসতে, না পারেন হাসি চাপতে। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে গা!

নীরজা পড়তে পড়তে বলবেন—আহা-হা! কি চমৎকার!

দ্রব ঠাকরুণ বসে ঢুলতে ঢুলতে ভাববেন—থামলে যে বাঁচি—

সকালে উঠে নীরজা বল্লেন—আজ আমার গুরুদেব আসবেন, দিদি দুখানা লুচি ভেজে দিও তো আমার ঘরে বসে।

বেলা দুটোর সময় এক সন্নিসি এসে হাজির। বেশ মোটা ভুঁড়িওয়ালা, এই লম্বা দাড়ি। নীরজা সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করে দু'বার মাথা ঠুকলেন গুরুদেবের পাদপদ্মে। আহারাদির যোগাড় করতেই কাটলো সারাদিন—তিনসের দুধ মেরে একসের হ'ল, ঘরে রাবড়ি মালাই তৈরি হ'ল। লুচি ভাজা হ'ল। সন্ধ্যার সময় নীরজা বসলেন গুরুর কাছে কি সব ক্রিয়া শিখতে। আসন না মাথামুণ্ডু তাই শিখতে। যত বা এ বকে, তত বা ও বকে। মনে হ'ল বুঝি কানের পোকা সব বেরিয়ে যায়।

গুরুদেব বাঙালী। রাত ন'টার পরে দ্রব ঠাকরুণকে ডাক দিলেন।

বল্লেন—তোমার বাড়ী কোথায়?

—গোপীনাথপুর, যশোর জেলা—

—কে আছে বাড়ীতে?

—নাতিরা আছে, তাদের ছেলে বৌ আছে।

—তুমি কাশীবাস করতে এসেচ?

—হ্যাঁ।

—নাম কি?

—দ্রবময়ী দেব্যা—

—দীক্ষা হয়েচে?

—না।

নীরজা চোখ কপালে তুলে বল্লেন—কি সর্বনাশ! দীক্ষা হয়নি এতদিন? তা তো জানতাম না?

গুরুদেব বল্লেন—দীক্ষা নিতে হবে মা তোমাকে।

—আমার পয়সা নেই, দীক্ষা নিতে গেলে খরচ আছে। নাতিরা এগারো টাকা করে মাসে পাঠায়—তার মধ্যে ঘর ভাড়া, তার মধ্যে খাওয়া। পয়সা পাই কোথায়?

—দীক্ষা না নিলে কাশীবাসে ফল কি মা?

—ফলের জন্যে তো আসিনি, শরীরডা সারাতি এসেছিলাম।

নীরজা রাগের সুরে বল্লেন—শরীর আগে না পরকাল আগে?

দ্রব ঠাকরুণ চুপ করে রইলেন।

গুরুদেব বল্লেন—নীরজা-মার কথার উত্তর দাও—চুপ করে থাকলে হবে না।

নীরজা বল্লেন—গীতার ভক্তিযোগ সেদিন পড়ছিলাম, শুনলে তো দিদি? কর্মের চেয়েও ভক্তি বড়, স্বয়ং ভগবান বলচেন—

আঃ কি বিপদ! মাগীর সব সময়েই কি আবোল-তাবোল বকুনি?

মুখে বল্লেন—আমি তো কিছু বুঝি নে, আপনারা যা বলেন। তবে এবার কিছু হবে না। নাতি সাতটাকা পাঠিয়েছিল, তা ঘর ভাড়াতেই গিয়েচে। হাতে টাকা না থাকলি—

তবুও দুজনই নাছোড়বান্দা। দীক্ষা নিতেই হবে।

গুরুদেব বল্লেন—কাশীবাস করচো মা, তোমার যথেষ্ট বয়েস হয়েচে। গুরুদীক্ষা না নিলে যে সবই মাটি। আজ আছ, কাল নেই। পৃথিবী কিছুই না—ইহকাল কিছুই না—

নীরজা বল্লেন—গুরুর মুখেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ইহকালেও তিনি, পরকালেও তিনি—

দ্রব ঠাকরুণ মনে মনে বল্লেন—আ মরণ মাগীর! তবে সোয়ামী কোথায় যাবে মেয়েদের? ঢং দ্যাখো না—! যাই হ'ক, বহু তর্ক করেও দ্রব ঠাকরুণকে দ্রব করা গেল না। নাম দ্রবময়ী হ'লে কি হবে, ভেতরে বেজায় শক্ত। নীরজা অবিশ্যি তাঁর জ্ঞান বুদ্ধি মতে এক-জন সত্তর বছরের মৃত্যুপথযাত্রিণীর ভালো করবারই চেষ্টা করছিলেন, সে রাজী না হ'লে তিনি আর কি করবেন?

নীরজার ভক্তি—হ্যাঁ, সে দেখবার মত একটা জিনিস বটে। গুরুর পাদোদক পান না করে তিনি দাঁতে তৃণ কাটবেন না। গুরুর বাক্য বেদবাক্যের চেয়েও মূল্যবান তাঁর কাছে। পুরনো একছড়া সোনার হার ছিল, সেটা বিক্রি করে এসে টাকা তুলে দিলেন গুরুদেবের হাতে।

কথাটা শুনে দ্রব ঠাকরুণ জিজ্ঞেস করলেন—অতগুলো টাকা দিয়ে দিলে গুরুদেবকে?

—টাকা সার্থক হ'ল, দিদি—

—তোমার নিজের হার?

—ও আমার বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ী থেকে দিয়েছিল—তিনি হাতে করে দিয়েছিলেন—

—সেই হার তুমি দিয়ে দিলে বেচে?

—দিদি, সংসার অনিত্য, সবই অনিত্য। কে কার স্বামী, কে কার স্ত্রী? সবই ভগবানের মায়া। মায়ায় সব ভুলে থাকা—গুরুই কেবল নিত্য বস্তু।

—তা তো বটে।

এ মাগীর মুখে সব সময় বড় বড় কথা। দিগে যা তোর সব কিছু গুরুর পাদপদ্মে বিলিয়ে,—তাঁর কি? বিয়ের পরে স্বামী নিজের হাতে যে হারছড়া দিয়েছিল, তা কোনো মেয়েমানুষ এভাবে ঘুচিয়ে দিতে পারে? গভীর রাত পর্যন্ত শুধু এই কথাটিই বার

বার তাঁর মনে পড়ে। সে সব দিন ঝাপসা হয়ে গিয়েচে, মনের আকাশ বিস্মৃতির মেঘে ঢাকা। ওই গোপীনাথপুরের ভিটে অমন ছিল কি তখন? ফুলশয্যার রাত!

হঠাৎ মনে পড়ে যায়, গত আষাঢ় মাসের প্রথমে উত্তর দিকের ভাঙ্গা পাঁচিলের গায়ে এতটুকু একটা শসাগাছ নতুন বর্ষার জল পেয়ে গজিয়েচে দেখে তিনি শুকনো কঞ্চি কুড়িয়ে একটা মাচা বেঁধে দিয়েছিলেন—এতদিনে গাছ বড় হয়েচে, কত শসার জালি পড়েচে গাছটাতে। কে খাচ্চে সে বনের মধ্যে? হয়তো কনকী আসে লেবু তুলতে—এক গাছ লেবু রেখে এসেছিলেন। সে-ই হয়তো শসা পেড়ে নিয়ে যায়—কে জানে?

হঠাৎ কি একটা কুস্বরে দ্রব ঠাকরুণ চমকে ওঠেন। নীরজার ঘর থেকে শব্দটা আসচে।

মাগী এত রাত্রে করে কি? হুস্ হুস্ করে অত জোরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলচে কেন? ঘুমের ঘোরে মুখ-চাপা লাগলো নাকি?

দ্রব ঠাকরুণ ডাকলেন—শুনচো—ওগো—কি হয়েচে? ওগো—

নীরজা বল্লেন—ডাকচেন কেন দিদি?

—বলি ও শব্দ কিসের?

—কুম্ভকের রেচক-পূরক অভ্যেস করচি—অনেক রাত ভিন্ন হয় না কিনা,—ঠাকুর তাই বলে গেলেন।

সে আবার কি রে বাবা! মাগী তো ঘুমুতেও দ্যায় না রাত্তিরে?

দ্রব ঠাকরুণ বল্লেন—যাক গে—ঘুমের ঘোরে মুখ-চাপা হয় নি তো?

—না দিদি—ঘুমুইনি এখনও। ঘুমুলে যোগের ক্রিয়া হয় না। জীবনটা যদি ঘুমিয়েই কাটাবো, তবে পরকালের কাজ করবো কখন?

—তা বেশ, বেশ।

—দিদি—ঘুমুলেন?

—না, কেন?

—নির্বিকল্প সমাধি না হওয়া পর্যন্ত আমার মনে শান্তি পাচ্চি নে, পাবোও না। দেহ কি জন্য দিদি? ঘুমুবার জন্যে নয়। আরামের জন্যে নয়—শুধু নিজের কাজ করে যাওয়ার জন্যে। দিন কিনে নাও, শুধু দিন কিনে নাও—

দ্রব ঠাকরুণের পিত্তি জ্বলে গেল। কিন্‌গে যা দিন মাগী, যদি তোর পয়সা থাকে! রাত্তিরে একটু ঘুমুতে দে অন্তত।

শীতকাল এসে গেল। কানু বড়দিনের ছুটিতে একবার কাশী এসে পিতামহীর সংগে দেখা করে গেল।

দ্রব ঠাকরুণ তাঁকে বল্লেন—কানু ভাই, অন্য একটা বাসা পাওয়া যায় না?

কানু বিস্মিত হয়ে বল্লে—কেন, এখানে কি হ'ল? সত্যর মা রয়েচেন, এই তো সব চেয়ে ভালো—

—ও মাগী পাগল।

—পাগল! সে কি!

—না বাবু, বেজায় ধর্মিষ্টি। অত ধর্মিষ্টি আমার পোষাবে না। আমাকে তুই সরিয়ে নিয়ে যা—

কানু কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলে। ঠাকুরমার যেমন কাণ্ড।

বল্লে—আচ্ছা ঠাক্‌মা, শেষ বয়েসে কাশীবাস করতে এলে—না হয় তুমিও হও একটু ধর্মিষ্টি। হ্যাঁ, উনি ওই রকমই বটে। সত্য বলছিল, মা কিছুতেই দেশে থাকতে চান না। এই গত বোশেখ মাসে সত্যর ছোট ভাইয়ের বিয়ে গেল, ওঁর ছোট ছেলের—ওঁকে

কত চিঠিপত্তর, কত অনুরোধ—কিছুতেই গেলেন না। বল্লেন, যে মায়া একবার কাটিয়েচেন, তাতে আর জড়িয়ে পড়তে চান না। ছোট ছেলে টেলিগ্রাম পর্যন্ত করলে, কোনো ফল হ'ল না।

দ্রব ঠাকরুণ অবাক হয়ে বল্লেন—বলিস কি রে কানু, সত্যি?

—মিথ্যে বলচি তোমার কাছে ঠাক্‌মা?

—আমায় এখান থেকে তুই সরিয়ে দে ভাই।

—ছিঃ—আচ্ছা, তুমি অত নাস্তিক কেন ঠাক্‌মা? ওঁর সংগে থেকে একটু ধর্ম শেখো না। চিরকালই বিষয় আর সংসার নিয়েই তো কাটালে।

—হাঁপ লেগে মরে যাবো যে এখানে থাকলে—

—আবার ওই সব নাস্তিকের মত কথাবার্তা—ঠাক্‌মা তুমি কি?

শীত কেটে গ্রীষ্ম এল, চলেও গেল। আবার আষাঢ় মাসের প্রথম। দেশের খবর নেই অনেকদিন। ন'ঠাকরুণের চিঠি আগে আগে আসতো—গত তিন চার মাস তাও বন্ধ। কথায় কথায় একদিন নীরজাকে কথাটা বলেই ফেল্লেন।

—দেশে কে আছে আপনার? শুনেচি সেখানে থাকে না কেউ?

—বাড়ীটা, গাছটা পালাটা—

—দিদি, এখনও ঐ সবের মায়া? বিশ্বনাথের পাদপদ্মে মন সমর্পণ করুন, সব বন্ধন ঘুচে যাবে। কেউ কিছু নয়, কিছু নয়—একমাত্র তিনিই সত্যি। বলে নীরজা চোখ কপালে তুলে ওপরের দিকে চেয়ে রইলেন। দ্রব ঠাকরুণ তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—ওই যাঃ, দাঁড়াও, কড়ার দুধটুকু বুঝি বেড়ালে খেয়ে গেল! নাঃ বেড়ালের জ্বালায়—যত বা বেড়াল, তত বা বাঁদর। অমন গামছাখানা সেদিন—

—দিদি, আজ আমার সঙ্গে চলুন, কেদার ঘাটে কাশীখণ্ডের ব্যাখ্যা করবেন উপীন কথক। শোনবার জিনিস। কাশীতে এসে কাশীখণ্ড শুনতে হয়—

—আমার শরীর ভালো না, আজ থাক, তুমি যাও—

নীরজা নাছোড়বান্দা, অবশেষে নিয়ে গেলেন দ্রব ঠাকরুণকে। কেদার ঘাটে এর আগেও দু'তিন বার দ্রব গিয়েচেন সত্যর মার সঙ্গেই। ওপরের রানার চওড়া চাতালের একপাশে ফর্সা রোগামত কথকঠাকুর কথকতা শুরু করেচেন—তাঁকে ঘিরে বাঙালী মেয়ে-পুরুষের ভিড়। পুরুষের চেয়ে মেয়ে অনেক বেশি।

সত্যর মা জিজ্ঞেস করলেন—দিদি, প্রণামী কিছু এনেচেন তো?

—তা তো বল্লে না—আনিনি—

—আট আনার কম দেওয়া যায় না। আচ্ছা, আপনারটা আমি দিয়ে দেব এখন—

—আমার আট আনা না দিয়ে চার আনা বরং দ্যাও। নাতিরা ক'টাকা বা পাঠায়?

—এখানে যা দেবেন দিদি, পরকালে তোলা রইল—

বর্ষার গঙ্গায় ঢল নেমেচে। কেদার ঘাটের সামনের নদীতে কাদের বড় একটা বজরা ভেসে চলেচে, দু'তিনখানা পান্সিতে সুসজ্জিতা নরনারী নদীভ্রমণে বার হয়েচে। রামনগরের দিকে সূর্য অস্ত যাচ্ছে—উঁচু বাড়ীর ছাদের কার্নিসে তরল সোনার মত ঝিলমিল করচে রাঙা রোদ। কথকঠাকুর সুকণ্ঠে গান ধরেচেন, কাশী সকল তীর্থের সার, মৃত্যুর সময় মণিকর্ণিকার ঘাটে স্বয়ং বিশ্বনাথ কানে মন্ত্র দেন—মানুষের শিবলোকপ্রাপ্তি ঘটে—এই হ'ল গানের অর্থ।

দ্রব ঠাকরুণের মন অজ্ঞাতে অনেকদূরে চলে গেল। তাঁর খয়েরখাগী গাছে কত কাঁঠাল হয়েচে এই আষাঢ় মাসে, বড্ড কাঁঠাল ধরে গাছটাতে, শেকড়ে পর্যন্ত কাঁঠাল। তিনটে

আম গাছে আমও নিশ্চয়ই খুব ধরেছিল—নাতিরা কি গিয়েচে আম খেতে? তাদের সেদিকে দৃষ্টি নেই। বারোভূতে লুটে খাচ্চে।

রাত্রি নামলো। নীরজা বল্লেন—চলুন দিদি—

দ্রব ঠাকরুণ লক্ষ্য করেচেন সমস্ত সময় নীরজা মাগী ফোঁস ফোঁস করে কেঁদেচে। আর কেবল বলেচে—আহা-হা-হা!

যদি এ মাগীর সঙ্গ ছাড়তে পারতেন!—কিন্তু তা হবার নয়, কানু শুনবে না।

বাসায় এসে নীরজা দেখলেন তাঁর সঙ্গিনীর মন বড় খারাপ—অন্যমনস্ক ভাব, বিশেষ কোনো কথা বলে না।

কাশীখন্ড শুনে আজ তা হোলে খুব ভালো লেগেচে বোধ হয়। পাষাণ বুঝি গলেচে।

নীরজা বল্লেন—কি ভাবচেন দিদি?

—একটা গাছ কাঁঠাল দেশে। খয়েরখাগীর কাঁঠাল, সে তুমি কখনো খাওনি—খেলে বুঝতে।

—দিদি, এখনও আপনার মায়ার বন্ধন গেল না? আপনার তো দুটো একটা গাছ, আমার তিনটে বড় বাগান—কলমের বোম্বাই, মালদ' ফজলি—মায় ন্যাংড়া পর্যন্ত। আমি তো ফিরেও চাইনি ওসব দিকে। ছেলেরা কাঁদে, বলে, এখন কি কাশীবাস করবার সময় হয়েচে তোমার? আমি বলি, না, সংসারের মায়ায় আর না। গানে বলে—কেবা কার পর, কে কার আপন? (এই মরেচে, মাগী আবার শুরু করেচে!) কালশয্যা পরে মোহতন্দ্রা ঘোরে, দেখে পরস্পরে অসার আশার স্বপন।

—তা আমি বলি—এতকাল তো সংসারের বন্ধনে ঘুরে আশার স্বপ্ন অনেক অনেক দেখলুম। এইবার পরকালের কথা ভাবি। আর আমার এই যে গুরুদেব, উনি দেহধারী মুক্ত পুরুষ—ওঁর কৃপায়—(নীরজা উদ্দেশে প্রণাম করলেন।)

দ্রব ঠাকরুণ মুখে বল্লেন—তা তো বটেই—

—চলুন দিদি, কাল বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে সেই মাইজির কাছে আপনাকে নিয়ে যাই—আপনার বয়স আমার চেয়ে বেশি, আপনার এখন উচিত গুরুমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে সব বন্ধন মুক্ত হয়ে একমনে কাশীবাস করা। আমাদের আর ক'দিন দিদি? শমন তো দোরে দাঁড়িয়ে—সব রকম তো দেখলুম শুনলুম।

দ্রব ঠাকরুণ মনে মনে বল্লেন—তোমার মুণ্ডু করলুম, মাগীর কথার আবার ধরণ শোনো না, ভাটপাড়ার ভট্‌চার্জি এসেচেন! মুখে বল্লেন—মুংলি ব'লে একটা গাই গোরু ছিল আমার—বড্ড ন্যাওটা। যেখানে যাবো, সেখানে যাবে। আমার হাতে না খেলে তার পেট ভরতো না। এই বেশ কচি কচি বাঁশপাতা এনে মুখে দেতাম তুলি—আর—

—আঃ, আবার ওই সব কথা আপনার মুখে! জড়ভরতের কথা জানেন তো? অত বড় জ্ঞানী—পূর্বজন্মের এক হরিণের মায়ায় তাঁর সব গেল। ভগবানের চিন্তা করুন—ভগবানের চিন্তা করুন—সব মিথ্যে। সব মিথ্যে।

দ্রব ঠাকরুণ কোনো কথা বল্লেন না। তাঁর ওর কথা একেবারেই ভালো লাগে না। মাগী যেন কী! কি বলে, কি করে! মাগী এমন পাষাণ যে, ছোট ছেলের বিয়েতে বাড়ী গেল না! মুখ দেখতে আছে ওর? ছিঃ—

সারারাত্রি স্বপ্নের ঘোরে দেখলেন, তাঁর গোপীনাথপুরের ভিটেতে চালাঘরের ছাঁচ-তলায় ম্লান মুখে ছলছলে চোখে তাঁর মুংলি দাঁড়িয়ে রয়েচে—ন'বৌ তাকে যত্ন করচে না, বুড়ী হয়েচে মুংলী, তেমন দুধ ত আর দিতে পারে না—মুংলিকে তিনি তার মায়ের পেট থেকে টেনে বার করে এতকাল নিজের মেয়ের মত পুষেছিলেন—তিনি

নেই, কে ওকে দেখে? কাঁঠাল হয়েচে বটে খয়েরখাগী গাছটাতে! এত কাঁঠাল তিন চার বছরের মধ্যে হয়নি। তিনি নাইতে যাচ্চেন নদীতে, মুখুজ্যে-গিন্নি বলচে—হ্যাঁ খুড়ীমা, এবার তোমার গাছে কী কাঁঠাল ধরেচে! তা আমায় একটা দিও, তোমার নাতিদের খেতে দেবো—

খড় উড়ে উড়ে পড়চে বাড়ীর চাল থেকে। কানু বা বিন্দে দেশে যায়নি, ঘরও সারায়নি। এবার বর্ষায় কি টিকবে চালে খুঁচি না দিলে?

কনক বলচে—অ ঠাক্‌মা, একটা নেবু দেবা? আমার মার অরুচি হয়েছে, কিছু খেতি পারে না—

সকালে উঠে নীরজা নিজেই গঙ্গাস্নান করে এসে স্বপাক হবিষ্যান্ন চড়িয়েচেন এবং প্রতিদিনের অভ্যাসমত ইষ্টমন্ত্র জপ শেষ করে গাল-বাদ্য সহকারে শিবপূজা করচেন। দ্রব ঠাকরুণের একটু বেলা হয়েচে আজ উঠতে। মনও খুব ভার। তাঁর আপনার জন পড়ে রইল—তাঁর মুংলি, তাঁর খয়েরখাগী গাছটা, তাঁর ডুমুর গাছ—আর তিনি কোথায়! আরও ওই মাগীর জ্বালায়...

নীরজার গাল-বাদ্য থামলো। দ্রব ঠাকরুণকে বল্লেন—আজ বড় সুখবর পেলুম দিদি—গঙ্গাস্নানে গিয়ে গুপ্তিপাড়ার সইয়ের সঙ্গে দেখা—সেও আমার মত কাশীবাস করচে—বাঙালীটোলায় থাকে, বল্লে, গুরুদেব আসচেন সামনের সোমবারে। হরিদ্বার থেকে ফেরবার পথে আমার এখানে পায়ের ধুলো দিয়ে তবে যাবেন। সইও একই গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েচে কিনা। আজ বড় শুভদিন আমার। গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করেই বেঁচে আছি, এবার এলে আপনাকে দীক্ষা নিতেই হবে দিদি, আমি ছাড়বো না। গুরুদীক্ষা না হ'লে দেহ পবিত্র হয় না, ভবসাগর পার হ'তে হ'লে গুরুর চরণরূপ ভেলা চাই আগে—নইলে হাবুডুবু খেয়ে মরতে হবে যে দিদি?

দ্রব ঠাকরুণ বল্লেন—তা তো ঠিক, তা তো ঠিক—

গুরুদেবের আগমনের পূর্বেই শনিবার সকালের গাড়ীতে কানু এসে হাজির হ'ল। দ্রব ঠাকরুণ নাতির কাছে কেঁদে পড়লেন—তুই আমায় গুপীনাথপুরে নিয়ে চল্‌ ভাই, আমার আর কাশীবাসে কাজ নেই—বাবা বিশ্বনাথ মাথায় থাকুন। ও মাগীর কাছে আর দু'মাস থাকলে আমি পাগল হয়ে যাবো।

ফলে সোমবার কাশীতে গুরুদেবের শুভাগমনের দিন দুপুরের ট্রেনে দ্রব ঠাকরুণ দেশের ইস্টিশানে তাঁর বোঁচকা-তোরঙ্গ নিয়ে নাতির সঙ্গে এসে নামলেন।

ন'ঠাকরুণ শুনে ছুটে এলেন—ও দিদি—দিদি—

—হ্যাঁ ন'বৌ—আমার মুংলি ভালো আছে?

—ভালো নেই দিদি। ওঠে না, খায় না—তোমার যাওয়ার পর থেকেই, গোয়ালে শুয়েই থাকে।

—সে আমার মন বলচে ভাই, তুমি কি বলবে। তাকে রাত্তিরে স্বপ্ন দেখেই তো আর টিকতে পারলাম না, চলে অ্যালাম। কানুকে বল্লাম, নিয়ে চল্‌ ভাই গুপীনাথপুর, মাথায় থাকুন বাবা বিশ্বনাথ—মুংলি কোথায়? ওকে কচি বাঁশপাতা খাওয়াবো নিজের হাতে, স্বপ্ন দেখিচি।

একটু পরে ন'ঠাকরুণ দড়া ধরে মুংলিকে নিয়ে এলেন। সত্যিই তার সে চেহারা নেই। সব কাজ ফেলে দ্রব ঠাকরুণ ছুটে গিয়ে তার গায়ে-মুখে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন। মুংলির চোখে জল পড়ে, তাঁরও চোখে জল পড়ে।

ন'ঠাকরুণ বল্লেন—আর-জন্মে ও তোমার মেয়ে ছিল দিদি—আর-জন্মের মায়ার বাঁধন—

—রক্ষে করো ন'বৌ—তুমিও বড় বড় কথা বলতে শুরু করলে নাকি, সেই মাগীর

মত? মুংলি এ জন্মেই আমার মেয়ে—আর-জন্ম-টন্ম ছেড়ে দাও।

—কে মাগী, কার কথা বলচো—

—সে বলবো এখন সব। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি দেশে এসে—বাবাঃ—

কানু হেসে বল্লে—নাঃ, ঠাক্‌মাকে নিয়ে আর পারা গেল না—এমন নাস্তিক—কাশী-প্রাপ্তি অদৃষ্টে থাকলে তো?

—তুই ভাই বল্, ন'বৌ বলো—আমার এই ভিটেতেই যেন তোদের কোলে শুয়ে সকলের কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে যেতে পারি। কাশী পেরাপ্তিতে দরকার নেই—এই ভিটেই আমার গয়া কাশী। তিনি এই উঠানের মৃত্তিকেতে শুয়েছিলেন ওই তুলসী-তলায়—আমাকেও তোরা ওখানে—

আঁচলের খুঁট দিয়ে দ্রব ঠাকরুণ চোখের জল মুছলেন।

বেলা যায় যায়--আষাঢ়ান্ত সুদীর্ঘ দিনমানের শেষে সূর্য ঢলে পড়েচে পশ্চিম দিকের নিবিড় বাঁশবনের আড়ালে। ঘেঁটকোল ফুল কোথাও জঙ্গলে ফুটেচে, বাতাসে তার কটু উগ্র গন্ধ। দ্রব ঠাকরুণের মন শান্তিতে, আনন্দে, উৎসাহে পূর্ণ হয়ে গেল। এগারো বছরের নববধূ এই বাড়ীর উঠানে পা দিয়েছিলেন, এখন তাঁর বয়েস তিন কুড়ি ছয়।

কনক হাসিমুখে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে—ঠাক্‌মা, ভালো আছেন? এয়েচেন শুনে ছুটে দেখতি অ্যালাম—আমাদের কথা মনে ছিল?

ভুবন বোষ্টুমী

ওই পথে ভুবন বোষ্টুমী যেত।

অনেকদিন গ্রামের এ পথে হাঁটিনি। এই ঝোপে ঝোপে ঘেঁটু ফুলে ভর্তি ফাল্গুন-অপরাহ্নে গ্রামের পিছনকার মাঠ ও বনের মধ্যেকার সুঁড়িপথের ধারে দাঁড়িয়েছি এসে হঠাৎ আজ বেড়াতে বেড়াতে। পঁচিশ বছর এ পথে পা দিইনি—সেই বাল্যকালে আসতাম খেলাধুলো করতে আপন মনে বনের ধারে। ওই পথটা নদীর ঘাটে যাবার। আমার ছেলেবেলায় বোষ্টমপাড়া ও জেলেপাড়ার লোকে ওই পথ ধরে নদীর ঘাটে যেত—এখনও বোধ হয় যায়। আমি গ্রামে বহুকাল পরে ফিরেছি এ বছর ফাল্গুন মাসে। মাঠের মধ্যে বেড়াতে বেড়াতে এই অপরাহ্নে এসে পড়েছি এই জায়গাটাতে।

প্রথমটাতে চিনতে পারিনি, তার পরেই মনে হল, ও, ঐ সেই ছিরেপুকুরের ধারের পথ! ওদিকে বেলেডাঙার বাঁওড়ের ধারের বট-অশথের ছায়াস্নিগ্ধ তীর। আম্রমুকুলের ঘন সুবাস সন্ধ্যার বাতাসে। পৃথিবীর বসন্ত আজ কি অপূর্ব রূপেই প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে আমার চোখের সামনে। একটা বেলগাছ, (যুগলকাকাদের বেলগাছ, এটা তাঁদেরই জমিতে অবস্থিত, ছেলেবেলা থেকেই জানি) পাকা পাকা বেল ঝুলছে। কত বেল কুড়িয়ে নিয়ে যেতাম এখান থেকে ছেলেবেলায়। বেশ ভাল বেল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ভুবন বোষ্টুমীর কথা মনে পড়ল কেন?

সে এ পথে যেত, এই বিকেলবেলা ওই বন-ঝোপ ঘেরা সরু ছায়াস্নিগ্ধ পথটি বেয়ে রাংচিতে বন ও গাবভেরেন্ডা গাছের পাশ কাটিয়ে। ঝরা শুকনো বাঁশপাতার রাশ পা দিয়ে মচমচ করে মাড়াতে মাড়াতে, ওই মাদার গাছের তলায় পড়া হলদে হলদে মাদার ফুলের কুঁড়ির সুবাস আঘ্রাণ করতে করতে, এ পথ দিয়ে নদীর ঘাটে গা ধুতে যেত ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগে।...

ভুবন বোষ্টুমীকে ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগেই দেখতাম। ফর্সা খাটোমত মানুষটি। বেশ

শান্ত মুখশ্রী, কানে ছিল সেকেলে মাকড়ি—হাতে কাঁচের চুড়ি। বয়স আমার মায়ের সমান হবে, দু-এক বছরের কমবেশি না হতে পারে এমন নয়। আমি তখন আট বছরের ছেলে, ন বছরের ছেলে, দশ বছরের ছেলে।

জীবনের ঐ তিনটি বছর পরে আর কখনও তাকে দেখিনি।

ভুবন বোষ্টুমী আমাকে বলত, হ্যাঁগা বামুনের খোকা, তুমি একা বনে বনে কি কর?

আমি সলজ্জ সুরে বলতাম—এই—

—বাবাঠাকুর যেন আমার কি! যাও যাও, বাড়ী যাও। এখানে বড় শেয়াল বেরোয়। ছেলেমানুষ, এখানে থাকে না। যাও—

—যাচ্ছি।

—আমি এগিয়ে দিয়ে আসব তোমায় খোকা?

—না, আমি পারি যেতে।

—থেকো না। চলে যাও। বামুন দিদি বকবে। লক্ষ্মি ছেলে—যাও মানিক—

—আর একটু খেলা করব?

—না। একা বনের ধারে তোমার কি খেলা বাবা? বড় শেয়াল বেরোয় এখানে।

—বড় শেয়াল তো দেখিনি—সব ছোট শেয়াল।

—তা না গো খোকা। বড় শেয়াল হল সেই যার নাম করতে নেই সন্ধেবেলা।

—বাঘ?

—নাম করে না, নাম করে না, দুষ্টু ছেলে!

এই রকম টুকরো কথা হয়তো হয়েছিল কোন এক বিকেলে।

দু-চারদিন হয়তো—তার বেশি নয়।

প্রায়ই তাকে দেখতাম, ঘড়া-কাঁখে নদীর ঘাটে যেত এমনই বিকেলে। সে কেন, বোষ্টম-পাড়ার জেলেপাড়ার মত বৌ-ঝি যেত।

এই পর্যন্ত তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ। ওর সঙ্গে আমার যোগাযোগ নিতান্তই সামান্য।

ভুবন বোষ্টুমীর ইতিহাস যতদূর আমার জানা আছে বা পরে বড় হয়ে শুনেছিলাম, তার মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু ছিল না। সে ছিল গোপীনাথ বৈরাগীর বিবাহিতা স্ত্রী। গোপাল পরামানিকের বাড়ীর পেছনে ওদের দুখানা মেটে ঘর ছিল। চাষবাস জমি-জমার সামান্য আয়ে সচ্ছল ভাবেই সংসার চলত নিঃসন্তান স্বামী-স্ত্রীর ঝামেলা-বিহীন সংসারের। ভুবনের মুখখানা ছিল সুন্দর, কারণ ওর মুখ আমি মনের চোখে স্পষ্ট দেখতে পাই। তবে ভয়ানক রকমের সুন্দর কিছু নয়, পাড়াগাঁয়ের মধ্যে পাঁচপাঁচি ধরনের চেয়ে একটু ভাল।

ভুবন বোষ্টুমীর সম্বন্ধে আর একটা কথা মনে আছে, কেউ তার চরিত্র সম্বন্ধে কোন অপবাদ দেয়নি। অথচ ও-পাড়ার অধিকাংশ ঝি-বৌ সম্বন্ধে সেই ছেলেবেলাতেই কত কানাঘুষো আমার কানে গিয়েছিল। পাড়াগাঁ জায়গা, পরের এতটুকু ছিদ্রও চোখ এড়ায় না সেখানে। এর কারণ অবিশ্যি এ নয় যে পাড়াগাঁয়ের সব লোকই হিংসুক বা নিন্দুক। এর বড় কারণ এই যে, এই সব পল্লীগ্রামে লোকের আমোদ-কৌতুকের কোনও বড় পথ নেই—যেমন আছে শহরে, ফুটবল খেলা বা সিনেমা বা রাজনীতি আলোচনার মধ্যে। কি নিয়ে এরা সময় কাটায়? এর-ওর ঘরের মুখরোচক কুৎসা-নিন্দা না নিয়ে থাকলে অবসর বিনোদনের অন্য পন্থা কই? সুতরাং দোষ এদের দেওয়া যায় না সেজন্যে।

এ হেন গ্রাম্য আলোচনার মজলিসেও ভুবন বোষ্টুমীর নামে কোন অপবাদ শুনিনি। বরং সকলে বলত, ভুবন খুব ভাল মেয়ে। শান্ত সুশ্রী স্নেহময়ী। এই পর্যন্ত, এর বেশী আর কিছু ওর সম্বন্ধে বলবার আছে বলে আমার মনে হয় না। অতি সাধারণ

গ্রাম্য-বধূদের একজন।

ভুবন বোষ্টুমী সম্বন্ধে আর কিছু বলবার নেই আমার। অথচ কেন এতকাল পরে এখানে দাঁড়িয়ে তাকেই আমার প্রথম মনে হল? এই পথের সংগে, বনফুলের গন্ধের সংগে, ফাল্গুন-অপরাহ্ণের সংগে ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগেকার ভুবনি কেন মিশে আছে? আরও কত ঝি-বৌ তো যেত। তারাও মরে হেজে গিয়েছে আজ কত বছর, তাদের কারো কথা মনে কেন ওঠে না? কারো মুখও কেন মনে নেই? অথচ এতকাল পরে চোখ বুজে ভাবলেই ভুবনি বোষ্টুমীর মুখ সামনে ভেসে ওঠে, যেমন ভেসে ওঠে আমার মায়ের।

এ কথার জবাব নেই।

আশ্চর্য হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি বনঝোপ-ঘেরা জনশূন্য পথে, ফুটন্ত ঘেঁটুফুলের ঝাড়ের ধারে। তার পর—কতবার কখনও বসন্তকালে কখনও গরমকালে, এক-আধবার শরৎ-কালের অপরাহ্ণে ওই পথে বেলগাছটার তলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি। প্রথম বারের পর আরো অন্ততপক্ষে দশ বারো বার, কি তার বেশি গত কয়েক বছরের মধ্যে। হয়তো অন্য কথা মনে ভাবতে ভাবতে গিয়েছি—কোনও একটা বইএর কথা, কি সাংসারিক কোন সমস্যার কথা, কি অর্থচিন্তা, যাই হক। কিন্তু যেমন ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, চুপ করে দাঁড়িয়ে মনকে শান্ত সংযত করবার চেষ্টা করেছি, অমনি কত বছরের পার থেকে ভুবন বোষ্টুমীর শান্ত সুশ্রী মুখখানা ধীরে ধীরে মনের মধ্যে ফুটে ওঠে। অথচ ভুবনি আমার কেউ ছিল না, আমাদের পাড়ার মানুষও ছিল না সে। খুব বেশি যে তার সংস্পর্শে এসেছি বাল্যে তাও নয়। তার চেয়ে অনেক বেশি মিশেছি যাদের সংগে, তাদের অনেকেই আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলীন। কতবার ভেবেছি অবাক হয়ে—কেন এমন হয়?

কিছু বুঝতে পারি নি।

জন্মদিন

আজ সকালের দিনটাই যেন কি রকম।

যা-কিছু করবার ছিল, শেষ হয়ে গিয়েচে রায় বাহাদুরের, প্রথম যৌবনে যখন রাতুল-পুর লালমোহন একাডেমির তিনি হেডমাস্টার—মাসিক বেতন ত্রিশ টাকা মাত্র, তখন সেই রাতুলপুরের স্কুলে পায়া-ভাঙা চেয়ারে বসে সম্মুখস্থ নিবিড় ব[illegible]বনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে কত কি দেখতে পেতেন সিনেমার ছবির মত। দেখতেন, এ দুঃখ থাকবে না, জীবন আসচে সামনে। সে জীবনে কলকাতায় তাঁর ভিলা হবে বালিগঞ্জে, মোটর থাকবে, কলিং-বেল টিপলে উর্দিপরা খানসামা ঘরে ঢুকবে। তখন ছিল স্বপ্ন, স্বপ্ন ছিল অপূর্ব রঙে রঙীন।

আজ তাঁর বয়েস একষট্টি। আজ একষট্টিতে পা দিলেন। লেক প্লেসের বাড়ীর নতুন বাড়ীর তেতলায় যে ছোট ঘরটি তাঁর শোবার ঘর, সে ঘরে আজ ভোরে জেগে উঠে দেওয়ালের ক্যালেন্ডারের দিকে চোখ পড়তেই রায় বাহাদুর দেখলেন আজ সাতাশে আষাঢ়, তেরশো বাহান্ন সাল। একষট্টি বছরে পড়লেন তিনি আজ।

সকালটা কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন নয়। দিব্যি রোদ উঠেচে বাড়ীর ছাদের মাথায়, সোঁদালি গাছগুলোর মগ-ডালে। মন কেমন চঞ্চল হয়ে উঠলো, চা-পানের পর বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ছোট মেয়ে সুমিতা বলেছিল—বাবা, টোস্ট ভাজা হচ্ছে, দুখানা খেয়ে যাও চায়ের সংগে—

—নাঃ। ও কি মাখন? আজকাল মাখন বলে যা বিক্রি হয় ও দিয়ে টোস্ট আমাদের ধাতে সয় না। তোরা খা—

বলে রায় বাহাদুর বেরিয়ে পড়েচেন।

খানিকটা এ-দিক ও-দিক ঘুরে রায় বাহাদুর লেকের ধারের বেঞ্চিতে এসে বসলেন। একখানা মিলিটারি বোট কিছুদূরে ভাসাতে চেষ্টা করচে। একখানা লরি নিকটের রাস্তায় স্টার্ট দেওয়ার প্রচেষ্টায় প্রচুর গ্যাস ও শব্দ ছাড়ছে। না, কোথাও যদি একটু শান্তি আছে।

একষট্টি হোল তা হোল। যখন তিনি ষোল সতের বছরের ছেলে, তখন মনে আছে কারো বয়েস বত্রিশ কি চৌত্রিশ বছর শুনলে তাকে প্রৌঢ় বলে মনে হোত। চল্লিশ বছরের লোক তো ছিল বৃদ্ধের মধ্যে গণ্য। আর এরই মধ্যে তাঁর একষট্টি বছর বয়েস হয়ে গেল? নিজেকে খুব বেশী বুড়ো বলে মনে করতে পারছেন না রায় বাহাদুর। সেদিনও তো ধর্মতলার চুলকাটার সেলুনে বসে চুল ছাঁটিয়েছেন—কত দিন আর হবে? রায় বাহাদুর মনে মনে একটা মোটামুটি হিসেব করবার চেষ্টা করলেন। কাশী থেকে এসেচেন সে-বার। বেশ মনে আছে। লেসলির বাড়ীতে তাঁর শালাকে সেবার চাকুরি জুটিয়ে দিলেন গণেশ সরকারের সাহায্যে। গণেশ সরকার তাঁর সহপাঠী, দুজনে একসঙ্গে সেকালের সিটি কলেজে পড়েছিলেন, গণেশ সরকার লেসলির বাড়ী বড় চাকরি করতো—এখন অবসর নিয়েছে। গণেশেরও বয়েস, তা হোল ষাট-একষট্টি। দু-এক বছর কম বা দু-এক বছর বেশী। ওতে কিছু যায় আসে না।

সেটা হবে ১৯২০ সাল, দেখতে দেখতে পঁচিশ বছর হয়ে গেল—নিতান্ত কমই বা কি? ভাবলে মনে হয়—সেদিনকার কথা। হিসেব করলে দেখা যায়, হাওড়ার পুলের তলা দিয়ে অনেক জল চলে গিয়েচে তার পর।

তবে ওই যা ভাবছিলেন রায় বাহাদুর। বয়েস হোলে কি হবে, আর পাঁচজন বুড়োর মতো তিনি নন। এমন কি পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন বছরের লোককে তিনি অনেক সময় বুড়ো বলে উল্লেখ করে থাকেন। নাতি ও ছেলেমেয়ের কাছে বলেন—সেই বুড়ো নাপিতটা আজ এসেছিল রে? নিজের চেয়ে দু-এক বছর কম বয়সের লোককে বলেন—আরে একেবারে বুড়ো মেরে গেলে যে! ছ্যা ছ্যা—দাঁতগুলো সব খুইয়েচ দেখচি।

তাঁর দাঁত এখনো অটুট আছে। দাঁতের নাকি যৌবন, তিনি মনে মনে ভাবেন এবং পাঁচজনকে বলেও বেড়ান। নিজের কাছে এই সত্যটা প্রমাণ করবার জন্যে তিনি মাঝে মাঝে পার্কে নির্জনে বসে চানাচুর ডাল-বাদাম ভাজা কিনেও খেয়ে থাকেন।

—এই, কি দিচ্ছিস ও? দুটো ডাল-ভাজা বেশি করে দিস। টাকার ডাঙানি নেই? ব্যাটারা সব ডাকাত। চার পয়সার ডাল-বাদাম নিলাম, বলে কি না টাকার ভাঙানি নেই! এই নে—যা—

বেশ জায়গা করেচে এই লেক। এই বেঞ্চিখানা বড় ভালো লাগে। মাঝে মাঝে এখানে এসে বসেন। নির্জনে বসে থাকতে ও ভাবতে বেশ লাগে। বাড়ীতে বড় গোলমাল, বসে ভাববার সময় নেই। ভাববার কথা অনেক কিন্তু বাইরের ঘরে ছেলে ও নাতিদের পড়ার মাস্টার এসে গিয়েচে এতক্ষণ—সুমিতার ঘরে সুমিতার বন্ধু অলকা ও ডাক্তারবাবুর নাতনি বেলা এসে গিয়েচে। অত গুজ্ গুজ্ ফুস্ফুস্ কেন? সুমিতার মাথা বিগড়ে দেবে ওই ডাক্তারবাবুর ধিঙ্গী নাতনিটা। কমিউনিস্ট! সেদিন কোথা থেকে একটি গাদা ওই সব কমিউনিস্ট বই-পত্তর সুমিতার বিছানায়। আজকাল কি যে হচ্চে দেশে! মেয়ে-ছেলেদের মধ্যেও কিনা ওই সব!

এই তো গেল বাইরের ঘরের কথা। যদি বাইরের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসবেন, তবে অমনি প্রতিবেশী বৃদ্ধ ভুবনবাবু এসে জুটবে।

—এই যে রায় বাহাদুর। বসে আছেন নাকি? তামাক খাবেন না সকালবেলা? আজ কাগজ দেখেন নি এখনো—ওকিনাওয়ার ব্যাপারটা দেখেচেন? ঘোল খাইয়ে ছাড়লে

আমাদের বাবাজিদের। চা?...তা হয় হোক, আপত্তি নেই।

নয়তো অবিনাশ দালাল এসে বলবে—রায় বাহাদুর, কেমন আছেন? বেশ, ভালো ভালো। শুনে খুশী হোলাম। আর আমাদের এখন—ইয়ে, একটা কথা। হরিশ মুখুয্যে রোডের বাড়ীখানা একবার দেখবেন? আজই যেতে হয়। ওদের এটর্নিরা বড্ড প্রেস্ করচে। কাল আপনাকে ভাবলাম একবার ফোন করি। কটার সময় সুবিধে হবে? ওর চেয়ে ভালো আর পাবেন না—তবে বায়নার আগে রেজিস্ট্রি আপিসগুলো একবার সার্চ করতে হবে। সে আমি করিয়ে দেবো, আপনাকে কিছু করতে হবে না। চা? এত বেলায় —আচ্ছা, তা—চিনি কম দিয়ে, হ্যাঁ—

কিংবা আসবে গলির জীবন মুখুজ্যে, ওর ভাইপোর একটা চাকরির জন্যে অনুরোধ করতে। তিনি যত বলেন, আজকাল তাঁর হাতে কিছু করবার নেই, চাকরি কোথা থেকে করে দেবেন—ততই তাঁকে আরও চেপে ধরে। বাড়ীর ভেতরে যে থাকবেন, সেখানেও বিপদ কম নয়! গৃহিণীর নানা রকম তাগাদা—ভাগনী-জামাইয়ের বাড়ী তত্ত্ব না পাঠালে নয়, ওপরের ঘরের পাখাখানা মেরামত করে দাও—নানা ফইজৎ।

তার চেয়ে এই বেশ আছেন।

পাশের বেঞ্চিতে একজন বৃদ্ধ লোক নাক টিপে বসে জপ কিংবা প্রাণায়াম করছে। ওদিকের বেঞ্চিতে একটি যুবক বসে লেকের জলের দিকে চেয়ে রয়েচে। এত সকালে আর কোথাও কোন লোক নেই।

হ্যাঁ, যা ভাবছিলেন। জীবনটা যেন কি রকম হয়ে গেল। রাতুলপুরের সেই দিনগুলি এই সকালবেলার রোদের মত স্বপ্নমাখা ছিল। এখন সে স্বপ্নের আবেশও স্মৃতি থেকে টেনে আনতে পারেন না। সেই রাতুলপুরের স্কুলের চটাওটা দেওয়ালটা। নবীন নাপিত চাকর ঘণ্টা বাজাতো। তাঁর জন্যে টিফিনের সময় বাজার থেকে নির্মাকি রসগোল্লা এনে দিত। নবীনের ছেলেটি মারা গেল টাইফয়েডে, ফ্রি পড়তো স্কুলের নিচের ক্লাসে। তার জন্যে একদিন স্কুল বন্ধ হোল। হেডমাস্টার ছিলেন গুরুচরণ সান্যাল। অনেক দিনের প্রবীণ শিক্ষক। তাঁকে বলতেন, আপনি হচ্চেন ইয়ংম্যান, কেশববাবু, এ সব স্কুলে আপনার পোষাবে না। এ সব কাজ কাদের জানেন, যাদের ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। যেমন ধরুন আমাদের। এ বয়েসে কোথায় যাচ্চি বলুন!

বেরিয়েছিলেন রাতুলপুর স্কুল থেকে তার পরের বছরেই। ভবিষ্যতের সন্ধানে। ভবিষ্যৎ তাঁকে একেবারে প্রতারণা করে নি। অনেকের চেয়ে তাঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেচে। কিন্তু আজ মনে হচ্চে, সব দিয়েও ভবিষ্যৎ তাঁকে যেন কিছুই দেয় নি। তাঁর স্বপ্নকে কেড়ে নিয়েচে, আশাকে কেড়ে নিয়েচে, ফুরিয়ে গিয়েচেন তিনি, নিঃশেষে ফুরিয়ে গিয়েচেন। যে ভবিষ্যৎ আজ অতীত, তাতে তিনি জেতেন নি—ঠকেচেন।

আজ তাঁর বয়েস—থাক বয়েসের কথা। ওটা সব সময় মনে না করাই ভালো। বয়েসের কথা মনে না আনবার জন্যেই তিনি পার্কে বসা ছেড়ে দিয়েচেন। তাঁর বাড়ীর কাছে একটা পার্ক আছে. ছোট পার্কটাতে লেকপাড়ার পেন্সনপ্রাপ্ত জজ, সাবজজ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, বড় কেরানী প্রভৃতি বৃদ্ধের দল নিয়মিত ভাবে বেড়াতে আসে। এ-বেঞ্চিতে ও-বেঞ্চিতে বসবে আর সামাজিক ও শারীরিক কথাবার্তা বলবে। অমুকের নাতনির বিয়ের কি হোল, অমুকের নাতনি এবার ম্যাট্রিকে বৃত্তি পেয়েচে। মেয়ে ছেড়ে ওরা নাতনিতে নেমেচে। নাতনি সম্বন্ধে এমন উচ্ছ্বসিত হবে, যেন কারো নাতনি কোন দিন ম্যাট্রিক পাশ করে নি। সব নাতনিই অসাধারণ, সাধারণ নাতনি একটাও চোখে পড়ে নি। নাতনির প্রসঙ্গের 'পরে উঠবে বাতের প্রসঙ্গ, দাঁতের ব্যথার প্রসঙ্গ, রক্তের চাপের প্রসঙ্গ। যমদূত যেন দণ্ড উঁচিয়ে বসে আছে পার্কটার প্রত্যেক বেঞ্চিখানার ওপরে। সে আবহাওয়ায়

বসলেই মনে হয়—

"এবার দিন ফুরুলো
সমঝে চলো
ইহকাল পরকাল হারিও না—"
কিংবা—"মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর"
কিংবা—"বাঁশের দোলাতে উঠে কে হে বটে
যাচ্চ তুমি শ্মশানঘাটে—"
ইত্যাদি।......

দিন কতক গিয়ে তাই রায় বাহাদুর আর ওই সব ক্ষুদ্র সামাজিক পার্কে যান না, যেখানে বাত-ব্যাধিগ্রস্ত পেন্‌সনভোগী বৃদ্ধদের যাতায়াত। তার চেয়ে আসেন তিনি এই লেকের ধারে, 'শ্যাম-বনকুঞ্জ পাও রে'! হরিৎবর্ণ দ্বীপটি জলের এক দিকে, কত সুগঠিত-দেহ তরুণ, কত প্রণয়চপলা তরুণী কলেজের ছাত্রী আসে যায়। ওয়াকাইয়ের দল কলহাস্যে চটুলপদে বেড়ায় মাঝে মাঝে, ঠোঁটে রঙ, খাকির আঁটসাট পোশাক পরনে। না, এখানে লাগে ভালো। যৌবনের হাওয়া বয় সর্বদা!

তিনি এখনো বাঁচবেন অনেক দিন। হাত দেখিয়ে বেড়ান এখানে সেখানে রায় বাহাদুর, সেদিন কার্জন পার্কে এক উড়িয়া জ্যোতিষী তাঁকে বলেচে। তা ছাড়া এ তিনি জানতেন। তাঁর আয়ু যে প্রায় নব্বুইয়ের কান ঘেঁষে যাবে, জ্যোতিষী না বললেও তা তিনি জানেন।

আজ এত পয়সা রোজগার করেও, কলকাতায় এত বড় বাড়ী করেও, ভি-এইট্ ফোর্ড চালিয়েও মনে হচ্চে রাতুলপুরের সেই দিনগুলো চব্বিশ বছরের সতেজ যৌবন নিয়ে যদি আবার ফিরে আসতো...সেই বাঁশবনের দিকে চেয়ে স্বপ্ন দেখা...ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজাতো নবীন নাপিত...কত নির্জনে বসে জীবনের ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকা...

তখন ছিলেন গরীব স্কুল-মাস্টার, আজ তিনি বড়লোক। স্কুল-মাস্টারি ছেড়ে এক বন্ধুর পরামর্শে ব্যবসা ধরলেন, ইন্সিওরেন্সের কোম্পানী খুললেন নিজে, বড় আপিস হোল, ধুলোমুঠো ধরলে সোনামুঠো হোতে লাগল। দেশহিতকর কাজও দু-চারটা যে না করেচেন এমন নয়, পয়সা যথেষ্ট হয়েচে। ছেলেরা বলে—ভালো গাড়ী কিনুন বাবা। একখানা মার্সেডিজ্ বেন্‌জ দেখে এলাম কাল—খরগোশের মত নিঃশব্দে চলে—কি ফোর্ড গাড়ীতে চড়বেন চিরদিন!

যুদ্ধের আগেকার কথা অবিশ্যি। তেলের অভাব ছিল কি?

কিছু ক্যালকাটা প্রপার্টিজও করলেন, যার জন্যে কলকাতার বড়লোকেরা হাঁ করে থাকে। বাড়ী বিক্রী থাকলেই রায় বাহাদুর কিনবেন। এটর্নির আপিসে গিয়ে হয়তো জানা গেল থার্ড মর্টগেজ। প্রথম দুই বন্ধকী খতের টাকা শোধ দিয়েও বাড়ী কিনেচেন, জেদের বশবর্তী হয়ে। দিনকতক জমি কেনাবেচা আরম্ভ করলেন। এই লেক অঞ্চলে, বালিগঞ্জ স্টোর রোড, গড়িয়াহাটা অঞ্চলের অনেক বাড়ী তাঁর জমির ওপর। এসব কাজে ঠকেচেনও অনেক, দায়শূন্য ভেবে যে সম্পত্তিতে হাত দিয়েচেন, রেজিস্ট্রি আপিসে অনুসন্ধান করে দেখা গেল তার অবস্থা কাহিল। মানুষকে বিশ্বাস করা যে কত বিপজ্জনক!

আজ সব করেও তিনি ফুরিয়ে গিয়েচেন। বড় ছেলে আপিসে বেরোয়। ভালো কাজ বোঝে, তাঁর অভাব কেউ অনুভব করে না আপিসে, ঘরেও না। মেয়ে-ছেলেরা এখন মালিক হয়েচে, নিজেরাই ব্যবস্থা করে, তাঁকে জিজ্ঞেসও করে না অনেক সময়। কেবল

গিন্নী এখনো পুরোনো দিনের সুর বজায় রেখেচেন, তাঁকে না হুকুম করলে গিন্নীর চলে না। মুখ-নাড়া মুখ-ঝাড়া সব তাঁরই ওপরে। আসলে পুত্রবধূদের প্রতাপে তিনিও প্রায় অর্ধ বাতিল। সুন্দরী বড় পুত্রবধূটির দাপট সবচেয়ে বেশি, কলেজে-পড়া মেয়ে, মুখের কাছে কেউ এগোতে পারে না, মুখের সৌন্দর্যে ত্রিভুবন জয় করতে পারে। বাড়ীর ঝি-চাকর তার কথায় মরে-বাঁচে। বুড়ো-বুড়ীকে বড় কেউ একটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না।

তাই তো বলচেন, তিনি ফুরিয়ে গিয়েচেন। একষট্টি বছরেই ফুরিয়ে গেলেন।

আজ গাড়ীর পঞ্চম চক্রের মতই তিনি অনাবশ্যক। ওই রাতুলপুরে তিনি প্রথম প্রেমে পড়েন। পুরুত-গিরি করতেন বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী, তাঁর মেয়ে, নাম নিরুপমা। শহরের তুলনায়—তাঁর বড় পুত্রবধূ প্রতিমার তুলনায় হয়তো নিরুপমা তত কিছু ছিল না, তবুও সে সুন্দরী ছিল, মুখশ্রী কিন্তু চমৎকার। বাড়ীতে আর কেউ থাকতো না পুরুত ঠাকুরের, নিরুপমার সঙ্গে বুড়ো জলপাই-গাছের তলায় দুপুরের ছায়ায় লুকিয়ে দেখা হোত মাঝে মাঝে। ষোল বছরের সুশ্রী কিশোরী।

একদিন নিরুপমা দুটি পাকা আতা দু হাতে নিয়ে এসেছিল।

হেসে বললে—তুমি আতা খাও?

—কেন খাবো না?

—এই নাও। আমাদের গাছের আতা।

—শুধু আতা দিলে আতা নেবো না—

নিরুপমা চোখ বড় বড় করে বললে—তবে কি?

—আর কিছু দিতে হবে ঐ সঙ্গে—

—কি?

—এই দেখিয়ে দিচ্ছি কি—সরে এসো—

—ধ্যেৎ—ভারি দুষ্ট তো!...

হাত ছাড়িয়ে নিরুপমা ছুটে পালিয়ে গেল হরিণীর মত চটুল গতিতে।...

আর এক দিন।

বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী সেদিন তাঁর মায়ের তিথি উপলক্ষে ব্রাহ্মণভোজনে গ্রাম্য মাস্টারটিকেও নিমন্ত্রণ করেচেন। খেতে বসেচেন ভাবী রায় বাহাদুর। পরিবেষণ করচে নিরুপমা, আরও পাঁচ-ছ জন ব্রাহ্মণ একত্র খেতে বসেচে। হঠাৎ খেতে খেতে মুখ তুলে দেখলেন নিরুপমা ঘরের মধ্যে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাঁর দিকে চেয়ে আছে। উনি ঈষৎ হেসে ফেলতেই নিরুপমাও মৃদু হেসে জানলা থেকে সরে গেল।

কালকের কথা বলেই মনে হচ্ছে।

অথচ কত কাল হয়ে গেল—চল্লিশ বছর!

আজও চোখ বুজলে নিরুপমার সে সলজ্জ দুষ্টুমির হাসি তিনি দেখতে পান। এক-আধ দিন নয়, এ রকম কত ঘটনা ঘটেছিল এক বছর ধরে। নিরুপমার সঙ্গে তাঁর বিবাহের প্রস্তাবও হয়েছিল। বিবাহ হয়েও যেতো কিন্তু গ্রামের বিধুভূষণ মজুমদার এক সামাজিক জোট পাকালেন। রায় বাহাদুর কিশোরকুণি থাকের ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ কৃষ্ণনগরের রাজারা যে বংশের। তখনকার আমলে কিশোরকুণি থাকের পাত্রকে কুলীনেরা কন্যাদান করতেন না। সেকালে এমনিই ছিল। বিবাহ ভেঙে গেল। রায় বাহাদুর বিদেশী লোক, কেউ তাঁকে খব দেবওয়ার ছিল না। বিবাহের দিন নিরুপমা কেঁদেছিল, না কাঁদে নি?

শুধু এই সংবাদটা পাবার জন্য রায় বাহাদুর কত চেষ্টা করেচেন, কেউ এ সংবাদ তাঁকে দিতে পারে নি। আর কখনো নিরুপমার সঙ্গে তাঁর দেখাও হয় নি।

কেই বা তাঁকে সংবাদ এনে দেবে?

এই ঘটনার কিছু দিন পরে রায় বাহাদুর সে গ্রাম ত্যাগ করে আসেন। আর যান নি কোনো দিন। জীবনের প্রথম প্রেম, সে সব দিনের কথা ভাবলেও হারানো যৌবন আবার ফিরে আসে যেন।

ওখান থেকে চলে আসবার পর তিনি কতবার ভেবেচেন, নিরু আজ কোথায় আছে? কেমন আছে? তাঁর জন্য নিরু কি ভেবেছিল?

এ সংবাদ তাঁকে আর কেউ দেয় নি। বিবাহ করেছিলেন বড়লোকের সুন্দরী মেয়েকে। কিন্তু নিরুকে ভোলেন নি কোনো দিন। প্রথম প্রথম খুবই ভাবতেন, মধ্যে দশ-বিশ বছর আর তেমন ভাবতেন না, অর্থ উপার্জনের নেশায় ভুলে ছিলেন। এখন আবার মাঝে মাঝে মনে হয়।

একটি তরুণ যুবক এসে কিছু দূরে একটা নারকোল গাছের তলায় দাঁড়ালো। এ-দিক ও-দিক চেয়ে যেন সে কাউকে খুঁজচে। রায় বাহাদুর সচকিত হয়ে উঠলেন। ছোকরা নিশ্চয়ই ওর প্রেমিকার সন্ধানে এসেচে। তাঁর ছোট ছেলে অমিয়জীবনের বয়সী। আজকাল অমনি হয়েচে যে। তাঁদের সময়ে কিছুই ছিল না। তরুণী অভিসারিকাদের পক্ষে স্বর্ণযুগ চলেচে এটা। কই, ছোকরা একা বসে আছে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে, তিনি কই? মানে, মা লক্ষ্মীটি? এখনো আসেন না কেন?

আজ রায় বাহাদুরের ইচ্ছে হোল রাতুলপুরে যাবেন। একবার গিয়ে দেখে আসবেন। তাঁর মনে হচ্ছে, চল্লিশ বছর যেন কেটে যায় নি, তিনি নব্য যুবকই আছেন, ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফ আছে তাঁর, যেন তিনি ব্লাডপ্রেসারে ভুগচেন না আজ দু বছর, যেন তাঁর বাত হয় নি সেবার আশ্বিন মাসে এবং বাতে কিছুদিন শয্যাশায়ী হয়ে ছিলেন না—যেন রাতুল-পুরের আম শিমুল জাম কাঁটালের ঘন ছায়ানিকুঞ্জে চিরযৌবনা নিরুপমা আজও কিশোরী, তাঁরই আশায় পথ চেয়ে বসে আছে।

গাছতলায় সেই যুবকটি কিছু দূরে একটা বেঞ্চির ওপর হতাশ ভাবে বসে পড়েছে। বেচারী!

সেই রাত্রেই রায় বাহাদুর মনে মনে ঠিক করে ফেললেন। তিনি রাতুলপুরে যাবেনই। কাল সকালে উঠেই যাবেন। ছোট মেয়ে সুমিতা এসে বললে—বাবা, রাত্রে কি খাবে? বৌদিদি বলে পাঠালেন—

রায় বাহাদুর মুখ খিঁচিয়ে বললেন—কেন, তিনি কি জানেন না আমি রাতে কি খাই? যাও পর্দাটা তুলে দাও—

সুমিতা মুখের অপূর্ব ভঙ্গি করে চলে গেল। রায় বাহাদুরের দোতলার দক্ষিণ-মুখী বসবার ঘর। সামনের দেওয়ালে সবই জানালা। সুমিতা জানালার পর্দা খুলে দিয়ে চলে গেল। পুরু গদি-আঁটা গিল্টি কৌচে বসে সেড দেওয়া লম্বা ডালের আলোতে রায় বাহাদুর অন্যমনস্ক ভাবে একখানা বাংলা মাসিক পত্রিকার পাতা ওল্‌টাচ্ছিলেন। এসব পত্রিকা-টত্রিকা এনেচে মেয়ে বা বৌমারা, তিনি এসব পড়েন না।

বড় পুত্রবধূ প্রতিমা রূপের হিল্লোল তুলে ঘরে ঢুকে বললে—আমায় ডেকেচেন?

—হ্যাঁ। আমি কি খাবো জিজ্ঞেস করে পাঠিয়েচ কেন? আমি কি খাই?

প্রতিমা জানে শ্বশুর বৃদ্ধ হয়ে ইদানীং খিট্‌খিটে হয়ে পড়েচেন। সে সান্ত্বনার সুরে বললে—না, সে জন্যে না। আপনি দুদিন কিছু খাচ্চেন না রাত্রে, বলেন সাবু করে দাও। তা আজও কি সাবু খাবেন, না লুচি খানকতক গরম গরম করে আনবো—ভালো মাগুর মাছ আছে কিনা, তাই বলে পাঠালুম—

—মাগুর মাছের কথা কেউ আমাকে তো বলে নি। সবাই হয়েচে—

—তা হলে দুখানা লুচিই আনি গে ভেজে।

—হ্যাঁ, রাত তিনটে কোরো—

—দশ মিনেটের মধ্যে আনচি বাবা।

না, এ সংসারে সুখ নেই। তাঁর মুখের দিকে কেউ তাকায় না।

গিন্নি কি এতই ব্যস্ত যে একবার এসে তাঁর খাওয়ার খোঁজ নিতে পারেন না? আজ যদি—

প্রতিমা একটু পরেই রুপোর থালায় লুচি সাজিয়ে ও একটা খুরো বসানো ছোট রুপোর বাটিতে মাছের ঝোল নিয়ে ঘরে ঢুকলো। রায় বাহাদুর বললেন—তোমার শাশুড়ী কি করচেন?

প্রতিমা সুললিত ভঙ্গিতে আঁচল সামলে নিয়ে বললে—মা ঠাকুরঘর থেকে বেরোন নি তো?

—বেশ, বেরুতে হবে না।

—বসুন, জল নিয়ে আসি বাবা, টেবিলেই খাবেন তো?

রায় বাহাদুর বিরক্তির সঙ্গে বললেন—রেডিওটা সর্বদা ঝং ঝং করলে আমার মাথা ধরে যায়। কে খুলেচে রেডিও? ছোট বৌমা বুঝি? বন্ধ করে দাও—ও নাকিসুরে গান সর্বদা বরদাস্ত করতে পারি নে—

রাতুলপুরেই যাবেন তিনি। অসহ্য হয়ে উঠেছে এ সংসার। শান্তি বলে জিনিস নেই এখানে। একবার গিয়ে ঘুরে আসবেন প্রথম যৌবনের শত মধুস্মৃতিমাখা গ্রামটিতে। হয়তো নিরুপমার সঙ্গে দেখা হয়েও যেতে পারে—অন্ততঃ সেই সব জায়গাতেও আবার গেলে জীবনের একঘেয়েমিটা কেটে যাবে।

মাথা ধরেচে বেজায়। শুধু ওই রেডিওটার জন্যে। কতবার তিনি বারণ করেচেন—কিন্তু এ বাড়ীতে তাঁর কথা কেউ আমলে আনে? সাধে কি তিনি—শরীর কেমন ঝিম ঝিম করচে।

মধ্যরাত্রে বড় পুত্রবধূ প্রতিমার ছোট খোকাটি জেগে মায়ের ঘুম ভাঙালো। প্রতিমা উৎকণ্ঠ হয়ে শুনলো দোতলায় শ্বশুরের ঘর থেকে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক গোঙানির শব্দ আসচে। সে তখুনি নিচে এসে সকলের ঘুম ভাঙালো। রায় বাহাদুর বিছানায় গুটিশুটি হয়ে অস্বাভাবিক ভাবে শুয়ে আছেন, তাঁর মুখ থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ বার হচ্চে। বড় ছেলে বাড়ী নেই। ছোট ছেলে ফোন করে দিলে ডাক্তারকে। তারপর নিজেও ছুটলো। খুব হৈ-চৈ উঠলো। সবাই ঝুঁকে পড়লো বিছানার ওপরে, বড় মেয়েকে আনতে মোটর ছুটলো বাগবাজারে। ঝি, চাকর, মেয়ের দল, নাতি-নাতনীরা মিলে লোকে লোকারণ্য ঘরের ভেতর। রায় বাহাদুর কি একটা বলচেন অস্পষ্ট গোঙানির মধ্যে—কেউ বুঝতে পারচে না। প্রতিমা কান পেতে ভালো করে শুনে বললে—নিরু কে? নিরু কার নাম? নিরু নিরু করে যেন কি বলচেন।

ডাক্তার এসে বললে, স্ট্রোক হয়েচে। সেবাশুশ্রূষা চললো, বড় ছেলেকে টেলিগ্রাম করা হল রংপুরে। সেখানে সে যুদ্ধের বড় কনট্রাক্টারির কাজে গিয়েচে। ট্রাঙ্ককল করা গেল মেজ ছেলেকে ঝরিয়ার কয়লার খনিতে।

সেদিন বেলা বারোটার আগে রায় বাহাদুর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

সন্ধ্যার কিছু আগে নীরেন ট্রেন হইতে নামিল। তাহার জানা ছিল না এমন একটা ছোট্ট স্টেশন তাদের দেশের। কখনো সে বাংলা দেশে আসে নাই ইতিপূর্বে এক কলিকাতা ছাড়া।

নীরেনের দাদামশাই রায় বাহাদুর শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে গিয়া সে যেন জল না ফুটাইয়া খায় না, মশারি ছাড়া শোয় না, নদীর জলে না স্নান করিয়া তোলা জলে স্নান করে। নীরেনের স্বাস্থ্যটি বেশ চমৎকার, ডাম্বেল মুগুর ভাঁজিয়া শরীরটাকে সে শক্ত করিয়া তুলিয়াছে, বড়লোকের দৌহিত্র, অভাব অনটন কাহাকে বলে জানে না। মনে নীরেনের বিপুল উৎসাহ। চোখের স্বপ্ন এখনও কাঁচা, সবুজ।

একটা লোক প্ল্যাটফর্মের প্রান্তে দাঁড়াইয়া প্ল্যাটফর্মে সাজানো দূর্বাঘাসের ওপর গরু ছাড়িয়া দিয়া গরুর দড়ি হাতে দাঁড়াইয়া ছিল। নীরেনের আহ্বানে সে নিকটে আসিল। নীরেন বলিল—রামচন্দ্রপুর কতদূর জানো?

লোকটা বলিল—কেন জানবো না? মেটারি রামচন্দ্রপুর তো? এখেন থে ঝাড়া তিনকোশ পথ—

—তিন কোশ!

—হ্যাঁ বাবু। কনে যাবেন সেখানে?

—বাঁড়ুয্যে বাড়ী।

—তা যান বাবু এই পথ দিয়ে—

নীরেনের কাছে এ সব একেবারেই নতুন। এই আসন্ন সন্ধ্যায় মাঠের মধ্যের পথ দিয়া সে যাবেই তিনক্রোশ দূরের গ্রামটিতে। ওই মাঠের মধ্যে কত মাটির ঘরে ভর্তি পাড়াগাঁর পাশ কাটাইয়া তাহাকে যাইতে হইবে। মাত্র ছাব্বিশ বৎসর বয়স যার—দুনিয়া তার পায়ের তলায়, সে অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে স্বর্ণখনির সন্ধানে বাহির হইতে পারে, সে উত্তরমেরু অভিযানে একঘণ্টার নোটিশে যোগ দিতে পারে, মাত্র একটা স্যুটকেসের মধ্যে টুথব্রাশ আর তোয়ালে পুরিয়া।

চৈত্র মাস। স্টেশনের পিছনে মাঠের ধারে বড় একটা নিমগাছ। ফুটন্ত নিমফুলের ভুরভুরে সুবাস বাতাসে। নিমগাছ অবশ্য তাদের আলিগড়েও আছে, কিন্তু এমন রহস্যময়ী অজানা সন্ধ্যা মাঠের প্রান্তে তাহার জীবনে কটা নামিয়াছে?

নীরেন জানে, যদিও সে দিল্লী ও আলিগড়ে মানুষ, একবার কানপুরে আসিয়া ভাবিয়াছিল প্রায় বাংলাদেশের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে বুঝি। পাঞ্জাবের অসম জল-হাওয়ায় তার শরীর গড়িয়া উঠিয়াছে—হয় ভীষণ শীত, নয়তো দুর্দান্ত গরম—একশো বত্রিশ ডিগ্রী উত্তাপের হাওয়া গা-হাত-পা পুড়াইয়া বহিতেছে—সেখানে গ্রীষ্মের দুপুরে বসিয়া বসিয়া বাদশায়ী তয়খানা ও সুন্দরী ইরাণীদের স্বপ্ন লুর আগুনে ঝলসাইয়া যায়।

নীরেন মাঠের মাঝখানের পথ বাহিয়া হন্ হন্ করিয়া হাঁটিয়া চলিল। দূর মাঠের প্রান্তে চাঁদ উঠিতেছে—নিশ্চয় আজ পূর্ণিমা, নতুবা সন্ধ্যার পরে চাঁদ উঠিবে কেন? দুখানা গ্রাম পথে পড়ে—রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া গ্রাম্য লোকেরা দেখিতেছে। একজন বলিল—কনে যাবা?

—রামচন্দ্রপুর।

—বাড়ী কনে?

—কলকাতা।

কলকাতা বলাই সহজ, কারণ আলিগড় বলিলে ইহারা কিছুই বুঝিবে না। কিছুদূর গিয়া আর একটি ক্ষুদ্র পল্লী—নীরেন্দ্র নাম জিজ্ঞাসা করিল। রাস্তার ধারেই একটা পুরানো কোঠাবাড়ী, গোটা দুই নারিকেল গাছ, দুটি বড় ধানের গোলা নারিকেল গাছটির তলায়। জন পাঁচ-ছয় লোক গোলার কাছে উঠানে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে কথা-বার্তা বলিতেছে—নীরেনকে দেখিয়া বলিল—বাড়ী কোথায়?

—কলকাতায়।

—এদিকি কোথায় যাওয়া হবে?

—রামচন্দ্রপুর।

তাহারা পরস্পর চাওয়াচায়ি করিয়া বলিল—এই রাত্তিরি সেখানে যাতি পারবেন না।

নীরেন বলিল—কেন?

—তিনকোশ পথ এখান থেকে, তা ছাড়া গরম কাল, মাঠের পথ, সাপ-খোপের ভয়। কার বাড়ী যাবা রামচন্দ্রপুর?

—বাঁড়ুয্যে-বাড়ী।

—কোন বাঁড়ুয্যে-বাড়ী? সে গাঁয়ে ব্রাহ্মণ তো নেই?

—এক বুড়ী আছে না?

—আছেন বটে এক মা ঠাকরোন। ওই বাঁওড়ের ধারে গোলাবাড়ীতে থাকেন। তা তিনি আবার মাঝে মাঝে তাঁর জামাইয়ের বাড়ী যান কিনা? দেখুন, আছেন কিনা।

সেখানে পৌঁছাইতে নীরেনের বস্ত রাত হইয়া গেল। গ্রামটিতে চারিধারে বাঁশবন আমবনের নিবিড় ছায়া, প্রথমেই গোয়ালাদের পাড়া, তারপর বড় মাঠ একটা, গোটা দুই বড় পুকুর, শেওলায় ও কচুরীপানায় ভর্তি।

পথের ধারে একটা খড়ের ঘরে তখনও টিম টিম করিয়া আলো জ্বলিতেছিল। নীরেনের প্রশ্নের উত্তরে একটি লোক উত্তর দিল, সেই গ্রামই রামচন্দ্রপুর বটে। বাঁড়ুয্যেবাড়ীর বুড়ী? হ্যাঁ, আর একটু আগে বাঁওড়ের ধারে সারি সারি নারিকেল গাছওয়ালা বড় আটচালা খড়ের ঘর।

নীরেন বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিল। বড় একখানা আটচালা ঘরের পাশে ছোট রান্নাঘর, সেখানে আলো জ্বলিতেছিল।

নীরেন উঠানে দাঁড়াইয়া ডাকিল—বাড়ীতে কে আছেন?

একটি বৃদ্ধা টেমি হাতে বাহিরে আসিয়া বলিল—কে ডাকে?

—আমি।

—কে বাবা তুমি?

—আমাকে কি চিনতে পারবেন? আমি আলিগড় থেকে আসচি।

বুড়ী টেমিটা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া নীরেনের মুখ দেখিবার চেষ্টা করিল। তাহার মুখে কৌতূহল ও সন্দিগ্ধতার রেখা। হাতের তালু চোখের উপর আড় করিয়া ধরিয়া আলো হইতে চোখ বাঁচাইবার ভঙ্গি করিয়া আরও দু-এক পা আগাইয়া আসিয়া বলিল—কে বাবা?

—আমার বাবার নাম রাজকৃষ্ণ মুখুয্যে—

বুড়ী আপনমনে বিড়বিড় করিয়া বলিল—রাজকেষ্ট? রাজকেষ্ট?

—আমাদের পৈতৃক বাড়ী ছিল গড় মুকুন্দপুর—আমার ঠাকুরদাদার নাম 'তারিণী-চরণ মুখুয্যে—আমার মায়ের বাপের বাড়ী ছিল সামতাবেড়ে, মায়ের নাম ছিল অমিয়-বালা—

—ও! এখন বুঝলাম। তুমি আমার মেয়ের সইয়ের ছেলে!

—হ্যাঁ দিদিমা।

—এসো এসো ভাই! কত কালের কথা সব। তোমাদের মুখ দেখে মরবো এইটুকু বোধ হয় ছিল অদেষ্টে। আর সবাই ছেড়ে গিয়েচে বাবা, শুধু আমিই পড়ে আছি!

—সইমা কোথায়?

—সে তো আজকাল এখানে থাকে না। সে থাকে তার শ্বশুরবাড়ী, এই পাশের গাঁ।

—আমি তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে এসেচি।

—আজ রাত্তিরে এখানে থাকো। কাল যেও এখন সকালে। এখান থেকে দু-কোশ।

—এই যে বললেন পাশের গাঁ?

—মধ্যে মাদারহাটির মাঠ আর জলা পড়ে যে ভাই। দু-কোশের বেশী ছাড়া কম হবে না।

নীরেন হাত পা ধুইয়া ঠাণ্ডা হইয়া বসিল। এ যেন নতুন একটা জগতে সে আসিয়া পড়িয়াছে। এমন দেশে সে কখনো আসে নাই। যে দেশে তাহার জন্ম, সে দেশে এত বনজঙ্গল কেহ কল্পনা করিতে পারে না গ্রামের মধ্যে। নতুন ধরনের গাছপালা, অসংখ্য পাখীর কলকাকলী, বনফুলের মৃদু সৌরভ। বুড়ীর রান্না শেষ হইতে রাত দশটা বাজিল। কেবল সোঁদা সোঁদা মাটির গন্ধ বাহির হওয়া লেপাপোঁছা মাটির ঘরের দাওয়ায় কলার পাতা পাতিয়া বুড়ী তাহাকে খাইতে দিল। রাঙা আউশ চালের ভাত, পেঁপের ডালনা, সোনামুগের ডাল, উচ্ছে ভাজা, আলুভাতে, ঘন আওটানো সরপড়া দুধ, দুটি পাকা কলা, একদলা আখের গুড়ের পাটালি। অদ্ভুত রান্না বুড়ীর হাতের। আলিগড়ের পশ্চিমা পাচকের হাতের রান্না খাইয়া সে আজীবন অভ্যস্ত—এমন চমৎকর রান্নার সঙ্গে পরিচয় ছিল না!

উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সুরে বলিল—এমন রান্না কখনো খাই নি দিদিমা! শুনতাম বটে বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়ের রান্নার কথা—কিন্তু এ যে এমন চমৎকার, তা ভাবি নি—

বুড়ী হাসিয়া বলিল—রান্না করতে পারতেন আমার শাশুড়ী। তাঁর কাছেই সব শেখা। ডাকসাইটে রাঁধুনী ছিলেন আটখানা গাঁয়ের মধ্যি—

বুড়ীর কথার মধ্যে যশোর জেলার টান নীরেনের বড় ভাল লাগিল।

শুইয়া শুইয়া উঠানের নারিকেল বৃক্ষশ্রেণীর পাতার কম্পন দেখিতে দেখিতে নীরেন ভাবিতেছিল, এই তাহার স্বদেশ, তাহার অতি প্রিয় স্বদেশ। এই তাহার মায়ের জন্মভূমি, পিতার জন্মভূমি, পূর্বপুরুষদের জন্মভূমি—বাংলা দেশ। কেন এতকাল সে মাতৃভূমিকে ভুলিয়া ছিল? ভাগ্যের দোষ। সে কি জানিত এত সৌন্দর্য বাংলাদেশের রাত্রির অন্ধকারে? গন্ধভরা অন্ধকারে? পাখীর ডাকের মধুর তান সে হিমালয়ে শুনিয়াছে। আলমোড়ায় ল্যান্সডাউনে শুনিয়াছে। তাহার ধনী মাতামহের সঙ্গে কয়েকবার সেসব স্থানে সে গিয়াছিল। দেবতাত্মা নগাধিরাজ মাথায় থাকুন—মাথায় থাকুক ক্যামেলস-ব্যাক-এর অপূর্ব দৃশ্য, মুসৌরীর অতুলনীয় গিরিশোভা—এখানকার পক্ষীকুলের সুমিষ্ট কাকলী যেন বহু পরিচিত বিগত দিনের প্রিয়জনের বার্তা বহন করিয়া আনে, কত দিনের ঘরোয়া কাহিনী এদের সঙ্গে জড়ানো।

বুড়ী বলিল—ঘুম হচ্চে না ভালো গরমে বুঝি? পাখা নেবা একখানা?

—না দিদিমা। নতুন জায়গা বলে ঘুম আসচে না, গরমে নয়।

—এবার ঘুমিয়ে পড়ো ভাই—

—হ্যাঁ দিদিমা—?

—কি ভাই?

—আমার বাবাকে আপনি দেখেছিলেন?

—না ভাই. আমার কোথাও যাতায়াত ছিল না। শুনিচি তাঁর কথা, দেখি নি কখনো—তোমাদের গাঁ ছিল তো—

—গড় মুকুন্দপুর।

—নাম শুনিচি, তবে যাই নি সেখানে।

সকালে উঠিয়া বুড়ী বলিল—হ্যাঁ ভাই, তোমরা শহরের লোক, সকালে কি খাও?

নীরেন হাসিয়া বলিল—যা খাই, তা কি দিতে পারবেন দিদিমা? চা?

বুড়ী বলিল—ও আমার পোড়া কপাল! ও-সব যে কখনো খাই নি ভাই, ওসবের পাটও নেই। একটু বেলের শরবত করে দি। ডোবার ধারের বেলগাছটায় কাল দুটো পাকা বেল পেইছিলাম ভাই।

চায়ের বদলে বেলের শরবত! উপায় কি? খাইতেই হইল তাহাকে। বুড়ী বলিল—তুমি কি মনে করে এসেছিলে ভাই?

সেই কথাটা বলাই নীরেনের পক্ষে শক্ত। সে যে জন্য আসিয়াছে প্রিয় পৈতৃক পল্লী-গ্রামটিতে, বৃদ্ধা কি সে কথা বুঝিতে পারিবে? সে বলিল—বেড়াতে এলাম দিদিমা।

—এর আগে কখনো আস নি?

—না দিদিমা।

দুপুরের আগেই তাহার যাওয়ার ইচ্ছা ছিল এখান হইতে, কিন্তু বুড়ী ছাড়িল না। দুপুরের পরে রোদ অত্যন্ত চড়িল। বেলা চারটার আগে বাহির হওয়া সম্ভব হইল না। যাইবার সময় বুড়ী তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিল—এসো, এসো ভাই, তোমার সইমার সঙ্গে দেখাশুনো করে আবার এখানে আসবে কিন্তু। ভুলে যেও না ভাই। আচ্ছা ভাই।

আধ ঘণ্টার মধ্যে নীরেন আসিয়া মাদারহাটির মাঠ ও জলার মধ্যে পড়িল। প্রকাণ্ড বিল, পদ্মফুল ফুটিয়া থৈ থৈ করিতেছে, পদ্মের পাতার ভিড়ে জল দেখা যায় না, একদিকে একটি অন্তরীপ মতন স্থানে অনেকগুলি বড় বড় গাছ—নীরেনের ইচ্ছা হইল ওই গাছগুলির তলায় সে কিছুক্ষণ বসিয়া বিশ্রাম করে। এই সুন্দর জলাভূমি যেন কাশ্মীরের ডাল বা উলার হ্রদের মত শোভাময়, কিন্তু এসব স্থানে টুরিস্ট ব্যবসায়ীদের ঢাক পিটানোর শব্দ নাই, সুতরাং এমন সুন্দর একটি সৌন্দর্যময় স্থানে কখনো কেহ আসে না।

সইমাদের গ্রামটিতে জঙ্গল তত নাই—ব্রাহ্মণপাড়ায় অনেকগুলি কোঠাবাড়ী, প্রায়ই সব চাষী গৃহস্থ, বড় বড় গোলা উঠানে, গোয়ালবাড়ী ভর্তি গরু। একজনের উঠানে দোতলা বাড়ী তৈয়ারি হইতেছে, উঠানের বাতাবী লেবু গাছের তলায় মজুরেরা দুমদাম শব্দে সুরকি ভাঙিতেছে। নীরেন সেখানে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—চক্রত্তিদের বাড়ী যাব কোন দিকে?

একজন বলিল—কোন চক্কত্তি? অনেক চক্কত্তি আছে এ গাঁয়ে।

—ভুবনমোহন চক্কত্তি—

—সে ও পাড়ায়। ওই তেঁতুল গাছের পাশের রাস্তা দিয়ে যান—

আধঘণ্টা পরে সে সইমাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার প্রদত্ত পিঁড়িতে বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছিল। নীরেন দেখিল তাহার সইমার বয়স খুব বেশি নয়, মাথার চুল এখনও একগাছি পাকে নাই, বরং বেশ ফর্সা, দোহারা চেহারা. এক সময় যে ইনি সুন্দরী ছিলেন, এখনও দেখিলে বোঝা যায়।

সইমা চোখের জল ফেলিলেন। অনেক আশীর্বাদ করিলেন। পাকা বেলের শরবত,

মুগের ডাল ভিজানো ও আখের গুড় খাইতে দিলেন। সইমাকে পাইয়া নীরেন যেন হারানো মায়ের সান্নিধ্য বহুদিন পরে অনুভব করিল। সে সইমাকে কখনো দেখে নাই এর আগে। সইমা কিন্তু তাহাকে দেখিয়াছিলেন সে যখন দুই বৎসরের খোকা তখন। প্রৌঢ়া মহিলার বহু পুরানো দিনের শোকস্মৃতি উথলাইয়া উঠিল আজ তাহাকে পাইয়া। এমন কত লোকের নাম করিতে লাগিলেন যাহাদের কথা মায়ের মুখে আলিগড়ে নীরেন শুনিত বাল্যকালে—কত বাল্যস্মৃতি-জাগানো নামাবলী। দেশের-ঘরের সব লোকের নাম। বাঁচিয়া আছে কেউ কেউ এখনও—তবে বেশির ভাগই মারা গিয়াছে।

সইমা বলিলেন—তোর মুখে সইয়ের মুখ যেন মাখানো রয়েচে—

নীরেন হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল।

—সই বড় সুন্দরী ছিল। গ্রামের কাজকর্মে যখন সেজেগুজে নেমন্তন্ন খেতে কি বিয়েথাওয়ায় জল সইতে যেতো তখন লোকে দু দণ্ড চেয়ে দেখতো। এদানি রোগে শোকে আর কিছু ছিল না চেহারার। এখান থেকে চলে যাওয়ার পরে আর কখনো দেখা হয় নি সইয়ের সঙ্গে। সে কতদিন হবে রে নীরু?

নীরেন মনে মনে হিসাব করিয়া বলিল—তা প্রায় তেইশ চব্বিশ বছর হল।

—সই মারা গিয়েচে কতদিন?

—বেশি দিন না, বললাম যে বছর পাঁচেক হবে।

—তাহলে সই বেঁচে থাকলে এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েস হোত—

—তা হবে, আমারও হোল ছাব্বিশ। আপনার ছেলেও তো আমার বয়সী হবে, না সইমা?

সইমা আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন—কোথায় ছেলে বাবা? সে ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েচে অনেক কাল।

রাত্রে নীরেন খাইতে বসিয়াছে, সইমা সামনে বসিয়া খাওয়ার তদারক করিতেছেন।

নীরেন বলিল—আপনার আর দিদিমার রান্না সমান। এমন রান্না অনেকদিন খাই নি।

সইমা বলিলেন—তোর মাও ভাল রাঁধতো রে—যখন কপাল পুড়লো, এ দেশ থেকে সেই পশ্চিমে চলে গেল, তখন সে কি কান্না! বলে—সই, আর কি তোর সঙ্গে দেখা হবে? এই যাওয়াই আমার শেষ যাওয়া। সে ভাগ্যিমানী স্বগ্‌গে চলে গেল, আমিই রইলাম পড়ে।

নীরেন হাসিয়া বলিল—আপনি না থাকলে আজ কার মুখ চেয়ে এখানে আসতাম, বলুন সইমা? সইমা দুধের বাটি নীরেনের সামনে রাখিয়া পাখার বাতাস দিয়া দুধ জুড়াইতে জুড়াইতে বলিলেন—তোকে যত্ন করবার দিন যখন আমার ছিল, তখন এলি নে। এখন কি আছে সইমার, কি দিয়েই বা তোকে যত্ন করবো? হ্যাঁরে, এতদিন পরে কি মনে করে এলি ঠিক বল তো?

—বলি সইমা, আপনি বুঝতে পারবেন। জানেন, আমি দুবছর বয়সে বাংলা দেশ ছেড়ে গিয়েছিলাম?

—সে তো খুব জানি।

—আর কখনো এদেশে আসি নি এর মধ্যে?

—তাও জানি।

—এতকাল পরে মায়ের ও বাবার বাক্সের কতগুলো পুরনো চিঠি পড়লাম সেদিন। পড়ে মনটা বড় ব্যাকুল হল জন্মভূমি দেখবার জন্যে। সে সব চিঠিতে আপনার নাম আছে, আমার এক পিসিমার নাম আছে। আমি বাবাকে কখনো দেখি নি, তাঁর সম্বন্ধে, আমার ঠাকুরদার সম্বন্ধে—আরও অনেক নাম আছে আমার এক পুরনো খাতার মধ্যে—সকলের সম্বন্ধে আমার জানবার বড় ইচ্ছে হোল। আমি জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত মামার বাড়ীর সকলকে

দেখে আসচি, বাপের বাড়ীর বা নিজের বংশের খবর রাখি নে। সেই সব খুঁজেপেতে বার করবো বলেই এলাম।

—ওমা আমার কি হবে! কোথাকার পাগল ছেলে দ্যাখো—

—না সইমা, আপনি ভেবে দেখুন আমার মনের অবস্থা। আমার ছাব্বিশ বছর বয়স হয়েছে, কিন্তু এ পর্যন্ত আমাদের বংশের কোনো খবর রাখি নে! বাপের বাড়ীর কোনো লোকের কথা জানি নে! অথচ আমার ভয়ানক ইচ্ছে জানবার। আপনি হয়তো ভাববেন এ আবার কি, আমার কিন্তু সইমা ঘুম হয় না এই সব ভেবে—সত্যি বলচি—আপনি আমায় বলে দিন কি ভাবে আমি তা করতে পারি—আমি তো কাউকে চিনি নে—বাংলাদেশের ছেলে, কিন্তু কোনো খবর রাখি নে দেশের।

—সব বলে দেবো, এখন খেয়ে শুয়ে পড়ো দিকি দুষ্টু ছেলে আমার!

নীরেন হাসিল। অনেকদিন পরে যেন হারানো মাকে ফিরিয়া পাইয়াছে, সেই ধরনের হাসি সইমার মুখে। ভাগ্যিস সে আসিয়াছিল। শ্যামল বাংলা মা যেন সইমার মূর্তিতে তাহাকে সস্নেহে অভ্যর্থনা জানাইতেছেন।

চৈত্র মাসের রাত্রি। হু হু দক্ষিণা হাওয়া খোলা জানালা দিয়া বহিতেছে। কি একটা ফুলের তীব্র সুবাস বাতাসে। নীরেন বাংলাদেশের অনেক কিছু গাছপালা চেনে না—কিন্তু তাহার কী ভালো লাগে এই সব পল্লীগ্রামের আগাছা জঙ্গল! আজ দুদিন তিন দিন মাত্র ইহাদের সহিত পরিচয়—তবুও যেন মনে হয় কত দিনের নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় তাহার শিরা-উপশিরার রক্তের সহিত আবদ্ধ ইহাদের প্রাণস্পন্দন। এই সব বনস্পতির সহিত সেও একদিন তাহার প্রিয় জন্মভূমির এই মাটিতে জন্মিয়াছে।

সে একখানা খাতা আনিয়াছে সঙ্গে।

খাতাখানা তাহার পিতামহ ৺গদাধর মুখোপাধ্যায়ের স্বহস্ত-লিখিত। তাহাদের গ্রামের কত প্রাচীনদিনের তুচ্ছ গ্রাম্য ঘটনা ইহাতে কেন যে তাহার পিতামহ টুকিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনিই বলিতে পারিতেন। ক্ষুদ্র এক অখ্যাত পল্লীগ্রামের প্রাচীন ইতিহাসে কার কি ফল? অমন কত গ্রাম, কত অগুন্তি গ্রাম বাংলা দেশে। কে জানিতে চাহিতেছে তাহাদের ইতিহাস? গরজই বা কাহার?

আজ রাত্রে আলোর সামনে বসিয়া খাতাখানা সে খুলিয়া দেখিল। সইমা তাহার বিছানা নির্দেশ করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ঘরে সে একা। মাটির ঘর। ছোট জানালা, কাঠের গরাদ। জানালার বাহিরে একটা কি গাছে থোকা থোকা গাদা গাদা ফুল ঝুলিতেছে—কতক ফাটিয়া তাহাদের ভিতরকার রাঙা রাঙা বীচি বাহির হইয়াছে—দিনমানে নীরেন লক্ষ্য করিয়াছিল।

খাতার পাতায় লেখা আছে—

"২২শে চৈত্র। ১২৭২ সাল......"

এইটুকু পড়িয়াই নীরেন অবাক হইয়া যায়। কত কালের কথা! ১২৭২ সালেও পৃথিবী এমনি সুন্দর ছিল, এমনি বসন্ত নামিত এ পাড়াগাঁয়ের বন বুকে, এমনি কোকিল ডাকিত রাত্রি দিনে? সে তখন ছিল কোথায়? কোন্ অতীত দিনের কাহিনী এ সব?

মনে পড়ে আলিগড়ে তাদের দোতলার পড়ার ঘরে বসিয়া এই ডায়েরির পুরাতন তারিখগুলো সে পড়িয়া বিস্মিত হইত—কিন্তু তাহার চেয়েও অনেক বেশি বিস্ময় রহস্যের অনুভূতি আজ তাহার মনে।

তারপর লেখা আছে—

"আজ রামলোচন রায়ের প্রথম পক্ষের স্ত্রী উহাদের আমবাগানে হারাধন মুস্তাফির সহিত ধরা পড়িলেন। ইহা লইয়া আজ জ্যাঠামশায়দের চণ্ডীমণ্ডপে সারাদিন ডামাডোল

চলিতেছে। রামলোচনের স্ত্রী বলিয়াছেন তিনি নিদ্দোষ। আমের গুটি ঝড়ে পড়িতেছে, তাহাই কুড়াইতে গিয়াছিলেন, হারাধন মুস্তফির কথা কিছু জানেন না। আজ রামলোচন রায়ের স্ত্রীকে দেখিয়াছি। বয়স হইলেও চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। খুব সুন্দরী। সোনা কুমোরের বৌ ইহার কাছে দাঁড়াইতে পারে না—"

নীরেন এই ডায়েরিটুকু পড়িয়া কতবার মনে মনে হাসিয়াছে।

পিতামহ গদাধর মুখুয্যে বহুকাল সাধনোচিত ধামেই সম্ভবত প্রস্থান করিয়াছেন, নীরেনের মায়ের বিবাহ তখনও হয় নাই। সে পিতামহের কার্যের সমালোচনা করিতেছে না, তবুও মনে হয় এই কুম্ভকার বধূটির এইখানে উল্লেখ থাকার কারণ কি? বিশেষ করিয়া ঠাকুরদাদা ইহারই নাম করিলেন কেন? গ্রামের সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বলিয়া? না—

হায় রে সে ১২৭২ সাল! আর রামলোচন রায়ের নিরপরাধা সুন্দরী পত্নী যিনি নির্জন দুপুরে বাগানে আমের গুটি কুড়াইতে গিয়া হারাধন মুস্তফির সংগে নিজের নাম যোগ করিবার সুযোগ দিয়া মিথ্যা কলঙ্ক কুড়াইয়াছিলেন একদিন প্রায় আশি বৎসর পূর্বের এক সুমধুর কোকিলমুখরিত, পুষ্পসুবাসামোদিত, প্রেমোচ্ছল বসন্তদিনে— কোথায় তিনি। আর কোথায় তাঁহার রূপের প্রতিদ্বন্দ্বী সোনা কুম্ভকারের রূপসী বধূ? আজ এই সব পল্লীগ্রামের মাটিতে তাঁহাদের নাম নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়াই যাইত যদি না তাহার পরোপকারী পিতামহ গদাধর মুখুয্যে এত ঘটা করিয়া উক্ত বধূদ্বয়ের ইতিহাস তাঁহার ডায়েরিতে নিঃস্বার্থ ভাবে লিখিয়া রাখিতেন।

হাসি পাইবার কথাই তো।

নীরেন ডায়েরি বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল, কিন্তু আজ রাত্রে তাহার বংশের পূর্ব-পুরুষেরা যেন ভিড় করিয়া আশেপাশে তাঁহাদের অদৃশ্য অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছেন। তাঁহাদের ইতিহাস ভালো করিয়া জানিবার জন্যই তো সে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া বাংলা-দেশে তাহার জন্মভূমি অঞ্চলে আসিয়াছে এত কাল পরে। তাঁহারা ঘুমাইতে দিবেন না।

সকালে সইমা ডাকিয়া ঘুম ভাঙাইলেন—ও নীরু, ওঠ বাবা, বেলা ঝাঁ ঝাঁ করচে—

নীরেন ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল।

সইমা বলিলেন—তোর আবার চা খাওয়ার অভ্যেস আছে, না?

—ছিল তো সইমা।

—এখানে কি করি উপায় তাই ভাবচি—

—ভাবতে হবে না। এখানে না হোলেও চলবে।

—তা কি হয় বাবা? দেখি। যার যা অভ্যেস—

—না সইমা, কিছু চেষ্টা করতে হবে না। তা হলে আমি দুঃখিত হবো।

সইমা কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু আধঘণ্টা পরে এক পেয়ালা ধূমায়িত চা আনিয়া তাহার সামনে রাখিলেন এবং একটা বাটিতে একবাটি মুড়ি। রায়বাড়ী হইতে চা চাহিয়া আনিয়াছেন, সেখানে বাড়ীসুদ্ধ সবাই চা খায়।

নীরেন চা পাইয়া মনে মনে খুশী হইল। মুখে বলিল—কেন বলুন তো এ সব—পরের বাড়ী থেকে আনতে যাওয়া?

সইমা বলিলেন—তোর মা থাকলে করতো না?

—তা কি জানি।

—করতো রে করতো। শুনবি তোর মায়ের কথা?

—কি বলুন।

—তোর মা বড্ড শান্ত ছিল।

—মাকে আমি দেখেচি, শান্ত ছিলেন সবাই বল্‌তো।

—একবার সই আর আমি নাইতে গিয়েচি ঘাটে। সাঁতার দিয়ে দুই সই মিলে নদীর

মাঝখানে গিয়েচি। এমন সময় ঘাট থেকে কে চেঁচিয়ে বললে, নদীতে কুমীর এসেচে। আমরা তো তাড়াতাড়ি ঘাটের দিকে এগুচ্চি, এমন সময় সইকে আমি ভয়ে জড়িয়ে ধরলাম। সই যত বলে ছাড়ো ছাড়ো, দুজনে ডুবে যাবো, আমি ততই ভয়ে সইকে জড়াই।

নীরেন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বলিল—তারপর?

—তারপর আর কি? দুজনেই বেঁচে উঠলাম, একখানা নৌকো আমাদের এই অবস্থায় দেখতে পেয়ে ছুটে এল।

—তখন আপনারা একগ্রামেই থাকতেন?

—হ্যাঁ রে, নইলে আর সই বলবো কি করে। পাগল ছেলে আর কি!

কথাটা নীরেন সন্ধ্যাবেলা তাহার খাতায় লিখিয়া রাখে।

গ্রাম্য-জীবনের কোনো কথা বাদ দিতে চায় না। মরুপর্বত ভেদ করিয়া সুদূর পাঞ্জাব হইতে ছুটিয়া আসা (কোনো কটাক্ষ কেহ করিবেন না) তবে কিসের জন্য?

সইমার শ্বশুরবাড়ী এটা। কিন্তু একটি দেওরপো ছাড়া এখানকার বাড়ীতে কেহ থাকে না। দুটি দেওর বাহিরে চাকুরি করে, সেখানেই পরিবার লইয়া থাকে ; যে দেওরপো এখানে আছে ওটি পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ। জ্যাঠাইমার কাছে মানুষ হইতেছে। জ্যাঠাইমা ভালও বাসেন।

দেওরপোর নাম কানু। কানু নীরেনকে খুব ভালো চোখে দেখে নাই। এই দুর্মূল্যের বাজারে ইনি আবার কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিলেন! কেন রে বাবা! যে তিন বিশ ধান হইয়াছিল, ইনি এখানে আসিলেন,—তাহাতে ক'দিন যায়? জ্যাঠাইমাও দেখিতেছি নীরু বলিতে অজ্ঞান।

কানু আসিয়া বলিল—যাত্রা দেখতে যাবেন?

—কি যাত্রা?

—এই দিগি—গোনাই যাত্রা?

—সে আবার কি?

—দেখবেন এখন। দিন দিকি একটা টাকা চাঁদা।

নীরু একটা টাকা বাহির করিয়া কানুর হাতে দিল।

গোনাই যাত্রার আসরে বসিয়া নীরেন যাত্রা তত দেখে নাই, যত সে এই সুন্দর রাত্রিটি ও যাত্রার আসরের পরিবেশের কথা চিন্তা করিয়াছে। যেখানে যাত্রার আসর, সেটা ছোট একটা মাঠ, তার চারিপাশে বনজঙ্গল, একদিকে বনের প্রান্তে একটা কামারের দোকান, সেখানে এখনও হাপরে আগুন জ্বলিতেছে। বাঁশের খুঁটিতে পাল টাঙানো হইয়াছে। পান বিড়ির দোকান বসিয়াছে, চাষা লোকে যাত্রা দেখিতে আসিয়া পানের দোকানের সামনে ভিড় করিতেছে। একটা মুচকুন্দ চাঁপার গাছতলায় ফুল পড়িয়া বিছাইয়া আছে। বাতাসে মুচকুন্দ চাঁপার সুবাস।

একটি গ্রাম্য মেয়ে ছিল গোনাই বিবি। তারই সুখ দুঃখের কাহিনী। নীরেনের পক্ষে এমন বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু যারা শ্রোতার দল, তাদের সারারাত্রি জাগিয়া দেখিবার বস্তু। ভ্রাতার বিরহে কাতরা তরুণী গোনাই বিবির সে করুণ গান, 'ও বছির, বছির রে, বৈঠা হাতে নিলি রে' অনেকের চোখে জল আনিয়া দিল।

নীরেন ভাবিতেছিল বহুদূরের লিপুলেক গিরিবর্ত্মে বরফ গলিয়াছে। দলে দলে ঝব্বুর পিঠে বোঝাই দিয়া যাত্রীরা চলিয়াছে মানস সরোবরে ও কৈলাসের পথে। গুরুসা মান্ধাতার তুষারাবৃত শৃঙ্গে সায়াহ্নদিনের সূর্যকিরণে সোনার রং ধরিয়াছে। তাহার দাদা-মহাশয়ের বন্ধু করালীচরণ মজুমদার সস্ত্রীক এই মাসের শেষে মানস সরোবরে রওনা হইবেন, সঙ্গে যাইবেন নীরেনের দিদিমা ও বড় মামীমা, বাড়ীর গোমস্তা নাদু চক্রবর্ত্তী। আলিগড় হইতে আলমোড়া। আলমোড়া হইতে ধারচুলা। ধারচুলা হইতে লিপুলেক

পাস। লিপুলেক হইতে মানস সরোবর। সে নিশ্চয় যাইত ওখানে থাকিলে।

কিন্তু সেজন্য তার দুঃখ নাই।

বাংলাদেশে সে আসিয়াছে মাতৃভূমির সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের সন্ধানে। গাছপালার পাখীর কাকলীর মধ্যে দিয়া সে পরিচয় দিনে দিনে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে। ঐ মুচকুন্দ চাঁপার ফুল যেন কতকাল পূর্বের কোন বিস্মৃত অতীত শৈশবদিনে তাহার অজ্ঞাতসারে, একদা সৌরভ বিতরণ করিয়াছিল—মায়ের মুখের সঙ্গে ঐ দিনটির ছন্দ একই তারে গাঁথা হইয়া আছে তার মনের বীণায়।

পরদিন গ্রাম্য নদীর ধারে একটা বড় নিমগাছের তলায় সে দাঁড়াইল।

একটি দিন

মনটা ভাল ছিল না। এক একদিন এরকম হয়, কিছু পড়তে ভাল লাগে না, কিছু ভাবতে ভাল লাগে না, কারুর সঙ্গে কথা বলতেও ভাল লাগে না। মনে হয় যেন মনের চাকার তেল ফুরিয়ে গিয়েচে—'অয়েল' না করে নিলে চাকা আর চলবে না, ক্রমে মরচে পড়ে আসবে—তারপর কবে একদিন ফুট্ করে বন্ধ হয়ে যাবে।

জেলেপাড়া লেনে এক পুরোনো তাসের আড্ডায় গেলুম। সেই সব পুরোনো বন্ধুরা এসে জুটেচে—তাস কিন্তু ভাল লাগল না। তাস খেলে জিতবো, অন্যদিন এতে কত উৎসাহ আনন্দ পাই। আজ মনে হল, না হয় জিতলামই, তাতেই বা কি?—এদের গল্প-গুজব ভাল লাগল না। অর্থহীন—অর্থহীন এই নীচু বৈঠকখানা ঘর, চুন-বালি-খসা দেওয়াল, সেই সব একঘেয়ে সস্তা ওলিওগ্রাফ্ ছবি—কালীয়দমন, অন্নপূর্ণার ভিক্ষাদান, কি একটা মাথামুণ্ডু ল্যান্ডস্কেপ—সেই একঘেয়ে কথাবার্তা, চিরকাল যা শুনে আসচি—হঠাৎ মন বিরস ও বিরূপ হয়ে উঠল—সব বাজে, সব অর্থহীন—পাশের একজনকে জিগ্যেস কল্লুম —আপনার বেশ ভাল লাগচে? মনে কোনোরকম—

সে অবাক্ হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল। বল্লে—কেন, ভাল লাগবে না কেন? কেন বলুন তো?

মন আরও তিক্ত হয়ে উঠল। কাজের ছুতোয় সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লুম। বেলা চারটে বাজে। ফিরিওয়ালারা গলির মধ্যে হাঁক্‌চে—ছেলেরা বইদপ্তর নিয়ে স্কুল থেকে ফিরচে—কলের জল পড়বার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে—গলির মোড়ে রোয়াকে-রোয়াকে এরই মধ্যে আড্ডা বসে গিয়েচে।

একটা নিতান্ত সরু অন্ধকার গলি, পাশেই একটা মিউনিসিপ্যালিটির নাইবার জায়গা। এই গলিটা দিয়ে যাতায়াত প্রায়ই করি—মিউনিসিপ্যালিটির নাইবার জায়গাটার পাশে একটা খোলার ঘর। এই ঘরখানা ও তার অধিবাসীরা আমার কাছে বড় কৌতূহলের জিনিস। হাত পাঁচেক লম্বা, চওড়াতেও ওই রকমই হবে, এই তো ঘরখানা। এরই মধ্যে একটি পরিবার থাকে, স্বামী স্ত্রী ও দুটি শিশুসন্তান। না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত, এইটুকু ঘরে কি ভাবে এতগুলি প্রাণী থাকে—তাদের জিনিসপত্র নিয়ে। কিন্তু সকলের চেয়ে অবিশ্বাসের বিষয় এই যে ওই পাঁচ বর্গহাত ঘরের এক কোণেই ওদের রান্নাঘর। আমি যখন ওখান দিয়ে যাই, প্রায়ই দেখতে পাই—উনুনে কিছু না কিছু একটা চাপানো আছে। বৌটি ছোট্ট ছেলে কোলে নিয়ে রাঁধচে, না হয় দুধ জ্বাল দিচ্চে। তার বয়েস দেখলে বোঝা যায় না—তেইশও হতে পারে, ত্রিশও হতে পারে, চল্লিশও হতে পারে। ঘোমটার কাছে ছেঁড়া, আধময়লা শাড়ি পরনে। হাতে রাঙা কড় কি রুলি। চোখ-মুখ নিষ্প্রভ, নির্বুদ্ধিতার ছায়া মাখানো। স্বামী বোধহয় কোনো কারখানাতে মিস্ত্রীর কাজ করে, দু'একদিন সন্ধ্যার আগে ফিরবার সময় দেখেচি লোকটা কালিঝুলি মেখে ছোট্ট

বাল্তি হাতে পাশের নাইবার জায়গায় ঢুক্‌চে।

আজও ওদের দেখলুম। দোরের কাছে বৌটি ছেলে কোলে নিয়ে বসে আছে, ছেলেকে আদর করচে। নির্বোধের মত আমার দিকে একবার চেয়ে দেখলে। সেই পায়রার খোপের মত ঘরটা, ছিটেবেড়ার দেওয়ালে মাটির প্রলেপ, তার ওপরে পুরোনো খবরের কাগজ আঁটা, কাগজগুলো হল্‌দে, বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে, দড়ির আল্‌নায় ময়লা কাপড়চোপড় ঝুল্‌চে।

মনটা আরও দমে গেল। কি ক'রে এরা এ থেকে আনন্দ পায়? কি ক'রে আছে? কি অর্থহীন অস্তিত্ব! কেন আছে? আচ্ছা, ও ছেলেটা বড় হয়ে কি হবে? ওই রকম মিস্ত্রী হবে তো, ওই রকমই খোলার ঘরে ছেলে বউ নিয়ে ওই ভাবেই মলিন, কুশ্রী, অন্ধকার অর্থহীন জীবনের দিনগুলো একে একে কাটাতে কাটাতে এগিয়ে চল্‌বে ততোধিক দীন, হীন মরণের দিকে! অথচ মা কত আগ্রহে খোকাকে বুকে আঁকড়ে আদর করচে, কত আশা, কত মধুর স্বপ্ন হয়তো—কিন্তু এখানেও আমার সন্দেহ এল। স্বপ্ন দেখবার মত বুদ্ধিও বৌটির আছে কি? কল্পনা আছে? নিজেকে এমন অবস্থায় ভাবতে পারে যা বর্তমানে নেই, কিন্তু ভবিষ্যতে হতে পারে বলে ওর বিশ্বাস? মনের গোপন সাধ-আশাকে মনে রূপ দিতে পারে? নিজের সংকীর্ণ, অসুন্দর বর্তমানকে আলোক-উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মধ্যে হারিয়ে ফেল্‌তে পারে?

বড় রাস্তার মোড়ে বই-এর দোকানগুলো দেখে বেড়ালুম। রাশি রাশি পুরোনো বই, ম্যাগাজিন। অধিকাংশই বাজে। অলস, অপরিণত মনের তৈরি জিনিস। চটকদার মলাটওয়ালা অসার বিলিতি নভেল, সিনেমার ম্যাগাজিন ইত্যাদি। অন্যদিন এখানে বেছে বেছে দেখি, যদি ভালো কিছু পাওয়া যায়। আজ আর বাছবার মত ধৈর্য ছিল না। মনের আকাশের চেহারা আজ ঘষা পয়সার মত, নীলিমার সৌন্দর্য তো নেই-ই, মেঘ-ভরা বাদল-দিনের রূপও নেই—নিতান্তই ঘষা পয়সার মত তার চেহারা।

সিনেমা দেখতে যাবো? আউট্রাম ঘাটে বেড়াতে যাবো? কোথাও বসে খুব গরম চা খাবো? লেকের দিকে যাবো?—

ধর্মতলার গির্জার সামনে এক জায়গায় লোকের ভিড় জমেছে। একটা সাহেবী পোষাক-পরা লোক ফুটপাথে অজ্ঞান হয়ে শুয়ে আছে, ধড়টা ও মাথাটা পরস্পরের সঙ্গে এমন অস্বাভাবিক কোণের সৃষ্টি করেচে যে মনে হচ্ছে লোকটা মরে গিয়েছে। দুজন সার্জেন্ট এল। লোকে বল্লে, সামনের বাড়ির নীচের তলায় এই বাথরুমের মধ্যে পড়েছিল এই অবস্থায়। বাড়ির দারোয়ান ধরাধরি করে ফুটপাথে এনে শুইয়ে দিয়েচে—লোকটা কে, তারা চেনে না। লোকটা মরে নি, মদে বেহুঁশ হয়ে আছে। সার্জেন্ট দুজন ধরাধরি করে তার সংজ্ঞাহীন নিঃসাড় দেহটা একটা ট্যাক্‌সিতে তুলে নিয়ে কোথায় গেল।

লোকটার ওপর সহানুভূতি হোল আমার। সেই নির্বোধ বধূটার ওপর যা হয় নি, এই বেহুঁশ মাতালের ওপর তা হ'ল। বেচারা আনন্দের খোঁজে বেরিয়েছিল, পথও যা হয় একটা ধরেছিল, হয়তো ভুল পথ, হয়তো সত্যি পথ...আনন্দের সত্যতা তার মাপ-কাঠি—কে বলবে ওর কি অভিজ্ঞতা, কি তার মূল্য? ওই জানে। কিন্তু ও তো বেহুঁশ।

কার্জন পার্কের সামনে এলুম। অনেকগুলো চাকর ও আয়া সাহেবদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বৃষ্টির ভয়ে গাড়িবারান্দার নীচে ফুটপাতের ওপর বসে আছে। বৃষ্টি একটু একটু বাড়চে, আমিও সেখানে দাঁড়ালুম। একটা ছোট্ট ছেলে, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া সোনালী চুল, নীল চোখ, বছর দেড় কি দুই বয়েস—সে তার চাকরের টুপিটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে টল্‌তে টল্‌তে উঠে অতি কষ্টে নাগাল পেয়ে চাকরের মাথায় টুপিটা পরিয়ে দিচ্ছে—আর যেমন পরানো হয়ে যাচ্ছে, অমনি হাত নেড়ে নেচে, ঘাড় দুলিয়ে দন্তহীন মুখে হেসে কুটিকুটি হচ্ছে। কিন্তু টুপিটা ভাল করে মাথায় বসাতে

পারচে না, একটু পরেই গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে, আবার খোকা অতি কষ্টে টুপিটা মাথায় তুলে দিচ্ছে...আবার সেই হাসি, সেই হাত পা নাড়া, সেই নাচ...তাকে কেউ দেখচে না, কারো দেখবার সে অপেক্ষাও রাখচে না, তার চাকর পার্শ্ববর্তিনী আয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপে এমন অন্যমনস্ক, খোকা কি করচে না করচে সেদিকে তার আদৌ খেয়াল নেই, নিকটের অন্য অন্য ছেলেমেয়েরাও নিতান্ত শিশু—ওই খোকাটি আপনমনে বার বার টুপি পরানো খেলা করচে।

আমি মুগ্ধমুখের মত চেয়ে রইলুম। নরম নরম কচি হাত পায়ের সে কি ছন্দ, কি প্রকাশভঙ্গির সজীবতা, কি অবোধ উল্লাস, কি অপূর্ব সৌন্দর্য!...খুশির আতিশয্যে খোকা আবার সামনে ঝুঁকে ঝুঁকে পড়চে, একগাল হাসচে, ছোট ছোট মুঠি বাঁধা হাত দুটো একবার তুলচে, একবার নামাচ্ছে...শিশুমনের আগ্রহভরা উল্লাসের সে কি বিচিত্র, কি সুস্পষ্ট, ভাষাহীন বার্তা!...

আমি আর চোখ ফেরাতে পারি নি। হঠাৎ অদৃষ্টপূর্ব, অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্যের সামনে পড়ে গিয়েছি যেন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। হঠাৎ চাকরটার হুঁশ হোল—সে আয়ার সঙ্গে গল্প বন্ধ করে খোকার দিকে ফিরে টুপিটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পাশে একটা পেরাম্বুলেটারের মধ্যে রেখে দিলে। খোকার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল, সে টলতে টলতে পেরাম্বুলেটারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল কিন্তু বড় উঁচু—তার ছোট্ট হাত দুটি সেখানে পৌঁছয় না। সে একবার অসহায় ভাবে এদিক-ওদিক চাইলে, তারপর থপ্ করে বসে পড়ল। চাকরটা আয়ার সঙ্গে গল্পে মত্ত।

কার্জন পার্কের বেঞ্চির ওপর গিয়ে বসলুম। সূর্য অস্ত যাচ্ছে, গঙ্গার অপর পারে আকাশ রাঙা হয়ে এসেচে।

খোকার মনের সে অর্থহীন আনন্দ আমার মনে অলক্ষিতে কখন সংক্রামিত হয়েচে দেখলুম। খোলার ঘরের মেয়েটিকে আর নির্বোধ মনে হোল না।

ছোটনাগপুরের জঙ্গলে

শহর বা তীর্থের জাঁকজমক গোলমাল আমার ভাল লাগে না। আমি চিরদিন নির্জন ভালবাসি। তাই পাহাড়, নদী, বন-জঙ্গল দেখে বেড়াই। বনে জঙ্গলে ভগবানের সৃষ্টির কি সৌন্দর্যই না দেখি!

১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাস,—আমি তখন ঘাটশীলায়। ছোটনাগপুরের জঙ্গল দেখবার সাধ হোল। মিস্টার সর্দার সিংও রাজী হলেন। আর দেরী নয়—দু'জনে বেলা তিনটার ট্রেনে ঘাটশীলা ছেড়ে চক্রধরপুর এলুম। রেস্তোরাঁয় চা খেয়ে দু'জনে চললুম হরদয়াল সিং-এর বাড়ী—সেখানে রাত্রে খাওয়া দাওয়া সেরে রেস্তোরাঁতে গিয়ে দু'জনের রাত্রিযাপন।

সকালে হরদয়াল সিং-এর বাড়ী থেকে এলো ক্ষেত থেকে সদ্য তোলা মুলো—চায়ের সঙ্গে সেই মুলো খেয়ে দু'জনে মোটরে করে বেরিয়ে পড়লুম। ভগবানের অসীম দয়া—তাই এমন সব বন্ধু পেয়েচি। না হলে এমন আরামে আমাকে জঙ্গলে নিয়ে যেতো কে? এলুম চাঁইবাসায়।

চাঁইবাসা জায়গাটি বেশ পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্যকর। এখানে একটি হ্রদ আছে। তেমন বড় না হলেও ভারি সুন্দর। উঁচু নীচু পথ—চমৎকার বাঁধানো। পথের একদিকে পাহাড়ের শ্রেণী, আর একদিকে টানা জঙ্গল। সরকারী ফরেস্ট। এ জঙ্গলে ছোটখাটো জীবজন্তু আছে। পথে সঞ্জয় নদী। নদীর উপর প্রকাণ্ড পুল। পার হয়ে জঙ্গলের পথে যোল মাইল আসবার পর শলাই বাংলো। দু'-বছর আগে এখানে এসেছিলুম। বাবলুর

মা রান্না করে খাইয়েছিলেন। সেকথা মনে পড়লো।

পাশে ছোট্ট গ্রাম। গ্রামের নাম বাকৈলা। বাকৈলায় হপ্তায় দু'দিন হাট বসে—নানা জিনিস বিক্রী হয়। এ হাটে বাবলুর মা একখানি চাদর কিনেছিলেন—এখানকার তৈরী চাদর। জঙ্গলের দৃশ্য এখানে অদ্ভুত—অপরূপ সৌন্দর্য। নিস্তব্ধ বনভূমি—যেন সৌন্দর্যের পশরা উন্মুক্ত করে রেখেচে! যাকে বলে ভীমকান্তি দৃশ্য।

বাকৈলায় পৌঁছুলুম বেলা তখন একটা। ইন্‌স্‌পেকশন বাংলো আছে। সেখানে উঠলুম। সঙ্গে খাবার-দাবার ছিল—খেয়ে একটু বিশ্রাম করে মিস্টার সিং-এর সঙ্গে বেরুলুম জঙ্গল দেখতে। বহুদূর চলে গেলুম। ক্রমে সন্ধ্যা হলো—চারদিক নিঝুম-নিস্তব্ধ। আকাশে একটুখানি চাঁদ গাছপালার আড়ালে কোথায় লুকিয়ে আছে, দেখা যায় না। পৃথিবীর মাথার উপর আকাশ যেন নীল চাঁদোয়া খাটিয়ে দিয়েছে—আকাশের গায়ে কি অপূর্ব নক্ষত্রশ্রেণী! মনে হচ্ছিল—যেন আকাশে দেওয়ালির দীপ জ্বলছে জ্বলজ্বল করে! অপূর্ব আনন্দ উপলব্ধি করেছিলুম। মনে হচ্ছিল, ভগবানের কি মহা-শিল্প এই পৃথিবী! বাবলুর কথা মনে হল—তার যেন চোখ খোলে! সে যেন ভগবানের এ শিল্প চোখে দেখতে পায়!

বাংলোয় ফিরলুম খানিক রাত্রে। পরের দিন সকাল আটটায় আবার বেরুলাম জঙ্গলের পথে। দুধারে কি ঘন জঙ্গল—আর গাছে গাছে কত রকমের লতাপাতা! গাছ-পালার আড়ালে ওদিকটা যেন লুকোনো আছে। পথ-চলা-পথিক পথে যেতে যেতে জঙ্গলের সব ঐশ্বর্য দেখে যাবে, সে উপায় নেই। সে ঐশ্বর্য পুরোপুরি দেখতে হলে পথ ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকতে হবে। কত রকমের ফুল! দেবকাঞ্চন ফুল ফুটে আছে—পিটু-নিয়া ফুটেচে। নভেম্বর মাস—জায়গাটা আশ্চর্যরকম ঠান্ডা। করম, কভিলা, শাল, পিয়াশাল প্রভৃতি গাছ-গাছড়া, বুনো কলা আর বুনো বাঁশ গাছ প্রচুর। দেখতে দেখতে কুরো নদীর ধারে এসে বসলুম। এখান থেকে সাত মাইল দূরে একটা স্টেশন। খানিক-ক্ষণ বসবার পর মোটরে চড়ে খাজুড়িয়া হয়ে একটা গ্রামে এলুম। গ্রামে হো-দের বাস—সকলেই খ্রীষ্টান। মেয়েদের মাথায় লাল ফিতা বাঁধা—সকলেই কাজকর্ম করচে। এখানে এক পাদ্রী আছেন, তাঁর নাম ধনকুমার হো। তাঁর সঙ্গে খানিক আলাপ করে বাংলোয় ফিরলুম, বেলা তখন একটা। স্নানাহার সেরে শুয়ে পড়লুম। শোবামাত্র নিদ্রা।

ঘুম ভাঙলে উঠে দেখি, বেলা পড়ে এসেচে। বারান্দায় বেরিয়ে এলুম। বারান্দায় সামান্য রোদ পড়েচে। সামনে পাহাড়ের শ্রেণী—সে-সব পাহাড়ের গায়ে রাঙা রোদ। বসে বই পড়তে লাগলুম—"রেজার্স এজ"। পড়তে পড়তে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে চারিদিক বেশ ঠান্ডা হয়ে এলো। তখন ঘরে এলুম। ঘরে আগুন জ্বালা হয়েচে—আগুনের পাশে বসে আবার বই পড়া। প্রেমচাঁদের গল্পের বই। বই শেষ করে খাওয়া-দাওয়া। তারপর অনেক রাত্রে ঘরের বাইরে বারান্দায় এসে দেখি বনের কি শোভা! আকাশে অসংখ্য তারা জ্বলজ্বল করছে। তারার ঝিকমিকি আলোয় নিস্তব্ধ বনভূমি দেখাচ্চে যেন স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা! আর কোন কথা নয়! মন কেবলি বলে ভগবানের কি অপূর্ব সৃষ্টি!

বিকেলে মিস্টার সিং-এর সঙ্গে গৈলকেরা গ্রামে বেড়াতে বেরুলুম। ঘুরে ঘুরে সব দেখে গ্রামের পিছনে একটা ডুংরীর উপরে উঠে বসলুম—সূর্য তখন অস্ত যাচ্চে—কি চমৎকার দেখাচ্ছিল! এমনি সুন্দর জায়গা আর এমনি সুন্দর দৃশ্যের ছবি কত কল্পনা করেচি, কিন্তু কল্পনায় এ দৃশ্য কোনোদিন ধরতে পারিনি—ভগবান আজ সে ছবি চোখের সামনে ফুটিয়ে তুললেন। ডুংরীতে বসেই বাড়ীতে চিঠি লিখলুম।

আকাশে অগণ্য নক্ষত্র—শাল, বনস্পতির মাথায় অনেক রাত্রেও জ্বলজ্বল করচে অগণিত তারা। সেই শালবনে বসে ভগবানের এই অপূর্ব বিশ্ব-সৃষ্টি দেখে মনে মনে

কেবলি বলতে লাগলুম, বাবলু বড় হয়ে যেন এ শিল্প দেখে—দেখে উপভোগ করে।

পরের দিন খাওয়া-দাওয়া সেরে মোটরে চড়ে পাল্টু-বাংলোর উদ্দেশে যাত্রা। পথে সরকারী ফরেস্ট—দু'তিনটে বাংলোও দেখা যায়। কি ঘন জঙ্গল! ছোটনাগপুরে বহু জঙ্গল দেখেচি—কিন্তু শৈলকেরার মত এমন ভীষণ জঙ্গল আর কোথাও দেখিনি। জঙ্গলে প্রচুর শালগাছ—জঙ্গলে কাঠুরেরা আসে কাঠ কাটতে। বাঘের কবলে অনেকে মারা যায়। এখান থেকে চার মাইল দূরে সারেন্দা টানেল। শুনলুম, বিশ-পঁচিশ বছর আগে সেখানে এক প্রকাণ্ড বুনো হাতীর সঙ্গে বি-এন-রেলওয়ের একখানা চলন্ত ট্রেনের সংঘর্ষ হয়—হাতীটাই জখম হয়ে শেষে মারা যায়।

যেতে যেতে জঙ্গলের প্রান্তে কাঠবোঝাই কখানা গোরুর গাড়ি দেখলুম। সার চলেচে। আরো খানিক এগিয়ে দেখি, পথের ধারে তিনটি ময়ূর—বন থেকে বেরিয়ে পথে এসেচে। আমাদের দেখে, চলন্ত মোটর দেখে তারা সরে গেল না। এমন নির্ভয়! পথে কারো নদী পার হলুম—তারপর কোইনা পার হয়ে শলাই-বাঙলোয় পৌঁছুলুম। খানিকটা বিশ্রাম করে চা-টা খেয়ে সন্ধ্যা নাগাদ বেড়াতে বেরুলুম। এক জায়গায় একটা নালা। নালার উপর রেলওয়ে-ব্রিজ। ছোট লাইন—কোন মাইনিং ফার্ম আছে তাদের প্রাইভেট লাইন। লাইনে দুজনে বসলুম—কি চমৎকার দৃশ্য! দুধারে পাহাড়—বন-জঙ্গলে আগাগোড়া ঢাকা লাইন থেকে অনেক উঁচু পর্যন্ত—লাইনকে যেন উঁচু পাঁচিলের মত ঘিরে রেখেচে! জঙ্গলের গাছে গাছে পাতায় পাতায় জোনাকি জ্বলচে—নক্ষত্র চাঁদ। ভগবানের উদ্দেশে দুজনে প্রাণের প্রার্থনা নিবেদন করলুম।

রাত্রি বাড়চে দেখে মিস্টার সিং বল্লেন—এবার ওঠা যাক। আমার উঠতে ইচ্ছা হয় না। আমি বল্লুম—এইখানে পড়ে থাকা যাক সারারাত। মিস্টার সিং বল্লেন—সর্বনাশ! ঐ জঙ্গলে আছে কত বুনো হাতী, হায়েনা, আর বাঘ—নরখাদক বাঘ। তিন-চার দিন হলো, মাইনিং কোম্পানির তিনজন কুলি এখানে কাজ করছিল—তাদের তিনজনকেই বাঘে নিয়ে গেচে। কদিন তাই কাজ বন্ধ আছে। শুনে গা ছমছম করে উঠলো।—থাকতে ভরসা হোল না। নদীর ধার দিয়ে চলে আসছিলুম—মিস্টার সিং দেখালেন, নদী-কিনারায় ভিজা বালিতে হাতীর পায়ের দাগ—হায়েনার পায়ের দাগ। মনটা খারাপ হয়ে গেল। এমন শোভা এমন সৌন্দর্য—তার পিছনে মৃত্যুর এ কি করাল ছায়া।

পরের দিন মোটরে চড়ে আবার যাত্রা। পথে এক জায়গায় দেখি, উঁচু একটা স্তম্ভ। স্তম্ভের নীচে গাড়ি থামিয়ে নামা হল। নেমে উপরে ওঠা। শৈলমালায় ঘেরা একটি টিলার উপরে স্তম্ভ ; উঠবার সিঁড়ি আছে—বরাবর। মিস্টার সিং বল্লেন—আপনার জন্যই কারা ঐ টাওয়ারে ওঠবার সিঁড়ি তৈরী করে রেখেচে! সিঁড়ি বেয়ে দুজনে উপরে উঠলুম। উপর থেকে কতদূর পর্যন্ত দেখলুম! বেশ উঁচু পাহাড়ের শ্রেণী। সিং বল্লেন—শশাং-দোবুরু পাহাড়—তিন হাজার ফুট উঁচু। বসে বসে দেখচি আর দেখচি। মনে হচ্ছে কোথায় থাকি—আর কোথায় এসেচি আজ! কি সুন্দর জায়গা! সত্যিই চোখে দেখচি? না, স্বপ্ন?

ক্রমে চাঁদ উঠলো—আকাশের পটে রাশি রাশি নক্ষত্র। ভয় হোল বিরাটত্বের রূপ দেখে। নীচে লৌহ-প্রাচীরের মত শৈলমালা—ঘন অরণ্য—মাথার উপর অগণ্য সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা। বিশ্বরূপের বিরাটত্ব বেশ ভাল করেই উপলব্ধি করলুম। মনে মনে ভাবলুম, তোমার এ রূপ দেখার সুবিধা আর সৌভাগ্য বাবলু যেন পায়, হে ভগবান!

বসুধারা, আশ্বিন ১৩৬০

নদীর ধারে বাড়ী

শ্যামলীদের বাসা পীতাম্বর লেনে। দু নম্বর পীতাম্বর চৌধুরীর লেন। সেকেলে পুরানো বাড়ী, দোতলার ছটি ঘরে ছটি পরিবারের বাস। কলকাতায় দুটিবেলা সমানে ঝগড়া চলে জল তোলা নিয়ে। শ্যামলী ওর মধ্যে একটু দেখতে ভাল, বয়েস ত্রিশের সামান্য ওপরে, দু-এক বছর ওপরে। চার সন্তানের মা, দুটি মেয়ে, দুটি ছেলে।

বেলা দশটা বাজে।

শ্যামলীর স্বামী খেতে বসেচে। শ্যামলী ডালের বাটিতে হাত ডুবিয়ে সামনে বসে আছে।

শ্যামলী বললে—ফিরবে কখন?

শ্যামলীর স্বামীর নাম যদুনাথ ভট্টাচার্য। যদুনাথ একটা সওদাগরি আপিসে সত্তর টাকা মাইনের চাকুরি করে। যুদ্ধের বাজারে তাতে চলে না। খাওয়া-দাওয়ার অসীম কষ্ট। ছেলেমেয়েগুলো দুধ খেতে পায় না; দুটো শুকনো মুড়ি চিবোয় স্কুল থেকে এসে।

যদুনাথ বললে—ফিরতে সাতটার পরে।

—আর একটা বাড়ী দ্যাখো, বুঝলে?

—সে তো বুঝলাম, বাড়ী মিলচে কই? খুঁজতে কি কম করচি?

—এ বাড়ীতে আর টেঁকা যায় না।

—কালও ঝগড়া হয়েছিল?

—কবে না হয়? বিশ্বেস গিন্নীর সঙ্গে মতীর মা-র ঝগড়া কালও খুব। অভয়ার সঙ্গে রামবাবুর বৌয়ের ঝগড়া।

—জল তোলা নিয়ে?

—তা আবার কি নিয়ে? ও তো রোজকার ঘটনা লেগেই আছে। রোজ রোজ এ ইতরামি আর ভাল লাগে না। অসহ্য হয়ে উঠেছে।

যদুনাথ চলে গেল। শ্যামলীর ছেলেমেয়েরা খেয়েদেয়ে স্কুলে চলে গিয়েছিল: ছেলে দুটি বড়, তারা হাই-স্কুলে পড়ে। মেয়ে দুটি পড়ে মোড়ের কর্পোরেশন স্কুলে। ছোট রান্নাঘর, একটি লোক কায়ক্লেশে বসে দুটি আহার করতে পারে। আজ নটি বছর এ বাসায়, বড় মেয়ে লীলার বয়েস। এই বাতাতেই লীলার আঁতুড় হয়েছিল। রান্নাঘরের সামনে খোলা ড্রেনে তরকারীর খোসা, ফেন, শাকের ডাঁটা, চিংড়ি-মাছের খোসা জমে দুর্গন্ধ বার হচ্চে। এই দুর্গন্ধ আর এই কুশ্রী দৃশ্য আজ নয় বছর ধরে সহ্য করতে করতে নাক অসাড় হয়ে গিয়েচে, এখন আর দুর্গন্ধকে দুর্গন্ধ বলে মনে হয় না।

বীণা ওপরের তলার মনোরঞ্জনবাবুর মেয়ে। সে শ্যামলীকে ভালবাসে। কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললে—কাকীমা কি রাঁধলে?

—মুসুরির ডাল আর চচ্চড়ি।

—মাছ আনেন নি কাকাবাবু?

—নাঃ। দু টাকা চিংড়ি মাছের সের। মাছ আর কি কেনবার জো আছে? উনি গিয়ে ফিরে এলেন।

—এবার রেশনের চালে কাঁকর খুব কম, কাকিমা। আপনারা রেশন আনেন নি?

—বুধবার আসবে রেশন। এখনো আনা হয় নি। তোমার কাকা যেতে সময় পান নি।

বিকেলে কলে জল আসতেই ওপরের ভাড়াটে গিন্নীরা বড় এক এক বালতি ঘড়া বসিয়ে দিলেন কলের মুখে। একজন একটা তুলে নিয়ে যায় তো আর একজনে একটা

বসায়। এইজন্যে চৌবাচ্চায় মোটে কয়েক ইঞ্চির বেশি জল জমতে পায় না। গা ধোবার কি কষ্ট বিকেলে। এই গুমট গরমে জলে স্নান করতে পারলে কি আনন্দই পাওয়া যেতো। কিন্তু তা হওয়ার জো নেই। এক একজন ছোবড়া আর সাবান নিয়ে নামবে ওপর থেকে, আধ ঘণ্টা ধরে থাকবে। প্রথমে নামবে অভয়া, তারপর নামবে মতির দিদি, এরা দুজনেই ভীষণ ঝগড়াটে। যতক্ষণ তারা কলতলায় গা ধোবে, ততক্ষণ কলে এক ঘটি জল কারো নেবার জো নেই—তাহলেই বাধবে ধুন্দুমার ঝগড়া।

অভয়া বাঙাল দেশের মেয়ে। বেশ সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী। শ্যামলীকে ডেকে বললে —ও দিদি কি হচ্ছে?

—কুটনো কুটচি ভাই।

—কি কুটনো?

—ঝিঙে আর ঢেঁড়স। আলু তো বারো আনা সের উঠেচে! আমাদের সাধ্যিতে কুলোলে তো কিনবো!

—রেশন এসেচে?

—না ভাই, বুধবারে আসবে।

—আমায় আধপোয়া চিনি দিতে পারবে দিদি তোমাদের রেশন থেকে?

—আসুক আগে, দেখবো এখন।

এদের মধ্যে সবাই সমান অবস্থার মানুষ। কেরানীর বৌ। পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া দ্বন্দ্ব করে এদের দিন কাটে। পান থেকে চুন খসলেই আর নিস্তার নেই। বিশ্বাস গিন্নী দলের মোড়ল, ওপরের ভাড়াটেদের সর্দার। তিনি সকলের হয়ে ঝগড়া করতে এগিয়ে আসেন। তাঁর সর্দারিতে ওপরের মেয়েরা কোমর বাঁধে, তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছে এই অভয়া। দেখতে সুন্দরী হলে কি হবে, যেমনি স্বার্থপর তেমনি কুটিল মন। এই যে বললে চিনি দিতে হবে, 'না' বললে আর রক্ষে আছে? কোন কালে এক বাটি নুন ধার দিয়েছিল, সেই ঘটনার উল্লেখ করে খোঁটা দিয়ে বলবে, বরিশালের টানে—আমরা কি কোনদিন কিছু কাউকে দিই নাই কি! সময়ে অসময়ে নুন রে—তেল রে—তা নিয়ে মনে থাকবে ক্যানে? ঘোর কলি যে! কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরুলে পাজি—আচ্ছা আমরাও কি আর কখনো কাজে লাগবো না! তখন যেন—ইত্যাদি।

এই বাসাটাতে কি গুমট গরম। দক্ষিণ দিক চাপা, এতটুকু হাওয়া আসে না, প্রাণ আইঢাই করে গরমে। আজ ন বছর কষ্টভোগ চলচে। এই ঝগড়ার আবহাওয়া আর এই দারুণ স্থানাভাব। সকলের ওপরে এই অপরিষ্কার, নোংরা পরিবেশ। সবাই সমান অশিক্ষিতা, ভাল বললেও এ বাড়ীতে মন্দ হয়। সেদিন অপরাধের মধ্যে ও শশীবাবুর স্ত্রীকে বলেছিল—দিদি, চিংড়ি মাছের খোসাগুলো একেবারে সামনেই ফেললেন, কলতলায় সকলেরই যেতে আসতে হয়—সকলেরই তো অসুবিধে।

আর যাবি কোথায়! শশীবাবুর বৌ চীৎকার জুড়ে দিলে—আমি কি একলা ফেলি নাকি, সবাই তো ফেলে, কেনই বা না ফেলবে; ভাড়া দিয়ে সবাই বাস করে, কারো একার সম্পত্তি তো নয়; সবারই সুবিধে এখানে দেখতে হবে—যদি তাতে অসুবিধে হয় তবে গরীব ভাড়াটেদের সঙ্গে বাস করা কেন, তাহলে দোতলা বাড়ী আলাদা ভাড়া নিয়ে বালিগঞ্জে গিয়ে বাস করলেই তো হয়—ইত্যাদি।

শ্যামলীও চুপ করে থাকবার মেয়ে নয়, সে বললে—দিদি, কি পাগলের মত বকচেন? আপনি চিংড়ি মাছের খোসা ফেলবেন তাতে কেউ বারণ করচে না, তবে আমারই রান্নাঘরের সামনে কেন ফেলবেন? কেন আমি তা ফেলতে দেবো?

—ফেলতে দেবে না তোমার কথায়? কি তুমি এমন লাটসায়েব এয়েচ রে বাপু! তুমি পাগল না আমি পাগল? রান্নাঘরের বাইরের জায়গা তোমারও যা, আমারও তা—

তুমি বলতে আসবার কে?

—তা বলে পরের সুবিধে অসুবিধে যারা না দেখে তারা আবার মানুষ? তাদের আমি ঘোর অমানুষ বলি।

এই পর্যন্ত গেল সাধারণ ভাবের কথা, একে ঝগড়া বলে অভিহিত করা যায় না। এর পর বাধলো আসল ঝগড়া যার নাম—। শ্যামলীও ছাড়লে না, শশীবাবুর বৌও না—উভয়পক্ষে বাধলো কুরুক্ষেত্র। তারপর কথা একদম বন্ধ হয়ে গেল দুপক্ষেই। নানারকম শত্রুতা আরম্ভ করলেন শশীবাবুর প্রৌঢ়া স্ত্রী। ছেলেমেয়ের হাত ধরে খোলা ড্রেনে বসিয়ে দিতে লাগলেন সকালবেলা, পায়খানা থাকা সত্ত্বেও। প্রায় শ্যামলীর রান্নাঘরের সামনেই। কিছু বলবার জো নেই। ওই আর এক গোলমাল। একটি মাত্র পায়খানা নিচে। মেয়ে পুরুষ তাতে যাবে। কি নোংরা করেই রাখে মাঝে মাঝে। ভোরে অন্ধকার থাকতে যদি ঘুম ভাঙে, তবে কল পায়খানা ব্যবহার করা যাবে সেদিন, নয়তো বেলা এগারোটা, পুরুষরা সবাই আপিসে বেরিয়ে গেলে। চৌবাচ্চায় তখন দু' ইঞ্চি মাত্র জল থাকে কোনোদিন, কোনোদিন তারও কম।

শ্যামলীর দম বন্ধ হয়ে আসে।...

এমন কি কোনো বাসা পাওয়া যায় না যাতে অন্তত মেয়েদের একটা আলাদা নাইবার জায়গা আছে?...

আষাঢ় মাসের প্রথম।

ফিরিওয়ালা গলির মধ্যে হাঁকচে—চাই ল্যাংড়া আম—ল্যাংড়া আ-আ-ম—

বৃষ্টি এখনও নামে নি এবার। জ্যৈষ্ঠ মাসের গরম প্রায় সমান ভাবেই চলচে। মতির ছোট বোন এসে বললে—দশ পলা তেল ধার দেবেন কাকিমা?

শ্যামলী বললে—হবে না। তেল নেই।

—আট পলাও হবে না?

—কিছু নেই।

মেয়েটা চলে গেল। শ্যামলী তেল দেবে কি, ওদের কোন আক্কেল নেই। শ্যামলী কি সাধে বিরক্ত হয়েচে? উনি খারাপ কলের তেল খেতে পারেন না বলে এক নম্বর কানপুর কিনে আনেন ওঁর আপিসের রেশন বেচে। সে কী ঝাঁজওয়ালা তেল। মতিরা এক কৌশল ধরেচে কি, বিশ পলা সেই ভাল তেল হপ্তায় ধার নেবে, আর শোধ দেবে পাঁচসিকে সেরের কলের তেল দিয়ে। উনি বলেন, ও তেল খেলে বোরিবেরি হয়। শ্যামলীদের ফি হপ্তায় বিশ পলা তেল অপব্যয়ে যায়।

ওরা চালাক আছে। একবার নেবে দশ পলা, তারপর আর একদিন এসে দশপলা। একসঙ্গে নেবে না। একেবারে যেন মৌরসী পাট্টা করে বসেচে।...দেবে না তেল, রোজ রোজ ও চালাকি খাটবে না আমার কাছে। দেখি কি হয়।

কিন্তু মতির মায়ের কৌশল অন্যরকম। সে এতটুকু চটলো না, আবার একবার বাটি হাতে এসে হাজির স্বয়ং মতির মা।

—ও শ্যামলী, দে দিকি ভাই একটু তেল।

—তেল নেই দিদি।

—দিতেই হবে। মাছ ভাজা হচ্চে না, পাঁচ পলা তেল দে—

—যা আছে আমারই কুলোবে না দিদি—

—দেখি তোর তেলের বোতল? দে ভাই আমায় পাঁচ পলা—

অগত্যা শ্যামলী উঠে গিয়ে তেল দেয়, ও আবার পরের কাঁদুনি-মিনতি বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারে না। ঠকচে তো দেখাই যাচ্চে, ঠকুক। লোকে তাতে খুশী হয়, হোক।

কিন্তু এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে দোতলার ভাড়াটেদের মধ্যে মহা ঘোঁটমঙ্গলের সৃষ্টি হোল। মতির মা গিয়ে সাতখানা করে লাগিয়েচে তাদের কাছে।...তেল থাকতেও দিতে চাচ্ছিল না, বোতল দেখতে চাইলুম, তাই তো দিলে। এমন ছোট নজর তো কখনো করতে পারি নে আমরা। এই যে সেদিন বোশেখ মাসে ওঁর পেটের ব্যথা ধরলো রাত্তিরে, যদুবাবু সোডা চেয়ে নিয়ে যান নি আমাদের এখান থেকে? দিই নি আমরা? লোকের কাছে হাত পেতে যেমন নিতে হয়, তেমনি দিতেও হয়। তবে লোকে মানুষ বলে।

তার পরের দিন আর কলতলায় যাওয়া যায় না। বড় বড় বালতি, ঘড়া আর টব পড়লো একের পর এক সকাল থেকে। সে সব সরিয়ে এক বালতি রান্নার জল নিতে গেলেও ঝগড়ায় মুখর হয়ে উঠবে সারা বাড়ীটা—সেকথা শ্যামলী ভাল রকমেই জানে। অনেকবারের অভিজ্ঞতায় জানে। সুতরাং আষাঢ় মাসের গুমট গরমে বেলা এগারোটা পর্যন্ত তাকে অস্নাত অবস্থায় থাকতে হোল। এগারোটার পর কলের জল কখন চলে গেল। যখন সে নাইতে গেল, তখন চৌবাচ্চায় ইঞ্চি চারেক মাত্র জল। কাকের মুখ থেকে তার মধ্যে পড়েচে ভাত।

এই সময়ে একদিন যদুবাবু এসে বললেন, ওগো শোনো, একটা সন্ধান পেয়েচি। রাণাঘাট থেকে নেমে যেতে হয় প্রায় এগারো মাইল উত্তরে, বল্লভপুর বলে পাড়াগাঁ। সেখানে কলকাতার এক বড়লোকের জমিদারি কাছারি ছিল, বিক্রি করে ফেলেছে। মাঝে মাঝে যেতো বলে কাছারিবাড়ীর সংলগ্ন দোতলা বাড়ী তৈরী করেছিল. ওপরে নিচে পাঁচখানা ঘর, বারান্দা, রান্নাঘর, নাইবার ঘর সব আছে। দশ বিঘে জমির ওপর কাছারিবাড়ী, তাতে আম কাঁঠালের গাছ, কলাগাছ আছে। বাড়ীর সেই জমির নিচে দিয়ে একটা ছোট নদী বয়ে যাচ্চে, তাতে জমিদার বাঁধানো ঘাটলা করে দিয়েচেন. বাড়ীর মেয়েরা যখন গিয়ে থাকতো তাদের নাইবার সুবিধার জন্যে। সবসুদ্ধ তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার টাকা হলে বাড়ীটা পাওয়া যায়—জমিসুদ্ধ—কিনবো? প্রভিডেন্ট ফন্ডের টাকা সব যদি তুলে নিই—

—অত কমে হবে?

—পাড়াগাঁ। কে সেখানে খদ্দের হচ্চে? যদ্দুর শুনলুম, চাষা গাঁ। গাঁয়েও অত টাকা দিয়ে কেনবার লোক নেই।

—টাকা দেবে কোথা থেকে?

—প্রভিডেন্ট ফন্ডের টাকা সব তুলে নিই। তোমার গহনা কিছু দাও আর ইনসিওরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে কিছু ধার করি। আমার কাছেও সামান্য কিছু আছে।

শ্যামলীর মন নেচে উঠলো। কতদিন সে পাড়াগাঁয়ের মুখ দেখে নি। বাপের বাড়ী ছিল হুগলী জেলার তারকেশ্বর লাইনে দাসপুর গ্রামে। সে বংশে বাতি দিতে কেউ নেই। জ্ঞাতি কাকারা পর্যন্ত উঠে এসে কলকাতায় বাস করচেন, ঘোর ম্যালেরিয়া. চলে না সেখানে থাকা।

যদি এ সম্ভব হয়।

ভগবান কি এত দয়া করবেন? তা কি তার কপালে সম্ভব হবে?

শ্যামলী বললে—কিন্তু তুমি কোথায় থাকবে?

—কেন, সেখানে।

—আপিস?

—চাকুরি ছেড়ে দেবো। একঘেয়ে হয়ে গিয়েচে এ জীবন। আর ভাল লাগে না। স্বাস্থ্য যেতে বসেচে। একটু সাহস করে দেখি, যা আছে কপালে। ওখানে জায়গা জমি নিয়ে চাষবাস করবো।

—ছেলে দুটোর লেখাপড়া?

—রাণাঘাটে বোর্ডিংয়ে থাকবে। সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে এখন। আর এ যা লেখাপড়া শিখছে, এ শিখে তো কেরানী হবে? তার চেয়ে ভাল কাজ ওখানে শিখতে পারবে। বিলেত থেকে লোক গিয়ে আমেরিকায় বাস করে আমেরিকা যুক্তরাজ্য স্থাপন করেছিল। অজানায় পাড়ি না দিলে মানুষ মানুষ হয়ে ওঠে না। জীবন উপভোগই যদি না করলুম, বেঁচে থেকে কি হবে? গ্রামের লোকদের কাছে দুটো ভাল কথা বলবো। নাইট স্কুল করবো। বই পড়তে শেখাবো। এ আমার অনেক দিনের ইচ্ছা।

স্বামী-স্ত্রীতে মিলে সারা বিকেল আর রাত ধরে পরামর্শ হোল। শ্যামলীর চোখে রঙীন স্বপ্ন ভেসে উঠেচে—দূরের পাখী-ডাকা ফুল-ফোটা সুমুখ জ্যোৎস্না রাত্রির প্রহরগুলি। কত অলস মধ্যাহ্নে বনানীকোলে ঘুঘুর ডাক শোনা—বিছানায় আধজাগরিত আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় শুয়ে শুয়ে! কত আম্রমুকুলের গন্ধে সুবাসিত সকাল-সন্ধ্যা!

দিন পনেরো পরে।

যদুবাবুর সঙ্গে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক শ্যামলীদের বাসায় ঢুকলেন। যদুবাবু বললেন, উনি এখানে খাবেন।

শ্যামলীকে আড়ালে বললেন—উনি ওদের স্টেটের নায়েব, ওঁরও নাম যদুবাবু। তবে উনি কায়স্থ। আমাকে বলে কয়ে উনিই বাড়ী দেওয়াচ্ছেন। অতি ভদ্রলোক। একটু ভাল করে খাওয়াও-দাওয়াও। সাড়ে তিনের মধ্যে হয়ে যাবে, আর সেই সঙ্গে জমিদারের খাস কিছু রোয়া ধানের জমি আছে, সেটাও ওই সঙ্গে হয়ে যাবে।

আহারাদির পরে ভদ্রলোক অনেকক্ষণ কি পরামর্শ করলেন যদুবাবুর সঙ্গে। তারপর চা খেয়ে বিদায় নিলেন। এর তিনদিন পরে শ্যামলীকে যদুবাবু বললেন, বাড়ী রেজেস্ট্রি করা হয়ে গিয়েচে।

আষাঢ় মাসের শেষের দিকে জিনিসপত্র গুছিয়ে শ্যামলীরা তাদের নতুন কেনা বাড়ীতে বাস করতে চললো। কলকাতার বাসা একেবারে উঠিয়ে দিলে না, কিছু কিছু জিনিস-পত্র ঘরে রেখে চাবিবন্ধ করে গেল।

রাণাঘাট থেকে ট্রেন বদলে ওরা বেলা দশটার সময় বনগাঁ লাইনের গাংনাপুর স্টেশনে নামলো। আগে থেকে বন্দোবস্ত করার ফলে বল্লভপুর গ্রামের একখানা গরুর গাড়ী স্টেশনে উপস্থিত ছিল।

মাঠ ও বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এ-গ্রাম ও-গ্রাম পেরিয়ে চললো গাড়ী। বেলা প্রায় তিনটের সময় সামনের একটা ঝাঁকড়া বটগাছ দেখিয়ে গাড়োয়ান বললে—ওই বুদ্দীপুরের বনবিবিতলা দেখা যাচ্চে—ওর পরেই বল্লভপুর।

শ্যামলীর বুক দুলে উঠলো। কি জানি কেমন হবে এত আশা-সুখে-কেনা বাড়ীটা, কেমন হবে সেখানকার জীবনযাত্রা! জানাকে ফেলে অজানাকে তো আঁকড়ানো হোল চোখ বুজে, এখন সেই অজানার প্রকৃতি কি, সেটা এখুনি তো বোঝা যাবে আর একটু পরেই। কি গিয়ে দেখব যে সেখানে, কি জানি? সর্বস্ব খুইয়ে তার বিনিময়ে কেনা।

ক্রমে আরও আধ-ঘণ্টা কেটে গেল। বেলা বেশ পড়ে এসেচে। এমন সময়ে গাড়োয়ান বললে—এই যে বাবু, বাড়ীর সামনে এসে গিয়েছে গাড়ী। নামুন মা-ঠাকরুন এবার।

দুরু দুরু বক্ষে শ্যামলী নামলো সকলের আগে। যদুবাবু বললেন—না দেখে বাড়ী কেনা। এতগুলো টাকা—বলতে গেলে সর্বস্ব খুইয়ে—এই দূর গাঁয়ে বাড়ী কেনা। তুমি আগে নেমে বাড়ীতে ঢোকো। মেয়েরা ঘরের লক্ষ্মী, তুমি আগে ঢোকো। আমার তো সাহস হচ্চে না, কি জানি কি রকম হবে! নামো আগে।

—হ্যাঁগো বাড়ী কি পরিষ্কার করা আছে, না একগলা ধুলো আর মাকড়সার জাল আর চামচিকের বাসা! গিয়ে এখন ঝাঁট দিতে হবে? চাবি কোথা?

গাড়োয়ান শুনতে পেয়ে বললে—মা ঠাকরুন, বাড়ীতেই আছে মুক্তোর মা গয়লানী আর তার ছেলে। তারাই বাড়ী দেখাশুনো করে, নিচের একটা ঘরে আছে। চাবি তো নেই, বাড়ী খোলাই পড়ে আছে।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে একটা বাঁশঝাড়ের আড়ালে একেবারে শ্যামলীর সামনেই যে বাড়ীটা পড়লো, সেটা দেখে সে আনন্দে ও বিস্ময়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এই বাড়ী তাদের! এমন বাড়ী এই অজ পাড়াগাঁয়ে!

কলকাতায় এমনি হলদে-রঙ-করা সবুজ রঙের জানালা খড়খড়িওয়ালা দোতলা বাড়ী দেখেচে—দোতলাও নয়, বাড়ীটা তেতলা—কিন্তু এমন বাড়ীটা সত্যিই তাদের নিজস্ব!

শ্যামলী আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে বললে—ওগো দ্যাখো, এসে দ্যাখো—

পরক্ষণেই ওর লজ্জা হল। গাড়োয়ানটা না জানি কি আদেখ্‌লেই মনে করলে ওকে! ততক্ষণে যদুবাবু ও ছেলেমেয়েরা বাঁশঝাড়ের মোড় ছাড়িয়ে বাড়ীর কাছে এসে গিয়েচে। যদুবাবু বললেন—বাঃ, বেশ—বেশ—

রাস্তায় আসতে আসতে গাড়োয়ানকে যদুবাবু বাড়ীর কথা বহুবার জিজ্ঞেস করে-ছিলেন। সে বলেছিল—চমৎকার বাড়ী বাবু। কলকাতার বাবুরা থাকবার জন্যি করলেন। তেতলা বাড়ী, দরাজ জায়গা, নদীর ধারে বাঁধাঘাট আছে, ফলপাকড়ের গাছ। দ্যাখবেন বাড়ীর মত বাড়ী!

কিন্তু ছোটলোকের সে কথায় আস্থা স্থাপন করতে পারে নি শ্যামলী বা তার স্বামী। এখন বাড়ীটা দেখে মনে হল গাড়োয়ান অনেক কমিয়ে বলেছিল। বাড়ীটা সম্বন্ধে আসল কথা হচ্চে অনেকখানি ফাঁকা জায়গার মধ্যে বাড়ীটা দাঁড়িয়ে, অথচ ঠিক পাশেই গ্রামের বসতি।

বনানীর ও মাঠের সবুজের মধ্যে হল্‌দে রঙের বাহার।

ওরা হুড়মুড় করে সবাই গিয়ে বাড়ী ঢুকলো। নিচের ঘরে গিয়ে দেখলে সেখানে এক বুড়ী মাদুরের ওপর ঘুমিয়ে আছে। শ্যামলী ডাকলে—ও ঝি—কি যেন নাম ওর—মুক্তোর মা? ও মুক্তোর মা—

বুড়ী ধড়মড় করে জেগে উঠে বসলো। তারপর ঘুমজড়ানো চোখে ওদের দিকে খুব সামান্য একটুখানি চেয়ে থেকে তাড়াতাড়ি মাদুর ছেড়ে উঠে এসে শ্যামলীর পায়ে গড় হয়ে প্রণাম করে বললে—পোড়াকপাল আমার মা, ঘুমিয়ে পড়িচি এই অবেলায়। বেন্‌বেলা থেকে ওপরে নিচে সব ঘর ধোলাম, পোঁছলাম, ছাদ ঝাঁট দেলাম, বলি মা ঠাকরুনরা আসচেন, বাবু আসচেন—তা ছাদ তো নয় গড়ের মাঠ, এই হাতির মত বাড়ী ধোয়ানো সামলানো কি এক দিনের কম্মো? আসুন মা ঠাকরুন, আসুন বাবা—

শ্যামলী বললে—তোমার নাম মুক্তোর মা?

—বলে সবাই। বলো না, অদেষ্টের মাথায় মারি সাত খ্যাংরা। নামটাই আছে বজায়, যার জন্যি সে আর নেই। তা হলি কি আজ আমার ভাবনা—

শ্যামলীর ওসব কথা ভাল লাগছিল না। তার ইচ্ছে হচ্ছিল এক দৌড়ে বাড়ীটার ওপর নিচে সব দেখে আসে। কিন্তু কী মনে করবে এরা। কী মনে করবে মুক্তোর মা।

ওরা সবাই মিলে নিচের ঘরগুলো দেখলে। বড় বড় দুটো ঘর, প্রশস্ত থামওয়ালা ঝিলিমিলি বসানো বারান্দা, ওদিকে অন্য একটা ছোট রোয়াকের সামনে রান্নাঘর। শ্যামলীর বড় ছেলে কানাই বললে—মা, এ তো রান্নাঘর নয়, এ আমাদের কলকাতার বাসার ঘরের চেয়েও অনেক বড়। দ্যাখো কেমন আলমারি দেওয়ালের গায়ে?

বড় মেয়ে ডলি বললে—কতগুলো জানালা দ্যাখো মা রান্নাঘরে!

ওপরে সিঁড়ি বেয়ে দুড়দুড় করে সবাই উঠলো। শ্যামলী বললে—ওগো, দ্যাখো কি সুন্দর মেজে। কাঁচে শার্সি বসানো জানলা!

কানাই ও ছোট ছেলে বলাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললে—কি সুন্দর সিনারি, দেখে যাও মা বারান্দা থেকে—ওই তো মাঠটার পরেই কেমন সুন্দর ছোট নদীটা—ওপারে সবুজ মাঠ, কেমন ঝোপ আর বাবলা গাছ, গরু চরচে—ও কি ফুল ফুটেচে ওপারের ক্ষেতে বাবা?

যদুবাবু বললেন—ও ঝিঙের ফুল; বর্ষাকালে সন্দের সময় ঝিঙের ফুল ফোটে কিনা। সত্যি ভারি সুন্দর সিনারিই বটে, ওগো দ্যাখো, ইদিকে এস! কি ফাঁকা!

শ্যামলী বললে—তেতলার ঘরটা দেখে আসি চলো।

তেতলার ঘরটি অপেক্ষাকৃত ছোট। কিন্তু খুব বড় বড় তিনটি জানালা তিনটি দেওয়ালে। রাঙা মাটির পালিশ করা মেজে। দরাজ ছাদ, ছাদের ওপর থেকে বহুদূরব্যাপী মস্ত মাঠের সবুজ বাণী এই আষাঢ় সন্ধ্যায় ওদের অন্তর স্পর্শ করলে। শ্যামলীর চোখে জল এলো। এ যে রূপকথার রাজবাড়ী তার কাছে, সে গরীব ঘরের মেয়ে, গরীব ঘরের বৌ, কলকাতার বাসার অন্ধকূপে আজীবন কাটিয়ে আজ কি ভাগ্যে এমন বাড়ীঘর নিজের মনে করবার অধিকার পেল। কানাই ইতিমধ্যে ছুটে এসে বললে—বাঁধাঘাট দেখে এলাম মা। একটু ভেঙে ভেঙে চটা উঠে গিয়েচে চাতালের। তবুও দিব্যি আরামে নাইতে পারবে। ওই তো—দেখা যাচ্চে—এই উঠোনটা পার হয়েই—

যদুবাবু বললেন—নাঃ, সাড়ে তিন হাজার টাকা নিক—জিনিসের মত জিনিস। বাড়ীর মত বাড়ী। ছেলেপুলে নিয়ে দরাজ জায়গায় বাস করো। এই তো পাশেই গাঁয়ের কি পাড়া। ডাক দিলেই লোক পাবে। কোনো ভয় নেই। আমি এখানেই একটা কিছু করবো। এত লোকের চলচে, আর আমার চলবে না? খুব চলবে। তোমরা দাঁড়াও, জিনিস-পত্তর সব ওপরে নিয়ে আসি। কি কি গাছ আছে মুক্তোর মা?

মুক্তোর মা বললে—তিনটে আমগাছ আছে, সাতটা কাঁঠাল গাছ, একটা পেয়ারা গাছ, একটা চালতে গাছ, একটা বিলিতি কুলগাছ, দুঝাড় কলাগাছ, চারটে নারকোল গাছ। বাবুরা নিজির হাতে সব লাগিয়েছিল, থাকবে বলে। শখ করে কলকেতা থেকে চারা এনে এই ও-বছর—ওই দ্যাখো একটা চাঁপাফুলগাছ বসিয়ে গিয়েচে।

একটু পরে সন্ধ্যা হয়ে অন্ধকার নামলো। শ্যামলীর দুঃখ হল, এখন আর কিছু দেখা যাবে না। নতুনতর জীবনযাত্রার পথে নতুনতর দেশের প্রতি পথঘাট চিনে নেওয়া যেতো, ভাল করে দেখা যেতো আলোভরা দিনমানে।

শ্যামলী তাড়াতাড়ি লণ্ঠন জ্বালালে। ডাকলে—মুক্তোর মা, ও মুক্তোর মা—

মুক্তোর মা মালপত্র গাড়ী থেকে নামিয়ে এনে দোতলায় তুলছিল। বললে—কি মা?

—জল আছে বাড়ীতে?

—জল তুলে রেখেচি একটা বালতিতে, আর তো পাত্তর নেই মা তাই তুলতে পারি নি—

—সে কথা বলচি নে, বাড়ীতে জল আছে? কুয়োটুয়ো—

—বাঁধানো পাতকুয়ো আছে। নাওয়ার ঘর আছে, রান্নাঘরের পেছনে। চলুন, আমি দেখিয়ে দি। বাবুদের বাড়ীর কোন ত্রুটি ছিল না, আগাগোড়া সানবাঁধানো। চৌবাচ্চা আছে বাঁধানো।

—তাতে জল তুলে রাখো নি?

—নাইবেন যদি তবে পাতকুয়োর জলে কেন মা? দিব্যি বাঁধানো নদীর ঘাট, অসাগর জল নদীতে। এখন জোয়ার এসেচে, সব পৈঠেগুলো ডুবে গিয়েচে। চলুন গা ধুয়ে আসবেন।

শ্যামলী নদীর ঘাটেই নাইতে গেল। ঘাটের ঠিক পাশে কি একটা বড় প্রাচীন গাছ। তার ছায়া পড়েছে বাঁধাঘাটের পৈঠাগুলোতে। কি একটা পুষ্পের সুবাস বাতাসে ভুর ভুর করচে। এই গাছ থেকেই আসচে।

—কি ফুলের গন্ধ মুক্তোর মা?

—কি একটা লতা এই গাছে উঠেচে মা, কাল সকালে দেখবেন সাদা সাদা ফুল ফুটেচে। ভারি বাস বেরোয় রাত্তিরে।

শ্যামলী জলে নামলো। আজ সে রূপকথার রাজকন্যে। স্নিগ্ধ জল, ওপারের দিক থেকে হাওয়া বইচে। সেই ফুলের সুগন্ধ। তারাভরা আকাশ। এই বাঁধা ঘাট, এই প্রাচীন কি বনস্পতি, এই বনপুষ্প-সুবাস—সব তাদের, নিজস্ব। তারা পয়সা দিয়ে কিনেচে। কলকাতায় সেই পচা ড্রেন, কলতলা, অভয়া, বিশ্বাস গিন্নি সব স্বপ্ন হয়ে গিয়েচে একদিনে। তাদের জন্যেই সত্যি কষ্ট হোল। বেচারী মতির মা। বেচারী শশীবাবুর বৌ। ওদের একবার এখানে আনতে হবে। না, এও স্বপ্ন, এখনো যেন বিশ্বাস হয় না এত সৌভাগ্য।

ডলি চেঁচিয়ে ডাকচে দোতলার বারান্দা থেকে—ওমা, শিগ্‌গির গা ধুয়ে এসো—বাবা চা চাইচে—এস চট করে—

শ্যামলী স্বপ্নলোক থেকে নেমে এল। সাবানের বাক্সটা নেই। আনতে ভুলে গিয়েচে তাড়াতাড়িতে।

—মুক্তোর মা, ছুটে যাও, বড়দিদিকে বলগে যাও, ছোট তোরঙ্গের মধ্যে সাবানের বাক্সটা আছে, দিতে।

মাকাল-লতার কাহিনী

এই বর্ষায় আমাদের গ্রামের নানা বনে ঝোপে মাকাল-লতার নিভৃত বিতান রচিত হয়েচে। আমি মাকাল-লতা বড় ভালোবাসি। যেদিন প্রথম আমার চোখে পড়লো মাকাল-লতার বিচিত্র রচনা, তখন মন আনন্দে ভরে উঠলো।

তারপর সেই সুন্দর দিনটি এল, যেদিনে দেখলুম মাকাল-লতার ঝোপে ঝোপে কাঁচা সবুজ ফল ধরেছে। সবুজ, মসৃণ, চিক্কণ গা পুষ্ট ফলগুলির। আমি রোজ বেড়াতে যাই, নাইতে যাই, ঝোপে মাকাল ফলের শ্যামল রূপ দেখি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে।

ঘন বর্ষার দিনে নদীর তীরে, নিভৃত মৌন বনবিতানে নীল আকাশের তলায় ঝোপে ঝোপে সবুজ আপেলের মত ফলগুলি, একদৃষ্টে কতক্ষণ ধরে চেয়ে থাকি। প্রজাপতি ওড়ে, পাখী গান গায়।

এ বছর বর্ষা তেমন হয় নি আজও; তবুও নদীর ধারে দুটি বনের ঝোপে মাকাল-লতা যথেষ্ট বেড়ে সারা ঝোপটির মাথা ঢেকে ফেলেচে। আর একটি মাকাল-লতা সুন্দর ঝোপ গজিয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেচে গোপালনগর বাজার ছাড়িয়ে পুরোনো ডাকঘরটার সামনের বটতলায়।

ডাকঘরের এ ঝোপের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, মটর-লতার মটর ফলের গুচ্ছ ও মাকাল ফল পাশাপাশি দুলচে। মনে হবে পারস্য দেশের সূর্যতপ্ত কোনো উদ্যানে আপেল ও দ্রাক্ষাগুচ্ছে একসঙ্গে ফলেছে—বাংলাদেশের ঘরোয়া জঙ্গল এ নয়। তারপর হঠাৎ একদিন দেখি মাকাল-লতার ফলগুলির কোনো-কোনোটাতে রং ধরেচে। ক্রমে সেগুলোতে একটু করে রং চড়ালো সূর্যতাপে, রাঙা টুকটুকে সিঁদুর গোলা ফলের রং, ঘন সবুজ ঝোপের সবুজ পত্রসম্ভারের মধ্যে রূপসী নববধূর মুখের মত উঁকি মারচে রাঙা টকটকে সুঠাম সুগোল ফলগুলি। এই দুটি মাকালঝোপ আমার কাছে কি অপূর্বই লাগে! নদীর ধারেরটি ও এই বটতলার।

নদীতীরের ঝোপ সৃষ্টি হয়েছে এক নিবিড় লতাবিতানের নিভৃত ছায়াগহন আশ্রয়ে। একটা সাঁই-বাবলা গাছের মাথায় মাকাল-লতা উঠে জড়িয়ে জড়িয়ে এই ঝোপ তৈরী

করেচে। সাঁই-বাবলা গাছ এমন সুন্দর, যেখানে থাকে সেখানে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে না দেখে থাকা যায় না। সরু সরু লম্বা পাতা, আঁকাবাঁকা শাখা-প্রশাখা, ভাদ্রমাসে সাদা মঞ্জরীর মত ফুল হয়েচে একসঙ্গে বহু, আর ওদের মুখ থাকে নীল আকাশের পানে উঁচু হয়ে। তারই ওপরে সেই মাকাল-লতার ঝোপ—আর মাথা থেকে ঝুলে ঝুলে পড়েচে এদিকে ওদিকে মাকাল-লতার দীর্ঘ ডালগুলি, আর তার প্রতি গ্রন্থিতে, লতাগ্র-ভাগে, সবুজ পত্রান্তরালে চিক্কণ শ্যাম অথবা লাল টকটকে মাকাল ফল।

এক অদ্ভুত সৌন্দর্যের জন্যে পটভূমি রচনা করেচে পাশে বড়গোয়ালে-লতার আর একটি বড় ঝোপ—একদিকে একটা আম্রবৃক্ষের নত শাখ, দশ বর্গফুট আন্দাজ সুনীল আকাশ আর গাছের তলায় শেওড়া, বৈঁচি, ভাট, বনকচু, বনআদা, সন্ধ্যামণির নিবিড় জঙ্গল। প্রভাতের অপূর্ব রৌদ্র পরিস্রুত হয়ে আসে বড় গোয়ালে-লতার বড় বড় পানের মত পাতার মধ্যে দিয়ে, ওই পাতার উল্টো পিঠগুলো যেন স্বচ্ছ দেখতে সূর্যকিরণে. একটি সজল ছায়া বিস্তৃত হয়ে আছে বনতলে, মেঘনগরীর ঊর্ধ্বের নীলাকাশ তার বাণী পাঠিয়েচে তার ওই দশ বর্গফুট বয়সের প্রতিনিধির হাতে। শালিক, ছাতারে, ঘুঘু, দোয়েল, নীলকণ্ঠ, শ্যামা, দুর্গা টুনটুনি প্রভৃতি পক্ষিকুলের সম্মিলিত প্রভাত-কাকলীতে মুখর হয়ে উঠেচে বনবাণী।

এরই মধ্যে সুদীর্ঘ নম্রমুখ লতা যেখানে মাটি ছুঁয়ে দুলচে, সেখানে লতার প্রতি গ্রন্থিতে দুলচে রাঙা টুকটুকে মাকাল ফল। ভাদ্রমাসে বেশির ভাগ মাকাল ফলই পেকেচে, ক্কচিৎ দু-চারটে কাঁচা আছে।

এই মাকালঝোপ কি জাদু জানে! বোধ হয় কোন ঐন্দ্রজালিক লুকিয়ে থাকে ওর শ্যামবনানীর অন্তরালে, মানুষের মনকে মোহগ্রস্ত করে ফেলে এক মুহূর্তে—যে মুহূর্তে বনতলে ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ানো যায় সেই মুহূর্তেই। কোন অসাধারণ ঐন্দ্রজালিক আর তার ইন্দ্রজাল এ!

এই ক্ষুদ্র মাকাল-লতার ঝোপে আমার মন কেন মোহাবিষ্ট করে তার কারণ আমি জানি নে বললে কবিজনোচিত ধোঁয়াটে বর্ণনা দ্বারা জিনিসটাকে ঘোরালো করা যেতো। কিন্তু এর কারণ আমি জানি।

কি জানি?

তাই কি বিশ্লেষণ করে বলার কথা?

ঝোপের পাশে দাঁড়ালুম সেদিন প্রভাত বেলায়। কাঁধে গামছা, হাতে সাবানের বাক্স-ইছামতীতে বনসিমলতার ঘাটে স্নান করতে যাচ্ছিলুম। ইচ্ছে করেই ঘুর পথ দিয়ে গেলাম শুধু এই মাকাল ফল দোলানো ঝোপটি দেখবো বলেই।

রোজই দেখি। দেখবার সুযোগ একদিনও ছাড়ি নে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ঊর্ধ্বে একটি অকলুষ, উদার, দিব্য জগতের অকথিত বাণী এই মাকাল-লতার ঝোপের পথে আমার মনে প্রবেশ করে। সারা নাক্ষত্রিক বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ সাধন করে এই অদ্ভুত সুন্দর রাঙা ফলগুলি! রঙের কি তীক্ষ্ণ কনট্রাস্ট! চিক্কণশ্যাম লতাবীথির শ্যামল পত্র-পুঞ্জের ফাঁকে ফাঁকে টুকটুকে রাঙা ফলগুলি...আপেল ফলের মত গড়ন অবিকল, তবে পাকা আপেল হয় হলদে-লাল মেশানো—এর একেবারে সিঁদুরের মত রং।

এর মধ্যেই বিশ্ব। এই মাকালঝোপের নিচেই। এই যে মাকাল-পাতাগুলো এদিক ওদিক অদ্ভুতভাবে ঝুলচে গাছ থেকে পড়ে, তার গাঁটে গাঁটে পাকা ফল, এই যে রহস্য-ময় সুন্দর দৃশ্য যার দিক থেকে চোখ ফেরানো যায় না, অবাক হয়ে বিমুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকতে হয়—এই সৃষ্টির আইডিয়ারূপী বীজ কার মধ্যে ছিল? কোন দেবতা তিনি? কত বড় শিল্পী তিনি?

'কল্পনাসৃষ্টিবীজস্য'।

কার মহতী কল্পনার মধ্যে এ সুন্দর মাকাল-লতার দুলুনি, এর শ্যামপত্রগুচ্ছ, এর টুকটুকে রাঙা, সুগোল, সুঠাম ফলগুলো ছিল বীজরূপে অধিষ্ঠিত? বাষ্পাগ্নিপ্রোজ্জ্বল শত শত সহস্র সহস্র লক্ষ কোটি নীহারিকা যিনি সৃষ্টি করেছেন, সেই মহারুদ্রের ভয়াল রূপ কোথায় মহাশূন্যের দূর প্রান্তে ; আর কোথায় এই ক্ষুদ্র পৃথিবী-গ্রহের এক কোণে সুনিভৃত নির্জন লতাবিতান, সূর্যের সে বিরাট হাওয়ার বাষ্পতেজ বহু মাইল ব্যাপী বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে, সজল বর্ষার মধ্য দিয়ে, বসন্তদিনের জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়ে, বন-বিহঙ্গকাকলীর মধ্য দিয়ে, বনকুসুমের সুবাসের মধ্য দিয়ে পরিস্রুত হয়ে মোলায়েম হয়ে প্রভাতের রৌদ্ররূপে যে লতাবিতানকে আলো করেচে,—আর তারই মধ্যে এই সুন্দর চিক্কণ, সুস্পষ্ট, রাঙা মাকাল-ফল লতাগ্রভাগে দোদুল্যমান!

যিনি অগ্নিতে, যিনি জলেতে...

যিনি মহারুদ্র, তিনিই চিরপ্রাচীন অথচ চিরতরুণ পুষ্পধন্বা দেবতা...সৃষ্টি বজায় রাখতে কামদেবের আবির্ভাবের প্রয়োজন হয়তো। মুখে মুখে এক কবিতা রচনা করলুম সেই অজানা শিল্পী দেবতার উদ্দেশে......

হেথা নীল আকাশের তলে
প্রজাপতি ওড়ে ফুলে ফুলে,
হোথা কোথা কত দূরে
'ওমিক্রন সেটি' ঘোরে
সঙ্গে তার সুশুভ্র বামন।*

কবিতা হিসেবে লোকে হাসবে হয়তো। কিন্তু লোকদের জন্যে এ রচিত নয়—যাঁর উদ্দেশে সেই প্রভাতের কনকদ্যুতিমণ্ডিত বনবীথিতলে এ কবিতা মুখে মুখে রচিত, তিনি কৃপা ও প্রশ্রয়ের স্মিতহাস্যে দক্ষিণপাণি প্রসারিত করে গ্রহণ করেচেন অক্ষমের সে স্তুতি। 'ওমিক্রন সেটি'র অগ্নিলীলার মধ্যে এই গোল গোল রাঙা মাকাল ফলের স্বপ্ন লুকানো আছে। 'ওমিক্রন সেটি'র চারিপাশে ঘূর্ণ্যমান গ্রহরাজি যদি থাকে, যদি সেখানে অনন্তযৌবনা দেবকন্যারা সে দেশের বনবীথির অন্তরালে, সেখানকার অজ্ঞাত বসন্তদিনে অলস শয়নে শুয়ে দিনপাত করেন, কে জানে সেই বনবীথির মাঝে এমন মাকাল-লতা, অমন দোদুল্যমান ফলগুচ্ছ, ঘনসবুজ ঝোপের অন্তরালে এমন টুকটুকে রাঙা ফল হয়তো আছে।

মাকাল ফলের আয়ুষ্কাল বেশী দিন নয়, একমাস দেড়মাস। সুপক্ক অবস্থায়ও দিন-পনেরো গাছে দোলে, তারপর একদিন ঝরে পড়ে যায়। তাই রোজ দুবেলা যেতাম মাকাল ঝোপের তলায়—একমাস দেড়মাস ধরে কত রূপে একে দেখেচি—এই লতাবিতানকে। প্রভাতের আলোতে, ঘনবর্ষার মেঘমেদুর সন্ধ্যায়, নির্জন ভাদ্র দ্বিপ্রহরে নিস্তব্ধ প্রশান্তির মধ্যে উদার নীলাকাশের তলে ঘুঘু-ডাকা উদাস বনানীর পটভূমিতে, সুন্দর জ্যোৎস্না-রাতের প্রথম প্রহরের জ্যোৎস্নায়। বাবলার হলদে ফুল আর সাঁই-বাবলার ফুলের শিষ, তার মধ্যে দুলে দুলে হলদে-ডানা সাদা-ডানা প্রজাপতির মেলা, তার মধ্যে দোদুল্যমান মাকাল-লতার নিবিড় ছায়াগহন আশ্রয়, তপোবনের ন্যায় স্নিগ্ধ, পবিত্র। খানিকটা সেখানে দাঁড়ালেই সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে পড়ি, কেমন যেন সারাদেহ শিউরে ওঠে, মন অপূর্ব ভাবে ও স্বপ্নে বিমুগ্ধ হয়ে পড়ে—এ আমি এই গত এক মাসের মধ্যে অন্তত ছ'সাতদিন দেখেচি। সে স্বপ্ন কিসের কি করে বলবো, আম্রশাখা ও সাঁই-বাবলার ফুলে ভরা শাখার পিছনকার নীল আকাশের স্বপ্ন, কোনো মহাশিল্পী মহাদেবতার প্রত্যক্ষ আবির্ভাবের স্বপ্ন, সবুজ ঝোপের মাথায় ফলন্ত রাঙা মাকাল ফলগুলির

* ওমিক্রন সেটির সহকারী নক্ষত্র, ইংরাজীতে 'হোয়াইট ডোয়ার্ফ' শ্রেণীর।

আমায় দেখে মেয়েটি বললে—কাকাবাবু, ও কিসের ছবি?

—ও আমার ফটো।

—আপনার ছবি?

মেয়েটি ফটোর কথা বোধ হয় বুঝতে পারে নি। বললুম—হ্যাঁ আমার ছবি।

—কে করেচে কাকাবাবু?

মেয়েটি এতক্ষণ বিস্ময় ও প্রশংসার দৃষ্টিতে ঘরের দেওয়ালের কতকগুলো ফটো, সিগারেটের বিজ্ঞাপনের মেমসাহেব, ক্যালেন্ডারের ছবিগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। পল্লীগ্রামের ঘরের দেওয়ালে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, যামিনী রায় বা রেম্ব্রাণ্টের ছবি অবিশ্যি টাঙানো ছিল।

—ও মেমসাহেব কি করচে কাকাবাবু?

—সিগারেট খাচ্চে।

—ওমা, মেয়েমানুষ সিগারেট খায়?

—মেমসায়েবরা খায়। দেখেচিস কখনো মেমসায়েব?

—হুঁ।

—কোথায়?

—রাণাঘাট ইস্টিশানে। আড়ংঘাটা যাচ্ছিলাম যুগলকিশোর দেখতে, তাই দেখি রেল-গাড়ীতে বসে আছে। সাদা ধপ ধপ করচে একেবারে।

দেখলুম ও একা বসে থাকলেও দেওয়ালের ওই অকিঞ্চিৎকর ছবিগুলো দেখে বেশ আমোদ পাচ্চে। আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আমি আবার ঢুকলাম ঘরে কি কাজে। মেয়েটি সেখানে ঠায় বসে আছে সেই ভাবেই। ওকে কেউ গ্রাহ্যও করচে না বাড়ীর মেয়েরা। তাতে ওর কোনো দুঃখ নেই, দিব্যি একা একা বসে আছে। চলেও যায় নি।

ও যে আমাদের ঘরে ঢুকে মেজের ওপর বসে আছে, এই আনন্দে ও ভরপুর। দিব্যি লাল রং দেওয়া মাজাঘষা মেজে, ঘরের বিছানা আসবাবপত্র দামী নয়, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেওয়ালে যে শ্রেণীর ছবি, সে তো বলাই হোল। একখানা টেবিল, একটা চেয়ারও আছে। টাটার টেবিল ল্যাম্প আছে একটা। কতকগুলো মাটির পুতুল—যেমন গণেশ-জননী, গরু, হরিণ, টিয়াপাখী, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি—একটা কাঠের তাকে সাজানো আছে।

গৃহসজ্জার এই সামান্য রূপই ওর চোখে আশ্চর্য ঠেকেচে, খুকীর চোখ দেখলে তা বোঝা যায়। আমার কষ্ট হল—ওকে কেউ আদর করে ওর সঙ্গে কথা বলচে না। ও সেটা আশাও করে নি। আমাদের গ্রামে তেমন ব্যবহার কামার-কুমোরদের মেয়েদের সঙ্গে কেউ করে না। ওরা ঘরে ঢুকে বসতে পেয়েচে, এতেই ওরা অত্যন্ত খুশী আছে।

আমি তেল মেখে নাইতে যাবো। নারকোল তেল আজকাল পাওয়া যায় না বলে বাড়ীর মেয়েদের ফরমাশ মতো গন্ধতেলের বোতল আসে দোকান থেকে—হেন কল্যাণ, তেন কল্যাণ।

আমি বোতল থেকে তেল বের করে মাথায় মাখচি দেখে ও চেয়ে রইল।

আমি বললাম—গন্ধতেল একটু মাখবি, খুকী?

মেয়েটি অবাক হয়ে গেল। এমন কথা ওকে কেউ বলে নি, কোনো ব্রাহ্মণবাড়ীর কর্তা তো নয়ই।

বললে—হ্যাঁ!

—সরে আয় দিকি মা।

তারপর তার চোখদুটির অবাক দৃষ্টিকে অবাকতর করে দিয়ে আমি নিজের হাতে তার মাথায় খানিক গন্ধতেল মাখিয়ে দিলাম, খোঁপা-বাঁধা চুলের ওপর ওপর। ও হেন অনাদৃতা আদর পেয়ে লজ্জা পেলে।

স্বপ্ন—গভীর সৌন্দর্যের স্বপ্ন। পাগল করে দেয় ওই স্বপ্ন।

আমি জানি, তেমন ভাব ও স্বপ্নালুতা সারা বছরে একদিন হলেও জীবন ধন্য হয়ে যায়—তাই এই মাকাল-লতার সীজন্-এ এল মাসে সাতদিন।

এ মাকাল-লতার ঝোপ যেন পবিত্র দেবায়তন, অতি পবিত্র অতি সুন্দর। সৌন্দর্যের পূজারী যে, এই দেবায়াতনে দেবতার আবির্ভাব সে দর্শন করবে। এখানে জাগ্রত ও প্রত্যক্ষ দেবতাকে নিত্য প্রণাম করবে।

জয় হোক মাকাল ফলের! জয় হোক 'ওমিক্রন সেটি'র। কত বড় ও কত ছোট। কিন্তু উভয়ের মধ্যেই আর্টিস্টের আবির্ভাব অতি প্রত্যক্ষ, অতি পবিত্র। যার মন খারাপ হয়েচে সে অমৃতের সাগরে এসে তীর্থজল আহরণ করুক। প্রত্যক্ষ করুক ঋগ্বেদের শিবরুদ্রীয় স্তোত্রের অমর বাণী। বৃক্ষের পত্রেও তুমি, পত্রের পতনেও তুমি।

আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি মাকাল ফল ঝরে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে, মাকাল-লতার শ্যাম শোভা অন্তর্হিত হবে, বনভূমি আগামী বৎসরের শ্রাবণদিনের প্রতীক্ষায় থাকবে—সুপক্ব মাকাল ফলের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায়। ঝরঝর বাদল দিনের অপরাহ্ণে আবার এদের দল আসবে ঘুরে, যেমন এরা আসে প্রতি বর্ষা ঋতুতে, কত বৎসর, কত শতাব্দী, কত যুগ ধরে...অনন্তের সসীম প্রতিনিধির মতো...কেউ খবর রাখে, কেউ রাখে না।

তুচ্ছ

আমি সকালে উঠে বসে কাগজপত্র নিয়ে ঘাঁটচি, এমন সময়ে একটি তেরো চৌদ্দ বছরের ছোট মেয়ে রাঙা শাড়ী পরে আমাদের বাড়ীতে ঢুকলো। আমাদের গ্রামেরই মেয়ে নিশ্চয়, তবে একে কোথাও দেখিনি বলে চিনতে পারলাম না। মেয়েটির এই অল্প বয়সেই বিয়ে হয়েচে, ওর কপালে সিঁদুর, হাতে সোনা-বাঁধানো শাঁখা; শ্যামবর্ণ, এক-হারা চেহারার মেয়ে। মুখখানি বেশ ঢলঢলে; বড় বড় চোখ দুটি। কানে দুটি সোনার দুল। জিজ্ঞেস করলুম—কার মেয়ে তুই রে?

মেয়েটি সামান্য একটু হেসে মাটির দিকে চোখ রেখে বললে—বিশ্বনাথ কামারের।

—বিশুর মেয়ে? বেশ, বেশ। তোর দেখচি বিয়ে হয়েচে এই বয়েসে। কোথায় শ্বশুরবাড়ী?

মেয়েটির খুব লজ্জা হ'ল শ্বশুরবাড়ীর কথায়। সে মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে বললে—নারানপুর।

—কোন নারানপুর? ঘিবে-নারানপুর?

—হ্যাঁ।

—ক'দিন বিয়ে হয়েচে?

—এই ফাল্গুন মাসে।

—শ্বশুরবাড়ী থেকে এলি কবে?

—পরশু এসেচি কাকাবাবু।

—আচ্ছা যা বাড়ীর মধ্যে যা।

গ্রামের মেয়ে বাপের বাড়ী এসেচে, এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় সব বাড়ী ঘুরে বেড়াচ্চে। বড় স্নেহ হ'ল খুকীটির ওপর। এই গ্রামেরই মেয়ে, আহা!

কিন্তু খানিকক্ষণ পরে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে দেখি মেয়েটি মাঝের ঘরের মেজেতে চুপ করে বসে আঁচল নিয়ে নাড়চে। কেউ ওর দিকে মনোযোগ দিচ্চে না, কেউ ওর সঙ্গে কথা বলচে না। প্রথম প্রথম হয়তো কথা বলেছিল মেয়েরা, এখন আর ওর কাছাকাছি কেউ নেই, ও একাই বসে আছে। কামারদের মেয়ে, তার সঙ্গে কে কথা বলে বেশিক্ষণ?

বললাম—কি রকম গন্ধ?

—চমৎকার, কাকাবাবু!

—কি তেল বল দিকি?

—কি জানি?

—খুব ভালো গন্ধতেল।

ভারি খুশী হয়েচে ও।

বললে—আসি তা হলে কাকাবাবু? বেলা হয়েচে।

—এসো মা। আবার এসো একদিন—

চলে গেল খুকী। কতটুকু আর তেল দিলাম ওর মাথায়। কিন্তু কি আনন্দ আমার স্নান করতে নেমে নদীজলে। উদার নীল আকাশে কিসের যেন সুস্পষ্ট, সৌন্দর্যময় বাণী। অন্তরের ও বাইরের রেখায় রেখায় মিল। চমৎকার দিনটা। সুন্দর দিনটা।

বেণীগীর ফুলবাড়ী

মুঙ্গেরের কষ্টহারিণী ঘাটে রোজ সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে ললিতবাবুর দেখা হইত।

আমি পিসিমার বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিলাম। পশ্চিমের শহরে তাহার পূর্বে কখনও বেড়াইবার অভিজ্ঞতা ছিল না, আমার এক বন্ধু আসিবার সময় বলিয়াছিল ওখানে জুতায় কালি দেওয়ার কোন দরকার হবে না দেখো।

দেখিলাম, ব্যাপার তাই বটে। লাল ধুলা মাখিয়া জুতার যে দশা হয় পনেরো মিনিট রাস্তা চলিবার পরেই, তাহাতে জুতায় কালি দিবার উৎসাহ ক্রমে কমিয়া গেল। শহরের মধ্যে বা বাহিরের যে কোন জায়গাতেই যান, সর্বত্র ধুলো। ক্রমে বেড়াইবার উৎসাহও কমিয়া আসিল। তখন সন্ধ্যার পরে গঙ্গার ধারেই দেখিলাম বেড়াইবার প্রকৃষ্ট স্থান। এদিক ওদিক বেড়াইয়া কষ্টহারিণীর ঘাটের সিঁড়ির উপর রাত পর্যন্ত একা বসিয়া থাকিতাম।

একদিন পাশে এক প্রৌঢ় বাঙ্গালী ভদ্রলোক আসিয়া বসিলেন। কথায় কথায় আলাপ হইলে জানিলাম, তাঁহার নাম ললিতমোহন ঘোষাল, বাড়ী হুগলী জেলায়—ভবঘুরে লোক, আগে ছিলেন বর্ধমান টাউনে, ম্যালেরিয়ায় স্বাস্থ্যহানি হওয়ায় পশ্চিমে আজ প্রায় দশ-বারো বৎসর আসিয়া বাস করিতেছেন। ক্রমে ললিতবাবুর সহিত প্রত্যহ দেখা হইত. ঘাটে বসিয়া গল্প করিতাম অনেক রাত পর্যন্ত।

একদিন তিনি আসিয়া আমায় বলিলেন—আপনি একজন সাহিত্যিক, এ কথা তো এতদিন আমায় বলেন নি?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কার মুখে শুনলেন আবার এ কথা?

—সবাই বলছে। আপনি সোমবার বেথুনবাজার লাইব্রেরীতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন শুনলাম। আমার বাড়ীওয়ালার ছেলে ছিল সভায়—

—হ্যাঁ, ও!...তা বটে।

—বড় আনন্দ হল আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে। আমিও নিজে একটু-আধটু লিখতুম কিনা এক সময়ে, তাই সাহিত্যিকদের বড় শ্রদ্ধা করি মশায়—আপনি বয়সে অনেক ছোট হলেও আমার নমস্য—

আমি বিনয়সূচক হাস্য সহকারে বলিলাম—কি যে বলেন!

—একদিন আসুন না গরীবের বাসায়। লেখাটেখাগুলো আপনাকে দেখাব। এককালে যথেষ্ট—হেঁ হেঁ—লোকে জানতো। আমার উপন্যাসের দু-তিনটে এডিশন হয়েছে মশাই—

শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলাম। বাল্যে আমি তখনকার সময়ের হেন উপন্যাস ছিল

না যাহা পড়ি নাই। কিন্তু ললিত ঘোষালের নাম ঔপন্যাসিক হিসাবে কোথাও পাই নাই, কাহারও মুখে শুনিয়াছি বলিয়াও তো মনে হইল না।

কৌতূহলবশতঃ একদিন ললিতবাবুর সঙ্গে তাঁর বাসায় গেলাম। স্টেশনের কাছে লাইনের ধারে একটা ছোট পুরানো বাড়ীর বাহিরের ঘরে তাঁর বাসা। অতি অপরিষ্কার ঘর, কত কাল যেন ঝাঁট পড়ে নাই, বিছানাপত্র ততোধিক ময়লা, ছেঁড়া তুলো-বেরুনো ওয়াড়বিহীন বালিশ, ময়লা গামছা ও ঘরে পরিবার ধুতি দেখিয়া মনে হইল ললিতবাবুর বর্তমান অবস্থা আদৌ সচ্ছল নয়। ললিতবাবু আমায় যত্ন করিয়া বসাইলেন। বলিলেন, একটু চা খান দয়া করে এসেছেন যখন।

আতিথ্যের কোন ত্রুটি হইল না। নিজেই চা করিয়া দুখানা আটার রুটিতে গুড় মাখাইয়া আমায় খাইতে দিলেন। হুঁকায় তামাক সাজিয়া আমায় দিতে গেলেন, আমার ও সব চলে না শুনিয়া দুঃখিত হইলেন।

নিজে তামাক খাওয়া শেষ করিয়া তিনি একখানা পুরানো বাঁধানো খাতা আমার কাছে আনিয়া খুলিলেন। আমার দিকে সলজ্জ হাসিয়া বলিলেন—এই দেখুন, মানে—যত কাগজে আমার সমালোচনা বার হয়েছিল আপনাকে দেখাচ্ছি। সাগ্রহে খাতাখানি দেখিতে লাগিলাম। এখন হইতে বিশ-পঁচিশ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ইংরাজী ১৯১০ কি ১২ সালের দিকে যে সব খবরের কাগজে ও মাসিক পত্রিকায় সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন, যেমন 'বঙ্গবাসী', 'ইংলিশম্যান', 'হিতবাদী', 'ভারত-মহিলা' প্রভৃতি—সেই সব পত্রিকা হইতে তাঁহার বিভিন্ন পুস্তকের সমালোচনাগুলি কাটিয়া আঠা দিয়া খাতাখানিতে আঁটিয়া রাখা হইয়াছে। প্রত্যেক টুকরাতে কাগজের নাম ও মাস তারিখ কালি দিয়া হাতে লেখা। টুকরাগুলি বিবর্ণ, হলদে ও জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু খুব বেশী ধুলাবালি পড়িয়া নাই তাহাদের উপর—দেখিয়া মনে হয় খাতাখানির প্রতি যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হয় ও মাঝে মাঝে ঝাড়ামোছা করা হয়। ললিতবাবু প্রত্যেকটি আমায় পড়িয়া শোনাইতে লাগিলেন। দেখিলাম—তাঁহার বইয়ের এককালে বেশ ভাল সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। পড়িতে পড়িতে গর্বে ও আনন্দে তাঁহার মুখ চোখের ভাবই যেন বদলাইয়া গেল। একখানি ইংরাজী কাগজে তাঁহাকে বঙ্কিমচন্দ্রের সমকক্ষ বলা হইয়াছে, তবে ইংরাজ-সম্পাদিত ইংরাজী কাগজ—বলা বাহুল্য, তাহাদের যেমন জ্ঞান বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে, তেমনি জ্ঞান ললিত ঘোষাল সম্বন্ধে। উঠিব উঠিব করিতেছি এমন সময় ললিতবাবু বলিলেন, দুখানা বই লিখে রেখেছি, অনেকদিন হল। মশায় তো কলকাতায় থাকেন, পাবলিশারদের সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ, বই দুখানার কিনারা করতে পারেন?

প্রধানতঃ তাঁহারই আগ্রহে পড়িয়া সেদিন দুখানা ভারি মোটা খাতা আমাকে বাসায় বহন করিয়া আনিতে হইল।

আসিবার সময় ললিতবাবু বার বার বলিলেন, আমি যেন পাণ্ডুলিপি দুখানা ভাল করিয়া পড়িয়া দেখি। কিন্তু বাড়ীতে আসিয়া খাতা দুখানা পড়িয়া ললিতবাবুর জন্য আমার কষ্ট হইল। অত্যন্ত সেকেলে ধরণের লেখা, জবড়জঙ্ ভাষা, সেণ্টেন্সগুলি কাঠের পুতুলের ন্যায় নড়নচড়ন-বিরহিত, প্রাণহীন। পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে পুণ্যের জয় ও পাপের শাস্তি পাঠ পাঠকের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখানো হইয়াছে। এ যুগে এ বই অচল। ললিত ঘোষালকে কথাটা খোলাখুলিভাবে বলিতে পারি নাই। কণ্টহারিণীর ঘাটে ললিতবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—পড়েছেন? কেমন লাগল?

বলিলাম—চমৎকার। একালে অমন লেখা আর দেখা যায় না।

কথাটার মধ্যে মিথ্যা ছিল না।

ললিতবাবু অত্যধিক খুশী হইয়া বলিলেন—হেঁ হেঁ, আপনি হলেন গিয়ে নিজে একজন লেখক—সমঝদার লোক। আপনাকে কি বুঝিয়ে বলতে হবে এসব? আজকাল

না। তাহার হাতে পাঁচটি টাকা দিয়া বলিলাম—ললিতবাবুকে গিয়ে বলো কলকাতা থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে—

মণিয়া টাকা কয়টি লইয়া চলিয়া গেল। ইহার পর দিনকতক ললিতবাবু আমাকে বড় উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। কোন্ পাবলিশার তাঁর বই লইতেছে—কি কথা হইতেছে তাঁহাদের সঙ্গে ইত্যাদি। বই পড়িয়া রহিয়াছে আমার বাসায়। কলিকাতার বইওয়ালারা এত বোকা নয় যে, ওই বইয়ের জন্য অগ্রিম টাকা দিতে যাইবে। মুখে বলিলাম—বই নেবে কি না তার ঠিক নেই—তবে যদি নেয় তার বায়নাস্বরূপ টাকাটা দিয়েছে।

ললিতবাবু বুঝিলেন না যে, আমার কথা সম্পূর্ণ অর্থহীন। বায়না করা ইহাকে বলে না, বা এ অবস্থায় কেহ বায়নার টাকাও দেয় না। অভাবের দিনে টাকা আসিয়াছে তাহাই যথেষ্ট, কোথা হইতে আসিল, কেন আসিল অত বুঝিয়া দেখিবার অবসর ও ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। সেই হইতে মাঝে মাঝে তাঁহাকে দু এক টাকা পাঠাইয়া দিতাম মণিয়ার হাতে, কারণ মণিয়াকে বাঁধা নিয়মে প্রতি সপ্তাহে আমার বাসায় পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন।

কষ্টই হইত তাঁহার কথা ভাবিয়া। প্রৌঢ় হইলেও ললিতবাবু দেখিতে সুপুরুষ, ভাল হোক মন্দ হোক তিনিও একজন লেখক ছিলেন, আজ অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িয়াছে, তিন কুলেও এদিকে কেহ নাই। এই দূর বিদেশে এই বয়সে কে তাঁহাকে দেখে, কে মুখের দিকে চায়? টাকা কোন্ প্রকাশক পাঠাইতেছে, একথা তিনি আমার মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেন। আমি কাল্পনিক পুস্তক-প্রকাশকের নাম করিতাম, তাহাদের কাল্পনিক চিঠির কথা বলিতাম, কোন রকমে সেকথা চাপা দিয়া অন্য কথা পাড়িতাম।

শীতের শেষে সেবার মুঙ্গের হইতে চলিয়া আসিলাম।

আসিবার পূর্বে ললিতবাবুর খাতাদুখানি তাঁহাকে ফেরত দিতে গেলাম। তিনি বলিলেন—কি হল মশায়?

—বড্ড গোলমাল হয়ে গেল সব। ওদের সে দোকানখানা উঠে গেল। ভাইতে ভাইতে গোলযোগ, কেস্ রুজু হয়েছে, এ অবস্থায় আর ওরা—তাই পরশু আমায় খাতা ফেরত পাঠিয়েছে।

পুনরায় ঘটনাচক্রে মুঙ্গেরে গেলাম তিন বৎসর পরে।

গিয়াই সর্বপ্রথম ললিতবাবুর কথা মনে হইল; কষ্টহারিণীর ঘাটে তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। দু-একজনকে জিজ্ঞাসাও করিলাম, ললিতবাবু মুঙ্গেরে আছেন না অন্যত্র চলিয়া গেছেন; কিন্তু বিশেষ কেহ কিছু বলিতে পারিল না।

একদিন শহরের বাহিরে টমটম ভাড়া করিয়া বেড়াইতে গিয়াছি, পথে শহর হইতে অন্ততঃ ছ-সাত মাইল দূরে একটা বড় বাগানবাড়ী দেখিয়া টমটমওয়ালাকে বলিলাম—এ কার বাগানবাড়ী রে? টমটমওয়ালা ভাল বাংলা বলে। আমার কথার উত্তরে সে বলিল—ই বেণীগীর ফুলবাড়ী আছে। শুনিয়াই বাগানটা দেখিবার শখ হইল।

—দেখতে দেয়?

—হাঁ বাবুজি, হুঁহা বাঙ্গালী বাবু আছে—দেখনে কাহে নেই দেবে?

আমার আগ্রহ আরও বাড়িল বাঙালী বাবুর নাম শুনিয়া। টমটম গেটের সামনে দাঁড় করাইয়া বাগানের ভিতর গেলাম। অদ্ভুত বাগান। দেখিয়াই বুঝিলাম—এককালে খুব বড় ও শৌখিন বাগানবাড়ী ছিল, বর্তমানে সে অবস্থা নাই, কিন্তু বনে জঙ্গলে সমাকীর্ণ এই পরিত্যক্ত বাগানবাড়ীর বন্য সৌন্দর্য আমাকে বড় মুগ্ধ করিল।

গেট হইতে কাঁকর বিছানো পথটি বাঁকিয়া চলিয়াছে—গাছপালার আড়ালে যে ভাঙ্গা পুরাতন বাড়ীর চুন-বালি-খসা শ্রীহীন, জীর্ণ রূপ দেখা যাইতেছে সেদিকে। বাগানের

লেখা বদলে গিয়েছে মশাই—লিখতে জানেই না। বঙ্কিম, হেমবাবু, নবীন সেন—কি সব মহা-মহারথী বলুন দিকি একবার? তা নয় রবিঠাকুর, রবিঠাকুর—হেঃ—

ললিতবাবু তাচ্ছিল্য ও বিরক্তির ভঙ্গিতে অন্যদিকে ঘাড় ফিরাইলেন।

আমি সমর্থনসূচক মাথা নাড়িলাম। ললিতবাবুর উপন্যাস দুখানির প্রশংসা করিয়া যে ভাল কাজ করি নাই, পরে তাহা বুঝিয়াছিলাম। দিন নাই রাত নাই ললিতবাবু তাগিদ দিয়া আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন যে, উপন্যাস দুখানির কি কিনারা করিলাম। এমন কি সন্ধ্যাবেলায় কণ্টহারিণীর ঘাটে বেড়ানো প্রায় ছাড়িয়া দিতে হইল।

পাঁচ ছয় দিন ললিতবাবুর সঙ্গে দেখা হয় নাই। একদিন আমার বাসার চাকর বলিল—আপনাকে এক আওরৎ খুঁজছে বাইরে—

আওরৎ কে খুঁজিবে? বাহির হইয়া দেখি একটি সুন্দরী যুবতী সলজ্জ সঙ্কোচের সহিত বাসার উঠানের পেঁপে-তলায় দাঁড়াইয়া আছে।

সবিস্ময়ে বলিলাম—কে?

মেয়েটি চোখ নীচু করিয়া দেহাতি হিন্দীতে বলিল—লোলিতবাবু আপনাকে একবার ডেকেচেন বাবুজী—

—ললিতবাবু? বেশ যাব ও-বেলা।

মেয়েটি চলিয়া গেল।

ভাবিলাম, মেয়েটি কে! ললিতবাবুর ঝি নাকি? কখনও সেখানে দেখিয়াছি বলিয়া তো মনে হইল না। বেশ দেখিতে মেয়েটি। এ দেশের হিন্দুস্থানী মেয়েরা সচরাচর যেমন আঁটসাঁট গড়নের হয়, তেমন তো বটেই, ফর্সা, ধপ্‌ধপে রং, মুখশ্রীও বেশ লালিত্যপূর্ণ।

সন্ধ্যাবেলায় ললিতবাবুর বাসায় গেলাম। ললিতবাবু উনুনে কড়া চাপাইয়া চায়ের জল গরম করিতেছিলেন। জল নামাইয়া দুধ ও ভেলিগুড় মিশাইয়া চা তৈরী করিয়া আমায় খাইতে দিলেন। আমি বলিলাম—একটি মেয়ে গিয়ে আমায় আপনার এখানে আসতে বল্লে। ক'দিন ব্যস্ত ছিলাম বলে আসতে পারি নি—

ললিতবাবু বলিলেন—ও মণিয়া গিয়েছিল বুঝি। তা এসেছেন ভালই করেছেন। আমি ভাবছিলাম, কেন আর আসেন না।

স্বল্পমাত্র ভূমিকার পর ললিতবাবু আবার বইয়ের কথা পাড়িলেন।

—জানেন ব্যাপারটা, হাতে একটু টাকার ইয়ে যাচ্ছে। ভাবলাম বই দুখানার একখানাও যদি লাগিয়ে দিতে পারেন তবে এ সময়ে কিছু পেলে বড় উপকার হত। তাই মণিয়াকে ওবেলা আপনার ঠিকানা দিয়ে—তা করেছেন কিছু?

বড় বিপদে পড়িলাম দেখিতেছি। ও বইয়ের আমি কি করিয়া কি করিব বুঝিলাম না। সেকথা ললিতবাবুকে বলিতে কিন্তু আমার মন সরিল না, কেন কি জানি।

বলিলাম—আজ্ঞে হ্যাঁ। দু-তিনজন পাবলিশারকে লিখেছি, এখনও উত্তর পাইনি—পেলেই জানাব আপনাকে।

ললিতবাবু বলিলেন—আপনাকে কণ্ট করে আসতে হবে না। মণিয়া যখন বাড়ী চিনে গেছে, ওই পরশু লাগাৎ আর একবার যাবে এখন—

—মণিয়া বুঝি আপনার এখানে কাজ করে?

ললিতবাবু যেন ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন—হ্যাঁ—ইয়ে—মণিয়া?...হ্যাঁ—

আমি সেদিন বিদায় লইয়া আসিলাম। তৃতীয় দিন মণিয়া আমার বাসায় আবার গিয়া হজির। এদিন আমার কৌতূহল হওয়াতে মণিয়াকে বলিলাম—ললিতবাবুর ওখানে কতদিন আছিস?

মণিয়া বেশী কথা বলে না, মুখ না তুলিয়া কি একটা বলিল ভাল বুঝিতে পারিলাম

সর্বত্র খুব বড় বড় বৃদ্ধ গাছ—প্রধানতঃ বট, অশ্বত্থ, নিম, মেহগিন কৃষ্ণচূড়া, ছাতিম ইত্যাদি। গাছগুলির তলায় ঘন ফার্ণ ও কাঁটাজঙ্গল, এখানে ওখানে জংলী গোলাপের ঝোপ, কালো পাথরের হাতীর মুখ, মকর-মুখের পয়ঃনালী, হাত-ভাঙ্গা লোহার বেঞ্চি, চটাওঠা ঠেস্‌-গাঁথা চাতাল, জঙ্গলের নীচে লতায় পাতায় কাঠবেড়ালীর লঘুপদে ত্রস্ত যাওয়া-আসা, বনটিয়ার ডাক, বড় বড় গাছের পাতার ফাঁক দিয়া সূর্যালোক আসিয়া পড়িয়াছে, একটা পাথরে গাঁথা শুকনো ফোয়ারার ধারে ঘন চামেলির ঝোপ, চামেলি ফুলের মিষ্ট সুবাস, প্রাচীন বটগাছে ডাহুক পাখীর ডাক, আর পায়ের নীচে আধ-শুকনো লম্বা লম্বা উলুঘাসের মধ্যে বহুরূপীর গতিবিধির খড়মড় শব্দ...সবটা মিলাইয়া একটা নিবিড় শান্তি ও নীরবতা।

কোন বড়লোকের বাগান ছিল এক সময়, বোধ হয় অবস্থা খারাপ হইবার জন্য আর বাগান দেখাশোনা করিবার শখ নাই। ফোয়ারার কাছে দাঁড়াইয়া এইসব দেখিতে দেখিতে ঐশ্বর্যের নশ্বরতা লইয়া বেশ একটা গভীর ধরণের প্রবন্ধ (যাহাতে মানুষের ও সমাজের সত্যকার উপকার হয়, হালকা গল্প বা উপন্যাস লিখিয়া লাভ কি?) রচনা করিব ভাবিতেছি, এমন সময় হঠাৎ চমকিয়া উঠিলাম।

আমার সামনের কাঁকরের পথ দিয়া আসিতেছেন কষ্টহারিণী ঘাটের সেই লেখক ললিত ঘোষাল।

আমি বলিলাম—ললিতবাবু যে! এখানে কি রকম? চিনতে পারেন?

ললিতবাবু চিনিতে পারিলেন। আমায় দেখিয়া খুব খুশী হইলেন। আমায় জোর করিয়া বাড়ীর দিকে লইয়া চলিলেন। আজ এখানে থাকিতে হইবে, কোন অসুবিধা নাই। কতকালের পর দেখা, অনেক কথা আছে, ইত্যাদি।

বাড়ীটা খুবই পুরানো, সামনে খুব বড় রোয়াক বা চাতাল, সেখানে আমরা পাথরের বেঞ্চিতে গিয়া বসিলাম। ললিতবাবুকে বলিলাম—তার পর? আপনাকে কত খুঁজেছি—মুঙ্গের শহরে আজ দিন পনেরো এসেছি। এখানে এই গড্‌ফরসেকন জায়গায় কি করে এসে পড়লেন? কিনেছেন নাকি? এখানে আর থাকে কে?

ললিতবাবু হাসিয়া বলিলেন—আরে, ব্যস্ত হবেন না। সবই দেখতে পাবেন। আপাততঃ একটু চা খান—দাঁড়ান বলে আসি—

ললিতবাবু কাহাকে চায়ের জন্য বলিয়া আসিলেন তখন বুঝি নাই, কিন্তু প্রায় আধ ঘণ্টা পরে যে ব্রীড়াবনতা সুন্দরী হিন্দুস্থানী মেয়েটি চা ও পাঁপর ভাজা আনিয়া আমাদের সামনে রাখিল, তাহাকে দেখিয়া চিনিলাম। ললিতবাবু বলিলেন—চিনেছেন একে?

—হ্যাঁ, ও তো সেই মণিয়া! ও তা হলে এখনও আপনার কাছেই কাজ করে? কথাটা শুনিয়া ললিতবাবু হাসিলেন, মণিয়ার মুখেও সলজ্জ হাসির রেখা ফুটিল। সে অন্য-দিকে মুখ ফিরাইল। ব্যাপার কি? আমার কথার মধ্যে হাসিবার কি আছে ভাবিয়া পাইলাম না।

ললিতবাবু বলিলেন—মণিয়া, যাও, আর একটু চা দাও আমাদের—

মণিয়া চলিয়া গেলে ললিতবাবু আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—কে কার কাজ করে মশাই? মণিয়াকে আপনি ভাল করে কোনদিন জানেন না। এই ফুলবাড়ী ওর নিজের। আমি ওর আশ্রয়ে আছি। এটা ওর বাপের বাড়ী।

মণিয়াকে ললিতবাবুর ঝি বলিয়াই জানিতাম, কখনও আমার মনে আসে নাই যে, সে ছদ্মবেশিনী রাজকুমারী, সুতরাং কথাটা শুনিয়া তো দস্তুরমত আশ্চর্য হইলাম। বলিলাম—মুঙ্গেরে যখন থাকতেন আপনি, তখন মণিয়া তো আপনার বাসায় কাজ করত—

ললিতবাবু হাসিয়া বলিলেন—কখনও আমার বাসায় কাজ করতে ওকে দেখেছিলেন?

আন্দাজ করেছিলেন আপনাকে ডেকে আনত বলে। আসল কথা জানতেন না।

—আসল কথাটা কি তাড়াতাড়ি বলুন, রহস্যটা কোথায়?

—মণিয়ার বাবার সঙ্গে ওর মায়ের বিয়ে হয় নি। ওর বাবা মস্ত ধনী জমিদার ছিলেন, ওর মা মজঃফরপুর জেলার এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থের মেয়ে—এই বাগানবাড়ীতে এনে ওর বাবা তাকে তাঁর কাছে রাখেন। মণিয়া ওদের একমাত্র সন্তান—এখন দুজনেই পরলোকগত, মণিয়া এই বাগানবাড়ীর মালিক। বুঝলেন কিছু? খুব সোজা কথা।

—খুব সোজা কথা নয়। মণিয়ার সঙ্গে আপনার কি ভাবে আলাপ, আপনিই বা এখানে থাকেন কেন, মণিয়ার অভিভাবকই বা কে ছিল—এসব কথা খুব সোজা আর কই?

ললিতবাবু বলিলেন—সে আরও সোজা কথা! আমি মণিয়ার বাবার প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলাম, তাঁর মৃত্যুর পরে আমিই এখন মণিয়ার অভিভাবক। আর একজন অছি আছেন, মুঙ্গেরের উকিল বাবু কমলেশ্বরী সহায়। মধ্যে আমাকে ওরা সবাই ষড়যন্ত্র করে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তাই মুঙ্গেরে গিয়ে বছরখানেক ছিলুম। মণিয়া প্রায়ই আমার সঙ্গে দেখা করতে যেত। আপনার কাছে ওকে পাঠাতুম বইয়ের দরুন টাকা আনতে। ও নিজেও অনেক সাহায্য করেছে—

বলিলাম—ওর বিয়ে হয়নি?

ললিতবাবু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—ওর এই ইতিহাস শুনে কে ওকে বিয়ে করবে বলুন। বিশেষত, এ দেশ তো জানেন?

ইতিমধ্যে সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল, বেলা আর বেশী নাই, চামেলি বনের ধারে পাথরের বেঞ্চিতে বসিয়া আমাদের গল্প জমিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় মণিয়া আবার চা আনিল।

ললিতবাবু বলিলেন—মণিয়া, এ বাবুকে চিনতে পেরেছ?

মণিয়া হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

—কোথায় দেখেছিলে বল তো?

—মুঙ্গেরে। ওঁর বাসায়।

পরে আমার দিকে চাহিয়া হাসিমুখে ওর অভ্যস্ত দেহাতি হিন্দীতে বলিল—ভাল আছেন বাবুজী?

—হ্যাঁ। তুমি ভাল আছ মণিয়া?

এই সময় ললিতবাবু বলিলেন—রাত্রে কিন্তু থাকতে হবে আপনাকে। আমি দুটো কথা বলবার লোক পাইনে, এসেছেন যদি থাকুন। মণিয়া, তুমিও থাকতে বল।

—আমিও তো বলছি, থাকুন বাবুজী। ভারী খুশী হব থাকলে।

অগত্যা রাজী হইতে হইল।

দেখিলাম মণিয়া সত্যই খুশী হইল। বলিল—রাত্রে আপনি কি খান বাবুজী? উনি পুরী খান—আপনিও তাই খাবেন তো?

ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, মণিয়া সত্যই সুন্দরী মেয়ে। হিন্দুস্থানী মেয়ের দেহের গড়ন ও বাঙালী মেয়ের মুখের লাবণ্য, এ দুটির অপূর্ব সমাবেশ হইয়াছে মণিয়াতে। দেহবর্ণ চম্পক-গৌর, কাশ্মিরী মেয়ের মত ঈষৎ গোলাপী। মাথায় ঘন কালো এক ঢাল চুল। বড় বড় চোখ। আমার আশ্বাস পাইয়া মণিয়া উৎসাহের সহিত বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল—সম্ভবতঃ রান্নাবান্না করিতে গেল।

ললিতবাবু বলিলেন—বড্ড সেবাযত্ন করে আমাকে—মানে খুব। তা মানবে না? আমাদের সঙ্গে ওদের কথা? কত কান্নাকাটি করে আমায় আনল।

রাত্রে চমৎকার চাঁদ উঠিল। জ্যোৎস্নার আলো বেণীগীর ফুলবাড়ীর প্রাচীন বট মেহগ্নি ও পাইন গাছের ডালে পড়িয়া সমস্ত উদ্যানটিকে যেন এক রহস্যময় পুরানো

দিনের জগতে পরিণত করিল। আমার মনে পড়িল দুটি প্রেমিক-প্রেমিকার কথা—মণিয়ার বাবা ও মা—তাঁরা সমাজ সংসারকে তুচ্ছ করিয়া এই নিভৃত নিরালা বাগানে পরস্পরের প্রণয়কে মাত্র সম্বল করিয়া জীবনের দিনগুলি কাটাইয়া গিয়াছেন।

মণিয়া আমাদের ডাকিয়া লইয়া গেল খাইবার জন্য। তখন রাত দশটার কম নয়। এই এত বড় বাড়ীর নিভৃত রান্নাঘরটিতে বসিয়া মেয়েটি এতগুলি রান্না রাঁধিয়াছে, এক চুপড়ি আটার পুরী ভাজিয়াছে—আগুনের তাতে সুন্দর মুখখানি রাঙা, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম—দীর্ঘ কালো কেশপাশ অবিন্যস্ত—দেখিয়া তাহার উপর কেমন মমতা হইল।

মণিয়া কাছে বসিয়া আমাদের যত্ন করিয়া খাওয়াইল, নিজের হাতে ললিতবাবুকে তামাক সাজিয়া দিয়া গেল, মশলা সুপারী দিয়া গেল—হিন্দুস্থানীর দেশে পান খাওয়ার তেমন রেওয়াজ নাই।

ললিতবাবুর উপর হিংসা হইল—লোকটা তোফা আছে। মণিয়ার মত মেয়ের সেবা যে দিনরাত পায়, তাহার উপর হিংসা হয় বৈকি। লোকটার বরাত ভাল।

এইভাবে ললিতবাবুর সঙ্গে যে আলাপ-পরিচয়ের সূত্র পুনরায় স্থাপিত হইল, আমার এক বৎসরব্যাপী মুঙ্গের প্রবাসের মধ্যে সেই সূত্র ধরিয়া অনেকদিন বেণীগীর ফুলবাড়ীতে গিয়াছি।

বার দুই যাইবার পরে আমার কৌতূহল বড় বাড়িল। হয়তো আমার সে কৌতূহল অযথা ধরনের, তবুও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কৌতূহল শুধু এই বিষয়ে যে, মণিয়া ও ললিতবাবুর মধ্যে সম্পর্কটি কি! ললিতবাবুর বয়স বাহান্ন হইতে পারে, সাতান্ন হইতে পারে, ষাট বলিলেও দোষ ধরিতে পারা যায় না। মণিয়ার বয়স খুব বেশী হইলেও চব্বিশের বেশী কখনও নয়।

পিতা-পুত্রীর সম্পর্ক! ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক। অভাবপক্ষে ভাই-বোনের সম্পর্ক! বয়স হিসাবে তাই হওয়া উচিত এবং হইলে দেখাইত খুব ভাল, মানিয়া লইতাম। কিন্তু জগতে যাহা ভাল দেখায়, যাহা হওয়া উচিত, তাহা সব সময় ঘটে না ইহাই দুঃখ।

একদিনের কথা বলি, কি করিয়া প্রথম আমার সন্দেহ হইল।

সেদিন ভয়ানক গরম, দারুণ রোদের তাত, বেলা তিনটার সময় আমি গিয়াছি ওখানে. গিয়া দেখি মণিয়া ছাড়া আর কেহ নাই বাড়ীতে।

সে আমায় দেখিয়া প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল—বাবুজী, উনি কোথায় বেরিয়ে গিয়েছেন দুপুরের পরে, এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরবার কথা—এখনও ফিরলেন না, কি হবে?

জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম, ললিতবাবু বালিশের জন্য শিমুল তুলা কিনিতে গিয়াছেন নিকটবর্তী কি একটা বস্তিতে। আমি যত মণিয়াকে বোঝাই, তাহার সে কি ব্যাকুলতা, কি উদ্বেগ, বার বার ঘরবাহির করার সে কি চঞ্চল ভঙ্গি। আমি সেদিন মণিয়াকে নতুন দৃষ্টি দিয়া দেখিলাম যেন। সেই একদিন দেখিয়াই আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলাম, মণিয়া ললিতবাবুকে ভালবাসে। পিতাপুত্রী নয়, ভাইবোন নয়। নায়িকার মত ভাল না বাসিলে ঠিক সে জিনিসটা হয় না—চোখে না দেখিলে কি করিয়া তাহা বুঝাইব!

তাহার পর ললিতবাবু একদিন আমাকে সামান্য একটু বলিলেন। কথায় কথায় মণিয়ার কথা উঠিলে আমায় বলিলেন—ও আমার মুখের দিকে চেয়ে ওর যৌবনের দিনগুলো কাটাল—কতবার ভাবি, আমার অবর্তমানে ওর কি যে হবে! সমাজে ওর স্থান কোনদিনই নেই। আমায় ছাড়া ও কাউকে জানেও না। ভেবে কষ্ট হয় এক এক সময়।

একটি কুড়ি-একুশ বছরের তরুণী যে একজন পঞ্চান্ন বছরের (কম পক্ষে) বৃদ্ধকে নিবিড়ভাবে ভালবাসিতে পারে, নিজের চক্ষে দেখার পূর্বে সে কথা কেহ যদি বলিত. তাহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম।

জীবনের কি রহস্যই বা আমরা জানি! মণিয়ার ভালবাসা দেখিয়া জীবনের একটি

অজ্ঞাত তথ্য জানিয়া বিস্মিত হইলাম।

আরও একটি ব্যাপার দেখিলাম।

ললিতবাবু সম্পূর্ণ বেকার, একটি কানাকড়ি দিয়াও তিনি মণিয়াকে সাহায্য করিতে অক্ষম, অথচ তাঁহার যাহা কিছু খরচ সব যোগাইতে হয় মণিয়াকেই এবং সে অম্লান বদনে তাহা এযাবৎ সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। ললিতবাবু তাঁহার স্বগ্রামস্থ এক বেকার ভ্রাতুষ্পুত্রকে মাসিক অর্থসাহায্য করেন (চার পাঁচ বার ললিতবাবু আমাকেই টাকাটা দিয়াছিলেন মণিঅর্ডার করিবার জন্য, কারণ তাঁহাদের এখানে নিকটে ডাকঘর নাই), তাহাও মণিয়ার পয়সায়। ললিতবাবু যখন একা মুঙ্গেরের বাসায় থাকিতেন, তখনকার অপেক্ষা এখন তাঁহার চাল অনেক বাড়িয়াছে। পরের পয়সায় আমাদেরও বাড়িত। কথা-বার্তার মধ্যে একদিন ললিতবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মণিয়ার বাবার প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন কতদিন? কি ভাবে আলাপ হয়?

—শুনবেন? কলকাতায় যখন বইটই আর কেউ নিতে চায় না, পাবলিশার খুঁজে পাইনে, তখন তো এলাম মুঙ্গেরে, আজ থেকে বছর বারো আগে। বাবু কমলেশ্বরী সহায় এখানকার বড় উকিল, তিনি বল্লেন, একজন বড়লোক মক্কেল বাঙালী সেক্রেটারী খুঁজছে, ইংরিজি চিঠিপত্র লেখার জন্য—তাই এখানে এসে মণিয়ার বাবার সঙ্গে দেখা করি। চাকুরিও হয়ে গেল—সাত বছর ছিলাম। মণিয়ার বাবা মারা যাওয়ার পরে আমি এখান থেকে গিয়ে মুঙ্গেরে বাসা করে থাকতাম, সে অবস্থায় আপনি আমায় দেখেছিলেন সেবার। মণিয়া জোর করে আবার নিয়ে এল এখানে। কি করি বলুন?

সত্যই তো। বেচারী ললিতবাবু! কি করিবার ছিল তাঁর? মণিয়াকেও দেখিয়াছি, ললিতবাবুকে সে ছায়ার মত অনুসরণ করে। তাঁহার এতটুকু কষ্ট বা অসুবিধা—বাস্তব বা কাল্পনিক, দূর করিতে কি ব্যাকুলতা! নিজের চোখে যাহা দেখিতে পাই তাহাকে অবিশ্বাস করিতে পারি কই? মাস কয়েক যাতায়াতের ফলে ক্রমে আমার মনে হইল যে, মণিয়া যতটা করে, ললিতবাবুর দিক হইতে তাহার অর্ধেকও নাই, বরং আরও কম। ললিতবাবু এখানে আছেন যে, তাহার কারণ মণিয়ার উপর তাঁহার দরদ নয়, তিনি বর্তমানে বেকার, মণিয়া তাঁহার সব খরচ চালাইয়া থাকে—এইজন্য।

ললিতবাবু মণিয়াকে তাঁহার ঝি বা পাচিকার মত ভাবেন যেন, হুকুমের উপর তাকে সর্বদা রাখিয়াছেন। অনেক সময় ভাবটা এই রকম দেখান যে, তিনি অতি বড় লোক বাঙালী, এখানে যে অবস্থান করিতেছেন সে নিতান্তই মণিয়ার উপর কৃপা করিয়া।

বেণীগীর ফুলবাড়ীর প্রাচীন বনস্পতিদের ছায়ায় চামেলি ঝোপের ধারের হাতল-ভাঙ্গা লোহার বেঞ্চিতে বা পুকুরের ভাঙা ঘাটে বসিয়া কতদিন তরুণী মণিয়ার জীবনের এ অদ্ভুত ট্রাজেডির কথা চিন্তা করিয়াছি।

জগতে কেন এমন ঘটে, অমন সুন্দরী মেয়ে—কত তরুণ প্রেমিক যাহার এক কণা অনুগ্রহ পাইবার জন্য অসাধ্য সাধন করিতে রাজী হইতে পারিত—তাহার অদৃষ্টে একি দুর্ভোগ।

একদিন এ অবস্থায় একা বসিয়া আছি, মণিয়াকে দূরে দেখিতে পাইয়া ডাকিলাম। এ সময়টা সে খানিকক্ষণ আপন মনে বাগানে বেড়ায় জানি।

মণিয়া কাছে আসিয়া বলিল—এখানে বসে কেন বাবুজী?

—বেশ বসে আছি। ললিতবাবু উঠেছেন?

—এখনও ওঠেন নি। উনি ঠিক চার বাজলে ওঠেন—তারপর চা করব।

ললিতবাবুর বৈকালিক নিদ্রা ঘড়ির কাঁটার মত বাঁধা পথ ধরিয়া চলে, নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রম বড় একটা ঘটিতে দেখিলাম না।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে।...

মণিয়ার পরনে একখানা হালকা চাঁপা রঙের শাড়ী, গায়ে হিন্দুস্থানী মেয়েদের মত কোর্তা. সুগঠিত গৌরবর্ণ বাহু দুটিতে বাজু, কানে বড় বড় কানবালা, কপালে কালো টিপ। রূপকথার রাজকুমারীর মত সম্পূর্ণ সেকেলে ধরনের বেশভূষা ওর, হালফ্যাশানের বড় একটা ধার ধারে না, দেহাতি মেয়ে, সম্ভবতঃ জানেও না।

বলিলাম, বসো মণিয়া—

—না বাবুজী, দাঁড়িয়ে আছি বেশ, সারাদিন তো বসে থাকি—

—তুমি আপন মনে বেড়াও এ সময়টা, না?

—হ্যাঁ বাবুজী, উনি ঘুমোন, আমার কাজকর্ম থাকে না—একটু বেড়িয়ে বেড়াই—

—ঘুমোও না বুঝি?

—না, দুপুরে আমার ঘুম ভাল লাগে না। অভ্যেস নেই বাবুজী।

—আচ্ছা, এ বাগানে কতদিন আছ?

—ছেলেবেলা থেকেই। এই তো আমাদের বাড়ীঘর। বাবা মা ছিলেন যখন, তখন খুব ভাল ছিল—বাবার বাগানের শখ ছিল খুব। নিজের হাতে গাছ পুঁতেছিলেন কত। একটা বটগাছ আছে বাবার হাতে পোঁতা, তার পাতাগুলো জুড়ে ঠোঙার মত হয়ে যায়—নাকি কৃষ্ণজী দুধ খেতেন বলে বৃন্দাবনে যমুনার ধারে অমনি হত, বংশীবট বলে এদেশে। আসুন দেখবেন—

আমাকে সে পুকুরের ওপারে বাগানের দক্ষিণ কোণে লইয়া গেল। বনের মধ্যে একটা ছোট বটগাছ, তাহার কচি পাতা পরস্পর জোড়া লাগিয়া ঠিক যেন ঠোঙার মত। মণিয়া আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, দেখলেন? কি তাজ্জব বাবুজী, না?

বিস্মিত হইবার মত মুখ করিয়া বলিলাম, তাজ্জবই বটে, সত্যি—

মণিয়া হাত নাড়িয়া উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিল—দেখুন, কতকাল আগে কৃষ্ণজী দুধ খেতেন বলে এখনও পাতাগুলো ওর জোড়া লেগে যায়। এতেও লোকের অবিশ্বাস ঘোচে না—বলুন বাবুজী!

বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম—ঠিক বলেছ মণিয়া—খুব ঠিক—

উহার সরল বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করিবার আমি কে?

জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমার বাবা কতদিন মারা গিয়েছেন?

—ছ বছর বাবুজী।

—উনি মারা যাওয়ার পর কোথায় ছিলে?

—কোথাও না বাবুজী, এখানেই। আমার দাই-মা আর চাচেরা ভাই সঙ্গে থাকত।

—তা ওরা এখন কোথায়?

—উনি আসাতে চলে গিয়েছে। কি করি বাবু, মুঙ্গেরে বড় কষ্ট পেতেন উনি, বাবা এমন কিছু রেখে যান নি যে সেখানকার সব খরচ দিই। তবে এখানে থাকলে চলে যায় এক রকমে। ওঁর কষ্ট চোখে দেখে থাকতে পারলাম না, তাই নিয়ে এলাম।

—তোমার ভাই তাতে চটল বুঝি?

—উঃ, ভারি রাগ তাতে, বলে বাংগালি বাবুকে কেন নিয়ে এলি তুই? আমিও বলেছি—ওর আসা পছন্দ না কর চলে যাও; আমার বাড়ী, আমি যা ভাল বুঝব করব। তাই চলে গেল। এখন উনি ছাড়া আর আমার কে আছে বাবুজী!

মণিয়ার চোখ দুটি ছলছল করিয়া উঠিল। মেয়েটি সত্যবাদিনী, তাহার স্পষ্ট সত্য কথা বলিবার সাহস দেখিয়া প্রীত হইলাম। অন্য কথা পাড়িবার জন্য বলিলাম—গান গাইতে পার মণিয়া?

মণিয়া সলজ্জকণ্ঠে বলিল—বেশী কিছু না বাবুজী, বহুৎ একটু—

—গাইবে? গাও না!

মণিয়া কি বুঝিল জানি না, বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া প্রতিবাদের সুরে বলিল—বাবুজী—

আমি মণিয়ার সহিত প্রেম করিতে চাহি নাই। মণিয়া আমাকে ভুল বুঝিয়া বসিল। সেভাবে কথাটা বলি নাই আমি। বলিলাম—এখন না হয়, সন্ধ্যের সময় করো। ললিত-বাবু যদি বলেন—তাহলে গাইবে?

অতিথির প্রতি উহার কর্তব্যবোধ ও ভদ্রতা বড়ঘরের ঘরানার উপযুক্ত বটে। কি সুন্দরী দেখাইতেছে মণিয়াকে! উহাকে দেখিলেই আমার মনে হয় ও সেকালের মেয়ে, সেকালের বেশভূষায়, প্রাচীন উদ্যানের বনস্পতিদের পটভূমিতেই ওকে মানায়, অন্যত্র ও নিতান্ত খাপছাড়া।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে, প্রাচীন বটের ডালে ডাহুক ডাকিতেছে, ললিতবাবুর ঘুম ভাঙ্গিবার সময় হইল। বলিলাম—চলো মণিয়া, চারটে বাজে—

সন্ধ্যার পর ললিতবাবুকে বলিয়া মণিয়াকে গান গাওয়াইলাম। ওর এমনি খুব সুরেলা গলা, তবে বিহারী দেশওয়ালী গ্রাম্যসুরের গানই বেশী জানে। বেণীগীর ফুল-বাড়ীতে বড় বড় গাছপালা, মেহগিনি, কৃষ্ণচূড়া, চামেলির বন আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে মুছিয়া গেল গান শুনিতে শুনিতে—আমি যেন অতীত যুগের ভারতে ফিরিয়া গিয়াছি। বাণভট্ট কি শূদ্রক বা ওই ধরনের কোন কবির নায়িকা জীবন্ত হইয়া যেন আমার সামনে বসিয়া সুন্দর হাতটি নাড়িয়া বীণা বাজাইয়া অর্ধমাগধী ভাষায় সংগীত গাহিতেছে...

সেদিন জ্যোৎস্নারাত্রের আলোছায়ার মধ্যে মণিয়াকে দেখিয়া আমার মনে হইল, কবি বাণভট্ট সে যুগের ঠিক এমনি একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখিয়া তাঁহার কাব্যের মহাশ্বেতার কল্পনা করিয়া থাকিবেন—সমগ্র বৃদ্ধ পৃথিবীকে নবযৌবনের সাজে সাজাইবার মায়ামন্ত্র যে ইহাদের সুন্দর মুখের স্মিতহাস্য, ইহাদেরই পদ্মপলাশলোচনের অশ্রুজল। হয়তো তখন আমার বয়স কম ছিল বলিয়াই মণিয়াকে আমার অত ভাল লাগিয়াছিল। এখনও বিহার বা পশ্চিমের কথা মনে হইলেই আমার মনের চোখে ভাসিয়া ওঠে বেণীগীর ফুলবাড়ী, তার প্রাচীন গাছপালা, চামেলি বন ও রূপসী মণিয়া।

মাস খানেক পরে।

একদিন ললিতবাবু মুঙ্গেরে আমার বাসায় আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া খুশী হইয়া বলিলাম—আসুন, আসুন ললিতবাবু, কখন এলেন?

ললিতবাবু কপালের ঘাম মুছিয়া বলিলেন—এই এলাম মশাই। দেশে যাচ্ছি।

—একটু বিস্মিত হইয়া বলিলাম—দেশে?

—হ্যাঁ, দেশে। ওখান থেকে চলে এলাম—

—চলে এলেন? তার মানে? মণিয়া কেমন আছে?

ললিতবাবু ঝাঁজের সহিত বলিলেন—ভালই আছে। আমার পোষালো না, চলে যাচ্ছি।

—ব্যাপার কি? হল কি?

—হবে আর কি? আমি কারো হাত-তোলা খেয়ে থাকতে পারব না। হয়েছে কি, আমার বাড়ীতে একটা সাড়ে এগারো টাকার রেভিনিউ মণিঅর্ডার পাঠাতে হবে, আজ কদিন ধরে চাচ্ছি টাকাটা। কবার চাইব? আমার মান বলে একটা জিনিস আছে তো? আজ দেব, কাল দেব, আজ ওবেলা নিয়ে এসেছে পাঁচটি টাকা। ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। আরে, আমার বইয়ের এককালে তিন-তিনটে এডিশন হয়েছে, আমায় টাকা চেনাতে হবে না। ওর মা মাগী ছিল ভ্রষ্টা, ওদের কি ভদ্রস্থতা আছে মশাই? ভদ্রলোকের খাতির কি বোঝে ছাতুখোর মেড়ুয়াবাদীর দল?

ললিতবাবুর মুখের এ কথার কিছুদূর পর্যন্ত আমি প্রণয়ীর অভিমান বলিয়া

ধরিয়া লইতে পারিতাম হয়তো, কিন্তু তাঁহার উক্তির সবটা এভাবে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। তাঁহার চরিত্র ও মেজাজের উপর আমার অশ্রদ্ধা হইয়া গেল। টাকার জন্য আমাকে পূর্বে তিনি কি রকম উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, (কারণ তাঁহার পুস্তক প্রকাশের আসল উদ্দেশ্য সাহিত্য-প্রীতি নয়—টাকা, তাহা অনেক দিন বুঝিয়াছি) সে কথা মনে পড়িল।

আমি বলিলাম—হয়তো মণিয়ার কাছে নেই, এ হতে পারে।

—নেই তো কি মশাই, সাতটা টাকা আর নেই? এর আগেও বাড়ীতে টাকা পাঠাবার বেলা এরকম করেছে। তাছাড়া ঠিক সে কথাও নয়, আমার আর ভাল লাগছে না এ ছাতু-খোরের দেশ। দেশে গিয়ে মানকচু আর নলেনগুড়ের পায়েস খেয়ে বাঁচি দিনকতক। রাঁধতে পারে কেউ এদেশে? যা রাঁধবে এক তরকারী, বেগুন বেগুনই এক তরকারী, পটল পটলই এক তরকারী—এ দেশে মানুষ আছে? রামোঃ—

বলিলাম—দেশে কে আছে আপনার?

—ভাইপো আছে, ভাইপোর স্ত্রী আছে, তাদের ছেলেমেয়েরা আছে, নেই কে? তাদের ফেলে বিদেশে থাকা কি পোষায় এই বয়সে, বলুন তো? দেশে থাকলে অভাব কি আমার? এ ছাতুর দেশে আর না, ঢের হয়েছে, হাঁপিয়ে উঠেছে প্রাণ—ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই।

মনে ভাবিলাম জিজ্ঞাসা করি, দেশে থাকিলে যদি চলিবার ভাবনা নাই, তবে ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে প্রতি মাসে টাকা পাঠানোর কি দরকার হইত ছাতুর দেশ হইতে? এবং তাও একটি ছাতুর দেশের সরলা মেয়ের নিকট হইতে ভুলাইয়া লওয়া টাকা?

নাঃ, লোকটা অকৃতজ্ঞের একশেষ। চলিয়া গেল দুপুরের ট্রেনে। আমি তুলিয়া দিতে পর্যন্ত গেলাম না। ঘৃণা হইল লোকটার প্রতি।

ললিতবাবু চলিয়া যাইবার দুদিন পরে আমার বাসায় জানলার কাছে বসিয়া আছি, এমন সময় দেখি মণিয়া বাসার সামনে টমটম হইতে নামিতেছে। আমি গিয়া তাহাকে ঘরের মধ্যে আনিয়া বসাইলাম। মণিয়া উদ্বিগ্ন স্বরে বলিল—বাবুজী, উনি কোথায় জানেন? আপনার এখানে এসেছিলেন? ওখান থেকে বেরিয়েছেন আজ দুদিন হল, সঙ্গে টাকাকড়ি আছে, উনি তো আপন-ভোলা মানুষ—আমার বড্ড ভয় হয়েছে—মুঙ্গের বড় খারাপ জায়গা বাবুজী—

—বিস্মিত হইয়া বলিলাম—টাকাকড়ি কিসের?

—আমার হার ছড়াটা ভেঙে গড়াতে দেবেন বলে সঙ্গে আনলেন আর পঞ্চাশটা টাকা—ওঁর নিজের কি দরকার আছে বল্লেন; আর বাগানের বড় চাতালটা—যেখানে বসে আপনারা চা খান, ওটা মেরামত করবার জন্য চূন আর সিমেণ্ট কেনবার দরকার—তাই। কালই ফিরবার কথা ছিল, কিন্তু আজ সকালেও যখন এলেন না তখন আর স্থির থাকতে পারলাম না—আপনার এখানে আসেন নি বাবুজী?

ব্যাপার শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম।

কেন জানি না, মণিয়াকে ব্যাপারটা খুলিয়া বলিতে পারি নাই। অর্থ নষ্টের দুঃখ হইতেও বড় দুঃখ আছে—এই সরলা দেহাতি তরুণীর মনে সে দুঃখ বড় বিষম বাজিত। হয়তো মণিয়ার প্রতি কোন ধরনের দুর্বলতা ছিল আমার, তাই সে দুঃখের হাত হইতে তাহাকে বাঁচাইলাম।

—বলিলাম, ললিতবাবু ভাইপোর অসুখের খবর পেয়ে হঠাৎ দেশে চলে গিয়েছেন, আমার ঠিকানায় তার এসেছিল। টাকাটা সঙ্গে নিয়ে গেছেন, খরচপত্রের দরকার আছে বল্লেন। হারগাছাটা তাড়াতাড়িতে দিতে পারেন নি, দেশের সেকরাকে দেবেন ভেঙে গড়াতে।

ইহার পর আমি বেশীদিন মুঙ্গেরে ছিলাম না; যে কদিন ছিলাম মণিয়া ছয় সাত

দিন অন্তর আসিয়া ললিতবাবুর কোন চিঠি আসিল কি না খবর লইত। বলা বাহুল্য, ললিলতবাবু কোন চিঠি দেন নাই।

সেই মাঘ মাসে আমি মুঙ্গের হইতে চলিয়া আসিলাম এবং তাহার পর প্রায় পাঁচ বছর ওদিকে যাই নাই। বিগত ১৯৩৪ সালের বিহার ভূমিকম্পের পর পিসিমাদের দেখিতে আমি আবার মুঙ্গেরে যাই।

মুঙ্গেরে পদার্পণ করিয়াই শহরের চেহারা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। সে মুঙ্গের নাই—চারিদিকে ধ্বংসদেবের প্রলয় তান্ডবের পদচিহ্ন। অবশ্য ভূমিকম্পের পর তখন তিন চার মাস উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

সপ্তাহখানেক পরে একদিন কি মনে করিয়া একখানি টমটম ভাড়া করিয়া বেণীগীর ফুলবাড়ীর দিকে রওনা হইলাম।

বেণীগীর ফুলবাড়ীতে মণিয়াদের সে জরাজীর্ণ বাড়ীটা ভূমিকম্পে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, মণিয়াও বাঁচিয়া নাই, বাড়ী চাপা পড়িয়া হতভাগিনীর মৃত্যু হইয়াছে, বেণীগীর ফুলবাড়ীর প্রাচীন বট, মেহগ্নি, কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় মহাশ্বেতার বীণার ক্লান্ত সুর কাঁদিয়া কাঁদিয়া চিরদিনের মত নীরব হইয়া গিয়াছে—ইহাই সেখানে নিশ্চয় দেখিব ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছিলাম।

কিন্তু তাহার বদলে যাহা দেখিলাম তাহার জন্য সত্যই প্রস্তুত ছিলাম না।

ফুলবাড়ীর সামনে টমটম হইতে নামিলাম। ফটক দিয়া ঢুকিতেই গাছপালার ফাঁক দিয়া চোখে পড়িল, বাড়ীটা যেন মাটির উপরেই দাঁড়াইয়া আছে। বাগানের ও বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া জনশূন্য বলিয়াও বোধ হইল না। আরও কিছু অগ্রসর হইয়া শুকনো ফোয়ারাটার ধারে চামেলি বনের কাছে যাইতেই কাছে একটি মেয়েকে গাছের ডালে বাঁধা তারের আলনায় কাপড় মেলিয়া দিতে দেখিয়া দাঁড়াইলাম। সেই সময় পায়ের শব্দে মেয়েটিও চমকিয়া আমার দিকে পিছন ফিরিয়া চাহিল। দেখিলাম সে মণিয়া।

মণিয়ার চেহারার কিছু পরিবর্তন হইয়াছে, একটু মোটা হইয়া গিয়াছে, মুখশ্রী বদলাইয়াছে, তবুও সে এখনও সুন্দরী।

মণিয়ার ডাগর চোখদুটিতে বিস্ময়ের দৃষ্টি তখনও কাটে নাই। আমার দিকে অল্পক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর উজ্জ্বল মুখে বলিল—বাবুজী? আসুন, আসুন, এতদিন কোথায় ছিলেন? সেই চলে গেলেন—আর খোঁজ নেই, কত ভেবেছি আপনার জন্যে।

—এখানে ছিলামই না—দিন কয়েক হলো আবার এসেছি। যে কান্ড হয়েছে দেখলুম তোমাদের দেশে! তারপর তুমি ভাল আছ?

মণিয়া সুন্দর ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আপনার আশীর্বাদে বাবুজী প্রাণে বেঁচে গিয়েছি সব! এ বাড়িটার বিশেষ কিছু হয় নি—আসুন না, চলুন বাড়ীতে—

বলিলাম—বাড়ীতে তুমি, এখন—মানে আর কে আছে?

মণিয়া বলিল—আমার দাই-মা, আর চাচেরা ভাই আছে—পরে সলজ্জ হাসিয়া বলিল—আর উনি আছেন।

পরম বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম—কে? ললিতবাবু?

মণিয়া পুনরায় সলজ্জ হাসিয়া চোখ নীচু করিয়া বলিল—আবার কে বাবুজী? সেই তো চলে গেলেন, দুবছর ছিলেন দেশে। আমার দাই-মা আর চাচেরা ভাই আবার এল। তিন বছরের মাথায় উনি ফিরলেন। মাগো, এমনি রোগ হয়ে গিয়েছেন! বাঙ্গালা মুলুকের জল-হাওয়া একদম নরম, ওঁর এতকাল পশ্চিমে বাস, সহ্য হবে কেন? হাতে পয়সা যা নিয়ে গিয়েছিলেন, কবে উড়িয়ে বসে আছেন, আমার হার ছড়াটা পর্যন্ত—সে যাক্‌গে বাবুজী —ওঁর এই দাড়ি, চুল, ময়লা দশা দেখে তো কেঁদে বাঁচিনে। সেই থেকে আছেন। এখন বেশ শরীর সেরেছে। আর দেশে যাওয়ার নামটি মুখে আনতে দিইনে—

অবস্থা শুনিয়া মনে হইল, ললিতবাবুও বর্তমানে সেকথা মুখে আনিবেন এমন কাঁচা লোক তিনি কখনই নহেন। বলিলাম—কোথায় উনি?

মণিয়া হাসিমুখে বলিল—চলুন, আসুন বাড়ীতে বাবুজী, ভারি ভাগ্যি আপনি এলেন। উনি খুব খুশী হবেন আপনাকে দেখে—এখনও ঘুম থেকে ওঠেন নি—চার বাজলেই উঠবেন,—তারপর চা করব—আসুন।

প্রাচীন বটের ডালে পুরনো দিনের মত ডাহুক ডাকিতেছিল। বেণীগীর ফুলবাড়ী ঘুমন্ত স্বপ্নপুরী যেন, মণিয়া রাজকুমারী, ঘুম ভাঙিয়া সদ্য উঠিয়াছে। সময় এখানে অচল।

ললিতবাবু লোকটার উপর পুনরায় ভয়ানক হিংসা হইল।

কুয়াশার রঙ্

ভয়ানক বর্ষা। ক'দিন সমানভাবে চলিয়াছে, বিরাম বিশ্রাম নাই। প্রতুল মেসের বাসার নিজের সিটটিতে বসিয়া বসিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কোথায় বা বাহির হইবে? যাইবার উপায় নাই কোনদিকে, ছাদ চুঁইয়া ঘরে জল পড়িতেছে—সকাল হইতে বিছানাটা একবার এদিকে, একবার ওদিকে সরাইয়াই বা কতক্ষণ পারা যায়? সন্ধ্যার সময় আরও জোর বর্ষা নামিল। চারিদিক ধোঁয়াকার হইয়া উঠিল, বৃষ্টির জলের কুয়াশার ফাঁকে ফাঁকে গ্যাসের আলোগুলা রাস্তার ধারে ঝাপ্সা দেখাইতেছে।

প্রতুল একটা বিড়ি ধরাইল। সকাল হইতে এক বাণ্ডিল বিড়ি উঠিয়া গিয়াছে—বসিয়া বসিয়া বিড়ি খাওয়া ছাড়া সময় কাটাইবার উপায় কই? সিগারেট কিনিবার পয়সা নাই। এই সময়টা সিগারেট খাইয়া কাটাইতে হইলে দুই বাক্স ক্যাভেণ্ডার নেভিকাট সিগারেট লাগিত।

প্রতুলের হঠাৎ মনে পড়িল, এবেলা এখনও চা খাওয়া হয় নাই। মেসের চাকরকে ডাকিবার উদ্যোগ করিতেছে—এমন সময় দুয়ারে কে ঘা দিল। হয়তো হরিশ চাকরের মনে পড়িয়াছে তাহার ঘরে চা দেওয়া হয় নাই। দুয়ার খুলিয়া প্রতুল অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

—এই যে প্রতুলদা, ভাল আছেন? নমস্কার। এলাম আপনার এখানেই—

একটি ত্রিশ বত্রিশ বছরের লোক, গায়ে ময়লা পাঞ্জাবি, পায়ে রবারের জুতা, হাতে একটা ছোট টিনের সুটকেস, সঙ্গে একটি বছর নয় দশের ছোট ছেলে লইয়া ঘরে ঢুকিল। ছাতি হইতে জল গড়াইয়া পড়িতেছে—ভিজা জুতায় ঘরের দুয়ারের সামনের মেঝেটাতে জলের দাগ পড়িল, খোলা দরজা দিয়া ইতিমধ্যে বৃষ্টির ঝাপ্টা ঘরে ঢুকিল।

—আয় রে খোকা, যা গিয়ে বোস গে যা—তোর জ্যাঠামশায়, প্রণাম কর। দাঁড়া, পা-টা মুছে দিই গামছা দিয়ে—যা—

প্রতুল তখনও ঠিক করিতে পারে নাই লোকটা কে, এমন দুর্যোগের দিনে তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে আসিয়াছে। দেশের লোক, গ্রামের লোক তো নয়—কোথায় ইহাকে সে দেখিয়াছে? হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল, এ সেই শশধর, নাথপুরের শশধর গাঙ্গুলী। এত বড় হইয়া উঠিয়াছে সেই আঠারো উনিশ বছরের ছোকরা! আর বাল্যের সেই চমৎকার চেহারা এত খারাপ হইয়া উঠিল কিভাবে?

—চিনতে পেরেছেন প্রতুলদা?

—হ্যাঁ, এসো বসো, ও কতকাল পরে দেখা, তা তুমি জানলে কি করে এখানে আমি আছি? ভাল আছ বেশ? এটি কে—ছেলে? বেশ, বেশ।

শশধর রাঙ্গা দাঁত বাহির করিয়া এক গাল হাসিয়া বলিল, তা হবে না? সে আজ

কত বছরের কথা বলুন তো? আজ বারো তেরো কি চৌদ্দ বছরের কথা হয়ে গেল যে! আপনার ঠিকানা নিলুম জীবন ভটচাযিার কাছ থেকে। জীবন ভটচাযকে মনে পড়ছে না? সেই যে জীবনদা, আমাদের লাইব্রেরীর সেক্রেটারী ছিল।

—কিন্তু জীবনবাবুই বা আমার ঠিকানা জানলেন কি করে—তাঁর সঙ্গেও তো বারো তেরো বছর দেখা নেই—যতদিন নাথপুর ছেড়েছি ততদিন তাঁর সঙ্গেও—।

—জীবনদার শালার এক বন্ধু আপনারও বন্ধু—রাধিকাবাবু, চিনতে পেরেছেন এবার? সেখানে জীবনদা শুনেছে—আপনি তো আমাদের খবর রাখেন না—আমরা আপনার রাখি। এই, স্থির হয়ে বোস্ খোকা—এক কাপ চা খাওয়ান না দাদা, বড্ড ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে।

সঙ্গের ছোট ছেলেটি অমনি বলিতে শুরু করিল, খিদে পেয়েচে, বাবা—আমার খিদে পেয়েছে।

তাহার বাবা ধমক দিয়া বলিল—থাম, ছোঁড়ার অমনি খিদে পেয়ে গেল, থাম না, খেইচিস্ তো দুপুরবেলা—

প্রতুল বলিল—আহা, ওকে ধমকাচ্চ কেন, ছেলেমানুষের খিদে তো পেতেই পারে! দাঁড়াও খোকা, আমি খাবার আনাচ্চি।

চা ও জলযোগের পর্ব মিটিয়া গেলে প্রতুল বলিল—তারপর শশধর, এখন হচ্ছে কি?

শশধর বলিল—করবো আর কি! রামজীবনপুরের ইউ পি স্কুলের হেড্ পন্ডিত। আজ দু দিন ছুটি নিয়ে কলকাতায় এলাম, একটু কাজ আছে। ভাল কথা প্রতুলদা, এখানে একটু থাকবার জায়গা হবে?

প্রতুল বলিল—হাঁ হাঁ, তার আর কি! থাকো না। জায়গা তো যথেষ্টই রয়েচে। আমি বলে দিচ্ছি তোমাদের খাওয়ার কথা রাত্রে।

আজ প্রায় বারো তেরো বছর আগে প্রতুল নাথপুর গ্রামের মিউনিসিপ্যাল অফিসে কেরানীর চাকুরি লইয়া যায়। নাথপুর নিতান্ত ক্ষুদ্র গ্রাম নয়, আশপাশের চার-পাঁচখানি ছোটবড় গ্রাম লইয়া মিউনিসিপ্যালিটি—ইলেক্শন লইয়া দলাদলি মারামারি পর্যন্ত হইত, লাইব্রেরী ছিল, ডাক্তারখানা ছিল, হাই স্কুল ছিল, একটা পুলিশের ফাঁড়ি পর্যন্ত ছিল।

একদিন নিজের ক্ষুদ্র বাসাটিতে বসিয়া আছি একা, একটি আঠার উনিশ বছরের ছোকরা আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—আপনি বুঝি নতুন এসেছেন আমাদের গাঁয়ে?

—হ্যাঁ। এসো বসো। তোমার নাম কি?

—আমার নাম শশধর। আপনার সাথে আলাপ করতে এলুম—একলাটি বসে থাকেন।

—এসো এসো, ভালই। তুমি স্কুলে পড় বুঝি?

শশধর পরিচয় দিল।

না, সে স্কুলে পড়ে না। অবস্থা ভাল না, স্কুলে কে পড়াইবে? তাহা ছাড়া সংসারে বাবা নাই, তাহারই ঘাড়ে সংসার। মা, দুই বোন, তিনটি ছোট ছোট ভাই, স্ত্রী।

প্রতুল বিস্মিত হইয়া বলিল, তুমি বিয়ে করেচ নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ওবছর বিয়ে হয়ে গিয়েচে।

ছেলেটি দেখিতে খুব সুশ্রী, সুপুরুষ। অল্প বয়সে বিবাহ হওয়াটা আশ্চর্য নয় বটে।

কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পরে ছেলেটি সেদিন চলিয়া গেল। তাহার পর হইতে মাঝে মাঝে সে প্রায়ই আসিত। এ গ্রামে প্রতুল নতুন আসিয়াছে, বিশেষ কাহারও সহিত পরিচয় নাই, এ অবস্থায় একজন তরুণ বন্ধু লাভ করিয়া প্রতুলও খুশি হইল। সময় কাটাইবার একটা উপায় হইল। সন্ধ্যাবেলাটা দুজনে গল্পগুজবে কাটিয়া যাইত।

একদিন শশধর প্রতুলকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করিল। শশধরের মা তাকে ছেলের মত যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন, শশধরের বোন কণা তাকে প্রথম দিনেই 'প্রতুলদা' বলিয়া ডাকিল —এই নির্বান্ধব পল্লীগ্রামে ইহাদের স্নেহ-সেবা প্রতুলের বড় ভাল লাগিল সেদিন।

ইহার পর অফিস হইতে প্রতুল নিজের বাসায় ফিরিতে না ফিরিতে শশধর প্রতুলকে ডাকিয়া নিজের বাড়ীতে প্রায়ই লইয়া যায়—প্রায়ই বৈকালিক চা-পানের ও জলযোগের ব্যবস্থা সেখানেই হইয়া থাকে।

দিনকতক যাইবার পরে প্রতুল ইহাতে সংকোচ বোধ করিতে লাগিল। শশধরদের সাংসারিক ব্যবস্থা বিশেষ সচ্ছল নয়, রোজ রোজ তাহার জলযোগের জন্য উহাদের খরচ করাইতে প্রতুলের মন সায় দিল না। সে খাওয়া বন্ধ করিল। অবশ্য মুখে সোজাসুজি কোন কিছু বলিতে পারা সম্ভব ছিল না—তবে যাইবার ইচ্ছা না থাকিলে ওজর আপত্তির অভাব হয় না।

একদিন শশধর আসিয়া বলিল—আজ যেতেই হবে প্রতুলদা—কণা বলেছে তোমাকে নিয়ে না গেলে সে ভয়ানক রাগ করবে আমার ওপর। প্রতুল আশ্চর্য হইয়া বলিল—কণা?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, কণা—আমার ছোট বোন। ভুলে গেলেন নাকি? চলুন আজ। প্রতুলের মনে বিস্ময় এবং আনন্দ দুই-ই হইল। কণার বয়েস পনেরো ষোল—রং ফর্সা, বেশ সুশ্রী মেয়ে। কথাবার্তা বলে চমৎকার—পাড়াগাঁয়ের তুলনায় লেখাপড়াও জানে ভাল। তাহার সম্বন্ধে কণা আগ্রহ দেখাইয়াছে কথাটা শুনিতে খুব ভাল!

কণা সেদিন প্রতুলের কাছে কাছেই রহিল। কয়দিন না দেখাশোনার পরে দুজনেরই দুজনকে যেন বেশী করিয়া ভাল লাগিতেছে। ফিরিবার সময় প্রতুলের মনে হইল, কণাকে আজ যেন তাহার অত্যন্ত আপন জন বলিয়া মনে হইতেছে। কেন?

নির্জন বাসায় ফিরিয়া কথাটা সে ভাবিল। কণা মেয়েটি ভাল, সত্যই বুদ্ধিমতী, সেবা-পরায়ণা। তাহাদেরই পালটি ঘর। আহা, এই জন্যই কি শশধরের এ তাগাদা—তাহাকে ঘন ঘন বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য?

কথাটা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে এ চিন্তাও তাহার মনে না আসিয়া পারিল না, তাই কণার অত গায়ে পড়িয়া আলাপ করার ঝোঁক তার সঙ্গে?

প্রতুল আবার শশধরদের বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিল।

শশধর আসিয়া পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিতে আদৌ বিলম্ব করিল না। এবার কিন্তু প্রতুল অত সহজে ভুলিল না। তাহার মনে দ্বন্দ্ব লাগিয়াছে। কণা তাহাকে সত্যই ভালবাসে, না তাহাকে বিবাহের ফাঁদে ফেলিবার জন্য ইহা তাহার একটি ছলনা মাত্র? কণার মা কিজন্য তাহাকে অত আদর করিয়া থাকেন বা শশধর তাহাকে বাড়ী লইয়া যাইতে অত আগ্রহ দেখায়—ইহার কারণ প্রতুলের কাছে ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। গরীবের মেয়ে, বিবাহ দিবার সঙ্গতি নাই উপযুক্ত পাত্রে—সে হিসাবে প্রতুল পাত্র ভালই, ত্রিশ টাকা মাহিনা পায় অফিসে, বয়স কম, দেখিতে শুনিতেও এ পর্যন্ত তো প্রতুলকে কেহ খারাপ বলে নাই।

ইহাদের সকল স্নেহ ভালবাসা আগ্রহের মধ্যে একটি গূঢ় স্বার্থসিদ্ধির সন্ধান জানিয়া প্রতুলের মন ইহাদের প্রতি নিতান্ত বিরূপ হইয়া উঠিল।

মাস দুই কাটিয়া গিয়াছে।

ভাদ্র মাস। সাত আট দিন বেশ ঝলমলে শরতের রৌদ্র—খালের ধারে কাশফুল ফুটিয়াছে, জল কাদা শুকাইয়া আসিতেছে। পূজার ছুটির আর বেশী দেরী নাই, প্রতুল বসিয়া বসিয়া সেই কথা ভাবিতেছিল—মিউনিসিপ্যাল অফিসে বারো দিন ছুটি।

এই সময় একদিন কাহার মুখে প্রতুল শুনিল, শশধরের বাড়ীতে বড় বিপদ। শশধরের

মা মৃত্যুশয্যায়। শুনিয়া সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। শশধর এদিকে অনেক দিন আসে নাই তা নয়, প্রতুল ইহাদের বাড়ী না গেলেও সে এখানে প্রায়ই আসিয়া বসিয়া থাকে, চা খায়, গল্পগুজব করে। কই, মায়ের এমন অসুখের কথা তো শশধর বলে নাই?

প্রতুল শশধরদের বাড়ী গেল। এমন বিপদের সময় না আসিয়া চুপ করিয়া থাকা—সেটা ভদ্রতা এবং মনুষ্যত্ব উভয়েরই বিরুদ্ধে। প্রতুলের কড়া নাড়ার শব্দে কণা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। প্রতুলের মনে হইল কণা তাহাকে দরজায় দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছে। প্রতুল আগে কথা কহিল। বলিল, মা কেমন আছেন?

—আসুন বাড়ীর মধ্যে। দাদা নেই বাড়ীতে, ডাক্তার ডাকতে গিয়েছে। অবস্থা ভাল না।

—চল, চল দেখি গিয়ে। আমি কিছুই জানিনে কণা অসুখের কথা, শশধর ক'দিন আমার ওখানে যায়নি। তবে মাঝে যা গিয়েছিল, তখন কিছু বলে নি।

—বলবে কি, মার অসুখ আজ সবে পাঁচ দিন হয়েচে তো। পরশু রাত্তির থেকে বাড়াবাড়ি যাচ্ছে। এর আগে এমন তো হয় নি।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া যেটা প্রতুলের চোখে সর্বপ্রথম পড়িল, সেটি ইহাদের দারিদ্র্যের কুশ্রী ও মলিন রূপ। সে নিজেও বড়লোকের ছেলে নয়, কিন্তু তবুও তাহাদের বাড়ীতে গৃহস্থালীর যে শ্রীছাঁদ আছে, এখানে তার সিকিও নাই।

কণা বলিল, এতকাল আসেন নি কেন এদিকে? আমাদের তো ভুলেই গিয়েছেন।

প্রতুলের মনে কষ্ট হইল। কণার ক্লান্ত, উদ্বেগপূর্ণ এবং ঈষৎ বিষণ্ণ চোখ দুটির দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল সে বড় নিষ্ঠুর কাজ করিয়াছে এতদিন এখানে না আসিয়া। কণা বড় ভাল মেয়ে, যতক্ষণ প্রতুল তাহাদের বাড়ী রহিল ততক্ষণের মধ্যেই প্রতুল জানিতে পারিল কণার কি কর্তব্যজ্ঞান, রুগ্ন মায়ের কি সেবাটাই করিতেছে কণা। এত দুঃখে উদ্বেগেও কণার সুন্দর রূপ ম্লান হয় নাই। অনেক মেয়েকে সে দেখিয়াছে—সাজিলে গুজিলে সুশ্রী বলিয়া মনে হয় কিন্তু মলিন কাপড় পরিয়া থাকিলে বা চুল না বাঁধা থাকিলে কিংবা হয়তো সদ্য ঘুম হইতে ওঠা অবস্থায় দেখিলে বড় খারাপ দেখায়।

কণার রূপের মধ্যে একটা কিছু আছে যাহাতে কোন অবস্থাতেই খারাপ দেখায় না। এত অনিয়ম রাত্রি জাগরণ, উদ্বেগ, পরিশ্রমের মধ্যেও কণা তেমনই ফুটন্ত ফুলটির মত তাজা, তেমনই লাবণ্য ওর সুকুমার মুখে।

কণার সম্বন্ধে এই একটি মূল্যবান সত্য আবিষ্কার করিয়া প্রতুল আনন্দিত ও বিস্মিত দুই-ই হইল।

ইহার পর প্রতুল কয়দিনই কণাদের বাড়ী নিয়মিত যাইতে লাগিল—রোগিণীর সেবায় সেও কণাকে সাহায্য করিত—স্টোভ জ্বালা, জল গরম করা, বিছানার চাদর বদলানোর সময় রোগিণীকে বিছানার একপাশে সরানো, ডালিম বেদানার দানা ছাড়ানো। পঞ্চম দিনের প্রাতঃকালে কণার মা যখন ইহলোকের মায়া কাটাইয়া চলিয়া গেলেন তখন সেই শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সে যথাযোগ্য সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, দাহকার্যের খরচপত্র নিজ হইতে দিল, কারণ শশধর একেবারে কপর্দকশূন্য সেদিন। নিজে শ্মশানে গিয়া শেষ পর্যন্ত রহিল। আবার সকলের সঙ্গে সেখান হইতে কণাদের বাড়ী ফিরিয়া আগুন তাপিল এবং নিমের পাতা দাঁতে কাটিল।

কণা আজকাল প্রতুলের দিকেও বড় টানে, তাহার সুখ দুঃখ, সে রাত্রে ঘুমাইল কিনা, তাহাকে চা ঠিক সময়ে দেওয়া এবং সেই সঙ্গে কিছু না হোক এক মুঠা মুড়ি ও তেল নুন মাখিয়া দেওয়া—এসব দিকে কণার সতর্ক দৃষ্টি—এত দুঃখ বিপদের মধ্যেও—ইহাও প্রতুলের মনে বড় আনন্দ দিয়াছে কয়দিন।

শ্রাদ্ধের আগের দিন প্রতুল শশধরকে নিজের মাহিনা হইতে কুড়িটি টাকা দিয়া তাহাকে কি করিতে হইবে না হইবে পরামর্শ দিল, জিনিসপত্র ও লোকজন খাওয়ানোর

ফর্দ করিল। সামান্য তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধ হইবে—শ্রাদ্ধের দিন বারোটি ব্রাহ্মণ এবং নিয়ম-ভঙ্গের দিন জন পনেরো জ্ঞাতি-কুটুম্ব খাইবে। এসব কথা কণাদের বাড়ী বসিয়াই হইতে-ছিল—পরমর্শান্তে প্রতুলকে বসাইয়া রাখিয়া শশধর কোথায় বাহির হইয়া গেল। প্রতুলের বসিয়া থাকিবার কারণ সে এখনও বৈকালিক চা পান করে নাই, না খাইয়া গেলে কণা চটিয়া যাইবে।

কণা চা লইয়া ঘরে ঢুকিল, প্রতুল কণার হাত হইতে পেয়ালাটি লইয়া বলিল—বসো কণা। কালকার সব যোগাড় করে রাখো—ফর্দ দিয়েছেন নবীন ভটচায্যি। সন্ধ্যের পর একবার দেখে নিও সেখানা—শশধর কেনাকাটা করতে গিয়েছে, যদি কিছু বাদ পড়ে, আনিয়ে নিও।

—আপনি টাকা দিলেন?

—আমি? হাঁ—তা ইয়ে—

—কত টাকা দিলেন?

—সে কথায় দরকার? সে এমন কিছু নয়—তা ছাড়া ধার—শশধর আবার আমায়—

—দাদা আবার আপনাকে ছাই দেবে। আপনাকে কথাটা বলবো ভেবেচি। কেন আপনি আমাদের পেছনে এমন করে খরচ করবেন? রোগের সময় টাকা দিয়েছেন—আবার কাজের সময় দেবেন! আপনি কি এমন ন'শো পঞ্চাশ টাকা ব্যাঙ্কে জমিয়েছেন শুনি? মাইনে তো পান ত্রিশটি টাকা। আপনার নিজের বাবা মা ভাই-বোন রয়েছে, তাদের কি দেবেন? নিজে কি খাবেন? আপনাকে বলি শুনুন। দাদা বেকার বসে আছে, আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়ে তা কখনো আর উপুড় হাত করবে না। ওর ওই স্বভাব। আপনি আর এক পয়সা দেবেন না বলে দিচ্ছি। মায়ের কাজ হোক আর না হোক আপনার কি? আপনি কেন দিতে যাবেন?

প্রতুল বিস্মিত দৃষ্টিতে কণার মুখের দিকে চাহিল। কণার মুখে একটি সবল তেজস্বী সারল্য...সত্যবাদী ও স্পষ্টভাষী ওর ডাগর চোখ দুটি, যা খোশামোদ করিতে বা ছলনা করিতে শেখে নাই আজও...প্রতুলের মনে হইল।

কিন্তু কণা আজ এ কি নতুন ধরণের কথা বলিল? ভারি আশ্চর্য কথা। এতদিন কণাকে চিনিতে পারে নাই সে, আজ চিনিল বটে। শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে প্রতুলের মন পূর্ণ হইয়া উঠিল। কণা সাধারণ মেয়ে নয়।

শ্রাদ্ধশান্তি মিটিয়া গেল। প্রতুল নিয়মিত উহাদের বাড়ী যাতায়াত করিতে লাগিল। কণার সেবা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, সে যত্ন ও সেবায় এতটুকু খুঁত কোনদিন প্রতুলের চোখে পড়িল না আজও। মায়ের শোক খানিকটা প্রশমিত হইবার পরে কণা আরও সুশ্রী হইয়া উঠিয়াছে এখন, পরিস্ফুট যৌবন-শ্রী তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে।

প্রতুল ইতিমধ্যে মনে মনে ভাবিয়া স্থির করিয়াছে কি করিয়া কথাটা এইবার সে পাড়িবে। কথাবার্তা পাকা না হয় রহিল, অশৌচ কাটিয়া গেলে বিবাহ হইতে বাধা কি! পরের বাড়ীর তরুণী পূর্ণযৌবনা মেয়ের সহিত এ ভাবে মেলামেশা উচিত হইতেছে না—একটা পাকাপাকি কথা হওয়া ভালো। বৈকালে প্রতুল কণাদের বাড়ী গেল।

কণা আসিয়া বলিল, ওইরে বাস্। আমি বলেচি কি না বলেচি, প্রতুলদা তো এলো বলে! দুধ নেই চা করবার, ওবেলা পিণ্টু দুধের কড়া আলগা করে দিয়েচে, আর সব দুধখানি উপুড় করে রেখে দিয়েচে বেড়ালে।

—বসো কণা এখানে। চা হবে এখন, তার জন্যে কিছু নয়।

কণা এখন মাতৃহীন ছোট ভাইবোনের মায়ের স্থান পূর্ণ করিয়া আছে, সংসারে সে-ই এখন কর্ত্রী, প্রতুল তা জানে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র কর্ত্রীটি মাঝে মাঝে কি রকম ফাঁদে পড়িয়া যায় পয়সাকড়ির অভাবে তাহাও প্রতুল দেখিয়াছে। কণা তাহাকে কিছু বলে

না—কোনদিন না—কিন্তু সে নানা রকমে টের পায়, যেমন আজই পাইল।

কণা কি কাজে একটু উঠিয়া গিয়াছে, প্রতুল কণার ছোট্ট ভাই বিনুকে ডাকিয়া বলিল, কি খেয়েচ খোকাবাবু?

—ভাত খেয়েচি।

—এখন কি খেয়েচ?

—আর কিছু নেই, ভাত নেই। দিদি খায় নি।

তখনি সেখানে কণার ছোট বোন এগারো বছরের পিণ্টু আসিল। প্রতুল বলিল, কণা খায় নি কেন?

পিণ্টু বলিল, ভাত ছিল না। ওবেলা চাল ধার করে নিয়ে এল দিদি ওই সরকারদের বাড়ী থেকে। দাদা কাল কোথায় গিয়েচে, আজও তো ফিরলো না। মহেশ চক্কত্তির দোকানে টাকা পাবে বলে চাল ডাল দেয় না আজকাল, দিদি এখন কোথায় পাবে, কোন্ দিকে যাবে?

প্রতুল অনেক কথা ভাবিল। কণা সংসার চালাইতে পারে না টাকার অভাবে, সে নিজে যদি বাহির হইতে দু'দশ টাকা সাহায্য করে সেটা যেন ভিক্ষা দেওয়ার মত দেখায়। সে টাকা হাত পাতিয়া লওয়ায় কণার গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়। কণাকে সে-অপমানের মধ্যে টানিয়া আনিতে তাহার মন সরে না অথচ এ রকম কষ্ট করিয়াই বা কণা কতদিন বাঁচিবে?

সবদিকের সুমীমাংসা করিতে হইলে বিবাহের কথাটা পাড়িতে আর বিলম্ব করা উচিত নয়। আজই সে কণার সঙ্গে এ বিষয়ে একটা বোঝাপড়া করিবে আগে—তাহার পরে শশধরকে জানাইলেই চলিবে এখন। শশধরটা মানুষ নয়, সে ইতিমধ্যে বেশ বুঝিয়া ফেলিয়াছে।

কণা চা লইয়া ঘরে ঢুকিল, বলিল—একটু দেরী হয়ে গেল প্রতুলদা, দুধ ছিল না একেবারে। আনলাম রায় কাকাদের বাড়ী থেকে। দেখুন তো চা-টা খেয়ে, কেমন হয়েছে?

প্রতুল বলিল—ব্যস্ত হয়ে ঘুরচ কোথায় কণা? বসো এখানে, কথা আছে।

শীতকালের বিকাল, কণাদের বাড়ীর চারিপাশে বনজঙ্গলে বনমৌরী লতায় ফুল ফুটিয়াছে—বেশ একটা উগ্র সুগন্ধে অপরাহ্নের শীতল বাতাস ভরপুর। ভাঙ্গা ইটের পাঁচিলের গায়ে রাঙা রোদ পড়িয়া কণাদের পুরানো পৈতৃক ভদ্রাসনের প্রাচীনত্ব ও দারিদ্র্য যেন আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

কণা বসিল, প্রতুলের মুখের দিকে আগ্রহের সহিত চাহিয়া বলিল, কি প্রতুলদা?

—তোমাকেই কথাটা বলি, কিছু মনে করো না কণা। অনেক দিন থেকে কথাটা আমার মনে রয়েচে—বলি বলি করে বলা ঘটে উঠচে না। তুমি আমায় বিয়ে করবে কণা? আমি অত্যন্ত সৌভাগ্য বলে মনে করবো, যদি—

কণা খানিকটা চুপ করিয়া রহিল। খানিকক্ষণ দুজনের কেহই কথা বলিল না। তারপরে কণা ধীরে ধীরে অনেকটা চাপা সুরে বলিল, সে হয় না প্রতুলদা।

প্রতুল বিস্মিত হইল। কণার উত্তর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত তাহার কাছে। বলিল, হয় না কণা?

কণা মাটির দিকে চোখ রাখিয়া পূর্ববৎ নিম্নসুরে বলিল, হয় না প্রতুলদা। কারণ আছে অবিশ্যি। কিন্তু সে কথা বলবো না। বিয়ে হতে পারে না।

—কারণটা জানতে পারলে বড় ভাল হতো, কণা। খুব বেশী বাধা কিছু আছে কি?

—হাঁ।

—কারণটা বলবে?

—আপনি কিছুই জানেন না? দাদা কিছু বলেনি আপনাকে?

প্রতুল আরও বিস্মিত হইল। কি জানিবে সে! শশধরই বা তাহাকে কি বলিবে! অত্যন্ত

আগ্রহ ও কৌতূহলের সঙ্গে সে বলিল—না কণা, তুমি কি বলচো আমি কিছুই বুঝতে পারচিনে। শশধর কি বলবে আমায়?

—আমি বিধবা।

—তুমি—

—হ্যাঁ, আট বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়—তেরো বছর বয়সে—এই পাঁচ বছর হলো।

প্রতুলের মাথা বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল যেন। সর্বশরীর যেন ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছে। কণা বিধবা! কণার বিবাহ হইয়াছিল আট বছর বয়সে! অদৃষ্টের কি দারুণ পরিহাস! আর সে কত আকাশ-কুসুম না রচনা করিয়াছে মনে মনে এই কণাকে লইয়া... ইহাদের প্রতি মনে মনে কত অবিচার করিয়াছে তাহাকে জামাই করিবার উদ্দেশ্য প্রতি-আরোপ করিয়া! গ্লানি ও অনুতাপে প্রতুলের মন পূর্ণ হইয়া গেল।

—কিন্তু কণা, একথা তো আমি কিছুই জানিনে। আমাকে তো কেউ কিছু বলেনি।

—আমার কিন্তু ধারণা ছিল যে, আপনি জানেন, দাদা বলেছে আপনাকে। আমিও অবাক হয়ে গেছি এ কথা শুনে।

—একটা কথা বলবো! বিধবার পুনর্বিবাহ তো হচ্ছে সমাজে!

—প্রতুলদা, ওসব কথা থাক্। যা হয় না যেখানে, সেখানে সে কথা তোলা মিথ্যে মিথ্যে কেন?

—না, আমার কথার উত্তর দাও কণা, আমি অমন ধরনের কথা শুনবো না তোমার মুখে; তোমায় সুখী করার দিকে আমার লক্ষ্য। সেজন্য সংস্কার এবং সমাজ আমি অনায়াসেই ঠেলবো।

কণার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সে মুখ নীচু করিয়া আঁচলের প্রান্ত দিয়া চোখ মুছিয়া বলিল—আপনার পায়ে পড়ি প্রতুলদা—

প্রতুল আর কিছু বলিল না। পরদিন অফিসে আসিয়াই সে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া দিল এক মাসের নোটিশে। এখানে আর থাকিবে না, থাকিয়া লাভ নাই।

এই এক মাসের মধ্যে সে কণাদের বাড়ী গেল প্রায় প্রত্যেকদিনই কিন্তু চাকুরিতে নোটিশ দেওয়ার কথা কাহাকেও বলিল না। বিবাহ সম্বন্ধে কণার সাথে আর কোন কথাও বলে নাই, যদিও কণা আগের মতই তাহার কাছে নিঃসঙ্কোচে আসে, বসে, কথাবার্তা কয়!

যাইবার পূর্বে সে কণাদের বাড়ী গেল। অন্যান্য কথাবার্তার পর সে বলিল, কণা, আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি কাল।

কণা আশ্চর্য হইয়া প্রতুলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—চলে যাবেন? কেন?

—চাকুরি ছেড়ে দিচ্চি।

—সে কি কথা!

—কথাটা ঠিক তাই। কাল যাচ্চি।

—সত্যি?

—সত্যি। মিথ্যে বলে লাভ কি?

—সেকথা তো একদিনও বলেন নি—

—না বলিনি। বলেই বা লাভ কি? যেতেই যখন হবে!

—কেন, এখানে আপনার অসুবিধা কি হচ্ছিল? ভাল চাকুরি পেয়েছেন বুঝি কোথায়ও?

—কোথাও না।

কণা চুপ করিয়া রহিল। প্রতুলও তাই।

খানিক পরে কণা বলিল, যাবেন তা জানতুম। বিদেশী লোক আপনি—আপনাকে তো ধরে রাখা যাবে না। আমাদের কথা আপনি শুনবেনই বা কেন?

—অনেক জ্বালাতন করেচি, কিছু মনে করো না কণা।

কণা চুপ করিয়া রহিল।

এই পর্যন্ত সেদিন কণার সঙ্গে কথাবার্তা। পরদিন আর একবার কণাদের বাড়ী যাইবার কথা ভাবিয়াও প্রতুলের যাওয়া ঘটিল না, দুপুরের ট্রেনে প্রতুল চলিয়া আসিল।

সারাপথ কেবল কণার কথা মনে হইল প্রতুলের। সেই অভাব অনটনের সংসারে চিরকাল কাটাইতে হইবে তাহাকে। গরীবের ঘরের অল্পবয়সী বিধবা মেয়ে, দাদার সংসার ছাড়া আর উপায় নাই। কণার জীবন অন্ধকার, কোন আলো নাই কোনদিক হইতে। প্রতুলের বুকের মধ্যে কোথায় যেন টন্‌টন্‌ করিতেছে। কণাকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইতেছে সে!

পরক্ষণেই ভাবিল, কি মুশকিল! কণা রয়েচে তার বাপের ভিটেতে ভাইবোনের কাছে, দাদার কাছে। আমার সঙ্গে তার কি?

মাস পাঁচ ছয় পরে, সেই ফাল্গুন মাসেই মায়ের পীড়াপীড়িতে তাহাকে বিবাহ করিতে হইল।

প্রতুলের শ্বশুরের দু-তিনটি ছোট বড় কলিয়ারি ছিল। কিন্তু কলিয়ারিগুলির অবস্থা ছিল খারাপ। চুরি হইত, নির্ভরযোগ্য ম্যানেজারের অভাবে কলিয়ারিগুলি লোকসানী মহল হইয়া পড়িয়া থাকিত।

প্রতুলের শ্বশুর একদিন প্রস্তাব করিলেন—সে অফিসে চাকুরি না করিয়া যদি কলিয়ারিগুলির তত্ত্বাবধান করে, তবে অফিসে যে বেতন পাইতেছে তাহা তো পাইবেই, উপরন্তু ভবিষ্যতে একটা উন্নতির আশা থাকে শ্বশুর-জামাই উভয়েরই। প্রতুল শ্বশুরের প্রস্তাবে রাজী হইল। আরও বছর দুই পরে কলিয়ারির অবস্থা সত্যই ফিরিল প্রতুলের কর্মদক্ষতায়। প্রতুল আসানসোলের রেল স্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে বুধচক্‌ কলিয়ারিতে সাজানো বাংলোতে স্ত্রীপুত্র (ইতিমধ্যে তাহার একটি ছেলে হইয়াছিল) লইয়া বাস করে—একটু স্টাইলের উপরই থাকে, না থাকিলে চলে না, কাজের খাতিরেই থাকিতে হয় নাকি।

কি জানি কেন, এখানে আসিয়া কণার কথা তাহার বড়ই মনে পড়িতে লাগিল। আজ তাহার এই সাজানো বাংলো, সুখ ঐশ্বর্য ইহাদের ভাগ কণা কিছুই পাইল না। সেই সুদূর পাড়াগাঁয়ে দারিদ্র্য ও নিরাশার অন্ধকারের মধ্যে ভাঙ্গা পুরোনো ইটের পুরোনো কোঠাবাড়ী আঁকড়াইয়া পড়িয়া রহিল!

প্রতুলের মনটা যেন হা হা করিয়া ওঠে। সে বুঝিল, এখনও কণার কথা তাহার মন জুড়িয়া বসিয়া আছে, তাই তাহাকে ভুলিয়া যাওয়া প্রতুলের পক্ষে সহজ নয়। প্রতুলের স্ত্রী বড়লোকের মেয়ে, বাল্যকাল হইতে সে সুখ ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া নতুন জিনিস দেখাইয়া লাভ কি? তেলা মাথায় তেল দেওয়া। বরং যে চরবঞ্চিতা—জীবন যাহাকে কিছু দেয় নাই—তাহাকে যদি আজ সে—কেন এমন হয় জীবনে কে বলিবে?

যে পাইয়া আসিতেছে সে-ই বরাবর পায়, যে পায় না সে কখনই পায় না। যাহাকে খাওয়াইয়া সুখ, পরাইয়া সুখ, দেখাইয়া সুখ—তাহাকে খাওয়ানো যায় না, পরানো যায় না, দেখানোও যায় না।

কেন এমন হয়?

এ সব চার পাঁচ বছর আগের কথা।

আজ কয়েক দিন হইল প্রতুল কলিকাতায় আসিয়াছে চাকুরির খোঁজে।

কলিয়ারি আছে কিন্তু প্রতুলের স্ত্রী নাই। পুনর্মূষিকের পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইবার ইতিহাস আছে! সংক্ষেপে এই যে, গত বৎসর স্ত্রীর মৃত্যুর পর হইতেই শ্বশুরের কলিয়ারিতে থাকা প্রতুলের ভাল মনে হইল না এবং তার পরে দেখা গেল প্রতুলের শ্বশুরেরও তাহা ক্রমশঃ ভাল বলিয়া মনে হইতেছে না। সুতরাং আজ কয়েকদিন হইল

প্রতুল তাহার ছেলেটিকে সংগে লইয়া কলিকাতায় আসিয়া এই পরিচিত মেসটিতে উঠিয়াছে এবং চাকুরির সন্ধানে আছে।

এই সেই শশধর। কণার ভাই। এতকাল পরে হঠাৎ এভাবে কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিয়া পড়িল! কিছুক্ষণ বসিয়া শশধর চা খাইয়া সুস্থ হইবার পরে প্রতুল বলিল, তারপর কি মনে করে? কেমন আছ?

শশধর বলিল, ভালই আছি। আপনি এখানে আছেন তা শুনলুম জীবনদার কাছে। আপনি নাকি চাকুরি খুঁজচেন? সেই জন্যেই আমার এখানে আসা। আপনার সব কথাই শুনেছি।

—কি ব্যাপার? চাকুরি সন্ধানে আছে নাকি?

—আমাদের দেশের মিউনিসিপ্যাল অফিসের সেই কেরানীর পোস্ট খালি হয়েছে। আপনি গেলে ওরা লুফে নেবে এখুনি। কিশোরী চাটুয্যে এখন চেয়ারম্যান, আপনাকে বড় ভালবাসতো, আমাদের আপনার লোক। দিন একখানা দরখাস্ত করে। আমি লিখলে একবার গিয়ে ইণ্টারভিউ করে আসবেন চেয়ারম্যানের সংগে।

আবার সেই নাথপুর! সেই মিউনিসিপ্যাল অফিসের ত্রিশ টাকা বেতনের কেরানীর পদ! তাহাই হউক। প্রতুল দরখাস্ত লিখিয়া পরদিন সকালে শশধরের হাতে দিল। চাকরি না করিলে চলিবে না। ছোট ছেলেটি লইয়া ত্রিশ টাকায় তাহার খুব চলিয়া যাইবে। তাহার বাবা মা জীবিত বটে, কিন্তু ছেলের রোজগারের উপর তাঁহাদের নির্ভর করিতে হয় না।

দিন পনেরো পরে শশধর লিখিল—চাকুরির সব ঠিক, একবার আসিয়া চেয়ারম্যানের সংগে দেখা করা দরকার। প্রতুল ছেলেকে লইয়া নাথপুরে গেল। দশ বৎসর আসে নাই এদিকে, অথচ যেন মনে হইতেছে কাল এ গ্রাম ছাড়িয়া গিয়াছে। কণার কথা সে শশধরকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই, কোথায় যেন বাধিয়াছিল—বহু চেষ্টা করিয়াও পারে নাই। আজ স্টেশনে নামিতেই কণার কথা মনে পড়িল। কণা যেখানে থাকে, সেখানেই সে থাকিবে জীবনের বাকী কয়টা দিন।

বেলা প্রায় একটা, শশধর স্টেশনে ছিল। বলিল—প্রতুলদা, আপনার সেই পুরানো বাসা ভাড়া করে রেখেছি। কোন অসুবিধা হবে না। আর কণা বলে দিয়েছে আজ ওখানে খাবেন। চাকুরি হয়ে যাবে এখন, সব বলা আছে।

প্রতুল বলিল—এবেলা খাব না। খোকাকে বরং নিয়ে যাও কণার কাছে। আমি অফিসের পরে যাব। আমরা দুজনেই সকালে খেয়ে গাড়ীতে চড়েচি।

বিকালের দিকে চেয়ারম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পরে প্রতুল শশধরদের বাড়ী গেল। প্রথমেই কণা আসিয়া সামনে দাঁড়াইয়া বলিল—প্রতুলদা, এতদিন পরে মনে পড়লো? তারপর সে পায়ের ধুলো লইয়া প্রণাম করিল।

প্রতুল অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। সে কণা কোথায়? কোথায় সেই লাবণ্যময়ী কিশোরী? এ কণাকে সে চেনে না। কণা পূর্বাপেক্ষা শীর্ণা হইয়াছে। যৌবনের সৌন্দর্য অন্তর্হিত হইয়াছে অনেককাল বলিয়াই মনে হয়—যদিও বর্তমানে সাতাশ-আটাশ বছরের বেশী বয়স নয় কণার। মুখের কোথাও পূর্ব লাবণ্যের চিহ্ন আছে কিনা প্রতুল বিশেষ-ভাবে খুঁজিয়া দেখিয়াও পাইল না।

সংগে সংগে প্রতুল দেখিল কণার উপর তাহার সে ভালবাসা যেন এক মুহূর্তে মন হইতে কর্পূরের মত উবিয়া গিয়াছে। এ কণা অন্য একজন স্ত্রীলোক—তাহার ভালবাসার পাত্রী, তাহার পরিচিত কণা এ নয়। কাহাকে সে ভালবাসিবে?

কণা অবশ্য খুব আদর-যত্ন করিল। আহারাদির পরে প্রতুলকে পান আনিয়া দিয়া কণা বলিল, কতদিন আসেন নি, অনেক কথা আছে আপনার সংগে প্রতুলদা। বসুন

আমি আসচি।

প্রতুল ভাবিতেছিল, ভাগ্যে কণার সঙ্গে তাহার বিবাহের সুবিধা বা যোগাযোগ হয় নাই। কি বাঁচিয়াই গিয়াছে সে! ভগবান বাঁচাইয়া দিয়াছেন। উঃ!

দু-চারটি মামুলী কথা বলিয়া প্রতুল ছেলের হাত ধরিয়া উহাদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া হাঁপ ছাড়িয়া যেন বাঁচিল।

পরদিন সকালে শশধরকে ডাকিয়া বলিল, না ভাই, ছেলেটার শরীর খারাপ হয়েছে কাল রাত্রেই। তোমাদের যা ম্যালেরিয়ার দেশ, ছেলে নিয়ে এখানে চাকুরি পোষাবে না। অন্যত্র চেষ্টা দেখিগে।

মাস্টার মশায়

প্রশান্তবাবুর কথা আমার এখনও পরিষ্কার মনে আছে।

সেদিন যেন কিসের ছুটি ছিল। বিকেলবেলা আমি ইস্টিশানের ধারে বেড়াতে যাচ্ছিলুম। বিকেলবেলা আমি প্রায়ই ইস্টিশানে বেড়াতে যেতুম, বিশেষতঃ ছুটির দিনে। হিস্ হিস্ করে স্টীম ছাড়ে, খট্‌খট্ করে গাড়ী চলতে থাকে, মাঝে মাঝে বিকট শব্দে সিটি দেয়। রেলের পুলের ওপর বসে আমার সেই সব দেখতে বেশ ভাল লাগত।

সন্ধ্যা হতে তখন অনেক দেরি আছে। পশ্চিম আকাশে লাল সূর্য যেন ফাগ ছড়িয়ে চারিদিক ভরিয়ে দিচ্ছে। কর্মব্যস্ত পৃথিবীর মধ্যে ক্লান্তি ও শ্রান্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছে। ধীরে ধীরে নিঃশব্দতায় ধরিত্রী ভরে যাচ্ছে। আশেপাশের ঝোপঝাপ থেকে পাখীদের কিচির কিচির শব্দ ভেসে আসছে। আমি আঁকাবাঁকা মেঠো পথ বেয়ে পাকা কাঁঠালের তীব্র গন্ধে চিত্ত মদির করে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছি।

এমন সময় কলকাতা থেকে ট্রেনখানা এসে প্ল্যাটফর্মের ধারে দাঁড়াল। সে এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করে সশব্দে হাঁফ ছাড়তে লাগল। মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে তার বিশ্রাম নেবার অধিকার। এই ক্ষণস্থায়ী মুহূর্ত কয়টির মধ্যে সকলের ওঠানামা শেষ করতে হবে। যথাসময়ে গাড়ী পুনরায় ছেড়ে দিল। সে ঝিক্ ঝিক্ করতে করতে সরু ফালি লাইনের ওপর দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে ধূম নির্গত করে ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হয়ে যেতে লাগল। তার পেছনের লাল আলোটা বহুক্ষণ ধরে দেখতে পেলুম। আম কাঁঠালের বাগানের ধার দিয়ে, বাঁশঝোপের পাশ হয়ে, সবুজ ধানক্ষেতের কোণ ধরে, পানের ঝাড় পেছনে ফেলে সশব্দে ট্রেন এগিয়ে গেল।

কুলীর মাথায় মোট চাপিয়ে একটি ভদ্রলোক ইস্টিশান থেকে বেরিয়ে এলেন। বেশ সুপুরুষ চেহারা. বয়স ত্রিশ পঁয়ত্রিশ, খুব ফর্সা, চোখে সোনার চশমা। গ্রামের মধ্যে কোথাও তাঁকে দেখেছি বলে মনে হয় না। অবাক হয়ে তাঁর পানে অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইলুম। আশ্চর্য! তিনি আমার কাছেই এগিয়ে এলেন, এমন কি তিনি আমাকেই প্রথমে সম্বোধন করলেন. শোন খোকা।

আমার চিত্ত পরম শ্রদ্ধায় ভরে গেল। বিনীত কণ্ঠে বললুম. আজ্ঞে!

তিনি বললেন, তুমি বুঝি এখানে থাক?

বললুম, হাঁ।

তিনি বললেন, বিষ্ণুপুর হাইস্কুল কোথায় বলতে পার?

বললুম, এই তো আমাদের স্কুল, চলুন না নিয়ে যাচ্ছি।

তিনি বললেন, ওঃ, তুমি বুঝি ওই স্কুলে পড়?

আমি গর্ব অনুভব করলুম। তিনি বললেন. কোন্ ক্লাসে পড়?

বললুম, ক্লাস সেভেনে।

তিনি বললেন, বেশ বেশ, তোমার নাম?

বললুম, শ্রীমান নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কথায় কথায় আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি, গ্রামের মধ্যেই প্রায়। একটা মোড় বাঁকতেই স্কুল দেখা গেল। বললুম, ঐ দেখুন, আমাদের ইস্কুল......ঐ সাদা রঙের দোতলা বাড়ীটা। আপনি কোথায় যাবেন? ইস্কুল তো এখন বন্ধ।

তিনি বললেন, আমি যাব আশু চৌধুরীর বাড়ী।

আমি বললুম, ওঃ। আপনিই বুঝি আমাদের নতুন হেড্‌মাস্টার?

তিনি স্মিতমুখে বললেন, হাঁ, কেন বল তো?

আশ্চর্য! আমি এতক্ষণ কার সঙ্গে কথা বলেছি? প্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায় এম. এ. আমাদের নবনিযুক্ত প্রধান শিক্ষক। আমি নিবিড় শ্রদ্ধায় তাঁর পদধূলি মাথায় নিলুম। তিনি আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, থাক্‌ থাক্‌ থাক্‌।

আজও আমি সেদিনের কথা ভুলতে পারিনি। তাঁর সেই সৌম্যমূর্তি মধুর ভাষা আমার স্মৃতিপটে দুরপনেয় রেখাপাত করে গেছে।

স্কুলে রীতিমত হৈ চৈ পড়ে গেল। আগেকার বুড়ো হেডমাস্টারের পরিবর্তে প্রশান্তবাবুকে পেয়ে অনেকে স্বস্তি বোধ করল। উঁচু ক্লাসের বড় বড় ছেলেরা তো হেসেই ফুঁ করে উড়িয়ে দিল। বলল, আরে ছ্যা! ও আবার হেডমাস্টারী করবে! ডিসিপ্লিন কাকে বলে তাই হয়তো জানে না। অতটুকু হেডমাস্টারকে কেই বা মানবে? কি বলিস্‌ বক্কেশ্বর?

বক্কেশ্বর তুড়ি দিয়ে বলল, আরে অমন অবনীবাবুকে ঘাল করে দিলাম, তার আবার প্রশান্ত মুখুজ্জে এম. এ.! মাত্তর দুদিন, তারপর দেখে নিস, বাছাধনকে বুঝিয়ে দেব আমরা হচ্ছি ইস্কুলের লিডার। নে নে ভোলানাথ, একটা গান ধর।

সঙ্গীতজ্ঞ ভোলানাথ বলল, ইস্কুলে বসে গান?

বক্কেশ্বর বলল, আরে গর্দভ, টিফিনের সময় গাইবি তো তাতে কি হয়েছে? নে সেই গানটা আরম্ভ কর, সেই 'ভুলি ভুলি করি ভুলিতে নারি'......

অগত্যা ভোলানাথ গলা ছেড়ে গান ধরল। গায়ক ভোলানাথের স্কুলে বেশ নাম আছে। আমি জানালার ফাঁক দিয়ে দেখছিলুম। সেখানে ঢোকবার হুকুম নেই, কারণ সে হচ্ছে বড়দের আসর। গান বেশ তালে তালে চলতে লাগল। এমন সময় কোথা থেকে হেডমাস্টার মশাই সেখানে নিঃশব্দে এসে হাজির হলেন। কে যেন ভোলানাথের গলাটা দুহাত দিয়ে চেপে ধরল। লিডারদের মুখ শুকিয়ে পাংশু হয়ে গেল। তাদের বীরত্ব আস্ফালন চিরতরে অস্তমিত হল। হেডমাস্টার মশায় ভোলানাথের কান ধরে দাঁড় করিয়ে তার দুগালে ঠাস্‌ ঠাস্‌ করে দুটো চড় মেরে বললেন, এটা বাগানবাড়ী নয়।

তারপর অন্যান্য শ্রোতাদের এক এক চড় মেরে তিনি যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন তেমন নিঃশব্দে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। লিডারদের তখন রক্ত গরম হয়ে গেছে। কেউ বলল, সেক্রেটারীর কাছে অ্যাপ্লিকেশন করবে। কেউ বলল, মজা দেখাবে।

কিন্তু কারুর মজা দেখাতে কিংবা অ্যাপ্লিকেশন করতে সাহস হল না। পরন্তু সকলে একবাক্যে স্বীকার করল যে হেডমাস্টার মশাই ভারী রাশভারী এবং কড়া মেজাজের লোক। বাস্তবিক ইস্কুলের সকলেই তাঁকে রীতিমত সমীহ করে চলত।

অল্পদিনের মধ্যেই গ্রামময় তাঁর সুনাম রটে গেল আদর্শ শিক্ষক হিসাবে। তাঁকে সকলে ভক্ত শ্রদ্ধা করতে লাগল। তিনি ছিলেন ছাত্রদের সাহায্যের জন্য সর্বদা প্রস্তুত। যে যখন যা প্রশ্ন করত তিনি তখনই তার উত্তর দিতেন। ছেলেদের মঙ্গলের জন্যে তিনি সব সময় উন্মুখ ছিলেন।

তাঁর মধ্যে কোথাও একটুকু গর্ব ছিল না। তাঁর মুখ কোন সময়ে হাস্যমধুর, কোন সময়ে বা গাম্ভীর্যে অটল-প্রায়। সেই যে কথা আছে না—'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি

কুসুমাদপি', হেডমাস্টার মশায় ছিলেন ঠিক সেই রকম। ছেলেরা কোন অন্যায় করলে তিনি তখন কঠোর শাস্তি দিতেন, আবার ছেলেরা কোন ভাল কাজ করলে তিনি তাদের প্রাণ ঢেলে ভালবাসতেন—

মাস কয়েক পরে শুনলাম তাঁর নাকি বিয়ে, এমন কি আমারই কাকার মেয়ে উষার সঙ্গে। উষাকে দেখতে ছিল ফুটফুটে ফুলের মত। দুজনকে চমৎকার মানায়। হারাণ-চক্কোত্তি বললেন, অমন সোনার টুকরো মাস্টারকে সংসারী না হলে কি মানায় মুখুজ্জে মশাই? আমরা থাকতে এমনি করে ভেসে ভেসে বেড়াবে?

মুখুজ্জে মশাই বললেন, কিন্তু বিয়ে যে করতে চাইছে না।

চক্কোত্তি বললেন, ক্ষ্যাপা! বিয়ে কর বল্লেই বুঝি ছেলেরা রাজী হয়? কলিকালে সব উল্টে গেছে। ওরা মুখে প্রথমে ওরকম বলে থাকে। তুমি দেখে নিও, ও বিয়ে করবে। আরে দাদা, বিয়ে করতে কার না ইচ্ছে যায়? দেখে নিও, চাটুজ্জের মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে দেবই দেব।

যথাসময়ে তাঁরা হেডমাস্টার মশায়ের কাছে গিয়ে কথাটা পাড়লেন। কিন্তু হেডমাস্টার মশাই প্রথমে বিনীতভাবে তাঁদের প্রস্তাব পালনে অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। অথচ গ্রামের লোকও কেউ সহজে ছাড়ল না। হেডমাস্টার মশাই বললেন, দেখুন আমার আত্মীয়-স্বজন এখানে কেউ নেই। এখানে বাড়ী ঘরদোরও নেই। আমি থাকি পরের বাড়ী! এখন আমার বিয়ে করা সাজে না।

রায়মশাই বললেন, বাড়ীর জন্যে ভাবতে হবে না মাস্টারমশাই। আমার একটা বাড়ী তো অমনি অমনি পড়ে রয়েছে। উঠবেন সেখানে গিয়ে।

হেডমাস্টার মশাই বললেন, আপনি আমায় নয় আজ থাকতে দিলেন, নয় ধরুন কাল থাকতে দিলেন; কিন্তু চিরকাল কি আশ্রয় পাব?

রায়মশাই বললেন, আশ্রয় দেওয়া কার সাধ্যি বলুন মাস্টার মশাই? আপনি নয় এক কাজ করতে পারেন, মাসে মাসে কিছু ভাড়া দেবেন, তা হলেই হবে। যতদিন বাড়ী থাকবে, যতদিন আপনি এখানে থাকবেন ততদিন আপনি ওখানে বাস করবেন।

হেডমাস্টার মশাই বললেন, শুধু তাই নয়, আমার বিয়ে দেবেই বা কারা?

রায়মশাই বললেন, তার জন্যে ভাববেন না। আমার বাড়ীর মেয়েরা গিয়ে আপনার বিয়ের সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেবে। আপনি কেবল সাতপাক ঘুরে আসবেন, ব্যস্; মানে গরীবের কন্যাদায় থেকে উদ্ধার হওয়া।

অগত্যা মাস্টার মশাইকে বাধ্য হয়ে বিয়ের জন্য রাজী হতে হল। তিনি একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে উষাকে দেখে এলেন। সেই প্রথম দেখাতেই তাঁদের বিয়ের কথা পাকা-পাকি হয়ে গেল। তিনি উষাকে তাঁর নিজের হাতের নামলেখা আংটি দিয়ে আশীর্বাদ করে এলেন। বাড়ীর ভেতর থেকে শাঁখ বেজে উঠল। মেয়েরা উলু দিল।

হেডমাস্টার মশাই আমাদের ইংরিজি পড়াতেন। প্রথম দিন ক্লাসে এলেন গম্ভীর-ভাবে। ইস্টিশানের সেই প্রশান্তবাবু আর নেই। কারুর মুখে কোন কথা নেই। যেন নিঃশ্বাসের শব্দটুকু শোনা যায়। তিনি আমাদের একখানা বই নিয়ে বললেন, তোমাদের কি পদ্য পড়া হয়েছে?

আমি বললুম, We are Seven, Lucy Gray, The blind boy...।

তিনি বললেন, We are Seven হয়েছে? কার লেখা বল দিকি?

সকলে সমস্বরে চীৎকার করে উঠল, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-এর।

তিনি বললেন, একজন একজন করে উত্তর দাও। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সম্বন্ধে তোমরা কে কি জান?

কারুর মুখে কোন কথা সরল না। তিনি আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, আচ্ছা তুমি বল দিকি?

আমি বললুম, তিনি প্রকৃতিকে ভালবাসতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে প্রকৃতির প্রাণ আছে।

তিনি বললেন, বেশ, বেশ। বল তো এই জায়গাটার মানে কি?

"How many you are, then" said I
"If they two are in Heaven?"
Quick was the little maid's reply
"O Master! We are seven."

অনেকেই তার কথার মানে করে গেল। তিনি তখন বললেন, কেউ আর কিছু জান?

কেউ আর উত্তর করতে পারল না। আমি বললুম, ঐ মানে আমরা শিখেছি।

তিনি মৃদু হাসলেন, বললেন, তোমাদের মানে ঠিকই হয়েছে। ওর আর একটা বিশেষ অর্থ আছে।

আমরা সকলে অবাক হয়ে তাঁর পানে তাকিয়ে রইলুম। তখন তিনি আমাদের বললেন, আত্মার অমরত্বের কথা। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনে গেলুম। সে ব্যাখ্যা এখনও আমার বেশ মনে আছে। শেষে তিনি বললেন, তোমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয় কে?

আমি উঠে দাঁড়ালুম, তিনি বললেন, ওঃ, তোমার সঙ্গেই না সেদিন দেখা হয়েছিল? তোমার নাম নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, না?

বললুম, হ্যাঁ।

এর পর তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় খুব গভীর হয়ে উঠল। তিনি প্রায়ই আমায় ছুটির পর অপিস ঘরে নিয়ে কত সুন্দর সুন্দর বই পড়তে দিতেন। যে জায়গাটা বুঝতে পারতুম না, সেটা কত রকমে কতবার বুঝিয়ে দিতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ'। এখন তোমরা শুধু পড়বে। পড়া মানে যে কেবল বইয়ের পড়া তা নয়। পড়া মানে জিজ্ঞাসু চোখ মেলে পৃথিবীর চারদিক গভীরভাবে দেখা। জান, নিউটন কি করে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেছিলেন, কি করে গ্যাল্ভানি ইলেকট্রিসিটি আবিষ্কার করেছিলেন, স্নান করতে করতে আর্কিমেডিস্ হায়ড্রোস্ট্যাটিকসের কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন? আমাদের চারপাশে এমন অনেক জিনিস ঘটছে যা আমরা দেখছি শুধু সাদা চোখে, তার সেই পর্দা সরিয়ে রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারছি না। বড় হতে হলে চোখ চাই—সব জিনিস বুঝে দেখবার চোখ।

আমরা পরম বিস্ময়ে তাঁর কথা শুনতাম। তিনি বলতেন, দেশ তোমাদের কাছে কিছু চায়। তোমরা দেশের কাছে বলিপ্রদত্ত। দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে হবে। প্রতিজ্ঞা কর দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে!

আমরা প্রতিজ্ঞা করলুম।

যে মাস্টার মশায়ের বিয়ে করবার আদৌ প্রবৃত্তি ছিল না, আশীর্বাদের পর তাঁর মধ্যে নতুন উৎসাহ দেখা দিল। অজস্র পয়সা খরচ করে তিনি বিরাট আয়োজন করতে লাগলেন। সারা গ্রামে মহা ধুমধাম পড়ে গেল। আমাদের স্কুল চারদিনের জন্য বন্ধ রইল। কলকাতা থেকে গায়েহলুদের আগের দিন জিনিসপত্র কিনে আনা হল। কনের জন্যে পঁয়তাল্লিশ টাকা দামের একখানা বেনারসী শাড়ী এল। বিখ্যাত জুয়েলারের দোকান থেকে গহনা এল। তারপর দূরান্তর কাঁপিয়ে সানাই বেজে উঠতে লাগল।

গায়েহলুদ দেখে সকলে তো অবাক হয়ে গেল।

গোধূলি লগ্নে বিয়ে। পাশের গ্রামের হেমন্ত হাজরা মোটর পাঠিয়ে দিয়েছে বর

নিয়ে যাওয়া হবে বলে। সারাদিন ধরে ফুল দিয়ে সেই মোটর সাজান হচ্ছে। আমাদের মন আনন্দে ভরে গেছে। আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে বসে বসে আমরা তর্ক করছি বরযাত্রী বড় না কনেযাত্রী বড়—এমন সময়ে দেখি স্কুলের সেক্রেটারী মশাই একজন বেঁটেমত কালো ভদ্রলোককে নিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি আমায় বললেন, তোর বাবাকে ডেকে দে দিকি!

তাঁর মুখ অত্যন্ত গম্ভীর এবং চিন্তাযুক্ত। আমি বাবাকে ডেকে দিলুম। সেক্রেটারী বললেন, শুনে যান গোষ্টবাবু, এই ভদ্রলোক কি বলছেন!

বাবা বললেন, কি কি!

সেক্রেটারী বললেন, এদিকে আসুন। সতীশবাবুর মুখেই ব্যাপারটা শুনবেন।

সতীশবাবু ওরফে সেই কালোমত ভদ্রলোকটির মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। বাবা উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁদের কাছে গেলেন। তাঁরা ফিস্ ফিস্ করে কি সব বললেন। বাবার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। তখনই কাকাকে ডাকা হল। তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। বাড়ীর ভেতর মেয়েরা চীৎকার করে কেঁদে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে চারদিক নিরানন্দে ভরে গেল—সারাগৃহে বিষণ্ণতার ছায়া। সেক্রেটারী মশায় যাবার সময় বলে গেলেন, একেই বলে কলিকাল। নইলে বলুন, মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করতে পারে না? আজকাল মানুষ চেনা দায়।

ইতিমধ্যে পাড়ার এ্যামেচার ড্রামাটিক ক্লাবের মেম্বাররা এসে দারুণ হৈ চৈ বাধিয়ে দিল। বলল, শাস্তি চাই। আমরা কি সব মরে গেছি? গাঁয়ের মধ্যে একজন এসে যে এই কেলেঙ্কারি করবে তা আমরা কখনই সহ্য করব না। আজ ওর হাড় গুঁড়িয়েই ছেড়ে দেব।

সেক্রেটারী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, না না, তোমাদের অত কিছু করতে হবে না। ভদ্রলোকের যা অপমান হবার খুবই হয়েছে। গায়ে যদি মানুষের চামড়া থাকে তো বুঝতে পারবে। কালই সমস্ত কাজ বুঝে দূর করে দেব গাঁ থেকে। তোমরা এই গরীব ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় থেকে রক্ষা কর।

তাঁরা সকলে চলে গেলে শুনলুম, হেডমাস্টারকে নিয়েই নাকি এই গণ্ডগোলের সৃষ্টি। তিনি নাকি বিধবার ছেলে। ঐ সতীশবাবু হচ্ছেন তাঁর কাকা। আমার কাকা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, এ সব ভাগ্য। তা নইলে অমন সোনার টুকরো ছেলের কিনা এই বিচ্ছিরি দোষ?

ঊষার বহু কষ্টে বিয়ে হল সেই গোধূলি লগ্নেই এই গাঁয়ের মতি বাঁড়ুয্যের ছেলে কিরণের সঙ্গে। কিরণ তখন সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে। যাই হোক, বিয়েতে আমি আনন্দ পাই নি একটুও, এমন কি বিয়েও কখনও এমন বিষণ্ণতার মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে বলে আর তো আমি শুনি নি। কোন প্রকারে সাত পাক ঘুরে মালাবদল করা আর নিঃশব্দে খাওয়াদাওয়া সাঙ্গ করা।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা। চুপ করে বাড়ী বসে থাকতে আর ভাল লাগল না। আস্তে আস্তে ইস্টিশানের ধারে বেড়াতে গেলুম।

সন্ধ্যা হয়েছে। দূরের জিনিস ভাল রকম দেখা যায় না। একটা নারকেল গাছের মাথাটা কাঁপছে. তার পাশ দিয়ে উজ্জ্বল শুকতারাটি দেখা গেল। ইস্টিশানে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠল। গাড়ী আসছে। ফ্ল্যাগ ডাউন করে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিন হলে হয়তো ছুটে গিয়ে লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে ট্রেন দেখতুম—সেটা হয়তো খটাখট খটাখট করে চলে যেত; কিন্তু আজ আমার পা যেন উঠতে চাইছে না। ধীরে ধীরে আঁকা-বাঁকা পথ বেয়ে চলেছি এমন সময়ে দেখি হেডমাস্টার মশাই ঠিক আমার সামনে। তাঁর হাতে

একটা স্যুটকেস, পেছনে চাকরের মাথায় অন্যান্য জিনিসপত্র। তিনি আমার কাছে এলেন, বললেন, এখানে কি করছ নির্মল? বাড়ী যাও, ঠান্ডা লাগবে।

তাঁর মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরুল না। মনে হল এবার বুঝি তিনি কেঁদে ফেলবেন। নিঃশব্দে তাঁর পদধূলি নিয়ে মাথায় ঠেকালুম। তিনি আমার পিঠটা বার দুয়েক চাপড়ে সহাস্যে বললেন, বেশ...বেশ...বেশ।

আমি অতি কষ্টে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম। তাঁর চোখ চকচক করছে যেন:

নিকটেই ট্রেনের শব্দ শোনা গেল। তিনি ক্ষিপ্র পদক্ষেপে প্রস্থান করলেন। যাবার সময় বললেন, বেশীক্ষণ আর এখানে থেকো না, বিশ্রী হাওয়া দিচ্ছে।

মাত্র মিনিট কয়েক ট্রেনখানা থামল। তার মধ্যেই ওঠানামা শেষ হয়ে গেল। আবার সেই দুরন্ত ট্রেন হু হু করে ছুটে চলল। মাথার ওপর দিয়ে ডানার ঝটাপটি করতে করতে একটা পেঁচা উড়ে গেল। আমার চোখ দিয়ে টপ্ টপ করে কয়েকবিন্দু অশ্রু ঝরে পড়ল।

তিরোলের বালা

মার্টিন কোম্পানীর ছোট লাইন।

গাড়ী ছাড়বার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, এখনও ছাড়বার ঘণ্টা পড়ে নি, এ নিয়ে গাড়ীর লোকজনের নানা রকম মতামত চলেছে।

—মশাই বড়গেছে নেমে যাব প্রায় পাঁচ মাইল। চারটে বাজে—এখনও গাড়ী ছাড়বার নামটি নেই—কখন বাড়ী পেঁছব ভাবুন তো?

—এদের কান্ডই এই রকম—আসুন না সবাই মিলে একটু কাগজে লেখালেখি করি। সেদিন বড়গেছে ইস্টিশানে দুটো ট্রেনের লোক এক ট্রেনে পুরলে—দাঁড়াবার পর্যন্ত জায়গা নেই—তাও কদমতলায় এল এক ঘণ্টা লেট্।

—ঐ আপিসের সময়টা একটু টাইমমত যায়—তার পর সব গাড়ীরই সমান দশা—

—আঃ, কি ভুল যে করেছি মশাই এই লাইনে বাড়ী করে! রিটায়ার করলাম, কোথায় বাড়ী করি, কোথায় বাড়ী করি, আমার শ্বশুর বললেন, তাঁর গ্রামে বাড়ী করতে—

—সে কোথায় মশাই?

—এই প্রসাদপুর, যেখানে প্রসাদপুরের ঠাকুর আছেন, মেয়েদের ছেলেপুলে না হলে মাদুলি নিয়ে আসে, হাওড়া ময়দান থেকে পঁচিশ মাইল, বেশী না। ভাবলাম কলকাতার কাছে, সস্তাগন্ডা হবে, পাড়াগাঁ জায়গা, শ্বশুরবাড়ীর সবাই রয়েছেন—তখন কি মশাই জানি? তিন-চার হাজার টাকা খরচ করে বাড়ী করলুম, দেখছি যেমনি ম্যালেরিয়া তেমনি যাতায়াতের কষ্ট, পঁচিশ মাইল আসতে পঁচিশ খেলা খেলছে। এই স্টুপিড গাড়ীগুলো—

—পঁচিশ কি স্যর, তিন পঁচিশং পঁচাত্তর খেলা বলুন। আমারও পৈতৃক বাড়ী ঐ প্রসাদপুরের কাছে নরোত্তমপুর। ডেলি প্যাসেঞ্জারি করি, কান্না পায় এক-এক সময়—

আমি যাচ্ছিলাম চাঁপাডাঙ্গা: লাইনের শেষ স্টেশন। এদের কথাবার্তা শুনে ভয় হলো। স্টেশন থেকে চার মাইল দূরে দামোদর নদীর এপারেই আমার এক মাসীমা থাকেন, মেসোমশায় নাকি মৃত্যুশয্যায়, তাই চিঠি পেয়ে মাসীমার সনির্বন্ধ অনুরোধে সেখানে চলেছি। যে রকম এরা বলছে, তাতে কখন সেখানে পেঁছব কে জানে?

কামরার এক কোণের বেঞ্চিতে একটি যুবক ও তার সংগে একটি সতেরো-আঠারো বছরের সুন্দরী মেয়ে বসে ছিল। মেয়েটির পরনে সিল্কের ছাপা-শাড়ী, পায়ে মাদ্রাজী চটি, মাথার চুলগুলো যেন একটু হেলাগোছা ভাবে বাঁধা—সে জানালা দিয়ে বাইরের

দিকে চেয়ে ছিল। যুবকটি মাঝে মাঝে সকলের কথাবার্তা শুনছে, মাঝে মাঝে বাইরের দিকে চেয়ে ধূমপান করছে।

গাড়ী ছেড়ে তিন-চারটে স্টেশন এল। পান, পটল, আলু, মাছের পুঁটলিহাতে ডেলি প্যাসেঞ্জারের দল ক্রমে নেমে যাচ্ছে। বাকি দল এখনও সামনা-সামনি বেঞ্চিতে মুখো-মুখি বসে কোঁচার কাপড় মেলে তাস খেলছে। মাঝে মাঝে ওদের হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে এঞ্জিনের ঝক্‌ঝক্ শব্দ ভেদ করে—টু হার্টস! নো ট্রাম্প! থ্রি স্পেডস!

যখন জাঙ্গিপাড়া গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে তখন বেলা যায়-যায়। জাঙ্গিপাড়া স্টেশনের সামনে বড় দীঘিটার ধারের তালগাছগুলোর গায়ে রাঙা রোদ।

শেষ ডেলি প্যাসেঞ্জারটি জাঙ্গিপাড়ায় নেমে যাওয়াতে গাড়ী খালি হয়ে গেল—একেবারে খালি নয়, কারণ রইলাম কেবল আমি। কোণের বেঞ্চির দিকে চেয়ে দেখি সেই যুবক ও তার সঙ্গিনী মেয়েটিও রয়েছে।

এতক্ষণ ডেলি প্যাসেঞ্জারদের গল্পগুজব শুনতে শুনতে আসছিলাম বেশ, এখন তারা সবাই নেমে গিয়েছে, আমি প্রায় একাই—এখন স্বভাবতই যুবক ও মেয়েটির প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হলো। মেয়েটি বিবাহিতা নয়। সে তো বেশ দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। তবে ওদের সম্বন্ধ কি ভাইবোন? কিংবা মামা-ভাগ্নী? মেয়েটি বেশ সুন্দরী। ছোকরা মেয়েটিকে ভুলিয়ে নিয়ে পালাচ্ছে না তো? আশ্চর্য নয়। আজকালকার ছেলে-ছোকরাদের কাণ্ড তো?

যাকগে, আমার সে-সব ভাবনার দরকার কি? নিজের কি হবে তার নেই ঠিক। সন্ধ্যা তো হয়ে এলো। মাসীমাদের গ্রাম স্টেশন থেকে দুই-তিন মাইল, পথও সুগম নয়। ট্রেন আঁটপুর এসে দাঁড়াল, জাঙ্গিপাড়ার পরের স্টেশন। তারপর ছাড়ল। বড় বড় ফাঁকা রাঢ়দেশের মাঠে সন্ধ্যা নেমে আসছে, লাইনের ধারে কচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষাগাঁ। লাউলতা চালে উঠেছে। একটা ছোট্ট গ্রাম্য হাট ভেঙে লোকজন ধামা-চেঙারি মাথায় ফিরছে—আবার মাঠ, জামগাছের মাথায় কালো বাদুড় উঠে এসে বসেছে, খালের পারে মশাল জেলে জেলেরা মাছ ধরবার চেষ্টা করছে।

আবার সহযাত্রীদের দিকে চাইলাম।

দুজনে পাশাপাশি বসে আছে। কিন্তু দুজনেই জানালার বাইরে চেয়ে রয়েছে। একটা কথাও শুনলাম না ওদের মধ্যে।

ছেলেটা মেয়েটাকে নিয়ে পালাতে পালাতে দু-জনের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে! বেশ সুন্দর চেহারা দুজনেরই। না, মামা-ভাগ্নী বা ভাইবোন নয়। নিয়ে পালানোই ঠিক। কিন্তু এদিকে কোথায় যাবে ওরা? মার্টিন কোম্পানীর ছোট লাইন তো আর দুটো স্টেশন গিয়ে রাঢ়দেশের অজ পাড়াগাঁ আর দিগন্তব্যাপী মাঠের মধ্যে শেষ হয়েছে। এ দুটি শৌখীন পোশাক-পরা তরুণ-তরুণীর পক্ষে সে অঞ্চল নিতান্ত খাপছাড়া ও অনুপযোগী।

যাক গে, আমার কেন ও-সব ভাবনা?

পিয়াসাড়া স্টেশনের সিগন্যালের সবুজ আলো দেখা দিয়েছে। সামনে ভয়ানক অন্ধকার রাত্রি, নিতান্ত দুর্ভাবনায় পড়ে গেলাম। রাঢ়দেশের মাঠের উপর দিয়ে রাস্তা, সঙ্গে ব্যাগে কিছু টাকাকড়ি আছে, শুনেছি হুগলী জেলার এদিকে চুরি-ডাকাতি নাকি অত্যন্ত বেশী। মেসোমশায়ের চিকিৎসার জন্যে মাসীমা কিছু টাকার দরকার বলে লিখেছিলেন। মা-ই টাকাটা দিয়েছে। ধনেপ্রাণে না মারা পড়ি শেষকালে!

হঠাৎ আমার সহযাত্রী যুবকটি আমার দিকে চেয়ে বললে—চাপাডাঙা ইস্টিশান থেকে নদীটা কত দূরে বলতে পারেন স্যার?

—নদী প্রায় আধ মাইল।

—নৌকা পাওয়া যায় খেয়ার?

—এখন নদীতে জল কম। তবে নৌকোও বোধ হয় আছে।

যুবকটি আর কোনো কথা না বলে আবার বাইরের দিকে চেয়ে রইল। আমার অত্যন্ত কৌতূহল হলো, একবার জিজ্ঞেস করে দেখি না ওরা কোথায় যাবে। কিন্তু ওদের দিক থেকে কথাবার্তার ভরসা না পেয়ে চুপ করে রইলাম।

পিয়াসাড়া স্টেশনে এসে গাড়ী দাঁড়াল। বিশেষ কেউ নামল উঠল না, ছোট স্টেশন। যুবকটি আমায় জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, স্যার, ওপারে গাড়ী পাওয়া যায়?

আমি ওর দিকে চেয়ে বললাম—কি গাড়ীর কথা বলছেন?

—এই যে-কোন গাড়ী—মোটর-বাস কি ঘোড়ার গাড়ী!

লোকটা বলে কি! এই অজ পাড়াগাঁয়ে ওদের জন্যে মোটরের বন্দোবস্ত করে রাখবে কে বুঝতে পারলাম না। বললাম—না মশায়, যতদূর জানি ও-সব পাবেন না সেখানে। পাড়াগাঁ জায়গা, রাস্তা-ঘাট তো নেই।

এবার ওদের গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে আমার কৌতূহল অতি কষ্টে চেপে গেলাম।

কিন্তু যুবকটি পরমুহূর্তেই আমার সে কৌতূহল মেটাবার পথ পরিষ্কার করে দিলে। জিজ্ঞেস করলে—ওখান থেকে তিরোল কতদূর হবে জানেন স্যার?

অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে ওর মুখের দিকে চাইলুম।

—তিরোল যাবেন নাকি? সে তো অনেক দূর বলেই শুনেছি। আমিও এদেশে প্রায় নতুন, ঠিক বলতে পারব না—তবে পাঁচ-ছ ক্রোশের কম নয়।

যুবকের মুখে উদ্বেগ ও চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। আমার দিকে একটু এগিয়ে বসে বললে—যদি কিছু মনে না করেন স্যার, একটা কথা বলব?

তবে ইলোপমেন্টই হবে। যা আন্দাজ করেছিলাম। কিন্তু তিরোলে কেন? সেখানে তো লোকে যায় অন্য উদ্দেশ্যে!

বললুম—হ্যাঁ, বলুন না—বলুন।

যুবকটি মেয়েটির দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে গলার সুর নামিয়ে বললে—ওকেই নিয়ে যাচ্ছি তিরোলে। পাগলা কালীর বালা আনতে ওরই জন্যে—আমার বোন, কাল অমাবস্যা আছে, কাল বালা পরা নিয়ম—

বাধা দিয়ে বললাম—মেয়েটি কি—

—চুপ করে আছে এখন প্রায় দু-মাস, কিন্তু যখন খেপে ওঠে তখন ভীষণ হয়ে ওঠে, সামলে রাখা কঠিন। এত রাত যে হবে বুঝতে পারি নি, সবাই বলেছিল স্টেশন থেকে বেশী দূর নয়—

—আপনারা আসছেন কোত্থেকে?

—অনেক দূর থেকে স্যার, ধানবাদের কাছে সয়ালডি কলিয়ারি—এ-দিকের খবর কিছুই জানি নে—লোক যেমন বলেছে তেমনি শুনেছি—কি করি এখন? ঐ মেয়ে সঙ্গে, বিদেশ-বিভূঁই জায়গা, বড় বিপদে পড়ে গেলাম যে!

চুপ করে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করলাম।

ছোকরা বিপদে পড়ে গিয়েছে বেশ। ওর কথা শোনার পর থেকে মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখছি, চমৎকার দেখতে মেয়েটি। ধপধপে ফর্সা রং, বড় বড় চোখ, ঠোঁটের দুটি প্রান্ত উপর দিকে কেমন একটু বাঁকান, তাতে মুখশ্রী আরও কি সুন্দর যে দেখাচ্ছে! অমন সুন্দরী মেয়ে নিয়ে এই বিদেশে রাত্রিকালে মাঠের মধ্য দিয়ে পাঁচ-ছ ক্রোশ রাস্তা গাড়ী ভাড়া করে গেলেও বিপদ কাটল বলে মনে করবার কারণ নেই।

এক চাঁপাডাঙ্গাতে কোথাও থাকা। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে অপরিচিত লোকদের, বিশেষ করে যখন শুনবে যে মেয়েটি পাগল—তখন ওদের রাত্রে আশ্রয় দেবার মত উদারতা খুব

কম মানুষেরই হবে।

যুবকটিকে বললাম—চাঁপাডাঙ্গাতে কোন লোকের বাড়ী আশ্রয় নেবেন রাত্রে—তার চেষ্টা দেখব?

—না স্যার, ওকে অপরিচিত লোকের মধ্যে রাখতে পারব না, তা হলেই ওর মেজাজ খারাপ হয়ে উঠবে। আমি ছাড়া আর কারও কাছে থাবে না পর্যন্ত। যে-কোনও তুচ্ছ ব্যাপারে ও ভীষণ খেপে উঠতে পারে— সে-ভরসা করি নে স্যার—ওর সে মূর্তি দেখলে আমি ওর দাদা, আমি পর্যন্ত দস্তুরমত ভয় পাই—সে না দেখাই ভাল। ও অন্য মানুষ হয়ে যায় একেবারে—

চাঁপাডাঙ্গা স্টেশনে গাড়ী এসে দাঁড়াল।

রাত্রির অন্ধকার এখনও ঘন হয়ে নামে নি, তবে কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাত্রি, অনুমান করা যায়, কি ধরনের হবে আর একটু পরে।

চাঁপাডাঙ্গা স্টেশনের কাছে লোকের বাড়ীঘর বেশী নেই। খানকতক বিচুলি-ছাওয়া ঘর, অধিকাংশ পান-বিড়ি, মুড়ি-মুড়কি কিংবা মুদিখানার দোকান। একটা সাইকেল-সারানোর দোকান। একটা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানা, ডাক্তারখানার এক পাশে স্থানীয় ডাকঘর। একটা পুকুর, পুকুরের ওপারে দু-একখানা চাষাভূষো লোকের ঘর।

আমরা টিকিট দিয়ে সবাই স্টেশনের বাইরে এলাম। সামনেই দুতিনখানা ছইওয়ালা গরুর গাড়ী দেখে আমার দুর্ভাবনা অনেকটা কমে গেল, কিন্তু যখন তাদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম নদীর ধার পর্যন্ত তারা যায়, নদী পার হবার উপায় নেই গরুর গাড়ীর —তখন আমি আমার সঙ্গীটিকে বললুম—কি করবেন, নয়তো ইস্টিশানেই থাকবেন রাতে!

—না স্যার, কাল অমাবস্যা, আমার তিরোল পেঁাছতেই হবে কাল। এখানে থাকলে কাজ হবে না। আপনি আর একটু কষ্ট করুন, আমার সঙ্গে চলুন। আপনাকে যখন পেয়েছি, ছাড়তে পারব না। আপনি না দেখলে কোথায় যাই বলুন!

আমি বড় বিপদে পড়ে গেলাম।

ওদিকে মেসোমশায়ের অসুখ, সেখানে পয়সা-কড়ি নিয়ে যত শীগ্‌গির হয় পেঁাছনো দরকার। এদিকে এই বিপন্ন যুবক ও তার বিকৃতমস্তিষ্কা তরুণী ভগিনী। ছেড়েই বা এদের দিই কি করে এই অন্ধকার রাত্রে? তা হয় না। সঙ্গে যেতেই হবে, মেসোমশায়ের অদৃষ্টে যা ঘটে ঘটুক।

গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানেরা কিন্তু ভরসা দিল। তিরোলের বাঁধা রাস্তা, নদী পেরিয়ে গাড়ী পাওয়া যায়, পালকি পাওয়া যায় একটু খোঁজ করলেই, হরদম লোক যাচ্ছে সেখানে, ভয়ভীত কিছু নেই—নদীর খেয়া থেকে বড় জোর দু-ঘণ্টার রাস্তা।

নদীর ধার পর্যন্ত একখানা ছইওয়ালা গরুর গাড়ীতে আমরা তিনজন এলাম। সারা ট্রেনে মেয়েটি কথা বলে নি, অন্ততঃ আমি শুনি নি। ছইয়ের মধ্যে বসে সে প্রথম কথা কইল। যুবকটির দিকে চেয়ে বললে—দাদা, আমার শীত করছে—তোমার শীত করছে না?

সুন্দর গলার স্বর—যেন সেতারে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। আমি সহানুভূতির চোখে তরুণীর দিকে চাইলাম, আহা, এমন সুন্দর মেয়েটি কি অদৃষ্ট নিয়েই জন্মেছে!

বললাম—শীত করতে পারে, নদীর হাওয়া বইছে—সঙ্গে কিছু আছে গায়ে দেবার?

যুবকটি বলে—না, গায়ে দেবার কিছু—ধরুন এ বোশেখ মাসে তো আনি নি—বিছানার চাদরখানা পেতে গাড়ীতে বসেছিলাম—ওখানা গায়ে দে—

মেয়েটি আবার বললে—কি নদী দাদা?

বেশ স্বাভাবিক সুরে সহজ ধরনের কথাবার্তা।

আমিই বললাম—দামোদর।

মেয়েটি এবার আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—বল্লভপুরে যে দামোদর? আমি জানি, খুব বড় নদী—না দাদা? ছেলেবেলায় দেখেছি—

যুবকটি আমায় বললে—দামোদরের ধারে বল্লভপুর বলে গ্রাম, বর্ধমান জেলায়, সেখানে আমার মামার বাড়ী কি না? পূর্ণিমা—মানে আমার এই বোন সেখানে দু-বার গিয়েছিল ছেলেবেলায়—তার পর—

খেয়ার নদী পার হবার সময় পূর্ণিমা ওর দাদাকে বললে—ভয় করছে দাদা—ডুবে যাবে না তো? ও দাদা—নৌকো দুলছে যে—

—ডুবে যাবি কেন? চুপ করে বসে থাক—দুলছে তাই কি?

ওপারে গিয়ে আমরা দেখি গাড়ীঘোড়া তো দূরের কথা, একটা মানুষ পর্যন্ত নেই। খেয়ার মাঝি লোকটা ভাল, সে আমাদের অবস্থা দেখে বললে—দাঁড়ান বাবুমশাইরা, শামকুড়ের গোয়ালপাড়ায় গরুর গাড়ী পাওয়া যায়—আমি ডেকে দিচ্ছি—আপনারা নৌকোতেই বসুন—

পূর্ণিমা বললে—দাদা, কিছু খাবে না? খাবার রয়েছে তো—

পরে আমার দিকে চেয়ে বললে—আপনিও খান, খাবার অনেক আছে—

ওর দাদা বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, দে না, ওঁকে দে—তুইও খা—কিছু তো খাস নি—পৌঁছতে কত রাত হয়ে যাবে।

পূর্ণিমা একটা ছোট্ট পুঁটুলি খুলে আমাদের সবাইকে লুচি, পটলভাজা, আলু-চচ্চড়ি ও মিহিদানা পরিবেশন করে দিলে।

বললে—দেখ তো দাদা, মিহিদানা খারাপ হয়ে যায় নি?

আমি বললাম—এ কোথাকার মিহিদানা?

পূর্ণিমা বললে—বর্ধমান থেকে কেনা, আসবার সময়ে। খারাপ হয় নি? দেখুন তো মুখে দিয়ে—

আজ যখন বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলাম, তখন ভাবি নি এমন একটি সন্ধ্যার কথা. ভাবি নি যে দামোদর নদীর উপর নৌকাতে বসে একটি অপরিচিত যুবক ও একটি অপরিচিতা তরুণীর সঙ্গে খাবার খাব এভাবে। কেমন একটি শান্ত পরিবেশ, যেন বাড়ীতে মা-বোনের মধ্যেই আছি—বড় ভাল লাগছিল।

কিন্তু পরবর্তী মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতার পটভূমিতে ফেলে আজ যখন আবার সেই সন্ধ্যাটির কথা ও আমার সেই তরুণ সঙ্গীদের কথা এখন ভাবি—তখন মনে হয়, সেদিন তাদের সঙ্গে না দেখা হওয়াই ভাল ছিল। একটা দুঃখজনক করুণ স্মৃতির হাত থেকে বাঁচা যেত তাহ'লে।

আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে, এমন সময় গরুর-গাড়ী নিয়ে খেয়ার মাঝি ঘাটের ধারে দামোদরের বিস্তৃত বালির চরে এসে হাজির হ'ল। তিরোল যাবার ভাড়া ধার্য করে আমরা গাড়ীতে উঠে পড়লাম, খেয়ার মাঝিকে তার পরিশ্রমের জন্যে কিছু বকশিশ দেওয়াও বাদ গেল না।

গাড়োয়ান বললে—বাবু, ভুল হয়ে গিয়েছে—বাড়ী থেকে তামাকের টিনটা নেওয়া হয় নি—গাড়ী গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে যাই—বেশী দেরী হবে না বাবু—

শামকুড় গ্রামের মধ্যে গাড়ী ঢুকল। আমবাগান, বাঁশবন, লোকের বাড়ী-ঘরের পেছন দিয়ে রাস্তা; ঘরের দাওয়ায় মেয়েরা রান্না করছে, তার পর আবার মাঠ, আখের ক্ষেত, পাটক্ষেত, মাঠের মধ্যে দিয়ে চওড়া সাদা রাস্তা আমাদের সামনে বহুদূর চলে গিয়েছে। রাঢ়দেশের মাঠ, বনজঙ্গল খুব কম, এখানে-ওখানে মাঝে মাঝে দু-চারটে কলাগাছ ছাড়া।

পূর্ণিমা আমায় বললে—আপনার মাসীমার বাড়ী এখান থেকে কত দূর হবে?

—সে তো এদিকে নয়—দামোদরের ও-পারে। স্টেশনের পূর্বদিকে প্রায় দু' ক্রোশ দূরে—

—আপনাকে আমরা কষ্ট দিলাম তো!

—কি আর কষ্ট?......আপনার কাজ শেষ হয়ে গেলে কাল আপনাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে মাসীমার বাড়ী গেলেই হবে—

পূর্ণিমা মুখে আঁচল দিয়ে ছেলেমানুষি হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলে হঠাৎ। বললে—কি আর কষ্ট? না? আমাদের কাজ শেষ হলে আমাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে—হি-হি-হি—

ওর হাসির অদ্ভুত ধরণের উচ্ছ্বাস ও সৌন্দর্য আমাকে বড় মুগ্ধ করলে, এমন হাসি কোন দিন আমি হাসতে দেখি নি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল এ অপ্রকৃতিস্থের হাসি। স্থিরমস্তিষ্ক মেয়ে হলে এ ধরনের হাসত না, অন্ততঃ এ জায়গায় ও এ অবস্থায়।

হঠাৎ ওর দাদা অন্ধকারের মধ্যে আমার গা টিপলে।

ব্যাপার কি? আমার ভয় হ'ল। মেয়েটি ভাল অবস্থায় আছে তো? আমি কোন কথা না বলে চুপ করে রইলাম। কি জানি মেয়েটির কেমন মেজাজ, কোন্ কথা তার মনে কি ভাবে সাড়া জাগাবে যখন জানি না তখন একদম কথা না বলাই নিরাপদ।

মনে মনে ভাবলাম, এমন সুন্দর মেয়ে কি খারাপ অদৃষ্ট নিয়েই এসেছিল পৃথিবীতে যে তার অমন সুন্দর প্রাণভরা হাসি, তাতে মনে আনন্দ না এনে আনে ভয়?

গাড়ীতে কিছুক্ষণ কেউ কথা বললে না—সবাই চুপচাপ। মাঠ ভেঙে গরুর গাড়ী আপনমনে চলেছে, বোধ হয় আমার একটু তন্দ্রাবেশ হয়ে থাকবে, হঠাৎ কেন যেন ঘুম ভেঙে গেল। গাড়ীর ছইয়ের মধ্যে অন্ধকার, আমার মনে হ'ল সেই অন্ধকারের মধ্যে তরুণী এবং তার দাদার মধ্যে যেন একটা হাতাহাতি ব্যাপার চলছে।

তরুণীর মুখের কণ্টকর 'আঃ' শব্দ আমার কানে যেতেই আমি পেছন ফিরে চাইলাম ওদের দিকে, কারণ আমি বসেছি ছইয়ের সামনে, আর ওরা বসেছে গাড়ীর পেছন দিক-টায়, সেদিকে বেশী অন্ধকার, কারণ ছইয়ের ও-দিকটা চাঁচের পর্দা আঁটা।

আমি কোন কথা বলবার পূর্বেই যুবকটি চাপা উদ্বেগের সুরে বললে—ধরুন, ওকে ধরুন, ও গাড়ী থেকে নেমে পড়তে চাইছে—

চাপা সুরে বলবার কারণ বোধ হয় গাড়ীর গাড়োয়ানের কানে কথাটা না যায়।

আমি হতভম্ব হয়ে মেয়েটির গায়ে কি করে হাত দেব ভাবছি, এমন সময় যুবকটি বেদনার্ত কণ্ঠে 'উহু-হু-হু' বলে উঠল। পরক্ষণেই বললে—কামড়ে দিয়েছে হাত—ধরবেন না, ধরবেন না—

ততক্ষণে গাড়োয়ান গাড়ী থামিয়ে ফেলেছে। আমাদের দিকে চেয়ে বললে—কি বাবু? কি হয়েছে?

গাড়োয়ানের কথার উত্তর দেবার সময় বা সুযোগ তখন আমার নেই। কারণ মেয়েটি আমায় ঠেলে বাইরের দিকে আসতে চাইছে অন্ধকারের মধ্যে।

ওর দাদা বললে—ওর চুল ধরুন—গায়ে হাত দেবেন না, কামড়ে দেবে—

কিন্তু আমি কোন কিছু বাধা দেবার পূর্বেই মেয়েটি আমাকে ঠেলে গরুর গাড়ীর সামনের দিকে গিয়ে পৌঁছল এবং গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে পড়ল।

হতভম্ব গাড়োয়ান গরুর কাঁধ থেকে জোয়াল নামাবার পূর্বেই আমি ও মেয়েটির দাদা দু-জনেই গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়লাম।

মাঠের মধ্যে অন্ধকার তত নিবিড় নয়, কিন্তু মেয়েটির কোন পাত্তা কোন দিকে দেখা গেল না।

আমার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে এবং বোধ হয় মেয়েটির দাদারও—

এই সময়ে কিন্তু আমাদের গাড়োয়ান যথেষ্ট সাহস ও উপস্থিত-বুদ্ধির পরিচয় দিলে। সে ততক্ষণে ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরেছে। তিরোল যারা যায়, তাদের মধ্যে কেউ না কেউ যে অপ্রকৃতিস্থ থাকবেই, এ তথ্য তাদের অজানা নয়, তবে আমাদের তিন-জনের মধ্যে কে সেই লোক, এটাই বোধ হয় সে এতক্ষণ ঠাওর করতে পারে নি।

গাড়োয়ান তাড়াতাড়ি বললে—বাবু শীগ্‌গির চলুন, কাছেই পাঁতিহালের খাল—সেদিকে উনি না যান, টিপকলের আলোটা জ্বালুন—

এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছি আমরা যে যুবকের পকেটে টর্চ রয়েছে, সে-কথা দুজনের কারও মনে নেই।

সবাই ছুটলাম গাড়োয়ানের পিছু পিছু। প্রায় দু-রসি আন্দাজ পথ ছুটে যাবার পরে একটা সরু খালের ধারে পৌঁছলাম, তার দু-পাড়ে নিবিড় কষার ঝাড়। তন্ন তন্ন করে ঝোপঝাড়ের আড়ালে খুঁজে, চিৎকার করে ডাকাডাকি করেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

সব ব্যাপারটা এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে গেল যে এতক্ষণে ভেবে দেখবারও অবকাশ পাওয়া যায় নি জিনিসটার গুরুত্ব কতটা বা এ থেকে কত কি ঘটতে পারে।

পূর্ণিমার দাদা প্রায় কাঁদ-কাঁদ সুরে বললে—আর কোন দিকে জলা আছে—হ্যাঁ গাড়োয়ান?

—না, বাবু, কাছেপিঠে আর জলা নেই তবে খালের ধারে আপনাদের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে থাকুন, আমরা বাকি দুজন অন্য দিকে যাই—

আমিই খালের ধারে রইলাম, কারণ যুবকটি একলা অন্ধকারে, যতদূর বুঝলাম, দাঁড়িয়ে থাকতে রাজি নয়।

ওরা তো চলে গেল অন্য দিকে। আমার মুশকিল এই যে সঙ্গে একটা দেশলাই পর্যন্ত নেই। এই কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাত্রের অন্ধকারে একা মাঠের মধ্যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কি জানি?

সেখানে কতক্ষণ ছিলাম জানি না, ঘণ্টাখানেক বোধ হয় হবে, তার বেশীও হয়ত। তারপর খালের ধার ছেড়ে মাঠের দিকে এগিয়ে গেলাম। এদের ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছি নে।

এমন সময় দূরে আলো দেখা গেল। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানের গলাটা শুনলাম—বাবু, বাবু—

আমার সাড়া পেয়ে ওরা আমার কাছে এল। গাড়োয়ানের সঙ্গে কয়েকটি গ্রাম্য লোক—ওদের হাতে একটা হারিকেন লণ্ঠন।

ব্যস্তভাবে বললাম—কি হ'ল? পাওয়া গিয়েছে?

যার হাতে লণ্ঠন ছিল, সে-লোকটা বললে—চলেন বাবু। সব রয়েছেন তেনারা আমার বাড়ীতে বসে। আমি বাবু গোয়ালঘরে গরুদের জাব কেটে দিতে ঢুকেছি সন্দের একটু পরেই—দেখি গোয়ালঘরের এক পাশে একটি পরমাসুন্দরী ইস্ত্রীলোক। তখন আমি তো চমকে উঠেছি বাবু, ইকি! তারপর বাড়ীর লোক এসে পড়ল। তারপর এনারা গিয়ে পড়লেন। তাঁদের আমরা বাড়ীতে বসিয়ে আপনার খোঁজে বেরুলাম। অন্ধকারের মধ্যে ভদ্দরলোকের ছেলের একি কষ্ট! চলুন গরীবের বাড়ী। দুটো ডাল-ভাত রান্না করে খান। দিদিঠাকরুণের মাথাটা ভাল যদি হ'ত একটু তো দিদিঠাকরুণ একেবারে লক্ষ্মীর পিরতিমে। আমাদের বাড়ীতে তাঁর পায়ের ধুলো পড়েছে—আপনারা সবাই ব্রাহ্মণ শোনলাম—কতকালের ভাগ্যি আমাদের। দুটো ভাত সেবা করে আজ রাতে শুয়ে থাকুন—কাল ভোরে আমি আমার গাড়ীতে তিরোল পৌঁছে দেব আপনাদের। অমন হয়।

গ্রামের মধ্যে লোকটার বাড়ী গিয়ে পৌঁছলাম।

বাড়ীটার কথা এখানে একটু ভাল ক'রে বর্ণনা করা দরকার। কারণ এর পরবর্তী

ঘটনার সঙ্গে এই বাড়ীর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এক-এক বার ভাবি সে-রাত্রে যদি সেখানে থাকবার প্রস্তাবে রাজি না হয়ে ওদের নিয়ে সোজাসুজি তিরোল চলে যেতুম!

আসলে নিয়তি। নিয়তি যাকে যেখানে টানে। তিরোল গেলেই কি নিয়তির হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যেত? ভুল।

বাড়ীটা ও-দেশের চলনমত মাটির দেওয়াল, বিচুলিতে ছাওয়া। বাইরে বেশ বড় একখানা বৈঠকখানা, তার দুই কামরা, মাটির দেওয়ালের ব্যবধান। সামনে খুব বড় মাটির দাওয়া, তার সামনে উঠান—উঠানের পশ্চিম ধারে ছোট একটা ঘাট-বাঁধানো পুকুর। বৈঠকখানার দুটো কামরার মধ্যে যেটা ছোট, সেটার পেছনের দোর খুলে কিন্তু বাইরের উঠানে আসা যায় না—সেটি অন্তঃপুরে যাতায়াতের পথ।

গৃহস্বামীর নাম রসিকলাল ধারা—জাতিতে কৈবর্ত। সুতরাং তাদের রাঁধা ভাত আমাদের চলবে না। রসিকলালের একান্ত অনুরোধে আমরা রান্না করতে রাজি হলাম। জিনিসপত্র, দুধ, শাকসব্জী ছ'জনের উপযোগী এসে পড়ল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রান্না করলে পূর্ণিমা। পূর্ণিমা আবার সেই আগেকার শান্ত, স্বাভাবিক মূর্তি ধরেছে। তার কথাবার্তা, রান্নার কৌশল, সহজ ব্যবহার দেখে কেউ বলতেও পারবে না কিছুক্ষণ আগে এ গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে পালিয়েছিল।

খেতে বসবার কিছু আগে পূর্ণিমা যেখানে রাঁধছে, সেখানে উঁকি মেরে দেখি গ্রামের অনেক মেয়ে ওকে দেখতে এসেছে, নানারকম কথাবার্তা জিগ্যেস করছে, বুঝলাম পূর্ণিমার কাহিনী গ্রামময় রটে গিয়েছে।

রাত এগারোটা প্রায় বাজে, পূর্ণিমা এসে আমাদের ডেকে নিয়ে গেল খেতে।

আমি বল্লাম—সকলের সঙ্গে আলাপ হল, পূর্ণিমা?

পূর্ণিমা সলজ্জ হেসে বললে—ওরা সব এসেছে কেন জানেন, নাকি আমায় সবাই দেখতে এসেছে। আমি বললাম, আমি ভাই আপনাদের মতই মেয়ে, দুখানা হাত, দুখানা পা, আমায় দেখবার কি আছে?

ওর দাদা বললে—আর কি কথা হ'ল?

—আর কিছু না। আমাদের বাড়ী কোথায়, আমার বয়স কত—এই জিগ্যেস করছিল। তার পর বেশ দিব্যি সহজভাবেই বললে—আর বলছিল তোমার বিয়ে হয় নি? আমি বললাম, এ-বছর আমার বিয়ে দেবেন বলেছেন বাবা!

বলেই সে আমাদের পাতে ডাল না কি পরিবেশন করতে আরম্ভ করলে।

আমি তো অবাক, ওর দাদার দিকে চাইতে সে বেচারী আমায় চোখ টিপলে। পাগল হোক, উন্মাদ হোক, মেয়েদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যাবে কোথায়? বড় কষ্ট হ'ল ভেবে, অভাগীর ও-সাধ এ জীবনে পূর্ণ হবার নয়।

কিন্তু এ ধরনের দু-একটা বেফাঁস কথা ছাড়া পূর্ণিমার অন্য সব কথাবার্তা এমন স্বাভাবিক যে, কেউ তার মধ্যে এতটুকু খুঁত ধরতে পারবে না। ওর গলার সুরটা ভারি মিষ্টি—খুব কম মেয়ের গলায় এমন মিষ্টি সুর শুনেছি। এমন একটি সুন্দর চালচলন, নিজের দেহটা বহন করে নিয়ে বেড়ানোর সুশ্রী ধরন আছে ওর যে ওকে নিতান্ত সাধারণ শ্রেণীর মেয়ে বলে কেউ ভাবতে পারবে না।

আমায় বললে—আপনাকে আমরা তো বড় কষ্ট দিলুম। আমাদের সয়লাডিতে যাবেন কিন্তু একবার দাদা—

—বেশ, যাব বইকি দিদি, নিশ্চয়ই যাব—

—এই পুজোর সময়েই যাবেন। আমাদের ওখানে দুখানা পুজো হয়, একখানা কলিয়ারীর বাবুরা করে আর একখানা বাজারে হয়। শখের থিয়েটার হয়—

ওর দাদা এই সময় বললে—আর একটা জিনিস দেখবেন—সাঁওতালের নাচ সে একটা

দেখবার জিনিস, আসুন পুজোর সময়—ভারী খুশী হব আমরা আপনি এলে।

পূর্ণিমা উৎসাহের সঙ্গে বললে—তাহলে কথা রইল কিন্তু দাদা। বোনের নেমন্তন্ন রাখতেই হবে আপনার—

এই সময় গৃহস্বামীর মেয়ে দুধ নিয়ে এসে পূর্ণিমাকে বললে—আমাদের সকলকে দুধ দিতে।

পূর্ণিমা বললে—তা হলে একখানা দুধের হাতা নিয়ে এস খুকী—ডালের হাতায় তো দুধ দেওয়া যাবে না।

পূর্ণিমার এই সমস্ত কথাবার্তার খুঁটিনাটি আমার খুব মনে আছে, কারণ পরে এই কথাগুলি মনে মনে আলোচনা করবার যথেষ্ট কারণ ঘটেছিল।

আহারাদির প্রায় আধঘণ্টা পর আমরা সবাই শুয়ে পড়লুম—পূর্ণিমা তার দাদার সঙ্গে বাইরের ঘরের ছোট কামরাটায় এবং আমি বড় কামরাটায়।

এবার আমি নিজের কথা বলি। শরীর ও মন বড় ক্লান্ত ছিল—অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু কতক্ষণ পরে জানি নে এবং কেন তাও জানি নে, হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমার বুকে যেন পাথরের ভারি বোঝা চাপিয়েছে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে যেন কষ্ট হচ্ছে। ভাবলুম, নিশ্চয়ই নদীর হাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছে কিংবা ওই রকম কিছু। অমন হয়। আবার ঘুমোবার চেষ্টা করি, এমন সময় আমার মনে হ'ল পাশের কামরায় কি রকম একটা কৌতূহলজনক শব্দ হচ্ছে। হয়তো পূর্ণিমার দাদার নাক ডাকার শব্দ। অদ্ভুত রকমের নাক ডাকা বটে—যেন গোঙানি বা কাৎরানির শব্দের মত। একটু পরেই আর শব্দ শুনতে পেলুম না—আমিও পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমার ঘুম ভাঙল খুব ভোরে।

পাশের কামরার দোর তখনও বন্ধ। আমি উঠে হাতমুখ ধুয়ে মাঠের দিকে বেড়াতে গেলুম। আধ ঘণ্টা বেড়ানোর পরে ফিরে এসে দেখি তখনও ওরা কেউ ওঠে নি—এমন কি বাড়ীর লোকও না! আরও আধঘণ্টা পরে গৃহস্বামী রসিক ধাড়া উঠে বাইরের ঘরের দাওয়ায় এসে বসল। আমায় বললে—ঘুমুলেন কেমন বাবু? মশা কামড়ায় নি? এঁরা এখনও ঘুমুচ্ছেন বুঝি?

রসিকের সঙ্গে কিছুক্ষণ চাষবাসের গল্প করলাম। তার পরে সে উঠে কোথাও বেরিয়ে গেল।

এদিকে প্রায় আটটা বাজল। তখনও পূর্ণিমা বা তার দাদার ঘুম ভাঙে নি। সাড়ে আটটার সময় রসিক ফিরে এল। গ্রীষ্মকাল, সাড়ে আটটা দস্তুরমত বেলা, খুব রোদ উঠে গিয়েছে চারিধারে। রসিক আবার জিজ্ঞেস করলে—এঁরা এখনও ওঠেন নি? আমি বললাম—কই না, ওঠে নি তো! গরমে সারারাতে ঘুম হয় নি বোধ হয়, ভোরের দিকে ঘুমিয়েছে আর কি।

আমার কাহিনী শেষ হয়ে এসেছে। বেলা ন-টার সময়ও যখন ওদের সাড়া-শব্দ শোনা গেল না তখন আমি দরজায় ঘা দিলাম। ঘরের মধ্যে মানুষ আছে বলেই মনে হলো না। তখন বাধ্য হয়ে আমি পশ্চিম দিকের ছোট জানালাটা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে গেলাম—ঘরের মধ্যে একটি মেয়ে নিদ্রিতা, এ অবস্থায় জানালা দিয়ে চেয়ে দেখতে দ্বিধা বোধ করছিলাম কিন্তু একবার দেখাটা দরকার। ব্যাপার কি ওদের?

জানালা দিয়ে যা দেখলাম তাতে আমি চীৎকার করে উঠেছিলাম বোধ হয়, ঠিক বলতে পারি নে। কারণ আমারও কিছুক্ষণের জন্যে বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল, কি যে ঘটেছে, কি না ঘটেছে আমার খেয়াল ছিল না।

প্রথমেই আমার চোখে পড়ল—ঘরে এত রক্ত কেন? চোখে ভুল দেখলাম নাকি? কিন্তু পরমুহূর্তেই আর সন্দেহের অবকাশ রইল না। ঘরে একখানা চৌকি পাতা, পূর্ণিমার

দাদা চৌকির উপরকার বিছানায় উপুড় হয়ে কেমন এক অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে শুয়ে, বিছানা রক্তে ভাসছে, মেঝেতে রক্ত গড়িয়ে পড়ে মেঝে ভাসছে—আর পূর্ণিমা দেওয়ালের ধারে মেঝের ওপর পড়ে আছে, জীবিতা কি মৃতা বুঝতে পারলাম না। একটা পাশবালিশ চৌকির ওপর থেকে যেন ছিটকে পূর্ণিমার দেহের কাছে পড়ে, সেটাও রক্তমাখা।

আমার চীৎকার অনেক দূর থেকে শোনা গিয়েছিল নাকি। লোকজন চারিধার থেকে এসে পড়ল। আমার জ্ঞান ছিল না, মাথায় জলটল দিয়ে আমায় সকলে চাঙ্গা করে দশ-পনেরো মিনিট পরে।

এদিকে দরজা ভেঙ্গে সকলে ঘরে ঢুকল। তারা দেখলে পূর্ণিমার দাদার গলায়, কাঁধে ও হাতে সাংঘাতিক কোপের দাগ, আগের রাত্রে কুটনো কোটার জন্যে একখানা বড় বঁটি গৃহস্থেরা দিয়েছিল—সেখানা রক্তমাখা অবস্থায় বিছানার ওপাশে পড়ে, পূর্ণিমার শাড়ী ব্লাউজে কিন্তু খুব বেশী রক্ত নেই, কেবল শাড়ীর সামনের দিকটাতে যেন ছিটকে লাগা রক্ত খানিকটা। হতভাগিনী রাত্রে কোন সময় এই বীভৎস কান্ড ঘটিয়েছে, নিজের হাতে ভাইকে খুন করে ঘরের মেঝেতে অঘোরে নিদ্রায় অভিভূতা। দিব্যি শান্ত, নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমুচ্ছে, আমার যখন জ্ঞান হয়ে ঘরে ঢুকেছি তখনও। ঘুমন্ত অবস্থায় ওকে দেখাচ্ছে কি সুন্দর, আরও ছেলেমানুষ, নিষ্পাপ সরলা বালিকার মত।

নারীর প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসমূর্তি সেই ভয়ানক প্রভাতে এক মুহূর্তে আমার চোখের সামনে যেন ফুটে উঠলো—পলকে যে প্রলয় ঘটায়, এক হাতে দেয় প্রেম, অন্য হাতে আনে মৃত্যু, এক হাতে যার খড়্গ, অন্য হাতে বরাভয়।

অতঃপর যা ঘটবার তাই ঘটল। পাড়ার লোক, গ্রামের লোক ভেঙে পড়ল। পুলিশ এল—আমি মেয়েটির অবস্থা সম্বন্ধে যা জানি খুলে বললাম। তাদের জেরার প্রশ্নোত্তর দিতে দিতে আমার মনে হ'ল হয়তো বা আমিই পূর্ণিমার দাদাকে খুন করে থাকব। ঘুমন্ত মেয়েটির পাশ থেকে ওর দাদার মৃতদেহ সরানোর ব্যবস্থা আমিই করে দিলাম—মৃতের সকল চিহ্ন, রক্তাক্ত বস্ত্র, বঁটি, বিছানা। উন্মত্ততায় ঘুম সহজে ভাঙে নি তাই রক্ষে—দুপুর পর্যন্ত পূর্ণিমা নিরুদ্বেগে ঘুমুল। পুলিশকেও কষ্ট করে ওর ঘুম ভাঙাতে হলো।

আমি ওর পাশে দাঁড়ালুম এই ঘোর অন্ধকার রাত্রে। অসহায় উন্মাদিনীর আর কে ছিল সেখানে? যদিও ওর অবস্থা দেখে চোখের জল ফেলে নি এমন লোক সে-অঞ্চলে ছিল না, কি মেয়ে কি পুরুষ—এমন কি থানার মুসলমান দারোগাবাবু পর্যন্ত।...

সয়লাডি কলিয়ারীতে টেলিগ্রাম করা হলো। ওর বাবা এলেন, তাঁর সঙ্গে এলেন তাঁর তিনটি বন্ধু। ওঁদের মুখে প্রথম শুনলুম, পূর্ণিমা বিবাহিতা। পাগল বলে স্বামী নেয় না—সে কখনও জানে সে বিবাহিতা, কখনও আবার ভুলে যায়। পূর্ণিমার মা নেই তাও এই প্রথম শুনলাম।

ভদ্রবংশের ব্যাপার, এ নিয়ে খুব গোলমাল যাতে না হয়, শুরু থেকেই তার ব্যবস্থা করা হলো। খবরের কাগজে ঘটনাটি উঠেছিল—কিন্তু একটু অন্যভাবে। কয়েকটি প্রভাবশালী লোকের সহানুভূতি লাভ করার দরুণ ব্যাপারের জটিলতার হাত থেকে আমরা অপেক্ষাকৃত সহজে রেহাই পেলাম।

পূর্ণিমাকে রাঁচি উন্মাদ আশ্রমে দেওয়ার ব্যবস্থা হলো। ওর বাবাও দেখলুম ওকে আর বাড়ী নিয়ে যেতে রাজি নন। শ্রীরামপুর কোর্টের প্রাঙ্গণ থেকে ওকে মোটরে সোজা আনা হলো হাওড়া। হাওড়া থেকে রাঁচি এক্সপ্রেসে যখন ওঠানো হচ্ছে—তখন একগাল হেসে ও আমার দিকে চেয়ে বললে—আমাদের সয়লাডিতে আসবেন কিন্তু একদিন। মনে থাকবে তো?

ওর বাবাকে বললে—দাদা কোথায় বাবা? দাদাকে দেখছি নে। দাদার কাছে কানের

দুল দুটো খোলা রয়েছে, কান বড্ড ন্যাড়া-ন্যাড়া দেখাচ্ছে—

এ-সব কয়েক বছর আগের কথা। অনেকেই বুঝতে পারবেন আমি কোন্ ঘটনার কথা বলছি। মানুষ চলে যায়, স্মৃতি থাকে। জীবনের উপর কত চিতার ছাই ছড়ানো, সেই ছাইয়ের সূক্ষ্ম স্তরে বহু প্রিয়-পরিচিত জনের পদচিহ্ন আঁকা।

এই শ্যামলা পৃথিবী, রৌদ্রালোক, পরিবর্তনশীল ঋতুচক্রের আনন্দ থেকে নির্বাসিতা সে হতভাগিনীর কথা মাঝে মাঝে যখন মনে পড়ে তখন ভাবি সে নেই, এত দিনে সুদূর রাঁচির উন্মাদ আশ্রমে তার অভিশপ্ত জীবনের অবসান হয়ে গেছে—ভগবান আর ওকে কতকাল কষ্ট দেবেন?

বলা বাহুল্য, এই কাহিনীর মধ্যে আমি সব কাল্পনিক নাম-ধাম ব্যবহার করেছি, কারণ সহজেই অনুমেয়।

প্রাবল্য

কথাটি শুনিয়া মন খারাপ হইয়া গেল। পাশের ঘরের বধূটির মেয়ের নাকি ভারী অসুখ। দিন দশ ধরিয়া লক্ষ্য করিতেছিলাম, তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি দুর্ভাবনার ছায়া-পাতে ম্লান হইয়াছে। তাহার অনর্গল কলকণ্ঠ ক্ষান্ত হইয়াছে। সে প্রভাত হইতে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত আমার স্ত্রীর সহিত কত অসংখ্য গল্প করিত—হাসিয়া হাসিয়া খুন হইত। আজ দীর্ঘ পাঁচ বৎসর যাবৎ তাহাদের সহিত তাল রাখিয়া আমাদের নিঃসন্তান সংসার-জীবন বহিয়া যাইতেছিল।

রমার বয়স বেশী নয়, বড়জোর বছর একুশ হইবে। কিন্তু এই অল্প বয়সেই সে রীতিমত পাকা গৃহিণী হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কথায় এবং কর্মে সর্বত্র সেই আভাস পাওয়া যায়। রবিবার দাড়ি কামাইলে নাকি শরীরের বৃদ্ধি কমিয়া যায়, বৃহস্পতিবারে আমিষ ভক্ষণ করিলে কোন্ এক দুষ্ট দেবতার কোপে পড়িতে হয় ইত্যাদি অগণিত বিধিনিষেধের বেড়াজালে নিজেকে বন্ধ করিয়া অতি সন্তর্পণে সে দিন গুনিয়া যাইতেছিল। তিন প্রাণীর সমবায়ে তাহার ক্ষুদ্র সংসার গড়িয়া উঠিয়াছিল। সে...তাহার কর্মব্যস্ত স্বামী ...ও স্বর্গের পরীর মত ছোট্ট একটি ফুটফুটে মেয়ে। এখনও তাহার ঠিকমত কথা ফুটে নাই। বয়স অতি অল্প বলিয়া টলিয়া টলিয়া চলিতে থাকে। কারণে অকারণে রাঙা ঠোঁট দুখানি কাঁপাইয়া হাসিয়া ওঠে। তাহার নামকরণ করিয়াছে ‘কমলা’, কিন্তু সচরাচর ডাকে ‘কমলি’ বলিয়া।

আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সে কমলাকে বড় ভালবাসে। অষ্টপ্রহর তাহাকে কাছে কাছে রাখিয়া দেয়। তাহাকে খাওয়ানো, স্নান করানো সমস্ত খুঁটিনাটি ভার আমার স্ত্রী স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে। সারাদিন সে আমাদের ঘরেই থাকে। রাত্রে তাহার মা আসিয়া ডাকে, কমলি কোথায় দিদি?

স্ত্রী কহিল, ঘুমুচ্ছে ভাই।

রমা বলিল, রাতেও রেখে দেবে নাকি?

স্ত্রী কহিল, থাকতো যদি তো রাখতুম ; কিন্তু ভাই, রাতদুপুরে মার জন্যে যদি কাঁদে!

রমা কহিল, অত আস্কারা দিও না দিদি।

স্ত্রী কহিল, আস্কারা নয় ভাই, আস্কারা নয়। তুমি ছেলেমানুষ, ছেলে মানুষ করার কি জান?

রমা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, কি মিথ্যুক গো তুমি! ছেলে মানুষ করার

সব কিছু তোমার জানা আছে বুঝি? না জানি পেটের পাঁচটা হলে কি দেমাকই না হত।

স্ত্রীর মুখ মুহূর্তের জন্য পাংশু হইল। তাহার বক্ষ দলিয়া পিষিয়া একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস বাহির হইল। রহস্যের ছলে কথাটি মুখ দিয়া বাহির হইয়া আর একজনকে যে এরূপভাবে আঘাত করিতে পারে, রমা হয়ত তাহা জানিত না। ঐ শব্দগুলি জোড়া দিয়া একটি যে বিশ্রী শ্রুতিকটু বাক্যের সৃষ্টি হইতে পারে তাহা রমার অবিদিত ছিল। সে অপ্রস্তুতে পড়িল। আমার স্ত্রীর হাতদুখানি চাপিয়া ধরিয়া করুণ সুরে মিনতি করিল, রাগ করলে দিদি? আমি না বুঝে একটা কথা বলে ফেলেছি।

রমার কাতর মুখ দেখিয়া স্ত্রীর পাষাণ-হৃদয় দ্রব হইল। সে ঠোঁটের ফাঁকে হাসি আনিয়া কহিল, ওমা! কি এমন মন্দ কথা বলেছ ভাই? ও আমার বরাত। তবে কি জান, মেয়েটা আমায় একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে!

রমা কহিল, ওর মা যে কে তাই ও ভাল করে বুঝতে পারে না। আর জন্মে তুমি ওর মা ছিলে নিশ্চয়।

স্ত্রী কহিল, মাইরি বলছি, বিচ্ছেদ যদি আমাদের মধ্যে কখনও হয় তো তোমার আমার সঙ্গেই হবে। কমলি যেন তার মধ্যে জড়িয়ে না পড়ে। ও যেখানে খুশী থাকবে।

রমা হাসিতে লাগিল, বলিল, এখন থেকে অত ভাবনা নেই তোমার দিদি। দেখে নিও, ও ঠিক তোমার কাছেই থাকবে।

স্ত্রী কহিল, ওকে দুদণ্ড না দেখতে পেলে আমার বুকের ভেতরটা কেমন কেমন করে।

আশ্চর্য হইয়া গেলাম। আমার স্ত্রী কিসের জোরে কমলিকে এমন নিবিড়ভাবে ভালবাসিয়া ফেলিল। কেমন করিয়া দিনে দিনে পলে পলে তাহার ঊষর বাৎসল্যবর্জিত জীবনমরুতে স্নেহপ্রেমের বিরাট মহীরুহ সৃষ্ট হইল? কেমন করিয়া তাহার নিষ্ফল হৃদয় নিঃস্বার্থভাবে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া একজন অচেনাকে দুহাত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিল! সত্য কথা বলিতে কি, আমার স্ত্রী কমলিকে তাহার জননীর চেয়ে বেশী ভাল-বাসিত বলিয়া বোধ হইত।

একদিন স্ত্রী কমলিকে কোলে শোয়াইয়া দুধ খাওয়াতেছিল। তাহার মুখের মধ্যে ঝিনুক পুরিয়া কহিল, তুই দিন দিন ভারী দুষ্টু হচ্ছিস বাপু। বসে দুধ খেতে শিখবি কবে?

আমি কহিলাম, শ্বশুরবাড়ী গিয়ে।

স্ত্রী আমার প্রতি একটি বিলোল কটাক্ষ হানিয়া কহিল, তুমি থাম দিকিন। দেখছিস তো কমলি, তোর জন্য লোকের পাঁচশো কথা শুনতে হয়। দাও দিকি গামছাটা, মুখ হাত পা মুছিয়ে দেব।

গামছা দিয়া কহিলাম, অতটা ভাল নয় সরো।

সরো অর্থাৎ সরোজিনী, আমার স্ত্রী। কহিল, মানে?

মরীয়া হইয়া বলিলাম, যাই হোক, পর ভিন্ন তো আর কিছু নয়।

আমার মুখ দিয়া আর কথা সরিল না, তাহার অবকাশও পাইলাম না। স্ত্রী তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করিল, তোমার ঐ এক সৃষ্টিছাড়া কথা! দেখ, ও অলক্ষুণে কথা আমায় কখনও বলো না। আমার কমলি-মাকে তুমি পর ভাবতে পার, কিন্তু আমি পারি না। মরে গেলেও পারব না। কমলি, তুই আমায় পর ভাবিস?

কমলি নেহাৎ ছেলেমানুষ। সংসারের এই সব তীক্ষ্ম বাক্যের অর্থ জানিত না। সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া কহিল, ধ্যেৎ!

সুতরাং আমার একটিও কথা কথা বলিবার রহিল না।

কমলাকে মধ্যস্থ করিয়া আমাদের দাম্পত্যজীবনে মাঝে মাঝে কলহ হইত। আজ তাহার খেলনা চাই—কাল তাহার পোষাক চাই—তার পরদিন জরির জুতো চাই। এই

অসংখ্য অভাব অভিযোগ পূরণ করিতে করিতে আমি অস্থির হইয়া উঠিতাম। আমি মানুষ—অমন নিঃস্বার্থভাবে জানিয়া শুনিয়া পরের জন্য এতটা ত্যাগ স্বীকার করিতে রাজী নই। স্ত্রী কহিত, তোমার হাত দিয়ে যদি জল গলে!

আমি কহিলাম, যেন জন্মে জন্মে না গলে।

স্ত্রী কহিল, ছিঃ, ছিঃ! লোকে বলবে কি?

কহিলাম, জান, বেচারা কাক কোকিলের ডিমে তা দেয়!

আসলে আমি কমলিকে আদৌ সুনজরে দেখিতাম না।

এহেন কমলির নাকি অসুখ—অসুখ নাকি সহজ নয়, কারণ ডাক্তার পর্যন্ত মুখ ঘুরাইয়া গিয়াছে। তাহাকে নাকি আরও আগে দেখানো উচিত ছিল। আমি আশ্চর্য হইয়া কহিলাম, বল কি? আগে তো শুনি নি!

বিশুষ্ক মুখে স্ত্রী কহিল, মা আবাগী কি বলেছে সে কথা?

আমি কহিলাম, বড়ই দুঃসংবাদ।

স্ত্রী যুক্তহস্ত ললাটে ঠেকাইয়া কহিল, মা মঙ্গলচণ্ডী! তুমি আমার বাছাকে ভাল করে দাও মা!

ব্যস্তভাবে বাজারের থলি খুঁজিতে খুঁজিতে কহিলাম, বাজার থেকে আজ কি আসবে বল তো?

স্ত্রী কহিল, আজ আর বাজারে গিয়ে কাজ নেই। তুমি বরং দুটো চিঁড়ে-মুড়কি খেয়ে আজ আপিস যাও।

কহিলাম, আর তুমি?

স্ত্রী কহিল, আমার কথা আমি ভাবব।

অগত্যা ফলার খাইয়া সেদিন যথাসময়ে আপিসে হাজির হইলাম। যাহা হউক, সেখানে তো আর স্নেহমমতার বালাই নাই—সেখানে স্ত্রীর ন্যায় আব্দার খাটিবে না। আত্মীয়স্বজনহীন, শূন্য প্রাণহীন, কর্মমুখর আপিস।

কমলির অসুখ আঁকাবাঁকা পথে মোড় ঘুরিতে ঘুরিতে আগাইয়া চলিল। আমার স্ত্রীর মন সংসারে আর বসিল না কিছুতেই। ভাত গলে না কিংবা গলিয়া যায় অত্যন্ত; তরকারিতে ঝাল বেশী হয় কিংবা ঝালই হয় না; হয়ত নুন বেশী হয় কিংবা আদৌ হয় না। স্ত্রীর তো ঠিকমত খাওয়াই হয় না। প্রাণধারণের জন্য ঐ যা দুবেলা দুটো দাঁতে কাটা। রাত্রি-দিন সে অক্লান্তভাবে কমলির সেবা করিতে লাগিল। আমি একদিন কহিলাম, শেষকালে তুমিও কি পড়বে!

স্ত্রী উদাস কণ্ঠে কহিল, জানি না।

বলিলাম, জানি না নয়। অমনি করে মিছিমিছি নিজের বিপদ ডেকে এনো না।

স্ত্রী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, কি পাষাণ গো তুমি!

সুতরাং সেইখানেই সে প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল।

সেদিন রবিবার।

বিকালবেলা স্ত্রী কহিল, আমি উনুনে আগুন দিচ্ছি। কোথাও যেও না যেন। সকাল সকাল আজ খেয়ে নাও।

প্রশ্ন করিলাম, কেন?

স্ত্রীর গণ্ড বাহিয়া মুক্তার ন্যায় অশ্রুকণা ঝরিতে লাগিল, ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে সে কহিল, কি জানি, আজ যেন মেয়েটাকে ভাল বুঝছি না। সত্যি আমার হাত পা অবশ হয়ে গেছে। কোন কাজ আর ভাল লাগছে না।

সন্ধ্যার পরই খাইতে বসিলাম। অর্ধেক খাওয়া হইয়াছে, এমন সময়ে পাশের ঘরে

রমা চীৎকার করিয়া উঠিল, ওরে কমলারে, তুই কোথায় গেলি রে?

সেই বিচ্ছেদবেদনাবিধুর ক্রন্দন-শব্দে আকাশ বাতাস রী-রী করিয়া উঠিল। স্ত্রী কাঁদিয়া উঠিল, তাহার হাত হইতে ভাতের থালা পড়িয়া গেল। সে জড়িত-কণ্ঠে কহিল, পাতের গোড়ায় একটু জল দাও।

আমি স্ত্রীর কথা পালন করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। স্ত্রী কহিল, ওকি, খেলে না যে বড়?

বলিলাম, পাষাণ গলে গেছে।

স্ত্রী নিঃশব্দে গৃহত্যাগ করিল। পরক্ষণেই মিলিত কণ্ঠে দুইজনে ঘোর রবে দিকে দিকে মৃত্যুর বার্তা পেঁৗছাইয়া দিল। রমার স্বামী সমস্ত পুরুষত্ব খোয়াইয়া ঘরের কোণে বসিয়া বার বার ডুকরাইয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। আমি হেন নিষ্ঠুর ব্যক্তিরও চক্ষু যেন ছলছল করিয়া উঠিল। কমলি এ মরজগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। সহস্র ব্যাকুল আহ্বানেও সে ফিরিয়া আসিবে না। এ কথা স্মরণ করিতে কোথা হইতে এক অনির্দেশ্য উদ্বেল বায়ু কুণ্ডলী পাকাইয়া পাকাইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রের পথ বহিয়া আসিয়া মধ্যপথ হইতে কেন জানি ফিরিয়া গেল। আমার বুক কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখিলাম—কখন আটটা বাজিয়া গিয়াছে। ভাবিলাম, সমস্ত কর্তব্যভার আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। আমি না করিলে কমলির সৎকারের কোন সম্ভাবনা নাই। কমলির বাপের নিকট গিয়া বলিলাম, রবীনবাবু, আপনি একটু স্থির হোন।

স্থির হওয়া তো দূরের কথা, রবীনবাবু বালকের ন্যায় আমায় জড়াইয়া ধরিয়া আকুল হইয়া উঠিল, কি হবে দাদা!

প্রবোধ দিলাম, আঃ! আপনার এত বিচলিত হলে চলবে কেন? আপনি পুরুষ-মানুষ। জানেন তো ভগবান বলেছেন, 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ।'

কথাটা নিজের কানেই যেন বিঁধিতে লাগিল। আমার কথায় কোন কাজ হইল না। রবীনবাবু বিন্দুমাত্র তাহাতে কর্ণপাত করিল না।

সুতরাং আমি লোক-সংগ্রহের জন্য বাহির হইলাম। নয়টার সময় ফিরিয়া সেই এক-টানা ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। সেই সুর করিয়া করিয়া পরপারবর্তী বধির যাত্রীর নিকট অসংখ্য অভিযোগ। দেখিলাম, ইহার মধ্যেই আমার স্ত্রীর গলা ভাঙিয়া গিয়াছে। সে মেঝের উপর লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতেছে, ওরে কমলিরে, পর বলে কি এমনি করে ফাঁকি দিতে হয় রে?

আর রমা? তাহাকে দেখিয়া অবাক হইলাম। সে কমলির বুকের উপর পড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে—তাহার কণ্ঠস্বর বিকৃতপ্রায় হইয়াছে—তাহার চক্ষু দুটি ফুলিয়া রাঙা হইয়া গিয়াছে—পিঠের উপর জমকালো চুলগুলি লুটাইয়া পড়িয়াছে।

স্ত্রী কহিল, বাছার একখানা ফটো তুলে রাখ গো। তা না হলে আমি কখনো বাঁচব না।

সুতরাং একখানি ফটো তোলা হইল। সেই নিমীলিত চক্ষু, বিবর্ণ মুখের বীভৎস ছবি। সঙ্গীদের মধ্যে একজন বলিল, ঐটুকু মেয়ের আবার ফটো তোলা কেন?

স্ত্রী মেঝের উপর মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে সুর সপ্তমে চড়াইয়া কাঁদিল, ওরে কমলি রে, তুই কেন অভিমান করে চলে গেলি রে?

কঠিন মেঝের আঘাতে কোমল কপাল ফুলিয়া উঠিল। তাহার সেই অশ্রান্ত ক্রন্দন, সেই আর্তনাদ যেন মর্ত্যভূমি ত্যাগ করিয়া অন্তহীন ইথার-সমুদ্র বাহিয়া স্বর্গের রুদ্ধ-দ্বারে আঘাত করিয়া ইহজগতে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। আমরা নিষ্ঠুরের ন্যায় নিজেদের কর্তব্য পালন করিতে লাগিলাম। রমার বুক হইতে তাহার প্রাণের পুত্তলীকে দুর্জয় বিক্রমে ছিনাইয়া লইলাম। নিশ্চেতন রমার শরীর স্পন্দিত হইল। সে কাতরে

ভাগন রাঙা চোখদুটি তুলিয়া মিনতি করিল, না—না—না। আমি যেতে দেব না।

মুহূর্তের জন্য আমার হাত অবশ হইল, সমস্ত কর্মশক্তি শিথিল হইল। ভবতারণ কহিল, সব মাটি করে ফেলছ খুড়ো। পুরুষমানুষের অত কোমল হলে চলে না। সরো দিকিন।

রমা 'মাগো' বলিয়া মেঝের উপর আছড়াইয়া পড়িল। আমার স্ত্রী ছুটিয়া আসিয়া আমাদের পা আঁকড়াইয়া ধরিল, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ সোনামানিককে আমার? আমি প্রাণ থাকতে যেতে দেব না। তার আগে আমার মরণ হোক গে।

তাহার কথায় কর্ণপাত করিলাম না। অবকাশও আর ছিল না।

সকলে একবাক্যে স্বীকার করিল। হাঁ, মার চেয়ে মেয়েটাকে বেশী ভালবাসত সরোজিনী —আমার সহধর্মিণী। আঘাতটা নাকি তাহাকেই বেশী করিয়া হানা দিয়াছে।

সাত দিন সাত রাত্রি ধরিয়া সরোজিনী একটানা সুরে শোক করিয়া চলিল। মুখে তাহার খাদ্য রুচিল না...রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হইল...মধ্যাহ্নে সাংসারিক কর্মে অবহেলা করিয়া মাঝে মাঝে চীৎকার করিতে লাগিল। সেই ফটোখানি বুকে চাপিয়া কমলিকে কতরূপে কত ছলে এই ধরাতলে পুনরায় ফিরিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। তাহার ক্লান্তিহীন শোকের গভীরতা দেখিয়া আমারই ভাবনা হইল। একদিন বলিলাম, সরো, তুমি একটা কথা শোন।

সে অশ্রুসজল চোখ দুটি তুলিয়া বলিল, কি?

বলিলাম, নিজেকে তোমায় বাঁচতে হবে। বল, এমনি করে খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করলে কি কমলি ফিরে আসবে? না আসতে পারে?

সরোজিনী অসহায়ের মত হতাশ সুরে বিষণ্ণভাবে বলিল, সত্যি আর সে আসবে না?

বলিলাম, পাগল! কখনো কি কেউ এসেছে? তুমি জেনেশুনে এমন ছেলেমানুষের মত কাজ কর। লক্ষ্মীটি আমার কথা শোন, দুটি খেয়ে নাও, কথার অবাধ্য হয়ো না।

কত সাধ্য-সাধনা করিলাম। আশপাশের কয়েকজন প্রতিবেশী আসিয়া অজস্র সান্ত্বনা দিতে লাগিল। তখন স্ত্রী বহুকষ্টে জীবনধারণের জন্যই যা দুটি অন্ন মুখে দিল। সরোজিনীর শোকাতিশয্যে সকলেই রমার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কমলির বিচ্ছেদ-বেদনায় তাহার যে বত্রিশ নাড়ী মোচড়াইয়া অসংখ্য ক্ষতের সৃষ্টি করিতে পারে, যাহা কোনরূপ প্রলেপেই আরোগ্য হইতে পারে না—তাহা ভাবিবার আমাদের ফুরসৎ ছিল না।

এই ঘটনার মাস দেড়েক পর একদিন আপিস হইতে ফিরিয়া আমি স্ত্রীর পানে চাহিয়া অবাক হইয়া গেলাম। তাহার মুখ দুর্ভাবনায় শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে। হাত-মুখ ধুইয়া বসিতেই বলিল, একটা কথা বলি শোন। হেসে উড়িয়ে দিও না।

বলিলাম, কি কথা শুনি?

সরোজিনী অবিচলিত কণ্ঠে কহিল, আর একটা বাড়ী দেখ, এ বাড়ীতে আর এক-দণ্ডও থাকতে পারব না, মাইরি বলছি।

কথাটি আমার হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিল। বাড়ী-বদল সহজ ব্যাপার নয় কোন মতেই। পাঁচ বৎসর নির্বিঘ্নে অনড় অবস্থায় এইখানে রমাদের সন্নিকটে দুটি পরিবারের স্নেহবন্ধনে দিনযাপন করিতেছিলাম। আজ অকস্মাৎ সেই সুগঠিত পরিপাটী নীড় ভাঙিবার আদেশ হইল। দুর্বাসার অভিশাপ বোধ হয় এ আদেশের সহিত তুলনীয় হয় না! বিচলিত চিত্তে কহিলাম, অপরাধ?

স্ত্রী তখন বিশদভাবে অপরাধ ব্যাখ্যা করিল। সে এক অভিনব অপরাধ। কেন জানি না, রমা কমলির ব্যবহৃত বিছানাগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। সেই বিছানার উপর শুইয়া কমলি নাকি নিশ্চিন্ত আরামে দেহত্যাগ করিয়াছিল। সরোজিনী তাহা স্বচক্ষে

দেখিয়াছে। এমন কি ফটোতে পর্যন্ত তাহার ছবি উঠিয়াছে। রমা সেই বিছানাগুলি প্রতিদিন নাড়িয়া-চাড়িয়া কারণে অকারণে কাঁদিতে থাকে। সেগুলিকে সযত্নে পবিত্রভাবে বাক্সের মধ্যে তুলিয়া রাখিয়াছে। স্ত্রী কহিল, সত্যি বাপু, ও আমি কখনও সহ্য করতে পারব না। ছিষ্টি রি-রি কচ্ছে। একটু বাছ-বিচার নেই। আমার ঠাকুর দুয়েছে, দেবতা রয়েছে। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আজই তুমি বাড়ী ঠিক করে এস।

কথাটি শুনিতে বা বলিতে খুব সহজ। কহিলাম, রমারা কি মনে করবে সরো?

সরোজিনী বলিল, তাই বলে তো আমি ইহপরকাল খোয়াতে পারি না। জেনেশুনে পাপ করি কি করে বল।

বলিলাম, কমলিকে তুমি না রমার চেয়ে বেশী ভালবাস? আড়াই টাকা দিয়ে তো ফটো তুললে!

সরোজিনী কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, ওগো দোহাই তোমার, আর দগ্ধে মেরো না। এই নাও কমলির ফটো। বেঁচে থাকতে তো একদিনও বাছাকে আমার একটুও ভালবাস নি। মরে গিয়েও তার রেহাই নেই।

কথার শেষে সে কমলির ফটোখানি নিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। বাতাসে ভর করিয়া সেই ফটো দূরে উড়িয়া গেল।

অগত্যা আমায় সে বাড়ী অচিরেই ত্যাগ করিতে হইল। রমাদের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন হইল। জানিয়া শুনিয়া তো আর পাপ করিতে পারি না। আচার-বিচার আগে, না আগে ভালবাসা!

আশ্চর্য মানুষ!

বাঁশি

আজও আবার সেই ভাঙা বাঁশিটা লইয়া গোল বাধিল। বহুদিনের একটা পুরাতন বিবর্ণ পিতলের বাঁশি। মুখের দিকটা খানিকটা ভাঙিয়া গিয়াছে, ছিদ্রগুলি আর নিখুঁত হইয়াও নাই, আস্তাকুড়ের আবর্জনায় ফেলিয়া দিলেই হয়। এমন একটা পুরানো বাঁশি ছোট বউ কেন এমন আঁকড়াইয়া থাকে, একথা বহুবার ভাবিয়াও সুলেখার শাশুড়ী কোন সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই। প্রায়ই এই বাঁশিটা লইয়া গোল বাধে। আর লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা ছেলেটাও যদি কথা শোনে—না, ঐ বাঁশিটাই তার চাই।

আজও গোল বাধিল। সুলেখা অনেক যত্নে, টুলের উপর দাঁড়াইয়া অনেক কষ্টে বাঁশিটাকে খুব উঁচুতে তুলিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল। খোকা খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে এবং ঘরের মেঝেতে বসিয়া অবাধ্য কাঠের ঘোড়াকে তাহা দ্বারা সজোরে আঘাত করিতেছে।

সুলেখা ঘরে ঢুকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একবার ভাবিল কিছু বলিবে না। কিন্তু কেমন একটা তীব্র বেদনা তাহার সমস্ত মনের গহনে স্নান হইয়া উঠিল। নিকটে এবং দূরে, সম্মুখে এবং পশ্চাতে কিসের এক কল্যাণময় সুর যেন শ্রান্ত গতিতে বাজিতে লাগিল। করুণ সুর কিন্তু সজীব।

সুলেখা খোকার নিকট আগাইয়া গেল। গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে আস্তে আস্তে বলিল—তোকে একটা নূতন বাঁশি এনে দেব...

খোকা জবাব দিল না। ঘোড়া কিছুতেই চলিতেছে না, তাহা লইয়া সে ব্যস্ত। সে ঘোড়ার উপর কয়েক ঘা লাগাইয়া বলিল—চল ঘোড়া। চল, হ্যাট—

সুলেখা বলিল—লক্ষ্মীটি! দে।

মুখ ফুলাইয়া খোকা বলিল—না। এবং এই 'না' বহু চেষ্টায়ও 'হাঁ'তে পরিণত হইল

না। বাঁশির এই অযত্ন সুলেখা সহিতে পারে না...

হাত হইতে বাঁশিটা টানিয়া লইল—তোকে পয়সা দেব। দে।

খোকা আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। কিন্তু সুলেখারও যেন আজ কি রকম এক রোক চাপিয়া গিয়াছেঃ বাঁশি তার চাই, চাই-ই। সে খোকার গালে অকস্মাৎ রাগের বশে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া গোটাকতক চড় মারিয়া বলিল, হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, কথা শোনে না। কী হবে তোর এ ভাঙ্গা বাঁশি নিয়ে? সেদিন কিনে দিলাম—সেটায় হবে না, এটা চাই। লক্ষ্মীছাড়া!

বলিয়া সুলেখা খোকার পিঠে আরও কয়েকটা চড় বসাইয়া দিল। চড় খাইয়া খোকা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। শব্দ শুনিয়া মা আসিলেন এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন এই নিত্যনৈমিত্তিক উপভোগ্য ব্যাপারটা দেখিতে ছুটিয়া আসিতে ভুলিলেন না।

পিসী এ বাড়ীতে বহুকাল ধরিয়া আছেন এবং বড় বৌয়ের দিকে টানিয়া মনরক্ষা করিয়াই চলিতে অভ্যস্ত।

পিসী বলিলেন, তোমার যে কবে জ্ঞানগম্যি কিছু হবে, তা এতটা বয়স হলেও আমি বুঝলাম না ছোট বউ।

সুলেখা কথা কহিল না। চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বড় বৌ আজ অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছেন। ছোট বৌ সুলেখাকে অত্যন্ত স্নেহ করিলেও এবং তাহাকে ছোট বোনের মত দেখিলেও, খোকার গালের দাগগুলি দেখিয়া মার হৃদয় সহসা কাঁদিয়া উঠিল। তিনি টান মারিয়া প্রাচীরের উপর দিয়া বাঁশিটা বাহিরে ফেলিয়া দিলেন।

সুলেখা আপত্তি করিল না। একটা প্রতিবাদও তুলিল না। যেমন ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল ঠিক তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু সমস্ত চোখে মুখে এক নিদারুণ বেদনা জাগিয়া উঠিল। বর্ষার দিনে সমস্ত আকাশ যেমন করিয়া মেঘ-ভারাক্রান্ত হইয়া সজল নয়নে চুপ করিয়া থাকে, তেমনি গাঢ় বেদনায় সে একান্ত নিরুপায়ের মত চুপ করিয়া রহিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। সমস্ত আকাশ ভরিয়া কালো আবছা অন্ধকার নামিয়া আসিল। দূরের গাছটার পাশ দিয়া সূর্যদেব নামিয়া যাইতেছেনঃ সব কিছুর মধ্যে আজিকার মতো বিদায়ের ধ্বনি।

সুলেখা ছাদে আসিয়া ছাদের আলিসা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আজ যেন কিছু ভাল লাগে না। এই পরিপূর্ণ সন্ধ্যা, এই মিষ্টি সুন্দর হওয়া, এই আলো, এই বাতাস—সব কিছু যেন তিক্ত বেদনায় ভরিয়া গিয়াছে। বাতাসে রোজকার মতো আছে সেই সুর, সেই ছন্দ ; তবু যেন ভালো লাগে না। হৃদয়ের কোন্ তন্ত্রী যেন কিসের আবাহনে আবার নিবিড় হইয়া উঠিল ; বিগত জীবনকে সে কত ভাবে কত দিক দিয়া ভুলিতে চাহিয়াছে, কর্মের মধ্যে নিজেকে সযতনে নিয়োজিত রাখিবার কত প্রচেষ্টাই না সে দিনরাত করে—তবু পারে না। ঐ বাঁশিটাই যেন তাহাকে সজোরে তাহার গত জীবনের মধ্যে লইয়া আসে।

সুলেখা ছাদ হইতে সেই বাঁশিটার দিকে তাকাইয়া রহিল। একটা ইঁটের উপর বাঁশিটা চুপ করিয়া শুইয়া আছে। সুলেখার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। মনে ভাবিলঃ ভালই হইল। ঐ অলুক্ষণে সর্বনাশা বাঁশিটাই যত নষ্টের গোড়া ; ওটাই কিছুতেই তাহার বিগত জীবনকে ভুলিতে দেয় না। ভালই হইল।

কিন্তু তবু যেন কিসের এক নিরবচ্ছিন্ন তীক্ষ্ম সুর তাহার কানে আসিয়া বাজিতে থাকে। সে সব কিছু ভুলিয়া যায়।

মনে পড়িতে লাগিল সেই দিনের কথা, যখন এ গৃহে প্রথম সে আসে। বয়স আর তখন কতই বা হইবে—ওই বছর পনেরো বা ষোল—বা তারও কম।

স্বামীকে মনে পড়ে। বনোজ যেন আজও তার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। সুন্দর,

গৌর চেহারা। বনোজ, তার স্বামী। তার স্বামীকে মনে পড়িয়া যায়।

আরও ধীরে ধীরে অনেক কথাই তার মনে পড়িতে লাগিল। এই বনোজ কি দুষ্টুই না ছিল। চব্বিশ ঘণ্টা তাহার খোঁপা খুলিয়া দুষ্টুমি করিয়া এমনি হাজারো রকমের কী বিরক্তিই না করিত। মাঝে মাঝে রাগ করিয়া সে বলিত, সুলেখার মনে পড়িতে লাগিল—তোমাকে একটি মুহূর্ত পাওয়া যায় না, কেমন মেয়ে তুমি?

সুলেখা বলিত, দিনরাতই ত কাছে আছি, তবু পাও না?

না পাইনে ত। এই বুঝি দিনরাত?

সুলেখা অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকিত।

এই বুঝি দিনরাত কাছে থাকা, বনোজ বলিত, হিসেব করে দেখ ত আজকে কতক্ষণ তুমি কাছে ছিলে! সেই ভোরে মিনিট খানেক—দুপুরে তিন সেকেন্ড, আর এই এসেই, যাই আর যাই।

সুলেখা প্রতিবাদ করিত না। কারণ, করিয়া লাভ নাই। বলিত, মা বসে আছেন সেই কখন থেকে, আর-আর-ওরা-সবাই বা কি ভাববেন, যাই।

এমনি কতো টুকরো টুকরো কাহিনী মনে পড়িতে লাগিল।

কিন্তু বনোজের একটি প্রিয় জিনিস ছিল—বাঁশি বাজানো। তন্ময় হইয়া সে বাঁশি বাজাইত এবং এই একটিমাত্র সময়েই সে সব কিছু ভুলিয়া যাইত—সংসার মুছিয়া যাইত দৃষ্টির সম্মুখ হইতে, সমস্ত কিছু সুরের ছন্দে নাচিয়া বেড়াইত। কী সুন্দর বাজাইতেই না সে জানিত! সুরের উপর সুর সৃষ্টি করিত এক অপরূপ রূপ-জগতের, যেখানে আর কাহারও স্থান ছিল না, সুলেখারও নয়। এ সময় সুলেখা আসিয়া কাছে দাঁড়াইলেও সেই দিকে তাহার বিন্দুমাত্র খেয়াল হইত না—হয়তো চোখ পড়িয়াও পড়িত না।

এই সুরের রাজ্যে বনোজ ছিল একান্তই একক। ইহার গণ্ডী পার হইয়া সুলেখাও কখনও সেই রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

এইখানেই ছিল তার দুঃখ। সে স্বামীর কাছে গিয়া দাঁড়াইত, বনোজ একবার ফিরিয়াও তাকাইত না।

সুলেখার রাগ বাড়িয়া যাইত। সে হয়তো টান মারিয়া বাঁশিটি তাহার হাত হইতে ছাড়াইয়া লইত। দু-একবার একটু আপত্তি তুলিয়া বনোজ চুপ করিয়া থাকিত। সুলেখাকে সে এতই ভালবাসিত যে অত্যন্ত রাগ হইলেও কখনও তাহাকে ব্যথা দিতে পারিত না, বলিত, সু—তুমি অমন করে কখনও বাঁশি কেড়ে নিও না আমার কাছ হতে।

সুলেখা জয়ের আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিত, বাঁশি তুমি আর কখনও বাজাতে পারবে না।

ম্লান ভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া সে বলিত, কেন?

সুলেখা রাগিয়া বলিত, কেন দিনরাত শুধু বাঁশি বাজাবে তুমি? আমি কতক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছি!

বনোজ কোলের কাছে তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইত। আদর করিয়া বলিত, এই কথা! বেশ ত। এসো।

বলিয়া এমন দুষ্টুমিই করিতে আরম্ভ করিত যে বাধ্য হইয়া সুলেখা বলিত, তোমার কেবল দুষ্টুমি, ছাড়ো।

বাঃ! তোমার সাথেও দুষ্টুমি করতে পারবো না?

না।

বেশ, বনোজও হাত পা ছড়াইয়া চুপ করিয়া নির্বিকার হইয়া বসিত। বেশ, না করলাম, বলিয়া বাঁশিটি হাতে তুলিয়া লইত।

ধাঁ করিয়া সুলেখা আবার তাহা কাড়িয়া লইয়া বলিত, না, এখন থাক বাজানো।

বেশ না হয় দুষ্টুমিই কর, কিন্তু দেখ ত এই সন্ধ্যাবেলা—শেষে কে কি বলে বসবে!

বনোজ আদর করিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিত, কেউ কিছু বলবে না।

এমনি কত কথাই তাহার মনে হইতে লাগিল, সে-সব কথা এতো ছোট, এতো ক্ষুদ্র যে কোনটিই মনে রাখার মতো নয়—তবুও প্রত্যেক কাহিনী, প্রত্যেকটি শব্দ, প্রত্যেকটি ছন্দ যেন কতো চেনা, কতো পরিচিত।

ভুলিতে চেষ্টা করিয়াও যেন ভোলা যায় না। স্মৃতির কোন্ অতল দেশ হইতে আপনিই উঠিয়া আসে। বসন্ত ঋতুতে যেমন করিয়া দক্ষিণের বাতাস সমস্ত কিছু ভরাইয়া দিয়া যায়, তেমনি করিয়া সেই সব গত কাহিনী মনের কোন গহ্বর হইতে উঠিয়া আসিয়া সুরে ছন্দে, গানে এবং প্রাবল্যে, উত্তেজনায় আর আনন্দে তাহাকে মাতাইয়া দিয়া যায়, তাহাকে বিভোর করিয়া তোলে। সে আচ্ছন্ন হইয়া যায় সেই রূপের মোহে, সেই সুরের ধ্বনিতে ছন্দের বিচিত্র বর্ণে এবং গন্ধে।

ভুলিতে চাহিলেও ভোলা যায় না।

এমন করিয়া কত কি সুলেখা ভাবিতেছিল।

নীচ হইতে মা ডাকিলেন, বৌমা!

বড় বৌ ডাকিলেন, ও ছোট, কোথায় তুই? নীচে আয়।

সুলেখা ডাক শুনিয়া নীচে আসিল। বড় বৌ বলিলেন, তোমার জন্যেই খোকাটা অত বাড় বেড়েছে, এখন বোঝ মজাটা। একদিন তুমি না খাইয়ে দিলে চলবে না, ভাত নিয়ে কতক্ষণ সাধাসাধি হলো। খাবে না।

সুলেখা কোন কথা বলিল না খোকাকে খাওয়াইয়া দিতে লাগিল। ইহাকে খাওয়ানো একটা মহাযুদ্ধ জয় করা হইতে কম নয়। এবং একমাত্র সুলেখাই তাহা পারে। খাইতে বসিয়া অন্ততঃ সহস্র আবদার রক্ষা না করিলে সে কিছুতেই খাইবে না। সুলেখা ইহা জানে, কিন্তু আজ তার কোন দিকে ভাল লাগিল না। বলিল, বুড়ো ছেলে এখনও নিজে খেতে শেখেনি, পারব না আমি তোকে রোজ খাওয়াতে, খা!

সুলেখা বুঝিতে পারিল আজ খোকার ভাল করিয়া পেট ভরে নাই। কিন্তু কোন কথা বলিল না, রাগ করিয়া এমন করিয়াছে একথা মিথ্যা—কেন যেন ভাল লাগিল না। যাকে এক মুঠা বেশী খাওয়াইবার জন্য উদ্বেগের আর তাহার অন্ত থাকে না আজ তাহাকে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দিতেও যেন কেমন এক বিশ্রী আলস্য। মনের সমস্ত কিছু ভরিয়া শুধু বনোজ। শুধু মাত্র বনোজ, আর কেউ নাই। এই পৃথিবী, এই বিরাট জগতের যা কিছু সব আজ নিঃশেষে এই বিধবা তরুণীটির নিকট হইতে মুছিয়া গিয়াছে কেবলমাত্র 'বনোজ' আজ সেখানকার অধীশ্বর কেউ আর কোথাও নাই। সব ফাঁকা সব খালি।

খোকার খাওয়া-পর্ব শেষ হইলে সুলেখা সংসারের ছোটখাটো কাজ করিল। আজ কাজ করিতেও কেমন এক বিতৃষ্ণা। দেখিল, মায়ের সন্ধ্যা-আহ্নিকের ব্যবস্থা পর্যন্ত এখনও হয় নাই। খোকার এবং অন্যান্যের বিছানা খালি পড়িয়া আছে, চাদর পাতা হয় নাই। বড় ঠাকুরের আসিয়াই গামছা চাই, অথচ র‍্যাকে গামছাটা পর্যন্ত ঝোলান নাই।

এসব কাজ সুলেখাই করে, এবং করিতে না পারিলে দুঃখিত হয়। কিন্তু আজ কিছু ভাল লাগিল না, কেমন যেন একটা অবসাদ, সমস্ত মাথার ছিদ্র দিয়া যেন অন্য কাহারও কথাই মনে ঢুকিতে লাগিল।

ছোট ননদ 'মিনু' আসিয়া বলিল—বৌদি, আমার পড়াটা একটু দেখিয়ে দেবে চল না।

চল, বলিয়া তাহাকে পড়াইতে বসিল।

কিন্তু আজকে যেন কিছু ভাল লাগে না, পড়াইতে পড়াইতে অকস্মাৎ কখন মনে পড়িয়া গেল—সন্ধ্যা হইলেই বনোজ ঐ বাঁশিটি লইয়া বাজাইতে বসিত, আস্তে আস্তে

সুর তুলিত গানের।

মিনু বলিল, তার পর কি হল বৌদি, কি হবে বলে দাও না।

বৌদি বলিল, বাঁশির ইংরাজী তাও জানো না—

মিনু বলিল, বা, তা বুঝি জিজ্ঞেস করছি?

বৌদির মন অবচেতনা হইতে ফিরিয়া আসিল। বলিল, আজ থাক বোন। আজ ভাল লাগছে না। ধীরা কই রে?

কে, বড়দি?

হাঁ।

সে ত আজ স্কুল হতে আসেনি।

কেন রে?

ওদের আজ প্রাইজ না কি, বললাম আমাকে নিয়ে যেতে—নিলে না।

বৌদি চুপ করিয়া রহিল।

মিনু বলিল, আজ ওরা হোস্টেলে থাকবে, কাল সকালে আসবে।

আচ্ছা।

ধীরা থাকিলে তাহার সহিত গল্প করিয়া কিছুটা সময় তবু কাটানো যাইত। আজ তাহারও উপায় রহিল না, অদৃষ্ট যখন খারাপ হয় তখন এমনি করিয়াই হয়।

রাত্রি এদিকে অনেক হইয়া গিয়াছে। আকাশে এক খণ্ড চাঁদ, তাহারই শুভ্র আলোকে সকল কিছু রঙগীন হইয়া উঠিয়াছে। সামনের বাড়ী-ঘর, দূরের ঐ প্রান্তর সমস্ত কিছুর উপর চাঁদের মিষ্টি আলো। কোমল স্পর্শ!

সকলে ঘুমাইয়া পড়িল। রাতও কম হইল না। সুলেখার চোখে ঘুম নাই। ঘুম যেন এ রাজ্য হইতে কতদূরে পলাইয়া গিয়াছে—ঘুম নাই। সুলেখা জানালার নিকটে দাঁড়াইল। কিসের যেন একটা মিষ্টি শব্দ কতদূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে। দূরের ঐ পল্লবিত বনানীর শ্রেণী পার হইয়া, ছোট ঝরণাধারাগুলিকে পাশে রাখিয়া কোথা হইতে যেন একটা বাঁশির শব্দ ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

জানালা ধরিয়া সুলেখা চুপ করিয়া রহিল।

আকাশে শ্বেত-শুভ্র অপরূপ জ্যোছনা, রূপার মত ঝক ঝক করিয়া বিছাইয়া গিয়াছে। জানালা দিয়া গলাইয়া আসিয়াছে খানিকটা তাহার ঘরের মধ্যে, এমনি কত রজনীতে কতদিন তাহারা দুইজনে বসিয়া গল্প করিয়াছে, বাঁশি লইয়া ঝগড়া হইয়াছে। এমনি করিয়া কত বসন্ত, কত বর্ষা, কত গ্রীষ্ম তাহাদের নিকট দিয়া হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইয়া গিয়াছে—খুশী করিয়া, হাসি দিয়া, কত ভাবে। কিন্তু তারপরের কথা ভাবিতেও সুলেখার ভয় হয়।

তখন বৈশাখ মাস। এমনি একটা সময়ে বনোজের সর্দি হঠাৎ বসিয়া যায়। তা লইয়া যমে-মানুষে টানাটানি। কিন্তু টানাটানিতে এক পক্ষই জিতিতে পারে—জয় হইল বিধাতার। অসুখের সময় বনোজ বাঁশি বাজাইতে চাহিত। ডাক্তারদের বারণে হইয়া উঠিত না। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে বনোজ সুলেখাকে কাছে টানিয়া নেয়। বলে, আমার ত সময় হইয়া আসিল। বিদায় দাও, সু!

চোখের অশ্রু মুছিয়া সুলেখা কি বলিতে চাহিতেছিল, পারে নাই।

মৃত্যুর মত হাসি হাসিয়া বনোজ বলিয়াছিল, যদি কিছু হয়—এ বাঁশিটি তুমি রেখে দিও। ওর চেয়ে প্রিয় আমার কিছু নেই।

কাঁদিতে কাঁদিতে সুলেখা বলিয়াছিল—অমন কথা বলবে ত আমি এক্ষুনি চলে যাব। আমি পারব না রাখতে তোমার বাঁশি।

বনোজ আর কিছু বলে নাই। শুধু বলিয়াছিল—ওকে রেখে দিও।

তারপর কোথা দিয়া কি হইয়া গিয়াছে আজ তাহা ভাবিতেও ভয় হয়। সুলেখা সে কথা ভাবিতেও শিহরিয়া উঠে। মাত্র তিন বছর স্বামীর সহিত বাস করিবার পরই তাহার সব ঘুচিয়া গেলঃ নারী যাহা লইয়া গর্ব করে, সে তাহাকে হারাইল।

তারপর কত বছর কাটিয়া গিয়াছে। কত বর্ষা, কত বসন্ত ডাকিয়া ডাকিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। গন্ধভরা উতলা বাতাসে কত দক্ষিণের গানই না রূপের মাধুর্যে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সব কিছুর মধ্যেই যেন মস্তবড় একটা দীর্ঘ ফাঁক। কি যেন হারাইয়া গিয়াছে। কিসের যেন অভাবে সমস্ত আলো, সমস্ত হাসি একটা বিরাট মিথ্যা হইয়া তাহার নিকট দেখা দেয়।

কিন্তু প্রত্যহ রাতে যেন কে আসিয়া ঐ বাঁশিটি বাজায়। সুলেখা ঘুমাইয়া পড়িলে যেন কাহার সজীব হস্তে বাঁশিতে সুর আরম্ভ হয়। জাগিয়া থাকিলে বাঁশি বাজে না। কিন্তু ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া প্রত্যেক রাত্রে সে ঐ বাঁশির শব্দ শুনিতে থাকে। তাহার বৈধব্য-জীবনের মধ্যে এই একটি মাত্র সান্ত্বনা। যাহা লইয়া সে আজও বাঁচিয়া আছে।

আজ তাহার মনে হইতে লাগিল কতদূর হইতে একটি বাঁশির করুণ সুর যেন ভাসিয়া আসিতেছে। কি করুণ সে সুর! প্রতিটি রেশের মধ্য হইতে কে যেন শান্ত কণ্ঠে বিনয় করিয়া বলিতেছে, আমায় তুমি নিলে না? তুলে নাও, নাও।

সুলেখার সমস্ত ইন্দ্রিয় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। কিন্তু কি করিবে, উপায় নাই। ওদিকে বাঁশি যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, আমায় তুলে নাও তুমি, তুলে নাও।

সুলেখা কি করিবে, অনেকক্ষণ বসিয়া ভাবিল। তাহার পর ধীরে ধীরে চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া বাহিরে আসিল। খিড়কীর দরজা খুলিয়া প্রাচীরের নিকটে আসিয়া সেই বাঁশিটির নিকট ধীরে ধীরে আগাইয়া গেল। কে এক ছায়ামূর্তি যেন বাঁশিটি হাতে করিয়া বসিয়া আছে। সুলেখা কেমন বিহ্বল হইয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল, পারিল না।

তারপর কিসের এক উন্মাদনায় আগাইয়া গেল এবং সেই ছায়ামূর্তির হাত হইতে বাঁশিটি তুলিয়া বুকে চাপিয়া ধরিল। ছায়ামূর্তি খুশী হইয়া উঠিল যেন, কিন্তু কিছু বলিল না।

শান্তিরাম

সন্ধ্যার কিছু আগে একখানা ট্রেন ছাড়ে। রাত সাড়ে নটা আন্দাজ সেখানা দেশের স্টেশনে পৌঁছায়। শান্তিরাম ওই ট্রেনেই বাড়ী যাওয়া ঠিক করিল।

কলে জল আসিয়াছে। ঝর ঝর শব্দে চৌবাচ্চায় পড়িতেছে। চৌবাচ্চাটা মাঝারি, ক্রমশঃ পুরিয়া আসিল বলিয়া। ভাদ্র মাসের পচা গুমোট, স্নান করিয়া লওয়া ভাল। কাপড় ভিজাইয়া দরকার নাই—গামছা পরিয়া শান্তিরাম অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করিল। এখনও ঝাড়ুদার আসে নাই। এবেলা-ওবেলার উচ্ছিষ্ট ভাত, শাকের চিবানো ডাঁটা, মাছের কাঁটা ঝাঁঝরির ড্রেনের মুখে পড়িয়া জলের স্রোত আটকাইয়াছে, দেখিলে গা কেমন করে—কি নোংরা!...কিন্তু এই নোংরা আঁস্তাকুড়ের মধ্যে আজ সাতটি মাস বাস করিয়াও পয়সা হইল কৈ? সে সব সহ্য করিতে পারিত যদি হোটেলটা হইতে কিছু পয়সা আসিত।

ভূপেনবাবু আপিস হইতে ফিরিয়া রান্নাঘরের পাশের ছোট্ট ঘরের চাবি খুলিল। ঘরটার সামনে চালের বস্তা, ডালের বস্তা, বেগুন পটলের ধামা, শুকনা বিলাতি কুমড়া। আধ নাগরী আখের গুড়—একটা ছোট্ট আড়াইসেরা টিনের অর্ধেক ভর্তি সরিষার তৈল।

বাজে হোটেলের মত যা তা তেল এখানে ব্যবহার করা হয় না, রামগোপাল মিলের মোহন-মার্কা খাঁটি সরিষার তৈল। কিন্তু এতেও হোটেল চলিল না।

ভূপেনবাবু কলতলায় হাত পা ধুইতে আসিল। কাঁধে গামছা, পায়ে খড়ম। চটির দাম বেশী। বেচারী পঁচিশটি টাকা মাহিনা পায়। ট্রাম কোম্পানীর আপিসে কাজ করে। ঘরের ভাড়া দেয় সাড়ে চার টাকা—পাইস হোটেল এটা, তবুও ভূপেনবাবুর সঙ্গে মাসিক বন্দোবস্ত আছে—ঘরভাড়া বাদে এগারো টাকা।

ভূপেনবাবু বলিল—শান্তিরামবাবু, আপনি নাকি আজ চল্লেন?

—না গিয়ে কি করি বলুন। এতদিন তো বেয়ে ছেয়ে দেখলাম। কিছুই যখন হলো না, তখন থেকে লাভ কি, খাবই বা কি?

—কেন, আপনাকে এরা রাখবে না?

—আমার পোষাবে না। আমি ছিলাম হোটেলের মালিক, আর এখন ওদের তাঁবে আমাকে সাত টাকা মাইনে আর খোরাকীতে খাটতে হবে। আর ওই যে নিধিরামবাবু, ওঃ, এমন মানুষ যদি দুটি—বল্লাম আর পঁচিশটি টাকা বেশী দাও গিয়ে। দেনার দায়ে নয় হোটেল বিক্রিই হচ্ছে, তা বলে আমায় ফাঁকি দিয়ে তোমাদের ভালো হবে! হোক, ভগবান মাথার উপর আছেন। তিনি দেখবেন। কারেই না হয় পড়েছি মশায়. চিরকাল এমন দিন থাকবে না, তাও বলে দিচ্ছি।

—বাড়ীতেই এখন থাকবেন?

—দেখি কি হয়! পয়সা যা পেলাম হোটেল বিক্রি করে, তা গেল পাওনাদারের পেছনে। মিথ্যে বলব কেন ভূপেনবাবু, আপনি আমার ছোটভাইয়ের মত, সাতটি টাকা আর রেলভাড়া—এই নিয়ে দেশে যাচ্ছি। তাতে আর কদিন চলবে সেখানে?

হঠাৎ শান্তিরামের মনে পড়িয়া গেল—ধারে হোটেলের জন্য কড়া ও বালতি কিনিয়াছিল আমহার্স্ট স্ট্রীটের গিরীন্দ্র কুন্ডুর দোকান হইতে। হোটেল বিক্রি হইয়া যাইতেছে শুনিয়া তাহারা আজ কয়দিন জোর তাগাদা চালাইতেছে। খাইতে দেয় না, ঘুমাইতে দেয় না। তাহাদের বিল-সরকারকে আজ সন্ধ্যার সময় আসিতে বলা হইয়াছে। আসিলেই চার টাকা কয়েক আনা তাহাদের দেনা শোধ করিতে হইবে। তবে বাড়ী যাইবে কি শুধু হাতে! পুঁজি তো সাতটি টাকা।

কাজের কথা নয়। তাহার আগেই বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। শেয়ালদা স্টেশনে গিয়া গাড়ীর জন্য বসিয়া থাকা ভাল। দেড় ঘণ্টা হোটেলে অপেক্ষা করিবার দণ্ড স্বরূপ চার টাকা কয়েক আনা দিতে সে রাজী নয়। নিজের ঘরটিতে ঢুকিয়া সে একখানা ময়লা কাপড় পাতিয়া দু-তিনখানা আধময়লা কাপড় ও জামা, কাঁসার গেলাসটা, পুরানো একজোড়া জুতা, একজোড়া খড়ম, পাটি একখানা—পুঁটুলি বাঁধিয়া লইল। না, এখানে কোন জিনিস ফেলিয়া গিয়া লাভ নাই। বাড়ীতে লইয়া গেলে গৃহস্থ সংসারে কত কাজে লাগিতে পারে।

ছোট টিনের সুটকেসটার মধ্যে ধোপার বাড়ী হইতে সদ্য-আসা দুখানি ধুতি এবং একটা ছিটের কাপড়ের পাঞ্জাবি পুরিয়া নিজের গায়ের শার্টটা পরিতেছে, রেলে যাইবার সময় ফর্সা জামা গায়ে দিয়া লাভ কি? বিশেষতঃ নিজের বাড়ীতেই যখন যাইতেছে সে, কুটুম্ব বাড়ীতে নয়—এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল—শান্তিরামবাবু আছেন?

—কে?

—সেদিনকার সেই আধ টিন সর্ষে তেলের দামটা পাওনা—কাল আসতে বলেছিলেন, কাল দু-দুবার এসে দেখা পেলাম না।

—কত বাকি?

—এক টাকা সাড়ে ন আনা।

শান্তিরামের একবার ইচ্ছা হইল বলে, কাল এসো সকালবেলা। কিন্তু ভূপেনবাবু পাশের ঘরেই রহিয়াছে, ভূপেনবাবু জানে, আজই হোটেল বিক্রি হইয়া গিয়াছে, সে—শান্তিরাম, আজই সন্ধ্যার গাড়ীতে দেশে চলিয়া যাইতেছে, আর এখন ফিরিবে না। এ অবস্থায় পাওনাদারকে কি বলিয়া মিথ্যা কথা বলা যায়?

অগত্যা দিতে হইল। সাত টাকার ভিতর হইতে বাহির হইয়া গেল এক টাকা সাড়ে না আনা। এ বেড়া-আগুনের জাল হইতে বাহির হইতে পারিলে এখন সে বাঁচে। আবার কোন্ দিক হইতে কে আসিয়া পড়িবে কে জানে?

—চল্লেন, তা হলে?

—হেঁ হেঁ আসি! নমস্কার। কিছু মনে করবেন না।

—বাড়ী গিয়ে চিঠি দেবেন—কি রকম আছেন, কেমন তো?

—হ্যাঁ, দেব বইকি—দেব না?

বেশ লোক ভূপেনবাবু।

ডান হাতে টিনের বিবর্ণ স্যুটকেসটা, বাম বগলে পুঁটুলি ও ছাতা লইয়া শান্তিরাম হোটেল হইতে বাহির হইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে শেয়ালদ-এর মোড়ে আসিয়া পৌঁছিল।

নাশপাতি—নাশপাতি—ছেলেদের জন্য কিছু কিনিয়া লওয়া যাক। দু'পয়সা জোড়া! ডাকাত নাকি রে বাবা! দু'পয়সা জোড়া নাশপাতি কে কবে শুনিয়াছে?

দিব্যি আপেলগুলি। কত দর? চার পয়সা জোড়া কেন, পয়সা পয়সা না?

ফলওয়ালা চটিয়া বলিল—বাবু কৌন জমানা মে আপেল পয়সা পয়সা বিকা?

অনেক দরদস্তুর করিয়া শান্তিরাম ছোট ছোট নাশপাতি দুই পয়সায় জোড়া দরে ছয়টি কিনিল, চার পয়সায় একজোড়া আপেলও কিনিল। পরিমল নস্য লইবে কিছু, দেশে ভাল নস্য পাওয়া যায় না।

ফলওয়ালাকে পয়সা বাহির করিয়া দিতেছে, এমন সময় পিছন হইতে কে ডাকিল—এই যে শান্তিরামদা, এ কি, যাচ্ছ কোথায়? বাড়ী নাকি?

শান্তিরাম পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল তাহাদের দেশের (ঠিক গ্রামের নয়) সরোজ মুখুজ্জে! সরোজ এখানে কোন মেসে থাকে, সপ্তাহে সপ্তাহে দেশে যায়। চাকুরি করে মার্চেণ্ট আপিসে। আশি-নব্বই টাকা মাহিনা পায়।

—আর ভাই, বাড়ী চল্লাম—সব উঠিয়ে দিয়ে চল্লাম।

—কেন, তোমার সেই হোটেল?

—চালাতে পারলাম কই? চলতো ভাল, পাঁচ ভূতে খেয়ে আর বাকি ফেলে ফেল মারিয়ে দিলে। এক এক ব্যাটার কাছে আট টাকা দশ টাকা বাকি, খেয়ে যাচ্ছে তো খেয়েই যাচ্ছে! উপুড় হাত করবার নামটি নেই। তাগাদা করতে গেলেই আজ দেব কাল দেব। এদিকে আমার পাওনাদারেরা—বাড়ীওয়ালা, কয়লাওয়ালা, মুদি আমায় ছিঁড়ে খাচ্ছে। জোচ্চোরের জায়গা কলকাতা। এখানে কি ভদ্দরলোক আছে?

—কিন্তু শান্তিরামদা, দেশে কতদিন যাওনি বল তো? দেশের অবস্থা জানো? বাড়ী তো যাচ্ছ, বন্যেয় সব ডুবে গিয়েছে—রসময়পুর থেকে নৌকায় চড়বে আর একেবারে তোমাদের গাঁয়ের বটতলায় গিয়ে উঠবে, কলুবাড়ীর কাছে। চাল নেই, ধান নেই—সব ডুবেছে। জিনিসপত্রের দাম চড়া—লোকজনের ভয়ানক কষ্ট। কত বাড়ী ঘর পড়ে গিয়েছে—আর এই দুর্দিনে তুমি যাচ্ছ দেশে? এখন যেও না আমি বলি!

—না গিয়ে কি করি?

—এখানে থেকে পয়সা উপায়ের চেষ্টা কর। এখানে নানা পথ আছে—দেশে কিছু নেই—এক ভিক্ষে ছাড়া। তাই বা দেবে কে? এখানে থেকে বাড়ীতে পয়সা পাঠাও, তাদের উপকার হবে। শুধু হাতে বাড়ী গিয়ে কি করবে? আচ্ছা আসি শান্তিরামদা, আসি।

বন্যার খবর শান্তিরাম কিছু জানে না। বাড়ীর চিঠি পায় নাই আজ পনেরো-কুড়ি দিন। চিঠি না পাওয়ার কারণ সে জানে। তিন পয়সা দাম একখানা পোস্টকার্ডের, পাড়াগাঁয়ের লোক নিতান্ত দরকারী খবর দিবার না থাকিলে চিঠি বড় একটা দেয় না। বিশেষতঃ তাহার সংসারের যা অবস্থা। তিনটি পয়সা তিনটি মোহর।

ট্রেন ছাড়িল। বেলা একদম পড়িয়া আসিয়াছে। স্টেশনের সিগন্যালের লাল সবুজ আলো জ্বলিতেছে। গাড়ীতে লোক বেশী নাই। শান্তিরাম এককোণে বসিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া মাঝে মাঝে বিড়ি টানিতে টানিতে ভাবিতে ভাবিতে চলিল।

সরোজ যাহা বলিল, তাহাতে বাড়ী যাইবার উৎসাহ তাহার কমিয়া গিয়াছে। সত্য বটে সে ন-দশ মাস বাড়ী যায় নাই। সে অগ্রহায়ণ মাসে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল, স্ত্রীর শেষ সম্বল বালা দুগাছা বিক্রয় করিয়া দুইশত টাকা লইয়া ব্যবসা করিতে আসিয়াছিল কলিকাতায়।

দুইশত টাকার মধ্যে বাড়ী লইয়া ফিরিতেছে পাঁচ টাকা সাড়ে ছ-আনা। অবশ্য এ কয় মাস কিছু কিছু খরচ পাঠাইয়াছিল বাড়ীতে—কিন্তু গত আষাঢ় মাসের শেষ হইতে আর কিছুই দিতে পারে নাই।

দেশে থাকিতে পয়সা উপার্জনের কোন পথ সে বাকি রাখে নাই। লেখাপড়া তেমন জানে না বলিয়া চাকুরি জোটে নাই, না-ই বা জুটিল চাকুরি? ব্যবসা করিয়া বড়লোক হওয়া যায়, চাকুরিতে নয়। গুড়ের ব্যবসা, কাঠ চালানির ব্যবসা, তরকারি চালানির ব্যবসা; এমন কি মাছ চালানির ব্যবসা পর্যন্ত। কিছুতেই কিছু হইল না। তাই স্ত্রীর বালা-জোড়া লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিল কোন একটা ব্যবসা করিতে।

অনেকে পরামর্শ দিয়াছিল হোটেল খুলিতে। খারাপ কিছু চলে নাই, দুবেলা লোক-জন খাইতেছিলও মন্দ নয়—কিসে কি হইল ভগবান জানেন, খরচে আয়ে আর কিছুতেই কুলায় না এমন হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। বাড়ীভাড়া বাকি পড়িয়া গেল তিন মাসের। বাড়ীওয়ালা শাসাইল জিনিসপত্র আটকাইয়া ভাড়া আদায় করিবে। মুদির দেনা, করলা-ওয়ালার দেনা, তরকারীওয়ালার দেনা, মাছওয়ালার দেনা, দুধওয়ালার দেনা, ঠাকুরের মাহিনা বাকি, ঝি-চাকরের মাহিনা বাকি—হোটেল চলে কি করিয়া?

সর্বস্বান্ত হইতে হইল—সত্যসত্যই সর্বস্বান্ত। এতটুকু সোনার গুঁড়া নাই ঘরে, এই কটি টাকা মাত্র সম্বল! বাড়ীতে পা দিলেই চৌকীদারি ট্যাক্সের তাগাদা—সেখানেও মুদির দেনা, গোয়ালার দেনা কোন বা দশ পনেরো টাকা না জমিয়া গিয়াছে!

তাহার উপর দেশের অবস্থা যে-রকম শোনা গেল, সব কিছু ডুবিয়া গিয়াছে, জিনিস-পত্রের দাম চড়া, ধার মেলা দুষ্কর হইয়া উঠিবে এ বাজারে। স্ত্রীপুত্র হয়তো বা উপবাসে দিন কাটাইতেছে। নীরদা কত আশা করিয়া আছে, পূজার সময় (আর দিন সতেরো বাকী পূজার) স্বামী কলিকাতা হইতে সকলের জন্য নতুন কাপড় এবং টাকাকড়ি লইয়া বাড়ী ফিরিবে।

নীরদাকে একদিনের জন্যও খুশী করিতে পারে নাই সে। বিবাহ করিয়া পর্যন্ত অভাব অভাব—অভাব আর ঘুচিল না কোনদিন। অদৃষ্ট! তাহার অদৃষ্ট না নীরদার অদৃষ্ট? দুজনেরই।

দেশের স্টেশনে নামিয়া সহযাত্রীদের মুখে শুনিল, পায়ে হাঁটিয়া গ্রামে পৌছানো যাইবে না। মাতুগঞ্জের বড় বিল ভাসিয়া রাস্তার উপর এক কোমর জল—এত রাত্রে নৌকাই বা পাওয়া যায় কোথায়? চিলমারির নবীন কলু তাহার মুদির দোকানের জন্য কলিকাতায় মাল কিনিতে গিয়াছিল। সে তিন গ্রোস দেশলাই ও দুই তিনটি মিছরীর কুঁদো লইয়া বড় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

—এই যে দাদাঠাকুর! কলকেতা থেকে এলেন বুঝি? এই গাড়ীতেই এলেন—কই

দেখিনি তো! এখন কি করে যাই বলুন তো? একটা লোক নেই ইস্টিশানে। নৌকো থাকবার কথা বলা ছিল, কই, কাউকে তো দেখছি নে। আপনিও তো যাবেন, ওদিকে সব জলে জলময়।

একজন কুলি তাহাদের জিনিসপত্র ঝাঁকায় করিয়া লইয়া যাইতে রাজী হইল। কুলিটার মুখে শোনা গেল, স্টেশন ছাড়াইয়া যে বড় মাঠ, কিছুদূর গেলে সেই মাঠের ধারে জেলেদের নৌকা ভাড়ার জন্য মজুত আছে। মাঠ জলে ভাসিয়া সমুদ্রের মত দেখাইতেছে —শুধু বাবলা গাছ ও অন্যান্য গাছপালার খানিকটা করিয়া জাগিয়া আছে মাত্র।

শান্তিরাম অবাক হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। বলিল—হ্যাঁ নবীন, এ রকম বন্যে তো আমাদের জ্ঞানে কখনো দেখিনি। এ কি হয়েছে, এ যে চেনা যায় না কিছু! গাঁয়ের মধ্যে জল ঢুকেছে নাকি?

বাড়ী পৌঁছিতে রাত এগারোটা বাজিয়া গেল। সবাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, শান্তিরাম ছোট ছেলের নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করিতে নীরদা উঠিয়া তাড়াতাড়ি ঘরের দোর খুলিয়া বাহিরের রোয়াকে আসিল। রং ফর্সা, রোগা চেহারা, শান্তিরামের অপেক্ষা সাত বছরের ছোট সুতরাং বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ হইয়াছে। মাথার চুল সামনের দিকে অনেক উঠিয়া গিয়াছে। মুখের লালিত্য অনেক দিন নষ্ট হইয়াছে। পরনে লাল পাড় ময়লা শাড়ী; চুলবাঁধা বা পরনপরিচ্ছদের মধ্যে এতটুকু পারিপাট্য নাই। অতিরিক্ত পান দোক্তা খাইয়া দাঁতগুলি কালো।

—এত রাত্তিরে কোন গাড়ীতে এলে! দ্যাও ওগুলো আমার হাতে। বাবা, একখানা চিঠি না পত্তর না—ভেবে মরছি। সতুর আজ আবার তিন দিন জ্বর আর পেটের অসুখ— বুলুর একটা ফোড়া হয়ে কষ্ট পাচ্ছে, ভাবছি আজকালের মধ্যে একখানা পত্তর দেব। তার ওপরে চারিদিকে জল! হাটবাজার করে এনে দেবার লোক পাচ্ছিনে, এই জল পেরিয়ে কে আমার জন্যে চিলেমারি থেকে জিনিস কিনে এনে দেবে! এলে বাঁচলাম—কি আতান্তরে যে পড়েছি—তার ওপর এদিকে হাতে—ও বুলু, কি বলছে শোন, এই যে যাই—চেঁচিও না, কে এসেচে দ্যাখ্—

—তোমার শরীর ভাল আছে? এই এতে আপেল আর নাশপাতি আছে, সতুকে বুলুকে দাও। খুকীকে দাও এই লেবেঞ্চুস—কলার আর কমলালেবুর। খুকী ভাল আছে তো? চল ঘরে—

—দাঁড়াও একটু, আলোটা জ্বালি, ঘরে অন্ধকার। সামনেই সব শুয়ে আছে, মাড়িয়ে চটকে দেবে।

খানিক পরে শান্তিরাম সুস্থ হইয়া বসিয়া তামাক খাইতেছে। ছেলেমেয়েরা তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া কেহ আপেলের টুকরা কেহ লেবেঞ্চুস খাইতেছে। নীরদা স্বামীর জন্য ভাত চড়াইতে গিয়াছে রান্নাঘরে।

নীরদা নিশ্চয়ই ভাবিয়াছে, সে না জানি কত টাকা লইয়াই ঘরে আসিয়াছে! নীরদাকে কিছু বলা হইবে না এখন। না, বলাই ভালো। মিথ্যা আশায় রাখিয়া লাভ কি! নীরদার মুখে আনন্দ ও উৎসাহ যেন ধরিতেছে না। কষ্ট হয় বলিতে—নীরদা, যা ভাবছো তা নয়, আমার হোটেল বিক্রী করে দিয়ে চলে এলুম। সর্বস্বান্ত হতে হয়েছে, তোমার সে বালা গিয়েছে, তার টাকা গিয়েছে। পাঁচ টাকা সাড়ে ছ আনা মাত্র হাতে অবশিষ্ট আছে।

এ কথা বলিতে কষ্ট হয়। নীরদাকে কোন সুখটা দিয়াছে জীবনে সে?

নীরদা ভাত চড়াইয়া দিয়া আবার ঘরের মধ্যে আসিল। বলিল—পুজোর আগে আবার যাবে বুঝি? তা এই যাবে আবার আসবে, মিছিমিছি পয়সা খরচ। একেবারে আর দুদিন দেরী করে পুজো পর্যন্ত থেকে যাও। ওদের কাপড়-চোপড় এনেছ নাকি?

শান্তিরাম একবার ভাবিল বলে—নীরদা, কিছু নেই, সব গিয়েছে। তোমার বালা

জোড়াটাও। সব উঠিয়ে দিয়ে এলাম। হাত একেবারে খালি! পুজোর কাপড়-চোপড় তো দূরের কথা, তোমাদের খেতে দেবো যে কোত্থেকে তাই ভেবে—

তবুও আজ আট মাস পরে বাড়ী আসিয়া তাহার কি ভালই লাগিতেছিল। কলিকাতায় হোটেল খুলিয়া থাকা—সে এক অন্য ধরনের জীবন। এই কয় মাসে সে তাহা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে। কখনো যে ঘরছাড়া হয় নাই তাহার পক্ষে একা ওভাবে নির্বান্ধব স্থানে থাকা কি ভালো লাগে? এ তাহার নিজের বাড়ী—সকলে এখানে আপন। এখানে নীরদা আছে, সতু, বুলু, খুকী, পিসিমা। পাশের বাড়ীতে দুর্গাদাস কামার, নিতাই কামার,—এরা সব তাহার আপন। নিতাই তাহার ছেলেবেলার বন্ধু, লেখাপড়া শেখে নাই—পৈতৃক বৃত্তি দা-বাঁধানো, লাঙলের ফাল-পোড়ানো অবলম্বন করিয়াছে। তাহাকে সে যে কত দিন দেখে নাই! নিতাই কামারের দোকানঘরের জামরুল-তলার ছায়ায় বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে নিতাই এবং কামারদোকোনের সমাগত লোক-জনের সঙ্গে বেগুন কুমড়ার গল্প করিতে কি সুখ! তার তুলনায় হোটেল? কাল নিতাইয়ের সঙ্গে সকালেই দেখা করিতে হইবে।

শান্তিরাম খাইতে বসিল।

—হ্যাঁ গা, পুজো পর্যন্ত থাকবে তো?

—হ্যাঁ।

—তা কাপড়জামা ওদের কলকাতা থেকে আনলে না কেন? এখানে দর বেশী।

—দর? হ্যাঁ, তা বেশী।

—হোটেল দেখাশোনা করবে কে এখন?

শান্তিরাম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—হোটেল নেই।

নীরদা বিস্ময়ের সুরে বলিল—নেই! তবে অন্য কি—কেন, এই সেদিনও তো চিঠি লিখলে হোটেলের কাজ চলছে ভাল।

শান্তিরাম বলিল—চলছিল তো ভালই। তারপর কিসে থেকে কি হলো, কেবল দেনা বাড়তে লাগলো। বিক্রি হয়ে গেল দেনার দায়ে।

—সে বালা-জোড়াটা আছে তো! এনেছ সঙ্গে তো?

নীরদা এই ধরনের প্রশ্ন করিয়া বড় বিপদে ফেলে। এই ধরনের প্রশ্ন না করিয়া যদি বলিত—"সে বালা দুগাছাও ঘুচিয়ে দিয়েছ তো?" তাহা হইলে উত্তর দেওয়াটা সহজ হইত যে বালা ঘুচিয়া গিয়াছে। মিটিয়া গেল। এতখানি আশা-ভরা প্রশ্নের উত্তরে তাহাকে এখন—

না, সংসার করা এত বিপদ জানিলে সে বিবাহ করিত না। বিবাহ সে ইচ্ছা করিয়া করেও নাই। স্বর্গীয় পিতৃদেব বাঁচিয়া থাকিতে পুত্রবধূর মুখ দেখিবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় উনিশ বছরের ছেলে শান্তিরামের বিবাহ দিয়া যান বারো বছর বয়সের নীরদার সঙ্গে।

—ইয়ে, বালা কোথায় নীরদা? বালা বিক্রী করেই তো হোটেল খুলেছিলাম!

নীরদা হঠাৎ নিজের গালে চড় মারিতে মারিতে বলিতে লাগিল—ওমা আমার কি হবে, ওমা আমার কি হবে—

শান্তিরাম বিরক্ত হইয়া বলিল—আঃ, কি ছেলেমানুষি কর—থামো—

ছেলেমেয়েরা কাঁদিয়া উঠিল।

শান্তিরামের ভাত খাওয়া হইল না—সে ভাত ফেলিয়া উঠিয়া নীরদার হাত ধরিল। স্বামীস্ত্রীতে তুমুল ঝগড়া বাধিয়া গেল। নীরদাকে শান্ত করিতে শান্তিরামের সময় লাগিল। মেয়েমানুষকে বোঝান দায়। অনেকক্ষণ পরে নীরদা কিছু প্রকৃতিস্থ হইল। চোখে মুখে জল দিয়া আসিয়া বলিল—তোমার খাওয়া হলো না—আর দুটি ভাত আছে,

বেড়ে নিয়ে আসি।

—না না, থাক। শোয়া যাক এখন। রাত হয়েছে বারোটা কি একটা—

শান্তিরাম স্ত্রীর প্রতি মনে মনে বিরক্ত হইয়াছে—একজোড়া বালা না হয় গিয়াছে, তা বলিয়া সে খাইতে বসিয়াছে আর এমন কুরুক্ষেত্র কাণ্ড! ছিঃ, এর নাম সংসার? একটু সান্ত্বনার কথা নাই, সহানুভূতি নাই! আচ্ছা সন্ন্যাসী হইয়া গেলে কেমন হয়? অনেকে তো যায়। সংসার আর ভাল লাগে না।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঠিকই বলিয়াছেন—কামিনী কাঞ্চন অসার! তাহাদেরই গ্রামের পাশে বন্দিপুরের মুখুজ্জে বাড়ীর বড় ছেলে রাধাকান্ত বহুদিন আগে সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছিল—এখন কি একটা বেশ বড় গোছের নাম লইয়া কাশীতে মঠ করিয়া আছে। বহু শিষ্য সেবক। দুধ ঘি খায়, কোন কষ্ট নাই—পায়ের উপর মোহর প্রণামী। দিব্যি আছে। আর সংসার করিলে তাহারও দশা এই রকমই হইত—ছেলেপিলে লইয়া জড়াইয়া মরিতে হইত এতদিন।

কামিনী কাঞ্চন সত্যই অসার।

নীরদাও স্বামীর উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া উঠিল না। শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল, বালা-জোড়াটা একমাত্র সম্বল ছিল। এই তো সংসারের ছিরি! তাহার বাবার দেওয়া বালা। শ্বশুরবাড়ী?......তাহা হইলে ভাবনা থাকিত না! এক কুচো এখানকার সোনা কোনদিন অঙ্গে ওঠে নাই। কি বিবাহই দিয়াছিলেন বাবা! অকর্মণ্য—আসল কথা এই যে অকর্মণ্য স্বামী। কত পুরুষ মানুষ কত কাজ করিয়া পয়সা রোজগার করিতেছে. গরীব অবস্থা হইতে বড় লোক হইতেছে। আর তাহার স্বামী যাহা ঘরে আছে বা ছিল, তাহাও ঘুচাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ী আসিয়া বসিল। বড়লোক হইতে সে চায় না। কিন্তু এই দুর্বৎসরের বাজারে ছেলেপিলের মুখে অন্ন দিতে হইবে তো? এমন লোকের বিবাহ করা উচিত হয় নাই। বিবাহের শখ আছে, স্ত্রীপুত্র পুষিবার ক্ষমতা নাই।

শেষরাত্রে ভয়ানক বৃষ্টি আসিল, ফুটা ছাদ দিয়া নানাস্থানে জল পড়িতে লাগিল। নীরদা ছেলেমেয়েদের লইয়া সরিয়া বিছানা পাতিল। স্বামীর মশারি ভিজিতেছিল দেখিয়া তাহাকে উঠাইল। শান্তিরাম কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে উঠিয়া বিছানার উপর বসিয়া বলিল—আঃ, কি?

—মশারি ভিজছে—ওঠো একটু। বৃষ্টি এসেছে বড্ড।

নীরদা মশারি খুলিয়া কোণের দিকে লইয়া গিয়া আবার খাটাইতে লাগিল। শান্তিরাম বিরক্তমুখে বিছানায় বসিয়া ছিল, কেরোসিনের টেমির মৃদু আলোয় নীরদার দিকে চাহিয়া দেখিল—নীরদা দেখিতে যেন বুড়ী হইয়া গিয়াছে এরই মধ্যে। বিবাহের পর প্রথম কয়েক বছর কি সুন্দর ছিল দেখিতে! সে রং, সে চেহারা কয়েক বছরের মধ্যেই যেন ভোজবাজির মত উড়িয়া গেল।

ঠিক তেমন ভালবাসাই কি এখন আছে? সে আকুলি-বিকুলি ভাব, না দেখিলে বাঁচি না ইত্যাদি—বহুদিন চলিয়া গিয়াছে।

নীরদা মশারি খাটাইতেছে। সামনের কপালখানা মাঠের মত চওড়া হইয়া গিয়াছে চুল ওঠার দরুন, ময়লা শাড়ীখানাতে চেহারা আরও খারাপ দেখাইতেছে। যেন ভদ্রলোকের ঘরের মেয়েই নয়। ফর্সা একখানা কাপড় পরিলে কি হইত?

শান্তিরামের মনে স্ত্রীর প্রতি হঠাৎ কেমন অনুকম্পা জাগিল। বেচারী নীরদা! তাহারই দোষে নীরদা অমন হইয়া গিয়াছে। মেয়েমানুষ অসহায়, যেমন রাখিবে তেমনি থাকিবে। পরাও না শান্তিপুর ফরাসডাঙার জরিপাড় শাড়ী, চড়াও না মোটরগাড়ীতে? এমন চড়িবে যখন, সাজসজ্জাও করিবে তখন। উহার দোষ কি?

না—কাল উঠিয়া কোন একটা চেষ্টা-চরিত্র দেখিতে হইবে। হাত-পা হারাইলে

চলিবে না!

নীরদা বলিল, পান দেব, পান খাবে?

—না! এক গেলাস জল বরং দাও। তামাকের পাত্রটা কোথায় রেখেছ? টিকেগুলোতে জল না পড়ে।

—তামাক খাবে নাকি? সাজবো?

—থাক, তুমি জল দাও। তামাক আমি সাজছি।

তামাক টানিতে টানিতে শান্তিরাম বলিল—এখানে আর দেনা কত হয়েছে?

—তা পনেরো-ষোল টাকা কেষ্টর দোকানে বাকি পড়েছে। রোজ তাগাদা করে, বলেছিলাম পুজোর সময় বাড়ী এলে একেবারে নিও—

—পনেরো-ষোল টাকা! এত ধার জমলো কি করে?

নীরদা একটু ঝাঁজের সহিত বলিল—জমবে আর কি করে! চার মাস যে বাড়ীতে উপুড়হাত করোনি সে কথা মনে আছে? চালাচ্ছি কি করে তবে? তবুও আমার কথায় চাল ধার দেয়—নইলে পাড়ায় ধার দেওয়া দোকান থেকে বন্ধ করে দিয়েছে!

এই কথাটিতে শান্তিরামের দুর্ভাবনা আবার বাড়িয়া গেল। একটা টাকা যাহার কাছে একটা মোহর—বর্তমানে, তাহার মুদীর দোকানে পনেরো-ষোল টাকা বাকি! না শোধ করিলে অবশ্যই চলে এবং চলিতও। কিন্তু বর্তমানে অসহায় অবস্থায় দোকান হইতে ধারে জিনিসপত্র না লইলে চলিবে না—এবং লইতে গেলেই পূর্বের দেনার কিছু অংশ শোধ করিতেই হইবে।

নীরদা বলিল—শুয়ে পড় এখন। ভেবে আর কি হবে। যা হবার হবে।

নীরদার এ কথাটা আবার শান্তিরামের বেশ লাগিল। নীরদার মনে ভালবাসা আছেঃ দুঃখ হোক, কষ্ট হোক, নীরদার মুখখানা দেখিলে তবুও যেন অনেকটা শান্তি।

নীরদা বলিল—ওগো শোন, তোমাদের গাঁয়ে পশুপতি মুখুজ্জে কে ছিল? পুকুরধারের ওই যে বড় দোতলা বাড়ীটা? ও তো আমার বিয়ে হয়ে পর্যন্ত পড়েই আছে ওই ভাবে। ওই বাড়ীর লোক এসেছে, আজ পুকুরের ঘাটে গিয়ে দেখি গাড়ী করে নামলো। একজন ছোকরা, এক ষোল-সতেরো বছরের মেয়ে, এক বুড়ী—বোধ হয় ওদের মা—মেয়েটা আইবুড়ো, বেশ দেখতে। ওরা পশ্চিমে থাকতো না?

শান্তিরাম বলিল—পশুপতিদাদার বাড়ীতে? তা হবে। পশুপতিদাদা তো মারা গিয়েছেন আজ সাত-আট বছর। তাঁর ছেলে শুনেছি ইঞ্জিনিয়র। এতকাল পরে দেশের কথা মনে পড়েছে বোধ হয়। লখনৌ না কানপুর কোথায় থাকে।

—কোন জন্মে তো আসতে দেখিনি। বাড়ীটা তো ভাঙাচোরা, থাকবে কি করে ও বাড়ীতে?

পরদিন সকালে শান্তিরাম বাহিরের ঘরে বসিয়া আছে, এমন সময় পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের একটি সুদর্শন যুবক আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—কাকা চিনতে পারেন?

শান্তিরাম বুঝিল এটি পশুপতি মুখুজ্জের ছেলে, যাহার কথা রাত্রে হইয়াছিল। বলিল—এসো বাবা, এসো। তোমার খুড়ীমা বলছিলেন—তোমরা কাল এসেছ। তোমার বাবার সঙ্গে আমার যথেষ্টই—আহা পুণ্যাত্মা লোক—তোমাদের রেখে স্বর্গে চলে গিয়েছেন—বসো বাবা, বসো। বৌদিও এসেছেন নাকি?

—না, মায়ের শরীর ভাল না। সঙ্গে এসেছেন আমার এক সম্পর্কে মাসীমা। আমি কখনো গাঁয়ে আসিনি—কাউকে চিনি নে। সকলের সঙ্গে আলাপ করে বেড়াচ্ছি। দেখুন, এই বাপঠাকুরদার দেশ। অথচ কাউকে চিনি নে। বাড়ীটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে একেবারে। কাল সারা রাত্তির বিছানায় জল পড়েছে। সঙ্গে আমার বোন আছে—ওকেও নিয়ে এলাম,

এবার ম্যাট্রিক দেবে। কলকাতায় মামার বাড়ী থেকে পড়ে।

—বেশ বেশ, খুব ভালো বাবা। যাবে আসবে বৈ কি? তোমরা গাঁয়ের রত্ন, না এলে-গেলে কি হয়? দেখছ তো গাঁয়ের অবস্থা। এমন সোনার চাঁদ ছেলে সব থাকতে, আমরা কি কষ্ট পাচ্ছি দেখ গাঁয়ে থেকে। তোমার নামটি কি বাবা?

যুবক বলিল—আজ্ঞে আমার নাম সুশান্ত। আমার বোনের নাম চিন্ময়ী, চিনু বলে ডাকে। আপনার কাছে যে জন্যে এলুম তা বলি। বাবা আমাদের হাতে কিছু টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন, ঠাকুরদাদার নামে গাঁয়ে একটা পুকুর কেটে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে। আজ সাত বছর বাবা মারা গিয়েছেন, কিন্তু নানা কারণে আমার গাঁয়ে আসা ঘটেনি। তাই এবার ভাবলুম—যাবই। কাজটা সেরে আসি। আমাদের বাড়ীর সামনে যে পুকুরটা রয়েছে, ও তো একেবারে মজা। ভাবছি ওটাকে কাটাবো। পাড়ার লোকের জল খাওয়ার সুবিধে হয় তা হ'লে। তা ও-পুকুরে আপনার অংশ আছে শুনলাম। আমি অন্য সব অংশীদারের কাছে গিয়েছিলাম, তাঁরা সব রাজী হয়েছেন। এখন আপনি যদি—আমি অবিশ্যি ন্যায্য দাম যা হয় দেব। সকলকেই দেব।

শান্তিরাম বলিল—এর আর কি বাবা, খুব ভাল কথা। তোমার খুড়ীমার সঙ্গে একবার পরামর্শ করে ওবেলা কি কাল যা হয় বলব।

যুবক চলিয়া গেল। শান্তিরাম স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল—শোন, শোন। একেবারে অকূল ভাবছিলাম, একটা কূল দেখা দিয়েছে—

তারপর পুকুরের ব্যাপারটা বর্ণনা করিয়া বলিল—মজা এঁদো পুকুর পড়ে আছে শেওলা হয়ে। কখনো কিছু তো হয় না। যা পাও, পঁচিশটে টাকাও দেবে। ভগবান জুটিয়ে দিয়েছেন। ভালোয় ভালোয় চুকে গেলে পাঁচ পয়সার হরিলুট দিও।

দুপুরের পর পশুপতি মুখুজ্জের মেয়েটি শান্তিরামের বাড়ী বেড়াইতে আসিল। নীরদাকে প্রণাম করিয়া বলিল, কাকীমা, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

নীরদা কাঁথা সেলাই করিতেছিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া মেয়েটির চিবুক ছুঁইয়া আদর করিয়া বলিল, এসো মা আমার, এসো, বসো। গরীব কাকার বাড়ী, তোমায় মা কোথায় বসাই: এ আসনখানাতে বসো মা।

দুজনে ভাবসাব খুব শীঘ্রই হইয়া গেল। মেয়েটি বেশ সুন্দরী। সারা দেহে একটা গতির হিল্লোল, ছিপছিপে গড়ন, মাথায় একরাশ চুল একটু নামাইয়া এলানো খোঁপা বাঁধা—সাদাসিধা ধরণের শাড়ী ব্লাউজ পরনে। হাসি ছাড়া যেন কথা কহিতে পারে না মেয়েটি।

নীরদা বলিল—তোমার দাদা এসেছিল ওবেলা তোমার কাকার সঙ্গে দেখা করতে। শুনলুম বড় ভাল ছেলেটি। তুমি ইস্কুলে পড় শুনলাম। কি পড়?

—ক্লাস টেন্-এ পড়ি। এবার ম্যাট্রিক দেব।

—তোমার মা এলেন না কেন? কখনো দেখিনি তাঁকে।

—তাঁর শরীর ভাল না। বিছানা থেকে উঠলে মাথা ঘোরে—কোথাও বেরুতে পারেন না।

—আহা! তাঁর দেখাশুনো কে করে? তোমার দাদার বিয়ে হয়েছে?

—না, দাদা বিয়ে করবে না এখন। দেশসেবা করবে, যারা লেখাপড়া জানে না তাদের লেখাপড়া শেখাবে—এসব দিকে মন। দেশের কাজ করবে বলে পাগল। অন্য ধরনের মানুষ দাদা।

দাদার কথা বলিবার সময় মেয়েটির চোখের দৃষ্টি স্নেহ ও শ্রদ্ধায় নম্র হইয়া উঠিল। ক্ষণে ক্ষণে ইহার মুখের চেহারা যেন বদলাইয়া যাইতেছে। ভারী জীবন্ত চোখমুখ—এসব পাড়াগাঁয়ে নীরদা কখনও এমন মেয়ে দেখে নাই।

অনেকক্ষণ বসিয়া এগল্প ওগল্প করিবার পর মেয়েটি উঠিতে চাহিলে নীরদা বলিল—চিনু মা, গরীব কাকিমার বাড়ী এসেছ যদি, কিছু না খেয়ে তো যেতে পারবে না। তুমি বসো, আমি একটু হালুয়া করে আনি—

চিনু বলিল—মুড়ি নেই কাকিমা? মুড়ি খেতে বড় ভালবাসি।

নীরদা তাড়াতাড়ি মুড়ি মাখিয়া আনিয়া দিয়া বলিল—তুমি কি মুড়ি খেতে পারবে মা, সেই জন্যে দিতে ভরসা করিনি। আমি নিজে মুড়ি ভাজি—

সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল মুড়ির ধান ফুরাইয়াছে, অথচ কিনিবার পয়সা নাই। আর দুদিন পরে চিনু আসিলে তাহাকে মুড়ি দিবার সামর্থ্য পর্যন্ত থাকিত না। মান-সম্ভ্রম কি করিয়া বজায় থাকে যে সংসারে পুরুষ মানুষ অমন অকর্মণ্য!

চিনু সেদিন গেল, কিন্তু পরদিন সকালে আবার আসিয়া প্রায় ঘণ্টা-দুই নীরদার সঙ্গে কাটাইয়া গেল। ভারি অমায়িক মেয়ে, এদিন সংসারের যত তরকারি, সব বঁটি পাতিয়া বসিয়া বসিয়া কুটিয়া দিতে লাগিল, নীরদার কোন বারণ শুনিল না। পাড়ার অন্য সকলের বাড়ীতে চিনু তত যায় না, যত এখানে সে আসে। নীরদাকে তাহার কি যে ভাল লাগিল সে-ই জানে! দিনে অন্ততঃ দুইবার তার এখানে আসাই চাই নীরদারও তাহাকে বেশ ভাল লাগে।

দিন দশ বারো পরে একদিন শান্তিরাম স্ত্রীকে বলিল—শুনেছ, আমার অংশের দাম ধার্য হয়েছে বত্রিশ টাকা। আশা করি নি এত হবে! তা সবাই যে দর নিয়েছে আমিও তাই নিলাম।

নীরদা অবাক হইয়া বলিল—সে কি গো! ওই এক মজা ডোবা, বত্রিশ টাকা করে অংশ হলে ছ-অংশের জন্য সুশান্তকে দুশো টাকা দিতে হবে?

—তা হবে বৈ কি। ঠাকুরদাদার নামে পুকুর পিরতিষ্ঠে করবার গরজ আছে—টাকা খরচ করবে না?

নীরদা গম্ভীর মুখে বলিল—একটা কথা বলি শোন—তুমি ও টাকা নিতে পারবে না। ছেড়ে দাও অমনি।

শান্তিরাম অবাক হইয়া বলিল—এমনি ছেড়ে দেব! কেন? বেশ তো তুমি—

নীরদা বলিল—চিনু আমাকে বড় ভালবাসে। এখানে ছাড়া সে কোথাও যায় না আসে না। দুটি চালভাজা দিই তাই হাসিমুখে বসে বসে খায়। মেয়ের মতো মায়া হয়েছে ওর ওপর, ওদের কাছ থেকে তুমি ওই ডোবা বেচে টাকা নিতে পারবে না—আর যে টাকা নেয্য নয়, তা কখনও নিতে পারবে না তুমি।

—তবে চলবে কি করে শুনি? এ টাকা ছাড়লে কিসে থেকে কি হবে?

—তা যাই হোক! ওরা বড়মানুষ বটে, কিন্তু গাঁয়ে সবাই ওদের ঠকিয়ে নিচ্ছে ছেলে-মানুষ পেয়ে—তা বলে তুমি তা নিতে পারবে না। এতে আমাদের ভাগ্যে যা আছে! তুমি নিলে আমি অনথ বাধাব বলে দিচ্ছি।

স্ত্রীকে শান্তিরাম ভয় করিত। কাজেই যখন অন্য সরিকেরা ডোবার অংশের দাম কড়ায়গণ্ডায় বুঝিয়া পাইল, শান্তিরাম কিছুতেই টাকা লইল না। সুশান্তকে বলিল—পশুপতি দাদার ইচ্ছেতে তাঁর বাবার নামে পুকুর হবে, আমি তাতে টাকা নিতে পারব না। এমনি লিখে দিচ্ছি আমার অংশ। ও অনুরোধ ক'রো না বাবা।

রাত্রে সে স্ত্রীকে বলিল—কথায় বলে স্ত্রীবুদ্ধি। তুমি টাকা নিতে দিলে না, এখন কর উপোস! বত্রিশ টাকায় দুটি মাস ভাবতে হতো না। এখন আমি কোথা থেকে কি করি, এই পুজো আসছে সামনে. অন্তত ওদের কাপড় কিনে দিতে পারতাম তো—

নীরদা বলিল—ফাঁকি দিয়ে টাকা আদায় করে সে টাকায় আমার ছেলেমেয়ের কাপড় কিনতে হবে না। ওরা কাপড় এবার না হয় পরবে না। যেমন চিনু, তেমনি ওর দাদা—

ওরা ছেলেমানুষ। ওদের কাছ থেকে দাম নিয়ে অনেয্য টাকা আদায় করে কদিন খাবে? বেশ করেছ ছেড়ে দিয়েছ।

টাকাটা হাতছাড়া হওয়াতে শান্তিরাম দুঃখিত হইল বটে কিন্তু স্ত্রীর এ নূতন মূর্তি তাহার কাছে লাগিল ভাল। সোনার বালার শোকে স্ত্রীর যে মূর্তি দেখিয়াছিল, ইহা তাহার বিপরীত ; নীরদা—না, বেশ লোক। এ জিনিস যে আবার নীরদার মধ্যে আছে—

বলিল—শোন, ওপাড়ার মহেশদাদা তো এক শরিক! আমায় ডেকে পরশু বলছে—হ্যাঁ হে, তোমরা নাকি বত্রিশ টাকা করে অংশ ধার্য করেছ? আমি আমার অংশ পঞ্চাশ টাকার কমে দেব না। ওদের গরজ পড়েছে, বড়লোক, যা চাইবো তাই দিতে হবে। ও খাস ব্রহ্মোত্তর, ছাড়বো কেন অত সহজে?—সত্যি যা বলেছ, সুশান্তকে ভালমানুষ পেয়ে ওরা দম দিয়ে বেশী টাকা আদায় করেছে।

—করে থাকে করেছে। যার ধর্ম তার কাছে। ও টাকা কদিন খেতে? ও কথা বাদ দাও। পুকুর কাটিয়ে দেবে ওরা একগাদা টাকা খরচ করে কিন্তু জল খাবে পাড়ার পাঁচজনেই তো? ওরা সেই পশ্চিম থেকে কিছু পুকুরের জল খেতে আসছে না। আমাদের সুবিধের জন্যেই ওরা করে দিচ্ছে। চিনু বলেছিল, ওর দাদা পরের কাজে, দেশের কাজে বড় মন দিয়েছে। বেশ ছেলেটি।

পুজোর দিন কয়েক বাকি।

সুশান্ত সন্ধ্যার সময় শান্তিরামের বাড়ী আসিল। বলিল—কাকা, আমরা কাল চলে যাচ্ছি পশ্চিমে। আমার ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। আপনার উপর একটা ভার দিয়ে যেতে চাই। পুকুর কাটানোর ভারটা আপনি নিন। গাঁয়ের মধ্যে আপনি অনেস্ট লোক দেখলুম। চিনুর মুখে আপনাদের সব কথা আমি শুনেছি। একটা প্রস্তাব আছে আমার, যদি কিছু মনে না করেন তবে বলি। আমি এই পুকুর কাটানোর আর আমাদের জমিজমা বাড়ীঘর এখানে যা আছে তা দেখাশুনা করবার জন্যে মাসে আপনাকে পনেরো টাকা দেবো। পুকুর কাটানো হয়ে গেলে আমাদের বাড়ীটা মেরামত করবার ভারও আপনার ওপর থাকবে। আমি টাকা পাঠিয়ে দিয়ে খালাস হবো। মাঘ মাসের দিকে মাকে নিয়ে এসে পুকুর প্রতিষ্ঠা করে যাবো। বলুন কাকা, এতে আপনি রাজী আছেন—রাজী না হলে ছাড়ছি নে, গাঁয়ে আর লোক নেই। আর আমাদের যাওয়ার আগে আপনার দু-মাসের টাকা দিয়ে যাবো—কেন না, পুজো আসছে, খরচপত্র আছে তো? পুকুর-কাটার দরুনও আপাততঃ একশো টাকা আপনার হাতে দিয়ে যেতে চাই—আপনাকে সকলে গাঁয়ে বলে হোটেলওয়ালা বামুন, কিন্তু দেখছি আপনিই খাঁটি লোক।

শান্তিরামের মাথা ঘুরিয়া গেল। ছোকরা আরও সব যে কি বলিয়া গেল শান্তিরামের মাথার মধ্যে কিছু ঢুকিল না। সুশান্ত চলিয়া গেলে তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর গিয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল—ওগো কোথায় গেলে, শুনছো—শোন শোন—

নীরদা সব শুনিয়া হাসিমুখে বলিল—স্ত্রীবুদ্ধি বলছিলে যে? আমার বুদ্ধি নিয়ে চলো একটু।

ফিরিওয়ালা

অনেক দিন আগে বাল্যজীবনে যখন কলকাতায় এসে কলেজে পড়াশুনা আরম্ভ করি, তখন হ্যারিসন রোডের একটা ছাত্রদের মেসে থাকতাম।

একজন ফিরিওয়ালা সে-সময় প্রত্যহ আমাদের মেসে আসত, তার মাথায় একটা চেপ্টা গড়নের হাঁড়ি—তাতে থাকত ক্ষীরমোহন ও রসগোল্লা। লোকটা সত্যিই ভারি চমৎকার ক্ষীরমোহন তৈরি করতে পারত—এবং তার চেয়েও বড় গুণ ছিল লোকটার,—সে ধারে খাবার দিয়ে যেত মেসের ছেলেদের।

মেসে জিনিসপত্র যারা বিক্রি করে, ধার না দিলে তাদের ব্যবসাই চলে না—একথা তাদের চেয়ে ভালভাবে কেউ বুঝত না। ধারও যেমন তেমন ধার নয়, মেসের ছেলেরা নির্বিবাদে দিনের পর দিন খেয়ে চলেছে, মাস শেষ হলে দেখা গেল, ফিরিওয়ালার ক্ষীরমোহনের দেনা দাঁড়িয়েছে এক-একজনের কাছে দশ টাকা, পনেরো টাকা। মজা হচ্ছে এই যে, টাকা শোধ না হলেও এসব ক্ষেত্রে ধার দিয়েই যেতে হবে—কারণ খাবার খাইয়ে না যেতে পারলে টাকা কখনই আদায় হবে না।

ক্ষীরমোহনওয়ালার মুখে বিনয়ের হাসি সর্বদাই লেগে থাকত, আমি কখনো তার হাসিমুখ ছাড়া দেখিনি অন্ততঃ। ও এলেই বড় ভাল লাগত—ওর মুখের মজার মজার হাসির গল্প শুনতে। মেসের ছেলেরা গল্প শুনতে শুনতে চার-পাঁচ টাকার খাবার খেয়ে ফেলত সবাই মিলে।

লোকটার চেহারা ছিল ভাল। বেশ দোহারা গঠনের, রং একটু ফর্সা, বড় বড় গোঁপ জোড়া দেখলেই আমাদের খুব হাসি পেত, তার ওপরে ওর মুখে ওর দেশের নানান রকম মজার গল্প শুনতে গিয়ে হাসতে হাসতে আমাদের পেটে খিল ধরবার উপক্রম হত।

ঘড়ির কাঁটার মত লোকটা আসত আমাদের মেসে।

ঠিক সাতটা যে-ই বাজল, মুখ ধুয়ে উঠে সবাই বসেছে, এইবার চা আর খাবার আনবার দরকার, অমনি দেখা গেল ক্ষীরমোহনওয়ালা তার চেপ্টা হাঁড়ি মাথায় করে হাজির হয়েছে। দুঘণ্টা ধরে নানারকম হাসির গল্পের মধ্যে বেচা-কেনা নিষ্পন্ন করে সে তার চেপ্টা হাঁড়িটা মাথায় তুলে আবার ফিরে যেত। এই রকম দুই তিন বছর কেটে গেল।

তারপর আমাদের মেস গেল ভেঙে, আমিও অন্যত্র গিয়ে উঠলাম। দিনকতক পরে আমার নতুন মেসে আবার সেই ফিরিওয়ালা গিয়ে হাজির।

মেসের ছেলেদের মন কি করে পেতে হয়, এ আর্ট ভালভাবে জানা ছিল লোকটার। মাসখানেক যেতে না যেতে ও এখানেও সবার অতি প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। এক হাঁড়ি করে প্রতিদিন বিক্রি হতে লাগল এ মেসেও। একদিন ক্ষীরমোহনওয়ালা (ওর নামটা বোধ হয় ছিল পঞ্চানন, কিন্তু ওর নাম ধরে কেউ কোনদিন ডাকেনি, কাজেই ঠিক মনে নেই) এসে আমাদের হাতজোড় করে বল্লে—বাবুমশাইরা, আমার ছেলের বিয়ের আজ বৌভাত, আপনাদের দোরে খেয়েই তো আমি মানুষ। আপনারা সবাই আমার মনিব। বলতে সাহস পাইনে, তবে যদি আপনারা দয়া করে আমার ওখানে আজ পায়ের ধুলো দিয়ে মিষ্টিমুখ করে আসেন, তবে বড় খুশী হই।

মেসের অনেকে গেল, কি কারণে আমার যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও শেষ পর্যন্ত যাওয়া ঘটে নি। যারা গিয়েছিল তারা ফিরে এসে ফিরিওয়ালার খাতির ও যত্ন আতিথ্যের যথেষ্ট প্রশংসা করলে।

বেলেঘাটা অঞ্চলে কোথায় একটা ছোট্ট খোলার বাড়ীতে ফিরিওয়ালার বাসা। তারই সামনে অন্য একখানা খোলার বাড়ীর বাইরের ঘরে ওদের বসবার জন্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিছানা পাতা হয়েছিল। পান তো ছিলই, এমন কি কাঁচি সিগারেটের পর্যন্ত ব্যবস্থা ছিল। মেসের ছেলেরা নববধূর জন্যে কিছু না কিছু উপহার নিয়ে গিয়েছিল। বৌটিও বেশই হয়েছে সবাই বল্লে, তবে বয়েস কম, এগারো বছরেরর বেশী নয়—ছেলের বয়েসই সবে ষোল বছর।

তারপর ফিরিওয়ালা সকলকে পরিতোষ করে খাইয়ে ছেড়েছে—লুচি, তরকারি, মাছ, দই, সন্দেশ ইত্যাদি। খাওয়ার পর আবার পান সিগারেট। একজন সামান্য ফিরিওয়ালা যে এমন চমৎকার খাতির যত্ন করবে ভদ্রলোকের ছেলেদের, সেটা এমন বেশী কথা কিছু নয়, কিন্তু তার আয়োজন যে এমন ত্রুটিশূন্য হবে, তার ঘর দোর, বসবার বিছানা যে এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে এটাই অনেকে আশা করেনি। এমন কি যাবার সময়ে

সকলে ঠিক করেই গিয়েছিল, যাচ্ছি বটে—নিতান্ত গরীব লোকটা নিমন্ত্রণ করে ফেলেছে, না গেলে মনঃক্ষুণ্ণ হবে তাই যাওয়া। ওর ছেলের বউয়ের মুখদেখানি স্বরূপ কিছু কিছু ওর হাতে দিয়েই চলে আসবে, কিন্তু খাবে না কেউ সেখানে। তার পরিবর্তে তারা যা দেখলে. তা আশাতীত বটে তাদের পক্ষে। দু-তিন-দিন ধরে মেসে ফিরিওয়ালার ছেলের বিয়ের কথাই চলল।

তারপর আবার ফিরিওয়ালা মেসে আসতে লাগল। আগের চেয়ে তার দশগুণ খাতির বেড়ে গেল আমাদের মেসে। ক্ষীরমোহন এক হাঁড়ি করে উঠত আগে—এখন দুবেলা ওঠে দু-হাঁড়ি।

ধড়িবাজ ব্যবসাদারও বটে লোকটা।

আরও বছর দুই পরে আমার ছাত্রজীবন শেষ হল, আমি কলকাতার বাইরে গেলাম চাকুরি নিয়ে এবং সেখানে সাত আট বছর কাটিয়ে দিলাম। কলকাতার জীবন ক্রমশঃ দূরের হয়ে গেল—মেসের কথা, পুরাতন বন্ধুবান্ধবদের কথা আর তেমন করে ভাবিনে। সেবার পুজোর পূর্বে বিশেষ কি কাজে কলকাতায় এসে দেখলাম, আমার পূর্ব-পরিচিত সেই ক্ষীরমোহনওয়ালা হাঁড়ি মাথায় নিয়ে মেসে খাবার বিক্রী করতে এসেছে।

আমি বল্লাম—কিগো, চিনতে পার?

ফিরিওয়ালা আমায় দেখে চিনতে পারলে, খুব খুশী হল। প্রণাম করে বললে—বাবুমশাই, চিনতে পারব না আপনাদের? আপনাদের দোরে খেয়ে মানুষ আর আপনাদের চিনব না? তা এখন কোথায় আছেন? অনেক কাল আপনাকে দেখিনি। বিয়ে'থা করেছেন বাবু? ছেলেপিলে হয়েছেন?

আমি আমার সব খবর মোটামুটি তাকে দিয়ে জিগ্যেস করলাম—তোমার সব খবর ভাল? আছ কেমন? তোমার ছেলেটি এখন কি করে—

লোকটা চুপ করে থেকে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—বাবু, সে নেই।

আশ্চর্য হয়ে বললাম—তোমার ছেলেটি নেই! মারা গিয়েছে? কতদিন হল?

ফিরিওয়ালার চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল। ময়লা কোঁচার খুঁটে চোখের জল মুছে বললে—বাবু, তার কি হয়েছে তা যদি জানতাম, তা হলে তো মনটা শান্ত হত। আর বছর মাঘ মাসে একদিন বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল বৌবাজার যাব বলে। বৌবাজারে আমাদের দেশের একজন লোকের মুদিখানার দোকান আছে। সেই যে বাবু গেল, আর এল না।

—খুঁজেছিলে?

—খোঁজার কি কিছু বাকি রেখেছিলাম বাবু? সব হাসপাতাল সব জায়গা খোঁজ করেছিলাম—কোন সন্ধান নেই। এখন সব আশা ছেড়ে দিয়েছি বাবু। আপনার সঙ্গে একটা কথা বলব—কাল থাকবেন?

পরদিন সকালে ফিরিওয়ালা আবার এসে আমার ঘরের দোরের সামনে দাঁড়াল। বললাম—এস, ঘরের মধ্যে এস, কেউ নেই—কি কথা বলবে বলছিলে?—

—বাবু, আপনি একটু খবরের কাগজে লিখে দেবেন ছেলের কথাটা? আমায় লোকে বলে তুমি কাগজে লিখে দাও, তা হলে ছেলে পাওয়া যাবে। দেবেন লিখে বাবু?

কোথায় কি লিখে দেব বুঝতে পারলুম না। এতদিন পরে লিখে দিলেও যে বিশেষ কোন ফল হবে. সে সম্বন্ধে আমার নিজের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তবুও পুত্রশোকার্ত পিতাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বল্লুম, আচ্ছা. তুমি বলে যাও, আমি লিখে নিই। কি রকম দেখতে ছিল তোমার ছেলে? বয়েস কত?

কলকাতা ছেড়ে যাবার আগে আমি নিজের খরচে দু'তিনখানা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে গেলাম। বাবা ননী, ফিরে এস, তোমার মা মৃত্যুশয্যায়, যদি শেষ দেখা করতে চাও—

ইত্যাদি।

এর ফলাফলের কথা আমি কিছু জানিনে—কারণ তিন-চার দিনের মধ্যেই আমি আবার কলকাতা থেকে চলে গেলাম।

পুনরায় কলকাতায় ফিরলুম দু-বছর পরে।

কলকাতায় এবার এসেছিলাম খুব অল্পদিনের জন্যে, আগের সেই মেসটাতেই উঠেছিলাম—কিন্তু ফিরিওয়ালাকে এবার আর দেখলাম না সেখানে, তার কথা যে খুব মনে ছিল, তাও নয়।

নিজের কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে সারাদিন এখানে ওখানে ঘুরতাম, অন্য কারও কথা ভাববার অবকাশ ছিল কোথায়?

হয়তো বা ওকে দেখলে সব কথা মনে পড়ত, কিন্তু তা হয় নি।

তারপর আবার চলে গেলুম কলকাতা থেকে।

বিদেশে থাকবার সময়ে অবসর সময়ে আমার মাঝে মাঝে দু-একবার ফিরিওয়ালা ও তার ছেলের কথা মনে হত—তারপর একেবারে ভুলে গেলাম।

ন-বছর পরে বিদেশে চাকুরি ছেড়ে দিয়ে এসে কলকাতাতেই চাকুরির খোঁজে এলাম, মাস কয়েক পরে একটা চাকুরি পেয়েও গেলাম।

মেসেই থাকি। পূর্বে যে অঞ্চলে থাকতাম, সেই অঞ্চলে বটে, তবে অন্য বাড়ীতে। হঠাৎ একদিন দেখি সেই ফিরিওয়ালা। সেই চেপ্টা ধরনের হাঁড়িতে ক্ষীমোহন ভরা. আগেকার মতই। ওকে দেখে কি জানি কেন, আমি হঠাৎ বড় খুশী হয়ে উঠলুম। এই যে মেসে এসে উঠেছি এখানে সবাই অপরিচিত, এদের সঙ্গে আমার মনের কোন যোগই নেই কোন দিক দিয়ে। এই অজ্ঞাত ব্যক্তিদের ভিড়ের মধ্যে এই লোকটিই একমাত্র আমার বহুদিনের পরিচিত—আমার বহুকাল পূর্বের ছাত্রজীবনের সঙ্গে কেবল এই লোকটিরই যোগ আছে—আর কারও নেই এখানকার মধ্যে।

আমাকে কিন্তু ও প্রথমটাতে আদৌ চিনতে পারেনি। আমার চেহারার অনেক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল এর মধ্যে, বয়েসও হয়েছিল, হবারই কথা—আমার বর্তমান জীবন ও ছাত্রজীবনের মধ্যে কুড়ি-একুশ বৎসরের ব্যবধান।

এখনও লোকটা ঠিক সেই আগের দিনের মতই সেই একই ধরনের চেপ্টা হাঁড়ি মাথায় করে মেসে মেসে ক্ষীরমোহন ফিরি করে বেড়ায়।

ওকে ডাকলুম। ক্ষীরমোহন কিনে পয়সা দেবার সময় ও আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে দু-একবার, কিন্তু কিছু বলতে সাহস করলে না।

আমি বল্লুম—কি, চিনতে পারো?

ফিরিওয়ালা হাতজোড় করে প্রণাম করে বল্লে—তাই চেয়ে চেয়ে দেখছি. বাবুমশাই না?...তা এখন আর চোখে তেমন তেজ নেই আগেকার মত। এতদিন কোথায় ছিলেন বাবু?

ফিরিওয়ালার চেহারার কিন্তু বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি। দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম—মাথায় চুল পাকেনি, দাঁত পড়েনি, মুখের চেহারা ঠিক তেমনি আছে।

বল্লাম—আমিও দেখছি—তোমার চেহারা রাখলে কি করে? কিছু বদলায়নি. মনে হচ্ছে যখন হ্যারিসন রোডের মেসে যেতে, সে যেন কাল্‌কের কথা।

ফিরিওয়ালা বল্লে—আর বাবুমশাই, চেহারা!

হঠাৎ মনে পড়ল ওর নিরুদ্দিষ্ট ছেলের কথা। আগে মনে হওয়াই উচিত ছিল সেটা. কিন্তু তা হয় নি। একটু ইতস্ততঃ করে জিগ্যেস করলুম—হ্যাঁ ভাল কথা. তোমার সেই ছেলেটি—

ফিরিওয়ালা বিষণ্ণভাবে ঘাড় নেড়ে বল্লে—না বাবু, সেই যে চলে গেছে. সেই শেষ।

খুব দুঃখিত হলাম শুনে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েও তাহলে কোন কাজ হয়নি!

—ছেলের বৌটি কোথায়?

—আমার কাছেই আছে বাবুমশায়, আর কোথায় যাবে?

—এখন আছ কোথায়?

—বেলেঘাটায় সেই বাসাতেই।

—তোমার স্ত্রী আছে তো?

—না বাবু—সেও আজ চারবছর হলো মারা গিয়েছে। ছেলের নিরুদ্দেশের পর তার শরীর সেই যে ভেঙে গেল, আর তো ভাল হয়নি। বাবু এসে পড়েছেন, ভাল হয়েছে—

—কেন বল তো?

—আমাকে কিছু সাহায্য করুন বাবুমশাই। বারো বছর হয়ে গেল, এবার খোকার কুশপুতুল দাহ করে শ্রাদ্ধ করব। বিধেন নিয়েছি ভটচাষ্যি মশায়ের কাছ থেকে। আমার তেমন রোজগারপাতি নেই আজকাল—ভিক্ষেসিক্ষে করে ছেলের কাজটা করব—

ওকে একটি টাকার বেশী দিতে পারলাম না—নিজেরই চাকুরির অবস্থা সুবিধে নয়, মেসের খরচ চালানোই দুর্ঘট হয়ে পড়েছে।

দিন পনেরো পরে ফিরিওয়ালা এসে আমায় বল্লে—বাবু, আজ আমার ছেলের কাজ, আপনি একটু পায়ের ধুলো যদি দেন গরীবের বাড়ীতে, ছোট মুখে বলতে সাহস হয় না আপনাকে—আপনার দয়া—

ওর অনুরোধ এড়াতে পারলুম না—মন সরলো না। বহুদিনের যোগাযোগ ওর সঙ্গে। আমার ছাত্রজীবনের আমলের আর কোন পরিচিত লোক কলকাতায় নেই—এই ফিরিওয়ালা ছাড়া। যেতেই হলো।

ও একটা ঠিকানা আমায় দিয়ে গেল বেলেঘাটার—যে অঞ্চলে জীবনে কখনো যাইনি, যাবার প্রয়োজনও হয়নি এতদিন। একটা বস্তির খানকুড়ি বাইশ ঘরের মধ্যে অতি কষ্টে ওর ঘর খুঁজে বার করলুম। সামনে একটা ডোবা। সামনে একটা নীচু খোলার ঘরে ফিরিওয়ালা আমায় নিয়ে গিয়ে যত্ন করে বসালে। কেওড়া কাঠের তক্তপোশের ওপর পুরু করে বিছানা পাতা। আমি আসতে ফিরিওয়ালা যে কৃতার্থ হয়ে গিয়েছে ওর প্রত্যেক কথার মধ্যে, হাত-পা নাড়ার ভঙ্গির মধ্যে তার প্রকাশ।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—এ বাড়ীতে কতদিন আছ?

—আজ ত্রিশ বছর বাবু, এ বাড়ীতে আমার খোকা জন্মায়—

তারপর সে ব্যস্ত হয়ে কোথায় চলে গেল। কিছুক্ষণ পরেই একবাক্স সিগারেট এনে আমার সামনে রেখে দিয়ে বল্লে—নিন, বেশ আরাম করুন বাবু, গরীবের কুঁড়েয় যখন এসেছেন—

ওর হাব-ভাব দেখে মনে হবার কথা নয় যে আজ ওর পুত্রের শ্রাদ্ধ। যেন কোন উৎসব আনন্দের কাজ চলছে বাড়ীতে। আমার মনে কেমন সঙ্কোচের ভাব এল, আমি এসেছি বলে আমার খাতির করতে গিয়ে ওকে উৎসবের মতই আয়োজন করতে হয়েছে।

আমায় বল্লে—আমার খোকার যখন বিয়ে হয়, আজ অনেকদিন আগেকার কথা—তখন আপনাদের সেই পুরোনো মেসের রমেশবাবু, হরিধনবাবু, গোপালবাবু, সতীশ-বাবু, ওঁরা সব এসে এই ঘরে এই তক্তপোশেই বসেছিলেন। বড় ভাল লোক ছিলেন ওঁরা। রমেশবাবু ওইখানটাতে বসে চা আর খাবার খেলেন, আমার আজও মনে আছে। সতীশবাবু বল্লেন—ওহে, গরম গরম লুচি নিয়ে এস তো? আমি তখন খোলা চড়িয়ে আমার স্ত্রীকে দিয়ে আলাদা করে গরম লুচি ভাজাই—খেয়ে তাঁদের কি ফুর্তি বাবু-মশাই! বল্লেন—বেশ করেছ, বেশ করেছ—আহা কি সব লোকই ছিল তখন। পান এনে

দি বাবু, বসুন—
আমি সত্যিই অস্বস্তিবোধ করছিলুম। আমারও নিমন্ত্রণ ছিল ওর ছেলের বিয়েতে সেদিন—বহুবছর আগের কথা—বিশ-বাইশ বছর হবে, সে কথা আমার মনে ছিল না, আজ ওর কথায় মনে হল—
তখন কেন আসা হয়নি জানিনে—এতকাল পরে সেই ছেলের শ্রাদ্ধতে এসেছি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।
লোকটা কিন্তু আমায় নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ল।
আমি ওর বাড়ীতে এসেছি, এ যেন ওর কাছে মহাশুভ ঘটনা। বার বার সে আমার কাছে এসে আমার সুবিধা অসুবিধা দেখতে লাগল। বিশ বৎসর আগে যখন আমার মেসের বন্ধুরা ওর বাড়ীতে এসেছিল ওর ছেলের বিবাহে, সেও ওর জীবনে দেখলুম এক অতি স্মরণীয় দিন হয়ে আছে—ঘুরে-ফিরে বার বার ও সেই কথাই পাড়তে লাগল।
—রমেশবাবুরা এলেন, তা আমি ওঁদের জন্যে সব আলাদা বন্দোবস্ত করেছিলাম। ফিরিওয়ালার কাজ করি বটে বাবু, কিন্তু আমি মানুষ চিনি বাবুমশাই। হরিধনবাবু বল্লেন—তুমি ক্ষীরমোহন বিক্রী কর, তোমার ছেলের বিয়েতে আমরা পেট ভরে ক্ষীর-মোহন খাব। নিয়ে এস ক্ষীরমোহন। আমি বড় হাঁড়ির এক হাঁড়ি ক্ষীরমোহন ওঁদের জন্যে আলাদা করে রেখেছিলাম। সতীশবাবু, রমেশবাবু খেয়ে খুব খুশী—তার পরের হপ্তায় সতীশবাবু আমায় পাঁচ সের ক্ষীরমোহনের অর্ডার দেন, বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে—
আমি বল্লাম—বিশ বছর আগেকার কথা তোমার এত খুঁটিনাটি মনে আছে?
ফিরিওয়ালা বল্লে—তা থাকবে না বাবু? আপনারা তো আমার বাড়ীতে রোজ রোজ পায়ের ধুলো দিচ্ছেন না। জন্মের মধ্যে কর্ম একটা দিন। তা মনে থাকবে না!
আর কিছুক্ষণ পরে আমি আরও গোটাদুই পান খেয়ে উঠবার চেষ্টা করছি, ফিরিওয়ালা জিভ কেটে বল্লে—তা কি হয় বাবু? এসেছেন যখন তখন—
আমি বল্লাম—না, শোন। আমি কিছু খেতে পারব না আজ—এ যদি আনন্দের কাজ হত আমি—
—ও কথাই মুখে আনবেন না বাবু। আপনারা আমার মা বাপ—আমার খোকার সদ্‌গতি হবে না আপনি আজ এখানে সেবা না করলে—ব্রাহ্মণ দেবতা আপনি—
অগত্যা কিছু খেতেই হল।
পাশের ঘরে আমার জন্যে পরিপাটি করে খাবার আসন পাতা। একটি ত্রিশ-বত্রিশ বছরের বিধবা যুবতী আধ-ঘোমটা দিয়ে আমায় খাবারের থালা দিতে এল।
ফিরিওয়ালা বল্লে, এই আমার বৌমা। গড় কর বৌমা, ওঁদের খেয়েই আমরা মানুষ—ব্রাহ্মণ দেবতা—
বৌটি গলায় আঁচল দিয়ে অত্যন্ত ভক্তির সঙ্গে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে।
ফিরিওয়ালা কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে বল্লে—বৌমা বড় ভাল মেয়ে মশাই। খোকা যখন আমায় ছেড়ে পালাল, তখন বৌমার কাঁচা বয়েস, এই আঠারো কি উনিশ। সেই থেকে এই সংসারেই আছে, গরীবের সংসার, কখনো ভাল মন্দ খাওয়াতে পরাতে পারিনি। মুখ বুজে সব সহ্য করে এসেছে। আমার পরিবার ওর ওপর একটু অত্যাচার করত, মিথ্যে কথা বলব না, দেবতা আপনারা। বলত, তুই অলক্ষুণে বৌ ঘরে এলি, আর ছেলে আমার দেশছাড়া হল। একদিনের জন্যেও বৌমা ব্যাজার হয়নি সে সব শুনে। এখন তো আর কেউ নেই—ও আছে আর আমি আছি। ওই আমার মা, ওই আমার মেয়ে—
ফিরিওয়ালার পুত্রবধূ ইতিমধ্যে দই আনতে গিয়েছিল বাড়ীর মধ্যে।
আমি বল্লাম—তোমার বৌমা বরাবর তোমার কাছেই আছে?...বাপের বাড়ী কোথায়?

সেখানে মাঝে মাঝে যাতায়াত আছে তো?...

—কোথায় বাবুমশাই? ওর তিন কুলে কেউ নেই। তাই তো মাঝে মাঝে ভাবি, বয়েস হয়েছে, আজ যদি চোখ বুজি, আমি তো বেশ যাব, পুত্রশোক জুড়িয়ে যাবে। কিন্তু বৌমার কথা যখন ভাবি, তখন আর কিছু ভাল লাগে না। কার কাছে রেখে যাব ওকে, সোমত্ত বয়েস, এক পয়সা দিয়ে যেতে পারব না। কখনো ঘরের চৌকাঠের বাইরে পা দেয় নি—কি খাবে, কোথায় যাবে!

—ও কি বাবুমশাই, তা হবে না, ও কখনো ফেলে উঠতে পারবেন না, খেতেই হবে।

আহারাদি শেষ করে চলে আসবার সময় বিধবা মেয়েটি পান এনে রাখলে সামনে। তারপর আমায় ওর শ্বশুর ও সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে।

এরও বছরখানেক পরে পর্যন্ত ফিরিওয়ালা নিয়মিত ভাবে আমাদের মেসে খাবার ফিরি করতে আসত। তারপর গত বৎসর পুজোর ছুটির আগে থেকে ও আর এল না। এখনও পর্যন্ত একদিনও আর তাকে দেখা যায় নি। মাঝে মাঝে লোকটার কথা মনে হয় —বেঁচে আছে না মরে গেল! খোঁজ-খবর নেওয়া উচিত ছিল অবিশ্যি—কিন্তু সময় করে উঠতে পারিনি।

নিষ্ফলা

—আ মর্! এগিয়ে আসছে দেখ না! দূর হ, দূর হ। ওমা আমি কোথায় যাব? এ যে ঘরে আসতে চায়। ছিঃ ছিঃ! ধম্ম-কম্ম সব গেল। বলি ও ভালমানুষের মেয়ে, এমনি করে কি লোককে পাগল করতে হয়?

বেলা বেশী নয়, আটটা হইবে প্রায়। বৈশাখ মাস—বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে। পাশের বাড়ীর গৃহিণী আহ্নিক করিতে বসিয়াছেন তাঁহার পূজার ঘরে। পূজার ঘরটি ত্রিতলে। সেইখানে বাড়ীর দুস্ট কুকুরটি দরজায় আসিয়া উঁকি মারিল। নামাবলীতে সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া ছোট একটি আরশি দেখিয়া নাকের উপর তিলক কাটিতে কাটিতে কুকুরের মুখদর্শন করিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার হাত হইতে সশব্দে তিলক-মাটি পড়িয়া গেল। তিনি তখন পূজায় বাধা পড়িতে দেখিয়া চকিতে ঠাকুরঘরের দরজাটি বন্ধ করিয়া ভীত-কণ্ঠে ঐ কথাগুলি বলিতে শুরু করিলেন। নীচের তলায় বধূটি স্নান করিতেছিল। সে মুহূর্তে ভিজা কাপড়েই দৌড়াইতে দৌড়াইতে উপরে আসিয়া কুকুরটিকে কোলে লইয়া বলিল—বেবী, তুই বড় দুষ্টু হয়েছিস। একদিন না এখানে আসতে বারণ করেছি!

কথা-শেষে সে বেবীর পিঠে মৃদু করাঘাত করিল। বেবী ভারী খুশী হইয়া লেজ নাড়িতে নাড়িতে একবার ডানদিকে একবার বাঁদিকে ফিরিয়া ডাকিল, ঘেউ-ঘেউ!

বিপদ কাটিয়া যাইতে দেখিয়া শাশুড়ী নির্ভয়ে পুনরায় পূজার ঘরের দরজা খুলিয়া দিলেন; বধূকে বলিলেন, দেখো গা বাছা, কুকুরকে অত আদর দেওয়া ভাল নয়। কথায় আছে না, কুকুরকে নাই দিলে মাথায় ওঠে! সব জিনিসের একটা সীমা আছে।

বধূটি প্রতিবাদ করিল, কি অত আদর দিতে দেখলেন?

—ঐ ত, তোমাদের সব তাতেই তক্ক। একটা কুকুরকে কোলে করে ধেই ধেই করে নাচাটা খুবই ভাল, না?

বধূ আর কোন কথা না বলিয়া কুকুরটিকে লইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

গল্পটি আরম্ভ করিবার পূর্বে একটু গোড়ার কথা বলা দরকার। মাস দুয়েক আগে পঞ্চাননতলার একটি সঙ্কীর্ণ গলিতে সকালবেলা হৈ হৈ পড়িয়া গেল। সেই গলির মধ্যে ডাস্টবিনের কাছে কাহাদের একটি কুকুরের ছানা পড়িয়া রহিয়াছে। বয়স তাহার

বেশী নয়, এখনও চোখ ফোটে নাই। বেচারা ঈষৎ নড়িয়া চড়িয়া মৃত্যুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে লাগিল। কাহার এই দুঃসাহস যে নিঃশব্দে রাত্রিকালে চুপি চুপি নিষ্ঠুরের মত এই দুর্ভাগা ছানাটিকে এইরূপে ফেলিয়া যাইতে পারিল? ছানাটির মৃত্যু সুনিশ্চিত। প্রথমত না খাইয়া মরিতে পারে—দ্বিতীয়ত কোন শত্রুর আক্রমণেও মরিতে পারে। অগত্যা বেচারাকে রক্ষা করিবার জন্য সকলে আকুল হইয়া পড়িল অথচ কেহই সাহস করিয়া তাহার ভার লইতে চাহিল না। পরিশেষে ঐ বধূটির স্বামী স্ত্রীর সনির্বন্ধ অনুরোধে ভিজা গামছা পরিয়া কুকুরটিকে নিজ গৃহে লইয়া গেল। নিঃসন্তান বধূটি তাহাকে মাতার স্নেহে পালন করিতে লাগিল। 'কৃষ্ণের জীবটি'র উপর তাহার অনুর্বর জীবনের স্নেহবাৎসল্যের প্রবল বন্যা বহাইয়া দিল। দিনে দিনে তাহার সুপ্ত স্নেহ ঐ কুকুরটিকে জড়াইয়া বিরাট মহীরুহ সৃষ্টি করিতে লাগিল। কুকুরটির নাম-করণ হইল 'বেবী'। কিন্তু এই বেবীকে উপলক্ষ করিয়া বধূটির সহিত তাহার শাশুড়ীর মনো-মালিন্য হইল। শাশুড়ী প্রাচীন-পন্থী বিধবা মানুষ। তিনি তাঁহার পূজা-আহ্নিক লইয়া দিনের চব্বিশটি ঘণ্টা কাটাইয়া দেন। সংসারে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। ভোররাত্রে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে গঙ্গাস্নানে বাহির হইয়া যান, রোদ উঠিলেই ফিরিয়া তাঁহার ত্রিতলের ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া গৃহদেবতার সেবা করেন। সন্ধ্যায় নিত্য বৈষ্ণব বাবাজীরা হরিনাম করিয়া গৃহ পবিত্র করিয়া যায়। বার মাসে তের পার্বণ। গঙ্গাজল আর গোময় লেপন করিতে করিতে সারা বাড়ী শুদ্ধ করিয়াই কাটাইয়া দেন। এ হেন শাশুড়ী ঐ অপবিত্র প্রাণীটিকে তাঁহার সুপবিত্র গৃহ কলুষিত করিতে দেখিলে যে খড়্গহস্ত হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি? বধূটি শাশুড়ীকে যে অমান্য করে তাহাও বলা যায় না, কিন্তু এক্ষেত্রে কেন জানি না সে বাঁকিয়া দাঁড়াইল। তাহার স্বামী অকস্মাৎ আশ্চর্যরূপে মূক হইয়া পড়িল। যেমন বেবী দিন দিন শশিকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিল তেমনই তাহাদের কলহও প্রবল হইতে প্রবলতর হইল। শাশুড়ী বলিলেন, ছিঃ ছিঃ এত ম্লেচ্ছপনা কি সহ্য হয়? হারামজাদা ছিষ্টি রৈ রৈ করছে। এ বাড়ীর ছায়া মাড়াতে পর্যন্ত গা ঘিন ঘিন করে। এমন সোনার সংসার ছারখার করে দিলে। আমার যে দুদিন কোথাও গিয়ে থাকবার চুলো নেই। কত লোকের কুকুর দেখেছি বাপু, এমন বাড়াবাড়ি কোথাও দেখিনি। তাদের কুকুর থাকে বার-বাড়ীতে বাঁধা। আর এনার কুকুরের শোবার ঘর নইলে রাতে ঘুম হয় না। জান দিদি, কুকুর দিন-রাত্তির খাটের ওপর শুয়ে থাকে।

বারমাস গঙ্গাস্নান করিয়া তিনি অনেক পথের দিদি জুটাইয়াছেন। সেই পথের দিদিই সবিস্ময়ে কহিলেন, ওমা, আমি কোথায় যাব!

শাশুড়ী বলিলেন, শুধু কি তাই? কুকুরকে কোলে নিয়ে অষ্টপহর কি আদর করেন—তাকে চুমু খাবার কি ঘটা!

—একেবারে সাহেবীয়ানা।

স্বামী ভুলিয়াও কোন দিন প্রতিবাদ করে নাই বা প্রশ্রয়ও দেয় নাই। মাঝে মাঝে দৈবাৎ কখনও হয়ত বলিল, বেবী এসে অবধি আমার অবস্থা বড় কাহিল হয়ে গেছে।

বেবীর কান দুইটি দুই হাত দিয়া ঈষৎ চাপিতে চাপিতে দুটি ডাগর চোখে স্বামীর পানে তাকাইয়া স্ত্রী প্রশ্ন করিল, তার মানে?

স্বামী বলিল, মানে, আমাকে তুমি কম ভালবাসছ। কারণ চব্বিশ ঘণ্টা বেবী হারাম-জাদাকে নিয়ে থাকলে আমি বেচারার কথাটা স্মরণ হওয়া তোমার দায় হয়ে উঠেছে।

অমনি স্ত্রী অভিমানের সুরে কহিল, ওঃ! বেবীর ওপর তোমাদের বাড়ীসুদ্ধু সকলের হিংসে! ওকে গলা টিপে মেরে ফেললে তোমাদের ষোলকলা পূর্ণ হয়, না?

বধূটির গণ্ড বাহিয়া অশ্রুকণা ঝরিতে লাগিল। স্ত্রীকে কাঁদিতে দেখিয়া স্বামীর চিত্তও বিচলিত হইল, ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিল, অমনি রাগ হল রমা? ঠাট্টাও বোঝ না? ষা-

হোক মানুষ!

রমা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কহিল, আমি বেশ জানি, এ তোমাদের ঠাট্টা নয়। তোমাদের মনের কথা। বেশ, দূর করে বিদেয় করে দেব একে। দূর হ! দূর হ হারামজাদা!

কথা-শেষে সে বেবীকে মেঝের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিল। বেবী কেঁউ কেঁউ করিয়া তাহার ব্যথা প্রকাশ করিল। উঠিয়া বধূটির পায়ের কাছে আসিয়া তাহার পানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া লেজ নাড়িতে লাগিল। বধূটি পিছু ফিরিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিল, আর মায়া বাড়াসনে রাক্ষস!

একটির পর একটি করিয়া দিন কাটিতে লাগিল। বেবীর সেবাযত্নে ত্রুটি হইল না। দুইবেলা মাংস রাঁধিয়া তাহাকে দেওয়া হইত। প্রতিদিন সকালে চা ও বিস্কুট সংযোগে সে জলযোগ করিত। তাহার নানা রকমের জামা তৈয়ারী হইল। কিন্তু রমার এই অক্লান্ত সেবাযত্ন সত্ত্বেও বেবীর শরীর পুষ্ট হইল না। পরন্তু সে দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল, তাহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও কর্কশ হইল। রমার আপ্রাণ চেষ্টা আদৌ ফলপ্রসূ হইল না। সে একদিন স্বামীকে কহিল, কুকুরটা দিন দিন কেন জানি না শুকিয়ে যাচ্ছে। একটু ডাক্তার-বদ্যি দেখাও না। শুনেছি কুকুরের নাকি ডাক্তার আছে।

স্বামী কহিল, কুকুর পোষার যদি অত শখ তা হলে এক কাজ কর না।

—কি?

—ওটাকে দূর করে দাও। আমি একটা ভাল বিলিতি কুকুর এনে দিচ্ছি। সেটা মানুষ কর।

রমা অভিমান করিয়া কহিল, তার মানে তোমরা সবাই ওর শত্রু। স্বাস্থ্য কি সকলের সমান হয়?

—কিন্তু ওর স্বাস্থ্য বদলাবে না কোন দিন রমা! ওর জাতটা মনে রেখো।

—ছেলে যদি কুৎসিত কুরূপ হয়, কোন মা-বাপ তাকে প্রাণ ধরে দূর করে দিতে পারে গো?

তাহার এই চরম আঘাত পাইয়াও স্বামী হো হো করিয়া হাসিল, বলিল, তার চেয়ে একটা ছেলে মানুষ কর না কেন? কত গরীব ছেলে পাওয়া যাবে!

—তারা বড় নেমকহারাম হয়।

—কিন্তু রমা, ও কুকুর তোমায় ত্যাগ করতেই হবে।

—কারণ?

—কারণ, ওর রোগটি সোজা নয়, ওর গায়ের ঘা বড় বিচ্ছিরি আর ছোঁয়াচে। কখনও সারে না।

স্বামী ভাবিয়াছিল স্ত্রী নিশ্চয়ই ভয় পাইয়া যাইবে, কিন্তু স্ত্রী ভয় পায় নাই। বরং সে নির্ভীকভাবে বেবীকে তাহার বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। তাহাকে চুম্বন করিতে করিতে বলিয়াছে, বেবী, সব্বাই তোর শত্তুর।

কি জানি কেন বেবীর চোখ দুটি চিক্ চিক্ করিয়া উঠিয়াছিল। রমা আঁচল দিয়া তাহার চোখ মুছিয়া দিতে দিতে কহিল, বেবী দুষ্টু কাঁদছিস? দূর পাগল, আমি তোকে কিছুতেই ছেড়ে দেব না।

কিন্তু এই ঘটনার দিন সাতেক পর বেবীই রমাকে ছাড়িয়া গেল। স্বামী যাহা বলিয়াছিল তাহাই সত্য হইল। বেবী পুরুষানুক্রমে যে দুরারোগ্য ও মারাত্মক রোগ পাইয়াছিল তাহা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে নিষ্কৃতি পাইল না। রমা ডাক্তার-বৈদ্য দেখাইতে ত্রুটি করে নাই। সকলে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছে, এই একটা হীনজাত কুকুরকে এই আপ্রাণ সেবা করিতে দেখিয়া।

শাশুড়ী কহিলেন, পয়সা খোলামকুচির মত উড়ে গেল দিদি। কুকুরটাকে নিয়ে

হারামজাদী পাগল হয়েছে একেবারে। এই বিচ্ছিরি রোগ, অত মাখামাখি কি ভাল? এতে কি এমন বাহাদুরী আছে?

দিদি কহিলেন, ছেলেপিলে নেই কি-না, তাই একটা টান পড়ে গেছে।

শাশুড়ী বলিলেন, ছেলেপিলে হবার বয়স যেন কেটে গেছে! এই তো সবে ছাব্বিশ বছর বয়স। আমার ভোঁদা হয়েছিল একুশ বছরে।

—একটা কিছু নিয়ে ত থাকতে হবে?

—তাই বলে এতটা বাড়াবাড়ি ভাল কি দিদি?

দিদি শাশুড়ীকে সাবধান করিয়া দিলেন, ছেলেকে তোমার ভাই অত মিশতে দিও না।

শাশুড়ী কহিলেন, ছেলে ত আর পাগল নয়।

বেবীর জীবনের শেষ কয়দিন শাশুড়ী তাহাকে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন, বধূটির স্বামীও আদেশের প্রতিধ্বনি করিল। অগত্যা বেবী বাহিরের উঠানে স্থান পাইল। রাত্রে একটা প্যাকিং বাক্সে তাহার শয্যা রচনা করা হইত। রমা নিজের হাতে রাত্রে তাহাকে খাওয়াইত। খাওয়া শেষ হইলে তাহাকে বাক্সের মধ্যে পুরিয়া দরজা বন্ধ করিয়া শুইতে যাইত। ইদানীং তাহার মুখে বিষাদের ছায়াপাত হইয়াছিল। তাহার যেন অতি আপনার জনটির জীবনান্তের সম্ভাবনা। সন্তানের রোগশয্যাপার্শ্বে সেবারতা মাতার মুখখানিও বুঝি এইরূপেই উদাস হইয়া থাকে। তাহার বত্রিশ নাড়ী এমন করিয়াই বার বার মোচড়াইয়া উঠে। রমার স্বামী কহিল, কুকুর কুকুর করে তুমি খেপলে নাকি!

রমা কুকুরের ক্ষত পরিষ্কার করিতে করিতে কহিল, সত্যি বেবী বাঁচবে না?

তাহার বিষাদ-কাতর চোখ দুটির পানে তাকাইয়া স্বামী বেদনা বোধ করিল, স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, ওর চেয়ে ভাল কুকুর এনে দেব রমা, যত দাম লাগে দেওয়া যাবে।

রমা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বেবীর গা মুছিতে মুছিতে বলিল, আহা, বাছার আমার সব হাড় কখানা বেরিয়ে গেছে।

ইহার দুইদিন পরই বেবীর ইহলীলা সাঙ্গ হইল। সকালে রমা তাহার কাঠের ঘরের দরজা খুলিয়া শিরে করাঘাত করিয়া বসিল। তাহার অত সাধের বেবীর মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। অসংখ্য লাল পিপীলিকায় সেই কদাকার হাড়-বার-করা রোম-ওঠা দেহটি ছাইয়া ফেলিয়াছে। রমা সেই বাক্সের উপর উবু হইয়া পড়িয়া আর্তকণ্ঠে বিনাইয়া বিনাইয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিল, ওগো, আমি কাকে নিয়ে থাকব গো?

ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল

চাকুরী গেল। এত করিয়াও কৃষ্ণলাল চাকুরী রাখিতে পারিল না। সকাল হইতে রাত দশটা পর্যন্ত (ডাউন খুলনা প্যাসেঞ্জার, ১০-৪৫ কলিকাতা টাইম) টিনের সুটকেস হাতে শিয়ালদ' হইতে বারাসত এবং বারাসত হইতে শিয়ালদ' পর্যন্ত 'তাঁতের মাকুর' মত যাতা-যাত করিয়া ও ক্রমাগত 'দত্তপুকুরের বাতের তেল, দত্তপুকুরের বাতের তেল—বাত, বেদনা, ফুলো, কাটা ঘা, পোড়া ঘা, দাঁত কনকনানি এক কথায় যত রকম ব্যথা, শুলানি, কামড়ানো আছে সব এক নিমেষে চলে যাবে—আজ চব্বিশ বছর এই লাইনে ওষুধটি প্রত্যেক ভদ্রলোক ব্যবহার করচেন, সকলেই এর গুণ জানেন—' বলিয়া চিৎকার করিয়াও চাকুরী রাখা গেল না।

সেদিন বসু মহাশয় (ইন্ডিয়ান ড্রাগ সিন্ডিকেটের মালিক নৃত্যগোপাল বসু) কৃষ্ণ-লালকে ডাক দিয়া বলিলেন—পাল মশায়, কাল রাত্রের ক্যাশ জমা দেন নি কেন?

—আজ্ঞে, আজ্ঞে—অনেক রাত হয়ে গেল—খুলনার ট্রেন—প্রায় বিশ মিনিট লেট।

—দেখুন, আগেও আমি অন্ততঃ সতেরো বার আপনাকে সাবধান করে দিয়েচি। খুলনা

ট্রেন দশটা একুশে স্টেশনে আসে। আমি সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত অফিসে বসে ছিলাম শুধু আপনার জন্যে। নিতাই দু'বার স্টেশনে দেখে এল ট্রেন রাইট-টাইমে এসেছে। লেট এক মিনিটও ছিল না—

—আজ্ঞে বড়বাবু, শরীরটা কাল বড়ই—

—ও আপনার পুরনো কথা। ও কথা আর শুনবো না আজ। যাক, ক্যাশ এনেছেন এখন?

কৃষ্ণলাল অপরাধীর মত বড়বাবুর মুখের দিকে চাহিল। বলিল—ক্যাশটা আনিগে যাই—না—একটু মুশকিল হয়েচে, আচ্ছা আসি—

—যান আসুন—

কৃষ্ণলাল তবুও দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া নিত্যগোপালবাবু বলিলেন—কি হ'ল!

—আজ্ঞে ওবেলা দেবো ওটা। বাসায় এনে রেখেছিলাম, চাবি দিয়ে বেরিয়ে গিয়েচে, আমি যার সঙ্গে থাকি।

—আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

—একটু বেড়াতে বার হয়েছিলাম ওই গোলদীঘির দিকে—

—সব বাজে কথা। আমি বিশ্বাস করিনে। কেন করিনে তাও আপনি জানেন। রাত দশটার পরই ক্যাশ এনে দেওয়ার কথা—আপনি বুড়ো হয়ে গেলেন এই ক্যানভাসারের কাজ ক'রে। জানেন না যে ক্যাশ তখুনি জমা দেওয়ার নিয়ম আছে?

—আজ্ঞে, আজ্ঞে—

—এ রকম আরও কতবার হয়েচে বলুন দিকি? আপনার কথার ওপর বিশ্বাস করা যায় না আর। বড়ই দুঃখের কথা। আপনি আমাদের পুরোনো ক্যানভাসার ব'লে আপনার অনেক দোষ সহ্য করেচি আমরা। কিন্তু এবার আর নয়। আপনি এ মাসের এই ক'দিনের মাইনে নিয়ে যাবেন আপিস খুললে—কমিশনের হিসেবটাও সেই সঙ্গে দেবেন। যান এখন।

অবশ্য এত সহজে কৃষ্ণলাল যাইতে রাজি হয় নাই—নৃত্যগোপালবাবুকে সে যথেষ্টই বলিয়াছিল, নৃত্যগোপালবাবুর বুড়োকর্তাকে গিয়া পর্যন্ত ধরিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত কিছুই হইল না।

মুশকিল এই, চাকুরী যখন যাইবার হয়, তখন তাহাকে কিছুতেই ধরিয়া রাখা যায় না। মৃত্যুপথযাত্রী মানবের মতই তার গতিপথ নির্মম, ধরাবাঁধা!

সুতরাং চাকুরী গেল।

তখন বেলা আড়াইটা। সকাল হইতে ইহাকে উহাকে ধরাধরির ব্যাপারেই এতক্ষণ সময় কাটিয়াছে। স্নান-আহার হয় নাই।

২৫/২ রামনারায়ণ মিত্রের লেনে ঢুকিয়াই যে টিনের চালওয়ালা লম্বা দোতলা মাটির ঘর, অর্থাৎ যে মাঠকোঠার ঠিক সামনেই আজকাল কর্পোরেশনের সাধারণ স্নানাগার নির্মিত হইয়াছে—তারই পশ্চিম কোণে সতেরো নম্বর ঘরে আজ প্রায় এগারো বছর ধরিয়া কৃষ্ণলালের বাসা।

কৃষ্ণলাল ঘরে একা থাকে না। ছোট্ট ঘরে তিনটি ময়লা বিছানা মেজের উপর পাতা। সে ঢুকিয়া দেখিল ঘরে কেবল যতীন শুইয়া ঘুমাইতেছে। আর একজন রুমমেট্ ট্রামের কণ্ডাক্‌টার, সাড়ে চারটার পর সে ডিউটি হইতে ছুটি লইয়া একবার আধঘণ্টার জন্য বাসায় আসে এবং তারপরেই সাজিয়া-গুজিয়া কোথায় বাহির হইয়া যায়।

নীচে পাইস্ হোটেলে ইহাদের খাইবার বন্দোবস্ত।

কৃষ্ণলালের সাড়া পাইয়া যতীনের ঘুম ভাঙিয়া গেল।

সে বলিল—এত বেলায়?

—বেলায় তা কি হবে? চাক্‌রীটা গেল আজ।

—সে কি! এতদিনের চাক্‌রীটা—

—কত করে বললুম বড়বাবুকে। তা শোনে কি কেউ? গরীবের কথা কে রাখে বলো!

—হয়েছিল কি?

—ক্যাশ জমা দিতে দেরি হয়েছিল। বলে তুমি ক্যাশ ভেঙেচ।

—তাই তো...তাহোলে এখন উপায়?

—দেখি কোথাও আবার চেষ্টা—জুটে যাবে একটা না একটা। আমাদের এক দোর বন্ধ হাজার দোর খোলা—আমাদের অন্ন মারে কে।

সামান্য কিছু পয়সা হাতে ছিল—পাইস্ হোটেল হইতে শুধু ডাল-ভাত খাইয়া আসিয়া কৃষ্ণলাল কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিল, পরে নবীন কুণ্ডু লেনে একটি খোলার বাড়ীতে ঢুকিয়া ডাক দিল—ও গোলাপী—গোলাপী—

তাহার সাড়ায় যে বাহির হইয়া আসিল, সে বর্তমানে রূপযৌবনহীনা প্রৌঢ়া, পরনে আধময়লা খয়েরী রংয়ের শাড়ী, হাতে গাছকয়েক কাঁচের চুড়ি। দু-গাছা সোনাবাঁধানো পৈাঁটি। মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে, গায়ের রং এখনও বেশ ফর্সা।

গোলাপীকে ত্রিশ বছর আগে দেখিলে ঠিক বোঝা যাইত গোলাপী কি ছিল। এখন আর তাহার কি আছে? কৃষ্ণলাল তখন সবে ঔষধের ক্যানভাসারের পদে বাহাল হইয়াছে—তাহার চমৎকার চেহারা ও কথাবার্তা বলিবার ভঙ্গিতে রেলগাড়ীর প্যাসেঞ্জার কি করিয়া সহজেই ভুলিয়া যাইত—জলের মত পয়সা আসিতে লাগিল।

এই নবীন কুণ্ডু লেনেই অন্য এক বাড়ীতে এক বন্ধুর সহিত আসিয়া সে গোলাপীকে দেখে। তখন নতুন যৌবন, হাতেও কাঁচা পয়সা। গোলাপীর তখন বয়স ষোলো-সতেরো। রূপ দেখিয়া রাস্তার লোকে চমকিয়া দাঁড়াইয়া যায়। গোলাপীর মা'র হাতে বছরে বছরে মোটা টাকা জমে। কৃষ্ণলাল সেই হইতেই নবীন কুণ্ডু লেনের নৈশ অধিবাসী। কত কালের কথা—গোলাপীর ঘরে মেহগ্নি কাঠের দেরাজ হইল, ঘরের দেওয়ালে বিলম্বিত বড় বিলাতি কাঁচবসানো আয়না হইল, সেকালে প্রচলিত ম্যাকাসার অয়েলের শিশির পর শিশি ভিড় জমাইয়া তুলিল—বাতায়ন মালতী ফুলের টবে সজ্জিত হইয়া বাড়ীর অন্যান্য ঘরের অধিবাসীদের মনে ঈর্ষার উদ্রেক করিল।

কাঁচা পয়সা কৃষ্ণলালের হাতে। প্রতিদিনের আয় তিন টাকা, আড়াই টাকার নীচে নয়।

একদিন গোলাপীর মা অভিমানের সুরে বলিল—যাই বলো বাপু, গোলাপী আমায় প্রায়ই বলে, একখানা বাড়ী তার নিজের না হ'লে চলে না আর—তা তেমন কপাল কি—এই এক বাড়ীতে ছত্রিশ জনার সঙ্গে—

—কেন মা? তার ভাবনা কি? কালই ঘর দেখে দিচ্চি—

—কত টাকা ভাড়ার মধ্যে হবে বলো—এই আমাদের পাড়াতেই আছে—

—যা তুমি বলবে। কুড়ি কি পঁচিশ—

—ত্রিশ টাকায় একখানা ভালো বাড়ি এ পাড়াতেই আছে—তাহ'লে তাই না হয়—

—হ্যাঁ হ্যাঁ—এ আবার আমায় জিজ্ঞেস করতে হয় মা?

গোলাপীরা নতুন বাড়ীতে উঠিয়া আসিল। বড় পাঁচী বলিল—ওলো, একটু রয়ে সয়ে নিস—দেখিস যেন আবার দড়ি না ছেঁড়ে—খুব বরাত তোর যাহোক গোলাপী। আর আমাদের ওই বুড়ো রায় বাবু রোজ আসেন আর বাঁধানো দাঁত জলের গেলাসে খুলে রাখেন—ক'দিন বললাম একখানা ঢাকাই শাড়ী, আর একটা বাজা-ঘড়ি দাও দেওয়ালে টাঙানো, তা বুড়ো মড়া আজ সাত মাস ঘুরুচ্চে--আজ এলে হয় একবার—ওর দাঁত খুলে জলের গেলাসে ডুবিয়ে রাখা বের করে দেবো—

শুধু বাড়ী? গোলাপীর টেবিল-হারমোনিয়ম হইল, জোড়া জোড়া শাড়ী, চেয়ার,

এমন কি শেষে কলের গান পর্যন্ত। কোন্ সুখ গোলাপীর বাকি ছিল? প্রতি রবিবারে কৃষ্ণলালের সঙ্গে গাড়ী করিয়া (অবশ্য ঘোড়ার গাড়ী) কালীঘাটে গঙ্গাস্নান ও দেবীদর্শন করিতে যাওয়া তাহার অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। বছরের পর বছর কাটিয়া গেল।

গোলাপী আর কৃষ্ণলাল, কৃষ্ণলাল আর গোলাপী।

ইতিমধ্যে গোলাপীকে সুখে-স্বচ্ছন্দে প্রতিষ্ঠিতা দেখিয়া তাহার মা একদিন নবীন কুন্ডু লেনের মায়া কাটাইয়া বোধ হয় উর্বশী বা তিলোত্তমা-লোকে প্রস্থান করিল। অমন জাঁকের শ্রাদ্ধ এ অঞ্চলে কেহ দেখে নাই তার আগে।

ক্রমে ক্রমে গোলাপীর যৌবনে ভাঁটা পড়িল। কৃষ্ণলালেরও আয়ের অঙ্ক কমিতে লাগিল। দত্তপুকুরের তেলের অনুকরণে শত শত বাতের তেল বাজারে বাহির হইল—রেলগাড়ীর কামরাও নিত্যনূতন ক্যানভাসারে ভরিয়া গেল। যা ছিল কৃষ্ণলালের একার—তাহার মধ্যে অনেক ভাগ বসিল। পূর্বের সচ্ছলতা কমিতে লাগিল।

তারপর দশ বারো বছর কাটিয়া গিয়াছে।

এই দশ বারো বছরে সুন্দরী গোলাপী কুরূপা প্রৌঢ়াতে পরিবর্তিত হইয়াছে—তাহার সে বাড়ী চলিয়া গিয়া আবার সাত-আটটি নানা বয়সের সঙ্গিনীর সঙ্গে এই বাড়ীটিতে থাকিতে হয়। তবুও কৃষ্ণলালের যাহা কিছু উপার্জন, এইখানেই তাহার সদ্ব্যয়। গোলাপীও তাহা বোঝে—এই ত্রিশ বছরের মধ্যে সে কৃষ্ণলালকে ছাড়িয়া অন্য কোথাও যায় নাই।

কৃষ্ণলাল বলিল—গোলাপী, চাক্‌রীটা গেল!

গোলাপী বিস্ময়ের সুরে বলিল—সে কি গা!

—বড়বাবু রাগ করেচে, কাল ক্যাশ জমা দিইনি বলে।

—কি করলে সে টাকা?

—খরচ হয়ে গেল!

—কোথায় খরচ হয়ে গেল—কিসে খরচ হয়ে গেল? তোমার এখনও দোষ গেল না তা ওরা কি করে রাখে তোমায়? কাল কোথায় গিয়েছিলে?

—সে খরচ নয় গোলাপী। দক্ষিণেশ্বর সেদিন যাওয়ার দরুন দেনা ছিল মনে নেই? কাবুলীর কাছ থেকে টাকা নিইনি? রাত দশটার পরে ইস্টিশানের গেটে আমায় ধরেচে। রুপী দেও। শেষে ভাবলাম কি ছোরা মারবে নাকি? ভয়ে পড়ে দিয়ে দিলাম টাকা। কাবুলীর দেনা, ও হজম করা কঠিন।

—তা নেও বেশ হয়েচে। এখন খাওয়া হয়েচে, না হয়নি? আমার অদেষ্টে ঝি-গিরি নাচ্‌চে সে তো দেখতে পাচ্চি। তখন বনু, পাড়াগাঁয়ের দিকে চলো—কোথাও একখানা ঘরদোর বেঁধে দুজনে থাকা যাবে—তা না, তোমার বাপু কলকেতা আর কলকেতা! কলকেতা ছেড়ে আমি থাকতে পারবো নি। এখন থাকো কলকেতায়? কে এখানে খাওয়ায় দেখি।

—জুটে যাবে, এখানেই জুটে যাবে। অত ভাবনার কারণ নেই—

—তোমার এ বুড়ো বয়সে চাক্‌রী নিয়ে তোমার জন্যে বসে আছে! এখন আর কি তোমার হাত পা নেড়ে বক্তিমে করবার গতর আছে নাকি?

—দেখিয়ে দেবো গোলাপী, দেখবি? ভদ্রমহোদয়গণ, এই সেই বিখ্যাত আদি ও অকৃত্রিম দত্তপুকুরের বাতের তেল—ইহা ব্যবহারে সর্বপ্রকার বাত বেদনা মাথাধরা, দাঁত কনকনানি, কাউর, ছুলি, কাটা ঘা, পোড়া ঘা—

গোলাপী হাসিতে হাসিতে বলিল—থাক্ গো গোসাই, আর বিদ্যে দেখাতে হবে না,

সবাই জানে তুমি খুব ভালো বক্তিমে দিতে পারো—আহা, কি হাত পা নাড়ার ছিরি! যেন থিয়েটারের এ্যাক্টো করচেন!

—তাহ'লে বল চাক্‌রীতে নেবে কিনা?

—নেবে না আবার? একশো বার নেবে—আমি যাই এখন ঝি-গিরি ক'রে নিজের পেট চালাবার চেষ্টা দেখি—নিজেই খেতে পাবে না তা আমায় আর খাওয়াবে কোত্থেকে! কি অদেষ্ট যে নিয়ে এসেছিলাম!

কৃষ্ণলাল চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া গোলাপী বলিল—ব'সো, দুটো মুড়ি-টুড়ি মেখে দি—খেয়ে একটু চা খেয়ে যাও—

অগত্যা কৃষ্ণলাল বসিল। বলিল—তাহ'লে বক্তৃতা এখনও দিতে পারি, কি বলো?

—নেও, আর আদিখ্যেতায় কাজ নেই। দিতে পারো তো—সত্যি কথা যদি বলি তবে তো পায়া ভারী হয়ে যাবে।

—কি বলো না গোলাপী, বলতেই হবে।

—তোমার মত কারো হয় না, আমি তো কতই দেখলাম দাঁতের মাজনের, ওষুধের ফিরিওয়ালা—আমাদের এই গলির মুখে হারমোনিয়াম গলায় বেঁধে নাচে, বক্তিমে দেয় পোড়ারমুখোরা—কিন্তু সে সব ফিরিওয়ালা তোমার মত নয়—

কৃষ্ণলাল রাগের সুরে বাধা দিয়ে বললে—কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা! তোকে নিয়ে আর পারিনে দেখচি—তারা হ'ল ফিরিওয়ালা—আমরা হলুম ক্যান্‌ভাসার—হারমোনিয়াম পিঠে বেঁধে যারা গান গেয়ে ঘুঙুর পায়ে দিয়ে নেচে বেড়ায়, আমরা কি সেই দলের? অপমান হয়, ওকথা আমাদের ব'লো না!

—যাক যাক, ভুল হয়েচে, তুমি এখন ঠান্ডা হয়ে বসে চা খেয়ে নেও।

গোলাপীর মন আজ বেশ খুশি। কতদিন পরে যেন যুবক কৃষ্ণলালের অঙ্গভঙ্গি ও সুন্দর সতেজ গলার স্বর সে আবার শুনিল। ত্রিশ বৎসরের অন্ধকার কালো ছেঁড়া পর্দাটা কে টানিয়া সরাইয়া দিল।

সে যত্ন করিয়া কৃষ্ণলালকে খাওয়াইল—কৃষ্ণলাল বিদায় লইয়া যখন আসে তখন বলিল—একটা কথা বলি শোনো। যদি খাওয়া-দাওয়ার কোনো কষ্ট হয়, তবে আমার কাছে এসে অবিশ্যি খেয়ে যাবে। এই বেদ্দ বয়েসে না খেলে শরীর থাকবে কেন? আমায় কিছু দিতে হবে না এখন। ওই সোনারবেনেদের ঠাকুরবাড়ীতে একটা ঝিয়ের দরকার, সকাল-সন্ধ্যে কাজ করব—আমি কাল থেকে সেখানে কাজে লেগে যাবো—তা তোমায় বলাও যা না বলাও তাই—তুমি কি আসবে? তোমায় আমি চিনি কিনা!

কৃষ্ণলাল হাসিয়া বলিল—ভালোই তো। তোর রোজগার এইবার খাই দিনকতক—সে সাধ আমার আছে অনেকদিন থেকেই। আচ্ছা তাহ'লে এখন আসি, ওবেলা হয়তো আসবো—সন্ধ্যের পর।

তাহার পর এক মাস কাটিয়া যায়। কিন্তু গোলাপীর বাড়ী কৃষ্ণলাল আর আসিল না। সুখের দিনে গোলাপীকে সে অনেক দিয়াছে—এখন দুঃখের দিনে বসিয়া বসিয়া গোলাপীর অন্ন ধ্বংস করিবে তেমন বংশে জন্ম নয় কৃষ্ণলালের। বিশেষত দেখিতে হইবে, গোলাপীও প্রৌঢ়া—ঝি-গিরি ভিন্ন এখন আর তার কোনো উপায় নাই।

মেসের ভাড়া বাকি পড়িয়াছিল দু'মাসের. মেসের অধ্যক্ষ কৃষ্ণলালকে ডাকিয়া বলিল—কি কৃষ্ণবাবু. আমাদের রেন্টটা কি হবে?

—আজ্ঞে ক্ষেত্রবাবু, দেখতেই তো পাচ্চেন—চাক্‌রীটা গেল. হাতে কিছু নেই। এ অবস্থায়—

—ফি-মাসে আমি পকেট থেকে ঘরভাড়া যোগাবো কোথা থেকে সেটাও তো দেখতে হবে? দুদিন সময় নিন—তারপর আপনি দয়া করে সিট ছেড়ে দিন, আমি অন্য ব্যবস্থা

দেখি।

কৃষ্ণলাল পড়িল মহা বিপদে। একে খাইবার পয়সা নাই—তাহার উপর মাথা গুঁজিবার যে জায়গাটুকু ছিল, তাহাও তো আর থাকে না। তিনদিন কাটিয়া গেল, দু'একটি পূর্ব-পরিচিত বন্ধুর নিকট হইতে চাহিয়া-চিন্তিয়া দু'চার আনা ধার লইয়া পাইস হোটেলের ডাল-ভাতে কোনোরকমে ক্ষুধানিবৃত্তি করিয়া এই তিনদিন কাটাইল। কিন্তু তিনদিন পরে তাহার সত্যই অনাহার শুরু হইল। দু' পয়সার ছাতু বা মুড়ি সারাদিনে—শুধু ছাতু, একটু গুড় বা চিনি জোটে না তাহার সঙ্গে। তাহার পর পেট পুরিয়া জল, কলের নির্মল জল।

মেসে ম্যানেজার আবার ডাক দিলেন। বলিলেন—কিছু হ'ল?

—আজ্ঞে এখনো—এই ভাবছি—

—আমার লোক এসে গিয়েচে—কাল মাসের পয়লা। দু' মাসের ভাড়া পকেট থেকে দিয়েচি—এ মাসেরও দিতে হবে। আমিও ছা-পোষা মানুষ মশাই—কত লোকসান হজম করি বলুন? আপনি জিনিসপত্তর নিয়ে চলে যান—আমার ভাড়ার দরকার নেই।

পরদিন সকালেই জিনিসপত্র সমেত (একটা টিনের ট্রাঙ্ক ও একটি ময়লা বিছানা) কৃষ্ণলালকে পথে দাঁড়াইতে হইল। বর্ষাকাল। জিনিসপত্র রাখিবার মত জায়গা কোথায় পাওয়া যায়? গোলাপী অনেকবার মেসে খবর লইয়াছে—মধ্যে একদিন দু'ঘণ্টা মেসের বাহিরের ফুটপাতে বসিয়া ছিল তাহার অপেক্ষায় (কারণ ম্যানেজার তাহাকে চেনে, মেসে কুচরিত্রা স্ত্রীলোক ঢুকিতে দিবে না)—কৃষ্ণলাল দূর হইতে দেখিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। এখন গোলাপীর বাড়ী গেলে সে কান্নাকাটি করিবে, আটকাইয়া রাখিতে চাহিবে। নতুবা সেখানে জিনিসপত্র রাখা চলিত।

মেস হইতে কিছু দূরে বড় রাস্তার উপর একটা চায়ের দোকানের মালিকের সঙ্গে কৃষ্ণলালের পরিচয় ছিল। বলিয়া কহিয়া সেখানে কৃষ্ণলাল জিনিসপত্র আপাতত রাখিয়া দিল। তাহার পর উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ দেখিল সে গঙ্গার ধারে আহিরিটোলার স্টীমারঘাটে আসিয়া পড়িয়াছে।

সকাল হইতে কিছু খাওয়া হয় নাই। ঘাটের ধারে একটা গাছতলায় হিন্দুস্থানী ফিরিওয়ালা ভুট্টা পোড়াইতেছে। কৃষ্ণলাল এক পয়সায় একটা ভুট্টা কিনিয়া জলের ধারে বসিয়া সেটি পরম তৃপ্তির সহিত খাইল।

একটা বিড়ি পাইলে হইত এই সময়।

এই সময় একটি ছোকরা ব্যাগহাতে আসিয়া তাহার পাশে ব্যাগটি নামাইয়া পকেট হইতে ঝাড়ন বাহির করিয়া সিমেন্ট-বাঁধানো রানার উপর পাতিল। বসিতে যাইবে এমন সময় ছোকরা হঠাৎ পকেটে হাত দিয়া কি দেখিয়া একবার চারিদিক চাহিল এবং কাছেই কৃষ্ণলালকে দেখিয়া বলিল—একটু দয়া করে ব্যাগটা দেখবেন? এক পয়সার বিড়ি কিনে আনি—

বিড়ি কিনিয়া আনিয়া সে কৃষ্ণলালকে একটি বিড়ি দিল। কৃষ্ণলাল আগেই আন্দাজ করিয়াছিল, ছোকরা একজন ক্যান্‌ভাসার। এখন জিজ্ঞাসা করিল—আপনি বুঝি ক্যান্‌ভাস করেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—কি জিনিস?

—হাতকাটা তেল—সার্জিক্যাল মলম—

—বেশ পাওয়া যায়? কমিশন কেমন?

—ভালোই। খদ্দেরকে হাত কেটে দেখাতে—সঙ্গে ছুরি থাকে—এই যে—

ছোকরা জামার আস্তিন গুটাইয়া দেখাইল—কব্জি হইতে কনুই পর্যন্ত হাতের

সমস্ত অংশটা ছুরি দিয়া ফালা ফালা করিয়া চেরা। কৃষ্ণলাল শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—এ কি! লাগে না?

ছোকরা হাসিয়া বলিল—লাগে—আবার মলম লাগালে সেরে যায়।

—কি রকম আয় করেন?

—চব্বিশ টাকা থেকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকা মাসে।

কৃষ্ণলালের মন বেজায় দমিয়া গেল। এত কান্ড করিয়া ত্রিশ টাকা! অথচ এমন সময় গিয়াছে—যখন দত্তপুকুরের বাতের তেল ফিরি করিয়া সে মাসে ষাট সত্তর টাকা অনায়াসে রোজগার করিয়াছে—তাহার জন্য নিজের হাত ছুরি দিয়া ফালা ফালা করিয়া কাটিবার প্রয়োজন হয় নাই।

ক্যানভাসারের কাজে আর সুখ নাই। আর সে এ কাজ করিবে না।

পরদিন কৃষ্ণলাল কলিকাতা ছাড়িয়া স্বগ্রামে রওনা হইল। বসিরহাট স্টেশনে নামিয়া সাত ক্রোশ হাঁটিয়া তাহার পৈতৃক গ্রাম ইলশেখালি পোঁছিতে বেলা তিনটা বাজিল। গ্রামে তাহার দূরসম্পর্ক জ্ঞাতি ছাড়া অন্য কেহ আপনার জন নাই—নিজের পৈতৃক ভিটা জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে। বহুদিন এদিকে আসে নাই, দেখাশোনাও করে নাই—খড়ের ঘর কতদিন টেকে? আজ প্রায় সতেরো আঠারো বছর পূর্বে দু পাঁচ দিনের জন্য একবার পিসিমার শ্রাদ্ধে গ্রামে আসিয়াছিল। সেই আর এই।

জ্ঞাতিরা অবশ্য কৃষ্ণলালকে জায়গা দিল। কিন্তু কিছুদিন থাকিয়া কৃষ্ণলালের কেমন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। গ্রামে তাহার মন টেকে না। কখনও সে দীর্ঘদিন ধরিয়া গ্রামে বাস করে নাই—এখানকার লোকে কথাবার্তা বলিতে জানে না, ভাল করিয়া মিশিতে জানে না, চা খায় না। কলিকাতায় রাস্তার ভিখারীও চা খায়। তাহার উপর এই পাড়াগাঁয়ে যেমন জলকাদা, তেমনি জঙ্গল—রাত্রে মশার উৎপাতে নিদ্রা হয় না। এরই মধ্যে ম্যালেরিয়া প্রায় সকল বাড়ীতেই দেখা দিয়াছে।

না, এখানে মন টেকে না। কৃষ্ণলাল চেষ্টা করিয়া দেখিল—এখানে সবাই যেন সারাদিন ঘুমাইয়া আছে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ইহারা চড়কতলার ক্ষুদ্র মাঠে বেলতলায় বসিয়া হুঁকা হাতে আড্ডা দেয়, পরচর্চা করে। কোনো কাজ নাই অথচ দুপুরে ভাত দুটি মুখে দিতে না দিতে এদের চোখ ঘুমে ঢুলিয়া পড়ে। দিবানিদ্রা চলে বেলা চারিটা পর্যন্ত—তারপর ঘুম হইতে রক্তবর্ণ চোখে উঠিয়া কেহ বা বাজারে দু'পয়সার সওদা করিতে যায়—সেখানেও আবার আড্ডা...এ দোকানে ও দোকানে বসিয়া তামাক খাওয়া... চার পয়সার সওদা করিতে তিন ঘণ্টা লাগাইয়া সন্ধ্যার পর বাড়ী আসে। তারপরই আহার ও নিদ্রা। কেরোসিন তেলের দাম চড়িয়া গিয়াছে—তেল খরচ করিয়া আলো জ্বালাইয়া রাখিতে কেহ রাজী নয়! কয়েক বাড়ী যাও—অন্ধকারে বসিয়া দু-একটা কথা বলো, গল্প করো—এক আধ কল্কে তামাক খাও—তাহার পর বাড়ী ফিরিয়া আবার বিছানা আশ্রয় কর। দিন শেষ হইয়া গেল।

কৃষ্ণলাল এরকম জীবনে অভ্যস্ত নয়। এ কি জীবন? অথচ সকলেই বলিবে, দাদা, সংসার আর চলে না, বড় কষ্ট। কষ্ট ঘুচাইবার চেষ্টা কোথায়? আজ দীর্ঘ পঁচিশ ত্রিশ বছর ধরিয়া যার কলিকাতায় ভীষণ কর্মব্যস্ত জীবন কাটিয়াছে, এ ধরণের অলস, শ্রমবিমুখ জীবনের ধারণাই করিতে পারে না সে।

সকালে উঠিয়াই নীচের তলার কলে স্নান সারিয়া লইতে হইত। খুব ভোরে স্নান না সারিলে এমন ভিড় জমিয়া যাইবে কলে যে, আর স্নান করা চলিবে না। নীচের তলায় সেকরার দোকানের লোকেরা, শালওয়ালা, দরজি, পূব দিকের ঘরে যে মুটেরা থাকে সবাই আসিয়া কলে ভিড় লাগাইয়া দিবে, ইহার পর আসিবে একদল বালতি হাতে জল ধরিতে ও চাউল ধুইতে। সারি সারি লোক দাঁড়াইয়া যাইবে কলসী হাতে জল ভরিতে।

ওপরের তিন তলায় তিনটি মেসের চাকরেরা। সকলেই কর্মব্যস্ত, ঘাড় ধরিয়া কাজ কলিকাতায়, 'সময় গেল। ছ'টা বাজে, কখন কি হবে?' দিন আরম্ভ হইয়াছে.... এখনি বাবুরা আসিয়া ভাত চাহিবে আটটা বাজিতে না বাজিতে, এতটুকু দেরি করিলে চলিবে না।

স্নান সারিয়া কৃষ্ণলাল ব্যাগ হাতে বাহির হইত শেয়ালদ'-দ' স্টেশনে, প্রথমেই সাতটা দশ বারাসত, সাতটা পঁচিশ নৈহাটি, পৌনে আটটা রাণাঘাট প্যাসেঞ্জার, সাড়ে আটটা বনগাঁ লোকাল, আটটা পঞ্চাশ দত্তপুকুর, ন'টা দশ কেষ্টনগর লোকাল......শুরু হইয়া গেল দিনের কাজ। বাতের তেল! বাতের তেল! যত প্রকার বাত, ফুলা, শুলানি, কন্‌কনানি, মাথা ধরা, পেটবেদনা, ইহার একমাত্র ব্যবহারে ভদ্রমহোদয়গণ, এই ওষুধটি আজ ত্রিশ বছর যাবৎ এই লাইনে সুখ্যাতির সহিত চলিতেছে,—এই চলিল বেলা বারোটা পর্যন্ত। বারোটা পঞ্চান্ন শান্তিপুর ছাড়িয়া গেলে তবে সকালের কাজ মিটিল। কি জীবন! কি আনন্দ! কি পয়সা রোজগার! কাঁচা পয়সা রোজ আসে, রোজ সন্ধ্যায় উড়িয়া যায়, যে পয়সা আয় করিতে জানে, সে-ই জানে খরচ করিতে, ইহাতে ক্ষোভ কি?

কৃষ্ণলাল আরও মাসখানেক কোনরকমে কাটাইল।

আর চলে না। এ অলস জীবন তাহার অসহ্য, কখনো পা গুটাইয়া কুর্মবৃত্তি অবলম্বন করিয়া এভাবে সে থাকে নাই। বেশিদিন এভাবে থাকিলে সে পাগল হইয়া যাইবে, নয়তো মরিয়া যাইবে।

কিন্তু কলিকাতায় গিয়া সে খাইবে কি? কোনো উপায় তো দেখা যাইতেছে না। ইণ্ডিয়ান ড্রাগ সিণ্ডিকেটে আর চাকুরী হইবার সম্ভাবনা নাই। তবুও একবার বসু মহাশয়কে গিয়া ধরিয়া দেখিলে কেমন হয়? কিছু যদি না জোটে, তবে আহিরিটোলার ঘাটে সেই হাতকাটা তেলের ক্যান্‌ভাসার ছোকরার সঙ্গে দেখা করিয়া......তবে ছুরি দিয়া নিজের হাতটা ফালা ফালা করিয়া কাটা—এ বৃদ্ধ বয়সে, ক্যান্‌ভাসারের চাকুরীর মত সম্মানের চাকুরী, আরামের চাকুরী আর নাই, কিন্তু হাত কাটিয়া দেখাইয়া জিনিস বিক্রয় করা? ওতে মানসম্ভ্রম থাকে না।

এভাবে গ্রামে বসিয়া থাকা জীবন নয়। চিরকাল কাজের মধ্যে থাকিয়া আজ বাঁচিয়া মরিয়া থাকা তাহার পোষাইবে না। গ্রামেও তো হাওয়া খাইয়া জীবন ধারণ করা যায় না—কেহ কেহ তাহাকে সামনের বছর দু'-এক বিঘা ধান করিতে পরামর্শ দিল—কেহ বলিল, ডোবার ধারে জমিটা পড়ে আছে কেষ্ট খুড়ো, তোমারই পৈতৃক জমি, এই শীতকালে মানকচু লাগাও ওটাতে, তবু হাটে হাটে কিছু ঘরে আসবে, সামনের শীতকাল নাগাৎ—কৃষ্ণলালের হাসি পায়।

কলিকাতার রোজগার যে কি ধরণের, সেখানে ক্যান্‌ভাসারের কাজে মাসে যে টাকা এক সময় তাহার আয় ছিল, এখানে গোটা বছর ধরিয়া কচু, কুমড়া বেচিয়াও যে সে আয় হওয়া অসম্ভব—এই মূর্খ, অর্বাচীনেরা তাহা কি করিয়া বুঝিবে?

অবশেষে সে একদিন বাক্স বিছানা বাঁধিয়া কলিকাতায় আসিয়া হাজির হইল।

বাঁচিতে হয় তো ভাল করিয়াই সে বাঁচিবে।

ট্রেনে পুরানো ক্যান্‌ভাসারদের সঙ্গে দেখা। নবশক্তি ঔষধালয়, কবিরাজ অনংগমোহন দেব, বিশ্বাস কোম্পানী—ইণ্ডিয়ান ড্রাগ সিণ্ডিকেট প্রভৃতি ফার্মের লোক সব। সবাই জানে, সবাই খাতির করে।

—আরে, এই যে কেষ্টদা, আজকাল আর দেখিনে যে?

—কেষ্টদা, কোত্থেকে? বিয়েথাওয়া করলেন নাকি এ বয়সে?

—আজকাল কোন্ কোম্পানীতে আছেন কেষ্টদা? দেখিনে ট্রেনে আর?

—জমিজমা দেখতে গেছলে ভায়া? তা দেখবেই তো, থাকলেই দেখে—আমাদের কোনো চুলোয় কিছু নেই, যা করে এই বিশ্বাস কোম্পানী, হিংসে হয় তোমায় দেখে, দু'শো টাকা বছরে আয়ের সম্পত্তি? বলো কি! তবে তো তুমি—

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কৃষ্ণলালকে এ বিড়ি দেয়, ও পানের কৌটা খুলিয়া সামনে ধরে। পুরাতন বন্ধুর দল। ইহাদের ফেলিয়া সে এতকাল ঘুমন্ত পুরীতে কাল কাটাইল যে কি ভাবিয়া? এখানে কাজ আছে, আমোদ আছে, পয়সা রোজগার আছে, তার পর ইয়ে আছে। আর সে কোথাও যাইবে না কলিকাতা ছাড়িয়া। মরিতে হয় এখানেই মরিবে।

পনেরো বিশ দিন এখানে ওখানে হাঁটাহাঁটি করিয়াও কিন্তু চাকুরী মিলিল না। বসু মহাশয় ঝাড়া জবাব দিলেন। এখন সুশ্রী চেহারার ছোক্‌রা ক্যান্‌ভাসার—বেশ লম্বা জুলপি, ঘাড় বাহির করিয়া চুল ছাঁটা, লপেটা জুতা পায়ে, থিয়েটারের রামের মত গলা, এই সবাই চায়; বয়স হইয়া গেলে—মানে, এখন উঁহাদের লোক আছে, দরকার হইলে চিঠি লিখিয়া জানাইবেন পরে।

পুরোনো মেসেই উঠিয়াছিল, বারান্দাতে আছে। গোলাপীর সঙ্গে দেখা করে নাই। এখন করিতে চাহেও না সে। অনাহারে দু'দিন কাটিল মধ্যে। অবশেষে একদিন আহিরিটোলার ঘাটেই গিয়া হাজির হইল, যদি হাতকাটা তেলওয়ালা সেই ছোকরার সঙ্গে দেখা হইয়া যায়। সে সাড়ে বারোটার স্টীমারে রোজ বালি হইতে আসে বলিয়াছিল। সাত আট দিন ক্রমাগত ঘুরিয়াও কিন্তু ছোকরার দেখা মিলিল না। কৃষ্ণলালের দুঃখ শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আর চলে না। আচ্ছা, সে ক্যান্‌ভাসারি ভুলিয়া যাইতেছে না তো? আজ কতদিন চাকুরী নাই। কতদিন বক্তৃতা দিবার অভ্যাস নাই। চর্চা অভাবে শেষে কিনা ছোকরা ক্যান্‌ভাসারেরা তাহাকে—কৃষ্ণলালকে ছাড়াইয়া যাইবে!

সেদিন কৃষ্ণলাল নিজের টিনের ছোট স্যুটকেস্‌টি হাতে লইয়া ড্যালহাউসি স্কোয়ারের মোড়ে দাঁড়াইয়া হাত পা নাড়িয়া ক্যান্‌ভাসারের বক্তৃতা জুড়িয়া দিল, চর্চা রাখা দরকার তো বটেই, তাছাড়া সে নিজের শক্তি পরীক্ষা করিতে চায়, খরিদ্দার জোটে কিনা সে একবার দেখিবে। এখনও তাহার যাহা গলা আছে, থিয়েটারের রামের মত গলাওয়ালা কোন্‌ ছোকরা ক্যান্‌ভাসার তাহার সঙ্গে পাল্লা দিবে, সে দেখিতে চায়।—দত্তপুকুরের বাতের তেল! ব্যবহারে সর্বপ্রকার বাত, বেদনা, মাথা ধরা, দাঁতশুলানি, হাতবেদনা, পিঠবেদনা......ভদ্রমহোদয়গণ। এই ঔষধটি আজ ত্রিশ বছর ধরিয়া এই লালদীঘির মোড়ে...

কৃষ্ণলাল মিনিট পাঁচ ছয় পরে সগর্বে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া লইল। বেশ ভিড় জমিয়া গিয়াছে। একজন ভিড় ঠেলিয়া কাছে আসিয়া বলিল—আমায় একটা ছোট ফাইল!—

কৃষ্ণলাল গম্ভীর ভাবে বলিল—আমার কাছে ওষুধ নেই—আমি বসু ইণ্ডিয়ান ড্রাগ সিণ্ডিকেটের পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্টের লোক, যাঁদের দরকার হবে, তাঁরা একশো ছয়ের সি হরিধন পোদ্দারের লেনে বসু ইণ্ডিয়ান ড্রাগ সিণ্ডিকেটের অফিসে......আমার নামের এই স্লিপটা নিয়ে যান দয়া করে, টাকায় চার আনা কমিশন পাবেন—দাঁড়ান লিখে দিচ্চি—

দিন পাঁচ ছয় কাটিল। কৃষ্ণলালের নেশা লাগিয়া গিয়াছে। সে বেলা তিনটার সময় রোজ স্যুটকেস্‌ হাতে ঝুলাইয়া ড্যালহাউসি স্কোয়ারের মোড়ে গিয়া বক্তৃতা জুড়িয়া দেয়। অফিস ফেরতা লোকেরা ভিড় করিয়া শোনে।

সেদিন কৃষ্ণলাল দাঁড়াইয়া দত্তপুকুরের বাতের তেলের গুণ ব্যাখ্যা করিতেছে, এমন সময় একজন ভদ্রলোক ভিড় ঠেলিয়া একেবারে তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কৃষ্ণলাল চমকিয়া উঠিল, বসু ড্রাগ সিণ্ডিকেটের মালিক নৃত্যগোপাল বসু মহাশয় স্বয়ং!

বসু মহাশয় কৃষ্ণলালের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, শুনুন একবার এদিকে—

কৃষ্ণলাল ভিড়ের পাশ কাটাইয়া কিছু দূরে বসু মহাশয়ের সঙ্গে গিয়া অপ্রতিভের মত দাঁড়াইল। বসু মহাশয় বলিলেন, এ কি হচ্চে?

কৃষ্ণলাল অপরাধীর মত মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল আজ্ঞে আজ্ঞে একবার চর্চাটা রাখচি, নইলে—

বসু মহাশয় বলিলেন, তাই তো বলি এ কি কান্ড! গত দিন পাঁচ-ছ'য়ের মধ্যে অফিসে আপনার নামের স্লিপ নিয়ে বোধ হয় একশো কি দেড়শো খদ্দের গিয়েছে। এত ওষুধ বিক্রি গত ক'মাসের মধ্যে হয়নি। একে তো এই ডাল্ সিজন্ যাচ্চে, আমি তো অবাক: সবাই বলে লালদীঘির মোড়ে আপনাদের পাবলিসিটি অফিসার, তাঁরই মুখে শুনে......আমি বলি আজ নিজে গিয়ে ব্যাপারটা কি দেখি তো নিজের চোখে। তা আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েচি, আপনার এরকম কাজে—

কৃষ্ণলাল বিনীতভাবে বলিল, আজ্ঞে, ভাবলাম ছোকরা ক্যান্ভাসারদের মত থিয়েটারী রামের গলা কোথায় পাবো—তবুও একবার দেখি দিকি—

বসু মহাশয় বলিলেন, শুনুন। ওসব থাক। আপনি আজই অফিসে আসুন এক্ষুনি। আপনাকে আজ থেকে হেড ক্যান্ভাসার য়্যাপয়েন্ট করলাম। ষাট টাকা মাইনে পাবেন আর কমিশন, শুধু তদারক ক'রে বেড়াবেন কে কেমন কাজ করচে, আর ছোকরাদের একটু তালিম দিয়ে দেবেন, বুঝলেন না? আসুন চ'লে আমার গাড়ীতে—

সন্ধ্যাবেলা।......নবীন কুণ্ডুর লেনে খোলার ঘরের সংকীর্ণ রোয়াকে গোলাপী ক্যানেস্ত্রাকাটা তোলা উনুনে আঁচ দিয়া প্রাণপণে পাখার বাতাস করিতেছে, এমন সময় বাহিরে কে পরিচিত গলায় ডাকিল—গোলাপী ও গোলাপী, বাইরে এসে এই জিনিসগুলো ধরো দিকি। হাত ভেরে গিয়েচে—

পারমিট

আজই সেই আশ্চর্য ব্যাপারটি আমার জীবনে ঘটেচে।

এমন সব অত্যাশ্চর্য কান্ডও মানুষের জীবনে ঘটে যায়! বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এখনও ভাবলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়চি এক-একবার।...

ভাদ্রের ভরা নদী। উভয় তীরের বনভূমির শাখা প্রশাখা জলের ওপর নত হয়ে আছে, এক এক জায়গায় জলমগ্ন নল-খাগড়ার বন নদীর স্রোতোবেগে থরথর করে কাঁপচে। এমনি এক স্থানে জলের ওপর কলমি শাকের দাম দেখে নৌকার মাঝি সয়ারাম শাক তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো নৌকা থামিয়ে। আমার সঙ্গী নকুড় চক্কত্তি তাকে বকচে—সন্দে হবে, ফিরতে বড্ড দেরি হয়ে যাবে শাক তুলতে।

নৌকো থেমে দাঁড়িয়ে জলের আবর্তে পাক খাচ্চে।

নকুড় চক্কত্তি বল্লে—একটা বিড়ি খাওয়া যাক, কি বলো হে?

আমার ওসব দিকে তত মন ছিল না। তবুও কলের পুতুলের মত ওর হাত থেকে বিড়ি নিয়ে ধরালুম। নকুড় চক্কত্তি জলের ধারের ধানগুলো সম্বন্ধে কি যেন বলচে। একবার সে বল্লে—যাক, একটা কাজের মত কাজ হয়েচে। ধানটা খুব জোর পাওয়া গিয়েচে। তুমি না গেলে হাকিম কি ধান দিত? হাকিমের স্ত্রী তোমায় চেনে নাকি? ও না থাকলে আজ ধান হ'ত, না ছাই হ'ত!

আমি অন্যমনস্ক ভাবে বল্লাম—হ্যাঁ।

গল্পে এমন ঘটনা অনেক পড়া গিয়েচে—কিন্তু বাস্তব জীবনে ক'টা ঘটে তাই ভাবচি।

একটাও না, অথচ সন্দে পড়লে হয়তো মনে হবে, এমন গল্প অনেক পড়া গিয়েচে। জীবনের অলিখিত কাব্যে কত অধ্যায় কত ঘটনা—এর পাঠক কে, না যে সে জীবন যাপন করচে। বহির্দেশে দন্ডায়মান বিরাট জনতা উৎসুখ শ্রোতা হতে পারে, দর্শক হতে পারে কিন্তু রসিক সমঝদার মাত্র, তার বেশি নয়।

বাগজোলার খালের মধ্যে দিয়ে জলের তোড় মাঠের দিক দিয়ে দুধারের ঘন বনের মধ্যে দিয়ে এসে নদীতে পড়চে। জলের তোড়ে একটা প্রকান্ড জগডুমুর গাছ শেকড় ছিঁড়ে জলে ঝুকে পড়ে আছে। নকুড় চক্কত্তি বল্লে—দ্যাখো তো বাবা সয়ারাম, গাছটাতে যদি কচি কচি ডুমুর পাওয়া যায়। নৌকোটা একটু থামিয়ে পাড় দিকি দুটো—তরিতরকারির যা দাম, তবুও দুটো ডুমুর নিয়ে গেলে কাজ হবে—ধানটা পেয়ে বড্ড সুবিধে হয়েচে—কি বলো রামলাল?

আমি বল্লাম—হ্যাঁ।

—তোমার আজ হয়েচে কি হে? কোনোদিকে যেন মন নেই—

—যা হয়েচে তা হয়েচে, ধান পেয়েচ তো?

—ওঃ—দশ টাকায় এক মণ ধান; এ না পেলে তোমার আমার মত লোকের—

নকুড় চক্কত্তির কথাটা আমার মনে লাগলো বটে কিন্তু কথাটা সত্যি, আমাদের মত অবস্থার লোকের কি অবস্থা হ'ত আজ যদি সুবিধে দরের ধান পাওয়া না যেতো। অথচ আজ নকুড় চক্কত্তি নিজের নামের সঙ্গে আমার নামটা জড়ালে শুনে মনের মধ্যে খচ্ করে উঠলো কোথায়।

অনেকদিন আগের কথা। আমার পিসিমার বাড়ী বামুনহাটি থেকে ফিরে আসছিলাম। আমি কলেজ থেকে বেরিয়েচি চার পাঁচ বছর, কিন্তু তখনও কলকাতায় থাকি, ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকেই চিরকাল মন। এক মাড়োয়ারী ফার্মে কাজ শিখি। এগারো মাইল রাস্তা মেঠো পথ। হেঁটে আসতে আসতে কাপাসীপাড়ার হাটতলায় বাঁধানো পুকুরের চাতালে বসে একটু বিশ্রাম করচি এমন সময় খুব ব্যস্তসমস্ত অবস্থায় দুটি লোককে আমার দিকে আসতে দেখে একটু আশ্চর্য হ'লাম।

লোক দুটির মধ্যে একজন ভট্চাজ বামুন, মাথায় টিকি, ফর্সা রং, গায়ে সাদা উড়ুনি। অন্য লোকটি আঠারো উনিশ বছর বয়সের ছোকরা মাত্র। দুজনেই খুব ঘর্মাক্ত, হাঁপাতে হাঁপাতে যেন অনেক দূর থেকে আসচে। ভট্চাজ মশায় আমার কাছে এসে বল্লেন—ওঃ, ছুটতে ছুটতে এসে ধরেচি। পাওয়া গিয়েচে শেষকালে। তোমার পিসিমার বাড়ী গিয়ে শুনি তুমি আধ ঘণ্টা আগে বেরিয়েচ—তখুনি রমেশকে বল্লাম, পা চালা, রমেশ। ধরতেই হবে পথে।

আশ্চর্য হয়ে বল্লাম—ব্যাপার কি? আপনারা আমায় খুঁজচেন?

—হ্যাঁ, বাবাজী হ্যাঁ। দাঁড়াও একটু জিরিয়ে নিই আগে—

মনে মনে ভাবচি এমন তো কোথাও চুরি বা খুন করে পালাচ্ছি নে, তবে এরা এমন ব্যস্তসমস্ত হয়ে আমার পেছনে ছোটে কেন? কিন্তু কিছু পরেই ভট্চাজ মশায় আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করলেন। আমায় বল্লেন—তোমায় এখুনি যেতে হবে বাবাজী। এই পাশেই গ্রাম, সীতানাথ বাবুর নাম শোনোনি? এ অঞ্চলের জমিদার। তোমার সঙ্গে তাঁর এক মেয়ের সম্বন্ধ আমিই প্রস্তাব করেচি। তুমি এসেচ খবর পেয়ে তোমার পিসিমার বাড়ী দৌড়েছিলাম। এটি আমার ভাইপো।—

এতক্ষণে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেল বটে, কিন্তু সবটা নয়। বল্লাম—কিন্তু আমি সেখানে যাবো কেন হঠাৎ?

—মেয়ে দেখতে, মেয়ে দেখতে। তাঁরাই পাঠিয়ে দিয়েছেন আমায়। সীতানাথ বাবু বল্লেন—নিয়ে এসো তাঁকে।

—তিনি কি করে জানলেন আমি পিসিমার বাড়ী গিয়েচি—

—তোমার যাবার দিন আমি তোমাকে দেখেছিলাম বাবাজী। সেদিন হাটে তোমার পিসেমশায়ের সংগে দেখা, তিনি বল্লেন, তুমি ওখানেই আছ। আমি এসে সীতানাথ বাবুকে বলতেই তিনি বল্লেন, নিয়ে এসো, মেয়ে দেখে যান তিনি।

আমার মনের খট্‌কা গেল না। কোথাও কিছু ভুল হয়ে থাকবে হয়তো। আমি বিবাহ করার জন্যে অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠিনি। আমার পিসেমশায়ের বাড়ী দু'বছর পাঁচ বছর অন্তর একবার যাই, তিনিই বা কি করে জানলেন আমি বিয়ে করবো কিনা।

হঠাৎ আমার মনে একটা তীব্র কৌতূহল হ'ল। এমন ভাবে রাস্তা থেকে ডেকে কেউ আমাকে কখনো মেয়ে দেখাতে নিয়ে যায় নি। সীতানাথ বাবু কেমন জমিদার, কেমন তাঁর মেয়ে, এ আমায় দেখতে হবে।

ওরা দু'জনে আমায় নিয়ে পাশের এক রাস্তা ধরলে। সে রাস্তার দু'ধারে ঘন বাঁশবন, কাপাসীপাড়ার কুম্ভকার পাড়া ছাড়িয়ে একটা খুব বড় মাঠ, মাঠের মধ্যে অনেক দূরে কাদের একটা সাদা রংয়ের বাড়ী। ভট্‌চাজ মশায় বল্লেন—ওই হ'ল রায়দের বাড়ী—এ অঞ্চলে নামডাক আছে ওদের। বংশও খুব ভালো...নাম শোনো নি?

আমি বিনীতভাবে বল্লাম, আমার এ অঞ্চলে তত বেশি যাতায়াত নেই। কাজেই অনেক লোকেরই নাম শুনি নি।

একটা সাবেক আমলের বড় বাড়ীর সামনে আমরা গিয়ে দাঁড়ালাম। বাড়ীটা দেখেই বুঝলাম এক সময়ে এ বাড়ীর মালিকেরা দেশের জমিদার ও শাসক ছিল, যদিও এখন এদের সে অবস্থা নেই। থাকলে রাস্তা থেকে ডেকে এনে আমায় মেয়ে দেখাতো না।

একটি বেশ সুন্দর মত ছোকরা আমাদের ডাক শুনে বাইরে এল, তারপর এলেন কর্তা স্বয়ং সীতানাথ রায়। আমাদের সাদরে নিয়ে গিয়ে বসালেন বৈঠকখানার মধ্যে। খুব বড় সাবেকী বৈঠকখানা, দেওয়ালে বড় বড় হরিণের শিং, ঝাড়লণ্ঠন টাঙানো, বড় বড় পুরোনো বিবর্ণ ছবি ভেতরে বাইরে ঝুলনো। বৈঠকখানার এক পাশের তক্তপোশের ওপর অনেকগুলি বাদ্যযন্ত্র—সেতার তানপুরা, ডুগিতবলা ইত্যাদি। মনে হ'ল সেগুলো ব্যবহার করবার লোক আছে এ বাড়ীতে। বেশ যত্নে তম্বিরে গুছিয়ে রাখা। এক কোণে আট দশ গাছা বড় হুইলের ছিপ। ভট্‌চাজ মশায় আমায় দেখিয়ে বল্লেন—এই ইনিই, এ'রই নাম রামলাল চাটুজ্যে—

এমন কিছু বিখ্যাত লোক আমি নই, অথচ কথার ভাবে মনে হ'ল আমার সম্বন্ধে এ'দের মধ্যে নিশ্চয়ই আলোচনা হয়েচে। সীতানাথবাবু আমার দিকে চেয়ে বল্লেন—আপনার পিসেমশায় ভবশঙ্কর বাবু [illegible] সংগে আমার যথেষ্ট পরিচয়। তিনি আমার সঙ্গে একবার আপনার কথা বলেছিলেন, তখন আপনি কোথায় পশ্চিমে চুনের ব্যবসা করতেন—খুব ব্যবসার ঝোঁক আপনার। এই তো চাই বাঙালীর। চাকরি চাকরি করে দেশ উচ্ছন্ন

বিনীতভাবে বল্লাম—চুনের ব্যবসা করি নি, করবার চেষ্টায় গিয়েছিলাম বটে।

—কোথায় যেন সেই?

—আজ্ঞে পশ্চিমে, বিন্ধ্যাচলের কাছে। ঘুটিং পাথর কিনে পুড়িয়ে চুন করে, সে [illegible] বড় বড় ভাঁটি আছে চুন পোড়ানোর।

—এখন কি করা হয় আপনার?

—বিজনেস করি কলকাতায় এক বন্ধুর সঙ্গে ভাগে। আমাকে 'আপনি' বলবেন না, আপনি পিসেমশায়ের বন্ধু, আমাকে—

—তা'তে কি তা'তে কি বাবাজী। ব্রাহ্মণসন্তান, কুলীনের সন্তান, সব নমস্য। কত বড় কুলীন বংশ আপনারা—

এইবার খানিকটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। সীতানাথ রায় মশায় পুরাতন-

পন্থী লোক, এখনও কৌলীন্য মানেন, আমাদের কুলীন হিসেবে এক সময়ে বেশ নাম-ডাক ছিল বাবা বলতেন। এখন আর ওসব কে মানে বা গ্রাহ্য করে? তবে এই সব অজ্ঞ পাড়াগাঁয়ে—

সীতানাথ রায় মশায়ের চেহারা আমার খুব ভালো লেগেচে। বেশ লম্বা, দোহারা, ফর্সা চেহারা, মাথার চুল ধবধবে সাদা, মুখশ্রীতে একটা সদানন্দ, উদার অথচ একটু যেন নির্বোধের ভাব। তাতে মানুষকে আরও বেশি আকৃষ্ট করে তাঁর দিকে। আমি নিজে তো ধূর্ত মানুষের চেয়ে নির্বোধ লোক ঢের বেশি পছন্দ করি।

আমায় বল্লেন—আমার বড্ড আনন্দ হচ্চে আপনি আজ এসেচেন আমার বাড়ী—বিয়ে হোক না হোক, সে ভবিতব্য। কিন্তু আপনার আসাতেই—

গ্রামের দু'তিনটি ভদ্রলোক, কেউ কোঁচার টিক গায়ে, কেউ একটা আধময়লা পাঞ্জাবি গায়ে, এসে বৈঠকখানায় ঢুকে আমাদের দিকে চেয়ে নমস্কার করে বসলেন অন্যদিকে। রায় মশায় বল্লেন—ওদিকে কেন, সরে আসুন, সরে আসুন—এই ইনিই রামলাল বাবু—আলাপ পরিচয় করুন—

কিন্তু তাঁরা নিতান্ত গ্রাম্য লোক, আমার সংগে আলাপ পরিচয় করতে তাদৃশ সাহস করলেন না বোধ হয়। একটু পরে তাঁদের একজন নিজেই তামাক সেজে টানতে লাগলেন। ভট্‌চাজ মশায়ও তামাক খাবেন বলে ওদিকে উঠে গেলেন। আমি আর রমেশ এদিকে বসে রইলাম। সীতানাথ রায় মশায় একটু পরে বাড়ীর ভেতর থেকে এসে বল্লেন—চলুন, একটু মিষ্টিমুখ করবেন।—অজ পাড়াগাঁয়ে এইটিই বলা রীতি। একটু শহর-ঘেঁষা জায়গা হ'লে বলতো—চলুন, চা খাবেন।

বৈঠকখানা ছাড়িয়ে খুব বড় একটা হলঘর পার হয়ে ডাইনে বাঁয়ে দু'দিকেই বারান্দাওয়ালা কুঠুরির সারি। অনেকগুলি কুঠুরি, আট দশটার কম নয়, তারপর আবার খোলা রোয়াক, পূব পশ্চিমে লম্বা। তারপর চাতাল বাঁধানো উঠান পার হয়ে ওদিকের আর একটা বড় টানা ঢাকা বারান্দায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল। আমি চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলুম। প্রাচীন জমিদার-বাটী বটে। ভেতরটা আগাগোড়া চকমেলানো. খুব উঁচু কার্ণিস-যুক্ত ছাদ—তবে সেকেলে বাড়ী, ছোট ছোট দরজা জানালা।

বারান্দায় আট দশজন লোকের প্রচুর জলযোগের আয়োজন সজ্জিত ছিল। সীতানাথ রায় মহাশয়ের প্রৌঢ়া গৃহিণী সকলকে লুচি পরিবেষণ করলেন—কারণ এখানে বাইরের লোকের মধ্যে এক যা আমিই আছি, আর সবাই এই গ্রামেরই লোক। আমার মনে হ'ল তিনি লুচি পরিবেষণের ছলে আমায় দেখতে এসেচেন এবং বেশ একটু আগ্রহের সংগেই আমার দিকে চেয়ে চেয়ে বার বার দেখচেন।

জলযোগান্তে রায় মশায় আমায় পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে ওঁর সংগে আলাপ করিয়ে দিলেন। আমি পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করতেই তিনি বল্লেন—এসো বাবা এসো—

মনে হ'ল ঠিক যেন নিজের মা।

আমায় আর একটি বর্ষীয়সী মহিলার সংগে আলাপ করিয়ে দিলেন গৃহিণী নিজে। বল্লেন—বড় কুলীন বংশ, যদি এখন আমার মেয়ের শিবপুজোর জোর থাকে—তোমরা পাঁচজনে আশীর্বাদ করো—

এ'রা আমার সংগে যে অমায়িক. হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করলেন, শুধু এই সব পল্লী-গ্রামেই তার তুলনা মেলে। নিজে আমি অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে পড়লাম এ'দের আত্মীয়তায়। জানালা দিয়ে চোখে পড়চে ওঁদের চকমেলানো ছাদের ওপর ঝুঁকে-পড়া নারিকেল বৃক্ষের কম্পমান শাখা প্রশাখা।

একটু পরে বাইরের ঘরে মেয়ে দেখানো হ'ল।

মেয়ে সুন্দরী না হোক. বেশ দেখতে শুনতে। বড় ঘরের মেয়ে ব'লে বোধ হয় বটে।

সীতানাথ রায় মশায় নিজে যত্ন ক'রে মেয়েকে গান বাজনা শিখিয়েচেন। বল্লেন—ভট্চাজ মশায়, বিনু আমার গান বাজনা জানে, সেতার বাজাতে পারে—সেটা একটু শুনতে উনি যদি চান—

আমি সলজ্জমুখে চুপ করে রইলাম। ভট্চাজ মশায় বল্লেন—হ্যাঁ হ্যাঁ—বিনু দিদি, ধরো একবার সেতারটা—

মেয়েটি বেশ সপ্রতিভভাবে গিয়ে বৈঠকখানার ঢালা বিছানায় বসে সেতার বাজালে, সীতানাথ রায় মশায় নিজে ডুগি-তবলা ধরলেন। আমি গান-বাজনার বিশেষ কিছু বুঝি নে, করি কয়লা আর চুনের আড়তদারি, তবুও মনে হ'ল মেয়েটি কাঁচা হাতে সেতার ধরে নি। সেতার নামিয়ে খানিক পরে যখন সে দু'টি গান গাইলে, তখন মেয়েটির কণ্ঠস্বর আমার কাছে বেশ ভালোই লাগলো। তবে, ঐ যে বল্লুম, ও জিনিসের সমঝদার নই আমি।

সেই অপরাহ্নটি আমার জীবনের এক অদ্ভুত অপরাহ্ণ বটে। দূর সম্পর্কের পিসিমার বাড়ী থেকে ফিরচি। থাকি কলকাতায়, যখন আসি বাড়ীতে কালেভদ্রে তখন হাঁটাপথে এগারো-বারো মাইল পথ নানা ধরনের পাড়াগাঁ, বিল, বাঁওড়ের মধ্যে দিয়ে যাবার প্রলোভনেই পিসিমার বাড়ী যাই—বিশেষ কোনো আত্মীয়তার টানে নয়।

সেই পথে ফেরবার সময়ে এ যেন এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। কখনো শুনিনি যাদের নাম, তাদের বাড়ীতে এসে এমন অমায়িক ব্যবহার পাওয়া আমার কাছে সম্পূর্ণ অভিনব। এই প্রাচীন জমিদারবাড়ী, ওই ভাঙা পুজোর দালানের কার্ণিসে বটচারাটা, জানালার বাইরে ওই গোলার সারি, এই সুগায়িকা মেয়েটি—সব যেন স্বপ্ন। আমি জানি এ বিয়ে হবে না, বিয়ে করার ইচ্ছে নেইও আমার, থাকলেও উপায় নেই—ব্যবসা-জীবনের সবে আমার শুরু, এখন বিয়ে ক'রে নিজেকে সংসার-জালে জড়িত করতে চাই নে আমি। তা ছাড়া ওঁরা অনেক কিছু ভুল খবর শুনেচেন আমার সম্বন্ধে, এটা ওঁদের কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারলাম। আমি সামান্যই ব্যবসা করি, তাও একটি বন্ধুর সঙ্গে ভাগে। সামান্য পুঁজির ওপর ব্যবসা—এমন কিছু আয় হয় না যা'তে কলকাতা শহরে বাসা ক'রে পরিবার নিয়ে সচ্ছলভাবে থাকা যায়।

এমন সময় ভট্চাজ মশায় এমন একটি কথা বল্লেন যা'তে আমি একেবারে অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

তিনি বল্লেন—বাবাজীর নিজের বাড়ী আছে কলকাতায়, নিজেই করেচেন—

রায় মশায় বল্লেন—হ্যাঁ, সে তো আপনি বল্লেন সেদিন—

আমি অবাক। ভট্চাজ মশায় জেনে শুনে মিথ্যে কথা বলচেন ঘটকালি অগ্রসর করবার জন্যে, না উনি আমার সম্বন্ধে ভুল খবর পেয়েছেন?

আমি তখনি প্রতিবাদ করতাম কিন্তু হঠাৎ কেমন দুর্বলতা এসে গেল মনে। ওই যে মেয়েটি এখানে বসে আছে, ওর কাছে এখুনি এত খেলো হব কেন? বিয়ে হবে না জানি, মেয়েটি উঠে যাক—আমিও এখান থেকে চলে যাই—তারপর আমি যা করবো তা আমার জানাই আছে।

রায় মশায়ই বল্লেন—তা'হলে মেয়েটিকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যেতে পারি?

অপরাধের বোঝা যথেষ্টই ভারী হয়েছে তাঁর কাছে আমার। আর নয়—আমি মেয়েকে নিয়ে যেতে বল্লাম। একটু পরে এল বাড়ীর মধ্যে থেকে মেয়ের হাতের নানারকম সূচের কাজকর্ম—একটি রাশ। কত রকমের তুলোর কুকুর, পশমের আসন, রুমাল, টেবিল ঢাকা কাপড়, মাছের আঁশের হাঁস ফ্রেমে বাঁধানো—ইত্যাদি! একটি সুদর্শন ছোট ছেলের সঙ্গে একজন ঝি সেগুলো নিয়ে এসে আমার সামনে রাখলে। গিন্নিমা নাকি সেগুলি পাঠিয়েছেন।

আরও আধ ঘণ্টা।

এইবার রওনা হতে হবে। ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম! সীতানাথ রায় মশায় আমাকে প্রথমে কিছুতেই আসতে দেবেন না, রাত হয়ে আসচে—এখন তিনি আমায় ছেড়ে দিতে পারেন না। রাত্রে এখানেই থাকতে হবে।

আমি বল্লাম—কোন অসুবিধে হবে না, মংগলগঞ্জের ঘাটে নৌকো ভাড়া ক'রে চলে যাবো। সে ঘাট তো মোটে দু'মাইল। জ্যোৎস্নারাত্রে বেশ চলে যাবো।

সীতানাথ রায় মশায় আমার সংগে একাই খানিক দূর হেঁটে চললেন। বল্লেন—আপনাকে আর বেশি কি বলবো মেয়ে আমার বড্ড ভালো।

—আজ্ঞে নিশ্চয়ই।

—আপনার মতামতটা যদি জানাতেন—

—সেটা আমার মামার সংগে পরামর্শ করে আপনাকে জানাবো, কারণ মামাই বলতে গেলে এখন অভিভাবক—

বলা বাহুল্য, যে মাতুলকে কর্মকর্তা নির্দেশ করলাম, তাঁর খবর পর্যন্ত রাখিনি আজ তিন চার বছর।

বল্লুম—তাহ'লে আপনি আর এগোবেন না—সন্দে হয়ে এল—

স্থানটি নির্জন। গ্রাম ছাড়িয়ে বড় একটা বিল ডান দিকে, সামনে ধু ধু মাঠের বুক চিরে সাদা বালির রাস্তা সোজা পশ্চিম দিকে চলে গিয়েচে। কেউ কোথাও নেই।

রায় মশায় এদিক ওদিক তাকিয়ে সুর নীচু করে বল্লেন—যা'তে এ হয়, তা তোমাকে করতেই হবে বাবাজী। আমার স্ত্রীর বড্ড পছন্দ হয়েচে তোমাকে, আমায় ডেকে বলছিল। আর কি জানো, বাইরে ঠাট যতই দ্যাখো, তেমন অবস্থা তো আর নেই। তোমার মত সুপাত্র কোথায় পাবো। দেনা পাওনার জন্য কিছু আটকাবে না—তোমার কলকাতার বাড়ী সাজানো আসবাবপত্তর দিতে পারব না হয়তো, তবে মেয়ের গা সাজানো গহনা দেবো। ত্রিশ ভরি সোনা দেবো, ওর গর্ভধারিণীর যা আছে, তা দুই মেয়েকে তিনি ভাগ ক'রে দেবেন। তাহলে মনে থাকে যেন বাবাজী—

এই প্রথম তিনি আমায় ঘনিষ্ঠ সম্বোধন করলেন!

চলে এলাম সেদিন এবং কয়েকদিন পরে কলকাতাতেও এলাম। তারপর আমি কোন উচ্চবাচ্য করিনি এ বিষয়ে। সীতানাথ রায় মশায় পত্র দিয়েছিলেন, লোক পাঠিয়েছিলেন। বহু অনুরোধ করেছিলেন—শেষ পর্যন্ত যদি আমি বিবাহ করি, উৎকৃষ্ট ধানের জমি মেয়ের নামে লেখাপড়া করে দিতে চেয়েছিলেন,—প্রায় পনেরো বিঘে। বড়ই দুঃখের সংগে বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে হ'ল আমায়। তিনি আগাগোড়া ভুলের ওপর যে বাড়ীর ভিৎ পত্তন করেছিলেন, সে ভিতের ওপর আমি বাড়ী তুলতে পারি নি।

সব কথা খুলে বলি নি কেন?

তখন বয়স ছিল কম। গর্বে বাধে, মুখ ছোট হয়ে যায়। এখন হ'লে সব খুলে বলতাম, তখন তা পারি নি।

এখন দেশেই আছি। এই যুদ্ধের বাজারে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার চালানো বড়ই কষ্ট। ব্যবসা অনেকদিন নষ্ট হয়ে গিয়েচে—বন্ধুই হ'ক আর যে-ই হ'ক ভাগে ব্যবসা না করাই ভালো—এই অতি মূল্যবান অভিজ্ঞতা ক্রয় করতে হয়েচে অতি কষ্টে উপার্জিত হাজার, সাতেক টাকার বিনিময়ে।

সেদিন প্রভা বল্লে—সামনের মাসে ধান ফুরিয়ে যাবে। ছত্রিশ টাকা চালের মণ, কি ক'রে এই পুরীপাল্লা চালাবো। সস্তায় নাকি কণ্ট্রোলের ধান দিচ্চে মহকুমায়—চেষ্টা দেখো না?

তাই আজ ক'দিন ধরে হাঁটাহাঁটি করছি মহকুমায়। ধান সস্তায় দেবার মালিক এক

বড় অফিসার, তিনি কলকাতা থেকে এসে দিন পনেরো আছেন। তাঁর আরদালি ক'দিন ফিরিয়ে দিয়েচে।

আজ নকুড় চক্কত্তি বল্লে, এমনি না হয়—একজন উকিল ধরে হাকিমের কাছে দরখাস্ত দিতে হবে! রোজ হেঁটে আর পারিনে—

তাই দু'জনে মিলে একখানা নৌকো ভাড়া করে এসেছিলাম।

বেলা দশটার সময় হাকিমের বাসার ফটকে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে না, ভেতরে ঢুকতেও সাহস হয় না। এমন সময় হাকিমের ছোক্‌রা আরদালিকে আসতে দেখে তাকে বল্লাম--ওহে শোনো, আমাদের দরখাস্তখানা নিয়ে যাও না সাহেবের কাছে?

হাকিম বাঙালী হলেও তাঁকে সাহেব বলাই নিয়ম।

লোকটা ইতস্তত করচে দেখে নকুড় চক্কত্তি তাকে দু'আনা পয়সা দিয়ে বল্লে—পান বিড়ি খেয়ো। আমরা গরীব লোক, নিয়ে যাও দরখাস্তখানা, আজ ন'দিন হাঁটাহাঁটি করচি। ধান মঞ্জুর হ'লে তোমায় আরো কিছু দেবো—

আরদালি কি ভেবে দরখাস্ত নিয়ে চলে গেল।

দু' ঘণ্টা কারো দেখা নেই—কেউ ডাকে না! সাহেব তো দূরের কথা, আরদালিরও চুলের টিকি আর দেখা যায় না। নকুড় চক্কোত্তি বলে—কি ব্যাপার হে, দু' আনা পয়সাই গেল এ বাজারে—থাকলে তবুও ছেলেপিলের জন্য দু'খানা কুচো গজা টজা নিয়ে গেলে—

এমন সময় সেই ছোকরা আরদালি বারান্দায় বেরিয়ে বল্লে—রামলালবাবু কার নাম?

নকুড় চক্কোত্তি বল্লে—যাও হে, তোমার ডাক পড়েছে—দেখে এসো—আমার কথাটাও একটু ব'লো। না খেয়ে মরে যাবে ছেলেপিলে—

বারান্দা পার হয়ে সামনের সাজানো মাঝারি গোছের ঘরে ঢুকেই আমি সামনে একটি মহিলাকে দেখে একেবারে চমকে গেলাম। থতমত খেয়ে সরে যাব কি না ভাবচি, এমন সময়ে মেয়েটি হাত তুলে আমায় নমস্কার করলে। আমি আরও থতমত খেয়ে গেলাম।

হাতের একখানা কাগজ দেখিয়ে মেয়েটি বল্লে—এ দরখাস্ত আপনি করেচেন? আমি আপনার নাম দেখে বুঝেচি আর গ্রামের নাম দেখে—আমায় চিনতে পারলেন না?

নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে মেয়েটির দিকে ভালো করে চাইলাম। কোথায় যেন দেখেচি, কিন্তু মনে করতে পারলাম না কোথায় দেখেচি।

মেয়েটি মৃদু হেসে বল্লে—আমাদের বাড়ী আপনি গিয়েছিলেন—আমার বাবার নাম শ্রীসীতানাথ রায়, কাপাসীপাড়া—

আমার সমস্ত শরীর যেন কাঠের মত আড়ষ্ট হয়ে গিয়েচে। এই সেই স্মৃতি, সীতানাথ রায়ের মেয়ে।

মেয়েটি আবার বল্লে—আমি আপনাকে আরও দু'দিন দেখেচি। দেখেই চিনেছিলাম. একটু সন্দেহ ছিল—আজ দরখাস্তে আপনার নাম দেখে আর সন্দেহ রইল না। উনি একটু বিশ্রাম করচেন। আপনার দরখাস্ত ওঁকে বলে মঞ্জুর করিয়েচি—নিয়ে যান। চেহারা খারাপ হয়ে গিয়েচে আগেকার চেয়ে। একটু চা খাবেন?

আমি যেন সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে বল্লাম—না—না—এখন থাক—

মেয়েটি হাত তুলে নমস্কার করে বল্লে—এবার এখানে এলে কিন্তু আবার দেখা করবেন। ওঁকে বলেচি আমার বাপের বাড়ীর দেশে আপনার পিসিমার বাড়ী। অবিশ্যি আসবেন, চা খাবেন সেদিন—

আমি দরখাস্ত হাতে নিয়ে বার হয়ে এলাম। সস্তায় দু'মণ ধানের পারমিট পেয়েছি। স্ত্রী পুত্র এখন দু'মাস খেয়ে বাঁচবে।

শারদীয়া যুগান্তর ১৩৫১

ওর ভাল নাম বোধ হয় ছিল নিস্তারিণী। ওর যৌবন বয়সে গ্রামের মধ্যে অমন সুন্দরী বৌ ব্রাহ্মণপাড়ার মধ্যেও ছিল না। ওরা জাতে যুগী, হরিনাথ ছিল স্বামীর নাম। ভদ্রলোকের পাড়ায় ডাকনাম ছিল, 'হরে যুগী'।

নিস্তারিণীর স্বামী হরি যুগীর গ্রামের উত্তর মাঠে কলাবাগান ছিল বড়। কাঁচকলা ও পাকাকলা হাটে বিক্রী ক'রে কিছু জমিয়ে নিয়ে ছোট মনোহারি জিনিসের ব্যবসা করে। রেশমী চুড়ি ছ গাছা এক পয়সা, দু'হাত কার এক পয়সা—ইত্যাদি। প্রসংগক্রমে মনে হ'ল 'কার' মানে ফিতে বটে ; কিন্তু 'কার' কি ভাষা? ইংরিজিতে এমন কোনো শব্দ নেই, হিন্দী বা উর্দুতে নেই, অথচ 'কার' কথাটা ইংরিজি শব্দ বলে আমরা সকলেই ধরে নিয়ে থাকি! যাক্ সে। হরি যুগীর বাড়ীতে দুখানা বড় বড় মেটে ঘর, একখানা রান্না-ঘর, মাটির পাঁচিল-ঘেরা বাড়ী। অনেক পুষ্যি বাড়ীতে, দু'বেলা পনেরো ষোলোখানা পাত পড়ে। হরি যুগীর মা, হরি যুগীর দু'টি ছোট ভাই, এক বিধবা ভাগ্নী, তার দুই ছেলে-মেয়ে। সংসার ভালোই চলে, মোটা ভাত, কলাইয়ের ডাল ও ঝিঙে ও লাল ডাঁটা চচ্চড়ির অভাব কোনদিন হয়নি, গোরুর দুধও ছিল চার পাঁচ সের। অবিশ্যি দুধের অর্ধেকটা ব্রাহ্মণপাড়ায় যোগান দিয়ে তার বদলে টাকা আসতো।

গ্রামের মধ্যে সুন্দরী বৌ-ঝির কথা উঠলে সকলেই বলতো—'হরে যুগীর বৌয়ের মত প্রায় দেখতে'। গ্রামের নারী-সৌন্দর্যের মাপকাঠি ছিল নিস্তারিণী। গেরস্তঘরের বৌ, স্নান ক'রে ভিজে কাপড়ে ঘড়া কাঁকে নিয়ে যখন সে গাঙের ঘাট থেকে ফিরতো, তখন তার উদ্দাম যৌবনের সৌন্দর্য অনেক প্রবীণের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিত।

এ গ্রামে একটা প্রবাদ আছে অনেকদিনের।

তুলসী দারোগা নদীর ঘাটের পথ ধরে নীলকুঠীর ওদিক থেকে ঘোড়া ক'রে ফিরবার সময়ে তুঁতবটের ছায়ায় প্রস্ফুট তুঁত ফুলের মাদকতাময় সুবাসের মধ্যে এই সিক্তবসনা গৌরাঙ্গী বধূকে ঘড়া কাঁকে যেতে দেখল। বসন্তের শেষ, ঈষৎ গরম পড়েচে—নতুবা তুঁত ফুল সুবাস ছড়াবে কেন?

তুলসী দারোগা ছিল অত্যন্ত দুর্ধর্ষ জাঁহাবাজ দারোগা—'হয়'কে 'নয়' করবার অমন ওস্তাদ আর ছিল না। চরিত্র হিসেবেও যে নিষ্কলঙ্ক ছিল, এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই। তুলসী দারোগার নামে এ অঞ্চলে বাঘে গোরুতে একঘাটে জল খেত। তার সুনজরে একবার যিনি পড়বেন, তাঁর হঠাৎ উদ্ধারের উপায় ছিল না। এ হেন তুলসী দারোগা হঠাৎ উন্মনা হয়ে পড়লো সুন্দরী গ্রাম্যবধূকে নির্জন নদীতীরের পথে দেখে। বধূটিকে সন্ধান করবার লোকও লাগালে। হরি যুগীকে দু'তিনবার থানায় যেতে হ'ল দারোগার সংগে সাক্ষাৎ করতে। কিন্তু নিস্তারিণী ছিল অন্য চরিত্রের মেয়ে, শোনা যায় তুলসী দারোগার পাঠানো বৃন্দাবনী শাড়ী সে পা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে বলেছিল তাদের কলাবাগানের কল্যাণে অমন শাড়ী সে অনেক পরতে পারবে ; জাতমান খুইয়ে বৃন্দাবনী কেন, বেনারসী পরবার শখও তার নেই।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে তুলসী দারোগা এখান থেকে বদলি হয়ে চলে যায়।

আর একজন লোক কিন্তু কথঞ্চিৎ সাফল্য লাভ করেছিল অন্যভাবে। গ্রামের প্রান্তে গোঁসাইপাড়া, গ্রামের মধ্যে তারা খুব অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, প্রায় জমিদার। বড় গোঁসাইয়ের ছেলে রতিকান্ত নদীর ধারে বন্দুক নিয়ে শিকার করতে গিয়েছিল—সন্ধ্যার প্রাক্কালে. শীতকাল। হঠাৎ সে দেখলে কাদের একটি বৌ ঘড়াসুদ্ধ পা পিছলে পড়ে গেল—খুব সম্ভব তাকে দেখে। রতিকান্ত কলকাতায় থাকতো, দেশের ঝি-বৌ সে চেনে না। সে

ছুটে গিয়ে ঘড়াটা আগে হাঁটুর ওপর থেকে সরিয়ে নিলে, কিন্তু অপরিচিতা বধূর অঙ্গ স্পর্শ করলে না। একটু পরেই সে দেখলে বধূটি মাটি থেকে উঠতে পারছে না. বোধ হয় হাঁটু মচকে গিয়ে থাকবে। নির্জন বনপথ, কেউ কোনদিকে নেই, সে একটু বিব্রত হয়ে পড়লো। কাছে দাঁড়িয়ে বল্লে—মা, উঠতে পারবে, না হাত ধরে তুলবো?

তারপর সে অপরিচিতার অনুমতির অপেক্ষা না করেই তার কোমল হাতখানি ধরে বল্লে—ওঠ মা আমার ওপর ভর দিয়ে। কোন লজ্জা নেই—উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করো তো—

কুণ্ঠিতা সঙ্কুচিতা বধূ ছিল না নিস্তারিণী। সে ছিল যুগীপাড়ার বৌ—তাকে একা ঘাট থেকে জল আনতে হয়, ধান ভানতে হয়, ক্ষার কাচতে হয়—সংসারের কাজকর্মে সে অনলস, অক্লান্ত। যেমনি পরিশ্রম করতে পারে, তেমনি মুখরা, তেমনি সাহসিকাও বটে। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের গৌরবে তখন তার নবীন বয়সের নবীন চোখ দুটি জগৎকে অন্য দৃষ্টিতে দেখে।

সে উঠে দাঁড়ালো, রতিকান্তের সঙ্গে কিন্তু কোনো কথা বল্লে না। বুঝতে পারলে গোঁসাইপাড়ার বাবুদের ছেলে তার সাহায্যকারী। বাড়ী গিয়ে দু-তিন দিন পরে সে স্বামীকে দিয়ে একছড়া সুপক্ক চাঁপাকলা ও নিজের হাতের তৈরী বাঁশশলা ধানের খইয়ের মুড়কী পাঠিয়ে দিলে গোঁসাইবাড়ী। বল্লে—আমার ছেলেকে দিয়ে এসো গে—

নিস্তারিণী সেই থেকে সেই একদিনের দেখা সুদর্শন যুবকটিকে কত কি উপহার পাঠিয়ে দিত। রতিকান্তের সঙ্গে আর কিন্তু কোনোদিন তার সাক্ষাৎ হয় নি। গোঁসাই-বাড়ীর ছেলে যুগী-বাড়ীতে কোনো প্রয়োজনে কোনদিন আসে নি।

রতিকান্ত কলকাতাতেই মারা গিয়েছিল অনেকদিন পরে। নিস্তারিণীর দু-তিন দিন ধরে চোখের জল থামেনি, এ সংবাদ যখন সে প্রথম শুনলে।

গ্রামের অবস্থা তখন ছিল অন্যরকম। সকলের বাড়ীতে গোলাভরা ধান, গোয়ালে দু-তিনটি গোরু থাকতো। সব জিনিস ছিল সস্তা। নিস্তারিণীদের বাড়ীর পশ্চিম উঠানে ছোট একটা ধানের গোলা। কোনো কিছুর অভাব ছিল না ঘরে। বরং ব্রাহ্মণপাড়ার অনেককে সে সাহায্য করেছে।

একবার বড্ড বর্ষার দিনে সে বাড়ীর পিছনের আমতলায় ওল তুলচে—এমন সময় বাঁড়ুয্যে বাড়ীর মেয়ে ক্ষান্তমণি এসে বল্লে—

—ও যুগী বৌ?

নিস্তারিণী অবাক হয়ে মুখ তুলে চাইলে। বাঁড়ুয্যেবাড়ীর মেয়েরা কখনো তাদের বাড়ীর বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে কথা বলে না। সে বল্লে—কি দিদিমণি?

—একটা কথা বলবো।

—কি বলো দিদিমণি—

—আমাদের আজ একদম চাল নেই ঘরে। বাদলায় শুকুচ্চে না, কাল ধান ভেনে দুটো চিঁড়ে হয়েছিল। তোমাদের ঘরে চাল আছে, কাঠাখানেক দেবে?

নিস্তারিণী এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে, তার খান্ডার শাশুড়ী কোনোদিকে আছে কিনা। পরে বল্লে—দাঁড়াও দিদিমণি—দেবানি, চাল ঘরে আছে। শাশুড়ীকে লুকিয়ে দিতি হবে—দেখতি পেলে বড্ড বকবে আমারে। তা বকুক গে. তা ব'লে বামুনের মেয়েকে বাড়ী থেকে ফিরিয়ে দেবো?

আর একবার বাঁড়ুয্যেবাড়ীর বৌ তার বৃদ্ধা শাশুড়ীকে ঝগড়া করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল : সে বৌ ছিল গ্রামের মধ্যে নামডাকওয়ালা খান্ডার বৌ—শাশুড়ীর সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া বাধাতো. কেরোসিনের টেমি ধরিয়ে শাশুড়ীর মুখ পুড়িয়ে দিয়েছিল। পাড়ার কেউ ভয়ে বৃদ্ধাকে স্থান দিতে পারে নি, যে আশ্রয় দেবে তাকেই বড় বৌয়ের গালাগালি খেতে হবে। যুগী বৌ দেখলে বাঁড়ুয্যে বাড়ীর বেড়ার কাছে বড় সেগুনতলার

ছায়ায় ন'-ঠাকরুণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে হাপুস নয়নে কাঁদচেন। ও গিয়ে বল্লে—ন'ঠাকরুণ, আসুন আমাদের বাড়ীর দাওয়াতে বসবেন—বড় বৌ বকেছে বুঝি?

ন'ঠাকরুণ শুচিবেয়ে মানুষ, তা ছাড়া বাঁড়ুয্যে বাড়ীর গিন্নী হয়ে যুগী বাড়ী আশ্রয় নিলে মান থাকে না। সুতরাং প্রথমে তিনি বল্লেন—না বৌ, তুমি যাও, আমার কপালে এ যখন চিরদিনের, তখন তুমি একদিন বাড়ীতে ঠাঁই দিয়ে আমার কি করবে? নগের বৌ যেদিন চটকতলায় চিতেয় শোবে, সেদিনটি ছাড়া আমার শান্তি হবে না মা। ওই 'কালনাগিনী' যেদিন আমার নগের ঘাড়ে চেপেচে—

নিস্তারিণী ভয়ে ভয়ে বল্লে—চুপ করুন ন'গিন্নী, বৌ শুনতি পেলি আমার এস্তক রক্ষে রাখবে না। আসুন আপনি আমার বাড়ীতে। এইখানে দাঁড়িয়ে কষ্ট পাবেন কেন মিথ্যে—

ন'গিন্নীকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে সে নিজের হাতে পা ধুয়ে দিয়ে পিঁড়ি পেতে দাওয়ায় বসালে। কিছু খেতে দেওয়ার খুব ইচ্ছে থাকলেও সে বুঝলে বড় ঘরের গিন্নী ন'ঠাকরুণ এ বাড়ীতে কোনো কিছু খাবে না, খেতে বলাও ঠিক হবে না। সে ভাগ্য সে করে নি।

অনেক রাত্রে গিন্নীর বড় ছেলে নগেন খুঁজতে খুঁজতে এসে যখন মায়ের হাত ধরে নিয়ে গেল, তখন নিস্তারিণী অনেক অনুনয় বিনয় ক'রে বড় একছড়া মর্তমান কলা তাঁকে দিয়ে বল্লে—নিয়ে যান দয়া ক'রে। আর তো কিছু নেই, কলাবাগান আছে, কলা ছাড়া মানুষকে হাতে ক'রে আর কিছু দিতে পারিনে—

তার স্বামী সেবার রামসাগরের চড়কের মেলায় মনোহারী জিনিস বিক্রী করতে গেল। যাবার সময় নিস্তারিণী বল্লে—ওগো আমার জন্যি কি আনবা?

—কি নেবা বলো? ফুলন শাড়ী আনবো?

—না শোনো, ওসব না। একরকম আলতা উঠেচে আজ মজুমদার বাড়ী দেখে এলাম। কলকেতা থেকে এনেচে মজুমদার মশায়ের ছেলে—শিশিনিতে থাকে। কি একটা নাম বল্লে ভুলে গিইচি।

—শিশিনিতে থাকে?

—হ্যাঁ গো। সে বড় মজা, কাটির আগায় তুলো দেওয়া, তাতে করে মাখতে হয়! ভালো কথা, তরল আলতা—তরল আলতা—

—কত দাম?

—দশ পয়সা। হ্যাঁগা, আনবে এক শিশিনি আমার জন্যি?

—দ্যাখবো এখন। গোটা পাঁচেক টাকা যদি খেয়ে দেয়ে মুনাফা রাখতি পারি, তবে এক শিশিনি ঐ যে কি আলতা তোর জন্যি ঠিক এনে দেবো।

এইভাবে গ্রামের ব্রাহ্মণ পাড়ার সাথে টেক্কা দিয়ে নিস্তারিণী প্রসাধন দ্রব্য ক্রয় করেছে। তাদের পাড়ার মধ্যে সে-ই সর্বপ্রথম তরল আলতা পায়ে দেয়। শূদ্রপাড়ার মধ্যে ও জিনিস একেবারে নতুন—কখনো কেউ দেখেনি। আলতা পরবার সময়ে যে দেখতো সে-ই অবাক হয়ে থাকতো। হাজরী বুড়ী মাছ বেচতে এসেচে একদিন—সে অবাক হয়ে বল্লে—হ্যাঁ বড় বৌ, ও শিশিনিতে কি? কি মাখাচ্চ পায়ে?

নিস্তারিণী সুন্দর রাঙা পা দুখানি ছড়িয়ে আলতা পরতে বসেছিল, এক-গাল হেসে বল্লে—এ আলতা দিদিমা। এরে বলে তরল আলতা।

—ওমা, পাতা আলতাই তো দেখে এসেচি চিরকাল। শিশিনিতে আলতা থাকে, কখনো শুনিনি। কালে কালে কতই দ্যাখলাম। কিন্তু বড় চমৎকার মানিয়েছে তোমার পায়ে বৌ—এমনি টুকটুকে রং, যেন জগদ্ধাত্রী পিরতিমের মত দেখাচ্চে—

এ সব ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা।

শীতের সকালবেলা। ওদের বড় ঘরের দাওয়ায় ছেঁড়া মাদুরে ছেঁড়া কাঁথা গায়ে নিস্তারিণী শুয়ে আছে। সংসারের সাবেক অবস্থা আর নেই, হরি যুগী বহুদিন মারা গিয়েচে—হরি যুগীর একমাত্র ছেলে সাধনও আজ তিন-চার বছর একদিনের জ্বরে হঠাৎ মারা গিয়েচে। সুতরাং নিস্তারিণী এখন স্বামী-পুত্রহীনা বিধবা। তার শাশুড়ী এখনও বেঁচে আছে, আর আছে এক বিধবা জা, জায়ের এক মেয়ে, এক ছেলে।

পঁয়ত্রিশ বছর আগের সে উচ্ছলযৌবনা, সুন্দরী গ্রাম্য বধূটিকে আজ আর রোগগ্রস্তা, শীর্ণকায়া, মলিনবসনা প্রৌঢ়ার মধ্যে খুঁজেও পাওয়া যাবে না। হরি যুগীর মৃত্যুর সঙ্গে তাদের সে গোয়ালভরা গোরু ও গোলাভরা ধান অন্তর্হিত হয়েচে—ঘরের চালে খড় নেই, তিন-চার জায়গায় খুঁচি দেওয়া খসে-পড়া চালে বর্ষার জল আটকায় না। গত বর্ষায় চালের ওপর উচ্ছেলতা গজিয়ে একদিকে ঢেকে রেখেচে, মাটির দাওয়ার খানিকটা ভেঙে পড়েচে, পয়সার অভাবে সারানো হয়নি। কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলে। সংসারের কর্তা, যার আয়ে সংসারের শ্রী, সে চলে যাওয়ায় নিস্তারিণীর আদর এ বাড়ীতে আর নেই। আগে ছিল সে-ই সংসারের কর্ত্রী, এখন তাকে পরের হাত-তোলা খেয়ে থাকতে হয়—তার ছেলে সাধন বাপের মনোহারী দোকান আর কলাবাগান কোনো রকমে বজায় রেখেছিল।

তিন বছর আগের এক ভাদ্র মাসে খুব বৃষ্টির পরে সাধন নদীর ধারে কলাবাগানে কাজ করতে গিয়ে সেখানে মারা যায়। কেন মারা যায় তার কারণ কিছু জানা যায়নি। সন্ধ্যা পর্যন্ত সাধন ফিরলো না দেখে তার ঠাকুরমা নাতিকে খুঁজতে বার হচ্চে এমন সময় বেলেডাঙার দুজন মুসলমান পথিক এসে খবর দিলে—সাধন মুখ গুঁজড়ে কলা-বাগানের ধারের পথে কাদার ওপরে পড়ে আছে—দেহে বোধ হয় প্রাণ নেই।

সকলে ছুটতে ছুটতে গেল। গ্রামের লোক ভেঙে পড়লো। সকলে গিয়ে দেখলে সাধন সত্যিই উপুড় হয়ে কাদার ওপর পড়ে, সর্বাঙ্গে কাদা মাখা, তার ওপর দিয়ে এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গিয়েচে। যেখানে শুয়ে আছে সেখানটা রক্ত প'ড়ে অনেকখানি জায়গা রাঙা, খানিকটা বৃষ্টির জলে ধুয়েও গিয়েচে। রক্তটা পড়েচে সাধনের মুখ থেকে।

গরীবের ঘরের ব্যাপার, দুদিনেই মিটে গেল। সংসারের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়লো ক্রমে—বাড়ীতে উপার্জনক্ষম পুরুষ মানুষের মধ্যে বাকী কেবল হরি যুগীর ভাই যুগলের ছেলে বলাই। যুগলও বহুদিন পরলোকগত, দাদার মৃত্যুর পর-বৎসরেই সে বিধবা স্ত্রী ও দু' বছরের শিশুপুত্রকে রেখে মারা যায়। বলাই এখন ষোলো বছরের বেশ কর্মঠ স্বাস্থ্যবান বালক।

নিস্তারিণীকে এখন আদর করে 'নিস্তার' বা 'বড়বৌ' বলে কেউ ডাকে না—যে ডাকতো সে নেই। এখন তার নাম 'সাধনের মা'। কেউ ডাকে পিণ্টুর ঠাকুমা। পিণ্টু সাধনের শিশুপুত্র—এখন তার তিন বছর বয়েস। সাধনের বিধবা বৌয়ের বয়স এই সবে সতেরো।

নিস্তারিণী ডাক দিল—ও পিণ্টু, পিণ্টু—

পিণ্টু উঠানের আমতলায় খেলা করছিল, কাছে এসে বল্লে—কি ঠাক্‌মা?

—তোর মাকে একবার ডেকে দে—

পিণ্টুর ডাকে তার মা এসে দাওয়ার ধারে দাঁড়িয়ে বল্লে—কি হয়েচে, ডাকচো কেন?

—আমি আজ দুটো ভাত খাবো, বল্‌ তোর ঠাকুরমাকে—

পুত্রবধূ ঝঙ্কার দিয়ে বল্লে—ভাত বল্লিই অমনি ভাত, খাবা কোথা থেকে? সে আমি বলতে পারবো না ঠাকুরমাকে।

—তবে একগাল খই কি চিঁড়েভাজা যা হয় দে এখন—খিদেয় মলাম—

—হ্যাঁ, আমি তোমার জন্যি বামুনপাড়ায় বেরুই লোকের দোর দোর। অসুখ হয়েচে চুপ ক'রে শুয়ে থাকো বাপু।

ওরা ওই রকম। সাধনের বৌ মুখঝঙ্কার দেয়, তাকে একেবারেই মানে না। সেকালের আর একালের মেয়েতে কি তফাৎ, তাই সে ভাবে এক এক সময়ে। তারও একদিন সতেরো বছর বয়স ছিল, কখনো শাশুড়ীর একটা কথার অবাধ্য হতে সাহস হ'ত তার? আশ্চর্যি।

একটু পরে নিস্তারিণীর শাশুড়ী এসে দূরে দাঁড়িয়ে বল্লে—বলি, হ্যাঁ বৌ, তোমার আক্কেলখানা কি? আজ নাকি ভাত খেতে চেয়েচ? জ্বর রয়েচে চব্বিশ পহরের জন্যি। ভাত খেলেই হল অমনি?...বলি, সোয়ামী খেয়েচ, পুত্তুর খেয়েচ, দেওর খেয়েচ—এখনো খাওয়ার সাধ মেটেনি তোমার?

নিস্তারিণী বড় দুর্বল হয়ে পড়েচে অসুখে—তবুও সে বল্লে, সোয়ামী-পুত্তুর তো তুমিও খেয়েছিলে, তবুও তিন পাথর ক'রে ভাত মারো তো তিনটি বেলা। লজ্জা করে না বলতি?

নিস্তারিণীর শাশুড়ী এ'কথার উত্তরে চীৎকার ক'রে গালাগালি দিয়ে এক কান্ডই বাধালে। সাধনের বউকে ডেকে ব'লে দিলে—ওকে কিছু খেতে দিবিনে আজ ব'লে দিচ্চি। এ সংসারে যে খাটবে, সে খাবে। আমরা সবাই মায়ে ঝিয়ে খাটি, ও শুধু শুয়ে থাকে। রোগ নিয়ে শুয়ে থাকলি এ সংসারে চলে না। তার ওপর আবার যে সে রোগ নয়, ওকে বলে পান্ডুর রোগ। মুখ হলদে, হাত পা ফুলেচে, ও কি সহজ রোগ? ও আর উঠবেও না, খাটবেও না, কেবল শুয়ে শুয়ে পাথর পাথর খাবে।

নিস্তারিণী ব'ল্লে—খাবো—খাবো, বেশ করবো। আমার খোকা কলাবাগান সামলে রাখতো, তারই আয়ে বাড়ীসুদ্ধ খাওনি? সেই কলাবাগান তদ্বির করতে গিয়েই বাছা আমার চলে গেল। তোমরা ওদের বাপছেলের রক্ত জল করা কলাবাগান, মনিহারি ব্যবসা ঘোচালে। এখন আমায় বসিয়ে খেতে দেবে না তো কি করবে? নিশ্চয়ই দিতে হবে।

—বাসি আখার ছাই খেয়ো দেবো। ডাইনি রাক্ষুসি—আমার সংসার তোর দিষ্টিতে জ্বলে পুড়ে গেল—নইলে কি না ছেল, গোলাভরা ধান ছেল না? হাঁড়ি ভর্তি ডালডুল, গোয়াল ভর্তি গোরু ছাগল—ছেল না কি?

উভয় পক্ষের চেঁচামেচি শুনে ওর জা নির্মলা সেখানে এসে পড়লো। এটি হরি যুগীর ছোট ভাই যুগলের বিধবা স্ত্রী। এর একমাত্র পুত্র বলাই এই সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম পুরুষ মানুষ। বলাইয়ের বয়েস এই উনিশ বছর।

বলাই বাঁশ কিনে গাড়ী বোঝাই দিয়ে রেলস্টেশনে নিয়ে যায়, সেখান থেকে মালগাড়ীতে উঠিয়ে কলকাতায় পাঠায়। গত বছরখানেক এ ব্যবসা ক'রে সে গোটা পঞ্চাশ টাকা হাতে জমিয়েচে—মার হাতেই এনে দিয়েচে সে টাকা। নির্মলা আবার সে টাকাটা থেকে কুড়িটি টাকা শাশুড়ীকে দিয়েচে। বুড়ী সেই টাকায় পাশের গ্রাম থেকে দুধ কিনে এ গ্রামের ব্রাহ্মণপাড়ায় যোগান দেয়, তাতেও সামান্য কিছু লাভ থাকে। বুড়ীর বয়স সত্তর ছাড়িয়ে গেলেও সে এখনও দুপুর রোদে সারা পাড়া, সারা গ্রাম ঘুরে বেড়ায়—দূর দুরান্তরে চাষাগাঁয়ে হাঁসের ডিম, মুরগীর ডিম সংগ্রহ করতে যায় ব্রাহ্মণপাড়ায় বিক্রির জন্যে।

নির্মলা নিজেও বসে থাকে না, তিনু গাঙ্গুলীর বাড়ী ঝিয়ের কাজ ক'রে মাসে দু' টাকা মাইনে পায়।

সুতরাং এ সংসারে এখন নির্মলার প্রতিপত্তিই বেশি। নিস্তারিণীর দিন সকল রকমেই চলে গিয়েচে। এখন নির্মলার ছেলে বলাই পয়সা আনে, নির্মলা নিজে পয়সা আনে, বলাইয়ের পয়সায় ওর ঠাকুরমা দুধের যোগান দিয়ে কিছু আয় করে। নিস্তারিণী শীর্ণ পান্ডুর দেহে উত্থানশক্তিরহিত শয্যাগত অবস্থায় শুধু 'খাই খাই' করে রোগের দুষ্ট-ক্ষুধায় অবোধ বালিকার মত। হরি যুগী বেঁচে থাকলে তার যে অন্যায় আবদার খাটতো, সাধন বেঁচে থাকলেও খাটতো। আজ তার আবদার কান পেতে শোনবার লোক কে আছে এ সংসারে।

নির্মলার বয়স প'য়ত্রিশ-ছত্রিশ—বেশ ধবধবে ফর্সা, কৃশাঙ্গী, মুখচোখ ভালোই. মাথায় এখনো এক ঢাল চুল, চুলে একটিও পাক ধরে নি। যুগীদের মেয়েরা সাধারণত সুন্দরী হয়ে থাকে—নির্মলার মেয়ে তারা বেশ সুন্দরী। তারা বলাইয়ের ছোটো, এই মাত্র চোদ্দ বছর বয়েস। আজ বছর দুই হ'ল এই গ্রামেই তার বিয়ে হয়েচে।

নির্মলা এসে বল্লে—দিদি, চেঁচিও না। ঝগড়া করে মরচো কেন?

নিস্তারিণী কাঁদতে কাঁদতে বল্লে—দ্যাখ দিকি ছোট বৌ, আমায় কিনা রাক্ষুসি, ডাইনি বলে। আমি নাকি এসে ওনার সংসারে আগুন লাগিয়ে দিইচি। আমার সোয়ামী পুত্তুরের অন্ন উনি কোনো দিন বুঝি দাঁতে কাটেন নি—

নির্মলা বল্লে—সে তো তুমিও ওনাকে বলেচো। যাক্, এখন চুপটি ক'রে শুয়ে থাকো।

—ও ছোট বৌ, আমি দুটো ভাত—

—না, আজ না। তোমার গাল ফুলেচে, মুখ ফুলেচে—তুমি ভাত খাবে কি বলে আজ?

—তা হোক, তোর পায়ে পড়ি—

—আচ্ছা এখন চুপ করো, বেলা হোক। ভাত রান্না হোক, আমি বলবো অখন।

নিস্তারিণীর হাত, পা, মুখ ফুলেচে একথা ঠিকই। কি বিশ্রী চেহারা হয়ে গিয়েচে তার, ওর দিকে যেন আর তাকানো যায় না—এমন খারাপ দেখতে হয়েচে ও। যত্ন করবার কেউ না থাকাতে আরও দিন দিন ওর অবস্থা খারাপ-তর হয়ে উঠেচে। খেতে ইচ্ছে করে কিন্তু আগ্রহ ক'রে খেতে দেবার কেউ নেই। রোগীর পথ্য তো দূরের কথা, দুটি ভাত তাই কেউ দেয় না।

ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে বেলা দশটা আন্দাজ সময়ে সে নাতিকে ডেকে চুপি চুপি বল্লে—পিণ্টু, দুটো পেয়ারা পেড়ে আনতে পারিস?

পিণ্টুর মা ছেলেকে বলে—খবরদার, যাবি না বুড়ির কাছে। ওর পাণ্ডুর রোগ হয়েচে, ছোঁয়াচে রোগ। ছেলে খেয়ে বসে আছে ডাইনি, আবার নাতিকে খাবার যোগাড় করচে। ঠ্যাঙ ভেঙে দেবো যদি ওর কাছে যাবি—

বেলা দুপুরের পরে সে ভীষণ জ্বরে বিকেল পর্যন্ত অঘোরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইল—কখন যে এ বাড়ীর লোক খাওয়া দাওয়া করেচে তা সে কিছুই জানে না। যখন তার খানিকটা জ্ঞান হ'ল, তখন ভাদ্র মাসের রোদ প্রায় রাঙা হয়ে উঠোনের আমগাছটা. বাঁশঝাড়গুলোর আগায় উঠে গিয়েছে। মুখের কাঁথাটা খুলে দিয়েই ও চিঁ চিঁ ক'রে প্রথমেই ডাকলে—ও পিণ্টু, পিণ্টু—

পিণ্টু কোথা থেকে ছুটে এসে বল্লে—কি ঠামা?

—আমার জন্যি সেই পেয়ারা এনেলি?

—না ঠামা।

—আনিস্ নি? ছেলেমানুষ ভুলে গিয়েচিস। বোস এখানে।

কিন্তু পিণ্টু বসতে ভরসা পায় না, মা দেখতে পেলে মার খেতে হবে। সে আনমনে খেলা করতে করতে অন্যদিকে চলে গেল। একটু পরে নিস্তারিণী আবার ডাকলে—ও ছোট বৌ—ছোট বৌ—

কেউ উত্তর দিল না, কারণ এ সময়ে বাড়ীতে কেউ থাকে না।

আবার দু'বার ডাক দিয়ে নিস্তারিণী অবসন্ন হয়ে পড়লো, তার বেশি চেঁচামেচি করবার ক্ষমতা নেই।

বেশ খানিকক্ষণ পরে নির্মলার মেয়ে তারা এসে বল্লে—হ্যাঁ জ্যাঠাইমা, ডাকছিলে?

নিস্তারিণী চিঁ চিঁ করতে করতে বল্লে—কাত্রে কাত্রে মরে গেলাম। তা যদি তোমাদের একজনও উত্তর দেবে। একজন এমন রুগী বাড়ীতে রয়েচে—বোস এখানে

একটু—

তারা ওর মায়ের মত ছিপছিপে গড়নের সুন্দরী বালিকা। নতুন বিয়ের কনে, পাশেই শ্বশুরবাড়ী। নবীন যুগীর ছেলে অভিলাষ তার স্বামী। এই মাত্র শ্বশুরবাড়ী থেকেই আসছে। আসবার কারণ অন্য কিছু নয়। অভিলাষ এখুনি গরম মুড়কি মেখেচে, বালিকা স্ত্রীকে আদর করে বলেচে, তোদের বাড়ী থেকে ধামি নিয়ে আয় মুড়কি খেতে দেবো। এই জন্যেই তার আগমন। রোগগ্রস্ত জ্যাঠাইমা বুড়ীর বকুনি শুনবার জন্যে সে এখন এখানে বসতে আসেনি। সুতরাং সে বিব্রত মুখে বল্লে—ও জ্যাঠাইমা, আমি এখন বসতে পারবো না, তোমার জামাই মুড়কি মেখেচে, নিয়ে বেলেডাঙায় ফিরি করতে বেরুবে—

—তোর মা কোথায়?

—বাড়ীতে কেউ নেই। মা গাঙ্গুলী বাড়ী কাজ করতে গিয়েছে, ঠাকুমা নরহরিপুরে হাঁসের ডিম আনতে গিয়েচে—

—পিণ্টুর মা কোথায়?

—ঐ যে শিউলীতলায় বসে বাসন মাজচে—

—একটু ডেকে দিয়ে যা দিকি মা—

পরে সুর খুবই নীচু ক'রে বল্লে—মা, দুটো মুড়কি অভিলাষের কাছ থেকে নিয়ে আয় না? আমার নাম যেন করিস নে—

তারা বল্লে—সে আমি পারবো না। অসুখ গায়ে মুড়কি খাবে কি? তারপর শেষকালে ঠাক্‌মা টের পেলে আমায় বকে ভূত ঝাড়াবে। চল্লাম আমি—ও বৌদিদি, শুনে যাও জেঠিমা ডাকচে—

পুত্রবধূ বিরক্ত মুখে এসে দূরে উঠোনে দাঁড়িয়ে বল্লে—বলি ডাকের ওপর ডাক কেন অত? আমার সংসারে কাজকর্ম নেই, না তোমার কাছে বসে থাকলে চলবে? কি বলচো বলো—

নিস্তারিণী কাতরসুরে বল্লে—তা রাগ করিস নে আমার ওপর বৌমা—আমায় দুটো ভাত দে—

—দিই। জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছ, ভাত না খেলে কি চলে!

—তবে আমি কি খাবো, খিদে পায় না?

—আমি জানিনে। আদিখ্যেতার কথা শোনো। খিদে পায় তা আমি কি করবো? ঠাক্‌মা এলে বলো! ঠাক্‌মা না বল্লি আমি ভাত দিতি পারবো না।

—পিণ্টু কোথায়? একটু ডেকে দে আমার কাছে—বড্ড ইচ্ছে করে দেখতি—

পুত্রবধূ ঝঙ্কার দিয়ে ব'লে উঠলো—অত সোহাগে আর কাজ নেই। ছেলের মাথা খেয়ে বসে আছে, এখন নাতিটি বাকি!

নিস্তারিণী মিনতির সুরে বল্লে—অমন ক'রে বলতি নেই, বৌমা। তা দে ডেকে, কিচ্ছু হবে না, দে একবার ডেকে—

পুত্রবধূ হাত পা নেড়ে বল্লে—না—না—হবে না। তোমার পাণ্ডুর রোগ হয়েচে, বিশ্রী ছোঁয়াচে রোগ। আমি ছেলে পাঠাতি পারবো না তোমার কাছে। গেলি আমারি যাবে—তোমার কি?

কথা শেষ ক'রেই মুখ ঘুরিয়ে পুত্রবধূ চলে গেল। নিস্তারিণীর দুই চোখ দিয়ে ঝর ঝর ক'রে জল গড়িয়ে পড়ে' ছেঁড়া, ময়লা, তেলচিটে বালিশটা ভিজিয়ে দিলে। এমন কথাও লোককে লোকে বলে—তাও নিজের পুত্রবধূ। সাধনের নাম রেখেচে ওই ধুলো-গুড়োটুকু—ওই অবোধ শিশু। মা সাতভেয়ে কালী, তার মঙ্গল করুন, মঙ্গল করুন। সে না তার ঠাকুরমা? বৌমা বলে কিনা, গেলে তারই যাবে!

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে নির্মলা বামুন বাড়ীর কাজকর্ম সেরে ফিরে এল। বড় জায়ের কাছে গিয়ে বল্লে—কেমন আছ দিদি? দেখি, গা দেখি—

নিস্তারিণী না-ঘুম না-জ্বরে আচ্ছন্নমত হয়ে পড়ে ছিল, পকালে ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ পেয়ে জেগে উঠে বল্লে—কে? ছোট বৌ? তুই আবার আমায় ছুঁলি কেন, তোর পাছে পাণ্ডুর রোগ হয়—আজ আমায় বৌমা বলেছে—হ্যাঁ ছোট বৌ, সাধনের ছেলে আমার কেউ নয়? বলো তুমি—

নিস্তারিণী নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলো। নির্মলা বল্লে—চুপ করো চুপ করো দিদি, সবই তোমার কপাল। পিরতিমের মত বৌ ছিলে, সব তো দেখেচি। স্বভাব চরিত্তির সম্বন্ধে কেউ একটা কথা বলতি পারে নি কোনো দিন।

—কেন, দেওরদের কোলেপিঠে করে মানুষ করি নি? আমি যখন ঘর করতি এলাম, তোর সোয়ামী তখন ন' বছরের ছেলে। আমার পাত থেকে বেগুন পোড়া ভাত মেখে খেতো—আর আজ আমি হইচি নাকি ডাইনি—

—চুপ করো দিদি। এসব কথা আমি সব জানি। এখন কি খাবে তাই বলো—

নিস্তারিণী মিনতির সুরে বল্লে—দুটো ভাত—

—না, আমায় বকিও না। সারাদিন কাজ ক'রে দুঃখধান্দা ক'রে এলাম। দুটো মুড়ি নিয়ে এসেচি—

—শোন ছোটবৌ, অভিলাষ আজ গরম মুড়কি মেখেচে, তারা বলে গেল—

—না, সে সব হবে না। গুড়ের মুড়কি জ্বর হ'লে খায় না। দুটো তেল নুন দিয়ে মুড়ি মেখে দিগে, খেয়ে এক ঘটি জল খেয়ে আজ রাত্তির মত পড়ে থাকো। শুনেচ কাণ্ড, বাজারে নাকি চালের পালি দেড় টাকা! ভাত আর খাতি হবে না। বলাই আর কত রোজগার করবে? কি ক'রে এই বিধবার পুরী চালাবে? ধান ফুরিয়ে এসেচে, এবার আমাদের মত গরীবদের না খেয়ে মরণ।

নিস্তারিণী স্তব্ধ হয়ে শুনলে। অসুস্থতার দরুণ সে বহুদিন অবধি বৈষয়িক ব্যাপারে নিস্পৃহ, তবুও দেড় টাকা এক পালি চাল শুনে সে যেন অত জ্বরের ঘোরের মধ্যেও চমকে গেল। সেকালে যে তাদের গোলার ধান বিক্রি হয়েচে—আঠারো আনা ক'রে সরু বাঁশসলা কি চামরমণি ধানের মণ। মনে আছে একবার তার প্রথম পুত্রের অন্নপ্রাশনের জন্য গোলা থেকে পঁচিশ টাকার ধান বিক্রি হয়—পাঁচ সিকা ছিল এক মণ ধানের দাম।

নিজের হাতে সে কত ধান বিলিয়ে দিয়েচে......একবার গাঁয়ে আকাল হয়েছিল, টাকায় সাড়ে তিন সের হয়ে উঠলো চালের দাম। বামুনপাড়ার মেজ গিন্নি একদিন তাকে বাড়ীতে ডেকে বল্লেন,—"বৌ, তোমায় একটা কথা বলি। খাওয়াদাওয়ার বড্ড কষ্ট, দু'মণ ধান আমাকে ধার দিতে হবে। ঈশ্বরের ইচ্ছেয় তোমার কোনো অভাব নেই। গোলা আরও উথলে উঠুক তোমার।" সে শাশুড়ীকে লুকিয়ে দু'মণ ধান বার করে দিয়েছিল গোলা থেকে। শাশুড়ী চিরকালের খাণ্ডার, কাউকে কিছু জিনিস দেওয়া পছন্দ করতো না কখনো। কিন্তু তখনকার দিনে এ সংসারে তার প্রতিপত্তি ছিল অন্যরকম। সে যা করবে তাই হবে। তার ওপর কথা বলবার কেউ ছিল না। কোথায় গেল সে সব দিন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েচে। নির্মলা এক বাটি দুধ নিয়ে এসে বল্লে—ও দিদি, খেয়ে নাও একটু দুধ।

নিস্তারিণী বল্লে—আমার এখানে একটু বোস ছোটবৌ—কেউ বসে না।

নির্মলার বেশীক্ষণ এক জায়গায় বসবার জো নেই। এক্ষুনি সব খেতে চাইবে, শেষ রাত্রে উঠে চার কাঠা ধানের চিঁড়ে কুটতে হবে বাঁড়ুজ্যেদের।

তারপর আবার যে একা, সেই একা। সারা দিনরাত আজ একটি মাস ধরে একাই শুয়ে থাকতে হচ্ছে। নির্মলা তকে ধরাধরি ক'রে ঘরের মধ্যে শুইয়ে দিয়ে গেল।

একদিন দুদিন করে কতদিন যে কাটলো, নিস্তারিণীর কোনো খেয়াল নেই। কেবল আবছা আবছা দিনগুলো আসে, সে সব দিনের প্রতিটি মুহূর্ত যেন নিঃসঙ্গ, কেবল ছোট্ট খোকা পিণ্টুকে দেখতে ইচ্ছে করে......কিন্তু তার মা তাকে পাঠায় না, একটু বসতে দেয় না কাছে। পুত্রবধূ হয়ে শাশুড়ীকে দেখতে পারে না......তার নাকি ছোঁয়াচে রোগ হয়েছে বলে। আর কেবল সবাই বকে, সবাই বকে।

একদিন সে শুয়ে শুয়ে লক্ষ্য করলে আর আকাশে বৃষ্টি হয় না। হলুদে রঙের রোদ বাঁশঝাড়ে, আমগাছের মাথায়। তেলাকুচো লতায় সাদা সাদা ফুল ধরেছে, বলাইয়ের হাতে পোঁতা উঠোনের রাঙা ডাঁটা শাক ক্রমে ফুরিয়ে আসছে। বর্ষাকাল তা হ'লে চলে গিয়েছে।

পুত্রবধূ আমতলায় কাঠ কাটছে। জিগ্যেস করলে—ও বৌমা, এটা কি মাস?

—সে খোঁজে কি দরকার তোমার?

—বল না বৌমা?

—শেষা ভাদ্দর। তোমার কি হুঁশ পোড়েন আছে? সেদিন চাপড়া ষষ্ঠী গেল, খোকাকে তোমার আশীর্বাদ করা দরকার। তোমার কাছে গিয়ে ডাকলে, তা যদি একটা কথা বলে—

বিকেলে ও-পাড়ার বুধো গোয়ালার মা দেখা করতে এসে বল্লে—ও মা, এ কি চেহারা হয়ে গিয়েছে! আহা, কতদিন হয়েছে আসি নি—বলি, শুনচি বড্ড অসুখ, একবার দেখে আসি। উদুরী হয়েছে বুঝি, পেট যে ফুলেচে বড্ড। সোনার পিরতিমে চেহারা ছিল বৌমার। আমি তো আজকের লোক নই, যখন হরি প্রথম বিয়ে ক'রে এল—ওই আমতলায় দুধে আলতার পিঁড়িতে দাঁড়াল, বেশ মনে আছে। রূপে একেবারে ঝলক্ দিয়ে গেল যেন। সে চেহারার আর কিছু নেই। এমন নক্ষি বৌ—আহা, তার এত কণ্টও ছেল অদেষ্টে।

নিস্তারিণী যেন সব বিষয়ে নিস্পৃহ, উদাসী হয়ে পড়েছে। এ সব কথা শুনে বায় বটে, কিন্তু কার বিষয়ে কে যেন কথা বলছে। সেকালের সে বড়বৌ তো কোন্ কালে মরে হেজে গিয়েছে। সে রূপসী, লক্ষ্মীর মত সংসারজোড়া বড়বৌ কোথায় আজ?... কেবল খেতে ইচ্ছে হয়। পান্তাভাত কতকাল খায় নি। কেউ দেয় না—দেখাই করে না এসে। সন্ধ্যার পরে নির্মলা এসে একটু কাছে বসে। বলে—ও দিদি, তোমার জন্যি একটা জিনিস এনেছি মনিববাড়ী থেকে।

নিস্তারিণী ব্যগ্রভাবে বলে—কি—কি?

—চুপ করো। দুটো তালের বড়া—গিন্নি ভাজছে তা আমাকে খেতে দেলে—

—কতকাল খাইনি। দে—

নির্মলা বেশীক্ষণ বসতে পারে না, রান্নাঘরে খই ভেজে দিতে হবে জামাই অভিলাষকে। তারা ব'লে দিয়েছে—কাল মুড়কি মাখবে সকালবেলা। সে মুড়কির ব্যবসা করে, কিন্তু খই ভাজা কাজটা মেয়েমানুষের, পুরুষের নয়—ওটা শাশুড়ীর বিনা সাহায্যে সম্পূর্ণ হয় না।

রান্নাঘরে যেতে সাধনের বৌ বল্লে—কাকীমার বুড়ীর কাছে রোজ বসা চাই-ই। অমন ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে—পাপের দেহ তাই কষ্ট পাচ্ছে—নইলে ম'রে যেত কোন্‌কালে।

নির্মলা ধমক দিয়ে বল্লে—অমন বলিস্ নে বৌমা, মুখে পোকা পড়বে। সতী নক্ষি মেয়ের নামে কিছু বোলো না। তোর আপন শাশুড়ী না? তুই ও-সব কথা মুখে বের করিস্ কি ক'রে? আজই না হয় ও অমন হয়ে গিয়েচে—ও যে কি ছিল, আমি সব দেখিচি। এই সংসারের যা কিছু ঝক্কি চিরডাকাল ও পুইয়েছে। দেওরদের মানুষ করা, বিয়ে থাওয়া দেওয়া—ও না থাকলে সংসার টিকতো না। আজই না হয় ওর—

সাধনের বৌ ঠোঁট উল্টে বল্লে—হোক গে যাক বাপু। ও নিজের ছেলে খেয়েছে—ওর

ওপর আমার এতটুকু ছেন্দা নেই। যতই বলো।

—ও খেয়েছে, কি বলিস্ বৌমা? ও ছেলে খেয়েছে! যাবার অদেষ্টে যায় চলে। কার দোষ দেবো। তা হোলে তো তোকেও বলতে পারি—তুই সোয়ামী খেয়েছিস।

এই কথার উত্তরে খুড়শাশুড়ী ও বৌয়ে তুমুল ঝগড়া বেধে উঠলো।

আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি। পুজো প্রায় এসে পড়েছে। নিস্তারিণী একেবারে উত্থান-শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। দিনের অর্ধেক সময় তার জ্ঞান থাকে না। এক একবার চেতনা সজাগ হয়ে ওঠে, তখন কেবল এদিক-ওদিক চেয়ে নাতিকে খোঁজে, নির্মলাকে খোঁজে। ওর মলিন বিছানা ও সারা দেহে কেমন একটা দুর্গন্ধ ব'লে আজকাল কেউই কাছে আসতে চায় না। কেবল খাওয়ার সময় কোনোদিন নির্মলা, কোনোদিন বা সাধনের বৌ দুটি ভাত দিয়ে যায়। সেদিন ও চোখ মেলে ভাত খাবার চেষ্টা করলে—কিন্তু পারলে না। অনেকক্ষণ পরে পুত্রবধূ বল্লে—ভাত খাওনি যে, খাইয়ে দেবো?

নিস্তারিণী অবাক হয়ে গেল অসুখের ঘোরের মধ্যেও। বল্লে—তাই দে বৌমা।

সাধনের বৌ ভাত দুটি খাইয়ে এ‍ঁটো থালা নিয়ে চলে গেল। একটু পরে নির্মলা বাড়ী এল। রোগীকে দেখতে গিয়ে ওর মনে হ'ল অবস্থা ভালো নয়। আপন মনে বল্লে—ঠাকুর, ওকে মুক্তি দাও, বড্ড কষ্ট পাচ্ছে—

প্রতিদিন সন্ধ্যায় যেমন নিস্তারিণীর জ্ঞান হয় আজও তেমনি হ'ল। জা'কে অবোধ বালিকার মত আবদারের সুরে বল্লে—দুটো পান্তভাত আর ইলিশ মাছ ভাজা খাবো—

নির্মলা দু' তিন দিন চেষ্টার পরে অতি কষ্টে এই যুদ্ধের বাজারে ইলিশ মাছ জুটিয়ে এনেছিল, কিন্তু জা'কে খেতে দিতে পারে নি।

নিস্তারিণীর অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে ঝুঁকলো পরদিন দুপুর থেকে।

সে অসুখের ঘোরে কোন্ বিস্মৃত পথ বেয়ে ফিরে গেল তার যৌবনদিনের দেশে! বাঁড়ুজ্যেদের ন'গিন্নী যেন এসে হেসে হেসে বলচেন, 'আমায় আজ দু'কাঠা চাল ধার দিতে হবে বৌ। বৌমা তাড়িয়ে দিয়েচে বাড়ী থেকে—তুমি না দিলে দাঁড়াবো কোথায়?' ...যে সব লোক কত কাল আগে চলে গিয়েচে, তারা যেন এসে দিনরাত ওর বিছানার চারিপাশে ওকে ঘিরে ভিড় করচে। বহুদিন পূর্বের শরৎ-অপরাহ্নের মত হাট থেকে ফিরে ওর স্বামী যেন হাসিমুখে বলচে—ও বড়বৌ, কলা বিক্রির দরুণ টাকাগুলো এই নাও, তুলে রেখে দাও—আর এই ইলিশ মাছটা—ভারি সস্তা আজ হাটে—

ওর সব দুঃখ, সব অপমান, অনাদরের দিনের হঠাৎ আজ এমন অপ্রত্যাশিত অবসান হ'ল কিভাবে? নিস্তারিণী অবাক হয়ে যায়, বুঝতে পারে না কোন্‌টা স্বপ্ন—কোন্‌টা সত্য। সে একগাল হেসে স্বামীর হাত থেকে ইলিশ মাছটা নেবার জন্যে হাত বাড়ায়।

নির্মলা চোখ মুছতে মুছতে বল্লে—সতী নক্ষী সগ্‌গে চলে গেল—বৌমা পায়ের ধুলো নে—

তারপর সে নিজেও ঝুঁকে পড়ে মাতৃসমা বড় জায়ের পায়ে হাত ঠেকায়।

শারদীয়া আনন্দবাজার, ১৩৫০

গায়েহলুদ

শ্রাবণ মাসের দিন, বর্ষার বিরাম নেই, এই বৃষ্টি আসছে এই আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। ক্ষেতে আউশ ধানের গোছা কালো হয়ে উঠেচে, ধানের শিষ দেখা দিয়েচে অধিকাংশ ক্ষেতে।

পুঁটি সকালে উঠে একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলে—চারিদিক মেঘে মেঘাচ্ছন্ন। হয়তো বা একটু পরে টিপ-টিপ বিষ্টি পড়তে শুরু ক'রে দেবে। আজ তার মনে একটা

অদ্ভুত ধরনের অনুভূতি, সেটাকে আনন্দও বলা যেতে পারে, ছদ্মবেশী বিষাদও বলা যায়। কি যে সেটা ঠিক ক'রে না যায় বোঝা, না যায় বোঝানো। আজ তার বিয়ের গায়ে-হলুদের দিন। এমন একটা দিন তার বারো বৎসরের ক্ষুদ্র জীবনে এইবার প্রথম এল। সকালে উঠতেই জেঠিমা বলেচে—ও পুঁটি, জলে ভিজে ভিজে কোথাও যেন যাসনি ; আর তিনটে দিন কোনও রকমে ভালোয় ভালোয় কেটে গেলে যে বাঁচি।

আজ কি বার?—মঙ্গলবার! শনিবার বুঝি বিয়ের দিন। পুঁটির মনে সত্যিই কেমন হয়, আনন্দের একটা ঢেউ যেন গলা পর্যন্ত উঠে আটকে গেল। বিয়ে বেশি দূরে কোথাও নয়, এই গ্রামেই. এমন কি এই পাড়াতেই। এক ঘর ব্রাহ্মণ আজ বছরখানেক হ'ল অন্য জায়গা থেকে উঠে এসেচেন এখানে, দুখানা বড় বড় মেটে ঘর বেঁধেচেন—একখানা রান্না-ঘর। এতদিন ধ'রে সে সঙ্গিনীদের সঙ্গে সেই বাড়ীতে কুল পাড়তে গিয়েচে, সত্যনারায়ণের সিন্নি আনতে গিয়েচে, যখন পাড়ার প্রান্তের ঘন জঙ্গল কেটে সে ভদ্রলোক বাড়ী তৈরী করেন ঘাটে যাবার পথের একেবারে ডান ধারে, তখন সে কতবার ভেবেচে এই ঘন বনের মধ্যে বাড়ী ক'রে বাস করবার কার না জানি মাথাব্যথা পড়ল।

কে জানত, সেই বাড়ীটাই—আজ এক বছর এখনও পোরেনি—তার শ্বশুরবাড়ী হবে!

কতদূরে আশ্চর্যের কথা, কতদূরে বিস্ময়ের কথা, ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। অথচ তারই ক্ষুদ্র জীবনে এমন একটা মহাশ্চর্য ব্যাপার সম্ভব হল! যখনই সে এ কথাটা ভাবে তখনই সে সুদ্ধু তার মন সুদ্ধু যেন কতদূরে কোথায় চলে যায়।

ঐ ভদ্রলোকের একটি মাত্র ছেলে, নাম সুবোধ, তারই সঙ্গে ওর বিয়ের সম্বন্ধ হয়েচে। সুবোধকে এই সম্বন্ধের আগে তাদের বাড়ীতে কয়েকবার যাতায়াত করতে দেখেচে—বেশ ফর্সা, লম্বামত মুখ, এবার ম্যাট্রিক দিয়েচে, এখনও পরীক্ষার ফল বার হয় নি। আগে আগে, সত্যি কথা বলতে গেলে, সুবোধের মুখ পুঁটি তত পছন্দ করতো না। তার দাদার সঙ্গে যতবার এসেচে তাদের বাড়ীতে—পুঁটি ভাবতো—দেখো না ঘোড়ার মত মুখখানা। কিন্তু আজকাল আর সুবোধের মুখ ঘোড়ার মত ত মনে হয়ই না, মনে হয় বেশ চমৎকার মুখ। গ্রামের ছেলেদের মধ্যে অমন চোখ, অমন রং, অমন মুখের গড়ন কার আছে?

রায়েদের পাঁচি সেদিন বলেছিল তাকে—হ্যাঁরে, তুই যে বড় ঘোড়ামুখো বলতিস্, তোর অদেষ্টে শেষকালে কিনা সেই ঘোড়ামুখোই জুটল!

পুঁটি মারতে ছুটে গিয়েছিল তার পিছু পিছু।

পুঁটির বাবা গোলার দোরে দাঁড়িয়ে ধান পাড়বার ব্যবস্থা করচে। তার বাবা বেশ চাষী-বাসী গেরস্ত। পুঁটিদের বাড়ীতে চারটা বড় বড় ধানের আউড়ি আছে, গোলা আছে একটা। আউড়ি জিনিসটা গোলার চেয়ে অনেক ছোট, তিন চার বিশ ধান ধরে—আর একটা গোলায় ধরে এক পৌটি অর্থাৎ ষোলো বিশ ধান।

তাদেরও ধান আছে গোলা ভর্তি, সব ক'টা আউড়ি ভর্তি। কলকাতায় চাকুরি করেন এ পাড়ার হরিকাকা, তিনি মাঝে মাঝে গাঁয়ে এসে পুঁটির বাবাকে বলেন—আর কি রায় মশায়, এ বাজারে ত আপনিই রাজা। গোলা ভর্তি ধান রেখেচেন ঘরে, আপনার মহড়া নেয় কে? কলকাতায় 'কিউ'তে দাঁড়িয়ে এক সের চাল নিতে হচ্চে—আর আপনি—।

পুঁটি জিগ্যেস্ করেছিল—কিসে দাঁড়িয়ে চাল নিতে হয় বাবা, বলছিল হরিকাকা?

—কে জানে কিসে দাঁড়িয়ে, তুই নিজের কাজ কর, আমি নিজের করি—মিটে গেল।

—তুমি জান না বুঝি ও কথাটার মানে? না বাবা?

—না জেনেও ত পায়ের ওপর পা দিয়ে এ বাজারে চালিয়ে দিলাম মা। কলকাতার মুখ না দেখেও ত বেশ চলে যাচ্চে।

কলকাতায় নাকি মানুষের এক সের চালের জন্যে চার ঘন্টা কোথায় নাকি দাঁড়িয়ে

থাকতে হয়—কিন্তু যে বাড়ীতে তার বিয়ে হচ্ছে, তাদের অবস্থা এত ভালো নয়। সুবোধ যদি পাশ করে, তবে হরিকাকা ভরসা দিয়েচেন কলকাতায় নিয়ে গিয়ে তাকে ওঁর আপিসে চাকুরি ক'রে দেবেন। তা হ'লে তাকেও কি কলকাতায় গিয়ে বাসায় থাকতে হবে আর সেই কিসে দাঁড়িয়ে রোজ এক সের চাল নিয়ে এসে রাঁধতে হবে? সে বড় কষ্ট—তবে, মানে সুবোধ যদি সঙ্গে থাকে, সে বোধ হয় সব রকম কষ্টই করতে প্রস্তুত আছে।

তাদের ধানের গোলা থেকে ধান পাড়া হচ্চে, খাবরাপোতা থেকে সীতানাথ কলু আড়ৎদার এসেছে—ধান কিনে নিয়ে যাবে। বিয়ের খরচপত্র ধান বেচে করতে হবে কিনা।

ওর জেঠিমা বললেন—ও পুঁটি, আজ কোথাও বেরিও না। নাপিত ও-বাড়ী থেকে হলুদ নিয়ে আসবে, সেই হলুদ গায়ে দিয়ে তোমায় নাইতে হবে।

এমন সময় সাধন জেলে এসে ভিজতে ভিজতে উঠোনে দাঁড়াল। হাত জোড় ক'রে মাথা নীচু করে প্রণাম করে বলল—প্রাতপেন্নাম।

তার বাবা বললে—ও সাধন, বাবা তোমায় ডেকেছি যে একবার। আমার যে কিছু মাছের দরকার এই শনিবারে।

কি জানি কেন পুঁটির বুকটা দুলে উঠল। এই শনিবার—এই শনিবারে তা হলে সত্যিই তার—

সাধন বললে—আজ্ঞে, মাছের যে বড্ড গোলমাল যাচ্চে। গাঙে কি মাছ আছে? ডুমোর বাঁওড়ের মাছ সব যাচ্চে কলকাতায়। বিরাশি টাকা দর। এমন দর বাপের জম্মে কোনও কালে শুনি নি রায় মশায়। এক সের দেড় সের পোনা ইস্তক পড়তে পাচ্চে না। মরগাঙে বাঁধল দিয়েলাম—একদিন কেবল এক সাড়ে এগার সের গজাড় মাছ—

পুঁটির বাবা বিস্ময়ের সুরে বললে—সাড়ে এগার সের গজাড়! এমন কথা ত কখনও শুনি নি—

—অবিরত গজাড় রায় মশায়। মাছের এমন দর, গজাড় মাছই বিক্রি হয়েল দশ আনা সের।

পুঁটি আর সেখানে দাঁড়াল না। মাকে এমন আজগুবি খবরটা দিতে ছুটল বাড়ীর মধ্যে। বিষ্টি একটু থেমেচে, একটু কোথাও বেরুতে পারলে ভালো হ'ত। তার জীবনে যে একটা আশ্চর্য ব্যাপার হতে চলেচে এ কথাটা কারও সঙ্গে আনন্দ করে বলাও চলে না। বেহায়া বলবে, নিন্দে করবে। কেবল বলা চলে তার সমবয়সী পাঁচি, আর ক্ষেন্তি জে নীর মেয়ে টুনির কাছে। আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার—তার চেয়ে অন্তত সাত বছরের বড় লতিদিদির এখনও বিয়ে হয় নি—অথচ লতিদিকে সবাই বলে সুন্দরী. লতিদির বাপের অবস্থা ভালো। লতিদি লেখাপড়া জানে ভালো, গান করে, ওর বাবা যখন কলকাতায় চাকরি করত, তখন লতিদি স্কুলে পড়ত সেখানে। কত বই পড়ে বসে বসে দুপুর বেলা। পুঁটি ওদের বাড়ী যায় যখনই তখনই দেখে লতিদি বই মুখে বসে। পুঁটি ভাল লেখাপড়া জানে না, বইয়ের নাম পড়তে পারে না, লতিদি একটু ঠ্যাকারে. সে লেখাপড়া জানে না বলে বুঝি আর মানুষ না?

তাকে বলে—তুই বই-টই নাড়িস নে পুঁটি। কি বুঝিস্ তুই এর আস্বাদ?

পুঁটি হয়ত বলে—এ কি বই বল না লতিদি?

—যা যাঃ, আর বইয়ের খবরে দরকার নেই। শরৎ চাটুজ্যের নাম শুনেছিস্? কোথা থেকে শুনবি? তোরা শুধু জানিস্ ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে কি করে চিঁড়ে কুটতে হয়। তাই করগে যা—এদিকে কেন আবার?

আচ্ছা, আজ তার লতিদিকে বলতে ইচ্ছে হচ্চে—কই লতিদি, তুমি এত বই পড়ে টড়ে বসে আছ, এত সব নাম জান—কই তোমার ত আজও বিয়ে হ'ল না। আমার জীবনে এত বড় একটা আশ্চর্য কান্ড তো টুক্ করে ঘটে গেল। ধানের নিন্দে কর,

বাবার গোলায় ধান ছিল বলে ত আজ—কই তোমাদের ত—তারপর ম্যাট্রিক পাশ বর। এ গাঁয়ে পাশ করা ছেলে একমাত্র আছে মুখুজ্যেদের জীবন দা'। সে নাকি দুটো পাশ—কোথায় চাকরী করচে যেন—ঐ দিকে কোথায়। যার সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্চে, সে মুখ্যু নয়। পাশের খবর বেরুবার দেরি নেই—বাবা বলেন, সুবোধ নিশ্চয়ই পাশ করবে। হে ভগবান, তাই করো, পাশ যেন সে করে, সত্যনারায়ণের সিন্নি দেবে সে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে।

নাপিত এসে বললে—মা ঠাকরুণ, ও-বাড়ী থেকে দেখে এলাম। গায়েহলুদের লগ্ন বেলা দশটার পর। আপনাদের যা দিতে হবে তার আগে দিয়ে দেবেন।

গায়েহলুদের তত্ত্ব আসবে ওবাড়ী থেকে। কি রকম জিনিসপত্র না জানি আসে। পুঁটির মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। একখানা লাল কাপড় নিশ্চয়ই তারা দেবে। পুঁটির মোটে তিনখানা শাড়ী আর একখানা ডুরে শাড়ী আছে মায়ের বাক্সে তোলা। এবার তার অনেক কাপড় হবে, গহনাও হবে। পাঁচ ভরি সোনা দেবার কথাবার্তা হয়েচে। এতদিন দুটি দুল ছাড়া অন্য কোনও গহনা তার অঙ্গে ওঠে নি—অথচ ঐ কুমারী মেয়ে লীতিদিরই হাতে ছ'গাছা করে চুড়ি, গলায় লকেট্ ঝোলানো হার, কানে পাশা, হাতে আংটিও আছে। ও থাকতো শহরে, সেখানে মেয়েদের চালচলন আলাদা। এ সব পাড়াগাঁয়ে কুমারী মেয়েরা কাঁচের চুড়ি ছাড়া আবার কি গহনা পরে? অত পয়সাও নেই তার বাপের। গোলায় দুটো ধান আছে মাত্র, নগদ পয়সা কোথায়। যা কিছু করতে হয়, সে ঐ ধান বেচে।

ভীষণ বৃষ্টি এসেচে। সঙ্গে সঙ্গে সামান্য ঝড়। রান্নাঘরের ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে বক্‌না বাছুরটা ভিজছে। কচুপাতায় জল জমে আবার গড়িয়ে গড়িয়ে পড়চে। তাদের কৃষাণ বীরু মুচি বলচে—ও দিদি ঠাকরোণ, তা একটু তামাক দ্যাও মোরে, বিয়েবাড়ী যে মনেই হচ্চে না। দু'দশ ছিলিম তামাক পোড়বে তবে ত বোঝবো যে নগনশা লেগেচে।

পুঁটি বীরুকে ধমক দিয়ে বললে—যাঃ, তোর আর বক্তৃতা দিতে হবে না। তামাক আমি কোথায় পাবো? কাকীমার কাছে গিয়ে চাইগে যা—

একটু বেলা হয়েচে। বাড়ীতে অনেক লোক এসেচে বিয়ের জন্যে। বিয়েবাড়ীর মত দেখাচ্চে বটে—কুমোরপুরের কাকীমা, পাঁচঘরার মাসীমা তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসেচেন—আজ বেলা এগারোটার সময়ে আরও একদল আসবে, ইস্টিশানে গাড়ী গিয়েচে। মেয়েরা সবাই দল বেঁধে নদীতে নাইতে গেল। কুমোরপুরের কাকীমা যাবার সময়ে তাকে বলে গেল—বাঁড়ুয্যে বাড়ী পিঁড়ি চিত্তির করতে দিয়ে আসা হয়েচে, দেখে আসিস্ পুঁটি সে-দুখানা পিঁড়ি হয়েচে কিনা।

কাকীমার এটা অন্যায় কথা। তার লজ্জা করে না? নিজের বিয়ের পিঁড়ি নিজে বুঝি সে চাইতে যাবে? এত বেহায়া সে এখনও হয় নি।

তার বাবা চণ্ডীমণ্ডপ থেকে হেঁকে বললেন—ও পুঁটি, হাতায় করে একটু আগুন নিয়ে এস মা—

চণ্ডীমণ্ডপের দোর পর্যন্ত গিয়ে ও শুনলে ওর বাবা আর একজন অজ্ঞাত লোকের মধ্যে নিম্নোক্ত কথাবার্তাঃ

—তা হলে পাল্‌কির বন্দোবস্ত দেখতে হয়—

—আজ্ঞে পাল্‌কি কোথায় মিলবে? ষোলডুবুরির কাহারপাড়া নির্বংশ। পাল্‌কি বইবার মানুষ নেই এ দিগরে।

—তবে ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে এস বনগাঁ থেকে।

—এ কাদা-জলে দশ টাকা দিলেও আসবে না। আসবার রাস্তা কই?

—ওরা বিদেশী লোক। বর আসবার ব্যবস্থা আমাদেরই করে দিতে হবে, বুঝলে না? আমরাই পারচি নে, ওরা কোথায় কি পাবে? হিম হয়ে বসে থেকো না। যা হয়

হিল্‌লে লাগিয়ে দ্যাও একটা।

—আচ্ছা বাবু, বলদের গাড়ীতে বর আনলি কেমন হয়?

—আরে না না—সে বড় দেখতে খারাপ হবে। সে কি—না না। শুন্‌চি ওরা ইংরিজি বাজনা আনচে। বলদের গাড়ীর পেছনে ইংরিজি বাজনা বাজিয়ে বর আসবে, তাতে লোক হাসবে।

—কেন বাবু, তাতে কি? বলদের গাড়ীতে কি আর বর যায় না? একেবারে আপনাদের বাড়ীর পেছনে এসে থামবে—সেই ত ভালো।

—বলদের গাড়ীতে বর যাবে কেন? সে কি ভদ্দরলোকের বর যায়? তা ছাড়া পেছনের ও পথ আইবুড়ো পথ। ওখান দিয়ে বর আসবে না, সামনের তেঁতুলতলার রাস্তা দিয়ে বরকে আনতে হবে। তুমি আজই যাও দীকি ষষ্ঠীতলা। সেখানে ক'ঘর কাহার আছে শুনিচি। সেখান থেকেই পাল্‌কি আনাতে—

—সে যে এখান থেকে তিনকোশ সাড়ে তিনকোশ রাস্তা বাবু।

পুঁটি সেখানে আর দাঁড়ালো না। সুবোধ আসবে বর সেজে বলদের গাড়ীতে? হি—হি—সে বড় মজা হবে এখন। ধুতরো ফুলের মালা গলায় দিয়ে?

দৃশ্যটা মনে কল্পনা করে নিয়েই হাসতে হাসতে পুঁটির দম বন্ধ।

—ও তিনু—তিনু রে—শোন্ শোন্ একটা মজার কথা—

তিনু চার বছরের খুড়তুতো ভাই। উঠোনের নীচে দিয়েই যাচ্চে। সে মুখ উঁচু করে ওর দিকে চেয়ে বললে—কি লে ডিডি?

—জানিস্? এই আমাদের বাড়ী বর আসবে—

—বল?

—হ্যাঁ রে। ধুতরো ফুলের মালা পরে বলদের গাড়ী চেপে ইংরিজি বাজনা বাজিয়ে—হি—হি—

তিনু না বুঝে হাসলে—হি—হি—

এই সময়ে ওদের জ্যাঠাইমা বাড়ীর ছেলেমেয়েকে ডাক দিলেন—ওরে, সবাই এসে কাঁঠাল খেয়ে যা—ও হিমু, পান্ত ভাত কে কে খাবে ডাক দিয়ে নিয়ে আয়। এক হাঁড়ি পান্ত রয়েচে সেগুলো কাঁঠাল দিয়ে ওঠাতে হবে। ভাত ফেলতে পারবো না। এই যুদ্ধের বাজারে—

পান্ত ভাত ও কাঁঠাল পুঁটির অতি প্রিয় খাদ্য। কিন্তু আজ এখন তার খাবার নাম করবার জো নেই—খিদেও পেয়েছিল, ইচ্ছে করলে সে কলসী থেকে কাঁঠালবীচি ভাজা আর মুড়ি লুকিয়ে পেড়ে নিয়ে খেতে পারতো—কিন্তু সে ইচ্ছে তার নেই। তাতে ভগবান রাগ করবেন। আজকের দিনে সে ভগবানকে রাগাবে না।

বেলা বাড়লো। ও বাড়ীতে শাঁক ও হুলুর শব্দ শোনা গেল। অবিশ্যি খুব কাছে নয় পুঁটির ভাবী শ্বশুরবাড়ী। তা হলেও শাঁকের শব্দ না আসবার মত দূরও নয়।

ওর খুড়তুতো বোন শ্যামা বল্‌লে—ওই শোন দিদি, দাদাবাবুর গায়েহলুদ হচ্চে—

পুঁটি ধমক দিয়ে বল্‌লে—চুপ্। মেরে ফেলে দেবো। দাদাবাবু কে?

—বা-রে, হয়েচেই তো—আর তো দুদিন দেরি—

—না। তা হোক্। আগে থেকে বলতে নেই।

—জ্যাঠাইমা তো বলচে?

—কি বলচে?

—বলচে, আমাদের জামাইয়ের গায়েহলুদ হচ্চে—সেখান থেকে তত্ত্ব নিয়ে নাপিত এবার এসে পেঁাছে যাবে—

—তা বলুক গে। আমাদের বলতে নেই।

—আচ্ছা দিদি—দাদাবাবু—ইয়ে সুবোধবাবু পাশ করেছে?

—খবর এখনও বের হয় নি।

—আমি ও পাড়ার রাধীদের বাড়ী গিয়েছিলাম এই একটু আগে। রাধীর দাদা পাশ করেচে, কাল বিকেলে কলকাতা থেকে ওর কাকা খবর দিয়েচে।

—তোর দাদাবাবুর—ইয়ে মানে ওর—দূর, ওই কেশববাবুর ছেলের খবর কে পাঠাবে কলকাতা থেকে? ওদের তো কেউ নেই কলকাতায়।

একটু পরে ওদের বাড়ীতে শাঁক বেজে উঠলো, হুলু পড়লো। নাপিত তত্ত্ব নিয়ে আসচে তেঁতুলতলার পথে, বাড়ী থেকে দেখা গিয়েচে।

পুটির বুক আনন্দে দুলে উঠলো—জ্যাঠাইমা বলছিলেন, আশীর্বাদ হয়ে গেলেও বিয়ে না হতে পারে, কিন্তু গায়েহলুদ হয়ে গেলে বিয়ে নাকি আর ফেরে না।

এবার তা হোলে সেই আশ্চর্য ব্যাপারটা তার জীবনে ঘটে গেল।

কেউ আর বাধা দিতে পারবে না। পাড়াগাঁয়ে কত রকমে ভাঙ্‌চি দেয় লোকে। তার বিয়েতেও ভাঙ্‌চি দিয়েছিল। বলেছিল, মেয়ের রং কালো, মুখ-চোখ ভালো না—লেখা-পড়া জানে না—আরও কত কি। কিন্তু সুবোধ—না। ছিঃ, ও নাম করতে নেই, নাম হিসেবে মনে ভাবতে নেই।

তারপর বাকি অনেকগুলো কি ব্যাপার স্বপ্নের মত তার চোখের সামনে দিয়ে ঘটে গেল। শাঁকের ডাক, হুলুধ্বনি, মা, কাকিমা, জ্যাঠাইমা তাকে তেল-হলুদ মাখিয়ে দিলেন। গায়েহলুদের তত্ত্ব এল লালপাড় শাড়ী, তেলহলুদ, একটা বড় মাছ, এক হাঁড়ি দই। তার সমবয়সী বন্ধু তিনজন খেতে এল তাদের বাড়ী। তাকে কাছে বসিয়ে কত যত্ন করে মাছ দিয়ে, দই দিয়ে, মা জ্যাঠাইমা কত আদর করে খাওয়ালেন, কত মিষ্টি কথা বল্‌লেন। সোনার পিঁড়িতে সিঁদুর দেওয়া হ'ল. প্রদীপ দেখানো হ'ল—যাতে শূন্য ধানের গোলা সামনের ভাদ্র মাসে আউশ ধানে অন্তত অর্ধেকটা পুরে যায়। বাবা বলেন, গোলার ধান খালি হয়ে যেতো না। মধ্যে কি একটা গভর্ণমেণ্টের হাঙ্গামা এল—কেউ গোলায় ধান জমিয়ে রাখতে পারবে না। তাতেই অনেক ধান কর্জ দিতে হ'ল গ্রামের লোকজনকে।

গায়েহলুদের তত্ত্বে আরও অনেক জিনিস এসেছিল, খাওয়া দাওয়ার পরে গাঁয়ের মেয়েরা কেউ কেউ দেখতে এল—তখন সে নিজেও দেখলে। আগে লজ্জায় ওদিকেও সে যায় নি। একটা শাড়ী, একটা ব্লাউজ, সায়া একটা—আলতা, সাবান, আয়না আর গন্ধ-তেল। এ সব জিনিস তার নিজস্ব। কা'রও ভাগ নেই এতে। সে ইচ্ছে করে যদি কাউকে দেয় তবেই সে পাবে, নইলে নিজের বাক্সে রেখে দিতে পারে, কারও কিছু বলবার নেই।

সব কাজ মিটতে বেলা দুটো বেজে গেল।

পুটির মন ছট্‌ফট্ করছিল, ওপাড়ার লতিদি, হিমি, অন্নু, রাধী—এরা কেউ আসে নি—এদের গিয়ে একবার দেখা দেওয়া দরকার—যাতে তারা বুঝতে পারে যে, তার গায়ে হলুদের মত আশ্চর্য ব্যাপারটা আজ সত্যিই ঘটে গিয়েচে। আচ্ছা, যখন ইংরিজি বাজনা বাজিয়ে বর আসবে তাদের বাড়ীর দোরে তেঁতুলতলার ওই পথটা দিয়ে, বোধনতলার কাছে পাল্‌কি নামিয়ে প্রণাম করে'—বাজি পুড়বে, লোকজনের হৈ হৈ হবে—ওঃ, সে সময়ের কথা ভাবাও যায় না। দেখে যেন পাড়ার সব মেয়েরা এসে।

সে বেড়াতে বেড়াতে গেল মুখুয্যেবাড়ী। মুখুয্যেগিন্নী ওকে দেখে বল্‌লেন—কি রে পুটি, আয় মা আয়। গায়েহলুদ হয়ে গেল? আহা, এখন ভালোয় ভালোয় দু-হাত এক হয়ে গেলে—বোসো মা, বোসো।

একটু পরে লতিকাও এসে হাজির হোল। পুটিকে দেখে বল্‌লে—ও পুটি, তোর

আজ গায়েহলুদ ছিল না? হয়ে গেল? কি তত্ত্ব এল শ্বশুরবাড়ী থেকে?

মুখুয্যেগিন্নী বল্লেন—বোস্ মা তোরা। লতি, পুঁটির সঙ্গে গল্প কর। একটু চা করে আনি। যাক্, ভালোই হ'ল, আজকাল মেয়ের বিয়ে দেওয়া যে কি কষ্ট, যে দেয় সে-ই জানে!

পাশের বাড়ীর জানালা দিয়ে গাঙ্গুলীদের ছোটবৌ ডেকে বললে—ও কে, পুঁটি নাকি? গায়েহলুদ হয়ে গেল? তা কই, আমাদের একবার বলতেও তো হয়? এই তো বাড়ীর পেছনে বাড়ী—

পুঁটি বললে—গেলেন না কেন বৌদি? আমরা তো বারণ করি নি যেতে। শাঁক যখন বাজলো, তখনও যদি যেতেন—

লতিকা ভাবলে, পুঁটি ছেলেমানুষ, এ উত্তরটা ওর দেওয়া উচিত হল না। এখানে ও কথা বলা ঠিক হয় নি। কিন্তু এর পরবর্তী ব্যাপারের জন্য সে বা পুঁটি কেউ প্রস্তুত ছিল না। গাঙ্গুলীদের ছোট বৌ মুখ লাল করে উত্তর দিলে—কি বললি? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? আমরা কখনও গায়েহলুদ দেখি নি, শাঁকে ফুঁ পড়লে অমনি কুকুরের মত ছুটে যাবো তোমাদের বাড়ী পাতা পাততে! অত অংখার ভালো না রে পুঁটি! তোমার বাপের বড্ড ধানের গোলা হয়েছে, না? অমন বিয়ে আমরা কখনও কি দেখিচি জীবনে? ছেলের না আছে চাল, না চুলো—সংসারে মানুষ নেই বলে হাঁড়ি ঠেলতে নিয়ে যাচ্চে। ছেলের বিদ্যে কত, তা জানতে বাকি নেই—এবার তো ম্যাট্রিক ফেল করেচে—

এখানে লতিকা আর না থাকতে পেরে বল্লে—কে বল্লে ছোট বৌদি? সুবোধ-বাবুর পাশের খবর তো পাওয়া যায় নি?

—কেন পাওয়া যাবে না? চিঠি এসেচে ফেল করেচে বলে—ওরা সে চিঠি লুকিয়ে ফেলেচে। বিয়ের আগে ও খবর জানাজানি হতে দেবে না। উনিই হাট থেকে চিঠি আনেন। পোস্টকার্ডে চিঠি। উনি সন্দের পর সুবোধদের বাড়ী দিয়ে এলেন। আমাদের চোখে ধুলো দেওয়া—

পুঁটির চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে বিশ্বসংসার লেপে মুছে গিয়েচে। মুখরা দর্পিত ছোট বৌয়ের মুখের কাছে সে কি করে দাঁড়াবে। চেঁচামেচি শুনে মুখুয্যেগিন্নী হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন, লতিকা ওর হাত ধরে নিয়ে ঘরের মধ্যে গেল।

মুখুয্যেগিন্নী ঘরের মধ্যে এসে চাপা গলায় বললেন—আহা, ছেলেমানুষ—ওর সাধ-আহ্লাদের দিনটা অমন করে বিষ ছড়াতে আছে—ছিঃ ছিঃ—দ্যাখ তো মা লতি কাণ্ডটা—

কাঠের পুতুলের মত আড়ষ্ট পুঁটির হাত ধরে ততক্ষণ লতিকা বলচে—চল চল পুঁটি, তোকে বাড়ী দিয়ে আসি—ছিঃ, বৌদির কি কাণ্ড! ও সব কথা মনে করিস নে, মিথ্যে কথা। চল পুঁটি—ভাই—

লতিকার গলার সুরে ও কথার ভাবে কিন্তু পুঁটির মনে হল লতিদিও এ খবরটা জানে—কি জানি হয়তো গাঁয়ের সবাই জানে—সে-ই কেবল জানতো না এতক্ষণ। পথে পা দিয়েই লজ্জায় অপমানে সে ছেলেমানুষের মত কেঁদে ফেলে বললে—লতিদি, আমি কী বলেছিলাম ছোট বৌদিকে?—খারাপ কথা কিছু?

বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র প্রথম খণ্ড সমাপ্ত